CUC-H04270-15-P011/56.

বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

15

১২শ বর্ষ, প্রথম খণ্ড
শ্রাবণ ১৩৪৫—পৌষ ১৩৪৫

সম্পাদক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্

পরিচালক
শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, এম-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস্)

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক সডাক মূল্য—৬৷৵০

p11156

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ ১৩৪৫—পৌষ ১৩৪৫)

বিষয় — লেখক	পৃষ্ঠা
ন্যাস—	
নালী রঙ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৬, ১৬১, ২৮৯, ৫৬৭
জয়িনী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৭১৪
পান্থ সা'—শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	৬৩, ১৫০, ৩০৩, ৪৩১, ৭৯৬
যা : প্রমত্তা নদী—শ্রীসুবোধ বসু	১১, ১৬৯, ৩৪৯, ৪৭৯, ৫৮১, ৭৩৫
ড়কুটো—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য	২৪৪, ৩৭৩, ৪৪৭, ৫৯৭
প্রবন্ধ—	
শপ ও বিষ্ণুশর্ম্মা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	২৩০
একুশাতি প্যাড়ি—শ্রীশান্তি পাল	২১৩
কাব্য ও ছন্দ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫৭
কোন পথ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৯০
গীতার ধর্ম—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯১
গীতায় শাস্ত্রবিধি—শ্রীঅনিলবরণ রায়	৪৩০
ঘিয়ের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩০
চৈতন্য চরিতামৃতের রচনাকাল—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত	৫০
দর্শন এবং ধর্ম্ম—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ রায়	৭৪
ধর্ম্ম ও সংসার—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৬৩৭
নারী চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ	৬৫২
নীলাচলের নীলমাধব—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার	৭৪৫
প্রতিমা—শ্রীকল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৪৬৬
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	২
বঙ্কিম প্রসঙ্গ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬
বঙ্কিমের ধূমপান—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত	২৬
বঙ্গ-সাহিত্য ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী	৩৬১
বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব—শ্রীঅবনীনাথ রায়	৬৬৬
বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৭৫৯
বাংলা দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ভূমিকা—শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী	১৭৫
বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ—ডক্টর মনোমোহন ঘোষ	৭২০
বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের বিকাশধারা—শ্রীনীলরতন কর	৮১৭
বৌদ্ধযুগে শিল্পশিক্ষা—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	২৮৫
মরমী শরৎচন্দ্র—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	২২২
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন ও যশোর রাজবংশ—শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য	৪৮৪
রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশু ও বাৎসল্য—শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী	১৯১
রসসাহিত্যে পরশুরাম ও কেদারনাথ—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ	৪৯৯
রবীন্দ্রনাথের যুগ—শ্রীঅবনীনাথ রায়	৭৬১
রাসলীলা—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৪২৫
হায়দর আলি এবং তাঁহার সেনানীবর্গ—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৮, ৩০৮
শরতের রূপ—শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী	৫১৪
শরৎ-সাহিত্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান—ডাক্তার এ, গুপ্ত	৬৩১
শরীর যন্ত্রের সঙ্গতি—"ডাক্তার"	৮০৩
শ্রীনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭১০
শ্রী-র ওকালতি—শ্রীকালিচরণ মিত্র	৬৯৮
সহজ ধর্ম্ম—শ্রীপুলীনবিহারী ভট্টাচার্য্য	৩৭
সংবাদ সাহিত্যের লক্ষ্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ	২৩২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাহিত্যিক চারুচন্দ্র	শ্রীকালিচরণ মিত্র	৮২২
সেবা ধর্ম্ম	শ্রীহরিহর শেঠ	২৩৯
গল্প—		
অ-কুপর্দক	শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	১৬৭
অনুবর্ত্তন	শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	৬৬১
অপেক্ষায়	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭০
উপকার	"ভাস্কর"	৫১০
এঁদের নিয়েই ঘটনা	শ্রীহরকালী সেনগুপ্ত	২১৪
কমলালেবু	"ভাস্কর"	৮০৮
খোলা দরজা	শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৯
গল্পের প্লট	শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়	৫৭
জয়	অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮১
জীবন-দেবতা	শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র	৭৬৬
দার্জিলিং এফেক্ট	"ভাস্কর"	২০
নিরর্থক	শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী	৬২৩
পরিতপ্ত	অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
পত্রাবলী	"ভাস্কর"	৩৮৭
পরিণতি	'ইচ্ছামতি'	৮১৮
প্রতিশোধ	শ্রীকৃষ্ণ মিত্র	২৩৫
পৃথিবীর চিড়িয়াখানায়	শ্রীবিমল সেন	৬৮৩
বন্ধুত্ব	দৌলতন নেছা খাতুন	৪৯২
মর্ম্মরধ্বনি কেন জাগিলরে	শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	৩২৬
মুক্তিলাভ	শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার	৬৩৯
শান্তি ও অশান্তি	শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য	৫২৪
সতীদাহ	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫১
সাহারা	শ্রীমতী মায়া বসু	৩০
সিনিক সুকুমার	শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী	২২৭
সুজনেরো ডোবে নাও	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	১৭৯
সুলতার আত্মকথা	শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার	৮১৮

বিষয়	লেখক	পৃ
কবিতা—		
অটবী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	৭
অলক্ষিত	শ্রীমতী অরুণা সিংহ	৭
আর কতদিন বাকি	শ্রীবিজয়কুমার রায়	১
আহ্বান	শ্রীগোপাল ভৌমিক	৭৯
একমেবাদ্বিতীয়ম	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৬৩
কণা	শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ	৩২৫, ৫০২, ৬
কবিতা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩০
কলুর বলদ	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৭৮
কামাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৮
কোথা আজি তারা	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়	৮২
গান	শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী	১৩
গ্রামিক লিপিকা	শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭২
জন্মাষ্টমী	শ্রীরসময় দাশ	২১
তাহাদের ইতিহাস	শ্রীহাসিরাশি দেবী	১১১
তুমি আছ	শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত	৪২১
তোমারে কি চিনিতাম আগে	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬৫
দানের মোহ	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী	[illegible]
দিদি	শ্রীকানাই সামন্ত	[illegible]
নবজন্ম	শ্রীনারায়ণ প্রসাদ আচার্য্য	৮৭১
নবীন উষার বার্ত্তা এল	শ্রীরবিদাস সাহা রায়	১৯০
নক্সী কাঁথা	শ্রীতারাপদ মুখটী	৩৪৭
নিবেদন	শ্রীমমতা ঘোষ (মিত্র)	৭৫০
পরিহাস	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী	৮৪
পাখী	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা	১৩৭
পানের বরজ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	৪২৩
প্রতিমা	দীলিপকুমার	৬২
প্রতীক্ষা	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	১৪৮
প্রশ্ন	শ্রীমতী অরুণা সিংহ	৩৭১
প্রার্থনা	শ্রীমতী অরুণা সিংহ	৫০৯
বঙ্গদর্শন	শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৩৩৮
বাণী	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	৪৩৮
বিদায় শেষে	শ্রীমতী—	৩৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিসর্জ্জন	শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৮৮
বিস্ময়	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	১৪৯
বিকাশ	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র	৬৮৭
বিলুপ্তি	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	৮৪২
ব্রাউনিংএর তিনটী কবিতা	শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী	১৬৬
বন্দেমাতরম	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৮
ব্যাকরণের অন্ত্যেষ্টি	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	১৯৭
বনের গহনে	শ্রীমতী অরুণা সিংহ	৭৬৪
মহাত্মা গান্ধী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৮
মুখবন্ধ	শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৮
মুক্তি-সাধক বঙ্কিম	শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী	৬০৮
মৌন	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	২৮৪
যাত্রা	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	২৩৪
রজনীগন্ধা	শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত	৪৮
রাখী	শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ	১৬০
লুকোচুরি	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	২৮৪
হঠাৎ মিলন	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
হে পরম আত্মীয়	শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৬
হেমন্ত রায়	শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ	৬২২
হেলেনের ভুল	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৬৩০
হেমন্তে	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫১
হৈমনী	শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী	৪৭৫
শরতের বাণী	কমলরাণী মিত্র	৩৩৯
শারদ-শ্রী	বিমলচন্দ্র ঘোষ	১৭৪
শিবানী	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা	২৭৭
শিল্পী	শ্রীকানাই সামন্ত	৫৭৫
শেষ সাধ	শ্রীবাসন্তী দেবী	১০৮
সনেট বৈচিত্র্য	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা	৭
সনেট	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী	৪৮৩
সত্য মিথ্যা	শ্রীবিভু কীর্ত্তি	৪৬৪
সন্ধান	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	৪৩৮
সুখ দুঃখ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	৪০৬
সুর ও কথা	নিশিকান্ত	৬১১
সূর্য্য-বন্দনা	শ্রীমতী সাহানা দেবী	২৪৩
সৃষ্টি	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র	৪৩৯
জীবনী—		
রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	৫৭৩
শিকার-কাহিনী—		
হিমালয়ের বাঘ	শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭৭
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—		
আধুনিক চিত্রকলায় বাঙ্গলা দেশ	শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৪২
চিত্রশিল্পে হিন্দুমুসলিম সঙ্গম	শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৩৫১
চীন জাপানে যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ	পি, সি, সরকার	৫০৩
ডানিয়ুবের উদয়লক্ষ্মী	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৭৮১
নর্থ বেঙ্গল	শ্রীঅবনীনাথ রায়	২০১
নব্য জাপানের প্রতি আধুনিক খুটিনাটী	পি, সি, সরকার	৩৬৫
প্যারিস	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৭২৪
ভিয়েনা	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৯৩
মিশর দেশ	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৮৯
রিভিয়েরার স্মৃতি	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৬১০
দেশের কথা	শ্রীসুশীলকুমার বসু	২৬৬, ৪০৭, ৫৪৬, ৮৩৫
বৈদেশিক	শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র	২৭০, ৪১২, ৫৪৯, ৬৭৭
খেলাধুলা	শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১২৯, ২৬৪, ৪০৪, ৫৬০
ছায়াপট	'বাণীনাথ'	২৫৫, ৩৯১, ৫৩৫, ৬৬৯, ৮২৬
পুস্তক পরিচয়—		১৩১, ২৭৪, ৪১৮, ৫৫২, ৭০০
নানাকথা—		১৩৩, ২৭৫, ৪২১, ৫৬২, ৭০২, ৮৪৬
চিত্র-সূচী—		
শকুন্তলা	শিল্পী মিঃ ডি, এ, মলি	
সমর্পণ	শিল্পী শ্রীকুলজারঞ্জন চৌধুরী	
রঙের খেয়াল—		
জননী—		
রাধাকৃষ্ণ	শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীশ্রীদুর্গা—		
ছেলেমেয়েদের পাঠ গ্রহণের দৃশ্য—		
কুমারী মেরী	লিওনার্দো দা ভিঞ্চি	

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৪৫ | ১ম সংখ্যা

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

হঠাৎ মিলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে;
তোমার নৌকো ভরা পালের ভরে
সুদূর পারের হতে
কোন্ অবেলায় এল উজান স্রোতে।
দ্বিধায় ছোঁওয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি,
নিবিড় সুখের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি'।
দুঃসহ বিস্ময়ে
ছিলাম স্তব্ধ হয়ে,
বলার মতো বলা পাইনি খুঁজে;
মনের সঙ্গে যুঝে
মুখের কথার হোলো পরাজয়।

তোমার তখন লাগল বুঝি ভয়,
বাঁধন-ছেঁড়া অধীরতার এমন দুঃসাহসে
গোপনে মন পাছে তোমায় দোষে।
মিনতি উপেক্ষা করি' ত্বরায় গেলে চলে
"তবে আসি" এইটি শুধু ব'লে।
তখন আমি আপন মনে যে গান সারাদিন
গেয়েছিলেম, তাহারি সুর রইল অন্তহীন।
পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে, তারি কলস্বর
দূরের থেকে পূর্ণ করে বিজন অবসর॥

আলমোড়া
২৭ মে, ১৯৩৭

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মহাকাব্যযুগে শিক্ষার ধারা

বৈদিকযুগে যে ধারায় শিক্ষা চলিয়াছিল তাহাই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া সূত্রযুগে পৌঁছিয়াছিল। সূত্রযুগের শিক্ষা-পদ্ধতি রামায়ণ ও মহাভারতকালে একরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। গৃহ্যসূত্রগুলিতে ছাত্র-জীবনের চিত্র বেশ উজ্জ্বল, সম্যক্ পরিস্ফুট। এই সূত্রগুলিতে চতুরাশ্রমের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক সময়ের কার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক উপদেশ আছে। ছাত্রজীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির একটুও বাদ পড়ে নাই।

সন্তান-জন্মের পর দেড়মাসকাল মাতা অশুচি থাকেন। এ সময়ে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। শিশুকে এই সময়ে অতি সাবধানে রাখা প্রয়োজন। জাতকর্মের পর মাতা ও শিশু শুদ্ধ হন। নিষ্ক্রমণের সময় শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে আনিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। একবর্ষ পূর্ণ হইলে উন্মুক্ত স্থানে চাঁদের আলোতে শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। তিন বা পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার চূড়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিদ্যালয়ের সহিত তাহার পরিচয়। এই বিদ্যালয় হইতেই তাহার খুব বাঁধাধরা জীবনের আরম্ভ হয়। ভোর হইতে না হইতেই তাহাকে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে হয়। তারপর সকল কাজ একটা বাঁধাধরা নিয়মের উপর করিতে হয়। দাঁতমাজা নিয়মিত হওয়া চাই—আহার শয়ন, সবই নিয়মিত হওয়া চাই। এখন হইতে ধর্মকথা উপকথাচ্ছলে তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। আর এই সময় হইতেই সহজ ধর্মভাব তাহার মন অধিকার করে। ইহার মূল্য যে কত আজিকার দিনে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইতেছে।

গৃহে এই প্রথম জীবনে শিশু মাতার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে যে, প্রকৃতির সকল কিছুর সহিত তাহার আন্তরিক ঐক্য আছে। প্রকৃতির সহিত এই সহজ মিলের জন্যই তাহার জীবনও সহজ হয়। ক্রমশঃ সে গৃহপালিত সকল জীবের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে, গল্পচ্ছলে গাছ পাতা জীবজন্তু তাহার মনের কোণে বাসা বাঁধে—এগুলিও তাহার জীবনের একটা অংশ হইয়া ওঠে। সে নিজের মনে বুঝিয়া ফেলে—ইহাঁদেরও প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখ আছে; ইহারা তাহারই মত বাঁচিয়া আছে। প্রকৃতির অন্তরে যে দেবতা আছে সেই ভগবান্‌কে—নদী, পর্বত, ঝটিকা-ঝঞ্ঝার কাহিনী ধীরে ধীরে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। সন্তানপালনে পিতামাতার দায়িত্ব যে কত তাহার সীমা নাই। এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শৈশব হইতে শিশুকে ঘর-সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত না। তাই তাহাকে তেমন কোন শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইত না। তাহাকে শুধু মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার তালিকা ছিল এইরূপ—লিপি, স্তুতি, শব্দার্থ ও শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ (নিরুক্ত); ব্যাকরণের মোটা মোটা কথা ইত্যাদি।

বর্ণানুসারে দীক্ষার বয়স নিরূপিত হইত। ব্রাহ্মণ-সন্তান ৮ হইতে ১৬, ক্ষত্রিয় ১১ হইতে ২২ এবং বৈশ্য ১২ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিত। আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন, পারস্কর ও গোভিল-গৃহ্যসূত্রে দীক্ষা-গ্রহণের বয়সের নিয়ম আছে। বৎসর-বিশেষে দীক্ষা-গ্রহণের একটা ব্যাখ্যাও ছিল। আপস্তম্ব বলেন, ৭ বৎসরে দীক্ষায় বিদ্যোন্নতি হয়, ৮ বৎসরে দীর্ঘজীবন, আর ৯ বৎসরে দীক্ষা হইলে প্রচুর বল ইত্যাদি লাভ হয়।

দীক্ষার সময় হইতে নব-জীবনের আরম্ভ। তখন আর পিতা-মাতা পুত্রের পাপের শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ

করিবেন না। অবশ্য এমন নির্দেশও আছে যে, ১৫ বৎসর বয়স্ পর্যন্ত দীক্ষিত নিজ প্রায়শ্চিত্তের অর্ধ পরিমাণমাত্র পালন করিবে এবং তারপর হইতে পূর্ণ মাত্রায় পালন করিবে। এরূপও দেখা যায় যে ১১ বৎসর বয়স হইতেই তাহার সত্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে।

দীক্ষার সময় বালকটীকে লইয়া একটী সামাজিক ভোজ হইত। বালকটীর ক্ষৌরকার্য হইত এবং তারপর তাহাকে স্নান করাইয়া দিয়া একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হইত। এই বস্ত্রখানি কিন্তু যে-সে বস্ত্র হইলে চলিত না। একদিনের মধ্যে তুলা ধুনিয়া তাহা হইতে সূতা কাটিয়া এবং সেই দিনের মধ্যেই বস্ত্রবয়ন সমাপ্ত করা হইত। এইরূপ কাপড়ই তাহার পরিধেয় হইত। এই যুগে বস্ত্রবয়ন সর্ব-সাধারণ গৃহ-শিল্প ছিল, আর গৃহবাসী সকলের বস্ত্রের ভার রমণীদের উপর ছিল। তখন সঙ্গীত সকলেই শিক্ষা করিত। সঙ্গীতের আনন্দধ্বনিতে সকল গৃহই মুখরিত থাকিত। তরুণ ব্রহ্মচারীকে একটী কটি-বেষ্টনী দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ হইলে সেটী হইত পবিত্র তৃণের, ক্ষত্রিয় হইলে জ্যারজ্জুর এবং বৈশ্য হইলে সেটী পশমের হইত। তাহাকে একটী দণ্ডও দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ হইলে সেই দণ্ডের দৈর্ঘ্য হইত নাসিকা পর্যন্ত, ক্ষত্রিয় হইলে কপাল পর্যন্ত এবং বৈশ্য হইলে মস্তক পর্যন্ত। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ডটী হইত বিল্ব কিংবা পলাশ-বৃক্ষের, যদি সে ক্ষত্রিয় হইত, তাহা হইলে দণ্ডটী হইত ন্যগ্রোধের, আর বৈশ্যের ব্যবহার্য ছিল উদম্বর বা অশ্বত্থের দণ্ড। বস্ত্র-সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার ছিল। দীক্ষার সময় বালকের নূতন নামকরণ হইত। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বালকের জন্য এই সময় বহু উপদেশ পাওয়া যায়। সকল উপদেশের সার কথা ছিল দেহ ও মনের উন্নতি। ধর্মশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, 'দিবসে ঘুমাইও না, মানসিক উন্নতির জন্য দৃঢ়-মন হও।' এই ব্রহ্মচারি-জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে উপদেশ আছে। যথা—দিনে ৫ বার মুখ ধুইতে হইবে, শয়নের পূর্বে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে হইবে, মাংস খাইতে পারিবে না, সন্ধ্যায় নিদ্রায় আয়ু হানি করে, ব্রহ্মচর্য অবশ্য পালনীয়, জিহ্বা কখন যেন মিথ্যা উচ্চারণ না করে। ব্রহ্মচারীর কঠিন জীবনে প্রয়োজনীয় সকল উপদেশই দেওয়া হইত। দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য, দয়া ও নম্রতার ব্রত গ্রহণের জন্যই এই ব্রহ্মচারীর জীবন। সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইত, জীবন যেন সার্থক হয়। এই সবিতৃ-উপাসনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বর্ণানুসারে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দে গাহিয়া গাহিয়া করিতে হইত।

এই দীক্ষার নাম ছিল উপনয়ন। বৈদিক যুগে ইহার অস্তিত্ব থাকিলেও ব্রাহ্মণে উপনয়নের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকম আচারের ব্যবস্থা অবেস্তায়ও আছে। তবে অবেস্তায় দীক্ষার বয়স কিছু বেশী এবং গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ ১৮ মাস হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত।

শিষ্যকে ভিক্ষা করিতে হইত। গুরুর প্রয়োজনীয় সকল জিনিসও সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাকে এমনিভাবে জীবনযাপন করিতে হইত যাহাতে তাহার জিহ্বা, হস্ত এবং উদর তাহার বশে থাকে। তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত। বেশী কথা, পরনিন্দা, দ্যূত, নিষিদ্ধ খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে সে সকল সময় অবহিত থাকিত। নৃত্য, উৎসব, জনতা ইত্যাদি তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান ছিল। কিন্তু সকলে সকল সময় এত খুঁটিনাটির ব্যাপারে নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিত না। ত্রুটি হইয়া পড়িত। সেগুলি ক্ষন্তব্য ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের চ্যুতি ঘটিলে তাহার নিস্তার ছিল না। একটী গর্দভ বলি দিয়া তাহাকে ঐ গর্দভের চর্ম পরিধান করিতে হইত। তাহার উপর লেজটী উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া পূর্ণ এক বৎসর তাহাকে নিজ পাপ-ঘোষণা করিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। এই সময় ব্রহ্মচর্যই শিক্ষার ভিত্তি ছিল। বেদের ন্যায় বেদান্ত ও সকল গৃহ্যসূত্রই ব্রহ্মচর্যকে শিক্ষার ভিত্তি বলিয়াছে। বেদাধ্যয়নের কালও নিরূপিত ছিল। মনের উৎকর্ষ যেমন লক্ষ্য ছিল, দৈহিক ব্যায়াম-প্রাচুর্যও তখন শিক্ষাজীবনে দেখা যাইত। শিক্ষার নীতি এই ছিল যে কামোত্তেজক বিলাসিতার নামগন্ধ শিক্ষা-জীবনে থাকিবে না।

প্রচুর অনধ্যায় দিবসের পরিচয় পাওয়া যায়। আরম্ভে ও শেষে তিন রাত্রি, অষ্টকে ও ঋতুশেষে একদিন ও এক রাত্রি অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। প্রতিপদ্, চতুর্দশী ও পূর্ণিমায় অধ্যয়ন হইবে না। মেঘাকুল আকাশ ও বজ্রগর্জনে দেড়

দিন পাঠ বন্ধ। শিষ্যের অপবিত্রতার কারণ, স্থানীয় রোগ বা মৃত্যু ঘটিলে অনধ্যয়ন।

বহু প্রকারের শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষকের গুণ-নির্দেশক বচনও অনেক পাওয়া যায়। গুরুর দায়িত্ব যে কত বেশী বার বার তাহা বলা হইয়াছে। আচার্যই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি শিক্ষার জন্য কোন বেতন বা অর্থ গ্রহণ করিবেন না। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ-রূপ নিয়মের পরিচয় কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গুরু আচার্যের সমান বিদ্বান্—তিনি শিষ্যের নৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগী। উপাধ্যায়কে কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য হয়তো সামান্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইত। আর যাঁহার নাম শিক্ষক তিনি নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা-বিষয়ে যে কোন গোঁড়ামি ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। পাণিনি গুরুর যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে আস্তিক, নাস্তিক ও দৈশিক সকলেই গুরু হইতে পারিতেন। বিদ্যার জন্য নাস্তিক গুরুকরণে কোন বাধা ছিল না। সন্দেহবাদী, বিদ্বান্ দৈশিক গুরুরও শিক্ষাদানে অধিকার ছিল। গুরুও শিষ্য গ্রহণ করিতেন পরীক্ষা করিয়া। সকল শিক্ষা যে সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে এমন বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল না। পাত্র-ভেদে যে শিক্ষার বিভিন্নতা হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ও ধারণা ছিল। উচ্চ শিক্ষা যে সকলে গ্রহণ করিবার যোগ্য নয় তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। কাহাকে কাহাকে উচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে মনুতেও তাহার ব্যবস্থা আছে। নারী এবং শূদ্রেরা সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষার যোগ্য নয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। নারীর মস্তিষ্ক নরের অপেক্ষা সাধারণতঃ আধ পোয়া কম। তাহার বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষা পুরুষের সঙ্গে এক হইতে পারে না। তাহাদের জীবনও তাহাতে বিশেষ বাধা দিবে। সেকালে শূদ্রের সংস্কৃতির অভাব স্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তখনও বিদুষী নারী ও জ্ঞানী শূদ্রের মাঝে মাঝে পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় ঘটে। হিন্দু শাস্ত্রেও আছে নীচ কুলের ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে পারা যায়। বিদুরকে গুণিজনশ্রদ্ধেয় বলিয়া মহাভারত পরিচয় দিয়াছেন।

গুরু শিষ্যের পিতৃস্থানীয়। তাহারা পরস্পরকে রক্ষা করিবে, তাই শিষ্যকে বলা হইয়াছে ছাত্র।

অশ্রদ্ধেয় লোকে জীবিকা-নির্বাহার্থ গুরু হইয়াছেন এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। আবার সাংসারিক কোন সুবিধার জন্য অথবা বিশেষ কোন লাভের জন্য ছাত্র বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন লোকেদেরও কথা শোনা যায়। তীর্থকরেরা বারংবার গুরু বদল করিত। ওদপাণিনীয়রা পাণিনি পাঠ করিত শুধু জীবিকার জন্য। ঘৃত-রন্ধ্য এবং কম্বলচারায়ণীযরা ঘৃত বা কম্বল লাভের জন্য ছাত্র হইত। কেহ কেহ আবার ছাত্রজীবন পূর্ণ হইবার পূর্বেই শিক্ষা ত্যাগ করিত। যাহারা এরূপ করিত, তাহাদের বলা হইত, খট্বারূঢ়।

অযোগ্য গুরুত্যাগে কোন বাধাও ছিল না। গুরুর বিদ্যার অভাব বা তাঁহার অনাচারে তাঁহাকে ত্যাগ করা হইত। শিষ্যকে মাত্র নিজের সুবিধার জন্য যদি গুরু অবজ্ঞা করেন এবং তজ্জন্য শিক্ষাদানে ত্রুটি ঘটে, তিনি যদি শাস্ত্রানুসারে বিদ্যানুশীলনে অবহেলা করেন, যাগযজ্ঞবিষয়ে অমনোযোগী বা কোন ঘোর পাপ করেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধা নাই। বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার জন্য, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ গুরুর নিকট শিক্ষাগ্রহণেও বাধা ছিল না।

বহু শিষ্য গুরুর গৌরবের কারণ বলিয়া গণ্য হইত। উপনিষদের যুগ হইতেই বহু শিষ্যের জন্য প্রার্থনার দৃষ্টান্ত বহুবার পাওয়া গিয়াছে। রাজা, ধনী ও সর্বসাধারণ সকল সময়েই শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, আর এই জন্যই বোধ হয় এ দেশে চিরকাল অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। কিন্তু শিক্ষানীতি সম্বন্ধে পৃষ্ঠপোষকদের কোনই হাত ছিল না। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। এই ব্যাপারটা আমরা বেশ বুঝি; যখন দেখি ভারতবর্ষে রাজা মাত্র একজন বিচারক। স্মৃতি বা আইন তিনি গড়েনও না ভাঙেন না। রাজা তুলাদণ্ডে বিচার-ব্যবস্থা করেন মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতির তিনি পালকমাত্র স্রষ্টা নহেন। পশ্চিমের

সকল দেশে রাজা বিধি-সৃষ্টি করেন; সেই বিধিকে রাজার বিধি বলা হয়। রাজাকে বিধির উপরে স্থান করা হয়। তিনি ইচ্ছামত বিধি ভাঙিতেও পারিতেন, নববিধি সৃষ্টি করিতেও পারিতেন।

সাধারণের শিক্ষা হইতে রাজার ছেলেদের শিক্ষায় কিছু পার্থক্য ছিল। সেরূপ থাকাও স্বাভাবিক। রাজার জীবনের উপযুক্ত হইবার বিশেষ শিক্ষাই রাজপুত্রদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

কৌটিল্য একটী পাঠ্য-তালিকা দিয়াছেন; তাহা প্রধানতঃ রাজপুত্রদের জন্য। উপনয়নের পরেই ত্রিবেদ-শিক্ষার আরম্ভ হইত। এখানে বেদ বলিলে বেদের ব্যাখ্যা এবং বেদ-সংযুক্ত অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝাইত। এইরূপ শিক্ষাকেই দিব্যাবদানে নিঘণ্টু ও কেটুভ বলা হইয়াছে। তারপর শিষ্ট ব্যক্তির অধীনে আহ্নিক্কিকী পাঠাভ্যাস। আহ্নিক্কিকী বলিলে সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত এবং সাধারণ দর্শন-শাস্ত্র, মনঃসংযম ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রভৃতি বুঝাইত। কৌটিল্য এই শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। ইহাতে সর্ববিষয়ে ধারণাশক্তি বাড়ে, এবং এই শিক্ষার পর, পরে অন্য কোন বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা কঠিন হয় না। অতঃপুর রাজপুত্রদের বিশেষ করিয়া শিক্ষার বিষয় ছিল বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি। বার্ত্তার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—কৃষি-জ্ঞান, গৃহ-পালিত পশু-তত্ত্ব, (বিশেষতঃ কি প্রকারে উত্তম-উত্তম শাবক সৃষ্টি করা যায়) এবং পণ্য-দ্রব্য-তথ্য। এই সকল বিষয়ের সেই সময়কার কোন বই আজকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু কৌটিল্য অন্যের মতবাদের সহিত নিজের মতবাদের বার বার তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় এই সকল বিষয়ে তখন শাস্ত্র ছিল। দণ্ড-নীতি বলিলে সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-নীতিই বুঝাইত। ইহার তত্ত্ব বা নীতি শিক্ষা দিতেন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; আর বড় বড় রাজপুরুষদের নিকট ইহার ব্যাবহারিক শিক্ষা পাওয়া যাইত। রাজ্যের বড় বড় অধ্যক্ষেরা রাজপুত্রদের শিক্ষক হইতেন।

চূড়াকরণের পরই অক্ষর-পরিচয় (লিপি) এবং অঙ্ক-(সংখ্যান) শিক্ষার আরম্ভ হইত। ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ইহার উপযুক্ত কাল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা উপনয়নের পূর্বেই শেষ হইত। উপনয়নের বয়স ছিল ৫ হইতে ৮। পাত্রবিশেষে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিলে উপনয়ন ১০ হইতে ১২ বৎসরেও হইতে পারিত।

১৬ বৎসরের পর বিবাহ হইত। তারপর দৈনন্দিন কার্য-সূচি এইরূপ ছিল—সকালের দিকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা এবং বিকালে ইতিহাস-শিক্ষা। ইতিহাস অর্থে বুঝাইত—পুরাণ (পুরুষ-পরম্পরাগত শ্রুতি), ইতিবৃত্ত (অবদান আকারে ইতিহাস), ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি এবং আন্তর্জাতিক-নীতি)।

বার্ত্তা-জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বহু স্থানে পাওয়া যায়। কৌটিল্য পূর্বশাস্ত্রকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র কার্যতঃ বার্ত্তার অন্তর্গত ছিল। অর্থনীতি সংক্রান্ত সমুদয় শাসন-বিভাগ ইহার অধীন ছিল। মাত্র উৎপাদন নয়, সুসঙ্গত বণ্টন, স্থানান্তরিত করিবার সুব্যবস্থা, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্র, পালিত পশু-চিকিৎসা। মোটা শিল্প, কামারের কাজ, ছুতারের কাজ, দড়ি তৈরী করার কাজ, উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণ, কেবল দুর্ভিক্ষ সময়ের ব্যবহারের জন্য সঞ্চয়, বাটকারা, ওজন, মাপের ব্যবস্থা, মূল্য, বেতন বা পরিশ্রম, মুদ্রানির্মাণ, টোল-শুল্ক, ছাড়পত্র ইত্যাদি সমস্তই ইতিহাসের মধ্যে ধরা হইত।

রাজপুত্রের ১৬ বৎসর বয়সের পর দূর দেশে প্রখ্যাত গুরুদেবের নিকট পাঠ লইতে যাইতেন। রাজপুত্রদের বিদেশে গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিবার বহু উদাহরণ পালি জাতকে পাওয়া যায়। সাধারণ শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্যও বিদেশ-যাত্রার পরিচয় আছে। এই রকম করিয়া তাঁহাদের ঔদ্ধত্য নষ্ট হইয়া সংযম-শিক্ষা হইত, শীতা-তপ সহ্য করিবার শক্তি-লাভ হইত এবং দেশ-বিদেশের রীতি-নীতির পরিচয়-লাভ ঘটিত। শিক্ষান্তে তাঁহারা নগর, গ্রাম এবং দেশ ভ্রমণ করিতেন। রামায়ণে রাজপুত্রদের শিক্ষার উপযুক্ত বিষয় দেওয়া হইয়াছে—ধনুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র, হস্তী ও রথতত্ত্ব, আলেখ্য ও লেখ্য, লঙ্ঘন (উল্লম্ফন ও অন্য ব্যায়ামাদি) এবং প্লবন (সন্তরণ)।

রাজা যে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না তাহার পরিচয়

কৌটিল্যে আছে। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, রাজা সেইরূপ সমস্ত আর্ত্তজনকে রক্ষা করিবেন। রাজা যে পারিষদ ভিন্ন চলিতে পারেন না, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজা বাস্তবিক কিরূপ হইবেন এবং সত্যই কেমন ছিলেন তাহার পরিচয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে ও বিভিন্ন রাজাদের কথায় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামচন্দ্রের ইতিহাস অস্বাভাবিক কাহিনীতে পূর্ণ নয়। অথর্ববেদে রাজকর্ত্তা বা রাজনির্ব্বাচনকারীদের উল্লেখ আছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে পুরু, দেবাপি প্রভৃতি নির্ব্বাচিত রাজা ছিলেন। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রও যে বহু ছিল তাহারও উল্লেখ অথর্ববেদ (৫, ২৯, ৯) ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে। বৈরাজ্যের উদাহরণও বিরল নয়। অর্থশাস্ত্রেও (৮. ২. ১২৮) আছে। জৈন আয়ারাঙ্গ সুত্তেও আছে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের এক সঙ্গে শাসনের উল্লেখ আছে। মহাবস্তুতে রাজা মহেন্দ্রের তিন পুত্রের এক সঙ্গে রাজত্ব করার কথা আছে। চষ্টন ও রুদ্রদামা একত্র রাজত্ব করিতেন পণ্ডিতেরা এরূপ কথাও বলিয়াছেন। জৈন সাহিত্যে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের বড় বড় লোককেই রাজা বলা হইয়াছে। বৈশালী-গণতন্ত্রে রাজপদবীর সংখ্যার অবধি ছিল না। ভদ্দিয় বুদ্ধের সম্পর্কে ভাই; তাঁহাকে কখন রাজাও বলা হইয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনকে মাত্র শাক্য শুদ্ধোধন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গণতন্ত্রের গৌরব বড় কম ছিল না। বহুকাল পরেও সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করিতেন। আমার মনে হয় অশোক অনুশাসনের সতিয়পুত্ত, কেরলপুত্ত প্রভৃতি গণতন্ত্রমূলক জাতিরই উল্লেখ। এরূপ হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে, উত্তরে ও দক্ষিণে গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যের চক্রবর্তী সম্রাট্ নিয়মতন্ত্রানুগ বলিয়া মনে হয়। ইঁহার মহত্ত্ব ও উদারতা অবিসংবাদী। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেকালের রাজারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা না হয়। রাজপুত্রদের শিক্ষাবিষয়ে এরূপ চেষ্টা করা হইত যাহাতে তাহারা উপযুক্ত রাজা হইতে পারে। রাজার সঙ্গে প্রজাদের হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত ছিল, তাই এদেশের প্রজাদের বিদ্রোহের ইতিহাস নগণ্য অথবা নাই বলিলেই চলে। অযোগ্য রাজা যে রাজ্যচ্যুত হন নাই তাহা নহে, তবে তাহার স্থানে নূতন রাজাকেই বসান হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রের আবশ্যক হয় নাই।

বুদ্ধের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তাহাতেই সেই সময়কার রাজপুত্রদের শিক্ষার চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার বিষয়গুলির নাম করিতেছি—লিপি, পুঁথি প্রস্তুতকরণ, আখ্যায়িকা কথন, কাব্য, ব্যাকরণ, অঙ্ক, নিঘণ্টু, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞবিধি ও প্রকরণ। সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, ভৈষজ্য, শল্য, দেহতত্ত্ব, স্ত্রী-পুরুষ, অশ্ব ও অন্যান্য জীবগণের লক্ষণবিদ্যা, পশুপক্ষীর রবের অর্থ, অপরের চিন্তা অনুমান, প্রহেলিকা সমাধান, স্বপ্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যবিদ্যা, আবৃত্তি, ঐক্যতান, লাক্ষাকর্ম্ম, সূচিশিল্প, মোমকর্ম্ম, বৃক্ষপত্রের শিল্পকর্ম্ম, রঞ্জন-শিল্প, বিভূষণ কর্ম্ম, মূক অভিনয়, মুখোস পরিয়া অভিনয় ইত্যাদি। গৌতমকে মল্লযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতে হইয়াছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সনেট বৈচিত্র্য

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

প্রবর্ত্তনা

দিলে তুমি অহমিকা ভীরুরে ;
নতশির তুলিল সে সাহসে,
সংশয়-মন্থর আলসে।
তুহিনপুঞ্জ ঘন মেরুরে
বহ্নু দগারি' গিরিবন্যা
দিল ঢালি আগ্নেয় প্রবাহ,
ভিখারীর গলে রাজকন্যা
দিল মালা, স্বৈর এ বিবাহ।

অনাদরে মরমে যে মরিয়া
ছিল পড়ি আঁখিভরা কক্ষে,
তাহারে আনিলে তুমি ধরিয়া,
নিলে টানি সুকোমল বক্ষে।
মালঞ্চ হ'ল মরু,—শিহরি,
বজ্র ফুটিল মেঘ বিদরি'।

ঔদাসীন্য

আমার নয়নে ছিল বাসনা
চোখে তব উদাসীন দৃষ্টি,
জানি তুমি মোরে ভালবাস না,
তবু প্রাণে হল ফুল বৃষ্টি।
শেফালির তরুমূলে শরতে,
একদা ছিলেম আমি বসিয়া,
রহি' রহি' পড়েছিল খসিয়া
ঝরা ফুল, ঝরেনি ত দরদে।

তোমার দিঠির মত স্নিগ্ধ,
শুভ্র পেলব ক্ষণভঙ্গুর,
আমারে করিল মোহদিগ্ধ।
তবু জানি বাসনার অঙ্কুর
নাই সে কুসুমে, তব চক্ষে,
মরে প্রেম গুমরি এ বক্ষে।

আপাতবিমুখতা

সব জান, মিছে কেন তবে
অকারণে বেদনা বাড়াও ?
জানি তুমি আমারেই চাও
কেন ভয় পাও পরাভবে ?
হাতখানি ধরি আমি যবে
হতে চাও অমনি উধাও,
বজ্রমুষ্টি মাঝে বাঁধা রবে,
দৃঢ় হতে আমারে শিখাও ?

দিতে বাহা চাও অকাতরে
তার লাগি দস্যুতা আমার
কেন টেনে আন লীলাভরে ?
দিতে চাও কলঙ্কের ভার
শিরে মোর, তারপরে ক্ষমা
আমারে করিবে নিরুপমা ?

সাবধানী

জানি তুমি মোরে চাও,
কাছে যেতে পারি না যে,
মরি শঙ্কায় লাজে,
—পাছে যদি টের পাও
কি আছে আমার মনে।
পারিব না যাহা দিতে,
যতনে সঙ্গোপনে
চাই তা সুরক্ষিতে।

ভুল বোঝো তাই চাই।
না থাকে আড়াল যদি
ভাঙে যদি গড়খাই,
দুটি জীবনের নদী
মিশে যাবে আমি জানি,
তাই হই সাবধানী।

অযাচনা

তুমি জান কি যে আমি চাই।
নাই কি তা তোমার নাগালে ?
কেন তবে হাত রাখি গালে,
রহ চুপে, মুখে কথা নাই।
যত বলি আছে আছে আছে,
নাই নাই বলে আঁখি দুটি,
কিছু ত বল না মুখ ফুটি,
ভয় পাও, ব্যথা পাই পাছে ?

ওই ভয়ে বেঁধেছ আমারে।
ভয় পাও তাই অনুমানি
ভালবাস মৌন মাঝারে।
তবু মুখে নাই কেন বাণী ?
বুঝি শুধু রয়েছে মমতা,
নাই প্রেম, তাই নীরবতা।

সম্ভাবনা

বল দেখি তুমি মোরে
যা কিছু পাবার আছে
নিখিল বিশ্ব ভরে
নাই কি তোমার কাছে ?
তুমি কি জান না মনে
বিশ্ব উজাড় করি
দিতে পার এই ক্ষণে
আমার দুহাত ভরি ?

বল শুধু একবার
মোরে ভালবাস তুমি,
ললাটে বারেক চুমি
খোল স্বর্গের দ্বার।
আমি দেবরাজ জানি,
তুমি মোর ইন্দ্রাণী।

বাধা

মোর সনে নহ তুমি বাঁধা
দেহ মনে সম সুরে জানি,
বক্ষে যবে লই আমি টানি
ঘোচেনা তথাপি তব বাধা।
বাহিরের কোনো আবরণ
থাকে না যখন মাঝখানে
রহে তব হিয়ার বারণ,
সে নিষেধ প্রাণ মোর জানে।

কাছে থাকি রয়েছ সুদূরে,
ভুজবন্ধে অবন্ধনা তুমি,
নিঃসঙ্গতা রয় বুক জুড়ে,
অধরে তুহিন শুধু চুমি।
ছাড়িতে পার না তবু মোরে,
বাঁধিয়া রেখেছ বাহু ডোরে।

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

অমোঘ

মুক্তি চাই, কোথা মুক্তি বল?
কী অমোঘ জান না নিয়তি!
তার হাতে বাঁধা যে শৃঙ্খল
ছিঁড়িবে কে? কার সে শকতি?
ভাবিও না বেঁধেছি তোমারে,
আমিও যে পড়েছি বন্ধনে,
চেয়েছি পালাতে বারেবারে
বেড়ি বাঁধা রয়েছে চরণে।

নাই যার কোনো প্রতীকার
তার তরে কোনো খেদ নাই,
সানন্দে তাহারে অঙ্গীকার
করি তাই ব্যথা নাহি পাই।
স্বেচ্ছায় বরণ করি যবে,
ভরে চিত্ত কল্যাণ গৌরবে।

রূপান্তর

তোমার টবের বেলফুলে
লভে জন্ম মোর প্রাণবায়ু,
পলে পলে হারাই যে আয়ু
ফোটে তাহা মুকুলে মুকুলে।
ক্ষুদ্র তব তরুর পল্লবে।
আমার প্রদীপ নিভে আসে,
আলো তার নিঃশব্দে নীরবে
দীপে তব দীপ্তি পরকাশে।

আমার এপার ভাঙে যত
তোমার ওপারে পড়ে চর।
ভাসিয়া চলেছে অবি
ছিন্ন করি জড়ের নিগড়
অণু অণু মোর প্রাণকণা
কাছে তব, বুঝিতে পার না?

পরিবর্ত্তন

এ তুমি সে তুমি কভু নহ,
সে সারল্য প্রতিমা কোথায়?
শ্যামলশ্রী মরু বালুকায়
পরিণত হল কিসে কহ?
ভালবেসেছিলে একদিন,
সে প্রেম কি নিঃশেষে ফুরাল?
হলে তুমি হেন সুকঠিন,
হেম শিখা কে তব নিভাল?

বিরহে এমন কভু হয়?
তোমার স্বপন মূর্ত্তি পূজি
একলব্য হল এ হৃদয়;
তুমি অনায়াসে নিলে খুঁজি
শক্তি উৎস লুকাল' কোথায়,
শুকালে সে অন্তঃসলিলায়।

নক্ষত্রিকা

চেতনা দেহের মেঘলোক,
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চসিন্ধু হ'তে
অহরহ অলক্ষিত স্রোতে,
বাষ্পাকারে বহু হর্ষ শোক
পুঞ্জীভূত হয় চিদম্বরে ;
সৃজনের নব বেদনায়
কী সূচনা ঘনায় অন্তরে !

সেই ধূম্রনীহারিকাজালে,
জাগে ঘূর্ণী, ফোটে ধীরে ধীরে
স্পন্দহারা একটি নয়ন,
আবির্শ্ময় স্নিগ্ধ ধারা ঢালে।
জীবনের নীরন্ধ্র তিমিরে
আনে বন্যা দীপ্তি প্রস্রবণ।

অনন্যকূলা

তুমি দিয়াছিলে মোরে দুঃখ,
ভেবেছিনু মোরে ভালবাস না,
ছিল মোর অতৃপ্য বাসনা
নিরোধ তোমার ছিল মুখ্য।
বিচার ছিল না মোর সূক্ষ্ম।
দেহে যে রহিল শব-আসনা
রূপে রসে নিত্য নিরশনা
প্রকৃতি তাহার বুঝি রুক্ষ।

ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা,
কল্যাণ অমেয় বদান্য,
মোর পরে অচল প্রতিষ্ঠা,
তোমারে করিনি অমান্য।
ভাবি তবু, কোথা আছ থামিয়া,
এলেনা অভাবে মোর নামিয়া।

গীতিকণ্ঠ

যে কথা পারিনি বলিবারে
আজি তা ফুটেছে গানে গানে,
জানি পশিবে না তব কানে
তবু গাই শোনাতে তোমারে।
নাই বা লভিনু প্রত্যুত্তর,
কি বলিবে অনুমানে বুঝি,
নৈঃশব্দ্যের মাঝে পাই খুঁজি
মৌন তব বাণীর নির্ঝর।

পেয়েছিনু তব ভালবাসা,
সেই দৃষ্টি পরশ চুম্বন
আজি মোর ছন্দ সুর ভাষা,
অন্তরের সুধা প্রস্রবণ।
গানের গাগরি তায় ভরি
সুরধুনী নীরে তৃষ্ণা হরি।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

পদ্মা-প্রমত্তা নদী

শ্রীসুবোধ বসু

সাত

আজও রাজার ইস্কুল ছিল না। দুপুরটা আর কাটিতে চায় না। মানুষরা যে কি করিয়া ঘুমাইয়া দুপুরটা কাটাইয়া দেয়, ভাবিয়া রাজা বড়ই বিস্ময় বোধ করে। সে নিজে চেষ্টা করিয়া দেখে নাই, এমন নয়; পিসিমার সজল শাসনে একাধিক দিন দুপুর রৌদ্রে পাড়া-বেড়াইবার দুর্নিবার প্রলোভন মনে চাপিয়া কম পক্ষে পাঁচদশ মিনিট নিদ্রার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু ঘুম আসা দূরে থাকুক, যত রাজ্যের কুল এবং আমগাছ, জেলে-ডিঙি এবং বৌয়ের নৌকা এবং তার বিচিত্র প্রকার বন্ধুদের চেহারাগুলি চোখের সমুখে আসিয়া এমনিভাবে হাত-ইসারায় ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বিকালে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দির ঠাকরুণের বিলাপ সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে নাই।

আজও আবার সেই সমস্যায় পড়িয়াছে। গত রবিবারের ছুটির দিন সারা দুপুর আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি আসিয়া বাবার কাছে যা বকুনি খাইয়াছিল তা আর বলার নয়। তাই যদিও আজ দুপুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন জঙ্গল, খালের পাড়, গয়লা পাড়া এবং জেলে-পল্লী তাকে শুধুই ডাকিতে লাগিল, তবু সে শক্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু এই রকম কৃচ্ছ সাধন করিয়া থাকা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে হতাশ হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে পিসিমার তাক হইতে আমের আচার চুরি করিতে গেল। ঐ আমের আচার রাজার একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা; এবং পিসিমা যতই আমের আচারের বোতল সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া ওঠেন, রাজার লোভটা ততই আরও দুর্দ্দমনীয় হইয়া ওঠে। কিন্তু তা হইলে কি হয়, পিসিমার সাবধানতার গুণে একদিনও সে বোতলটার নাগাল পায় নাই,—কোথায় যে পিসিমা সেটাকে এমন অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে লুকাইয়া রাখে, রাজা সুগভীর অধ্যবসায় সত্ত্বেও তার কোনও কিনারা করিতে পারে না। এই হয়তো দেখিল, বোতলটা মুড়ির টিনের পিছনে, ঠিক করিয়া গেল, পিসিমা একটু সরিলেই হয়; কিন্তু পিসিমা সরিয়া গেলে রাজা যখন হৃষ্টচিত্তে পুনঃপ্রবেশ করিল, তখন আমের আচার অদৃশ্য হইয়াছে। অন্য বহুপ্রকারের আচার আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাদের উপর রাজার কিঞ্চিৎমাত্র লোভ নাই এবং সেই জন্যই সে-সব পিসিমার ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

দিনান্তের পরিশ্রমের পর ইন্দির ঠাকুরুণ মহা আরামে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নাকের একটানা ডাক শুনিয়া রাজার আর কোনও আশঙ্কাই রহিল না, মুখের সঙ্গে সঙ্গে গাটাও সে দরজা দিয়া গলাইয়া দিল। একটু মুচকি হাসিয়া মনে মনে কহিল—লক্ষ্মী পিসিমা তো, বেশ একটু পাকা ঘুম ঘুমোও, বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও; আমের আচারের জন্য তোমার কোনও ভয় নেই।—

পা টিপিয়া টিপিয়া আদত একটা চোরের মতন রাজা পিসিমার নিজ হাতের তৈরি যাবতীয় সুখাদ্যগুলি যে তাকের উপর সাজান থাকে, সে দিকে অগ্রসর হইল। আম পাকাইয়া কেন যে লোকে সেগুলি নষ্ট করে, রাজা ভাবিয়াই পায় না; তার চেয়ে কাঁচা থাকিতে পাড়িয়া আচার করিয়া রাখিলে তা খাইতে ঢের ঢের ভাল! পায়ের

বুড়ো আঙুল দুইটার উপরে দাঁড়াইয়া, ঘাড়টা যথাসম্ভব প্রলম্বিত করিয়া রাজা আমের আচারের বোতল খুঁজিতে লাগিল। পাইবার যে খুব আশা ছিল, তা নয়—পিসিমাকে অত অসাবধান সে মনে করে না—তবে বরাতের কথা কে বলিতে পারে!

বরাতই বটে! রাজার দুই চোখ লুব্ধ খুসিতে চক্চক্ করিয়া উঠিল। বাতাসার হাঁড়িটার পিছনে, নারকোল নাড়ু ও কিস্‌মিসের বড় বোতল দুইটার মধ্যখানে সেই বহুমূল্য আচারের বোতলটা একান্তই নিরীহভাবে অবস্থান করিতেছে। সোনার বর্ণ তেলের মধ্যে কম পক্ষে দশ পনের টুকরা আমের আচার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছিল; রাজাকে দেখিয়া যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজার আর মুহূর্ত্ত সহিল না; একবারমাত্র পিসিমার দিকে চাহিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইল, এবং পরক্ষণে তাকের উপরে দুই হাতের কনুইয়ে ভর করিয়া দেহের অর্দ্ধেক উঠাইয়া অবলীলাক্রমে আচার হস্তগত করিল। পরমুহূর্ত্তে রাজা আর সে-ঘরে নাই।

খালের পাড়ের লিচু গাছটার তলায় বসিয়া সমস্ত আচার নিঃশেষ করিবার পর তবেই রাজার বিবেকটা একটু গোলমাল সুরু করিল। সবটা খাইয়া ফেলা ভাল হইল না, একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেছে; পিসিমা যে চাইলে একেবারেই দেয় না, এমন তো নয়—একবারে এক আধ-টুকরার বেশি দেয় না বটে, কিন্তু দেয় তো! ঘুম হইতে উঠিয়া আমের আচারের অবস্থা দেখিয়া পিসিমার যা বিলাপ সুরু হইবে—হি হি হি—কিন্তু সবটা না খাইলেই ভাল হইত। রাজা ভাবিতে লাগিল—খেতে খুব মজা লাগে কি না, তাই তো সব খেয়ে ফেল্‌ম, যা ভাল লাগে আমের আচার! কিন্তু বুড়ো মানুষেরটা সব শেষ ক'রে দিলুম—দূর! এত কষ্ট ক'রে সব সময়ে লুকিয়ে রাখে! নিরিমিষ খায় কি না, তাই আচার না হলে খাওয়া যায় না! এমন আমি লোভী হয়েচি, পেটুকের হাড়! রাজার মনটা সহসা খারাপ হইয়া গেল। এমন ভালমানুষ পিসিমা—কত পিঠা তৈরি ক'রে দেয়, কত রূপ কথা বলে, মাথায় তেল মেখে দেয়, কত আদর করে—দূর, আচার খেয়ে একটুও ভাল হয় নি—

কিছুক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে রাজা খালকে সম্বোধন করিয়া কহিল—খেলুমই বা, আর বুঝি তৈরি করা যায় না; গাছে তো কতদিনই বোল দেখা দিয়েচে—এইবার কচি কচি আম দেখা দেবে; দিয়েচেই তো,—যমুনা বষ্টুমী সে দিন বল্লে না, আখড়ার গাছে এরই মধ্যে আম ধরে গেছে,—আমাকে আনতে যেতে বল্লে না! ধরেচেই তো, ঈশ্বরের জায়গায় আগেই সব ধরে!

আচার খাওয়া উপলক্ষ্য করিয়া যমুনা বৈষ্ণবীর নিমন্ত্রণটা রাজার মনে পড়িয়া গেল।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে বাউলদের একটা বড় রকমের আখড়া আছে। দুর্গাপ্রসন্নকে ধরিয়া এই বাউল সম্প্রদায় কোটালভিটার উত্তর প্রান্তে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড জোগাড় করিয়াছিল এবং গ্রামান্তর হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া এখানে মস্ত বড় আখড়া ফাঁদিয়াছে। বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে এবং পূজার্চ্চনা ও নাম কীর্ত্তনাদি বিশেষ আড়ম্বরের সহিতই অনুষ্ঠিত হয়। বৈরাগী এবং বৈষ্ণবীর সংখ্যাও কম নয়, এবং গ্রাম গ্রামান্তরের বিভিন্ন বাউল সম্প্রদায়ের বহু অতিথি সর্ব্বদাই যাতায়াত করে।

তবে গ্রামের সামাজিক জীবনের সঙ্গে আখড়াবাসীদের কোনই সংযোগ নাই—তারা সব কিছুর বাহিরে। এর কারণ এই নয় যে বাউলেরা সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক লোপ করিয়া সাধন ভজন লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে চায়; প্রকৃত কারণ এই যে, গ্রামের লোকেরা ওদের দেখিলে নাক সিঁটকায়,—প্রায় অস্পৃশ্যের কাছাকাছি মনে করে, এবং ভিক্ষা দেওয়া ছাড়া ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা গর্হিত মনে করে।

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে কদাচার দুর্ব্বলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু অভাব নাই; প্রকৃত বাউল এবং ছদ্ম-বাউলে তফাৎ সাধারণের কাছে লোপ পাইতে বসিয়াছে। কোটালভিটার আখড়ারও দুর্নামের অভাব ছিল না; বিশেষত যুবতী বৈষ্ণবীদের প্রাদুর্ভাব গ্রামের বুড়ারা বিশেষ

সন্দেহের চোখে দেখিত, এবং আর যারই হোক, ইহারা যে শ্রীকৃষ্ণের সেবাদাসী নয়, তাহাতে তাহাদের সন্দেহমাত্র ছিল না। এই সম্প্রদায় কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাস করিত, কিন্তু সেখানে পরকীয়া ভাবের এমন নাকি বাড়াবাড়ি হয় যে গ্রামের লোক মিলিয়া ওদের দূর করিয়া ছাড়িল। সেই দুর্নামের অংশ ওরা কোটালভিটায়ও বহন করিয়া আনিয়াছে; এখানেও ওরা নেড়ানেড়ীর দল নামে পরিচিত।

যমুনা এই আখড়ারই বৈষ্ণবী। কোটালনগরের বাড়ি বাড়ি সে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়; তাকে চিনে না, এমন মানুষ কম। বছর ত্রিশ বয়স হইবে; চেহারাটাও ভদ্র মেয়ের মতন। গলাটা মিষ্ট এবং কীর্ত্তনে সত্যই কিছু দক্ষতা আছে। এই সব কারণে চাল সে সব চাইতে বেশি সংগ্রহ করে।

রাজার সঙ্গে তার বড় ভাব। ভিক্ষায় আসিয়া করতালে ঠোকাঠুকি করিয়াই সে হাঁক দেয়—কোথায় গেলে আমার গোপাল,—গান গাইব কার কাছে?

রাজা হয়তো দোতলার ঘরের জানলার কাছে মুখ আনিয়া বলে—এই, চেঁচাচ্চ কেন, বষ্টুমি, দেখচ না, পড়াশুনো করচি! ফের 'গোপাল' 'গোপাল' করবে না, বলে দিলুম!

'ওঃ, ভুলে গিছলাম, ছোট কর্ত্তা; কিন্তু তুমিই যদি না শুনবে, কার কাছে গাইব?'

'তার আমি কি জানি! আর শুনচ বষ্টুমি, রোজ রোজ এক গান গেয়ো না, আমার মাথা ধরে যায়।'

যমুনা হি হি করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। ইন্দির ঠাকরুণের দিকে চাহিয়া হয়তো সহর্ষে বলে—দেখলেন, মা ঠাকরুণ, ছোট কর্ত্তার কেমন গানের কান,—বলেন, রোজ রোজ একগান গেয়ো না, মাথা ধরে যায়; সারা গাঁয়ে যমুনাকে এমন কথাটি আর কেউ বলে না।'

ইন্দির ঠাকুরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—ভগবান বাঁচাইয়া রাখে, তবে তো!

'রাখবে, রাখবে মা—রাজার ছেলে মহারাজ হবে! এমন চালাক ছেলে আর তো চোখে দেখিনি।'

সেই যমুনার কাছ হইতেই রাজার নিমন্ত্রণ ছিল। আখড়ার গাছে ইতিমধ্যেই আম বড় হইয়া উঠিয়াছে—রাজা গেলে সে তাকে বিস্তর পাড়িয়া দিবে; তাছাড়া আখড়ার মতন এমন বিগ্রহ আর কোথাও নাই,—রাধাকৃষ্ণ যেন সত্যই খুসিতে সর্ব্বক্ষণ হাসিতেছেন।—শ্রীখোলের সঙ্গে কীর্ত্তনও সে রাজাকে শুনাইয়া দিবে ইত্যাদি।

যদিও রাধাকৃষ্ণকে রাজা ভক্তি করে এবং শ্রীখোল শুনিতে তার আশৈশব আগ্রহ, তবু কিন্তু আমের কথাটাই তার প্রাণে সব চাইতে বেশি লাগিয়াছিল। পিসিমার আচার শেষ করিয়া আজ যমুনা বৈষ্ণবীর আম দিবার প্রতিশ্রুতির কথাটাই তার মনে পড়িল। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলে পিসিমা যখন তার স্বভাবসিদ্ধ বিলাপটা আজ অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে সুরু করিবে, রাজা তখন কাপড়ের খুঁট হইতে সগর্ব্বে এতোগুলি নতুন কচি আম বাহির করিয়া দিবে। দেখি, পিসিমার কান্নাটা আর থাকে কেমনে।

যমুনা তখন ঠাকুরঘরের সমুখের মাটীর দাওয়ায় পিটুলি গোলা দিয়া আলপনা আঁকিতেছিল, চোখ উঠাইয়া বিস্ময়ে একেবারে অবাক হইয়া গেল। রাজপুত্র পক্ষীরাজে চড়িয়া সত্যসত্যই যে তার দুয়ারে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা কি সে স্বপ্নেও ছাই ভাবিতে পারিয়াছে! মুখটা তার গর্ব্বে, আনন্দে, হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—ছোটকর্ত্তা, তুমি! এস, এস ভাই,—তুমি আসবে, এতো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

রাজা দাওয়ার উপরে উঠিয়া কহিল—বাঃ রে, তুমিই তো আমাকে আসতে বলেছিলে; বলেছিলে যে—

'বলেছিলুম তো—সারা জীবন ধরে' কত প্রার্থনাই তো করেচি, কটা চাওয়া আমার পূর্ণ হয়েচে! চল ভাই, এখানে আর নয়; রাজপুত্রকে একবার কুঁড়ে ঘরে নিয়ে বসাই।

নিজের কুটীরের আলপনা-আঁকা মাটীর মেঝের উপরে যমুনা পাড়ের-সূতায় তৈরি আসন পাতিয়া দিল; চিত্রিত হাত পাখাটা তাড়াতাড়ি পাড়িয়া আনিয়া রাজাকে জোরে

জোরে হাওয়া করিতে লাগিল ; অপূর্ব্ব মমতার সঙ্গে বারম্বার কহিতে লাগিল—এই রৌদ্রের মধ্যে সারাটা পথ হেঁটে এসে মুখখানা যে রাঙা হয়ে উঠেচে—কত কষ্ট করেই এলে —আহা মরে যাই। কী গৌরবই দিল হতভাগিনীকে—

'কী বলচ, বষ্টুমি ? ও রকম কচো কেন ?—অসুখ হয়েচে তোমার ?'

'না, গোপাল, না, অসুখ নয়। এর চাইতে বড় সুখ আমি ভাবতে পারি না, গোপাল—'

'ফের গোপাল ?'

'কি বলব তবে ? আর কোন্ বড় গৌরবের নাম দিয়ে তোমায় ডাকব ?'

'আমার নাম রাজা।'

'রাজা যিনি, তিনিই তো গোপাল।' যমুনা চোখ বুজিয়া কহিল,—'সবার মনের উপর তারই তো রাজত্ব ; বৃন্দাবনে একদিন তিনিই রাখালদের সঙ্গে বাঁশি বাজিয়েছিলেন।—তাঁরি খোঁজে তো অন্ধকারে হাতড়ে মরচি, পাব তাঁকে কবে ?'

'শুনচ, বষ্টুমি, তাকাও।'

'কি রাজা ?' যমুনা চোখ মেলিয়া কহিল।

'তোমাদের এখানে অনেক আম গাছ আছে, না ?—সবশুদ্ধ কতগুলো ?'

অনেক আছে। সবই দেখাব তোমাকে ; কত আছে বৈরিগী, কতই আছে বষ্টুমি, কত গাছ, কত মিঠে ছায়া, কত ফুল, কত গান ; রাধেশ্যাম রয়েচেন সবার মধ্যে রাজা রাণীর মতন—সব তোমাকে দেখাব।—তার আগে আমিই তোমাকে চোখ ভরে দেখে নিই ; তাদেরও দেখাব, কিন্তু তারা চিনলে হয়!' যমুনা বৈষ্ণবী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে রাজার দিকে তাকাইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

রাজা বিব্রত হইয়া কহিল,—ধ্যেৎ, এমন করলে আমার লজ্জা করে। ও রকম ক'রো না!

যমুনা তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিল ; দীর্ঘশ্বাসের মত করিয়া কহিল,—'আর করবো না, গোপাল!'

যমুনা রাজাকে একেবারে টানিয়া লইয়া বেড়াইল। আশ্রমের এমন কেহ বাকি রহিল না যাহাকে যমুনা রাজপুত্র না দেখাইল ; কিন্তু অন্য কাহাকেও সে রাজার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিতে দিল না ;—রাজা যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি, এমনি গৌরব এবং গর্ব্বের সঙ্গে রাজার হাত ধরিয়া সে ফিরিতে লাগিল। তার ভাণ্ডারে যত কিছু খাবার ছিল, বিগ্রহের ভোগের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ছিল, সব আনিয়া সে রাজার জন্য জড়ো করিল। রাজা খাইতে চায় না, কিন্তু যমুনাকে আজ কে রোধ করিতে পারে! ঝড়ের পদ্মার মত সে আজ দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

কাণ্ড দেখিয়া আশ্রমের প্রবীণ অধ্যক্ষ মথুরা দাস স্মিত হাস্য করিয়া কহিলেন,—যমুনার আজ হলো কি ? ওরে, তোরা দেখ,—আমার পাগলি মেয়েটার মনে এ কোন তুফান সুরু হলো—

'গোপাল ?'

'কেন ?'

'রাজা!'

'কি ?'

'বল, আবার আসবে, আবার তুমি আসবে। এই শেষ নয়। একটু আশা আমাকে করতে দাও—। বল, আসবে ?'

'না।'

'না ?' যমুনা স্তম্ভিত হতাশার সঙ্গে কহিল—'নয় কেন ? কি অপরাধ আমি করলাম ? সত্যি বলতো, কি দোষ আমি করেচি—সজ্ঞানে তো কিছু করিনি, বড়ি—; ওঃ, তোমাকে গান শোনাব বলেছিলুম, সোনাই নি,—না ? শুনবে ? বল, কি গান আমি গাইব ?—

'দূর, তা নয়। বাঃ রে, তোমার একটুও মনে নেই বুঝি ?' রাজা হতাশ হইয়া কহিল,—'আমার আম কোথায় ? সেদিন তো কতই কাঁচা আম পেড়ে দেবে বলেছিলে, একটাও দিলে কি ?'

'ও আমার কপাল!' বলিতে বলিতে যমুনা উচ্ছ্বসিত হাসির বেগে একেবারে গড়াইয়া পড়িল। কহিল—'আমি তো ভয়ে মরি, কেন জানি এতো রাগ!—কত আম তুমি

নেবে, এই নাও'—বলিয়া তক্তপোষের নিচ হইতে এক ডালা ভরতি ছোট ছোট কাঁচা আম বাহির করিয়া আনিল।

এতোগুলি কাঁচা শ্যামল সুন্দর কচি কচি আম দেখিয়া রাজা খুসিতে প্রায় নাচিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিয়া উঠিল, ইস্, কী সুন্দর রে!—হি হি হি—এই আমি খুঁটে মেলে ধরলাম, ঢেলে দাও—সব ঢেলে দাও—

'ও কি!' হাসিয়া যমুনা কহিল,—'দূর, তুমি খুঁটে করে' নিতে যাবে কেন? তোমার দুটো পকেট আজ ভরতি করে নিয়ে যাও,—বাকি যেগুলি থাকবে, কাল ভোরেই আমি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব,—আরও কুড়িয়ে নিয়ে যাব। না না, ছি ছি, রাজপুত্রকে আমি আম খুঁটে বেঁধে দিতে পারব না—আমার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই, লোকে আমাকে বলবে কি?'

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেই রাজাকে রাজি হইতে হইল; কিন্তু নিচের দুইটি এবং উপরের একটি পকেট সে মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং দুই হাতে সাধ্যাতিরিক্ত আম স্তূপীকৃত করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করিল। ইহার পর যমুনা বৈষ্ণবীকে পুনর্ব্বার আসিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া তার পক্ষে আর কষ্টকর হইল না, এবং আর এক মিনিট সময়ও বৃথা নষ্ট না করিয়া সে আখড়ার বাহিরে আসিল এবং দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটিতে সুরু করিয়া দিল।

সন্ধ্যার আর বেশি বাকি ছিল না। রাজাকে বিদায় দিয়া সেই অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আখড়ার প্রবেশ-দুয়ারে হেলান দিয়া যমুনা বৈষ্ণবী একটা বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে সমুখ দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিছুই যেন সে দেখিতে পাইতেছে না,—ঘনায়মান সন্ধ্যার মত তার দৃষ্টিও ঝাপসা হইয়া আসিল। শুধু মনের মধ্যে বহুদিন বিস্মৃত একটা ক্ষীণ রাগিণীর লুপ্তপ্রায় একটু রেশ আসিয়া বারবার উপস্থিত হইতে লাগিল—আখড়ায় ফিরিবার মত শক্তিও আর তার বজায় রহিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

বঙ্কিম প্রসঙ্গ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আসে এমন একটা কোনো বস্তুর আভাস যা একান্তভাবে দৃঢ়, ঋজু এবং উচ্চ,—অক্টারলোনি মনুমেণ্ট, সেণ্ট পলস্ কেথিড্রাল অথবা বেণীমাধবের ধ্বজার মতো যা একেবারে সোজাসুজি আকাশের দিকে মাথা উঁচু ক'রে চলে গিয়েছে, যার গতি-পথের সতেজ সবল ঋজুতার মধ্যে কোথাও একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বক্রতা নেই।

বস্তুতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এই প্রকারেরই দৃঢ় ঋজু এবং উন্নত ছিল। সময়ে সময়ে এই দৃঢ়তা এবং ঋজুতা উগ্রতার ঘরে গিয়ে উপনীত হ'ত এ কথা বললেও বোধ করি অত্যুক্তি অথবা অযথাভাষণ হয় না। এই উগ্র ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মিত্রপক্ষ তাঁকে করত সম্ভ্রম, শত্রুপক্ষ করত ভয়। দেখতে বঙ্কিমচন্দ্র সুপুরুষ ছিলেন, বচনেও রুক্ষভাষী ছিলেন না, কিন্তু মুখে-চক্ষে কথাবার্ত্তায় ভাবে-ভঙ্গিতে এমন একটা দীপ্তি এবং শক্তির পরিচয় থাকত যে শত্রুপক্ষের মধ্যে যারা তাঁকে তিরস্কার করবার অভিপ্রায়ে এগিয়ে আস্‌ত কার্য্যকালে অনেক সময়ে তাঁকে নমস্কার ক'রে পিছিয়ে যেত। শুধু সহজ সাধারণ ব্যক্তিদের সম্পর্কেই যে এ কথা খাটে তা নয়, ঊর্দ্ধতন ইংরাজ রাজপুরুষদেরও যে সময়ে সময়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে এসে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হ'তে হ'ত তার দৃষ্টান্ত বিরলও নয়, কৌতুকপ্রদও যথেষ্ট। বাহুল্য ভয়ে শুধু একটিরই কথা এখানে উল্লেখ করি।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ই, ভি ওয়েষ্টম্যাকট তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক রুজু করা কোনো একটা ফৌজদারী মকর্দমার বিচারভার বঙ্কিমবাবুর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। এই মকর্দমার বিচার ফলের বিষয়ে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের বিশেষ একটু স্বার্থ, সুতরাং বিশেষ একটু আগ্রহ ছিল। মকর্দমার কিরূপ নিষ্পত্তি হয় জানবার জন্য তিনি সর্বদা সংবাদ নিতেন। অবশেষে একদিন সেই বহু-অপেক্ষিত সংবাদ পাওয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র রেলওয়ে কোম্পানীকে পরাজিত ক'রে আসামীগণকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এই দুঃসংবাদ অবগত হয়ে ওয়েষ্টম্যাকট যৎপরোনাস্তি কুপিত হ'য়ে তৎক্ষণাৎ বঙ্কিমবাবুর এজলাসে উপস্থিত হ'লেন। বঙ্কিমবাবু তখন অপর একটা কোনো মকর্দমার বিচারে ব্যস্ত।

ক্রুদ্ধস্বরে ওয়েষ্টম্যাকট্ বললেন, "Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case?" বঙ্কিমবাবু, আপনি রেলওয়ে মকর্দমার আসামী-গণকে মুক্তি দিয়েছেন?

আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে না উঠে মকর্দমা করতে করতে নিতান্ত সহজভাবে বঙ্কিমবাবু বললেন, "What of that?" তা'তে কী হয়েছে?

ওয়েষ্টম্যাকট্ বললেন, "You ought to have convicted the accused." আসামীদিগকে আপনার দণ্ড দেওয়া উচিত ছিল।

বঙ্কিমবাবু বললেন, "You are uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty." আপনি যা বলছেন তাতে আদালতের অবমাননা হচ্ছে। আমি এখন মহিমার্ণবা সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি।

এ কথাতেও ওয়েষ্টম্যাকট নিরস্ত হলেন না; বললেন, "You have done wrong, and you ought to be told so." আপনি অন্যায় কাজ করেছেন, এবং সে কথা আপনাকে বলা উচিত।

এইবার বারুদে অগ্নিসংযোগ হ'ল। বঙ্কিমবাবু আর বাক্যব্যয় না ক'রে কস্ ক'রে একটা কাগজ টেনে নিয়ে ওয়েষ্টম্যাকটের বিরুদ্ধে Proceedings লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। দেখে ওয়েষ্টম্যাকটের ত চক্ষু স্থির! একজন দেশী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইংরাজ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে Proceedings আরম্ভ করতে সাহস পায়, এ একেবারে অচিন্তনীয় ব্যাপার! কিন্তু সেই অচিন্তনীয় ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে, এবং একবার সেটা গতি লাভ করলে তার দৌড় কোন্ সুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করবে, হাইকোর্ট পর্য্যন্তই কি-না, তা কে বলতে পারে! তা'ছাড়া ওয়েষ্টম্যাকটের আচরণ যখন সাধারণ নীতি এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার নিঃসন্দেহ ব্যতিক্রম, তখন এই proceedings যে শেষ পর্য্যন্ত বিষমর ফল উৎপাদন করবে না, তারই বা ভরসা কোথায়? জুলুম, জবরদস্তি, আইন-কানুনের লঙ্ঘন,—এ সকল ব্যাপার যতক্ষণ বকবা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ এক রকম চলে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তারা অনুযোগের বিষয়ীভূত হ'য়ে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় চ'ড়ে বসে, সেই মুহূর্ত্তেই তাদের গুরুত্ব রতুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিমান ওয়েষ্টম্যাকটের এ বিবেচনাটুকু ছিল, সুতরাং তিনি তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য বঙ্কিমবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করলেন না। বঙ্কিমবাবু ওয়েষ্টম্যাকটকে ক্ষমা ক'রে proceedings-এর কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লেন। *

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যে আত্মসচেতনতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা এমন দুরতিক্রম্য মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল যে, অপরের সঙ্গে যখন তাঁর সংঘর্ষ বাধ্‌ত তখন তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের শক্তি-কেন্দ্র হ'তে স্খলিত হ'তেন না, তাই বিবাদের শেষে সন্ধি যখন হ'ত তখন প্রায়ই তাঁর দিক থেকে সেটা জয়েরই নামান্তর হ'ত, এবং প্রতিপক্ষর দিক থেকে হ'ত পরাজয়ের।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক জীবনের এই অটল আত্মনিষ্ঠতা তাঁর সাহিত্য-জীবনের সৃষ্টি-প্রতিভায় দেখা দিয়েছিল একটা অনন্যসুলভ স্বকীয়তার প্রদীপ্ত মূর্ত্তিতে। অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভা উভয়ই ছিল একই বৃক্ষের দুটি ফুল,—একই মৃত্তিকা-রসে, একই সমীর হিল্লোলে, একই উদার আকাশের প্রসন্ন দৃষ্টির নিম্নে উভয়ের পরিপুষ্টি; সুতরাং উভয়কে দোসর বললে মন্দ হয় না, কিন্তু সোদর বললে ভাল হয়।

বঙ্কিম প্রতিভার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈচিত্র্যপরতা। একই ক্ষেত্রে এত বিভিন্ন প্রকারের শস্য উৎপাদন করতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা গিয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। একাধারে বঙ্কিমচন্দ্র কবি, ঔপন্যাসিক, দেশভক্ত, ঐতিহাসিক, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্, সমালোচক, বৈজ্ঞানিক-সন্দর্ভ-রচয়িতা এবং আরও অনেক-কিছু ছিলেন, শুধু সেই জন্যই এ কথা বলছিনে,—এ সকল ত নিশ্চয়ই ছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়। সাহিত্যের এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগেও তিনি যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সাধন করেছেন আমি তার কথাই বিশেষ ক'রে বলছি। এ বিষয়ে তিনি কদাচ অনুবর্তনের অপরাধ করতেন না;—অর্থাৎ, নব নব সৃষ্টির উদ্যোগপর্বে মাল মশলা সংগ্রহের জন্য নিজ অতীত সৃষ্টির ভাণ্ডার-গৃহ হাতড়ে বেড়াতেন না। তাই পুনরাবৃত্তি থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে সুদুর্লভ এই নবোন্মেষ-হ্লাদিনী সৃষ্টিশক্তির প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুবিস্তৃত রচনার সাম্রাজ্যে এমন অপরূপ বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে সৃষ্ট বহু এবং বিচিত্র চরিত্রাবলীর মূর্ত্তি স্মরণ ক'রে দেখলে আমার এ কথার সত্যতা সহজেই অনুভূত হবে। প্রতিভাবান কল্পনাশীল ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোনো-কোনো ধাঁজের চরিত্র কোনো-কোনো ঔপন্যাসিককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, এবং ফলে সেই চরিত্রগুলি তাঁদের বিভিন্ন উপন্যাসে পরিবর্তিত নামে এবং পরিবর্তিত বেশে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। এইরূপে এক-একজন লেখকের এক-একটি ছাঁচ বা type গ'ড়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে এরূপ কোনো

* এ ঘটনাটি শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্কিমজীবনী' হইতে গৃহীত।

ছাঁচ আবিষ্কার করা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যে দ্বিতীয় কপালকুণ্ডলা নেই, দ্বিতীয় দলনী বেগম নেই, দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ নেই, দ্বিতীয় ভ্রমর নেই, দ্বিতীয় গিরিজায়া নেই, এমন কি দ্বিতীয় রমানন্দ স্বামীও নেই। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী থাকার অর্থ দ্বিতীয় রমানন্দ স্বামী থাকা নয়, এ কথা অবশ্য কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙলা পুস্তক লিখতে আরম্ভ করেন তখন বাঙলা গদ্য সাহিত্যের তরুণ অবস্থা বলা চলে। বোধ করি তার বৎসর পঞ্চাশেক পূর্বে রামরাম বসু প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামক বাঙলার প্রথম গদ্য গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জীবনের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর দীর্ঘকাল বিবেচিত হ'লেও সাহিত্যের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর দীর্ঘকাল নয়; বিশেষতঃ সেই সাহিত্যের পক্ষে যে সাহিত্য সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে, এবং যে নবজাত সাহিত্য-শিশু দুর্ভাগ্যক্রমে তার আত্মীয়জনের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। কেন এবং কিরূপে বঞ্চিত এবার সেই কথা বলব।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে আমাদের দেশে ইংরাজি ভাষার নব অভ্যুদয়। অতুল সম্পদশালী ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যের ঐশ্বর্যপ্রভা দেশের প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে, বিশেষতঃ যখন জানা গিয়েছে যে রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠালাভের এবং অর্থার্জনের পক্ষে সেই ভাষা এবং সাহিত্যই প্রশস্ততম পথ।

মোগল রাজশক্তির অপমৃতি হেতু পারসী এবং উর্দ্দ ভাষার অপচীয়মান প্রভাব তখন অবশ্য তার শেষ রশ্মি বিকীর্ণ করছে। কিন্তু টোলে এবং পণ্ডিত সমাজে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সংস্কৃত ভাষার প্রভাব নিতান্ত কম নয়। সুতরাং তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজ বস্তুত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—এক, ইংরাজি-প্রধান শিক্ষিত সমাজ; অপর, সংস্কৃত-প্রধান।

ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজের মনোভাব বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত হেয় এবং অপমানজনক ছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"যাহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন।" শুধু যে 'লিখিতে পড়িতে না জানা' অগৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন না, তা নয়;—তদপেক্ষা এক কাঠি বেশি,—গৌরবেরই মধ্যে গণ্য করিতেন! এখন অবশ্য পরিবর্তিত বায়ুর দিন এসেছে,—বিশেষতঃ একজন বাঙ্গালী লেখকের নোবেল প্রাইজ লাভ করার পর থেকে,—কিন্তু তাই ব'লে তদানীন্তন বাঙলা-বিদ্বেষী সমাজ যে একেবারে লুপ্ত হয়েছে, তাদের দু-চারজন বংশধরও যে এখন বর্তমান নেই, সে কথা বলতে সাহস হয় না।

এই ত গেল ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজের কথা। সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজের মনোভাবও বাঙলা ভাষার প্রতি, বিশেষতঃ প্রচলিত কথ্য ভাষার প্রতি, সম্ভ্রমের ছিল না। সংস্কৃতর ঔরসে প্রাকৃতের গর্ভজাত বাঙলা ভাষাকে তাঁরা কতকটা জারজ সন্তানের মত বিবেচনা করতেন, তাই তার প্রতি তাঁদের আধিপত্য হয় ত কিছু ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁরা মনে করতেন বাঙলা ভাষার মধ্যে যতটুকু সংস্কৃত, ততটুকুই তার কৌলীন্যের পরিচায়ক, বাকিটুকু অপযশের। তাই তাঁরা বাঙ্গলা ভাষার শীর্ণ দেহে সংস্কৃত ভাষার কৃত্রিম অনুপ্রবিষ্ট ক'রে ক'রে কৌলীন্যের স্বাস্থ্যে তাকে চাঙ্গা ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেন। ফলে বাঙ্গলা ভাষার মেদ বৃদ্ধি হ'ত কিন্তু শক্তি বাড়ত না।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ লিখেছেন,—"বাঙ্গালার রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না-বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল। এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল।"

এই 'সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের' মুখপাত্রস্বরূপ ছিলেন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন। তিনি লিখিত কিন্তু অকথিত

সংস্কৃতবহুল বাঙলা ভাষার একজন অত্যুৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কিন্তু অবশেষে একদিন এই কৃত্রিম বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই সে কথা বলি,—

"টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

আলালের ঘরের দুলালের কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রকাশিত করলেন। এই 'হুতোম পেঁচার নক্সার ভাষা' আলালের ভাষারই অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা আরও খানিকটা গ্রাম্যশব্দবহুল আরও খানিকটা সংস্কৃতর নাগপাশ হ'তে বিচ্ছিন্ন।

রামগতি ন্যায়রত্ন এই আলালী এবং হুতোমী ভাষার বিরুদ্ধে সবলে অস্ত্রধারণ করলেন। তাঁর রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে তিনি লিখলেন, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থ রচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোম পেঁচা বল, মৃণালিনী বল,—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও-সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়।"

এইরূপে বাঙলা দেশে তখন দুইটি লিখিত গদ্যভাষার প্রচলন হ'ল—একটিকে বলা যেতে পারে সংস্কৃতিপ্রমুখ, এবং অপরটিকে সংস্কৃতবিমুখ।

বাঙলা সাহিত্যের তখন একটা অতিশয় প্রবল যুগ চলছে। বড় বড় সাহিত্য দিক্‌পালগণ উদিত হ'য়ে বাঙলা-ভাষাকে নানারূপে সমৃদ্ধ ক'রে তুলছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রামরাম বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি অধিকাংশই প্রথমোক্ত সংস্কৃতপ্রমুখ দলের অন্তর্গত। দ্বিতীয় দলের প্রধান সমর্থক 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র এবং হুতোম পেঁচার নক্সা প্রণেতা কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর রচিত গ্রন্থাদিতে টেকচাঁদ ঠাকুর কল্পিত নাম গ্রহণ করতেন, একথা বোধ করি সকলেরই জানা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন এই দুটি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ভাষার মধ্যে কোনোটিই দোষশূন্য নয়। একটি অতিরিক্ত মাত্রায় সংস্কৃতপ্রমুখ এবং অপরটি ঠিক অনুরূপ মাত্রায় সংস্কৃতবিমুখ। একটিকে যদি 'টুলো' ব'লে তিরস্কার করা যায় ত' অপরটিকে 'হেটো' ব'লে নিন্দিত করতে হয়। এই দুইটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভাষার মধ্যবর্ত্তী একটি সরল অথচ সবল, অভিজাত অথচ প্রাণস্পর্শী, সম্পন্ন অথচ জনপ্রিয় ভাষা আবিষ্কৃত হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতই লোকোত্তর প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল। সেই কার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্পন্ন করলেন। তিনি সংস্কৃতপ্রমুখের ফোঁটা-তিলক এবং সংস্কৃতবিমুখের ধূলি-কর্দম ধুয়ে পুঁছে উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলেন। সেই পরিণয়ের ফলস্বরূপ যে অপরূপ কান্তিমান সন্তান প্রসূত হ'ল তার ললাটে দিলেন শ্বেতচন্দন, কণ্ঠে দিলেন পুষ্পমাল্য, অধরে দিলেন বংশী এবং চরণে দিলেন নূপুর। সেদিনকার সেই স্বর্ণজন্মা সন্তান অদ্যাবধি জীবিত আছে, আধুনিক বাঙলা দেশ এখনো সেই জাতকের স্বরূপে এবং সঙ্গীতে মুগ্ধ।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি বাঙলা গদ্যের জন্মদাতা বলিনে। সে গৌরব যদি কাউকে দিতে হয় ত বোধ করি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সে গৌরবের অধিকারী। কিন্তু আধুনিক গদ্য ভাষার এবং উপন্যাস-সাহিত্যের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র, এ কথা বলতে আমার একটুও সঙ্কোচ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁর সাহিত্য-জীবনের মধ্যে তদানীন্তন প্রচলিত বাঙলা ভাষার যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন,

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী বন্ধ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, তা তার তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ। এটুকু পরিবর্ত্তন না ঘটলে বুঝতে হ'ত বাঙলা ভাষা সজীব নয়, মৃতকল্প; কারণ পরিবর্ত্তন জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। ১২৮৪ সালের কিশোর রবীন্দ্রনাথ যেমন ১৩৪৫ সালের প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের জন্মদাতা, ঠিক সেইরূপে বঙ্কিমযুগের গদ্যভাষা এবং উপন্যাস-সাহিত্য বর্ত্তমান যুগের গদ্যভাষা এবং উপন্যাস-সাহিত্যের জন্মদাতা। আমার মতে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত সকল ঔপন্যাসিকের অবিসম্বাদী গুরু বঙ্কিমচন্দ্র।

কেন তিনি গুরু, সে কথা আজ আর নয়, অন্য কোনো দিন প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। আজ শুধু দেশ-প্রীতির উদ্বোধক, বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি, উপন্যাস-কথা সাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনির্বচনীয় প্রতিভাকে প্রণতি জানিয়ে আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করলাম।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৫ কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসবের উদ্‌যাপন-দিবসে সভাপতির অভিভাষণ।

দার্জিলিং এফেক্ট

"ভাস্কর"

১

শিয়ালদহ ষ্টেশন। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ফিটন গাড়ী হইতে একটি বিছানা, দুইটি সুটকেস, একটি ফ্লাস্ক্, একটি অ্যালুমিনিয়মের কুজা এবং একটি ছাতা লইয়া যাহারা নামিল তাহাদের নাম ললিত এবং অমিয়া। সাংখ্যিক বয়স, পচিশ আর ষোল।

দার্জিলিং মেলের একখানি ইণ্টারক্লাসের কামরায় উঠাইয়া দিয়া বক্‌সিস লইয়া কুলি চলিয়া গেল। জানালা হইতে অমিয়া দেখিল একটি আধুনিক মহিলা ব্যাগ-হাতে খুট্ খুট্ করিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে পুরুষ মানুষ নাই, পিছনে কুলির মাথায় জিনিষপত্র। অমিয়া ললিতকে বলিল, দেখলে, কি বেহায়া। অমিয়ার নিজের পা খালি, একখানি সাধারণ সাড়ী সাধারণভাবেই পরিয়াছে, তার উপরে একখানি সিল্কের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। গরম চাদর সুটকেশে আছে। শিলিগুড়ি গিয়া বাহির করিবে। ললিত পরিয়াছে এল্‌বার্ট স্লিপার, মিলের ধুতি, গলাবন্ধ কোট, তার উপরে একখানি উড়ানি।

দার্জিলিং মেল ছুটিয়াছে। অমিয়া জানালার ধারে বসিয়া আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিল, কত জোরে চলছে বলত? ললিত বলিল, তা পঞ্চাশ মাইল হবে। তুমি শোবে না?

না, আমি সারা ব্রিজ না দেখে শোব না।

সে অনেক দেরি। এখন শুয়ে পড়। সারা ব্রিজের কাছে এলে আমি ডেকে দেব।

তুমিও বুঝি ঘুমিয়ে পড়? না, আমি এখন শোব না।

সারা ব্রিজ পার হইয়া অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। একবার ঘুমায়, একবার জাগে, এমনি করিয়া রাত কাটাইল। জলপাইগুড়ি পার হইয়া আসিয়া সম্মুখে ডানদিকে কাল কাল পাহাড়ের সারি দেখাইয়া ললিত বলিল, ঐ দেখ হিমালয় পাহাড়।

আমরা কি ওখানে যাব?

হ্যাঁ, ওর অনেক উপরে।

শিলিগুড়ি। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে আসিতেই সম্মুখের প্ল্যাটফর্মে ডি. এইচ. আর-এর গাড়ী দেখিয়া অমিয়া বলিল, ও কি! বেশ খুদে খুদে গাড়ী তো!

হ্যাঁ, ওই গাড়ীতে করেই তো আমরা পাহাড়ের উপরে উঠবো।

ও কি! ইঞ্জিন নাকি? অতটুকু? ও ত আমাদের বাড়ীর সামনে যে ষ্টীম-রোলারটা দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় তারই মতন।

জিনিষপত্র লইয়া একখানি গাড়ীর জানালার ধারে স্থান করিয়া লইয়া ললিত বলিল, দেখ তুমি এই বাঁ ধারে এখানে বস, বাঁ দিক থেকেই দৃশ্য ভাল দেখা যায়। অমিয়া ক্রমাগতই হাসিতেছে। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, কেবলই হাসছ যে!

কি খুদে খুদে গাড়ী! আমার ভারি হাসি পাচ্ছে।

কেন? হাওড়া আন্দা লাইনের গাড়ীও তো এই রকম; দেখনি বুঝি?

গাড়ী ছাড়িল, তিন টুকরা করিয়া। মাঝের টুকরায় ললিতরা। অমিয়া বলিল, তিনখানা গাড়ী একসঙ্গে যাচ্ছে কেন?

নইলে ইঞ্জিনে টান্তে পারে না। আগে বড় একখানা গাড়ীর সামনে আর পিছনে দুখানা ইঞ্জিন থাক্তো। তাতেও সুবিধে হত না। তাই আজকাল এই রকম করেছে।

গাড়ী শুকনা ছাড়িয়ে বনের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গা বাহিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, ঝক্‌ঝক্-ঝক্‌ঝক্ ঝিকিঝিকিঝিকিঝিকি শব্দ করিতে করিতে ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে আর অমিয়া বিস্ময় হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। ট্রেণ ঘুরিবার সময়ে ইঞ্জিন দেখা যাইতেছে। কখনও সামনের ট্রেণখানি দেখা যাইতেছে, আবার অদৃশ্য হইতেছে। কখনও পিছনের ট্রেণখানি নীচে দেখা যাইতেছে, কখনও মাথার উপর দিয়া আবার কখনও পায়ের তলা দিয়া রেলের লাইন গিয়াছে, লুপের কাছে গাড়ী ঘুরপাক খাইতেছে, রিভার্সের কাছে গাড়ী পিছনে চলিতেছে, এই সব দেখিতে দেখিতে অমিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনধারিয়া হইতে এবং কার্সিয়ং হইতে নীচের সমতলভূমি কেমন সুন্দর দেখায়! অমিয়া প্রত্যেক ষ্টেশনের উচ্চতাগুলি পড়িয়া দেখিতেছে। ক্রমশঃ যখন ঘুম আসিয়া পড়িল, তখন ললিত বলিল, এইটে সবচেয়ে উঁচু ষ্টেশন। এর পরেই দার্জিলিং, খানিকটা নীচে।

দার্জিলিং। বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘা শ্রেণীর অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল এবং একটি নারীর (কুলিরমণী) পৃষ্ঠে জিনিষপত্র চাপাইয়া কার্টরোডের নিকটেই একটি হোটেলে উঠিল।

২

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। অমিয়া বলিল, আমার আজ কেমন নূতন নূতন লাগছে।

নূতন জায়গা, নূতন তো লাগবেই।

তা বলছি নে।

তবে?

রান্নাবান্না নেই, কুটনো-কোটা নেই, ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, দুটো তৈরী ভাত খেয়ে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোনো—এ যেন ভাবতেই পারছিনে।

সেই জন্যেই তো এখানে আসা। দিন কতক নিশ্চিন্ত মনে নির্ঝঞ্ঝাটে বেড়িয়ে নাও।

মেকেঞ্জি রোড বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ললিত বলিল, এই এখানকার বড় ডাকঘর—আর এই একটা বায়োস্কোপ।

রোসো, আমার জুতোর ফিতে খুলে গেছে, বেঁধে নি।

অমিয়া কেডস্ জুতার ফিতা বাঁধিয়া শালখানি গায়ে জড়াইল। ললিত তাহার আলোয়ানখানি দিয়া গলাটা ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইল। উঃ! কি কন্‌কনে শীত!

আর একটু উপরে উঠিয়া আর একটি বায়োস্কোপ। তারপর অক্ল্যাণ্ড রোডের মোড়ে আসিয়া ললিত বলিল, এই পর্য্যন্ত মোটর আসতে পারে। এর উপরে মোটর যায় না।

তারপর দুধের দোকান, ফোটোর দোকান, জুতার দোকান, ঔষধের দোকান প্রভৃতি পার হইয়া তাহারা চৌরাস্তায় আসিয়া পড়িল। ললিত বলিল, এটাকে ম্যাল বলে।

ম্যাল মানে কি?

ম্যাল মানে?—আচ্ছা, বাড়ী গিয়ে ডিক্‌সনারি দেখে বলব।

P 11156

আমি আর হাঁটতে পাচ্ছি নে। আমার বুকটাও ধড়্‌ফড়্ করছে। বাবাঃ, যেন মনুমেণ্টে উঠছি।

চল, এখানে বেঞ্চিতে একটু বসা যাক।

উভয়ে ম্যালের পুবদিকের একখানি বেঞ্চিতে গিয়া বসিল এবং নানাবিধ লোকের যাতায়াত দেখিতে লাগিল।

অমিয়া বলিল, ও মেয়েটা কি বাঙ্গালী ?

হ্যাঁ।

মেয়েদের মত ঘাগরা পরেছে কেন ?

সখ।

কি উদ্ভট সখ বল তো! আচ্ছা, ওই যে যাচ্ছে, ওটা কি মেম না সাহেব ?

পিছন থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে ফিরুক—ওই যে—ও তো মেম।

ও পেণ্টুলন পরেছে কেন ?

সখ।

এ আবার কেমন ধারা সখ! যত সব—

এইবার চল, অবজারভেটরি হিলের চারিদিকে একটা পাক দেওয়া যাক—কেমন, পারিবে তো ?

পারবো, চল।

উভয়ে বেঞ্চি হইতে উঠিয়া বাঁ দিক দিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

ললিত বলিল, দেখ, লোকগুলো কেবলই তোমার দিকে তাকায়, আমার ভাল লাগে না।

সুন্দরীর দিকে লোকে তাকাবেই তো!

ইস্, ভারি গরব যে!

কেন গরব হবে না ? এরই জন্যে তো তুমি তোমার বাবার সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করেছ!

এখন আর বাবার রাগ নেই কিন্তু। যাই বল, লোকগুলো ভারি তাকায়।

আমি যদি কালো কুৎসিত হতুম, আর কেউ আমার দিকে না তাকাত, তা হলে তোমার ভাল লাগতো ?

তা কাজ্জা লাগে নাকি ?

তাকালেও ভাল লাগে না, না তাকালেও ভাল লাগে না—তোমাদের মন বোঝাই ভার।

যাক গে, যে তাকায় সে তাকাক, তুমি তাই বলে তাকিও না কিন্তু।

বেশ, এই আমি চোখ বুজছি, তুমি আমার আঁচল ধরে টেনে নিয়ে চল।

আঃ! আমি কি তাই বলছি না কি ? ঐ দেখ, নীচে কার্টরোড দেখা যাচ্ছে। ওই রাস্তাই শিলিগুড়ি থেকে বরাবর এসেছে।

বাঃ বেশ দেখাচ্ছে তো! নীচে, উপরে, রাস্তার উপর রাস্তা, বাড়ীর উপর বাড়ী, বেশ দেখতে, না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে ও লতাগুলো কি ? আঙ্গুরের মত পাতা—

ওগুলো আইভি-লতা। তুমি আঙ্গুরের পাতা কোথায় দেখলে ?

কেন ? বি সরকারের ক্যাটালগে।

ও! ওই দেখ একটা ছোট্ট পার্ক—এখানে ছেলেপিলেরা বেড়ায়—ওর নীচে একটা ছোট্ট যাদুঘর আছে। অনেক প্রজাপতি আছে—আর একদিন দেখা যাবে। একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনও আছে একটু নীচে, জেলখানার কাছে। সেখানে অনেক রকম সিজন-ফ্লাওয়ার আছে।

আচ্ছা, একদিন ওদিকে গেলেই হবে। সামনে ওই মেয়েটাকে দেখছো—ঐ আসছে!

হ্যাঁ, ওর নাম দুরদৃশ্যা।

কি করে জানলে ?

একটু এগোলেই বুঝতে পারবে।

ও মা'গো! তাই তো, দূরে থেকে কিন্তু—। ঐ দেখ, দেওয়ালের গায়ে কত ফুল ফুটে রয়েছে, ঠিক যেন ছোট বড় নাকছাবির রাশ—ও কি ফুল ?

ওগুলো ডেজি।

ঐ যে সেই পড়েছিলাম—What time the daisy decks the green ?

হ্যাঁ। ঐটে সাহেবদের ক্লাব, আর ওই সামনে গেট, পুলিশে পাহারা দিচ্ছে, ঐ লাটসাহেবের বাড়ী।

আরো খানিকটা গিয়া অমিয়া বলিল, নীচে ঐ সাদা গোল পরিস্কার জায়গাটা কি ?

ওটা লেবং রেসকোর্স।

ঠিক যেন পাহাড়ের মাথায় টাক পড়েছে। বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা, ওগুলো কি? ঐ যে ছোট ছোট ফুলের গাছ, একটা করে শিষ উঠেছে, তার গায়ে ছোট ছোট করবী ফুলের মত ফুল, কোনটা সাদা, কোনটা লাল—

ও গুলোকে ইংরাজিতে বলে ফক্স্ গ্লাভ, ল্যাটিন নাম ডিজিট্যালিস্, বুকের অসুখের ভাল ওষুধ ওর থেকে তৈরী হয়।

আর ওই সরু সরু পাতা—ঐগুলো।

ওগুলোর সাধারণ নাম ফার্ণ, ও অনেক রকম আছে। ঐ দেখ, দার্জিলিং পাহাড়ের পরেই ওই যে কালো পাহাড়টা, তারপরেই একটু ফাঁক, ঐ ফাঁকের নীচে তিস্তা নদী? বাঁ দিক থেকে রঙ্গিত গিয়ে মিশেছে ওর সঙ্গে। ওর ওপারে ঐ যে একটা ঢালু পাহাড়, তার গায়ে সাদা সাদা বাড়ী—ওই কালিম্পং।

ওখানে কোন পথে যায়?

শিলিগুড়ি থেকে রেল আর মোটর। এখান থেকে ঘোড়া বা বেবি অষ্টিন।

যাবে?

এবার আর না, আর একবার, দেখা যাবে। সামনের ওই মেঘটাকে দেখেছ—ওই যে যাচ্ছে—ওর নাম পশ্চাদৃশ্যা।

তাই নাকি?

একটু এগিয়ে চল তাহলেই বুঝতে পারবে।

ও মা গো, তাই তো। পেছন থেকে মনে হচ্ছিল—

এখন কি করবে? অবজারভেটরি হিলের উপরে উঠবে, না বাসায় ফিরবে?

চল বাসায় ফিরি। আজ আর না, বড্ড পরিশ্রম হয়েছে।

তাই চল।

৩

ললিত ও অমিয়া প্রত্যহই বেড়াইতেছে। বেড়াইতেই তো আসা। কলিকাতায় একতলা হইতে দোতলায় উঠিতে আলস্য হয়, আর এখানে আজ জলাপাহাড়, কাল কাটা-পাহাড়, তার পর দিন ঘুম—কেবল ফূর্তি!

প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, উহারা দার্জিলিং আসিয়াছে। কাল টাইগার হিল হইতে ফিরিয়া অমিয়ার হাটুতে একটু ব্যথা হইয়াছে, আজ আর কোথায়ও যাইবে না। ভাল করিয়া বিশ্রাম না করিলে ব্যথাও সারিবে না; বেড়ানও একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। ললিতও একা বেশী বেড়াইতে চায় না, আজ অল্প একটু ঘুরিয়া আসিয়া বাসাতেই আছে। দু'জনে গল্প গুজব হইতেছে।

অমিয়া বলিল, দেখ তোমার ধুতিগুলো তো প্রায় সব ময়লা হয়ে গেল। তাছাড়া এ শীতের মধ্যে ধুতি পরলে পায়ে কোমরে ঠাণ্ডাও লাগে। তার চেয়ে বরং একটা বা দুটো ফ্লানেলের পেণ্টুলন করে নাও না—তাতে কি?

আমিও তাই ভাবছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু আর কি? এখানে তো কুলীরাও পেণ্টুলন পরে, ওতে আর হয়েছে কি? সঙ্গে গোটা দুই সার্ট, গোটা কয়েক কলার আর গোটা চারেক টাই হলেই হবে।

দেখি। আর তোমার ওই কেড্‌স্, হাঁটতে সুবিধে বটে, কিন্তু ভারি বুড়ো বুড়ো দেখায়।

তাই বলে অত গোড়ালি-উঁচু জুতো আমি পরতে পারবো না—হাঁটতে গিয়ে পড়েই যাব।

বেশী উঁচু নাই হলো। ওই তো সে-দিন বাটার দোকানে দেখলুম, বেশ অল্প উঁচু খাসা জুতো রয়েছে, তারই একজোড়া কিনো, তোমার টুকটুকে চরণপল্লবে বেশ মানাবে।

সে দেখা যাবে। তুমি আজই পেণ্টুলনের অর্ডার দিয়ে এসো।

তা দেব'খন। আর দেখ, দুইজনে এই একটা ছাতার মধ্যে ভারি বিচ্ছিরি দেখায়। তুমি একটা ছাতা কেন—ওই যে বেঁটে বেঁটে ছাতাগুলো, নেহাত মন্দ না দেখতে।

আচ্ছা। আর দেখ, একটা ফেল্ট হ্যাটের কথা যেন ভুলো না, আর একটা ডোরা-কাটা মাফলার।

আচ্ছা। তোমার ওই সেকেলে আলোয়ান, ওটা

ছাড়, হাঁটবার সময়ে আলোয়ান সামলাতেই প্রাণান্ত! কেবলই ভয় হয়, বুঝি পায়ে আটকে আছাড় খেলে! একটা ওভার কোট হ'লে বেশ হয়—প্লেন দেখে কিন্‌লেই হবে—বেশী দামী নাই হ'লো।

এ কয়দিনের জন্য আর কোট কিনে কাজ নেই, বরং একটা মাষ্টারনী মাফলার কিনে দিও, পিঠের উপর দিয়ে দেড় পাক ঘুরিয়ে পরলেই হবে। কিম্বা উলের কাজ করা একটা কাশ্মীরী ঢিলা জ্যাকেট, শাড়ীর উপরে প'রে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম—পথে কত দেখি! আর তোমার কোটটা যেন ভাল হয়—বেশ মানায় যেন!

হ্যাঁ, একটা টুইডের স্পোর্টস্ কোট করবো। এখানে গরম কাপড়ের দাম প্রায় কলকাতারই মত—দরজীর খরচও খুব বেশী নয়।

হোটেলের চা আসিতে গল্প বন্ধ হইল।

৪

এক মাস হইতে চলিল। দিনগুলি যেন উড়িয়া যাইতেছে। খাওয়া, বেড়ান আর ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ডে চিঠি লেখা, এ ছাড়া কোন কাজই নাই। শরীরও দুজনেরই বেশ ভাল আছে। এখন আর চাকরবাকরে বাবু আর মাইজি বলে না, তারা বলে সার্ আর মেম্‌সাব। হোটেলের লোকেরা এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছে, এটা দার্জ্জিলিং এফেক্ট—তাতে বয়েই গেল! স্যুট পরা ললিত আর ওভারকোট-পরা ব্যাগ-হাতে অমিয়া এখন সকলের সামনেই যাতায়াত করে, কোনই সঙ্কোচ নাই।

সেদিন চলিয়াছে বার্চ হিলের দিকে। যেখানটায় সেই কুকুরটার স্মৃতিস্তম্ভ, সেখানে আসিতেই বিপরীত দিক হইতে একটি ঘোড়া লইয়া একটি ভুটিয়ানী আসিয়া বলিল, সাব্, ঘোড়া?

ললিত বলিল, আমি ও ভুটিয়ানীর ঘোড়ায় চড়বে না, তুমি চড়বে?—আমি?

যাও, কি যে বল?

তাতে কি, একটু চড়ই না। মেমরা তো সবাই চড়ে আমি কি মেম নাকি?

বেশী তফাৎই বা কি? তাছাড়া এখানে কেউ কোথাও নেই—একেবারে নির্জন। কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

না, ছিঃ, ঘোড়ায় চড়্‌বো কি!

লক্ষ্মীটি, একবার চড়ই না, দেখি কেমন দেখায়!

তুমি যখন বলছ, আমি চড়ছি, কোথায়ও যাব না কিন্তু, এখানেই একটু হেঁটেই নেমে পড়ব। একটু দেখ তো ভাল করে, কোন দিক থেকে কেউ আস্‌ছে কি না।

কেউ নেই, এ সময়ে এ পথে কেউ আসবে না।

নানী এবং ললিত উভয়ে ধরাধরি করিয়া অমিয়াকে ঘোড়ায় উঠাইয়া দিল। পা ঠিকমত রাখা হইলে এবং লাগাম ধরা হইলে ললিত বলিল, এ নানী, তোম মেম সাবকা ঘোড়াকা পাস খাড়া হো যাও. হাম ফোটো লেগা।

ফোটো তোলা হইয়া গেলেই অমিয়া নামিয়া পড়িল। নানী কিছু বখসিস লইয়া বিদায় হইল।

অমিয়া রাগিয়া বলিল, ফোটো তুললে কেন? সবাইকে দেখাবে বুঝি যে, আমি দার্জিলিংএ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম?

কাউকে দেখাব না, এ আমার কাছে থাকবে অমি, আমাদের ছেলেমানুষির চিহ্ন। যখন বড় হ'ব তখন দেখে হাসি পাবে। ছেলেমানুষিটাই জীবনের আনন্দ, অনাবিল আনন্দ টুকুই। আর সব তো দায়িত্ব, কর্ত্তব্য, সামাজিকতা, বন্ধুত্ব, কুটুম্বিতা—ওসব তো আছেই, চিরদিনই থাকবে। ছেলেমানুষ আর কদিন থাকবে?

যাই কর, ফোটো সাবধানে রেখো। কলকাতায় গিয়ে কাউকে দেখিও না কিন্তু।

সে আমাকে বলতে হবে না, তুমি নিজেই সাবধান থেকো।

৫

এবার ফিরিবার পালা। নূতন জায়গায় আসিলে কিছু কেনা-কাটা করিতে হয় বই কি? কিছু তরকারী কেনা হইল—কপি, মটরশুটি, টমাটো, বীনস, আনারস, গাজর বড়এলাচ, আলুবখরা, স্কোয়াস, গোল লঙ্কা, লম্বা কুমড়া ইত্যাদি। কয়েক পাউণ্ড চা আর দুই এক বোতল কমলা-মধু না নিলে কি চলে? হাবের মল্লিকের দোকান

হইতে দু'ডজন কাচের, মুক্তার আর পুঁথির মালা, উলের কাজ করা চটের থলে, দুখানা ভুটিয়া চাদর, দুখানা লাসা-সাড়ী, একখানা চায়ের ছড়ি, একখানা কুকরি, আর একখানা কাশ্মীরি টেবল্‌ক্লথ কেনা হইল। হ্যাড-হার্টের দোকান হইতে দুখানা কাঠের ট্রে কেনা হইল, একখানা আঙ্গুরপাতা, আর একখানা পদ্ম-কাটা। মোমের ময়ূর-আঁকা একখানা টেব্‌ল্‌-ক্লথও অমিয়া পছন্দ করিয়া কিনিল। একখানা ছবির অ্যালবাম এবং দু'ডজন ছবি-পোষ্টকার্ড কেনা হইল। তন্মধ্যে, ঝুড়িতে একটি শিশুকে বসাইয়া পিঠে করিয়া একটি ভুটিয়ানী মেয়ে, এই ছবিখানি এন্‌লার্জ করিয়া এবং রং দিয়া আঁকিয়া বাঁধাইয়া লওয়া হইল। এ ছবিখানি ললিতের ভারি পছন্দ। স্যান্‌ডাক্‌ফু হইতে এভারেষ্ট-শৃঙ্গের দৃশ্যখানিও এন্‌লার্জ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইটালি, বেলজিয়ম এবং জার্মেনিতে প্রস্তুত খাঁটি তিব্বতী, নেপালী এবং সিকিমি জিনিষও এ দোকান ও দোকান হইতে গোটাকয়েক কেনা হইল।

শিয়ালদহে প্ল্যাটফর্মে নামিতেই একটি লোক আসিয়া বলিল,—বাবু, গাড়ী চাই?

নেহি।

কুলি দুইটিকে ডাকিয়া ললিত বলিল,—একঠো ট্যাক্সিমে উঠাও।

বাসায় পৌঁছিয়া কড়া নাড়িতেই ললিতের ছোট বোন অতসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখে সাহ্‌ এবং মেমসাব্‌ দেখিয়া জিভ্‌ কাটিয়া দড়াম্‌ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল,—ঝি, অ ঝি, ছাখ্‌ তো বাহিরে কারা?

ইতিমধ্যে দাদা এবং বউদি বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। ললিত বলিল,—কিরে অতু, চিনতেই পারলি নে?

ও মা গো, তোমরা সাহেব হয়েছো, কেমন করে জানবো বল? আগে থেকে জানাতে হয়?

অমিয়া বলিল,—আমি ভাই, কিছু জানিনে, এ সব তোমার দাদার খেয়াল।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব দাদার খেয়াল, আর তুমি মাটির পুতুল!

৬

অমিয়া আর অতসী, প্রায় সমবয়সী। মেঝেতে একখানা বড় কার্পেট পাতিয়া স্যুটকেস খুলিয়া বসিয়াছে। এটা তোমার, এটা ছোটদির মেয়ের, এটা পিসিমার ছেলের, এটা ছোট কাকীমার, ইত্যাদি কথাবার্তা হইতেছে। ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌ পিছনে করিয়া যে ফোটো তোলা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া অতসী বলিল, বেশ, খাসা তো! এর পরের বার কিন্তু একা যেতে পারবে না। আমিও যাব।

এবারেই কেন গেলে না? আমি তো কত বলনুম তোমাকে।

ইচ্ছে করেই যাই নি। এর পরের বারে যাব।

জিনিষপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ সেই বার্চহিলের ঘোড়ায় চড়া ফোটো একখানি দেখিতেই খপ্‌ করিয়া তুলিয়া লইয়া অতসী বলিল,—এ কার ফোটো?

ও কি? ওটা কোথায় পেলে?

হুঁ, আমি কিছু জানিনে, সব দাদার খেয়াল। দাঁড়াও একবার, সবাইকে দেখিয়ে আসি।

কর কি অতু? তোমার পায়ে পড়ি, কাউকে দেখিও না, দাও আমাকে—দাও। সত্যি বলছি, আমি কিছুতেই রাজি হইনি, শেষে তোমার দাদা রাগ করতে লাগল, কি করি বল?

আচ্ছা কাউকে দেখাব না, কিন্তু এখানা আমার কাছে থাকবে।

না, আমাকে দাও।

তোমার তো আরো রয়েছে, এখানা থাক্‌ আমার কাছে।

কাউকে দেখাবে না তো?

না—না।

ইহার পর হইতে যখনই কোন বিষয়ে অমিয়ার সহিত অতসীর মতভেদ হয়, তখনই অতসী তাহার ফোটো সকলকে

দেখাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায় আর অমিয়াও তখনি পরাজয় স্বীকার করে। মোট কথা ঐ ফোটো দিয়া অতসী তাহার বৌদিকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে।

৭

অতু, দাদা, বৌদি খাইতে বসিয়াছে। দার্জ্জিলিঙের গল্প হইতেছে। অতসী বলিল,—ওখানে খুব কপি আর কড়াইশুটি পাওয়া যায়, না?

হ্যাঁ, বাজারে কপি আর কড়াইশুটির পাহাড়—সেখানে ওসব গরুতে খায়।

বৌ। আর পাহাড়ের গায়ে রাশ রাশ থলকুড়ি। ভেবেছিলাম মার জন্য এক ঝুড়ি নিয়ে আস্‌ব। শেষে আর হয়ে উঠ্‌ল না।

দা। থলকুড়ি নয়, থানকুনি।

বৌ। থানকুনি নয়, থলকুড়ি।

অ। না, থানকুনি।

বৌ। না, থলকুড়ি।

অ। বটে! তাহলে—কেমন!

বৌ। না, ভাই, তাহলে থানকুনি।

দা। কিরে অতু, তোর বৌদি যে একেবারে কেঁচো—কি করে বশ করলি?

অ। আমি একটা শিকড় পেয়েছি, আমার বাক্সে আছে, তাতেই ও বশ হয়েছে।

দা। আমাকে দে না, দেখি, আমি বশ করতে পারি কি না।

অ। সে শিকড়ে তোমার কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, দাদা, সেখানকার মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে?

দা। ওখানকার মেয়েরা তো চড়েই, তাছাড়া মেমরাও চড়ে।

অ। বাঙ্গালী মেয়েরা চড়ে?

অমিয়া অতসীকে খুব জোরে চিমটি কাটিল। অতসীর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। ওদিকে দাদা মহাশয় একটা ভীষণ বিষম খাইয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, এই অতু, তোর কল্‌কলানির জ্বালায় কেউ খেতেও পারবে না? ওঠ শিগগির ওখান থেকে।

দাদা ও বৌদি আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইলেন।

"ভাস্কর"

বঙ্কিমের ধূমপান

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত

আমরা সংসারের অতি সাধারণ মানুষ, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং লাভ লোকসান খতাইয়া প্রত্যেক জিনিসের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকি—তা, সে সর্ব্বমানবীয় এবং জাগতিক হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ব্যক্তিগত-স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোনও জিনিসই হউক না কেন। এইরূপ ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং লাভ লোকসানের মাপ কাঠিতে প্রত্যেক জিনিসের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, যাঁহারা নিজেদের লাভ লোকসান দেখেন না, তাঁহাদের বলি নেশাখোর ও পাগল।

বঙ্কিমেরও নেশা ছিল, কিন্তু সে অহিফেন ও তামাকুর। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র আফিঙ খাইতেন। অহিফেন প্রসাদাৎ তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে,—ঈশ্বর প্রীতি, মানুষে মানুষে প্রীতি এবং দেশপ্রীতিই মানুষের একমাত্র কাম্য। সেই জন্য তিনি আপন মনে প্রীতির গান গাহিতেন। আমরা সংসারের প্রসন্ন গোয়ালিনীর দল—সে গানের কদর্থ করিয়াছিলাম এবং নেশাখোর ও পাগল বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলাম। তিনি জগতে

ন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায়ের, প্রীতির পরিবর্ত্তে হিংসার, সরলতার পরিবর্ত্তে কাপট্যের রাজত্ব দেখিয়া, পাগলের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল খুঁজিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলাম না। মধ্যে কমলাকান্তভ্রমে দুই একজনকে ধরিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহারা ঝুটা কমলাকান্ত—অচিরে প্রকৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

হায়! আর কি তাঁহাকে পাইব না! আবার তাঁহার মুখে তাঁহার সেই গান শুনিব না!

বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় গুণীর আদর জানিতেন। তাই যে-নেশার-ঘোরে দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়া কমলাকান্ত তাঁহার প্রবন্ধগুলি লিখিতেন সেই নেশার খোরাক অহিফেন জোগাইয়া তিনি সেই প্রবন্ধগুলি লইতেন। আজকালকার সম্পাদক মহাশয়দিগের ন্যায় টাকার মূল্যে তিনি তাহা কিনিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র করিতেন তামাকু সেবন। তাঁহার এই তামাকু সেবনের স্বরূপ কি এক্ষণে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন বঙ্কিম কর্ম্মক্লান্ত শরীরে অফিস হইতে ফিরিয়াছেন। অফিসের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইলেন। তাঁহাকে সময়োপযোগী আহার্য্য দেওয়া হইল। বঙ্কিম তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইলেন। অতঃপর ভৃত্য আলবোলা আনিয়া সুরভিত তামাকু প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেল। বঙ্কিম ইজিচেয়ারে বসিয়া নলটী লইয়া তাহাতে টান দিতে লাগিলেন। প্রথমে অল্পে অল্পে, পরে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি নির্গত হইতে লাগিল এবং গৃহের আয়তন ভেদ করিয়া ক্রমশঃ বহিরাকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বঙ্কিমের চক্ষুর্দ্বয় আয়ত্ত এবং সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ হইল।

বঙ্কিমের দিব্য দৃষ্টি স্থান ও কালের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃ, দূরে দূরে—অতিদূরে প্রসারিত হইল। কল্পনানেত্রে. বঙ্কিম কথনও দেখিতেছেন ত্রিস্রোতাতীর, মন্বন্তরপীড়িত পরিত্যক্ত কঙ্কালাবশেষ অধ্যুসিত, নরভুক হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল বিজন পল্লী, সমুদ্রতটস্থ সৈকতভূমি ও বালুস্তূপ, নদী-বেষ্টিত অরণ্যময় ভূভাগ, ভাগীরথী বক্ষ, সুবর্ণ রেখা ও বৈতরণী সন্নিহিত বনময় পার্ব্বত্য ভূভাগ, বাংলার চিরশ্যামল শস্যক্ষেত্র, পল্লীমধ্যস্থ স্বচ্ছ নীলদর্পণবৎ দীর্ঘিকা, সুদূর রাজপুতানার পার্ব্বতীময় প্রদেশ ও গিরিপথ; কখনও দেখিতেছেন ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের চরম নিদর্শন হর্ম্ম্যরাজি ও প্রস্তর মূর্ত্তি, স্তম্ভ, গুহা, মন্দির ও সমাধি, প্রাসাদ, দরবার কক্ষ এবং সেই সঙ্গে ভারতের প্রাচীন নগরী সমূহ—নবদ্বীপ, গৌড়, মুঙ্গের, পাটলীপুত্র, বারাণসী, প্রয়াগ মথুরা, আগ্রা, দিল্লী, চিতোর। বিস্মৃত অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া কখনও প্রত্যক্ষ করিতেছেন ভারতের বিচিত্র জীবন্ত নরনারী—জগৎসিংহ, ওসমান, বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা, আয়েসা; মাধবাচার্য্য, হেমচন্দ্র, বক্তিয়ার, মনোরমা; মীরকাশিম, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, দলনী, সুন্দরী, শৈবলিনী; নবকুমার, কাপালিক, মেহেরউন্নিসা; ভবানী পাঠক, রঙ্গরাজ, ব্রজেশ্বর, প্রফুল্ল; সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, শান্তি, কল্যাণী; চন্দ্রচূড়, চাঁদশা, সীতারাম, জয়ন্তী, শ্রী, নন্দা, রমা; রাজসিংহ, মাণিকলাল, বিক্রম শোলাঙ্কি, আওরংজেব, মবারক, চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী, জেবউন্নিসা। বাঙ্গালীর সংসারে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতেছেন নগেন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনন্দিনী; কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দলাল, ভ্রমর; রজনী, ললিতলবঙ্গলতা। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া কল্পনায় গড়িতেছেন মানস দুহিতা মনুষ্য সমাজের কৃত্রিমতা ও কুটীলতা হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা।

কখনও বা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া উদ্ধার করিতেছেন দেবপ্রতিম রাম, পতিগত প্রাণা সীতা, ত্যাগের আদর্শ ভীষ্ম, কারুণ্য ও বীরত্বের সংমিশ্রণ অর্জ্জুন, কোমলতা ও কঠোরতায় মিশ্রিতা শকুন্তলা, দ্রৌপদী, রুক্মিণী—সর্ব্বোপরি তাঁহার আদর্শ মানব কৃষ্ণ।

কত বলিব? বলিয়া শেষ করা যায় না। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খচিত সুনীল গগনমণ্ডলের ন্যায় এক বিশাল চিত্রপট তিনি বাঙ্গালীর চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া গিয়াছেন।

ইহাই বঙ্কিমের ধূমপান। তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করি, আমার এমন ক্ষমতা নাই। সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায়, বাঙ্গালী এই চিত্রপট দেখিয়া হৃদয়ে সাহস, আশা ও শক্তি পায়, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

অন্যান্য দেশে মহাপুরুষের নিত্য ব্যবহারের প্রিয় বস্তুটী যাদুঘরে রাখিবার রীতি প্রচলিত আছে। জানা গিয়াছে, যে মহামন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনের পেন্সিলটী এবং অন্য এক প্রধান মন্ত্রীর পাইপটী বিলাতের কোনও কোনও যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। বাংলার সাহিত্য-পরিষদ কি বঙ্কিমের আলবোলাটী নিজস্ব যাদুঘরে রাখিবেন না?

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বঙ্কিম ধূমপান করিয়া গিয়াছেন। কয়জন বাঙ্গালী আর সেইরূপ ধূমপান করিতে পারিবে?

কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মত সংসারীজনের হিতার্থে সাধারণভাবে ধূমপানের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বর্ণনা করিতে বঙ্কিম বিস্মৃত হন নাই।

আলবোলা ও হুক্কাকে সম্বোধন করিয়া বঙ্কিম বলিয়াছেন "বিশ্বজনশ্রমহারিণী!"

এ কথার যাথার্থ্য আমরা সকলেই জানি। এই কাল্না সহরে থাকিয়াই পরলোকগত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় আইলের উপর বসিয়া বাঙ্গালী কৃষকের লাঙ্গল চষার কঠোর পরিশ্রমের পর ধূমপানের উল্লেখ করিয়া ইংরাজ শাসকবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তামাকুই বাঙ্গালী কৃষকের একমাত্র বিলাস ব্যসন। ইংরাজ শাসকগণ যেন তাহার উপর কর বসাইয়া না দেন। যতদিন ইংরাজ শাসকগণের উপর শাসন ভার ন্যস্ত ছিল, ততদিন তাঁহারা এই উপদেশ মানিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু যেই স্বদেশীয়গণের হস্তে কথঞ্চিৎ শাসন ভার ন্যস্ত হইল, অমনি তাঁহারা এই তামাকুর উপর কর বসাইয়া দিলেন।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন "বাঙ্গালী তুমি কখনও তামাকু ছাড়িও না। আধ পয়সার তামাকু হইলেই ১৩ জন আগন্তুককে আহ্বান করিতে পারিবে। এত সস্তায় অথিতিসৎকারের প্রথা অন্য দেশে নাই।"

বঙ্কিম তৎপরে বলিলেন "ভার্য্যা-ভর্ৎসিতজন চিত্তবিকার বিনাশিনী"। ভুক্তভোগী মাত্রেই ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন —টিকা নিষ্প্রয়োজন।

আরও বলিলেন "প্রভুভীতজন সাহসপ্রদায়িনী।" বাঙ্গালী চাকুরীজীবী। বিশেষতঃ দেখিতেছি "প্রাদেশিক আত্ম-কর্ত্তৃত্ব" অর্থে চাকুরীর বাঁটোয়ারা। সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে তামাকু সেবন অপরিহার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তামাকুর আরও অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। রসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবেন।

অতঃপর বঙ্কিম-কথিত গৃহস্থজনের তামাকু সেবনের পরম উপকারিতার তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথম দৃষ্টান্ত:—বুড়া কৃষ্ণকান্ত আফিমের নেশা কিছু চড়াইয়া আলবোলা টানিতে টানিতে তন্দ্রামগ্ন হইলেন। তন্দ্রার ঘোরে দেখিলেন যে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। সেখানে উর্ব্বশী আসিয়া তাঁহার সামনে মাঝে মাঝে ঘোরা ফেরা করিতেছেন। তবে উর্ব্বশীর মাথাটা গতকল্যকার সেই মাগীটার মাথা। এমন সময় বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে শব্দ হইল "জেঠা মহাশয়!" তন্দ্রাঘোর কাটিলে কৃষ্ণকান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয় তুল্য গোবিন্দলাল দণ্ডায়মান। গোবিন্দলাল যেন তাঁহাকে কি বলিতে আসিয়াছে কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণকান্ত তখন তামাকু প্রসাদাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া গোবিন্দলালের মনের কথা জানিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বড় স্নেহ করিতেন। মনে মনে বলিলেন "ছুঁচো দেখিতেছি, মাগীটার চাঁদপানা মুখ দেখিয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে"। দুষ্টামি করিয়া বলিলেন "মাগীটার মাথা মুড়াইয়া দুর করিয়া দাও!"

গোবিন্দলাল মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বুড়া বলিলেন "বদি—ও দোষ করে নাই—মনে কর,—তাহা হইলে উহাকে যাইতে দাও।"

গোবিন্দলালের কার্য্য সিদ্ধ হইল। গোবিন্দলাল সেখান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

সুতরাং দেখা গেল যে তামাকু খাইলে বুড়ালোক যুবক যুবতীর মনের কথা জানিতে পারেন। সংসারে সেটী আবশ্যক। অতএব বুড়ালোকের তামাকু সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত:—দেবীরাণী জানিতে পারিলেন যে সাগর ব্রজেশ্বরের সহিত একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া বসিয়াছে। এবং

তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মীমাংসা দরকার। তা ছাড়া দেবীরাণীর রাণীগিরিতে আর মন উঠিতেছিল না। কিসের জন্য তাঁহার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

তিনি ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া আনিলেন। রাজোচিত আদর অভ্যর্থনা এবং রাজভোগের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দেবী-রাণী জানিতেন যে তাহাতেও কুলাইবে না। সেই জন্য তিনি সুবর্ণময় আলবোলায় সুরভি তামাকু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কৌশলে সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। ব্রজেশ্বর তাহাতে আরও চটিয়া গেলেন। কিন্তু সেই সময়ে সেই সুসজ্জিত আলবোলা আনিয়া সাগর তাহার নলটী ব্রজেশ্বরের হাতে দিলেন। দুই একটী টান দিতেই ব্রজেশ্বরের রাগ দূর হইল, উভয়ের মনের ময়লা কাটিয়া গেল। ব্রজেশ্বর ও সাগর আবার পূর্ব্বের ব্রজেশ্বর ও সাগর হইল।

তারপর দেবীরাণী স্বয়ং ঠোঁট পরিয়া ব্রজেশ্বরকে দেখা দিলেন। ব্রজেশ্বর দেখিলেন এ তাহারই প্রফুল্ল। তামাকুর নেশায়, ব্রজেশ্বর নিজের বাটীতে প্রফুল্লর নিকট একবার যে একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই অপরাধটী আবার করিয়া ফেলিলেন। দেবীরাণী দেখিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ত।

এই দুইটীই ছিল দেবীরাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণ উদ্দেশ্য ছিল শ্বশুরের জমিদারী রক্ষা।

অতএব দেখা গেল দম্পতির মনোমালিন্য দূর করিতে এবং পতি-পত্নীর পুনর্মিলন ঘটাইতে তামাকু ব্রহ্মাস্ত্র।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত :—কমলমণি ভ্রাতৃজায়ার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। পত্রটী একটু গোলমেলে। তিনি তাহার মানে করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। প্রথমে সতুবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। পরিবর্ত্তে, সতুবাবু মাতার নাক কান কামড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তখন কমলমণি দেখিলেন, তাঁহার সেই মন্ত্রীবর ব্যতীত ইহার যথার্থ অর্থ হইবে না। কিন্তু মন্ত্রীবর তখন আফিসে। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। কমলমণি রাগিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে মন্ত্রীবর অফিস হইতে ফিরিলেন। ধড়াচূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে আহারাদি দিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত কোন কথা না কহিয়া দুর্জ্জয় রাগ ও অভিমানভরে সতুবাবুকে লইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া প্রেমের শিরোমণি ঠাকুরটী অত্যন্ত নাকাল হইয়াছিলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া একটী উৎকট উপায়ে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। অবশ্য সে কাজটী গোপনে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুষ্টা গোপীগণ আড়াল হইতে দেখিয়া সেটী লোক সমাজে প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহার বিদ্যা জাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরটীর এরূপ নাকাল হইবার কারণ এই যে, তাঁহার সময়ে সার ওয়াল্টার র‍্যালে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র এ-কালের লোক। তিনি এই ব্রহ্মাস্ত্রটী জানিতেন। তিনি ইংরাজ সওদাগরের হৌসে কাজ করিতেন। তিনি আমদানী রপ্তানীর সব খবর রাখিতেন। এজন্য তিনি বলিলেন,—"যারা আমার উপর রাগ করিয়াছে, করুক, আমি ততক্ষণে দশ ছিলিম তামাক পুড়াইব।" কমলমণি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ। শ্রীশচন্দ্র একবার তামাকু দেবীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা দুষ্কর হইবে। সুতরাং তাঁহার দুর্জ্জয় রাগ ও অভিমান ভাঙ্গিল। নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমরা কি ভেসে এসেছি না কি যে দশ ছিলিম তামাক পুড়াইবে?" এই বলিয়া তিনি আলবোলার মাথা হইতে কলিকাটী লইয়া ফেলিয়া দিলেন।

অতএব দেখা গেল যে যুবতী পত্নীর রাগ ও অভিমান ভাঙ্গিতে তামাকু অমোঘ অস্ত্র।

অতএব আমি উপদেশ দিতেছি যে, এখানে যিনি গৃহী আছেন, তিনি যেন বাড়ী ফিরিয়াই সর্ব্বকাজ ছাড়িয়া একপ্রস্থ আলবোলা কিনিয়া আনেন। আর যিনি গৃহিণী আছেন, তা তিনি নবীনাই হউন, আর প্রবীণাই হউন, তিনিও যেন একটু বেশী পছন্দসই আর এক প্রস্থ আল-বোলা কিনিয়া আনিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। সময়ে অসময়ে অনেক কাজে লাগিবে। তাঁহাদের জীবন মধুময় হইবে, গৃহে চিরশান্তি বিরাজ করিবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত

* কালনায় বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পঠিত।

STUDENTS' COMMON-ROOM P.G.A

Remark Pass

সাহারা

শ্রীমতী মায়া বসু

দুটী মানুষ লইয়া সংসার। বিপত্নীক মাতুল মহিম, ও পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় জ্যোতি।

জ্যোতি কলেজে পড়ে আর মহিম চেষ্টাকৃত অকাল বার্দ্ধক্যকে বরণ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে মহিমের পত্নী-বিয়োগ হয়, তদবধি তিনি যেন কেমন করিয়া চেষ্টা করিয়া করিয়া বৃদ্ধ হইয়া পড়েন। এখন মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স, কিন্তু হইলে কি হয় তিনি এমন চালে থাকেন যে তাঁহাকে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি পুরাণ দাদখানি চালের ভাত খান, নিরামিষ ঝোল খান, কাঁচকলা ডুমুর হিংচে ইত্যাদি অখাদ্যগুলি খান, ইহাই তাঁহার প্রিয়। বলেন, এ বয়সে এই ভাল। শীতের দিনে সন্ধ্যার পর আর বাহিরে যান না, গলায় গলাবন্ধ জড়াইয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া থাকেন, ভৃত্য মধু মুহুর্মুহু তামাক বদলাইয়া দেয়। বন্ধু বান্ধব যাঁহারা আসেন তাঁহারা ভাগবতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেন।

আবার জ্যোতি ঠিক বিপরীত। সে কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া এক দিস্তা লুচি খায়, আধসের দুধ খায়, গোটা দুই ডিম খায়,—টেনিস সু পায়ে দিয়া টেনিস র‍্যাকেট ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া যায়। সে ক্লাবে ব্রীজ খেলে, ডিবেটিং সোসাইটিতে বক্তৃতা দেয়, ইউথ লীগের প্রেসিডেণ্ট হয়, রোয়িং ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়, সুইমারস এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী হয়, পুটিং দি ডিশকাপের চ্যাম্পিয়েন হয়, ফুট বলের গোলকীপার হয়, ছাত্র সমিতির সভাপতি হয়, পাড়ার বারোয়ারীর মোড়ল হয়, নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে।

সম্পূর্ণ চরিত্রগত বৈষম্য থাকিলেও কিন্তু মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে স্নেহ-বন্ধন অতিশয় গাঢ়। জ্যোতি মামার দিকে চোখ তুলিয়া কথা বলে না, বাহিরে সে যেমন দুর্দ্দান্ত, মহিমের সম্মুখে তেমনই নিরীহ প্রকৃতি। মহিমও জ্যোতিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সংবাদপত্রে যেখানেই খেলা-ধূলা বা যে কারণেই হউক জ্যোতির নাম দেখেন, কাঁচি দিয়া সেটুকু কাটিয়া রাখেন, একটি মোটা খাতা আছে তাহাতে পরে এক সময় আটা দিয়া আঁটিয়া দেন। কিন্তু ইহা এতই নীরবে হয় যে জ্যোতি পর্য্যন্ত ইহার খবর রাখেনা। বন্ধুরা জ্যোতির বিবাহের কথা বলিলে, বলেন, এখন থাক, আগে এম-এ টা পাশ করুক। প্রকৃত কথা কিন্তু তা নয়; মনে হয় যত দিন না বিবাহ হইতেছে তত দিনই জ্যোতির প্রতিভা এমন করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছে, বিবাহ হইলেই সেই মেয়েটাকে কেন্দ্র করিয়া সে সব প্রতিষ্ঠা হারাইবে।

বন্ধুদের কথায় বড় কান দেন না।

নারী জাতির উপর তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা বা স্নেহের ভাব নাই। কিন্তু এই নারীবিহীন বিসদৃশ গৃহে একদিন অতর্কিতে নারীর আবির্ভাব হইল যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই অবাঞ্ছিতভাবে।

মহিমের এক মাস্-শাশুড়ীর বাড়ী ছিল হুগলী জেলার কোন এক গ্রামে, বিবাহের পর মহিম চার পাঁচ বার সেখানে যাওয়া আসাও করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর আজ প্রায় বিশ বৎসর তাঁহাদের কোন সংবাদ রাখিতেন না।

এই মাস্-শাশুড়ী একদিন সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাও একা নয়, অনূঢ়া তরুণী লইয়া।

মহিম তখন ভাগবত পাঠে তন্ময়, মধু আসিয়া সংবাদ দিল, দুটী মেয়েছেলে কোথা থেকে এসেছেন।

মহিম চক্ষু তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—মেয়েছেলে? আমাদের বাড়ী মেয়েছেলে কিরে? নম্বর-টম্বর ভুল করেনি ত?

মধু বলিল,—না বাবু, ভুল করবেন কেন? আপনার নাম বল্‌ছেন যে! অগত্যা ভাগবতখানি মাথায় ঠেকাইয়া চশমাটা মুছিয়া মহিম নীচে নামিয়া আসিলেন।

নীচের দালানে একটি প্রৌঢ়া বিধবা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কপাল পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন টানা। তাঁহার পিছনে একটি তরুণী গুণ্ঠনহীন মস্তকটি বতটা পারা যায় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তার একান্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া নাতিদীর্ঘা প্রৌঢ়ার পিছন হইতে তাহার মাথা প্রায় আধ হাত উঁচু হইয়াছিল।

মহিম চিনিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসু নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে প্রৌঢ়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—পরিচয়ের পথ ভগবান রাখেন নি বাবা, আমি নির্ম্মলার সেজ মাসী।

বহু দিনের কথা, তবু মহিম ভুলেন নাই। পদধূলি লইয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন,—আপনার এ অবস্থা হয়েছে দেখে বড় কষ্ট পেলুম মাসীমা।…এটি কি মেয়ে? আসুন, ওপরে বসবেন চলুন। তিনি অগ্রগামী হইলেন, মহিলা দুটী পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন।

উপরে গিয়া বসিলে মঙ্গলা তাঁহার দুঃখের করুণ কাহিনী বলিতে লাগিলেন। আট বৎসর হইল, বিধবা হইয়াছেন। চারটি ছেলে, একটির মৃত্যু হইয়াছে, দুটী আন্দামানে। একটি লইয়া সংসারে ছিলেন, সেটিও আজ সাত মাস হইল অন্তরীণ হইয়াছে। এটি কন্যা নয়, পিতৃমাতৃহীনা দেবর-কন্যা। মঙ্গলা বলিলেন,—বাবা, অভাব নেই, কিন্তু সংসারের দশা ত শুনলে, বিয়ের চেষ্টা করে কে?

মহিম অস্ফুটে কহিলেন, তা সত্যি।

মঙ্গলা বলিলেন,—বিপদ ত কম নয়, পল্লীগ্রামে ঝি বউ নিয়ে ঘর করা এক দায় হয়েছে। বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই দেখে গাঁয়ের নিষ্কর্ম্মা হতভাগাগুলো নানারকম করে জ্বালাচ্ছে। হতভাগাদের খেতে দেবার মুরোদ নেই, প্রাণে সখ ঢের। মেয়ে ত ভয়ে কাঠ হয়ে গিছল, আমি আর ওই দেশে রাখতে ভরসা পেলুম না, কি জানি কোনদিন কি বিপদ ঘটবে!

মহিম সংক্ষেপে বলিলেন, তাই বটে!

মঙ্গলা একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—আশুর কাছে তোমার খবর মধ্যে মধ্যে পাই। কলকাতায় চেনা ত কেউ নেই, তাই ভাবলুম তোমারি কাছে আসি, কাছে-পিঠে একটা বাড়ী ভাড়া করে দিবে যদি একটু দেখা শোনা করতে পার বাবা, তা'হলে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আমি দেশে চলে যাই।

মহিম একটু হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু কলকাতা সহরটাও তত ভাল নয় মাসিমা, যতদিন না মেয়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছেন আপনি এখানেই থাকুন। আপনার একা থাকা আমি অনুমোদন করতে পারি না।

৩

জ্যোতি বাড়ী ফিরিয়া দেখে বৃহৎ ব্যাপার।

উপরে তিনখানি ঘরের মধ্যে দুই পাশের দুইখানিতে মহিম ও জ্যোতি থাকিতেন, মাঝেরখানি অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। সেই ঘরের সম্মুখে চেয়ার পাতিয়া মহিম বসিয়া মঙ্গলার সহিত গল্প করিতেছিলেন। মামাবাবুকে এমন প্রসন্নমুখে গল্প করিতে দেখিয়া জ্যোতির তাক্‌ লাগিয়া গেল।

মঙ্গলা বলিলেন,—এইটি বুঝি তোমার ভাগ্নে? খাসা ছেলে!

মন্তব্য শুনিয়া জ্যোতি একটু দাঁড়াইল, ইনি কে কিছুই জানে না, অথচ অতিক্রম করিয়া ঘরে ঢুকিতেও পারে না; মহিমের উত্তরের প্রত্যাশায় একটু দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন,—জ্যোতি, ইনি তোমার দিদিমা।

ইঙ্গিত পাইয়া জ্যোতি প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল। ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, যেন অজন্তার একখানি প্রাচীর-চিত্র সদ্য প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চোখোচোখী হইতেই মল্লিকা মাথা হেঁট করিয়া লইল।

প্রণাম সারিয়া মিনিট পাঁচ দাঁড়াইয়া জ্যোতি নিজের ঘরে গেল; গায়ের জামা খুলিয়া মেলিয়া দিতে দিতে মৃদু হাসির সহিত অনুচ্চকণ্ঠে কহিল,—উনি ত দিদিমা, তরুণীটা কে? দোহাই ধর্ম্ম, মাসী-টাসী না হয়! অমন সুন্দর চোখ দুটী মাসির থাকবার কোন আবশ্যক করে না!

স্নান করিয়া জ্যোতি সাধারণতঃ খোলা গায়েই উপরে

যায়, আজ কিন্তু কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার জ্ঞান হওয়া অবধি এই প্রথম বাড়ীতে নারী সমাগম হইল, সেজন্য কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতেছিল। জ্যোতি ভিজা তোবালেখানা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে আপন মনেই বলিল,—হল মন্দ নয়, ছত্রিশবার ওদের ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে হবে।

সিঁড়ির বাঁকে মল্লির সহিত জ্যোতির একেবারে মুখোমুখী দেখা হইয়া গেল।

জ্যোতির কাঁধে চওড়া লাল পাড় গামছা, বাঁ হাতে সাবানের বাক্স, ডান হাতে কতকগুলা কাপড় চোপড়। সেও কাপড় কাচিতে যাইতেছে।

সিঁড়ি স্বল্প-পরিসর, জ্যোতির একার পক্ষে ছোট না হইলেও তুই জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মল্লি যতদূর পারিল কোণ ঠাসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। জ্যোতি কাত হইয়া উঠিয়া গেল, তথাপি তুজনের হাতে হাত ঠেকিয়া গেল। জ্যোতি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—সিঁড়িটা বড় সরু, আমার নেবে যাওয়াই উচিত ছিল।

মল্লি নতমুখে নামিয়া গেল।

৪

মঙ্গলা আসিবার পর প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন মঙ্গলা মহিমের খাবার কাছে আসিয়া বসিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কোন দিনই মহিমকে খাইতে দেখেন নাই। পূজার্চ্চনাতে তাঁহার তুই বেলাই অত্যন্ত সময় লাগে, মহিমের তখন খাওয়া হইয়া যায়। আজ একটু সকাল সকাল হইয়া গিয়াছে। মহিমের পাতের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—তুমি মাছ খাও না বাবা?

মহিমের অন্তরে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। তিনি ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—কে বা আছে, কে বা দিচ্ছে। রাঁধুনি বামুনের হাতের মাছ রান্না আমার খেতে ইচ্ছে করে না।

মঙ্গলা বলিলেন,—খাও যদি মল্লিও ত রোজ তু'একখানা রেঁধে দিতে পারে।…তবে তাও সত্যি, কেইবা আছে, আর কেই বা যত্ন করে খাওয়ার তদারক করে!" একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন,—"নির্ম্মলা গেছে কতকাল হয়ে গেল,—তখন তোমার বয়সই বা কি। যদি আবার সংসারী হতে তবে এমন ছন্নছাড়া সংসারটা হত না। এখন তোমার বয়স কত হল মহিম?

চিরসত্যাশ্রয়ী মহিমের গলার কাছে কেমন একটা কষ্টকর শ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল, তথাপি তাহা দমন করিয়া বলিলেন,—আঠত্রিশ হবে গেছে।

মঙ্গলা বলিলেন,—মোটে? এখন ত দেখি ছেলেরা তোমার বয়সে অনেকে প্রথম বিয়েই করে।

মহিম আর কথা বলিতে পারিলেন না। মিথ্যাকথা বলার অনুতাপে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল।

কিন্তু ইহার পর বেশ একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন মহিমের ব্যবহারে দেখা গেল। মহিম তাঁহার অকাল-বার্দ্ধক্যের মিথ্যা খোলসটি ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিলেন।

তিনি প্রচুর আমিষ ভোজন করেন, ফ্যাসান মত ফিট্‌ফাট কাপড় পরেন, সান্ধ্যবায়ু সেবনে যান;—ভাগবতের আসর আর তেমন জমে না। বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হন।

জ্যোতি দেখে, আর হাসে। আপন মনেই বলে,—এবার বসন্তের বাতাস দেখছি ছোটমামাবাবুর গায়েই লেগেছে! এ হল কি! পঙ্কজনেত্রার দৃষ্টিপাতের ফল নাকি!

তার আর মল্লির সম্পর্কটা দূর দূরই আছে। মল্লি গৃহিণীহীন সংসারে শৃঙ্খলা আনিয়াছে তার সেবানিপুণ তুখানি হাতের ছাপ গৃহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু জ্যোতির সহিত মুখোমুখী কথাবার্ত্তা তাহার হয় নাই। জ্যোতির অনুপস্থিতিতে মল্লি তাহার ঘরে আসে, তাহার বই গুছাইয়া রাখে, বিছানা ঝাড়ে, জামা কাপড় গুছাইয়া রাখে, বোতাম বসাইয়া রাখে, ছেঁড়া কাপড় বাতিল করে। একান্ত আবশ্যক হইলে 'হুঁ' 'না' বলে, কিন্তু তার বেশি নয়। শুধু জ্যোতির মেডেল, শিল্ড, কাপ ইত্যাদির সম্বন্ধে তাহার ঔৎসুক্যের সীমা নাই, সেগুলি প্রত্যহ নানাভাবে সাজাইয়া সে যেন আশ মিটাইতে পারে না।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখে নীচে হইতে একটা কাচের আলমারী উপরে তাহার ঘরে আসিয়াছে এবং তাহাতে কাপ, শিল্ড ইত্যাদি সুষ্ঠু ভাবে সাজান। মল্লির কাণ্ড!

জ্যোতি ত হাসিয়াই অস্থির; তাহারপর মনে হইল যে এতখানি মমত্ব লইয়া এগুলি সাজাইয়াছে তাহাকে একটু ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। দালানে আসিতেই মল্লির সহিত দেখা হইয়া গেল। সে ছাদ হইতে এক পাথর বড়ি লইয়া নামিতেছিল।

জ্যোতি হাসিয়া বলিল,—ও কি কাণ্ড করেছেন?

মল্লির ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল, ঈষৎ সলজ্জ-কণ্ঠে কহিল,—কেন? কি করেছি?

"কেউ যদি দেখে, বলবে কি?"

"কেন, কি আর বলবে? কিছু দোষ হয়েছে কি?"

জ্যোতি আবার হাসিল; বলিল,—"দোষ আর কি হবে? কিন্তু যদি কেউ দেখে, বলবে আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী।"

মল্লি বলিল,—"কোনদিন কারুকে ত আসতে দেখিনি—"

জ্যোতি তাড়াতাড়ি নিম্নস্বরে বলিল,—"ও বাবা, আমার বন্ধুদের এখানে আনতে পারি?—এই শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তারাত এক একটা ডাকাত।"

আটদশ দিন পরের কথা;—মল্লি তাহাদের কক্ষদ্বারে পিঠ দিয়া বসিয়া একটা টেবিলক্লথ সেলাই করিতেছিল। জ্যোতি তাহার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া ব্লেড দিয়া পেন্সিল কাটিতেছিল;—অন্যমনস্ক হইয়া মল্লির কর্ম্মরত মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া চাহিয়া পেন্সিল কাটিতে গিয়া এক সময় তাহার আঙুলের অগ্রভাগটা ব্লেড লাগিয়া অনেকটা কাটিয়া গেল।

একটা অস্ফুট শব্দ পাইয়া মল্লি চোখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর সেলাই ফেলিয়া ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া আসিল, বলিল, "কি করলেন? রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে কি করব?"

জ্যোতি ব্লেডটা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"ভয় পাচ্ছেন কেন? এমন কিছু হয়নি। একটু চূণ আনুন দেখি, রক্তটা বন্ধ করি।"

মল্লির মুখ শুখাইয়া গিয়াছিল; বলিল,—"চূণ দেবেন? বড্ড জ্বালা করবে যে! তার চেয়ে যান না একবার ডাক্তারের কাছে।"

জ্যোতি বলিল, "কিছু হবে না, ভয় কি। ডাক্তার খানিক বেনজিন দিয়ে বেঁধে দেবে, সে এক হাঙ্গাম। খেলতে গিয়ে কত সময় এমন কেটে যায়।" মল্লি আর কথা বলিল না, চূণ আনিতে গেল। চূণ আনিয়া যত্ন করিয়া কাটা হাতখানি ধরিয়া ক্ষতস্থানে দিতে দিতে বলিল,—"কিন্তু এই নিষ্ঠুর কাজটা করতে আমার গা শিব শির করছে। লোকে বলে, কাটা ঘাযে নুনের ছিটে—আমাকে তাই করতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে যেন আপনার শত্রুতা ছিল।"

জ্যোতি হাসিল; কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তিতে তাহার কণ্ঠস্বর প্লাবিত হইয়া গেল, বলিল,—"শত্রু নয়;—বলুন বন্ধু। কেটে ত প্রায়ই যায়—কত সময় কত সাংঘাতিক আঘাত পাই, কিন্তু কে আর কবে এত মমতা করে সেবা করে!"

মল্লি কি জানি কেন চোখ তুলিয়া জ্যোতির পানে চাহিতে পারিল না, নতমুখে অস্ফুটস্বরে কহিল,—"সেবা ত কতই করলাম!"

এই প্রথম দিন দুজনের সাহচর্য্যে দুজনের এতটা কাটিল।

৫

মল্লির বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাত্র যে না মিলিল তা নয়, আর পাত্রী দেখিয়া কেহ অপছন্দ করিবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু মল্লির পিতৃকুলের পরিচয় পাইয়া সকলেই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। এত বড় বিপ্লবী ঘরের মেয়ে লইতে কেহ ভরসা করে না। মঙ্গলার মনে অভিমান জাগে জ্যোতির মত সুপাত্র ঘরে থাকিতে মহিম ঘটক লাগাইয়া পাত্র খোঁজেন, মল্লি কি তার যোগ্য নয়? কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারেন না—কি জানি মহিম যদি মুখের উপরই 'না' বলিয়া বসেন!

এমনই করিয়া পূর্ণ একটি বৎসর কাটিয়া গেল। মঙ্গলা নিজের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁর শোকজীর্ণ অন্তরের মুক্তি কল্পনা করিয়া শান্তি বোধ করিলেও মল্লির জন্য চিন্তিত হইলেন। তাঁর অবর্ত্তমানে মল্লির দাঁড়াইবার স্থান নাই।

একদিন থাকিতে না পারিয়া ইঙ্গিতে মহিমকে সে কথা জানাইলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। যেদিন মহিমকে বলিলেন, তাহার পরদিন মঙ্গলার জ্বর আসিল এবং সাত দিনের পীড়ায় মঙ্গলা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অসুখের

কয়দিন আচ্ছন্ন হইয়াই কাটিয়া গেল, কাজেই মল্লির সহিত জ্যোতির বিবাহের ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

মঙ্গলার শ্রাদ্ধের তিনদিন পূর্ব্বে কনিষ্ঠ অন্তরীনাবদ্ধ পুত্র আসিতে পাইল। শ্রাদ্ধান্তে যাইবার প্রাক্কালে সে জ্যোতিকে বলিল,—মল্লির জন্যে বড় ভাবনা নিয়েই যাচ্ছি। আপনাদের আশ্রয়েই এতদিন সে আছে—তবু মা ছিলেন…। আমরা ওর হতভাগা দাদা,—ছোট একটি বোন, কিন্তু তাকেও সৎপাত্রে দিতে পারলুম না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—যদি ক্ষমা করেন তাহলে বলি, মল্লিকে আপনি নিন, ও আপনার অযোগ্য হবে না……।

জ্যোতির বুকের রক্ত দ্রুততালে বহিল; এযে তার গোপন স্বপ্নের স্বর্গ। মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—কিন্তু প্রকাশবাবু, উনি বয়স্থা, ওঁরও একটা মতামত আছে, তিনি আমার অযোগ্য, কি আমি তাঁর অযোগ্য সেটা তাঁর বিচার্য্য।

প্রকাশ শান্ত হাসির সহিত কহিল,—মল্লি হিন্দুর মেয়ে জ্যোতিবাবু, এর চেয়ে বড় কথা আমি বলতে পারি না…। আর তাছাড়া আপনি রমণীরঞ্জন, কোন সমাজের কোন স্তরের মেয়েই বোধ হয় আপনাকে অযোগ্য বোধ করবে না।

জ্যোতি সলজ্জ হাসির সহিত বলিল,—খুব উঁচুদরের সার্টিফিকেট দিলেন দেখছি! কিন্তু অসম্ভবও অনেক সময় সম্ভব হয়।

প্রকাশ বলিল,—মনে সন্দেহ রাখবেন কেন? মল্লি ত ছেলেমানুষ নয় তার মত আছে কিনা তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। আমার স্থির বিশ্বাস তাঁর অমত নেই।

জ্যোতি বলিল, আপনার ধারণা সত্য হলে আমি ভাগ্যবান।

৬

জ্যোতি স্থির করিল একদিন মল্লির কাছে প্রস্তাব করিয়া দেখিবে। কিন্তু শোকার্ত্তা মল্লির ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া একথা উত্থাপন করিতে সঙ্কোচ হইতে লাগিল।

সেদিন এমনই অকারণে এদিক ওদিক করিতে করিতে জ্যোতি অন্যমনস্কভাবে মহিমের ঘরে ঢুকিল। বোধহয় পনের ষোল বৎসরের মধ্যে সে কোন দিন এ ঘরে ঢোকে নাই। কোন দিন এঘরে আসিবার ইচ্ছাও জ্যোতির হয় না, এঘরে এমন সব ধর্ম্মতত্ত্ব মাথান আছে যে জ্যোতি তাহা সহ্য করিতে পারে না। আজ অকস্মাৎ সে টেবিলের কাছে জ্যোতি আগাইয়া গেল। রাশিকৃত বইগুলির পানে চাহিয়া মৃদুহাস্যে অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীদের আর কি সে আদর আছে?

বইগুলি নাড়িতে নাড়িতে সে যেন ভূত দেখিয়া চমকাইয়া গেল একি? বৃদ্ধ ঋষি বাৎসায়ণ এখানে প্রবেশ করিলেন কি করিয়া? জ্যোতির কৌতূহল বাড়িয়া গেল, এটা ওটা নাড়িতে নাড়িতে দেখিল একা বাৎসায়ণ নয় হ্যাভলক ইলিস, বার্ট্‌ও র‍্যাসেল, মারী ষ্টোপস অনেকেই আছেন!

মারী ষ্টোপস তুলিতেই তাহার ভিতর হইতে কিসের একটা কোণ বাহির হইয়া আসিল, খুলিয়া দেখে, মল্লির ছবি?

একবার পাটনায় মল্লির একটা সম্বন্ধ হইয়াছিল, পাত্র পক্ষ পাত্রীর ছবি চাহিলে জ্যোতিই এই ছবি তুলিয়া দেয়।……তাহারই হাতের করা জিনিস যেন কালসর্প হইয়া তাহাকেই দংশন করিল।

জ্যোতি কম্পিত পদে বাহির হইয়া আসিল। নিজের ঘরে গিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল তার বুকের ভিতর যাহা হইতেছে তাহার কাছে বিহারের ভূমিকম্পও তুচ্ছ।

"অমন করে বসে আছেন কেন? অসুখ করছে কি?"

মল্লির কণ্ঠস্বর! নাস্তিক জ্যোতির বুক ভেদিয়াও একটা গভীর শ্বাস পড়িল, নিয়তি তোমার কি পরিহাস!

মল্লি হেঁট হইয়া মাথায় একটা হাত রাখিয়া বলিল, উত্তর দিলেন না যে? কি অসুখ করছে? মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি? জ্যোতি মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, আমি ভাল আছি।

মল্লি বলিল, মুখ তুলুন দেখি, কেমন ভাল আছেন দেখি!

তাহার পর স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, মাথায় এত যন্ত্রণা হচ্ছে যদি একবার আমাকে খবর দিলেন না কেন? ওডিকলোনের জলে মাথাটা ধুয়ে দিই?

জ্যোতি মল্লির দিকে চাহিতে ভরসা করিল না, তদবস্থ থাকিয়াই বলিল, না, আমি সত্যি ভালো আছি। আমার ঘুম পাচ্ছে। বলিয়া জ্যোতি শুইয়া পড়িল।

মল্লি কিছুই বুঝিল না, খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মন্থর পদে চলিয়া গেল।

রাত্রে মহিম আসিয়া জ্যোতির মাথার কাছে বসিলেন, প্রথমে কি অসুখ করিয়াছে কেমন আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "দেখ, এত দিন মাসিমা ছিলেন, কোন কথা ছিল না, কিন্তু এখন মল্লির এভাবে এখানে থাকাটা বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

জ্যোতি নির্ব্বাক দৃষ্টিতে মহিমের প্রতি চাহিয়া রহিল।

মহিম বলিলেন, তুমি ত পরশু গিয়ে দিল্লীতে জয়েন করবে, আমার ইচ্ছে তার পূর্ব্বেই মল্লির সঙ্গে তোমার বিবাহটা হয়ে যাক। জ্যোতি শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল; স্থির চক্ষে মহিমের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "উনি ছোট মামিমার বোন,—আমার মাতৃস্থানীয়া,—আমায় ও কথা বলবেন না।"

মহিমের স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে শুধু উচ্চারিত হইল, জ্যোতি! কি বললে?

জ্যোতি পুনরায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, যাঁকে মা বলেছি তাঁর সম্বন্ধে আর এ আলোচনা চলে না ছোটমামা বাবু, তবে এভাবে থাকা সত্যিই খুব খারাপ দেখাচ্ছে। আপনি ওঁকে বিয়ে করুন।

* * * * *

পরদিন এক সময় জ্যোতি শুনিতে পাইল মহিম পাশের ঘরে মল্লির সহিত কথা বলিতেছেন। মাঝখান হইতে কতকটা কানে গেল,—আমি অস্বীকার করছি না মল্লি, যে তোমার উপর আমার এই বয়সেও প্রচণ্ড আসক্তি আছে। এটা খুবই লজ্জার কথা, আমি নিজের এ দুর্ব্বলতাকে সমূলে নিঃশেষ করতে চেয়েছিলুম জ্যোতির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে। মহিম একটু থামিলেন, মনে হইল তাঁহার কণ্ঠস্বর বেদনায় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম হতভাগ্যটার কথায়! এই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বিপত্নীক আমি, আমার মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, চব্বিশ বছর বয়সে ওর তা নেই, একেবারে আশী বছরের বুড়োর চেয়েও অধম! কুর্ণিশ করে তোমায় মা বলে বসল! বলে আপনি বিয়ে করুন। মহিম আবার একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আমি এ অসম্ভব কথা মনে ঠাঁই দিতেও পারি না, তোমার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি আমার বয়েস......তবে এমনি জায়গায় এসে তুমি দাঁড়িয়েছ যেখানে তোমাকে আর একটা বেলাও রাখা যায় না; যা হোক কিছু করতেই হবে।

মল্লির কণ্ঠ শুনা গেল, "আপনি আমার হিতার্থী, যাতে আমার ভাল হয় তাই করুন।"

৭

বছর দেড়েক বাদে জ্যোতি পূজার অবকাশে কলিকাতায় আসিল। জ্যোতির প্রণাম মল্লি বেশ স্বাভাবিক ভাবে লইল, তাহার পর শান্ত হাসির সহিত বলিল, এত দিনের মধ্যে কি বাবা একটিবারও আসতে নেই।

তার কথার ভঙ্গী দেখিয়া জ্যোতি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর কত দেশ-বিদেশের গল্প হইতে লাগিল। মহিমও একবার আসিলেন, মল্লিকে বলিলেন, জ্যোতিকে পাঁচ রকম মাছ টাছ করে খাওয়াও। পশ্চিমে ভাল মাছ পাওয়া যায় না।

মল্লি মহিমকে দেখিয়া অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

দুই চারিটা অবান্তর কথার পর তিনি সরিয়া পড়িলেন। তিনি গেলে জ্যোতি প্রশ্ন করিল, "ছোট মামাবাবুকে যেন বড় রোগা দেখলুম,—

মল্লি মাঝখানেই বলিল, "হবে না? দীক্ষা নিয়ে পর্য্যন্ত মাসে পাঁচ ছটা উপোস হচ্ছেই। এখন ত আবার 'নবরাত্রি' যাচ্ছে।" জ্যোতি উৎসুক হইয়া বলিল, ন'দিন? কি খান?

মল্লি বলিল, "কিছু না, রাত্রে একটা ডাব আর দুটো সন্দেশ!" জ্যোতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ, এ রকম করলে শরীর থাকবে কি করে!" আপনি কিছু বলেন না কেন ছোট মামীমা!"

মল্লি ম্লান হাসিল, কথা বলিল না।

খাইতে বসিয়া কথায় কথায় জ্যোতি জানিতে পারিল,

মহিম আবার আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়াছেন, এবং একার জন্য কি আর করে বলিয়া মল্লিও প্রায় তাঁহাই হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতি ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ভাগবতের আলোচনা তেমনি চলে?

মল্লি হাসিল; অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ হাসি, বলিল, চলে বৈকি। বয়সও বাড়ছে ছাড়া কমছে না, পরকালের চিন্তা সকলেরই বয়স বাড়ার সঙ্গে আসে।

জ্যোতির বুকে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল, তার এক মুহূর্ত্তের অপরিণামদর্শীতার ফল। বেচারী মল্লি?

পূর্ব্বে মল্লি ও মঙ্গলা যে ঘরে থাকিতেন এখন মহিম সেই ঘরে লেখা পড়া করেন। বৈকালের দিকে এক সময় মহিমের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া জ্যোতি সচকিত হইয়া উঠিল। মহিম বলিতেছেন, "আহা কি করো ছেলে মানুষী ছাড়ো। আচ্ছা জ্বালাতন করেছ! না পড়ব না, চব্বিশ ঘণ্টা তোমার সঙ্গে মাথামুণ্ড বকব। ওঃ জ্যোতি বাড়ী আছে বলে যদি এতই লজ্জা তবে হুড় করতে ঘরে ঢুকেছ কেন? যাও এখান থেকে। আহ্নিকের জোগাড় করে এসেছ?"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জ্যোতি বারান্দায় বাহির হইতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। বারান্দায় মল্লি দাঁড়াইয়া আছে সামনের গ্যাসের আলো পরিপূর্ণ ভাবে তাহার মুখে পড়িতেছে—গালের উপর দুটী রজত ধারা বহিতেছিল!

জ্যোতির বুকের ভিতর রুদ্ধ ক্ষোভ গুমরিয়া উঠিল। এ অশ্রু-ধারার জন্য দায়ী কে!......

শ্রীমায়াদেবী-বসু

মায়া (handwritten)

আবার দেবী (handwritten)

বিদায় শেষে

শ্রীমতী—[handwritten name] — Dundabala Debi. Late of P. G.

ভোরের বেলায় শিশির ভেজা বাঁকা পথে
সাবধানে যায় হাওয়া,
বাসি ফুলের গন্ধটুকু নিয়ে।
একটি ফিঙে ঝাউয়ের গাছে সরু ডালে
কালো রঙের আলো লাগায় চোখে।
তুমি চাইলে অন্যমনে,
তারপরে তো মিলিয়ে গেলে রাঙা পথের বাঁকে।
মনের কোণে আঙুল-ছোঁয়া দিল
সেগুন ডালের বেঁকে পড়া রোদ।
তাল লাগালো ধানের শিষে
মিঠে আলোর উতলা উর্ব্বশী।

চেয়ে দেখি ফিঙের পুচ্ছে
ভোর রজনীর চমকে-জাগন কাঁপে।
অজস্রতায় প্রাণ ভরা তার
ফাগুন-বনে আম্রের বোলের মতো।
তোমার চোখের তারা
পাখীর ডানার নাচন-ছন্দে গড়া;
চলার পথে লাগিয়ে গেল রেশ।
মাঠের পারে কলের বাঁশি শুনে
উদাস করে মন।
চেয়ে দেখি পাখী গেছে তুমিও গেছ চলে।
আর কখনো দেখি নাইতো
শিউলি বনে এমন শূন্যতা।

STUDENTS' COMMON-ROOM P. G. A

সহজ ধর্ম্ম

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্-এ

সহজ ধর্ম্মের উদ্ভব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ৺পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বৈষ্ণব সহজ ধর্ম্মের উৎপত্তি বৌদ্ধ সহজ ধর্ম্ম হইতে, তবে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধ সহজধর্ম্মের অর্থ ভগবানের করুণার পরমা স্ফুর্ত্তি তখনই যখন সন্তান-সম্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং এই রূপকের পরীক্ষা নিজ দেহের উপর দিয়া। বৈষ্ণব মতেও সহজধর্ম্ম রূপক। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে নিজ দেহের উপর পরীক্ষা বা experiment না চলে ঠাকুরাণীর দেহে চলেছে। সহজিয়ারা প্রকৃতি লইয়া সাধনা করেন, এই দেখিয়া অনেক পণ্ডিত সহজিয়া ধর্ম্মের উপর তান্ত্রিক প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের তত্ত্ব ও আচার সম্বন্ধে কিছু ঐক্য দেখে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। কিন্তু অনুসন্ধানে যদি এমন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহা অস্বীকার করাও সমুচিত নয়।

সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে লিখা আছে সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক আকর্ষণ ঋষিরাও অতিক্রম করিতে পারেন নাই।(১) শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, ভগবদ্গীতা এবং ভাগবতের মধ্যে আমরা ভক্তিধর্ম্মের সূত্র পাই। কিন্তু কোথাও কান্তাভাবমূলক কথা—যে প্রেমধর্ম্ম চৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য তাহার পরিচয় নাই। কান্তাভাবমূলক প্রেমগীতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ও আল্‌বার-দিগের সঙ্গীতে আমরা দেখি। কেহ কেহ বলেন, কান্তা-ভাবের ভজন প্রবর্ত্তনে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য দেশের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত। ভাবপ্রবণ দ্রাবিড়দের নিকট হইতে তিনি এই ভাবের আমদানী করেন। কিন্তু "খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজধর্ম্ম প্রচার করেন।"(২)

"যুগনদ্ধরূপং সহজানন্দফলং।"

এখানে দেখা যায় বৌদ্ধ সহজিয়ারা ভগবানকে অস্বীকার করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়ারা ততটুকু অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা মানুষের প্রাধান্য দিয়েছেন।

"শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

আমরা দেখি রাগমূলক উপাসনার মূল ভিত্তি চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তীযুগে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ এই বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শক।

"ব্রহ্ম রুদ্র-সুররাজচর্চ্চিতঃ।
পর্চ্চিতশ্চ রমরাঙ্কমালয়া॥
চর্চ্চিতশ্চ নবগোপবালয়া।
প্রেমভক্তিরসশালিমালয়া॥"

সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবঃ।

চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত ব্রহ্ম-সংহিতায়ও এই ভাবের উল্লেখ আছে।

আনন্দ চিন্ময় রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।

৪২ শ্লোক।

সহজিয়া ধর্ম্মের একমাত্র বিশেষত্ব প্রকৃতি লইয়া সাধনা। তন্ত্রের দিক দিয়ে এই সাধনা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। নিজকে নারী ভেবে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছায়। ইংরেজ কবি নিউম্যান বলেছেন—নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে রমণীর ন্যায় হৃদয়কে মধুর রসে আপ্লুত করতে পারলে ব্রহ্ম-সান্নিধ্য লাভ হয়। (১) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সহজিয়া-

(১) ঋগ্বেদ, ৮৷৬২৷৯

(২) বৌদ্ধ গান ও দোহা, Introduction, page 16. মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(১) If soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become a woman, yes, however manly thou mayst be among men."—Newman.

দের অনুরূপ "একান্তিপ্রায় সম্প্রদায়" নামে এক সম্প্রদায় ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে "পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী" জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভায় নে'চে গে'য়ে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি সাধন করেছেন। গীতগোবিন্দে রাগমূলক উপাসনার বিশেষভাব উপলব্ধ হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের মতে জয়দেব তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং গুরুপরম্পরাক্রমে এই ভাব অবগত হন। বিদ্যাপতির কবিতায় আমরা দেখি :—

যব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে বাজব মঙ্গলতুর॥
আলিপনা দিব সখি মোতিম হার।
উপহার দিব নুব যৌবন ভার॥
সেজ বিছায়ে খোব বিকচ কুসুমে।
হৃদয় পাতিয়া দিব রহিবে শয়ানে॥
আঁচলে বাতাস দিব ঘুমাইবে সুখে।
সারানিশি চেয়ে রব শ্যামচাঁদ মুখে॥

গাইকোয়াড় রাজ্যের অন্তর্গত মেহসানা নগরের নিকটে চুবাল গ্রামে বহুচরা নামে দেবী আছেন। এই মন্দিরের পূজকেরা নারীবেশে থাকেন এবং কৃত্রিম উপায়ে আপনাদিগকে পুরুষত্বহীন করেন। বাংলাদেশে এক শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা নিজ দেহে রাধার আবির্ভাব ভেবে হাতে শাঁখা ও কপালে সিঁদুর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করেন। দাদুর শিষ্য সুন্দরদাস তাঁহার সহজানন্দ গ্রন্থে লিখিয়াছেন সহজ মুক্তধর্ম্ম চিরকালের। বাউলরা বলেন তাঁহাদের 'সহজ ধর্ম্ম বেদের আগেকার।' অথর্ব্ব বেদের ব্রাত্যেরা তখনকার দিনের বাউল। মধ্যযুগের প্রায় সকল ভক্তই গানপ্রিয়। ইঁহারা আত্মপ্রকাশ করেছেন কবিতায় ও গানে এবং সহজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এই সব প্রাচীনতম কবিতার মধ্য দিয়ে।

যুগপ্রবর্ত্তক কবি চণ্ডীদাসকেই অনেকে সহজিয়ার আদিগুরু বলেন। রামীর সহিত সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত চণ্ডীদাসের গল্প ভুবনবিদিত। চণ্ডীদাস প্রেমিক, সাধক ও বাশুলীর ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন রাধা প্রেমময়ী এবং তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। কিন্তু সহজিয়ারা কৃষ্ণে রূপ, রাধায় প্রেম ও বাশুলীতে আনন্দ, এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন। চণ্ডীদাস খাঁটি মানুষ ছিলেন। মানুষের দুর্ব্বলতা তাঁহার ছিল। প্রেম জাতকুলের ব্যবধান মানে না। চণ্ডী ঠাকুরের রামীর প্রেমে পড়া অসম্ভব নয়। তবে তিনি নিজের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রেমমার্গীয় সহজ ধর্ম্মরূপে প্রচার করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুর গীতিকবিতাগুলি কান্তাভাবমূলক রসে ভরপুর।

আবহমানকাল হ'তে আমাদের দেশে মুক্তিই সাধকের লক্ষ্য ছিল। গীতায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য আছে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। গীতা ভক্তির প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব জানা যায়। তবে মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতে ভক্তির যে স্বতন্ত্র এবং অভিনব অভিব্যক্তি দেখি তাহা আর কোথাও নাই। মহাপ্রভুর মতে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, ধাম বৃন্দাবন, ব্রজবধুগণের মধুর ভাবে ভজন শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ প্রেম। (১) মধ্বাচার্য্য চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের আদিগুরু বলিয়া কথিত হন। তবে মধ্ব ও চৈতন্যের ম'তে পার্থক্য আছে। মধ্বমতে হরি আরাধ্য, চৈতন্য মতে কৃষ্ণ; মধ্বমতে কাম্য সুখানুভূতিরূপ মুক্তি, সাধন বিশুদ্ধ ভক্তি; চৈতন্যমতে কাম্য প্রেম, সাধন গোপীভাবে ভজন; মধ্বমতে ভগবৎ-জ্ঞানের প্রমাণ বেদ, চৈতন্য মতে ভাগবত। (২) গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আমরা দেখি শ্রীচৈতন্য নিজের জীবনে রাধাভাব উপলব্ধি করে রাধার বিরহ ব্যথামূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। (৩) আবহমান-

---

(১) আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।

(২) শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতবঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনম্
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।

(৩) স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তি পূর্ব্ব সুদুস্করে।
অন্তর্ব্বহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্॥

কাল হইতে আমাদের দেশে মুক্তিই সাধকের লক্ষ্য ছিল। মহাপ্রভু মুক্তির পরিবর্ত্তে প্রেমতত্ত্বের আগমনী গাহিলেন। বুদ্ধ বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা দিয়েছিলেন, যীশু প্রেমকে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেম কেবল মানুষের কল্যাণ-সূচক প্রেম নহে; এখানে বিরহরূপ কষ্টিপাথরের তীব্রতায় প্রেমের গভীরতা। (১)

"রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

চৈতন্যচরিতামৃত।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পরকীয়াবাদ কখন প্রবেশ করে এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ডাক্তার সুশীলকুমার দে'র মতে পরকীয়াবাদ বড় গোস্বামীরা সমর্থন করেন নাই। (২) রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন "শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর স্তবাবলী পাঠ করিলে তাঁহারা পরকীয়াবাদের বিরোধী বলিয়া বোধ হয় না। (৩) আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিরক্ত, ভজনসাধনপরায়ণ বৈষ্ণব সাধুরা যে পরকীয়ারূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তাহা নহে। তাঁদের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সাংসারিক খুঁটিনাটির অনেক উপরে। তাঁহারা চিদানন্দঘনমূর্ত্তি রাধাকে প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে স্থাপন করেছেন। (৪) তাঁদের রাধা রক্তমাংসের আকর্ষণ হইতে দূরে, সামাজিক রীতিনীতি, যুক্তিতর্ক ও বাঁধন কষণের উপরে প্রেমময়ী মূর্ত্তি। সাধক রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী বা পরকীয়া ভাবিয়া মাথা ঘামান না, তিনি রাধাকে দেখেন বিশুদ্ধ রতির স্বরূপা। তবে এই নিকষিত হেমরূপ প্রেমের মধ্যে পরকীয়া ভাব অতি সুস্পষ্ট।

হে সুন্দরি! পশ্য মিলতি বনমালী।...সনাতন।

চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রসশাস্ত্রে পরকীয়ারূপ রসের আমদানী ছিল না কিন্তু বৈষ্ণব গোস্বামীরা পরকীয়াকে কেবল রস বলেন নাই,—বলেছেন:—

পরকীয়া প্রীতি অতি রসের উল্লাস।
স্বকীয়াতে রস নাই কহিল বিশেষ॥

পরকীয়াই একমাত্র রস, স্বকীয়াতে কোথাও কোথাও কৃপাদৃষ্টি করিয়া রসাভাসমাত্র বলেছেন। চৈতন্যদেব দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এইরূপ উপাসনার ক্রম ব্যাখ্যা করলেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম-এ মহোদয়ের মতে "সনকাদি সম্প্রদায় হইতে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। তান্ত্রিকদের মতে তাঁহারা শক্তিকে পুরুষ অপেক্ষা বড় মনে করেন। তাই তাঁহাদের রাধা আগে, কৃষ্ণ পরে। (১) মহাপ্রভুকে অনেকটা এই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হয়েছে বলেই সহজিয়ারা অতি সহজেই নিজেদের গৌড়ীয় চৈতন্যসম্প্রদায়ী ব'লে চালাচ্ছে। কেহ কেহ বলেন বাংলার চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত মহারাষ্ট্রের তুকারামের যোগ ছিল। ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনায় সকল সহজিয়ারাই চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃত-রত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী প্রভৃতি তথাকথিত সহজিয়া ধর্ম্মের আদিগ্রন্থগুলি চৈতন্য-পরবর্ত্তী-যুগে লিখা হয়েছিল বলে মনে হয়। পরবর্ত্তীযুগে সহজিয়ারা ক্রম না মেনে কেবল মধুর রসের দিকে ছুটলেন।

"শ্রীরূপের অনুগত ভজনে যে হয় রত
স্থিতি তার কেবল মধুরে।"

কোন কোন সহজিয়াদের মতে তাঁদের ধর্ম্ম কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দদের দ্বারা প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। এখানে বলা উচিত যে কল্পনার ক্ষেত্রে যে বীজ থাকে, তাহাই অতি সহজে প্ররোচিত হয়। নবদ্বীপের জনৈক গোস্বামী-সন্তান হইতে অবগত হয়ে স্বামী সত্যানন্দ তীর্থ স্ব-প্রণীত "বৈষ্ণব সমাজের কলঙ্ক মার্জ্জন" গ্রন্থে সহজিয়াদের গুরুপ্রণালী এইরূপ বর্ণনা করেছেন:—

(১) যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥
শ্রীমহাপ্রভু।

(২) Thus the six Gosvamins at any rate do not countenence the Parakiya-Vada which developed at a later period in Bengal Vaisnavism.
—Introduction to Padabali of Rup Goswamin.
Page. LXVII

(৩) স্বাধিকার, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪২ আশ্বিন।

(৪) মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
—চৈতন্য চরিতামৃত

(১) ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা। পৃঃ। ৩৭

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
|
শ্রীরূপ গোস্বামী
|
মুকুন্দদাস গোস্বামী
|
রূপ কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যকারিকা গ্রন্থে এইরূপ লিখা আছে :—

'বঙ্গদেশে এক গ্রামে বহু শিষ্য নিয়া
রূপ কবিরাজ বৈসে মণ্ডলী করিয়া।
* * *
রূপ কহে শিক্ষা গুরু মুকুন্দ গোঁসাই নাম।
কৃষ্ণদাস পরিবার রূপ কবিরাজ নাম॥
* * *

"শ্রীরূপ গোস্বামিপাদানাং ত্রীণি নামানি শ্রীরূপ মঞ্জরী রঙ্গনমালা রঙ্গনবল্লী গৌরচলানিভাঙ্গ শিখিপুচ্ছ-নীলাম্বরা সার্দ্ধত্রয়োদশবর্ষীয়া। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-পাদানাং দ্বে নামানি রাগরেখা শ্রীরাসমঞ্জরী চম্পকপুষ্পবর্ণা অপরাজিতা পুষ্পবসনা ত্রয়োদশবর্ষীয়া।" রূপ গোস্বামীর তিন নাম এবং বয়স সাড়ে তের। রঘুনাথ গোস্বামীর দুই নাম এবং বয়স তের। এখানে নারীর বয়ঃসন্ধির রূপই যেন সাধকের লক্ষ্য। সখার কাজ করে মঞ্জরীত্ব লাভের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে—

মাধুর্য্যের পাত্র বলে সখা সখী যারা।
কৃষ্ণেতে ঈশ্বরবুদ্ধি নাহি করে তারা॥
শিক্ষাগুরু কৃষ্ণমূর্ত্তি মানুষ নিশ্চয়।
মানুষ ভজনে প্রেমরস প্রাপ্তি হয়॥

কেবল এই পর্য্যন্তই নহে। এমন কি অঘোরপন্থী তান্ত্রিকদের অনুরূপ আচারও দেখা যায় এবং নাথ ধর্ম্মের বিন্দুসাধনের কথাও আছে।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ মতে।
জীবের অস্থি বিষ্ঠা মহাপবিত্র কহেন স্পষ্ট মতে॥
মীননাথ গোরক্ষনাথ আদি সিদ্ধগণে।
বাক্যসিদ্ধ হইল তারা যে চন্দ্র সাধনে॥

অঘোরপন্থী তান্ত্রিকেরা নরমাংস ভক্ষণ এবং নানাবিধ ঘৃণ্য কার্য্য করিয়া লোকের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করত। তাঁহারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করতে পারে নাই, কারণ তাঁদের আচার ব্যবহারে লোক কাছে ঘেঁষে নাই এবং বর্ত্তমানে তাঁহারা প্রায় লোপ পেয়েছে। পরন্তু সহজিয়া বৈষ্ণবেরা বাহ্য শুচিতা এবং নিরামিষ আহারের পবিত্রতার আড়ালে নানাবিধ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিষ্ঠাবান আকুমার বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের প্রেমগানে স্বর্গ মর্ত্ত্যের সীমারেখা ছেড়ে ভগবৎপ্রেমে বিভোর হন। সহজিয়া বৈষ্ণব আদি রসের গানে সমস্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা দূরে ফেলে দেয়। উল্লিখিত গ্রন্থে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সঙ্ক্ষেপে বলা হয়েছে।

শুনহ মথুরাদাস সাধন আমার।
* * *
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মে হয় লয়।
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ব্রহ্মে নিষ্ঠা লইয়া যে বা মনানন্দে রয়।
আহারে···তার কিছু দোষ নয়॥
পরকীয়া রস কৃষ্ণে করিলা বৃন্দাবন।
বিবাহ করিলা পরে মহিষীর গণ॥
সহস্র সহস্র নারী বিবাহ করিলা।
কত কত সন্তানাদি উৎপত্তি হইলা॥
কৃষ্ণের এসব লীলা করহ বিচার।
দোষ গুণ কিছু নাই রস ব্রহ্ম সার॥

—কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় সকল সহজিয়া গ্রন্থেই চৈতন্য চরিতামৃতকে ব্রহ্মসূত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠবার মূলে ছিল বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা। যে প্রেমতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এবং যাহার উপর ভিত্তি করে সহজ সাধনার প্রথা গড়ে উঠেছে, তাহার মূল ছিল সামাজিক নিপীড়নে। সহজিয়া ধর্ম্মের মূল খুঁজিতে মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির অনুশীলনও যথেষ্ট সাহায্য করে। কৌলিন্যরক্ষার আশায় বহু বিবাহের লজ্জাকর পরিণতি, বালবিবাহের দুর্নীতি, বাল বিধবার অভিশপ্ত জীবন, প্রেমের ও মনের অবমাননাই সহজিয়া মতবাদ গঠনের মূলভিত্তি। আসল কথা, সহজিয়া মতবাদ গঠিত হয় নর

নারীর আত্মবিকাশের ইচ্ছায়। বিদ্রোহী যুগপ্রবর্ত্তক কবি চণ্ডীদাসকে পুরোভাগে রেখে তাঁহার মানবধর্ম্মের আদর্শকে সম্মান দিয়ে বৈষ্ণব বিদ্রোহী হয়ে সহজিয়া সম্প্রদায় গঠন করেছিল।

দেশশুদ্ধ লোক পরকীয়া রসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি? দেশের লোক ভাবতত্ত্বের দিক দিয়ে মধুর রসবহুল বিষয়ে মন দিল কেন? অবশ্য অন্যান্য ধর্ম্মমতেও স্থলে স্থলে এরূপ মতবাদ আছে; কিন্তু এত বহুল নহে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে দেশ দুর্নীতিপরায়ণতা ও কাপুরুষতার চরমে উঠেছিল। রাজসভায় জয়দেব দেবদাসী নিয়ে নাচতেন। বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন করবার জন্য ব্রাহ্মণেরা মুসলমান বিজেতাদিগকে উত্তেজিত করতেন, সুযোগ পাইলে নিজেরাও সামাজিক উৎপীড়ন করতেন। মানুষের অন্তরাত্মা তথাকথিত আচার ধর্ম্মের ফট্‌কা আওয়াজে মরমে মরতে লাগল। কৌলিন্যরূপ কদাচারের মারফতে একশ দু'শ বিবাহকারী সমাজে মান পায়। বালবিধবার বিবাহের বিধি মিলে না, কিন্তু দুর্নীতির দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ঘ্রাণের দ্বারা সে যুগে মানুষের জাতি যাইত। এ হেন সময়ে চণ্ডীদাসের মত মনীষীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে ইন্দ্রিয়াতীতের নির্দ্দেশ করা হয়েছে। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন পাঠে তিনি যে রামীর প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন না এমন ধারণা কেবল বর্ত্তমান শ্লীলতার যুগেই সম্ভব। দেশ নীতির দিক দিকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। বাংলার নিভৃতপল্লীর সমাজধুরন্ধরগণের চরিত্র পর্য্যালোচনা করলে এরূপ ধারণা খুবই স্বাভাবিক। তবে ইহাও একান্ত সত্য যে চণ্ডীদাসের মত প্রতিভাবান কবির পক্ষেই রামীর প্রেমে পড়া এবং রামীর কলঙ্কসায়রে ডুবা একান্ত সম্ভব। চণ্ডীদাস খাঁটী মানুষ ছিলেন, মানুষের দুর্ব্বলতা তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি ভণ্ডের মত দুর্ব্বলতাকে ধর্ম্মের ছাঁচে ফেলেন নাই এবং ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন নাই! তাই তিনি নিজের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সহজিয়া ধরণের প্রেমতত্ত্বরূপে প্রচার করেন নাই; বরঞ্চ তাঁহার রাধাবিরহে আমরা প্রেমের Sublimation পাই। তাঁহার রাধাবিরহে মানুষের শাশ্বত পিপাসা ব্যক্ত হয়েছে, পরিশেষে তিনি অমর্ত্ত্য ভাবের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁহার রাধাতত্ত্বে কবিজনসুলভ সৌন্দর্য্য ও মহাভাবের প্রেরণা আছে। শ্রীচৈতন্য স্বীয় জীবনে এই ভাবকেই উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্ত্তী সহজিয়ারা সংযমের অংশটুকু বিশেষভাবে ত্যাগ করে নিজেদের এ-যাবৎ গৌরধর্ম্মী বলে প্রচার করছে এবং চণ্ডীঠাকুরকে তা'দের আদর্শ মেনে নিয়েছে। বর্ত্তমানে সহজধর্ম্ম দুর্ব্বলচিত্ত ইন্দ্রিয়বিলাসীর আত্মপ্রতারণা। চণ্ডীদাস ও রামীর জনশ্রুতি কাল্পনিক হ'লেও প্রেমমার্গীয় সহজধর্ম্মের মূল এই বলেই সহজিয়ারা ধারণা করে নিয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থে কেবল প্রেমতত্ত্বই প্রচারিত হয়েছে। এক শ্রেণীর সহজিয়ারা প্রকৃতি লইয়া প্রেমসাধনার পক্ষপাতী, তাই তাঁহারা নজীর দেখাইবার জন্য আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রত্যেক গোস্বামীর সহিত এক একটি প্রকৃতির সন্ধান দিয়েছেন। চৈতন্যদেব ভক্তির স্থানে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে সহজিয়ারা নিজেদের গৌরভক্ত বলে প্রচার করে।

সমাজ যা'দিকে রুদ্ধ করে পিষে মারবার চেষ্টা করে তা'রাই অধিকাংশস্থলে বিদ্রোহী হয়ে সহজিয়া হয়। প্রত্যেক সহজিয়া নর-নারীর অতীত বৃত্তান্ত আলোচনা করলে ইহা এখনও সপ্রমাণ হয়। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বে কমলিলতার চরিত্রে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। সহজিয়ারা স্ত্রী-স্বামীরূপে বাস করে; এমন কি স্থলে স্থলে সন্তান পালনও করে।

বাংলায় সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে বাঙ্গালার সমাজ ব্যবস্থা। মানুষের মনের দিক দিয়ে ফিরে তাকাবার মনোবৃত্তি সমাজপতিদের খুব কম ছিল। তদুপরি বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ঘরের মায়ায়। নারীর প্রেমের দাবী বাঙ্গালীর নিকট গৌণ নয়। শিখিপুচ্ছধারী প্রেমিক কৃষ্ণ যেদিন কুরুক্ষেত্রনায়ককে তাড়া করলেন সেদিন অত্যাচারিত দুর্ব্বল জাতি জীবের লক্ষ্য কেবল প্রেমকে দেখল, জাতি তখন শক্তির পথ ছেড়ে প্রেমের পথ ধরল। তাই যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হয়েছে; গৃহের গণ্ডী যা'দের নিকট বিশাল, তারা নিজেরাই সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্প্রদায় গড়ে তুলল। নির্ব্বাণের সূক্ষ্ম আদর্শ সাধারণের নিকট বোধগম্য নহে। তাই সহজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য

আধুনিক চিত্রকলায় বাঙ্গলা দেশ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সকল যুগে চিত্রে ভাস্কর্য্যে ও সাহিত্যে সমসাময়িক অবস্থার একটা প্রকৃষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পীরা নানাভাবে নিজেদের আবেষ্টন ও আবহাওয়ার পথে নিজেদের অনুভূতির ভিতর গ্রহণ করে' নানাভাবে সেসব ফলিত করে।

এযুগে এসেছে বহুমুখী কর্ম্মপর্য্যায়। ইয়োরোপের সংস্পর্শে যন্ত্রযুগের ভেরীরব চারিদিকে বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মত্ততা ও চিত্তের একটা অভাবনীয় উত্তেজনা। তাতে করে' আধুনিক জগতের কলকারখানা, বেতারবার্ত্তা প্রভৃতি একেবারে সমগ্র বিধানকে গ্রাস করে' বসেছে। এর ভিতর আর কিছুর যেন স্থান নেই এমন মনে হয়। সব জায়গায় জলের কল, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, ইঞ্জিন, দমকল প্রভৃতি যেন সকল জাতির উপর সিন্ধুবাদের বোঝার মত এসে চেপেছে।

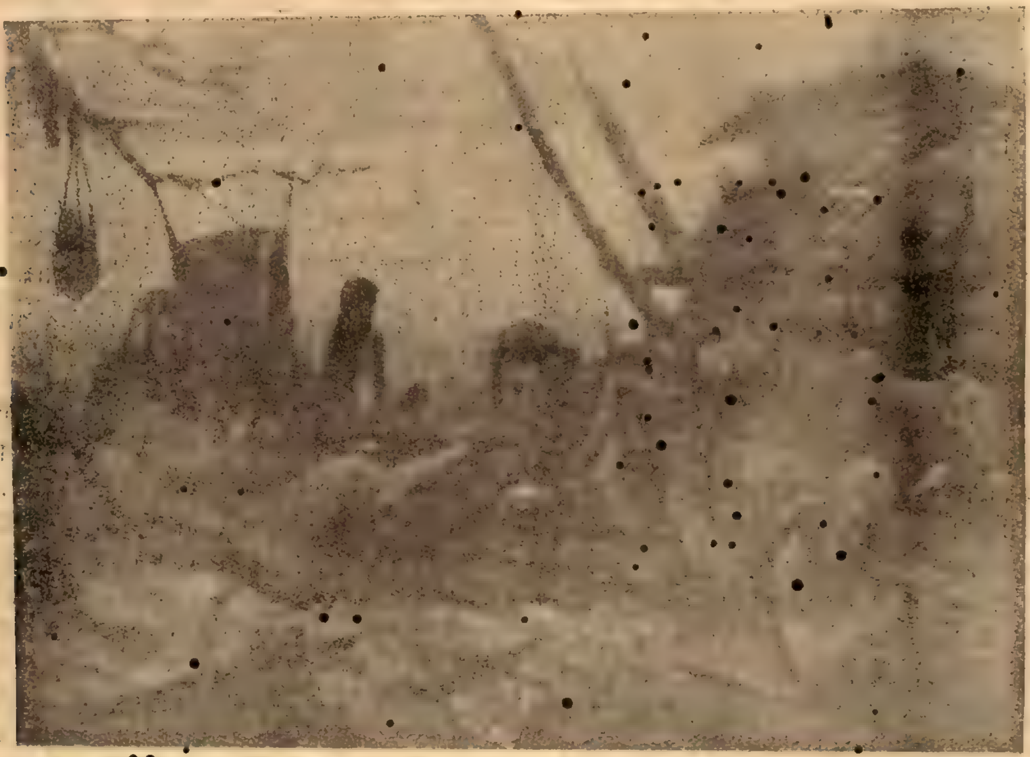

"সর্ব্বনাশ"

গোবর্দ্ধন আশ

যুগল
অবনী সেন

দোলযাত্রা
এইচ কে গাঙ্গুলী

এর ভিতর নানাদেশের মানবসমাজ কিভাবে সত্যিকার জীবন যাপন করছে তা' খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়েছে। ভারতবর্ষেও এসেছে এই যান্ত্রিক সঙ্ঘর্ষ ও বিপ্লব। এর ভিতর মানবজীবনের সত্যিকার সুখদুঃখের সারল্য একেবারে যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একদিকে এই অবস্থা অন্যদিকে বিভীষিকার মত এসে পড়েছে Tractor প্রভৃতি কৃষির কল, মোটর যান, ষ্টীমার। এসব পল্লীর বুকে বুকে ছড়িয়ে শোণিত শোষণ আরম্ভ করেছে। উষ্ণ-শোণিত যেন লক্ষিত হয় না। সব কিছুই যেন একটা নেশার টানের ব্যাপার হয়ে পড়েছে। অলীক আলেয়ার পেছনে ছুটে জীবনও অলীক হয়ে যাচ্ছে। জীবনের জাগ্রত কল্লোলের সালঙ্কারিক শোভনতা যেন কারও চোখে পড়ছে না।

এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালার চিত্র-শিল্পে দেশমাতৃকার প্রতিবিম্ব খুঁজতে যাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে। সব জায়গায় একটা অবাস্তব নিয়ে চর্চ্চা। এটা বল্‌তে হয় কঠিন বাস্তবকে

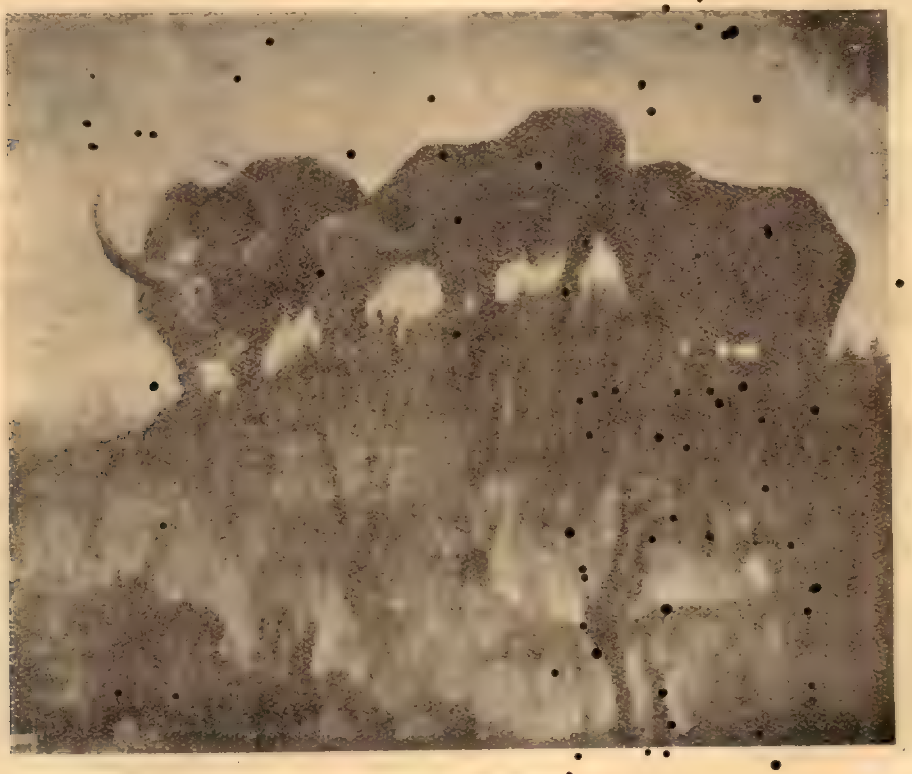

আমরা তিনজন

অবনী সেন

একদিকে যন্ত্রের জর্জ্জরিত দাবী—অন্যদিকে আছে অবাস্তব জগতের একটা অলীক স্বপ্ন। এদেশের শিল্পীরা দেবদেবীর সালঙ্কার মূর্ত্তি বা অজন্তাদির কল্পিত লালিত্য এঁকে নিজেদের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে। এ দুটির কোনটির সঙ্গে ইহলোকের সম্পর্ক নেই। দু'টিই একটা অবাস্তব পরীরাজ্য সৃষ্টির মত। তা'তে করে' জীবনের নিয়ে সব সময় মত্ত থাকাও অসম্ভব। বিশেষত যখন এই বাস্তব আমাদের দেশে কষ্টকর। আমাদের আর্ত্তনাদ ও হাহাকার সব সময় উদ্দীপনা নিয়ে আসতে পারে না। আমাদের বাস্তব অনেক সময় হলাহলস্থানীয়। এরূপ অবস্থায় শিল্পীদের সে সব বিষয় চর্চ্চা করা কষ্টকর হয়ে উঠে। তবুও সমসাময়িক চিত্রকলায় দেশের মূর্ত্তি কি ভাবে ওঠে পড়ে তা' আলোচনার বিষয়।

এক্ষেত্রে কয়েকটি শিল্পীর তুলিকা আমাদের দুর্লভ সম্পদ দান করেছে। শিল্পী গোবর্দ্ধন আশের বাঙ্গলার বহুমুখী রূপ একটা মর্ম্মন্তুদ দুঃসহ অনুভূতি জাগ্রত করে। শিল্পীর বাঙ্গলা কুটিরের দৃশ্য একটা চমৎকার রচনা। বাঙ্গলার ঋণজর্জ্জরিত কৃষকদের অর্দ্ধভগ্ন কুটির, আসবাব ও গৃহপালিত চাষের জন্য গো-মহিষাদির সম্পর্ক এমন একটি চিত্তগ্রাহী রচনা এই শিল্পী উপস্থিত করেছে যা দেখে বিস্ময় জন্মে। কলিকাতায় ঘোরাঘুরি করে এমন ছবি আঁকা অসামান্য দীপ্যমান হয়ে গিয়েছে। শিল্পীর "সর্ব্বনাশ" নামক চিত্রে নরনারীর চিত্র আছে। সৌধবাসী কলিকাতার বিলাসপুষ্ট জীবনের সহিত এ জীবনের কোন যোগ নেই। বার্দ্ধক্য-পীড়িত, দারিদ্র্যভগ্ন দুর্ভিক্ষগ্রস্থ বাঙ্গলা দেশ দেখতে কি রকম তা' কি একবার উপলব্ধি করবার দরকার নেই? এই হল সত্যিকার আমাদের ছবি। শিল্পীর রস কদর এই চিত্রে নিজের সমগ্র অর্ঘ্য দান করে' বস্তুটি ফুটিয়ে তুলেছে।

মৎস্যজীবী

বিমল দে

প্রতিভার কাজ। ছবির উপর যন্ত্রজগতের বৈজয়ন্তী স্বরূপ টেলিগ্রাফের তারও দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রে আমাদের কৃষকদের সম্পদ কি তা' দেখতে পাওয়া যায়। এ রকম ছবি চোখে না পড়লে দেশের একটা বাস্তব-বোধ জাগে না। শিল্পীর এই কুটিরটি এমনিভাবে রচনা করেছে যাতে নিমেষে সমগ্র কৃষক জগতের একটা বার্ত্তা

অপর দিকে বাঙ্গলা নদীমাতৃক দেশ। বাঙ্গলার নদীজীবন একটা বৃহৎ অধ্যায়—এ দেশের জীবনে। বাঙ্গলার পণ্যবাহী নৌকো গ্রামে গ্রামে দেখবার জিনিষ। উপস্থিত বাঙ্গলার বহুমুখী জীবনের এ সব চিরন্তন বার্ত্তা শিল্পীর নিপুণ তুলিকা এই জগৎকেও মোহিত করে ধন্য হয়েছে। বস্তুতঃ এই শিল্পীর সহজ সত্য বোধ অতুলনীয়।

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

বিমল দের মৎস্যজীবি বাঙ্গলার দরিদ্র জীবনের আর একটি দিককে বিমুগ্ধ করেছে। জেলের নৌকা, জাল, মাছ ধরা, এ সব বাঙ্গালীর জীবনের এক অপরিহার্য্য পরিচ্ছেদ। জলজীবিরা না হ'লে মৎস্য-প্রিয় বাঙ্গালীর চলে না।

এক্ষেত্রে শিল্পী আনী সেনের রচনাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবনী সেন বাঙ্গলার গৃহপালিত পশু-রচনায় কৃতিত্ব লাভ করেছেন। "আমরা তিনজন" নামক করাই শক্ত। অবনী সেনের "ষাঁড়"ও একটি চমৎকার রচনা। একটি অজ্ঞাত শিল্পীর রচিত "পাটের ক্ষেত" অতি সুন্দর হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিল্পী জৈনল-আবেদিনের নামও করতে হয়। এ শিল্পীর ব্রহ্মপুত্র নদীর দৃশ্যাদি অতি মনোহর হয়েছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালার পল্লীর বুকে এই সব বাস্তব দৃশ্যাদি স্বপ্ন অপেক্ষাও লোভনীয় ব্যাপার। এরূপ কত কি দৃশ্য এখনও লোকের সামনে উপস্থিত করা হয়নি।

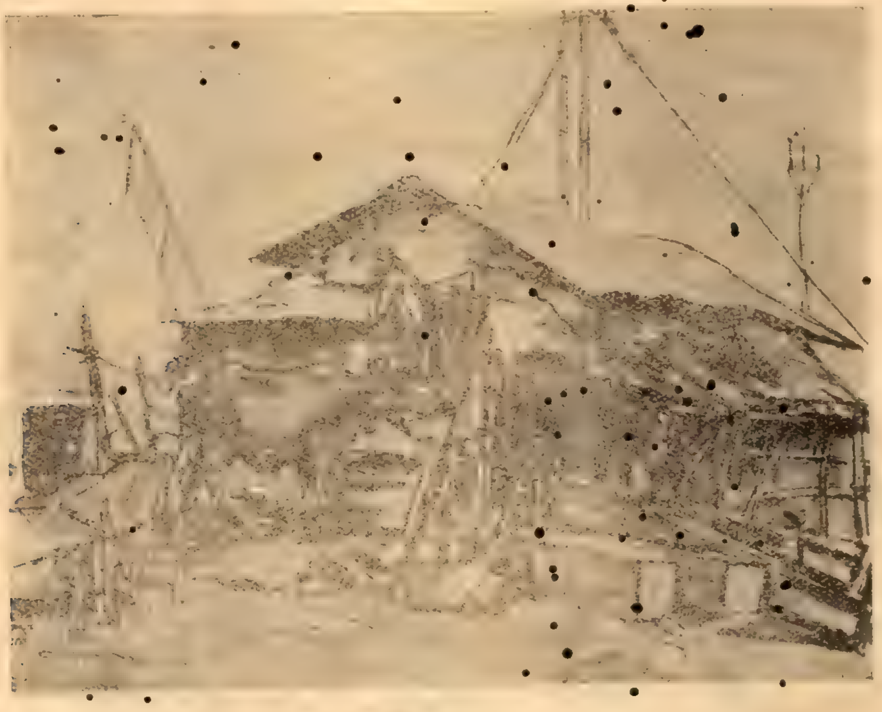

কুটির দৃশ্য
গোবর্দ্ধন আশ

চিত্রে তিনটি মহিষকে অতি চমৎকার ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। গরীব বাঙ্গলা ছ্যাকড়া গাড়ীর দেশ-পল্লীতে পল্লীতে গরুর গাড়ী না হলে যেমন চলে না তেমন এই শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী না হলেও হয় না। কাজেই যুগল চিত্রে গাড়ীর ঘোড়াদুটির যে চেহারা আঁকা হয়েছে তা' সব বাঙ্গালীর পরিচিত। অথচ এতদিন এ সব চিত্রের বিষয়ই হয়নি। যা সামান্য বা যা অবজ্ঞাত তা' নিয়ে কিছু সৃষ্টি

H. K. Ganguly বাঙ্গলার উৎসব জীবনের একটি ছবি এঁকে সকলের প্রীতি সঞ্চার করেছে। শিল্পীর দোলযাত্রা একটা সত্যিকার ব্যাপার হয়েছে। বাঙ্গালী মেলা ভালবাসে। পূজার্চ্চনা উপলক্ষে জনসঙ্ঘ প্রতি পল্লীতে দেখতে পাওয়া যায়। এ সব মেলায় নানা শিল্প দ্রব্যাদির কেনা বেচা হয়। বস্তুতঃ এ সব অনুষ্ঠান বাঙ্গলার অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার। শিল্পীরা বাঙ্গলার জীবনের এই সব দৃশ্যাদিকে রসযুক্ত

নৌকো (রেখাচিত্র)

গোবর্দ্ধন আশ

করে সকলের নিকট উপস্থিত করলে সমগ্র জাতি সম্বন্ধে একটা সচেতন বোধ জাগ্রত হবে। শুধু আক্ষরিক আলোচনায় এই সত্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব নয়। নব্য জাতীয়তার দিনে এই সকল শিল্পীদের সাগ্রহে আহ্বান ক'রে উৎসাহিত করা দরকার। আমাদের সাহিত্যে যেমন, তেমনি চিত্রকলাতেও কঠিন জগতের ছায়া প্রতিফলিত করা দরকার। রসরূপের ভিতর দিয়ে তবেই দেশ জাগবে—অন্তর স্পন্দিত হবে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

রজনীগন্ধা

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

কালো সরোবরের জলকে আলোকিত ক'রে
অপরূপ শান্ত সৌন্দর্য্যে ফুটে ওঠে শতদল,—
তেমনি কালো নিশীথিনীর অন্ধকারকে পুষ্পিত করে
তুমি উদ্ভিন্ন হয়েছ আপনার শান্ত শুভ্র মহিমায়
এই ক্লান্ত শ্রাবণের সায়াহ্নে।
সবিতা যখন ধরণীকে দিয়ে যায় অস্তরাগের আশীর্বাদ
বিদায়ের বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—
তুমি নন্দিত হয়ে ওঠো স্নিগ্ধ সৌগন্ধ্যে
পৃথিবীর প্রীতির অঙ্কুর!
পূরবীর ম্লান মূর্চ্ছনা মূর্ত্ত হয়েছে তোমার সুরভিতে,
অন্তরের গভীরে স্থান পেয়েছে তোমার সরল আমন্ত্রণ।

ললাটের উপর হাতদু'খানি অঞ্জলিত ক'রে
ভীরু কিশোরী দেহলীতে দেখায় সন্ধ্যার দীপ—
তেমনি তোমার মঞ্জুল মঞ্জরীতে
ধরণীর অঙ্গনে জ্বলে উঠ্‌লো সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শিখা
শুভ্র, সুন্দর অথচ সকরুণ;
যার মায়া পথিককে প্রসন্ন ক'রে তোলে,
—এই প্রশান্ত প্রদোষে।

বর্ষারঙ্গমঞ্চের আর সব নটীরা প্রগল্‌ভা—
কেতকী ও হেনা আমাদের আচ্ছন্ন করেছে তীব্র সুগন্ধে,
অপরাজিতা মুগ্ধ করেছে নীল-নয়নের কটাক্ষে,
কদম্ব পুলকিত করেছে আপনার প্রদীপ্ত লাবণ্যে।

গল্পের প্লট

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

ভাব ভাষা না থাকিলে কি জোর করিয়া গল্প লেখা হয়? তিনদিন ধরিয়া একটা গল্প লিখিব লিখিব ভাবিতেছি, এখনো সেটা আরম্ভই করা হইল না। কোন বড় গল্প লেখকের সহিত পরিচয়ও নাই যে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, —মশাই, গল্পের কি আরম্ভটাই শক্ত, না শেষটা।—আমার ত সন্দেহ হইতেছে, বোধ হয় আরম্ভটাই হইবে। নহিলে গল্পটার বিষয় বস্তু যাহা হউক একটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, অথচ দুইবেলা সমানে কাগজ কলম সামনে লইয়া বসিয়া লেখা আরম্ভ করিতে পারিতেছি না কেন! এখন ভাবি, বড় বড় লেখকেরা এত এত সুন্দর সুন্দর—

"বাবু।"

চমকিয়া উঠিলাম।

"কে রে?" বলিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখি, ঝি মোক্ষদা দাঁড়াইয়া আছে। উহাকে দেখিয়া পিত্ত জ্বলিয়া গেল। অপয়াটার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। সেদিন সকালে একটা গল্প লইয়া 'বঙ্গ-মধু' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট গিয়াছিলাম। গল্পটা মনোনীত হইল না। ফিরিলাম বিফল-মনোরথ হইয়া। রাস্তায় আসিতে আসিতে হঠাৎ মনে পড়িল,—ঠিক বটে, আজ সকালে উঠিয়াই মোক্ষদার মুখ দেখিয়াছি। ওটাই যত অশুভের মূল।—সেদিন হইতে আর উহার উপর আমার কোন ভক্তি নাই।

মোক্ষদা বলিল, "মা বলছেন, আর একসের গুড় এনে দিতে হবে, ওতে কুলোচ্ছে না।"

ঝাঁকিয়া উঠিলাম, "তা' তুমি যেতে পার না?"

"আমার যে কাপড় ভালো নয়, বাসন মাজতে মাজতে উঠে এলুম।"

"মন্টু কোথা?"

"সে খেলতে বেরিয়েছে।"

"বেশ করেছে। চল, যাচ্ছি।"

ছুটির দিনেরও নিস্তার নাই দেখিতেছি! আজ রবিবার, অফিস নাই। গল্পটা লইয়া বসিয়াছি, মনের অবস্থা ও পরিকল্পনা প্রায় গল্প লেখার অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আসিল গৃহিণীর তলব। সবেমাত্র কাল মাহিনা পাইয়াছি মশায়, আজই গৃহিণী আবদার ধরিলেন, শীত ফুরাইয়া যায়, পিঠা-পায়স না করিলে চলিতেছে না। তথাস্তু! যোগাড়-যন্ত্র সবই করিয়া দিয়াছি; ফাই-ফরমাসের জন্য ছেলেটাও বাড়িতে থাকিলে হইত ত। তা' নয়, তিনিও বৈকালিক আমোদ-প্রমোদে বাহির হইয়াছেন! উঃ, সকলে মিলিয়া যেন পরামর্শ করিয়া আমার পিছনে লাগিয়াছে। দূর ছাই! কেরাণীর আবার গল্প লেখা! সংসার বজায় রাখিয়া, গৃহিণীর মান-অভিমান-আদর-আবদারের দিকে নজর রাখিয়া কি সাহিত্য-চর্চা চলে।

উপরে গিয়া দেখি, সে যেন এক উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের সামনে ছাদের উপর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে পিঠা-পায়স খাইতে বসিয়াছে। দুইটি বউ—একটি চাল বাটিতেছে, আর একটি পিঠার জন্য গোলা গুলিতেছে। বুঝিলাম, ইহারা আশেপাশের বাড়ি হইতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। হাসি-গল্পের আর বিরাম নাই যেন ইহাদের। ব্যাপার এমন কিছুই নহে, অথচ ইহাদের কতই না আনন্দ!

আমাকে দেখিয়া সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া গেল। আমি রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো, আবার কি দরকার পড়লো?"

উত্তর আসিল, "একসের গুড় এনে দাও দিকি ওই বাটিটা নিয়ে গিয়ে।"

বাটিটা তুলিয়া লইতে লইতে বলিলাম, "মণ্টুটাকে আটকে রাখতে পারনি ?"

"ছেলেমানুষ, বিকেলবেলা একটু বেড়াতে গেচে। আচ্ছা, একবারের বেশী দু'বার বাজারে যেতে বললেই কি তোমার পায়ে বাত ধরে।"

ওপাশ হইতে হাসির শব্দ কাণে আসিল। লজ্জায় আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।...

খানিকক্ষণ পরে গুড় হাতে লইয়া উপরে গিয়া দেখিলাম, সকলেই চলিয়া গিয়াছে। কেবল মোক্ষদা একধারে ট্যাঙ্ক হইতে জল তুলিয়া ছাদ ধুইতেছে, আর মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গৃহিণীর সহিত গল্প করিতেছে।

গুড়টা নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, "কই গো, কি কি করলে, কেমন হ'ল সব দেখি।" বলিয়া একটা পিঁড়ি লইয়া ছাদের উপর বসিলাম।

গৃহিণী একটা থালায় করিয়া পরিপাটিরূপে আহার্য দ্রব্য সাজাইয়া আমাকে খাইতে দিলেন।

গৃহিণীর সহিত কথা বলিতে বলিতে খাইতেছিলাম। বহুক্ষণ কাটিয়া গেছে। হঠাৎ এক সময় মনে হইল, মোক্ষদার কোন সাড়াশব্দ আসিতেছে না কেন। এই ভাবিয়া চাহিতেই মোক্ষদার চোখে চোখ পড়িয়া গেল। সে যে কতক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়াছিল জানি না, আমার চোখে চোখ পড়িতেই শশব্যস্তে কাজে মন দিল। মনটা আমার ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। উহার বিরলকেশ মস্তক, পাথরের মত কালো গায়ের রং, বোঁচা নাক, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স, শিশুর মত লোভি দৃষ্টি—সবগুলি মিলিয়া আমার অন্তরটাকে যেন বিশ্রী করিয়া দিল।

কর্কশস্বরে বলিলাম, "এই মুকি, এতক্ষণ ধরে' ওখানে কি কচ্চিস ?"

মোক্ষদা চোখ না তুলিয়াই জবাব দিল, "বড্ড শেওলা পড়েচে বাবু, ঝাঁটা দিয়ে ঘসে' ঘসে' তুলে দিচ্চি।" বলিয়া সে সত্যসত্যই ঝাঁটা দিয়া ছাদ ঘষিতে লাগিল।

মনের মধ্যে কিরকম সন্দেহ হইতে লাগিল। গৃহিণী ত আমার খুবই মার্জিত রুচি সম্পন্না; তিনি যে অবহেলা করিয়া ছাদের উপর শেওলা জমিতে দিয়াছেন, এমন বোধ হইল না। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ছাদের উপর একটুও শেওলা পড়ে নাই; বুঝিলাম, যদি পড়িয়া থাকে ত উহার মনেই পড়িয়াছে। উহার দিকে চাহিয়া মনে মনে একটু হাসিতে লাগিলাম, একটু সমবেদনাও হইল উহার জন্য। উহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "দেখ, মুকিকে কিছু পিটে-পায়েস দিয়ে দিও ত যাবার সময়।"

কিছুক্ষণ পরে ভোজন-পর্ব শেষ করিয়া নীচে আসিলাম। অস্থির হইয়াছিল বলিয়া মনটা গল্প-লেখায় বসিতেছিল না। তাই একটা নভেল লইয়া পড়িলাম। ব্যাপারটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কাণে আসিল, "বাবু।"

বুঝিলাম মোক্ষদা। মুখ না তুলিয়াই বলিলাম, "বল।"

অনুনয়ের সুরে মোক্ষদা বলিল, "এই, বলচি কি—"

"কি বলচিস ?"

"আমার মাইনে দু' টাকা দেবেন ?"

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম, বলিলাম, "সেকি! বাংলা মাস শেষ হ'তে ত এখনও চোদ্দ-পনের দিন বাকি। এরই মধ্যে মাইনে ? আগের মাসের মাইনে ত বাকি নেই।"

"আজ্ঞে না, তা' বলচি না। এ—ই, বাড়িতে অসুখ-বিসুখ, সেইজন্যে চাইচি।"

"বাড়িতে অসুখ বিসুখ কি আবার! লোক বলতে ত তোরা দু'জন, তুই আর তোর অন্ধ বুড়ো। আর কে ?"

"আর কেউ না। তা' দু'জনই হই আর একজনই হই, অসুখ করলে ওষুধ খেতে হ'বে ত।"

"তুই যে বড় কথা শিখেচিস রে আজকাল। যা যা, আমার কাছে ওসব হ'বে না। আরও এক বাড়িতে ত কাজ করিস, সেখানে চাইগে যা।"

"তেনারা দিলে না বাবু। আপনি দয়া না করলে আর চলে না।"

মিনতি ঝরিয়া পড়িল মোক্ষদার স্বরে।

মনটা একটু নরম হইয়া গেল, বলিলাম, "তা' বাপু, এ' মাসে ত আমার বড় খরচ। ছেলেটাকে একটা বড় ইস্কুলে

ভর্ত্তি করতে হ'বে, নতুন বই কিনে দিতে হ'বে। সে প্রায় তিরিশ টাকার ধাক্কা। তাঁ চাইচিস যখন বিপদে পড়ে,' একটা টাকা নিয়ে যা।"

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ মনে হইল, মিথ্যা বলিতেছে না ত। কিছুক্ষণ পূর্বে উহার বুড়া বয়সের হ্যাংলামি ধরিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া লজ্জায় অথবা রাগে টাকা লইয়া পলাইতে চায় নাকি ?

যাচাই করিবার জন্য বলিলাম, "সত্যি বলচিস ত, না তুই আর এখানে কাজ করতে চাস না।"

সহসা জিব কাটিয়া ফেলিয়া মোক্ষদা কহিল, "ছি ছি, সেকি বাবু, আপনাদের দয়াতেই ত বেঁচে আছি। কাজ ছেড়ে দিলে চলবে কি করে আমাদের।"

"দেকিস বাপু।" বলিয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া উহার পায়ের সামনে ফেলিয়া দিলাম। সে ওটা কুড়াইয়া লইয়া দূর হইতে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, এরূপ খুসি সে বোধ হয় জীবনে হয় নাই।

মনে মনে হাসিলাম,—খাইতে পায় না, উহাদের আবার লজ্জা, উহাদের আবার রাগ !

রাত্রে বিছানায় শুইয়া গৃহিণীকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম। এত বয়স হইয়াছে মোক্ষদার, অথচ এখনও ছোট ছেলের মত লোভ ছাড়িতে পারে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। বোধ হয়, অনেকখানিই উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছিল আমার কথায়।

গৃহিণী যেন একটু ব্যথিত হইয়াই বলিলেন, "আহা, ওদের কি সুখ বল ত ? সারাজীবন কি ভাবে ওরা কাটিয়ে এসেচে একবার ভেবে দেখ দিকি। খেয়েচেই বা কি, পরেচেই বা কি, আর মনেরই বা কি সুখ পেয়েচে ওরা। এখন একটু ভালোমন্দ কিছু দেখলে খেতে ইচ্ছে করবে না ?"

অনেক কিছুই প্রতিবাদ করিতে পারিতাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "আর মুকি আমাদের সে দলের লোক নয়। ওই বুড়োকে নিয়ে ও অনেক দিন ধ'রে আচে। বুড়ো নাকি আজ পাঁচ বছর ধ'রে অন্ধ হ'য়ে গেচে, ও-ই ত দেখচে বাপু। আমাদের ভদ্র ঘরে এ রকম হ'লে একবার দেখা যেত কার কত ক্ষমতা।"

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, "কেন, আমি যদি আজ অন্ধ হ'য়ে যাই, তা হ'লে আমার ওপর তোমার নিষ্ঠা-ভক্তি আর থাকবে না নাকি ?"

ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন গৃহিণী, "আহা, কি রসিকতাই না শিখেচ। ঠাট্টা কি আর খুঁজে পাও না নাকি ?"

ভয়ে চুপ করিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, মুকি ত আমাদের হ্যাংলা নয় বাপু। আহা, বেচারীর পেটের অসুখ বলে' একটু কিছু দাঁত দিয়ে কাটলে না। বাড়ির জন্যে দিতে চাইলুম, তাও নিলে না।"

বুঝিলাম, ধরা পড়িয়া গেছে বলিয়া মিথ্যা কহিয়া মোক্ষদা পিঠা-পায়স খাওয়ার বা লইয়া যাওয়ার দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, মোক্ষদারও সম্মান-বোধ আছে !

সকালে বাজার হইতে আসিয়া শুনিলাম, তখনো মোক্ষদা কাজে আসে নাই।

শুনিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল, বলিলাম, "দরকার নেই ওটাকে, ছাড়িয়ে দাও। তার চেয়ে অন্য একজন ভালো লোক দেখি।

গৃহিণী কহিলেন, "ছিঃ, তা' কি হয়, গরীব মানুষ, সত্যিসত্যিই অসুখ নিয়ে পড়েচে বোধ হয়। ওবেলা আসবে।"

সন্ধ্যার সময় অফিস হইতে ফিরিয়া শুনি বিকালেও মোক্ষদা আসে নাই।

আর সহ্য করিতে পারিলাম না, গৃহিণীকে বলিলাম, "আমি ত তোমায় আগেই বলেচি, ও জোচ্চোর, পাজী, মিথ্যেবাদীর একশেষ। কাল তোমায় বলে' গেচে, ওর নিজের অসুখ, আর আমায় বলে' গেচে, ওর বুড়োর অসুখ।

তাও ত তোমায় বলি নি, একটা টাকা নিয়ে গেচে অসুখ বলে'। একটা টাকা মানেই ওর পনের দিনের মাইনে আর কি। দুটাকাই চেয়েছিল, ভাগ্যিস দিই নি। মানে কি জান, হ্যাংলামি ধরা পড়ে গেচে বলে' ও আর এখানে কাজ করতে চায় না। ও কি কম বজ্জাত ভেবেচ। থাক্, বাঁচা গেল বাবা।"

গৃহিণী নির্বিকারচিত্তে কহিল, "তা' হোক গে। তুমি একবার গিয়ে দেখে এস, কি হ'ল ওর। হুট্ করে' ত আর নতুন লোক রাখা যায় না। শেষ বেলায় নতুন লোকও রাখা হ'ল, আর ও-ও এসে হাজির হ'ল, তখন কি হ'বে ?"

"দূর দূর করে' তাড়িয়ে দেবো ওকে।"

"ছিঃ! লক্ষ্মীটি, একবার গিয়ে দেখে এস।"

কী যে ওর উপর গৃহিণীর এত টান, তাহা বুঝিতে পারি না। বহুদিন পূর্বেও একবার দিন পাঁচেক জ্বরে ভুগিয়াছিল, গৃহিণীর তাড়ায় রোজ একবার গিয়া খবর লইয়া আসিতে হইত। আজও সেই পুরানো হুকুম তামিল করিতে চলিলাম।

আমার বাড়ি হইতে মোক্ষদার বাড়ী প্রায় মিনিট সাতেকের পথ। বড় রাস্তা হইতে একটা সরু বন্ধ গলি বাহির হইয়া মাঝে দুই তিনবার বাঁকিয়া গেছে। ইহারই শেষ প্রান্তে একটা মেটে বাড়ির সদরের ঘরে মোক্ষদা থাকে। ঘরটির ভাড়া দুই টাকা। ভাড়া অনুযায়ী ঘরটিও লম্বা চওড়ায় হাতপাঁচের বেশী হইবে না। তবে গলির দিকে এক হাত আন্দাজ একটা জানালা আছে বটে। বহুদিন মোক্ষদার বাড়ী যাই নাই; রাস্তাঘাট চিনিয়া চিনিয়া চলিতেছিলাম। বড় রাস্তা পার হইয়া গলিটায় আসিয়া পড়িলাম। মনে হইল, গলিটার সহিত যেন আলো বাতাসের বিবাদ আছে, নিশ্বাস বুঝি এখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। নাকে কাপড় দিয়া কয়েকটা নালা-নর্দমা ডিঙ্গাইয়া অবশেষে মোক্ষদার জানালায় আসিয়া পৌছিলাম।

দূর হইতেই কি যেন একটা পোড়া-গন্ধ নাকে আসিতেছিল, চড়্ চড়্ শব্দও শুনিতে পাইতেছিলাম। জানালার কাছে আসিতে ঐগুলি আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। সহসা কতকগুলি গলার আওয়াজ একসঙ্গে কানে আসিল। মোক্ষদারই ঘরে কোন ব্যাপার চলিতেছে নাকি। কৌতূহলবশে ভিতরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলাম। ঘরে কতকগুলি মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমিয়াছে। জ্বলন্ত উনানের উপর হইতে মোক্ষদা চাঁচিয়া চাঁচিয়া কি নামাইতেছে। আর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কি গো, এবারও পুড়ে গেল ?"

স্বল্পালোকিত অন্ধকারে মোক্ষদার মুখ ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, জানালার উপরে বেশীক্ষণ ধরিয়া মুখও রাখিতে পারিতেছিলাম না, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে ত অপ্রস্তুতে পড়িব। তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, মোক্ষদার কণ্ঠস্বর ভিজা, হাসিয়া বলিতেছে, "হ্যাঃ, এবারও পুড়ে গেল। দেখি আর দু'একবার, যদি না-হয় ত গোলা-গুলো ফেলে দোব। কী যে মরণ-লোভ হ'ল আমার। কালকে বাবুর বাড়িতে পিটে পায়েসের ঘটা দেখে ইচ্ছে হ'ল, বুড়োকে নিজে হাতে তৈরী করে' খাওয়াব।"

বলিতে বলিতে সে হাতায় করিয়া গোলা লইয়া কড়ায় ঢালিল। তারপরে খুন্তি দিয়া নাড়িতে নাড়িতে একমনে সে পিঠা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। আবার একটা হৈ চৈ হইল—কেহ বলিল, 'কড়াটা মাঝে মাঝে নামিয়ে নাড় না গো?' কেহ বলিল, "কড়াটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলাটা চারধারে ছড়িয়ে দে না, নইলে পুড়ে যাবে যে।" মোক্ষদার নিজের বুদ্ধি বলিতে যেন কিছুই নাই, যে যাহা বলিতেছে সে তাহাই করিতেছে। এদিকে মুখে বলিতেছে, "তোমাদের কথা শুনে ত এতক্ষণ দেখলুম গা, কিছুতেই ত কিছু হ'ল না।" দেখিয়া শুনিয়া বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আহাহা, এবারও পুড়ে গেল গো," বলিতে বলিতে টপ্ করিয়া কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া মোক্ষদা ক্ষিপ্রহস্তে খন্তি দিয়া পিঠা চাঁচিতে লাগিল, আর সে দিকে চাহিয়া জিব দিয়া একরূপ আক্ষেপসূচক শব্দ করিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল, পিঠা ত পোড়ে নাই, যেন মনটা তাহার পুড়িয়া গিয়াছে।

রাগ করিয়া ধাক্কা দিয়া কুড়াটা সে একধারে সর'ইয়া রাখিল। তারপর থালার উপর রাশীকৃত পোড়া পিঠাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে ঘরের লোক-গুলিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "কাল লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলুম, কি কি জিনিষ দরকার লাগে। তারপর মিথ্যে কথা বলে' বাবুর কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে আনলুম। মনের আনন্দে সকালে কাজে না গিয়ে বাজার থেকে দু'সের দুধ, এক সের গুড়, ময়দা এক সের, দুটো নারকোল—সব কিনে আনলুম। সারা দুপুর খেটে যোগাড়-যন্তর করলুম। পোড়া কপালে সবই নষ্ট হ'য়ে গেল গা। এদিকে বিকেলেও কাজে যাই নি; কাল গেলে বাবুরা যে মুখে ঝেঁটা মারবে।"

মোক্ষদার মুখে অশ্রুসজল হাসি।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, "র'াধতে জানে না, মাগির লোভ আছে ষোল আনা!"

এ'কথা শুনিয়াই মোক্ষদার বুড়া খ্যাক্ ক'রিয়া উঠিল, "তা'তে তোমাদের কি হয়েচে গো? ও র'াধতে জানে না ত আমাদের নোকসান, তোমাদের তা'তে কি? আর মুকি, যা রেঁধেচিস তাই আমাদের ভালো। তুই-আমি খেয়ে ফেলি আয়।"

মোক্ষদা পিঠার থালা লইয়া বুড়ার কাছে আগাইয়া আসিল। তারপর অতি সুযত্নে অন্ধ বুড়াকে তাহার পিঠা খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিতে লাগিল, "দু'জায়গায় কাজ ক'রে পাঁচটি টাকা ত পাই। তা'র একটা টাকা ত আগে থেকেই নিয়ে এসে খরচ ক'রে ফেললুম। ঘর ভাড়া দিয়ে আসচে মাসে আমিই বা খাব কি ছাই, আর তোমা-কেই বা খাওয়াব কি? কী যে ভীমরতি হ'ল আমার।"... বলিতে বলিতে মোক্ষদা এবার সত্যসত্যই ঝরঝর্ ক'রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বুড়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "কাঁদিস নি মুকি, কিচ্ছু ভয় নেই রে। তোর বাবুরা খুব ভালো নোক। আসচে মাসে একটা টাকা ভিক্ক্‌ে চেয়ে নিস। ঠিক দেবে, দেকিস। ভগবান কি নেই রে!"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, চোখে জল আসিয়া পড়িল। নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। মনে হইল, মোক্ষদা যেন আজ আমায় কি একটা শিক্ষা দিয়াছে। মনটা খুব হাল্কা বোধ হইতে লাগিল।

ব্যাপারটা সব শুনিয়া গৃহিণীরও চোখে জল আসিয়া পড়িল, কহিলেন, "হ্যা গো, তাই মুকি আমায় কাল সব খুঁটে খুঁটে জিগ্যেস করছিল, কোন জিনিষ কতটা লাগে, কি ক'রে গোলা করতে হয়, এই সব। আমি কি তখন অতটা বুঝতে পেরেচি ছাই। প্রত্যেকবার গোলা দেওয়ার আগে কড়াতে তেল মাখিয়ে নিতে হয়, বেচারি তা' বোধ হয় জানে না, তাই পিটেগুলো সব পুড়ে গেচে। আহা, কাল একটা টাকা দিও ওকে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মোক্ষদার ঘরের ছবিটি চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া ভাসিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় মনে হইল, ঠিকই ত, গল্প লিখিবার জন্য প্লট খুঁজিয়া বেড়াই, অথচ চোখের সামনেই ত প্লট পড়িয়া রহিয়াছে। মোক্ষদার পিঠা খাওয়া লইয়া ত বেশ একটা গল্প লেখা যায়। এ'কথা ভাবিয়া মনে মনে মোক্ষদাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

ঠিক করিয়াছি মোক্ষদার পিঠা র'াধিবার কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা গল্প লিখিয়া "বঙ্গ মধু" পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পাঠাইব। এবার হয়ত মনোনীত হইবে।

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

STUDENTS' COMMON ROOM P.G.A

প্রতিমা

দীলিপকুমার

তুমি জীবনের দিনমণি
আছ কোন্ সে অলখ-পুরে!
তবু তোমার নূপুর-ধ্বনি
বাজে নিখিল নৃত্যসুরে।

যবে পাখি গায় কলগান
হিয়া পিঞ্জরে মেলে পাখা
মোর স্বপ্নবিধুর প্রাণ
যেথা তোমারি প্রতিমা আঁকা।

তবু কালো মেঘে মুছে যায়
সেই আলোভরা ছবিরেখা
তাই খণে খণে ভুলি হায়
তব চাহনি-লিপির লেখা।

আঁখি তোমারি আঁখির বরে
যাচে কাঁটায় গোলাপগীতি,
মন তোমারি মনের তরে
খোঁজে মনের মানুষে নিতি।

শ্রুতি তোমারি মরমমিড়ে
শোনে পরমের বন্দনা
তাই তৃষ্ণা খুঁজিয়া ফিরে
তব মুরলীর মূর্ছনা।

সেই অশ্রুত আহ্বান
বাজে বাহিরে-ভিতরে কভু,
লভি বাহিরে তোমার দান
তুমি ভিতরে রাজিলে প্রভু!

তাই যাচি প্রিয় অন্তরে
তব শ্যামল সিন্ধু-সুধা
এসো ঝরি' রূপ-নির্ঝরে
মোর মিটাতে যুগের ক্ষুধা।

আমি তাহ'লে লভিব নাথ,
তব মিতালি-মধুর বাণী,
যার ঝঙ্কারে দিনরাত
হৃদি গাহিবে: "তোমারে জানি।"

সুশান্ত সা

তৃতীয় পর্ব্ব

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

১

আমি বন্দী। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত আমি বন্দী—জামিন পাইনি। খুলনার জজ সাহেব জামিনে আমাকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকৃত হন। হরিশ সেন আমার পক্ষ সমর্থন করে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়ে উপযুক্ত উকিল ব্যারিষ্টারের সাহায্যে আমার জামিনের চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু কিছুই ফল হয় নি। হাইকোর্টের বিচারপতিরাও আমাকে জামিনে খালাস দিতে নারাজ। আমি খুলনা জেলে বন্দী—কালই খুলনার দায়রা আদালতে সকলের সম্মুখে আমার বিচার সুরু হবে।

উঃ—সেদিন সেই রাত্রিটার কথা কি কখনও ভুলব! স্পষ্ট মনে আছে সমস্ত রাত খুলনা জেলে দোতালার একটা লম্বা ঘরে একটা বড় খোলা জানালার কাছে মোটা মোটা লোহার গরাদের একটা ধরে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। এক সেকেণ্ডের তরেও ঘুমুইনি। ঘরে আরও ৫।৬ জন লোক এক একটা কম্বল বিছিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে শুয়েছিল। তাদের মধ্যে দুটো আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কইছিল অনেক রাত পর্য্যন্ত—সেদিকে আমার মোটেই কান ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে একটা কালো বিরাট চেহারার লোকের বিকট নাসিকা গর্জ্জনে আমি প্রায় উন্মাদের মত হয়ে উঠছিলাম। কতবার ইচ্ছা হয়েছিল লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দি, কিন্তু কেমন প্রবৃত্তি হয় নি। আশ্চর্য্য! আমারই মতন কোনও না কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ছিল তারা। নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ, নইলে জামিন পায়নি কেন? কিন্তু তাদের—কই ঘুমের ব্যাঘাত ত এতটুকুও হচ্ছিল না। এরাও ত মানুষ! আমারই মতন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ!

আমি ঘুমুইনি। বিচার সুরু হওয়ার আগের দিন রাত্রে এক মুহূর্ত্তের তরেও ঘুমুইনি। ঘুমান কি সম্ভব? আমি সুশান্ত—মাধবপুরের স্বনামধন্য জমিদার রতনসা'র কৃতী সন্তান সেই 'সুশান্ত সা'—খুনের অপরাধে অভিযুক্ত, খুলনা জেলে সামান্য কয়েদী হয়ে একটা ছেঁড়া কম্বলের উপর মেজেয় বসেছিলাম—আমি ঘুমুতে পারি? পরের দিন বেলা ১১টায় আমার বিচার সুরু হবে—আমার চোখে ঘুম? বিচারে কি হবে কে জানে? হয়ত ফাঁসী—না ভাবব না। কতবার শিউরে উঠে মনের লাগাম কষে দিয়েছিলাম ঘুরিয়ে সেদিন রাত্রে; ভাবব না, বিচারের ফলাফল।

সমস্ত রাত বসেছিলাম। বাইরের দিকে চেয়ে, আকাশে চাঁদ ছিল। তিথিটা মনে নাই—পূর্ণিমা কি তার এদিক ওদিক কোন একটা তিথি। প্রায় সমস্ত রাতই আকাশে চাঁদ ছিল। এখন ভাবি, আমার অসীম সৌভাগ্য তাই চাঁদ ছিল আকাশে। নইলে ঘন অন্ধকারে আমি বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম—সেইদিন রাত্রে।

জানালা দিয়ে সেদিন রাত্রের দূরের ছবিটা আমি কি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম? সেই যে, দূরে ভৈরব নদীর ওপারের গোটা তিনেক লম্বা লম্বা তাল গাছ, তার তলায় নুয়ে পড়া বনভূমির প্রান্ত রেখা নদীর কিনারায় এসে দিয়েছে ধরা প্রস্ফুটিত চাঁদের আলোয়, একটা মায়া রাজ্যের ঘুমন্ত ছবি সেইযে দূরে সমস্ত রাত ছিল ভেসে—আমি ত তাদের আমার প্রাণের অভিনন্দন জানাইনি সেদিন রাত্রে। তবুও ত তারা আমার বুকের রক্তের সঙ্গে রয়েছে মিশে—কিছুই ত হারায়নি।

কত কথা, কতদিনের কত তুচ্ছ হারিয়ে যাওয়া কথা সেদিন রাত্রে মনের মধ্যে কতবার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে

উঠে অকস্মাৎ আবার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল—কে তার খবর রাখে? কত কথা ভেসে ভেসে উঠছিল—সেই আমার প্রথম জীবনের ছেলেবেলার দিনগুলি, বেগবতী নদীর ধার দিয়ে সেই স্কুলে যাওয়া আসা, সেই স্কুলের খেলার সাথীরা, সেই বাজারের ননী ময়রা, সেই বাবা, মা, পরে মণি বোঠান, সেই সাবিত্রী, কত আশা কত আনন্দ, কত কি! একবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছেলেবেলার সন্ধ্যাটী যেদিন আমার বাপকে খুনে বলার দরুন হরিশকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করেছিলাম—আমি ও মুকুন্দ। সেই হরিশ, সেই এখন আমার একমাত্র বিপদের বন্ধু—এ বিপদে আমাকে উদ্ধার করাব জন্য প্রাণপাত করতে পর্য্যন্ত রাজী। আর মুকুন্দ! সেই বোধ হয় এখন আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। কেমন যেন হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম খাণিকক্ষণের জন্য।

হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। সত্যই কি আমি—সুশান্ত আমি খুনের অপরাধে বন্দী? কাল আমার বিচার? এ সবই একটা দুঃস্বপ্ন নয়ত? খুনী? আমি খুনী? মিথ্যাকথা—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। এত বড় মিথ্যা যারা আমার নামে রটিয়েছে প্রাণ ভরে সেদিন রাত্রে তাদের অভিসম্পাত দিয়েছিলাম।

বাবাকে মনে মনে বারে বারে প্রণাম করে কাতরভাবে জানিয়েছিলাম, 'বাবা! তুমি কোথায় আছ জানিনা। তুমি ত সবই দেখতে পাচ্ছ—বুদ্ধিমান তুমি একবার আমার দিকে চোখ তুলে চাও, এর বিহিত কর। আমি আজ বড় দুর্ব্বল, বড় নিরুপায়।'

হঠাৎ আবার নিজের মনেই প্রশ্ন উঠল—মিথ্যা কি? আমি কি অপরাধী নই? কেমন যেন সত্য মিথ্যা নিয়ে সমস্তই ওলোট পালোট হয়ে গেল বুকের মধ্যে খানিকক্ষণের জন্য।

ব্যাপারটা সব খুলে বলা দরকার।

* * * * * *

নদীর কিনারা হতে সেদিন শেষরাত্রে, সাবিত্রীর হাত ধরে যখন আবার ঘরে ফিরে গেলাম মনের মধ্যে একটা শান্তি একটা যেন অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম। সাবিত্রীর প্রাণে আমার ঠাঁই হয়েছে—একটা নিরুদ্বেগ বিশ্রামে বিছানায় শুয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন শেষরাত্রে। অন্য সব চিন্তা প্রাণ থেকে যেন অনেক দূরে গিয়েছিল সরে সেদিন রাত্রে, ক্লান্ত মন তাদের নাগালই পায়নি।

পরেরদিন সকালবেলা ঘরে এসে ঘুম ভাঙ্গাল সাবিত্রী। ঘুম ভেঙ্গে সাবিত্রীর দিকে চেয়েই প্রাণখানা একটা সরস পুলকে উঠল ভরে। সেই দুটো চোখ একপ্রাণ ভালবাসা নিয়ে চেয়েছিল আমার মুখের পানে। মধুর কণ্ঠে শুধালাম, "চায়ের জল কি চড়ান হয়েছে?"

বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি এখন উঠবে, না আরও ঘুমুবে?"

বললাম, "বাজল কটা?"

বললে, "৯টা।"

উঠে পড়লাম। মুখ হাত ধুয়ে 'চা' খেতে খেতেই দু একটা চিন্তা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। তুষারের দিকটা এখন কি করা যায়। অবশ্য এখন দু চার মাস থাকুক বাপের বাড়ীতে। কিন্তু তারপরে? বাপের বাড়ীতে চিরদিন সে থাকবেও না এবং রাখাও সম্ভব হবে না। তার সঙ্গে আর জীবনে এক সঙ্গে ঘর করব না—এ শপথ আমি ইতিমধ্যেই মনে মনে করেছিলাম। কিন্তু তাকে কোথায় কি ভাবে রেখে দেওয়া যায়?

মন তখনও আমার ক্লান্ত—বেশী ভাবতে রাজী নয়। মনে মনে ঠিক করে নিলাম—সময় ত আছে, পরে ভেবে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। মন তাতেই যেন নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু আশ্চর্য্য! দাদা ও তুষারকে নিয়ে সাবিত্রী যে এত বড় একটা নির্ম্মম সত্য আমার চোখে ধরিয়ে দিয়েছে, কৈ তা নিয়ে ত কোন অশান্তি অনুভব করিনি সে দিন সকাল বেলা। মনের মধ্যে মোটের উপর একটা নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততাই অনুভব করেছিলাম। মন যেন এই নিষ্ঠুর সত্যের জন্য এত দিন তৈরীই ছিল। যেন একটা প্রকাণ্ড সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল আমার জীবনে।

গনু! গনুর কথা মনে হতেই মনটা কেমন কাতর হয়ে উঠল। আহা! বেচারীকে জোর করে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে।

সাবিত্রী শুধাল, "চা খেতে খেতে অত তন্ময় হয়ে ভাবছ কি ?"

কেন জানি না, গন্থর কথা ভেবে যে মনটা কাতর হয়েছিল, তাড়াতাড়ি সাবিত্রীর কাছ থেকে লুকিয়ে নিলাম। সে আমার কাছে ধরা দিয়েছে এখন আর আমার মনে কোন দুঃখই নেই, থাকাও যেন উচিত নয়, এই ভাবেই বললাম, "দাদা আজ সকালে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেছেন—জান ?"

সাবিত্রী বলল, "জানি।"

বললাম, "কোন্ লজ্জায় আর আমার কাছে মুখ দেখাবেন।"

আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম।

সাবিত্রী বলল, "যে যার নিজের ব্যবস্থা ত করে নিলে, এখন আমার কি হয় ?"

একটু চমকে শুধালাম, "তোমার ?"

একটু হেসে সাবিত্রী বললে, "হ্যাঁ আমার। নানান ভাবনা চিন্তার মধ্যে সে দিকটাও মাঝে মাঝে একটু ভেবো—বুঝলে ?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "তোমার বিষয় আর ভাবনাটা কি ? তোমাকে আমি জীবনে ছাড়ব না।"

একটু হেসে সাবিত্রী বললে "তারপর ?"

বললাম, "তারপর আবার কি ? লোকে নিন্দে করবে ? করুকগে—কিছু এসে যায় না। গ্রাহ্যও করব না।"

হাসি মুখেই সাবিত্রী বললে, "ইস্! বড্ড মনের জোর দেখতে পাচ্ছি যে। যাক, এখন আমার কাজ আছে, আমি যাই।"

এই বলে চলে গেল।

আলী মিঞার সঙ্গে বেলা ১১টা আন্দাজ দেখা হল সেরেস্তায়। আলী মিঞার কাছে শুনে অবাক হলাম যে দাদা নাকি আগের দিন সন্ধ্যাবেলাই আলী মিঞাকে আজ ভোরে কলকাতায় রওয়ানা হয়ে যাবার কথা বলেছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, মাসে মাসে কলকাতায় আড়াইশো করে টাকা তাঁর নামে পাঠানোর জন্য আলী মিঞাকে কড়া হুকুম দিয়ে গেছেন। এবং আরও নাকি বলে গেছেন যে এখন তিনি বেশ কিছুদিন বিদেশেই থাকবেন—দেশে ফিরবেনই না। টাকাটা মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে নিশ্চয়ই যেন তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং তিনি যদি চিঠিতে কলকাতার কোন ঠিকানা না পাঠান ত টাকাটা যেন মুকুন্দর ঠিকানায়ই যায়।

কথাগুলি বলে আলী মিঞা বললেন, "কিন্তু বাবু! বড়বাবু বিদেশে থাকেন থাকুন। আড়াইশো টাকা মাসে মাসে পাঠাতে আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ও-বাড়ীর ছোট বাবুর সঙ্গে বড়বাবুর এতটা ঘনিষ্ঠতা মেলামেশা ভাল হচ্ছে না। ছোট বাবুর কুপরামর্শে বড়বাবু যদি শেষটা জমিদারীর ব্যাপারে ছোট বাবুর পক্ষ হয়ে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেন ত অবস্থা মোটেই সুবিধার দাঁড়াবে না।"

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি এমন নয়, কিন্তু তবুও আলী মিঞাকে বললাম, "অতদূর মনে করবার এখনও কোনও কারণ হয়নি।"

আলী মিঞা কিন্তু আশ্বস্ত হলেন না। বললেন, "কি জানি বাবু, বড়বাবু যে রকম দুর্ব্বল চরিত্রের লোক, ছোট বাবু ও নবীন মুন্সী এতদিন অনেক চেষ্টা করেও আমাদের বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু বড় বাবুকে একবার হাত করতে পারলে—"

কথাটা থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, যদি প্রয়োজন হয় ত সে পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন কিন্তু বড়বাবুর টাকাটা মাসে মাসে ঠিক পাঠিয়ে দেবেন। তা হলেই তিনি আর কোনও গণ্ডগোলের মধ্যে যাবেন না বলে আমার বিশ্বাস। এবং আরও একটা কাজ করবেন—"

কথাটা শেষ না করেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আলী মিঞাও প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ মনে মনে ইতস্ততঃ করে বললাম, "বাড়ীর বৌঠাকরুণও এখন কিছুদিন বাপের বাড়ী থাকবেন—তাঁর শরীরটা এখানে বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না ত। তাঁকেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হবে। তাই তহবিলে সব সময়ই টাকা মজুত থাকে যেন।"

একথাটা আলীমিঞাকে এখুনি বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও বললাম, কেননা তুষারেরও হঠাৎ চলে যাওয়ার একটা কৈফিয়ত আলী মিঞাকে দেওয়ার যেন প্রয়োজন হয়েছিল। এবং আমার মনের দিক দিয়ে সেদিকেরও একটা সুবন্দোবস্ত এই সঙ্গেই করে ফেলে আমি যেন নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ম।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর যখন উপরে আমার শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম একটা চিন্তায় মনটাকে কিছুক্ষণ পেয়ে বসল। দাদা ত সন্ধ্যা বেলায়ই আলী মিঞাকে কলকাতায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তখনও ত তুষারের সঙ্গে আমার কোনও কলহ হয় নি। তবে কি দাদার চলে যাওয়ার সঙ্গে তুষারের চলে যাওয়ার কোনও যোগ নেই? তুষার না গেলেও দাদা চলেই যেতেন কলকাতায়? কিংবা সবই কি একটা ষড়যন্ত্রের ফল? কলহটা হয়েছিল ভালই, না হলেও তুষারকে দাদা কাল রাত্রেই পলতায় পাঠিয়ে দিতেন। কিছুই ঠিক বুঝতে পারলাম না।

যাইহোক এসব চিন্তা নিয়ে মন আমার বেশীক্ষণ দাঁড়াতে চায় নি, সহজেই ঝেড়ে ফেলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সরস হয়ে উঠল সাবিত্রীর চিন্তায়। সাবিত্রী! সেই আমার ছেলেবেলার সাবিত্রী—এতদিন পরে আবার সত্যই ফিরে এল আমার জীবনে। কত ঘাত প্রতিঘাত ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে দুজনেই চলে এসেছি, শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্যে দুজনেই যেন জীবনে পরিপূর্ণতা পেলাম। মনে হয়েছিল—তুষার, সে ত আমার জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন, কেটেই গেল। বাপের বাড়ীতেই থাকুক না এখন কিছুদিন, তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দিলেই হবে। সেদিক দিয়েও উদ্বেগ বা চিন্তার আপাততঃ কোনও কারণই ছিল না।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল আমার জীবনে। সেই আমাদের মাধবপুরের বাড়ীতে আর কেউ নেই—আমি ও সাবিত্রী। এখন জীবনের শেষ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ভাবি আর মনে হয় সেই সময় সাবিত্রীকে নিয়ে কয়েকটা দিন কি অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যেই না কাটিয়েছিলাম। ছেলেবেলার সাবিত্রীর সঙ্গে সেই প্রেমের দিনগুলির কথা মনে হলে এখন ত বুঝতে পারি যে তার মধ্যে সত্য যতখানি ছিল, তার চাইতেও বোধহয় একটা মাদকতা ছিল অনেক অনেক বেশী। সেই সব দিনের সেই সব ছোট ছোট পুলকের শিহরণ মনকে থেকে থেকে পাগল করে দিত একটা নেশার উত্তেজনায়। কিন্তু এবার সাবিত্রীকে পেয়েছিলাম স্পষ্ট ভাবে, সহজভাবে, সরল স্বভাবে। তার মধ্যে শুধু যে আনন্দ ছিল তা নয়, একটা আশ্রয় ছিল বিশ্রাম ছিল। আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটা, প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার কেমন করে সরস করে মধুর করে তুলতে হয়—এ মন্ত্রটা জগতের সমস্ত মেয়ের মধ্যে বিশেষ করে যেন সাবিত্রীরই ছিল জানা। তাই সেই সময় জীবনের কয়েকটা দিন, নিজের বলে কিছুই রাখিনি, সমস্ত উজাড় করে তুলে দিয়েছিলাম সাবিত্রীরই হাতে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়। তাই বোধ হয় প্রতি পদক্ষেপে একটা পরিতৃপ্তির অনুভূতি বহন করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম আমি আমাদের সেই মাধবপুরের বাড়ীতে, তার অন্দরে বাইরে—বেশ কিছুদিন।

কিন্তু সইল না। এমনি অদৃষ্ট, এ শান্তিটুকুও আমার সইল না। আনন্দের জোয়ারে ধীরে ধীরে ভাঁটার টান লাগল আমারই অন্তরের মধ্যে। নিজেকে উজাড় করে তুলে দিয়েছিলাম সাবিত্রীর হাতে কিন্তু ক্রমে আমার সেই পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্যে এল কার্পণ্য। মাস ২।৩ এর মধ্যেই বোঝা গেল যে জীবনে দেওয়া নেওয়া শুধু ইচ্ছা সাপেক্ষই নয়, সে ইচ্ছায় শক্তিও চাই। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলি।

মনের মধ্যে একটা আশা ছিল যে পলতা থেকে আমার কাছে একটা চিঠি আসবে। তুষার আমার কাছে কোনও চিঠি লিখবে এ আশা আমি করিনি, চাইওনি আমি তুষারের চিঠি। কিন্তু ভেবেছিলাম তুষারের মাতা আমার কাছে একখানা চিঠি লিখবেন। তুষারের ওরকম ভাবে চলে যাওয়ার দরুণ আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং তুষারকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়ে, কিংবা ঐ ধরণের একটা কিছু চিঠি যে আমি পাব এ বিষয় আমার কোন সন্দেহ ছিল না। মোটের উপর মনের মধ্যে একটা আশা ছিল তুষারের মা আমার ও তুষারের আবার মিলনের জন্য যা হয় একটা কিছু চেষ্টা

করবেন। তুষারকে নিয়ে আমি অবশ্য আর কখনও সংসার করব না; কিন্তু তার মায়ের কাছ থেকে কোনও রকম অনুরোধ এলে, সেই সময় নিজের জোরের উপরে তুষারের বিষয় একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দেব—এইটেই ছিল আমার মনের সঙ্কল্প।

এবং এই দিক দিয়েই আমার মন আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। গন্নুকে যে ভাবে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—সে কথা আমি ভুলিনি। তার চলে যাওয়ার সময়ের শেষ আর্তনাদটা—"বাবা"—কথাটা, গন্নুর কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি করে উঠত, কেমন যেন সমস্ত প্রাণমন অস্থির হয়ে উঠত গন্নুকে একবার দেখার জন্য। এবং মনে মনে ইতিমধ্যেই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে তুষারের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার সময় গন্নুর সঙ্গে আমার দেখাশুনার কোনও দিক দিয়ে কোনও বাধা না হয়, সে ব্যবস্থাও আমি করব; এবং গন্নুকে প্রয়োজন হলে আমারি কাছে এনে রেখে আমারই তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখাবার ভার নেব।

কিন্তু মাস দুই কেটে গেল, পলতার কোনও চিঠি আসা ত দূরের কথা,পলতার যখন কোনও খবরই পাওয়া গেল না তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা অস্থিরতা গড়ে উঠে ক্রমেই আমাকে অভিভূত করে ফেলতে লাগলো। তুষারের এবং বিশেষ করে তার মার আমাকে এ রকম ভাবে অবজ্ঞা করার মধ্যে আমার প্রতি যে অপমান পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছিল সেটাও আমার মনের দিক দিয়ে মোটেই ভাল লাগছিল না এবং বিশেষ করে গন্নুর কোনও খবর না পাওয়ার দরুণ গন্নুর চিন্তাই সব চেয়ে বড় হয়ে আমার মনটাকে একেবারে জুড়ে বসল। কেবল ভাবতে লাগলাম—এখন কি করা যায়।

গন্নুর খবরের জন্য একজন লোক পলতা পাঠাব? এ প্রস্তাবে মন সায় দিল না। মনে হল, এর মধ্যে একটা পরাজয় আছে। অন্ততঃ ওরা মনে করবে—আমিই পরাজিত হয়ে এগিয়ে গিয়েছি, তুষারের সঙ্গে কোনও রকম মিটমাট করে ফেলতে চাই। এ চিন্তাও আমার মনের দিক দিয়ে সে সময় ছিল অসহ্য। কোনও রকম চিঠি আমি সেধে প্রথম লিখব না—এ শপথ আমি অনেক আগেই মনে মনে করেছিলাম। তা হলে কি করা যায়?

সাবিত্রীর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তখনও কোনও আলোচনা করিনি। কেন করিনি তার কৈফিয়ত অতি সোজা। তুষারের দিকটা নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে কোনও কথা কইতেই আমার যেন কেমন একটা লজ্জা হত। ভয়ও যে প্রাণে একবারে হত না এমন নয়। মনে হত ওসব বিষয় কথা কইতে গেলেই সাবিত্রী হয়ত আমাকে ভুল বুঝবে। হয়ত ভাববে নিতান্ত নির্লজ্জ আমি ওদিককার টান তখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। হয়ত ভাববে ঐ দিকটাই আমার প্রাণের আসল বড় দিক। ষোল আনা ধরা দিয়েছে সে আমার কাছে, হয়ত নিজেকে ষোল আনাই অপমানিত মনে করবে। কিন্তু গন্নু! গন্নুই ত আমার মনের দিক দিয়ে ছিল বিবেচনার বিষয়—তুষার ত নয়। কিন্তু তবুও সাবিত্রীর সঙ্গে আলোচনা করিনি। গন্নু যখন আমাদের বাড়ীতে ছিল, তখন তার প্রতি সাবিত্রীর মনোভাবটা ত আমি একেবারেই ভুলিনি। কেমনই মনে হত গন্নুর বিষয় কথা কইতে গেলেও সাবিত্রী ঠিক সহজ ভাবে নেবে না। ভুলই বুঝবে।

যাই হোক যতদিন মন নিশ্চিন্ত ছিল, যতদিন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পলতা থেকে খবর আসবে ততদিন সাবিত্রীকে বলার ত কিছু ছিলও না। কিন্তু মাস দুই আড়াই পরে মনের মধ্যে যখন একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হল, গন্নু যখন ক্রমেই মস্ত বড় হয়ে উঠতে লাগলো আমার অন্তরে, তখনই এল প্রাণের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ।

তখনিই আমার মনে শান্তির পরিপূর্ণ জোয়ারে আবার সুরু হল ভাঁটার টান।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি সাবিত্রীর আমার মনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা মোটেই কঠিন হয়নি। আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে একদিন সকালবেলা সামান্য বৃষ্টি পড়ছিল। তাই 'চা' খাওয়ার পরে আমি আমাদের দোতালার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম—'গন্নুকে এ রকম ভাবে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে ত চলবে না। তার লেখাপড়া

শেখার বয়স হয়েছে—এবার তার শিক্ষা সুরু হওয়া উচিত। আর কেনই বা তাকে আমি এরকম ভাবে ভাসিয়ে দেব? যেমন করে হোক এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। পারব না? এতই অপদার্থ কি আমি? কিন্তু কি করা যায়? গনুকে নিবে এইসব নানান চিন্তায় মনটা মোটেই ভাল ছিল না।

এমন সময় সাবিত্রী এসে দাঁড়াল আমার কাছে। শুধাল, "তন্ময় হয়ে এত আকাশ পাতাল কি ভাবছ?"

একবার ইচ্ছে হল সাবিত্রীকে সব বলি। কিন্তু বলতে বাধল। কথাটা চেপে নিয়ে বললাম, "এই সব এলোমেলো বাজে চিন্তা। কি করে বেড়াচ্ছ? বোস না। একটু এখানে।"

বললে, "আজকাল বাজে চিন্তায় প্রায়ই অন্যমনস্ক থাক দেখতে পাই। এ রকম বাজে চিন্তাওয়ালা লোক নিয়ে আমিই না পাগল হই।"

কথাটার মধ্যে কি একটু ঝাঁঝ ছিল? বুঝলাম তাকে নিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দে আমার এই অন্যমনস্ক ভাবটাও যেন সে সইতে রাজী নয়। সে দিতে চাইলে, দিতেও জানে ষোল আনা এবং প্রতিদানে সে ষোল আনার এক পয়সাও কম নিতে রাজী নয়—সাবিত্রীর প্রাণের এই সত্যটুকু ত আমি ইতিমধ্যেই বুঝেছিলাম।

যাইহোক সাবিত্রীকে আসল কথাটা বলার যে ইচ্ছাটুকু প্রাণের মধ্যে হয়েছিল, সাবিত্রীর কথা শুনে সে ইচ্ছাটুকু প্রাণের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল উড়ে। কথাটাকে আরও ভাল করে চাপা দেবার জন্য বললাম, "জমিদারীর অবস্থা ত মোটেই ভাল নয়। মুকুন্দরা চারিদিকে বড্ড গোলমাল লাগিয়েছে। অথচ মাসে মাসে দাদাকে আড়াইশো করে টাকা পাঠাতেই হচ্ছে।"

যাইহোক সাবিত্রীকে কথাটা বললাম আমি আষাঢ় মাসের শেষাশেষি।

কথাটা বলতেই হল। কথাটা ক্রমেই এতবড় হয়ে উঠেছিল আমার প্রাণে যে সাবিত্রীর কাছ থেকে কথাটা চেপে রাখা সম্ভব হয়নি—আমার মনের দিক দিয়েও নয়। বাইরের দিক দিয়েও নয়।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি ঠিক করে ফেললাম গনুকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য পলতায় লোক পাঠাব। বেশ জোরের সঙ্গে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে একখানা চিঠি লিখে পাঠাব যে গনুর লেখা পড়ার বয়স হয়েছে, তাকে ওরকম-ভাবে ওখানে রেখে দিতে আমি একেবারেই রাজী নই; তাই লোক পাঠাচ্ছি তাকে যেন নিশ্চয়ই এই লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং আরও লিখব, তুষারের এখন বাপের বাড়ীতে থাকাই উচিত এবং তাই আমার মত; এবং তার মাসোহারা হিসাবে কিছু কিছু টাকাও আমি পাঠাতে রাজী আছি; এবং গনু স্কুলের ছুটীতে ছুটীতে বছরে ২।৩ বার গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করে আসবে—সে ব্যবস্থাও আমি করব।

যাইহোক কথাটা যখন মনের মধ্যে ঠিক করে ফেললাম, তখন যেন আমার আর তর সইছিল না। গনুকে একবার দেখার আগ্রহটা অবশ্য আমার প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শুধু সেই জন্যই নয়। বর্ত্তমান অবস্থাটাকে ভেঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম। এদিক দিয়ে একটুও দেরী করতে মোটেই ভাল লাগছিল না।

দাসমশাই আমাদের অত্যন্ত পুরাণো কর্ম্মচারী, প্রভুভক্ত অথচ বেশ সরল জোরালো লোক। ঠিক করে ফেললাম তাঁকে একজন চাকর সঙ্গে দিয়ে চিঠি দিয়ে পলতায় পাঠাব। এবং বিশেষ করে বলে দেব যেমন করে হোক বুঝিয়ে জোরের সঙ্গে গনুকে যেন তিনি নিশ্চয়ই আনেন।

ভিতরের অবস্থা অনেকটা বলতে হয়, তাই দাসমশাইকে কথাটা বলতে প্রথমটা একটু বাধল। কিন্তু উপায়ই বা কি? দাসমশাই পুরাণো লোক, তাঁকে বিশ্বাস করতে আমার দ্বিধা ছিল না, তাই একদিন তাঁকে ডেকে চুপি চুপি কতকটা বললাম।

বললাম—"বৌঠাকুরাণীর সঙ্গে আমার যে রকম মনোমালিন্য হচ্ছিল তাই তাঁকে এখন কিছু দিন বাপের বাড়ীতে রাখা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু গনুকে আমার কাছে নিয়ে আসা দরকার তার লেখাপড়া—"ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাসমশাই আমার সমস্ত কথা শুনে সম্পূর্ণ আমার মতের সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, "এ অতি উত্তম কথা বাবু. খোকা বাবু আমাদের সা'বংশের এক মাত্র কুলপ্রদীপ। তিনি কেন মামার বাড়ী ওরকম ভাবে পড়ে থাকবেন। আপনি ভাববেন না, আমি যেমন করে হোক খোকাবাবুকে নিয়ে আসবই।"

সব ঠিকঠাক। এখন সাবিত্রীকে না জানিয়ে ত এ কাজ করা চলে না, তাই কথাটা তাকে বলা দরকার। এত বড় কথা আমার মনের—সাবিত্রীকে বলবার জন্য সমস্ত প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল—অথচ বলতে গেলে কেমন যেন বাধা পেতাম, কিন্তু না বলে আর উপায়ই বা কি।

কথাটা বললাম একদিন সন্ধ্যার পরে। বললাম, "সাবি! তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী পরামর্শ আছে।"

একটু হেসে বললে "কি ব্যাপার? কোন কাজের কথা নিশ্চয়ই।"

তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ, এমন কিছু বড় কথা নয়, তবে কথাটা জরুরী। এই গনুর বিষয় তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার।"

দেখলাম সাবিত্রীর মুখ গম্ভীর হল। বললে, "তা আমার সঙ্গে আবার কি পরামর্শ?"

একটু রসিকতার চেষ্টা করে বললাম, "তোমার পরামর্শ না পেলে আমার জীবনে আর কোনও কাজই চলে না—জানত? কথাটা হচ্ছে গনুর লেখাপড়ার বিষয়। লেখা পড়ার বয়স হয়েছে তার। অথচ ও রকম ভাবে ওখানে ফেলে রেখে লেখা পড়া না শেখালে ত একটা গরু হয়ে উঠবে।"

বললে, "তোমার ছেলে, তুমি লেখাপড়া শেখাবে, তা আমাকে জিজ্ঞাসা করার কি আছে।"

একটা গম্ভীর নির্লিপ্ত কথার ধরণ। তাড়াতাড়ি বললাম, "কথাটা হচ্ছে আমি এ বিষয় একটু ভেবে দেখেছি। পলতায় কোনও স্কুল নেই। আর সেখানে ঐ সংসর্গে থাকলে ওর লেখাপড়া হবেও না কিছু। তাই ভাবছিলাম ওকে এখানে নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে একটা ভাল মাষ্টার রেখে লেখা পড়া শেখাই কি বল? একটু বড় হলে মনে করছি কলকাতায় কোনও বোর্ডিংএ রেখে দেব। ওর মা পলতায় যেমন আছে তেমনি থাকুক।"

বললে, "কেন, মা-ই বা পলতায় থাকবে কেন?"

বললাম, "তার মানে?"

বললে, "এর মধ্যে কোন্ কথাটার মানে বোঝনি?"

বললে, "কিছুই বলতে চাইনা। তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলে, তাদের এখানে নিয়ে এসে রাখবে, তাতে আমার বলবার কি আছে। ভালই ত বুদ্ধি করেছ। সবাই ভালই বলবে তোমাকে।"

একটা খুব চাপা রকমের ঝাঁঝ মেশান বিদ্রূপ প্রত্যেক কথাটার মধ্যে ঠিকরে বার হচ্ছিল। এবং এই কথা কয়টা বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে গেল চলে।

একটু রাগ হল। এত বড় আমার মনের কথাটা বুঝলে না, বুঝতে চাইলে না। কি বলতে চায় সাবিত্রী? গনু লেখাপড়া না শিখে পলতায় মূর্খ হয়ে পড়ে থাকুক—তা হলেই কি সাবিত্রী সুখী হবে? মনে মনে শপথ করলাম—তা কিছুতেই হতে দেব না, তাতে সাবিত্রী যতই রাগ করুক না কেন। ভাবলাম যুক্তি বিবেচনা জিনিষটা ভগবান কি মেয়ে জাতকে একেবারেই দেন নি?

সেইদিন রাত্রেই দাসমশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে পরের দিন সকাল বেলাযই দাস মশাইকে পলতায় পাঠিয়ে দিলাম। পলতায় নৌকায় যেতে ৩।৪ ঘন্টার বেশী সময় লাগে না, তাই সন্ধ্যার মধ্যেই গনুকে তিনি নিয়ে ফিরে আসবেন—এই আশায় মনটা সমস্ত দিন উৎফুল্ল হয়ে রইল।

গনু ফিরে আসবে—আমার মনের সেই দিনের সেই আশার আনন্দটুকু সত্যই ছিল একেবারে খাঁটী। তার মধ্যে কোনও দ্বিধা ছিল না, কোনও উৎকণ্ঠা ছিল না। গনুর ও রকম ভাবে মাকে ছেড়ে এখানে এসে থাকার মধ্যে গনুর মনে কোনও রকম কষ্ট হতে পারে—এ চিন্তা আমার মনে একবারও আসে নি। আমার মনে কেমনই একটা বিশ্বাস ছিল যে গনু আসলে অন্তরে অন্তরে আমারই একান্ত

অনুরক্ত এবং আমার কাছে থাকতে পেলেই সে সুখী হবে, শান্তি পাবে। আমাকে পেলে গনুর মার অভাবটা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে সে বিষয় আমার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না।

সাবিত্রীর দিক দিয়েও গনুর আসার আমার মনে কোনও উৎকণ্ঠা ছিল না। অবশ্য গনুকে এখানে আনার ব্যাপারটা সাবিত্রীকে বলতে গিয়ে সাবিত্রীর যে মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে যদিও বিস্মিত হইনি, তবুও ব্যথা যে একেবারেই পাইনি এমন নয়। সাবিত্রীর মনোভাবটা নানান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক বিবেচনা করে দেখেছি কিন্তু সাবিত্রীর এই মনোভাব আমি প্রাণে প্রাণে কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনি। সাবিত্রীর বর্ত্তমান অবস্থায়, কোনও দিক দিয়ে তুষারের সঙ্গে আমার যদি কোন যোগ থাকে সাবিত্রীর মত মেয়ের পক্ষে তা সহ্য করা মোটেই সহজ নয়—একথাও ভেবে দেখেছিলাম। কোনও রকম যোগ যদি আবার হয়, সাবিত্রীর বর্ত্তমান জীবনের পক্ষে সেটা দারুণ অপমানজনক—সে কথাও বুঝতে আমার দেরী হয়নি। এবং যে-ভাবে আমার ভেঙে পড়া জীবনটাকে সাবিত্রী বিনা দ্বিধায় এতটুকুও কার্পণ্য না করে তার প্রাণের পরে সাদরে তুলে নিয়ে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিল, তাতে করে কোনও দিক দিয়ে তাকে এতটুকুও অপমানিত হতে দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়, সে ধারণাও আমার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তবুও গনুর প্রতি সাবিত্রীর মনোভাবটাকে আমি সমর্থন করিনি, কেননা কোনও কিছুর জন্যই গনুকে বিসর্জ্জন দেওয়ার অধিকার আমার কিংবা সাবিত্রীর কারুরই নাই—এইটেই ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পাপ পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম যদি মানতে হয় ত শিশু যারা, বালক যারা, যারা অসহায়, যারা দুর্ব্বল, হাত ধরে এগিয়ে না নিয়ে গেলে যারা জীবনের পথে এক পা ও এগুতে পারে না, প্রতি পদক্ষেপে যাদের বিপথে চলে গিয়ে ধ্বংসের পথে মরণের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা, তারাই সকল অবস্থায় সকলেরই পুজনীয়। তাদের অবহেলা করার অধিকার সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান কাউকে দেননি—কোনও মানুষকেই না। তাই সাবিত্রীর মনোভাবটা আমি সমর্থন করিনি যদিও—তার প্রাণের উদারতার প্রতি, তার মনের সত্যিকারের মাহাত্ম্যর প্রতি আমার একটুও সন্দেহ হয়নি—একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল। তাই ভেবেছিলাম ছোট অসহায় বালক মাকে ছেড়ে যদি তার কাছে এসে আশ্রয় চায় সাবিত্রীর মত মেয়ে কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে নেবে না, নিতে পারে না, তাকে সাদরে আশ্রয় দেবে, মুখে সে এখন আমাকে যাই বলুক না কেন। ভেবেছিলাম—সাবিত্রীর আমার প্রতি ভালবাসাটা একটা প্রচণ্ড বন্যার মত, সমস্ত নিয়ম সমস্ত বাঁধন প্রাণের শক্তির প্রাচুর্য্যে ভেঙে চুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই তার উৎসাহ তার আনন্দ। কিন্তু সত্যি যদি কোনও অসহায় শিশু সেই বন্যার মুখে পড়ে আকুল হয়ে ওঠে কেঁদে জলোচ্ছ্বাসের মধ্য হতে গঙ্গার মত বেরিয়ে আসবে স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি—শিশুটাকে আশ্রয় দেবে, কোলে তুলে নেবে, তলিয়ে যেতে কখনই দেবে না।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে সাবিত্রীর কাছে কথাটা আবার তুললাম। কাল রাত্রে সাবিত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর সাবিত্রী চুপচাপ একটু গম্ভীর ভাবেই ছিল আমার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা বলেনি। তাই কথাটা আমি নিজেই আবার তুলেছিলাম।

কোনও রকম ভূমিকা না করেই হঠাৎ বলে ফেললাম "সাবি। আমি গনুকে আনতে লোক পাঠিয়েছি।"

কোনও রকম ভাবের অভিব্যক্তি না করেই বললে, "বেশ ত।"

বলতে লাগলাম,—"ভেবে দেখ, এ ছাড়া এখন আর উপায়ই বা কি?"

চুপ করে রইল। কোনও কথা বললে না।

আবার বললাম, "চুপ করে আছ যে?"

নির্লিপ্ত সুরেই বললে, "বলব কি?"

বললাম, "পূজার ছুটীর ত আর বেশী দেরী নেই—মাস দুই মাত্র। মাস দুই পরে আবার পলতায় পাঠিয়ে দেব। তখন তোমাকে নিয়ে একবার পশ্চিমে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আছে।"

বললে, "সে তখনকার কথা তখন। এখন যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তাই ভাব।"

কথা বেশী এগুল না। সব কথাই কেমন যেন দিল কেটে। ভাবলাম গন্থু একবার এসে পড়ে দিন কতক থাকতে থাকতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে মনে কল্পনাও করে ফেললাম যে এ বছরটা হবে না, আগামীবারে পূজার সময় দূর দূর পশ্চিমে বেড়াতে বেরুব আমি ও সাবিত্রী আর সঙ্গে থাকবে গন্থু।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দাসমশাই ফিরে এলেন। ফিরে এলেন একা—গন্থু আসেনি।

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার দাসমশাই? গন্থু এলনা?"

দাসমশাই বললেন, "না, তাকে কিছুতেই পাঠালেন না।"

দাসমশাইয়ের কথার মধ্যে একটা বিরক্তি ফুটে বেরুচ্ছিল।

বললাম, "পাঠালেন না কিরকম—তার মানে?"

দাসমশাই বললেন, "শুধু পাঠাতে রাজী হলেন না নয়, আমাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়েন নি।"

ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। বললাম, "কে? কে কি বলেছে আপনাকে?"

দাসমশাই চুপ করে রইলেন।

বললাম, "বলুন সমস্ত খুলে আমাকে—চুপ করে থাকবেন না।"

ধীরে ধীরে দাসমশাই বলতে লাগলেন, "কথাগুলি শুনিয়েছেন বৌঠাকরুণ—কিন্তু বড়বাবুর সামনে। বড়বাবু তাতে একটীও কথা বলেন নি।"

চমকে উঠলাম। "বড়বাবু"?

দাসমশাই বলে যেতে লাগলেন, "হ্যাঁ বড়বাবু। তিনি এখন বেশীর ভাগ কলকাতা থেকে এসে সেইখানেই থাকেন। আমাকে বললেন,—বৌঠাকরুণদের ত ও রকম করে ভাসিয়ে দিলেও চলবে না, তাঁদেরও ত দেখা শুনা করা দরকার।"

একটু চুপ করে রইলাম। পরে যত দূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে শান্ত গলায় শুধালাম, "বৌঠাকরুণ কি বললেন?"

দাসমশাই চুপ করে আছেন দেখে আবার বললাম, "বলুন সব; ইতস্ততঃ করবেন না।"

দাসমশাই বললেন, "সে অনেক কথা। বিস্তারিত আমার মনেও নাই আর বলতে আমার ভালও লাগছে না। এক কথায় বৌঠাকরুণের মতে এ পুরী পাপের পুরী—এখানে তিনি কিছুতেই ছেলে পাঠাবেন না যতদিন না—"

বললাম "যত দিন না পাপ বিদেয় হবে এ পুরী আবার ধর্ম্মের পুরী হয়, কেমন? আচ্ছা। আলী মিঞা কোথায়, তাকে ডেকে দিন আমার কাছে।"

দাসমশাই চলে গিয়ে আলী মিঞা এলেন।

বললাম, "আলীমিঞা! বড় বাবুর মাসোহারা আজ থেকে বন্ধ। আমার বিনা হুকুমে আর এক পয়সাও যেন না যায়।"

আলী মিঞা যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে সেখান থেকে চলে গেলাম।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেশ ছেড়ে রওয়ানা হলাম—আমি ও সাবিত্রী। রওয়ানা হলাম দূর পশ্চিমাভিমুখে।

* * * *

(ক্রমশঃ)

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

গ্রামিক লিপিকা

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তোমার আকাশে নাগরিক ভাই, বোশেখী-সূর্য্য জ্বলে,
আমার আকাশ কালো হোলো কেন বেদনার কজ্জলে?
রুগ্ন চাঁদের নিচে
বেতস বনের বেদিয়া বাতাস করুণ নিঃশ্বসিছে।
ভুলে' গেছ আজ নাকি
আমার মানস-লিপিকা ব'য়েছে বিরহী চক্রবাকী?

প্রসারিত প্রেত-প্রান্তরে দেখি ধূসর পাণ্ডুরতা,
বিরল-তৃণের বুকে দেখি আজ মৃত্যুর স্তব্ধতা···
দক্ষিণা সমীরণে—
কার জীবনের ব্যর্থতা কাঁদে সজল সঞ্চরণে?
আজি পহেলায় ভাই
তোমারে সাজায় মহা সমারোহে আমার নগ্নতাই॥

আমি জানি ভাই তোমার স্বপ্ন ট্রামের চাকার নিচে
গু'ড়ো হ'য়ে আজ আমার কেয়ায় মধুর মুঞ্জরিছে
আমার নির্জ্জনতা
তোমার চিত্তে পুষ্পিত হ'য়ে এনেছে বিহ্বলতা।
আজো কী বোঝাতে হবে
তোমার মৃত্যু ঘনাবে সেদিন, আমারে ভুলিবে যবে॥

তোমার ওখানে নতুন বর্ষ নবীন জন্ম নিলো,
নীরব নভের দীর্ঘ নীলিমা যাত্রায় শঙ্কিল—
এখানে মেঘের বেণী
একটি তারার ফুল-আভরণ আজ রাতে ভুঞ্জেনি।
তোমার গ্যাসের তলে
প্রলাপের মত জনতার দল আজিকেও চঞ্চলে?

তোমারে ভাবিয়া আজি পহেলায় প্রতিটি প্রহর যাপি
হিসাবের ঘরে পথের অঙ্ক কি হবে বন্ধু, মাপি' ?
আমি কি জানিনা কিছু
কিযে অভিশাপ ব্যর্থতা কত সঞ্চয় করে পিছু ?
সাম্‌নে চাহিয়া থাকা—
আমার পথের সঙ্গতি জানি মনের মাধুরীমাখা ॥

নাগরিক ভাই, তুমি হোথাকার যক্ষের খোঁজ রাখো ?
আমি জানি তার বেদনার ভার, তুমি কিছু বোঝোনাকো ?
হেথা আসন্ন মেঘে
তাহারি চোখের কৃষ্ণ ইসারা কী মায়ায় আছে লেগে' !
বছরের পহেলাতে
রাত্রির শব বাঁচিয়া উঠুক তোমার কল্পনাতে ॥

তোমার ওখানে উৎসব, তাই কোরেছো নিমন্ত্রণ,
হেথায় কোকিল রেখে' গেছে শুধু নীলিমায় নির্জ্জন ;
তোমার নিঠুরতা
আমার মনের মৌচাকে সেকি জ্বালায় চঞ্চলতা !
জ্বলিব নিজের বিষে
সেইক্ষণ স্মরি' বাতায়নে বসি' চাহিও নির্ণিমিষে ॥

তোমার জ্ঞানের আলোকে আমার লিপিকার ব্যর্থতা
যাহা কিছু বেশী, জানিয়ো আমার হৃদয়ের অর্থ তা' ।
যা' কিছু বলার ছিলো
বাণীতে তাহার ব'লেছি খানিক মৌনতা কিছু নিলো ।
আমার রাত্রি, মিতা
চোখের জলের বেদনার দীপে' ক'রেছি দীপান্বিতা ॥

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দর্শন এবং ধর্ম্ম

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ রায়-ন্যায়বাগীশ বি-এ

দার্শনিক হেগেল বলেন, দর্শন এবং ধর্ম্ম উভয়েরই আধেয় এক, কেবল আধার ভিন্ন। (Religion and philosophy have the same contents, only the containers are different)। এই কথা সত্য কিনা তাহার বিচার করিতে হইলে, আমাদিগের দর্শন সম্বন্ধে ধারণা যেরূপ সুস্পষ্ট থাকা উচিত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণাও সেইরূপ সুস্পষ্ট থাকা উচিত।

ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে তাহা। এই অর্থে অদ্বৈতবাদীদিগের পারমার্থিক তত্ত্বই ধর্ম্ম। হেগেল যদি ধর্ম্ম বলিতে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং দর্শন বলিতে অদ্বৈতবাদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন তবে ত তাঁহার কথা ঠিকই।

কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ ইহা হইলেও সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিতে ইহা লক্ষিত হয় না। ধর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থে ইহার জন্য কয়েকটী বিশ্বাস অপরিহার্য্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, আমাদিগের আত্মার অমরত্বে এবং নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস, সকল ধর্ম্মেরই গোড়ার কথা। এ ছাড়া আরোও এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আমরা ইচ্ছা করিলে পাপ করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে পুণ্যও করিতে পারি। ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, পুণ্যের ফল সুখ পাপের ফল দুঃখ, এবং ঈশ্বর এই সুখ-দুঃখের বিধানকর্ত্তা।

দর্শনের মধ্যে যেমন অদ্বৈতবাদ এবং বহুসত্তাবাদ আছে, ধর্ম্মের মধ্যেও তেমন এক-ঈশ্বরবাদ, দুই-ঈশ্বরবাদ, এবং বহু-ঈশ্বরবাদ আছে। সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন যুগের গ্রীকগণ এবং ভারতীয় বৈদিক আর্য্যগণ ছিলেন বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বর্ত্তমানে পারসিকগণ ব্যতীত আর সকল সুসভ্য সম্প্রদায়ই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। পারসিকগণ দুই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। দার্শনিক মতের মধ্যে যেমন অদ্বৈতবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক আদরণীয়, তেমন ধর্ম্মের মধ্যেও এক-ঈশ্বরবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক আদরণীয় এবং দার্শনিক-ভাবে সমালোচনার যোগ্য।

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মসকলের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে তিন রকমের বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বিশ্বাসে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, জড় ও জীব-জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। বিশ্ব একভাবে না একভাবে তাঁহারই অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় প্রকার বিশ্বাস বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং করুণাময়। জীবও তাঁহার ন্যায় পারমার্থিক। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান,—জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান। ঈশ্বর হাতে পাওয়া উপাদানের সাহায্যে জগৎ রচনা করিয়া, তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি আমাদিগের পাপ পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারের বিধানকর্ত্তা। তৃতীয় প্রকার বিশ্বাসেও ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং করুণাময়। কিন্তু তিনি জগতের উপাদান-কারণ নহেন; জীবও পারমার্থিক সত্তা নহে। তিনি অবস্তু হইতে (Exnihils) জীব ও জড় উপাদান সৃষ্টি করিয়া, তদ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন এবং ইহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি পাপ পুণ্যের শাস্তি এবং পুরস্কারের বিধানকর্ত্তা।

প্রথম প্রকারের এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মমতগুলি এক-ঈশ্বরবাদ না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয় সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। মোটের উপর, ভারতীয় এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক প্রায় সকল ধর্ম্মমতই সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। এমন কি গোড়াতে শাক্ত ধর্ম্মমতও সর্ব্বেশ্বরবাদ। আমরা দেখিয়াছি যে, যে সকল অদ্বৈত মতে

পারমার্থিক সত্তাকে এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সত্তা মনে করে, তাহারাও ইহাকে শক্তিবর্জ্জিত সত্তা মনে করে না। শক্তি এবং জ্ঞান একই পারমার্থিক সত্তার দুইটি দিক (aspects) মাত্র। আমরা ইহাকে সর্ব্বশক্তিমৎ জ্ঞানও বলিতে পারি, সর্ব্বজ্ঞ শক্তিও বলিতে পারি। যাহাদিগের ধর্ম্মমতে ইহার জ্ঞানের উপর ঝোঁক বেশী তাহারা বলে, ইহা এক সর্ব্বশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী জ্ঞান; এবং যাহাদিগের ধর্ম্মমতে ইহার শক্তির উপর ঝোঁক বেশী তাহারা বলে ইহা এক জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী শক্তি। শক্তিমৎ জ্ঞানের উপাসকগণ তাহাদিগের উপাস্যকে বলে ভগবান বা পরমেশ্বর, এবং জ্ঞানশালিনী শক্তির উপাসকগণ তাহাদিগের উপাস্যকে বলে ভগবতী বা পরমেশ্বরী। ভগবানের উপাসকই হউক বা ভগবতীর উপাসকই হউক সকলের মতেই এই উপাস্য—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ। সকলের মতেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সুতরাং তাহারা সকলেই সর্ব্বেশ্বরবাদী।

অদ্বৈতবাদী দার্শনিককে যদি তাঁহার ধর্ম্মমত এবং দার্শনিক মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, তবে তাহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদী (Pantheist) হইতেই হইবে। হেগেল ছিলেন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক। যদি তিনি দর্শন বলিতে অদ্বৈতবাদ এবং ধর্ম্ম বলিতে সর্ব্বেশ্বরবাদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে তিনি যে বলেন ধর্ম্ম এবং দর্শনের আধেয় এক, কেবল আধার ভিন্ন, এই কথা যে সত্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ব্বেশ্বরবাদীদিগের ঈশ্বর এবং অদ্বৈতবাদীদিগের পারমার্থিক তত্ত্ব ত একই সত্তা। সুতরাং আধেয় একই হইল। পার্থক্য কেবল আধারে। একের আধার যুক্তি এবং অপরের আধার বিশ্বাস। তবে, হেগেল ধর্ম্ম বলিতে সর্ব্বেশ্বরবাদ লক্ষ্য করিয়াছেন, কি বাইবেলের ধর্ম্মমতসকল (dogmas) লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা বিবেচনার বিষয়।

হেগেল তাঁহার বিতর্কের প্রণালী (dialectics) দ্বারা ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ দেখাইতে যাইয়া বলেন যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই ধর্ম্ম বিষয়ক ধারণার চরম বিকাশ বা উন্নতি। প্রাচীন গ্রীক জাতির ধর্ম্মে মানুষের উৎকর্ষতা দেখানো হইয়াছে বিশেষভাবেই। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা আদৌ উচ্চ রকমের নহে। আবার প্রাচ্য জাতিদিগের ধর্ম্মে, ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নহে। এই বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় হইয়াছে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মানুষ-ঈশ্বরে (God-man-এ)। ইহাই যদি হেগেলের ধর্ম্মমত হয় তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহার দার্শনিক অদ্বৈতমতের সহিত তাঁহার ধর্ম্মমতের কোনই সামঞ্জস্য নাই। যদি ধর্ম্ম বলিতে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের মত-সকল (dogmas) লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং দর্শন বলিতে তাঁহার নিজের অদ্বৈতমত লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে ধর্ম্ম এবং দর্শনের আধেয় এক, কেবল আধার ভিন্ন এই কথা ঠিক নহে।

আর একটী কথা এই যে, হেগেল যে বলেন, প্রাচ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের মধ্যে মানুষ কিছুই নয়, ঈশ্বরই সব, এই কথাও ঠিক নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মোটের উপর ভারতীয় ধর্ম্ম সকল সর্ব্বেশ্বরবাদমূলক। যে ধর্ম্মে মানুষকে ঈশ্বরের অংশ অথবা বিকাশ মনে করে সেই ধর্ম্মে ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নয় এ কথা স্বীকার করা যায় না। এমন কি, এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী যে সকল গ্রাম্য ধর্ম্ম মানুষকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করে না, সেই সকল ধর্ম্মও মানুষকে ঈশ্বরের ন্যায় পারমার্থিক সত্তা বলিয়া মনে করে এবং ঈশ্বরের সহিত স্বরূপত তাহার কোনোও পার্থক্যই স্বীকার করে না। যেটুকু পার্থক্য স্বীকার করে, তাহা জ্ঞান এবং শক্তির পরিমাণে—স্বরূপে নহে। সুতরাং হেগেল যে বলেন প্রাচ্য জাতির ধর্ম্মে ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নহে, এই কথাও অবিসংবাদে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের আত্মা ঈশ্বরের অংশ হইলেও ইহার স্থান সৃষ্ট মানুষের উপরে, এবং ইহা ঈশ্বরের ন্যায় পারমার্থিক হইলেও ইহার স্থান সৃষ্ট মানুষের উপরে।

হেগেল বলেন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ধর্ম্মবিকাশের ঠিক উন্নতি এই জন্য যে, ইহাতে ঈশ্বরের মানুষরূপে অবতারের কল্পনা আছে। যদি অবতারবাদই ধর্ম্মমতের উৎকর্ষতার মাপকাঠি হয় তবে আমরা এই বলিতে পারি যে, হেগেল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য যে সব সম্মানের দাবি করেন, কোন কোনও প্রাচ্য ধর্ম্মমতও সেই দাবি করিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্মমতে ঈশ্বর যেমন পারমার্থিক, আমাদিগের আত্মাও তেমন পারমার্থিক। সুতরাং এই ধর্মমতে পারমার্থিক বিষয়ে আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতার অবকাশ রহিয়াছে। এই ধর্মমতের সহিত দ্বৈতবাদের, এবং যে সকল দার্শনিক মত ঈশ্বরের ন্যায় আমাদিগের আত্মাকে পারমার্থিক সত্তা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের, বেশ সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্ম্মের জন্য যদি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্বে এবং করুণাময়ত্বে এবং আমাদিগের নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্য হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে দার্শনিক মতে আমাদিগের আত্মার পারমার্থিকতা স্বীকার করা হইয়াছে কেবল তাহাতেই ইহা নির্দ্দোষভাবে, অর্থাৎ যুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিলে, সম্ভব। দার্শনিক ক্যাণ্টের দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা যেরূপভাবেই করা হইয়া থাকুক না কেন তাহার একটী উক্তি সুস্পষ্ট, এবং ইহা এই যে, যদিও ব্যবহারিক জগতে (Phenomenal world এ) আমরা নিয়তির অধীন, পারমার্থিক জগতে (nowmenal world এ) আমরা স্বাধীন। আত্মা পারমার্থিক সত্তা না হইলে স্বাধীন হইবে কিরূপে? তাই ক্যাণ্টের মতে ঈশ্বর যেমন পারমার্থিক আমাদিগের আত্মাও তেমন পারমার্থিক। সৃষ্টি প্রকরণে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এইস্থলে কথাটীর উল্লেখ করা গেল মাত্র। এই ধর্ম্মমতের সঙ্গে দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং দর্শন বলিতে দ্বৈতবাদ, এবং ধর্ম্ম বলিতে এই প্রকারের এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম মনে করিলে, ইহা বলা যাইতে পারে যে, উভয়েরই আধেয় এক, কেবল আধার মাত্র ভিন্ন। একের আধার যুক্তি, অপরের আধার বিশ্বাস।

তৃতীয় প্রকার এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মমত বলে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় ঈশ্বর অবস্তু হইতে (Exnihilis) জীব ও জড় উপাদান সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা জগৎ রচনা করিয়া ইহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, এবং যে সকল ধর্ম্ম প্রাচীন বাইবেলের পূর্ব্বভাগের প্রত্যাদেশের (Revolationএর) উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল ধর্ম্মের এই মত। অবস্তু হইতে (Exnihils) সৃষ্টির কোনও স্বাধীন চিন্তামূলক দার্শনিক মতেই সমর্থন নাই। কেবল তাহা নহে, এই ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত স্বাধীন চিন্তার সংঘর্ষ হইয়াছে বড় কম নহে। এই বিশ্বাসের পরিতৃপ্তির জন্যই দার্শনিক ব্রনোকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া, কেপলারকে কারাবরণ করিয়া, গেলিনোকে নিজের মত সত্য জানিয়াও তাহা যে সত্য নহে এইরূপ স্বীকার করিয়া, এবং আমার মনে হয়, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্টকেও তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থসকল রচনা হইবার পরও দীর্ঘকাল না ছাপাইয়া।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন যুগেই হউক বা বর্ত্তমান যুগেই হউক, বিশ্বাস এবং যুক্তির সংঘর্ষণের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন সব চিন্তাশীল ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে যাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্মবিশ্বাসকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সময় আসিবেই, যখন ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। ইয়ুরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত এবং স্বাধীন চিন্তামূলক দার্শনিক মতের মধ্যে সংঘর্ষণের সময়ও এই শ্রেণীর চিন্তাশীল অথচ ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সংকল্প হইয়াছিল, ধর্ম্মমতসকল (dogmas) যে যুক্তিসহ তাহা দেখানো। তাঁহাদিগকে বলা হইত Schoolmen বা শাস্ত্রতান্ত্রিক। তাঁহাদিগের গবেষণা-প্রণালীর নাম ছিল Scholasticism বা শাস্ত্রতান্ত্রিকতা।

সেণ্ট অগষ্টিন ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী স্কোটাস্ এবিজিনা, সেণ্ট এনসেলেম, এবিলার্ড সেণ্ট টমাস প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার পরিপোষকতার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের সংকল্প হইল খ্রীষ্ট ধর্ম্মমত সকলকে (dogmas) যুক্তিসহ করা। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটা না চেষ্টা করিয়াছেন যুক্তির অনুসন্ধানে, ততটা করিয়াছেন প্লেটো এবং অরিষ্টটলের দার্শনিক মতের মধ্যে ধর্ম্মমতের (dogmas) সমর্থন পাওয়া যায় কিনা, তাহার অনুসন্ধানে। প্লেটোর ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং মঙ্গলময়ত্বের মধ্যে তাঁহারা সমর্থন পাইলেন ত্রিত্বের (Trinityর)—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের। তাঁহারা ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব এবং ইহাদিগের সত্ত্ব এবং সক্রিয়ত্বের মধ্যে সমর্থন পাইলেন, ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ধর্ম্ম সঙ্ঘের (church-এর) যে অস্তিত্ব আছে, এবং ইহা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপে পাপ মার্জ্জনা করিতে পারে, তাহার। অরিষ্টটলের নক্ষত্রলোক এবং তথায় নক্ষত্রলোক-বাসীদিগের সহিত ঈশ্বরের বাসের মধ্যে সমর্থন পাইলেন স্বর্গের এবং স্বর্গে যে ঈশ্বর দেবদূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, তাহার। একটা কথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে ইহাতে তাঁহারা গ্রীকদর্শনকে মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে স্থান দিয়াছিলেন বাইবেলের—অন্ততঃ ইহার পূর্ব্ব ভাগের উপরে। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন, এবিলার্ড স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে বাইবেলের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগের (Old Testament এবং New Testament এর) মধ্যে পার্থক্য যতটা প্লেটো এবং অরিষ্টটলের দার্শনিক মতের সহিত ইহার উত্তর ভাগের New Testament এর পার্থক্য ততটা নহে।

শাস্ত্রতান্ত্রিকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল ধর্ম্মমত সকলকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু তাঁহাদিগের যুক্তি তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্যই একটা সঙ্কট (moral crisis) সৃষ্টি করিয়াছিল, যে ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহাকে হয় বিশ্বাস না হয় যুক্তি এই দুইটির একটাকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। শাস্ত্রতান্ত্রিকগণ ছিলেন প্রত্যাদেশ (revealation) মূলক ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী; সুতরাং বিশ্বাস পরিত্যাগ ত সম্ভবই ছিল না। তাই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল যুক্তি; কিন্তু ইহা ত স্পষ্টভাবে নহে। ইহা তাঁহারা সাধন করিলেন, যুক্তির নামে হেত্বাভাসের আশ্রয় লইয়া। ইহা ত এক প্রকার প্রতিজ্ঞাচ্যুতিই হইল।—যাহাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ বলেন প্রতিজ্ঞাহানিরূপ নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তি।

সেণ্ট অগষ্টিন শাস্ত্রতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও তিনিই ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহার বিচার-শক্তি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি যদি বিশপ অগষ্টিন না হইতেন তবে হয়ত খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর একজন সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিতেন। যখন দার্শনিক অগষ্টিনের সূক্ষ্ম যুক্তি তাঁহাকে অদ্বৈতবাদের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন বিশপ অগষ্টিন আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাকে আড়াল করিয়া এবং বাধ্য করিলেন এই বলিতে যে মানুষ কখনও ঈশ্বরের অংশ বা বিকাশ হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে তাহাকে অনেক বড় করা হয়। মানুষ কখনও এত বড় হইতে পারে না। মানুষ সৃষ্ট জীব—অবস্তু হইতে (Exnihilo) সৃষ্ট জীব। তিনি আরও বলিলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, সকল মানুষ উদ্ধার পায়। তিনি যাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহা পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আর যাহারা বাকী রহিল তাহারা উদ্ধার পাইবে না। ইহা ত যুক্তি হইল না। ইহা হইল যুক্তি ত্যাগ।

স্কোটাস এবিজেনাকে বলা হয় শাস্ত্রতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার যুক্তি তাঁহাকে এমন এক ঈশ্বরের সম্মুখীন করিল যিনি এক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত নির্গুণ (Impersonal) সত্তা—যিনি সদসতের উপরে, অস্তিনাস্তির উপরে, সর্ব্বতোভাবে বাক্য ও মনের অগোচর। কেবল তাহা নহে, তাঁহার যুক্তি তাঁহাকে ইহাও বলিতে বাধ্য করিল যে স্বর্গ নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। পাপ-পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞানই পুরস্কার এবং অনুতাপই নরক। এত কথা বলিয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত আর তাঁহার যুক্তি অনুসরণ করিতে পারিলেন না। শেষটায় বিশ্বাস তাঁহাকে এই বলিতে বাধ্য করিল যে মানুষকে উদ্ধার পাইতে হইলে খ্রীষ্টের ভিতর দিয়াই পাইতে হইবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই।

সেণ্ট এনসেলেমকে বলা হয় দ্বিতীয় অগষ্টিন। তাঁহার যুক্তি বলিল যে, অবস্তু হইতে (Exnihilo) সৃষ্টি যুক্তি-সঙ্গত নহে এবং ঈশ্বরেও কোনও গুণ আরোপ করা যায় না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস বলিল যে, মানুষের পাপ এত গুরুতর ছিল, যে ইহার জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরের নিকট সমস্যা ছিল, হয় মনুষ্যকুল ধ্বংস করা নয় নিজে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাওয়া। ঈশ্বর নিজে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাওয়াটাই ভাল মনে

করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য যীশু খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন। ঈশ্বরের যীশুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার যুক্তির মধ্যে যৌক্তিকতা কতটা আছে পাঠক নিজেই তাহা স্থির করিবেন।

আর একজন শাস্ত্রতান্ত্রিক দার্শনিক এডিলার্ড। তাঁহার মতে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং মঙ্গলময়ত্বের প্রতীক হইয়াছে—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। তিনি আরও বলেন যে বাইবেলের পূর্ব্বভাগ এবং উত্তর ভাগের মধ্যে যতটা পার্থক্য গ্রীক দর্শন এবং বাইবেলের উত্তর ভাগের মধ্যে এতটা পার্থক্য নহে। তাঁহার আর এক কথা এই যে যখন ঈশ্বরই সকল কারণের কারণ এবং আমরা তাঁহাতেই বাস করি, তাঁহাতেই চলাফেরা করি এবং তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি (In as much as he is the absolute cause in whom we live move and have our being) তখন আমাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? আমরা যাহা করি, তাহা তিনিই করান। পাপ বলিয়াও কিছু নাই, পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। আমরা যাহা অমঙ্গল দেখি তাহা আমাদিগের ভাল হইবার শক্তি-বৃদ্ধির জন্যই। এডিলার্ডের লেখার মধ্যে ধর্ম্মমতের (dogmas) সমর্থন বড়ই আছে।

সেণ্ট টমাসের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণই হওয়া উচিত দর্শনের কার্য্য। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে ইহা হইতে পারে না। তাই ঈশ্বর খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার স্বরূপ এবং তিনি যে আছেন ইহা মানুষের নিকট প্রকাশ করিয়া গেলেন। সেণ্ট টমাস আর একটী কথা বলিয়াছেন যাহার সহিত dogmaর মিল নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বর যদিও স্বাধীন, তথাপি তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার মধ্যে freedom of indifference নাই। তাঁহার ইচ্ছা এবং necessity একার্থ বোধক।

ডন স্কোটাসের যুক্তি তাঁহাকে লইয়া গেল ইহার বিপরীত দিকে। তাঁহার মতে কেবল যে ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তাহা নহে, মানুষেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। এই মতের সমর্থন তিনি পাইলেন অরিষ্টটলের লেখাতে।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে শাস্ত্রতান্ত্রিকগণ ধর্ম্মমতসকলকে যুক্তিসহ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

এই স্থলে পাঠককে একটী কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে—যে তিনটী এক ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মমতের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগের কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা আমরা তাহার সমালোচনা বা নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি না। সর্ব্বেশ্বরবাদও সত্য হইতে পারে। আমাদিগের আত্মা এবং ঈশ্বর এই উভয়ের পারমার্থিকতায় বিশ্বাসমূলক এক-ঈশ্বরবাদও সত্য হইতে পারে, এবং অবস্তু হইতে সৃষ্টিতে বিশ্বাসমূলক এক ঈশ্বরবাদও সত্য হইতে পারে। আমাদিগের আলোচনার বিষয় হইয়াছে এই তিনটির সহিত স্বাধীন চিন্তামূলক দার্শনিক মত সকলের সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা প্রদর্শন করা।

আশা করি অকাট্য যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিয়াছি যে অদ্বৈতবাদের সহিত সর্ব্বেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য আছে। কোন অদ্বৈতবাদী যদি তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত মিল রাখিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসী হ'ন তবে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইতেই হইবে। দ্বৈতবাদের সহিত দ্বিতীয় প্রকার এক-ঈশ্বরবাদের সর্ব্বশক্তিমত্বে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে, করুণাময়ত্বে এবং আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতায় এবং নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য আছে। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্বে, এবং করুণাময়ত্বে এবং অবস্তু হইতে সৃষ্টি বিশ্বাসমূলক এক ঈশ্বরবাদের সহিত অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদ কি বহুসত্তাবাদ কোনও স্বাধীন চিন্তামূলক দর্শনের সামঞ্জস্য নাই।

জড়তান্ত্রিক দার্শনিকগণও আমাদিগের আত্মার নিত্যত্বেই বিশ্বাসী নহেন। সুতরাং ইহাতে ধর্ম্মের কথাই উঠিতে পারে না।—ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য থাকা ত দূরের কথা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ

পরিতপ্ত

অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবীন্দ্র দারোগার বাসায় উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উষা-মূর্তি পরমাসুন্দরী একটি তরুণী মেয়ে জাগ্রত হয়ে ক্ষিপ্রহস্তে গৃহকর্ম ক'রে বেড়াচ্ছিল। তার চারিদিকে যেন শ্রী লাবণ্য আর কল্যাণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার নাম শুচিতা। সে কবীন্দ্র দারোগার বিধবা মেয়ে। তার মুখখানি বড় মলিন, বিমর্ষ।

অল্পক্ষণ পরেই একটি ছোট মেয়ে ও তার চেয়েও ছোট একটি ছেলে ঘুম থেকে উঠে এল। অমনি শুচিতা তাড়াতাড়ি ভাইবোন দুটিকে আদর ক'রে মুখ ধুইয়ে দিলে, রাত্রিবাসের জামা-কাপড় বদলে দিলে।

মেয়েটি কাতরস্বরে বললে—দিদি, খিদে পেয়েছে।

শুচিতা বললে—মা উঠুন ভাই। মা উঠে খেতে দেবেন।

মেয়েটি প্রতিবাদের ও আবদারের স্বরে বললে—আমাদের খাবার ঢাকা আছে তুমি তো জান। তুমি দাও না।

শুচিতা বললে—না ভাই, আমি দিলে মা রাগ করবেন, বকতে থাকবেন।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা দিদি, মা অমনি শুধুশুধু সবাইকে দাঁত খিঁচিয়ে সমস্ত দিন ধরে বকে কেন? বাবা বলছিল—তোদের মা নৃত্যকালী না তো রক্ষাকালী।

এই ব'লেই মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

শুচিতার বিমর্ষতা কেটে গেল, সে হেসে ফেলে বললে—চুপ চুপ। মা শুনতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না, বাবাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি ক'রে অপমান করবেন।

সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

পাশের ঘর থেকে পানের ডিবে আছড়ে ফেলার ঝঞ্ঝনা শব্দ শোনা গেল। বাড়ীর সবাই বুঝলে যে এইবার বাড়ীর গিন্নি নৃত্যকালীর ঘুম ভেঙেছে। সন্ত্রাস সকলের বুক চেপে ধরল।

নৃত্যকালী ভূষণশিঞ্জনে সকলের বুকে ভয়ের শিহরণ জাগিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু লাবণ্যের লেশমাত্র কোথাও নেই; মুখে একটা বিশ্রী দৃষ্টিকটু কঠোরতা সিংহাসন পেতে বিরাজ করছে। সে বেরিয়ে এসেই চীৎকার ক'রে উঠল—এই জেঠুয়া, আমার মুখ ধোবার জল কই রে হারামজাদা নচ্ছার পাজি?

ভৃত্য জেঠুয়া নম্রস্বরে বললে—জল তো রোজই রাখি, কিন্তু কাল আপনি লাথি মেরে বালতি ফেলে দিলেন। সেই ভয়ে আজ আর রাখিনি।

নৃত্যকালী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—ওরে আহাম্মক হতভাগা কোথাকার! কালকের জলে ময়লা ছিল বলে ফেলে দিয়েছিলাম। আজকে কি আমি মুখ ধুতে পুলিসের ইঁদারায় লোটা হাতে ক'রে যাব? না পুকুরে যাব? কি বলিস তোরা? ওরে বাপরে! একটা মানুষের পিছনে বাড়ী সুদ্ধ সবাই লাগলে সে কি সুস্থির থাকতে পারে?

নৃত্যকালীর কণ্ঠস্বর এত উচ্চগ্রামে চ'ড়ে গেল যে থানার আপিস-ঘর থেকে কবীন্দ্র দারোগা বাহির হয়ে এসে মিনতির স্বরে বললে—একটু আস্তে কথা বলো। ও ঘরে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এসেছেন।

নৃত্যকালী কণ্ঠস্বর তেমনি চড়া আর কর্কশ রেখে মুখ খিঁচিয়ে বললে—ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তোমার উপরওয়ালা, ও আমার কে যে ওকে রেয়াত ক'রে সমীহ ক'রে চলব? সবাই মিলে একটা মানুষের পিছনে লাগলে সে না চেঁচিয়ে কি করতে পারে বলতে পারো?

কবীন্দ্র হতাশ হয়ে বললে—কিচ্ছু না। সে আপিসে চ'লে গেল।

নৃত্যকালী মুখ ফিরিয়েই দেখলে রান্নাঘরের দরজার ডান দিকে একখানা শিল খাড়া দাঁড় করানো আছে, আর নোড়াটাও তার পাশে দাঁড় করানো আছে। এই দেখেই নৃত্যকালীর মেজাজ খেপে উঠল, সে চীৎকার ক'রে বললে—এখানে এমন ক'রে শিলনোড়া কে রেখেছে।

শুচিতা প্রচুর গালাগালি প্রত্যাশা ক'রে মলিনমুখে ভীত মৃদুস্বরে বললে—আমি রেখেছি মা। তুমিই তো রাখতে বলেছিলে।

নৃত্যকালীর চীৎকার গগনভেদী হয়ে উঠল। সে বললে আমি বলেছিলাম শতেকখোয়ারী নচ্ছার পাজি মেয়ে? সকাল বেলায় মিথ্যা কথা বললে মুখ খসে যাবে, মুখে পোকা পড়বে। আমি যাকে যা বলি তা ঠিক ঠিক ফলে তা জানিস। হবে না কেন? কেমন গর্ভের মেয়ে?

শুচিতার সুন্দর টুলটুলে মুখখানি অসহ্য বেদনায় কাতর ম্লান হয়ে উঠল। সে মৃদুস্বরে বললে—মা, আমার মাকে তো তুমি দেখোওনি, তাঁর সম্বন্ধে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু শোনোওনি। তিনি ম'রে স্বর্গে গেছেন—তাঁকে নিয়ে কেন টানাটানি ক'রে খোঁয়ার কর?

নৃত্যকালীর কাংসকণ্ঠ খনখন ক'রে উঠল—উঃ! স্বর্গে গেছেন না বৈকুণ্ঠে গেছেন। দেখগে যা নরকে গুয়ের হ্রদে হাবুডুবু খাচ্ছে।

শুচিতার দুই চোখ বেয়ে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে সেখান থেকে পালিয়ে এক ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকাল। সেখানে তার ছোট ভাই বোন দুটি ছিল। মেয়েটি দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—লক্ষ্মী দিদি, কেঁদো না। মা তো অমন শুধু শুধু সবাইকেই বকে।

নৃত্যকালী শিলখানাকে ধ'রে দরজার বাঁ দিকে দুম ক'রে শুইয়ে রাখল; নোড়াটাকে আছড়ে কাত ক'রে শিলের কোলে ফেলে দিলে।

মায়ের রণচাণ্ডী মারমুখো মূর্ত্তি দেখে ছেলে মেয়ে দুটি খাবার চাইতে আর সাহসই করলে না।

বাপ-মা নাম রেখেছিল কবীন্দ্র। বাস্তবিক তার মধ্যে বেশ ভালো রকমের কবিত্বশক্তি ও সাহিত্যরস বিধাতা সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে সে-সব চাপা প'ড়ে গেল, তাকে পুলিশের দারোগাগিরি নিতে হল। তার আগের স্ত্রী একটি ছেলে বীরেশ ও একটি মেয়ে শুচিতাকে রেখে মারা গেছে। তার পরে কবীন্দ্রের স্কন্ধে ভর করেছেন শ্রীশ্রীমতী নৃত্যকালী। কবীন্দ্রের পিতা মেয়েটির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বধূরূপে বরণ ক'রে তাকে বাড়ীতে এনেছিলেন। তারপর বছর না ফিরতেই নৃত্যকালী শ্বশুর শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি বাড়ীর সকলকে কথার বিষে এমন অতিষ্ঠ ক'রে তুললে যে তাঁরা কাশী পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কবীন্দ্রকে এখন মাসে মাসে খোরপোষ জোগাতে হয় আর তার জন্যে নৃত্যকালীর কাছ থেকে খুব বেশি রকমের কটু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এ বিধাতার শাস্তি। কবীন্দ্রের প্রথম স্ত্রী ছিল লক্ষ্মী। কিন্তু সে বেচারী ক্ষুধায় পায়নি অন্ন, রোগে পায়নি ঔষধ পথ্য। যুবতী মেয়ে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজসজ্জা করলে শাশুড়ি ননদ অকথ্য ভাষায় তার ভাবনকে ব্যঙ্গ করত। এই রকমে নিত্য নিরন্তর জ্বালাতন হয়ে সে বেচারী ম'রে বেঁচেছে।

কবীন্দ্রের ছেলে বীরেশ কতকগুলি যুবকের সর্দার হয়ে গোপনে বোমা তৈরি করছিল আর রিভলভার কার্টিজ সংগ্রহ করছিল। কবীন্দ্র খবর পেয়ে সমস্ত দল গেরেপ্তার ক'রে থানার হাজতে এনেছে। খবর শুনে শুচিতা কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বললে—বাবা, দাদাকেও তুমি জেলে দেবে?

কবীন্দ্র ব্যথিত স্বরে বললে—ভুলে যেও না মা, অন্য ছেলেরাও বোনেদের দাদা। আমার কর্ত্তব্য তো আমাকে পালন করতেই হবে মা।

বীরেশদের আট দশ বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

নৃত্যকালী শুনে খুসী হয়ে চীৎকার ক'রে কবীন্দ্র ও শুচিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল—খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে! ওরে বাবা! একটা আস্ত ডাকাত, এত দিন বাড়ীতে পোষা ছিল। কী ভাগ্যি যে খুন করে রাখেনি? হবে না? কেমন ঔরসে, কেমন গর্ভে ওদের জন্ম! হাড় দজ্জাল, হাড় পাজি!

শান্তিনিকেতনে আকাশতলে ছেলেমেয়েদের পাঠ-গ্রহণের দৃশ্য

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

শুচিতা অশ্রুজালের ভিতর দিয়ে কাতর দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকাল। কবীন্দ্র উদ্গত অশ্রু গোপন করবার জন্য তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কবীন্দ্র থানার আপিস থেকে দ্রুতপদে বাড়ীতে ঢুকেই প্রফুল্ল মুখে উৎসাহিত কণ্ঠে ডাকতে লাগল,—শুচি, শুচি!

শুচিতা "যাই বাবা" ব'লে সাড়া দিয়ে বাবা'র কাছে এল।

কবীন্দ্র হাসিমুখে বললে—শার্ঙ্গরব রাজবংশী আমাদের থানায় ইন্টার্নড্ হয়ে আসছেন।

শুচিতা উৎফুল্ল হয়ে বললে—তাই নাকি? তা বেশ হবে। যার কেবল নামই এতদিন শুনছিলাম, এখন তাঁকে দেখতে পাব, তাঁর কথা শুনতে পাব।

শার্ঙ্গরব রাজবংশী তরুণ বয়স্ক ছোক্‌রা। বিলাতে গিয়েছিল আই সি এস পরীক্ষা দিতে। সেখানে থাকতেই তার চিন্তাশীলতা আর সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ ইউরোপ আমেরিকা আর ভারতের সব কাগজে ছাপা হচ্ছিল, আর তার মতামত আলোচনা হচ্ছিল সব কাগজে ও সবার মুখে। সে পরীক্ষায় পাস ক'রে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে বাংলায় ফিরে এল। এসেই এক কৃষাণ মজুরদের সভায় গরম গরম বক্তৃতা ক'রে সকল শ্রোতার কাছ থেকে বাহবাসূচক হাততালি পেলে। কিন্তু সেই বক্তৃতায় পুলিস পেলে রাজদ্রোহের স্পষ্ট প্রকাশ। শার্ঙ্গরবের জেল হয়ে গেল দু বছর। যে লোক ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে দেশ শোষণ ও শাসন করতে পারত সে অবহেলায় সেই চাকরী লাথি মেরে ফেলে দিয়ে জেলে গেছে। এতে সে দেশের লোকের কাছে মার্টার হয়ে উঠল। শার্ঙ্গরবের যে দিন মুক্তি হবে সেদিন কংগ্রেসের লোক ও বহু যুবা মজুর কৃষাণ ফুলের মালা আর পতাকা নিয়ে জেলের গেটে অপেক্ষা করছিল। শার্ঙ্গরব বেরিয়ে আসতেই তাকে অর্ডিন্যান্সের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে রাজবন্দী করা হল। শার্ঙ্গরব ফুলের মালা গলায় হাসিভরা গর্বিত মুখে অন্তরীণে চল্ল। চারিদিকে জয় নিনাদ হ'তে লাগল—বন্দেমাতরম্! জয় শার্ঙ্গরব-বাবুকী জয়!

আজ শার্ঙ্গরব কবীন্দ্র দারোগার থানায় আসবে। অদম্য উৎসাহে আগ্রহে শুচিতা নদীর ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন নৌকা দেখা যাবে। নৌকা দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা যেমন যেমন দুলছিল, শুচিতার বুকও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গে দুলে দুলে উঠছিল। নৌকা এসে ঘাটে লাগল। ডাঙায় নাম্‌ল কবীন্দ্রের সঙ্গে শার্ঙ্গরব। কবীন্দ্র শুচিতাকে ঘাটে প্রতীক্ষমানা দেখে হাসিমুখে বললে—শুচি, এই ইনিই শার্ঙ্গরব-বাবু। শার্ঙ্গরব-বাবু, এই আমার মেয়ে শুচিতা।

পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো—স্নিগ্ধ মধুর কোমল। হাসিও বদল হলো—উজ্জ্বল। শার্ঙ্গরব নমস্কার ক'রে বললে—আপনাদের অতিথি হয়ে এলাম। এর পরে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে। আমার নাম শার্ঙ্গরব রাজবংশী, কিন্তু হয়েছি শার্ঙ্গরব রাজবন্দী।—এই ব'লে সে খোলা গলায় উচ্চরবে হেসে উঠল। শুচিতার বুক আনন্দে ও গর্বে ফুলে উঠল। উঃ! তার কী অসহ্য সৌভাগ্য! শার্ঙ্গরব রাজবংশী তার সঙ্গে কথা বলেছেন!

শুচিতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—শার্ঙ্গরব লম্বা চৌড়া জোয়ান। ফর্সা, সুশ্রী সুপুরুষ। হাঁ, পুরুষ বটে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শার্ঙ্গরবের সঙ্গে কবীন্দ্রের বাড়ীর সকলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়ে গেছে। শার্ঙ্গরব আগে প্রায় রোজই কবীন্দ্রের বাসায় আসত। রোজ আসে না কেন এর জন্য অনুযোগ ও তাগাদা শুচিতা শার্ঙ্গরবের দেখা পেলেই করেছে। তৎসত্ত্বেও সেই অনুরোধ পালিত না হলে কত মান অভিমান চোখের জলের লীলা ব'টে গেছে। ক্রমে শার্ঙ্গরবের রোজ আসাই নিয়ম হয়ে গেল। শার্ঙ্গরব এলেই দজ্জাল কর্কশকণ্ঠ নৃত্যকালীও কোমল হয়ে শুচিতাকে বলে—যাও, যাও, সার্ঙ্গ বাবুর সঙ্গে আলাপ করোগে।

শুচিতা কাজের ওজর করে বিলম্বে যাবে বললে নৃত্যকালী বলে—ও কাজ থাক, আমি করব। তুমি যাও।

শুচিতা অবিশ্বাস-ভরা বিস্মিত দৃষ্টিতে একমুহূর্ত্ত দয়াময়ী মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে চ'লে যেত। আর অমনি নৃত্যকালীর দুই ঠোঁটের আর চোখের কোণে নিতান্ত ক্রূর নিষ্ঠুর হাসি ধারালো ছুরীর ফলার মতন চকচক

করতে থাকত। যে নৃত্যকালী শুচিতাকে দিয়ে মাংস থেঁৎলে হাড় ছেঁচে কাজ করিয়ে নেয়, তার কী অসীম অসম্ভব দয়া! শুচিতা কোনো যুবকের সঙ্গে একটা কথা বললে নৃত্যকালী রায় বাঘিনীর মতন গাঁক গাঁক ক'রে তেড়ে আসে। আর এখন তার কী দরাজ করুণা।

কয়েক মাস কেটে গেল। একদিন কবীন্দ্র আর শুচিতা ঘরে আছে, নৃত্যকালী ঘরে এসে ঢুকল আর বাঁকা হাসিতে কঠোর মুখখানাকে কঠিনতর ক'রে বললে—ওগো! আতুড়-ঘর বাঁধো! নাতি হবে যে, সানাই বসাও!

কবীন্দ্রের মুখ দুঃখে অপমানে কালো হয়ে উঠল। সে ব্যথা-ভরা স্বরে বললে—দেখ, মেয়েকে নিয়ে বাপকে ব্যঙ্গ ক'রে অপমান করাটা যে কতখানি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা তা কি ভেবে দেখো নি?

নৃত্যকালী মুখ বাঁকিয়ে বললে—এর আবার নিষ্ঠুরতা হৃদয়হীন ব্যঙ্গ কোথায়? হয় নয় গুণবতী মেয়েকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখ না।

কবীন্দ্র বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টি ফিরিয়ে শুচিতার মুখের দিকে চাইলে। শুচিতার মুখখানি দরবিগলিত ধারায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। নৃত্যকালী কর্কশ শব্দে খলখল ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই হাসির শব্দ বজ্রধ্বনির মতন কবীন্দ্র ও শুচিতার মর্মে গিয়ে বিঁধল। কবীন্দ্র এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে কোমল মমতা-ভরা স্বরে বল্‌লে—তুমি অপাত্রে হৃদয় দাওনি। শার্ঙ্গরবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে তোমার সুখ-সৌভাগ্য হবে।

শুচিতা পিতার মমতার স্পর্শ পেয়েই তার কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চোখের জলে লজ্জা ধুয়ে ফেল্‌তে লাগল।

কবীন্দ্রের মনের মধ্যে কিন্তু একটা মস্ত "কিন্তু" ভয় দেখাচ্ছিল শার্ঙ্গরবের সঙ্গে বিয়ে হলে। কিন্তু যদি না হয়। হতভাগিনী কন্যাকে সে ত্যাগ করতে পারবে না, সে তো কোনো পাপ করেনি।

শার্ঙ্গরবের মুক্তির আদেশ এসেছে। সে কবীন্দ্রের বাড়ীতে বিদায় নিতে এসেছে। নৃত্যকালীর কাছে বিদায় চাইতেই সে বল্‌লে—যাচ্ছ যাও। ছেলে হলে খবর দেবো নেমন্তন্ন খেয়ে যেও।

নৃত্যকালী অট্টহাস্য করল। শার্ঙ্গরবও পাপিষ্ঠের মতন সেই হাসিতে যোগ দিলে।

শুচিতার কাছে বিদায় চাইতেই শুচিতা অশ্রুজালের ভিতর দিয়ে ব্যথাতুর দৃষ্টি শার্ঙ্গরবের মুখের উপর পাঠিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমার কি উপায় ক'রে যাচ্ছ?

শার্ঙ্গরব হেসে উঠে বল্‌লে—উপায় আবার কি? পুলিশের দারোগারা দেশের শত্রু। তার একটাকে অপমান ক'রে জব্দ করতে পেরেছি এই আমার পরম আনন্দ আর গৌরব।

শুচিতা সর্পাহতার মতন ছিট্‌কে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শুচিতার ছেলে হয়েছে একমাস হল। নিত্য নিরন্তর নৃত্যকালীর কুৎসিত অপমান সহ্য করতে না পেরে সে স্থির করলে যে আর একবার শার্ঙ্গরবের কাছে আত্মনিবেদন ক'রে দেখবে। সেখানে আশ্রয় না মেলে, সর্বাশ্রয় যমরাজ আছেন। সে খবরের কাগজে দেখছিল শার্ঙ্গরব তখন ঢাকায় আছে। একদিন গভীর রাত্রিতে গৃহত্যাগ ক'রে ঢাকায় এসে কংগ্রেস আপিস থেকে শার্ঙ্গরবের ঠিকানা সংগ্রহ করলে। শার্ঙ্গরব এবারও শুচিতার চোখের জলও কঠোর নির্মমতার সঙ্গে উপেক্ষা করলে। তখন শুচিতা নিরুপায় ও কাতর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে আমাদের খাওয়া-পরা চলবে কেমন ক'রে?

শার্ঙ্গরব নীচাশয় পাষণ্ডের মতন উত্তর দিলে—তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে। রাস্তায় দাঁড়ালে রোজগারের অভাব হবে না।

শুচিতার সমস্ত মন ধিক্কারে ভ'রে উঠল। সে নীরবে সেস্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। নিরুদ্দিষ্টভাবে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে সে গ্যাণ্ডারিয়ার বড় পুলের উপরে এসে উপস্থিত হলো। উঁচু থেকে নীচে জল দেখেই তার মনে হলো এই তো সর্ব গ্লানি থেকে মুক্তি শীতল কোল পেতে তাকে ডাকছে। অমনি সে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মরা তার কপালে ঘটল না,

পুলিশ তাকে জল থেকে টেনে তুললে। ছেলেটি মা'র বক্ষচ্যুত হয়ে কোথায় তলিয়ে গেছে, তার আর সন্ধান মিলল না।

আত্মহত্যা ও সন্তানহত্যার দায়ে শুচিতার ছ মাস জেল হলো। শুচিতা জেল থেকে বেরিয়ে এসে সেই জজের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলো যিনি তাকে জেল দিয়াছিলেন। শুচিতা বললে—আপনারা তো আমাকে মরতে দিলেন না। এখন দয়া ক'রে আমাকে কোথাও আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করুন।

জজের ঘরে অন্য এক ভদ্রলোক বসে ছিল। জজ তাকে বললেন—মার্তণ্ড, বিধবা আশ্রম, অবলা আশ্রম, উদ্ধার আশ্রম, কত কির সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে। কোথাও ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারো না।

মার্তণ্ড শুচিতাকে বললে—আমার সঙ্গে চলো। চেষ্টা ক'রে দেখি।

দুজনে মুখোমুখী ব'সে গাড়ীতে যেতে যেতে মার্তণ্ড মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুচিতার রূপ দেখছিল। সে বললে—দেখ, আমরা ব্রাহ্ম। আমাদের বাড়ীতে কেবল আমি আর আমার বুড়ো মা আছেন। আমাদের বাড়ীতে থাকতে তোমার যদি আপত্তি না হয়, তা হলে সেখানে থাকলেই তুমি সুখে আর নিরাপদে থাকবে।

শুচিতা আশ্রয় পেয়ে বর্তে গেল। সে আগ্রহভরে ব'লে উঠল—তা হলে তো আমি বেঁচে যাই। আমাকে আপনি পরিত্যাগ করবেন না।

শুচিতার দুই চোখের দৃষ্টি থেকে কৃতজ্ঞতা ক্ষরিত হয়ে মার্তণ্ডকে অভিষেক করিয়ে দিতে লাগল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুচিতা একদিন মার্তণ্ডের সঙ্গে কল্‌কাতায় জু গার্ডেনে বেড়াতে গেছে। সেখানে হঠাৎ শার্ঙ্গরবের সঙ্গে দেখা। শুচিতার আত্মহত্যার প্রয়াস সন্তানহত্যা আর জেল হওয়ার খবর পাওয়া অবধি শার্ঙ্গরবের মন আত্মগ্লানিতে আত্মধিক্কারে অনুশোচনায় পীড়িত হচ্ছিল। সে শুচিতাকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়ে হাসিমুখে শুচিতার হাত ধরতে গেল।

শুচিতা হাত সরিয়ে নিয়ে ক্রোধে চোখমুখ আরক্ত ক'রে বললে—কোথাকার ছোট লোক তুমি? তোমাকে আমি চিনি না, জানি না, তুমি কেমন ক'রে একজন ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দিতে সাহস পাও?

তারপর শুচিতা মার্তণ্ডের হাত ধরে বললে—এই দেখ আমার স্বামী। চলো আমরা বাঘের ঘরের দিকে যাই।

শার্ঙ্গরব অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে মার্তণ্ড আর শুচিতা দুজনের কাছেই নিজের দুষ্কর্মের জন্যে ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে স'রে পড়ল। শুচিতাকে আজ হারিয়ে তার সমস্ত অন্তর হায় হায় ক'রে আর্তনাদ করতে লাগল। শার্ঙ্গরব ব্যথিত হয়ে চ'লে যাচ্ছে দেখে শুচিতারও দৃষ্টি ব্যথিত ও করুণ হয়ে উঠল। শুচিতার দৃষ্টি দেখেই মার্তণ্ড বুঝতে পারলে এই শার্ঙ্গরব। সে শুচিতাকে বললে—তুমি একটু এগোও। আমি এক্ষণি আসছি।

শার্ঙ্গরব দ্রুতপদে হন হন ক'রে ফিরে চলেছিল। মার্তণ্ড তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে আপনার যথার্থ পরিচয় দিলে আর শার্ঙ্গরবের ঠিকানা নিয়ে নিজের ঠিকানা তাকে দিলে। মার্তণ্ড বললে—আপনি কাল আমাদের বাসায় যাবেন। তখন শুচিতার রাগ আর অভিমান প'ড়ে যাবে। শুচিতা এখনো আপনাকেই ভালোবাসে। আপনার ফটোতে ফুল দিয়ে নিত্য পূজা করে। আপনার কৃতকর্মের জন্য আপনি বাস্তবিকই যদি অনুতপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমি আপনাদের মিলন করিয়ে দেবো।

পরদিন শার্ঙ্গরব মার্তণ্ডের বাসায় এসেছে। মার্তণ্ড শুচিতাকে পূর্বে কিছু না ব'লে শার্ঙ্গরবকে একেবারে এনে হাজির ক'রে দিলে তার কাছে আর সে নিজে স'রে পড়ল। শুচিতা শার্ঙ্গরবকে দেখেই ক্রুদ্ধস্বরে উদ্ধত ফণিনীর মতন গর্জন ক'রে উঠল—তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! যাও, তুমি আমার দৃষ্টি থেকে বা'র হয়ে যাও। দূর হও! দূর হও!

শার্ঙ্গরব কাতর হয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করলে, ক্ষমা প্রার্থনা করলে। কিন্তু শুচিতার রাগ বেড়ে যায় বই কমে না। তার মুখে শুধু এক কঠোর কথা—দূর হও, তুমি দূর হও।

শার্ঙ্গরব আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারলে প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার বেদনা। সে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

শার্ঙ্গরবকে ম্লানমুখে ফিরে আসতে দেখে মার্তণ্ডের মন কি জানি কেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তথাপি সে শার্ঙ্গরবকে বললে—আপনি হতাশ হয়ে চ'লে যাবেন না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

মার্তণ্ড শুচিতার ঘরে এসে দেখলে সে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে বড় কান্নাটাই কাঁদছে। সে ভুল ক'রে ভাবলে শার্ঙ্গরব অপমান করাতে শুচিতা কাঁদছে। তার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। যে দিন থেকে শুচিতা তাকে স্বামী ব'লে নির্দ্দেশ করেছিল, সেইদিন থেকেই ক্ষীণ আশা সে বুকে পোষণ করছিল, আর বুকের পকেটে একখানি চিঠিতে বিবাহের প্রস্তাব লিখে সে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। মার্তণ্ড তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে মা'র কাছে গেল। বললে—মা, আমি শুচিতাকে বিবাহের প্রস্তাব করতে যাচ্ছি। তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ করো।

মা বললেন—তোদের মনস্কামনা সিদ্ধ হোক বাবা।

মার্তণ্ড প্রৌঢ় বয়সী হলেও এতদিন বিবাহ করেনি। আজ সে আশা আর আনন্দ নিয়ে শুচিতাকে পত্নীরূপে বরণ করতে চলল।

মার্তণ্ড ঘরে এসে ঢুকতেই তার সাড়া পেয়ে শুচিতা অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলে হতাশাকাতরস্বরে মার্তণ্ডকে জিজ্ঞাসা করলে—উনি কি চ'লে গেছেন?

মার্তণ্ড বললে—না। আমি তাকে এখনই নিয়ে আসছি।

মার্তণ্ড শার্ঙ্গরবকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে। তারপর সুখব্যথিত মুখে ফিরে যেতে যেতে সে আশীর্বাদ করতে লাগল—আহা! ভগবানের আশীর্বাদে ওরা সুখী হোক, সুখে থাকুক।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিহাস

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

হে সাকী ভাবিয়াছিনু পেয়ালায় তব
বসন্তের হেম প্রাতে নব বেশে সাজি
আকণ্ঠ করিব পান রাঙা সুরা নব
নব মন্ত্রে লয়ে' দীক্ষা শুভলগ্নে আজি।

একি পরিহাস তব, উৎসব প্রাতে
রঙীণ বসন পরি' লয়ে' নব বাণী
এসেছ পেয়ালা হাতে, নাহি ওগো তাতে
পিপাসার নব সুরা; পূর্ণ পাত্রখানি—

অতীতের স্মৃতি-রঙে, হেরি মাঝে তার
ব্যর্থ প্রেমিকার দুটি সজল নয়নে,
নিটোল কপোল-কূলে তীব্র বেদনার
মূর্চ্ছিত লালিমা আঁকা, উদাস বয়ান।

নূতন পেয়ালিটিতে দিলে তুমি মোরে
পুরাতন স্বপনের রাঙা মদ ভরে'।

মিশর-দেশে

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা উগাণ্ডা হইতে নীল-নদের বীচি-বিচঞ্চল বুকের উপর দিয়া সুদান হইয়া সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলা-স্থলী মিশর দেশে চলিয়াছি। আমাদের দৃষ্টিতে দুই দিকের দৃশ্যাবলী বিচিত্র বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। নীল-নদের নির্ম্মল নীরে তৃণাস্তীর্ণ তীরে কুম্ভীরকুল গম্ভীর ভাবে অবস্থান করিয়া অন্যান্য জল-জন্তুর অন্তরে শঙ্কার সঞ্চার করিতেছে। আমাদের অর্থাৎ বঙ্গবাসীর চক্ষুতে কুম্ভীর অপেক্ষা জলহস্তীগুলিই অধিক বিচিত্র বা বিস্ময়কর। আমরা যতই যাইতেছি যেন ততই জলহস্তীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে তীরবর্ত্তী বন-বক্ষ বিচরণরত স্থলহস্তীদলও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই হস্তী। বিস্ময়কর বিচিত্র ব্যাপার বটে। এক প্রকার জলচর হরিণ জল-সিক্ত জঙ্গলের বুকে মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছিল। কেহ যেন মনে না করেন এই সকল মৃগ জাতীয় জীব নদীর জলে বিচরণ করে। ইহারা জলা বা জলসিক্ত জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। নদী-তীরবর্ত্তী কাননকোলে নানা রকম হরিণ চকিত চক্ষুতে চারিদিকে চাহিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে।

আফ্রিকার অতি-আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্য পক্ষী-বৈচিত্র্য, ইহা আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়া থাকিব। আমরা উর্দ্ধস্থ আকাশে এবং তীরস্থ জঙ্গলে নানাপ্রকার মৎস্য-জীবী পক্ষী দেখিতে পাইলাম। স্থানে স্থানে স্বর্ণবর্ণ শীর্ষ-শালী এক রকম বক নীল-নীর-বাসী মীনদলের ধ্যানে লীন হইয়া নীরবে অবস্থান করিতেছে। বাজ, মাছ-রাঙ্গা, মৎস্য-জীবী ঈগল প্রভৃতি নানা জাতীয় বিহঙ্গম আমরা দেখিতে পাইলাম। কাহারও পক্ষ শ্যাম-সুন্দর কিন্তু বক্ষ বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট। কাহারও পক্ষ শোণিতসম লোহিত কিন্তু পৃষ্ঠদেশ শ্যামল। কাহারও পক্ষ নীলমণি-নিভ নীল। কাহারও কণ্ঠ পীত কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ সবুজ। পক্ষী, পুষ্প ও প্রজাপতি এই তিনটি পদার্থের মধ্যে যেরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য ও বর্ণ বিন্যাস কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তেমন আর প্রকৃতি-প্রসূত অপর কোন পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায় না।

নীল নদের এই সকল অংশে ষ্টীমার চালন তেমন সহজ ব্যাপার নহে। বহুপ্রকার অসুবিধা আছে। উচ্চ-বীচি-বিচঞ্চল জলরাশি কল-কল-নাদে অতি বেগে বহিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে জলস্রোত বিশেষ বক্র-গতিতে বা আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। ষ্টীমারের পক্ষে তীরস্থ মৃত্তিকা বা তলদেশের সহিত আহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

প্রাচীন মিশরের অন্যতম রাজধানী মেমফিজ-মহানগরে স্থাপিত দ্বিতীয় রামেসেসের শায়িত মূর্ত্তি

ষ্টীমারে এমন দুইজন সহযাত্রী আমরা পাইয়াছিলাম যাঁহাদের সংসর্গ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। দুইজনেই বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া অশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সমর্থ

হইয়াছেন। উভয়ের একজন এখনও ভারত ভ্রমণ করেন নাই, শীঘ্রই করিবেন বলিলেন। তিনি আমার নিকট ভারতবর্ষের কথা যতই শুনিতে লাগিলেন তাঁহার ভারতবর্ষ দর্শনাভিলাষ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে

মিশরের স্ফিনক্স (অদূরে পিরামিড)

একদিন আমাকে বলিলেন, তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন মিশর-দেশ দর্শনের অব্যবহিত পরেই ভারতাভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং তথায় পৌঁছিয়া হিমাদ্রি হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণপূর্ব্বক অধ্যাত্মপ্রধান সভ্যতার অভিনয়-ভূমি ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিবেন। তিনি পূর্ব্বে আরও দুইবার মিশরে আসিয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাক্ষেত্র পশ্চিম এশিয়াও দুইবার দেখিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ড ইঁহার জন্মস্থান কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকায় বাস করিয়া থাকেন। পর্য্যটন-প্রিয় অপর সহযাত্রীটি কিছুকাল ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় তিনি ভারতবাসীর সহিত মেলামেশা করেন নাই।

বিস্ময়ের বিষয় প্রথম সহযাত্রীটি ভারতে না আসিয়াও ভারত সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ-ভাব বা শ্রদ্ধা-বুদ্ধি পোষণ করিতেন দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিছুকাল এই দেশে বাস করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদের মনে হয় প্রথম ব্যক্তি ভারতবর্ষকে যে দৃষ্টিতে দেখেন সে দৃষ্টি দ্বিতীয় ব্যক্তির নাই। প্রথম ব্যক্তির নিকট ভারতবর্ষ উন্নততম আধ্যাত্মিকতার, সত্য-দ্রষ্টা ঋষিদের এবং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও যোগী অরবিন্দ প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের জন্মভূমি। দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ভারতভূমি বিজিত জাতির জননী—দুর্ব্বল ও দরিদ্রদিগের দেশ ছাড়া অন্য কিছু নহে।

থার্টুমের নিকটস্থ নীলনদের উপর সুদান সরকারী রেলপথের সেতু

সুদান-প্রদেশে নীল-নদের বীচি-বিচঞ্চল বিচিত্র বক্ষই গমনাগমনের প্রধান উপায় বা পথ। সরকারী কর্ম্মচারীরাও সর্ব্বদা এই জলপথেই যাওয়া আসা করেন। এই সকল কর্ম্মচারীর মুখে যাহা শুনিতাম তাহাতে বুঝা গেল এই দেশের জলবাতাস আদৌ স্বাস্থ্যকর নহে, পরন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানই অতিশয় অস্বাস্থ্যজনক।

উগাণ্ডা হইতে বাহির হইয়া সুদান-প্রদেশে পৌছিলে প্রথমেই জুবা নামক উল্লেখযোগ্য স্থানটিকে পাওয়া যায়। জুবার পর যেখানে ষ্টীমার থামিল আমরা নদী-তীরে দেশীয় নর-নারীকে বিস্ময় চকিত চক্ষুতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। এই প্রদেশের আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের অবস্থা উত্তর উগাণ্ডার অসভ্য আরণ্য জাতিদিগের অবস্থা অপেক্ষা কিছু উন্নত বলিয়া মনে হয়। উত্তর উগাণ্ডার অসভ্য জাতিদিগের পুরুষেরা পরিচ্ছদ পরিধান করে কিন্তু নারীগণ মাত্র কৌপীনবৎ ক্ষুদ্র চীরখণ্ডের দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ সুদানে ঠিক বিপরীত ব্যাপার আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এখানে নারীরা শরীরকে উপযুক্ত পরিচ্ছদের দ্বারা আচ্ছাদিত করে কিন্তু পুরুষরা একপ্রকার বিবস্ত্রই থাকে। ইহারা আবরণ বিহীন দেহকে মশকাদির দংশন হইতে বাঁচাইবার জন্য ভস্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। কৌপীনধারীতো বটেই, তাহার উপর ভস্মভূষিতাঙ্গ সুতরাং প্রত্যেক পুরুষ যেন এক একটি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

জুবার পর কোদক উল্লেখযোগ্য জায়গা। ইহার প্রাচীন নাম ফাশোদা। এখানকার আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থা আরও কিছু উন্নত। বিবস্ত্র বা কৌপীনধারী নর-নারী আর দেখা যায় না। কোষ্টি পৌছিবার পূর্ব্বে আমরা সংবাদ পাইলাম ষ্টীমার যাইবার উপযুক্ত জল নাই বলিয়া

কোষ্টি হইতে খার্টুম পর্য্যন্ত রেল-পথে যাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়া জানা গেল। জল ক্রমশঃ কমিয়াছে বলিয়া আমাদিগকে কোষ্টি পৌছিবার পূর্ব্বেই বড় ষ্টীমারটি ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট একটি ষ্টীমারে উঠিতে হইল। জল বিশেষ হ্রাস হওয়ার জন্য এই ছোট ষ্টীমারেও অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইল।

আবু-সিম্বেল
সম্মুখে গিরি-গাত্র উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত
দ্বিতীয় রামেসেসের প্রতিমূর্ত্তি

নদীর উভয় পার্শে আমরা আফ্রিকাসুলভ নানাপ্রকার পশু-পক্ষী দেখিতে পাইলাম। দলে দলে উষ্ট্র অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে যে চিরতৃষ্ণাতুর মহামরুস্থলী অদূরে অবস্থিত। কোষ্টি পৌছিবার পূর্ব্বে যে সকল দর্শনীয় দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে নীল-নদের বক্ষে বিস্তৃত "কোষ্টি রেলওয়ে সেতু" অন্যতম। এই সেতুর উপর দিয়া সুদানের সরকারী রেল-রাস্তার একটি শাখা এল-ওবিদ পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়াছে।

আমরা যে ট্রেনে আরোহণ করিব উহা এল-ওবিদ হইতেই আসিবে। এই অঞ্চল হইতে মহামরু সাহারা বিশেষ দূরে অবস্থিত নহে বলিয়া এখানে দিনে দুঃসহ গরম অনুভূত হয়। আমরা যখন কোষ্টিতে পৌছিলাম তখন দিবস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তবুও তীব্র তাপ অনুভূত হইতেছিল। উত্তপ্ত বাতাসকে মায়া-মরীচিকার আবাস স্থল চির অভিশপ্ত সাহারার হাহাকারভরা উষ্ণ নিশ্বাস বলিয়া মনে হইতেছিল। আমরা ট্রেনের আসার আশায় প্রতীক্ষাকাতর নয়নে অতি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছিলাম। যখন গিয়াছিলাম তখন এই ট্রেণ সপ্তাহে দুই দিন মাত্র যাওয়া আসা করিত। এই সকল ট্রেণে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারিটি শ্রেণী বিদ্যমান।

কোষ্টি হইতে খার্টুম যাইতে এক রাত্রি লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তথায় পৌছিলাম। অনেকেই জানেন খার্টুম সুদান প্রদেশের রাজধানী। কিন্তু ষ্টেশন গৃহটি এত ছোট যে দেখিলে মনে করা কঠিন হয় কোন রাজধানীতে উপনীত হইয়াছি। দুইটি অনাবৃত প্লাটফর্ম্ম এবং এদেশের সামান্য একটি ষ্টেশনের মত ক্ষুদ্রকায় ষ্টেশন-ভবন। কিন্তু ষ্টেশনের একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। এই বৈশিষ্ট্য অগণিত সিগনাল। ষ্টেশন-টিকে সিগনালের বন বলা চলে। যেখানে সমগ্র দিনে দুইটি বা তিনটি ট্রেণ গমনাগমন করে সেখানে এতগুলি সিগনাল অতি সতর্কতার কথাই প্রকাশিত করিতেছে।

ব্লু-নাইল বা নীল-নদের বাম-তীরে খার্টুম নগর দণ্ডায়মান। এই নগরের নিকটেই নীল নীলের সহিত শ্বেত নীল সম্মিলিত হইয়াছে। নীল নীলের পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ বাঁধের উপর দিয়া একটি সুদৃশ্য পথ প্রসারিত রহিয়াছে। এই রমণীয় রাস্তার পার্শ্বে রেল কর্ত্তৃপক্ষ পরিচালিত প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড পান্থ-নিবাস গ্রাণ্ড-হোটেল দণ্ডায়মান। এই পথের পার্শ্বে আরও দুইটি দর্শনীয় ভবন দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি

সেই প্রাসাদ যেখানে প্রসিদ্ধনামা সেনানায়ক গর্ডন হত হন। অপরটি গর্ডন মেমোরিয়াল কলেজ অর্থাৎ গর্ডন-স্মৃতি-বিদ্যামন্দির। যে গৃহে গর্ডন হত হন এখন তথায় সুদানের শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর বাস করিয়া থাকেন। অনেকগুলি প্রশস্ত পথ আমরা খার্টুম সহরে দেখিতে পাইলাম। একটি সুবিস্তৃত রাস্তা সুদানের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড সহর শ্বেত-নীল নদ তীরবর্ত্তী ওমদারমান পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই পথে ট্রামও চলিয়া থাকে। এই ট্রাম-পথ শ্বেত-নীলের উপর নির্ম্মিত বৃহৎ সেতুর সহায়তায় পরপারে গমন করিয়াছে।

অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য বিশেষ অসুবিধা হইলেও আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া খার্টুম সহরটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। গর্ডন যেখানে হত হন সেই বিখ্যাত ভবন আমরা দর্শন করিলাম। এখন ইহাই গভর্ণমেণ্ট হাউস। সেই স্মৃতি-ফলক দেখিলাম যাহাতে বীরবর গর্ডনের মৃত্যুর কথা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গর্ডন যে গোলাপ-গাছগুলি লাগাইয়াছিলেন প্রাসাদ-পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে এখনও তাহারা বিদ্যমান। প্রাসাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী চৌ-রাস্তায় উপনীত হইয়া আমরা উচ্চ বেদীবক্ষে বিরাজিত গর্ডনের অশ্বারোহী মূর্ত্তির গম্ভীর দৃশ্য সসম্ভ্রমে দর্শন করিলাম।

আমরা শ্বেত-নীল সেতুর সহায়তায় পার হইয়া দেশীয় সহর ওমদারমানে উপনীত হইলাম। প্রচুর খর্জ্জুর এখানকার বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। পার্শ্বস্থ মরুপ্রান্তর-পূর্ণ প্রদেশগুলিতে খর্জ্জুর-তরু ব্যতিরেকে অন্য কিছু জন্মে না বলিলেও চলিতে পারে। শস্য ও খর্জ্জুরের বাজার বিশেষ জনতাপূর্ণ। রৌপ্য-রচিত ও হস্তী-দন্তনির্ম্মিত নানারকম সুদৃশ্য জিনিষ আমরা ওমদারমানের বাজারে দেখিতে পাইলাম। ভূতপূর্ব্ব খলিফার বাস-গৃহ যাদুঘরে পরিণত হইয়া নিয়তির বিচিত্র লীলার বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

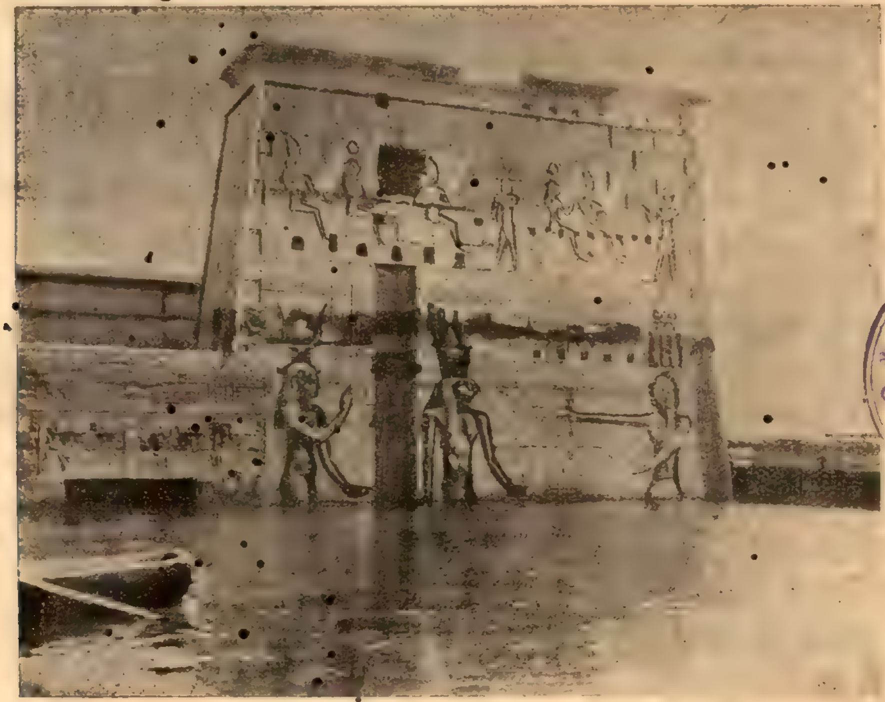

প্রাচীন মিশরের মন্দির—ফাইলে
(ইহা ফাইলের অংশতঃ জলমগ্ন মন্দিরত্রয়ের অন্যতম)

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বিচিত্র বস্তু এই গৃহে সংগৃহীত রহিয়াছে। খলিফার ব্যবহৃত অধিকাংশ পদার্থই এখানে রক্ষিত রহিয়াছে। গর্ডনের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিষও দেখা গেল।

এ দেশের অন্যান্য সহরের তুলনায় ওমদারমানকে বিশেষ বিশাল বলিতে হইবে। ইহার প্রত্যেক পার্শ্বই প্রায় সাত মাইল দীর্ঘ। আমরা এখানে বিচিত্র বেশধারী মরুচারী যাযাবর নর-নারীদিগকে দেখিতে পাইলাম। ইহারা ওমদারমানের বাজারে প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ কিনিবার জন্য আসিয়াছে। আমরা ওমদারমান হইতে খার্টুমে ফিরিবার সময় শ্বেত-নীল ও নীল-নীলকে পাশাপাশি প্রবাহিত হইতে দেখিলাম। বর্ণের বিভিন্নতা উভয়কে চিনাইয়া দিতেছে।

আমরা সুদানের সরকারী রেলপথে খার্টুম হইতে যাত্রা করিয়া ওয়াদি হালফার দিকে অগ্রসর হইলাম। ওয়াদি হালফা পৌঁছিতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগে। প্রসিদ্ধ-নামা লর্ড কিচিনার এই রেল রাস্তা প্রস্তুত করান। এই অঞ্চলে নীল-নদ প্রপাতাদিতে পূর্ণ বলিয়া জলযান যাইবার পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। লর্ড কিচিনার ১শত ৬৩ মাইল ব্যাপী রেলপথ নির্ম্মাণ করান। এই মরুপ্রান্তর-প্রধান প্রদেশে নগর ও গ্রাম নাই বলিয়া ষ্টেশন-গৃহগুলির গাত্র নামের পরিবর্ত্তে শুধু সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। সলিল-শূন্য প্রকৃত মরুভূমি আবু হামিদ নামক স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে এঞ্জিনের সহিত অতিরিক্ত একটি ট্যাঙ্ক বা জলাধার প্রদত্ত হইয়া থাকে। আবু আহম্মদ এবং ওয়াদি হালফার মধ্যে একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও জল পাওয়া যায় না।

আমরা ওয়াদি হালফায় পৌঁছিয়া পুনরায় বাষ্পীয় জলযানে আরোহণ করিলাম। এই জলযানগুলি সুদান সরকারী রেল-পথের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ষ্টীমারখানি সুপ্রাচীন সভ্যতার অভিনয়-ভূমি মিশর-দেশ-দর্শনার্থী যাত্রিদলে পরিপূর্ণ। আমেরিকান, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়ান ও ইংরেজ—এই পঞ্চ জাতির অন্তর্গত পর্য্যটক সংখ্যাই বেশী। সম্ভবতঃ আমেরিকান আরোহীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম অপূর্ব্ব নিদর্শন—দ্বিতীয় রামেসেসের বিচিত্র কীর্ত্তি, গিরি-গাত্র উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত মন্দিরাবলী দর্শনের জন্য আমরা আবু সিম্বেল নামক স্থানে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলাম। ইহারা

ফাইলের জলমগ্ন (অংশতঃ) মন্দিরত্রয়

নীল-নদের বাম তীরে বিরাজিত। বুঝিলাম এইবার আমরা বিশ্ব-বিস্ময় মিশরীয় সভ্যতার অভিনয়-ভূমির সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছি। প্রাচীন মিশরের শক্তিশালী সম্রাটগণ নিউবিয়া ও সুদানের অধিবাসিবৃন্দের অন্তরে শঙ্কা, সম্ভ্রম ও বিস্ময় সঞ্চারের জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন আবু সিম্বেলের ভাস্কর্য্য কীর্ত্তিগুলিকে তাহাদিগের অন্যতম বলা চলে।

অজন্তা ও ইলোরার আশ্চর্য্যজনক ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্য-ভূষিত গুহাগৃহগুলি যাহাদিগের সৃষ্টি, সেই ভারতবাসীর দৃষ্টিতে বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া বিবেচিত না হইলেও ইহারা প্রাচীন মিশরের শিল্প-শিল্পী সমূহের অসাধারণ অধ্যবসায়-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। গিরেট ও কঠিন বালুকা প্রস্তরকে কাটিয়া এই সকল সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মহান মূর্ত্তি রচনা করা হইয়াছে। একটি রাজার মন্দির, অপরটি রাণীর মন্দির বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজা অর্থাৎ দ্বিতীয় রামেসেসের স্মৃতি-মন্দিরটিই বৃহত্তর। এই মন্দিরের মুখে ও সমুচ্চ পার্শ্বে প্রস্তুত দ্বিতীয় রামেসেসের মহান মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ইহাদিগকেও গিরি-গাত্র ক্ষোদিত করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ৬৫ ফিট উচ্চ।

রাণীর স্মৃতি-মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দ্বিতীয় রামেসেস ইহা প্রিয়তমা পত্নী নেফেরতারীর স্মৃতিচিহ্নরূপে নির্ম্মাণ করান। এই মন্দির হাথর দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। রাণার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত ছয়টি ছোট ছোট মূর্ত্তি এই মন্দিরে দেখা যায়। উভয় মন্দিরেই অনেকগুলি করিয়া কক্ষ গিরি-বক্ষ খোদিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। গুহাগৃহগুলির প্রাচীর গাত্রে নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক বিচিত্র চিহ্ন ও চিত্র রচিত রহিয়াছে। আরোহী-দিগের পক্ষে এই সকল চিত্র-দর্শনের সুবিধার জন্য ষ্টীমার হইতে বিস্তৃত তাড়িত তারের সাহায্যে গুহাগৃহগুলিকে আলোকিত করার প্রশংসনীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে। এই বিরাট মূর্ত্তিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থিরভাবে বিরাজিত রহিয়া কালস্রোতের ধ্বংসকারিণী শক্তি ও বাহ্য প্রকৃতির প্রবল পরিবর্ত্তনপ্রবাহকে যেন পরিহাস করিতেছে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সভ্যতার অভিব্যক্তি ইহারা।

বিশ্ববিখ্যাত আস্যুয়ান বাঁধের অব্যবহিত উর্দ্ধাংশে অবস্থিত শেল্লাল নামক স্থানটিকে মিশরের সরকারী রেল-পথের শেষ সীমা বলা চলে। আবু-সিম্বেল হইতে জল-পথে যাত্রা করিয়া এই স্থানটিতে পৌছিতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা

লাক্সারে অবস্থিত প্রাচীন মন্দিরাবলীর ভগ্নাবশেষ

লাগে। স্বভাব-শোভার সমৃদ্ধ দুই দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সময় যেন সবেগে বহিয়া গেল। শস্যশ্যাম সমতল উপত্যকার দুই পার্শ্বে সমুচ্চ শৈল-শ্রেণী। সেই সবুজ উপত্যকার বুকের উপর দিয়া মিশর দেশের প্রাণ-স্বরূপ নীল-নদ আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নদী ঠিক পর্ব্বতমালার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে আমরা অম্বরচুম্বী তুঙ্গ-শৃঙ্গকে গম্ভীর মূর্ত্তিতে ঠিক মাথার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। মধ্যে মধ্যে শৈল-শীর্ষে প্রাচীন দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে।

আস্যুয়ান বাঁধের জন্য সেল্লালের নিকটে নীল নদ হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে। আমরা শেল্লালে পৌঁছিয়া একটি নৌকা ভাড়া করিয়া আস্যুয়ান বাঁধ ও ফাইলের মন্দির দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এই বাঁধ দেখিতে হইলে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে হয়. দর্শনকালে কোন বিপদ ঘটিলে সে জন্য আমরা নিজেই দায়ী, এ বিষয়ে বাঁধের কর্ত্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব নাই। বাঁধটি প্রায় এক মাইল ব্যাপী। বাঁধের শীর্ষ পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। স্লুস বা স্রোতোদ্বার দিয়া জল-যাওয়ার দৃশ্য অতি চমৎকার।

মেমননের মূর্ত্তিদ্বয়

(এই দুইটির একটি হইতে সূর্য্যোদয়ের সময় সঙ্গীতের স্বর সমুত্থিত হইত)

সন্ধ্যার সময় আমরা কোরস্কো নামক স্থানের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইলাম। খর্জ্জুরকুঞ্জ বেষ্টিত এই লোকালয়টি সুদক্ষ শিল্পি-অঙ্কিত চিত্রবৎ চিত্তাকর্ষক। পর্ব্বত পার্শ্বে অবস্থিত শুভ্রবর্ণ বাসগৃহ ও উপাসনা-গৃহগুলি আমাদের চক্ষুতে চমৎকার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। স্থানটি প্রাচীন। প্রাচীন কারাভানগুলি এই পথে নিউবিয়া ও লোহিত সাগরের দিকে গমন করিত। পাহাড়ের দ্বারা গতি প্রতিহত হওয়ার জন্য নীল নদ এই স্থানে দক্ষিণ দিকে বেঁকিয়াছে।

প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩০ লক্ষ গ্যালন জল যাইতেছে বলিয়া জানা গেল।

আমরা ফাইলের মন্দির আখ্যায় যাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছি উহারা অংশতঃ জলমগ্ন তিনটি প্রাচীন মন্দির। ঈশার আবির্ভাবের বহু কাল পূর্ব্বে ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদিগের গাত্রে কতিপয় বিচিত্র-দর্শন প্রাচীন চিত্র ও চিত্রাক্ষর বা হাইরোগ্লাফিক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই প্রাচীন মন্দিরত্রয়ের কোন কোন অংশ টোলোমি আখ্যায় অভিহিত (অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের) মিশর-

সম্রাটদিগের শাসন সময়ে নির্ম্মিত। আস্সুয়ান বাঁধই এই প্রাচীন মন্দিরগুলির অংশতঃ জলমগ্ন রহিবার কারণ। এই বাঁধ আরও উচ্চতর হইলে মন্দিরত্রয় অধিকতর জলমগ্ন হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানের প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রাচীনের প্রতি এই উপেক্ষা আমাদের অন্তরে এক প্রকার দুঃখ সঞ্চারিত করিল। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্যই এই বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা উচ্চতর হইলে আরও বহু সহস্র বিঘা ক্ষেত্র সলিলসিক্ত হইয়া প্রাণপ্রদ শস্য সম্ভারে সজ্জিত হইতে পারিবে। প্রাচীন কীর্ত্তিকে বাঁচাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের বাঁচিবার উপায়কে উপেক্ষা করিবে কে?

আমরা নীল নদ তীরবর্ত্তী মনোরম আস্সুয়ান উদ্যানাবলী দর্শনের পর রেল-পথে লাক্সর যাত্রা করিলাম। আমরা লাক্সরে পৌছিয়া সেখানকার একটি বিশ্রামাবাসে আশ্রয় লইলাম। য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সহযাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই উইন্টার প্যালেস হোটেলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহারা সর্ব্ব প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইবেন।

যেমন পাণ্ডার সাহায্যে আমরা তীর্থস্থানের দর্শনীয়গুলি দেখিয়া থাকি তেমনই মিশরীয় সভ্যতার বিস্ময়কর অবশেষ বা নিদর্শনগুলি দেখিতেও প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। আমরাও একজন প্রদর্শককে সঙ্গে লইলাম। প্রথমে লাক্সরে অবস্থিত মহান্ মন্দিরটি আমরা দর্শন করিলাম। পরে অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য কার্ণাক নামক স্থানে গমন করিয়া তথাকার দর্শনীয়গুলি দেখিলাম।

পরদিন জলযানযোগে নীল-নদ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রাচীন মিশরের অন্যতম রাজধানী থীবিস নগরের ধ্বংসাবশেষের ভিতর দিয়া সাম্রাজ্ঞীদিগের সমাধি মন্দিরসমূহ দর্শনের জন্য গমন করিলাম। পথে আমরা মেমননের বিশালকায় কলোসাই প্রভৃতি থীবিসের দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়া লইলাম। প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও এই বিশাল মূর্ত্তিদ্বয় বিস্ময় জাগাইয়া তুলে।

এক সময় এই থীবিস মহানগর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। রামেসিয়াম নাম-ধারী সমাধি-মন্দিরের মধ্যে কলোসাস আখ্যায় অভিহিত দ্বিতীয় রামেসেসের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত রহিয়াছে। আমরা আবু-সিম্বেলে গিরিগাত্র ক্ষোদিত করিয়া গড়িয়া তোলা যে মহান মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াছি তাহারাও এই দিগ্বিজয়ী শক্তিশালী সম্রাটের। মিশরের বিস্ময়কর বিশাল ভাস্কর্য্য সৃষ্টিগুলির অধিকাংশই ইঁহারই কীর্ত্তি।

দ্বিতীয় রামেসেস ঊনবিংশ বংশে সম্ভূত হন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১২৯২ হইতে ১২২৫ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। হিত্তাইতদের হাত হইতে ইনি প্যালেষ্টাইন প্রদেশকে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হন। সিরিয়ার রাজা ইঁহার সামন্ত বা করদ রাজায় পরিণত হন। মিশরের অতুলনীয় সভ্যতার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি ধ্বংসাবশেষসমূহের বক্ষে আমরা বার বার ইঁহার নাম উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। বিবান্-এল-মুলুক নামক স্থানে ইঁহার শব সমাহিত হইয়াছিল। শবের সহিত মহামূল্য রত্নাদি রক্ষিত রহিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশেষে অপহৃত হইবার ভয়ে প্রথম সেথসের সমাধি-বক্ষে দ্বিতীয় রামেসেসের শব রক্ষিত হয়। পরে উহাও নিরাপদ না বোধ হওয়াতে উহা প্রথম আমেনোফিসের সমাধি মন্দিরে নীত হয়। ইহার পর সম্রাটদিগের মামিসমূহকে বিভিন্ন সমাধি মন্দির হইতে আনিয়া দেইর-এল-বাহরি নামক স্থানের গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত রাখা হয়। দ্বিতীয় রামেসেসের মামি অবশেষে কায়রো নগরের যাদুঘরে স্থান লাভ করে।

ইংরেজী সাহিত্যে রামেসিয়াম ওজিম্যাণ্ডিয়াসের সমাধি নামে অভিহিত হইয়াছে। শেলীর কাব্যে আমরা এই নাম প্রাপ্ত হই। এই সমাধি-মন্দিরের অধিকাংশ না হোক অর্দ্ধাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বক্ষে আমরা হিত্তাইতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বহু দৃশ্য দেখিতে পাই।

এই সমাধি-ক্ষেত্রের দ্বিতীয় অঙ্গনে আমরা কৃষ্ণবর্ণ গ্রানিট-নির্ম্মিত দুইটি বিরাট মূর্ত্তি (ভগ্নাবস্থায়) দেখিতে পাই। ইহারাও রামেসেসের। ভগ্ন মূর্ত্তির কয়েকটি খণ্ড ভূতলে পতিত রহিয়াছে। মূর্ত্তির মস্তক এই খণ্ডগুলির অন্যতম। নাসিকা ছাড়া এই মুখের অন্যান্য অংশ অবিকৃত রহিয়াছে। যে আসনে মূর্ত্তিদ্বয় উপবিষ্ট, তাহাদের গাত্রে রাজার নাম ক্ষোদিত আছে। প্রথম অঙ্গনে স্থাপিত

প্রকাণ্ডতম প্রধান মূর্ত্তিটি অধিকতর বিকৃতি প্রাপ্ত এবং স্থান-চ্যুত ও ভূপতিত হইয়াছে। মূর্ত্তির আসনগাত্রে হাই-রোগ্নীফিক বা চিত্রাক্ষরে উৎকীর্ণ রামেসেসের নামটি অবিকৃত আছে। মূর্ত্তির বাহুর ঊর্দ্ধাংশেও নাম ক্ষোদিত আছে। মূর্ত্তির মুখ-মণ্ডল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস পাইয়াছে। বিশাল বক্ষ, বৃহৎ বাহুর ঊর্দ্ধাংশ, একটি পা এবং আরও দুই একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখনও বিদ্যমান যাহা আছে তাহার দ্বারাই উপলব্ধি হয় কিরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত এই মহান মূর্ত্তিকে ক্ষোদিত করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। দেখিলে অনুমান করা যায় এই মূর্ত্তির সমগ্রাংশের ওজন হাজার টন হইতে কম ছিল না। এই মূর্ত্তি উপবিষ্টাকারে নির্ম্মিত হইলেও ইহার উচ্চতা কিঞ্চিন্যূন ষাট ফিট বলিয়া অনুমিত হয়। গোলাপী বর্ণের গ্রানিট-প্রস্তরের দ্বারা এই প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

প্রচণ্ড আত্মাভিমানে মত্ত হইয়া এই বহু দেশ বিজয়ী শক্তিশালী সম্রাট ভাবিয়াছিল তাহার এই বিরাট বিগ্রহের সম্মুখে দর্শকদল নিজেদের ক্ষুদ্রতায় সঙ্কুচিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিবে।

রামেসিয়ামের দক্ষিণে—সামান্য (এক মাইলের কিছু কম) দূরে আরও দুইটি মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলেও ইহারা স্থাপিত হইবার দিনের মতই স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের মুখ-মণ্ডলই শোচনীয় বিকৃতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য অংশ বিশেষ কোন বিকার প্রাপ্ত হয় নাই। এই মূর্ত্তিদ্বয় দ্বিতীয় রামেসেসের নহে, তৃতীয় আমেনোফিসের। ইনি অষ্টাদশ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত সম্রাট। সম্রাটের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে এই মূর্ত্তিদ্বয় স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু এখন আমরা সেই সমাধির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইনা। পীতাভ বাদামীবর্ণ-বিশিষ্ট এক প্রকার বালুকা প্রস্তরের প্রকাণ্ড খণ্ডের দ্বারা এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় প্রস্তুত। ইহারাই মেমননের মূর্ত্তি নামে বিশ্ব-বিখ্যাত। এইরূপ খ্যাতির কারণ—রোমানগণ এই মূর্ত্তিদ্বয়কে ইয়স্ ও টিথনাসের পুত্র মেমননের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিত। মেমনন ট্রোজান বা ট্রয়ের যুদ্ধে নেষ্টর-নন্দন আণ্টিলোকাসকে নিধন করেন। পরে বীরবর আচিলিস মেমননকে বধ করেন।

দুইটি মূর্ত্তিই প্রায় সমান। প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির ওজন আটশত হইতে কম এবং হাজার টন হইতে অধিক হইবে না। দক্ষিণদিকের মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত অধিক অবিকৃত। এক একটি মূর্ত্তির উচ্চতা (পাদ-পীঠ সহ) প্রায় ৬৫ ফিট হইবে। মাথার মুকুট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উহা রহিলে উচ্চতা ৭০ ফিট হইত। উত্তরের মূর্ত্তিটিই সুবিখ্যাত সঙ্গীতকারী মেমনন। তৃতীয় আমেনোফিসের মূর্ত্তির বামে তাঁহার মাতা মেৎ-এম্-উয়ীর মূর্ত্তি বিরাজিত এবং দক্ষিণে তাঁহার পত্নী সাম্রাজ্ঞী তিয়ীর প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত। সম্রাটের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি মূর্ত্তি নির্ম্মিত ছিল, উহা ধ্বংস পাইয়াছে।

রোমানসাম্রাজ্যের সময়েই মূর্ত্তি হইতে সঙ্গীত সমুত্থিত হইবার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধনামা প্রাচীন ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো এই মূর্ত্তি হইতে সূর্য্যোদয় সময়ে সঙ্গীত সমুত্থিত হইবার সংবাদ দান করিয়াছেন। এই সঙ্গীত শুনিয়া সাধারণ জনগণের মনে বিশ্বাস জন্মিল মৃত মেমনন প্রস্তরের বুকে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া মমতাময়ী মাতা ইয়স্‌কে (উষা) সুমধুর ও সকরুণ সঙ্গীতের সহায়তায় অভিবাদন করিতেছেন। সেইজন্যই এই সঙ্গীত উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠে। পুত্রের এই সকরুণ সঙ্গীত শুনিয়া জননীর নেত্র হইতে উষার শিশিররূপ অশ্রুনীর ঝরিয়া পড়িয়াছে। কথিত আছে, কোন দিন সেই স্বর না শুনিলে, উষাদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করিতেন। বর্ত্তমান যুগের নর-নারী এই কাহিনীকে কল্পনা-প্রসূত মনে করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে সঙ্গীতব্য শব্দ নির্গত হইবার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দিবসে রবি-রশ্মির তীব্র তাপে এই প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির পরমাণুপুঞ্জ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। পরে রাত্রির অতি শীতল বাতাসে উহারা পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়াছে। পরমাণুপুঞ্জের এই প্রসার ও সঙ্কোচ বা সঙ্কোচ ও প্রসার হইতে এইরূপ শব্দ সম্ভূত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। হেতু যাহাই হউক রোম-সম্রাট সেপ্টিমাস সেভেরাসের সময় হইতে সঙ্গীতকারী মেমনন সম্পূর্ণ নীরব হইয়াছে।

একটি ব্যাপার দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। দর্শকদলের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির গাত্রে স্ব স্ব বিদ্যা জাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া চাঞ্চল্য ও চটুলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ সঙ্গীত-কারী মেমননের গাত্রেও বাক্য উৎকীর্ণ করিয়াছেন। কেহ যেন মনে না করেন এই সকল লেখা একান্ত আধুনিক, ইহাদিগের অধিকাংশই গ্রীক ও রোমান পর্য্যটকদিগের কার্য্য। কেহ কেহ সঙ্গীতকারী মেমননের পায়ের উপর কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন।

সাম্রাজ্ঞীদের সমাধি-মন্দির সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় রামেসেসের পত্নী নেফেরতারীর সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই সমাধি-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

লাক্সরের দর্শনীয় সমূহের মধ্যে সম্রাটদিগের সমাধি অন্যতম। একটি অনুর্ব্বর উষর উপত্যকার বক্ষে এই সমাধি ক্ষেত্র অবস্থিত উপত্যকার চারিদিকে বালুকা-প্রস্তরের পাহাড় খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা ৭ শত হইতে ৮ শত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই সমাধি-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সম্রাট তুতাঙ্খামনের সমাধি। বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত সমাধি কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক আমরা স্বর্ণমণ্ডিত সমাধি-ফলক ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত শবাধার দেখিতে পাইলাম। শবাধারটি মনুষ্যাকার। এই সমাধি-বক্ষে প্রাপ্য অন্যান্য মহামূল্য রত্নরাজি কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত রহিয়াছে। এই সকল বিস্ময়কর বিচিত্র-বস্তুর আবিষ্কারক মিঃ হাউয়ার্ড কার্টার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কেন এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ঐশ্বর্য্য তরুণ সম্রাট তুতাঙ্খামনের শবের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রত্ন-প্রেমিক পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সূর্য্যবাদ বা এটনবাদের প্রবর্ত্তক সম্রাট-দার্শনিক চতুর্থ আমেনোফিস বা আখেনেটনের পর সম্রাট তুতাঙ্খামন পুনরায় আমন-বাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। আমনের পুরোহিতগণ বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই পুরোহিতগণের প্রভাবে তুতাঙ্খামনের শবের সহিত এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ঐশ্বর্য্য রক্ষিত হইয়াছিল। তেল-এল-আমর্ণা নামক স্থানে চতুর্থ আমেনোফিসের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বংসা-বশেষের বক্ষে সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞী সুন্দরী-শিরোমণি নেফেরতেতীর প্রতিকৃতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহার পর আমরা লাক্সর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত দেন্দেরা নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের স্থাপত্য-কীর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দির দর্শন করিলাম। ঈশার আবির্ভাবের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে টোলেমি আখ্যাধারী মিশর সম্রাটদিগের সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। বিশ্ব-বিখ্যাত রাজ্ঞী ক্লীওপেট্রার শাসনকালে ইহার নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। এই মন্দির হাথর দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি চিত্রে ক্লিওপেট্রা তাঁহার পুত্র কাযেসাননকে আমন-রা নামক দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিতেছেন। এই মন্দিরের নিকটে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সুন্দর মন্দির দণ্ডায়মান। এই মন্দির অসিরিস ও আইসিসের পুত্র হোরাসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। হোরাসের বিচিত্র জীবন সম্বন্ধীয় কতিপয় চিত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। আইসিস বালক হোরাসকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—এই চিত্র যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে খৃষ্টীয় "ম্যাডোনা" বা মাতৃমূর্ত্তি তাহারই অভিব্যক্তি। আইসিসের ক্রোড়স্থ হোরাসকে দেখিয়া মাতা মেরীর ক্রোড়লগ্ন শিশু যিশুকে মনে পড়ে।

মিশরের দর্শনীয় সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বিচিত্রাকার স্ফিংক্স। প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড পিরামিড-গুলির নিকটেই ইহা অবস্থিত। এই বিস্ময়কর বিচিত্র মূর্ত্তির অন্তর্নিহিত রহস্যজাল আজিও ছিন্ন হইল না। সুদীর্ঘ পঞ্চ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই বিরাট মূর্ত্তি কালের কঠোর করাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া মিশরের প্রাণস্বরূপ নীলনদের বীচিবিচঞ্চল বক্ষের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বহু পরিমাণে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও ইহার বিস্ময়কর বিশালতা—ভৈরব গাম্ভীর্য্য ও ভ্রূকুটিকুটিল ভঙ্গী এখনও দর্শকদলের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব ভাবধারা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ। যে শৈল বা শিলাকে উৎকীর্ণ করিয়া এই অদ্ভুত মূর্ত্তিকে

গড়িয়া তোলা হইয়াছে সম্ভবতঃ উহা স্বভাবতঃই সিংহাকৃতি ছিল। পরে সম্রাট কেফরেণের সমাধি-মন্দির গীজের দ্বিতীয় পিরামিড প্রস্তুত করিবার কালে শিল্পিগণ সেই সিংহাকৃতি শিলাকে কাটিয়া এমন আকারে পরিণত করেন যাহার সহিত সম্রাট কেফরেণের মুখমণ্ডলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কেফরেণ চতুর্থ বংশের ফেরাও বা নৃপতি। পরে এই মূর্ত্তি সূর্য্যদেবের প্রতীকরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করে এবং ইহা হার্ম্মাচিস বা "দিগন্তক্রোড়ে হোরাস" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বালু-ধূসর উষর প্রান্তর-বক্ষে বিরাজিত বলিয়া বালুরাশি মূর্ত্তির নিম্নাংশকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। মধ্যে মধ্যে খনন করিয়া এই অংশকে বালুস্তূপ হইতে বাহির করিতে হইয়াছে।

অষ্টাদশ বংশীয় চতুর্থ থুৎমোসিসের দ্বারা এই খনন কার্য্য প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পরে টোলোমিদিগের শাসন সময়ে এবং রোমান আধিপত্যকালে এইরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির গাত্রে-উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক লিপি বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত এই সকল চেষ্টার কথা আমাদিগকে জানাইতেছে। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোন্মত্ত সেখদিগের দ্বারা সম্পাদিত কালাপাহাড়ী কাণ্ডের দ্বারা এই মূর্ত্তির বিশেষ অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। পরে মামেলিউক আখ্যায় অভিহিত পরবর্ত্তী দুর্দ্দান্ত শাসকগণের অত্যাচারেও ইহা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রথম খনন কার্য্য কাভিগলিয়া নামক ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিরাট ও বিকট মূর্ত্তির বক্ষস্থলের সম্মুখস্থ ও থাবাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র মন্দিরটি এই সময়েই আবিষ্কৃত হয়।

বর্ত্তমানে এই মহান মূর্ত্তির মস্তক বিশেষ বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, শ্মশ্রু এবং নাসিকা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং স্কন্ধদেশ ক্ষীণ হইয়াছে। যে লোহিতবর্ণ-রাগে মুখ-মণ্ডল রঞ্জিত ছিল তাহা প্রায়ই বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তবুও মুখমণ্ডলের অভিব্যক্ত ভীমভৈরব ভঙ্গী—ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ যে ভাবে আজিও পরিস্ফুট রহিয়াছে তাঁহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার তন্দ্রালস অন্ধকারে বসুন্ধরা আচ্ছন্ন হইল। সূর্য্যদেবের সর্ব্বশেষ রক্তিম রশ্মিরেখা দিগন্ত-কোলে মিলাইয়া গেল। আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের নীচে নীরবে উপবিষ্ট সেই রহস্য-ভরা ভৈরব-গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। চক্ষুর সম্মুখে চিত্রপটের মত প্রতীচ্য সভ্যতার সূতিকাগারস্বরূপ মিশরের সেই বিচিত্র ইতিহাস একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই করালকায় বিশাল মূর্ত্তির ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষ যাহা যুগের পর যুগ প্রত্যক্ষ করিয়াছে কত শক্তিশালী সাম্রাজ্য কালস্রোতে ফুটিয়া উঠিয়া কালস্রোতে ডুবিয়া গেল, কত প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশ জীবন-প্রবাহে জাগিয়া উঠিয়া মরণের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, কত প্রবল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ বিশাল বিশ্বের বুকে বহিয়া গেল কিন্তু এই মূর্ত্তি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফেরাও কেফরেনের সময়ে যেভাবে চাহিয়াছিল আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঠিক সেইভাবেই চাহিয়া রহিয়াছে। যে বিশ্বরহস্য মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে, শক্তি ও সামর্থ্যকে আজিও পরিহাস করিতেছে নিশাকাশের নিম্নে নীরবে অবস্থিত সেই অর্দ্ধ পশু বা অর্দ্ধ মানব অদ্ভুত মূর্ত্তিকে তাহারই প্রতীক বলিয়া মনে হইল। কবে এই রহস্যজাল ছিন্ন হইবে কে জানে?

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশু ও বাৎসল্য

শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী

সৃষ্টির আদিযুগে যখন মানব সভ্যতার কোনও বিকাশ হয় নাই মানুষ তখন কতকটা যাযাবর প্রকৃতির ছিল একথা বোধ হয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; প্রবৃত্তি দ্বারাই হইত তাহারা চালিত। পুরুষ ও নারীর সম্মিলনের সম্বন্ধ তখনও দূরীভূত হয় নাই। তারপর স্বয়ংক্রমে নারী সন্তান প্রসব করিল। পুরুষ ও নারী উভয়ের মনেই তখন এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল—যাহার প্রেরণায় তাহারা যাযাবর জীবন ছাড়িয়া একটি স্থায়ী নীড় গড়িয়া তুলিতে চাহিল—তাহাই বাৎসল্য।

ক্ষুদ্র অসহায় শিশু, একমাত্র ক্রন্দন ছাড়া তাহার অভাব অভিযোগ জানাইবার ক্ষমতা নাই। শীত তাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, উপযুক্ত আহারের দ্বারা ইহার পুষ্টি বিধান করিতে হইবে, ইহাই মানুষের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। ইহাকে উপলক্ষ করিয়াই গড়িয়া উঠিল মানুষের ক্ষুদ্র সংসার। তারপর ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের নানা অভাব অভিযোগ মিটাইতে গিয়া মানব সভ্যতা নানাভাবে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। যে বাৎসল্যরস একদিন মানুষকে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিল, তাহাই চিরকাল ধরিয়া মানব-হৃদয়কে সরস সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। ইহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ একদিন স্বয়ং ভগবানকেও পুত্ররূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছে—বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়া ভগবৎপ্রীতির ক্ষুধা মিটাইবার উদ্দেশ্যে। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের একটি প্রধান কথা ভগবানকে বাৎসল্য রসের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করা। এই ভাব মানব-অন্তরে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া সমস্ত শিশুর দিকেই সঞ্চারিত হইতেছে। অত্যন্ত কঠিনহৃদয় অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে শিশুর কাছে তাহার সমস্ত কাঠিন্য তরল হইয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে যে দুর্বৃত্ত দস্যু শত শত নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ফলস্বরূপ লৌহ কারাগারে হিংস্র পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইতেছে, হাতের কাছে মানুষ পাইলে যেন পশুরই মত ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না; তাহারই সম্মুখে যখন তাহার ক্ষুদ্র শিশু সন্তানকে উপস্থিত করা হইল তখন দেখা গেল যে সেই নররক্তপিপাসু দস্যু সেই মুহূর্তে তাহার রক্ত পিপাসা ভুলিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে উদ্দিপ্ত হইল। শিশুকে সে যখন চুম্বন করিল, তখন এক স্বর্গীয় ভাবে তাহার মুখ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের ভিতরে আমরা এমন একটা ভাব, সৌন্দর্য্য ও বাৎসল্যরসের পরিচয় পাই যে ঐ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মরু পর্ব্বতময় সুদূর আফগানিস্থান হইতে রহমৎ কাবুলিওয়ালা ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল বাংলার রাজধানী কলিকাতায়। কোথায় সেই প্রস্তরাকীর্ণ অনুর্ব্বর দেশ আফগানিস্থান, আর কোথায় শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক উর্ব্বর বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতা। কাবুলিওয়ালা তার চারি বৎসরের কন্যাকে দেশে রাখিয়া কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসিয়াছিল; সেখানে ছোট্ট একটি বাঙ্গালী মেয়ে মিনিকে দেখিয়া সেই বয়সেরই তাহার কন্যার কথা মনে করিয়া তাহার বাৎসল্য বুভুক্ষিত অন্তরের স্নেহ ধাবিত হইয়াছিল ঐ ছোট্ট মেয়েটির দিকে। তাহার স্নেহের সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তির কথা ভাবিয়া দেখিয়া ভুলিয়া যাইতে হয় যে একজন কাবুলিওয়ালা আর একজন বাঙ্গালী।

তখন জাতি, ধর্ম্ম ও দূরত্ব সব ভুলিয়া যাইতে হয়—কেবল একটা কথাই মনে হয় যে উভয়েই সন্তানের পিতা। কাবুলিওয়ালার এই স্নেহের উপর যে দিন একটু রূঢ়তার

আঘাত লাগিল, (অর্থাৎ মিনির পিতা খুকীকে উপহার দেওয়া মেওয়ার দাম তাহাকে দিতে চাহিলেন) সেই দিন তাহার মুখে যাহা প্রকাশ পাইল তাহা অতি করুণ, অতি সুন্দর। কাবুলিওয়ালা কহিল—

"বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোকীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমিত সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে তাহা মিনির পিতার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। দেখা গেল কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপর তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশু-হস্তটুকুর স্পর্শখানি তাঁহার বিরাট বিরহী-বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে। কাবুলিওলার এই কন্যাবিরহ বেদনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি করুণ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে স্বতই ফুটিয়া উঠে, তাহা পূজার ছুটি শেষে কর্ম্মোপলক্ষে পিতার দূরদেশে যাওয়া উপলক্ষ করিয়া ছোট্ট চারি বৎসরের কন্যার কথা—

"যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়।"

কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—সেই বেদনাও ফুটিয়া উঠিয়াছে চমৎকার।

"সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গম্ভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে' যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।"

জীবনের এই যে ট্রাজিডী তাহা পিতার চোখে যেন সমস্ত বিশ্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্য ভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে, বেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া দীর্ঘতর করি, অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশী।
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্র পীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়ন যুগল।
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।"

রবীন্দ্রনাথের "গোরার" আনন্দময়ীতে আমরা এক অপূর্ব্ব মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যরসের নির্ঝর দেখিতে পাই। যে বাৎসল্য- রসের নির্ঝর চারিদিক প্লাবিত করিয়া উর্ব্বর করিয়াছে তাহা আনন্দময়ীর গর্ভজাত সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া নহে। আনন্দময়ী নিঃসন্তান কিন্তু সন্তানহীনা এই নারীর সান্নিধ্য যাহারা লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই এই মাতৃহৃদয়ের পূত বারিধারায় স্নাত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পবিত্র হইয়াছে। আনন্দময়ীর হৃদয়ের বাৎসল্যরসের নির্ঝর ফুটিয়া বাহির হইয়াছে আয়রিশম্যানের ছেলে গোরাকে উপলক্ষ করিয়া। ঘটনাচক্রে গোরা ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রতিপালিত, কৃষ্ণদয়ালকেই সে পিতা ও আনন্দময়ীকে মাতা বলিয়া জানিত। এই গোরা যখন একদিন ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত আচার পালন না করার জন্য মাকে অনুযোগ করিল, তখন আনন্দময়ী বলিয়াছিলেন—

"ওরে অত করে আমাকে কি বোঝাচ্ছিস্! আমার মনে কি হয় সে আমি জানি! আমার স্বামী, আমার ছেলে,—আমাকে নিয়ে তাদের যদি পদে পদে কেবল বাধতে লাগল তবে আমার আর সুখ কি নিয়ে। কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েচি তা জানিস?

ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে একথা নিশ্চয় জেনেচি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।"

তারপর অন্যদিন আর একটি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আমরা দেখিতে পাই যে দিন গোরা তাঁর সত্যিকারের পরিচয় জানিতে পারিল। আনন্দময়ীর ভয় হইয়াছিল যদি গোরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়—কিন্তু গোরা সেইদিন উদাত্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তনে' বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়া মস্ত বড় একটি বিয়োগান্ত দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই।—

ভৃত্য রাইচরণের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া তাহার প্রভুর শিশুপুত্র পদ্মায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। স্নেহপ্রবণ ভৃত্য মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিল পুত্রশোকাতুর পিতামাতার হৃদয়ের ব্যথা। তারপর রাইচরণ দেশে চলিয়া গেল। বহুদিন পরে রাইচরণ আবার ফিরিয়া আসিল, আপন শিশুপুত্রটিকে সঙ্গে করিয়া। প্রভুপুত্রকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল এই কথা বলিয়া আপন পুত্রকেই প্রভুর কাছে সমর্পণ করিল। রাইচরণ আপন পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত এবং এত ভালবাসিত বলিয়া পিতৃমাতৃ হৃদয়ের ব্যথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে প্রভুর ঋণ শোধ করিল আপন হৃদয় ছিঁড়িয়া দিয়া। চলিয়া যাইবার সময় "রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। বাঁচিল কি মরিল কি হইল কেহ জানেনা। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।"

জীবনস্মৃতি পাঠে আমরা জানিতে পারি, কবির বিসর্জ্জন নাটকের সূত্রপাত হয় বাৎসল্য রসের ভিতর দিয়া। রবীন্দ্রনাথ একবার রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দেওঘরে যান (১২৯২°)। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়ীতে ভিড় ছিল; ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল, একটি গল্পের উপকরণের বিষয় ভাবিতেছিলেন। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, একি! এযে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় কন্যাবাৎসল্যে পিতার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কবি জাগিয়া উঠিলেন, মনে হইল এটি তাঁহার স্বপ্নলব্ধ গল্প। গল্পটির সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া "রাজর্ষি" গল্প লিখিত। পরে এই রাজর্ষির গল্পের অংশ লইয়া কবি তাঁহার অমর নাটক "বিসর্জ্জন" লেখেন। বিসর্জ্জন নাটকে দেখিতে পাই ভিখারিনী বালিকা অপর্ণার স্নেহচ্ছায়ে পালিত ক্ষুদ্র ছাগশিশুকে রাজপুরোহিত রঘুপতি দেবতার কাছে বলি দিলেন। অপর্ণা ছাগশিশুর খোঁজে আসিয়া মন্দির সোপানে রক্তচিহ্ন দেখিতে পাইল। ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য তাহার অন্তরের সহিত সমস্ত স্নেহ সমুদ্রোচ্ছ্বাসের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সকরুণ স্নেহবিগলিত মাতৃহৃদয় নিংড়াইয়া বাহির হইল—

"এই যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত? ওরে বাছনি আমার।
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারিদিকে ব্যাকুল নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এলনা?"

একটি অসহায় ছাগ শিশুকে উপলক্ষ করিয়া বাৎসল্য রসের কি সকরুণ উচ্ছ্বাস।

বালিকার স্নেহপূর্ণ সরল হৃদয়ের ব্যথা রাজার হৃদয় আকর্ষণ করিল, বালিকার দুঃখে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইল। ত্রিপুরা রাজ্যে জীবজননীর পূজাচ্ছলে জীবহত্যা নিষিদ্ধ হইল। ইহা হইতেই বিসর্জ্জন নাটকের সুরু।

এই রাজাদেশে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন; একরাত্রে রঘুপতি স্বপ্ন দেখিলেন যে জীবজননী জীবের রক্তাহুতি না পাইয়া অপরিতৃপ্ত, ক্রুদ্ধ। জননীর এই ক্রোধ উপশমিত হইবে রাজরক্তে—

"দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষরাত্রে!

* * *

তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।"

মোহাচ্ছন্ন মনের বিকৃত এই স্বপ্ন রঘুপতিকে বিচলিত করিয়া তুলিল। কি নিষ্ঠুর পরিহাস, তাহা না হইলে যিনি জগন্মাতা, সমস্ত বিশ্বের জননী, সমস্ত বাৎসল্য রসের আধার যিনি, সমস্ত বিশ্ববাসী যাঁহার সন্তান তিনি চান সন্তানের রক্তে পরিতৃপ্ত হইতে। রঘুপতি রাজ্যের প্রজাদের পর্য্যন্ত রাজাদেশের বিরুদ্ধে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিলেন; তাহারা রাজাদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। তখন গোবিন্দমাণিক্য যাহা বলিলেন তাহা কি মর্ম্মস্পর্শী—

"বুঝিতে পারনা। শিশু
দুদিনের, কিছু যে বোঝেনা আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে।—তোরা
এমন কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মা'কে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পারনা মাতা দয়াময়ী?
বুঝিতে পারনা জীব জননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে।
বুঝিতে পারনা—ভয় যেথা মা সেখানে।
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল। ওরে বৎস,
কি করিয়া দেখাব তোদের, কি বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কি কাতর দয়া,
কি ভৎর্সনা অভিমান ভরা ছল ছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতাম্ আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মার সিংহাসন হ'তে সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার।"

রাজার উক্তি প্রজাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। রঘুপতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে চলিল; মায়ের চরণে রাজরক্ত নিবেদন করিতে পারিলেন না। এদিকে রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহকে পিতার অকৃতকার্য্যতা জনিত মানসিক ব্যথায় অত্যন্ত পীড়িত করিয়া তুলিল। জয়সিংহকে রঘুপতি শিশুকাল হইতে মাতাপিতার স্নেহ দিয়া, প্রাণের অধিক ভালবাসা দিয়া মানুষ করিয়াছেন। এই জয়সিংহ পিতার মনোক্লেশ দূর করিতে চাহিল দেবীর চরণে আপন হৃদয়রক্ত নিবেদন করিয়া। এই উপলক্ষে একটা চরম ট্রাজিডীর ভিতর দিয়া পরে রঘুপতির মনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন, কাজেই তাঁহার ধমনীতে রাজরক্তের প্রবাহ ছিল। শ্রাবণের শেষরাত্রে জয়সিংহ আপন হৃদয়রক্ত মায়ের চরণে নিবেদন করিলেন। রঘুপতি এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ব্যাপার একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মত তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিল। একি নিষ্ঠুর ব্যাপার। সন্তানের রক্তে কি মায়ের তৃপ্তি হইবে? রঘুপতির মুখ হইতে তখন যাহা বাহির হইল তাহা একেবারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উত্থিত গভীর ক্রন্দন।—

"জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কি সর্ব্বনাশ করিলিরে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্ম্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী। জয়সিংহ, কুলিশ কঠিন।
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,

প্রাণাধিক, জীবন মন্থন করা ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাই; অহঙ্কার, অভিমান,
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!"

যাহাকে আবাল্য স্নেহে প্রাণাধিক পুত্রের ন্যায়, প্রিয়তম শিষ্যের ন্যায় বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সে নিজকে বলি দিয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। দুদিন আগে যে রঘুপতি রক্তমত্ততায় নৃত্য করিয়াছেন, রাজরক্ত দিয়া মায়ের তৃপ্তি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, আজ তাঁর একি পরিবর্ত্তন, একি দারুণ দুঃখে হৃদয় তাঁহার অভিভূত। কি তৃপ্তি হইল ইহাতে জননীর—সন্তানের রক্তে মায়ের তৃপ্তি একি সম্ভব?—তারপর, তারপর রঘুপতির চোখের সামনে জননীর কল্যাণ-ময়ী, স্নেহনির্ঝরিণী, বাৎসল্যসরস মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল—

'পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!"

এইখানে রবীন্দ্রনাথের অন্য একখানি নাটকের উল্লেখ করিতে চাই, সেখানি "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। তত্ত্বের দিক হইতে এই নাটকখানার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। রবীন্দ্র-নাথ স্বয়ং এই নাটকখানির বিষয়ে তাঁহার জীবনস্মৃতিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আবশ্যকীয় স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর উপরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"

আমি এইখানে বলিতে চাই যে অসহায় ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটির জন্য সন্ন্যাসীর হৃদয়ে যে বাৎসল্যরস সঞ্চিত হইল ইহাই হইয়াছিল তাঁহার অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পাথেয়স্বরূপ। "বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি কিন্তু সেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন।"

কড়ি ও কোমলের "কাঙ্গালিনী" শীর্ষক কবিতায় আমরা দেখিতে পাই ধনীর উৎসব-বাড়ীর দরজায় ম্লানমুখে দণ্ডায়মানা অসহায়া ছিন্নবস্ত্র পরিহীতা কাঙ্গালিনী বালিকার মূর্ত্তি কবির হৃদয়ে কি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কবি-হৃদয়ের সমস্ত বাৎসল্যরস যেন ঐ রকম স্নেহকাঙ্গাল বালক-বালিকাদিগের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তাই তিনি তাহা-দের পক্ষ হইতে সমস্ত মাতৃজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

কবির বহু কবিতায়, নাটকে ও গল্পে বাৎসল্য রসের এমন সুন্দর সমাবেশ রহিয়াছে যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নে কেবলমাত্র গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম।

কড়ি ও কোমলের—পাষাণী মা, হাসিরাশি, আকুল আহ্বান, মায়ের আহ্বান, আশীর্ব্বাদ।

সোনার তরীর—যেতে নাহি দিব।

চিত্রার—স্বর্গ হইতে বিদায়।

কথার—দেবতার গ্রাস, বিসর্জ্জন।

চৈতালীর—কর্ম্ম, পরিচয়, মিলনদৃশ্য, করুণা।

ছবি ও গানের "একাকিনী" প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এবং পলাতকার কোনও কোনও কবিতায় এবং গৃহ প্রবেশ নাটকের মাসী চরিত্রে বাৎসল্যরসের চমৎকার অভিব্যক্তি রহিয়াছে।

এইবার কবির শিশু নামক কাব্য গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। এই আলোচনার পূর্ব্বে একটু গোড়ার কথা বলিয়া নিলে ভাল হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী বিয়োগের (১৩০৯, ৭ই অগ্রহায়ণ) এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবীর মৃত্যু হয় (১৩১০, জ্যৈষ্ঠ)। এই কন্যাটিকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য তিনি আলমোড়া পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল শিশু পুত্র শমী; এই শমীন্দ্রনাথেরও মৃত্যু হয় ১৩১৪ সালে। পীড়িতা কন্যা ও মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী কবির কাছে পিতার ও মাতার উভয়ের স্নেহলাভ করিয়াছিল।

আলমোড়া পাহাড়ে অবস্থান কালে কবি "শিশু" নামক কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করেন। সেই সময়কার বাৎসল্যরস-পরিপূর্ণ অন্তর হইতেই "শিশু" গ্রন্থখানির সৃষ্টি হয়। নিজের কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা এই গ্রন্থখানিতে শিশু জীবনের আনন্দালোককে কবি এমন চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন যে বাংলা সাহিত্যে 'শিশু' অদ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে।

শিশু জন্মগ্রহণ করিল। মায়ের প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিত আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শিশুকে ঘিরিয়া তার অতীত ও ভবিষ্যতের কত কল্পনা জল্পনা মায়ের মনে জাগিতে লাগিল। ফুলের কুঁড়ির ন্যায় নির্ম্মল শিশু তাঁহার অন্তরে নন্দনের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে যেন এক নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। সব কিছুই নানাভাবে তাহার মনে কৌতূহল উদ্রেক করিতেছে। গতিশীল মানবমনের শত প্রশ্ন এখন হইতেই তাহার মনে উত্থিত হইতেছে। শিশু একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করে—

"এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

কোথা হইতে আসিয়াছি আমরা, কেন আসিয়াছি, আবার কোথায় যাইব এই প্রশ্ন আবহমানকাল হইতেই মানব মনে আসিতেছে। ইহার সমাধানের চেষ্টা যুগ যুগান্তর ধরিয়াই চলিয়াছে এবং ইহা হইতে কত চিন্তা, কত গবেষণ, কত দার্শনিক তথ্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মা কিন্তু সহজ সরলভাবে এই কথার উত্তর দিলেন, তাঁহার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা নিংড়ান কথায় তাহার জবাব দিলেন—

"ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গ'ড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।
* * * *
সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি।"

মায়ের সমস্ত অন্তরের ভিতরে এই শিশু ছড়াইয়াছিল, বিশ্বের সমস্ত আনন্দের উৎস যেন ঐ শিশুতে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে আমি বৈষ্ণব মাধুর্য্যতত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা ভগবানকে বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়া দেখেন, তাঁহাদের সেই মাধুর্য্যরসের স্রোত ইহাতে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত।

এ হেন শিশুকে নিয়া আবার মায়ের মনে সর্ব্বদাই কখন হারাই কখন হারাই এই ভয়—

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।

জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখবো বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু-দুটির আড়ালে।"

খোকাকে নিয়া মায়ের, মাকে নিয়া খোকার কল্পনা জল্পনার অন্ত নাই। সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় মায়ের হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে—

মা বলেন—

"আমার খোকা কার গো যদি মনে
এখনি উড়ে' পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায়না সে কি সাধে ?
মায়ের বুকে মাথাটি থুয়ে
সে ভালবাসে থাকিতে শুয়ে,
মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরাণ তার কাঁদে!"

"কেন মধুর" শীর্ষক কবিতাটি পড়িলে মন এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে ভরিয়া উঠে। কল্পনার রঙ্গে সৃষ্টি-মাধুর্য্য সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার ভিতর দিয়া যেন অনন্তের সুর ধ্বনিত হইতেছে।—

"রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।
গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝিরে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে।"

মাতা ও শিশুকে উপলক্ষ করিয়া প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কত কবি কত শিল্পী যে কত ভাবে কত কাহিনী বর্ণিত ও অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কবি ও শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে ইহা পবিত্রতম। রবীন্দ্রনাথের অমর তুলিকায় বাৎসল্যরস ও শিশুমনস্তত্বের যে রূপ মূর্ত্ত হইয়াছে তাহা রূপে রসে ভাবে এত অনবদ্য যে রসপিপাসু মানবমাত্রেই চিরকাল তাহার নির্ম্মল রস পান করিয়া অপার আনন্দ ও শান্তি লাভ করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

মুক্তি-সাধক বঙ্কিম

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

সঞ্জীবন মন্ত্র তব মুক্তির সঙ্গীত
আত্মভোলা বাঙ্গালীরে কি দিল ইঙ্গিত,
রক্তে তার মেতে ওঠে কি নব চেতনা !—
মৃত্তিকার বক্ষে শোনে মায়ের বেদনা।

যোগায়েছে প্রাণরস যাঁরি বক্ষতল
শূন্য করি আপনার সকল সম্বল,
চিত্ত-বিত্ত-দেহ-গেহ স'পি তাঁরি পায়ে
শিখেছে বাঙ্গালী তব পূজিতে সে মায়ে।

স্বপ্নে তব ফুটেছিল যত সম্ভাবনা
সত্য করে তুলিল তা' জাতির সাধনা।
সপ্তকোটি মিলি আজ ডাকে জননীরে,
মায়েরি প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মন্দিরে।
তারি সাথে কালজয়ী হে মহামানব
নিভৃতে ধ্বনিয়া ওঠে তব জয়রব।

শেষ সাধ

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

কাছে এসো মোর লীলা-চঞ্চলা ভীরু কৌমুদী সমা,
সারা-জীবনের মূর্ত্তস্বপন, কাছে এসো নিরুপমা।
লজ্জা কি প্রিয়া ? আজি যে মোদের মিলন-বাসর লগ্ন,
দূরে চেয়ে দেখ জ্যোৎস্নার প্রেমে সকল ধরণী মগ্ন।
কাছে এসো রাণী, কানে কানে বলি আমার হিয়ার আশা,
দিবসে সবার কোলাহলে তারা পায়নাকো কোন ভাষা,—
সাধ জাগে মোর, আজি রজনীতে সকল ভুলিয়া যবে
তোমার ব্যাকুল তৃষিত হৃদয় চকিত চপল হবে
জীবনেরে পান করিয়া তখন পূর্ণ বাসনা মম,
সাধ জাগে প্রিয়া ঘুমায়ে পড়িতে শেষ রজনীর সম।

খোলা দরজা

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে আসিয়া কহিল—"পিসিমার আসতে একটু দেরী হবে মিঃ দে। এসময়টুকু আপনাকে আমার সঙ্গেই গল্প করে কাটাতে হবে।"

তরুণী মহিলার এই নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা দিতে গিয়া পাছে অনাগতা পিসিমাতার সম্মানের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে, তাই, সুখেন্দু কোনও কথা না কহিয়া নীরবে একটু হাসিল মাত্র।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—

"এখানকার আর কারো সাথে আপনার জানাশোনা আছে নাকি ?"

"জনপ্রাণীর সাথেও না। বছর পাঁচেক আগে আমার দিদি এখানে ছিলেন; তিনিই কয়েকজনের নামে পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন।" শেষের কথা কয়েকটি বলিতে গিয়া সুখেন্দুর চোখে মুখে একটা বিষন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। একান্ত অপরিচিত গৃহে এইরূপ পরিচয়ের পালা গাহিয়া ক্লান্ত মনকে সে যে এতটুকু বিশ্রাম দিতে পারিবে সে বিষয়ে মনে মনে তাহার বিশেষ সন্দেহ ছিল।

এখানে আসিবার আগে তাহার দিদি বলিয়াছিলেন, "ওখানে তোমার যা অবস্থা হবে তা আমি বেশ জানি। দুদণ্ড কথা কইবার মতন একজন পরিচিত লোকও সেখানে পাবে না। সারাটা দিন একলা একলা ঘুরে তোমার মনের অবসাদ তো যাবেই না বরঞ্চ মন আরও ভারী হয়ে উঠবে। তার চেয়ে আমি কখানা চিঠি লিখে দিই তোমার হাতে আমার পরিচিত কয়েকজনের নামে। তাদের সাথে জানাশোনা করে' নিলে তোমার দিনগুলো বেশ কেটে যাবে। দেখবে এঁদের ভিতর দু'চারজন আবার কত ভালো!"

এই মিসেস সিংহ সেই কত 'ভালো'দের মধ্যে একজন কিনা সুখেন্দু মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর কিশোরী কথা কহিল।

"তাহ'লে আমার পিসিমার সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না ?"

"শুধু ওঁর নাম আর বাড়ীর ঠিকানা।" প্রকৃত পক্ষে মিসেস চৌধুরী সধবা কি বিধবা সে সম্বন্ধে কোনও মীমাংসাই সুখেন্দু এখনও পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে, কি জানি কেন, গৃহের সাজসজ্জা ও আসবাব পত্রে কোনও অপরিচিত পুরুষের অস্তিত্বের ছাপ সে স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিতেছিল।

"তাঁর জীবনে একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বছর চারেক আগে আপনার দিদি চলে যাবার ঠিক পরেই।" কথা শেষ করিবার সাথে সাথেই কিশোরীর সমস্ত বক্ষঃ কাঁপাইয়া এক প্রবল দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

"দুর্ঘটনা ?" এই পরম শান্তিপূর্ণ স্থানটিতে যে কোনও দুর্ঘটনা কখনও ঘটিতে পারে সে কল্পনাও সুখেন্দুর কাছে অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

"এই পৌষ মাসের সন্ধ্যাবেলাতেও ওই দরজাটা শুধু শুধু কেন খুলে রাখা হয়েছে জানেন ?" কিশোরীর নির্দ্দিষ্ট দরজার ভিতর দিয়া সুখেন্দু বাহিরের উন্মুক্ত মাঠের কিয়দংশ বেশ পরিষ্কার রূপেই দেখিতে পাইল। সে একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল—

"পৌষ মাস হলেও ঠাণ্ডা এখনও তেমন পড়েনি। তবে যে দুর্ঘটনার কথা বলছিলেন—"

সুখেন্দুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিশোরী বলিল—'সেই কথাই বলছি।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু দুইটী

যেন কি এক বেদনার স্মৃতিতে অত্যন্ত ম্লান হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল—

"আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে একদিন সন্ধ্যা বেলায় ও'র স্বামী অর্থাৎ আমার পিসেমশাই, তাঁর পোষা কুকুরটিকে সাথে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ঐ দরজা দিয়ে কিন্তু আর ফিরে আসেন নি। সবাই সন্দেহ করেছিলেন যে মাঠের ওপারের নদী পার হ'তে গিয়ে হয়ত তিনি ও তাঁর কুকুর দু'জনেই চোরা বালিতে আটকা পড়ে গেছেন। জানেন তো, এদিককার নদীতে বর্ষাকালে ছাড়া অন্য সময়ে জল খুব কমই থাকে, সেই সময় নীচেকার বালি বেরিয়ে পড়ে। আর এই বালি জায়গায় জায়গায় এত সাংঘাতিক যে কেউ একবার এর ভিতরে পড়লে তার জীবন্ত সমাধি নিশ্চিত। তবে, সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, অনেক খোঁজাখুজি করেও তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।"

সুখেন্দুর মনে হইল কিশোরীর কণ্ঠ যেন কি এক নিদারুণ বেদনার স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

"পিসিমার কিন্তু ধারণা যে তাঁর স্বামী তাঁর ছোট্ট কুকুরটিকে সাথে নিয়ে একদিন ওই দরজা দিয়েই ফিরে আসবেন। তাই দরজাটাকে রোজ সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত খুলে রাখা হয়। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না— অনেকদিন সন্ধ্যেবেলায় এখানে একলা বসে থেকে থেকে আমারও মনে হয় সত্যি সত্যিই পিসেমশাই একদিন তাঁর কুকুরটিকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকবেন—ওই দরজা দিয়েই।

তাহার কণ্ঠ যেন এক অজ্ঞাত ভয়ের আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার সমস্ত শরীর যেন বারেক প্রবল বেগে কাঁপিয়া উঠিল। সুখেন্দুও একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; সেও তাহার দেহের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করিতে লাগিল। হঠাৎ এই সময়ে মিসেস সিংহ আসিয়া পড়াতে সে একটু আশ্বস্ত অনুভব করিল।

বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া মিসেস সিংহ বলিলেন "হাসির সাথে গল্প করছিলেন বুঝি?"

সুখেন্দু সলজ্জ হাসিয়া বলিল—

"অনেক মজার গল্প শুনছিলাম ওঁর কাছে।"

হঠাৎ মিসেস সিংহ কহিলেন—"ওদিকের ঐ দরজাটা খোলা থাকায় আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমার স্বামী বেড়াতে বেরিয়েছেন, তিনি ঐ পথেই ফিরবেন কিনা তাই দরজাটা খুলে রাখা হয়েছে। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঘরের আলোটা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত যায়—বাইরে যা অন্ধকার হয়ে আসছে!"

এখানকার দর্শনযোগ্যস্থান, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য প্রভৃতি লইয়া মিসেস সিংহ অনর্গল বকিয়া চলিলেন। সুখেন্দু লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে তাহার সহিত কথা কহিতে থাকিলেও মিসেস সিংহের দুটি চোখ পড়িয়াছিল সেই খোলা দরজার দিকেই। সে একটা দারুণ অসাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। সকালে না আসিয়া সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিবার দুর্ব্বুদ্ধি যে তাহার কেন হইয়াছিল সুখেন্দু মনে মনে তাহাই অনুশোচনা করিতে লাগিল।

সদ্য পরিচিত তাহার অসুস্থতার বিবরণ যে মিসেস সিংহের কাছে খুব প্রীতিকর হইবে না তাহা বুঝিতে পারিলেও, শুধু এই আলোচনার ধারা ফিরাইবার জন্য সে বলিল,—"ডাক্তারদের পরামর্শেই আমি এখানে এসেছি। কিছুদিনের জন্যে আমার যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার এ বিষয়ে তাঁহারা সবাই একমত;—কিন্তু, পথ্য বিষয়ে তাঁদের মত একেবারেই বিভিন্ন।

"কি আশ্চর্য্য!"

উৎসাহের ভাব প্রকাশ করিলেও মিসেস্ সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া সুখেন্দু সহজেই বুঝিতে পারিল যে তাঁহার এ সৌজন্য মৌখিক। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে পাছে পুরাতন প্রসঙ্গ আবার ফিরিয়া আসে এই ভয়ে সে নিজের কথাই অনর্গল বকিয়া চলিল। হঠাৎ মিসেস সিংহ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—তাঁহার মুখে চোখে একটা আনন্দের ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

"ঐ যে উনি এসেছেন।"

সুখেন্দুর বুকখানা সবেগে কাঁপিয়া উঠিল। কিশোরী মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল এক বিস্ময়মিশ্রিত

ভীত দৃষ্টি তাহার দুই চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুখেন্দুর অজ্ঞাতে তাহার সমস্ত দেহ যেন একটা হীমশীতল পাথরের স্তূপে পরিণত হইয়া গেল। তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করিয়া তাহার দুই চোখের দৃষ্টি সেই খোলা দরজার দিকে ঘুরাইয়া দিল। বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের ভিতরেও সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল একটি দীর্ঘকায় পুরুষমূর্ত্তি গম্ভীর পদক্ষেপে তাহাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

"জিম্, জিম্, আয়!"

সুখেন্দু কম্পিত হস্তে চেয়ারের দুটি হাতল শক্ত করিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর—চলন্ত রেলগাড়ীতে বসিলে দুই পাশের মাঠ, বন, বাড়ীঘর যেমন ছায়ার মতন আরোহীর চক্ষে অতি দ্রুত মিলাইয়া যায়, তেমনি করিয়া—সামনের দরজা, লাল কাঁকরের পথ আর বাইরেকার ফটক ছায়াবাজীর মত কোথা দিয়া সুখেন্দুর চক্ষে একে একে মিলাইয়া গেল। তাহার সহিত ধাক্কা বাঁচাইতে গিয়া একজন সাইকেল-আরোহী রাস্তার বিপরীত দিকের বেড়ার গায়ে ছিটকাইয়া পড়িল।

পুরুষমূর্ত্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—

"বড্ড দূরে গিয়ে পড়েছিলাম বলে ফিরতে আজ একটু দেরী হয়ে গেল। ভাল কথা, কাকে যেন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলাম?"

মিসেস্ সিংহ হাসিয়া উঠিলেন।

"একটি ভদ্রলোক—এখানে যে মিসেস বোস্ ছিলেন, তাঁর ভাই। বেড়াতে এসেছেন এখানে। লোকটি শুধু নিজের অসুখের কথা নিয়েই ব্যস্ত। তার উপর, তুমি আসার সাথে সাথেই—কি জানি কেন—একটা কথা পর্য্যন্ত না বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাথার গণ্ডগোল আছে বোধ হয়!"

"তাই হবে!" মিঃ সিংহ হাসিয়া উত্তর করিলেন।

কিশোরী গম্ভীরভাবে কহিল—

"আমার কিন্তু, মনে হয় পিসিমা, ভদ্রলোক জিম্‌কে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কুকুরকে নাকি উনি ভীষণ ভয় করেন। আমায় গল্প বলছিলেন যে জামালপুরে থাকতে একবার উনি পাহাড়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একদল কুকুর নাকি ওঁকে তাড়া করে। ভদ্রলোক প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে একটু দূরের একটা কবরখানার মধ্যে ঢুকে পড়েন। সৌভাগ্য ক্রমে, সামনেই উনি একটা নতুন খোঁড়া কবর দেখতে পেয়ে তার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেন। কুকুরগুলো নাকি সমস্ত রাত্রি ধরে ওপরে বসে চীৎকার করেছিল। আচ্ছা পিসেমশাই, এ অবস্থাতে মানুষ অনেক সময় পাগল হয়ে যেতে পারে, না?"

অতি অল্প সময়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী সৃষ্টি করাই কিশোরী হাসির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব! *

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

* একটি ইংরাজী গল্পের অনুসরণে

STUDENTS' P. G. A COMMON-ROOM

তাহাদের ইতিহাস

শ্রীহাসিরাশি দেবী

নীল নভোতলে দলে দলে চলে বনবলাকার দল,
চলে কোন্ দূর দেশে
কোন সীমানার শেষে,
কোন মানসের তীর অন্বেষি' উদ্বেগ-চঞ্চল!

কত প্রভাতের তরুণ অরুনিমায়,
কোমল-করুণ মেঘ-নীল সন্ধ্যায়,
সাত-রঙা রবি রামধনু রঙে যত কথা গেল লিখে
ওদের এ চলা-পথের দিগ্বিদিকে,
সে কত হাসিতে—কত আঁখিজলমাখা।
আজ ভাবি যদি ভুল ক'রে পিছু ডাকা
রচি বাহুডোর যতনে ওদের বাঁধিয়া রাখিতে চায়,
ওরা ফিরিবে না আর,
বহিতে দুঃখ-ভার,
এ যাওয়ার ব্যথা ধীরে মুছে যাবে
নিঃসীম নীলিমায়॥

যারা যায়, তারা ফিরিবেনা আর জেনে যায় মনে মনে;
তবু সেই পদরেখা
হেথা র'য়ে যায় লেখা,
এ মরু-মাঝারে বাতাস ব্যাকুল তাদেরি অন্বেষণে।
কত পথহারা ফুলের সুবাস,
এ মরুর মাঝে রচে উচ্ছ্বাস,
কতনা মধুর মাধবী নিশার ব্যর্থ বাসনা কাঁদে
অসীম-আঁধারে,—করুণ আর্ত্তনাদে।
চাঁদিনী রাতের উতলা সুরের ঢেউ
পাড়ি দিয়ে যায় হেথায় ফেরেনি কেউ,
আমি ভাবি শুধু তাহাদেরই ইতিহাস —
যারা হেথা ব'সে রয়
কেন তারা শুধু বয়
ক্লান্তিভরা এ দীর্ঘ দিবস
দীর্ঘ বরষ মাস।

শ্রীহাসিরাশি দেবী

দিক দিয়ে প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ললিতার ভূমিকায় নবাগতা কুমারী প্রতিমা দাসগুপ্তা। ক্যামেরার সামনে সহজ সুন্দর চলাফেরা, লীলায়িত ভঙ্গীতে বিনয় ও পানু বাবুর সঙ্গে মিষ্টি ও শ্লেষপূর্ণ কথাগুলি সব দিক দিয়েই মিস্ প্রতিমা দাসগুপ্তা রবীন্দ্রনাথের ললিতাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। জীবন গাঙ্গুলির গোরার অভিনয়ে বেশ অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে। চিত্রনাট্যে দোষ না থাকলে গোরা ও সুচরিতাকে আরো আমরা কাছে পেতাম। সুচরিতার গানগুলি বেশ। রাজলক্ষ্মী আনন্দময়ীর সত্যিকার চরিত্রগত মাধুর্য্যটুকু ফুটিয়ে তুলে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নরেশ মিত্র ও মনোরঞ্জন দুই বিশিষ্ট ভূমিকায় নেবেছেন এবং বেশ প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। তবে মাঝে মাঝে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (হয়ত দাড়ির জন্যে ?) একটু নির্জ্জীব হয়ে পড়েছেন যখন তাঁর উদার স্বাধীন অন্তরটুকুর পরিচয় চিত্রের দিক দিয়ে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মহিমের ভূমিকায় রবি রায় অশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। নির্ম্মলেন্দু বিনয়কে সত্যিকার বিনয় হিসেবে বেশ মানিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিনয়কে যেন অনেকখানি মোহন ঘোষালের সুষ্ঠু অভিনয়ের মধ্যে পেলাম।

সেট, সাজসজ্জা, নটনটীর পোষাক-পরিচ্ছদে আর্ট-পরিচালক যথোচিত জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯শ শতাব্দীর চিত্রের নায়কনায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির একেবারে বিংশ শতাব্দীর হাল ফ্যাসানের পোষাক পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে রেডিওর সঙ্গে কফি, আর সিগারেট টেনে বৃহৎ বক্তৃতাদান মন্দ লাগছিল না। শব্দযন্ত্রীর কাজ বেশ উত্তম হয়েছে। আলোকশিল্পীর কাজ প্রশংসা পাবার যোগ্য। সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য নয়। সঙ্গীত উপভোগ্য।

"গোরা" নরেশ মিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচালনার নিদর্শন এবং রজনী ও ইন্দিরার পর একটি ভাল ছবি প্রযোজনা করে দেবদত্ত ফিল্ম আনন্দ বিতরণ করতে কার্পণ্য করেননি।

চোখের বালি :—

কাহিনী—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রযোজনা—বি, পি, মেহেরা

পরিচালক—সতু সেন

আলোক-চিত্রশিল্পী—ননী সান্যাল

শব্দানুলেখ—মধু শীল

সুর-শিল্পী—অনাদি দস্তীদার

প্রধান ভূমিকা লিপি :

বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জ্জি

আশা—ইন্দিরা রায়

মহেন্দ্র—হরেন মুখার্জ্জি

বেহারী—ছবি বিশ্বাস

সাধুচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

৩০শে জুলাই রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' চিত্ররূপে "শ্রী" চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে। বি, পি, মেহেরার প্রযোজনায় এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স ছবিখানি তুলেছেন। পরিচালনা করেছেন সতু সেন।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ববিখ্যাত মনস্তত্বমূলক উপন্যাসখানি যখন চিত্রে রূপ দেবার কথা উঠল তখন আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে চোখের বালি নিশ্চয়ই গতানুগতিক অতি সাধারণ ছবিতে পরিণত হবে। সুষ্ঠু পরিচালনারগুণে সেই ভুল সতু সেন আমাদের ভেঙ্গে দিয়েছেন। চোখের বালির ন্যায় কঠিন কাহিনীকে সত্যিকার চিত্রে রূপ দেওয়া কম সহজ নয়। সিনেমার উপযোগী মাল মসলার অভাব না থাকলেও একমাত্র উন্নত Treatmentএর ওপর এই ছবিখানির সমস্ত কিছু নির্ভর করে।

সাধারণ দর্শকদের মনস্তুষ্টির জন্যে হালকা রস এবং আনন্দ পরিবেশন করবার পথ এই চিত্রে একেবারেই বন্ধ। সহজ স্বচ্ছ ভাষায় নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় পরিচালক ছবিখানি তুলিয়েছেন। সাধারণ জিনিষ নিয়ে অতি অসাধারণ কিছু গড়বার প্রয়াস পান নি এই জন্যে সতু সেনকে প্রশংসা করা যায়।

বিনোদিনী, আশা, মহিম ও বেহারী—এই চারটি চরিত্র নিয়ে এই অপরূপ কাহিনী গড়ে উঠেছে। অতি নিষ্ঠার সহিত সতু সেন তাঁর ছবির চরিত্রগুলির গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সুখ দুঃখের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং সে বিষয়ে তিনি অনেকখানি কৃতকার্য্যও হয়েছেন।

ছবির প্রথম মুখ কিছু একঘেয়ে হলেও বিধবা বিনোদিনী মহিমের বাড়ীতে আগমনের সঙ্গে গল্পের জটিলতা বেড়ে যায় এবং এইখান্ হতেই চরিত্রগুলি বিকসিত হতে থাকে। আশাকে মহিম ও বিহারী দুইজনেই চেয়েছিল এবং মহিমই তাকে পত্নীরূপে পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই বিনোদিনী চরিত্র।—সে যে নারী—তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে আছে। একটা দুশ্ছেদ্য ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তে পড়ে চারিটী প্রাণীর অন্তর উন্মথিত করে যে হলাহল উত্থিত হয়েছিল সেটুকু সুন্দরভাবে চিত্রে দেখান হয়েছে।

মহিমের ভূমিকায় হরেন মুখার্জ্জির অভিনয় প্রশংসা করা

যায়। স্থানে স্থানে অভিনয় মাত্রা একটু ছাড়িয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়েছে তার সন্দেহ নেই। বিহারীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেনি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অনুরূপ মুখের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নি। আশার ভূমিকায় ইন্দিরা রায় আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নববধূ আশার সঙ্গে

তাঁর আকৃতির কোন সাদৃশ্য নেই। ছবির সবচেয়ে কঠিন ভূমিকা বিনোদিনী। সুপ্রভা মুখার্জ্জির উন্নত অভিনয়ের গুণে এ ভূমিকাটি চিত্রে উৎকর্ষ লাভ করেছে। গানগুলি ভালই হয়েছে কিন্তু ছবির গতি তাতে কিছু বাধা পেয়েছে। সাধুচরণের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কিছু হাসির খোরাক জুটিয়েছেন। রাজলক্ষী ও অন্নপূর্ণা দুই ভূমিকায় শান্তিলতা ঘোষ ও রমা ব্যানার্জ্জি মন্দ করেন নি। ছবির সেট তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বিহারী ও মহিমের বাড়ীর পার্থক্য বুঝা কঠিন। মহিমের সম্পূর্ণ বাড়ীখানি খণ্ড খণ্ড সেটে ভাগ হয়ে মিল না থাকায় চোখে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত এই চিত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রের জন্যে কয়েকটি নূতন সঙ্গীত ও সুর যোজনা করেছেন। গানগুলির পরিচালনার দ্বারা অনাদি দস্তিদার সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

ছবিকে এক রকম হত্যা করেছেন আলোক শিল্পী ননী সান্যাল। এত নিম্ন দরের ফটোগ্রাফী খুব অল্প ছবিতেই

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

দেখা যায় এবং তারই সঙ্গে সম মাত্রায় দোষী হচ্ছেন রসায়নাগারাধ্যক্ষ কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি। সম্পাদনা মন্দ নয়।

ষ্টুডিও সংবাদঃ—

নিউ থিয়েটার্স

দেশের মাটী

নীতীন বসুর পরিচালনায় ছবিখানি শেষ হয়ে গেছে এবং এই মাসে হিন্দি ধরিত্রীমাতা নর্দার্ন ইণ্ডিয়ায় দেখান হবে। ছবিখানির ভিত্তি হচ্ছে বর্ত্তমান দেবী গ্রামের মেয়ে গৌরীর ভূমিকায় আমাদের মুগ্ধ করতে পারবেন। গান হবে এই চিত্রের আর একটি চিত্তাকর্ষক উপকরণ। দেশের মাটী "গোরা"র পর "চিত্রায়" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। এই চিত্রের শেষে নীতীন বোস "শত্রু" নাম দিয়ে নূতন ছবি তুলতে আরম্ভ করেছেন। দেশের একটি মহা সমস্যা কাল ব্যাধি যক্ষা রোগকে ভিত্তি করে বিদেশের "documentary' ফিল্মের ন্যায় চিত্রটির মূল আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে।

"দিদি" ছবির পর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নাবছেন

দেশের মাটি চিত্রে সায়গল ও চন্দ্রাবতী

দেশের অন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার। "Back to village" হয়ত এই চিত্রের মূল উদ্দেশ্য। দুর্গাদাস, সায়গল, কৃষ্ণ দে, উমা দেবী, পঙ্কজ, ভানু ব্যানার্জ্জী, চন্দ্রাবতী বাংলা সিনেমার নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের এই চিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। বহু বছর পর উমা লীলা দেশাই। নায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন সায়গল, তাছাড়া টোনা রায়, বিক্রম নাহার প্রভৃতিকে দেখা যাবে। গানের সুর-সংযোগ করছেন পঙ্কজ মল্লিক। হাসপাতালের অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম সহ একটি ক্লিনিকে সায়গল ও লীলা দেশাইকে নিয়ে সুটিং এখন চলছে।

অধিকার চিত্রে স্বনামধন্যা অভিনেত্রী যমুনা

অধিকার—

হিন্দি ও বাংলা উভয় সংস্করণে "অধিকার" চিত্রখানি সেন্সার হয়ে গেছে। ছবিখানি শেষ ক'রে প্রমথেশ বড়ুয়া সস্ত্রীক বিমানযোগে বিলাত রওনা হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, মিষ্টার বড়ুয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিলেতের ষ্টুডিয়োয় নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার ফিরে এসে ছবি তোলা।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার—

এ ছবিখানি প্রায় শেষ হয়ে এল। এই মাসেই বোধহয় সম্পাদকের ঘরে মূল ছবিখানি আশ্রয় নেবে। শুধু গান ও নাচ ছাড়া কাননের অভিনয় বেশ সন্তোষজনক হচ্ছে। মনের আনন্দের সঙ্গে কাজ করছেন সায়গল। কানন ও সায়গলের ডুয়েট গান হয়ত এই চিত্রখানিকে প্রসিদ্ধ করে রাখবে।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার চিত্রে কানন ও শৈলেন চৌধুরী

হয়ত অধিকার চিত্রখানির উদ্বোধন হবে নিউ সিনেমায়। তবে নিউ সিনেমা বাংলা ছবির পক্ষে উপযুক্ত স্থান কিনা কর্তৃপক্ষদের সে কথা ভাবা উচিত। সঙ্গীত, বাদ্য, অভিনয় এবং সেট "অধিকার" চিত্রের প্রধান আকর্ষণ হবে। ছবিখানি নাকি সত্যিই ভাল হয়েছে এবং মেনকা, শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জ্জির অভিনয় খুব চিত্তাকর্ষক হবে।

বস্তির দৃশ্যে সত্যিকার বস্তিতে এসে কানন ও সা[illegible] নিয়ে সুটিং করে তরুণ ফণী মজুমদার নূতন কিছু [illegible] এই ছবির পরেই ফণী মজুমদার আবার একটি [illegible] তুলবেন।

বড়দিদি—

যশস্বী অভিনেতা সুযোগ পে[illegible]

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের নবতম আকর্ষন
অভিনয় চিত্রে সুপ্রভা মুখার্জ্জী

পরিচালক হতে পারেন তারি প্রমাণ দিচ্ছেন শ্রীঅমর মল্লিক। শরৎচন্দ্রের "বড়দিদিকে" চিত্রে রূপ দিতে অমর মল্লিকের কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। অভিজ্ঞানের সন্ধ্যার ভূমিকায় যিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনয়ের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেছেন সেই শ্রীমতী মলিনা বড়দিদির ভূমিকায় দেখা দেবেন। এখন কলিকাতায় ব্রজবাবুর গৃহে সুরেন্দ্র (পাহাড়ী) ও বড় দিদির (মলিনা) সুটিং চলছে।

ভারতলক্ষ্মীর "অভিনয়"—

এই চিত্রখানি শীঘ্রই রূপবাণী প্রেক্ষা গৃহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রোপযোগী মাল মসলা অভিনয় চিত্রে কম নেই। মধু বোসের পরিচালনায় "অভিনয়" ছায়া লোকে

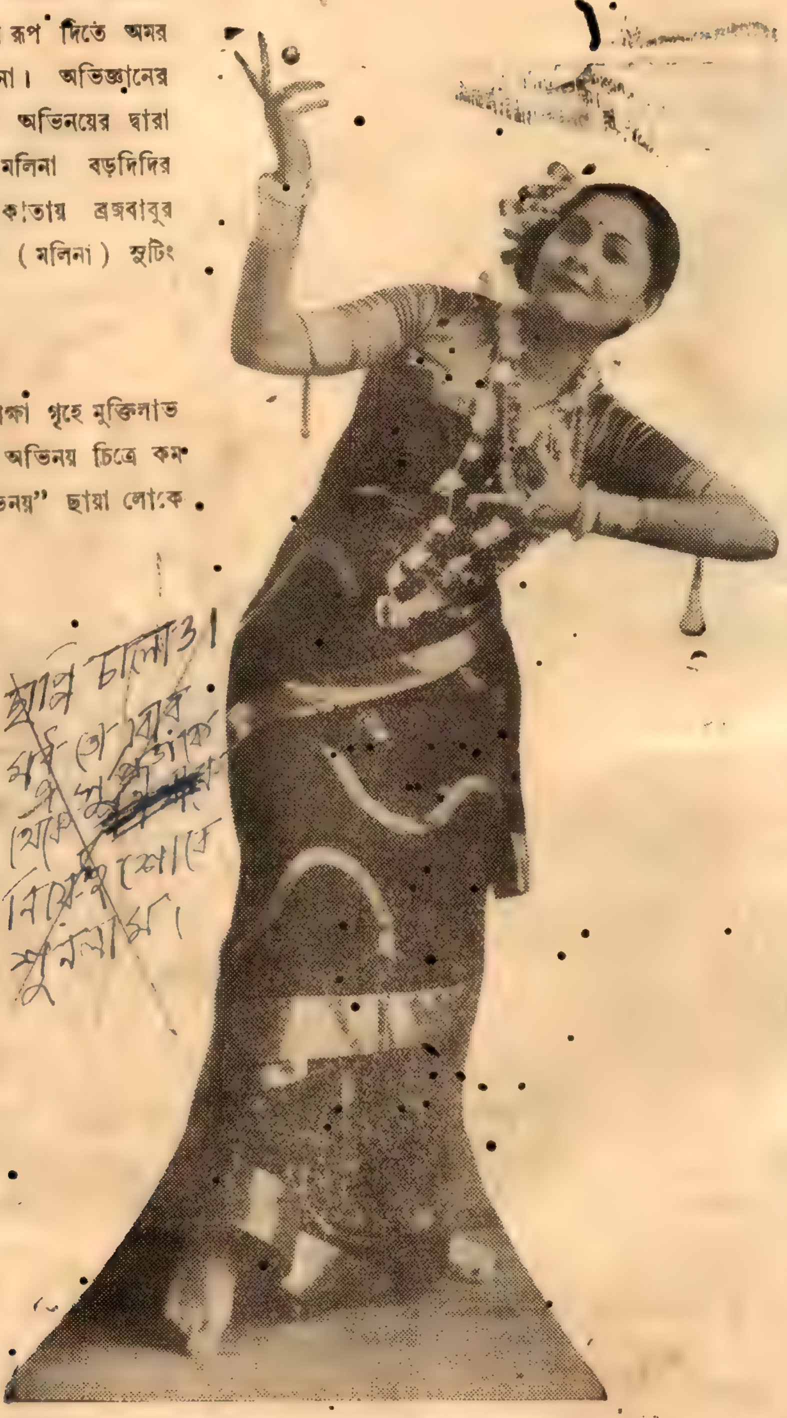

নৃত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় শ্রীমতী সাধনা বসু

চাঞ্চল্য আনবে। সাধনা বসুর নৃত্য ও সুষ্ঠু অভিনয় ভিন্ন অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, প্রতিমা মুখার্জ্জি, বিভূতি গাঙ্গুলি ও প্রীতি মজুমদার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

কলম্বিয়ার স্বনামধন্যা সুন্দরী অভিনেত্রী পেট্রিসিয়া ফার

ফার্ষ্ট এম্পায়ারে নৃত্যানুষ্ঠান :—

সুপ্রসিদ্ধ "আর্ট প্লেয়ার" মধু বোসের পরিচালনায় কয়েকদিন ফার্ষ্ট এম্পায়ারের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠান ও "রাজনটী" নাটক অভিনয় হয়েছে। সাধনা বোসের মুগ্ধকর নৃত্য প্রশংসনীয়। শিকার নৃত্য, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি নৃত্যগুলি প্রচুর প্রশংসালাভ করেছে দর্শকদের কাছ হতে। "রাজনটী" মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটক। রাজনটী বেশে সাধনার অতুলনীয় অভিনয় এবং রাজপুত্র মধু বোস ও গুরুদেব অহীন্দ্র চৌধুরীর সংযত অভিনয় এই নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নৃত্যের ও অভিনয়ের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুবিখ্যাত সুরশিল্পি তিমিরবরণ।

কলম্বিয়ার উদীয়মানা অভিনেত্রী জন পেরী

কলোম্বিয়ার ড্যামেজড লাইফ চিত্রের একটি দৃশ্য

রাধা ফিল্ম কোম্পানি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স ঃ—

রাধা ফিল্ম কোম্পানির নবতম আকর্ষণ "বেকার নাশন" ১৩ই আগষ্ট উত্তরায় মুক্তিলাভ করবে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি। এঁদের ছবি "নর-নারায়ণ"এর কাজ দ্রুত চলেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, শীলা হালদার, রবি রায় প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এই ছবিতে দেখা যাবে। হরি ভক্তের পরিচালনায় হেমেন্দ্র রায়ের "যখের ধন" ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিয়োতে তোলা হচ্ছে। এই চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে দেখা দেবেন অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়, শীলা হালদার প্রভৃতি।

কলোম্বিয়ার "Damaged Lives" ঃ—

এই ছবিখানি বিদেশে "চিত্র মহলে" এক গভীর চাঞ্চল্য এনেছে। ছবিখানিকে এক হিসেবে "documen[redacted]" পিকচার্স বলা যায়। যে দুষ্ট কাল ব্যাধি সমাজটুকে তরুণ ও তরুণীদের সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে তা' অতি সুন্দরভাবে চিত্রে দেখান হয়েছে। Venereal disease যে—যে কোন দেশের একটী বড় সমস্যা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চিত্রের নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে যে কলোম্বিয়ার কর্ত্তৃপক্ষরা দেশের জনসাধারণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পেরেছেন সেটি সত্যই মঙ্গলজনক। চিত্রখানি পিকচার্স প্যালেসে মুক্তিলাভ করেছে।

রাণী[illegible]

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৪

মনের মধ্যে একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণা এবং অপমানের দাহ নিয়ে নরেন যখন গগনবিহারীর গৃহ থেকে নিজের গৃহে ফিরে এল রাত্রি তখন দশটা। বঞ্চিত হওয়ার দুঃখকে তখন হার মানিয়েছিল অবনমিত হওয়ার আক্রোশ। একটা হিংস্র জিঘাংসার নিঃশব্দ দাপটে তার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় কালো হ'য়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, দংশন করি, বিদীর্ণ করি, গুঁড়িয়ে দিই, পুড়িয়ে দিই। কিন্তু উপস্থিত আততায়ীকে আক্রমণের সীমান্তরেখার মধ্যে না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে সে নিজেকেই বারম্বার দংশন করতে লাগল।

গগনবিহারী নরেন্দ্রকে স্পষ্ট ক'রে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু সামান্য যেটুকু বলেছিলেন তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। তিনি বলেছিলেন, "যুদ্ধই বল, আর প্রেমই বল, উভয়েরই অভিযানে গতিবেগই সব সময়ে প্রধান বস্তু নয়, সময় বিশেষে গতিরোধও তার চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে; গতিরোধের দ্বারা অপর পক্ষকে আকৃষ্ট ক'রে এমন সঙ্কটের স্থানে এনে ফেলা যায় যেখানে তার পরাভব সুনিশ্চিত। তোমার দিকে বাসনা যদি তার গতি মন্দীভূত করেছে ব'লে সন্দেহ কর, তা হ'লে তুমিও তোমার গতি একেবারে রোধ ক'রে দাঁড়াও,—হয় ত তা'তে উপকার হবে। আর একান্তই যদি তাতে কোনো সুফল না দেখা যায়, তা হ'লে একথা নিশ্চয় মনে মনে অনুভব কোরো যে, বাসনাই সকলের পক্ষে কামনার বস্তু নয়।"

এ কথার উত্তরে নরেন বলেছিল, "বাসনা যে সকলের পক্ষে কামনার বস্তু নয়, সে কথা ত এখনই কতকটা অনুভব করছি, কিন্তু বাসনার পক্ষে উপস্থিত এই মুহূর্তে কে কামনার বস্তু তা বলতে পারেন দাদামশায়?"

তদুত্তরে গগনবিহারী বলেছিলেন, "নিশ্চয় ক'রে বলতে পারিনে, অনুমান হয় ত করতে পারি; কিন্তু অনুমানের কথা ব'লে কোনো লাভ নেই, কারণ সে-রকম অনুমান তুমিও হয় ত কিছু কিছু করছ।"

এর পর আর যে-সকল কথা হ'ল তা থেকে একমাত্র অমরেশই যে উভয়েরই মনে অনুমানের বস্তু, সে অনুমানও উভয়ের মনে মনে প্রবলতর হ'য়ে উঠল। নরেনের বিরুদ্ধে বাসনাকে কেউ যে আকৃষ্ট করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, আর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অমরেশ ভিন্ন অপর কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না।

নরেন্দ্র হচ্ছে একান্ত ভাবে বস্তুতন্ত্রবাদী। আপাদমস্তক, পায়ের নখ হ'তে মাথার চুল পর্যন্ত, সে একজন এঞ্জিনীয়ার মানুষ। ফুট ইয়ার্ড আর কোয়ার্ট হন্দরের সঙ্গে তার গভীর পরিচয়, তাই বস্তুর মূল্য নির্ণয় করবার তার অভ্যাস ওজন আর মাপের হিসাব দিয়ে। কতকটা সেই ভাবে সে তার নিজের এবং বাসনার যে আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় ক'রে রেখেছিল তা'তে বাসনা তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষার বস্তু হ'লেও, দুরাকাঙ্ক্ষার নয়। তাই তাকে হারাবার আশঙ্কা, যত-না আঘাত দিলে তার মনকে, ততোধিক দিলে তার আত্মপরতাকে; বেদনাকে অতিক্রম করলে আক্রোশ।

সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাবে বাসনার বিষয়ে নরেনের মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন অচিন্তিত ভাবে তার মধ্যে সংশয়ের সূত্রপাত হ'ল। তখন অমরেশ হরিদ্বারে অবস্থান করছে, কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনের কাল আসন্ন হয়ে এসেছে। দক্ষিণ ভারতে কিছুদিন হ'তে একটা সেতু নির্মিত হচ্ছিল, সেই বিষয়ে একটা জরুরী পরামর্শের জন্য নরেন এসেছিল এক রবিবারের প্রাতে শৈলনাথের সহিত

আলোচনা করতে। কাজকর্মের অবসানে কাগজপত্র দেরাজে তুলে রাখতে গিয়ে শৈলনাথের দৃষ্টি পড়ল খামে-মোড়া একখানা চিঠির উপর। চিঠিখানা বার ক'রে শৈলনাথ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "এই দেখ! বাসুর চিঠিটা পোষ্ট করতে ভুল হ'য়ে গিয়েছে। কাল অমরেশের চিঠি পেয়ে কালই তাড়াতাড়ি উত্তর লিখে অফিস যাবার সময়ে আমার হাতে দিয়েছিল, অফিসের কাগজপত্রের সঙ্গে ভুলে চ'লে এসেছে।" তারপর খামের উপর ডাক-টিকিট মেরে বললেন, "আমার কাছে রাখা আর নিরাপদ নয়, আবার হয়ত এমনি ক'রে ভুল হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে তুমি বাড়ি যাবার পথে কোনো জায়গায় এটা পোষ্ট করে দিয়ো।" ব'লে চিঠিখানা নরেনের হাতে দিলেন।

মোটরে আরোহণ ক'রে বাসনার চিঠির উপর নরেনের কৌতূহল জাগ্রত হ'ল। চিঠিখানা অমরেশের চিঠির কেবল মাত্র অতিক্ষিপ্র উত্তরই নয়, চিঠির ওজন বিবেচনা করলে উত্তরের দৌড়টাও খুব সংক্ষিপ্ত ব'লে অনুমান করা চলে না। শৈলনাথও সেই ওজনেরই কথা মনে ক'রে চিঠির উপর দু আনার টিকিট বসিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিখানা করতলে স্থাপিত ক'রে তার অনুভব করবার অভিপ্রায়ে উপর-নীচে একটু দুলিয়ে দেখে নরেনের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। চিঠি ত ছাত্রী লিখচে তার শিক্ষককে,—তবে তাড়াই বা তার এত কেন, আর কথাই বা তা'তে এত কিসের? এ চিঠি যে সহজ সাধারণ চিঠি, এ চিঠির নিবেদন যে শ্রদ্ধা-ভাজন গুরুর প্রতি ভক্তিমতী শিষ্যার শ্রদ্ধা-নিবেদনের অতিরিক্ত আর কিছু নয়, তা না জেনে নরেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। কৌতূহল হ'য়ে উঠল উদগ্র,—ডাক বাক্সে চিঠি ফেলা হ'ল না।

গৃহে উপনীত হ'য়ে সে ক্ষনকাল দ্বিধাজড়িত চিত্তে চিঠিখানা হাতে নিয়ে ব'সে রইল, তারপর দুরতিক্রমণীয় ঔৎসুক্যের হস্তে বিবেক ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করলে। চিঠির আঠার অংশে জলের পোঁছ বুলিয়ে ছুরির প্রান্তভাগ দিয়ে সন্তর্পণে সে খামখানা খুলে ফেললে, তারপর তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বার ক'রে তার আদ্যন্ত সমস্তটা আগ্রহ সহকারে পাঠ করলে।

চিঠিখানা অবশ্য দয়িতের প্রতি প্রণয়িনীর প্রেমলিপি নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু শিক্ষকের প্রতি ছাত্রীর সাধারণ ভক্তি-নিবেদনও তাকে বলা চলে না। মেঘের ধারে ধারে আলোকের রূপালী পাড়ের মতো সাধারণ কথার পাশে পাশে অসাধারণের আভাস, যা ক্ষণে ক্ষণে গুরু-শিষ্যা পর্যায়ের শেষ প্রান্তরেখা উল্লঙ্ঘন করবার উপক্রম করে। ভক্তি যেন সব সময়ে ষোল আনা ভক্তিই নয়, দুঃখ যেন সময়ে সময়ে ধারণ করে অভিমানের রূপ। এমন কি পারুল নামে কোনো স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গে কৌতূহল এবং ঔদাসীন্যের যে অপ্রাকৃত অসমঞ্জস যোগ-তা যেন ঈর্ষার কাছ ঘেঁসে চলে।

বাসনার চিঠির মধ্যে নরেন দুর্লক্ষণের অশুভ ছায়া অবলোকন করলে।

অবশ্য অমরেশের প্রৌঢ়ত্ব কতকটা আশ্বাসের কথা বটে, কিন্তু প্রেম যখন বন্যারূপে মানুষের, বিশেষত স্ত্রীলোকের, চিত্ত প্লাবিত ক'রে ধাবিত হয় তখন তার সম্মুখে প্রৌঢ়ত্বের বাঁধ এমন-কিছু দৃঢ় বাধা নয়। পার্শ্ববর্তী প্রাচীন বৃক্ষকে নববল্লরী পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে, এমন দৃষ্টান্তও ত' প্রকৃতির বক্ষে সুপ্রচুর। স্ত্রীলোকের লতাধর্মী মনের পক্ষে সান্নিধ্য একটা প্রবল হেতু। নরেন্দ্র স্থির করলে বাসনাকে অমরেশের সান্নিধ্য হ'তে অবিলম্বে ছিন্ন ক'রে নিজের পাশে রোপন করতে হবে।

সে কাজের লোক,—তৎপর মানুষ;—চেষ্টা ক'রে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বাসনার সহিত সাক্ষাৎ করলে। নির্জনে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথোপকথন করবার সুযোগও ঘ'টে গেল; কিন্তু সুবিধা হ'ল না। অমরেশের সান্নিধ্য হ'তে বাসনাকে ছিন্ন করা সহজ হবে কি না তা ঠিক বোঝা না গেলেও নিজের পাশে তাকে রোপন করা যে অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না, তা' নিশ্চয় ক'রে বোঝা গেল। সংশয় হ'ল বর্ধিত।

কথাটা আরও খানিকটা পরিষ্কার ক'রে বোঝবার অভিপ্রায়ে কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার পর পুনরায় সে শৈলনাথের গৃহে উপস্থিত হ'ল। চাকরের মুখে শুনলে, দিদিমণি আর মাষ্টার বাবু বাহিরের ঘরেই অবস্থান করছেন। অমরেশ যে কলকাতায় ফিরে এসেছে তা' সে জানত না। কৌতূহলী

হ'য়ে ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে মুখ বাড়িয়ে দেখলে বাসনা অমরেশকে খাবার খাওয়াতে ব্যস্ত। মনে পড়ল কয়েক দিন পূর্বে সাক্ষাৎকালে সে তাকে এক পেয়ালা চা পান করবার জন্যও অনুরোধ করেনি। পিত্ত উঠল জ্বলে। পিছিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করলে। হঠাৎ মনে পড়ল গগনবিহারীর কথা। ভাবলে, তাঁকে মধ্যস্থ ক'রে কথাটার অবতারণা করলে হয়ত একটা সুরাহা হতে পারে। বাসনার উপর গগনবিহারীর আধিপত্য চলে, এ কথা তার জানা ছিল। তখনি মোটর নিয়ে গগনবিহারীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হ'ল। পৌঁছে শুনলে, গগনবিহারী বেরিয়েছেন, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করবেন। কথাটা ভুল নয়,—মিনিট পনের কুড়ির মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন, কিন্তু একা নয়, অমরেশ এবং বাসনাকে সঙ্গে নিয়ে।

বাসনা এবং অমরেশকে পুনর্বার একত্র দেখে এবং নিজের অভীষ্ট সাধনে দ্বিতীয় বার এইরূপে ব্যর্থ হ'য়ে নরেনের মনে ক্রোধ দুর্মদ হ'য়ে উঠল। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পথে ক্রোধের ন্যায় মানুষের দ্বিতীয় রিপু নেই স্মরণ ক'রে সেদিন সে ক্রোধকে দমিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

আজ কিন্তু তা হ'ল না। গগনবিহারীর সহিত কথাবার্তার পর আজ যখন সে অনুভব করলে যে, আসন তার টলেছে, বাসনার উপর অধিকারের যে বাঁধনকে এতদিন অমোচ্য ব'লে কল্পনা করত তা শিথিল হয়েছে, তখন তার মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। প্রজ্বলিত ক্রোধের দু-চারটা আতস্‌বাজির দ্বারা গগনবিহারীকে সম্বর্ধিত ক'রে সে প্রস্থান করলে।

গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে নরেন সোজাসুজি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে। আহারে প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না। কথোপকথনের পূর্বে চায়ের সহিত যে টুকু খাবার গগনবিহারী অনুরোধ ক'রে খাইয়েছিলেন তাই আজকে রাত্রি যাপনের পক্ষে যথেষ্ট মনে হ'ল। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক গভীর চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাকর্ষণে বাধা দিলে।

পরদিন প্রত্যুষে যখন নিদ্রা ভাঙল তখন কিন্তু মনটা অনেকটা চাঙ্গা হয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য এবং চা পান শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়ল অপর্ণার সহিত দেখা করবার অভিপ্রায়ে। অপর্ণা তার সর্বাংশিক নির্ভরের স্থল, তার প্রবলতম শক্তি-কেন্দ্র এ সত্য তার অগোচর ছিল না। স্থির করলে, একবার শক্তি-সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা না ক'রে পরাজয় স্বীকার করবে না। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গ *

কিছুই আমরা হারাইনে। এক দিকে যা হারাই, অন্য দিকে তা ফিরে পাই। রূপ থেকে হয় রূপান্তর। এই হচ্ছে বিশ্ব সংসারের নিয়ম। তা যদি না হ'ত তা হলে এত দিনে বিশ্ব হ'য়ে যেত নিঃস্ব,—আর মানুষ হ'য়ে যেত দেউলে।

এই জাগতিক নিয়মেরই ফলে আমরা হারিয়েছি এক ধরণীর দুহিতাকে, আর পেয়েছি এই 'স্বর্গ'। এ স্বর্গ ধার্ম্মিকের স্বর্গ নয়, পুণ্যবাণের স্বর্গ নয়;—এ মরমীর স্বর্গ, দরদীর স্বর্গ। যারা হারিয়েছে, আর যারা এখনো হারায়নি, তারা 'স্বর্গ' পাঠ ক'রে অনুভব করবে যে, সত্যিসত্যিই কিছু হারায় না।

'স্বর্গ' কবিতা পুস্তক নয়, গদ্যে রচিত ইহলোক-পরলোকের অলৌকিক কাহিনী; তবু আমি একে কাব্য বলব, কারণ এর স্তুতি কাব্যের। এই মৃত্যু-কাব্যটি যখন প'ড়ে শেষ করলাম, দেখলাম যুগপৎ আনন্দে এবং দুঃখে মন পরিপূর্ণ হয়েছে,—বুঝলাম লেখাও সার্থক হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

---

* স্বর্গ—শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত। প্রকাশক—চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

STUDENTS' COMMON ROOM
P. G. A.

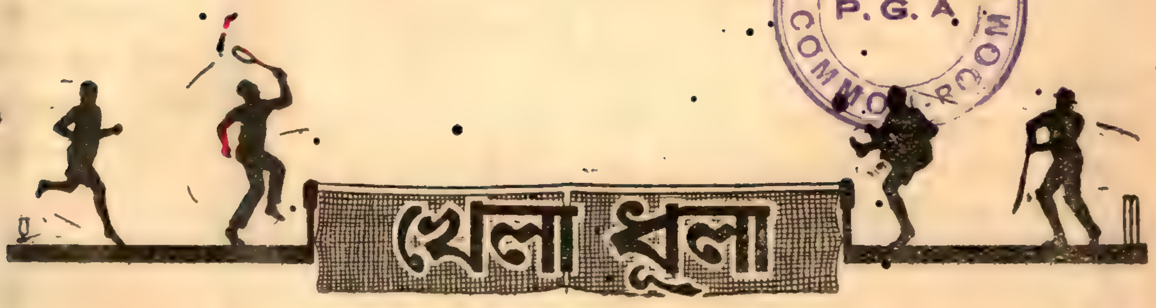

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী এম-এ

টেষ্ট, ম্যাচ ঃ—

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ এবার সব দিক দিয়েই এক রেকর্ড করল। টসে জয়লাভ করে নটিংহাম মাঠে ইংলণ্ড খেলা আরম্ভ করেন। ওরিলী, ওয়ার্ড প্রভৃতি বোলারদের জব্দ ক'রে তরুণ ইংলণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানরা রাণের পর রাণে সকলকে বিস্মিত করলেন। খেলায় ১ম ইনিংসে হটন ১০০, বার্ণেট ১২৬, প্যাণ্টার ২১৬, নট আউট ও কম্পটন ১০২—একই ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরী রাণ টেষ্টে এক রেকর্ড হল। ৮ উইকেটে ইংলণ্ড ৬৫৮ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করেন। এর প্রত্যুত্তরে অষ্ট্রেলিয়ার রাণ হয় ৪১২। ম্যাককার অতি সুন্দর খেলে ইংলণ্ডের জয়োল্লাসকে থামিয়ে ২৩২ রাণ করে অষ্ট্রেলিয়াকে বাঁচান। তবুও অষ্ট্রেলিয়াকে 'ফলো-অন' করতে হল। ব্রাউন ও ব্র্যাডম্যান দক্ষতার সঙ্গে খেলে ইংলণ্ডের আক্রমণকে ব্যর্থ করে ১৩৩ ও ১৪৪ নট আউট হলেন। ৬ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ৪২ রাণ করে। খেলাটি ড্র হয়।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ লর্ডস এডিজে হয়। এবার ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হ্যামণ্ড ক্রীড়া কৌশলে সকলকে মুগ্ধ করলেন। প্রতি বলটি দেখে খেলে রাণ করলেন ২৪০। টেষ্ট ম্যাচেও হ্যামণ্ডের একটি রেকর্ড। অন্যদিকে ব্রাউন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২০৬ রাণ করে সম্মান পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংস বেশ প্রতিযোগিতাসূচক হয়েছিল। ৮ উইকেটে ইংলণ্ড ২৪২ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করেন। হ্যামণ্ড রাণ করেন মাত্র দুই কিন্তু প্যাণ্টারের ৪৩ ও কম্পনের ৭৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাডম্যান আবার একটি সেঞ্চুরী রাণ করে হবসের রেকর্ডকে ম্লান করে দিলেন। ৪১ টেষ্ট ম্যাচে ৭১ ইনিংস খেলে হবস রাণ করেছিলেন ৩৬৩৬। ব্র্যাডম্যান মাত্র ২৫টি টেষ্ট ম্যাচে ৪০টি ইনিংস খেলে ১৪টি সেঞ্চুরি করে হবসের চেয়ে উচ্চতর রাণ করেছেন। খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ২০৪ রাণের সময় সময়ের অভাবে ড্র হয়।

ওয়েম্বলডন চাম্পিয়ানশিপ ঃ—

গত বছরের চাম্পিয়ান ব্যাজ এবারও তিনটি প্রতিযোগিতায় ফাইন্যালে উঠে আমেরিকার ক্রীড়া গৌরবের পরিচয় দিলেন। সিঙ্গল্‌স্ ফাইন্যালে ইনি অষ্টিনকে সাক্ষাৎ করেন। খেলায় ব্যাজ সুন্দর খেলে অতি সহজে ৬—১, ৬—০, ৬—৩ গেমে অষ্টিনকে হারিয়ে দেন। ডবলস ফাইন্যালে ব্যাজ ও মেক্কো (আমেরিকা) ৬—৪, ৩—৬, ৬—৩, ৮—৬ গেমে হেঙ্কেল ও মেটেক্সাকে (জার্ম্মাণী) পরাজিত করেন। মিক্সড্ ডবলস ফাইন্যালে ব্যাজ ও মিস মার্বেল—হেঙ্কেল ও মিস ফেরিঙ্গানকে হারান। মহিলা সিঙ্গল্‌স্ ফাইন্যালে আমেরিকার দুই বিখ্যাত খেলোয়াড় সাক্ষাৎ করেছিলেন। মিসেস মোদী ৬-৪, ৬-০ গেমে জেকবস্‌কে হারিয়ে চাঞ্চল্য আনলেন। এই নিয়ে ৮ বার মহিলা চেম্পিয়ান হয়ে মিসেস মোদী টেনিসে এক স্মরণীয় ইতিহাস রাখলেন।

লীগ ঃ—

এবার খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অতি নিম্নতর হয়ে এসে প্রতিদিন

অতি বাজে খেলা প্রদর্শন করেছিল। কোন টীমেই তেমন সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিল না। নইলে গোলের সামনে গোল দিবার বহু সুযোগ পেয়েও কেউ গোল নষ্ট করে না। লীগের দ্বিতীয় হাফে মহমেডানের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল কাষ্টমস্ ও ইষ্টবেঙ্গল। বাকি টীমগুলি লীগে খেলেছে, কিন্তু তেমন কোন চাঞ্চল্য আনতে পারেনি। ইষ্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগ বেশ ভাল ছিল। বাজে দুই একটি ফরোয়ার্ডের দোষে ইষ্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ান হতে পারল না। শেষের দিকে মহমেডানও পুলিসের কাছে হার স্বীকার করাতে কাষ্টমস্ এক লাফে উঠে মহমেডানের প্রতিদ্বন্দ্বী হল। শেষ খেলা হয় কাষ্টমস্ বনাম মহমেডান। তখনও মহমেডান দুই পয়েন্টে এগিয়ে। খেলায় মহমেডান ১—০ গোলে হারাতে লীগে গভীর চাঞ্চল্য দেখা গেল। দুই টীমই সমান পয়েন্ট করাতে লীগ চ্যাম্পিয়ানের জন্যে আবার লড়াই করতে হল। এবার কিন্তু মহমেডান কোন ভুল করল না। কাষ্টমসকে ১—০ গোলে পরাজিত করে আবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হলেন। পাঁচ পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া কম কৃতিত্ব নয়। এবার টীম হিসেবে মহমেডানের ফরোয়ার্ড লাইন ছাড়া আর তেমন কিছু ছিল না। জুম্মা খাঁ একমাত্র ব্যাক, তা'ছাড়া ডিফেন্সে তেমন কোন খেলোয়াড় ছিল না যে প্রতিদ্বন্দ্বী টীমের আক্রমণকে ব্যর্থ করতে পারে। মোহনবাগান, এরিয়ান্স, কালিঘাট তেমন কোন আশ্চর্য্যকর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়নি। এবার লীগে সর্ব্বনিম্ন স্থানে এসেছে ক্যালকাটা। বহুবার লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ক্যালকাটার দুর্দ্দশা সত্যি দুঃখের বিষয়। আশা করা যায়, ক্যালকাটা তার পুরোণ রেকর্ডের জন্যে নিশ্চয়ই বি ডিভিসনে নামবে না।

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী

গান

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

চোখের দেখা নাই দেখিলে
মনের দেখা পাবেই প্রিয়,
চোখের জলের মালা গেঁথে
সেই ফুল ডোর সাজিয়ে দিও।
তোমার আমার সব বারতা
বলবে বনের তরুলতা ;
আর যা' থাকে গোপন ব্যথা
উদাস পাখীরে কহিও।

তোমায় স্মরে কাঁদি যখন
সান্ত্বনা দেয় তোমার স্মৃতি,
পরের দেওয়া অপমানের
জ্বালা ভোলায় তোমার প্রীতি।
এ জনমের সকল আশা,
অপরিসীম ভালবাসা,
ক্ষণতরের নয় পিপাসা
সব জনমের স্মরণীয়।

বাসর ঘর—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। দাম দুই টাকা।

বেনামী বন্দর—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম পাঁচ সিকা।

উর্ণনাভ } শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত। প্রত্যেকখানির
নবনীতা } দাম দুই টাকা।

ডি, এম, লাইব্রেরীর কতকগুলি বই হাতে এসে পড়েছিল। পড়ে দেখলুম তার মধ্যে উপরের বই ক'খানির কোনটাই কম উল্লেখযোগ্য নয়, তাই একসঙ্গে নাম দিয়েছি। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের "বেনামী বন্দর" ছোট গল্পের বই। 'ভবিষ্যতের ভার' এবং 'এই দ্বন্দ্ব' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। এত কম কথায় এমন সুনিপুণ স্পর্শে গল্পের রং ফলানো হয়েছে যে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। মনে হয়, অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শিল্পীহিসাবে প্রেমেন্দ্রবাবুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর বইগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের হাপুস হুপুস কাঁদুনি নেই, অচিন্ত্যবাবুর ভাষার অতি-দৌরাত্ম্য নেই, বুদ্ধদেববাবুর অতি-মনো-বিশ্লেষণও পদে পদে গল্পপড়ার আনন্দকে বাধা দেয় না। দুঃখের বিষয়, প্রেমেন্দ্রবাবু তাঁর সমসাময়িক শিল্পীবন্ধুদের তুলনায় আমাদের পাঠকদের কাছে যথোচিত আদর পাননি।

নিখুঁত শিল্প হিসাবে বুদ্ধদেববাবুর বই সাধারণত আমার খুব ভাল লাগে না। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি নির্ভীক চিন্তাশীল, তাঁর চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতা দুই-ই আছে এবং বক্তব্য তিনি অদ্ভুতভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

বুদ্ধদেববাবুর আগেকার অনেকগুলি উপন্যাস পড়তে পড়তে (অবশ্য "যেদিন ফুটল কমল"খানি বাদ দিয়ে) মনে হয়েছে, তাঁর আঁকা নরনারী আমার পরিচিত জগতের নয়। তাই তাদের আমি একান্ত আপনার জন বলে নিতে পারতুম না—যেমন প্রতিবেশীদের নিই। মনে হয়েছে, তারা যেন লেখকের মাথার সৃষ্টি, তিনি তাদের কল্পনায় হয়ত দেখেছেন, তাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটবার সুযোগ হয়ত তাঁর হয়নি। কিন্তু তবু তাঁর বই গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত না পড়েও থাকতে পারি না। তাঁর লেখনিতে শক্তি আছে বলেই তিনি আমাদের মনকে এমনভাবে টানতে পারেন।

কিন্তু 'বাসরঘর' বইখানির বিষয়বস্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা—তার নায়কনায়িকাও অনেকটা আমাদের পরিচিত জগতের। স্বামীস্ত্রীর মনের দ্বন্দ্বকে তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সতেজ গতিশীলতা। লেখক যেন অনুচ্ছেদ দাঁড়ির কোন জায়গাতেই পাঠককে দম নিতে দেন না—একেবারে টেনে নিয়ে যান শেষ পর্য্যন্ত। সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় এই যে, এই টেনে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর মূল উপকরণ হচ্ছে আগেকার যুগের সাহিত্যসুলভ ঘটনা সংস্থানের কৌশল বা গল্পবস্তুর অলৌকিকতা নয়।

"নবনীতা" ও "উর্ণনাভ" অচিন্ত্যবাবুর দুখানি উপন্যাসই ভাল লাগল। তাঁর ভাষার বাহুল্য অনেক সময় পাঠকের ঔৎসুক্য নষ্ট করে। যা বলেন তা মিষ্টি করে তিনি বলতে জানেন। মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্যের গভীরতার জন্যে ভাষার বাহুল্য অনিবার্য্য হয়ে পড়ে স্বীকার করি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার লঘুতায় ভাষাবাহুল্য নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশকদের কারো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে বলে মনে হয় না—একমাত্র "রঞ্জন পাবলিশিং হাউস" আর "প্রবাসী"

কার্য্যালয় ছাড়া। বিখ্যাত প্রকাশক ফার্মকে অপাঠ্য বই ছাপতে প্রায়ই দেখি। বিলাতে বড় বড় প্রকাশক ফার্ম যেভাবে নিজেদের বিশিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখেন আমাদের দেশে তা কল্পনার অতীত। ডি, এম, লাইব্রেরীর যে ক'খানা বই একসঙ্গে হাতে পড়ল তাতে দেখছি এর কোন বইখানাই অচল নয়। এ যদি ডি, এম, লাইব্রেরীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

খেয়াপারে—শ্রীযুক্ত শান্তি পাল প্রণীত। প্রকাশক কমলা বুক ডিপো লিঃ ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আধুনিক সময়ে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য ক্ষেত্রে যে কয়টি সাহিত্যিক যথার্থ গুণপণা দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত শান্তি পাল অন্যতম। জনসাধারণ শান্তিবাবুকে সুদক্ষ সন্তরণ বিশারদ বলিয়াই জানে, কিন্তু যাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে উদাসীন নহেন তাঁহারা জানেন যে কাব্য-সমুদ্র বক্ষে ছন্দের পাড়ি জমাইতে শান্তিবাবু কিরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে শান্তিবাবুর তিনখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছে—ছায়া, ছন্দোবীণা এবং পথচারী। এই বই তিনখানি রসিক সমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে এবং শান্তিবাবুর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আলোচ্য বইখানি—খেয়াপারে—তাঁহার কবিযশোবৃদ্ধিকল্পে অপরিসীম সহায়তা করিবে। এই ছোট কাব্য গ্রন্থটির মধ্যে কবি যে অনবদ্য কাব্য-রস পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা সকল কাব্য-রসিককে সমান আনন্দ দান করিবে বলিয়া আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে।

শান্তিবাবুর ছন্দোনৈপুণ্য সত্যসত্যই বিস্ময়কর, কিন্তু ছন্দোনৈপুণ্যেই তাঁহার কাব্যের শেষ কথা নহে, ছন্দের উপরেও যে অনির্ব্বচনীয় কাব্যরস তাহা শান্তিবাবুর কাব্যে কুত্রাপি বিরল নহে। সহরের বাসিন্দা হইয়াও তিনি যে অকুণ্ঠিত পল্লীপ্রীতি এবং পল্লীসুষমা তাঁহার কবিতায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমাদের পেটেণ্ট 'পল্লী-কবি'দের কাব্যেও সুলভ নহে। শহরের ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর মত্ততার একান্ত বাহিরে খাঁটী বাংলার যে শান্ত করুণ জীবনযাত্রা মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে তাহারই সহৃদয় অভিব্যক্তি অপূর্ব্বভাবে রূপায়িত হইয়া শান্তিবাবুর অনেকগুলি কবিতায় অনবদ্য সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। ইহাই বোধ করি শান্তিবাবুর কাব্য সৃষ্টির সব চেয়ে বড় কথা।

খেয়াপারে বইটিতে মুখবন্ধের কবিতাটি ছাড়া সর্ব্বসমেত চৌদ্দটি কবিতা আছে—পান্থ (উষা), পৌষে, ওয়াটারপোলো, ছন্দা, মধুমাসে, গোধূলি, আষাঢ়ে, আশ্রয়, শ্মশানের আলো জ্বলে, এ-পারে ও-পারে, ফাল্গুনে, চৈতে, পান্থ (সন্ধ্যা), খেয়াপারে।

আলোচ্য বইটির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটি রোমাণ্টিক সুর ধ্বনিত হইতেছে। কবিতাগুলি সবই অনিন্দনীয়। আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিল পান্থ (উষা) এবং পান্থ (সন্ধ্যা) এই কবিতা দুইটি। কিছু নমুনা দিতেছি।

ওগো মোর জীবনের লীলা-সহচরী,
বিরহের সুধাপাত্র এক হস্তে ধরি
আর হস্তে লিখে যাও পাষাণের গায়ে
আজিকার দিনে যত ব্যথা বাজে পায়ে;
সন্ধানী পথিকদল যদি আসে কেহ
অর্থ তারা করি লবে যা আছে দুর্জ্ঞেয়;
যৌবন পীড়িত বক্ষে অনাগত দিনে
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে পথ লবে চিনে! (পান্থ উষা)।

ত্রিলোক মন্থন ক'রি পাইনু যে মণি
কৌস্তভ-রতন এক লাবণ্যের খনি,
চঞ্চল উল্লাসভরে যেই পরি গলে
ভুজঙ্গের রূপ ধরি কাটে মর্ম্মতলে।
অমৃতের মধুভাণ্ড পূর্ণ বিষে ভরা
মত্ত অলি সম ধাই, ধূলাময়ী ধরা
সকৌতুকী চেয়ে থাকে, আঁখি অচপল
তিমিরের খেয়া চলে, বুকে নামে ঢল! (পান্থ সন্ধ্যা)

শান্তিবাবুর কাব্য-সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। খেয়াপারে পাঠ করিয়া আমরা এই কথাই বলিব।

শ্রীসুকুমার সেন

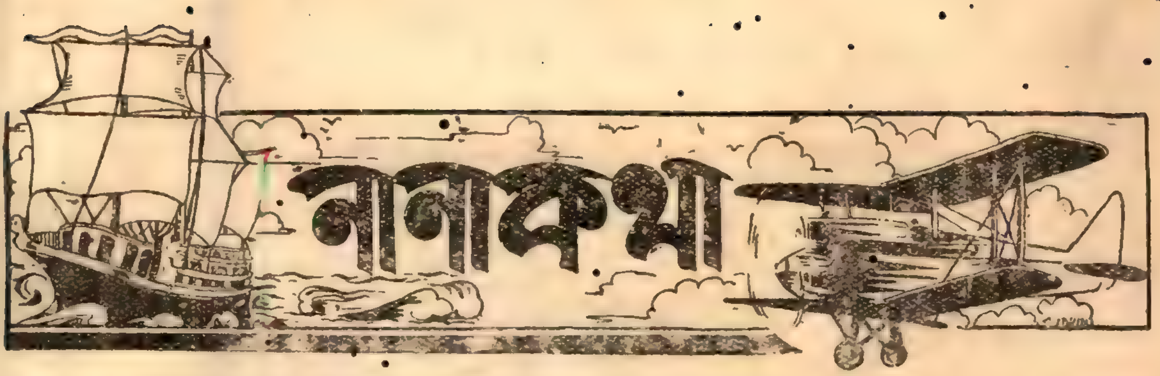

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেকস্থলে শ্যামাপ্রসাদ নামেই পরিচিত। তার কারণ, ভাইসচ্যান্সেলারের উচ্চপদ অধিকার করলেও, অনেকের অপেক্ষা তিনি বয়সে ছোট। ছোট হ'য়েও কিন্তু তিনি বড়। পৃথিবীর মধ্যে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ব'লে বিদিত। চার বৎসর পরে সম্প্রতি তাঁর কার্যকালের অবসান হয়েছে। তাঁর স্থলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার এবং গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজল হক ভাইসচ্যান্সেলার নিয়োজিত হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সর্বত্র সুলভ নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের মধ্যে অন্যতম বিরাট প্রতিষ্ঠান বটে। শ্যামাপ্রসাদের পিতা বিশ্ববিশ্রুত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিশালতার ভিত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন। এখন এর কার্য্যপরিধি এত বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, যে-কোনো প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে বিনিদ্র অবসর নিয়োগ ক'রেও এর কার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে। শ্যামাপ্রসাদ এই কঠিন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে বিদায় গ্রহণ করেছেন, কাজেই তিনি যে সারা দেশের অভিনন্দনভাজন হচ্ছেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

শ্যামাপ্রসাদের কার্যকালের সর্বপ্রধান ঘটনা সম্ভবতঃ মাতৃ-ভাষায় পঠন-পাঠনের প্রবর্ত্তন। এর কৃতিত্ব প্রধানতঃ স্যার আশুতোষের প্রাপ্য হ'লেও এ কথা বলতেই হবে যে, এই ব্যাপারের পূর্ণ পরিণতি হ'তে বহু বিলম্ব ঘটত যদি শ্যামাপ্রসাদ এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না থাকতেন। মাতৃভাষা যেখানে একটি, সেখানে এই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত পরিবর্ত্তন সংঘটন করতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশে একটিমাত্র ভাষা চলে না। কাহারও মাতৃভাষা বাঙলা, কাহারও উর্দ্দু, কাহারও হিন্দী, কাহারও বা অসমীয়। এই বৈচিত্র্য-কণ্টকিত সমস্যার মীমাংসার কূল পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। গভর্মেণ্টও বহু বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সে সকল সরকারী ও সাম্প্রদায়িক বাধা অতিক্রম ক'রে শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রথম শ্রেণীর জটিলতাপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। তারপরে এই সকল ভাষায় শিক্ষার বিধান হ'লেও উপযুক্ত বই নেই। প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়াতে হ'লে যে সকল বই দরকার তা-ও মাতৃ-ভাষায় নেই। এতদিন বিজ্ঞান ইংরেজির দ্বারাই শেখানো হ'ত। এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব

বিশেষ ভাবে অনুভূত হ'ল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনস্বীদের সাহায্যে পরিভাষা সংকলন এবং পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা ক'রে সে অন্তরায় দূর করলেন। পরিভাষার কার্য এখনও শেষ হয় নি। এই সকল বিষয় শ্যামাপ্রসাদের কীর্ত্তি ব'লে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে উল্লিখিত হবে।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী যে কক্ষে অবস্থিত ছিল, তা ক্ষীণ আলোকের জন্য এবং স্থানাভাবের জন্য নিতান্ত অসন্তোষজনক অবস্থায় ছিল। বর্ত্তমান ধারণা অনুসারে পাঠাগারের সুব্যবস্থা সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট কর্ত্তব্য ব'লে

পরিগণিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে প'ড়ে ছিল। শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় সে কলঙ্ক দূরীভূত হয়েছে। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরীর জন্য সুপ্রশস্ত, সুচিত্রিত এবং সুব্যবস্থিত কক্ষ নির্মিত হয়েছে। একজন কৃতবিদ্য যুবককে বিদেশ হ'তে আধুনিকতম গ্রন্থাগারিক বিদ্যায় শিক্ষিত ক'রে আনা হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্বদেশী বিদেশী সকলের একটি দ্রষ্টব্য স্থান হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র। যে-সকল বিষয়ে শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে নিজ দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ প্রদান করা একটি অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি চিত্রশালা গঠনে মনোনিবেশ করেছেন। বাঙলার যেখানে যা কিছু দেখবার ও শেখবার আছে তার প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শন একস্থানে সংগৃহীত হচ্ছে। ইহাও শ্যামাপ্রসাদের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির ফল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় বস্তু তার বিজ্ঞান মন্দির। এর কতক অংশ বালিগঞ্জে স্যার তারকনাথ পালিতের ভবনে অবস্থিত, কতক অংশ সাকুলার রোডে সায়েন্স কলেজে সমাবিষ্ট। এই বিজ্ঞান বিভাগ এখন উন্নততর ও সুচারুতর ভাবে ব্যবস্থিত হয়েছে। এর জন্য বহু অর্থব্যয়ে ভূমি ক্রয় করা হয়েছে। প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান মন্দিরের বিস্তৃতি সাধন করা হবে।

নারী শিক্ষার জন্য স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্রের যে দান পাওয়া গেছে, তদ্বিষয়েও একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা হয়েছে। কলিকাতার কোনও উপযুক্ত স্থলে একটি ছাত্রীনিবাস নির্মিত হবে। ছাত্রীরা যেরূপ অধিক সংখ্যায় উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, তা'তে তাঁদের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণের আবশ্যকতা ক্রমশই অধিকতর অনুভূত হচ্ছে। বিশেষতঃ মফস্বল হ'তে যে সকল মহিলা উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসতে বাধ্য হ'ন তাঁদের জন্য একটি উপযুক্ত ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করতে না পারলে অতিশয় অসুবিধা হবে। সুতরাং অচিরে এই অভাব মোচন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুতর দায়িত্ব।

আমাদের দেশে সাধারণ জ্ঞানবিস্তারের জন্য পুস্তক প্রচারের কোনও ব্যবস্থা নেই বললেও চলে। শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এইরূপ জ্ঞানবিস্তার পুস্তকমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

সংস্কৃত বিভাগেও দেশের প্রাচীন জ্ঞানগরিমা সম্বন্ধে বহু পুস্তক এখনও অপ্রকাশিত বা অপরিজ্ঞাত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেইরূপ পুস্তক প্রকাশের জন্য একটি যোগ্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্বরূপে শ্যামাপ্রসাদ যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা-ও উল্লেখযোগ্য। বাঙলা সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার যে পাণ্ডুলিপি পেশ করেছিলেন তা বঙ্গদেশের আত্মসম্মানে আঘাত করে। সরকার বাহাদুর এই বিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও একবাক্যে উহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তখনো শিক্ষামন্ত্রী আশা ত্যাগ করলেন না। তিনি মনে করলেন যে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সভ্যগণকে দলভুক্ত করতে পারলে ব্যাপার সহজ হবে। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলারকে কোনোমতেই পেরে ওঠা গেল না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতই বাহাল রইল, গভর্মেণ্ট বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। আবার দেখছি আর এক বিল ঝড়ের মেঘের মতো উদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবার কি করেন দেখা যাক।

এই সকল কার্যকলাপ ব্যতীত ছাত্রদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, ব্যায়ামাগার স্থাপন, বালিগঞ্জের হ্রদে নৌচালন সমিতির প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ছাত্রদের বাদ্যভাণ্ড সহ শোভাযাত্রা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একাত্মবোধের উন্মেষ প্রভৃতি বহু হিতকর অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ক'রে যিনি বাঙালীর জাতীয় উন্নতিতে এত সহায়তা করেছেন, তাঁর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে উল্লিখিত হওয়া উচিত।

শ্যামাপ্রসাদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকাল শুধু তাঁর অধ্যবসায়ের বা প্রতিভার ফল নয়। তাঁর যোগ্যতার প্রধান মন্ত্র ছিল চরিত্র মাধুর্য্য। এ যে তাঁর কত বড়

সম্পদ তা বুঝতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে এই সুদীর্ঘ কার্যকালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পিতার ন্যায় প্রতিপত্তি-শালী নন, তাঁর মতো প্রভুত্বও কখনো অর্জন করতে পারেন নি, তাঁর মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই তাঁর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করত এবং সকলে একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতকল্পে আত্মনিয়োগ করতে কার্পণ্য করে নি। এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নতির মূল।

পরলোকগত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ বরিশাল জেলা, বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৫ বৎসর হয়েছিল, কিন্তু এ বয়সেও তিনি সম্পূর্ণরূপে সবল এবং কার্যক্ষম ছিলেন। তিনি দেশহিতৈষী, ধার্মিক এবং উৎপীড়িতের বন্ধু ছিলেন। বঙ্গ-চ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অন্যান্য নেতৃবর্গের সহিত ইনি ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্বাসিত হন। হৃদয়ের ঔদার্য এবং পবিত্রতার জন্য ইনি সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন।

পরলোকগত রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

৫১ বৎসর বয়সে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। রাজা প্রফুল্লনাথ জনপ্রিয় ছিলেন এবং দেশের বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি চিত্র-শিল্পের একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর অভাবে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি করের অঙ্কিত চিত্রের সহিত বিচিত্রার পাঠকবর্গের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাঁর বহু চিত্রের প্রতিলিপি বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। বয়সে নিতান্ত তরুণ হলেও এই প্রতিভাবান শিল্পী এরই মধ্যে স্বদেশী এবং বিদেশী বহু গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এঁর দুটি চিত্র সম্বন্ধে মনস্বী রোমাঁ রোলাঁ এইরূপ বলেছেন:—Both show much talent, and each has its own particular style.…I appreciate the quiet and sober colouring in 'The Eternal Commune' in perfect harmony with the grand serenity of the face of Sri Gauranga amidst the tumult of the waves.

সম্প্রতি ইনি প্যারিস যাত্রা করেছেন। তথায় কোনো বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রমন্দিরে যোগদান করে পাশ্চাত্য অঙ্কন-পদ্ধতির কলাকৌশল অর্জন করবার অভিপ্রায়। আপাতত দুই বৎসর তিনি প্যারিসে অবস্থান করবেন ব'লে সঙ্কল্প করেছেন। তরুণ শক্তিশালী শিল্পীর এই নবতর প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

বর্ত্তমান সংখ্যার মনোরম প্রচ্ছদ-চিত্রটি শ্রীযুক্ত চিন্তামণির অঙ্কিত। প্যারিস যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে এই চিত্রটি অঙ্কিত ক'রে দিয়ে তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

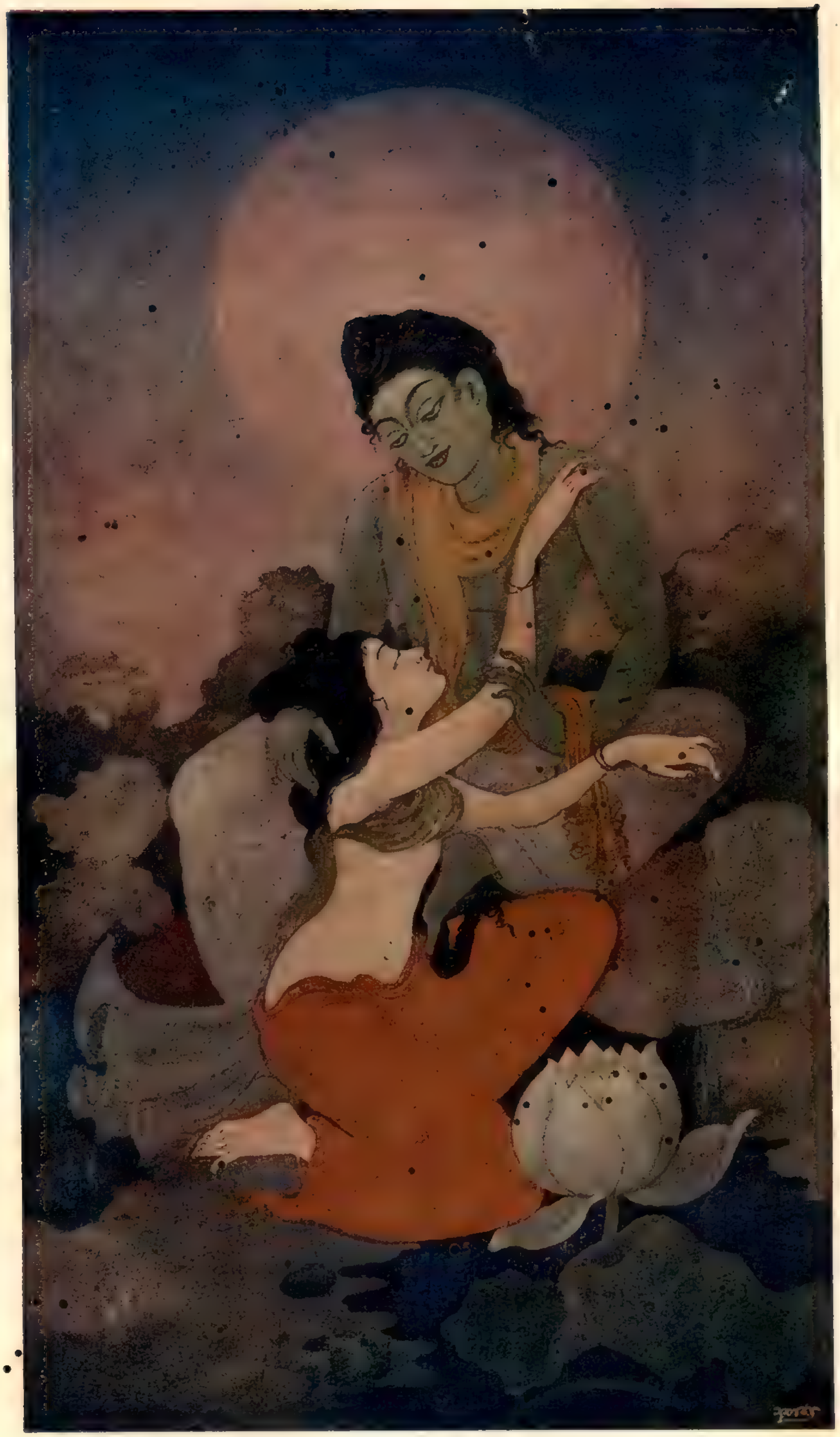

সমর্পণ

শ্রীকুলজারঞ্জন চৌধুরী

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৪৫ | ২য় সংখ্যা

পাখী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

কত পাখী বসে ডালে গান গায় উড়ে চলে যায়,
বাঁধে না কুলায়।
তাহাদেরি তুমি একজনা
চপল চরণা,
আসিলে, গাহিলে গান, ডানা দুটি মেলে
উড়ে গেলে
জানি না সে কোন্ শাখী 'পরে
দূরান্তরে।
শিকড়ে রয়েছি বাঁধা সুকঠিন এই পৃথ্বীতলে
অটুট শৃঙ্খলে।
পত্রে পত্রে শাখায় শাখায়
লক্ষ ডানা মেলি যেন উড়ে যেতে চায়
এই শাখী
হে অচিন পাখী
সন্ধানে তোমার,
বন হ'তে বনান্তরে সাগরের এপার ওপার।

ওই গান
বক্ষে মোর রেখে গেল চিরকলতান।
দুরন্ত আহ্বান যেন নিত্য মোরে ডাকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
খ'সে খ'সে পড়ে পাতা, মুক্ত পক্ষে তারা উড়ে যায়
চৈত্রবায়ে পর্ণবলাকায়,
দীর্ণ করি শীর্ণ শাখা কিশলয় নবীন মঞ্জরী
ওঠে ফুটি, কাঁপে থরথরি।
যেন সে গানের তানে গুমরি গুমরি এতদিন
গুঁড়ির কঠিন বক্ষে ছিল তারা সবে অন্তরীণ,
আলোকে মেলিল আজি আঁখি
শুধায়,—বরণে গন্ধে ফুটালো যে কোথায় সে পাখী?

হায়দর আলি এবং তাঁহার ইউরোপীয় সেনানীবর্গ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

হায়দরের পিতা ফতে মহম্মদ মহিশুর রাজ্যের জনৈক ফৌজদার বা অধস্তন সেনানায়ক ছিলেন। সাহবাজ বা ইস্মাইল নামে হায়দরের দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতা ছিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের নিতান্ত অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। অনন্তর নাবালক পুত্রদ্বয়কে লইয়া তাহাদের জননীর দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সাহবাজ মহিশুরী সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। তখনকার দিনে উৎসাহী কৃতী ব্যক্তির পদোন্নতিতে বিলম্ব ঘটিত না। দেবানপল্লী অভিযানে (১৭৪৯ খৃঃ) ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃতিত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া মহিশুরের দলবাই বা প্রধান সেনাপতি নন্দিরাজ * জ্যেষ্ঠকে বাঙ্গালোর প্রদেশ জায়গীর এবং কনিষ্ঠকে অধস্তন সেনানায়কের পদ দিয়াছিলেন। কর্ণাটক সমরকালে নিজাম নাসিরজঙ্গের সাহায্যার্থ মহিশুর হইতে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল ভ্রাতৃদ্বয়ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সমরাবসানে স্বদেশে ফিরিবার পথে হায়দর পন্ডিচেরী দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় ফরাসীদের দুর্গ, বন্দর, সৈন্যদল, নৌবহর, অস্ত্রশস্ত্র, শিল্পবাণিজ্য বিশেষতঃ অদ্ভুতকর্ম্মা ডুপ্লেকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতির উৎকর্ষই যে ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠার মূল কারণ তাহা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং মহিশুরে ফিরিয়া যাইয়া সাহবাজকে সকল কথা বুঝাইয়া ইউরোপীয় সৈনিকলাভে সমুৎসুক করিয়া তুলিয়াছিলেন। মালবার উপকূল হইতে ক্রমে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতীয় প্রায় ৩০ জন মাল্লা সংগৃহীত হইয়াছিল। উঁহাদের হস্তে হায়দর তাঁহার তোপখানার ভার দিয়াছিলেন। বোম্বাই সরকারের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র কিনিবার জন্য ভ্রাতৃদ্বয় জনৈক পার্সী ব্যবসায়ীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি উঁহাদের নিকট হইতে ছয়টী মেঠো তোপ এবং ২০০০ সঙ্গীন সমেত বন্দুক ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং সাহবাজ এবং হায়দরকেই আমরা প্রথম ভারতীয় সর্দ্দার বলিতে পারি যাঁহারা বন্দুক-বেয়নেটে সজ্জিত সিপাহী সেনা এবং ইউরোপীয় গোলন্দাজদল সংগঠন করিয়াছিলেন।

ডুপ্লের প্রবোচনায় ইহার স্বল্পকাল পরে নন্দিরাজ তাঁহার মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ত্রিচিনপল্লী প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া মহিশুরী সাহায্য লাভ করিয়াও নবাব মহম্মদ আলি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তিনি তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এবারকার অভিযানের নেতৃত্ব হায়দরকে প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। হায়দর ফরাসীদের যুতখানি সম্ভব নিকটে শিবির স্থাপন করিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া ফরাসীরা নন্দিরাজের নিকট অনুযোগ করিলে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন যে উঁহাদের নিকট হইতে সামরিক জ্ঞানলাভের জন্য তিনি তাহাদের সান্নিধ্যকামী; তদ্ভিন্ন তাঁহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। বাস্তবিক হায়দর ফরাসী সৈনিকগণের যাবতীয় কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। উঁহাদের অনুকরণে তিনি নিজ সিপাহীগণকে ড্রিল এবং প্যারেড শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনভ্যস্ততাবশতঃ যখন উহারা হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গীর সহিত ঐ সকল কার্য্য করিত তখন ফরাসীদের আমোদের অবধি থাকিত না। এইরূপে হায়দর পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে কাজ চালাইবার

* বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের মত মহিশুরে এই সময় সেনাপতিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; রাজা শুধু নামেই রাজা ছিলেন।

মত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ফরাসীরা কিন্তু তাঁহার একটি কার্য্য প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। প্রলোভন দেখাইয়া তিনি অনেক ফরাসী সৈনিককে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিলেন। সে কারণ ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি বিষম বিরক্ত হইলেও তখন তাঁহাদের হায়দরকে হাতে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়া সে প্রসঙ্গে কোন বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই। ষ্টেনেট নামক জনৈক ফরাসী সৈনিক এই সময়ে (১৭৫৩ খৃঃ) হায়দরের কর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দেও উহাকে মহিশূরী সেনাদলে গোলন্দাজগণের কাপ্তেন পদে অধিষ্ঠিত দেখা যায়।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সাহবাজের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কোন সন্তান না থাকায় উত্তরাধিকারী রূপে হায়দর তৎপরিত্যক্ত জায়গীর, দুর্গ, সেনাদল প্রভৃতি যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দলবাই তাঁহাকে ভ্রাতার শূন্য সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন। এই সময় হায়দরের নিজস্ব ১৫০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ পদাতিক এবং দুইশতেরও অধিক ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। হায়দর আলি এবং টিপু সমসাময়িক অপরাপর নৃপতিবৃন্দের মত ইউরোপীয় সেনানীবর্গ কর্তৃক পরিচালিত পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহীসেনা গঠনে যত্নবান হন নাই। অশ্বারোহী এবং পদাতিক ইউরোপীয় সৈনিক লাভেই তাঁহাদের আগ্রহ ছিল। এক সময়ে মহিশূরী বাহিনীতে শ্বেতকায় সৈনিকের সংখ্যা আটশতেরও অধিক ছিল। ফরাসী শিল্পীগণের সাহায্যে হায়দর স্বীয় প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পন্দিচেরীর পতনের পর বহু ফরাসী সৈনিক শত্রুহস্ত হইতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া অন্য কোন আশ্রয় স্থলের অভাবে হায়দর সকাশে আগমন করিয়াছিল। প্রখ্যাতনামা কর্ণেল হুগেল, আলে এবং সম্ভবতঃ কনিষ্ঠ লালীও এই সময় তাঁহার কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হুগেল বা আলে'র প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা নাই। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আলসেস প্রদেশের অধিবাসী; সেজন্য তাঁহার এই জর্ম্মণ ধরণের নাম। ইংরাজগণ কর্তৃক পন্দিচেরী অবরোধের সম্ভাবনা দেখা দিলে কাউণ্ট লালী রসদ সংগ্রহ করিবার জন্য থিয়াগার এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হুগেল এবং আলে'র নেতৃত্বে একদল সৈন্য রাখিয়াছিলেন। থিয়াগার দুর্গমধ্যেও একদল ফরাসীসেনা রক্ষিত ছিল। লালীর অনুরোধে হায়দর অবরুদ্ধ ফরাসীগণের সাহায্য জন্য তাঁহার অন্যতম সুদক্ষ সেনানায়ক ও শ্যালক মখতুম আলি খাঁকে পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে থিয়োগার দুর্গস্থিত ফরাসী সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া মখতুম পন্দিচেরী উদ্ধারে আগুয়ান হইয়াছিলেন। হুগেল এবং আলে'ও তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিলেন। পন্দিচেরীর অদূরে আসিয়া পৌঁছিয়া মখতুম শিবির স্থাপন করিলেন; অবরুদ্ধগণের জন্য বহুবিধ আহার্য্য সামগ্রী তিনি দুর্গমধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু লালীকে তিনি কোন মতে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। দীর্ঘ দুই মাস কাল এই ভাবে কাটাইয়া অগত্যা তিনি প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। হুগেলের দলও তাঁহার সহগামী হইয়াছিল। ঐ দলে তখন ১০০ ইউরোপীয় পদাতিক, ২০০ অশ্বারোহী এবং কতকগুলি দেশীয় সৈনিক ছিল। প্রায় তিন বৎসর কাল হুগেল হায়দরের কর্ম্মনিরত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বহুযুদ্ধাভিযানে তিনি প্রভূত সাহায্যকার সাধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাভানুরের অদূরে এক ভীষণ সংগ্রামে কুর্ণুল, কড়াপা এবং সাভানুরের পরাক্রান্ত পাঠান নবাবত্রয়ের পরাজয় সমধিক উল্লেখযোগ্য।

কিরূপে সামান্য হায়দর নায়েক নিজ কর্ম্মক্ষমতার বলে ক্রমে মহিশূর রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব হায়দর আলি খাঁ বাহাদুরে পরিণত হইয়াছিলেন সে ইতিহাস অন্যত্র দ্রষ্টব্য। এখানে শুধু ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের ইতিহাস-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে কিছু বলা যাইতে পারে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর বেদনূর রাজ্য জয় করেন। এই বিজয় লাভ তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী সকল সাফল্যের মূল সোপান বিবেচনা করিতেন। বেদনূর রাজভাণ্ডারের দীর্ঘসঞ্চিত অতুলনীয় ধনরাশি তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। কথিত আছে তিনি শুধু স্বর্ণ এবং রৌপ্য ১২২ কোটি টাকা মূল্যের পাইয়াছিলেন। অভিযান সংশ্লিষ্ট ফরাসী

সৈনিকগণের কাহিনী হইতে প্রকাশ যে জহরৎ এবং মুক্তার পরিমাণ এত অধিক ছিল যে আরব্যাপন্যাস-বর্ণিত কাহিনীর মত তাহা শস্য মাপিবার পাত্র করিয়া ওজন করিতে হইয়াছিল।

বেনুরাধিপতিগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে পর্ত্তুগীজরা উহার কতকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। হায়দর প্রথমে উহাদিগকে ভদ্রভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না দেখিয়া তিনি বাহুবল প্রয়োগে যত্নবান হইলেন। কারবার জেলা দখল করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ রামগড় দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। উহা হস্তগত হইলে পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত জনপদ মধ্যে প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইত। কিন্তু হায়দরের ফরাসী সৈনিকগণ কিছুতেই জাতি অপর এক ইউরোপীয় জাতীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহণে সম্মত হইল না। এমন কি, তাঁহার পরম স্নেহভাজন হুগেল পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে জানাইলেন যে, অধিক পীড়াপীড়ি করিলে বরং তাঁহারা বিপক্ষশিবিরে আশ্রয় লইবেন, তথাপি কোন মতে উহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না। অতঃপর হায়দর পর্ত্তুগীজদের সহিত রফা করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিলেন। ফিরিঙ্গি গোলন্দাজরা যুদ্ধ না করিলে যে সুদৃঢ় রামগড় দুর্গ অধিকার সম্ভবপর নয় তাহা তিনি জানিতেন। এই ঘটনা এবং অন্যান্য আরও দুই একটি ঘটনা হইতে হায়দর বুঝিলেন যে, যদি না সে সময় ইউরোপে সেই জাতির সহিত ফরাসীদের সমরানল প্রজ্জলিত থাকে, কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিলে, তাঁহার ফরাসী সৈন্যদিগের নিকট হইতে তাঁহার কোন সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই।

ইহার স্বল্পকাল পরে হুগেল হায়দর আলির কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। মাদুরার সুবেদার ইউসুফ খাঁ যখন ইংরাজদিগের এবং তাঁহাদের মিত্র আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন, তখন তিনি হুগেলের দল লাভে সমুৎসুক হইয়া ম্যালেট নামক তাঁহার কর্ম্মাধীন জনৈক ফরাসীকে বহু অর্থ দিয়া উহাদের আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। হায়দর যে সহজে হুগেলকে ছাড়িয়া দিবেন না তাহা বুঝিয়া ম্যালেট গোপনে তাঁহার সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়দরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ সহজ ছিল না। তিনি সকল কথা জানিতে পারিয়া হুগেলকে মহিশুর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে সমর নিবৃত্তির সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিল। অতঃপর ফরাসীদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু আর আশা করিবার নাই বুঝিয়া তিনি হুগেলকে বিদায় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি যাহাতে ইংরাজরা তাঁহার আচরণে অসন্তোষের কিছু না পান তজ্জন্য সোজাপথে উহাঁকে মাদুরা যাইতে না দিয়া গোয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইউসুফ খাঁ প্রচুর অর্থে বৃত্তিলাভ করিয়া দুইশত অনুচরসহ গোয়ায় আসিয়া পৌঁছিলেও (জানুয়ারী ১৭৬৪ খৃঃ) হুগেলের কিন্তু তাঁহার নিকট যাইবার কোন আগ্রহ দৃষ্ট হইল না। গোয়া হইতে তিনি দিনেমারদের অধিকৃত ট্রাঙ্কুইবারে গিয়াছিলেন এবং ইউসুফ খাঁর পক্ষে যোগ না দেওয়ার মূল্যস্বরূপ ইংরাজদিগের নিকট ফরাসী ভারতের নবনিযুক্ত গভর্ণর না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার দলের যাবতীয় ব্যয়ভার দাবী করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট তাঁহার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

অতঃপর হুগেল দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দেশীয় দরবারে কর্ম্মলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ কার্য্য কোথাও না পাইয়া তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানেও অধিক দিন থাকিতে ভাল না লাগায় তিনি পুনরায় পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন (১৭৬৯ খৃঃ)। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে বেশীদিন রাখেন নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের সহিত সমরে চেরকুলি বা চিনাকুবালির যুদ্ধে (৩০।৪।১৭৭১) সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

বেদনুর হস্তগত করিবার পর হায়দরের পক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহ অধিকারে সচেষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। মালাবারদেশ এই সময় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ নায়ার সর্দ্দারের আধিপত্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কালিকটের জামোরিণই

সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। নায়ারদিগের সহিত মোপলাদিগের প্রায়ই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। সুতরাং মুসলমান হায়দরকে অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া মোপলারা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছিল। এই সময় উভয় জাতিতে পুনরায় একটি বিরোধ বাধিলে কানানোরের মোপলা-সর্দ্দার আলি রেজা খাঁ হায়দরকে স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাতে ঔদাসীন্য দেখাইবার পাত্র হায়দর ছিলেন না। জামোরিণের নিকট পূর্ব্বেকার দরুণ তাঁহার কিছু অর্থ বাকি ছিল। পুরাতন দাবীর অজুহাতে তিনি সসৈন্যে মালাবার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিকট তখন মাত্র ১২০০০ সৈন্য এবং ইউরোপীয় কোর (corps) ছিল। পক্ষান্তরে নায়ারদের সৈন্য সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উহাদেরও ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গি গোলন্দাজবাহিনী ছিল। যুদ্ধাভিযানের দীর্ঘ বিবরণ অনাবশ্যক। সংক্ষেপে বলা ভাল যে মালাবার জয়ে হায়দরকে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই।

উপকূলভাগের আধিপত্য লাভ করিয়া হায়দর একটি নৌবহর গঠনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আলি রেজার নিজের একটি সুন্দর নৌবহর ছিল। হায়দর তাঁহাকে স্বীয় বহরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনতিকাল পরে আলি-রেজা মালদ্বিভদ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া তথাকার নৃপতিকে বন্দী এবং অন্ধ করিয়া হায়দর সকাশে আনিয়াছিলেন;—সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যে হায়দর সন্তুষ্ট হইবেন। হায়দর কিন্তু স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিলেন না। পরাজিত শত্রুর অকারণ নিগ্রহে তাঁহার ক্ষোভ ও বিরক্তির অবধি রহিল না। তাঁহার নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি আলিরেজাকে পদচ্যুত করিয়া ষ্ট্যানেট নামক জনৈক ইংরাজকে বহরের অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছিলেন।

তখন বর্ষাকাল সমাগত প্রায়। মালাবারের নিদারুণ বর্ষা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। নবজিত জনপদের অদূরে বর্ষাবাস করা মনস্থ করিয়া হায়দর কৈম্বাটুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে ৬ ক্রোশ দূরে মদ্গিরি নামক স্থানে চাঁদ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেবের অধীনে অগ্রগামী একদল সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি এ সময় মহিশুর দরবারে ভাগ্যান্বেষণে নিরত ছিলেন। হায়দর যদি মনে ভাবিয়াছিলেন যে অতঃপর মালাবার প্রদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং নায়াররা আর কোন উৎপাত করিবে না তাহা হইলে সে ধারণা অচিরেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের তিন মাসের মধ্যেই নায়াররা অধীনতা পাশ মোচনার্থ অভ্যুত্থান করিয়াছিল (মে ১৭৬৬)। মদ্গিরির অদূরে পুদিচেরি নামক গ্রামে একদল মহিশুরী প্রহরী সেনা অবস্থিত ছিল। সহসা একদিন গ্রামবাসীগণ অস্ত্রধারণ করিয়া সকলকার প্রাণবধ করিল। পরদিবস মাহে হইতে কয়েকজন ফরাসী সৈনিক কোন কথা না জানিয়া হায়দরের কর্ম্মগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তেজিত জনতার হস্ত হইতে তাহারাও রক্ষা পাইল না। দেখিতে দেখিতে সমগ্র মালাবার উপকূলে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

নায়াররা তাহাদের দেশের ঘোর বর্ষায় অভ্যস্ত ছিল। উহারা আশা করিয়াছিল যে হায়দরের আগমনের পূর্ব্বেই তাহারা কালিকট পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত তাহারা সকল আয়োজন করিয়াছিল যে রাজা সাহেব বা হায়দর কেহই কোন কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই। কালিকট এবং পাণিয়ানি নগরদ্বয় আক্রান্ত হইবার পর রাজা সাহেব নায়ারদের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়াছিলেন। পাণিয়ানির অবরুদ্ধ কিল্লাদার কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক পর্ত্তুগীজ জাতীয় নাবিক তাঁহার নিকট সংবাদ আনিয়াছিল। দুর্গাধ্যক্ষ উহাকে সুপ্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া উক্ত বিপজ্জনক কার্য্যে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। নায়ারদিগের ভয়ে দিবাভাগে যাইতে সাহস না করিয়া ঐ ব্যক্তি সুধু রাত্রিযোগে মাত্র একটি ছোট পকেট-কম্পাস সম্বলে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে প্রবাহিত নক্রসমাকীর্ণ দীর্ঘ নদীপথ বাঁশের ভেলায় একাকী পাড়ি দিয়া মদ্গিরিতে আসিয়া পৌছিয়াছিল।

অনন্তর হায়দর চতুর্দ্দিক হইতে নিজ বিক্ষিপ্ত সেনাবল সমবেত করিয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চি-

চেরী এবং কলম্বো হইতে সদ্যাগত ৩০০ ইউরোপীয় সৈনিক এই সময় তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিল। হুগেলের প্রস্থানের পর তাঁহার শ্বেতকায় সৈনিকগণের সংখ্যা নিতান্ত হ্রাস পাইয়াছিল। উহাদের আগমনে তাঁহার সে ক্ষতি অতঃপর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। লে মেত্র দে লা তুর নবাগত সৈনিকগণের অধ্যক্ষ ছিলেন। উহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা নাই। অপরাপর বহু ভাগ্যান্বেষীর মত তিনিও সর্ব্বপ্রথম ফরাসী সৈনিকের বেশে এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তখন দারুণ বর্ষা;—সমস্ত দেশ জল প্লাবিত। মহিশুরীদের কোথাও বা এক বুক জল ঠেলিয়া কোথাও বা সাঁতার দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। হায়দর যে অত শীঘ্র আসিয়া দেখা দিবেন নায়াররা তাহা মনে ভাবে নাই। পণ্ডিয়াগড়ি নামক স্থানের অদূরে উহারা শত্রু পক্ষকে বাধাদানে দাঁড়াইল। হায়দর নিজ সেনাদল তিন অংশে বিভক্ত করিয়া বামপ্রান্তের ভার জনৈক ইংরাজ সেনানায়ককে এবং দক্ষিণপ্রান্তের ভার গোয়া হইতে সমাগত একজন পর্ত্তুগীজ জাতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেলকে * দিয়া স্বয়ং কেন্দ্রদেশে মূল বাহিনী লইয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রিজার্ভ সেনাদল ও ইউরোপীয়গণ অবস্থিত ছিল। উভয় সেনাদলের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত খাত ছিল। হায়দরের নিকট হইতে শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিবার আদেশ পাইয়া পর্ত্তুগীজ সেনানায়ক নিজ সৈনিকগণকে ঐ নালার প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহার সকল সাহস বিলুপ্ত হইয়াছিল; তিনি আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া সেইখান হইতে উহাদের প্রতিপক্ষের প্রতি গুলি চালাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হইতে মুষলধারে গুলিবৃষ্টি করিয়া নায়াররা উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত মহিশুরীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। অকারণ লোকক্ষয়ে হায়দরের ক্রোধের অবধি রহিল না। কর্ত্তব্যের সম্মুখে তিনি লক্ষ সৈনিকের দেহত্যাগে কাতর হইতেন না; কিন্তু একটি লোকেরও অকারণ মৃত্যু তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দে লা তুর এ যাবৎ স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইবার কোন সুযোগ পান নাই। তিনি হায়দরের নিকট ইউরোপীয়গণ ও রিজার্ভদল সহ সিপাহীদের নেতৃত্ব লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ফরাসীরাও মদ্‌গিরিতে নিহত সহযোগীবৃন্দের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা মহোৎসাহে দ্রুত ধাবনে ব্যবধানপথ মধ্যবর্ত্তী খাত অতিক্রম করিয়া ভীমবেগে শত্রুসেনার প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। সে আক্রমণের বেগ রোধ করার সাধ্য নায়ারদের হইল না। ফিরিঙ্গিদিগের বীরত্বে ও সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মহিশুরী বাহিনী শত্রুকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। কিন্তু নায়াররা আর তাহাদের বাধা দিতে দাঁড়ায় নাই।

হায়দর সৈনিকগণের কৃতিত্বে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। দেলাতুরকে তিনি "বাহাদুর" উপাধিসহ দশহাজারী মনসবদারী এবং তোপখানার অধ্যক্ষপদ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈনিককে তিনি ৩০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। আহতদিগকে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। ফিরিঙ্গিদের অসমসাহসিক কাণ্ডে মলাবারীদের প্রাণে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া হায়দর তাহাতে ইন্ধনদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে ফিরিঙ্গি স্থান হইতে শীঘ্রই তাঁহার অনেক সৈন্য আসিবে। উহারা নরমাংসলোলুপ দুর্দ্দান্ত জীব। নায়ারেরা শীঘ্র বশ্যতাস্বীকার না করিলে তিনি উহাদের হস্তে তাহাদিগকে

---

* প্রসিয়াধিপতি ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সামরিক ব্যায়ামের উৎকর্ষ জন্য ইউরোপের অন্যান্য সকল রাষ্ট্র তাহা গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া হায়দর তাহা নিজ সৈন্যদলে প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া গোয়া, পন্দিচেরী, মান্দ্রাজে উপযুক্ত শিক্ষকের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার ফলে গোয়া দরবার ঐ ব্যক্তিকে হায়দর সমীপে পাঠাইয়া দিয়াছিল। যুদ্ধে উহার অযোগ্যতা দর্শনে হায়দর তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরদিবস কোন কারণে উভয়ের মধ্যে বচসা হইয়াছিল। ইহাতে নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া কর্ণেল কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সামন্তা করিবার ভার দিবেন। বৈরনির্য্যাতনপরতন্ত্র ফরাসীসৈনিকগণ যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল তাহা হইতে জনসাধারণের মনে হায়দরের সকল কথা সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা অবাধ্যতাচরণ হইতে নিরস্ত হইয়া মহিশুরী শাসন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

দে লা তুর এই সময়ের কতকগুলি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সকলগুলি প্রদান করা সম্ভব নহে; সংক্ষেপে শুধু দুই একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়ারদের সহিত যুদ্ধকালে হায়দর চন্দ্রাও নামক একজন মারাঠা সর্দ্দারকে চারি হাজার বর্গী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার দিয়াছিলেন। লোকটী নিতান্ত কৃপণ ও অর্থগৃধ্নু ছিল। আবশ্যকমত অর্থব্যয় না করাতে তাহার সৈনিক সংগ্রহ হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। ধীর মন্থরগতিতে প্রায় বৎসরকাল পরে মারাঠারা যখন আসিয়া দেখা দিয়াছিল তখন আর তাহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। উহাদের না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা। সৈনিক না বলিয়া উহাদের একদল লুণ্ঠনলোলুপ দস্যু বলাই অধিকতর সঙ্গত ছিল। উহাদের দেখিয়াই হায়দরের চক্ষুস্থির হইয়াছিল। তিনি তাহাদের বলিয়াছিলেন যে সময়টা তাহারা অকারণ নষ্ট করিয়াছে সে সময়ের বেতন তিনি দিবেন না। বলা বাহুল্য এ ধরণের কথা শুনিতে মারাঠারা অভ্যস্ত ছিল না। তাহারা সক্রোধে জনাইয়াছিল যে এক ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের দাবী মিটান না হইলে তাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিবে।

হায়দরের নিকট তখন মাত্র ৩০০ এবং দে লা তুরের দলের ৩০ জন সৈনিক ছিল। উহাদের লইয়া চারি হাজার উত্তেজিত বর্গীর মোহড়া লওয়া যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সৌভাগ্যক্রমে মারাঠারা মুখে আস্ফালন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল। তাহারা সহসা কিছু করিতে সাহস করিল না। বাহুবলে উহাদের নির্জ্জিত করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও সে কার্য্য শান্তভাবে সাধিত হয় তাহা হায়দরের অভিপ্রায় ছিল। দে লা তুরকে তিনি সে কথা বলিয়া বাগীদের শান্ত করিবার ভার দিয়াছিলেন। "ফরাসী সেনাপতি হায়দর তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছিলেন নিজেকে তাহার উপযুক্ত দেখাইতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন এবং কীদৃশ গুরুভার তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইয়াছে তাহা বুঝিলেও মহোৎসাহে তাহা সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।" মদ্‌গিরির ফৌজদারকে যত অধিক সম্ভব টোপাসী * সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার এবং তাঁহার ফরাসী সৈনিকদের তথা হইতে যথাসম্ভব কৈম্বাটুরে আসিবার আদেশ দিয়া তিনি মারাঠা-সর্দ্দারের নিকট একবার সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নিজেদের অবস্থাও কোন মতে উহাদের অপেক্ষা ভাল নহে; কারণ নায়ারদিগের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহারা মহিশুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া তখন নবাবের সহিত তাঁহাদের বেতন ভাতাদি সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই। সুতরাং নিজেদের স্বার্থরক্ষাকল্পে ফরাসীরা ও মারাঠারা যদি একযোগে কাজ করে তাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। নবাব তাহাদের সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ দুই এক দিনের মধ্যে কৈম্বাটুরে আসিবে; যতদিন না তাহারা আসিয়া দেখা দেয় ততদিন চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত। ইতোমধ্যে তিনি একবার নবাবের নিকট কথাটা পাড়িয়া দেখিবেন বলিলেন। মারাঠারা তাঁহার সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

মদ্‌গিরিতে তখন প্রায় ৪০০ ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। পরদিবস প্রায় সারাদিন ধরিয়া উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কৈম্বাটুরে আসিতে লাগিল। প্রত্যেক দলই আসিয়া বলিল যে মূল বাহিনী তাহাদের পিছনে আসিতেছে। সন্ধ্যার পর বাদ্যভাণ্ডসহকারে টোপাসীরা আসিয়া দেখা দিল। অন্ধকারে তাহাদের টুপি এবং ব্যাণ্ড হইতে মারাঠারা ভাবিল

* টোপাসী কথাটার প্রকৃত অর্থ টুপীপরিহিত ব্যক্তি। বর্ণসঙ্কর পর্ত্তুগীজদের তাহাদের ইউরোপীয় টুপীর জন্য উক্ত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে টোপাসীদের দলে বহু বিভিন্ন ব্যক্তি স্থান পাইত। উহাদের সকলের ইউরোপীয় উৎপত্তি সন্দেহস্থল ছিল। তোপখানার ভার প্রধানতঃ টোপাসীদের হস্তে থাকিত।

বুঝি বা এবার প্রধান দল আসিল। উহাদের পক্ষে ফিরিঙ্গি-দের প্রকৃত সংখ্যা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। মারাঠারা উহাদের বাস্তবিক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়াই মনে ভাবিল।

পরদিবস দে লা তুর চমরাজকে বলিলেন যে হায়দরের সহিত তিনি দেখা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে যে সর্ত্ত দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত মনে না হওয়ায় তাহাতে সম্মত হইয়া আসিয়াছেন এই আশায় যে মারাঠাদের মত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনও অবুঝ হইবেন না। বলা বাহুল্য তিনি হায়দরপ্রদত্ত পূর্ব্বেকার সর্ত্তগুলির পুনরুক্তি করিলেন মাত্র। ইহাতে বিরক্ত হইয়া মারাঠারা দরবার হইতে প্রস্থান করিল। গভীর নিশীথে লালী নামক দে লা তুরের জনৈক এডজুটাণ্ট তাঁহার আদেশে কয়েকটী কামান সহ মারাঠা-শিবিরের অদূরে স্থান পরিগ্রহণ করিলেন। সকালে উঠিয়া কামানসমূহের পার্শ্বে বর্ত্তিকাহস্তে ফরাসী গোলন্দাজদের দেখিয়াই মারাঠাদের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল। হায়দর এইরূপে তাঁহার ইউরোপীয় সেনাপতির কৌশলে অনায়াসে একদল অপদার্থের জন্য অহেতুক অর্থব্যয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন এবং স্বীয় প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে দেহরক্ষী দল গঠনের অনুমতি সহ তজ্জন্য কুড়িটী সুন্দর ঘোটক উপহার দিয়াছিলেন। বক্সীকে তিনি ফরাসীদের বেতনাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। দে লা তুর বলেন যে উহাদের দাবী অত্যধিক মনে হওয়ায় বক্সী তাহা দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থ অত্যল্পবোধে ফরাসীরা লইতে চাহে নাই। এ সংবাদে হায়দর নাকি উহাদের নিজ সমক্ষে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন "শুনিলাম বক্সীর সহিত তোমাদের মতভেদ হইয়াছে। তাহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত। তোমরা আমাকে সকল কথা বল নাই কেন? তোমরা কি জান না, তোমরা আমার কত প্রিয়? আমার যাহা কিছু আছে সবই আমি তোমাদের দিতে পারি।" অনন্তর তিনি বক্সীকে উহাদের নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং পর দিবস স্বীয় আবাসে এক ভোজে উহাদের সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।*

এবারে দ্বিতীয় কাহিনীটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। মেকুইনেজ নামক হায়দরের একজন পর্ত্তুগীজ জাতীয় সৈনিক ছিল। দীর্ঘকাল পরম বিশ্বস্তভাবে প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া মারাঠাদের সহিত একযুদ্ধে ঐ ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হায়দর তদীয় বিধবা পত্নীকে তাহার মৃত্যুর পর কর্ণেল পদসহ রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন। মাদাম সৈন্যগণের সহিত সর্ব্বত্র যাইতেন, উহাদের কুচকাওয়াজাদি নিয়মিত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাহাদের বেতন তাঁহার হস্তেই প্রদত্ত হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তাহাদের পরিচালন করিতেন। হায়দর আদেশ দিয়াছিলেন মৃত মেকুইনেজের নাবালক পোষ্যপুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া অবধি এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

এখনকার মত তখনার দিনেও স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের অগোচরে সংসার খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু জমাইতে ভালবাসিত। ইউরোপীয় বা খৃষ্টীয় মহিলারা সঞ্চিত অর্থ নিজেদের কাছে না রাখিয়া সাধারণতঃ পাদ্রিগণের নিকট গচ্ছিত রাখিত। স্বামী বা অপরাপর আত্মীয়বর্গ ঐ টাকার কথা অনেক সময় কিছু জানিত না। সুতরাং দৈবক্রমে কাহারও মৃত্যু হইলে পাদ্রিমহাশয়ই লাভবান হইতেন। তবে সাধারণতঃ উঁহাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে দেখা যাইত না। মাদাম মেকুইনেজও স্বীয় অর্থালঙ্কারাদি জনৈক পর্ত্তুগীজ জেসুইটপাদ্রির নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালাধি-পতি স্বীয় অধিকার মধ্যে জেসুইট-সম্প্রদায় নিরোধ করিবার আদেশ দিলে উক্ত পাদ্রি স্বীয় রাজভক্তি দেখাইবার জন্য মহিশুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনমানসে গোয়ায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মাদাম তাঁহার নিকট গচ্ছিত সম্পত্তি দাবী করিলে তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে আসিবার সময় তিনি জিনিসগুলি জেভিয়ারপল্লীয়ম নামক স্থানের পাদ্রির নিকট রাখিয়া আসিয়াছেন। বিবি মেকুইনেজ তাঁহাকে ঐ গুলি প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলিলেন। মাদাম নবাব সরকারে অভিযোগ করিলে হায়দর দে লা তুরের হস্তে বিচারের ভার দিয়াছিলেন।

* এ সকল কথা কিন্তু সত্য বলিয়া মনে হয় না। উত্তর কালে হায়দরের লালীকে বেতন দানে এ প্রকার দাক্ষিণ্যের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট কার্পণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরদিবস মাদাম বিচার সভায় নিতান্ত কাতরভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জেস্যুইট পাদ্রির বিশ্বাস ভঙ্গ যে তাঁহাকে দুর্ভাগ্যের চরমে নিক্ষেপ করিয়াছে সেজন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে বহু কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়া তিনি স্বীয় অনুকূল একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের অনেকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া মনে মনে জেস্যুইটদিগের নিপাৎ কামনা করিতে লাগিল। পাদ্রিমহাশয় দে লা তুরকে স্বীয় বক্তব্য একান্তে বলিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই প্রকার ছিল :—"মহাশয়, নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্প্রদায় মধ্যেও কখন কখন জুডাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যাহার জন্য আমরা এই বিপদে পড়িয়াছি তাহাকেও উক্ত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ঐ ব্যক্তি গোয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি উহার সম্বন্ধে অপযশকর কিছু শুনিয়া তাহাকে সবিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়াতে উহার সকল কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করি। গোয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সে ম্যাঙ্গালোর গিয়াছে শুনিয়া আমিও সেখানে গিয়াছিলাম এবং ফৌজদারের সাহায্যে তাহাকে আটক করিয়া সাধারণে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলাম যে উহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন দাবী থাকিলে সে যেন কালবিলম্ব না করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। দাবীদারগণের মধ্যে মাদাম মেকুইনেজও ছিলেন। তিনি চুণী বসান একজোড়া বালা, একছড়া মুক্তার মালা এবং নগদ ২০০০৲ টাকা ফেরৎ লইয়া গিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ কুঠিতে এ বিষয়ে দলিল পত্র লিখিত হইয়াছিল। ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল তাহার সাক্ষী ছিলেন। আমি পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত রসিদের নকল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা উহা দিতেছেন না। আপনার পক্ষে সুবিচারের জন্য উহা পাওয়া আবশ্যক। নবাবের নামে কোন ফরাসী কর্ম্মচারীকে এ কার্য্যে পাঠাইবেন এবং তাহাকে বলিয়া দিবেন যেন সে পর্ত্তুগীজদের কোন আপত্তিতে কান না দেয়। সকল কার্য্য সঙ্গোপনে করা প্রয়োজন, নবাবের সমর-সচিব নরীমরাও (?) যেন কোন কথা জানিতে না পারে, নতুবা তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল সব কাগজপত্র গোয়ায় সরাইয়া ফেলিবেন। আমার বিশ্বাস নবাবের উক্ত মন্ত্রী, পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল, জেস্যুইট পাদ্রি এবং মাদাম মেকুইনেজ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।"

পরদিবস মাদাম আসিলে দে লা তুর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছি ছি! এ তুমি কি করিয়াছ? স্বেচ্ছায় এ বিপদ কেন ডাকিয়া আনিলে? নবাবের দয়ায় ত তোমার অর্থের অভাব নাই। তবুও একজন বিধর্ম্মী এবং একজন ভণ্ড পাদ্রির সহিত হেয় চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া "চর্চ্চের" সম্পত্তি লোভ করিতে তোমার এতটুকু সঙ্কোচে বাধিল না। এখনও যদি সত্য কথা স্বীকার কর তবে আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি। সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। মঙ্গোলোর হইতে ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ কুঠিয়ালদ্বয় এখানে আসিতেছেন। যদি বাঁচিবার বাসনা থাকে এখনও সত্য কথা স্বীকার কর। নবাবের ন্যায়নিষ্ঠা তোমার অজানা নয়। তোমার জুয়াচুরি ধরা পড়িলে তিনি কি ভীষণ শাস্তি দিবেন তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ।"

মাদাম এরূপ পরিণতি আশঙ্কা করেন নাই। তরে তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি সকল কথা স্বীকার করিলেন, বলিলেন নরীমরাও এবং জেস্যুইট মিসনারীর পরামর্শে তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাদী ফাদার বৃথাপবাদ হইতে রক্ষা পাইয়া প্রথমে পরমপিতার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়া দে লা তুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি নবাবের নিকট সকল কথা প্রকাশ না করেন, কারণ তাহাতে স্ত্রীলোকটীকে বড় বিপদে পড়িতে হইবে। দে লা তুরের নিকট গোলমাল মিটিয়া যাইবার সংবাদ পাইয়া হায়দর বলিয়াছিলেন "মাননীয় ফাদারগণের বিরুদ্ধে ইহা চক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। শুনিয়াছি বিবির স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তিনি এখনও সাবধান না হইলে পরে আবার নূতন কোন বিপদে পড়িতে পারেন। তোমরা যখন উহাকে মার্জ্জনা করিয়াছ আমি আর তখন কিছু করিব না।"

হায়দরের কথাই ফলিয়াছিল। মাদাম কিছুকাল পরে একজন ফিরিঙ্গি-পর্ত্তুগীজ সার্জ্জেণ্টকে বিবাহ করেন। ইহাতে হায়দর তাঁহাকে সার্জ্জেণ্ট-পদে নামাইয়া দিয়া তদুপযোগী বেতন তাঁহাকে দিবার জন্য বক্সীকে আদেশ দিয়া-

ছিলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত বীরসৈনিক মেকুইনেজের বিধবা যাহাতে অভাবগ্রস্তা না হন সে বিষয়ে অবহিত থাকা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু মাদাম তাঁহার পরলোক গত স্বামীর স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা না করায় অতঃপর উহার সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন দায়ীত্ব ছিল না।

এই সময় দে লা তুরের পরামর্শে হায়দর এক কোর গ্রিনে-ডিয়র বা পাশ্চাত্য ধরণের পদাতিক সেনা গঠন করিয়া-ছিলেন। উহাতে দশ ব্যাটালিয়নে মোট পাঁচ হাজার সৈনিক ছিল। তন্মধ্যে শুধু দুইটি ব্যাটালিয়ন টোপাসী বা মেটে ফিরিঙ্গি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যাটা-লিয়ন আবার চারিটী কোম্পানীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কোম্পানীর নেতৃত্বে একজন ইউরোপীয় এডজুটাণ্ট ও সার্জ্জেণ্ট-মেজর এবং প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষ পদে একজন কমিশন প্রাপ্ত অফিসর নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ সিপাহীদের মাসে ৮৲ টাকা বেতন দেওয়া হইত, কিন্তু গ্রিণেডিয়রদের বেতন ছিল মাসিক ১০৲ টাকা। তদ্ভিন্ন উহাদের আরও কয়েকটী বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইত। তাহাদের কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে অথবা শাস্ত্রীর প্রহরা দিতে হইত না। আদেশ-প্রাপ্তিমাত্রে গমনাগমনের সুবিধার জন্য প্রতি সাতজন সৈনিকের জন্য একজন পাচক, ভৃত্য এবং আবশ্যকীয় ভারবাহী বলিবর্দ্দ থাকিত। প্রত্যেক কোম্পানীতে সাতজন করিয়া শিক্ষানবীশ সৈনিক থাকিত। দলের সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং নিহত ব্যক্তিগণের স্থলাধিকার করিবার জন্য উহারা রক্ষিত হইত। সকালে সিপাহীরা অফিসরদের কাছে লক্ষ্যভেদ করিতে শিখিত; বৈকালে তিনটা হইতে ছয়টা অবধি দে লা তুর পালা করিয়া ব্যাটালিয়নগুলিকে কাওয়াজ করাইতেন। তাহার পর দুই ঘণ্টাকাল তাহারা মার্চ্চ করিতে বাধ্য হইত। যাইবার সময় যে পথ তাহারা সহজ গতিতে যাইত ফিরিবার সময় সেই পথ তাহাদের দ্রুতধাবনে অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপে অনতিকাল মধ্যে হায়দর এমন একটী বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন যাহাদের আশুগতি উত্তরকালে তাঁহার অনেক সাফল্যের কারণ হইয়াছিল।

টার্ণার নামে হায়দরের একজন আইরিশ সৈনিক ছিল। মান্দ্রাজের গভর্ণর বুর্শীয়ের অনুরোধে তিনি উহাকে কর্ম্মদান করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি প্রথম ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষ ছিল এবং মালাবারের যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। নবাব তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বিশ্বাস করিয়া অনেক দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার উহাকে দিতেন। টার্ণার কিন্তু সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখে নাই। ইংরাজ গভর্ণর কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে সুপারিশ করা লোককে কর্ম্মে গ্রহণ করা নবাবের উচিত হয় নাই। হায়দর প্রতিমাসের পাঁচ তারিখে সৈন্যদের বেতন দিতেন; ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষের হস্তে তাহা দেওয়া হইত, তিনি সকলকে নিজ নিজ প্রাপ্য মিটাইয়া দিতেন। এই সময় একবার সিপাহীরা টার্ণারের নিকট বেতন আনিতে গেলে সে উহাদের পরদিন সকালে আসিতে বলিল, জানাইল মুন্সি না থাকায় তখন টাকা দেওয়া সম্ভব নহে। রাত্রি সমাগত হইলে টার্ণার উক্ত অর্থ এবং নিজ যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি সহ পলায়ন করিল। জনৈক সুইডেনদেশাগত তরুণ সৈনিক তাহার সহগামী হইয়াছিল। উহারা ভৃত্যদের বলিয়া গিয়াছিল যে তাহারা কৈম্বাটুরে প্রধান সেনাপতির ভবনে নৈশভোজনে যাইতেছে। তাহার অল্প পরে কয়েকজন অফিসর সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া টার্ণারের গৃহে আসিয়াছিল এবং ভৃত্য-গণের নিকট তাহার কৈম্বাটুর গমনের সংবাদ পাইয়া তাহারাও তথায় গমন করিয়াছিল। উহারা মনে ভাবিয়াছিল পথিমধ্যে তাহাদের টার্ণারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু কৈম্বাটুরে আসিয়া সকলকে সুপ্তিমগ্ন দেখিয়া উহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। দে লা তুরের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া উহারা তাঁহাকে সকল কথা জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সন্ধান লইবার আদেশ দিলেন। কিছু পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে দুইজন ইউরোপীয়কে অশ্বারোহনে কোচীনের পথে যাইতে দেখা গিয়াছে। কাপ্তেন মিনার্ভা নামক এক-জন আইরিস অফিসার ৫০ জন ইউরোপীয় সৈনিক সহ উহাদের অনুসরণে প্রেরিত হইলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে কোচীন রাজ্যের সীমানার অদূরে এক পরিত্যক্ত কুটির মধ্যে পলাতক যুগলকে সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় ধৃত করিয়া তিনি শৃঙ্খলবদ্ধাবস্থায় কৈম্বাটুরে আনিয়াছিলেন।

অনুরূপক্ষেত্রে ফিরিঙ্গিস্থানে যাহা হইয়া থাকে হায়দর সেইমত উহাদের বিচারের আদেশ দিয়াছিলেন। কোর্ট-মার্শালের বিচারে বিনানুমতিতে দল হইতে পলায়ন এবং সহকারী তহবিল তছরুপ অপরাধে উহাদের প্রতি অবমাননার সহিত পদচ্যুতি এবং তৎপরে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। সুইডিস সৈনিক নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিল এবং সে রাজকোষের অর্থ অপহরণ করে নাই শুধু বিনানুমতিতে সেনাদল পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাও আবার টার্ণার কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া করিয়াছিল এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া সামরিক আদালত নবাবকে উহার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। বিচারকালে টার্ণার কতকগুলি অদ্ভুত স্বীকারোক্তি করিয়াছিল;—বলিয়াছিল যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিজামের সহযোগিতায় হায়দরকে আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য আবশ্যকীয় গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। মৃত্যুদণ্ডই যে তাহার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি তাহা মানিয়া লইয়া টার্ণার বিচারকগণকে অনুরোধ করিয়াছিল যে তাহার স্বীকারোক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা যেন ফাঁসীর পরিবর্ত্তে তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার আদেশ দেন? বলা বাহুল্য তাঁহারা উহার এ শেষ প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে টার্ণার মিনার্ভাকে অন্তিম স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ স্বীয় অসি ও ঘড়ি উপহার দিয়াছিল এবং নিজ অর্থাদি যে সকল সৈনিকের প্রতি তাহাকে বধ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সকলকে দেখাইবার জন্য মৃতদেহ পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। টার্ণারের আচরণ যত নিন্দনীয় হউক না কেন মৃত্যুকালে সে যথেষ্ট নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিল। মান্দ্রাজ সরকারের কার্য্যও নিতান্ত অল্প গর্হিত ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত সুইডিস সৈনিককে হায়দর কিছুকাল পরে বলিয়াছিলেন যে বিবি মেকুইনেজকে সে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বপদে গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু সে প্রস্তাব ঐ ব্যক্তি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে জানাইয়াছিল যে উহার মত হীন চরিত্র স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পরিবর্ত্তে সে সহস্রবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। তাহার সাহস ও চিত্তের দৃঢ়তায় প্রীত হইয়া হায়দার তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

STUDENTS P.G.A COMMON ROOM

প্রতীক্ষা

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

আসিবে অজানিতে যদি তা' জানিতাম,
তবে কি পথ চাহি দিবস যাপিতাম ?
নয়নে ঘুমঘোর, নীরব নিশীথিনী,
চরণ-ধ্বনি তব স্বপনে যেন চিনি,—
জাগিয়া দেখি বারি ঝরিছে অবিরাম !

এমনি কত গেল দিবস বিভাবরী,
বরষা এল কত দু' কূলে নদি ভরি',
লাগিল হিম-শীতে কাঁপন দুরু দুরু ;
কত কি হোলো সারা, কত কি হোলো সুরু।
জানি নে গেলে কবে হৃদয় হ'তে সরি' !

একদা হেরি চেয়ে আকাশ মেঘে ঢাকা,
আকুল দিঠি মম রুধিল পথ বাঁকা।
হিয়ার মাঝে দেখি আহা কি মরি মরি—
পরশ দিয়ে তব বক্ষ আছ ভরি' !

———

বিস্ময়

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

এ কি বিচিত্র বিস্ময় !

আলোর মাঝে আলো হারাই,
আলোতে চোখ মেলিয়া ধাই,—
আলোক তবু খুঁজে না পাই
সারা বিশ্বময় ।
এ কি বিচিত্র বিস্ময় !!

জীবনের কোন্ সকাল বেলায়
অবিশ্রান্ত কোলাহলে,
অজানিত অবহেলায়
আনন্দ সব গেল চলে ;

আঁধারে সেই বেদনা বুকে
বাজিল যবে গভীর দুখে,
চোখে তখন কি কৌতুকে
আলোর ধারা বয় ।
এ কি বিচিত্র বিস্ময় !!

সুশান্ত সা

তৃতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

১

* * *

বিশেষ কিছু বিবেচনা না করে কেবল একটা মনের উত্তেজনাতেই পশ্চিমে রওয়ানা হয়েছিলাম। রওয়ানা হওয়ার মধ্যে প্রাণে একটা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম, একটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। মনকে বুঝিয়েছিলাম—এ অপমান আমি চুপ করে কখনও সইব না, এবং একটা বিহিত আমাকে নিশ্চয়ই করতে হবে, গন্নুকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে আসব আমার কাছে, তা সে-পথে যত বাধাই থাকুক না কেন। ভেবেছিলাম—এখন দিন কয়েক দূর দূর পশ্চিমে ঘুরে আসি, মনটাও একটু শান্ত হোক তারপর এর বিষয় যা হয় একটা বিহিত করব। কি করা যায়—এই ভাবনা নিয়ে চুপ করে সেই মাধবপুরের বাড়ীতে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে তখন অসম্ভব হয়েছিল।

আরও একটা দিক দিয়ে সেই সময় মাধবপুর ছেড়ে যাওয়াটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিল। দাসমশাই ফিরে আসবার ২।১ দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার মনের ঐ অবস্থায় ও-সময় মাধবপুরের বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকলে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে আমার ও সাবিত্রীর মধ্যে। দাসমশাই ফিরে আসবার পর সমস্ত ব্যাপারটা সাবিত্রীকে যখন বললাম সাবিত্রী চুপ করেই রইল—আমার মনের সেই উত্তেজনায় কোনও রকম সহানুভূতি বা সাড়া কিছুই পাওয়া গেল না তার কাছ থেকে। "পাপের পুরী" বলে তুষার তারেও কি রকম অপমান করেছে সে কথাও সাবিত্রীকে শুনিয়ে দিতে ছাড়িনি, কিন্তু তবুও সেই একই ভাব। আমার মনের এই দিকটার সঙ্গে যেন তার সম্পূর্ণ অসহযোগ, কোনও কথাই যেন সে কইতে রাজী নয়। কথাগুলো সব শেষ করে, একটু চুপ করে থেকে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত যখন বললাম "কথাগুলো সব শুনলে ত?"

তখন শুধু বললে, "ও টাকা বন্ধ করার তোমার কি অধিকার আছে?"

"অধিকার? আমার মনের জোরের অধিকার। আইন কানুন হিসাবে ত কোনও কাজই হচ্ছে না।"

বললে, "কি জানি।—এসব কথা আমাকে বলে কোনও লাভ নেই। আমি এ সব বুঝি না।"

এই বলে উঠে চলে গেল; এবং দিন ২।৩ বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা না বলে গম্ভীর ভাবেই কাটিয়ে দিল—এটাও আমি লক্ষ্য করেছিলাম। এবং সাবিত্রীর ঐ রকম ধরণে আমার মনেও ধীরে ধীরে একটা বিরক্তির সঞ্চার হচ্ছিল—এ কথাও অস্বীকার করব না।

দু তিন দিন পরে যখন বিদেশ যাওয়ার কথাটা বললাম তখন সাবিত্রীর মুখে যেন একটু হাসি ফুটল এবং যেদিন গরুর গাড়ী করে সত্য সত্যই আমরা রওয়ানা হলাম—সাবিত্রীর আনন্দ উৎসাহ যেন আর ধরে না। সাবিত্রীদের বাড়ীর পিছন দিককার সেই ঘন বেত বনের পাশ দিয়ে সদর রাস্তা ধরে যখন আমাদের গাড়ীখানি হেলে দুলে খুলনা অভিমুখে যাচ্ছিল, সাবিত্রী গাড়ীর ছইয়ের ভিতর হতে একটু মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই বেতবনের ঝোপের দিকে। সাবিত্রীর দিকে চেয়েই আমার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা কথা—সেই আমার দেশ ছেড়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে যাওয়ার দিন, যেদিন সাবিত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল ঐ বেতবনের মধ্যে, একদৃষ্টে চেয়েছিল আমারই গরুর গাড়ীর পানে।

বললাম, "মনে পড়ে?"

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে একটু মাথা দুলিয়ে ঈষৎ একটু হেসে কেমন যেন এক রকম করুণ ভাবে চাইল।

মুখে বললে, "হ্যাঁ"।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে নিয়ে বললাম, "উঃ—কতকাল আগেকার কথা! তখন কী জীবনই না ছিল!"

আলী মিঞাকে যখন বলেছিলাম যে আমি সাবিত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন তীর্থ পরিদর্শন করবার জন্য দূর বিদেশে রওয়ানা হচ্ছি তখন কোথায় কোথায় যাব, কোথায় কোথায় কতদিন থাকব—এসব কথা আলীমিঞা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু আমি কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিই নাই।

বলেছিলাম, "আমার কিছু ঠিক নাই, যা হয় খবর পাবেন।"

মনে মনে ঠিক করেছিলাম—খবর আমি কিছুই দেব না; আমার সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে, আমার সমস্ত অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কেটে দিন কয়েক সাবিত্রীকে নিয়ে থাকতে চাই—নতুন আবহাওয়ায় নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। যতদূর সম্ভব অতীতটাকে ভুলেই যেতে চাই—অন্ততঃ কিছু দিন।

এ কথাটা শুনলে সাবিত্রী অত্যন্ত খুসী হবে বুঝে গরুর গাড়ীতেই সাবিত্রীকে কথাটা বললাম। বললাম, "কারুকে কোনও চিঠি দেব না, বুঝলে? দেশের দশের জমিদারীর কোনও খবর রাখব না। কারুকে জানতেও দেব না আমরা কোথায় কি অবস্থায় আছি। সমস্ত ভুলে গিয়ে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে কেবলমাত্র তোমাকে নিয়ে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে থাকতে চাই—অন্ততঃ কিছুদিন। কি বল?"

একমুখ হাসি হেসে সাবিত্রী আমার দিকে চেয়ে বললে, "সত্যি? তুমি তা পারবে ত?"

বললাম, "নিশ্চয়ই। দেখে নিও।"

তাড়াতাড়ি সাবিত্রী বললে, "তা হলে ত—"।

হঠাৎ চুপ করে গেল। যেন বলতে চেয়েছিল তা হলে ত তার সুখের সীমা পরিসীমা থাকবে না। এ জীবনে এর চাইতে সুখের অবস্থা সে যেন কল্পনাও করতে পারে না।

দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি উত্তর ভারতবর্ষের সমস্ত নামজাদা ভাল ভাল স্থানগুলি মাসখানেক ধরে ঘুরে বেড়ালাম আমি ও সাবিত্রী এবং এলাহাবাদে এসে যেদিন বেলা ১১টার সময় নামলাম সেদিন ৫ই ভাদ্র।

এলাহাবাদে দিন দুই থেকে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে দুজনে এক সঙ্গে স্নান করে কাশী অভিমুখে রওয়ানা হব—আমাদের এই সিদ্ধান্তই ছিল। এবং এলাহাবাদে বেশী দিন থাকতে আমি মোটেই রাজী ছিলাম না পাছে কোথাও সুলোচনা দিদি বা তাঁর স্বামী বিমলবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়; কেননা নানান কারণে বর্তমান জীবনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না।

ইতিমধ্যে আমার মনের অবস্থা ঠিক কি ছিল বলা কঠিন। একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তি, নতুন নতুন দেশে সাবিত্রীর সঙ্গে নতুন নতুন অবস্থায় থাকার একটা উত্তেজনার অপূর্ব পুলক আমার মনের মধ্যে যে ছিলনা এমন নয়; কিন্তু প্রাণের গভীরতম তল দেশে একটা বেদনার একটা অস্বস্তির অভাব আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে পেতাম এবং প্রাণটা কোনদিক দিয়ে একটু নাড়াচাড়া পেলেই সেই বেদনায় টন টন করে উঠত অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য। বেশ মনে আছে দিল্লী থেকে এলাহাবাদ আসবার পথে একটা ষ্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেনখানি যখন মন্দ গতিতে এগুচ্ছিল চলতি ট্রেণের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ছোট ছেলেকে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি কেমন চমকে উঠেছিলাম—ঠিক যেন গদু! মাথাটা তুলে চেয়ে থাকার ভঙ্গীটা ঠিক যেন গদুর মতন। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে আকাশ পাতাল ভেবেছিলাম মনে আছে।

যখনি মনটা দুলে উঠত তখনই মনকে নানান রকম করে বোঝাতাম। ভাবতাম—ব্যস্ত হয়ে লাভটা কি? বর্তমানটাকে ষোল আনা উপভোগ যদি না করতে পারি ত নিজেরই লোকসান; অতীত ত আছেই; তার মধ্যে ত ফিরে যেতেই হবে একদিন; অতীতটাকে ভেঙে চুরে নতুন ভবিষ্যত তৈরী করবার শক্তি যখন আমার মধ্যে প্রচুর আছে তখন অব ভাবনাটা কিসের? অপেক্ষা করি দিন কতক। অপেক্ষা করার মধ্যে ত কোনও দৈন্য নেই, কোনও পরাজয় নেই, ক্ষতিও বিশেষ কিছু নেই; বরং লাভ। ভাবতাম—

অদূর ভবিষ্যতে যে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তার পূর্ব্বে মনটাকে ত একটা বিশ্রাম দেওয়ার দরকার; তাতে মনের শক্তির তেজই বাড়বে। এই সব নানান সান্ত্বনায় মনকে বুঝিয়ে, যতদূর সম্ভব সাবিত্রীর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দটুকুর উপভোগ ষোল আনা সার্থক করে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমার এতটুকুও কার্পণ্য ছিল না। তাই বোধহয়, আমার নিভৃত অন্তরের বেদনাটাকে আভাষে পর্য্যন্ত কোনও দিন সাবিত্রীকে বুঝতে দি নাই, যতদিন তাকে নিয়ে বিদেশে বেড়িয়েছি।

যাইহোক এলাহাবাদে দিন দুইয়ের বেশী থাকবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু দেরী হয়ে গেল, থাকতে হল প্রায় দিন পনেরো।

উঠেছিলাম একটি ধর্ম্মশালায়, এবং আসার পরের দিন, অর্থাৎ যেদিন রাত্রে ১১টার গাড়ীতে আমাদের রওনা হওয়ার কথা সেইদিন বিকেলে সাবিত্রীর হঠাৎ জ্বর এল এবং দেখতে দেখতে সন্ধ্যার পরেই একেবারে বেঁহুস হয়ে পড়ল সাবিত্রী। দিন দুই কেটে গেল, জ্বর যখন কিছুতেই ছাড়ল না, পরন্তু নানা উপসর্গ যখন দেখা দিল, তখন একটা বাড়ী মাস খানেকের জন্য ভাড়া করে সাবিত্রীকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এদিকে আমার হাতে তখন টাকার জোর ছিল না— টাকা ফুরিয়ে এসেছে। বিদেশে নানান স্থান পরিদর্শনে মোটামুটি টাকার যে হিসেবটা করেছিলাম খরচ সব দিকেই হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এবং দিন পাঁচেক কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রীর জ্বরের যখন কিছুতেই উপশম হল না, চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় জলের মত যখন অর্থ ব্যয় হতে লাগলো তখন সত্যসত্যই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লাম— বান্ধবহীন এলাহাবাদ সহরে।

ইতিমধ্যে আলীমিঞাকে কোনও চিঠি লিখিনি, কারো কাছে আমাদের বিষয় কোনও খবরই দি নাই। কিন্তু এলাহাবাদ আসার ৬দিনের দিন আলীমিঞাকে টাকার জন্য জরুরী তার দিতে বাধ্য হলাম—উত্তরের টাকা ও আমার এলাহাবাদের ঠিকানা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম। এবং আলীমিঞার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত বিশেষ দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম বলাই বাহুল্য। নানান রকম ভয় হয়েছিল—হয়ত আলীমিঞা দেশেই নাই, হয়ত মফঃস্বলের কোনও নিভৃত পল্লীতে জমিদারী সংক্রান্ত কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত।

আলীমিঞার টেলিগ্রাফের উত্তর এল দিন দুই পরে এবং উত্তর দেখে বিস্মিত হলাম। টাকা অবশ্য আলীমিঞা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন— টেলিগ্রাফ পাওয়ামাত্র দেশে ফিরে যেতে, নতুবা নাকি সর্ব্বনাশ হবে। অনেক ভেবেও, আমি এখুনিই দেশে ফিরে না গেলে সর্ব্বনাশ যে কেন হবে, তার কোনও সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন উঠল—তবে কি গমুর খুব বেশী অসুখ? পল্লীতায় বিশেষ কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না, তাই কি বিপদের সম্ভাবনা? সাবিত্রীর অসুখ, তার সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা চলে না, অস্থির চিত্তে সেইদিনই আলীমিঞাকে আর একটা জরুরী তার পাঠালাম।—জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম—"গমুর কি অসুখ? বিস্তারিত খুলে লেখ।"

দিন দুই পরে আলীমিঞার জবাব এল এবং যেদিন এল, তার আগের দিন বিকেলে সাবিত্রীর জ্বরের উপশম হয়েছে। জবাব এল—গমুর অসুখ নয়, বিস্তারিত টেলিগ্রাফে লেখা অসম্ভব, টেলিগ্রাফ পাওয়ামাত্র যেন রওয়ানা হই, একদিনও দেরী যেন না করি।

সেদিন, যদিও জ্বর ছিল না, সাবিত্রী অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থায় বিছানায় ছিল শুয়ে, তাই তাকে কিছু বলা গেল না। একটা চিন্তিত মন নিয়ে নানান রকম ভেবে আলীমিঞার টেলিগ্রাফের অর্থ কিছুতেই আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

যাইহোক, সাবিত্রীকে যখন ৩।৪ দিনের মধ্যে নড়ান সম্ভব নয় তাই অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু সাবিত্রীকে কথাটা বললাম পরের দিনই দ্বিপ্রহরে, তার রুগ্ন শয্যার পাশে বসে। সব শুনে সাবিত্রী শুধাল, "তা কি করবে এখন?"

বললাম, "কি আর করব? তুমি একটু সুস্থ হলেই চল তোমাকে নিয়ে দেশে রওয়ানা হই।—কি যে ব্যাপার হয়েছে, কিছুই ত বুঝতে পারছি না।"

বললে, "তা আলীমিঞার ত একটা চিঠি আসবে?"

বললাম, "কি জানি; হয়ত ভাবছেন আমি রওয়ানা হয়েছি—তাই হয়ত কোনও চিঠি লিখবেন না।"

বললে, "তা আলীমিঞাকে একটা টেলিগ্রাফ করো না—বিস্তারিত চিঠি লিখতে।"

বললাম, "কিন্তু টেলিগ্রাফ পেয়ে চিঠি লিখলে, সে চিঠি আসতে অন্ততঃ ৫।৬ দিন কেটে যাবে। তাই ভাবছি—"

বললে, "তা বেশ ত চল না, কালই রওয়ানা হই।'

বলে যেন ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজলি। বুঝলাম আলীমিঞার এক টেলিগ্রাফ পেয়েই বিশেষ কিছু না বুঝে তখনই দেশে রওয়ানা হওয়া সাবিত্রীর ইচ্ছা নয়। বুঝলাম—সাবিত্রীর মতে, দেশে এমন কিছু হতে পারে না যার মূল্য আমাদের এই বিদেশ ভ্রমণের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিটুকুর মূল্যর চেয়ে কোনও অংশে বেশী।

তাড়াতাড়ি বললাম, "না কাল কেন? পরশু পর্য্যন্ত রওয়ানা হওয়া যাবে। গাড়ী রিজার্ভ করে নেব মনে করছি। তোমার বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না।"

কোনও উত্তর দিল না। চুপ করেই শুয়ে রইল। আমার মন তখন সত্যি সত্যই অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল দেশের খবরের জন্য। কি ঘটেছে বিস্তারিত না জানতে পারলে আমি যেন কিছুতেই সুস্থ হতে পারছিলাম না। হয়ত সত্য সত্যই কোনদিক দিয়ে বিশেষ কিছু সর্বনাশের কারণ উপস্থিত—হয়ত দেশে রওয়ানা হতে দেরী হলে কোনও একটা দিক ধ্বসে ভেঙে যাবে আমার জীবনে চিরদিনের জন্য; কে জানে?

এতদিন দেশের কথা ভাবিনি—মনের সেদিককার জানালাটা যেন ছিল একেবারে বন্ধ। একটু যেমন ফাঁক হল, অমনি জোর হাওয়ায় জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে প্রাণ মন অস্থির করে তুলল সেই দিককার একটা আকুল বাতাস।

দিন ৪।৫ পরে দেশে ফিরে এলাম একদিন সকালবেলা ১১টা আন্দাজ। গাঢ় নীল আকাশের তলায় চারিদিকে মাঠে মাঠে বনে বনে শরৎকালের তাজা সোনালী রোদটুকু, গরুর গাড়ীতে পথে আসতে আসতে বিশেষ করে মধুর লেগেছিল আমার চোখে—স্পষ্টই মনে আছে।

সাবিত্রীকে বলেছিলাম "সাবি! শরৎকালের সকাল-বেলা জীবনটাকে যেন আবার নতুন করে পাই—যেন নতুন করে আবার সুরু হল সবই জীবনে।"

সাবিত্রী বললে, "আমার কিন্তু বড্ড বেশী পুরাণো কথা মনে পড়ে শরৎকালের সকালবেলা।"

বললাম, "তাও ঠিক। কিন্তু মজা হচ্ছে পুরাণো কথা মনে হয়ে মন অবসাদে ভরে উঠে না শরতের সকালে। বরং পুরাণোর মধ্য দিয়েই একটা নতুন পথের আভাষ পাই—যেন আনন্দ জীবনে ফুরিয়ে যায়নি, আরও ঢের আছে বাকী।

সাবিত্রী বললে, "তা যদি হয়ত শরতের সকালে পুরাণো ঘরে ফিরে যাওয়াটা ভুল। সব পুরাণো ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয় নতুনের পথে—নতুন আনন্দের সন্ধানে।"

কথাটা বলেই সাবিত্রী একটা সলজ্জ হাসিভরা চাহনিতে চকিতে একবার আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। বুঝলাম ও ধরণের কথায় ও রকম জবাব আমার মুখের উপর দিয়ে সে নিজেই যেন লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

সহাস্য মুখে বললাম, "বারে সাবি! খাসা কথা কইতে শিখেছ ত।"

তাড়াতাড়ি বললে, "যাও।—তুমি লোককে বড় অপ্রস্তুত করতে পার।"

বললাম, "না না, চমৎকার কথা বলেছ। কথাটা খুবই ঠিক। দেশে বেশীদিন থাকব না। দেশে গিয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই চারিদিককার একটা ব্যবস্থা কিছু করে দিয়ে আবার তোমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ব—নতুন পথে। এবার যাব দাক্ষিণাত্যের দিকে।

সাবিত্রী চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

একটু পরে বললাম, "দেশে একবার যাওয়াটা দরকার, সেটা ত বুঝতে পারছ?"

বললে, "কি জানি, আমার মন মোটেই ভাল লাগছে না। সেই দেশের বাড়ীতে ফিরে যেতে প্রাণ যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।"

তাড়াতাড়ি শুধালাম "কেন ? কেন ?"

বললে, "কেন জানি না।—আমার ভয় হয়—" চুপ করে গেল।

সাবিত্রীর পিঠে হাত রেখে বললাম, "বল—কিসের ভয় তোমার ? চুপ করে গেলে কেন ?"

ক্লান্তভাবে বলতে লাগল, "কেমন মনে হয় ও-বাড়ীর আর মঙ্গল কিছুই নাই—সবই অমঙ্গল। সত্যিই পাপের পুরী। মনে হয় যা আমার অদৃষ্ট, ও-বাড়ীতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত আবার কি হয় কে জানে।"

বললাম, ও কথা বলছ কেন সাবি ? কি আর হবে ? তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না—সে ত তুমি জান।"

ক্লান্তভাবেই বলে যেতে লাগল, "ও বাড়ীতে গেলেই আবার তোমার মনে পিছনের টান না লাগে। পিছনের টান লাগলে মঙ্গল হবে না, কিছুতেই হবে না, একথা আমার মন জোর করে বলছে।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "সাবি! তুমি কি এখনও আমাকে চেননি ? পিছনের টান বলতে তুমি কি বুঝছ ? বিশ্বাস কর সাবি—একমাত্র গন্থ। জগতে আর সব থাকে থাকুক যায় যাক্—কিছুমাত্র আসে যায় না। গন্থর একটা সুব্যবস্থা করে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সাবিত্রী আবার বললে, "ব্যবস্থা করতে হয় করো—আমি ত বারণ করি না। কিন্তু দোহাই তোমার—জড়িও না। নিজেকে আর কারোর সঙ্গেই জড়িও না, নইলে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারবে না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মনে কর'না একথা আমি খালি নিজের জন্যই বলছি। মোটেই তা নয়।"

বললাম, "কিন্তু ভেবে দেখো—"

কথাটা কেটে দিয়ে সাবিত্রী বললে, "এ নিয়ে তর্ক কোর না। তোমাকে আমি যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মন বারে বারে বলে—তোমার আমার দুজনার অতীতেই এত বিষ আছে যে তার সঙ্গে কোনও দিক দিয়ে এতটুকু যোগ হলে আবার সব যাবে বিষিয়ে। তা হলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই।"

চুপ করে বসে রইলাম। গরুর গাড়ী ক্রমেই এগুতে লাগল—মাধবপুরের পানে, সেই আমাদের বাড়ীর দিকে। এতদিন সাবিত্রীকে নিয়ে ঘর করছি এ রকম সরলভাবে এ সব কথা সাবিত্রী কখনও আমাকে বলেনি।

চুপ করে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলাম। সাবিত্রীর প্রাণের গহন তলদেশ হতে যেন কথাগুলি বেরিয়েছিল—আমার প্রাণকে স্পর্শ করেছিল, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। আমার প্রতি তার গভীর প্রেমের ঠাঁই ছিল তার প্রাণের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে; তাই সে যেন বুঝতে পেরেছিল কিসে আমার মঙ্গল, আর কোথায় আমার অমঙ্গল, অতি সহজে—কোনও যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করার কোনও প্রয়োজনই হয়নি।

কিন্তু আমার মনে তর্ক উঠেছিল। গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে চুপ করে বসে সাবিত্রীর কথা নিয়ে নানান যুক্তিতে নানান তর্কে আমার মন উঠ্‌ল ভরে। মনে হল প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করার মধ্যেই ত পুরুষোচিত গর্ব্ব, পলায়নের মধ্যে ত নয়। ভেবেছিলাম—সাবিত্রী সমস্ত অবস্থাটাকে যাচাই করে দেখেছে কেবল নিজের প্রাণের অনুভূতির কষ্টিপাথরে; এবং যতই আমি মনে মনে সেই অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করি না কেন, আমার জীবনে তার কষ্টি-পাথরই ত একমাত্র কষ্টিপাথর নয়। ক্রমে মাধবপুরের কাছাকাছি এসে ঘুরে যখন মাধবপুর বাজার দেখা গেল তখন আমার মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার অতীতে যে বিষ আছে সে বিষয় আমার এতটুকুও সন্দেহ হয়নি, কিন্তু মনে মনে শপথ করেছিলাম—সে বিষ যদি আমি সমূলে নির্ম্মূল করতে নাও পারি গন্থকে আমি সেই বিষের হাত থেকে উদ্ধার করবই, কিছুতেই তার মধ্যে তাকে ফেলে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব না, তাতে আমার যতই অমঙ্গল হোক না কেন।

বাড়ী এসেই আলীমিঞার খবর নিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি তখন ছিলেন না, স্নানাহারের জন্য জগতী চলে গিয়েছিলেন। দাসমশাই প্রভৃতি ২।১ জন কর্ম্মচারীকে ডেকে খবরাখবর নিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। সবদিকই ত ঠিক আছে মনে হল, তবে আলীমিঞা আমাকে ওরকম টেলিগ্রাফ পাঠালেন কেন ?

আলীমিঞার সঙ্গে দেখা হল বিকেল বেলা। দ্বিপ্রহরে নিদ্রার পরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে যখন বৈঠকখানাবাড়ীতে গেলাম তখন আলীমিঞার সঙ্গে দেখা হল বৈঠকখানার দোতলায়। কুশলাদি প্রশ্নের পর আমার বসবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলীমিঞা বলতে লাগলেন, বাবু! সর্বনাশ উপস্থিত, এখুনিই যা হয় একটা বিহিত করা দরকার। আপনি ত বড়বাবুর মাসোহারা বন্ধ করবার হুকুম দিয়ে চলে গেলেন তারপর শ্রাবণ ভাদ্র এই দুই মাসের টাকা আমি বড়বাবুকে পাঠাইনি। তিনি আমাকে ইতি-মধ্যে চারখানা অত্যন্ত কড় চিঠি লিখেছেন—আমি তার কোনও জবাব দি নাই। আমি তাঁর কাছ থেকে শেষ চিঠি পেয়েছি ভাদ্র মাসের ৯ই। তাঁর আগের চিঠিখানা পেয়েছিলাম ভাদ্র মাসের ১লা এবং সে চিঠিতে তিনি লিখে-ছিলেন যে যদি ভাদ্র মাসের ৫ই এর মধ্যে টাকা না পান ত তিনি জমিদারীর ম্যানেজারী থেকে আমার বরখাস্তনামা লিখে নবীনমুন্সীকে তাঁর অংশের ম্যানেজার নিযুক্ত করে আদায় তহশীলের সমস্ত ক্ষমতা তাকে দিয়ে তার নামে আম-মোক্তারনাম লিখে দেবেন এবং শেষের চিঠিখানায় আমাকে বরখাস্ত করে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে নবীন মুন্সীকে আম-মোক্তারনামা দেওয়াই তিনি ঠিক করেছেন এবং এবার পূজাকিস্তিতে নবীনমুন্সী তাঁর তরফের তহশীল করবার জন্য আমাদের মহলে বেরুবে।—"

প্রশ্ন করলাম, "চিঠিগুলো সব আসছে কোথা থেকে ?"

আলীমিঞা বললেন, প্রথম দু'খানা চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে কিন্তু শেষ দু'খানা চিঠি পলতা থেকে লেখা, যদিও—"

প্রশ্ন করলাম, "যদিও ?"

আলীমিঞা বললেন, যদিও চিঠির উপরে কোনও ঠিকানা নাই, কিন্তু আমি পোষ্ট আফিসের ছাপ পড়ে দেখেছি। দেখবেন চিঠিগুলি ?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "না।"

আলীমিঞা বললেন, "থাক্ সে সব চিঠি দেখে আপনার দরকার নাই। যা হোক বাবু! এখুনিই যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন। যদি নবীন মুন্সীকে আম-মোক্তারনামা দিয়ে তিনি পূজা কিস্তিতে মহলে পাঠান—সর্বনাশ হয়ে যাবে বাবু। মহলগুলো সব ছারখারে যাবে। স্বনামধন্য 'রতনসা'র সোণার জমিদারীটা যাবে একেবারে উচ্ছন্নে।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "তা এতদিনে হয়ত আম-মোক্তারনামা লিখে দিয়েছেন তাকে। সে কি মহলে এখনও বেরোয়নি ?"

বললেন, "না বাবু! এখনও কিছু হয়নি। আমার শেষ চিঠি পাবার দিন দুই পরেই বড়বাবুর হাতের লেখা নবীন মুন্সীর নামে চিঠি পলতা থেকে এখানে আসে। আমার সন্দেহ হয়েছিল যে বড়বাবু পলতা থেকে আম-মোক্তার-নামা দেওয়ার জন্য নবীনমুন্সীকে ডেকে পাঠাবেন। তাই আমি পোষ্ট আফিসে নজর রেখেছিলাম। পিওন ডাক নিয়ে আসার সময় রোজই পোষ্ট আফিসে গিয়ে আমি পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে গল্প গুজব করতাম। নবীন মুন্সীর নামে বড়বাবুর হাতের লেখা চিঠি দেখেই চিঠিখানা আমি চুরি করে ফেলি। মাষ্টার টের পায়নি। পরে খুলে পড়ে দেখি যা ভেবেছিলাম তাই। তবে গতকাল কলকাতা থেকে বড়বাবুর চিঠি নবীন মুন্সীর নামে এসেছে। চিঠিখানা চেষ্টা করেছিলাম, সরাতে পারিনি। তাতে তিনি নবীন মুন্সীকে পলতা যেতে হুকুম দিয়েছেন কি না জানি না।"

বললাম, "নবীন মুন্সী এখনও এখানেই আছে ?"

বল্লেন, "হ্যাঁ—আমি তার উপর কড়া নজর রেখেছি। এখনও সে রওনা হয় নি বাবু। আপনি এসে পড়েছেন আমি বেঁচেছি। কী যে করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এসব কথা ত বলাও যায় না কাউকে—সব কথাই অত্যন্ত গোপনে রেখেছি। এখন আপনি যা হয় করুন।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

পরে বললাম, "তা এর আমি কি করতে পারি আলী মিঞা ? তা যাক্ না নবীন মুন্সী মহলে মহলে। বড় তরফের পূজা কিস্তির তহশীল সেই করুক না এবার।"

তাড়াতাড়ি আলীমিঞা বললেন, "না, না বাবু! না, কখনই না। তা' হলে একেবারে সর্বনাশ হবে। নবীন মুন্সী কখনই আমাদের মঙ্গল দেখবে না। একবার যাওয়ার সুবিধা পেলে মহলে মহলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে মামলা

বাধিয়ে, নানাভাবে মহলগুলোকে একেবারে উচ্ছন্নে দিয়ে আসবে। বিশেষতঃ আপনার এমন সর্ব্বনাশ করে আসবে যে—”

একটু জোরের সঙ্গে বললাম, “তা আমার সে কি করতে পারে?”

আলীমিঞা বললেন, “এখন কিছুই করতে পারে না, যদিও তার চেষ্টার অবধি নাই, জানেন ত সব। কিন্তু একবার বড়বাবুর পক্ষ নিয়ে যদি সে আমাদেরই মহলে যেতে পায় আপনার বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মাতব্বরদের নিয়ে এমন সব জটলার সৃষ্টি করবে যে আমাদের আদায় তহশীলে ব্যাঘাত ত ঘটবেই অধিকন্তু আপনাদের নামে একটা কুৎসার—”

আলীমিঞাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, “থাক। জানি সব আলীমিঞা, বুঝি সবই। কিন্তু বর্ত্তমানে উপায় কি আছে বলুন।”

বললেন, “বড়বাবুকে যেমন করে হোক এ কাজ থেকে বিরত করতে হবে।”

বললাম, “কি করে? টাকাকড়ি নিয়ে গিয়ে সেধে তার পায় ধরতে পারবো না আলীমিঞা। তার চাইতে জমিদারী উচ্ছন্নে যায় যাক্।”

ক্রমেই আমি যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মার একটা কথা—দাদা মার সঙ্গে ঠাকুরঝি-তলায় পূজা দিতে যেতে অস্বীকার করলে মা বলেছিলেন “শনিতে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়।” হায়রে! এ শনির দশা কি সব দিকে একেবারে সর্ব্বনাশ না করে কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু চুপ করে থেকে আলীমিঞা বললেন, “টাকা কড়ি কিছু পাঠিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে বড়বাবুকে আমি একখানা চিঠি লিখব? আপনার অনুমতি পেলেই লিখতে পারি।”

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বর্ত্তমান অবস্থায় দায় পড়ে আবার দাদাকে টাকা পাঠাতে এবং তার উপর খোসামোদ করে আলী-মিঞাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে আমার সমস্ত শরীর মন অপমানের গ্লানিতে জলে জলে উঠছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, মুকুন্দটা কোথায়? সে কি দেশে আর ফিরবে না কখনও?

আলীমিঞা বললেন, “কলকাতাতেই আছেন বাবু। আশ্বিনের প্রথমেই ফিরে আসবেন এবং এবার এসে কিছুদিন দেশেই থাকবেন শুনেছি।”

আবার চুপ করে বসে রইলাম।

একটু পরে আলীমিঞা বললেন, “বাবু! আপনি অনুমতি দিন। এ ছাড়া আপাততঃ আর কোনও উপায় নেই। নইলে সত্যই সব ছারখার হয়ে যাবে। অনুমতি দিন, আমি আজই পলতায় কিছু টাকা ও চিঠি দিয়ে লোক পাঠাই।”

“যা হয় করুন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।”

এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজার কাছে এসে দরজাটা খুলে ফেললাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আলীমিঞাকে ডেকে বলে গেলাম, “আলীমিঞা! বড় বাবুকে লিখে দেবেন, তিনি যেন পত্রপাঠ পলতা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকেন এবং তাহলেই টাকাকড়ি তাঁকে নিয়ম মত পাঠান হবে। জোর করে লিখে দেবেন যে তাঁর পলতায় থাকা আমার একেবারেই মত নয়।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

কাব্য ও ছন্দ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কবিতাকে সুনিয়মিত ছন্দোবন্ধ হতে, পদ্যের কাঠামো হতে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা কয়েকরকম রচনারীতি সৃষ্টি করেছে। এগুলি একটি ক্রমিক পর্য্যায়ে সাজান যেতে পারে।

প্রথম হ'ল গদ্য—সরল সাধারণ স্পষ্ট গদ্য। দ্বিতীয়, সুরাত্মক গদ্য (rhythmic prose)। তৃতীয়, গদ্য কবিতা (prose poem)। চতুর্থ, মুক্ত কবিতা (free verse)। আর সর্ব্বশেষ, পদ্য—বন্ধছন্দের কবিতা। ছন্দের প্রয়োজন সব রকম রচনায়। ছন্দ হল রচনার প্রাণ, জীবনীশক্তি। তবে ছন্দের প্রকারভেদ আছে, এবং এই প্রকারভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত রচনার উক্ত শ্রেণীপঙ্‌ক্ত। এই শ্রেণী-বিন্যাস অনুসরণ করলে দেখা যায় ছন্দ কি রকমে বিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে—ক্রমেই নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত সংহত গাঢ় দৃঢ় (আধুনিকেরা আরো বলবে, কঠিন অসাড় আড়ষ্ট) হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। রবীন্দ্রনাথ হতেই সব রকমের নমুনা দিব। প্রথম, নিছক নির্জ্জলা গদ্য—সম্পূর্ণতার জন্য এটিও দিতেছি—

"প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোষ্ট-মাষ্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোষ্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।"

তারপর দ্বিতীয়, সুরাত্মক গদ্য—

"দেশদেশান্তরে তোমার যত সন্তান আছে, পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র কর তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হোক, দেশ থেকে দেশান্তরে জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক।"

অথবা, স্মরণ করা যেতে পারে বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব।"

তৃতীয়, গদ্যকবিতা—"পুনশ্চে"র প্রথম কবিতাটিই—

পদ্মা কোথায় চলেছে বয়ে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
একপারে বালুর চর,
নির্ভীক সে, কেন না নিঃস্ব নিরাসক্ত,—
অন্যপারে বাঁশবন, আমবন,
পুরাণো বট, পোড়ো ভিটে,—

চতুর্থ, মুক্ত কবিতা—"পুনশ্চে"রই

"যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে;
ধরে রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্ন-প্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে তার নেইনা ঠিকানা।"

আর পঞ্চম, পদ্যকবিতা—সেই অতি পুরাতন অতিপ্রিয়

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি—

প্রথমটিতে, সাধারণ গদ্যে ছন্দের যেন আদিম মূর্ত্তি—অস্পষ্ট, অস্ফুট, বিশেষ আকার নাই, নিজস্ব সত্তা নাই, বাক্যের অর্থের মধ্যে নিহিত, অর্থের দাস, অর্থকে একটু জোরালো করতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তার স্থান। এখানে ছন্দ হল একটা সাধারণ গতিবেগ মাত্র। দ্বিতীয় পর্য্যায় ছন্দ কেবল গতি নয়, সে গতিতে ফুটে ওঠে একটা সুর—তান ও লয়। এখানে ছন্দের একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি, বাচ্যার্থের অতিরিক্ত নিজস্ব পৃথক সৌন্দর্য্য ফুটে উঠতে সুরু হয়েছে—কিন্তু কেবল সুরু হয়েছে, সে মূর্ত্তি তরল,

পরিবর্ত্তনশীল। প্রথমে ছিল যেন জলের টানা স্রোত; এখন সেখানে ঢেউ দিয়েছে কিন্তু "ঢেউগুলি নিরুপায় ভেঙে পড়ে দুধারে" জেগে উঠেছে, আবার মিলিয়ে যেতেছে, একটির মধ্যে আর একটি মিশে যেতেছে। তৃতীয় স্তরে, গদ্যকবিতায়, সুর-তান-লয় স্পষ্টতর হয়েছে; ঢেউগুলি স্ফুট, তাদের গতিভঙ্গ বিশিষ্ট রূপ নিয়ে উঠেছে। মুক্ত-কবিতার সুরের সঙ্গে আরম্ভ হল তাল—ইতিপূর্ব্বে তাল যদি আরম্ভ হয়ে থাকে, তবে তার ছিল নিতান্ত ভ্রূণাবস্থা; কিন্তু তাল এখানে অনিয়মিত, কোন সুস্পষ্ট বিধিবদ্ধ ছক তার হয়ে ওঠে নাই—তবু ছন্দের স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গাঢ় হয়ে উঠেছে, তার স্বকীয় জীবনস্পন্দন আপনাকে ঘোষণা করছে। শেষ পর্য্যায়ে ছন্দ হল একান্ত তাল নিয়ন্ত্রিত সুর; এখানে সে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে আর সে রূপ সুস্পষ্ট-রেখা-নিবদ্ধ, নিটোল পূর্ণাঙ্গ দৃঢ়, একটা ব্যক্তিত্বময়। ছন্দ আর নিরুপায় তরলিত তরঙ্গভঙ্গ নয়—সে হয়েছে যেন ভাস্কর্য্যের মূর্ত্তি।

এই যে ক্রমনির্দ্দেশ করা গেল, এটি কিন্তু আদৌ ঐতিহাসিক ক্রম নয়—এটি ন্যায়তত্ত্বগত (logical) এবং মনস্তত্ত্বগত (psychological)। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখি এক বিচিত্র ব্যাপার—সকলের শেষে যেটি সেটি দেখা দিয়েছে সকলের আগে; কারণ, আদিকালেই উদ্ভব বাঁধা ছন্দের কাব্য। মুখের ভাষা বা গদ্য এমন কি তাও পরে এসেছে—আমি বলছি সাহিত্যরচনা হিসাবে। এর একটি কারণ হয়ত এই যে গদ্য হল প্রধানতঃ বুদ্ধির যুক্তির বাহন—মস্তিষ্কবৃত্তির চলনবলনই গদ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আর পদ্য গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ অনুভবের আবেগের উদ্দীপনার প্রেরণায়। প্রথমযুগের আদিকালের মানুষে ছিল এই দ্বিতীয় ধারার প্রাধান্য। মানুষের জীবন ও সৃষ্টি গোড়ায় চালিত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার প্রাণময় পুরুষের দ্বারা—তার পক্ষে সহজ ছিল অন্তর্জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভব। যুক্তি তর্কবুদ্ধি—মনোময় পুরুষ—মানুষের মধ্যে পরে দেখা দিয়েছে। ইউরোপে যুক্তিসর্বস্ব ১৮ শতক হল সাহিত্যে গদ্যের যাকে বলা হয় স্বর্ণযুগ। আর আধুনিককালে কবিতাকে যে ক্রমে গদ্যধর্ম্মী করে তুলবার চেষ্টা চলেছে, তারও একটি কারণ কি এই হতে পারে না যে বর্ত্তমান হল বৈজ্ঞানিক যুগ অর্থাৎ মস্তিষ্কপ্রধান এবং কাব্যের বস্তু ও প্রেরণা উভরেই আসছে এই মস্তিষ্কের ক্ষেত্র হতে, চিন্তার বিশ্লেষণী-শক্তিই কাব্যসৃষ্টির মূলে?

২

আজকাল সন্দেহ উঠেছে পদ্যই কাব্যের একমাত্র বা প্রকৃষ্ট বাহন কি না। এবং মোটের উপর চলিত সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে নির্জ্জলা পদ্যের চেয়ে গদ্যপদ্যই আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কাব্যের সুষ্ঠুতম প্রকাশ হতে পারে। পদ্যের যে নিয়ম—অক্ষর (বা মাত্রা) সাম্য, তাল সাম্য, মিল—তা কি কৃত্রিম নয়? একটি ভাবকে দৃষ্টিকে নিখুঁৎরূপে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে—কিন্তু পদ্যের বিধি নিষেধ মানতে হলে, সেই ছাঁচে ঢালতে হলে, সে ভাব ও দৃষ্টি কি বিকৃত হতে বাধ্য নয়? মিলের খাতিরে, পর্ব্ব-যতি-তাল ঠিক রাখবার জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনাবশ্যক 'চ-বৈ-তু-হি'র প্রয়োগ ত করতেই হয়। তা ছাড়া পদ্যের ছন্দ ও ছাঁদ ত স্থূল মোটা-গোণাগুণতির ব্যাপার। ছন্দ যা দরকার তা হবে যেমন সূক্ষ্ম তেমনি বন্ধন মুক্ত—ভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, রাগের বৃহৎ দোল যাতে প্রতি-ফলিত হতে পারে তাই সেই ছন্দ। ওয়ল্ট হুইটম্যানের ভাবে ভাষায় যে বিশাল বিপুল অ-শৃঙ্খল কলরোল, কোন্ পদ্যছন্দ তাকে প্রকাশ করবে? বা ফরাসী কবি vie le griffin এর যে সূক্ষ্ম ভাব বৈদগ্ধ্য কি রকমে তা alexandrine (দ্বাদশ অক্ষরের) লৌহ ছাঁচে ঢালাই হতে পারে?

পদ্যের দিক থেকে যে উত্তর নাই তা কিন্তু নয়। প্রথমত অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার। কিন্তু যাকে অনাবশ্যক বলা হয়, গঠন সৌন্দর্য্যের মধ্যে মিলেমিশে অঙ্গীভূত হয়ে যায় তবে দোষ কোথায়? কাব্যের লক্ষ্য কেবল কথাবলা নয়—সে ত মানুষমাত্রেই পারে—কিন্তু সুন্দর করে,—শুধু তাই নয়, সুন্দরতম করে,—কথা বলা; তাই তাকে একান্ত প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করতেই হয়। সুন্দরের আরম্ভ ত রূঢ় প্রয়োজনের সীমার বাহিরে থেকে। এদিক দিয়ে দেখলে পদ্যে কেন, গদ্যেও যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয় অবান্তর

উপায় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাদপূরণ বা গোঁজামিল সাধারণ ছোট কবির মধ্যে সুলভ হলেও, শ্রেষ্ঠ কবির সৃষ্টিতে তা আবিষ্কার করা বড় সহজ নয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা ত তাকেই বলে যার প্রতিটি অক্ষর পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য, অপরিবর্ত্তনীয়। Sophocles বা Virgil বা Racineএর পদ্যে বৃথা অযথা বাক্য যিনি খুঁজে বার করতে চান তাঁকে দুঃসাহসী বলব। তারপর পদ্যের কাঠামোর সংকীর্ণতা স্থূলতা যখন নির্দ্দেশ করা হয় তখন মনে জিজ্ঞাসা জাগে হোমর তাঁর Hexametreএর আটে ঘাটে মহাসাগরের দোল কি রকমে ফুটিয়ে তুললেন, মিলতন অতি প্রচলিত পঞ্চমাত্রিক আইয়াম্বের (iamb) ছাঁদকে ধরে যে অর্গান-সঙ্গীত মন্দ্রিত করে তুলেছেন তার রহস্য কি? আর পদ্যের বাঁধনে মুক্তি কতখানি যে লীলায়িত হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন শেক্সপীয়র ও সুইনবার্ণ এবং ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও কাকু কি পরিমাণে থাকতে পারে তা দেখিয়েছেন রাসীন (Racine) এবং লা ফঁতেন (La Fontaine)।

বরং এ কথা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা যেতে পারে যে রচনার বিভিন্ন ধরণ নির্ভর করে ভাবাভিব্যক্তির বিশিষ্ট প্রয়োজনের উপর—এবং প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা আছে। হুইটমান যে ভাবের ভাবুক, হুইটমানের ভাষার ভঙ্গীও তদনুরূপ। রাসীনের ভঙ্গীতে হুইটমানের আত্মপ্রকাশ হয় না। কিন্তু যদি দাবি করা হয় হুইটমানের পন্থাই উন্নততর মহত্তর সুষ্ঠুতর তবেই তর্ক ওঠে। তখন বলতে ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক ভঙ্গী তার আপন ভাবটির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হলেও, ভাব যত গভীর নিবিড় সমুচ্চ হয়ে ওঠে, ততই তা ধারণ করে পদ্যেরই রূপ। দান্তে ভাবে ভাষায় যে সংহত তীব্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তা অনিবার্যভাবে বরণ করে নিয়েছে পদ্যের terza rima কঠোর বাঁধন। ভালেরী (Valéry)র মতে শ্রেষ্ঠকাব্যমাত্রই গ্রহণ করে ভাস্কর্য্যের গুণ, তাই আধুনিক কবি হয়েও তিনি পুরাতনের একটিমাত্র ছাঁদে সব কবিতা রচনা করেছেন। গদ্যে কাব্য হয় এক বিশেষ ধরণের, নিম্নতর অনুচ্চ সব চূড়ায়; কিন্তু কাব্য যত গভীর গাঢ় সমুচ্চ কবিত্ব হয়ে ওঠে তত সে গদ্যের চলনবলন ছেড়ে ক্রমে গ্রহণ করে পদ্যের শৃঙ্খলিত রূপ। তাই ত দেখি আধুনিক কবিদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রথমে গদ্যছন্দে হাত মক্স করে শেষে পদ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এখানেই যেন তাঁদের কবিচিত্ত শেষে পেয়েছে পরিতৃপ্তি।

ভাষার একটি রহস্য মনে রাখা দরকার—পদ্যের রূপ ভাষায় অন্তর্নিহিত সহজ স্বাভাবিক শক্তি, কেন কি ভাবে সে আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই। এ শক্তি যেন অগ্নির দাহিকাশক্তি—ভাষার গড়নে স্বভাবে তা অঙ্গীভূত একীভূত, তা কৃত্রিম বা বাহির হতে আরোপিত নয়। ভাষার অন্তঃপ্রতিভা হতেই তা স্বতঃউৎসারিত। অনেক কবির পক্ষে পদ্যে কাব্য রচনা বরং সহজ, গদ্যই তাঁদের পক্ষে দুরূহ।

আরও মনে রাখা দরকার ছন্দের মুক্তি ভাবের দিক দিয়ে যে একান্ত অনিবার্য্য তা নাও হতে পারে। ছন্দোগত মুক্তি বাহ্যরূপেরই একটা পরিবর্ত্তন মাত্র—বাহ্যরূপেরও যদি নূতনত্ব অভিনবত্ব রসহিসাবে উপভোগ করতে চাই সেই জন্য। নতুবা শ্রেষ্ঠ কবিরা প্রায়ই দেখি অতিপুরাতন চলিত সাধারণ ছন্দোবন্ধকেই আশ্রয় করে তাঁদের প্রাণের অন্তরাত্মার যাবতীয় অনুভব সম্পূর্ণভাবে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের মহত্ত্ব ছন্দ আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে না।

আমাদের যুগের কবিরা বেশি সূক্ষ্ম বেশি গভীর বা বেশি বিশাল হয়েছেন? তাই ছন্দের পুরাতন বন্ধন হতে মুক্তি চাই? এই তাঁদের দাবি অবশ্য। কিন্তু কার্য্যত কি দেখি? দেখি তাঁরাও যখন ভাবগাঢ় হয়ে উঠেছেন তাঁদের হাতে দিয়ে অজ্ঞাতসারে অথচ কেমন সহজে বের হয়ে এসেছে খাঁটি পদ্যছন্দ। Lawrenceএর একটি কবিতায় (The Red Wolf) আশেপাশের অনেকখানি গদ্যের মধ্যে প্রস্ফুটিত—

Day has gone to dust on the sagegrey desert

কিম্বা আমাদেরও জনৈক গদ্যপন্থী কবির গদ্যরাশির মধ্যে পাই, এরকম নিখুঁৎ-পদ্য।

পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ

নির্জ্জলা গদ্যেও যেখানে তা ছন্দসুন্দর হয়ে উঠেছে, সেইখানে যদি নিরীক্ষণ করি তবে প্রায়ই দেখব ছন্দতরঙ্গের চূড়ায়

চূড়ায় ফুটে উঠতে চেয়েছে, ফুটে উঠেছে পুষ্পগত মাত্রা সুষমা। এই ধরুন বঙ্কিমের (পদ্যের আকারে ছন্দগুলি সাজালে)—

ধীরে রজনি ধীরে
দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে
কিন্তু এ আঁধারপুরি আলো করিবে

পদ্য ও গদ্য মিশিয়ে একটা অভিনব ও চমৎকার ছাঁদ বা কাঠামো পাওযা যেতে পারে। দুইএরই যা শ্রেষ্ঠ গুণ তাই আহরণ করে এ তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করা যেতে পারে। গদ্যের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি এবং পদ্যের সংযম ও সংহতি। পদ্যে আড়ষ্টতা প্রাণহীনতা আসতে পারে—কিন্তু গদ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খলতাও তেমনি দেখা দিতে পারে। প্রাণ চাই, কিন্তু আত্মসমাহিত প্রাণ—আত্মশাসন ব্যতিরেকে যথার্থ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হতে পারে না। অবশ্য সকলের উপরে মনে রাখা দরকার, গদ্য হোক পদ্য হোক গদ্যপদ্য হোক কি পদ্যগদ্য হোক সব রকম রূপ বা ছাঁচ কবি চেতনার আধার, বাহন বা অবলম্বন মাত্র। দ্রব্যগুণ হিসাবে ইহাদের নিজস্ব গুণ বা সামর্থ্য যাই থাকুক না কেন, এরা প্রকৃত মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অর্জ্জন করে, তাদের অন্তর্নিহিত আধেয় ও অধিষ্ঠাত্রী কবি চেতনার মহত্ত্বকে ও মাহাত্ম্যকে প্রতিফলিত করে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রাখী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

উষার অরুণরাগ সন্ধ্যার আরক্তলাজ ছানি
    লাবণি মিলায়ে লয়ে হৃদয়ের প্রস্ফুট কোরকে
মৌনতার মধুমাখা পরিপূর্ণ প্রণয়ের বাণী
    আনন্দ-সুন্দর মন্ত্রে এই হেথা সৃজিলাম তোকে।

জীবনের ধ্যানখানি তারে রূপ পারিনা যে দিতে
    ভাষা যে ডুবিয়া যায় আঁখির অতলে
দিগন্তে আভার মত ঘনাইয়া সুতার রাখীতে
    মুদিয়া এসেছে প্রেম অরবিন্দদলে।

ধরিত্রীর নিত্য কাজ, পথে ছোটা, অবসর নাই ;
    তার পানে কেহ না তাকায়—
একটী আকুল হিয়া কার পানে ছুটিছে সদাই
    বিশ্বময় খুজিয়া বেড়ায়।

যার পরিচয় নাই পুষ্পপ্রান্তে শিশির মতন,
    যে সৌরভ অকারণ তারে
কেহ খুজিবে না কিছু কোথা তার তৃপ্তি-নিকেতন
    সাজাবে না কবিতার হারে।

তাহারে বাঁধিতে হবে, ভরিতে যে হবে চিরদিন
    জড়াইয়া রাখীর নিঃশ্বাসে,
কালের প্রবাহে ভাসি যায় সবি চলে উদাসীন ;
    মরি আমি উৎকণ্ঠিত ত্রাসে।

একটী মুগ্ধ স্পর্শ যে আমারে দিল উপহার
    অনন্ত অক্ষয়
ওরে রাখী এ জীবনে তুই থাক্ গোপনে তাহার
    হাতের বলয়।

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫

সাংসারিক বিপর্যয় হেতু স্ত্রীলোকের মনে ক্রোধ অথবা বিরক্তি উৎপন্ন হ'লে শেষ পর্যন্ত তার চোটটা যে বহু ক্ষেত্রেই কারণে এবং অকারণে স্বামী হতভাগ্যের উপর গিয়ে চড়াও হয়, এ সত্য স্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানা আছে। নারীচিত্তের এই বিশেষ ধর্মের ফলে নরেনের সহিত কথাবার্তার পর অপর্ণার মনের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বেচারা শৈলনাথের উপর। মনে হ'ল কন্যার বিবাহ ব্যাপারে আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার জন্য প্রধানতঃ শৈলনাথের ঔদাসীন্য এবং অবিবেচনাই দায়ী। বাসনার আই-এ পাশ করার পর একবার যখন পাত্র পক্ষ থেকে বিবাহটা সেরে ফেলবার প্রস্তাব উঠেছিল তখন কন্যার অসঙ্গত আবদারের বশীভূত না হলে নরেনের মত আদর্শ জামাতা লাভের সম্ভাবনায় আজকের এই সংশয় উপনীত হ'ত না। কন্যার বিবাহ দেবার পরম শুভ মুহূর্ত যখন উপস্থিত তখন সেটাকে বন্ধ রেখে দিলেন কন্যাকে বি-এ ক্লাসে ভর্তি ক'রে। এখন ভোগ কর সেই নিদারুণ অবিবেচনার কঠিন শাস্তি!

অফিস যাবার পূর্বে অপর্ণা স্বামীকে কোনো কথা বললেন না, কিন্তু সমস্ত দিন ধ'রে নিরবসর চিন্তার ফলে ক্রমশঃ যে ক্রোধটা পুঞ্জিত এবং বর্ধিত হ'ল অফিস থেকে প্রত্যাগমনের পর চা-পান করবার সময়ে শৈলনাথ তার লক্ষণ দেখলেন পত্নীর শুষ্ক মলিন মুখমণ্ডলে। বুঝলেন একটা ঝটিকা আসন্ন হ'য়ে আছে—জলযোগ শেষ হ'লেই যা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

সমস্ত বেগটা হঠাৎ এক সময়ে ভেঙে পড়বার পূর্বে খোঁচা মেরে খানিকটা হাওয়া বার ক'রে দিতে পারলে উত্তরকালে কিছু সুবিধা হ'তে পারে মনে ক'রে শৈলনাথ ভয়ে ভয়ে বললেন, "অপু, মুখচন্দ্রে ছায়া পড়েছে কিসের?"

উদ্যম ব্যর্থ হল। মৌনভঙ্গ ত হ'লই না, উপরোক্ত মুখচন্দ্রে ছায়া যেন আরও ঘনীভূতই হয়ে উঠল।

একটা মাছের কচুরি হাতে তুলে ধ'রে পুনরায় ডিশে স্থাপন ক'রে শৈলনাথ বললেন, "শাস্ত্রের মতে গ্রহণকালে কিছু খেতে নেই; গ্রহণ না ছাড়লে আর খাওয়া-টাওয়া হচ্ছে না।" ব'লে হাত গুটিয়ে বসলেন।

এবারকার কৌশল কিন্তু নিষ্ফল হল না। সতর্জনে অপর্ণা বললেন, 'রঙ্গ রেখে শীগগির খেয়ে নাও বলছি! এখনি শ্যামপুকুর যেতে হবে।"

"কোথায়? তোমার বাপের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"তা বেশ ত, বেড়িয়ে এস না।"

"তোমাকেও যেতে হবে।"

'আমাকেও! কিন্তু আজ যে আমার একটু কাজ আছে অপু।"

"কাজ থাক, যেতেই হবে।"

"বাপরে! ওয়ারেন্ট আছে না-কি?"

"হ্যাঁ, ওয়ারেন্ট আছে।"

মাছের কচুরিখানা হাতে তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে শৈলনাথ বললেন, "তা হ'লে চল যাই। তোমার বাপের বাড়ি আমার পক্ষে এমন আকর্ষণের জায়গা যে, ওয়ারেন্ট ত' ওয়ারেন্ট, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলেও ভাল লাগে।"

অপর্ণা মনে করেছিলেন, অধিক বাকবিস্তার করবেন না, কারণ কৌতুক পরিহাসের পথ একবার ভাল ক'রে গ্রহণ করলে স্বামীকে নিরস্ত করা কঠিন,—এ কথা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে এতটা অতিশয়োক্তি পরিপাক করতেও পারলেন না; ভ্রুকুটিপূর্ণ নেত্রে বললেন, "মিছে কথা বোলোনা বলছি! বছরে দুবার যাও কি-না তার ঠিক নেই, আর কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলেও ভাল

লাগে বললেই আমি বিশ্বাস করব। সে ভাল লাগত বিয়ের পর,—প্রথম প্রথম।"

মাথা নেড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শৈলনাথ বললেন, "তার মানে ভাল লাগার গুরুতম কারণটি তখন সেখানে থাকতেন। এখন তিনি এখানে থাকেন।"

অপর্ণা বললেন, "তা নয়। তখন তিনি নতুন ছিলেন, এখন তাঁর বয়স হয়েছে বেশি।"

অপর্ণার কথা শুনে শৈলনাথ হাস্‌তে লাগলেন; বললেন, "এ তোমার 'স্বামী' নয় অপু, যে, বয়স বেশি হ'লে ভাল লাগবে না। এ স্ত্রী,—দস্তুরমত স্ত্রী। আমার ফুলও ভাল লাগে, ফলও ভাল লাগে। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন ফুল, এখনকার দিনে ফল। তখনকার তিনি ফুল হ'য়ে দিতেন সুগন্ধ। এখনকার ইনি ফল হ'য়ে দেন রস।"

"বেশি চালাকি কোরোনা বলছি, তা হ'লে এখনকার ইনি বেশ ক'রে খানিকটা তেতো রস দেবেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তৈরী হও, আমি কাপড়টা চট ক'রে বদলে আসি।" ব'লে অপর্ণা উঠে দাঁড়ালেন।

শৈলনাথ বললেন, "কিন্তু কি জন্যে যাওয়া তা'ত শুনলাম না এখনো।"

"সে একেবারে সেখানে গিয়ে শুনো।"

"অভিযোগটা আগে শুনলে আত্মরক্ষার জন্যে একটু প্রস্তুত হ'য়ে যেতে পারতাম।"

"আমার কথার অবাধ্য হ'য়ো না, তা হ'লে আত্মরক্ষা তোমার আপনা-আপনিই হবে।" ব'লে অপর্ণা প্রস্থান করলেন।

কথাটা শৈলনাথ নিজে-নিজেই অনেকটা অনুমান করেছিলেন, কিন্তু গাড়িতে অপর্ণার নিকট তার যথার্থ বিবরণ পেলেন। মনটা হ'ল কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন।

১৬

দক্ষিণ দিকের দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে শয়ন ক'রে গগনবিহারী একটা পুস্তক পাঠ করছেন এমন সময়ে তথায় শৈলনাথ এবং অপর্ণা উপস্থিত হ'লেন। বৈশাখান্তের বেলা,—অল্পক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু সাতটা প্রায় বাজে।

কন্যা এবং জামাতাকে একত্রে আস্‌তে দেখে গগনবিহারী উৎফুল্ল হ'য়ে চেয়ারের উপর উঠে বস্‌লেন। সাগ্রহে উভয়কে আহ্বান ক'রে নিকটে দুখানা চেয়ারে বসিয়ে উচ্চস্বরে হাঁক দিলেন, "দীনবন্ধু!"

অপর্ণা সর্বদাই পিতৃগৃহে যাতায়াত করেন, কিন্তু বিশেষ কোনো কারণ ব্যতীত শৈলনাথের আসা হ'য়ে ওঠে না। বৎসরের মধ্যে দুটি দিন অবশ্য বরাদ্দ আছে—বিজয়া দশমী এবং জামাই ষষ্ঠী। বয়োবৃদ্ধির ওজুহাতে জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে শৈলনাথ মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি তোলেন, কিন্তু গগনবিহারী সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন না। তিনি বলেন, বয়সটা শুধু জামাতারই বাড়ছেনা, সেই অনুপাতে শ্বশুরেরও বাড়ছে; এবং দ্বিতীয়ত, পরলোকগতা পত্নীর এই অতি যত্নের করণীয়টি তাঁর জীবদ্দশায় বাদ পড়লে তাঁর স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখানো হবে ব'লে তাঁর মনে হয়। এই শেষোক্ত যুক্তির নিকট শৈলনাথ পরাজয় স্বীকার করেন।

দীনবন্ধু নিকটেই ছিল, প্রভুর আহ্বানে উপস্থিত হয়ে শৈলনাথ এবং অপর্ণাকে দেখে উৎফুল্ল মুখে উভয়কে প্রণাম করলে।

গগনবিহারী বললেন, "বউদিদিমণিকে ব'লে দে জামাই বাবু আর দিদিমণি এসেছেন, রাত্রে খেয়ে যাবেন।"

ব্যস্ত হয়ে শৈলনাথ বললেন, "আজ্ঞে না,—খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করবেন না,—সকাল-সকালই আমরা ফিরব।"

গগনবিহারী বললেন, "সর্বদা যারা আসা-যাওয়া করে তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ন-মাসে ছ-মাসে যারা একবার আসে, রাত্রি এগারটার সময়ে ফিরলেও তাদের সকাল সকালই ফেরা হয়।" ব'লে এ প্রসঙ্গের আর অবসর না দিয়ে একেবারে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে পড়লেন।

ক্ষণকাল সাধারণ কথাবার্তার পর অপর্ণা আসল কথার অবতারণা করলেন, বললেন, "বাবা, বাসুকে তোমার শাসন করতে হবে।"

অপর্ণার কথা শুনে গগনবিহারীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল; বললেন, "শাসন করতে হবে বাসুকে? কেন, কি অপরাধ বাসু করেছে?"

"কি অপরাধ বাসু করেছে তা ত সমস্তই তুমি জান বাবা,—সে অপরাধের কথা তুমিই ত নরেনকে জানিয়েছ।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে গগনবিহারী বললেন, "অপরাধের কোনো কথা ত' নরেনকে জানাইনি, তার বিষয়ে বাসুর মনের খবরটুকু শুধু দিয়েছি জানতে চাইলে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে ভুলিয়েই বা রাখি কি ক'রে বল?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে অতিশয় অপ্রসন্ন সুরে অপর্ণা বললেন, "এ কিন্তু বাসনার ভারি অবিবেচনার কথা বাবা। সত্যিই এ তার ভারি অবিবেচনার কথা।"

কথার ঝোঁকটা এমন যে এই অবিবেচনার মধ্যে যেন গগনবিহারীরও একটু অংশ আছে।

স্মিতমুখে গগনবিহারী বললেন, "এ ত' শুধু বিবেচনা-অবিবেচনার কথা নয় অপু,—এর মধ্যে রুচি-অরুচির কথাও আছে। এখন, আমের তুলনায় কেউ যদি কাঁটাল অপছন্দ করে তা হলে ত তাকে শুধু অবিবেচনারই দোষ দেওয়া যায় না।"

বিস্ফারিতনেত্রে বিস্মিতকণ্ঠে অপর্ণা বললেন, "নরেনকে তুমি কাঁটাল বল বাবা?"

মুখমণ্ডল গম্ভীর ক'রে গগনবিহারী বললেন, "বাসু যখন তাকে পছন্দ করছেনা তখন ত আমি তাকে আম বলতে পারিনে।"

"আম তবে কে শুনি?—অমরেশ?"

"তাই বা কি ক'রে বলি। বাসু শুধু কাঁটালের কথাই বলেছে, আমের কথা এখনো কিছু বলে নি।"

"কিন্তু নরেন ত অমরেশের কথাই বলে। শেষকালে কি বাসনার একটা বুড়ো বর হবে বাবা?" অপর্ণার কথার মধ্যে একটু করুণ হতাশার সুর।

গগনবিহারী বললেন, "একান্তই যদি তাই হয় তা হ'লে তুই কি করবি তা বল? লোকে কথায় বলে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।"

এ সান্ত্বনায় কিন্তু অপর্ণার মন একটুও প্রবোধ মানল না; ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে তিনি বললেন, "রুচির কথা বলছিলে বাবা, ঐ সোনার চাঁদ ছেলে নরেনকে ছেড়ে বুড়ো অমরেশকে যে পছন্দ করে তার রুচির আমি একটুও সুখ্যাতি করিনে।"

গগনবিহারী বললেন, "কিন্তু এ রকম রুচি বিপর্যয় মাঝে মাঝে ঘ'টে থাকে অপু। শুধু আজকালকার যুগেই নয়, পৌরাণিক যুগেও এর দৃষ্টান্ত আছে। বালিকা উমা কঠোর তপস্যা ক'রে বৃদ্ধ মহাদেবকে পেয়েছিলেন,—এ কথা ত জানিস্।" তারপর শৈলনাথের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "বাবা শৈলনাথ, তুমি চুপচাপ ব'সে রয়েছ, কোনো কথা বলছ না যে?"

শৈলনাথ বললেন, "আজ্ঞে, আমি যে কথাটাই বলব বলব মনে করছি আপনি সেটা বলে ফেলচেন। সেই জন্যে কথা বলবার সুবিধে পাচ্ছিনে।"

শৈলনাথের কথা শুনে গগনবিহারী হো হো ক'রে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন; বললেন, "তা হ'লে আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল আছে দেখছি।"

শৈলনাথ বললেন, "তা আছে।" তারপর ভ্রুকুটি-কুটিলনয়না পত্নীর মুখের প্রতি সহসা একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "প্রায় আছে।"

শৈলনাথের এই অতি-সকরুণ 'প্রায়' শব্দটি যোগের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে গগনবিহারী মনে মনে পুলকিত হলেন। রুষ্টা পত্নীর আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সময়ে সময়ে এরূপ যোগ-বিয়োগের প্রয়োজন হয়, পত্নীর জীবদ্দশায় সেরূপ অভিজ্ঞতার সহিত তাঁরও কিছু কিছু পরিচয় ছিল। সুতরাং সে বিষয়ে কোনোপ্রকার মন্তব্য না ক'রে বললেন, "শুধু পৌরাণিক যুগের উমার কথাই বা কেন, আজকালকার দিনেও এ রকম ঘটনা একেবারে বিরল নয়। কিছুদিন আগে ষ্টেটস্‌ম্যানে পড়ছিলাম বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী তেইশ বছরের একটি সুন্দরী ইংরাজ মেয়ে এক-জন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে বিয়ে করেছে। মনে করিস্‌নে কোনো আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে। দীর্ঘ এক বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরিণতি তাদের এই বিয়ে। তা হ'লে শুধু উমারই বা দোষ কি তা বল্।"

আধুনিক কালের দৃষ্টান্তটি অতিরিক্ত প্রবল দেখে অপর্ণা পৌরাণিক দৃষ্টান্তের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হ'লেন; বললেন, "কিন্তু বাবা, উমার কথা স্বতন্ত্র। পূর্বজন্মের সতীই যে পরজন্মে উমা হ'য়ে জন্মেছিলেন, একথা ত ভুললে চলবে না।"

গগনবিহারী বললেন, "না, তা ভুললে চলবে না। কিন্তু পূর্ব জন্মের উমাই যে এ জন্মের বাসনা নয়, আর মেনকা যে তুই নোস্, তারই বা প্রমাণ কোথায় বল?"

শৈলনাথ গম্ভীর মুখে বললেন, "আর আমি যে হিমালয়, তার কিন্তু প্রমাণ আছে আমার শৈলনাথ নামে।"

শৈলনাথের কথা শুনে গগনবিহারী অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন; বললেন, "ষোল আনা প্রমাণ আছে। তুমি বাবাজী, হিমালয় হ'য়ে পাশে ব'সে আছ, এ আমার একেবারেই খেয়াল হয় নি।"

শ্বশুর-জামাতার এই ক্রমবর্দ্ধমান কৌতুক পরিহাসের বহর দেখে অপর্ণা হতাশ হলেন; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "বাবা, বাড়িতে ত' হাসি-ঠাট্টার জন্যে একটা কাজের কথা হবার উপায় নেই, তোমার কাছে ছুটে এলাম কিন্তু তুমিও যদি এমনি ক'রে তার প্রশ্রয় দাও তা হ'লে যাই কোথায় বল দেখি? আচ্ছা, বাসুর বিষয়ে তোমরা কি সকলে মিলে একটা সুপরামর্শ করবে না? সে কি এমনি ক'রে কিনা মাথায় যা ইচ্ছে তাই ক'রে বেড়াবে?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, "পরামর্শের কথা পরে বলছি, কিন্তু বাধা দিয়ে কি পেরে উঠবি অপু? পঁচিশ বছর আগে তোর মা তাঁর মেয়েকে বাধা দিতে গিয়ে হার মেনেছিলেন, আর তার দু যুগ পরে এই স্বাধীনতা-স্বতন্ত্রতার কঠিন দিনে তুই তোর মেয়েকে বাধা দিতে সাহস করিস্?"

গগনবিহারীর কথা শুনে অপর্ণার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল, এবং সকৌতুক পুলকে শৈলনাথ মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগলেন।

গগনবিহারী বললেন, "তোর মা রতনপুরের জমিদারদের বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি দেখে ভুলেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুণে সারালো জিনিস তোকে ভুলিয়েছিল ব'লে আজ শৈলনাথের হাতে তোর এত সুখ এত সৌভাগ্য। কে বলতে পারে তোর জীবনে যেমন ঘটেছিল, তোর মেয়ের জীবনেও তেমনি ঘটবে না।"

অপর্ণা বললেন, "কিন্তু অমরেশের কথা ভেবে দেখ বাবা, পঁয়তাল্লিস ছেচল্লিস বছরের কম তার বয়স হবে না। বাঙালীর পক্ষে সে ত প্রায় একটা বুড়ো মানুষ। তার সঙ্গে বাসুর বিয়ে হবে?"

গগনবিহারী বললেন, "কিন্তু কি করবি তা বল? ছেলেবেলার ছড়া মনে আছে ত? 'তালগাছে কুটুম বোসের বাটুম গৌরী গো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর তা আমি করব কি?' অদৃষ্টের এই সান্ত্বনা অনেক মাকেই মেনে নিতে হয়েছে অপু, তোকেও হয়ত মেনে নিতে হবে। শিব, উমা, মেনকা, হিমালয় শুধু সেকালেই ছিলেন না, চিরকালই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে মানুষের মধ্যে আছেন। উমার বিষয়-বুদ্ধির অভাব, আর সেইজন্যে মেনকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার শাস্তি—এ চিরন্তনের জিনিস। উমাশ্রেণীর মেয়েরা চিরদিনই মহাদেবশ্রেণীর বেয়াড়া বেঢঙ অসংসারী লোকদের জন্যে তপস্যা ক'রে মরবে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে আছে ত?

শুনি শ্মশানবাসীর কল কল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ—"

সহসা কবিতা আবৃত্তি বন্ধ ক'রে গগনবিহারী বললেন, "তুই যে কাঁদচিস্ তা' ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তুমি ত' মনে মনে প্রমাদ মানছ না বাবা শৈলনাথ?" ব'লে শৈলনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

শৈলনাথ বললেন, "আজ্ঞে মানছি বই কি একটু; আপনার কন্যার আর ন্যাতনীর মধ্যে প'ড়ে একটু-আধটু মান্‌তে হচ্ছে।"

শৈলনাথের কথা শুনে গগনবিহারী হাস্‌তে লাগলেন।

অপর্ণা বললেন, "একটুও নয় বাবা, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কিন্তু ও-সব বাজে কথা যাক,—তুমি বাসুর মাথায় একটু শুভবুদ্ধি দাও, আর যাতে আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে নরেনের সহিত তার বিয়েটা হ'য়ে যায় সেই চেষ্টা কর।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থির হ'ল যে, আপাততঃ কিছুদিন বিবাহের বিষয়ে বাসনাকে কোনো প্রকার উপরোধ অনুরোধ করা হবে না, এবং তদবসরে নরেনের সহিত তার পরিচয় যাতে ঘনিষ্ঠতর হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অপর্ণা বললেন, "তা ছাড়া, অমরেশের সঙ্গে তার দেখাশুনো একেবারে বন্ধ করা চাই বাবা।"

গগনবিহারী বললেন, "জোর ক'রে হঠাৎ কিছুই করতে যাসনে—তাতে বিপরীত ফল ফলবে। অমরেশের সহিত তার দেখাশুনোর সুযোগ এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ বাসনাকে পড়াবার সুবিধা তার হবে না। একথা সে আমাকে ব'লে গিয়েছে।"

এ সংবাদে অপর্ণা অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন, কিন্তু শৈলনাথ খুসি হ'তে পারলেন না; বললেন, "পড়াশুনোতে তা হ'লে দেখছি বাসুর ভারি অসুবিধে হয়ে গেল। অমরেশের মতো শিক্ষক হঠাৎ পাওয়া সম্ভব হবে না।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অপর্ণা বললেন, "না হোক, তার দরকার নেই। যা লেখাপড়া হয়েছে; মেয়ে মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।"

তারপর এ প্রসঙ্গ একেবারে বন্ধ করে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন; বললেন, 'পারুল কে বাবা? পারুল নামে কোনো মেয়ের কথা তুমি জান?"

গগনবিহারী বললেন, "জানি। কিন্তু তুই তার কথা কেমন ক'রে জানলি?"

"নরেনের মুখে শুনেছি।"

"সে কার কাছে শুনলে?"

"তা'ত বলতে পারিনে। কিন্তু কে সে, বাবা? অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?"

গগনবিহারী বললেন, "সে একটি আশ্রয়হীনা মেয়ে। অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতার।"

কিন্তু অপর্ণা এইটুকুতেই নিরস্ত হ'লেন না, প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা ক্রমশঃ পারুলের সব কথাই জেনে নিলেন; অবশেষে বললেন, "এ রকম নীচ স্ত্রীলোকের সঙ্গে যার মেলা-মেশা চলছে তার সংস্রব ত্যাগ করাই উচিত। তার স্বভাব চরিত্র কখনই ভাল থাকতে পারে না।"

এ কথায় শৈলনাথ মৃদু আপত্তি উত্থাপিত করলেন, বললেন, "এর আর-একটা দিক আছে সে কথা ভুললেও চলবেনা। যার চরিত্রশক্তি দৃঢ় সে এ রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা ক'রেও ভাল থাকতে পারে। কণ্ঠে বিষ ধারণ করলে মহাদেবের কোনো ভয় নেই।"

"কিন্তু অমরেশ যে মহাদেবের মতো শক্তিমান পুরুষ তার কোনো প্রমাণ নেই।"

শৈলনাথ এ কথার উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেলেন না, পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘন্টি বাজছিল, দীনবন্ধু এসে বললে, "দিদিমণি, তোমাকে মা-মণি ডাকছেন।"

দ্রুতপদে টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হ'য়ে রিসিভারটা কানের কাছে ধরে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন: "কে রে?—বাসু?"

"হ্যাঁ।"

"কি বলছিস্?"

"তোমরা কখন ফিরবে? আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরতে পারবে কি?"

"আমরা এখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাব, ফিরতে রাত্রি সাড়ে দশটা এগারটা হবে। কেন, কি দরকার?"

"মাষ্টার মশাই এসেছেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কথা আছে।"

অমরেশ এসেছে অবগত হ'যে অপর্ণার মুখ অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল। যে সময়ে তার সংসর্গ ত্যাগ করবার পরামর্শ চলছে ঠিক সেই সময়েই কি সে বাসনার পাশে এসে জুটেছে! অসন্তোষের অকোমল কণ্ঠে অপর্ণা বললেন, "এখন আবার কি জন্যে সে এল?"

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কথাগুলো এপর্য্যন্ত অপ্রসন্ন সুরেই আসছিল, অপর্ণার শেষ প্রশ্নের আঘাতে সুরটা আরও রূক্ষ হ'য়ে উঠল; বললে, "কি জন্যে আসেন তা' ত তুমি জান,—আমাকে পড়াতে আসেন। কিন্তু আজ পড়াতে আসেন নি।"

"তবে কেন এসেছে।"

"অত কথা টেলিফোনে শুনে কি হবে, পরে শুনো। কবে তাঁকে আসতে বলব বল।"

একটু চিন্তা ক'রে অপর্ণা বললেন, "রবিবারে বেলা নটার সময়ে যেন আসে। এখন আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই; তাকে যেতে ব'লে দে।"

অপর প্রান্তে কণ্ঠস্বর আরও রূক্ষ হ'য়ে উঠল; বললে, "সে কথা বলবার দরকার নেই, আমার সঙ্গে কথা শেষ হ'লে আপনিই চ'লে যাবেন।" রিসিভার নামিয়ে রাখবার শব্দ পাওয়া গেল।

"বাসু! হ্যালো বাসু!"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আর বারান্দায় না গিয়ে অপর্ণা অপ্রসন্ন চিত্তে অন্দরমহলে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর ভ্রাতৃজায়াকে বললেন, "বাসু কোন্ করছিল,—শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি ফিরব। যা হ'য়েছে তাই দিয়ে তুমি আমাদের দু'জনকে খাইয়ে দাও ভাই।" (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রাউনিংএর তিনটি কবিতা

শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী এম্-এ

এক

সারা বসন্ত গোলাপ তুলিয়া গাঁথিনু পত্রদলে,
সেই ফুল আজি ছিন্ন করিয়া ছড়াই পথের তলে ;
সেই ফুলে করি কুসুমিত তার পায়ে-চলা পথখানি ;
দেখিবেনা চাহি ? ফুল্ল হবে ধূলি। তবু সার্থক মানি—
তবুও রাখিনু হায়,
পথে যেতে যেতে আনমনে যদি বারেক ফিরিয়া চায়।

কত দিন, মাস, বর্ষ যাপিনু সাধিয়া বীণার সুর,
আজি সেই বীণা মুখরিতা, আজি সঙ্কোচ করি দূর
ভেবেছিনু গানে প্রকাশিব মোর বেদনার ইতিহাস ;
সে তো শুনিবেনা ? মিছে বাঁধি তার। বৃথা ছিল দুরাশার ?
আশা করেছিনু—যদি কভু জাগে গান শুনিবার আশ।

এ জীবন ভরি' ভালোবাসিয়াছি, আজি ভেবেছিনু মনে,
কহিব কথায়, চিরদিন যাহা রয়ে গেল মনে মনে ;
স্বর্গ,—নরক ? কি জানি কি হয়। হয় তো স্বর্গ নয় ;
ও পদ-প্রসাদ স্বর্গ আমার ; সে নহে ভাগ্যলিপি ?
তবু কহি, তার প্রসাদিত জন ধন্য সে চিরজীবী।

(One way of Love)

দুই

সেই ধূসর সাগর, আর দীরঘ-কাজল-সিকত-রেখা,
আর আধখানি চাঁদ পীতবরণের, সুমুখ আকাশে লেখা ;
বুঝি নিদ্রা টুটিয়া চকিত উর্ম্মি জাগিল ঘূর্ণিপাকে,
যবে নিসাড়া এলেম নৌকা বাহিয়া, ভিড়ানু বালুকা বাঁকে।

সাগর-শীকর-গন্ধ-জড়িত উষ্ণ সে বেলাভূমি,
আধ ক্রোশ তার বাহিয়া এলেম, তিনখানি প্রান্তর,
অবশেষে দ্বারে উতরিনু আসি, দিনু সঙ্কেত করি';
অমনি আঁধারে নীল-দীপশিখা ঝলিল আঁধার চুমি'।
অতি ভয়, সুখ—অতি মৃদুভাষ, শিহরিত অন্তর,
তারপরে শুধু পরিপূর্ণতা দুইটি পরাণ ভরি'।

(Meeting at Night)

তিন

সহসা হেরিনু সম্মুখে মম সাগর কল্লোলিত,
আর উদয় তপন ঝলিয়া উঠিছে শৈলমালার তীরে,
দূরে যতদূরে চাই, প্রসারিত তার স্বর্ণ-আলোক-রথ,
হায় সুবিপুল ধরা শত প্রয়োজনে আমারে ধরিল ঘিরে।

(Parting in the Morning)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

P. G. A. Common Room
University of Calcutta
V.C.—Azizul Haq

অ-কপর্দক

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

ও পাশের বাঙ্কটার উপর যে লোকটা এতক্ষণ প্রায় আপাদমস্তক কম্বলে মুড়িয়া নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিকার ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ সে যদি তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া ধরা গলায় অনর্গল আবোল-তাবোল বকিতে সুরু করে এবং এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সহযাত্রীরা যদি তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয় কিছু মন্তব্য প্রকাশ করে তাহাতে বিস্মিত হইবার বোধকরি কোন কারণ নাই। এবং এজন্য শ্রীমতী সুতনিমা বা তাঁহার স্বামী পঙ্কজ রায় তাহারও উপর দোষারোপ করা চলে না।

—লোকটা ক্ষ্যাপা নাকি?

—কি জানি, তবে মনে হচ্চে তো সে রকম।

—কিছু ক'রে বসবে না তো?

—করলেই বা কি করা যাবে। চতুর্থ ব্যক্তি তো আর গাড়িতে নেই! তবে ষ্টেশনে থেমেচে, এই ভরসা। বেশি বাড়াবাড়ি করে তো নামিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই মধুর সংলাপ সে ইহাতে কর্ণপাতমাত্র না করিয়া অবিশ্রাম বকিয়া চলিল—পাগল! পাগল জাননা? কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা চুপ ক'রে ব'সে থাকে, দু'গাল বেয়ে চোখের জল নেমে আসে। আমিও হাসি, আমিও কাঁদি, আমিও চুপ

ক'রে ব'সে থাকি, আমারও চোখ দিয়ে জল পড়ে,—আর আমি পাগল না? নিশ্চয়ই পাগল, একশ'বার পাগল, দু'শ' বার পাগল, তিনশ'বার—

কে একজন দরজা দিয়া কিছুক্ষণ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাতমাত্রই একলাফে নামিয়া পড়িয়া লোকটা চীৎকার করিয়া উঠিল—কে?

—আমি চেকার।

—এখানে কেন?

—আজ্ঞে, টিকিট।

—কোথাকার টিকিট?

—যেখানে যাবেন।...স্বরে একটু বিরক্তির আভাষ।

—রাঁচি যাচ্ছি,—গম্ভীর মুখে লোকটা কহিল।

—এ-তো রাঁচির গাড়ি নয়, এ যে আসাম-মল।

—তবে চাক্‌রি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি। কোন গাড়ি কোথায় যাবে জাননা, চাকরি করতে এসেছ, না?—বলিতে বলিতে লোকটা দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। চেকার মহাশয় পূর্বাহ্নেই বোধকরি কিছু সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাই আস্তিন গুটাইয়া এই লোকটির আক্রমণের পূর্বেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।—গাড়িও ছাড়িয়া দিল।

আর মিনিট কুড়ি নিরাপদে কাটাইতে পারিলেই গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়; মিসেস সুতনিমা করুণ নয়নে একবার লোকটার পানে চাহিলেন; ইহার রাঁচি যাওয়াই উচিত।—আর পারিনে বাবা, বলিতে বলিতে লোকটা সম্মুখের বেঞ্চিটাতে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, ফ্ল্যাস্কে চা-টা কিছু আছে না কিরে পঙ্কজ? গলাটা শুকিয়ে উঠেছে যে!

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে পঙ্কজ তাহাকে চিনিল—আরে, প্রদোষ যে!—কণ্ঠস্বর বিস্ময়ের সপ্তমে চড়িয়াছে।

প্রদোষ তখন তাহার মাথায় জড়ানো র‍্যাপারটা কাঁধে ফেলিতে ফেলিতে কহিতেছিল—কিছু মনে করবেন না মিসেস রায়, এ একটা অভিনয় বৈতো নয়, উদ্দেশ্য কিন্তু সাধু।

উভয়ে বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

—কিন্তু বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ নেই। আগে একটু চা পাই, তারপর সব কুয়াসা উড়িয়ে দিচ্ছি।

চায়ের আরামে কুয়াসা কাটিল। এক ঝলক আলো পড়িয়া অস্পষ্ট প্রশ্নগুলা সব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—তোমরা তো থার্ড-মাষ্টারিটা মিলিযে দিয়েই খালাস। আমি এদিকে অকপর্দকানন্দ পরমহংস। মা গেলেন মারা। বাড়ি ঘর দোর যা কিছু ছিল সব বেচে দিয়ে দিলাম বোনটার বিয়ে। শিষ্যের খোঁজ করছি, এমন সময় শিষ্যের হাটেই একেবারে নেমন্তন্ন।...ষ্টেশনে তো আসা গেল। কিন্তু...সন্নিসি?...ও ব্যবসাটা ফেল প'ড়ে গেচে। সন্নিসিদেরও আজকাল নাকি পয়সা লাগে।...উপায় ঠিক করতে সময় লাগল না। কিন্তু থার্ড-ইণ্টারে উঠতে ভয় হ'ল। অত লোক, শেষটায় সত্যিই রাঁচি চালান ক'রে দেবে না তো।...হাঃ হাঃ হাঃ...

—তাহলে প্রথম পরিচয়টা ভালই হ'ল বলুন?—হাসি থামিলে মিসেস রায় কহিলেন।

—ভাল বই কি। তবে প্রথম দেখাটাও সেবারে নেহাৎ মন্দ হয় নি।

—থাকগে, (একটু লজ্জিত ভাবে) আপাততঃ আমাদেরই অতিথি হচ্চেন তো?

—অ-তিথি নয়, একবারে স-তিথি অর্থাৎ এ মাইগ্রেটরি ষ্টেজটা যতদিন না ঘোচে তত তিথি।

—কিন্তু, পঙ্কজ কহিল, গাড়ি তো ঝিমিয়ে এল। ষ্টেশনে কি পালার অভিনয় হবে শুনি?

—সে আবার কি? ইস্কুলের থার্ড মাষ্টার এসেচে সেক্রেটারি জমিদার বাবুকে আর তাঁহার মাননীয়া পত্নীকে ওএলকাম করতে।

ট্রেণ প্ল্যাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

পদ্মা: প্রমত্তা নদী

শ্রীসুবোধ বসু

আট

দুর্গাপ্রসন্ন এক সময় রাজাকে এয়ারগান্ কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার বহুদিন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু সমুদয় পাখী এবং কাঠবেড়ালী অক্ষত থাকিয়া যায়। এ-অবস্থায় রাজা যখন ছররা ছুঁড়িত, তখন গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায়, কোনও ফলেরই আশা করিত না। কিন্তু একদিন সহসা তার গুলি লক্ষ্য বেধ করিল—ছোট একটা চড়ুই পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে হাওয়ার মধ্যে চক্র রচনা করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র প্রাণীটার বুকের মধ্য হইতে যখন রাঙা শোণিত ফিনিক দিয়া বাহির হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র কোমল লোমগুলি যখন রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল, একটা নিরুপায় বেদনায় যখন সেটা ডানা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দুইটা দাপড়াইতে লাগিল, তখন রাজার সমস্ত বীরত্বগর্ব্ব সহসা জল হইয়া গেল।

মনে মনে সে কহিল—দূর, এত্তোটুকু একটা পাখীকে আবার মারতে আছে নাকি—না মারলেই ভাল ছিল, কিচিরমিচির করে কতই খেলে বেড়াত!—আর ওর যদি একটা মা থাকে, তবে তো আমার পাপই হবে;—মারতে যদি হয়, বাঘ মার, সাপ মার, বুনো শূয়ার মার—যারা তোমার ক্ষতি করবে—ও-বেচারী আর কোন্ ক্ষতিটা করত!—শুনলি পাখী, মানুষের হাতে না মরলি, স্বর্গে যাবি, বেশ মজাতে থাকবি,—কিচিরমিচির আর করতে হবে না, সুন্দর সব গান গাইতে শিখবি—মরেছিস তাতে ভয় কি, না?

রাজা ঠিক করিল, চড়ুইয়ের রীতিমত একটা অন্ত্যেষ্টি করিবে, যাতে ওর স্বর্গলাভের আর কোনও বিঘ্নই না ঘটে। স্বর্গে যদি যাইতে পারা যায়, তবে মরাটা যে অকিঞ্চিৎকর ও উপেক্ষারই জিনিষ, রাজার এই দর্শন আজিকার নয়। ওর মার মৃত্যুর পর হইতেই এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে; ইহা সাধারণ একটা অলস আশা মাত্র নহে, ইহা তাহার নিকট একটা গভীর সত্য।

দুপুর বেলা। চাকরবাকরেরা পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছে,—শুধু রাজারই বিশ্রামের ফুরসুৎ নাই, সম্মুখে তাহার কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা হাতের তালুর মধ্যে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে সে দালান হইতে বাহির হইয়া আসিল। এখান হইতে খালের মধ্য পথে একটা চৌচালার ঘর ছিল—দালান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দুর্গাপ্রসন্ন সেইটাকে বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করিতেন। তারই পিছনে তেঁতুলগাছটার তলায় রাজার প্রভাতের শিকার কচুপাতায় ঢাকা ছিল; রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পকেটের মধ্যে হাত চালাইয়া কয়েকখণ্ড কাঠের টুকরা বাহির করিয়া আনিল এবং সেই কাষ্ঠসহযোগে পরিপাটী এক চিতাশয্যা রচনা করিল—মায়ের চিতা রাজার দেখা ছিল। অবশেষে পাতার আচ্ছাদন হইতে পরম মমতার সঙ্গে মরা পাখীটাকে বাহির করিয়া আনিয়া চিতার উপর শোয়াইয়া দিল এবং শুক্নো পাতা দিয়া পুনর্ব্বার ওকে ঢাকিয়া দিয়া মুখাগ্নির ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইল।

কিন্তু মুস্কিল হইল দেশলাই জ্বালান লইয়া। আংশিক-ভাবে দেশলাইটা পুরাণ হওয়ার দরুণ এবং আংশিকভাবে বাতাসের দৌরাত্ম্যিতে কাঠি আর কিছুতেই ধরান যায় না।

রাজা কাঠির পর কাঠি ঘষিতে লাগিল,—মুখ বিকৃত করিয়া ক্রোধে ঠোঁট কামড়াইয়া যতই সে অধ্যবসায়ের একশেষ হইল, দেশলাই ততই অদ্ভুত কৌতুকে মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল,—একটু ঝিলিকমাত্র দিল না। কিন্তু রাজাও না-ছোড়-বান্দা; একটা কাঠি সে খোলে, দেশলাইয়ের গায়ে প্রবল জোরে ঘষিয়া দেয়, এবং তাহা না জ্বলায় ক্রোধের সঙ্গে ঘরের বেড়ার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া নতুন কাঠি বাহির করিয়া প্রাণপণে ঘষ্‌ড়াইতে আরম্ভ করিয়া দেয়

উদ্যোগী পুরুষসিংহের লক্ষ্মীলাভ সম্বন্ধে একটা কথা আছে, রাজার ক্ষেত্রেও তাহা ফলিল; সহসা একবার দেশলাইয়ের বারুদ মৃদুগুঞ্জন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শুক্‌না পাতায় আগুন ধরাইয়া দিতে রাজা একটুও আর বিলম্ব করিল না; এক নিমিষে মরা পাতাগুলি রঙীন মহোৎসব সুরু করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল—রাজার আর আক্ষেপ রহিল না। একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া হাত জোড় করিয়া সে প্রার্থনা করিতে লাগিল—ভগবান, ওকে তোমার কাছে স্বর্গে নিয়ে যাও; ও ভারী লক্ষ্মী পাখী,—কাউকে কিছু করে না, শুধু আপন মনে কিচির মিচির করে' খেলে বেড়ায়।

সহসা আগুনের ঝাঁজটা বড় বেশী মনে হইল; পাতার উপরে যে আগুন নাচিতেছিল তার চাইতে বহুগুণ অধিক অগ্নিশিখার এক আভা আসিয়া মুদিত চোখের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। রাজা তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া ঘরের দিকটায় চাহিল, এবং একমুহূর্ত্তে ভয়ে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, ঘরের এদিককার বেড়ার নীচে একরাশ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া উন্মাদের মত উপরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেড়ার সমস্ত দৈর্ঘ্য তারা আবেষ্টন করিয়া ফেলিল—সাপের ফনার মত অগ্নি-শিখা উদ্ধতরোষে বাঁশের বেড়ায় ছোবল মারিতে লাগিল; মাটী হইতে ছাড়া পাইয়া যেন এক সহস্র দৈত্য লাফাইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের লোলুপ জিহ্বা হইতে স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিতেছে। বাঁশের গিঠগুলি বন্দুকের গুলির মত সশব্দে ফাটিতে আরম্ভ করিল; সমস্ত বেড়া অগ্নিজালে ছাইয়া গেল।

রাজার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; চীৎকার করিতে গেল, দেখিল গলা দিয়া শব্দ বাহির হয় না। তখন চোখ বুজিয়া প্রাণপণে সে বাড়ীর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সংবাদ পাইয়া সারা বাড়ীর লোক সে দিকে ছুটিল। গমস্তা অম্বিকাচরণ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অপরাপর সকলকে হারাইয়া দিয়া ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিতে লাগিল—'ওরে বালতি আন, জল আন, আগুন, আগুন!' দুর্গাপ্রসন্নও রাজার ভীত চীৎকার শুনিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন এবং ইন্দির ঠাকরুণ ছুটিতে ছুটিতে বিলাপ সুরু করিলেন—ওরে আমার সর্ব্বনাশ হইল রে,—কোন্ পাপে এমন হইল রে—বৌমা, তোমার সোনার সংসার আমার হাতে পুইড়া ছাই হইল গো—.

একাধিক প্রাচীর, ঘর ও দালানের বাধা ডিঙাইয়া তবে সেই পুরাতন বৈঠকখানা ঘরের কাছে যাওয়া যায়। অম্বিকা প্রমুখ সকলে যখন অকুস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন বিস্ময়ে সবাই হতবাক্ হইয়া গেল। দেখিল, একদিকের সুদীর্ঘ বেড়ার সমস্তটা মাটীতে কাত হইয়া পড়িয়া তখনও স্থানে স্থানে জ্বলিতেছে, কিন্তু সারা ঘরের আর কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নাই; যেন কে একজন মহা বলবান ব্যক্তি একদিকের সমস্তটা বেড়া আলগোছে তুলিয়া লইয়া একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে—অন্যান্য বেড়াতে যাতে আগুন লাগিতে না পারে সে বিষয়ে তার হুঁসিয়ারির দরুণ সারা ঘর জ্বলিয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ আসে পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, একটা জনপ্রাণীরও চিহ্ন দেখা যায় না। পোড়া বেড়াটাতে আগুনের যতটা আধিপত্য দেখা গেল তাহাতে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিল না এই ভাবিয়া যে কোন্ অদ্ভুত উপায়ে বাড়িটা রক্ষা পাইল—অন্যান্য বেড়ায় আগুনের ছোঁয়াচ লাগিল না কেন? এক অত্যাদ্ভুত উপায়ে তারের বাঁধনগুলি খুলিয়া সুবিশাল এই বেড়াটা কি করিয়া এতটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িল? এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেহই পায় নাই, রাজাও নয়। সে শুধু এইটুকু দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে তার পাখীটার

দাহকার্য্য বেশ ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ওর স্বর্গ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকাই উচিত নয়।

কিন্তু এই ঘটনার পরে এবং এই উপলক্ষ্যে কতকগুলি মন্তব্য রাজাকে অত্যন্ত বেশী রকম প্রভাবান্বিত করিয়াছিল—অন্তত কিছুকাল। শিশুর মধ্যে যে মরমী চির-বিরাজমান, তার নিকট এগুলির মূল্য কম নয়।

সদর গমস্তা অম্বিকাচরণ বুড়া নায়েবমশাইকে এ-সম্বন্ধে বলিতেছিল—বড় দুরন্তছেলে, আগুনটা জোর করে ধরলে এই দালানটাই কি রক্ষা পেত মনে করেন—উল্টো দিকের জোর হাওয়ার আগুন এঅবধি টেনে আনিত না?—তবে আশ্চর্য্যি বলতে হবে, একটা সারা বেড়াময় আগুন ধরে উঠল, অথচ ঘরের অন্ত কোথাও একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগল না! আর বেড়াটাই বা অমন করে' খসে দূরে এসে ছিটকে পড়ল কেমন করে? জনমানুষ তো একটা চোখে পড়ল না; আর যদি মানুষেই করে' থাকবে, তবে সে পালিয়ে যাবে কেন, গর্ব্ব করে' দাঁড়িয়ে থাকত—ছোটলোক হলে বকৃশিষ আদায় করে' ছাড়ত!

বৃদ্ধ নায়েব গম্ভীরস্বরে জবাব দিয়াছিলেন—অমনি করেই ভগবান শিশুর সঙ্গে খেলা করেন, অম্বিকা।—ঐতো তাঁর আনন্দ!

রাজা এই কথাগুলি আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল। শুনিয়া এক অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত পুলকে সে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভগবান? সত্যই তো ভগবান।—শুধু চোখে দেখতে পাওয়া গেল না—এই যা দুঃখ!

তার বাবাকেও সে একদিন এ-সম্বন্ধে পিসিমার কাছে মন্তব্য করিতে শুনিতে পায়।—ঘর ভাঙবার প্রবৃত্তি ওর রক্তের মধ্যে আছে, দিদি; পুড়ে যে সব শেষ হয়নি, এ ভগবানেরই ইচ্ছা।—নইলে অমন আগুন অমন করে' থেমে যায়?—এ যেন তিনি আপনি এসে নিজ হাতে নিবিয়ে দিয়ে গেলেন, শিশুর সঙ্গে অদ্ভুত খেলা খেলে গেলেন!

ইন্দিরঠাকুরাণী অসীম স্নেহের সঙ্গে কহিলেন—অথন ভগবান বাঁচাইয়া রাখলে, তবে তো।—রাখব—যেমন এইবার রাখল, এমন কইরাই রাখব!

ইহার পর প্রায় একটা সপ্তাহ গত হইয়াছে। সেদিন বিকালে রাজা জেলেপাড়ার দিকে রওনা হইয়া পড়িল। উদ্দেশ্য, মাণিকের সঙ্গে দেখা করিয়া পদ্মায় মাছ ধরিতে যাওয়ার বিষয়ে একটা পাকাপাকি করিয়া আসিবে। এমন ফাঁকি দেয় মাণিকটা—এ ছুতায় ও ছুতায় রাজার অমন সঙ্গত প্রস্তাবটা এড়াইয়া চলে। রাজা আজ ঠিক করিয়াছে মাণিককে যাইয়া বলিবে যে বাবা যাইতে অনুমতি দিয়াছে। এবং বলিয়াছে যে মাণিক রাজাকে শীঘ্র একদিন না লইয়া গেলেই তাঁর বড় রাগ হইবে।

বড় সড়ক ছাড়িয়া রাজা জেলেপাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরিল। বাঁ দিকে কিছুদূরে চোখে পড়িতেছে মুণ্ডেশ্বরীর বাগান। অমাবস্যার রাত্রে এই বাগানের দুই প্রান্তের দীর্ঘ দুইটা তালগাছে পা দিয়া মুণ্ডমালিনী কালীকে নাকি এখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। 'আজগুবি'—রাজা মনে মনে বলে। 'মা-কালীর যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই।'

কিন্তু মুণ্ডেশ্বরীর বাগানটা গ্রামবাসীদের কাছে একটা মহা আতঙ্কের স্থান। ঘনসন্নিবিষ্ট আমবাগানের মধ্যে মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরটা এখন একটা ভঙ্গিহীন ভগ্নস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে; সেই স্তূপ ফুঁড়িয়া একাধিক অশ্বত্থ এবং বটগাছ ক্রমেই স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে। নীচেই কচুরি এবং শ্যাওলায় আচ্ছন্ন একটা ডোবা পূতিগন্ধ বিস্তার করে। এইটা নাকি একসময় সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলে মুণ্ডেশ্বরীর সুন্দর মন্দির সততই প্রতিফলিত হইত। কত লোক ইহা হইতে জল লইত, কত লোক স্নান করিত—ঘণ্টা এবং বাদ্যের শব্দে জলরাশি প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত আমবাগান মুখরিত করিয়া তুলিত। যাহা অতীতের গৌরব ছিল, ভক্তিতে এবং প্রাণের উচ্ছ্বাসে যে-দেবায়তন এককালে স্পন্দমান থাকিত, আজ তাহা গ্রামের আতঙ্কের বস্তু; সরস্বতীপূজার সময়ে ইস্কুলের ডানপিটে ছেলেরা এখানে পলাশফুল সংগ্রহ করিতে আসে—আর কেহই আসে না, আসিবার প্রয়োজনও হয় না। জেলেদের ছাড়া এ পথ দিয়া চলিবার অন্য কাহারও প্রয়োজন হয় না এবং জেলেরাও অধিকাংশ সময়ে খালের পথে যাতায়াত করে।

শিষ দিতে দিতে রাজা মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের কাছ দিয়া আগাইয়া চলিল।—এই বাগানে নাকি ভূত থাকে!—ভূত কেমন হয়, রাজার বড়ই দেখিতে ইচ্ছা, আবার ভয়ও করে। মুণ্ডেশ্বরীর বাগানে একদিন মাণিককে সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিলে মন্দ হইত না। পরম কৌতূহলের সঙ্গে রাজা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া মুণ্ডেশ্বরীর ভগ্নস্তূপ দেখিতে চেষ্টা করিল; কিছুই চোখে পড়িল না। কাজেই সে বরাবর হাঁটিয়া চলিল। মাণিকের দেখা পাওয়া গেল না। বটতলির হাটে সে মাছ বেচিতে গিয়াছে। সুতরাং রাজাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের কাছ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তার গা-টা একটু একটু ছমছম করিতে লাগিল।—সত্যি, কী আছে এই বাগানের মধ্যে? কেন লোকেরা এর ভেতরে যায় না? গেলে কি হয়? ভূত কি সত্যিই আছে? বাবা বলেন—'ভূত যদি থাকেও তবু আমাদের চোখ দিয়া ভূত দেখা সম্ভবপর নয়;—অনিষ্ট করিবার শক্তিও ভূতের কিছু নাই।'—আর ভূত যদি সত্যই দেখা যায়, তবে কেমন দেখিতে হইবে?

সহসা চমকাইয়া উঠিয়া রাজা দেখিল কখন্ সে দুর্ব্বাচ্ছন্ন অসমতল পায়ে-চলার পথটা ধরিয়া মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—টের পায় নাই। অদূরে একটা ইঁটের পাঁজা দেখা যাইতেছে—হয়তো এটই মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির; তার নীচেই হাজিয়া যাওয়া ঘাস ও দামে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন একটা দীঘি। একমুহূর্ত্তে রাজা দুই চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়া, কোন্ পথে সে এই ভয়ঙ্কর আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িল? কোথায় ছিল তার চোখ, কোথায় ছিল তার বুদ্ধি! ভূত? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ভূত দেখিতে পাওয়া যায়! অ্যাঁ, ভূত! ভূত! যন্ত্রচালিতের মত রাজা মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিল। ছুটিয়া ফিরিয়া পালাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কে যেন একটা লোহার শিকল দু'পায়ে পরাইয়া দিয়াছে এবং সেই শিকল টানিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; অত্যদ্ভুত পরিশ্রমে রাজার কপাল দিয়া টস্‌টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল এবং ভগ্নস্তূপের নিকট যে কখন গিয়া বসিয়া পড়িল নিজেই টের পাইল না।

কারা সব ও-দিক হইতে আগাইয়া আসিতেছে? চতুর্দ্দিক হইতে যেন সহস্র সহস্র অশরীরী আত্মা একটা জীবিত মনুষ্যের সঙ্গ পাইবার জন্য অন্ধকার বাগানের সংখ্যাহীন গোপন আবাস হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। সহসা একটা ডাল মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, এবং পরক্ষণে যেন অদৃশ্য বহুজনের মিলিত পদশব্দে শুকনা পাতারা মুখর হইয়া উঠিল; কোথা হইতে সহসা বাতাস উত্থিত হইয়া ভগ্নস্তূপের ছিদ্রগুলির মধ্যে হি হি করিতে আরম্ভ করিল।

হাঁটু দুইটা বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া রাজা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারপর ভয়ে আর সে চোখও মেলিতে পারিল না। শুধু নিজের মধ্যে সাহস আনিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া কহিতে লাগিল—বেশ তো, ভূত দেখা গেলে ভালই তো—আমার মাও তো এখন ভূত—মাকে দেখলে তো মজাই—কতদিন যে দেখিনি।—বেশ তো—

রাজা চোখ মিটিমিটি করিয়া চাহিল। সহসা অস্পষ্ট অন্ধকার ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতে লাগিল; রাজা উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। ইঁটের স্তূপে কনুই ভর দিয়া কোনও প্রকারে সে অবসন্ন দেহটাকে খাড়া করিয়া রাখিল। কে যেন চুপি চুপি পরামর্শ দিতে লাগিল—আর কেন, শুইয়া পড়, জাগিয়া থাকিয়া আর লাভ কি!

সহসা যেন অতি-সূক্ষ্ম সানুনাসিক একটা শব্দ রাজার কাণে প্রবেশ করিল; শব্দ লক্ষ্য করিয়া রাজা দূরের তেঁতুল গাছটার দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল। স্পষ্টই মনে হইতে লাগিল—কৃষ্ণবর্ণ একটা অশরীরী ছায়া, অদ্ভুত সানুনাসিক শব্দ করিতে করিতে সরু দীর্ঘ পা বাড়াইয়া এক ধাপ এক ধাপ করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। রাজা সে শব্দ স্পষ্ট কাণে শুনিল, মুদ্রিত আঁখি-পল্লব সেই অশরীরী মূর্ত্তিকে আটকাইতে পারিল না।

সহসা একমুহূর্ত্তে রাজার মনে পড়িয়া গেল বৃদ্ধ নায়েব মশায়ের কথাটা—'অমনি করেই ভগবান শিশুর সঙ্গে খেলা করেন, অম্বিকা।—ঐতো তাঁর আনন্দ।' ইহা যেন মন্ত্রের

ন্যায় কাজ করিল ; এই অদ্ভুত জয়স্তম্ভিত আবেষ্টনের গহন অন্ধকারে রহস্যকণ্টকিত বনস্থলী চমকিত করিয়া সহসা রাজা উচ্ছ্বাস করিয়া উঠিল—কিছু না, ভগবান, কিছু না—সব তোমার চালাকি !—আমি সব বুঝতে পেরেচি—হি হি করিয়া রাজা কেবলই হাসিতে লাগিল। কৌতুকের এবং ভয়ের সংমিশ্রণে সে হাসি বিচিত্র হইয়া উঠিল।

হি হি হি—ছেদহীন, সমাপ্তিহীন, উন্মাদ হাসি !

এমন সময়ে জেলেপাড়ার দিক হইতে ক্রমশ: একটা সঙ্গীত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে শোনা গেল ; কতক্ষণ পরে তার পদগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল :—

ও মন মাঝিরে তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল্

রাজা প্রথমেই অনুমান করিয়াছিল, গলা শুনিয়াই চিনিতে পারিল এ মাণিক ছাড়া আর কেহ নহে। এবার সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পরক্ষণে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—মাণিক, মাণিক, আমি রাজা বাবু,—ছোট কর্ত্তা—মুণ্ডেশ্বরী জঙ্গলে এসে পড়েছি, নিয়ে যা আমাকে,—শুন্‌চিস্,—ও মাণিক !

'ও মন মাঝিরে তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল্'

মাণিকের গান থামিলই না। রাজা বুঝিল, সে শুনিতে পায় নাই। গলায় যতটা শক্তি ছিল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সে চীৎকার করিতে লাগিল। অতঃপর মাণিকের গান থামিয়া গেল। কতক্ষণ চুপ থাকিবার পর তার হাঁক শোনা গেল—কে ? বাগানে কে ?

রাজা সচীৎকারে কহিল—আমি, রাজাবাবু, ছোটকর্ত্তা—তুই শীগগির আয়—আমার ভয় করচে।

'ছোটকর্ত্তা ?' দূর !—হ, আমি বুঝি আর তোমাগো কৌশলটা বুঝি না ! ভুলাইয়া নিতে চাও !—মাণিক মাঝি অত কাঁচা ছাওয়াল কিনা—ছোটকর্ত্তা না হাতী !—ছাই পড়ুক, ছাই পড়ুক তোর মুখে।'

'আরে না না,—আমি সত্যিই আমি ; আমিই রে, আমি ভূত না।'

'এই তে কি আর মাণিক মাঝি ভোলে—হকল ভোল্‌ই আমি জানি—মাঝির ছাওয়াল না ? কও দেখি—রাম রাম।'

এই বিপদের মধ্যেও রাজার আবার হাসি পাইল। বলিল—হি হি হি—রাম রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা—আর কত শুনবি। দূর ভীরু, আমি ছোট ছেলে হয়ে এখানে আসতে পেরেচি, আর বুড়ো ধাড়ী তুই ভয় পাচ্ছিস্ ?

রাজার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারায়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, তাহাকে রাম নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া মাণিকের প্রত্যয় হইল। হাঁক দিয়া কহিল—ওঃ, তুমি নি, ছোট-কর্ত্তা ? দাঁড়াও আমি আইলাম।

মাণিক ছুটিতে ছুটিতে বাগানে ঢুকিল। কিন্তু রাজাকে ইটের স্তূপের কাছে সপষ্ট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইল না—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি সন্দেহভরে দৃষ্টি বুলাইয়া এবং অবশেষে মাটিতে তার ছায়া দেখিয়া তবেই নিকটবর্ত্তী হইল।

রাজা রাগিয়া কহিল—যা ভীরু তুই মাণিক, ভয়েই মরিস্।

মাণিক কহিল—এই কি কাণ্ড করছ, ছোটকর্ত্তা ! মুণ্ডেশ্বরীর বাগানে একটা জুয়ানমর্দ্দও দিনদুপুইরে একলা ঢুকতে সাহস পায় না—আর তুমি এই গহিন রাত্রে করচ কি—অ্যা ? আরে সব্বনাশ,—এইহানে যে দানাদৈত্যি, ভূতপেত্নীর মহোচ্ছব !—

রাজা সগর্ব্বে কহিল—হলোই বা, ভূত দেখতেই তো এসেছিলাম,—দেখেওছি ; ঐ তেঁতুল গাছটার থেকে নেমে, বুঝলি—

'থাউক থাউক, কর্ত্তা,—আগে ভালয় ভালয় বাগানের বাইরে চল।'

হাত ধরাধরি করিয়া, তাহারা মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

—(ক্রমশ:)

শ্রীসুবোধ-বসু

শারদ-শ্রী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

বনে বনে ফুটিয়াছে জুঁই বেল করবী
তোমার আমার মন হরিয়া,
কেতকী কেয়ার দল ছড়াইছে পরিমল,
অবিরল পড়ে রেণু ঝরিয়া,
মলয় হয়েছে তা'রে পরশিয়া গরবী
তোমারি আমার মন ভরিয়া ॥

আঁকা বাঁকা মেঘে ঢাকা শরতের গগনে
অনামী পাখীরা চলে গাহিয়া,
শঙ্খচিলের দল, পার হ'য়ে নীলাচল
চলেছে নিতল নভো বাহিয়া,
হংস-মিথুন তাই উড়ে শুভ লগনে
নীল সরোবরে অবগাহিয়া ॥

চঞ্চল লঘু মেঘ গুরু গুরু ডাকিছে
কাশকুসুমের হিয়া শিহরে,
কপোত কপোতী ডাকে গহন সবুজ শাখে
ডাহুক ডাহুকী সুখে বিহরে,
তরুতলে শেফালিকা কি যে ছবি আঁকিছে,
তোমার আমার হিয়া শিহরে ॥

পাগল করিয়া যেন ডাকে বনবীথিকা
তোমার আমার মন হরিয়া,
তারার দীপালী জ্বলে সুনীল গগন তলে,
ছায়া কাঁপে নদীজলে পড়িয়া ;
শ্যাম-পল্লব গাহে কী মধুর গীতিকা
অজানিত বল্লভে স্মরিয়া ॥

সোনালী ধানের ক্ষেতে দয়াময়ী কমলা,
শস্য শ্যামল আয়ু বিতরে,
গন্ধ আসিছে ভাসি,' রাখাল বাজায় বাঁশী
সে সুর যে চিরপরিচিতরে,—
হে মোর শারদ রাণী, জাগো জাগো অমলা
পুলকিত মরমের ভিতরে ॥

জ্যোৎস্না নামিল ঐ বনতল ভরিয়া
রজত ধবল চারু চরণে,
স্নিগ্ধ মাধবীলতা জাগা'ল মিলন-কথা,
সুরভিত আকুলতা স্মরণে,
ময়ূর ডাকিয়া উঠে কেকারব করিয়া
বিশ্ব-বিরহ-ব্যথা হরণে ॥

STUDENTS
P.G.

বাংলা দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ভূমিকা

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী এম্‌-এ

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সমগ্র বাংলা দেশে সত্তরটী বৌদ্ধ বিহার এবং তিন শতেরও অধিক দেব মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকটী বৌদ্ধ বিহারের এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি নগরের পূর্ব্ব গৌরব ও শোভা সমৃদ্ধির পরিচয়ও তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানা যায়।' ১ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল-রাজগণের নির্ব্বাচন এবং তাঁহাদের উত্তরাপথে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ। বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর এই গৌরবময় যুগে এই রকম কত যে মন্দির, কত যে বিহার, আরও কত নানা কীর্ত্তি যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঠিক পরিচয় পাইবার এখন উপায় নাই। তবুও রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এবং রাজানুগ্রহ এই তিনের শুভ সম্মিলনে জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহাদিগকে মন্দির ও বিহারাদি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ রকম উৎসাহিত করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বাংলার ও বাঙ্গালীর এই উন্মেষ ও বিকাশের যুগে রাজাধিরাজ হইতে সম্পন্ন গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গবাসের পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে নানারূপ সাহায্য করিতেন এ পরিচয় আমরা সমসাময়িক লিপিমালা হইতেই জানিতে পারি। মন্দিরাদি দেবস্থান স্থাপনা বিষয়েও পালরাজগণ বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী সেনরাজগণ উদাসীন ছিলেন না। নূতন মন্দির ও বিহারাদির প্রতিষ্ঠা, পুরাতনের জীর্ণ সংস্কার, নূতন নূতন নগর স্থাপন করিয়া প্রাক্‌মুসলমান যুগে বাংলা দেশে তাঁহারা একটী অভিনব শিল্প ও সভ্যতার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এ কথা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসানুরাগী সকলের নিকটই সুপরিচিত।

কিন্তু কোথায় গেল পুরাতন বাংলার এই সব সুসমৃদ্ধ নগর আর কোথায় গেল সেই সব নগরের শোভাসৌন্দর্য্যময় অপরূপ শিল্পসুষমামণ্ডিত উত্তুঙ্গ মন্দির, আর শত শত জ্ঞানার্থীভিক্ষুসমাবাসিত সুবিস্তীর্ণ বিহারালয়? পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটীবর্ষ, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, বিক্রমপুর, বিলাসপুর, রামাবতী, বিজয়পুর প্রভৃতি নগরীর শোভা, সৌন্দর্য্য ও পুরাতন সমৃদ্ধির যে চিত্র টুকরা টুকরা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে আজ আমাদের কল্পনার নেত্রে ফুটিয়া উঠে তাহা যেমনই উজ্জ্বল, তেমনই গৌরবময়। অপরূপ কারুকার্য্যখচিত কুলভূধরের মত সুউচ্চ মন্দিরের বর্ণনা এই বাংলা দেশেরই লেখমালায় পাওয়া যায়। ১ কোন কোন মন্দিরকে পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ ("ভূভূষণঃ") বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।২ কোন কোন মন্দির অভ্রভেদী উচ্চতায় সূর্য্যের গতিরোধ করিবার স্পর্দ্ধা করিত ৩ এ বর্ণনার অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও দেউলের উচ্চতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও সমৃদ্ধির এই উজ্জ্বল চিত্রের কতটুকু আজ অবশিষ্ট আছে?

১। Watters, Yuan Chwang, vol. II, pp. 184-85, 187; 190, 191.

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা—বাণগড়-লিপি ৭ম শ্লোক।

২। Dinajpur Pillar Inscription, J.P. A.S.B., vol. vii, 1911, pp. 615-619.

৩। N. G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, vol-iii—Deopara. Inscription of Vijayasena, verses 27-28.

সারা বাংলাদেশ ঘুরিয়া এখন জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রায়শঃ ভগ্ন শিলামূর্ত্তি ছাড়া প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন আর কিইবা পাওয়া যায়? মহাকালের লীলায় সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান চোয়াং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রায় পাঁচশত বৎসরের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী "আস্তং ভুবো ভবনম্" বলিয়া বর্ণিত ১ "বরেন্দ্রীমণ্ডল-চূড়ামণি" এই নগরীর পূর্ব্বসমৃদ্ধির কতটুকু পরিচয় মহাস্থান এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপের ভিতরে অবশিষ্ট আছে? পূর্ব্বভারতের সুবিখ্যাত বন্দর প্রাচীন তাম্রলিপ্তির গৌরব তমলুকের কয়েকটী স্তূপে পর্য্যবসিত। পাল সাম্রাজ্যের "জনকভূ" বরেন্দ্রীর উদ্ধারকর্ত্তা দ্বিতীয় রামসদৃশ মহারাজাধিরাজ রামপালদেব গঙ্গা-করতোয়া-সঙ্গমে যে সুরম্য রাজনগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে নগরীর অবস্থান পর্য্যন্ত এখন অজ্ঞাত। কৌশাম্বী, মথুরা, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের অশেষ সমৃদ্ধ নগরীর সমানপর্য্যায়ভুক্ত ছিল বাংলাদেশের দেবীকোট বা কোটীবর্ষ নগরী। যে নগরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনায় একাদশ শতাব্দীতে রাজকবি সন্ধ্যাকরনন্দী প্রশংসামুখর হইয়াছিলেন ২ তাহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কতটুকুই বা দেবীকোট-বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষে খুঁজিয়া পাওয়া যায়? অনেক প্রাচীন নগরীর অবস্থান পর্য্যন্ত এখনও সঠিক রূপে নিরূপিত হয় নাই। ইউয়ান চোয়াং বর্ণিত দেউল বিহারাদির কথা দূরে থাকুক, বাংলার এমনই দুর্ভাগ্য যে পরবর্ত্তী যুগেরও মন্দির বিহারাদির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যে মন্দির শিল্পসুষমায় "ভূভূষণ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে দিনাজপুর রাজোদ্যানে রক্ষিত কারুকার্য্যখচিত একটীমাত্র প্রস্তরস্তম্ভ ব্যতীত তাহার অস্তিত্বের আর কোন নিদর্শনই আজ নাই। সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেনের যে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির সুউচ্চ শিখরসমূহের দ্বারা সূর্য্যের গতিরোধ করিবার স্পর্দ্ধা করিত সেই অভ্রভেদী উচ্চতা আজ প্রায় পার্শ্ববর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রের সহিত মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

কিন্তু কেন এমন হইল? কয়েকটী শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ এমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল কেন? ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অনেক প্রাচীনতর কীর্ত্তিও একেবারে লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক এখনও উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান আছে। বাংলা দেশের সহিত সে সমস্ত দেশের এমন কি প্রভেদ যাহাতে সেখানে পুরাতন অনেক কিছুরই টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছে? কিম্বা বাংলাদেশের প্রাচীন গৌরব, পুরাতন সমৃদ্ধি ও কীর্ত্তির যে সমস্ত প্রমাণাদি আমরা পাই তাহার অধিকাংশই কবি কল্পনা?

বাংলাদেশ পলিমাটীর দেশ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, এবং তাহাদের নানা উপনদী ও শাখানদী বাংলাদেশকে শতধা বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে যাইয়া মিশিতেছে। উত্তর পশ্চিমে ও পূর্ব্বসীমান্তে পর্ব্বত বা পাহাড়ের অস্তিত্ব দেখা গেলেও, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, পূর্ব্বে গারো ও খসিয়া পাহাড় ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে প্রায় সমতলভূমিই বলা চলে। উত্তরবঙ্গে বরিন্দ অঞ্চলে, পূর্ব্ববঙ্গে মধুপুরের গড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ে কিছু কিছু উচ্চভূমি দেখা যায়। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সমস্তটাই পলিমাটীতে গঠিত।

বাংলাদেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে দেশের ভূতত্ত্বের এই তথ্যটী আমাদের জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পর্ব্বত-হীন নদীবহুল এই সমতলভূমিতে পাথরের বিশেষ অভাব, দুর্লভ বলিলেই চলে। তাই অতীতকালে, বাংলা ও বাঙ্গালীর সুখসমৃদ্ধির দিনে, এদেশে যে সব বর্দ্ধিষ্ণু নগর, মন্দির, বিহারাদি ধর্ম্মস্থান এবং অন্যান্য কীর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে পাথরের পরিবর্ত্তে ইটেরই বহুল প্রচলন ছিল। মন্দির বা অন্যান্য ইমারত গঠনে পাথরের ব্যবহার ছিল খুবই কম। সাধারণতঃ স্তম্ভ এবং চৌকাঠ পাথরের তৈয়ারী হইত। তাহা ছাড়া, মন্দির বা অন্যান্য ইমারতের ভিত্তি, দেওয়াল, চূড়া প্রভৃতি সমস্তই তৈয়ারি হইত ইটে। এই কাদামাটীর দেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় ইটে তৈয়ারী

১। করতোয়ামাহাত্ম্যম্ (P. C. Sen, Mahasthan and its environs.)

২। রামচরিতম্ (M. A. S. B, vol iii chap. iii) ৯ম শ্লোক।

ইমারত কতদিন টেকে? প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ইটের ইমারতে আগাছার উৎপত্তি হইতে বেশীদিন লাগে না। আজ যে ইমারত গঠনের জন্য অকুণ্ঠ ব্যয়ে সুদক্ষ শিল্পী কর্ম্মী ও যথোপযোগী উপাদানের সমাবেশ করা হয়, শত শত শিল্পী মিলিয়া দিনের পর দিন যে ইমারত নানা কারুকার্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলে, প্রতিষ্ঠায় আয়োজন উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়, কালচক্রের আবর্ত্তনে হয়তো সে ইমারত যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করিবারও লোকবল বা অর্থবলের অভাব হয়। আগাছা জন্মিয়া বড় বড় বৃক্ষে পরিণত হয়। তাহার শিকড় ক্রমশঃ ইমারতের পঞ্জর ভেদ করিয়া ভিত্তি আক্রমণ করে। তারপর একদিন হয়তো প্রবল বারিপাতে বা ঝটিকায় সমস্ত ইমারত ভাঙ্গিয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের নদীগুলির গতিও বড় বিচিত্র। নরম পলিমাটীতে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইতে বেশী সময় লাগে না। আজ এখানে, কাল সেখানে এইরকমে সরিতে সরিতে নদীগুলি যেন সমস্ত দেশ ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প। বাংলাদেশের প্রাচীন নগর, মন্দির, বিহারাদি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ এইরূপেই নষ্ট হইয়াছে। পুরাতনের নিদর্শন যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা এখন জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত।

কিন্তু শুধু নৈসর্গিক কারণেই যে পুরাতন বাংলার সুরম্য নগর, মন্দির, বিহারাদি পুরাকীর্ত্তি সমূহ এরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এমন নয়। বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে দেশের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই দেশে বিধর্ম্মী বিজেতার আক্রমণের প্রবল প্রবাহে পুরাতন বাংলার গৌরবময় যুগের অবসান। শুধু তাই নয়। বিজেতাগণের এই আক্রমণ শুধু অঙ্কুর বিনষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া রাজা প্রজা মিলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে, প্রভূত অর্থ ব্যয়ে, অপরূপ উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তিতে, বাংলার যাহা কিছু কীর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল, আক্রমণের প্রবল স্রোতে সে সমস্তই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রথম যুগে, নূতন নূতন দেশ জয়ের উন্মাদনার সহিত ধর্ম্মোন্মাদনা মিলিয়া যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিজিত পরধর্ম্মী পৌত্তলিক জাতির কত যে কীর্ত্তিচিহ্ন ধ্বংস হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? তাহার পর, মুসলমান রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আরম্ভ হইল নূতন নূতন উপনিবেশ ও নগর প্রতিষ্ঠার পালা। এই সমস্ত উপনিবেশ ও নগরের প্রায়শঃই পত্তন হইয়াছিল প্রাচীনতর হিন্দু নগরে বা তাহার আশে পাশে—সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহের আশায় এবং অজুহাতে। প্রাচীনতর কীর্ত্তিগুলি ধ্বংস করিয়া, সেই উপকরণ দিয়াই মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগের ইমারতগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া, দিবকোট প্রভৃতি যে কোন প্রাচীন মুসলমান নগরীর ধ্বংসাবশেষেই প্রাচীনতর প্রাক্‌মুসলমান যুগের উপকরণ ও উপাদানের ব্যবহার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে আক্রমণের যুগে দেশ জয়ের ও ধর্ম্মের উন্মাদনায় এবং পরবর্ত্তী কালে অধিকারের যুগে নিজেদের উপনিবেশ ও নগরাদি প্রতিষ্ঠার আয়োজনে, বিজিত পৌত্তলিক সভ্যতার অনেক কীর্ত্তিচিহ্নই যে বিজেতাগণের কল্যাণে নষ্ট হইয়া গেল তাহা অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়। একদিকে নৈসর্গিক কারণে ইটের তৈয়ারী ইমারতাদির স্বল্পস্থায়িত্ব, অন্যদিকে বিজেতাগণের হস্তক্ষেপ, এই দুইয়েব সংঘাতে বাংলার পুরাতন কীর্ত্তিগুলি ক্রমশঃ লতাগুল্মপরিবৃত-ইষ্টকস্তূপের অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল। দেশের পুরাতন ইতিহাসও সঙ্গে সঙ্গে গেল মাটী চাপা পড়িয়া।

দেশের প্রাচীন ইতিহাস, পুরাতন সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও কীর্ত্তির একমাত্র নিদর্শন আজ তাই এই সব ইতস্ততঃ ছড়ান ইটের স্তূপ ও নগরাদির ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্নাবশেষ। দেশের প্রাচীন ইতিহাস এই সমস্ত স্থানে মাটী চাপা পড়িয়া আছে। তাই ঐতিহাসিকের নিকট এই সব ভগ্ন, আপাতনগণ্য নিদর্শন এক একটী অমূল্য সম্পদ। আজকাল দেশের ইতিহাস লিখিবার প্রেরণায় দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস এখন আর সরস আখ্যায়িকামাত্র নয়। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা এখন উপযুক্ত উপাদান এবং প্রমাণপ্রয়োগের ভিত্তিতে। সেই প্রমাণ প্রয়োগের উদ্ধারে প্রথম প্রয়োজন তথ্যানুসন্ধান। তথ্যানুসন্ধান দুই প্রকারের হইতে পারে—পুঁথিগত ও ক্ষেত্রগত। বাংলাদেশের, শুধু

বাংলাদেশেরই বা বলি কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় পুঁথিগত প্রমাণের বিশেষ অভাব। সে কারণে ক্ষেত্রগত প্রমাণ প্রয়োগের উদ্ধারে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। বাংলাদেশ ঘুরিয়া দেখিলে ক্ষেত্রের অভাব আছে বলিয়া মনে হইবে না, যদিও কোন স্থানেই উপরের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। যে সমস্ত নিদর্শন কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া ভগ্নাবস্থায় লতাগুল্মাদির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, বাংলার ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে ঐ সমস্ত নিদর্শনেরই আশ্রয় লইতে হইবে। বাংলার বিলুপ্ত কাহিনী ইহাদেরই মর্ম্মস্থলে লুক্কায়িত আছে; উপযুক্ত খননে এবং অনুসন্ধানে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রাচীন ভূভাগে ইতস্ততঃ যথাতথা খননে এবং কৃষি কার্য্যে লাঙ্গলের ফালে ইতিহাসের এমন সব অমূল্য উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত খননে দেশের পুরাতন ইতিহাস এবং প্রাচীন সভ্যতার অনেক পরিচয়ই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এইরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। এই সমস্ত উপাদান সংগ্রহের আকাঙ্খাতেই জনসাধারণের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি এবং পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত সহানুভূতি এবং উদ্যোগী কর্ম্মীর অভাবে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির অকালমৃত্যু ঘটিলেও, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এবং ঢাকা মিউজিয়মের সংগ্রহশালায় যে সমস্ত উপাদান একমাত্র কুড়াইয়াই সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে যথাযথ খননের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক চক্রবিভাগে বিহার প্রদেশের সহিত যুক্ত থাকায় সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে নাই। পরে বাংলা এবং আসাম এক বিভাগান্তর্গত হইলে বাংলা দেশে রীতিমত খননাদি আরম্ভ হইতে না হইতেই আর্থিক কারণে কাজ একরকম বন্ধ রাখিতে হয়। এখন আবার কয়েক বৎসর হইতে সামান্য-ভাবে কাজ আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে অতি সামান্য। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ স্যর জন মার্শাল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার, বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথম খননকার্য্য আরম্ভ করা হয়। নানা কারণে তাঁহাদের কাজ বন্ধ হইয়া গেলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে সেই অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। এই একটী খননকার্য্যেই বাংলার পুরাতন ইতিহাস ও সভ্যতার এত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সমগ্র দেশে সুবিস্তৃত খনন কার্য্যের প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে।

দেশের প্রত্যেকটী প্রাচীনস্থান, ভগ্ন দেউল, বিহারাদির যথাযথ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। শুধু সরকারী কর্ত্তৃত্বে এবং সাহায্যে এরূপ বিস্তৃত অনুসন্ধান অসম্ভব মনে হওয়ায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এরূপ অনুসন্ধান পরিচালিত হইবে আশায়, খনন-কার্য্যের আইন সংশোধিত হইয়াছে। এই সংশোধিত আইন অনুসারে যে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এইরূপ অনুসন্ধান এবং খননকার্য্য পরিচালনা করা যাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ভাইস্‌চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়[১] বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এইরূপ অনুসন্ধান ও খননকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অনুরূপ অনুসন্ধানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান হইবেন।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

১। সম্প্রতি কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়াতে তিনি ভাইস্‌চ্যান্সেলর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমারত কতদিন টেঁকে? প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ইটের ইমারতে আগাছার উৎপত্তি হইতে বেশীদিন লাগে না। আজ যে ইমারত গঠনের জন্য অকুণ্ঠ ব্যয়ে সুদক্ষ শিল্পী কর্ম্মী ও যথোপযোগী উপাদানের সমাবেশ করা হয়, শত শত শিল্পী মিলিয়া দিনের পর দিন যে ইমারত নানা কারুকার্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলে, প্রতিষ্ঠার আয়োজন উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়, কালচক্রের আবর্ত্তনে হয়তো সে ইমারত যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করিবারও লোকবল বা অর্থবলের অভাব হয়। আগাছা জন্মিয়া বড় বড় বৃক্ষে পরিণত হয়। তাহার শিকড় ক্রমশঃ ইমারতের পঞ্জর ভেদ করিয়া ভিত্তি আক্রমণ করে। তারপর একদিন হয়তো প্রবল বারিপাতে বা ঝটিকায় সমস্ত ইমারত ভাঙ্গিয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের নদীগুলির গতিও বড় বিচিত্র। নরম পলিমাটীতে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইতে বেশী সময় লাগে না। আজ এখানে, কাল সেখানে এইরকমে সরিতে সরিতে নদীগুলি যেন সমস্ত দেশ ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প। বাংলাদেশের প্রাচীন নগর, মন্দির, বিহারাদি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ এইরূপেই নষ্ট হইয়াছে। পুরাতনের নিদর্শন যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা এখন জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত।

কিন্তু শুধু নৈসর্গিক কারণেই যে পুরাতন বাংলার সুরম্য নগর, মন্দির, বিহারাদি পুরাকীর্ত্তি সমূহ এরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এমন নয়। বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে দেশের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই দেশে বিধর্ম্মী বিজেতার আক্রমণের প্রবল প্রবাহে পুরাতন বাংলার গৌরবময় যুগের অবসান। শুধু তাই নয়। বিজেতাগণের এই আক্রমণ শুধু অঙ্কুর বিনষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া রাজা প্রজা মিলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে, প্রভূত অর্থ ব্যয়ে, অপরূপ উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তিতে, বাংলার যাহা কিছু কীর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল, আক্রমণের প্রবল স্রোতে সে সমস্তই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রথম যুগে, নূতন নূতন দেশ জয়ের উন্মাদনার সহিত ধর্ম্মোন্মাদনা মিলিয়া যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিজিত পরধর্ম্মী পৌত্তলিক জাতির কত যে কীর্ত্তিচিহ্ন ধ্বংস হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? তাহার পর, মুসলমান রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আরম্ভ হইল নূতন নূতন উপনিবেশ ও নগর প্রতিষ্ঠার পালা। এই সমস্ত উপনিবেশ ও নগরের প্রায়শঃই পত্তন হইয়াছিল প্রাচীনতর হিন্দু নগরে বা তাহার আশে পাশে—সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহের আশায় এবং অজুহাতে। প্রাচীনতর কীর্ত্তিগুলি ধ্বংস করিয়া, সেই উপকরণ দিয়াই মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগের ইমারতগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া, দিবকোট প্রভৃতি যে কোন প্রাচীন মুসলমান নগরীর ধ্বংসাবশেষেই প্রাচীনতর প্রাক্‌মুসলমান যুগের উপকরণ ও উপাদানের ব্যবহার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে আক্রমণের যুগে দেশ জয়ের ও ধর্ম্মের উন্মাদনায় এবং পরবর্ত্তী কালে অধিকারের যুগে নিজেদের উপনিবেশ ও নগরাদি প্রতিষ্ঠার আয়োজনে, বিজিত পৌত্তলিক সভ্যতার অনেক কীর্ত্তিচিহ্নই যে বিজেতাগণের কল্যাণে নষ্ট হইয়া গেল তাহা অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়। একদিকে নৈসর্গিক কারণে ইটের তৈয়ারী ইমারতাদির স্বল্পস্থায়িত্ব, অন্যদিকে বিজেতাগণের হস্তক্ষেপ, এই দুইয়ের সংঘাতে বাংলার পুরাতন কীর্ত্তিগুলি ক্রমশঃ লতাগুল্মপরিবৃত-ইষ্টকস্তূপের অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল। দেশের পুরাতন ইতিহাসও সঙ্গে সঙ্গে গেল মাটী চাপা পড়িয়া।

দেশের প্রাচীন ইতিহাস, পুরাতন সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও কীর্ত্তির একমাত্র নিদর্শন আজ তাই এই সব ইতস্ততঃ ছড়ান ইটের স্তূপ ও নগরাদির ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্নাবশেষ। দেশের প্রাচীন ইতিহাস এই সমস্ত স্থানে মাটী চাপা পড়িয়া আছে। তাই ঐতিহাসিকের নিকট এই সব ভগ্ন, আপাতনগণ্য নিদর্শন এক একটী অমূল্য সম্পদ। আজকাল দেশের ইতিহাস লিখিবার প্রেরণায় দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস এখন আর সরস আখ্যায়িকামাত্র নয়। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা এখন উপযুক্ত উপাদান এবং প্রমাণপ্রয়োগের ভিত্তিতে। সেই প্রমাণ প্রয়োগের উদ্ধারে প্রথম প্রয়োজন তথ্যানুসন্ধান। তথ্যানুসন্ধান দুই প্রকারের হইতে পারে—পুঁথিগত ও ক্ষেত্রগত। বাংলাদেশের, শুধু

বাংলাদেশেরই বা বলি কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় পুঁথিগত প্রমাণের বিশেষ অভাব। সে কারণে ক্ষেত্রগত প্রমাণ প্রয়োগের উদ্ধারে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। বাংলাদেশ ঘুরিয়া দেখিলে ক্ষেত্রের অভাব আছে বলিয়া মনে হইবে না, যদিও কোন স্থানেই উপরের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। যে সমস্ত নিদর্শন কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া ভগ্নাবস্থায় লতাগুল্মাদির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, বাংলার ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে ঐ সমস্ত নিদর্শনেরই আশ্রয় লইতে হইবে। বাংলার বিলুপ্ত কাহিনী ইহাদেরই মর্ম্মস্থলে লুক্কায়িত আছে; উপযুক্ত খননে এবং অনুসন্ধানে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রাচীন ভূভাগে ইতস্ততঃ যথাতথা খননে এবং কৃষি কার্য্যে লাঙ্গলের ফালে ইতিহাসের এমন সব অমূল্য উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত খননে দেশের পুরাতন ইতিহাস এবং প্রাচীন সভ্যতার অনেক পরিচয়ই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এইরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। এই সমস্ত উপাদান সংগ্রহের আকাঙ্খাতেই জনসাধারণের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি এবং পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত সহানুভূতি এবং উদ্যোগী কর্ম্মীর অভাবে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির অকালমৃত্যু ঘটিলেও, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এবং ঢাকা মিউজিয়মের সংগ্রহশালায় সব সমস্ত উপাদান একমাত্র কুড়াইয়াই সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে যথাযথ খননের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক চক্রবিভাগে বিহার প্রদেশের সহিত যুক্ত থাকায় সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে নাই। পরে বাংলা এবং আসাম এক বিভাগের অন্তর্গত হইলে বাংলা দেশে রীতিমত খননাদি আরম্ভ হইতে না হইতেই আর্থিক কারণে কাজ একরকম বন্ধ রাখিতে হয়। এখন আবার কয়েক বৎসর হইতে সামান্য-ভাবে কাজ আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে অতি সামান্য। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ স্যর জন মার্শাল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার, বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথম খননকার্য্য আরম্ভ করা হয়। নানা কারণে তাঁহাদের কাজ বন্ধ হইয়া গেলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে সেই অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। এই একটী খননকার্য্যেই বাংলার পুরাতন ইতিহাস ও সভ্যতার এত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সমগ্র দেশে সুবিস্তৃত খনন কার্য্যের প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে।

দেশের প্রত্যেকটী প্রাচীনস্থান, ভগ্ন দেউল, বিহারাদির যথাযথ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। শুধু সরকারী কর্ত্তৃত্বে এবং সাহায্যে এরূপ বিস্তৃত অনুসন্ধান অসম্ভব মনে হওয়ায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এরূপ অনুসন্ধান পরিচালিত হইবে আশায়, খনন-কার্য্যের আইন সংশোধিত হইয়াছে। এই সংশোধিত আইন অনুসারে যে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এইরূপ অনুসন্ধান এবং খননকার্য্য পরিচালনা করা যাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ভাইস্‌চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়[১] বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এইরূপ অনুসন্ধান ও খননকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অনুরূপ অনুসন্ধানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান হইবেন।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

১। সম্প্রতি কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়াতে তিনি ভাইস্‌-চ্যান্সেলর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

সুজনেরো ডোবে নাও

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিশীথ নাথ সকাল বেলা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্যাডের উপর কাগজ রাখিয়া এক মনে লিখিয়া যাইতেছেন। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তবু এক একবার কপালে হাত বুলাইতেছেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বর্ণ শ্যাম, একহারা গড়ন, শান্ত মুখশ্রী।

লীনা ঘরে ঢুকিল। বছর তেইশ বয়স কিন্তু দেখিতে অতটা দেখায় না। মুখখানি কাঁচা। চাঁপা ফুলের মত রং, ভাস্করের গড়া মুখের মত মুখ। চোখ দুটি ঢল ঢল। সাজ পোষাক অত্যন্ত শাদা সিধা, মেয়েরা দেখিলে বলিত পরিদের মত। লীনা দাঁড়াইয়া রহিল, নিশীথনাথের হুঁশ নাই, লিখিয়াই চলিয়াছেন। শেষ করিয়া যে-ই মাথা উঠাইয়াছেন, অমনি লীনা বুকের উপর হাতখানি রাখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

লীনা। লেডি কম্প্যানিয়নের জন্য আপনি যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আমি সেই কাজের প্রার্থী হয়ে এসেছি।

নিশীথ। (অপ্রস্তুত ভাবে চাহিয়া) হ্যাঁ, তা, আমার সেক্রেটারী বিজ্ঞাপন দিয়েছে বটে। কিন্তু—এ—তা—

লীনা। আপনি ভাবচেন আমি সে কাজ পার্ব্ব না। কিন্তু আপনি এটা ভুল কর্‌চেন, কাজ না পার্‌লে আমি আসতুম না।

নিশীথ। (মনে যে চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল তাহা বলিতে না পারিয়া বিব্রতভাবে) কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন নি সব কথা। আমার বোন রুগ্ন, তার সঙ্গে থাকার জন্ম লোক দরকার। এই বোনটি ছাড়া আমার বাড়ীতে আর কেউ নেই। এ রকম একা এখানে আপনি কিছুতেই থাকতে পার্ব্বেন না। রুগীর মনোরঞ্জন করা বড় টিডিয়াস্ কাজ।

লীনা। রুগীর সেবা আমার অভ্যাস আছে। আমার দিদিমা বাতের রুগী, আমিই তাঁর সেবা করি। আমারও সংসারে আর কেউ নেই, এই বিছানায়-পড়া দিদিমা ছাড়া। একা থাকাটা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে না। আমার মনে হয় আমিই একাজ সবার চাইতে ভাল কর্ত্তে পার্ব্ব।

নিশীথ। (স্বগত) ছেলে মানুষ, একেবারে ছেলে মানুষ! কিছুতেই বুঝচে না আসল কথা। ওর মত সুন্দরী তন্বী তরুণীকে গায়ত্রীর কম্প্যানিয়ন করে রাখলে লোকে বলবে গায়ত্রীর কথাটা ফাঁকি, আসলে "ওকে আমারই লাইফ কম্প্যানিয়নের জোগাড় করেছি। কেউ হাসবে, কেউ টিটকারি দেবে,—এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে শেষে। কিন্তু একে ত আর একথা বল্‌তে পারিনে। আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়লুম যা হোক্।

লীনা। দেখুন এতে অত ভাববার কিছুই নেই। আপনি না হয় অন্ ট্রায়েল আমাকে এক মাস রেখে দেখুন। আপনার কাছে যদি আমি কাজ না পাই, তাহলে বিপদে পড়ব। লেখা পড়ায় আমি মোটে সুবিধে কর্ত্তে পারিনে। আই-এটা দু দুবার ফেল্ করে বসলাম। ম্যাট্রিকও টিচাররা ফেভার না কর্‌লে পাশ আর আমার হ'তে হোত না। কাজেই বুঝতে পারছেন স্কুলের কাজ আমার দ্বারা চলবে না। প্রাইমারি ক্লাসে কাজ পেতে পারি, কিন্তু সে গাধা পিটানো আমার কর্ম্ম নয়। আমি নিজেই গাধা কি না।

নিশীথনাথ একটুখানি হাসিলেন।

লীনা। আপনি যদি আমায় না রাখেন, তা হলে আমি কি যে কর্ব্ব জানি না। আমার ও আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, আমাকেই দিদিমাকে খাওয়াতে হবে। এতদিন দিদিমা আমাকে খাইয়েছে, এখন দিদিমা বাতের ব্যারামে বিছানায় পড়ে। কাজ আমার পেতেই হবে, এবং এই হপ্তার মধ্যেই পেতে হবে। হয়ত, আপনারা কি লোক রাখবেন—আপনারা কি লোক রাখবেন—এই বলে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরে হেঁকে বেড়াতে হবে। ক্ষুধার জ্বালায় লোকে অনেক কিছুই বিসর্জ্জন দিয়েছে, আমারও হয়ত এবার ডিগ্‌নিটি বিসর্জ্জন দিতে হবে।

লীনা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নিশীথনাথ। (ব্যস্তভাবে) কাজের জন্য যদি আপনাকে এতটা বিব্রত হতে হয়, তাহলে না হয় থাকুন। কিন্তু এ মোটেই আপনার উপযুক্ত কাজ নয়।

লীনা। আমি ত বল্লুমই আপনাকে, আমাকে শুধু না হয় একটি মাসের জন্য রাখুন। এর ভেতরে আমি অন্য কাজ দেখে নেবার একটা সুযোগও ত পেতে পার্ব্ব। বিজ্ঞাপনে কিন্তু মাইনের বিষয় কিছুই লেখে নি। কত দেবেন বলুন ত?

নিশীথনাথ। (স্বগত) সেক্রেটারিকে বলেছিলুম টাকা চল্লিশ দের। যাক ওটা না ছাপিয়ে ভালই করেছে। মেয়েটি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, চল্লিশ টাকায় ওর পোষাবে না। (প্রকাশ্যে) সত্তর টাকা পাবেন।

লীনা। (খুসী হইয়া) আমাকে যে আপনি সত্তর টাকা দিলেন, এ খুব আশ্চর্য্য! আপনি বড় লোক, আপনার বোনের মর্য্যাদার জন্য হয়ত দিলেন—কিন্তু আমি এতে কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেলুম। কারণ দেখুন, দিদিমার যদি অসুখ না হোত তা হ'লে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় আমার হয়ে যেত, কিন্তু ব্যামোতে খরচা বেড়ে যায় ঢের। তা হ'লে আমি কবে থেকে আসব?

নিশীথনাথ। কাল থেকে আসতে পারেন।

লীনা। (উঠিয়া প্রণাম করিয়া) আচ্ছা, তবে আসি।

লীনা চলিয়া গেল। নিশীথনাথ উন্মনাভাবে বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে বাহিরে মটরের হর্ণ শোনা গেল এবং একটু পরে নীরা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরার বয়স সাতাশ আটাশ, শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে গড়ন, মাঝারি গোছের লম্বা; সুন্দরী না হলেও চেহারার একটা কমনীয়তা আছে। পরণে ক্রীম কলারের ঢাকাই সাড়ী, পদ্মমালিকার চওড়া পাড়, গায়ে ডালিমফুলি সিল্কের ব্লাউস, পায়ে জরির স্যাণ্ডাল, নিশীথনাথের ও পুরাতন বন্ধু।

নীরা। (পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে উঁকি দিয়া) রাস, এখনো লিখচেন বসে? বেলা হয়েছে কতটা জানেন?

নিশীথনাথ। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া আসিয়া) অসময়ে তুমি কোত্থেকে এলে? এ বেলায় তোমার আসা ত মোটেই আশা করি নি?

নীরা। আজ স্কুল ছুটি, কাজ নেই কিছু, কাকার সঙ্গে মার্কেটে গিয়েছিলুম, ফিরতি পথে এখানে নেমে পড়লুম। কতদিন আমাদের ওখানে যান নি, হিসেব আছে? দেখতে এলুম নিজেই। গায়ত্রী কেমন আছে?

নিশীথনাথ। মাঝে একবার জ্বর হয়ে গেছে, ভাল বড় চলছে না তার পর থেকে। তুমি এসেছো,—ভালই হোল, আজকার দিনটা এখানে কাটিয়ে যাও। খাওয়া দাওয়ার পরে রাত্তিরে আমি তোমাকে রেখে আসব এখন।

উভয়ে গিয়া ড্রয়িং রুমে বসিল।

নিশীথনাথ। বড় ব্যস্ত আছি কিছুদিন ধরে, তোমাদের ওখানেই যে যাই নি শুধু তা নয়, এই কর্ট্‌নাইট্‌ কোথাও যাইনি।

নীরা। (হাতের উপর চিবুক রাখিয়া নিশীথনাথের দিকে চাহিয়া) নিশীথবাবু, মানুষের মন লোকান্তরের মত ছোট বড় নানা জ্যোতিষ্কের আধার। খাঁটি বলুন ত, যে জ্যোতিষ্কটি আপনার হৃদয়াকাশে সব চেয়ে বড় হয়ে এখন দেখা দিয়েছে, তা কাঞ্চন কি না?

নিশীথনাথ। (হাসিয়া) বড় ভাইট্যাল কোশ্চেন করেছ নীরা! ভিখিরী থেকে রাজা পর্য্যন্ত কাঞ্চন-তৃষ্ণা কারুরই কম নয়। কাজেই ও জিনিসটা ঠিকমত য়্যানালাইজ করা একটু মুস্কিল।

নীরা। (ঈষদ্ধাস্যে) আপনার আরো সবার চাইতে বেশী মুস্কিল। কারণ আপনার চিত্ত-নদীর কোনো শাখা উপশাখা নেই, চ্যানেলেই তা বইছে। ঢের টাকা ত জমিয়েছেন, এখন শরীরকে একটু আরাম দেবেন।

নিশীথনাথ। তুমি বোঝ না নীরা, শরীরের আরামকে যখন আমরা ভুলে থাকি, তখনই আমরা প্রকৃত আরামে থাকি। তারপর টাকার চাইতে আরেক জিনিস আমাদের বড়। সে হচ্ছে আমাদের পোজিশন্। পোজিশন্ তার তত বড় যা'র টাকা যত বেশী। কাজেই, টাকা এনাফ্ হ'লেও পোজিশন্ এনাফ্ গ্র্যাটিফাইং হয় না। আমার চাইতে যারা বড় তারা হচ্ছে আমার অক্ষয় প্ররোচনা। দুজনকে যদি টপ্‌কাইও দশজন থেকে যায় বাকি। সুতরাং থামা অসম্ভব।

নীরা। ডিমরালাইজিং ষ্টেট্‌মেন্ট, আপনি আবার বিয়ে করুন—বস্তু জগৎ ছেড়ে আপনার মন চিন্ময় জগতে প্রবেশ করুক।

নিশীথনাথ। তোমার ঐ প্রপোজিশান আরও বেশী ডিমর‍্যালাইজিং। বিয়ে মানুষের ক'বার হয়! দু'বার যে বিয়ে করে আমার মতে সে স্কাউণ্ড্রেল্। আর, বিয়ের জন্য এত পাগল হওয়াই বা কেন, প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমাদের driving force of life, ও ছাড়া life হয় vapid। বিয়ে করলেই তার প্রয়োজন ঘোচে না। তোমরা যে মনে কর তোমাদের জন্যেই আমরা সব করি—সেটা তোমাদের vanity। আমাদের নিজের স্যাটিস্ফ্যাক্‌সনের জন্যেই আমরা দুনিয়ার সঙ্গে লড়ি। এটা হোল পুরুষের instinct। সভ্যতার ফলে ওর চেহারা বদলেছে কিন্তু আসল জিনিসটা বদ্‌লায়নি।

নীরা। (সহাস্যে) আশ্চর্য্য করে দিলেন কিন্তু। গত দশ বছরের মধ্যেও আপনার ধারণাগুলি একটুও বদ্‌লায়নি। অথচ আপনি এসে পড়েছেন জীবনের সেই বাঁকটিতে, যেখানে এসে মানুষের প্রথম জীবনের ধারণাগুলো অসম্ভব রকম বদলে যায়। এতে প্রমাণ হচ্ছে এই যে জীবনের পথে আপনার চলা বন্ধ হয়ে গেছে? এ অবস্থা সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা! আপনি যতই বলুন, এভাবে আপনি যদি গতি হারান, তবে পরিণামে fossilত্ব-প্রাপ্ত হবেন।

নিশীথনাথ। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) Fossil হয়ে যাব—কী যে বল!

নীরা। যাকে আপনারা গতি মনে করছেন, তা যে আসলে গতি নয় তা কি ভেবে দেখেছেন কখনো?

নিশীথনাথ। (কপালে হাত বুলাইয়া) না, ভাবিনি। (হঠাৎ লীনার কথা স্মরণ করিয়া) দেখ নীরা, আজ আমি যা এক এম্‌ব্যারাসিং অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলুম কি আর বল্‌ব! তুমি যদি আর আধ ঘণ্টা আগে আস্‌তে তা হলে হয়ত একটা সুরাহা হোত, কিন্তু আমাকে যা করতে হয়েছে, তা একেবারেই অদ্ভুত!

নীরা। ফোন্ করলেন না কেন আমাকে!

নিশীথনাথ। এমন ঘাবড়ে গেলুম, যে ফোন্ করা টরা কিছুই মনে হোল না। গায়ত্রীর কম্প্যানিয়নের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে আজ একটি মেয়ে এসেছিল। ছেলেমানুষ বেচারা, অতি অল্প বয়স, দারিদ্র্যের কষ্টে ওকে দেখাচ্ছিল দুপুর রোদে চলে পড়া গোলাপের মত। এ কিন্তু কাব্যের অতিশয়োক্তি নয়,—যে মেয়ে আমার বাড়ী চাকরী কর্ত্তে আস্‌ছে তার সঙ্গে কাব্যের কোনো সম্বন্ধই থাকতে পারে না—একথা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ। সত্যি যদি তুমি তাকে দেখতে তবে গোলাপের সঙ্গে ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তাকে উপমা দিতে পারতে না। আন্‌আর্থলি বিউটি! অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে ও এই চাকরী কর্ত্তে এল কেন!

নীরা। আপনি কি বল্লেন তাকে?

নিশীথনাথ। বল্লুম ও এ কাজ ওকে মানাবে না। কিন্তু সে তাতে কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল। বলে একমাস ট্রায়েল দিয়ে দেখুন, যদি সন্তোষজনক কাজ না হয় তখন বিদায় দেবেন। দেখলুম, অত্যন্ত নিঃসহায় নিরুপায় অবস্থা। কি আর করি, লজ্জায় পড়ে এন্‌গেজ্ করলুম। একটা মাস বইত নয়।

নীরা। তা বেশ করেছেন। আপনার মত লোক যদি একজন অসহায় মেয়েকে রাস্তা দেখিয়ে না দেন, তা হলে দুনিয়ার আর কিছুরই ওপর কারো ভরসা থাকে না। চলুন এখন গায়ত্রীর কাছে যাই।

নিশীথনাথ। (সানন্দে) ভালই কোরেছি তবে ওকে এন্‌গেজ্‌ করে?

নীরা। (মুচকি হাসিয়া) নিশ্চয়ই!

২

নীরাদের বাড়ী। দক্ষিণে প্রশস্ত বারান্দা ক্রোরোডেন্‌ড্রন লতায় ঢাকা। একদিকে গোটা দুই বেতের সোফা ও একটি টিপয়। আরেক দিকে মাটিতে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া নীরা ওর ভাইএর ছোট ছেলেটির জন্য দু-রঙ্গা উল দিয়া কোট বুনিতেছে। নিশীথনাথ আসিল।

নীরা। (হাসিয়া) বসুন। কার মুখ দেখে উঠেছি, তা আমার ভেবে বার কর্‌ত্তে হবে।

নিশীথনাথ। গাড়ী থেকে নাম্‌বার সময় আমার মনে ঠিক এই ভয়টাই জাগছিল।

নীরা। (মুখের দিকে চাহিয়া) কিসের ভয়?

নিশীথনাথ। তোমার অনুযোগের অথবা বক্রোক্তির।

নীরা। লোকের কাছে একথা বল্‌বেন না যেন; তা হলে আমার virago নাম রটবে।

নিশীথনাথ। তোমার মত মধুর স্বভাব মেয়ে ভাইর‍্যাগো?

নীরা। (লজ্জিতভাবে) আপনি ফ্ল্যাটারি জানেন তা কিন্তু জান্‌তাম না। ভাল, আপনার বাড়ীর নূতন মেম্বরটির খবর কি?

নিশীথনাথ। (হর্ষ-বিকসিত মুখে) অনেকে বলে সুন্দরীরা অহঙ্কারী হয়, স্বার্থপর হয়,—কিন্তু এ মেয়েটির অযাচিত সেবার আমি মুগ্ধ হয়েছি। ওর সঙ্গে ত কোনো কাজ কর্ম্মের কথা নয়—গায়ত্রীর ও সঙ্গিনী কিন্তু ও যেচে অনেক কিছু করে দেয়। আমার খাওয়া দাওয়ার যথেষ্ট তদারক করে। গায়ত্রী ত খুব খুসী। ওর ভারী মনোকষ্ট ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়ার যত্ন ও কিছু করতে পারে না। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া যার দেখা দিয়েছে বাবুর্চি খানসামা তার বাতিল করা দরকার কি না। তখন আসে খাঁটি বাঙ্গলার ছেলে হয়ে শাক পাতা সুক্ত দিয়ে ভোজন পর্ব্ব সমাধার পালা। লীনা আমার জন্য এত যে র'াধে এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড বল দেখি!

নীরা। বাস্তবিকই এ খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার?

নিশীথনাথ। লীনার মত মেয়ে ওরকম র'াধতে পারে এ চোখে না দেখ্‌লে আমি বিশ্বাস কর্‌তুম না।

নীরা। (হাসিয়া) শুনি আপনার আজকার মেনু?

নিশীথনাথ। শাক পাতা ত কাউকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার মত জিনিস নয়—বিশেষতঃ—আমার মত তোমার চল্লিশের কাছে বয়ঃসীমা পৌছোয় নি—নইলে রাত্তিরে আমার ওখানেই খেতে আজ। দিনে লীনা আমার জন্যে করেছে পল্‌তার ঝোল, শীমে বেগুন, বেতের ডগার বড়া, কুমড়ো ডগার ঝোল এই সব। বাবুর্চ্চির হাতের উৎকৃষ্ট রান্না এ বাড়ীতে আর সইবে না।

নীরা। লীনা তাহ'লে আপনাকে পারফেক্ট ভেজিটেরিয়ান করে ছেড়েচে।

নিশীথনাথ। (আনন্দে হাস্য) কিছুদিন থেকে ঘুমটা ভাল হচ্ছিল না, ভেবেছিলাম ওভার ওয়ার্কের জন্য, বোধ হয়—কিন্তু তা নয়, ইরাসিনের পেঁয়াজ রসুনের ঠ্যালায় মাথা গরম হয়ে ঘুম হোত না। আজ কাল কিন্তু বেশ ঘুমুচ্ছি। কিন্তু এই নেহাৎ সাদা সিধে কথাটা আমার মাথায় ঢোকে নি এতদিন।

নীরা। (সহাস্যে) আপনার ট্রেনেগুাস লাক্ দেখা যাচ্ছে!

নিশীথনাথ। আমরা পুরুষরা কিন্তু বড় স্বার্থপর। আমাদের আরামের জন্য আমরা মেয়েদের ঢের কষ্ট দিয়ে থাকি?

নীরা। কষ্টই যদি হ'বে তবে তা কর্‌বে কেন!

নিশীথনাথ। (সানন্দে) আমার জন্য এত যে করে লীনা—তাতে ও কষ্ট বোধ করে না?

নীরা। নিশ্চয়ই না।

নিশীথনাথ। (কপালে হাত বুলাইয়া) আশ্চর্য্য কিন্তু!

নীরা। নারীচিত্ত আপনার কাছে এখনো অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর মত রয়েচে নিশীথবাবু।

নিশীথনাথ। মানুষ মাত্রেই একই সুখ দুঃখ আশা আকিঞ্চন দিয়ে গঠিত—পুরুষ ও নারীর মধ্যে তার কিছু বিভেদ আছে কি?

নীরা। ও জানটা সম্প্রতি মুলতুবীই থাক্, আপনার এখনো তা বুঝবার সময় হয় নি।

নিশীথনাথ। (হাস্য) সময় হয় নি, না সময় অতীত হয়ে গেছে? কিন্তু শোন,—

নীরা। (সাবধানে কাঁটার ঘর গুণিতে গুণিতে) কি, বলুন।

নিশীথনাথ। এই ই'য়ে, অর্থাৎ—মানেটা হচ্ছে এই—যে লীনার অবস্থাটা বড় শোচনীয় কাপড় চোপড় কিছুই নেই। আমি ভাবছি, আমি যদি কিছু কিনে দি, তবে কি সেটা খারাপ দেখাবে? মাইনে পেতে ওর এখনো ত দেরী আছে ঢের। অথচ ভাখো গায়ত্রীর কম্প্যানিয়ন যদি চাঁদনীর সস্তা শাড়ী পরে ছেঁড়া ময়লা স্যাণ্ডাল প'রে ঘুরে বেড়ায়, তা হ'লে সেটা ত আমারই লজ্জা।

নীরা। নিশ্চয়ই তা আপনার লজ্জা। তা দিন্ না কাপড় কিনে তাতে আর দোষ কি! আপনাদের জন্য যে এত কর্চ্ছে, তাকে দেবেন না ত কাকে দেবেন?

নিশীথনাথ। অর্থাৎ কি না—এই ইয়ে—মানে—আমার এ রকম গায় পড়ে কিনে দেওয়াটা কিছু খারাপ দেখাবে না ত?

নীরা। আপনার যদি সঙ্কোচ থাকে মনে, তবে গায়ত্রীকে দিয়ে দেওয়াবেন।

নিশীথনাথ। (আশ্বস্ত হইয়া) ঠিক বলেছো, আমি না দিয়ে গায়ত্রী দিলেই ভাল হবে। তুমি কবে যাবে বল দেখি?

নীরা। (ঈষদ্ধাস্যে) আমার যাওয়ার কি বিশেষ দরকার আছে?

নিশীথনাথ। একথার কোনো মানে নেই। তোমাকে কোনো কাজের জন্য যেতে বলছি নে।

নীরা। বেতের বড়া আর লাউডগার ঝোল খাওয়ার নেমন্তন্ন কি?

নিশীথনাথ। ঠাট্টা রাখো। যেয়ো একদিন। মেয়েটি বড় ভাল, যেন innocense incarnated! সারল্যের প্রতিমা। একেবারে আর্টলেস্, খুব সাদা সিধে ভাবে থাকে। আজ আসি তবে। তোমার মার সঙ্গে কিন্তু আজ দেখা হোল না।

নীরা। মা বাড়ীতে নেই। জ্যেঠিমার ওখানে গেছেন।

নিশীথনাথ। আচ্ছা উঠি তবে। যেয়ো কিন্তু।

নিশীথনাথ চলিয়া গেল। একটু পরে নীরার বন্ধু চন্দনা আসিল। গোলগাল মাঝারি গড়ন, শ্যামবর্ণ, চোখ দুটি কৌতুকোজ্জ্বল। হাসিহাসি মুখ। সম্মুখের ঘরে নীরার ছোট দুটি ভাইপো ও ভাইঝি লুকাচুরি খেলা করিতেছিল। খোকা রাইটিং টেবিলের নীচে লুকাইয়া, ওর বড় মেয়েটি মাঝখানে চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া। চন্দনা তাহার মাথায় টোকা মারিল।

চন্দনা। এই দিতি, পিসী কই?

খুকী। (চোখ খুলিয়া অপ্রস্তুতভাবে) শুয়ে আছে ঘরে।

চন্দনা। এই বিকেল বেলা শুযে কি রে!

খুকী। বাঃ, আমি দেখলুম যে শুয়ে! আমাদের নীচে পাঠিয়ে দিলে পিসীমা-ই ত।

চন্দনা সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিয়া গেল; সন্তর্পণে নীরার শিয়রে দাঁড়াইয়া মাথার উপর হাত রাখিল। নীরা চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল।

চন্দনা। (পাশে বসিয়া) কি হয়েছে রে?

নীরা। (ঈষদ্ধাস্যে) তুই আজ আসবি আমি কিন্তু মোটেই ভাবি নি।

চন্দনা। মনের সাধে তাই অশ্রুবারি ঢালা হচ্ছিল!

নীরা। মোটেই না।

চন্দনা। (চিবুকের নীচে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া) হাতে দৈ পাতে দৈ চোরা বলে কৈ কৈ! চোখের পাতা তোর এখনও ভিজে। ব্যাপার কি? নিশীথবাবু এসেছিলেন, না রে? আমি যেন তাঁকে যেতে দেখলুম।

নীরা। এসেছিলেন।

চন্দনা। কি বল্লেন?

নীরা। কি আর, লীনার স্তবগান হোল শতমুখে!

চন্দনা। সত্যি? পুরুষ মানুষ কি যে বোকা! শুনি, কি বল্লেন?

নীরা। Innocense incarnated, সারল্যের প্রতিমা।

চন্দনা। যাঃ, বাড়িয়ে বল্‌ছিস্।

নীরা। এক বিন্দুও না, ছাকা সত্যি কথা। অসাধারণ অলৌকিক এই মেয়ে লীনা! আনা হয়েছিল তাকে রুগ্ন মেয়ের কম্প্যানিয়ন করে, কিন্তু আসলে হয়েছে বাড়ীর গিন্নী। লোককে খাওয়ায় দাওয়ায়, যত্ন করে, পরিচর্য্যা করে—

চন্দনা। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) এতখানি?

নীরা। এতখানি।

চন্দনা। লক্ষণ ভাল নয়।

নীরা। সেত সুরু থেকেই। মন্দই বা কি। ভদ্রলোক কতদিন আর এভাবে থাকবে। ভাঁটা লেগেছে স্রোতে— এর পর জল আর মিলবে না।

চন্দনা। জল আর মিলবে না, না, জলে থই পাওয়া যাবে না। তুই পোড়ারমুখী কি কর্‌বি তখন?

নীরা। তীরে বসে তরঙ্গর লীলা দেখব।

চন্দনা। পার্‌বি না তা—কিছুতেই পার্‌বি না, প্রাণ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—তখন বলবি, "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান!"

নীরা। একজনকে আনন্দসাগরে ভাসমান দেখেও কিছু আনন্দ কি লাভ কর্‌ব না?

চন্দনা। (মাথা দোলাইয়া) মোটেই না।

নীরা। দেখা যাবে। বাস্তবিকই খুসীতে ওঁর প্রাণ ভরপুর এখন। কোন দিকে চলেছেন তার খেয়ালও নেই। জ্ঞান হবে এক চরম মুহূর্ত্তে।

চন্দনা। তোরই ত দোষ। আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা, ধূলায় ঢাকা-স্বভাব যদি তোর না হোত।

নীরা। আমার রুচি অতি সেকেলে। না পাই সেও ভালো, তবু হ্যাংলামি কর্‌ব না। আমি ত সুন্দরী নই, আমায় দেখে কারুর মনে পদ্ম গোলাপের কথা মনে পড়ে না, মুগ্ধ হৃদয় আত্ম-বিস্মৃত হয় না—

চন্দনা। (ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া) এতই বলেছে ভদ্রলোক?

নীরা। বলেছে কি আর সজ্ঞানে?

চন্দনা। ঐটি হচ্ছে আরো দুর্লক্ষণ। এই লীনা মেয়েটিকে আমার না দেখলে চল্‌ছে না।

নীরা। যাবি সত্যি?

চন্দনা। সত্যি।

নীরা। ইদানীং ত তুই ওদের বাড়ী যাস না। আর— কি বলবি গিয়ে?

চন্দনা। চন্দনা তাতে ঠেক্‌বে না—তুই দেখে নিস। তুই যাবি?

নীরা। উঁহু।

চন্দনা। ভয়?

নীরা। না, wisdom.

চন্দনা। শেষ রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বি ত?

নীরা। কি করে বল্‌ব? আসুক ত আগে শেষ।

চন্দনা। নাঃ, দেরী করা চল্ল না। আমি এখনি চল্লুম।

নীরা। আমায় betray কর্‌বি না ত?

চন্দনা। বাজে বকিস্ নে। চল্ আমায় খেতে দিবি। কি আছে বল্ ত? ক্রিস্‌মাস্ কেক চকোলেট সব খেয়ে ফেলেছিস, না আমার জন্যে রেখেছিস কিছু?

নীরাকে টানিয়া লইয়া চন্দনা নীচে নামিয়া গেল।

৩

নিশীথনাথের বাড়ী। ভিতরের বারান্দায় নিশীথনাথ দাঁড়াইয়া আছেন। বড় একটা মাষ্টিফ পায়ের কাছে বসিয়া। নাম ওর হীরো। নিশীথনাথের ও পেট্। হীরোর পায়ে কাঁচ ফুটিয়া যাওয়াতে হীরো বেদনায় ঘোঙরাইতেছে। নিশীথনাথ বয়কে বারংবার ডাকিতেছেন ও হীরোর মাথায় হাত বুলাইতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বেগের ছায়া। উপরের বারান্দা হইতে লীনা তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল।

লীনা। (ব্যস্ত ভাবে) কি হয়েছে?

নিশীথনাথ। কাঁচ ফুটেছে ওর পায়ে।

লীনা। (উদ্বিগ্ন ভাবে) কোত্থেকে ফুটল কাঁচ, কোন্‌খানে ফুটল? (বসিয়া পা তুলিয়া কোলে লইল।)

নিশীথনাথ। কাঁচ আমি তুলে নিয়েছি, বয়কে ডাক্‌ছিলুম আইওডিনের জন্য।

লীনা। আমি নিয়ে আসছি।

নিশীথনাথ। ঐ বয় আসছে।

(বয় সম্মুখে আসিল)

নিশীথনাথ। গরম জল, আইয়োডিন, তুলা আউর বাণ্ডিজকে কাপ্‌ড়া লে আনা।

বয় চলিয়া গেল।

নিশীথনাথ। ভিটারনারি সার্জ্জনকে ডাকব নাকি?

লীনা। কেন আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন? হীরোর সেবা আমি কর্ব্ব। কাটা যদি শুখিয়ে ওঠে তবে সার্জ্জন লাগবে না।

বয় সব জিনিস লইয়া আসিল, লীনা গরম জলে হীরোর পা ধোয়াইয়া আইয়োডিন দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। বয় শিকল ধরিয়া তাহাকে বারান্দার অন্যদিকে লইয়া চলিল।

লীনা সিড়ীতে উঠিয়া যাইতে এক পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লীনা। দেখুন, আপনাকে একটা কথা আমার বলবার ছিল।

নিশীথনাথ। কি কথা বলুন।

লীনা। আমার ত এক মাস প্রায় পূর্ণ হবে এল, পরশু আমার বাড়ী ফিরে যাওয়ার দিন। আপনাদের দয়া এ জীবনে আমি ভুলব না। কী অবস্থায় আমি ছিলাম আর কী করে আপনারা আমাকে রেখেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলাম, যে এ স্বপ্ন একদিন ভাঙবে—(গলা ধরিয়া গেল)।

নিশীথনাথ। (কাছে আসিয়া সিঁড়ীর রেলিং এর মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া) কেন আপনি মনে কচ্ছেন আপনার বাড়ী ফিরে যেতে হবে? এও ত আপনার বাড়ী হ'তে পারে!

লীনা। (হর্ষগদ্গদভাবে) কি বলছেন আপনি! আমি নিতান্ত অনাথা, অসহায়া, আপনাদের কাছে দাঁড়াবার আমি যোগ্য নই—

চন্দনা ড্রয়িংরুমের হালের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সিঁড়ীর কাছে লীনা ও নিশীথনাথকে দেখিল।

চন্দনা। (স্বগত) নীরা কি আর অমনি অমনি শয্যাশায়ী হয়েচে! ভদ্রলোক দেখি আত্মহারা একেবারে! এই বেলা ডাক দি, নইলে লজ্জা পেয়ে মরবে। (প্রকাশ্যে) এই যে আপনি এখানে!

নিশীথনাথ। (ফিরিয়া চাহিয়া) ও, আপনি, হ্যাঁ, তা—কখন এলেন?

চন্দনা। (হাসিয়া) বেশীক্ষণ নয়। গায়ত্রীকে দেখতে এলুম। ভাল আছে ত?

নিশীথনাথ। আগের চেয়ে অনেকটা ভাল। হার্ট-ডিজিজের রোগীর মনের প্রফুল্লতা থাকা দরকার। বাড়ীতে ত আর দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই, একা একা থেকে ক্রমশঃই কেমন মরোস্ হয়ে যাচ্ছিল। (লীনার দিকে চাহিয়া) এঁকে কম্প্যানিয়ন রাখার পর থেকে বেশ হাসি খুসী হয়েছে। গায়ত্রীকে বহুদিন আমি এরকম প্রফুল্ল দেখিনি।

চন্দনা। (উপরে উঠিতে উঠিতে) নীরার কাছে ওঁর কথা অনেক শুনলুম। বেশ মেয়েটি পেয়েছেন যাহোক। আজ রাত্তিরে থেকে আপনার ভেজিটেবল্ ডিনার কিছু খেয়ে যাবার লোভ হচ্ছে।

নিশীথনাথ (আনন্দের সহিত) বেশ ত থেকে যান্ না, গায়ত্রীও খুব খুসী হবে।

গায়ত্রীর শয়ন কক্ষ। গায়ত্রী একখানা ইজিচেয়ারে র‍্যাপ গায় জড়াইয়া শুইয়া আছে। গোর্কির একখানা বই সামনে টিপয়ের উপরে বইটা পাতা মেলিয়া উপুড় করিয়া রাখায়, আরো পড়ার সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। শ্বেত পাথরের ছোট একটা টেবিলের উপর রূপার ফুলদানীতে বড় ক্রিসেন্থিমামের একটা তোড়া।

গায়ত্রী দেখিতে খানিকটা নিশীথনাথের মত। রোগে ভুগিয়া রোগকাতর চেহারা।

চন্দনা। (ঘরে ঢুকিয়া হাস্যমুখে) আজ তোমাকে দেখতে এলাম অনেক দিনের পরে।

গায়ত্রী। (সুইচ টিপিয়া বাতি জ্বালিয়া) ওমা, তুমি যে!

চন্দনা। ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছিলুম অতীতের সঙ্গে, যেমন করে মিশে যায় বসন্তের ফুলগন্ধ, মলয়ের মৃদু হিল্লোল—

গায়ত্রী। (হাসিতে হাসিতে) বোস, বোস; পোইট্রি

দিয়ে আর ফাঁকি দিতে হবে না। মিশে যাচ্ছিলে—কেন যাচ্ছিলে তা শুনি! ইচ্ছে কল্লেই ত আসতে পারো!

চন্দনা। ঐটিই তোমাদের ভুল গায়ত্রী। ইচ্ছে কল্লেই করতে পারা যায়—এ রকম ফ্যালাসি পোষণ কোরো না।

গায়ত্রী। কেন, কি বাধাটা শুনি!

চন্দনা। (কপট বিষাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) স্বামী—পুত্র—সংসার!

গায়ত্রী। (মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া) বাবা, চন্দনাদি, কি ঢঙ্গি মেয়ে তুমি! শুনেচি ত বরকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারো না।

চন্দনা। (হাসিয়া) লোকে তিলকে তাল করে বলে। ভাল, তোমার কম্প্যানিয়ন রূপসীটিকে তোমরা কোথায় কুড়িয়ে পেলে বল দেখি।

গায়ত্রী। ও, তুমি লীনার কথা বলছো? বিজ্ঞাপন দেখে ও নিজেই এসে দাদাকে ধরেছিল।

চন্দনা। কোথায় ওর বাড়ী?

গায়ত্রী। যোড়াসাঁকো।

চন্দনা। কার মেয়ে রে?

গায়ত্রী। ওর বাপের নাম বলেছিল ত্রিপুরা সান্ন্যাল। কেউ নেই ওর, এক দিদিমা আছে, সেও বাতব্যাধিতে অচল।

চন্দনা। কি পাশ কোরেছে?

গায়ত্রী। আই-এ ফেল্।

চন্দনা। বেথুনের? এই বছরের ফেল্?

গায়ত্রী। হ্যাঁ এই বছরেই ফেল্ কোরেছে। ঘরে অন্ন নাই, তাই এসেছে চাকরী করতে। বেশ মেয়েটি!

চন্দনা। ভাগ্যিস্ তোদের ঘরে কেউ নেই, নইলে এ অগ্নিশিখা আমরা ত কেউ সাহস করে ঘরে নিতে পারতুম না।

গায়ত্রী। (হাসিয়া) যা বোলেছো চন্দনাদি! অগ্নিশিখাই বটে!

চন্দনা। তোমাদের নাকি খুব রেঁধে বেড়ে খাওয়ায়?

গায়ত্রী। বেচারা ইষাসিনের ভাত উঠত যদি না ওকে আমার চিকেনব্রথ, কাষ্টার্ড পুডিং, পোচ্ ইত্যাদি করতে হোত। দেশী রান্না লীনা বেশ ভাল জানে। দাদা ত মাছ মাংস প্রায় ছেড়ে দিয়েচেন!

চন্দনা। কম্প্যানিয়ন হয়ে রান্না বান্না সব করে এ খুব আশ্চর্য্যি কিন্তু।

গায়ত্রী। নিশ্চয়ই! ও বলে, "আপনারা আমাকে এত সুখে রেখেচেন, আমি আপনাদের সামান্য একটু রান্নাও করে দেব না!"

চন্দনা। কলিকালে এতটা কৃতজ্ঞতা দেখা যায় না।

গায়ত্রী। বাস্তবিকই, ও আমাদের একেবারে অবাক্ করে দিয়েছে।

চন্দনা। আচ্ছা উঠি আজ। আস্‌ব আরেক দিন।

গায়ত্রী। এবার খোকাকে এনো কিন্তু। আমার খুব দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

চন্দনা। নিয়ে আসব।

চন্দনা চলিয়া গেল।

চন্দনাদের ফ্ল্যাট। চন্দনা এবং তাহার স্বামী আদিত্য শয়ন কক্ষে কথা বলিতেছে।

আদিত্য। এলুম ত সব খবরাখবর করে।

চন্দনা। কি জান্‌লে?

আদিত্য। রীতিমত গোয়েন্দাগিরি কর্ত্তে হয়েছে। গেলুম বেথুনে, তোমাদের পাড়ার রমলাকে ধরলুম। বলে, লীনা সান্ন্যাল—খুব সুন্দরী, এ বছর ফেল্ করেছে—হ্যাঁ চিনি তাকে। ও সেই ক্লাশের মেয়ে যাকে বাড়ীতে আমরা উঠ্‌তে দিনা, এবং ছুঁলে চানও করি বোধ হয়। বাপের নামটা বানানো, মা নেই, দিদিমা একজন পসারওয়ালা পতিতা, এখন দুরবস্থায় পড়েচে। ধনী স্বামী যোগাড় করাটা হচ্ছে ওর লক্ষ্য। ওর সঙ্গে যারা পড়েচে তারা সবাই প্রায় ওর এই অ্যাসপিরেশন্ জানে। ওর মাকে কারা খুন কোরেছিল, সেই ভয়ে জাত ব্যবসা অবলম্বন করে নি। শুধু শুনেই আমি ক্ষান্ত হইনি। যোড়াসাঁকো ওদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়ে ওর দিদিমাকে দেখে এসেচি।

চন্দনা। আমি ত চিরকালই বলেছি—যে তোমার এবিলিটি যথেষ্ট আছে, শুধু লোকে তা বুঝ্‌ল না।

আদিত্য। হাস্‌চ। কিন্তু যা হয়েছিল ওখানে তা যদি বলি এখুনি হাপুস নয়নে কাঁদতে বসবে।

চন্দনা। কি হয়েছিল শুনি।

আদিত্য। তা কি আমি বলি।

চন্দনা। বলবে না?

আদিত্য। উহুঁ।

চন্দনা। দেখাচ্ছি তবে। (গলা জড়াইয়া ধরিয়া নাক কামড়াইয়া ধরিল)।

আদিত্য। আরে আরে, রাক্ষুসী সর্ব্বনাশী, স্বামী-খাকী।

চন্দনা। (হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া) কোথায় শিখ্‌লে এ গাল, যোড়াস াঁকোতে?

আদিত্য। তুমি স্বামী ভক্ষণ করতে পার, আর আমি বল্‌তে পারি না?

চন্দনা। (হাত ধরিয়া) নাও, রঙ্গ রাখো, লক্ষীটির মত বলে ফেল দেখি কি হয়েছিল?

আদিত্য। আরে সে যা কাণ্ড? লীনার দিদিমা ভাব্‌লে আমি লীনার গ্রাহক একজন, বলে একটু সময় দিন বাবু, নাৎনী আমার অপরূপ রূপসী। কলেজে পড়েছে—একটু এক বগ্‌গা মত—কোথায় গেছে চাকরী কর্ত্তে। বোঝালুম কত, ঘরে বসে থাক্‌, কত লক্ষপতি কোটিপতি তোর পায় লুটোবে। তা শুনলে না। দিন পনরো পরে আপনি আসবেন, তখন ঠিক ওকে সোজা করে আনব। (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া) এই নাও তাদের ঠিকানা, নাম, ফটো—সব?

চন্দনা। (নাড়িয়া চাড়িয়া সব দেখিয়া) তবেই ত? এখন কি করে ও বোকাটাকে বাঁচাই?

আদিত্য। একটা চিঠি লিখে দাও।

চন্দনা। কি বুদ্ধিমানের কথাটাই বল্লেন? এরকম একটা কথা মানুষ কথনো চিঠিতে জানায়? কি ভাব্‌বে ভদ্রলোক আমাকে? ফোন্ করে দাও—এখুনি চলে আসুক।

আদিত্য। (সংশয়ান্বিতভাবে) কর্ব্ব ফোন?

চন্দনা। নিশ্চয়ই।

আদিত্য ফোন্ করিল। খানিক পরেই নিশীথনাথ আসিল।

নিশীথনাথ। (কৌচে বসিয়া) এত জরুরি তলব কি জন্যে চন্দনা দেবী? আদিত্যবাবুকেও ত উপস্থিত দেখছি। আমি ভাবলুম নাইট এর‍্যাণ্টের কোনও কাজ পড়ল বুঝি বা।

চন্দনা। আপনাকে খুব একটা অপ্রীতিকর কথার জন্য কিন্তু ডাকিয়েছি। ভরসা দিন যে চটে যাবেন না, তাহ'লে বলি।

নিশীথনাথ। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) অপ্রীতিকর কথা! কিছুই বুঝতে পারলুম না।

চন্দনা। দেখুন ব্যাপার অত্যন্ত সীরিয়াস্, কর্ত্তব্য বোধে আপনাকে তা না জানিয়ে আমাদের উপায় নেই। আপনি যদি আপনার কোনো এষ্টিম্‌ড্ ফ্রেণ্ডকে চোখ বুজে গর্ত্তে পা বাড়াতে দেখেন—তাহ'লে কি আপনি ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেবেন না?

নিশীথনাথ। (চিন্তিতভাবে) বলে ফেলুন যা বলবার, বল্লেই সোজা হয়ে যাবে।

চন্দনা। গায়ত্রীর কম্প্যানিয়নকে আমি চিনি। ও আপনাদের ছদ্ম পরিচয় দিয়েচে। ভদ্রঘরের মেয়েও নয়?

আদিত্য। (ঠিকানার কাগজ ও নাম সম্বলিত ফটোখানি হাতে দিয়া) দৈবক্রমে আমাদের হাতে এগুলি এসে পড়েচে। আপনি এইখানে খোঁজ করে, না হয় নিজে গিয়ে দেখে আসবেন। ওর দিদিমার সঙ্গে দুমিনিট কথা হ'লেই আপনার কোনো রকম কোনো সন্দেহ থাকবে না। লীনা আপনার ওখানে নিযুক্ত হয়েছে একটা অভিসন্ধি নিয়ে।

নিশীথনাথ নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

চন্দনা। একটা দারুণ শক্ আমরা আপনাকে দিলুম। আমি কিন্তু এতেও নিবৃত্ত হ'তে পারছি নে। কাটা ঘায়ে কিছু নুনের ছিটা দেব। দেখুন এ পৃথিবীটা মাটির; সিলেশিয়াল হেভেনলি থিং এখানে গড়াগড়ি যায় না। এখানে

কুসুমের পেছনে থাকে কণ্টক, মেঘের পেছনে থাকে বজ্র, আলোর পেছনে থাকে অন্ধকার। অবিমিশ্র সুখ ও অবিমিশ্র ভালো এখানে নেই। একেবারে লাভবান হতে চাইলে একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। এই অনুপম রূপসীর চাইতে যদি—বাঙলার এক শ্যামলা মেয়েকে—যে গোলাপও নয় পদ্মও নয়—উষাও নয় তৃষাও নয়—নেহাৎ প্লেন অর্ডিনারি দেখতে—যে দশটি বছর ধরে—এমন কি আপনার প্রথম বিয়ের আগের থেকে—নিভৃতে গোপনে আপনাকে তাঁর ধ্যানের মধ্যে স্থাপনা করেছে—যে আপনার জন্যে তার জীবনের সব সুখ-সাধ বিসর্জ্জন দিয়ে চির কৌমার্য্য বরণ করেছে—তাঁর দিকে যদি একবার ফিরে চাইতেন তা হ'লে বরঞ্চ—

নিশীথনাথ। কি বলছেন আপনি, কার কথা বলছেন? আমার পরিচয়ের রেডিয়াসের ভেতর কোনো মেয়ের কথা আমি জানি নে যার সঙ্গে আপনার এ সব কথা মেলে।

চন্দনা। জানেন না? আচ্ছা ভাবুন বসে। আমি আপনার লাঞ্চ নিয়ে আসি।

(আদিত্য ও চন্দনা চলিয়া গেল)

নিশীথনাথ। ষ্ট্রেঞ্জ! একেবারেই ষ্ট্রেঞ্জ! এরা যা বলছে তা কি ঠিক? আমার অজ্ঞাতসারে আমি কি লীনার প্রতি অনুরক্ত হয়েছি? আশ্চর্য্য! এতখানি বয়সে ঐ ছেলে মানুষের ওপরে মন পড়ল? লীনা ভদ্র ঘরের মেয়ে নয়,—একথা ভাবতেও প্রাণে কী রকম বেদনা বোধ কর্চ্ছি! অভিসন্ধি করে ও আমার এখানে এসেছে! কি অভিসন্ধি? আমায় হাত করা? আশ্চর্য্য! স্বপ্নেও ভাবিনি এ রকম কথা! এক তিল সন্দেহও কখনও মনে আসে নি! চন্দনা যা বলছে, হয়ত তা-ই সত্যি। ওর রূপে মোহিত হয়েছিলুম! গর্ব্ব করে সেদিন নীরার কাছে বলেছিলুম—যে মেয়ে আমার বাড়ী চাকরী কর্ত্তে এসেছে,—তাকে আমি বাড়ীর গৃহিণীর পদে কখনই অভিষিক্ত করবো না। সে গর্ব্ব আমার চূর্ণ হোল। নীরা! চন্দনা যার কথা বলছিল সে নীরা নয় ত? আমার জানা শোনার মধ্যে আজীবন কৌমার্য্য কে আর অবলম্বন কোরেছে? যে সময়ে মনে করলুম জীবনকে বুঝতে আরম্ভ কোরেছি,—সেই সময়েই কি সবার বাড়া ভুল করলুম?

(খাবারের রেকাবি হাতে করিয়া চন্দনা প্রবেশ করিল)

চন্দনা। নিশীথবাবু, দেখুন, একেবারে দিশী ষ্টাইল। খাবারগুলি তৈরি করেছি নিজে। ভেজিটেবল ডিশ। মটরশুঁটির কচুরি, ফুলকপির সিঙ্গাড়া, পেস্তার বরফি, চাল কুমড়োর মোরব্বা, পেঁপের জ্যাম, আঙ্গুরের সরবৎ। ফেলতে পার্বেন না কিন্তু কিছুই। তবে যদি আপনার মন খারাপ থাকে—তাহলে অবশ্য—

নিশীথনাথ। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) না না, সে কি কথা, মন খারাপ আবার কিসের! কিন্তু আমি এত ত খাই না। সরবৎটা আর বরফিটা শুধু খাব। আরেকটা রেকাবি দিন।

নিশীথনাথ নীরবে আহার করিতে লাগিল, চন্দনা হাসিয়া একটার পর আরেকটা ঐ রেকাব হইতে এই রেকাবটিতে তুলিয়া দিতে লাগিল।

নিশীথনাথ। (আহারান্তে) চল্লুম তবে। ও মেয়েটিকে আজই বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আপনারা যত সিরীয়াস ধরছেন, ব্যাপার এমন কিছু সিরীয়াস নয়। মেয়েটিকে আমি পছন্দ করতুম। এই মাত্র। বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ নেই কি না, ওর যত্নটা তাই ভাল লেগেছিল।

চন্দনা। তবেই দেখুন শূন্য গৃহ ভাল নয়। এ ঘর বাস্তবিক যে আলো কর্ব্বে—রূপে নয়—স্বভাব মাধুর্য্যে, সেবায়, যত্নে, অনুরাগে—তাকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করুন। শান্তি পাবেন, সুখী হ'বেন।

নিশীথনাথ বাহিরে গিয়া নিজের কার ছাড়িয়া দিয়া ভাড়াটে গাড়ী নিলেন। গাড়োয়ানকে বলিলেন যোড়া-সাঁকো যাইবেন।

দরজায় ধাক্কা দিতে ঝী কপাট খুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। লীনার দিদিমা আসিল। যাট পঁয়ষট্টি বয়স; নাম গোলাপ; রাতে একটা পা খোঁড়াইয়া চলে। রং খুব ফরসা। বুড়া হইলেও বোঝা যায় এককালে সুন্দরী ছিল।

গোলাপ। (হাত যোড় করিয়া প্রণাম করিয়া) সেদিন কি আপনিই এসেছিলেন? না আপনার কোন লোক

এসেছিল? চোখে একটু কম দেখি কি না ঠিক চিনতে পারি না।

নিশীথনাথ। আমি এই প্রথম আসছি।

গোলাপ। (তীক্ষ্ণভাবে নিশীথনাথকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) আপনি কি করেন?

নিশীথনাথ। কি করি সেটা পরের কথা, সম্প্রতি এই বলতে পারি যে আমার পয়সা আছে।

গোলাপ। পয়সা না থাকলে, কি আর লীনার কাছে এসেছেন। আনকোরা নতুন মেয়ে—অপরূপ রূপসী—কলেজ থেকে বেরিয়েছে মাত্র। লীনা যে সে মেয়ে নয়।

(নিশীথনাথ অন্তরে বৃশ্চিক দংশনবৎ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

গোলাপ। (ব্যস্ত হইয়া) বসুন বসুন উঠছেন কেন। লীনার সঙ্গে দেখা করবার বন্দোবস্ত করি আগে।

নিশীথনাথ। আচ্ছা থাক, তা পরে হবে, এখন আসি।

নিশীথনাথ তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মাঝখানে নামিয়া গড়ের মাঠে কিছুক্ষণ হাঁটিলেন তাহার পর চলিলেন নীরাদের বাড়ী। রাত্রি তখন নয়টা, নীরাদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। ওর ভ্রাতৃবধূ মা ছেলেপিলে যে যার ঘরে গিয়াছে। নীরা শুধু বারান্দায় বসিয়া আছে। নিশীথনাথকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া চাহিল।

নীরা। একি, আপনি এত রাতে কোত্থেকে?

নিশীথনাথ। (কৌচে নীরার পাশে বসিয়া) বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

নীরা জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিল।

নিশীথনাথ। একটা পরামর্শ চাইব। দেবে?

নীরা। কি রকম স্ট্রেঞ্জ ভাবে কথা কইছেন। কি হয়েছে?

নিশীথনাথ। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিস সম্বন্ধে তোমার কি মত?

নীরা। (হাসিয়া) বস্তুভেদে মূল্যের তারতম্য ঘটে থাকে। কোহিনূরের দিল্লীশ্বরের মাথায় যে দাম ছিল, ইংলণ্ডেশ্বরের মাথায় তার চেয়ে কি দাম কমেছে? তারের যন্ত্র পুরাণো হলেই বাজে ভাল, নতুন যন্ত্রে সুর ওঠে না।

নিশীথনাথ। দুঃখের বিষয় মানুষ অত্যুজ্জ্বল রত্নও নয় তারের যন্ত্রও নয়। চল্লিশের কাছে যার বয়স এসেছে, স্বাস্থ্যে লেগেছে ভাটা, উৎরাইএর পথ যার সামনে—জীবনটা ভাঙ্গাচোরা বেমেরামত—কোনও শোভা যার নেই—বসন্ত যার ঝরা পাতার তলায় চাপা পড়েছে, শীতের কুজ্ঝটিকা যার সামনে—সে কি কখনও আপনাকে কাউকে অর্পণ কর্ত্তে পারে?

নীরা। (লীনার কথা মনে করিয়া কষ্টে আত্মসংযম করিয়া) আপনি মিছামিছি নিজেকে অত ছোট করে দেখছেন? আমি কিন্তু ভাবি আপনি যাকে আপনাকে অর্পণ কর্বেন, সে আপনার মূল্য সম্যক উপলব্ধি কখনও করবে কি না?

নিশীথনাথ (উৎফুল্ল হইয়া) সত্যি তাই ভাব?

নীরা। সত্যি তাই ভাবি।

নিশীথনাথ। তা হলে নীরা, ভাঙ্গাচোরা পুরাণো হতশ্রী জীবনের ওপর তোমার ঘৃণা যদি না থাকে তা হ'লে তুমি কি আমায় গ্রহণ কর্ত্তে পারো? আমি তোমার যোগ্য নই,—এ জেনেও কি পারো?

নীরা। (কষ্টে আঘাত সামলাইয়া লইয়া) নিশীথ বাবু, নিশ্চয়ই আপনি আজ প্রকৃতিস্থ নেই। আপনি যে কাকে কি বলছেন তাও আপনার খেয়াল নেই বোধ হয়। আমি নীরা—লীনা নই, আপনি কি ক'রে এ রকম ভুল করলেন!

নিশীথনাথ। ভাবছো আমি মাতাল হয়ে এসেছি? তুমি কি কখনও শুনেছো আমি ড্রিঙ্ক করি? আমি সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে—তোমারই পাণি প্রার্থনা করছি, লীনার নয়। লীনার সম্বন্ধে কনফেশন যদি চাও—তাও কর্ত্তে আমি প্রস্তুত।

নীরা। (ছলছল চক্ষে) কি হয়েছে আপনার, কি বলছেন আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি নে। আজ বরঞ্চ আপনি বাড়ী যান, মন সুস্থির হ'লে কাল আসবেন। হয়ত কোনও কারণে আপনি আন্‌হিঞ্জড্ হয়ে গেছেন।

নিশীথনাথ। আমি ঠিক আছি নীরা, বিশ্বাস কর, আমার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে নি। আমার ভুল আমি বুঝতে

পেয়েছি এতদিনে। লীনা আমার চোখ্‌ ফুটিয়ে দিয়েচে। ও ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, আমাকে প্রতারণা করে ও আমার গৃহের কর্ত্রী হ'তে চেয়েছিল। এখন বুঝ্‌লে? আমি তোমার কাছে তোমাকে চাইবার জন্যই এসেচি। মমতার অসীম ঔদার্য্যে আমার অপরাধ যদি তুমি ভুলে যেতে পারো—তা হ'লে আমার কাছে এসো। আজ এর বেশী তোমাকে বল্‌ব না। হঠাৎ কেন যেন নিজেকে ভয়ানক দুর্ব্বল অসহায় বোধ কর্চ্ছি, মনে হচ্ছে তোমার আশ্রয় ভিন্ন আমি উঠে দাঁড়াতে পারবো না।

বিভ্রান্তের মত মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া নিশীথনাথ হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন।

নিশীথনাথ। আচ্ছা, আজ আসি তবে।

নীরা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতের ভিতর হাত রাখিয়া) আমি শুধু আপনাকে এই বল্‌ছি যে ভুল করে কিছু করবেন না বা সাময়িক চিত্তাবেগ বশতঃ কিছু করবেন না।

নিশীথনাথ। (হাতখানি বুকের উপর তুলিয়া ধরিয়া) আমাকে তুমি বিশ্বাস কর নীরা?

নীরা। হ্যাঁ করি।

নিশীথনাথ। যা হয়েছে তা সত্ত্বেও?

নীরা। তা সত্ত্বেও।

নিশীথনাথ। তবে আমার ছলনায় বিড়ম্বিত কোরো না,—বল তুমি আমাকে গ্রহণ কর্ত্তে কুণ্ঠিত নও।

নীরা নীরবে নিশীথনাথের কাঁধের উপর মাথা রাখিল।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

নবীন উষার বার্ত্তা এল

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

আজকে আমার গহন বনের
ঘুচলোরে ঐ অন্ধকার,
পাগল ভ্রমর বেড়ায় নেচে
পুষ্প বিলায় গন্ধ তার।

পাখীরা সব মধুর রবে
বল্‌ছে ডেকে—"জাগো সবে",
নবীন উষার বার্ত্তা এল
আজকে দুয়ার বন্ধ কার?

ভাঙ্গলো বনের মৌনতা ঐ
লক্ষ পাতার মর্ম্মরে,
শিশির ঘাসে, লতায় ফুলে
কি যে মধুর নর্ম্মরে।

ভোরের হাওয়ার চঞ্চলতা
নেয় লুটে সব বিষণ্ণতা,
রবির আলো ঘুচায় আজি
মনের সকল অহঙ্কার।

গীতার ধর্ম

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

১৩৪৪ সনের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে আমি গীতা ও হিন্দুশাস্ত্র নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। অনিলবাবু তাহা সমালোচনা করিয়া গীতা ও শাস্ত্র নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ১৩৪৫ সনের আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতায় ১৬।২৪ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য এবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।" শাস্ত্র এই শব্দের অর্থ সুবিদিত। বেদ ও বেদমূলক ধর্মগ্রন্থের নাম শাস্ত্র। বেদের অপর নাম শ্রুতি। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র,—ইহারা বেদমূলক ধর্ম গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থের সাধারণ নাম স্মৃতি। এজন্য শাস্ত্র শব্দের অর্থ শ্রুতি বা স্মৃতি। ভগবান যখন শাস্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তখন এই সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এইরূপ মনে করাই যুক্তিযুক্ত। তিনি যদি ইহা কোনও অসাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে তাহা বলিয়া দিতেন।

গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়াছেন যে ধর্মশাস্ত্র (মনুসংহিতা প্রভৃতি) ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত) পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত বেদই এখানে শাস্ত্র শব্দের অর্থ। শঙ্কর এই শ্লোকে শাস্ত্রের অর্থ উল্লেখ করেন নাই, পরের শ্লোকের (১৭।১) ভাষ্যে বলিয়াছেন শাস্ত্র শব্দের অর্থ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন শাস্ত্র শব্দের অর্থ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি। বস্তুতঃ সকল প্রাচীন ব্যাখ্যাকারই এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে শাস্ত্র মানিতে হইবে, অনিলবাবু বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে শাস্ত্র মানিতে হইবে না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মুখে যাহা বলিয়াছেন, মনের মধ্যে তাহার বিপরীত উদ্দেশ্য ছিল।

অনিলবাবু যে বলিয়াছেন শাস্ত্র মানিতে হইবে না, তাহার কি কি কারণ দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

অনিলবাবু প্রথম যুক্তি দিয়াছেন, "শাস্ত্র অনেক, "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ", এক্ষেত্রে অর্জ্জুন কোন্ বেদ, কোন্ শাস্ত্র মানিবে? এক ব্যক্তিকে বলা হইল, "তুমি আইন মানিয়া চলিও", সে যদি বলে বিভিন্ন আইন আছে, এক এক আইনের অনেক ধারা, কোন্ আইন মানিয়া চলিব, তাহা হইলে তাহাকে যে উত্তর দিতে হইবে, অনিলবাবুর এই প্রশ্নেরও সেইরূপ উত্তর দিতে হইবে। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে যে সকল নিষেধ আছে সেগুলি লঙ্ঘন করিও না, যে সকল বিধি আছে যতদূর সম্ভব সেগুলি পালন করিও। বলা বাহুল্য বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। বিভিন্ন বেদবাক্যের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য করিতে হইবে তাহার প্রণালী পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনে দেখান হইয়াছে। উত্তর মীমাংসা দর্শনে বিভিন্ন উপনিষদের আপাতবিরোধী বাক্য সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব হইতেছে এই যে বেদ সত্য। বেদের বিভিন্ন অংশ পরস্পরবিরোধী হইলে বেদ সত্য হইতে পারে না। বেদজ্ঞ ঋষিগণ বেদের অর্থ "স্মরণ" করিয়াই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। এজন্য এই সকল গ্রন্থের নাম "স্মৃতি"। এই সকল গ্রন্থের সহিত বেদের কোনও বিরোধিতা নাই। আপাতবিরোধী বাক্যগুলি মীমাংসা-নির্দিষ্ট প্রণালীতে সামঞ্জস্য করা যায়। স্মৃতি গ্রন্থ সকল যে শ্রুতির অনুগামী এই সুবিদিত সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া কালিদাস উপমা দিয়াছেন।

শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ (রঘুবংশ) অর্থাৎ স্মৃতি যেমন শ্রুতির অনুগমন করে সেইরূপ সুদক্ষিণা সুরভি-নন্দিনীর অনুগমন করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য অনিলবাবু যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ" ইহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে বেদ ও স্মৃতির বিভিন্ন অংশ সকল পরস্পরবিরোধী। "বিভিন্ন" এবং "বিরোধী" এই দুইটি শব্দের অর্থ এক নহে।

শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ যদি পরস্পরবিরোধী হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিতেন না। যাহা পরস্পর-বিরোধী তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না।

অনিলবাবু নিজেই এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন "প্রথম প্রথম" শাস্ত্র মানিয়া চলা উচিত। সুতরাং বেদ এবং স্মৃতি বিভিন্ন হইলেও শাস্ত্র মানিয়া চলা সম্ভব, অনিলবাবু নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পুনশ্চ তিনি বলিয়াছেন যে বেদ ও স্মৃতি বিভিন্ন অতএব শাস্ত্র মানিয়া চলা অসম্ভব। তাঁহার এই দুই উক্তি পরস্পরবিরোধী হইয়াছে।

অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন প্রচলিত শাস্ত্রে যদি কেহ বিশ্বাস হারায়, তাহা হইলে সে কি করিবে? ইহার উত্তর এই যে—সে মনে করিবে যে তাহার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে এজন্য শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। শ্রদ্ধা না থাকিলেও সে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিবে না। অনিলবাবু বলিয়াছেন যে গীতা ১৭।২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে শ্রদ্ধা না থাকিলে কোনও কর্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। কিন্তু সেজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকিলে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে না। "চুরি করা অন্যায়" এই নিয়মে অনেক চোরের শ্রদ্ধা নাই। সেজন্য কি তাহাদের পাপ হইবে না?

অনিলবাবু লিখিয়াছেন,—তিন প্রকারে শাস্ত্রলঙ্ঘন করিবার কথা গীতাতে আছে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এখানে অনিলবাবু ১৮ অধ্যায়ের ৭, ৮ ও ৯ শ্লোক লক্ষ্য করিতেছেন। ৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে অজ্ঞান হেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম ত্যাগ হইতেছে তামসিক ত্যাগ। ৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে কর্ম করিতে কষ্ট হইবে এজন্য কর্মত্যাগ হইতেছে রাজসিক ত্যাগ। তাহার পর ৯ শ্লোকে যে সাত্ত্বিক ত্যাগের উল্লেখ আছে অনিলবাবু তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করেন নাই। ৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে কর্ম করা হইবে, কিন্তু কর্মে আশক্তি থাকিবে না এবং কর্মফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। অতএব সাত্ত্বিক ত্যাগে কর্ম করা হইবে, শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন হইবে না। এখন অনিলবাবু কি বলিতেছেন শুনুন। অনিলবাবু বলিতেছেন "সাত্ত্বিক ভাব লইয়াও শাস্ত্রত্যাগ করা যায়, স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া প্রচলিত শাস্ত্রের ত্রুটি বা অপূর্ণতা দর্শন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত যদি কেহ নূতন পথ, নূতন নীতি অনুসরণ করে, তাহা হয় সাত্ত্বিক।" গীতায় সাত্ত্বিক ত্যাগে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, অনিল বাবুর সাত্ত্বিক ত্যাগে সে কর্ম করা হয় না, অন্য নূতন কর্ম করা হয়। সুতরাং গীতায় যাহা আছে, অনিলবাবুর মতে তাহা নাই। অনিলবাবুর মতে যাহা আছে, গীতায় তাহা নাই। গীতায় সাত্ত্বিক ত্যাগে শাস্ত্র লঙ্ঘনের কথা নাই। ইহা অনিলবাবুর কল্পনা মাত্র।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে মহাপুরুষগণ শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন। তিনি প্রথম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, তাঁহার কতকগুলি আচরণ অনুকরণীয় নহে, তাঁহার সকল আদেশ পালনীয়।

গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করিতে শাস্ত্রকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার আদেশ।

অনিলবাবুরও আশা করি এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া রাসলীলা করা মানবের কর্তব্য, যদিও ইহা শাস্ত্র বিরোধী। অনিলবাবু বুদ্ধদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বেদবিরোধী মত প্রচার করিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার ফল কি ইহা দেখুন। অধিকার নির্ণয় না করিয়া দলে দলে লোকে সন্ন্যাসী হইবার ফলে জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল হইল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারত আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, অনধিকারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবন ব্যভিচারপূর্ণ হইল। অপর দিকে বুদ্ধদেব বলিলেন যজ্ঞে পশু বধ করা অন্যায়, কারণ তাহাতে পশুদের কষ্ট হয়, কিন্তু তিনি ইহা

বলিলেন না যে অন্য ব্যক্তি পশু বধ করিলেও সেই মাংস ভোজন করা অন্যায় (যদিও তাহা বলিয়াছেন); ফলে চীন, ব্রহ্ম, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে মানবের রসনা তৃপ্তির জন্য প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যা হয়, ভারতে যজ্ঞে পশুবলি হইলেও অনেক কম প্রাণী হত্যা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সুস্পষ্ট ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি হইল এবং সনাতন হিন্দুধর্ম জয়যুক্ত হইল। সুতরাং বুদ্ধদেবের ত্যাগমহত্ব পূর্ণ হইলেও তাঁহার প্রচারিত হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী মতগুলি কল্যাণজনক হয় নাই। অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "শঙ্করাচার্য্য বেদের সমগ্র শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। যাগযজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যায় মীমাংসকদের এই শিক্ষা তিনি বর্জন করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ মীমাংসকগণ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন শঙ্কর তাহা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বেদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য ইহা বলা যায় না যে শঙ্কর বেদের সমগ্র শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পর কর্ম বর্জনের কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাও বেদাদি শাস্ত্রেই আছে, তাহাও শাস্ত্র বিরোধী নহে। বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রের ভাষ্যে শঙ্কর ভগবানের বাণী বলিয়া এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে"—অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি আমার (ভগবানের) আজ্ঞা। সুতরাং শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শঙ্করের মত অতিশয় সুস্পষ্ট।

যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন জগতের ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয় ইহা বুঝাইবার জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন,

কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

অনিলবাবু যে মনে করিয়াছেন যে এই বাক্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্মী দেবীকে ঘৃণা করা, ইহাও অনিলবাবুর বুঝিবার ভুল।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যদেবকে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের জন্য পণ্ডিতগণের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।"

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতিরেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥"
"বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ

"জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২০ পরিচ্ছেদ

গয়া যাইবার পথে তাঁহার অসুখ হইয়াছিল, আরোগ্যের জন্য তিনি ব্রাহ্মণ পাদোদক পান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইবার পরও তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিতেন, শূদ্রের গৃহে ভোজন করিতেন না; ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা ১৭ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করা শ্রীচৈতন্যের মতের বিরুদ্ধ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একটি বাক্য আছে যে কলিতে সন্ন্যাস নাই। অনিলবাবু এজন্য মনে করিয়াছেন যে শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রবিরোধী কর্ম করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের মত পূর্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে কলিতেও সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত এইরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ অন্য শাস্ত্র বাক্য আছে "যাবৎ বর্ণ বিভাগঃ স্যাৎ ইত্যাদি" তাহার অর্থ এই যে যতদিন বর্ণ বিভাগ লোপ না হয় ততদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়। এই দুই শাস্ত্রবাক্য সামঞ্জস্য করিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সন্ন্যাস-নিষেধ-বাক্য বর্ণ বিভাগ লোপের পরে প্রযোজ্য এইরূপ স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ রাণী রাসমণির মন্দিরে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিরোধী কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাও যথার্থ নহে। ঐ মন্দিরে পৌরোহিত্য করা শাস্ত্রবিরোধী নহে এইরূপ বিশ্বাসেই তিনি রাজি হইয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্র বিশ্বাস এরূপ প্রবল ছিল যে ঐ মন্দিরের অন্ন ভোজন করা শাস্ত্রবিরোধী মনে করিয়া তিনি অন্ন ভোজন করেন নাই। অনিলবাবুও লিখিয়াছেন সাধনার প্রথম অবস্থায় শাস্ত্র মানিয়া চলা উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পৌরোহিত্য লইয়াছিলেন সাধনার প্রথম অবস্থায়। তখন শাস্ত্রবিরোধী কর্ম করা অনিলবাবুরও মতের বিরুদ্ধ। রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে

(সাধকভাব ২৫৭ পৃষ্ঠায়) স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন "শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সময় তাঁহার কালী দর্শন প্রভৃতি কোনও অলৌকিক অনুভূতি হইলে তিনি যতক্ষণ না শাস্ত্রবর্ণিত অনুভূতির সহিত মিলাইতে পারিতেন ততক্ষণ নিঃসন্দেহ হইতেন না যে তাঁহার অনুভূতি যথার্থ (ঐ পুস্তক ১৩৪ পৃঃ) ইহাও তাঁহার শাস্ত্র বিশ্বাসের পরিচায়ক। তিনি শূদ্র ভক্তের গৃহে ভাত খাইতেন না। শূদ্র প্রণব উচ্চারণ করিলে আপত্তি করিতেন। তাঁহার সাধারণ ভক্তগণ অখাদ্য খাইলে স্পর্শ করিবেন না বলিতেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রবিরোধী ছিলেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—বেদ প্রামাণ্য; বেদ বলিয়াছেন, মনুর সকল ব্যবস্থা ঔষধের ন্যায় হিতকারী "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২) অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা মনু দিয়াছেন, সুতরাং যিনি বেদ মানিবেন তাঁহাকে বলিতে হইবে যে অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা চণ্ডালের পক্ষেও হিতকর (চণ্ডাল নিজকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, অনুতাপ দ্বারা পূর্ব জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন)। অনিলবাবুও বলিয়াছেন "বেদ ও উপনিষদ্ ভগবানের বাণী"। বেদ যখন মনুর বিধানের প্রশংসা করিয়াছেন তখন মনুবিহিত অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা নিন্দা করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

অনিলবাবু শ্রীঅরবিন্দের গীতা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কিছু ভুল আছে কি না বলিতে পারি না। কারণ উদ্ধৃত অংশে একস্থানে বলা হইয়াছে যে বেদ সনাতন, আবার অন্যস্থানে বলা হইয়াছে যে হৃদয় হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয় তাহাকে সনাতন বলা যায় না। সুতরাং বেদকে সনাতন বলিয়া তাহার উৎপত্তির কথা বলিলে পরস্পর বিরোধিতা আসিয়া পড়ে। অধিকন্তু যে কোনও কবি যাহা কিছু রচনা করেন সকলই হৃদয় হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং হৃদয় হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা যদি প্রামাণ্য হয় (উদ্ধৃত অংশে ইহা বলা হইয়াছে) তাহা হইলে সকল গ্রন্থই প্রামাণ্য হয়। বেদের প্রামাণ্যের প্রকৃত কারণ এই যে কোনও মানব বেদ রচনা করেন নাই, ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা সনাতন বেদ দর্শন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম "অর্জুনের সন্দেহ হইয়াছিল কোন্ কর্ম তাঁহার কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন শাস্ত্র দ্বারা তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় কর। তুমি ক্ষত্রিয়, শাস্ত্র বলিয়াছেন ধর্ম যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, তুমি তাহাই কর।" অনিলবাবু আমার এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "এ শিক্ষা ত জলের মত সহজ, তাহা হইলে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা বিবৃত করিবার প্রয়োজন কি?" ইহার উত্তর এই যে যুদ্ধ করিয়া অর্জুন স্বর্গলাভ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মোক্ষলাভের উপায় দেখাইয়া দেন। এজন্য অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা উপদেশ দিয়াছেন।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন কোন্‌টা কর্ম কোন্‌টা অকর্ম সে বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিও বিমূঢ় হন, কর্মের গতি অতিশয় গহন (৪।১৬, ১৭)। শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতেই যদি সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মীমাংসা হইয়া যায় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের একথা বলিবার সার্থকতা কি?" কিন্তু এখানে কেবল কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের কথা হইতেছে না। এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, কর্ম, বিকর্ম, অকর্ম। কর্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম। বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম। অকর্ম অর্থাৎ কর্মের ফল হইতে মুক্তি। এজন্য ৪।১৮এ বলা হইয়াছে "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দর্শন করে, কর্ম করিয়াও কর্মের ফল ভোগ করে না। এ সকল তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, এজন্য ভগবান বলিয়াছেন গহনা কর্মণো গতিঃ। কোন্ কর্মের কি ফল, কি ভাবে কর্ম করিলে সে ফলভোগ করিতে হয় না, এই সকল কর্মের গতির কথা অতিশয় গহন।

অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "কে কোন্ বর্ণের মানুষ তাহা নির্দ্ধারিত হইবে কি প্রকারে?" জন্মের দ্বারাই বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে। গীতা ১৩।২১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন কেহ যে সৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে কেহ অসৎ যোনিতে, গুণের প্রতি আসক্তিই তাহার কারণ। গীতায় এই বাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০।৭ বাক্যের প্রতিধ্বনি। সেখানে বলা হইয়াছে যাহাদের আচরণ উত্তম

তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহাদের আচরণ নিন্দনীয় তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নিন্দনীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মনু ১০।৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে। বর্ণ নির্ণয় করিবার একটা সহজ উপায় না থাকিলে কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ প্রায় নিষ্ফল হয়। জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় হয় বলিয়াই যুধিষ্ঠির ও ভীম উভয়েই ক্ষত্রিয়, যদিও বাস্তবতঃ উভয়ের গুণ ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই অশ্বত্থামা যুদ্ধব্যবসায়ী হইলেও এবং নিদ্রিত পঞ্চপাণ্ডবের পুত্রগণকে হত্যা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। জন্ম ছাড়িয়া যদি আমরা পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির গুণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে মতভেদ হইবে। বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার বিধান আছে। জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় না করিলে তাহা সম্ভব হয় না।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে আজ কাল অনেক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত গুণ নাই। তাহারা ব্রহ্মবন্ধু বা ব্রাহ্মণাধম। শ্রীকৃষ্ণও অশ্বত্থামাকে ব্রহ্মবন্ধু বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বা শূদ্র বলেন নাই। মানবের গুণ পরিবর্ত্তনশীল। যখন যেরূপ গুণের প্রকাশ হয় তখন সেরূপ বর্ণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে না, সেরূপ চেষ্টা করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হয়।

অনিলবাবু বলিয়াছেন, যে যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সেই কুলেই বাস করিতে হইবে ইহা গীতার শিক্ষার বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। গীতা বলিয়াছেন "সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" (১৮।৪৮) সহজ কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। সহজ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম জন্মের সহিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় এইরূপ, যে ব্যক্তি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সেই কুলের কর্ম করিতে হইবে।

আমি যে সকল কথা বলি নাই সে সকল কথা অনিল বাবু আমার প্রতি আরোপ করিয়াছেন ইহা বড় দুঃখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন "বসন্তকুমার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন।" আমি একথা কোথাও বলি নাই। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মনুসংহিতা প্রভৃতিই শাস্ত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শাস্ত্র নহে। হিন্দুদের পশুবলি প্রথা অবশ্য আমি সমর্থন করি কারণ বেদে ইহার বিধান আছে। অনিলবাবু বেদকে ভগবানের বাণী বলেন অথচ দেবতার নিকট পশুবলি প্রদান প্রথা নিন্দা করেন. কিরূপে তাহাই তাঁহার বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। পুনরায় অনিলবাবু লিখিয়াছেন "মনুসংহিতাতে আছে যে ইহার কথাগুলি বেদমূলক বসন্তকুমার ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মনুসংহিতা বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়।" ইহাও সত্য নহে। আমি কোথাও বলি নাই যে মনুসংহিতা অপৌরুষেয়। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি প্রগাঢ় বৈদিক পণ্ডিতগণ মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, মনুকে পূর্ণজ্ঞানী বলিয়াছেন, বেদ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মনুসংহিতাকে সমর্থন করিয়াছেন "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাই ঔষধের ন্যায় হিতকারী। মনুসংহিতার কথাগুলি বেদমূলক এই উক্তি যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে তাঁহারা মনুসংহিতাকে এই ভাবে সমর্থন করিতেন না। মনুসংহিতাকে বেদমূলক বলিলেই অপৌরুষেয় বলা হইল অনিলবাবুর এই উক্তি ভুল।

অনিলবাবু বলিয়াছেন শাস্ত্রবাক্য ত্যাগ করিয়া ভিতর হইতে অনুপ্রেরণা লইয়া কাজ করা উচিত। কিন্তু অনেক সময় মানব যাহা ভিতর হইতে অনুপ্রেরণা মনে করে তাহা তাহার আসক্তি বা বিদ্বেষ হইতে প্রসূত। বিদ্বান ব্যক্তিরও আসক্তি ও বিদ্বেষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করা অতিশয় দুরূহ। বলা বাহুল্য শাস্ত্র বাক্য ত্যাগ করিবার কথা গীতাতে নাই। ইহা অনিলবাবুর কল্পনামাত্র।

গীতায় "নিয়তং কর্ম" কয়েকস্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ৩।৮, ১৮।৭, ৯, ২৩, ৪৭। অনিলবাবু পূর্বে বলিয়াছিলেন যে নিয়তং কর্ম করার অর্থ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া সকল রকম কর্ম করা। এক্ষণে বলিতেছেন যে নিয়তং কর্ম করার অর্থ শাস্ত্র বাক্য অনুসরণ না করিলে গীতা ১৬।২৪এর সহিত বিরোধ হয়। ১৮।৪৭ শ্লোকে যাহাকে স্বভাব নিয়তং কর্ম বলা হইয়াছে ১৮।৪৮ শ্লোকে তাহাকে সহজং কর্ম

বলা হইয়াছে। সহজ কর্ম অর্থাৎ যাহার যে বর্ণে জন্ম সেই বর্ণের জন্য বিহিত কর্ম। ৪৮।৪১ হইতে ৪৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কর্ম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নিয়তং কর্ম ইহার অর্থ শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (শাস্ত্রবিহিত কর্ম) উহাই যথার্থ।

অনিলবাবু বলিয়াছেন স্মৃতিশাস্ত্রে নানা ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে, যাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রও শাস্ত্রের অন্তর্গত। সুতরাং এ বিষয়ে হয় শ্রীকৃষ্ণের ভুল হইয়াছে, নয় অনিলবাবুর ভুল হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আর কত দিন বাকি?

শ্রীবিজয়কুমার রায়

মনে পড়ে সখি প্রথম স্বপন, প্রথম সে কাছে আসা।
ভীরু কিশোরীর দুরু দুরু বুক, আধো অস্ফুট ভাষা।
নবীন ধরণী, রঙীন আকাশ, মলিন আমার মুখে,
জানি না সজনী, কি ছবি সেদিন দেখেছ সকৌতুকে।

তবু ভুলেছিলে! তবু তুলেছিলে নব সঙ্গীত সুর,
তবু দিয়েছিলে সম্ভাষণের শিহরণ সুমধুর,
সুখের নদীতে প্রণয়ের তরী প্রেমেই ভাসায়ে দিয়া
এ জীবন মন করিলে ধন্য, চির জনমের প্রিয়া।

কে জানিত, সুখ রবে না আমার বহুদিবসের তরে?
কে জানিত, শেষ হ'বে সে মিলন? চির বিচ্ছেদ পরে।
কে জানিত এক, কাল-বৈশাখী—কালরূপে দেবে দেখা
তুমি চলে যাবে! ক্লান্ত চরণে মোরে যেতে হ'বে একা!

এপারে ওপারে যোগ নাহি কোন, বিরহাশ্রুর নদী
একূলে ওকূলে বাড়াইতে জ্বালা, ব'য়ে যায় নিরবধি—
দিন আসে, আর রাত চলে যায়, দুই পড়ে যায় ফাঁকি,
শ্রান্ত পথিক, তীরে বসি হাঁকি, আর কত দিন বাকি?

বৈয়াকরণের অন্ত্যেষ্টি

(ব্রাউনিঙের A Grammarian's Funeral হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

এসো তবে, শব দেহ তুলে লই মোরা স্কন্ধোপরি
সমস্বরে গাহিতে গাহিতে।

তুচ্ছ পর্ণকুটী ক্ষেত রহুক পশ্চাতে সব পড়ি'
আপনার ক্ষুদ্র বেষ্টনীতে

ওই সমতল ভূমে; নিরুদ্বিগ্ন বিরামের কোলে
গাঢ় ঘুমে থাক অচেতন,

কুক্কুটেরা প্রত্যুষের জাগরণী বংশীধ্বনি তোলে
তীব্রকণ্ঠে নাহি যতক্ষণ।

ওই দেখ নামে দিবা সারি সারি ভূধর শিখরে
আঁকিয়া কনক আলিপনা,

ওই ত সে পীঠস্থান যেথাকার উদার অম্বরে
মানবের চিন্তা ও ভাবনা

ধরে সূক্ষ্ম সান্দ্ররূপ, ঘনীভূত ধূম্রে ধূপিকার
উদগীরিত হতে যেন চায়।

থাক পড়ি গিরিমূলে মূঢ় সঙ্ঘ লয়ে শস্যভার,
উচ্চতম ভূধর চূড়ায়

রচিব সমাধি মোরা বৈদগ্ধ্যের, যেথা সংস্কৃতি
পাবে স্বীয় যোগ্যতম ভূমি।

আর সব গিরিরাজি তুলনায় তুচ্ছ খর্ব্বাকৃতি,
আছে একা নীলাম্বর চুমি'

সমাচ্ছন্ন মেঘজালে, না না, ওই তুঙ্গ শৃঙ্গ পরে
জ্বলে দৃপ্ত দুর্গের মিনার

বলয়িত রবিকরে, চল ঊর্দ্ধে দৃঢ় পদভরে
অপেক্ষা কিসের তরে আর?

নিয়ে সমতল ভূমে ছিনু মোরা নিশীথ তিমিরে,
জ্ঞানী লাগি জাগে উষালোক,

স্তরে স্তরে পা ফেলিয়া স্ফীতবক্ষে সমুন্নতশিরে
এ বাহিনী অগ্রসর হোক।

সসম্ভ্রমে নিরীক্ষণ কর সবে, চলেছি আমরা
স্কন্ধে ধরি আচার্য্যের দেহ,

প্রাণহীন শান্ত দান্ত প্রসিদ্ধি যাঁহার লোকোত্তরা,
সমকক্ষ নাহি যাঁর কেহ।

ঘুমাও ধানের গোলা মেষমাল ক্ষেত্র ও কুটীর
নিরাপদ নিশ্চিন্ত প্রভাতে।

কবরের পানে যাঁরে গানে গানে লঙ্ঘিয়া তিমির
বহিয়া চলেছি এক সাথে,

সবিতার মত তাঁর মুখে দীপ্তি, কণ্ঠে উথলিত
আবির্ধারা বিগলিত বাণী।

ছিলেন অনেকদিন খ্যাতিহীন, শীতে অন্তর্হিত
বসন্ত কেমনে হয় জানি?

একটিমাত্র লঘুস্পর্শে যৌবন ফুরালো যেন তাঁর,
পঙ্গু দেহ ক্ষীণ বলহীন।

কহিলেন রুদ্ধকণ্ঠে ?—"নবীনের নৃত্যে অভিসার,
আমার চরণ ছন্দহীন ?"

STUDENTS P.G. COMMON-ROOM

ধরাসার সর্ব্বস্বের হেন খেদ কভু তাঁর নয়।
(পাহাড় ঘেঁসিয়া চল সবে
সেই পথে যে সরণি সহরের অভিমুখে লয়।)
গোনা দিন ফুরালো যে ভবে,
মরণের সে ইঙ্গিতে আপন গৌরবে দর্পভরে
চলিতেন দৃক্‌পাতে না আনি
পরের সহানুভূতি অনুকম্পা, ক্রীড়া নর্ম্মপরে
বৈরাগ্যের যবনিকা টানি' ।
রহিতেন কর্ম্মযোগে, দ্রুত বেগে পলায়নপর
মরতেরে বক্ষে আঁকড়িয়া।
শুধাতেন, "তুলটে কি আছে লিখা প্রসারিয়া ধর
মর্ম্মোদ্ধার করিব পড়িয়া।
মানবের অন্তর্দর্শী ঋষি কবি আলেখ্য আপন
ছত্রে ছত্রে রেখেছেন আঁকি'।"
গুরুর আসন তাই দিনু তাঁরে, তাঁর নির্দ্ধারণ
অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখি।
মাথায় ধরিল টাক চক্ষু হল সীসা সম ভারী,
অস্পষ্টতা জাগে উচ্চারণে।
এ দশায় অন্যমুখে শুনিতাম—"দিব অপসারি
সন্ন্যাসের নিবিড় গুণ্ঠনে।"
এই প্রবীণের মুখে শুনিতাম, "প্রকৃত জীবন
আগামী মুহূর্ত্তে বুঝি ঢাকা !
ক্ষণতরে ধৈর্য্য ধর। গবেষণা তথ্যনিরূপণ
হল বটে পুঞ্জীভূত শ্লোকে,
তথাপি রহিল বাকী টীকা ব্যাখ্যা, করিব মন্থন
গুপ্ততত্ত্ব পড়ে নাহি চোখে।
সর্ব্বজ্ঞত্ব লক্ষ্য মোর, অল্পাধিক জ্ঞান নাহি বুঝি
সহজ অথবা সুকঠিন,
ভোজে বসি সর্ব্বগ্রাস তরে আমি কণাটুকু খুঁজি
ক্ষুধা মোর বিতৃষ্ণাবিহীন।"

জীবনের সঞ্চয়ন শেষ হলে ভুঞ্জিতে জীবন
ছিল তার শেষ অভিলাস,
তার পূর্ব্বে একমাত্র আকিঞ্চন শুধু অধ্যয়ন,
চয়নিতে পুঁথির নির্য্যাস।
জীবনের আস্বাদন কদাচন ইতিপূর্ব্বে নয়।
সমগ্রের সর্ব্বাগ্রে ধারণা
তারপরে ধীরে ধীরে কিম্কর্ত্তব্যপ্রচেষ্টা নির্ণয়।
চক্ষে জাগে যে পরিকল্পনা
সে আদর্শে বিরচিতে হবে সৌধ লৌহ ও প্রস্তরে,
থরে থরে সাজাবে ইষ্টক,
চূণ শুরকি বালির মিশ্রণে তারা গাঁথা হবে পরে,
শিলা লৌহে স্ফুরিবে দীপক।

(সহরের দ্বারে আসি উত্তরিনু। হাটের প্রাঙ্গন
অদূরে রয়েছে প্রসারিত।)
মধুর বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনের,—শুধু সঞ্চয়ন,
(সমস্বরে করি বিঘোষিত)
জীবনেরে বরিবার আগে তিনি পাথেয় তাহার
সংগ্রহিতে ছিলেন ব্যাকুল।
সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন, পরে ব্যয়ের সন্ধান বিধাতার
উদ্‌ভাবনা করিবে নির্ভুল।
সংশয়ে অপরে কয়, "কালের প্রবাহ বহমান,
করিবে যা, এখনি কর তা,
নতুবা মাহেন্দ্রক্ষণ চিরতরে হবে অন্তর্দ্ধান
ভুলোনা আয়ুর নশ্বরতা।"
তিনি কিন্তু বলিতেন, কাল ক্ষিপ্র ? থাক বর্ত্তমান
বানর ও কুক্কুরের তরে !
মানুষ যে, তার তরে চিরন্তন চিরদীপ্যমান,
থাকে সে অচল ধৈর্য্যভরে।"

পুঁথিতে গুঁজিয়া মাথা নতশির তিনি অনুদিন।
অশ্মরী ধরিল অবশেষে,
সীসাভরা দুনয়ন ক্রমশঃ হল যে দৃষ্টিহীন
ক্ষয়কাশে কাটে নিশি কেশে।

বলিতাম যবে মোরা, "গুরুদেব হোন সাবধান,
শ্রমে ক্ষান্তি দিন ক্ষণতরে।"
সে কথায় কর্ণপাত করে কভু বধিরের কান?
(দ্বিগুণিত সতর্কতাভরে
চল ধীরে, সরু গলি, জোড়ে জোড়ে হও অগ্রসর।)

নিরুদ্বিগ্ন উৎফুল্ল আনন
গ্রন্থস্তূপে ডুবিলেন মহোৎসাহে তিনি অতঃপর,
সিংহ সম আক্রমে ভীষণ।

আত্মার পিপাসা তাঁর নিদারুণ, মিটিবার নয়,
সিন্ধুপায়ী আগস্ত্য-পিপাসা,
সুরার ভৃঙ্গারে যেন প্রমত্তের ওষ্ঠ লগ্ন রয়
গণ্ডীবদ্ধ নয় তাঁর আশা।

অধুনার লাগি মোরা সীমা দিয়া ঘেরি সাম্প্রতেরে
সুদূরের দৃষ্টি নিভে যায়,
প্রত্যক্ষের লোভে মোরা দৃক্‌পাতে না আনি
অলক্ষ্যেরে,
এ জীবন ভরি রিক্ততায়।

সুমহান নহে কিগো এ আদর্শ? বিধাতার হাতে
(কহিতেন বারংবার তিনি)
রয়েছে সে বরদান, যার বলে মর্ত্তের ভাষাতে
লভিব স্বর্গের বাণী জিনি'।

অর্ব্বাচীন সম তিনি স্বর্গ সনে কিস্তিবন্দী করি
অল্পে অল্পে চান নি লভিতে
জ্ঞান ঋদ্ধি। সম্পূর্ণ ভাণ্ডার কিম্বা নয় কানা কড়ি,
এই পণ ছিল তাঁর চিতে।

হয় ত্রিদিবের বলে সর্ব্বজয়, কিম্বা সর্ব্বহারা
হওয়া শুধু দুরন্ত সংগ্রামে।
তাঁহারে শুধাতো যদি কভু কেহ, "জীবনের ধারা
মরণে কি থামে না বিরামে?
"থাকুক, তথাপি কর সংসারের হীন প্রলোভন
হেলাভরে দূরে প্রত্যাখ্যান।"
এই বাণী তাঁর কাছে করিতাম সতত শ্রবণ,
বক্ষে তাঁর অলক্ষ্যের ধ্যান।

ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্র কাজে নিয়োজিত করে আপনারে,
দেখে যাহা তাই শুধু ধরে।
এহেন মহৎজন অজানা সত্যের অভিসারে
ধাবমান কি আবেগভরে!

অলক্ষ্যের সনে কভু হয়না সাক্ষাৎ পরিচয়
মৃত্যু আসি পূর্ণচ্ছেদ টানে।
ক্ষুদ্র প্রাণ একে একে শতকেতে উপনীত হয়,
আদর্শান্ধ শত কোটি জানে,
একের ঘরেতে শূন্য কোটিকল্প তবু যোগফল।
এ ধরণী সর্ব্বস্ব যাহার
প্রাপ্তি তার মুঠিতলে, পরকালে কী তার সম্বল?
—এ ধরা উত্তর দিক্ তার।

ধ্যানী যিনি, চিত্ত তাঁর বিধাতারে আত্ম-সমর্পণ
করি পায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়,
চির অন্বেষণ তাঁর যাঁর লাগি তাঁর দরশন
সেই অপেক্ষার মাঝে রয়।

মরণ আসিয়া যবে কণ্ঠ তাঁর ধরেছিল চাপি,
গুরুদেব তন্ময় তখন
ব্যাকরণে, তদ্ধিত প্রত্যয় ধাতু বিচারে তথাপি
জাগ্রত উদ্দীপ্ত তাঁর মন।

পাণিনি ও কলাপের জটিল সূত্রের পাকেপাকে
যেন ফণী বেষ্টিত ধূর্জ্জটি,

উঠিছে টঙ্কারধ্বনি রসনার দোর্দ্দণ্ড পিনাকে,
অরণ্য চরণ হতে কটি
মরণের হিমস্পর্শে ; বচন তখনো স্ফূর্ত্তি পায়
বিশ্লেষণে বিচারে ব্যাখ্যানে,
সমুদ্যত প্রাণপণ অন্তিমের শেষ প্রচেষ্টায়
ফোটে বাণী উপলব্ধ ধ্যানে।

উপনীত মোরা এবে গিরিশৃঙ্গে, যোগ্যতম স্থান
প্রবীণের দেহরক্ষা তরে।
নভচারী বিহঙ্গের হেথায় যাত্রার অবসান,
সীমানারে নমি শ্রদ্ধাভরে।
এই সেই তুঙ্গতম গিরিচূড়া, উপত্যকা ভূমে
জনতার নিশ্চিন্ত কুলায়,
তাদের জীবনযাত্রা সেথাকার কোলাহলে ধূমে
হট্টগোলে দিন কেটে যায়।
জীবনের মায়া জিনি' জ্ঞানে যিনি রচিলেন নীড়
হেথা তাঁর দেহের সমাধি,
এই ত সে যোগ্যস্থান, মেঘেরা যেথায় করে ভিড়,
দামিনী স্ফুরণে কাঁপে আঁখি,
উল্কারাজি পড়ে খসি নক্ষত্রেরা আনাগোনা করে।
আনন্দ নার্মুক্ত ঝঞ্ঝাবাতে,
শিশির বিন্দুতে যেন প্রশান্তির কণাগুলি ঝরে।
সুমহৎ স্বপ্নের পশ্চাতে
আসে হেন সমাপ্তিকা সমুচ্চ শিখরে রেখে যাই
ঊর্দ্ধমুখী মহাত্মার দেহ,
জীবন মরণাতীতে ক্রমোন্নতি, অন্ত কভু নাই,
এ মরতে বুঝিবে না কেহ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

নর্থ বেঙ্গল

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বন্ধু বললেন, দার্জ্জিলিং গিয়ে আর কি হবে? পাহাড় টাহাড় আমার ভাল লাগে না—তার চেয়ে আপনি যখন এলাহাবাদে আছেন তখন একবার অর্দ্ধোদয় যোগ কিম্বা কুম্ভযোগে এলাহাবাদে ত্রিবেণী স্নান ক'রে আসা যাবে।

বার্চ্চ হিলের দৃশ্য

বন্ধুর মন্তব্যে আশ্চর্য্য হলুম। দার্জ্জিলিং যেতে সাধলে কেউ অস্বীকার করে এ ধারণা আমার ছিল না। মানুষের পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ প্রবল জানি, সময়ে সময়ে তার উৎকট অভিব্যক্তিও দেখেছি কিন্তু সুন্দরের আবেদন মানুষের কাছে একেবারে অকিঞ্চিৎকর এবং ব্যর্থ হয়েচে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু দেখলুম তা-ও হয়। আমাদের মধ্যে একদল মানুষ আছেন (বয়সে তাঁরা যুবক শ্রেণীর) যাঁরা জীবনকে উপভোগ করতেও জানেন না। আগে ভাবতুম অতিরিক্ত দারিদ্র্যই বুঝি এর কারণ। পরে দেখলুম, তা' নয়, জীবনকে দেখার এক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীই এর জন্যে দায়ী। ভাগ্যপীড়িত ব'ল্যে নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে রসের উৎসমুখ এঁদের জীবনে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। এঁরা যে ভোগ ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েচেন তা-ও নয়, ভোগ করেন কিন্তু সেটা নিতান্ত গতানুগতিক এবং মেকানিক্যাল ভাবে অর্থাৎ নাক সিঁট্‌কিয়ে। তাই কোন বস্তুর আবেদনই যেন এঁদের

লেবং রেশ কোর্সের দৃশ্য

জীবনে যথেষ্ট উৎসাহ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে এঁদের সজাগ ক'রে তুলতে পারে না। কিন্তু সে ভূমিকা বাদ দিলুম। এখন আসল কথাটা বলি।

হঠাৎ সরকারী কাজে ডাক পড়লো—সৈয়দপুর যেতে হবে। বন্ধুমহলে কথাটা ব্যক্ত করতেই দেখলুম বন্ধুদের ভূগোল পরিচয় আমার সমশ্রেণীর। অবশ্য তা না হ'লে তাঁরা আমার বন্ধু হবেন কেন! একজন বললেন, তা বেশ বেশ; সোদপুর যাচ্ছেন—তবে ত কলকাতা থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জার হ'তে পারবেন। আর একজন বললেন, সৈদপুর? সে ত আসামে-ধুবড়ির কাছে বুঝি? এই পূজোর আগে—আপনাকে সেই অগস্ত্যর দেশে ঠেললে?

কার্সিয়াং হইতে মেঘ এবং পাহাড়ের দৃশ্য

পাঠক পাঠিকাবর্গের অবগতির জন্যে চুপি চুপি বলতে পারি এঁদের একজন উপার্জ্জনশীল অ্যাডভোকেট, আর একজন সরকারী বড় কর্ম্মচারী। অতএব প্রমাণ হচ্চে অর্থাগমের সঙ্গে ভূপরিচয়ের কিছুমাত্র সংস্রব নেই।

বন্ধুদের চমৎকৃত ক'রে দিয়ে বললুম, সৈয়দপুর আসামেও নয়, কলকাতার উপকণ্ঠেও নয়। জায়গাটা নিতান্ত বাংলাদেশে এবং রংপুর জেলায়। তবে কলকাতা থেকে অবশ্য ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা যায় না।

অবশেষে এক বর্ষাধৌত সজল প্রত্যূষে সত্যিই সৈয়দপুরে উপস্থিত হলুম। আশ্বিনের মাঝামাঝি, অতএব বাংলার অন্যান্য অংশে তখন বর্ষা শেষ হয়েচে কিন্তু সৈয়দপুরে তখনো বর্ষণের বিরাম নেই। মিষ্টসম্বন্ধযুক্ত আমার এক সম্বন্ধী আমাকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন।

ছোট্ট জায়গা—সাবডিভিসনও নয়। একটা থানা আছে বটে। সহর থেকে মাইল দুই দূরে করতোয়া নদী—অপরিসর কিন্তু স্রোতস্বতী।

স্থানীয় বাঙালীদের জীবন প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলুম—সন্ধ্যার সময় বি, আর, সিং রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে উপস্থিত হলুম। বিদ্যুতের ধারায় বাড়িখানি আলোকিত—রেডিয়োতে গান চলচে। কেউ কেউ তাস খেলচেন—কেউ কেউ ক্যারম। আর একখানি ঘরে অনেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সংবাদপত্র পড়চেন দেখা গেল। উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র প্রায় সবগুলিই নেওয়া হয় দেখলুম। ঘুরতে ঘুরতে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলুম। গ্রন্থাগারিক পরিচিতের মত হেসে 'আসুন, বসুন' ব'লে চেয়ার এগিয়ে দিলেন। এতখানি সৌজন্য প্রত্যাশা

মহাকালের পূজাবেদী

করি নি। অনেক বছর হ'ল বাংলাদেশের বাইরে আছি। প্রবাসে বরঞ্চ দেখেছি নতুন কোন বাঙালী দেখলে কেউ কেউ তাঁর পরিচয় নেবার জন্যে উৎসুক হন। বাংলা দেশে এর উদাহরণ বিরল। কেননা সে দেশে বাঙালী সুলভ এবং স্বাভাবিক। তাই গ্রন্থাগারিকের ভদ্রতায় মুগ্ধ হলুম। পরে জানলুম শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সেনগুপ্তের সৌজন্যবোধ অবিসংবাদিত।

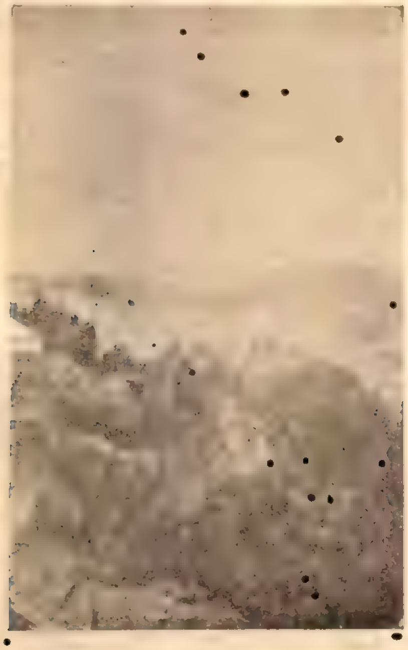

জলাপাহাড়ের দৃশ্য

দেখলুম মিঃ বি, আর, সিং ই, বি, রেলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অনেকখানি। নিজে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, পরে এজেন্ট পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি এজেন্ট হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্চে এই যে ই, বি, রেল লাইন জুড়ে তাঁর কীর্ত্তি ছড়িয়ে আছে। শিয়ালদায়, বি, আর, সিং হাসপাতাল, সৈয়দপুরে বি, আর, সিং ইনস্‌টিটিউট ইত্যাদি। সৈয়দপুরের ইনস্‌টিটিউটের বাড়ি তৈরি করতে তিনি হাজার টাকা দান করেছিলেন।

সৈয়দপুর ইনস্‌টিটিউট গ্রন্থাগারে ইংরাজি এবং বাংলা মিলিয়ে প্রায় চার হাজার গ্রন্থ আছে। গ্রন্থাগারিক শিলিগুড়ি ষ্টেশন (সৈয়দপুর হইতে ৭৬ মাইল) পর্য্যন্ত গিয়ে পাঠার্থীদের বই সরবরাহ ক'রে আসেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্চে এই যে উক্ত লাইব্রেরির বইগুলি অত্যন্ত সুনির্ব্বাচিত। অধিকাংশ লাইব্রেরীতে দেখতে পাওয়া যায় উপন্যাসের (তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক) প্রাচুর্য্য সুনিশ্চিত। তার কারণ নতুন নতুন উপন্যাস সরবরাহ করতে না পারলে লাইব্রেরির নিয়মিত খদ্দের রাখা যায় না। আর সেই নিয়মিত খদ্দের যাঁরা তাঁরা যে পাঠিকা-শ্রেণীর অন্তর্গত সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রত্যেক

ক্যাথলিক গির্জ্জা
—সৈয়দপুর

লাইব্রেরি রক্ষা করার আরো একটা উদ্দেশ্য আছে। সে হচ্চে মানুষকে গবেষণা করার সুযোগ দেওয়া এবং বিকৃত রুচির মোড় ফেরানো। এই উদ্দেশ্য সাধিত না হ'লে প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে কোন বই আমাদের বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট হবে না। কেননা ইংরাজিতে যাকে সিরিয়াস্‌ ষ্টাডি বলে বই যদি বিক্রি না হয় তবে লেখকেরা সে ধরণের বই

লিখবেন কেন? সৈয়দপুর গ্রন্থাগার সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন দেখলুম।

বি, আর, সিং ইনসটিটিউট ব্যতীত সৈয়দপুরে আরো দু'টি ইনসটিটিউট আছে—একটির নাম রেলওয়ে ইনসটিটিউট, সেটি ইউরোপীয়ানদের জন্যে। আর একটি খালাসী প্রভৃতি শ্রমিকদের জন্য। অতএব এখানেও দেখা যাচ্ছে

রবিবারের বাজার

জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান। প্রত্যেক ইনসটিটিউটের রক্ষা কল্পে বেতন থেকে আবশ্যিক চাঁদা কেটে নেওয়া হয়। চাঁদার হার বেতন অনুসারে কম বা বেশি। এই চাঁদা ব্যতীত রেলওয়ে কোম্পানীও প্রতি মাসে গ্র্যাণ্ট দিয়ে থাকেন।

সৈয়দপুরের ওয়ার্ক সপটিও লক্ষ্য করবার মত। অবশ্য এটি মিটার গেজের ওয়ার্ক সপ। ব্রড গেজের ওয়ার্ক সপ কাঁচড়াপাড়ায়। এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে দিয়ে এই কারখানায় এঞ্জিন তৈরি করা হয় এবং এঞ্জিন মেরামত করাও হয়। লোহা পেটাই, লোহা কাটা, বোল্ট তৈরি প্রভৃতি সমস্ত কাজ মেসিনে হয়। এই মেসিনগুলির প্রত্যেকটি অনেক দামের (পনের হাজার, বিশ হাজার)—সুতরাং সবগুলির দাম একত্র করলে লক্ষ টাকার বেশি হবে। আর এই মেসিনগুলিও চিরস্থায়ী নয়। এদের প্রত্যেকটির জীবনীকাল সুনির্দ্দিষ্ট। সেই কাল উত্তীর্ণ হ'লে অথবা তৎপূর্ব্বেই বিদেশ থেকে নতুন মেসিন আনাতে হয়। অতএব আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা আর ঘুচলো না।

এই ওয়ার্কসপে কেরাণী এবং শ্রমিক হিসাবে অনেক-গুলি লোকের জীবিকা সংস্থান হয়। শুনলুম তাদের সংখ্যা নাকি তিন হাজার হবে।

বেঙ্গলী এসোসিয়েসান
—কার্সিয়াং

সৈয়দপুরে দুটি গির্জ্জা—একটি রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, অপরটি প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের। রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জাটি দেখতে বড় সুন্দর—তার প্রবেশ দ্বারে Ave Maria লেখা আছে।

স্থানটি স্বাস্থ্যকর ব'লেই মনে হ'ল। অন্ততঃ তার জল হাওয়ায় যে ক্ষুধাকরতা গুণ আছে তার সাক্ষ্য দিতে পারি। বঙ্গদেশসুলভ ম্যালেরিয়া কিম্বা কোন মহামারীর উপদ্রব নেই।

পূর্বেই বলেছি সরকারী কাজে সৈয়দপুর যেতে হয়েছিল কিন্তু অতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে মনে করলুম দার্জ্জিলিং দেখে না গেলে অন্যায় হবে। বিশেষ করে কার্সিয়াং-এ আমার এক স্নেহাস্পদ বন্ধু আছেন—তিনি বারে বারে আহ্বান করতে লাগলেন। সেই আহ্বান মেনে নিয়ে এক আসন্ন শীতের প্রত্যুষে রওনা হলুম। নিল্‌ফামারি, ডোমার, হল্‌দিবাড়ি,

মল রোড হইতে মেঘ এবং পাহাড়ের দৃশ্য

জলপাইগুড়ি—সব নামগুলির সঙ্গেই নামতঃ পরিচয় কিন্তু কোনদিন তাদের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় হ'ল না। ট্রেণে যেতে যেতে ভাবতে লাগলুম কি বিচিত্র এই বাংলা দেশ! এ দেশে নদী নালা, বন, প্রান্তর, সমতলভূমি, পাহাড় কোন বস্তুরই কি অভাব নেই? কত ঐশ্বর্য্য দিয়েই না প্রকৃতি-দেবী একে সাজিয়েচেন! এই অশেষ ঐশ্বর্য্যের আমরা কোন হিসাব রাখি নে, চোখ মেলে কোনদিন দেখিনে ব'লেই আমরা এর পরিমাণ জানি নে। হিসাব ক'রতে গেলে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতুম—পাহাড়ে বেড়িয়ে মনে হ'ত এই সম্পদ-টুকুই ত যথেষ্ট—এর সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়েই ত একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। আবার সমতলভূমির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি যাত্রা সুরু করতুম তবে তার বিস্তীর্ণতা, তার ফলফুল, নদী নালা, বিল বাঁওড়, তার অধিবাসীদের বিভিন্ন শাখা, সম্প্রদায়, ভাষা, তাহাদের আচারপদ্ধতি প্রভৃতি দেখতে দেখতে এবং তার বিষয় ভাবতে ভাবতে একটা আয়ুষ্কাল শেষ হ'য়ে যেতে পারতো।

যখন শিলিগুড়ি পৌছুলুম তখন বেলা ৯॥০টার কাছা-কাছি। মনে করেছিলুম শিলিগুড়ি থেকেই বোধ হয় পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হবে কিন্তু দেখলুম পাহাড় তখনো দূরে। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ের ছোট গাড়ি প্ল্যাটফর্মের অপরপার্শ্বে সজ্জিতই ছিল—আসন গ্রহণ করলুম। গাড়ির ড্রাইভার, গার্ড সকলেই পাহাড়ী। মনে করেছিলুম তারা সম্ভবত সময়নিষ্ঠা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় কিন্তু দেখলুম

দার্জ্জিলিং সহর

তারা ঠিক সময়মতই ট্রেণ ছাড়লে। সুক্‌না ষ্টেশন থেকে উত্তরণ সুরু হ'ল। বন্ধু বলেছিলেন, দার্জ্জিলিং গিয়ে আর কি হবে? কিন্তু আমি দেখলুম, দার্জ্জিলিং-এ তখনো পৌছুই নি কিন্তু তার বিচিত্র রেলপথ দেখেই আমার মন তৃপ্তিতে ভ'রে যাচ্চে। ছোট্ট রেলপথ, সঙ্কীর্ণ তার সঙ্গতি কিন্তু কি বিপুল প্রয়াসেই সে পাহাড়ের অঙ্গকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেচে। যেন সমগ্র পর্বতগাত্র ব্যেপে এক দীর্ঘচ্ছন্দ

সরীসৃপ এলিয়ে প'ড়ে আছে। ক্রমোন্নতি তুচ্ছ ক'রে আমরা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে লাগলুম—নীচে প'ড়ে থাকলো মানুষকে নিয়ে তার সভ্যতার জনপদ, তেরাইয়ের বনভূমি—উঁচুতে উঠতে উঠতে আমরা দেখতে লাগলুম পাহাড়ের গায়ে জাফরি-কাটা পল্লব-চতুষ্কোণ, (চায়ের বাগান) আর আলো ছায়ার খেলা, পাহাড়ের একধারে রৌদ্র

দুপুরের রৌদ্রে দার্জ্জিলিং সহর

ঝলমল করেচে, অপর ধারে ছায়া। আরো দেখতে লাগলুম রেল পথের বৃত্ত—যাকে আমরা নীচে ফেলে এসেচি, এই রেলপথের আরোহণটা বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায়। খালি একটা কামিজ গায়ে দিয়েই চলেছিলুম কিন্তু তিন্ধারিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে শীত বোধ করতে লাগলুম। দেখলুম তিন হাজার ফুট উঠেচি। সহযাত্রী এক হিন্দুস্থানী আমার ভাব দেখে হেসে বললেন, বাবু সা'ব, আভি গরম কোট পেহেন লিজিয়ে।

বেলা একটা নাগাদ কার্সিয়াং পৌঁছুলুম। সব চেয়ে মজা লাগলো সেখানকার আবহাওয়ার পার্থক্য দেখে। তখন যদি আমি সৈয়দপুর থাকতুম তবে নিশ্চয় ফ্যান চালাতুম, কেননা তার আগের দিনও চালিয়েছি কিন্তু কার্সিয়াং এ বেলা একটার সময় সকলেই গরম কোট প্যাণ্ট, সোয়েটার প'রে ঘুরে বেড়াচ্চেন দেখলুম। এঁরা দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ের অডিট আপিসে চাকরি করেন। বন্ধু ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন—আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে মাত্র ৫২ মাইলের ছোট্ট রেলপথ কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে মোটরবাসেরও চলাচল আছে—তাতে চ'ড়েও কার্সিয়াং কিম্বা দার্জ্জিলিং যাওয়া যায়। কোর্ট রোড রেল লাইনের পাশে পাশে চলেচে। শুনলুম এই মোটরবাস-প্রতিযোগিতার ফলে উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর আয় অনেক কমে গেছে—কাজেই খরচ কমানোর জন্যে তাদের রিট্রেঞ্চমেণ্ট করতে হয়েচে। এই

রেলওয়ে ষ্টেশন
—সৈয়দপুর

উপায়ে বারো লক্ষ টাকা খরচের জায়গায় তারা সাড়ে আট লক্ষ টাকা খরচ করচে অর্থাৎ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ কমিয়েচে। এর থেকে অনুমান করা যাবে যে এই রিট্রেঞ্চ-মেণ্টের ফলে কত লোকের চাকরি গেছে। বিশেষ ক'রে যদি আমরা মনে রাখি যে এই রেলের শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৪৲ মাত্র। রেলপথ অত্যন্ত বেঁকাচোরা ব'লে প্রত্যেক গাড়ীখানির পিছনে একজন ক'রে লোক দড়ি ধ'রে

দাঁড়িয়ে থাকে—পথ যেখানে যে রকম তাই বুঝে সে ব্রেক কসে বা ঢিল দেয়। হিমালয় পাহাড়ে শীতের রাত্রে চলন্ত ট্রেণে এই রকম দড়ি ধ'রে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা সকলেই অনুমান করতে পারবেন। অবশ্য পাহাড়ী ছাড়া আর কোন জাত এই চাকরি করতে পারে না। কিন্তু তাদের বেতন বারো টাকা থেকে চৌদ্দ টাকা পর্য্যন্ত। অথচ এই রেলওয়ে কোম্পানীর যিনি জেনারেল ম্যানেজার তাঁর বেতন মাসিক দু'হাজার টাকা—আর বসবাসের জন্যে নিশুল্ক বাংলা।

বি, আর, সিং ইন্‌ষ্টিটিউট

বন্ধু বল্লেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠলে কার্সিয়াং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য্যের প্রথম আলোকসম্পাত দেখতে পাওয়া যায়। পরদিন ভোরে উঠে পাহাড়ের একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালুম—তখনো পর্ব্বতপ্রদেশে রাত্রির অন্ধকার বিরাজমান। ক্রমে শুভ্রবর্ণ হেমশীর্ষ চিরতুষার হঠাৎ দৃষ্টির সাম্‌নে ভেসে উঠলো—আর তার পিছনকার সমস্ত মেঘে রঙের খেলা সুরু হ'য়ে গেল। সে রঙের সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্য বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই। কেবলমাত্র এইটুকু বলতে পারি যে ছোটবেলায় যেমন বিনা কারণে কিম্বা সামান্য কারণে মনে একটা বিমল আনন্দ উপভোগ করতুম কিন্তু যার আস্বাদ বহুকাল ভুলে গেছি সেই হঠাৎ-ফিরে পাওয়া আনন্দ আমার সমস্ত দেহকে রোমাঞ্চিত ক'রে তুললো এবং আমার অজ্ঞাতসারেই সেখানে বেজে উঠলো এক মন্ত্র—'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং'।

সকালে ৮-৫০ মিনিটের ট্রেণে কার্সিয়াং থেকে দার্জ্জিলিং রওনা হলুম। কার্সিয়াং এবং দার্জ্জিলিং-এর ভিতরে অনেকগুলি লোক্যাল ট্রেণ আছে। সেদিন রবিবার। সুতরাং বন্ধুও আমার সহযাত্রী হলেন। বন্ধু-পত্নী শীতের দেশে অত সকালেই আমাদের ভাত খাইয়ে দিলেন—যাতে দার্জ্জিলিং পৌছে খাওয়া দাওয়ার ধান্দায় আমাদের খানিকটা সময় নষ্ট না হয়। রেলপথের বর্ণনা

অবজারভেটারি পাহাড়ের দৃশ্য

আগেই করেছি—এবারও সেই রকম, বরঞ্চ আরো সুন্দর। বাতাসিয়া লুপ ত একেবারে বৃত্তাকার। ক্রমে আমরা ঘুম পৌছুলুম। এই ষ্টেশনটিই রেলপথের সর্ব্বোচ্চ শিখর সকলেই জানেন—৭ হাজার ফুটের উপর। ঘুম নামটি সার্থক—জায়গাটি মেঘের কোলে ঘুমিয়ে আছে। সূর্য্যা-

লোকের অভাবে ফটো নেওয়া সম্ভব হ'ল না। ছোট-বেলায় দার্জ্জিলিং-এর বর্ণনা পড়তে গিয়ে ঘুমের বুড়ীর কথা পড়েছিলুম—হয়ত একটা ছবিও তাতে দেওয়া ছিল। ষ্টেশনে নেমে চক্ষুতারকা বিস্ফারিত করে সেই বুড়ীকে খুঁজতে যথেষ্ট চেষ্টা করলুম—কিন্তু পেলুম না। তবে সেখানকার যে কোন বুড়ীর ফটো নিলে সেই ছোটবেলায় মনে-আঁকা ঘুমের বুড়ীর সঙ্গে খানিকটা মেলে বটে। ঘুম থেকে অনেকে হেঁটেও দার্জ্জিলিং যান—৫ মাইল পথ। আমরা

দার্জ্জিলিং দাঁড়িয়ে তার চারিদিককার পাহাড়ের দৃশ্য বর্ণনা করা নানা কারণে নিষ্প্রয়োজন। প্রথম কথা এই ধরণের বৃত্তান্ত অনেক ছাপা হয়েচে—তার পুনরুক্তি কারো কাছে রুচিকর হবে আশা করা যায় না। দ্বিতীয় কথা যে অনৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনা করবার ভাষা আর যারই থাকুক আমার নেই। এই খানেই প্রকৃতির ভাষার কাছে মানুষের ভাষার পরাজয়। দার্জ্জিলিংএর ফটো তুলবো ব'লে আমি ক্যামেরায় ৮খানি ফিল্ম নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু মল রোডে

যক্ষ্মা হাসপাতাল

ট্রেণেই গিয়েছিলুম। বেলা ১১টার পর দার্জ্জিলিং পৌছুলুম।

ষ্টেশন মাষ্টার এবং অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার দু'জনেই বাঙালী—ষ্টেশন মাষ্টারের চেহারাটি ভারি সুন্দর—দূর থেকে তাঁকে সাহেব বলেই আমার ভুল হয়েছিল। ডি, এইচ রেলওয়ে তার কর্ম্মচারীদের গরম কাপড়ের ইউনিফর্ম যা দেয় তা বেশ ভাল—অন্তত এই বিষয়ে তাদের কার্পণ্য নেই। কিন্তু বেতনের হার যে নিতান্ত সামান্য সে কথা এই বললেই প্রমাণ হবে যে ষ্টেশন মাষ্টারের মাইনে ১২৬৲ টাকা এবং তাঁর সহকারীর মাইনে ৪২৲ টাকা।

দাঁড়িয়ে মনে হ'ল ৮খানি ফিল্ম ত তুচ্ছ, ৮ হাজার ফটো নিলেও এই সৌন্দর্য্যের কণামাত্র আস্বাদ যাঁরা না দেখ্‌লেন তাঁদের দেওয়া যাবে না। দার্জ্জিলিংএর মল্ রোড, অবজার ভেটারি হিল, সেই হিলের উপর মহাকালের পূজাবেদী, সেখান থেকে লেবং রেসকোর্সের দৃশ্য, জলাপাহাড়ের দৃশ্য, বার্চ হিল, গবর্ণমেণ্ট হাউসের কাছ থেকে দার্জ্জিলিং সহরের দৃশ্য, এর এক একটা দেখি আর মনে হয় যে দুটো চোখের বদলে ভগবান আমাকে যদি সহস্র চোখ দিতেন তবেই যেন এই সবের কতকটা উপভোগ করতে পারতুম। মেঘও যে মানুষের সাথী, তার ঘরকন্নার জিনিষ তা বুঝ্‌তে পারি

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত প'ড়ে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়ে এবং দার্জ্জিলিংএর মত মেঘের দেশে এসে।

বন্ধু বললেন মহাকাল খুব জাগ্রত দেবতা। যিনি যা মানসিক করেন দেবতা তা পুরণ করেন। কিন্তু মহাকালের কোন মন্দির নেই। অনেক ভক্ত মন্দির তৈরি ক'রে দিতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁরা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন যে মন্দিরের কোন দরকার নেই। ফলে মহাকালের পুজাবেদী দুই ত্রিশূলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত, চারিপাশে নানারঙের পতাকা উড়্‌চে। মহাকালের পীঠস্থান যে পাহাড়ের উপর তার নীচের দিকে একটা গুহা আছে সেই গুহার ভিতর দিয়ে নাকি কৈলাস এবং মানস সরোবর যাওয়ার পথ আছে। কিন্তু এসম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন—কেননা যে দু' একজন ঐ পথ দিয়ে যেতে চেষ্টা করেচেন তাঁরা ফেরেন নি।

পরদিন আমার ফেরবার পালা। বন্ধু বললেন, যাওয়ার আগে একবার কার্সিয়াংএর যক্ষা হাসপাতালটা দেখে যান। সহজেই সম্মত হলুম। ডাউহিলে উঠতে উঠতে অনেক উপরে যক্ষা হাসপাতাল পাওয়া গেল। গেটেই ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত হাসপাতাল, রোগীদের থাকবার ঘর, ডাক্তারখানা প্রভৃতি দেখালেন। তখনো হাসপাতালের উদ্বোধন হয় নি। তার দু'দিন পরে মন্ত্রী নৌসের আলি উদ্বোধন করলেন। তখন হাসপাতালে তিনজন রোগিণী ছিলেন। হাসপাতাল দেখে ফিরবার মুখে দেখলুম গেটের কাছে এক বুড়ো মত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন—গলাবন্ধ কোট, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, হাতে একটা মোটা লাঠি, মাথাটা অল্প অল্প কাঁপচে (Palsy)। ডাঃ কুমুদশঙ্কর বললেন, ইনিই রায় বাহাদুর শশিভূষণ দে, হাসপাতালের বাড়ি তৈরি করতে ষাট হাজার টাকা দিয়েচেন। নমস্কার করলুম। বৃদ্ধ বললেন, শুধু হাসপাতাল দেখে গেলেই হবে না, আপনাকে উপরে গিয়ে আমার 'হেলেন লজ' দেখে যেতে হবে। বৃদ্ধের সঙ্গে উপরে চললুম। পথে যেতে যেতে বললুম, আচ্ছা রায় বাহাদুর, বাড়ির কাছেই যক্ষা হাসপাতাল করলেন, আপনার ইনফেকসনের ভয় নেই? বৃদ্ধ হেসে বললেন, ভয়? মৃত্যুর ভয়? কিন্তু আমার আর ক'দিন? আমার ত দিন গোণা হ'য়ে গেছে। লজ্জিত হলুম। মনে মনে বললুম, এমন লোকের কাছে মৃত্যুর কথা পেড়ে ভাল কাজ করিনি। পাহাড়ের মাথার উপর বিস্তৃত ভূখণ্ড—তেরো বিঘে জমি নিয়ে বৃদ্ধের সম্পত্তি। ক্রিসেনথিমাম, জেরেনিয়াম, কার্ণ, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলে এবং লতাপাতায় আলো হ'য়ে আছে। বৃদ্ধ বললেন, এই সমস্ত বাড়িটা কোন সৎকাজে দিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললুম, বলেন কি রায় বাহাদুর, সমস্ত বাড়িটাই দিয়ে দেবেন তবে আপনি নিজে থাকবেন কোথায়? বৃদ্ধ বললেন আরে আমার আবার থাকবার ভাবনা? আমার একটা কুঁড়ে ঘর হ'লেই হবে। আমি পাহাড়ের নীচে নেমে যাব। বিস্মিতই হলুম। তখনো জানি নে বৃদ্ধের দানের পরিমাণ কত। সেটা জানলুম 'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের একটা প্রবন্ধ প'ড়ে। সেই প্রবন্ধে ডাঃ রায় শশিভূষণ বাবুকে পাশ্চাত্য দেশের কার্ণেগী রকফেলারের সঙ্গে তুলনা করেচেন। রায় বাহাদুরের দানের পরিমাণ অদ্যাবধি ছয় কোটি পাউণ্ড। কলকাতায় বৌবাজারে ওঁর খরচায় দু'টো ফ্রি স্কুল চলচে। কার্সিয়াং-এ বাঙালীদের অ্যাসোসিয়েসানের বাড়ি তৈরি করতে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন— ওঁর স্ত্রীর নামে বাড়ির নাম রাজরাজেশ্বরী হল। যাদবপুরের যক্ষা হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার। এর বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভব নয় প্রয়োজনও নয় কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই রায় বাহাদুরের দান আছে। সেই কথাটাই সন্তর্পণে তুললুম। বললুম, আপনার এই দান আমাদের দেশের অন্ধ লোকের চোখ খুলে দেবে। একটা আশার আলোকে বৃদ্ধের মুখখানা দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। আবেগভরে বললেন, দেবে? তাই আপনি মনে করেন? আহা তাই হোক। আমার বড় দুঃখ যে লোকে আমার কাছে বড় কিছু চায় না, কেবল দু'টাকা চার টাকা চাইতে আসে। বুঝলুম নিজের সর্ব্বস্ব উজাড় ক'রে দান করার যে মহৎ তৃপ্তি এক মাত্র তাই এখন বৃদ্ধের কাম্য। পিতৃদত্ত হাজার টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে যে লোক একদিন জীবন সুরু করেছিলেন তিনি আজ ৬৯ বৎসর বয়সে কোটীপতি হ'য়ে জীবনের সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন। বারো বছর আগে জীবনসঙ্গিনী

স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেছেন—'হেলেন লজে' তাঁর শেষ শয্যা পাতা হ'য়েছিল ব'লে হেলেন লজ ছেড়ে বৃদ্ধ নড়তে পারেন না। এক মাত্র পুত্র পঁচিশ বছর বয়সে ইহলোক থেকে অপসৃত হয়েছেন। বৃদ্ধের এখন কেবলমাত্র বন্ধন তাঁর পুত্রবধূ। এই সব কথা ভেবে চোখ দু'টো জলে ভ'রে উঠছিলো—এমন সময় রায় বাহাদুর একটা সদ্যপ্রস্ফুটিত শুভ্র ডালিয়া ফুলের সঙ্গে একটা লতা জড়িয়ে আমার জামার বাটন্-হোলে পরিয়ে দিলেন। তাঁর নিরহঙ্কার শিশুসুলভ চিত্তের কাছে আমার মন আপনা আপনি প্রণত হ'ল। যতদিন না ফুলটি শুকিয়ে অব্যবহার্য্য হ'য়ে গিয়েছিল ততদিন সেটি ফেলিনি।

পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার আগে ভেবেছিলুম প্রকৃতিই বড়, বিশ্বজয়ী। পাহাড়ের থেকে নামবার মুখে ভাবতে ভাবতে এলুম, মানুষও কখনো কখনো প্রকৃতির চেয়ে বড় হয়—মহতো মহীয়ান্।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

জন্মাষ্টমী

শ্রীরসময় দাশ

কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীর দিক্‌স্তব্ধ ঘন অন্ধকারে
সেদিন দুর্য্যোগ নামে ভয়াতুর ধরণীর দ্বারে।
বর্ষে প্রলয়ের বারি, বজ্র এসে হাঁক্ দিয়ে যায়,
বিদ্যুৎ ধাঁধিয়া আঁখি জ্বলি উঠে দিগন্ত সীমায়।
ভীষণ ঝড়ের দাপে কাঁপে মুহু কংস কারাগার ;—
সে দুর্দ্দিনে হে কংসারি ! আবির্ভাব সহসা তোমার।

মিথ্যাময়ী পুতনার চূর্ণিবে যে অপূত-ছলনা,
দম্ভ শিশু-পালে নাশি' ধরিত্রীর ঘুচাবে বেদনা,
ভাঙ্গিবে যে কারাগার, ছিঁড়িবে যে শৃঙ্খল ভীতির,
ন্যায়ের রথের গতি রণক্ষেত্রে যে রাখিবে স্থির,
গোবর্দ্ধন যে ধরিবে, যে করিবে কালীয় দমন,—
দুর্য্যোগের অন্ধকারে নিঃশব্দে তাহার আগমন।

এমনি সে বার বার অন্যায়ের স্ফীত স্পর্দ্ধাতলে
উৎপীড়িত নিঃসহায় যখনি ভেসেছে অশ্রুজলে ;
যখনি ধর্ম্মের নামে চলিয়াছে মিথ্যা অনাচার,
দরিদ্রের অন্নগ্রাস কাড়িয়াছে দম্ভ অহঙ্কার ;
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃতের বিনাশ কারণ
যুগে যুগে ধরা তলে নেমে এস তুমি নারায়ণ।

দুর্দ্দিনে ঘনায়ে আসে আজি পুনঃ এদেশের 'পরে,
অন্যায় উন্নত শির অনুক্ষণ ফিরে স্পর্দ্ধা ভরে।
রন্ধ্রহীন কারাগারে মহাপ্রাণ ফেলে অশ্রুবারি,—
এখনো কি দীপ্ত রোষে নামিবে না সুদর্শনধারী ?
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের করিতে মুক্তি দান,
অবনত এ ভারত তোমারেই চাহে—ভগবান্।

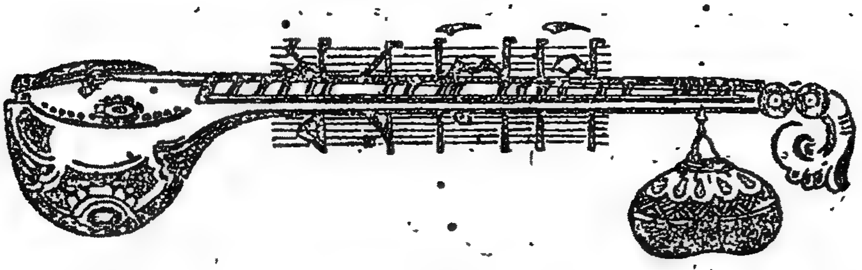

গ্রাম্য-গীতি

ভাটিয়ালী—কার্ফা

ওরে ভাই, রতনপুরের নাইয়া !
পঞ্চসারের গেরাম-চেন নাই !
যাও তো রে ভাই, মুন্সীগঞ্জের হাটে
রাম-পাইল্যা কলা-মূলা
কিইন্যা আন নাই !
শব্‌রী কলার রঙ্‌রে তাহার, কি সুন্দর গড়ন,
রাঙা-মূলার গাল দুইটা তার নীল শাড়ী পরণ,—

চাইয়া থাক্‌লে চোখের পানে
মন বিকাইয়া আইছ্‌ কান নাই !
আমি ভাই, সেই দ্যাশে গিয়া কাইন্দা যে মরলাম,
নয়া নাওখান বাইয়্যা থুইয়া সাগরে ভাইস্‌লাম,—
শিঁশিরে শয়ন রে যার সাগরে কিসের ডর
বল্‌তে পার নাই !
তুমি গেরাম চেন নাই !

কথা—শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়, বি.এ.   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সা সা সা রা I
ও রে ভা ই

II{ গা পা পা পধা | মা গা -া -া I গা মা পা পধা | গা পমা গা রগা I
র তন্ পু রের | নাই য়া ০ ০ | প ঞ্চ সা রের | গে রাম চে ন

সা -া -া -া | সা সা সা রা }I
নাই ০ ০ ০ | ও রে ভা ই

পধা ধা র্সা র্সা | না র্সা না ধনা I ধা পা -া -া | পা -া পা পা I
যাও তো রে ভাই | মু ন্সী গ ঞ্জের | হা টে ০ ০ | রা ম্ পাই ল্যা

পধা ধণা ধা পা | মা -া ধা পা I মপা গা -া -া | মপা গমা মা গা I
কং লাং মৃ লা | কি ০ ন্তা আ নং নাই ০ ০ | তুমি গে রাম চে

রগা সা -া -া | সা সা সা রা II
নং নাই ০ ০ | "ও রে ভা ই"

II পা গা পা পধা | ধা র্সা র্সা র্সা I র্সা র্রা র্রা র্রর্গা | র্সা -া -া -া I
শব্ রী ক লার | রঙ্ রে তা হার কি সু ন্দর গং | ড়ু ন্ ০ ০

পধা ধা র্সা র্সা | না র্সা নধা পা I না র্সা র্না ধনা | পা -া -া -া I
রাং ঙা মু লার | গাল্ দুই টাং তায় নীল্ শা ড়ী পং | র ন ০ ০

সা সমা মা মা | মা পধা পা মপা I গা -া -া -া | না র্সা না ধনা I
চাই য়াং থাক্ লে | চো খের পা ০০ নে ০ ০ ০ | মন্ বি কাই য়াং

পা পধা পা মপা | পা -া মা পা I গা গমা গা রগা | সা -া -া -া II
আই ছং জা নং | নাই ০ তু মি গে রাম চে নং | নাই ০ ০ ০

II সা সা মা মা | মা পধা পমা গা I মা পা ধা ধণা | পা -া -া -া I
আ ম্লি ভাই সেই | ভা লেং গিং য়া কাইন্ দা যে মর | লাং ০ ম ০

পধা ধা র্রা র্সা | না নর্সা নধা পা I পপা পধা ধণা ধণা | পা -া -া -া I
নং য়া নাও খান্ | বাইন্ ধ্যাং থুই য়া সাগ রেং ভাং ইস্ | লা ০ ম্ ০

র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সর্রা র্রর্গা র্সা -া I র্সর্সা র্সর্মা র্গা র্রর্গা | র্সা -া -া -া I
শি শি রে শ | য়ন রেং যা র সাগ রেং কি সের | ড ০ র ০

না র্সা না ধনা | পা -া মা পা I গা গমা গা রগা | সা -া -া -া II
বল্ তে পা রং | নাই ০ তু মি গে রাম চে নং | না ই ০ ০

একহাতি পাড়ি

শান্তি পাল

এই পুরাতন কায়দার একহাতি পাড়ি দীর্ঘপথ যাইবার জন্য উপযোগী। সাঁতারু নদীর মধ্যে বহু দূর-পথ গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, দেহ ভাসাইয়া এই পাড়ির সাহায্যে ধীরে তীরে উঠিতে পারেন। পূর্ব্বে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সাঁতারুগণ এক-হাতি পাড়ি ব্যবহার করিতেন। ইংলিশ-

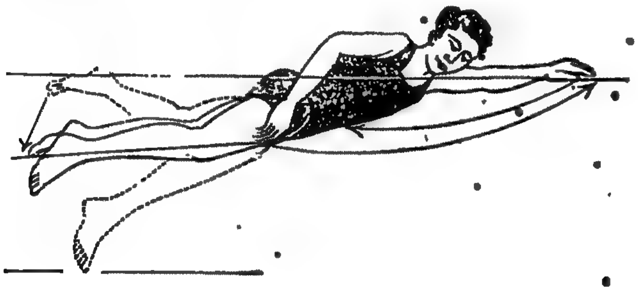

১নং

চ্যানেল-বিজয়ীগণ অনেকেই এই পাড়ির বলে সমুদ্রের মধ্যে অনায়াসে ঝড় তুফানের সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু ট্রাড্জান পাড়ির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা এক প্রকার অপ্রচলিত হইয়াছে।

এক-হাতি পাড়ি শিক্ষাকালে শিক্ষার্থী প্রথমত পায়ের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। যদি শিক্ষার্থীর ট্রাড্জান বা কাঁচি-পাড়ির সহিত পরিচয় থাকে, তাহা হইলে পায়ের উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রয়োজন নাই। এক-হাতি পাড়ির পায়ের ক্রিয়া ট্রাড্জান বা কাঁচি-পাড়ির অনুরূপ। যদি কাঁচিপাড়ির সহিত পরিচয় না থাকে তাহা হইলে পুষ্করিণী বা বাথের মধ্যে মঞ্চের যে কোন অংশ ধরিয়া, দেহ এক পাশে হেলাইয়া (চিত্র ১) সেই দিকে নীচের পা পিছনে যতদূর সম্ভব টানিয়া (চিত্র-২) অবস্থায় আসিবেন। এই ভাবে কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর পায়ের ক্রিয়া আয়ত্বের মধ্যে আসিবে। ইহা স্থলেও যে কোন নরম যায়গায় শুইয়া উপরিলিখিত নিয়মে অভ্যাস করা যাইতে পারে।

এইবার হাতের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পদ সঙ্কুচিত করিবার সময় যদি দক্ষিণ দিকে কাত হওয়া যায় অর্থাৎ বাম হাত উপরে থাকে, তাহা হইলে দক্ষিণ পদ পশ্চাতে টানিবার সময় দক্ষিণ হস্ত দ্রুত জলতলে প্রসারিত করিয়া পদক্ষেপণের সঙ্গে হাত টানিবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হস্ত মস্তকের সমান উচ্চতা হইতে ক্ষেপন করিবেন। এবং

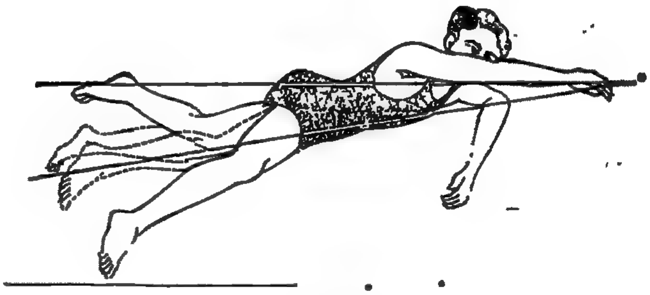

২নং

পা পুনরায় সঙ্কুচিত করিবার সময় বাম হস্তটি উরুর নিকট পর্য্যন্ত আনিবেন। এইভাবে এক হস্তে প্রশ্বাস গ্রহণ ও অপর হস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করা সমীচীন। জীবন রক্ষাকালে এই উপেক্ষিত পাড়ি সময় সময় কাজে লাগে।

এঁদের নিয়েই ঘটনা

[শব্দনাট্য—একাঙ্কে]

শ্রীহরকালী সেনগুপ্ত

পাঁচু—আর পাঁচজন বাঙ্গালীর মতই মসীজীবী যুবক।

রমা—এঁর বোন।

বৌদি—দ্ 'অনারি।

ক্যাস্তপিসী—নিত্য গঙ্গাস্নায়িনী ব্রাহ্মণ-বিধবা।

কেনারাম—উকীল শকুনিচাঁদ ভড়ের মুহুরী।

বেচারাম—"ভরাথমাথা এসিউরেন্স" বীমা কোম্পানীর দালাল।

মৌলবী কাজেমালি—"কদমতলা ডিসপেন্সারীর" সবেধন হোমিও চিকিৎসক।

নিমাই—ডাঃ শমনরাম দীর্ঘাঙ্গীর-কম্পাউণ্ডার।

গ্রহাচার্য্য—জ্যোতির্ব্বিদ্।

মিস্ টেলার—পেটেণ্ট ঔষধ হাটে মাঠে এবং বাড়ী বাড়ী ফিরি করেন এই ফিরিঙ্গী যুবতী।

ইভা—দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

মিলন, হাতী সিং, গোবর্দ্ধন—এঁরই সহপাঠী।

এঁরা ছাড়া আছেন—"কাফে দ্য ঘুলঘুলির" ম্যানেজার, বয়েরা, পাহারাওয়ালা ও ভিখারী।

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—ধর্ম্মতলার মোড়—ট্রাম, বাস, মোটার, সাইকেল প্রভৃতি অনবরত যাতায়াত করিতেছে।—"এক পয়সায় দশ রকম", "এ বাবী, একঠো পেসা", "সেণ্ট লিবে বাবেন—চার চার আনে শিশি—মজাদারী সেণ্ট—বয় খতম্ হোবে না" প্রভৃতি বিচিত্র ধ্বনিতে মোড় মুখরিত। গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ৫টা বাজিল।…

হঠাৎ হৈ হৈ শব্দ উঠিল—এক সঙ্গে মোটারের হর্ণ ও সাইকেলের বেল বাজিয়া উঠিল।]

কয়েকজন পথচারী (সমস্বরে)—"আরে, আরে,—রোকো, রোকো—ঐ গেল যাঃ—ঈ—ঈস"।

[একখানা মোটার দ্রুতবেগে চলিয়া গেল এবং "মাডগার্ডের" আঘাতে পাঁচু ছিটকাইয়া ফুটপাথের উপর পড়িল।]

ক্যাস্তপিসী—আহা হা—কার বাছা গো—একেবারে শেষ করে দিলে গো! নিব্বংশের পো'রা কলের গাড়ী চালিয়ে যাবে একবারে চোখের মাথা খেয়ে গো—আহা হা—কার সোণার বাছা গো।

কেনারাম—গাড়ীর নম্বরটা নোট করে নিয়েছি মশায়—সিক্স ফোর লট ওয়ান সেভেন (৬৪০১৭)। দিন মশাই ঠুকে পয়লা নম্বর কেশ্ (মামলা)। নগদ দশটি হাজার পাইয়ে দেব। বারের সিনিয়ার (প্রবীণ) উকীল মশাই,

শকুনিবাবু—শকুনিচাঁদ ভড়—বুঝলেন মশাই কেশটা (মামলাটা) তাঁর হাতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী বসে থাকুন গিয়ে—বাড়ী বয়ে সরকার বাহাদুর আপনাকে টাকা দিয়ে আসবেন। সেবার, বুঝলেন মশাইরা, মিরচাই-রাম ধনজিরিয়া গাড়ী করে ব্যারাকপুর রেসে যাচ্ছিলেন—

বেচারাম—রেখে দিন মশাই কেলেজিরিয়া তেজপাতরাম আর হলুদিয়া মেথিরাম—ওসব রান্নাবাড়ার কথা এখন থাক। দেখছেন না ভদ্রলোক কি রকম নিস্পন্দ হয়ে গেছেন—একেবারে অসাড়। নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক রকম জখম হয়েছেন। এঁর কথাই আপনাদের সকলের আগে ভাবা দরকার। খুব সম্ভব ইনি এঁর লাইফটা (জীবনটা) ইনস্যিওর (বীমা) করেন নি; কেননা ইনসিওর করলে জীবনে যে শৃঙ্খলা আর মিতব্যয়িতা আসে—যে সাবধানতা আসে—ইনি ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াতে সেগুলির অভাবই প্রমাণ করে। এই রকম একটা মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতে বসেছিল—ভাবুন দিথি এঁর স্ত্রী পুত্র পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা! কী ভীষণ!! "ভরাথ-মাথা এসিউরেন্সে" আমাদের 'পার্মানেণ্ট ডিসেবিলিটি স্কীমে' (চিরতরে বিকলাঙ্গতার প্রতিষেধক পরিকল্পনায়) একটা পলিসি (বীমাপত্র) এঁর আজই নেওয়া উচিত।

খুব কম খরচে এবং বেশী সুবিধায় এর চেয়ে আর ভাল দিশি কোম্পানী নেই। আজকালকার দিনে ভারতবাসী ভারতবাসীকে না রাখলে কে রাখবে? বল ভাই—'মহাৎমা গাঁধী কি জয়!'

[এক ক্ষীণ নিরুৎসাহ প্রতিধ্বনি শোনা গেল—মহাৎমা গাঁধী কি জয়।]

মৌলবী কাজেমালি—হঃ মশয়—আপনেরা লাগাইছেন কি কইবার পারেন? আদমিডা একেবারে খতম্ হৈয়া যাইবার লাগছে আর আপনেরা তার অসুধপত্রের বেবস্থা না কৈরা চাইর দিক থন হাল্লা করবার লাগছেন ক্যান্? ভিড়ডা ছারেন, ভিড়ডা ছারেন।...এট্টু পানি আর এক ডোজ (মাত্রা) ইগনেছিয়া ছিক্‌ছ (Ignatia 6) আনবার পারেন আপনেরা কেউ? আমি মৌলবী কাজেমালি, 'কদমতলা ডিছপেনছারির' হ্যাড (Head-প্রধান) ডাগদর।

ক্ষ্যান্তপিসী—ওগো বাছারা, তোমরা একটু সরে দাঁড়াও না গা। গঙ্গার থেকে নেয়ে ধুয়ে এলাম, আর রাস্তার মাঝখানে একি কাণ্ড! তা মা গঙ্গা মাথায় থাকুন। তোমরা বাছারা সরে দাঁড়াও ত একটু—আ মর মিনসে, তুই ঘাড়ের ওপর এসে পড়িস ক্যানে রাস্কেলা তোর মা বোনের ঘাড়ের ওপর পড়গে যা। এই ক্ষেন্তি বামনীর মুখ ছুটলে কারু সাধ্য নেই তার সামনে দাঁড়ায়—হাঁ। ভালয় ভালয় সরে যাও বাছারা। আমার কমণ্ডলুতে যে গঙ্গাজলটুকু আছে বাছার চোখে মুখে ছিটিয়ে ত দিই (তথা করণ)। বোধ হয় খুব বেশী জখম হয় নি। তোমাদের মধ্যে বড় পাশ করা ডাক্তার কেউ আছ নাকি গা?

নিমাই—এই যে আমি আছি। আমি হচ্ছি ডাক্তার নিমাইলাল পাত্র, সি, এফ (C. F.); বি, এন্, জি, এস্, (B. N. G. S.)—ডাঃ শমনরাম দীর্ঘাঙ্গী, এম্, ডি; এফ্, আর, সি, এস্, এর এসিষ্ট্যান্ট (সহকারী)। তা আমায় কি করতে হবে বলুন।

ক্ষ্যান্তপিসী—তা বাছা বলছ তুমি ডাক্তার—আমায় জিজ্ঞেস করছ কি করতে হবে? কি করতে হবে না হবে আমি তার কি জানি? তুমি এগিয়ে এস—এসে দেখ একবার। দেখে শুনে পরীক্ষে করে কি করতে হবে না হবে তা যদি বলতে না পার ত তুমি কিসের ডাক্তার—বোড়ার?

নিমাই—আহা হা—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। আমি যখন আছি তখন দেখে নেবো একবার যমই বা কে আর নিমাইলালই বা কে? দেখুন মশাইরা, সেবার আমার সিনিয়ার ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী অপারেশন (অস্ত্রোপচার) কর্লেন অতি সাধারণ এক এপেণ্ডিসাইটিসের (অন্ত্র প্রদাহের) রুগী কিন্তু এক মাসের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। শেষে ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী—ডাক্তার বলতে ভারতবর্ষে ওঁর জুড়ি নেই, একথা দু' বছরের ছেলেতেও জানে—তা ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী আমায় একদিন ডেকে বল্লেন, "নিমাই, তোমার সেই পেটেণ্ট অসুধ 'উল্লম্ফিন'টা একবার দিয়ে দেখ ত কি হয়।" বল্লে বিশ্বেস করবেন না হয়ত—সেই অসুধ পাঁচ ডোজ (মাত্রা) পড়তে না পড়তে সেই রুগী বিছানা ছেড়ে উঠে দুদিনের মধ্যে দৌড়ে বেড়াতে লাগল।

গ্রহাচার্য্য—এবম্প্রকার অলীক জল্পনায় কালব্যাজ করে কি ফল? মানবের সাধ্য কি দৈবের হস্ত হতে নিষ্কৃতি পায়? গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান ও গমনাগমন মনুষ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে—যথাশাস্ত্র, যথারীতি কুপিত গ্রহনক্ষত্রাদির শান্তির নিমিত্ত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী গ্রহাচার্য্যদ্বারা স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান কর্লে সুফল অবশ্য প্রাপ্য। আপনারা এবং খুব সম্ভবতঃ এই মৃতকল্প ভদ্রমহোদয় প্রাচ্যের এই অরিষ্টবিনাশিনী ক্ষমতায় সন্দিহান্। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে অধুনা আপনারা প্রাচীন অমূল্যসম্পদের অবহেলায় উন্মুখ। কিন্তু এক্ষণে আমার বাক্যের প্রমাণ উপস্থিত করি। এই ভদ্রযুবকের বৃহস্পতির উপর রাহু অর্দ্ধদণ্ডকাল অবস্থান করার ফলে এই দুর্ঘটনা। ইনি যদি আমার "সর্ব্বগ্রহকোপবিনাশিনী কবচ" ধারণ কর্ত্তেন, ত জীবনে এবম্প্রকার অপঘাতের হস্ত হতে পরিত্রাণ লাভ ত কর্ত্তেনই উপরন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীও অচিরে উহার উপর প্রসন্না হতেন। কবচটির মূল্য নামমাত্র। অর্দ্ধমূল্য কবচগ্রহণের সহিত এবং অপরার্দ্ধ ফললাভের সহিত দেয়।

মিস্ টেলার—What's up (কি হয়েছে)? Oh,

dear, dear (হায়, হায়)—an accident (দুর্ঘটনা হয়েছে)?

(পাঁচু চোখ মেলিল)

কয়েকজন (সমস্বরে)—এই যে চোখ মেলেছে।

পাঁচু—একটু জল।

মিস্ টেলার (নিমাইকে)—এ বাবু দেখো, জেরা সে পানি লাও। দেখো বাবু লোগ হামারা পাশ আচ্ছি আচ্ছি medicine—দাওয়াই হ্যায়। Price (দাম) ভারি Cheap (সস্তা)। হামার father (বাবা) —dear old thing (বুড়ো বেচারী)—ভারি ডাগদর থা। He was an assistant to the assistant of a Sub-Assistant Surgeon of an Extraordinary Emergency Hospital during the Great War। বহুৎ আচ্ছি দাওয়াই Prepare (তৈয়ার) করকে dad (বাবা) heavenly ঘরমে (পরলোক) গিয়া হ্যায়—Peace to his soul (তাঁর আত্মার শান্তি হোক)! আপলোক কুছু কুছু try (ব্যবহার) করে দেখতে পারে। এই Ointment (মলম) আছে—Accidentine—কুছু কাটা বা bruise (ছেঁচা) হোবে ত লাগিয়ে দিলে একদম আরাম পাবে (এটাসি কেস খুলিতে উদ্যত)।

[পাঁচু ততক্ষণ কিছু সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে]

পাঁচু (নিম্নস্বরে)—মরব ত মরব ফিরিঙ্গীর অষুধে মরব কেন? (উচ্চে) Thanks Miss awfully for your trouble (বহু ধন্যবাদ মহাশয়া আপনি যে আমার জন্ম কষ্ট করলেন তার বাবদ)। সামনের ডিসপেন্সারী থেকে খানিকটা টিংচার আইয়োডিন লাগালেই হবে বোধ হয়। (চলিতে উদ্যত)।

নিমাই ও কাজেমালি (সমস্বরে)—হাঁ হাঁ হাঁ করেন কি, করেন কি—

পুলিশ (ভারিস্বরে)—এৎনা লোক কাহে হিয়া ঝামেলা লাগাতা হ্যায়? এ বাবু লোগ তুম লোগ সব হঠ যাও। সার্জ্জেন্ট সাব দেখনেসে বহুৎ তকলিফ হোগা।

মৌলবী কাজেমালি—হঃ সরন লাগে এহন। পুলিশের হ্যাঙ্গামায় না থাকনই ভাল। [প্রস্থান]

গ্রহাচার্য্য (স্বগত)—অন্ত কবচ একটিও বিক্রয় হলনা। গ্রহাদি নিশ্চয়ই বিষমরূপে রুষ্ট। আশু বিশদ গণনা অত্যাবশ্যক। গ্রহকোপের উপর রাজরোষে পতনের সম্ভাবনা। এক্ষণে স্থান ত্যাগই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম।

(তথাকরণ)

পাচু—কি গেরো! (প্রস্থান)

মিস টেলার—I must now be off from these rabbles (ছোটলোকের ভিড়ের থেকে এখন স'রে যাওয়াই উচিত)।

কয়েকজন (সমস্বরে)—কেটে পড়া যাক বাবা। নৈলে রাজদ্বার এবং সেখান থেকে হয়ত সোজা শ্বশুরবাড়ী!

[দেখিতে দেখিতে ভিড় প্রায় সাফ]

বেচারাম—তোফা বাবা নিমাইলাল—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ। তোমার নামের শেষে সি, এফ (C. F.) টাইটেলটির (পদবীটির) মানে কি ধন?

নিমাই (গম্ভীর স্বরে)—কম্পাউণ্ডারী ফেল (কেনারাম ও বেচারামের হাস্য)।

কেনারাম—আর বি, এন, জি, এস (B. N. G. S)?

নিমাই (পূর্ব্ববৎ)—বিলেত না গিয়ে সাহেব (উচ্চহাস্য)।

—পটপরিবর্ত্তন—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—"কাফে ডা বুলবুলি"—নৈশ আলোকে 'কাফে' উদ্ভাসিত—আহার্য্য পাত্রাদির টুংটাং শব্দ ও অরকেষ্ট্রার মৃদুরব ভাসিয়া আসিতেছে—মধ্যে মধ্যে "এই বয়, একঠো অরেঞ্জ স্কোয়াশ লাও," "ইয়ে ডিসঠো লিয়ে যাও বাবা, মাজাতা রাজার রয়াল ডিনারের (রাজভোগের) ডিস (খাবার) হেথা কেন যাদুমণি?" ইত্যাদি শব্দ শোনা যাইতেছে।—এক টেবিলে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ইভা ও তাহার সহপাঠী মিলন ও হাতীসিং বসিয়া আইসক্রীমের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।]

হাতীসিং—মিস্ চৌধুরী, আপনার জন্যে আউর খানিকু আইসক্রীম অর্ডার (হুকুম) দিই?

ইভা—Thanks, no (ধন্যবাদ—না)।

[ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে ৬টা বাজিল]

মিলন—কৈন্দ্রুর আক্কেলখানা একবার দেখলেন, মিস্

চৌধুরী ? ছ'টা বেজে গেল—এখনও বাছাধনের টিকিটির দেখা নেই। অথচ কাল "ছন্নিৎ-সঙ্ঘের" বার্ষিক অধিবেশন। দক্ষিণদিকের বারান্দা আর গেটের (ফটকের) ভলান্টিয়ারদের চার্জ্জ (ভার) দেবার মত লোক ফৈজু ছাড়া আর কাউকেই খুঁজে পেলেননা আপনি, মিস্ চৌধুরী ? আজ ঠিক হয়ে যাবে কাকে কোথায় রাখতে হবে—ছ'টা কোন কালে বেজে গেল—হুঁঃ! এরকম দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোক নিয়ে আপনার চলে কি করে, মিস্ চৌধুরী ?

ইভা—যা বলেছেন মিলনবাবু। আমিও মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য যে না হই তা নয়! তা দক্ষিণটা বাদ দিয়ে অন্য তিন দিকের বন্দোবস্ত হয়ে যাকনা কেন ?

হাতীসিং—বাঃ তা কি কোরে হোতে পারে ? মিঃ প্যাটাক্‌ও গরহাজির যে।

ইভা—হ্যাঁ, তাও ত বটে। গোবর্দ্ধনবাবুরও Percentage নেই (অনুপস্থিত)। ত ওঁরা বোধ হয় আরও Attractive metal (শক্তিশালী চুম্বক)এর পাল্লায় পড়েছেন!

হাতীসিং—মাফ্ কোরবেন, মিস চৌধুরী—আপনার সাথে একদিল হোতে পারলামনা। (জনান্তিকে) এখানকার Magnet(চুম্বক)এর চেয়ে Strong field—মানে জোরালো টান—আউর কোথা আছে তা মানিনা।

ইভা—ধন্যবাদ, মিঃ হাতীসিং, আপনার প্রশংসার জন্যে। আপনাকে কি পুরস্কার দিই ? আমার আইসক্রীমের খানিকটা দেব ?

হাতীসিং (জনান্তিকে)—এঁ হেঁ হেঁ—আপনাকে পরশংসা কোরে উঠতে প্রারি এমন শক্তি হামার নাই। (উচ্চে) Thanks (ধন্যবাদ)—আমাকে আইসক্রীম লাগবেনা। (নিম্নস্বরে) তবে যদি মেহেরবাণি কোরে আপনার একটো ফোটো—

ইভা (জনান্তিকে)—ছিঃ, মিঃ হাতীসিং, আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এমন অজ্ঞানের মত কথা বলছেন ? ফোটো ত ছায়া—Material (স্থূলবস্তু) ত নয়। তার চেয়ে আমার মাথার একগাছি চুলও যে বেশী করে আমার মনে পড়িয়ে দেবে!

হাতীসিং (জনান্তিকে)—খুব ভালো হোবে—Thanks awfully (বহুৎ ধন্যবাদ)।

মিলন (বিরক্ত হইয়া)—যেমন ফৈজু, তেমনি গোবর্দ্ধন—এ বলে আমায় দ্যাখ ওবলে আমায় দ্যাখ।

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন—আরে দেখব কি ব্রাদার ?—ফৈজুর মুখ কি আর তোমরাও দেখতে পাবে ?

সকলে (সচকিত) কেন, কেন—কোনও Accident (দুর্ঘটনা) নাকি ?

গোবর্দ্ধন—গুরুতর রকমের।

ইভা—গোবর্দ্ধন বাবুর এক একটি বাণী যেন স্যাকরার হাতের এক একটি থানমোহর—টিপে টিপে ছাড়ছেন!

গোবর্দ্ধন—ব্যস্ত হবেন না, মিস্ চৌধুরী। আপনার কৌতূহল এবং বন্ধুবর্গের উদ্বেগ এখনি শান্ত করছি। আজ ভোরে ফৈজুর টাকার আণ্ডিল বাবাটি সশরীরে দেশ থেকে ফৈজুর মেসে এসে হাজির বিনা নোটিশে। আপনাদের সবার মনে আছে ফার্ষ্ট ইয়ারে (প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে) ফৈজুর একটা ভ্রমকালো "সুরেন বন্দ্যো, সুরেন বন্দ্যো" চেহারা ছিল। ক্ষৌরকার্য্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে ও একেবারেই সচেতন ছিল না। আজ সকালে ফৈজুর চাঁদপানা মুখ দেখে বুড়ো ভড়কে গেছে। প্রথমে প্রশ্ন—পরে সপ্তমে গালাগালির ফোয়ারা এমনি ছোটালে বুড়ো যে মেসের শাবকেরা সেখানে কাতারে কাতারে জড়োত হলই শেষে রাস্তার ভিড় ঠেকাতে পুলিশ কমিশনারকে আর একটু হলে ১৪৪ ধারা জারী করতে হয়েছিল আর কি!

হাতীসিং—তারপর, তারপর ?

গোবর্দ্ধন—তারপর বুড়ো ফৈজুকে মালপত্তর শুদ্ধ নিজের কলুটোলার বাড়ীতে এনে মাল পত্তরের সঙ্গে একঘরে বন্দী করে সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে দিচ্ছে না।

মিলন—কী সর্বনাশ! কাল বার্ষিক অধিবেশন, আর আজ এই কাণ্ড!!

ইভা—আপনি এ খবর পেলেন কি করে গোবর্দ্ধন বাবু ?

গোবর্দ্ধন—এখানে আসবার মুখে ফৈজুর রুমমেট (একঘরের বাসিন্দা) কামালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তারই শ্রীমুখপ্রসাদাৎ।

ইতা—তা চায়ের সঙ্গে ফেঙ্গু সিনিয়ারের (বাবার) বিশদকীর্ত্তি আরও ভাল করে উপভোগ করা যাবে বোধ হয়।

হাতীসিং—Oh, yes (ঠিক)। এই বয়, আঁভি চারঠো ছোটা হাজরী লাও।

(একটা গোলমালের শব্দ)

মিলন (গলা বাড়াইয়া)—আরে কিছুক্ষণ আগে যে ভদ্রলোক ধর্ম্মতলার মোড়ে মোটার চাপা পড়েছিলেন তাঁর মত দেখছি যে! ব্যাপার কি?

পাঁচু—কী মুস্কিলেই পড়া গেল! আমার কথাটা শোনা তোমরা কেউ দরকার মনে করনা নাকি? ওহে, আমি মফঃস্বলের আমদানি কাঁচা মাল নই।

১ম বয (জনান্তিকে ২য় বয়কে)—একথা সবাই বলে থাকে, নয় রে পুঁটে? কাপড়ে জামায় জায়গায় জায়গায় ধুলোর চাপ্টা—কপালে কেটে গিয়েছে—হয় গুণ্ডার হাতে মার খেয়েছে, আর না হয় গাড়ী চাপা পড়েছে। অথচ পোষাকে জৌলুষ আছে—পাড়াগেঁয়ে কাপ্তেন না হয়েই যায় না। (উচ্চে) আজ্ঞে না, না—সে কি কথা! আপনি আমাদের "কাফের" বরাবরের খদ্দের। তবে পুরাণো খদ্দের বলেই বলছিলাম যে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা লেমন স্কোয়াশ এনে দেব স্যার?

২য় বয়—আপনাকে ভারি কাহিল দেখাচ্ছে স্যার—লেমন স্কোয়াশের পর কিছু পুডিং আর এক কাপ চকোলেট—

১ম বয়—সঙ্গে চৌ চৌ আর চিংড়ির কাটলেট—

২য় বয়—চপ আর ডবল ডিমের মামলেট—

পাঁচু (স্বগত)—এ দু' ব্যাটার মুখের পচা ইঁদুরের গন্ধে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে। "কাফেতে" ঢুকে কি গোখুরিই করেছি! Accident-এর (দুর্ঘটনার) পর সোজা বাড়ী ফিরে গেলেই হত—না অফিসের পর ক্ষিদের মুখে মরতে ঢুকলাম এই কাফেতে। (উচ্চে) ভ্যাখ—

১ম বয়—এমন ফাষ্টো কেলাস কাটলেট স্যার—

২য় বয়—আমাদের "কাফের" মামলেট, স্যার, কোলকাতায় কে না জানে?

পাঁচু—আচ্ছা, দেখ—

["আচ্ছা" বলিতে না বলিতে দু'জনই দৌড়াইল। "দেখ" শুনিয়া ২য় বয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁ স্যার?]

বলছিলাম কি এক কাপ চা, চার টুকরো রুটি আর আধ প্লেট ফাউলকারী (মুরগীর মাংস) হলেই চলবে।

২য় বয়—এখুনি এনে দিচ্ছি, স্যার। [প্রস্থান]

(কাটলেট ও "স্কোয়াশ" লইয়া ১ম বয়ের প্রবেশ)

১ম বয়—এই আপনার চিংড়ির কাটলেট আর লেমন স্কোয়াশ স্যার!

(তাড়াতাড়ি টেবিলে রাখিতে গিয়া "স্কোয়াশ" খানিকটা চল-কাইয়া পাঁচুর গায়ে পড়িল।)

পাঁচু—অ্যা হা হা—দিলে ত লেমন স্কোয়াশ ফেলে জামাটা নষ্ট করে? চোখে কি দেখতে পাওনা হে?

১ম বয় (স্বগত)—ধুলোর চাপ্টা "স্কোয়াশে" খানিকটা তবু সাফ হল—আবার তম্বি! (উচ্চে) ভারি অন্যায় হয়ে গেছে স্যার মাপ করুন।

(ইতিমধ্যে রুটি ও "কারী" লইয়া ২য় বয়ের প্রবেশ)

২য় বয়—আপনার টোষ্ট আর ফাউলকারী স্যার। (১ম বয়ের প্রতি) ওরে নেপা, চা' টা নিয়ে আয় গিয়ে।

১ম বয়—যাই। [প্রস্থান]

২য় বয়—দেখুন, লজ্জা করবেন না স্যার—চেয়ে চিন্তে নেবেন। আপনাদেরই জিনিষ।

পাঁচু—তোমরা যে রকম লাগিয়েছ—অন্যের বলে ভুল করে কার সাধ্য? দেখ, এত খাবার মানুষে খেতে পারে?

২য় বয়—এ আর কি স্যার? বাজারের সেরা জিনিষ স্যার—খেলে অসুখ করবে না—আর ভারি সস্তা। আপনি দামের জন্যে কিছু ভাববেন না স্যার।

পাঁচু (কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে)—না, না সেজন্য নয়—আচ্ছা, থাক।

[১ম বয়ের চা লইয়া প্রবেশ]

১ম বয়—এই, স্যার, আপনার চা।

[আলাপের মৃদু গুঞ্জন পাত্রের এবং অরকেষ্ট্রার মৃদু রবের সহিত ভাসিয়া আসিতেছে।]

পাঁচু—বয়, আমার বিল?

১ম বয়—এই যে স্যার। (বিল প্রদান)

পাঁচু—কত? দেড় টা—কা? (স্বগত) ব্যাটারা কসাই—একটা কাটলেট, একটা লেমন স্কোয়াশ, এক কাপ চা, চারটুকরো রুটি আর আধ প্লেট "কারি"—দেড় টাকা? (উচ্চে) আচ্ছা, এই নাও। (পকেটে হাত দেওয়া) একি? বুক পকেটে আমার "পার্স" (টাকার খুঁতি) ছিল?

[ক্রমে ক্রমে একে একে সমস্ত পকেটেই হাত পড়িল কিন্তু টাকার সন্ধান মিলিল না। আসন্ন বিপদ সম্ভাবনার চিন্তায় পাঁচুর রক্তের চাপ বাড়িবার উপক্রম হইল।]

(রুদ্ধ স্বরে) এঁ্যা—আমার "পার্স"? আমার মণি-ব্যাগ কোথায় গেল?

১ম বয় (কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে) বাবু, বিলটা?

পাঁচু—এঁ্যা, হ্যাঁ, তা দেখ—

১ম বয়—অমন ঢের দেখেছি মশায়—বিলটা চুকিয়ে দিন ক্যাসিয়ারের কাছে জমা দিয়ে আসি।

পাঁচু—হ্যাঁ, শোন ভাই—আজ কিছুক্ষণ আগে ভিড়ের মধ্যে পড়েছিলাম। সেখানে বোধ হয় কেউ পকেট কেটে—

১ম বয়—এখন ভাই বেরোদায়—সবই হব। তা অনেক কাতো বাবুরই পকেট গুণ্ডায় কাটে জানি।

পাঁচু—কি বল্লি, ইষ্টুপিড্?

১ম বয়—খবরদার গাল দিওনা বাবু—অমন বাবু ঢের ঢের দেখা আছে। হয়েছে কি? বিলের টাকা ফেলে সোজা চলে যাও—তোমার গালাগালির ধার কে ধারে?

পাঁচু—দেবনা টাকা, কি কর্ত্তে পারিস্?

১ম বয়—ও! সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না!! তা তোমার মত খদ্দের অনেক ঠেঙ্গা করেছি। (একজন বয়কে) এই মকবুল, তুই এখানে দাঁড়া। দেখিস্ বাবু যেন পয়সা না দিয়ে না পালায়। আমি ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে আনি।

মিলন—কি হয়েছে মশাই?

পাঁচু—দেখুন না মশাই—কিছুক্ষণ আগে ভিড়ের মধ্যে থেকে এক পকেটকাটা আমার মণিব্যাগ সরিয়েছে—জানতেও পারিনি। এখন বিলটা মেটাতে গিয়ে দেখি—

[১ম বয়ের সহিত ম্যানেজারের প্রবেশ]

১ম বয় (পাঁচুকে দেখাইয়া)—এই বাবু।

ম্যানেজার—কী হইয়েসে, বাবুজি?

পাঁচু—দেখুন ম্যানেজার মশাই—

ম্যানেজার—'মোশা' নেহি, 'সাব্' বলিয়ে।

পাঁচু—বেগ ইওর পার্ডন (মাপ করুন) তা বলছিলাম কি ম্যানেজার সায়েব—কিছু আগে ভিড়ের মধ্যেমে গিয়ে পড়ে আমার মণিব্যাগঠো খোয়া গিয়া হ্যায়। বোধ হয় গাঁটকাটাতে পকেট মার দিয়া। আগে পকেটে হাত দিতে ভুল গিয়া—তা বিল চুকোতে গিয়ে যেই খোঁজ লাগায়া হ্যায়—অমনি ধরা পড়া হ্যায়।

ম্যানেজার—বাবু, Its an old game (এটা পুরাণ খেলা)। আপ একঠো জোয়ান মরদ চালাক আদমি আছে—পাকিট মার দিয়া তো আপকো একদম মালুম হুয়া নেহি? ইয়ে বড়ি তাজ্জব কি বাত! বিলটা মিটাইয়া দিয়ে চলিয়ে যান।

পাঁচু—আমি কি মিছে কথা বোলতা হ্যায়? (পকেট উল্টাইয়া) এই দেখ একটি পয়সাও নেই।

ম্যানেজার—তব হামি কি করবে? আপকো কোটটো হিঁয়া ছোড়কে যানে হোগা। রুপয়ে লে আনে সে ফিন ইয়ে কোট মিল যায়গা।

পাঁচু—তার চেয়ে বরং একটা লোক আমার সঙ্গে দাও। আমি বাড়ী থেকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানেজার—এৎনা ফালতু আদমি হিঁয়ে নেহি হ্যায়। আপনি কোট দিবে কি না?

পাঁচু—না।

ম্যানেজার—এ নেপু, এ মকবুল, এ পুঁটিয়া কোটটো ছিন লো।

(মহা গণ্ডগোল ও ধস্তাধস্তি—কয়েকখানা চীনামাটির বাসন ও কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গিল—চেয়ার উল্টাইয়া পড়িল—দুই চারিটা চড় চাপটের শব্দও শোনা যাইতে লাগিল)

ইভা—এইও বয় লোগ—তুম লোগ বাবুজিকো ছোড়্ দো।

(গণ্ডগোল ক্ষীণ হইল)

মিলন—ম্যানেজার সায়েব, আমি নিজের চোখে দেখেছি যে প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে এই ভদ্রলোক ধর্ম্মতলায়

মোড়ে মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। কপালে প্লাষ্টার আর কাপড়ে জামায় ধুলো দেখেও বুঝছেন না? সেই সময়েই খুব সম্ভব ওঁর পকেট মারা গিয়ে থাকবে।

গোবর্দ্ধন—দেখ ম্যানেজার ধন, এই বাবুটি খুব সম্ভব মফঃস্বল থেকে কোলকাতায় এই সবে নতুন এয়েছেন। তাই গাড়ী চাপা, পকেট কাটা মায় তোমার বয়গুলোর হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ কোনোটাই ভদ্রলোকের বাকী রইল না। তা হাজামাটা না বাধিয়ে আমরা পাঁচজন বাঙ্গালী ছিলাম—আমাদের জানালেও ত পারতে? কত বিল হয়েছে এঁর?

১ম বয়—দেড় টাকা?

ইভা—এই সামান্য ক'টা পয়সার জন্যে এত কাণ্ড! বলিহারী! (হ্যাণ্ডব্যাগ খুলিয়া) এই নাও (প্রদান)। আর আমাদের বিলটাও দাও। এই 'কাফে' যাতে ছাত্রমহল বয়কট (বর্জ্জন) করে তার ব্যবস্থা করব। তোমাদের হোটেলওয়ালাদের কিছু ভদ্রতা শেখানো দরকার।

—পট পরিবর্ত্তন—

পথে ভিখারী

গান

পয়সার গোলে বাঁধে যত গোল—
ধরাখানা তত শেখায় ভুগোল।
থাকিলে অর্থ ঘটে অনর্থ
শাস্ত্র ব'লন বটে—
পয়সা বিহনে বিপদ দ্বিগুনে
(তবে) চেনা যায় আশু সকলের খোল।
হায়রে পয়সা টাকাটা সিকেটা—
উচ্ছন্নে দিস মাটিটা ভিটেটা।
তোরি তরে আমি দিনমান যামী
ঘুরে মরি পথে পথে
তবু কিযে হয়ে ধরা নাহি যায়
দিস তুই ফাঁকি আমি খাই খোল।

—পট পরিবর্ত্তন—

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান—পাঁচুর বাড়ী—মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যে মধ্যে রাজ পড়ার শব্দ।...রমা পাঁচুর বোন—অর্গানে বসিয়া সুরে বেসুরে আওয়াজ তুলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সুরে বেসুরে গানও ধরিতেছে—"নয়নে বাদল, গগনে বাদল, হৃদয়ে বাদল ছাইয়া", "এমন দিনে তারে বলা যায়।" "কোলকাতারি নোনা জলে বন্ধু মরেছে" ইত্যাদি। এদিকে রমার বৌদি উল দিয়া ছেলের জন্য একটি জামা বুনিতেছেন। সুরে বেসুরে গানে ও বাজনায় বোনার ঘর ভুল হইয়া যাইতেছে আর তিনি বিরক্ত হইয়া রমাকে বকিতেছেন।)

বৌদি—ছাখ রমা—রাক্ষুসি, বাজনা, গান থামা। না হলে দেখবি মজা! তোর জ্বালায় এই নিয়ে তিনবার উলের ঘর ভুল হোলো।

রমা (প্রাণপণে)—"সখিরে, কি কহব মোর দুখের নাহিক ওর, ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

বৌদি—কের? (হাসিয়া ফেলিয়া) ওগো বিরহিণী, আর প্রাণবিটকেল সুরে আক্ষেপ জানাতে হবে না। তোমার শূন্য মন্দির কবে পূর্ণ হোতো! তোমার বি এ পাশের জেদের জন্যেই ত সেটা স্থগিত রয়েছে। তা হাতের কাছে ত তোমার সাড়ে বত্রিশ কোটি রয়েছেন—কোনটি পছন্দ হয় বল। আমরা যোগাড় করি।

রমা (নাটকীয় সুরে—হাত জোড় করিয়া)—হে পিতঃ যে অভাগিনী একটা অতি সহজ পদের অর্থ বোধ করিতে অক্ষম—যে হতভাগিনী থার্ড ক্লাশে ফেল করিয়া একেবারে বিয়ে পাশ করিয়া বসিয়াছে—যে নারিকেলমুখী "দুখের ওর"কে "দুধের ওর" বলিয়া ভুল করে—কাব্য ও কবিতা, গান ও বাজনা সম্বন্ধে যে শঙ্খমুখীর ধারণা মাত্র উলবোনায় পর্য্যবসিত, হে প্রভু, তাহাকে ক্ষমা কর।

বৌদি—আ-মেন। ছাখ লো রায়বাঘিনী, কবিতা বুঝি আর না বুঝি—তোর অবস্থাটা এখন—

সত্য কথা সরল ভাবে শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কিনা
বুঝবো কেমন করে?
মিথ্যা ছলে তাই শুনিয়ে দিয়ে যাই;
উল্‌টা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই।

রমা (গম্ভীরভাবে)—হুঁ! তাই ত বলি আজ মাসখানেক ধরে আমার "চয়নিকা"খানা পাওয়া যাচ্ছে না

কেন ? তা থার্ড ক্লাশের পত্র বিছে ত অনেক দুর এগিয়েছে ! প্রাইভেট পড়ার এমনি গুণ !

বৌদি (হাসিয়া)—ত তুই ত আর পড়লিনি, না হলে তুইও কোনকালে পুঁথিলেপা ডাক্তার ফাক্তার হয়ে যেতিস্। মাষ্টার পাকা হলে ভাবনা কি ? [ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে দশটা বাজিল] ঠাকুরপো'র আজ হোলো কি ? সেই সাত সকালে দুটি ভাত নাকে মুখে গুঁজে আপিসে গেছে—এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই !

রমা—পাঁচুদা বোধ হয় আপিস থেকে সোজা সিনেমায় ঢুকে পড়েছিল—তারপর আর বাদলার ধাক্কায় বাড়ী পৌছে উঠতে পারে নি। (অর্গানে গান ধরিল)।

শাওনে—

বৌদি (রমার পিঠে ভম্ করিয়া একটি কিল মারিয়া) —রাক্ষুসী খালি "শাওনে" আর "বাদলে" করে জ্বালিয়ে মারছে। এত করে বলছি আমার এই কয় ঘর বোনা শেষ করে দে, কিছুতেই সে কথা শোনা হচ্ছে না ?

গান

রমা—

শাওনে ঘনঘটা গগনে।
আঁধিয়া বনপথ গিয়েছিল বন্ধুর
দামিনী চমকিছে সঘনে।
ছল ছল কলকল চঞ্চল নদীজল
ব্যাকুল সাগর গমনে—
ঝিঝি ঝিঝি ঝির ঝির বরিষে নীরদ নীর
শ্রান্ত পবন নত শয়নে।
কোথা তুমি কত পথ, অপূরিত মনোরথ—
বাধা হে দুর্ব্বল চরণে।
কৈতব পরিহরি অনুগতে দয়া করি
লহ লহ তব সদনে। *

[সহসা দরজায় করাঘাত। পাঁচুর গলা শোনা গেল— "ভজা, দরজা খোল্।"]

বৌদি (হাসিয়া)—ঐ "সদনে" নেবার জন্যে সে এসেছে। [রমা বৌদির পিঠে কিল মারিল]

বৌদি—উঃ।

রমা—মরণ আর কি ? (উচ্চে) ভজা মেজবাবুকে দরজাটা খুলে দে।

[পাঁচুর প্রবেশ]

বৌদি—একি ঠাকুরপো, একি দশা হয়েছে তোমার ? কপালে প্লাষ্টারই বা কেন, আর ভিজে নেয়েই বা এলে কোত্থেকে ? কোলকাতার সহরে কি হঠাৎ গাড়ীর অভাব ঘটল ?

পাঁচু—বলছি, বলছি, সব বলছি বৌদি। আপাততঃ আমায় একখানা শুকনো কাপড় আর একটা গেঞ্জি ফরমাস কর।

বৌদি—যাই ভাই। [প্রস্থান]

রমা—সত্যি, দাদা এই দুরন্ত বিষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে আসার দুর্ভোগ ভুগবার কি দরকার ছিল ?

পাঁচু—দুর্ভোগ আজ সকাল থেকেই চলছে, রমা। সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে রক্তারক্তি। আপিসে একটা সামান্য ভুলের জন্য বড়বাবু ভদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম কর্ত্তে দ্বিধা না করে আমায় পাকে প্রকারে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর শালাটি আপিসে দু'মাস বিনা মাইনেতে খেটেছে। এখন তার একটা মাইনে-করা কাজের দরকার। এমনি ভুলচুক আর হলে আমার পথ দেখতে হবে। ছুটির পরে রাস্তায় বেরিয়ে মোটার accident এর হাত হতে বড় জোর বেঁচে গিয়েছি। (কপালের প্লাষ্টার দেখাইয়া) এই কপালে তার চিহ্ন ত্যাখ। তারপর খিদের জ্বালায় এক রেস্তর'াতে ঢুকে খেয়ে বিল মেটাতে গিয়ে বেইজ্জৎ। গুণ্ডায় কোন সময়ে আগেই পকেট মেরে দিয়েছে টেরও পাইনি। বহুকষ্টে রেস্তর'া থেকে ছাড়ান পেয়ে মেঘ দেখে এক রিক্সায় চাপলুম। বাড়ীর কাছে রাস্তায় প্রায় কোমর জল। রিক্সার পর্দ্দা ফেলে বিষ্টি আটকাবার অক্ষম চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তে আসছিলাম—হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় রিক্সা উল্টে ফেলে দিল। ফলে রাস্তার পবিত্র ড্রেণের জলে হল আমার অবগাহন। একদিনে এই নিরীহ বাঙালীর বরাতে এতগুলি রোমাঞ্চকর রোমান্স কেন যে ঘটে গেল—

বৌদি (দরজার নিকটে)—ঠাকুরপো, এই তোমার ধুতি আর গেঞ্জি। (উচ্চে) ওরে ভজা, ষ্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চড়া। উনুনত নিভে গেছে আজ আর জ্বালবার উপায় নেই। ঘুঁটেওয়ালী আজ ঘুঁটে দেয়নি—আজ বিষুৎবার।

পাঁচু—ও—

(যবনিকা)

শ্রীহরকালী সেনগুপ্ত

* হেমচন্দ্র সেন বিরচিত

মরমী শরৎচন্দ্র

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-এ

শরৎপ্রতিভা মানুষের মধ্যে অপরূপের সন্ধান পেয়েছে। জীবন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী মিষ্টিকের। তিনি মরমী ঔপন্যাসিক। এখানে মিষ্টিক শব্দের মানে এই নয় যে শিল্পী মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে জীবন বলা হয়, সেই সীমার বাইরে গভীরতর একটা ক্ষেত্র আছে,—সৃষ্টিলীলার মধ্যে ফল্গুধারার মত এক বিরাট শক্তির প্রবাহ রয়েছে, তার সন্ধান আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যায় না, মানুষের গতিবিধি, কাজকর্মের উৎস হিসাবে অন্তরের অন্তস্তলে এমন একটা নিয়ন্ত্রক-শক্তি আছে, তা অতীন্দ্রিয় লোকের, তার বিচার বুদ্ধি দিয়ে না করা গেলেও সেই শক্তিই মানুষকে জীবনের বিচিত্রক্ষেত্রে চালায়—দুর্গম থেকে দুর্গমতর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস দেয়, মূলত এই বিশ্বাস যার আছে তাকেই মিষ্টিক বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র মানুষের মনে এই অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি-করা নরনারী মূলতঃ পুরোতন জগতের লোক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে, বিশেষতঃ যুদ্ধের পরে আমাদের দেশে সহরকে কেন্দ্র করে যে একটা উপসমাজ গড়ে উঠেছে তার গার্হস্থ্য ও সমষ্টিগত জীবনের আদর্শ, প্রেম ও স্নেহ সম্বন্ধে ধারণা ঠিক পুরোতন সমাজের অনুযায়ী নয়। শরৎচন্দ্রের চরিত্রেরা ঠিক এ যুগের মানুষ নয়। এমন কি "চরিত্রহীনে"র সরোজিনী বিলেত ফেরতের বোন এবং পোষাকে আচারে ব্যবহারে ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন হলেও তার মন ছিল পুরোতন জগতের। সে জগতের জীবনের আদর্শ সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামকে কেন্দ্র করে। তখন মানুষ গার্হস্থ্যজীবনের স্নেহপ্রেমের আবেষ্টনকে পূর্ণ আশক্তির সঙ্গে চাইত, জীবন সম্বন্ধে তাদের একটা সন্দেহাকুল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। তাঁদের মূল আদর্শ ছিল সমাজ প্রথম, ব্যক্তি দ্বিতীয়। তাই দেখা যায়, মা যেন নিজের চেয়ে সন্তানের জন্যই জীবন ধারণ করতেন, স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা করতেন না, পুরুষ ভাবতেন ব্যক্তিগত ভোগের চেয়ে একটা বৃহৎ সংসারের কর্তা হওয়াই জীবনের আদর্শ। জীবন সম্বন্ধে—এবং পরজীবন সম্বন্ধেও তাঁদের একটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই জীবনে যা পাওয়া গেল না তার জন্য তারা যেমন দুঃখ পেতেন, না-পাওয়াকে লাভ করার জন্য ত্যাগ স্বীকারেও তেমনি তাঁদের ছিল উৎসাহ। কারণ, এ জন্মে না পেলেও যথাযোগ্য ত্যাগের দ্বারা অন্য কোন জন্মে তা পাওয়া যাবে—এ বিশ্বাস ছিল তাঁদের মনে দৃঢ়। আজকের জগতের আদর্শ যেন একটা আসক্তি-শূন্যতার আদর্শ। জীবনে যা পেতে চাও তা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, না পেলে দুঃখ নেই কারণ ইহ সংসারে সব কিছু পাওয়া যায় না। জীবনের মধ্যে জড়িয়ে পড় না। ত্যাগ আদর্শ নয়, ভোগের আদর্শে জীবনকে গ্রহণ কর, জীবনের মধু লুটে নাও। মহাযুদ্ধের পরে আমাদের নতুন গড়া আদর্শের মূলে এই রকম একটা ভাবধারা আছে বলে মনে হয়। কোন আদর্শ ভাল বা মন্দ, সে বিচার এখানে অবান্তর। নানা কারণে আদর্শের একটা পরিবর্তন হয়েছে, শুধু তাই আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। বলা বাহুল্য সকল যুগেই নানা আদর্শের মানুষ থাকে এবং কোনযুগেই কোন একটি আদর্শধারা কোন মানুষ পুরোপুরি মানতে পারে না। তবু এই সব ব্যতিক্রমের বাইরে মোটামুটি যে বিশিষ্ট ভাবধারা প্রাধান্য পায় তাকেই আমরা যুগ-আদর্শ আখ্যা দিয়ে থাকি।

শরৎসাহিত্যে আছে মহাযুদ্ধের আগেকার নরনারী। তাই বলে তারা কোন যুগের প্রতিনিধি নয়। সাহিত্য জগতে একদল ঔপন্যাসিক আছেন, আবেষ্টন সৃষ্টিতে তাঁদের দক্ষতা।

মানুষ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা বিশেষ সময়ের বিশিষ্ট দলের প্রতিনিধি হিসাবে। যেখানে মানুষ দেশকালের সীমার অতীত, যেখানে সে শুধু মানুষ—এমন বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে না। তাঁদের সাহিত্যে দেখা যায়, চরিত্রের চেয়ে একটা সামাজিক পরিমণ্ডলের চিত্রই পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে। শরৎচন্দ্র অতুলনীয়-রূপে গল্পের পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন, তাঁর দৃষ্টি যেমন প্রখর, তেমনি সূক্ষ্ম। তাঁর কাহিনীর জগতকে রূপায়িত করে তোলবার জন্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে যেমন অখণ্ড মনোযোগ, তেমনি সেই জগতকে গভীরভাবে উপলব্ধিও তিনি করতে পারেন। গল্পের আবেষ্টন রচনার দিক থেকে শরৎচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কিন্তু আবেষ্টন তাঁর সৃষ্টির মুখ্য বস্তু নয়। তাঁর প্রতিভার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মানুষ। সে মানুষ দেশকালের সীমার বাইরে। সে তাঁর নিজের দেখা জগতকে আদর্শ করে কল্পনার যাদুস্পর্শে সৃষ্টি করা মানুষ। মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন। মুখ্যতঃ, মানুষকেই তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর বইগুলি পড়তে পড়তে আমরা আর সব কথা ভুলে যাই,—শুধু মানুষের চরিত্র, তার অন্তরের দ্বন্দ্ব, সুখদুঃখ, আশাহতাশা আমাদের মন কেড়ে নেয়। মানুষের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি মিষ্টিক। তাঁর সাহিত্যে কোন হাল্কা মনের চরিত্র নেই কারণ মানুষকে তিনি হাল্কাভাবে দেখতে পারেননি। মিষ্টিকদের কাছে বাহ্যজীবন সম্পূর্ণ জীবন নয়। তারা গভীরতার সন্ধানী। শরৎচন্দ্র মানুষকে দেখেছেন গভীরতার মধ্যে। যেখানে সে কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদের প্রতিনিধি নয়, যেখানে চলেছে একটা বিরাট শক্তির প্রকাশলীলা, মানুষ যেখানে বৃহৎ এবং বৃহৎ বলেই মহৎ,—তাঁর মিষ্টিক প্রতিভা মানুষের অপরূপ মূর্তির সন্ধান পেয়েছিল। শুধু 'মহৎ' না বলে 'বৃহৎ বলেই মহৎ' বলা হল এই জন্যে যে মহৎ শব্দ শুনলেই আমাদের মনে একটা ভাল-মন্দের প্রশ্ন আসে। শিল্পী নিজের মতামতকে লেখার মধ্যে যদিও যথাসাধ্য লুকিয়ে রেখেছেন তবু তাঁর মনের যে সূক্ষ্ম ছবি লেখার ভিতরে অব্যক্তের মধ্যেও ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তা বিচার করলে দেখা যায়, তিনি কোন উপন্যাসে আদর্শ সৎলোক বা সাধু চরিত্র আঁকবার ইচ্ছা নিয়ে কোন মানুষ গড়ে তোলেননি।—সংসারের নিত্য পরিবর্তনশীল সামাজিক আদর্শের ভালমন্দের মাপকাঠিতে তিনি মানুষকে বিচার করেন নি। তাহলে 'দত্তা'র নরেন এবং শয়তান রাসবিহারীকে সমান দরদ দিয়ে অমন নিখুঁতভাবে আঁকতে পারতেন না। সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য সামাজিক 'মর‍্যালিটির' কষ্টিপাথর দিয়ে বিচার করলে তাঁর অনেক চরিত্রই নিছক সাধুপ্রকৃতির নয়। 'গৃহদাহে'র সুরেশ নীতিবাদের দিক থেকে হেয়, সতীশও খুব সাধু নয়। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকে সমাজের দশজন সৎলোকের সঙ্গে সমান আসন দেওয়া যায় না। দেবদাস, অচলা, কমলা, অভয়া—এরা সমাজপতির দৃষ্টিতে সৎ না হতে পারে কিন্তু এরা বৃহৎ এবং মহৎ। কারণ এদের প্রেম গভীর, মনের দ্বন্দ্বও গভীর, এদের মধ্যে যদি কারো পতন হয়ে থাকে তাও সহজে হয় নি।

গভীর প্রকৃতির মানুষ খুঁজতে গিয়ে শিল্পী সাধারণকে বাদ দিয়ে অনন্যসাধারণের পিছনে ঘোরেন নি। তিনি সাধারণের মধ্যে অনন্যসাধারণকে দেখেছেন। বৃহৎ মানুষ শুধু সমাজের উচুস্তরে নেই। জাতের গণ্ডী দিয়ে তাকে বাঁধা যায় না। কুসুম, কুঞ্জ, বৈকুণ্ঠ, ধর্মদাস, বেহারী, বিন্দু, একাদশী, গোফুর—সমাজে তাদের স্থান খুব উচুতে নয়। কিন্তু তাদের স্নেহ, ভালবাসা, প্রভুর প্রতি অনুরাগ, ভাল বাসার জন্য তাদের ত্যাগ এবং দুঃখ ভোগ সাধারণ মানুষের মত নয়। তারা প্রত্যেকেই অন্তরের ঐশ্বর্যে অসামান্য।

ভালবাসার জন্যে এই যে এতগুলি নরনারীর দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব এবং অপরিমেয় দুঃখ ভোগ, শরৎচন্দ্র বুদ্ধি দিয়ে তার বিচার করতে যান নি। তিনি দেখেছেন, মানুষ ভালবাসে এবং দুঃখ ভোগ করে। এই দুঃখ ভোগ করতে মানুষের মনে কোন সন্দেহ জাগে না।—উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তাদের চঞ্চল করে না। মানুষ এ সব সহ্য করে কারণ সে বৃহৎ,—সে মহত্ত্বের অধিকারী। সাধারণ জীবনের সুখ দুঃখই তার চরম কাম্য নয়। তাই শরৎচন্দ্র নিজে যেমন মিষ্টিক, মনে হয়, তাঁর অধিকাংশ চরিত্রও সেইরূপ মিষ্টিক। নিজেদের প্রেম সম্বন্ধে কোথাও তারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার

করতে বসেনি। তাদের কাছে প্রেম একটা "দুর্নিবার শক্তি"। একে তারা জীবনে গ্রহণ করেছে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে।

মানুষ হিসাবে নারীই শরৎ প্রতিভার মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করেছে। তাঁর প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই প্রধান অংশে আছে কোন না কোন রমণী। মানুষের মহত্বের পূর্ণ স্ফুরণের সন্ধান রমণী চরিত্রেই তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য, নারী নারীসমাজের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর সাহিত্যে কোথাও আশ্রয় পায় নি। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর স্বাধিকারের সংগ্রাম তাঁর কোন উপন্যাসের বিষয়বস্তু নয়। তাঁর আঁকা কোন মেয়ে ইবসেনের "ডলস হাউস"এর নোরার মত বলেনি, রইল আমার সংসার, রইল আমার স্বামী। আমার কাছে ব্যক্তিত্বের মর্যাদাই সব চেয়ে বড় সম্পদ। খেলাঘরে বন্দী থেকে সেই ব্যক্তিত্বকে আর অপমান করব না। বরং শরৎ সাহিত্যের মেয়েরা প্রেমের জন্য নিজের ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত। ভালবেসেই তাদের চরম আনন্দ। নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিতে পারাই যেন তাদের একমাত্র কাম্য।

বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল—আমাদের দেশে বেশির ভাগ সাহিত্যিকের তুলিতে পুরুষের চেয়ে নারীই ফুটে উঠেছে। কিন্তু শরৎসাহিত্যের মত আর কোথাও নারী চরিত্রের এত উচ্চ আসন নেই। কথা শিল্পীর কাছে জগতের সব কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী নারী। সে পুরুষের ছায়া নয়। সে মহত্বের নিত্যস্ফূর্ত উৎস। "পল্লী-সমাজে" পুরুষদের অতিক্রম করে পাঠকের হৃদয় আলোড়িত করে তোলে রমা এবং জ্যাঠাইমা চরিত্র। জ্ঞানদার মামা যেখানে নিজের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেছে, সেখানে "পোড়া কাঠের" মহত্ব উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিন্দু ও হেমাঙ্গিনী স্বার্থলেশহীন বাৎসল্য রসের অপূর্ব চিত্র। সাবিত্রীর ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের কাছে সতীশ নিষ্প্রভ। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের তুলনা করা যায় না। জীবানন্দের পাশে ষোড়শীর অন্তরের ঐশ্বর্য অমূল্য মণির মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের মেয়ে চরিত্র পুরুষ চরিত্রের চেয়ে বেশি মানসিক শক্তি সম্পন্ন, গভীর এবং জটিল। তিনি নারী চরিত্রে বিস্ময়কর রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। জগতে যা কিছু বৃহৎ এবং শ্রেয়ঃ তার পূর্ণ প্রকাশ নারীর অন্তরে। সে-ই সকলের আগে অমৃতের অধিকারী। মিষ্টিক শরৎচন্দ্র মানুষের অন্তরে যে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ দেখেছিলেন তার শ্রেষ্ঠ আধার নারী। এই বিষয়ে য়ুরোপীয় শিল্পী মেটারলিংকের সঙ্গে তাঁর খুব মিল আছে। মেটারলিংকের নাটকেও নারীই প্রধান আকর্ষণ। Aglavaine, Selysette, Monna Vanna, Sister Beatrice—প্রত্যেকের চরিত্র নাটকের পুরুষ চরিত্রদের চেয়ে জটিল এবং অন্তরের সম্পদে ঐশ্বর্যবান। জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণা মিষ্টিকের মত এবং তাদের শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীও পুরোপুরি তাই। 'দি ট্রেসার অব দি আম্বল' বইখানিতে মেটারলিংক মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অতি চমৎকার ভাবে বলেছেন; "Women are indeed the veiled sisters of all the great things we do not see. They are indeed nearest of kin to the infinite that is about us, and they alone can still smile at it with the infinite intimate grace of the child, to whom its father inspires no fear. It is they who preserve here below the pure fragrance of our soul, like some jewel from Heaven, which none know how to use; and were they to depart, the spirit would reign in solitude in a desert. Theirs are sulll the divine emotions of the first days, and the sources of their being lie, deeper far than ours, in all that was illimitable."

জীবনের প্রতি যাদের দৃষ্টিভঙ্গী মিষ্টিকের তাদের চিত্ত আদর্শবাদী। তারা বিশ্বাস করে, জগতের দিকে দিকে প্রাণপ্রবাহের যে লীলা খেলা চলেছে তার আদি ও অন্তে আছে শিবম্ এবং আনন্দম্। জীবনে যা কিছু বাধা, —যা কিছু দুর্বোধ সমস্যা সেই শিবম্ এবং আনন্দংকে ঢেকে ফেলে, তাদের অস্তিত্ব ক্ষণিকের, তাদের চরম

কোন মূল্য নেই। মেঘে-ঢাকা দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা অদৃশ্য হয়ে থাকে বটে কিন্তু তাহলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করে সে-ই, জীবনে অবিশ্বাস যার মূল প্রেরণা, দৃষ্টি সংকীর্ণ,—ধ্রুবকে পাবার দুর্জয় সাহস এবং শক্তি যার নেই। মিষ্টিক মানুষের কাছে দুঃখ জীবনের একটা নৈতিকমূলক সমস্যা নয়—আকাঙ্ক্ষিতকে পাবার দুঃসাধ্য উপাদান মাত্র। দুঃখের অনুভূতি দুঃসহ বটে কিন্তু তা-ই তারা চায়, তা-ই তাদের কাম্য। জীবনে পাওয়াটা তাদের কাছে বড় নয়—পাওয়ার সাধনাই আকাঙ্ক্ষার ধন। শরৎচন্দ্রের মিষ্টিসিজমের যাঁরা পরিচয় পাননি, তাঁরা অভিযোগ করেন, উপন্যাসে তিনি সমস্যা নিয়ে এসেছেন, সমাধান করতে পারেন নি। কেউ বলেছেন, শিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্র ভীরু। সামাজিক বিদ্রোহের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের জয় ঘোষণা করতে পারেন নি। কেউ বা ব্যাখ্যা করেছেন, সাবিত্রী ও রমার নিস্ফলতার কারণ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিত্বের পরাজয়। অবশ্য এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে এখানে সমাজের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের লোকদের সঙ্গে নয়,—নায়িকাদের অন্তরেই সুপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দৃঢ়সংস্কার-রূপে সমাজ বাধা সৃষ্টি করেছে। মনে হয়, শরৎচন্দ্রের শিল্প প্রতিভার ঠিক ঠিক বিচার করতে হলে আরো গভীরতার মধ্যে যেতে হবে। আর একটি প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, কোন সমস্যাকে শরৎচন্দ্র নিছক সমস্যা হিসাবে দেখেন নি তাই মীমাংসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন উপন্যাসেই কোন বিশিষ্ট দ্বন্দ্বের অবতারণা করতে পারেন নি। শিল্পজগতে কোন শিল্পীরই অখণ্ড স্বাধীনতা নেই। তাঁর নিজের গড়া সৃষ্টি আপন নিয়মে লেখনিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই অপূর্ব্ব অধীনতা যে শিল্পী মেনে নিতে পারেন নি, উপন্যাসে সমস্যার সমাধান তিনি যতই সুশৃঙ্খলে করে থাকুন, শিল্পের চরম কষ্টিপাথরে তাঁর সৃষ্টি ব্যর্থ হয়।

শরৎচন্দ্রের নরনারীর আদর্শ ও কর্মধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায়, মিষ্টিকদের মত জীবনের প্রতি তাদের আছে একটা বিস্ময়ের ভাব। সে ভাব কর্মীর মত নয়,—বরং শিল্পীর মত। কর্মীর মত দুর্দম ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জীবনের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে তাদের বেশি আগ্রহ নেই। তাদের গোপন মনের কোণে এই ধারণা যেন বদ্ধমূল, সংসারে ইচ্ছামত জীবনকে ভেঙে গড়ে নতুন করে তৈরি করা যায় না। যা এসেছে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। বিদ্রোহ কর, কিন্তু বিদ্রোহই জীবনের চরম কাম্য নয়। জীবনে যা ঘটে তৃতীয় ব্যক্তির মত উপভোগ করবার চেষ্টা কর, তোমার নিজের দুঃখ যেন তোমার নয়। জীবনের সার্থকতা ইহজগতের ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈপ্সিতকে সংসারে না পেলেই যে জীবন ব্যর্থ হল, তা এরা বিশ্বাস করে না। যে ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি দুঃখ বাঁধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে তোমার জীবনকে বিকশিত করে তুলছে, সেই চরম কল্যাণময়ী শক্তির কাছে নিজেকে যতদূর সাধ্য উৎসর্গ করে দাও। একদিক থেকে মনে হয় সকল মিষ্টিকই অদৃষ্টবাদী। শরৎচন্দ্রের নরনারীও মূলত তাই। এই কারণেই সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, বিপ্রদাস, রমা, পার্বতী, সতীশ—কারোকে শেষ পর্যন্ত জীবনের বিরুদ্ধে দুর্জয় সংগ্রাম করতে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরই চরিত্রে শেষে একটা যেন নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অন্তরে অন্তরে স্বামীহিসাবে সতীশের সব দাবী সাবিত্রী মেনে নিয়েছে, সতীশের সঙ্গে বারবার অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেছে, সমাজপতিদের লাঞ্ছনার ভয়ে পিছিয়ে যায় নি, অথচ শেষকালে সে-ই তার প্রিয়তমকে অপরের হাতে তুলে দিলে। এই সময়ের ছবিখানি শিল্পী বড় সুন্দর করে এঁকেছেন। ভালবাসার পাত্রকে ইহজীবনে আর সে আপন বলে কাছে পাবে না—এই না-পাওয়ার দুঃসহ বেদনায় তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল কিন্তু কোথাও এই বেদনাকে ব্যর্থতা বলে অনুশোচনা করেনি। অসামান্য ইচ্ছাশক্তিতে দৃঢ় বিপ্রদাস যার সঙ্গে চরম সংঘাতের দিনে সামান্য দৃঢ়তা এবং কর্মকুশলতা দিয়ে উপন্যাসের গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে পারত। কিন্তু জীবনের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করলে না—দুঃখের আঘাতকে মাথা পেতে নিলে। সংসারের দিক থেকে তার ব্যর্থতা নিয়ে আমরা অনেকে শোক করেছি কিন্তু

সে কোনদিন করেনি। উপন্যাসের চরিত্রকে যারা জীবন্ত চরিত্রহিসাবে দেখেন না, সামাজিক সমস্যার বিগ্রহ হিসাবে দেখেন শরৎচন্দ্রের নরনারীকে নিয়ে তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু এঁদের মনের বিশিষ্ট গঠন-প্রণালির আলোচনা করলে স্রষ্টিকারকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। জীবনের সমস্যার মীমাংসা করে সমাজকে ভেঙে চুরে গড়ে তুলতে প্রস্তুত এমন মানুষের চরিত্র আমাদের ভাল লাগে না, তা নয়,—অন্য কোন শিল্পীর আঁকা বিশিষ্ট জগতের বিশিষ্ট ধরণের নরনারীকে সেভাবে কাজ করতে দেখলে সমান আনন্দই পাব। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই মিষ্টিক মানুষগুলিকে দিয়ে যদি সে কাজ করানো হত তাহলে কোন আনন্দই যে পাওয়া যেত না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র শরৎসাহিত্যের মধ্যে মনে হয় একমাত্র দেবদাস জীবন-নটরাজের রূঢ় আঘাতকে মিষ্টিকের মত গ্রহণ করতে পারেনি, ব্যর্থতার বেদনায় আত্মহারা হয়ে নিজেকে অধঃপতনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল।

জীবনের অফুরন্ত লীলাধারার প্রতি বিস্মিত দ্রষ্টার ন্যায় শরৎচন্দ্রের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, একে তিনি কোথাও মেটারলিংকের মত তাত্ত্বিকরূপ দেবার চেষ্টা করেন নি। অসহিষ্ণু, সমাজসংস্কারপন্থী সমালোচকেরা বারবার তাঁকে ভীরু, কাপুরুষ ঔপন্যাসিক বলে ইঙ্গিত করেছেন। বিদ্রোহের ছবি আঁকতে পারেন না বলে দোষারোপ করায় "আত্মশক্তি" সাপ্তাহিকে একবার একখানা চিঠিতে তিনি কয়েকটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, অনেকে তাঁকে বলে তিনি পতিতাদের সমাজে আশ্রয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা করেন নি,—শুধু তাদেরও যে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার আছে,—তারাও যে মানুষ, এই বিষয়টি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রবন্ধে স্বীকার করেছিলেন, সমস্যার মীমাংসা করা তাঁর দায়িত্ব নয়। এই বক্তব্যকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শরৎচন্দ্র এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন, কোন বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বা মতবাদী নরনারীর স্বাধিকার নিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করার চেষ্টা তাঁর নয়। সংসারের দিকে দিকে যেখানেই শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বা দুঃখ ও বেদনার পুঞ্জীভূত কারুণ্যে তাঁর প্রতিভা আকৃষ্ট হয়েছে তা-ই তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পী কোন একটি বিশিষ্ট দলের মানুষ নন। তাই উৎপীড়িত প্রজা গোফুর আর দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান বিপ্রদাস চরিত্র সমান দরদ দিয়ে আঁকতে পেরেছিলেন। মনে হয়, মাত্র একবার তিনি বিদ্রোহিনীর চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন—হয়ত সমালোচকদের প্ররোচনায়। কিন্তু তাতে খুব সফল হন নি। "শেষ প্রশ্নে" সমাজ এবং জীবনের বিরুদ্ধে কমলের বিদ্রোহ যতই সক্রিয় ও তীব্র হোক, তার চরিত্রের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, রমার মূর্তি বারবার উঁকি মেরেছে। এইজন্যেই মনে হয় তার চরিত্রের সঙ্গে তার জীবনের কাজকর্ম ঠিক খাপ খায়নি। বইখানা পড়তে-পড়তে বোধ হয়, শিল্পী যেন সৃষ্টির প্রেরণায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারেন নি,—মানুষ শরৎচন্দ্র কোথায় যেন জোর করে বিশেষ একটি মতবাদকে মূর্তি দেবার চেষ্টা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসেই গল্প হয় প্রেম না হয় বাৎসল্যমূলক। প্রেম সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা এবং তাঁর চরিত্রদের মতামত আলোচনা করলে তিনি যে কত গভীর মিষ্টিক ছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে বিষয়ে বারান্তরে লেখার ইচ্ছা রইল।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

সিনিক সুকুমার

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী এম-এ

সুকুমার একজন সিনিক। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা'র মানে বেচারী বুঝি হতাশ প্রেমিক? কথাটা মিথ্যা নয়, ওর ভাগ্যে প্রেম আর হতাশা দুই ঘটেছিল।

ও তখন হোষ্টেলে থেকে এম-এ পড়ছে। ওর বাবা বিদেশে যেখানে চাকরী করতেন সেখান থেকে লিখে পাঠালেন, তাঁর অনেকদিন আগেকার পুরোনো বন্ধু ভুবন বাবুর হঠাৎ খবর পাওয়া গেছে, তিনি কল্কাতাতেই স্কুলমাষ্টারী করছেন, সুকুমার যেন মাঝে মাঝে শ্যামবাজারে তাঁদের বাড়ী গিয়ে খোঁজখবর নেয়। প্রথমটা সুকুমার বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে সামান্য বিস্মিত হ'ল, তা'রপর খোঁজখবর নিতে হবে জেনে মনে মনে খুবই চ'টে গেল। একদিন অত্যন্ত ব্যাজার মুখে নেহাৎই পিতৃ-আজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর এক গলির ভিতরে ভুবনবাবুর বাড়ী আবিষ্কার করল। ভুবনবাবু যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তাঁর চেহারা দেখে ও আরও বিরক্ত হ'য়ে উঠল। যেমনি মোটা, তেমনি কালো, বড় বড় গোঁফ আর দারুণ ভ্রূকুটি। ঠিক স্কুল মাষ্টারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি দরকার তোমার?

প্রথম সাক্ষাতেই এই 'তোমার' সম্বোধন শুনে সুকুমার আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। একটু অস্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, আজ্ঞে, বাবা আমাকে লিখেছেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে। তাই—

তুমি কি মনোহরের ছেলে?

সুকুমার বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করল, আজ্ঞে।

মুহূর্ত্তে দেখা গেল, ভুবনবাবু বদ্‌লে গেছেন। "আরে ভেতরে এস, ভেতরে এস" ব'লতে ব'লতে তিনি ওর হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পাশের রান্নাঘরের উদ্দেশে "ওগো, মনোহরের ছেলে এসেছে ব'লে ওকে ওপরে নিয়ে গেলেন। ভুবনবাবু আবার যেন কা'কে ডেকে ব'ললেন, তিনু, শীগ্রি চা ক'রে নিয়ে আয়।

অনেকদিন বোধ হয় ভুবনবাবু এমনভাবে হাসেন নি বা কথা বলেননি। সুকুমার যথাসম্ভব 'হ্যাঁ' 'না' 'তা তো বটেই' 'তা যা বলেছেন' প্রভৃতি উত্তর দিচ্ছে।

এমন সময় আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ভুবনবাবুর স্ত্রী ঘরে এলেন। সুকুমার প্রণাম ক'রে যখন বসল, তখন ভুবনবাবুর স্ত্রীকে ভাল ক'রে দেখতে পেল। বয়স তাঁর বেশী হয় নি, কিন্তু স্বাস্থ্য খুব খারাপ। মুখখানি তাঁর অতিসুন্দর, যদিও একটা ক্লান্তির ভাব তা'তে স্পষ্ট দেখা যায়। সুকুমার মনে মনে ভাবল, যৌবনকালে নিশ্চয় এঁকে দেখতে অপূর্ব্ব ছিল।

একটু পরেই ঘরে প্রবেশ করল একজন সতের আঠার বছরের মেয়ে, ভুবন বাবুর স্ত্রীর মতই দেখতে, এবং পরে জানা গেল তাঁরই বোন। তা'র নাম তনিমা। যৌবনকালে ভুবনবাবুর স্ত্রী কেমন ছিলেন তা' সুকুমার দেখল। তনিমার সুন্দর মুখের উপর দুটি বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে ও বিস্মিত হ'য়ে গেল। এমন নিখুত চেহারা ও কখনো দেখে নি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঐ চোখ। চোখের রহস্য যে এত নিকট থেকে উপলব্ধি করা যায় তা' ও কখনো ভাবে নি। তনিমা অত্যন্ত সাধারণ একটা সাড়ী অত্যন্ত সাধারণ ভাবে প'রে এসেছে, কিন্তু সাধারণের রহস্য সুকুমার জান্‌ল। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে তনিমা আজ সুকুমারকে হাতে ক'রে চা দিতে এসেছে।

কোন রকম না ঘুরিয়ে সোজা স্পষ্ট কথায় ব'লতে গেলে, সুকুমার সেই মুহূর্ত্তে তনিমার প্রেমে প'ড়ে গেল। শ্যাম-বাজারের সরু গলির ভিতরের স্কুল মাষ্টারের বাড়ী হ'য়ে উঠল রোমান্টিক এবং ভুবনবাবুর সেই প্রাণহীন নীরস

আলাপের জন্যে সুকুমার হঠাৎ নিজেকে আগ্রহান্বিত দেখল।

অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে নানারূপ কথা এবং ভুবন বাবুর বাড়ীতেই সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য তাঁর যথারীতি অনুরোধ এবং সুকুমারের যথারীতি প্রত্যাখ্যানের পরেও আর একটু সময় কাটিয়ে যখন সুকুমার উঠল, ভুবন বাবু ব'ললেন, "মাঝে মাঝে নিশ্চয় এস সুকুমার", সুকুমার তনিমার দিকে তাকাল, ব'লল; নিশ্চয়, আসব বই কি।

সেদিন ঘরে ফিরে সুকুমারের আর পড়াশুনো হ'ল না। বাবাকে চিঠিতে লিখল যে ভুবনবাবুকে তা'র ভালই লাগল। তাঁর বাড়ী মাঝে মাঝে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা সে করবে, এবং তাঁর স্ত্রী তা'কে খুব যত্ন করেছেন। তনিমা ব'লে যে কেউ আছে সে কথা সুকুমারের চিঠি প'ড়ে জানা অসম্ভব।

তারপর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ও তনিমার কথাই ভাবতে লাগল। তনিমা কি কখনো তা'কে ভালবাসবে? তনিমা কি তা'র নিজের সম্বন্ধে একটুও সজাগ? সে কি জানে তা'র মধ্যে কতখানি ক্ষমতা রয়েছে? ভারী সুন্দর ওর চোখ দুটি আর ধনুকের মত বাঁকা দুটি সরু ভ্রূ। ঠিক যেন-শিল্পীর গড়া দেবী প্রতিমা। তনিমা; তিহু।

অত্যন্ত খুসী মনে সুকুমার পাশ ফিরে শুল এবং খুব সম্ভব স্বপ্ন দেখতে লাগল যে তনিমার হাত থেকে চায়ের কাপ তুলে নিচ্ছে।

তনিমার গুণ অনেক। কিন্তু সে সব বলা বৃথা। সুকুমার যা'কে ভালবেসেছে সে হচ্ছে দোষে গুণে মিশ্রিত সমগ্র তনিমা। তা'র কোন বিশেষ গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে সব জানবার বা কাজে লাগিয়ে দেখবার ইচ্ছা তা'র নেই। হায়রে, কখনো তা'র সে সৌভাগ্য কি হবে? তনিমাকে আশা করাও যা, আকাশের চাঁদের জন্যে ছেলে মানুষি বায়না তোলাও তাই।

কাজেই ও এখন অন্যান্য সকলের মত সকলের চেয়ে সোজা উপায় গ্রহণ করেছে অর্থাৎ কবিতা লেখা। কবিতার খাতার একপাশে জড়ো ক'রে লিখে রাখল, মনোরমা, প্রতিমা, অমা, সমা, রমা ইত্যাদি। আপাততঃ মনে হয় সুকুমার কবিতার মধ্যে তনিমাকে যতটুকু পাওয়া সম্ভব ততটুকুতেই সন্তুষ্ট। তনিমার তৈরী চিনি-কম চায়ের সুমিষ্ট আস্বাদ, তা'র অযত্ন অবহেলার চিহ্নমাখা অত্যন্ত এলো খোঁপা, তা'র হঠাৎ অকারণে লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গী—তা'র প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে সে তাঁ'র কবিতায় অমর ক'রে দিল। তনিমার যে লাবণ্য অহরহ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তা'কে সে যথাসাধ্য কালিকলমের বাধার মধ্যে বেঁধে রেখেছে। কেউ যা'র খবর রাখছে না, তা'র কথা সুকুমারের খাতায়।

কিন্তু বেশীদিন এমন চলে না। ভুবনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রতে সুকুমারের যে একটুও আপত্তি ছিল তা' নয়, কিন্তু তা'র ভয় ছিল তা'র বাবা মত দেবেন না।

হ'লও তাই। মনোহর বাবু সুকুমারকে চিঠি দিলেন যে ভুবনবাবু তাঁকে তা'র বিবাহ সম্বন্ধে সম্মতি দেবার জন্যে অনুরোধ করেছেন কিন্তু তিনি সম্মতি দেওয়া সম্ভব মনে করেন না। তা'র পরীক্ষা শীঘ্রই, তাছাড়া সুকুমারও নিশ্চয় এ বিবাহে রাজী হবে না।

ও চিঠি পেয়ে কি করবে ভেবে পেল না। কিছু ভেবে না পেয়ে ধীরে ধীরে ভুবনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠল। দেখল তাঁরা কোন খবর জানেন না। কাজেই জানিয়ে কোন লাভ নেই মনে ক'রে তনিমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল তনিমা, তোমার বইখানা পড়া হয়েছে?

তনিমা একটি অপরূপ ভঙ্গী ক'রে উত্তর দিল, এত তাড়া কেন? পড়া হ'লে তবে দেব, একমাস পরে, এক বছর পরে—

তনিমা কি জানে তা'র মধ্যে কতখানি ক্ষমতা রয়েছে? তনিমা কি তা'র নিজের সম্বন্ধে একটুও সজাগ?

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। ভুবনবাবু তাঁর কাজে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ধমক দিয়ে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। তনিমা আর সুকুমার ছাদে গিয়ে চাঁদের আলোয় ব'সে গল্প ক'রতে লাগল।

চাঁদের আলো সাধারণ লোককেও আলোছায়ার রাজ্যের রহস্যময় মানুষ ক'রে তোলে। সুকুমার পুলক এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল তনিমা এক মুহূর্ত্তে তার কত নিকট এবং তা'র থেকে কত সুদূর হ'য়ে গেছে। দিনের আলোয় যে মেয়েকে সে দেখে, তা'র বিশেষ ভঙ্গীটি, তা'র অপরূপ চোখদুটি, তা'র হাসি, তা'র অঙ্গ-সজ্জা। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে তা'কে মুগ্ধ করে। এখন এই চাঁদের আলোয় সবই একাকার হ'য়ে গেছে। যেন কোন এক ঐন্দ্রজালিকের যাদুতে তনিমা বদলে গেছে। তবু আজকের রাতের এই মায়াময়ী নারীর মধ্যে যে সেই তনিমাই রয়েছে তাই ভেবে সুকুমার নীরবে তা'র হাত দুটি নিজের হাতের ওপর টেনে নিল। তা'র পরেই ও ব'লে ফেলল ওর বাবার চিঠির কথা। তনিমা নিজের হাত টেনে নিতে গেল কিন্তু সুকুমার জোর ক'রে ধ'রে রেখে বলল, তুমি কিছু মনে ক'র না তিন্নু। আমি যেমন ক'রে পারি বাবা'র মত করাবই।

কোন উত্তর না পেয়ে সুকুমার কি ক'রবে ভেবে পেল না। বাঁহাত দিয়ে তনিমাকে কাছে টানতেই তনিমা ওর কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়ল এবং তা'র মাথার খোঁপা আলগা হ'য়ে গিয়ে কাল চুলগুলো মেঘের মত ওর পিঠ ঢেকে ফেলল। পুলকিত সুকুমার শুধু ব'লতে পারল, তনিমা, তিন্নু!

এমন সময় ভুবনবাবু 'সুকুমার' 'সুকুমার' ব'লতে ব'লতে ওপরে উঠে এলেন। এতটা দেরী হ'য়ে গেছে দেখে দুজনেই ধড়মড় ক'রে উঠে পড়তেই ভুবনবাবু এসে পড়লেন, একটা চিঠি বের ক'রে বললেন, তোমার বাবার চিঠি, পড়বে এস।

সুকুমার বিষণ্ণমুখে নীচে নেমে এল। ভুবনবাবু ব'ললেন, স্কুলের ঠিকানায় মনোহর চিঠি দিয়েছে। অনেক কথাই লিখেছে, প'ড়ে দেখ।

অনেক কথাই লিখেছেন বটে। ছেলেকে ভাল মনেই পাঠান হয়েছিল অথচ ভুবনবাবু এমনভাবে জাল ফেলে শিকারের চেষ্টা করচেন্ জানা থাকলে ইত্যাদি। ভুবনবাবু ব'ললেন, তুমি আর এস না সুকুমার। স্বীকার করি তোমাদের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু আমি শিকারী নই। তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল, মনোহরও আমার অনেক দিনের বন্ধু। যাক্‌গে, যেখানে থাক ভাল থাক।

সুকুমার ভেবে পেল না যে তা'র বাবার মত সে কি ক'রে আদায় ক'রবে। বাবাকে সে চেনে, তা ছাড়া যিনি তাঁর অনেকদিনের পুরোনো বন্ধুর প্রতি অমন ভাষা ব্যবহার ক'রতে পারেন, তিনি যে আবার মত দেবেন এমন আশা করা বৃথা।

অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে সুকুমার ঘরে ফিরে গেল এবং আপাততঃ ভেবে ঠিক করল ভুবনবাবুর বাড়ী আর না যাওয়াই উচিত।

তনিমার সঙ্গে বিবাহে এই যে বাধা ঘটল তারপর প্রায় দু' বছর কেটে গেছে। তা'র মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে ভাবলেও আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। একদিকে তনিমা আর অন্যদিকে সুকুমার কিভাবে দিন কাটাচ্ছে জানতে ইচ্ছা করে।

সুকুমার অবশ্য এখন বিবাহিত। এখন তাকে দেখলে চেনা যায় না। মুখের চেহারা আগের চেয়ে রোগা এবং কঠিন হ'য়ে গেছে। সর্ব্বদাই রুক্ষ ভাব আর যখন হাসে তখন তা'র মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ হতাশা দেখা যায়। ওর নিস্তব্ধ অবসন্ন মুখের ওপর যেন কিসের একটা বেদনা কঠোর হ'য়ে বসে আছে। ওর এখন বৃহৎ সংসার, ছেলে-মেয়ে অনেকগুলি, দু-চারজন মারাও গেছে। কোন্ একটা স্কুলে পড়িয়ে কোনরকমে ওদের সংসার চলে।

সুকুমারের স্ত্রীর নাম তনিমা। ওরা পালিয়ে এসে বিয়ে ক'রেছিল।

হাঁ, সুকুমার একজন সিনিক্।

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী

ঈশপ ও বিষ্ণুশর্ম্মা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, বি-এল

মানব মাত্রেই একটা গল্পশ্রবণলালসা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইজন্য সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই মানবজাতি প্রেমিক প্রেমিকাকে যেরূপ ভালবাসে গল্পকেও তদ্রূপ ভালবাসিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের অভিধানে ঠানদিদির ব্যাখ্যা গল্পের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া লিখিলেও ক্ষতি হইবে না। গল্পদ্বারা শিশুগণের বিবাদ মিটাইতে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে অথবা ঘুম পাড়াইতে তাঁহাদের তুল্য আর কেহ নাই। যখন মুদ্রাঙ্কনপ্রথা প্রচলিত ছিল না তখন গল্পগুলি উত্তরাধিকার ও হস্তান্তর সূত্রে স্মৃতিপথে চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও অনেকগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি এখনও যে কত কত গল্প আকাশে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

কল্পনাশক্তি যখন অতিশয় প্রবল থাকে তখন মানবের মন লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনাতে অধিকতর আনন্দ পায়। একটি পারিবারিক গল্প অপেক্ষা একটি ভূতপ্রেত-বিশিষ্ট গল্প শুনিতে শিশু অধিক ভালবাসে। তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত যখন কল্পনাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস ও সংযত হইয়া আসে তখন প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া সে ভাবিতে থাকে বাস্তবজীবনে সেরূপ ঘটনা সম্ভবপর কি না। ব্যক্তিগত মানবজীবনের পক্ষে যেরূপ সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ঠিক তাহাই। পৃথিবীর শৈশব চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবী এক্ষণে মানব অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাই ভূতপ্রেত দৈত্যদানবের গল্প ছাড়িয়া আমরা শরীরী জীবের গল্প শুনিতেছি।

কেবল বাস্তব উপাদানে গঠিত বলিয়াই যে আমরা অশরীরী ত্যাগ করিয়া শরীরী জীবের গল্প শুনি তাহা নহে; বস্তুতঃ সেগুলি অন্য একটি কারণে মানবের বহুমূল্য সামগ্রী। মানব যাহা কিছু নিরীক্ষণ করে তাহার নিজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিবেচনা করে; বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে মানব যখন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তখন সমস্ত বিষয় হইতে একটা নীতি বাহির করিবার ইচ্ছা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বৃক্ষটি ফলভরে নত দেখিলেই গুণভরে নত মানবের কথা স্বতঃই তাহার মনে উদিত হয়। মানব জাতির উপর এ গল্পগুলির শিক্ষাদানরূপ প্রভাব আছে বলিয়াই এগুলি এত মূল্যবান।

নীতিপ্রদ বটে, কিন্তু তাহারই সঙ্গে এগুলির যদি মনোরঞ্জনের ক্ষমতাও না থাকিত তাহা হইলে ইহারা এত বিশ্বব্যাপক হইত না। এগুলি অমনি খাইতেও মিষ্ট অথচ পরিণামে উপকারী—এগুলি হিতকর অথচ মনোহারী। যিনি প্রকৃত গল্প কথক তিনি গল্প বলিয়া কেবলমাত্র হাস্যোৎপাদন অথবা চিত্তবিনোদন করেন না, পরন্তু মানবের ভাবের অভিব্যক্তি, মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধন ও শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয় তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সেগুলিকে ইতর প্রাণীর কথোপকথন আকার ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারা এরূপ ভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে পাঠক তাহা জানিতে পারে না অথচ অজ্ঞাতসারে নীতিগুলি শিক্ষা করিতে থাকে। স্বতঃই উত্তম চরিত্রগুলির উপর সহানুভূতি এবং অধম চরিত্রগুলির উপর অবজ্ঞা জন্মে।

এ গল্পগুলি কবে কাহার দ্বারা সৃষ্ট হইল এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক মানবের মনে এরূপ গল্পের বীজ উপক্ষিপ্ত। কিন্তু পৃথিবীর এই প্রকার গল্প বর্ণনার ইতিহাসের সূচনাতেই আমরা দুইটি বিরাট মূর্ত্তির সম্মুখীন হই—তাহা গ্রীসদেশীয় ঈশপ ও অস্মদ্দেশীয় বিষ্ণুশর্ম্মা। তাঁহাদের পর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশপ ও বিষ্ণুশর্ম্মা মূল গল্পগুলিকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, কাজেই কোনগুলি ঠিক

তাঁহাদের এবং শ্লোকগুলি পরবর্ত্তী হস্তক্ষেপকের তাহা বলিবার উপায় নাই। আরও দেখা যায় অনেক গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্য সাধারন সম্পত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াই থাকে কিন্তু ঈশপ ও বিষ্ণুশর্ম্মার প্রতিভা এগুলির মধ্যে চিরকাল ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে।

বিষ্ণুশর্ম্মা ও ঈশপ সমব্যবসায়ী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঈশপের রচনা, উপদেশাত্মক গল্প, বিষ্ণুশর্ম্মার রচনা কঠোর রূপক। ঈশপের রচনায় গল্পটি প্রবান, বিষ্ণুশর্ম্মার নীতিটি। বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পে দেখা যায় তিনি যে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন একথা বড় নির্দ্দয় ভাবে জানাইয়া দিতেছেন। উপদেষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান পাঠকের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর, বিশেষতঃ তিনি যদি নিজেকে লুক্কায়িত না রাখিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন তাহা হইলে তাহা আরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। 'হিতোপদেশ' পড়িতে পড়িতে আমরা গল্প পড়িতেছি এরূপ মনে হয় না; আমাদের মনে হয় আমরা বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ শুনিতেছি। তাঁহার গ্রন্থের লক্ষণগুলি এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—

(১) প্রথমতঃ, তাঁহার গ্রন্থখানির নাম 'হিতোপদেশ।' নামমাত্র শুনিয়া লোকে ইহাকে নীতিপুস্তক ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবিবে না।

(২) বইখানির নামের মত চরিত্রগুলির নামও রূপকাত্মক। সেগুলিতে যেন নীতির ছাপ দেওয়া হইয়াছে। কাহারও নাম 'অনাগত বিধাতা', কাহারও নাম 'প্রত্যুৎপন্ন মতি' এবং কাহারও নাম 'যদ্ভবিষ্য'। কাহারও নাম 'ধর্ম্ম বুদ্ধি', কাহারও নাম 'পাপ বুদ্ধি'। এবিষয়ে যে হিতোপদেশকার কোনও অংশে দোষী তাহা আমরা বলিতে পারি না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির ইতিহাসে এমন একটা সময় চলিয়া গিয়াছে যখন তথায় একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন —রূপক (allegory)। এই রূপকের বিষম বাতাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের আকাশকে এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহার আক্রমণ হইতে কোনও সাহিত্যিকই রক্ষা পান নাই। ইংরাজী সাহিত্যে যখন আমরা 'work—while—there—is—time—or—they—dame—will—beat—thee' অপেক্ষাও বড় রকমের নাম পাই তখন আমরা বলি বিষ্ণুশর্ম্মার মধ্যে রূপক একেবারেই নাই। কিন্তু ঈশপের পুস্তকে এরূপ ভয়াবহ রূপক আদৌ নাই।

(৩) 'হিতোপদেশের' প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে একটি করিয়া শ্লোক দেওয়া থাকে তাহাতে নীতিটি ও গল্পের শেষ ফলটি উল্লিখিত থাকে, যথা—

"অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ
মার্জ্জারস্য হি দোষেন হতো বৃদ্ধো জরদ্গবঃ।"
"অব্যাপারেষু ব্যাপারঃ যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কীলোৎপাটীব বানরঃ।"

গল্পের শেষ ফলটি পূর্ব্ব হইতে জানা হইয়া গেলে গল্পের আকর্ষণ শক্তি কমিয়া আসে। গল্পের নীতিটিও এরূপ সাধারণ হওয়া উচিত এবং গল্পের সহিত এরূপভাবে মিশ্রিত থাকা উচিত যে গ্রন্থকার না বলিয়া দিলেও যেন সমস্ত পাঠক উহার একরূপ ব্যাখ্যা করে। বিষ্ণুশর্ম্মা নিজেই নীতিটির উল্লেখ করিতেছেন—দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি যে নীতিটির দৃষ্টান্ত দিতে চাহিতেছেন তাহা পাঠক পড়িয়া ধরিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

(৪) 'হিতোপদেশে' গল্পের সহিত ধর্ম্মনীতি-জড়িত আছে, কিন্তু ঈশপের গল্পে তাহা নাই। এজন্য ঈশপের গল্পগুলির সার্ব্বজনীনতা অধিক। সেগুলি—দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ এবং মানবের সাধারণ দোষগুণ অবলম্বনে রচিত। 'হিতোপদেশের' গল্পগুলি আমাদের দেশের লোকের নিকট যতদূর বোধগম্য অন্য দেশের লোকের নিকট ততদূর নহে। 'নিত্যস্নায়ী' 'নিরামিশাসী' প্রভৃতি বিষয় অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা আমরা বেশী বুঝি। এগুলিতে পরলোকে বিশ্বাস, কর্ম্মফল প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের তথ্যগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাপ ও পুণ্যের ফল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কাজেই এগুলি অন্য দেশের লোকের তত ভাল না লাগিবার কথা।

(৫) কলানৈপুণ্য হিসাবে বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলিকে একটি

চীনাবাক্সের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। একটি প্রধান গল্প হইতে ক্রমশঃ শাখাপ্রশাখা বাহির হইতে থাকে। তাঁহার একটি সাধারণ কৌশল এই যে কোনও একটি ঘটনার স্থলে একটি চরিত্র তাঁহার সঙ্গী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক বলে। তাহাতে দ্বিতীয় চরিত্রটি কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে "সে কিরূপ?" তখন প্রথম চরিত্রটি গল্প বলিতে আরম্ভ করে এবং গল্পের শেষে "এই জন্য আমি বলিতেছিলাম" বলিয়া তাহার শ্লোকটির পুনরাবৃত্তি করে। পক্ষান্তরে দেখা যায় ঈশপের গল্পগুলি সমস্তই স্বতন্ত্র ও পরস্পরনিরপেক্ষ। অবশ্য গল্পের ভিতর গল্প বলাও যা, গল্পগুলি স্বতন্ত্রভাবে বলাও তাই, তথাপি বিষ্ণুশর্ম্মার প্রণালীটি এক ছাঁচে ঢালা।

বিষ্ণুশর্ম্মা ও ঈশপ উভয়েই মানুষের সাধারণ দোষগুণ ধরিয়াছেন—যথা বন্ধুত্ব, একতা, ভণ্ডামি, যদৃচ্ছাচারিতা, অবিবেকিতা, লোভ, কুসংসর্গ ইত্যাদি; কিন্তু ঈশপের মস্তিষ্ক বিষ্ণুশর্ম্মার অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর। বিষ্ণুশর্ম্মা যাহা দিয়াছেন ঈশপ তাহা অপেক্ষা শত শত গুণ অধিক দিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার উদ্দেশ্য এক হইলেও প্রণালী বিভিন্ন। একজন নীতিটি অজ্ঞাতসারে প্রদান করিতেছেন, অন্যজন কঠোরভাবে। একজনের গল্প দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ বলিয়া বিশ্বব্যাপী, অন্যজনের গল্প একটি দেশ বিশেষের ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য নীতি মিশ্রিত বলিয়া সীমাবদ্ধ, কিন্তু উভয়েই বিশ্বকালীন গল্পসাহিত্যের দুইটি আদিম ও অকৃত্রিম মহিমান্বিত মূর্ত্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সংবাদ-সাহিত্যের লক্ষ্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল কবিতা, কাব্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, এইগুলির সমষ্টিকে সংবাদ-সাহিত্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সংবাদ-সাহিত্যের লক্ষ্য কি প্রকার হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সংবাদ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য—সুলভে সাহিত্যের প্রচার করিয়া গণ শিক্ষার প্রসারণ ও জাতীয়তার উন্নতি সম্পাদন। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা সকলে আবার নিয়মিত-ভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করেন না। এই দেশে মূল্য দিয়া বই ক্রয় করিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি একেবারেই কম; তদুপরি পুস্তকের দাম যদি বেশী হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। এইজন্য সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে সব সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়াই পাঠকগণ সাহিত্য চর্চ্চায় সন্তুষ্ট থাকেন। শুধু এই কারণেই আমাদের সংবাদ সাহিত্যের মূল্য খুব বেশী হওয়া আবশ্যক।

সংবাদ-সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসের অনেক মূল্য আছে। কিন্তু সেইগুলি যদি সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা পাঠকের কোনও উপকার হয় না। আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ কি? আধুনিক গল্প ও উপন্যাস গুলিতে কলেজের তরুণ-তরুণীর প্রেম বিনিময়, লেক-ট্রাম-বাসে তাহাদের কথোপকথন, সিনেমা-থিয়েটারে তাহাদের দৃষ্টি-বিনিময়ের ফলে যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। বস্তুতঃ আধুনিক সাহিত্য তথাকথিত আভিজাত্য গৌরবে গর্ব্বিত পরিবারের বিলাস-চঞ্চলতা ও

প্রেমের উদ্দাম লীলার উপর ভিত্তি সংস্থাপনে সম্পাদিত। এই সাহিত্য যুবকযুবতীর যৌনবৃত্তিসম্পন্ন চিত্ত ও মনকে ক্ষণিক আনন্দ দান করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সাহিত্য দেশের জাতীয়তার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সাহিত্য হইতে বাংলার প্রকৃতির পরিচয়, বাংলার লোকের পরিচয়, বাংলার নারীর পরিচয়—এক কথায় বাংলার নিজস্ব সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমাদের নারীদের ভিতর শিক্ষার প্রসারকল্পে সংবাদ-সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নারীদের মধ্যে যাহাতে সংবাদপত্র পাঠের স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য নারীদের শিক্ষোপযোগী গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। শুধু মাত্র মেয়েদের জন্য মেয়েদের সম্পাদিত খ্যাতনামা সংবাদ পত্র আমাদের দেশে প্রকাশিত হইতেছে। যাহাতে মেয়েদের ভিতর এই সকল পত্রিকার প্রচার হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুদের ও বালকদের উপযোগী করিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা দরকার। যাহাতে শিশুর ঔৎসুক্য জাগে, কল্পনা সচেতন হয়, ও শিক্ষা আনন্দদায়ক হয়, তজ্জন্য চিত্তাকর্ষক কবিতা ও গল্প প্রকাশ করার আবশ্যকতা আছে। ছাত্রসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশের কথা, তথ্যপূর্ণ সরস ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীর লোকের আকৃতি প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার এবং তাঁহাদের আদর্শ গুণের কথা, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সাময়িক ঘটনার কথা ও স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিমত আলোচনা করিতে হইবে। জ্ঞানস্পৃহার স্ফুরণ হয় এবং হীনস্বাস্থ্য, ক্ষীণ কর্ম্মশক্তি ও অলস অভ্যাস দূর হয়, এমন রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা বিধেয়।

পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণের জন্য লেখকদের গভীর পাণ্ডিত্য দেশকাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি থাকা প্রয়োজন। জাতীয় জীবনে আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে হইলে আমাদের সাহিত্যের ভিতর চিন্তাশীলতা, গভীর জ্ঞান, পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাগুলির পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের লেখকগণ সাধারণতঃ কাব্য, কবিতা, গল্প ও উপন্যাস রচনাতেই মনোনিবেশ করেন। আজও সমালোচনা, চরিত্রালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। সমালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বইএর সংখ্যা অতি কম। এইদিক দিয়া বাংলা সাহিত্য অতিশয় দরিদ্র। বৈজ্ঞানিক, বানিজ্য বিষয়ক, শিল্প সম্বন্ধীয় ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে লোকশিক্ষার বহুল প্রচার হইবে। জাতির উন্নতির জন্য অতীত গৌরবকাহিনীর প্রচার দ্বারা জাতির প্রাণে সাড়া আনিবার জন্য আমাদের অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের উদ্ধার সাধন একান্তভাবে আবশ্যক। বিদেশী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশীয় সাহিত্যের ভাল ভাল প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকগণ প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

যাত্রা

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এস-সি, পি-এইচ-ডি

তোমার সাথে আমার সাথে
আবার দেখা হবে,
না জানি সে কবে।
ঐ জগতের লোকের মাঝে
একাই ফিরি বৃথা কাজে;
ভীড়ের মাঝে বিজনতা
বিরাম তাহার হবে
না জানি সে কবে।

ওই সুদূরে আকাশ যেথা
জলের সাথে মেশে,
যাবো সেথায় শেষে।
পার হয়ে এই মত্ত তুফান,
পেয়ে আমার আনন্দ গান,
পৌছাব সেই আকাঙ্ক্ষিতা
অভিপ্সীতার দেশে;
যাবো সেথায় শেষে।

আজকে আমি তোমার লাগি
নৌকা দিলাম ছাড়ি,
দিলাম সাগর পাড়ি।
সকল বাধা ঠেলেছি আজ,
তোমার লাগি করেছি সাজ,
উৎসাহি মন ডরায় না আর
মত্ত সাগর-বারি;
নৌকা দিলাম ছাড়ি।

মিলন পথে যাত্রী আমি
আজকে প্রিয়ার লাগি,
হয়েছি বৈরাগী।
এতদিন যে দিন গুনেছি,
আজকে তাহার ডাক শুনেছি,
বাহির হলাম অকুলে তাই
প্রিয়ার দরশ মাগি;
হয়েছি বৈরাগী।

নূতন করে তোমার আমার
আবার দেখা হবে,
ভাবছি সে যে কবে।
নিবিড় ঘন বাহুর ডোরে
আবার তুমি বাঁধবে মোরে,
মানস নীরে স্বর্ণকমল
উঠবে ফুটে তবে;
যেদিন দেখা হবে।

প্রতিশোধ

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

১

স্বদেশীর হুজুকটা বন্ধ হ'তেই শ্রীমান দুর্গাদাস আবার ফোর্থইয়ারে উদয় হলেন। তবে পুরোন কলেজ তাকে ছাড়তেই হ'ল কারণ সরকারী কর্ম্মচারী মামাবাবু যেন ও কলেজটার ওপরই চটে গেলেন। যাক দুর্গাদাস মন দিয়েই পড়াশুনা সুরু করে দিল। দুর্গাদাসকে এ দিককার সবাই ভালভাবে চিনতো কারণ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর ক্যাপ্টেন হিসেবে সে অনেকদিন এ দিকেই কাটিয়ে দিয়েছে। দু'দিন যেতে না যেতে মামাবাবু এক চিঠি দিলেন হোষ্টেল থেকে তাকে স্থানান্তরিত হ'তে হবে কারণ সহরের নামকরা ডাক্তার মিঃ নাগ তার মামার বিশেষ বন্ধু এবং তারই বাসায় তাকে থাকতে হ'বে। চিরবিদ্রোহী অশান্ত দুর্গাদাস যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়েছে। চিঠির আদেশ মতই সে পরিবর্ত্তিত হল।

দিন দুই যেতে না যেতে সেই দু'বছর আগেকার কথাই তার মনে হ'তে লাগল—যেন কোন্ রাত্তিরে সে এই বাসায় একদিন ভুরি ভোজন করেছিল। সংশয় তার দূর হোল যখন দেখল সেই যুগের লেডি ক্যাপ্টেন শ্রীমতী ধারা নাগ তার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে—কি রকম দুর্গাদা, চিনতে পারেন? না চিনবার কোনই কারণ ছিল না তাই দুর্গাদাস বিনয়ের সাথে বলল—পৃথিবী গোল একথা কে না জানে।

সেদিন রাতে দুর্গাদাস একটা পুরোন ঘটনা ভেবে যেতে লাগল—একদিন জ্বরে পড়ে সে এক পয়সার ময়দা কিনে রুটী করবার জন্যে সন্তোষকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ধারার বাসায়; তারপর জ্বর কমলে যখন সে ধারার অনুরোধে খেতে এল তার বাসায়—তখন দেখল একথালা পরিপূর্ণ লুচী ও খাবারের মাঝে কাগজে মোড়া এক পয়সার ময়দা। সবটা খেয়ে যখন সে ঠাট্টা ক'রে চাকরটাকে জিজ্ঞেস করল —রামু তোদের বাড়ী এ গুলোর সৎকার হয় কি করলে? তখন ধারাই পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল,—'যারা এক পয়সার ময়দা কিনে পাঠিয়ে দেয় কোনো বাসায় রুটী করে দিতে তাদের ওটা খাবার পর জলে গুলে মুখে মাখতে হয়'—। জ্বর ছিল বলে দুর্গাদাস ঘাবড়ায় নি—সে আদেশ অনুযায়ী মুখ ধোবার পর ওটা মুখে মাখিয়ে বলেছিল—আমার মত পুরুষের মুখে এ রকম প্রসাধন মোটেই বেমানান নয়।

দুর্গাদাস সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। ছোট বেলায় মা বাপ হারিয়ে সে দিল্লীতে দাদামশাইয়ের কাছে সাহেবী ধরণে হয়েছিল মানুষ। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করবার পর সে ভর্ত্তি হ'ল এসে কলকাতার কোন কলেজে, কারণ দাদামশাই গেল মারা তাই কলকাতায় সে ছিল তার মেজমামার কাছে। স্বভাবটা ছিল তার অদ্ভুত ধরণের। মতের স্থিতি তার কোন দিনই ছিল না, হঠাৎ স্বদেশীর হুজুকে উঠল মেতে। বছর খানেক বাদে কলকাতায় কলেজ ছেড়ে সে ভর্ত্তি হল এসে এক মফঃস্বল কলেজে।

দিন যতই কেটে যায় ধারার সাথে তার সম্বন্ধ যেন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হযে উঠতে লাগলো। দুর্গাদাসের অসুখ করলে ধারা স্কুল চুলোয় দিয়ে বসে থাকে তার মাথার পাশে—সারাদিন তার কেটে যায় অশ্রান্ত সেবায়। ডাক্তার নাগ যেন সংসারের কোন খবরই রাখেন না। আর মিসেস নাগ তার একমাত্র মেয়েকে কোনদিনই শাসন করে বশে আনতে ভালবাসতেন না। তাই যখন সে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে দেশের কাজে যেতে চেয়েছিল তখন তিনি শুধু বলেছিলেন—'নিজেকে তৈরী করে; নিজেকে ঠিক রেখে তবে পরকে তৈরী করতে যেও।'

ফুটবল, থিয়েটারের ওপর ঝোঁকটা দুর্গাদাসের ছোটবেলা থেকেই ছিল। সেদিন কলেজ থেকে ফুটবল খেলে যখন সাতটার সময় দুর্গাদাস বাসায় ফিরল, তখন দেখল তার বিছানার ওপর চুপটী করে বসে রয়েছে ধারা। কাপড় ছেড়েই দুর্গাদাস আনমনে পড়তে বসল—আস্তে আস্তে খাবারটা টেবলের ওপর রেখে ধারা বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে খাবারটা সরিয়ে রেখে দুর্গাদাস বেশ শান্ত গলায় ডাকল,—ধারা, ধারা!—

ধারা বোধহয় পাশের ঘরেই ছিল, ঘরে ঢুকতেই দুর্গা ব'লল,—তুমি আমাকে বড় বেশী যত্ন কর।

জানি।

কেন কর বলতে পার?

আমি নিজে যেন একটু একটু বুঝতে পারি—তবে পরকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই—

আচ্ছা। এখন যাও। হ্যাঁ শোন, বাড়ীতে বল, কালই আমি বোর্ডিংএ চলে যাব।

কেন?

সে কৈফিয়ৎ বোধহয় ডাক্তার নাগকে দিলেই চলবে। ধারা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ কি ভেবে দুর্গাদাস দু' মিনিটেই খাবারগুলো সাবাড় করে দেখলো পান নেই। উঠে ধারার ঘরের দিকেই এগিয়ে চলল; ঘরে ঢুকে দেখলো ধারা নিঃশব্দে দুটো তৈরী পান হাতে করে দাঁড়িয়ে—মুখটায় আলো না পড়লেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে কাঁদছে। দুর্গাদাস এগিয়ে যেতেই ধারা হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিল। দুর্গাদাস ভাবছিলো এইবার হয়ত ধারা তাকে বুঝতে পেরেছে, এইবার হয়ত এসে লুটিয়ে পড়বে তার পায়ে। কিছুক্ষণ ঠিক একভাবে কেটে যেতে দুর্গাদাস ব'লল—কি টেবলের ওপর পান রেখে আসনি কেন?

এবার বেশ সরল সোজা গলায় ধারা উত্তর দিল—আশ্রয়দাত্রীকে ঝি ব'ললে বোধহয় অপমানি তাকে করা হয় না,—যাও বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।—

দুর্গাদাসের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। সে বেরিয়ে এল শুধু ও ঘর থেকেই নয়। পরদিন সকাল বেলায় দেখা গেল বন্ধু সুনীলের রুমে সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

২

মানুষের ওপরেও যেন একজন মাতব্বর আছে। সবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে মানুষ চ'লতে পারে কিন্তু তার নির্দ্দিষ্ট পথ এড়িয়ে চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। টেষ্টের আগে দেখা গেল সেই দুর্গাদাসই ধারার স্বামী—শুধু মামার মতে নয়—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। বিয়ে হ'য়ে গেল, কিন্তু ফুলশয্যার রাতে দুর্গাদাসকে ধারার পাশে পাওয়া গেল না। সে কিছুতেই ধরা দিল না, আজ সে তার সমস্ত প্রতিশোধ একটি রাতেই নিঃশেষ করে নিল, ধারার ব্যথার ওপর দিয়ে। কিন্তু ভোর হ'তেই সে এসে ধারাকে ডেকে নিয়ে গেল ওপরের ছাতে—দুহাত দিয়ে ধারার ব্যথায় ভরা অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে ব'লল—কেন বোকার মত কাঁদ? মানুষে তোমার আমার সম্বন্ধ যে ভাবে নেবে তুমিও কি সেই চোখে দেখবে?

ধারা তার বুকে মাথা রেখে বলল—তোমার ওপর কি আমার এতটুকু অধিকার নেই......সে আর ব'লতে পারল না। হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে ভিজে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে দুর্গাদাস ব'লল,—কিন্তু তোমার ওপর ত আমার বেশ অধিকারই রয়েছে—মুখটা নীচে করে ধারার কপালে একটা চুমু দিতেই ধারা মুখ তুললো—কি যেন সে বলতে চায় কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কলেজের সময় হ'ল বলেই দুর্গাদাস বেরিয়ে গেল।

এর পর ওরা এক সপ্তাহ বেশ আমোদেই কাটিয়ে দিল। চাঁদনি রাতে দুর্গাদাস বাইকের পেছনে করে ধারাকে নিয়ে যায় কলেজে বেড়াতে, নিয়ে যায় অজয়ের ধারে তার গান শোনাতে,—নিয়ে যায় বনের বুকে তার মনকে খুলে দেখাতে। ধারা যেন স্বপ্ন দেখে, ভাবে জগৎ শুধু স্বপ্নেই ঘেরা—দুর্গাদাসের বুকের ওপর মাথা রেখে তার কোলটিতে বসে সে গায়—

'আজি ফাল্গুন বাযে তব তনুর সুবাস—
বহিয়া এনেছে প্রিয় উতল বাতাস'

এমনি ক'রে ওদের দিন কাটে স্বপ্নের মাঝে। হঠাৎ বাস্তবের রূপ নিয়ে এসে দেখা দিল শেষ পরীক্ষা। পনের দিনের জন্যে ছুটী নিয়ে দুর্গাদাস হেসে চ'লল, কিন্তু মন

যেন ওর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে……ধারা শুধু ভগবানকে ডাকে। হঠাৎ সংস্কৃত পত্রিকায় প্রশ্ন দেখে দুর্গাদাস বেরিয়ে এল—ধারার কাছে এসে ব'লল—'আমার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধের জন্যে যেন মন্ত্র দিয়েছে—কলার পরীক্ষ, থাক দরকার নেই আমার পাশ করে—ধারার মুখটা একটু আঁধার হয়ে আসে, মনটা পড়ে মুষড়ে তবুও হাসি টেনে এনে বলে—থাক তবে।

মানুষের সংসার ঠিক যেন জাপানী সাইকেল, ও যে কোন সময় বিগড়ে বসে তা বলা যায় না। সেদিন হঠাৎ ধারা বলল,—যদি পরীক্ষেটা দিতে তবে এমনি অকেজোর মত বসে থাকতে হ'ত না—। দুর্গাদাস উত্তর দিল—তার মানে—তোমার বাবার ভাত ধ্বংস হ'ত না—

—নিশ্চয়।

—বেশ—দুর্গাদাস গুম হ'য়ে রইল। রাত্রের গাড়ীতেই সে কলকাতায় রওনা হবে, কেউ তাকে ঠেকাতে পারল'না। যাবার সময় দূরের বনে কি একটা পাখী রুক্ষ-স্বরে তিনটে ডাক দিল।

ধারার বুকটা কেঁপে উঠতেই সে ব'লল,—শোনো।

কিন্তু শোনবার সময় বুঝি হ'লনা, কারণ দুর্গাদাস তখন যাত্রা করেছে।

৩

কলকাতায় এসে ও ধারার প্রায় পাঁচ ছয়খানা চিঠি পেল। শেষে না থাকতে পেরে শুধু এইটুকুই লিখলো—তোমার বাপের অন্ন ত এখন ধ্বংস করছি না—এখন আবার অত তাড়া কেন; জানি আমায় নিয়ে তুমি সুখী হতে চাওনা'—। আঘাত ধারার বুকে বড় বাজে। ওর আর চিঠি দেবার ক্ষমতা রইল না। সারা দিন রাত ও শুধু চিঠিখানা কাছে নিয়ে বেড়ায়—তার স্বামীর চিঠি কিন্তু খুলে পড়তে সাহস করে না—নিষ্ঠুর আঘাত! মাকে বলে—এ চিঠি তোমায় দেখাবার নয়—তবে তোমায় সে প্রণাম জানিয়েছে। ক্রমেই ও যেন দুর্বল হয়ে পড়ে—দুর্গাদাসকে খবর দিলে সে তার জবাব দেয় না।

একদিন দুপুর বেলায় টেবলের ওপর একটা টুল রেখে ধারা দুর্গাদাসের বিএ পড়বার বইগুলো নাড়ছে—বইগুলো রয়েছে মাথার ওপরের শেলফের ওপর—হঠাৎ একটা মোটা বই পেড়ে তার ঝোঁক সামলাতে না পেরে ধারা টুল শুদ্ধ এসে মাটীতে প'ড়ল। মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল—সবাই এসে দেখলো অজ্ঞান। মাঝে মাঝে দু' একবার চীৎকার করে ওঠে—'ভুল বুঝেছ'—'ভুল বুঝেছ'—সবাই ব্যস্ত হ'য়ে রাত কাটায়।

* * * *

বিকেলে চাকরীর চেষ্টা থেকে ফিরে দুর্গাদাস রাত্রের মত এসে উঠল এক বন্ধুর মেসে।

…তোমায় অত করে আসতে লিখলাম তুমি এলে না কেন?…

…'তোমার ওপর রাগ করে'…

কিন্তু রাগ ত আমারও হ'তে পারে, প্রতিশোধ ত আমিও নিতে পারি…। ধারা ফুলবাগানের দিকে চ'লল। দুর্গাদাস ক্রমেই এগিয়ে যায়—কিন্তু ধারাকে যেন চোখের সামনে থেকে হারিয়ে ফেলে,—হঠাৎ যেন অন্ধকার হ'য়ে আসে—ভয়ে চীৎকার করে ওঠে…'ধারা'…'ধারা'…'ধারা' …সবাই ঘুম থেকে চম্‌কে উঠে দুর্গাদাসকে ডেকে তোলে। দুর্গাদাস তখন কাঁদছে—চোখের জলে ওর সমস্ত বালিশ ভিজে—সবাই বলে কাকে ডাক্‌ছিলে—? বোকার মত ও ঘুম থেকে উঠে সবার মুখের দিকে তাকায়—কোন উত্তর দিতে পারে না।

তখুনি উঠে ও গেল বাসায়—দেখ্‌ল ওর নামে এক টেলিগ্রাম—ধারা গুরুতরভাবে পীড়িত।

দুর্গা তখুনি রওনা হ'ল। এক মাসের টিউশনের টাকা দিয়ে ও কিছু ফল আর একখানা লাল পেড়ে শাড়ী কিনলে।

সন্ধ্যেবেলায় যখন ঘাটে সে নামলো তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে—অজয়ের জলে ধারার শেষ চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। দুর্গাদাস চ'মৃ…। বাড়ী তখন কান্নার রোলে আবার ভরে উঠলো—কারো সাথে কথা না ব'লে—ও গিয়ে ধারার সেই ঘরে—খাটের ওপর পড়ে—আলো নিভিয়ে—দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পরেই যেন শুনতে পেল কে খুব

চেপে চেপে কাঁদছে—বোঝা গেল না ঘরে কি বাইরে……
…দরজার কাছে এসে ধারা দুর্গাদাসকে ডাকলো……
—'এসো চাঁদনী রাতে একটু অজয়ের পাড়ে ঘুরে আসি—ভয় ক'রছে ? তবে চল ফুলবাগানে—'

ধারার এ করুণ চোখের কাতর মিনতি আজ দুর্গাদাস এড়াতে পারল না। ধারা আগে আগে চল্লে—জ্যোৎস্নার আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা গেল পরিধানে দুর্গাদাসের দেওয়া সেই লাল পেড়ে শাড়ী—

এক জায়গায় গিয়ে ওরা দুজন বসল—ধারা ব'লল 'সেই গানটা গাও—মরণ আমার কেন ডাকে ইসারায়—'

দুর্গাদাস বাধা দিয়ে ব'লল—'ওসব কেন, তার চেয়ে—আজি এ জোছনা রাতে'—

তাকে শেষ করতে না দিয়েই ধারা নিজেই ধরল'

'বলে চলে আয় ওরে চলে আয়,
মরণ আমারে কেন ডাকে ইসারায়'—

সেই দিন গভীর রাত্রে নিদ্রিত পল্লীর বুক-চিরে শোনা গিয়েছিল একটা মর্মন্তুদ আর্ত্তনাদ—ধারা দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমিও যাব।

পরদিন সকালে দেখা গেল দুর্গাদাস ফুল বাগানের কোনের হেনা গাছটার পাশে পড়ে রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

বন্দেমাতরম্

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নহে গায়ত্রী নহে ওঙ্কার ছন্দে গ্রথিত মন্ত্র,
অম্বর ধরা কম্পিত করি উঠিল একি এ মন্ত্র!
নহ তুমি শুধু ভাষা ও ভাবের সম্রাট্ দূরদর্শী,
চির জাগ্রত এ তব মন্ত্র সজীব সুধাবর্ষী।

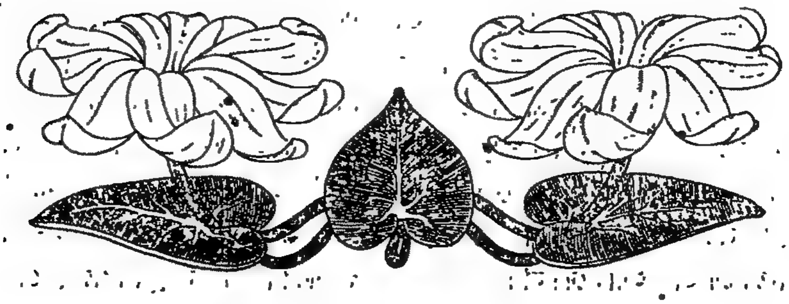

সেবা ধর্ম্ম *

শ্রীহরিহর শেঠ

সঙ্কোচের সহিত আমি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলেও, আমি আপনাদের সেবা সমিতির এই অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইহা একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার বয়স এবং আপনাদের গ্রাম ও পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থার অনুপাতে ইহা আদৌ অকিঞ্চিৎকর নহে। ইহার আড়ম্বরময় বহুশোভা ও উদ্দীপনাপূর্ণ কর্ম্মতালিকা না থাকিলেও, উদ্দেশ্যমূলে যে মহাপ্রাণতা নিহিত আছে তাহা কখনই উপেক্ষনীয় নহে। ইহাকে একটি মহাতরুর ক্ষুদ্র বীজ বলিতে পারা যায়।

আর্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শোকাতুরকে সান্ত্বনা-দান ইহার অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়, জীবসাধারণ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। মনুষ্যত্বের চরম পরিচয় ইহাই। সংসারি মানবের পক্ষে অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে দুস্থ দরিদ্রকে নিজ নিজ ক্ষমতা মত সাহায্য করা একটি অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। যে সব লইয়া সংসার আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব, ইহা তাহারই অন্যতম। গৃহস্থের বাটী হইতে মধ্যাহ্নে ক্ষুধার্থকে ফিরিতে হইলে সে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। অতিথি ভগ্নাশ হইয়া ফিরিলে গৃহস্বামীকে অতিথির সমস্ত দুষ্কৃতি লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিগুলি দিতে হয় ইহাই পুরাতন শাস্ত্র বচন। অতিথি অভ্যাগতগণ তখন নারায়ণ আখ্যায় অভিহিত হইত।

আজকাল দেশের বহু স্থানে সাহায্য সমিতি ও সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে দুস্থ দুর্গতদের জন্য অতিথিশালা, সদাব্রত, অন্নছত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সে সকল প্রায় অর্থশালী ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইত। পাঁচজনের চেষ্টায় পাঁচ-জনের সহায়তা লইয়া মিলিতভাবে সেবা বা সাহায্য করার প্রথা তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনা যায় না। ইহা আধুনিক; বহু বিষয়ের ন্যায় ইহাও একটী আবশ্যকীয় কার্য্যের কালোপযোগী সংস্কৃত ব্যবস্থা। তখনকার কালে দীন দরিদ্রদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য গৃহস্থের গৃহে দ্বারস্থ হইলেই যথেষ্ঠ হইত। তখন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে গোলাভরা ধান্য, প্রান্তরে মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণী ছিল। তাঁহাদের অবস্থার সাচ্ছল্য, ভোজ্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাঁহারা বিরক্তির পরিবর্ত্তে অতিথির সেবা করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। পল্লী তখন সর্ব্বপ্রকারেই সুষমামণ্ডিত ছিল। নানা কারণে আজ সেদিন নাই, সে সুযোগের সহিত সে মনোবৃত্তিরও লোপ পাইয়াছে, অন্যদিকে অবস্থার ফেরে এখন দেশে দীন দরিদ্রদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অন্নবস্ত্রের জন্য দেশব্যাপি হাহাকার উঠিয়াছে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও অন্নহীন ভিখারী বলিতে সাধারণতঃ যে দরিদ্র-শ্রেণীকে বুঝাইত, আজ শুধু সেই শ্রেণী নয়, নিরন্ন বেকার ভদ্র-সন্তানদের চীৎকারেও গগন পবন বিদীর্ণ হইতেছে। দেশের অবস্থার মধ্যে এই পরিবর্ত্তনে ইহার প্রতিকার পন্থারও পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে। মহর্ষি বেদব্যাস কোন অতীতযুগে বলিয়া গিয়াছেন "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে" সত্যই অধুনা ইহা বহুক্ষেত্রেই প্রযুজ্য। লোক সাহায্য, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, সন্তপ্ত ও আর্ত্তজনের সেবা ও দুঃখ-মোচন বিষয়েও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করা ভিন্ন আর কোন সু-উপায়ই বা আছে। সুতরাং দীনজনকে সেবা সহায়তা

* ভদ্রেশ্বর মাণিকনগর সেবাসমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

করিবার জন্য দেখা যাইতেছে সঙ্ঘ-সমিতি কালেরই উপযোগী।

আপনাদের উদ্দেশ্য মধ্যে আছে দরিদ্র নরনারীকে রোগে সেবা করা, ঔষধ ও পথ্যের দ্বারা সাহায্য করা, দরিদ্র বালক বালিকার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মৃতের সৎকারে সহায়তা করা এবং দীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিধবাগণের জীবিকার্জ্জনের সুবিধার জন্য গৃহশিল্পের প্রবর্ত্তন করা। এই সকল মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য প্রয়োজন শুধু অর্থ নয়, তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সদিচ্ছাসম্পন্ন লোকবল। সমষ্টিগত শক্তির দ্বারা এ সকল কার্য্য যত সহজে এবং সুব্যবস্থিত ভাবে সাধিত হইতে পারে, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় ব্যষ্টিগত ভাবে সেরূপ হওয়া সম্ভব হয় না। সদিচ্ছাপ্রণোদিত সভ্যগণ দ্বারা একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সমিতির মধ্য দিয়া এ সকল কার্য্য সুচারুরূপেই সাধিত হইতে দেখা যায়। এই যে সেবা, রোগীর পরিচর্য্যা, দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষাদান এ সবের মধ্যে অর্থহীন নিঃসম্বলেরও করিবার অনেক কিছু আছে। সেজন্য শুধু প্রবৃত্তি এবং সামান্য দৈহিক সামর্থ্যের আবশ্যক। ইহার দ্বারা জগতে অনেক কাজ করা যাইতে পারে। হৃদয়ই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন, ইহার অধিকারী যিনি তাঁহার দ্বারা জগতের বহু হিতসাধন হইতে পারে, কিন্তু অর্থ সম্পন্ন হৃদয়হীনের দ্বারা তাহার কিছুই সম্ভব নয়। গৈরিকধারী অর্থ সামর্থশূন্য স্বামী বিবেকানন্দ কটিবাসমাত্র পরিহিত মহামানব মহাত্মা গান্ধী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মৃতের সৎকার এবং সেই কার্য্যে সাধ্যমত অর্থসাহায্য ইহা একটি অতি মহৎকার্য্য। রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে ব্যক্তি পার্শ্বে থাকিয়া সহায়তা করেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বন্ধু নামে অভিহিত করিয়াছেন। এহেন কার্য্যে অর্থের যাহা আবশ্যক তাহা প্রায় কিছুই নহে।

আমার বরাবরই মনে হয় এবং অনেক সময়ই বলিয়াছি দাতব্য ভাণ্ডার সাহায্য সমিতি প্রভৃতি এইভাবের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই সাধারণের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া দুস্থদিগকে নিয়মিতভাবে তাহা বিতরণ করিয়া তাহাদের অভাব মোচনে যত্নবান। তাঁহারা যদি সেই সঙ্গে দুস্থদরিদ্রদের মধ্যে যাহারা অপটু নহে কোন না কোন কর্ম্মক্ষম, তাহাদের যাহাতে অন্নবস্ত্রের অভাব না ঘটিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন সম্ভবপর উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হন তাহা হইলে প্রার্থীদের অধিকতর উপকার করা হয় এবং তদ্বারা সমাজও উপকৃত হয়। প্রার্থী অথবা দুস্থদের দান করাই যথেষ্ট নহে। যে দানের দ্বারা গ্রহিতার সঙ্কোচ আসিতে বা দান গ্রহণ জন্য একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা আসিতে পারে সে দান নিকৃষ্ট দান, যে দান গ্রহণ জন্য দাতার কাছে গ্রহিতার হৃদয় বিক্রীত হইয়া যায় সে দান অপকৃষ্ট শ্রেণীর দান, তাহা দানই নহে। গ্রহিতা সকল অবস্থাতেই দাতার অপেক্ষা নিম্ন পদবিতে অধিষ্ঠিত থাকে ইহা স্বাভাবিক, তদুপরি যদি তাহাকে সেই জন্য অন্তরে নিপীড়িত হইতে হয় তবে তাহার জীবন বিষবৎ হইয়া উঠে। ভিক্ষাব্যবসায়ী ভিখারী যাহারা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের অভ্যাসজনিত সহনশীলতা কিছু বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যাহারা কখন ভিক্ষা করেন নাই প্রতিবাসী পাঁচজনের একজন হইয়াই পুরুষানুক্রমে কাটাইয়া আসিয়া অবস্থাবৈগুণ্যে আজ ভিক্ষার্থী তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা পেটের জন্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র কন্যার জন্য লজ্জা সম্ভ্রম বংশমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া হাত পাতিয়াছেন, তাহাদের যাহাতে দান গ্রহণ জনিত ব্যথা যথাসম্ভব কম মর্ম্মপীড়াদায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অনুষ্ঠাতৃদের একান্ত কর্ত্তব্য। এজন্য আমার মনে হয় একমাত্র উপায় তাহারা যাহাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছে ইহা না উপলব্ধি করিতে পারে তাহার পন্থা স্থির করা। তাহাদের যেরূপ ক্ষমতা যাহাতে তাহারা সেই পরিমাণ কোন কাজ করিয়া দিতে পারে বা ঘরে বসিয়া অনুষ্ঠাতৃদের নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থামত কোন সহজসাধ্য শিল্পকার্য্য করিয়া দিতে পারে সে উপায় করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। শেষোক্ত ব্যবস্থাই অধিকতর সমীচীন। চেষ্টা করিলে কোন কোন উটজ শিল্প যে এভাবে প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে না তাহা মনে হয় না। বারাসত ও গোন্দল পাড়ার অনাথ ভাণ্ডারের অধিবেশনে এবং বহরমপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী-সমিতিতেও আমি এই কথা বলিয়াছিলাম।

জানিনা তাঁহাদের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়াছে কিনা। আপনাদের কার্য্যবিবরণী হইতে দরিদ্র বাল-বিধবাদের মধ্যে গৃহশিল্প প্রবর্ত্তন দ্বারা সাহায্যের কথা জানিয়া আমি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। শুধু বিধবাদের জন্য নয়, আমি বলি আপনারা অন্যান্য দুস্থ, যাহারা নিতান্ত হীনবল ও আতুর নহে তাহাদের জন্যও এই ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হউন। তাহাদের নিকট হইতেও এমন অনেক কিছু পাওয়া যাইতে পারে পৃথিবীতে যাহার মূল্য আছে। এ কার্য্যের দ্বারা তাহাদের লাভ, আপনাদের লাভ এবং দেশের লাভ। ইহা দ্বারা তাহাদের ভিক্ষাজনিত হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া জীবনকে উন্নত করিবে। তাহাদের জীবনের যে একটুও সার্থকতা আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া অশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। ইহার দ্বারা শুধু ভিক্ষার্থীদলের উপকার নহে সমগ্র দেশের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। তাহারাও যেমন মনে করিতে পারিবে এ দান গ্রহণ নয, সাহায্য প্রাপ্তি নয, তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ ন্যায্য উপার্জ্জন, তেমনই তাহাদের সহজলভ্য শক্তি সমবায়ে কর্ম্মী দেশবাসীর চেষ্টায় দেশের একটা মহা সমস্যা দূর হওয়ার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারিবে।

মিলিত শক্তির চেষ্টায় অনেক কাজ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করার পথে বাধাও অনেক। পূর্ব্বে বলিয়াছি সদিচ্ছা-প্রণোদিত সভ্যগণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত সমিতির মধ্য দিয়া উক্ত সকল কার্য্য সুচারু-রূপেই সাধিত হইতে পারে। একথা সত্য, ইহার মধ্যে সংশয় নাই। কিন্তু এরূপ সভ্যমণ্ডলীর দ্বারা গঠিত সমিতি সুলভ নহে। যে উদ্দেশ্য লইয়া সভা বা সমিতি গঠিত হয় অন্তরে বাহিরে মাত্র সেই উদ্দেশ্য ধরিয়াই অগ্রসর হওয়া দরকার। অনেক সময় দেখা যায় সভ্যবৃন্দের মধ্যে মনের অনৈক্য হইতে সমিতির বিলোপ সাধন হইয়া থাকে। মতের অনৈক্য হইলেও মনের অনৈক্য সময় সময় হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় অন্য কারণও থাকে, তাহা প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভের হীন প্রচ্ছন্ন লালসা। পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষেত্রে যে একমত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই, সে সময় সকলকে বুঝাইয়া হয় একমত হইতে হইবে নচেৎ অধিকাংশের মত মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট মনে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ইহার জন্য আশঙ্কার তত কারণ নয় যত কারণ অন্যটিতে। দরিদ্রনারায়ণের পূজা দীনজনের সেবারূপ উন্মাদনাহীন কাজের ভার লইয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে আপনারা স্বেচ্ছায় যখন এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনাদের সে আশঙ্কা নাই। আজকাল দেশ সেবা বলিতে সাধারণতঃ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতির সদস্য হইয়া কাজ করাকেই বুঝায়। কিন্তু আপনারা যে কাজ লইয়াছেন ইহাই দেশসেবার পবিত্র সোপান। যিনি এই পুণ্যব্রত দেহ মনে গ্রহণ করিয়াছেন, নিজকে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য, তিনি যুবক হউন বালক হউন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

আমি যতদূর জানি এই সব সভাসমিতির প্রাণ অধিকাংশ স্থলেই সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানগণ। তাঁহাদের অনেকেই হয় বিদ্যালয়ের ছাত্র না হয় অল্পদিন-মাত্র পঠদ্দশা ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অর্থস্বাচ্ছল্য থাকা সম্ভবপর নহে। এজন্য স্থানীয় সকল সম্পন্ন ব্যক্তির সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্য আবশ্যক। যদি এই শিশু সমিতি এখনও সে সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ না হইয়া থাকে, ইহার কার্য্যের দ্বারা অচিরে তাহা লাভ করিতে পারিবে। যদি কর্ম্মে আসক্তি থাকে, হৃদয়ে ঐকান্তিকতার অভাব না হয়, নিজেদের কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিয়া সমাজের যথার্থ হিতসাধনে রত হইলে অর্থাভাবে সে কার্য্য কখন পড়িয়া থাকে না। এজন্য চাই কর্ম্মপ্রচেষ্টা, চাই একতা, চাই সংহতিশক্তি। মানুষের পক্ষে যাহা সাধ্য এই শক্তিতে যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহাদের পক্ষে তাহা অসাধ্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শক্তিলাভের মূল হইতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থকে ভুলিয়া যাওয়া। দেশের ও দশের কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের জন্য যে স্বার্থ তদ্ভিন্ন কাজের সংস্রবে স্বতন্ত্র স্বার্থের স্থান থাকা চলিতে পারে না। এই স্বার্থের সংঘর্ষে কত ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। মানুষের সেবা সমাজের

সেবা, দেশের সেবা, যদি আপনাদের অন্তরের কাম্য হয়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের কাছে কোন সঙ্কীর্ণতা দুর্ব্বলতার স্থান হইবে না।

যুবকবৃন্দ, ভাই সকল, এখানকার স্থানীয় অবস্থা আমি সম্যক অবগত না হইলেও বেশ অনুমান করা যায় যে, এখানে কোন অভাবেরই অভাব নাই। আপনারা সামান্য হউন সহায়হীন হউন, প্রতিকারের চেষ্টা আপনাদেরই করিতে হইবে। সে কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে সাফল্যলাভ হইবেই। বাঙ্গালার বুকে যে নিত্য শ্মশান রচিত ও বিস্তারিত হইতেছে ইহা রোধ করিতে যদি কেহ পারে ত ছেলেরাই পারিবে। আপনারা নৈরাশ্যকে মনে স্থান দিবেন না, আগে মানুষ তারপর অন্য যাহা কিছু। পরহিতব্রত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানবের সাফল্য এক প্রকার সুনিশ্চিত। কোন সমিতিতেই এরূপ মানুষ অনেক থাকে না। অনেক উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় কাজ করেন এক বা দুইজন অন্য সভ্যগণ সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইহার অভাব ঘটিলে বিশিষ্ট কর্ম্মীর কর্ম্ম প্রতিভাও ম্লান হইয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠানটীকে শিথিলমূল করিয়া ফেলে। সুতরাং কর্ম্মশক্তি সকলের সমান না থাকিলেও একতাই বহু সমস্যা সমাধানের মূল মন্ত্র।

দেশকালের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আপনাদের এই সমিতি সকল দিক হইতেই সময়োপযোগী হইয়াছে। আজ বাঙ্গালায় আর সে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়। তখন একজনের অসুখ হইলে তাহাকে দেখিবার শুশ্রূষা করিবার লোকের অভাব হইত না। এখন রোগীকে শুশ্রূষা করা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে লোকাভাব অন্যদিকে রোগী পরিচর্য্যা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা অথচ নিত্য নূতন ব্যাধির আবির্ভাব। এ সময় সত্যই পল্লীতে পল্লীতে এরূপ একদল লোকের প্রয়োজন হইয়াছে যাঁহারা এ সমস্যা দূর করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। আপনারা সেই ব্রতই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমিতির পরিচালকবর্গের মধ্যে দুইজন চিকিৎসক আছেন আপনারা তাঁহাদের সহায়তায় এ কার্য্য অনায়াসসাধ্য করা বিচিত্র নহে। আপনারা এ বিষয় নিশ্চয়ই বিশেষভাবে মনোযোগ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। আজ যাহা আপনারা কর্ত্তব্য করিয়া লইবেন, কাল তাহাই অনাত্মীয়ের প্রতি প্রীতিরূপে দেখা দিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহাই দেশ-প্রীতির স্বরূপ হইয়া নানা কল্যাণের আকর হইবে।

দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষা বিষয় সহায়তা করিবার আপনাদের ব্যবস্থা আছে, উহা কি প্রণালীতে হয় জানি না। আমার মনে হয় যদ্যপি আপনাদের ব্যবস্থা না থাকে তবে একটি অবৈতনিক সান্ধ্য বা নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহার দ্বারা দরিদ্র বালক বালিকাদের গৃহ শিক্ষকের অভাব অনেকটা দূর করা যাইতে পারে, অথচ হয়ত সমিতির সভ্য মহাশয়দের মধ্যে কয়েকজন মনোযোগী হইলেই ইহা সম্ভবপর হয়। তবে যদি পল্লীর মধ্যে ভাল পাঠশালার অভাব থাকে তাহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা অগ্রে করা উচিত। এজন্য একজন ট্রেণিং পাশ করা শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। সমিতির বর্ত্তমান অবস্থায় এজন্য যে ব্যয় তাহা বহন করা সহজ নয়, কিন্তু সুহৃদের সাহায্য যেমন আবশ্যক ইহার আবশ্যকতাও প্রায় তদ্রূপ। আমার মনে হয় এই পাঠশালা অবৈতনিক করা সম্ভব না হইলে ছেলেমেয়েদের সামান্য বেতনের ব্যবস্থা করাও ভাল, তাহাতে শিক্ষকের বেতন সঙ্কুলান না হইলে অবশিষ্ট ভাণ্ডার হইতেই দিতে হইবে। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলেও অনেক উপকার হয়।

আপনারা অর্থাভাবে ঈপ্সিত সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। আমি স্বীকার করি, বিষয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় এখনও সমিতির কার্য্যের পরিসর কম, কিন্তু আপনাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এক বৎসরে অঙ্কুরিত হইয়াছে মাত্র। সকলের প্রারম্ভই ছোট, সে জন্য নৈরাশ্যকে মনে স্থান দিবেন না। ছোটর ভিতরেও আদর্শকে বড় করা যায়। আপনারা বড় আদর্শ ধরিয়া বরেণ্য হউন ইহাই প্রার্থনা করি।

আপনারা আজ সুযোগ দেওয়ায় প্রসঙ্গত যাহা কিছু বলিলাম তাহা নূতন কিছুই নহে। অন্যান্যস্থলেও যখনই

সুযোগ পাইয়াছি তখন ঠিক এই সকল কথাই বলিয়াছি। জানি উপদেষ্টার আসন লইয়া বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। কর্ম্মের পথে বাধা অনেক, কিন্তু যাহা খাঁটি, যাহা সত্য, তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। আপনাদের চেষ্টার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকিলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে সাফল্যলাভ অনিবার্য্য। আজ যে অর্থ সামর্থ বা সম্পদের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে যথা-কর্ত্তব্যভাবে কর্ম্মপথে আরও একটু অগ্রসর হইলে স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্পন্ন হৃদয়বান মহোদয়গণের সহযোগিতায় তাহা দূর হইবে। স্থানীয় প্রধানগণের অভিভাবকতায় তখন শক্তিশালী হইতে পারিবেন। তাঁহাদের শুধু উৎসাহ বাক্যও এই শিশু সমিতির কাছে আশীর্ব্বচন সদৃশ। তদ্‌ভাবে নিরুৎসাহ হইবেন না, নিজের কর্ম্মশক্তি ও ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া অগ্রসর হউন, তাঁর কৃপায় আপনাদের শুভ প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হইবেই।

শ্রীহরিহর শেঠ

সূর্য্য-বন্দনা

শ্রীমতী সাহানা দেবী

কালের প্রোজ্জ্বল নেত্র—হে যুগ-প্রহরী!
কত কল্প বক্ষে তব গেল অতিবাহি'
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে। কত কাল ধরি'
রয়েছ জাগিয়া স্থির নির্নিমেষ চাহি'।

তুমি খুলিয়াছ রুদ্ধ তিমির-দুয়ার
দীর্ণ করি শর্ব্বরীর কৃষ্ণ-যবনিকা
হেরিয়াছ নিয়তির গুপ্ত অভিসার
অনন্তের ভালে।

তব মর্ম্ম-পটে লিখা
কত চরাচর-লীলা, রুদ্রের নটন,
অগ্নি-মন্ত্রে সঞ্চরিত আলো-অভিযান—
যুগ-যুগান্তের কত প্রদীপ্ত-স্বপন
সুবর্ণ-সত্তায় তব আজো জ্যোতিষ্মান্।

হে সবিতা! নামি মোর অচেত-জীবনে
তব বহ্নি-শিখা জ্বালো স্তিমিত চেতনে।

খড়কুটো

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

পাত্র-পাত্রী

বলাই চৌধুরী
লীনা চৌধুরী—ঐ প্রথমা কন্যা
মীরা, নীরা, কেষ্ট, বিল্টু } অন্যান্য পুত্রকন্যা
ডাক্তার গাঙ্গুলি
ফণী হালদার
মুরারী সোম

মিস্ হেমপ্রভা—নার্স (শিক্ষানবীশ)
মিস্ গীতিকা—হাসপাতালের স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট
ডাক্তার সরকার—স্যানাটোরিয়মের প্রধান চিকিৎসক
ডাক্তার সেন—ঐ সহকারী
মিষ্টার শোভান—
পতিতপাবন—জনৈক রোগী
তরঙ্গিণী—হাসপাতালের মেট্রন
বিলাসিনী, বীণা, সুশীলকুমার ও অন্যান্য রোগীগণ
বিনোদিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দৃশ্য পরিচয়)

[সহরের উপকণ্ঠে চৌধুরীদের বাড়ীর খাবার ঘর। বাঁ দিকে এক পাশে একটি চৌবাচ্ছা। পিছনের দেয়ালে দুটি জানলা, তার মধ্য দিয়ে ভিতরকার উঠোন দেখা যায়। এক পাশে একটা খোলা আলমারী, তাকে তাকে বাসন ও চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি সাজানো। ডান দিকে বাড়ীর ভিতর যাবার দরজা। দেয়ালের গায়ে গায়ে নানারকম বাক্স, টেবিল, প্রভৃতি সরঞ্জাম। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল, তার ওপর চাদর পাতা। টেবিলের দুধারে চারখানি চেয়ার। এক পাশে দুখানা বড় রকিং চেয়ার। দেয়ালে কয়েকখানা ছবি ঝুলছে। ঘরটি মোটের উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক কোণে ষ্টোভের ওপর জল গরম হচ্ছে, ধোঁয়া উঠছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের দারুণ শীত, কাল সন্ধ্যা।

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল, বলাই চৌধুরী ষ্টোভের কাছে একখানা রকিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুরোট খাচ্ছে আর খবরের কাগজ পড়ছে। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, মোটা সোটা চেহারা, মুখে কতকটা গোঁয়াড়ে ভাব, নাকটা চ্যাপটা, ঠোঁট পুরু এবং ঝুলে পড়ার মতো, গায়ের রং তামাটে, কপালে ভাঁজ পড়া, চুল ছোট করে ছাঁটা, মাথার মাঝখানে একটু টাক। চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় লোকটা স্বার্থপর আর চতুর। গলার স্বর কর্কশ। গায়ে আছে একটা গলা খোলা ফ্লানেল সার্ট।

ছোট মেয়ে মীরা টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসে একখানা ছবির বইএর পাতা ওলটাচ্ছে। মেয়েটি রোগা, শান্তশিষ্ট, বয়স আন্দাজ আট বছর।]

বলাই। (মেয়েটির দিকে যেন হঠাৎ চোখ পড়াতে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে একটু বিদ্রূপের সুরে)—এই যে, লক্ষ্মী মেয়েটি এখানে একেবারে মুখ বুজে বসে আছে দেখচি। (মেয়েটি সলজ্জ দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো, তার চোখে তখনো স্বপ্নদৃষ্টি)—আমি তো মনে করছিলাম ঘরে কেবল আমি একাই আছি, আর কেউ নেই। মুখে যে একেবারে কথাটি নেই মীরা, কি নিয়ে এমন তন্ময়?

মীরা। ছবি দেখছিলাম এতক্ষণ।

বলাই। অবিকল দিদিটির মতো তুইও তৈরী হয়ে উঠছিস ক্রমে ক্রমে, দিন রাত শুধু বই আর বই। তোর মায়ের স্বভাবও ঐ রকম ছিল। নীরা আর কেষ্টা, এরা কতকটা বাপের ধাত পেয়েছে। কেবল বিল্টুটা হয়েছে

ভীষণ দুরন্ত, ও হয়েছে অবিকল আমারই মতো আমারই রক্তের গুণে। কিন্তু তোরা পেয়েছিস মামার বাড়ীর ধারা, যেন কেবল স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটিয়ে দিবি। (দেশলাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরাইয়া লইয়া পরম গম্ভীর ভাবে)—বেশি বেশি বই পড়া ভাল নয়। এই বয়সে ভাইবোনদের নিয়ে লাফাবি, ঝাঁপাবি, ছুটোছুটি করে বেড়াবি, তা নয় বসে বসে কেবল বই আর বই। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া)—ডাক্তার হতভাগা তো এসেছে অনেকক্ষণ, এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি করছে বল তো? লীনার সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, দেখে একটা ওষুধ লিখে দিতে আর কতক্ষণ সময় লাগে? যা তো মীরা, দেখে আয় তো, অন্য দরজা দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেছে না কি?

মীরা। (ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিল)—না বাবা, ডাক্তার ওপরের ঘরেই আছে, দিদির সঙ্গে কি কথা কইছে।

বলাই। আঃ দরজাটা বন্ধ করে দেনা বাপু, ঠাণ্ডা আসছে। (মীরা দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। বলাই শ্লেষের সুরে বলিতে লাগিল)—তেমনি ডাক্তার বটে কি না, ভিজিটের টাকা না নিয়েই অমনি চলে যাবে! ডাক্তার তো নয়, ডাকাত, গরীবদের টাকাগুলো একেবারে লুটে নিয়ে যায়! আমি মরে গেলেও ডাক্তার ডাকি না, ওষুধ আমি খেতেই চাই না। যতই ওষুধ খাবো ততই ব্যারাম লেগে থাকবে, আর ততই ওদের ভিজিট দিতে হবে। লীনা হঠাৎ কেমন অজ্ঞানের মতো হয়ে গেল, তাই আজ বাধ্য হয়ে আমাকে ডাক্তার ডাকতে হোলো।

মীরা। (উদ্বিগ্ন হইয়া)—দিদির বুঝি খুব অসুখ করেছে বাবা?

বলাই। (কর্কশ সুরে)—জানি না বাপু। দিনরাত ঘরের মধ্যে বই নিয়ে বসে বসে শরীরটাকে মাটি করে ফেললে। সেও তাই করে আর তুইও তাই করছিস। এততেও তোদের শিক্ষা হয় না। (হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া) ফেলে দে বলছি বইখানা! এ বাড়ীতে আর কেউ বই পড়তে পাবে না। আমার হুকুম যদি না মানো তবে আমি চাবুক ধরবো।

মীরা। (বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া) আমি তো শুধু ছবি দেখছিলাম।

বলাই। মুখের ওপর আর তর্ক করতে হবে না! ছবিই হোক আর পড়াই হোক, ও রকম বই নিয়ে মুখ গুঁজে থাকা চলবে না। (কিছুক্ষণ পরে বিমর্ষ সুরে) গত বছর তোর মা গিয়েছেন, তারপর থেকেই সময়টা কেবলই খারাপ যাচ্ছে। লীনার হোলো আবার শরীর খারাপ, সে যদি বিছানায় পড়ে থাকে তাহলে, কেই বা সংসার দেখবে, আর কেউ বা তোদের দেখবে? অগত্যা সেই তোদের বিনোদিনী মাসীকে আবার আনাতে হবে। তার মানেই হচ্ছে পয়সা খরচ, কিন্তু এত পয়সা আসে কোথা থেকে? সারাজীবন দাসত্ব করে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বা দু পয়সা বাঁচিয়েছি, সবই এইবার ফুঁকে যাবে। (তিক্তস্বরে) রীতিমত বড় মানুষ না হয়ে যে কতকগুলো ছেলেপুলের পাল জন্ম দেয় তার মতো নিরেট গাধা কি আর দুনিয়ায় আছে? (পুনরায় করুণ সুরে) জানিস মীরা, ভগবানের এ কত বড় অন্যায় বিচার, যখন আমার নিতান্ত দরকার ঠিক সেই সময়টিতেই তোর মাকে তিনি সরিয়ে নিলেন। (মীরা কাঁদিয়া ফেলিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া) তুই আবার প্যান্ প্যান্ সুরু করলি কেন?

মীরা। (সজলনেত্রে)—মায়ের জন্যে মন কেমন করচে।

বলাই। (রাগতভাবে)—বছর পেরিয়ে গেল, এখন আবার নতুন করে মায়াকান্না কাঁদা হচ্ছে! চুপ কর বাপু, ভাল লাগে না, (মীরা কান্না চাপিয়া চুপ করিল)

[রাস্তায় ছেলেদের উচ্চহাসি ও চীৎকার শোনা গেল। পিছনের দরজা সজোরে খুলিয়া নীরা ও কেষ্ট হাঁফাইতে হাঁফাইতে ভিতরে প্রবেশ করিল। নীরার বয়স আন্দাজ বারো, হৃষ্টপুষ্ট, সুশ্রী, চতুরা, মুখে চাঞ্চল্য এবং দুষ্টামি মাখা। কেষ্টর চেহারাও কতকটা নীরার মতো। সবল সুস্থ দেহ, নীরার অপেক্ষা বছর খানেকের ছোটো। উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল বিল্লু, মুখে বিরক্ত ভাব। বিল্লু তাহার বাপের চোদ্দ বছর বয়স্ক প্রতিচ্ছবি, বাপের সে সকল বিষয়েই নকল করে, এমন কি তাহার কর্কশ গলার আওয়াজটুকু পর্য্যন্ত।]

বলাই। (গম্ভীরস্বরে)—এই যে, গরুর পাল একসঙ্গেই এসে জুটেছো? তা দরজাটা দয়া করে বন্ধ করো, ঠাণ্ডায় মরলাম যে।

নীরা। (বাপের সম্মুখে আসিয়া লাফাইতে লাফাইতে) কেষ্টাতে আর আমাতে রেস্ হচ্ছিল বাবা। আমি একে হারিয়ে দিয়েছি। (ভাইয়ের দিকে জিভ ভেঙাইয়া) দুপা নড়তে পারে না।

কেষ্ট। আমায় হারাতে বুঝি পেরেছিস?

নীরা। হাঁ হারিয়ে দিয়েছি তো।

কেষ্ট। মোটেই না। ফাঁকি দিয়ে জিতেছিস্। সিঁড়িতে আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে তবে তো এগিয়ে গেলি! জোচ্চোর!

নীরা। (চটিয়া) মিথ্যেবাদী! নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়লি, আবার চালাকি? আমি তো ঠিকই জিতেছি, নয় বাবা?

বলাই। (স্মিতমুখে) হাঁ, হাঁ, ঠিকই তো জিতেছো। (কেষ্ট মুখভার করিয়া দূরে একটা চেয়ারে গিয়া বসিল, বলাই নীরার চুলের উপর হাত বুলাইতে লাগিল) তোমার সঙ্গে দৌড়ানো কি সোজা কথা।

নীরা। (কেষ্টকে মুখ ভ্যাঙাইয়া) শুনলি তো মিথ্যেবাদী? (সে মীরার কাছে গিয়া টেবিলের উপর উঠিয়া বসিল)

বলাই। (বিল্লুর প্রতি রুক্ষস্বরে) আমি যে চুরুট আনতে বলেছিলাম তা কি আনা হয়েছে?

বিল্লু। নিশ্চয় (পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া দিল। নীরা ইতিমধ্যে অলক্ষ্যভাবে টেবিল হইতে নামিয়া টেবিলের নীচে প্রবেশ করিল)

বলাই। তুমি যে ভুলে যাও নি এটা আশ্চর্য্যের বিষয় বলতে হবে। (চুরুট ধরাইল)

কেষ্ট। (হঠাৎ টেবিলের নীচ হইতে পা টানিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া) ওঃ, গেলুম, গেলুম! দেখাচ্ছি মজা! (সে টেবিলের নীচে লাথি ছুড়িতে লাগিল, কিন্তু নীরা ততক্ষণে টেবিলের অপর প্রান্তে সরিয়া গিয়াছে)

বলাই। (ক্রুদ্ধ হইয়া) থাম্, অত বড় হাঁ করে চেঁচাতে হবে না। কি, হয়েছে কি?

কেষ্ট। (চেঁচাইয়া) নীরা আমায় এমন জোরে চিমটি কেটে পালিয়ে গেল, আবার এখন দাঁত বের করে হাসছে দেখনা!

নীরা। (পুনরায় টেবিলের উপর উঠিয়া বসিয়া) আহাহা, মরে যাই, ছিঁচ কাদুনে! বেশ করেছি।

কেষ্ট। দাঁড়াও না, মজা দেখাচ্ছি। লীনাদি'কে বলে দিলে টের পাবে মজা!

নীরা। দাও গে না বলে! লীনাদি'র তো অসুখ করেছে।

কেষ্ট। সেই জন্যেই তোর এত আস্পদ্ধা বেড়েছে। সে সামনে থাকলে তোর কি এত সাহস হোতো?

বলাই। (বিরক্ত হইয়া) থাম্ থাম্, আর গোলমাল করতে হবে না। যে যার বিছানায় গিয়ে এবার শুয়ে পড়ো। মীরা ওদের সঙ্গে তুইও যা।

নীরা। (মীরার চুল ধরিয়া টানিয়া) আয় মীরা।

মীরা। আঃ! গেছি গেছি! (কাঁদিতে লাগিল)

বলাই। (ধমক দিয়া) চুপ কর বলছি! ফুলের ঘায়ে একেবারে মূর্চ্ছা গেলেন! দিন রাত তোর প্যান্‌প্যানানি ভালো লাগে না। চুপ করবি কিনা শুনি! এক্ষুণি যদি বিছানায় গিয়ে না শুবি তো ঠ্যাঙানি খাবি বলছি। লীনা যদি একবার চোখের আড়াল হয়েছে তো অমনি তোদের মাথায় যেন ভূত চাপে। যা বলছি সব? (সকলে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল) আর যদি চেঁচামেচি শুনবো তো মেরেই ফেলবো।

নীরা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) বাবা একবার লীনাদি'কে দেখে আসবো?

বলাই।—না না, লীনাদি'র কাছে ডাক্তার রয়েছে। (তাড়াতাড়ি সুর বদলাইয়া) আচ্ছা, যা যা, তাহ'লে ডাক্তারটা হয়তো তাড়াতাড়ি বেরোবে। অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত সেখানেই থাকবে না কি? (নীরা চলিয়া গেল। বিল্লু চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। বলাই চেয়ারে বসিয়া একটা যন্ত্রনাসূচক শব্দ করিল) পারিনে বাবা, পায়ের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠলো। লীনা যদি আরো কিছুদিন এমনি বিছানায় শুয়ে থাকে তাহ'লে এরা কি আর আমার কিছু বাকি রাখবে?

বিল্লু। লীনার অসুখ কি খুব বেশি?

বলাই। (তাচ্ছিল্যের সুরে) একটু ঠাণ্ডা লেগেছে

ছাড় কি! (বিষণ্ণভাবে) তোমার মাও কিন্তু গেলেন বুকে ঠাণ্ডা লেগে। (বিলু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল) ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে, কিন্তু এত পয়সা যে কোথা থেকে আসে সেই তো ভাবনা। (পুত্রের দিকে চাহিয়া) তোমারও তো মাইনে এখন কিছু বাড়বে না!

বিলু। (হতাশভাবে) না। যে কৃপণ আমাদের মনিব, একটি পয়সা কারো মাইনে বাড়াতে রাজি নয়।

বলাই। (শ্লেষের সুরে) তোমার মত এত বড় ছেলে, হপ্তায় মাত্র পাঁচটি করে টাকা রোজগার! লোকের কাছে বলতেও লজ্জা হয়। লীনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে কী ভুলই করেছি, ভেবেছিলাম তোমার একটা রোজগার বাড়লে তাতে আমার কিছু সাশ্রয় হবে।

বিলু। স্কুলে গিয়েই বা আমার কি লাভ হয়েছে? মাষ্টারগুলো কেবল তাড়া দিতেই জানে। কিই বা সেখানে শিখেছি?

বলাই। (বিরক্তির ভাবে) যে মোটা বুদ্ধি তোমার, কোথাও গিয়ে কিছু শিখতে পারবে না তা আমার জানা আছে। (সিঁড়িতে পায়ের শব্দ) ঐ ডাক্তার নেমে আসছে। দেখি আবার উনি কি বলেন। (ডাক্তার গাঙ্গুলি প্রবেশ করিল। মোটাসোটা, মধ্যবয়সী, টাক মাথায় লোকটি, জোরে জোরে কথা কয়, রোগীদের প্রতি নরম সুরে উপদেশ দেয় না, আদেশ করে। বলাই কপট বিনয়ের সহিত বলিল) হাঁ ডাক্তারবাবু, লীনাকে কেমন দেখলেন বলুন তো? হঠাৎ কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে ভাবটা কেটে গেছে তো?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (কথার কোন জবাব না দিয়া তিনি গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া আসিলেন ও দু'খানি কাগজ হাতে করিয়া হুকুমের সুরে বলিলেন) এই দুখানা প্রেস্কৃপ্সন এখনি পাঠিয়ে দাও, ডাক্তারখানা থেকে সার্ভ করিয়ে আনুক।

বলাই। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) বিলু, যাতো দৌড়ে ওষুধগুলো নিয়ে আয় তো। (ডাক্তার বিলুর হাতে প্রেস্কৃপ্সন দিলেন)

বিলু। কৈ, টাকা দাও।

বলাই। (একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পকেটে হাত দিলেন) কত আন্দাজ লাগবে ডাক্তার?

ডাঃ গাঙ্গুলি। একটা টাকা লাগবে হয়তো।

বলাই। (প্রতিবাদের সুরে) এক টাকা! সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছে তার জন্যে এত দামী ওষুধ? (ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কঠিন মুখভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল এবং বিলুর হাতে একটি টাকা দিল) খুচরো কিছু বাঁচে তো ফেরৎ এনে দেবে। চালাকি কিছু কোরো না যেন, কালই আমি ডাক্তারখানায় গিয়ে জেনে আসবো কত দাম পড়েছে।

বিলু। ছি ছি, আমাকে তুমি কি ভাবো? (টাকা লইয়া চলিয়া গেল)

বলাই। (ব্যস্ত হইয়া) বলুন না ডাক্তার, লীনার কি হয়েছে এইবার বলুন তো!

ডাঃ গাঙ্গুলী। (চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর সুরে) তোমার মেয়ের অসুখটা খুবই গুরুতর।

বলাই। (বিরক্তস্বরে) সে তো আমি জানি ডাক্তার, যে আপনি এই কথাই বলবেন।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত) তোমার মেয়ের টিউবার্কিউলোসিস্ হয়েছে।

বলাই। (হতভম্বের মতো) টু-বার-ক্লোসিস্?

ডাঃ গাঙ্গুলি। হাঁ, যাকে তোমরা থাইসিস্ বলো, যক্ষ্মারোগ বলো।

বলাই। (ভীতস্বরে) থাইসিস্? লীনার? (হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) কেন ডাক্তার যা তা মিথ্যে কথা বলচেন?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (কঠিন স্বরে) দেখ, তোমার কাছে অপমান শুনতে আমি এখানে আসি নি।

বলাই। (থতমত খাইয়া) রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। লীনার হঠাৎ থাইসিস হয়ে গেল? আপনি ভুল করেন নি তো?

ডাঃ গাঙ্গুলি। না, ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ওর ডান দিকের ফুসফুসটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

বলাই। (সঙ্কুচিত ভাবে) হয়তো ঠাণ্ডাই খুব বেশি লেগেছে?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (কঠিন স্বরে) বোকার মতো কথা বোলো না। (বলাই আরো সঙ্কুচিত হইয়া গেল) আর দেরী করা চলবেনা, ওকে এখনই স্যানাটোরিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক দিন আগেই ওকে পাঠানো উচিত ছিল। মেয়েটা অসুখ শরীর নিয়েই জোর করে এতদিন ঘোরাঘুরি করেছে, তাইতেই অসুখটা আরো তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে। (ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তিনি বলাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বলাই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া রহিল) আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে তুমি ওর দিকে একবার লক্ষ্যও করো নি, ওর শরীরটা যে এত খারাপ, ওর যে যত্ন নেওয়া দরকার সে কথাও তুমি ভাবো নি! ওর শরীরে আর আছে কি, কেবল হাড়কখানি, আর তার ওপর চামড়াটা!

বলাই। (অতর্কিত ক্রোধের সহিত) কী যে বলেন আপনি!

ডাঃ গাঙ্গুলি। তাইতো, তোমরা এই রকমই মানুষ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধাক্কাটা না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের কোনো চৈতন্যই হয় না। মেয়েটার অনেকদিন থেকেই শয্যাগত হয়ে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাকে তুমি একটুও বিশ্রাম দাও নি, মরতে মরতে সে তোমার সংসারের কাজ চালিয়ে এসেছে,—রাঁধা, বাড়া, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ভাই বোনদের খবরদারি করা, তোমার আরামের ব্যবস্থা জোগানো, যত কিছু—(বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুষ্ক হাস্যের সহিত)—কিন্তু এসব ব'লে এখন ফল কি? যা অনিষ্ট ঘটবার তা ঘটেছে। আমাদের এখন ঐ ক্ষতি পূরণ করবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করতে হবে। আজই রাত্রে আমি স্যানাটোরিয়মে ডাঃ সরকারকে চিঠি লিখে খবর নিচ্ছি সেখানে বেড খালি আছে কিনা। যদি খালি থাকে তো এখনই ওকে পাঠিয়ে দেবো। যত শীঘ্র সেখানে যেতে পারে ততই ভাল।

বলাই। (রাগে মুখ চোখ লাল করিয়া) লীনাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন, না? দিলেই হোলো বুঝি? ওসব কথা ছেড়ে দিন না। বাজে কথা যা খুসি তাই বলে যাচ্ছেন। লীনার থাইসিস্ হয়েছে? হতেই পারে না, মিথ্যে কথা। ডাক্তারদের এখন ঐ এক বুলি হয়েছে, রোগ হলেই থাইসিস্। লীনা বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না, এই আমি বলে দিলাম।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (শ্লেষের দৃষ্টিতে কঠিন সংযতভাবে) তুমি ওকে স্যানাটোরিয়মে পাঠাতে অস্বীকার হচ্ছো?

বলাই। নিশ্চয়।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (ভয় দেখাইয়া) তা হলে বাধ্য হয়ে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে, কর্ত্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠাতে হবে যে জেনেশুনেও তুমি মেয়েটাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছো।

বলাই। (কিছু থতমত খাইয়া) যেখানে খুসি রিপোর্ট করতে পারেন, যা খুসি তাই করতে পারেন।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (গম্ভীরভাবে) তুমি জানো, আমাদের টিউবার্কিউলোসিস্ এসোসিয়েশনের কারা সভ্য? তোমার মনিবও তার মধ্যে একজন, জানো কি? বেশী যদি চালাকি করো তা হলে আমিও জানি তোমাকে কেমন করে জব্দ করতে হয়।

বলাই। (ভয় পাইয়া) ডাক্তার আপনি সব কথা বোঝেন না, এই তো বড় মুস্কিল! লীনা যদি হাঁসপাতালে যায় তা হলে এই সব ছেলেমেয়েদের দেখবে কে, ঘর, সংসার কে আগলাবে?

ডাঃ গাঙ্গুলি। তার জন্যে স্বচ্ছন্দে তো একটা ঝি রাখতে পারো?

বলাই। (পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া) মাইনে দিয়ে ঝি রাখবো? আপনি বুঝি আমাকে লক্ষপতি ঠাউরেছেন?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (বিদ্রূপের সুরে) ও, পয়সা খরচের বেলাই বুঝি যত মুস্কিল? (ক্রুদ্ধ হইয়া) দেখ বলাই, আমি বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না, কিন্তু আমি যা বলছি তা করবোই এটা জেনে রাখো। কথা কাটাকাটি করে কোনোই ফল হবে না।

বলাই। (মিনতির সুরে) কিন্তু এত টাকা পাই কোথায় বলুন তো?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (কঠিন ভাবে) সে আমি কি জানি? নিজের অবস্থা সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলে তোমার কোনো লাভ হবে না। বেশ ভালই মাইনে পাও তা আমি জানি, মদ খেয়ে যে কত টাকা ওড়াও তাও আমি জানি। স্যানাটোরিয়মে হপ্তায় মাত্র সাত টাকা খরচ, তার বেশি নয়। তুমি অনায়াসে এ খরচ চালাতে পারবে; কয়েক বোতল মদের দাম মাত্র।

বলাই। সাত টাকা! আর শুধু কি তাই, সংসার দেখবার জন্যে একটি লোক রাখতে হবে, তারও খরচ আছে। শেষ বয়সে একটি পয়সাও হাতে থাকবে না দেখছি, ভিক্ষে করে খেতে হবে।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (ধমক দিয়া) বাজে কথা বোলো না!

বলাই। বিশ্বাস করুন, একবর্ণ মিথ্যে কথা বলছি না।

ডাঃ গাঙ্গুলি। আচ্ছা, এতই যদি তুমি গরীব হও, তা'হলে এসোসিয়েশন থেকে ওর অর্দ্ধেক খরচ দেবার ব্যবস্থাও আমি করতে পারি। অসমর্থ লোক দেখলে ওরা কখনো কখনো এ রকম দান করে।

বলাই। (খুশি হইয়া) তাই করুন, ডাক্তার, তাই করুন।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (নিশ্চিন্ত হইয়া) তা হ'লে রাজী তো?

বলাই। (আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) তা লীনার যাতে ভাল হয় তাই তো করতে হবে! তা'হলে ডাক্তার আমার মনিব টনিবদের এ সব কথা জানাবেন না তো?

ডাঃ গাঙ্গুলি। যদি তুমি অবাধ্য হও তা হলেই জানাতে হবে।

বলাই। ওদের কাছে অর্দ্ধেক খরচ পাওয়া যাবে তো?

ডাঃ গাঙ্গুলি। দেখি কতটা কি করতে পারি। তবে তোমার জন্যে নয়, তোমার মেয়ের মঙ্গলের জন্যেই সেটুকু করবো।

বলাই। আহা, তাই হোলো, তাই হোলো, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। (আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) আচ্ছা, ওরা তো ইচ্ছে করলে সমস্ত খরচটাই দিতে পারে, ওদের আর টাকার অভাব কি? ওরাই তৈরী করেছে হাঁসপাতাল, তার খরচ চালাবার টাকা গরীবদের কাছ থেকেই বা নেবে কেন?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (বিরক্ত হইয়া) আরে! বাজে কথা ছাড়ো। আমি ডাঃ সরকারকে কাল সকালে টেলিফোন করবো, বিকেলে যখন তোমার মেয়েকে দেখতে আসবো তখন সব বন্দোবস্তর কথা শুনতে পাবে।

বলাই। (মুখভার করিয়া) আবার আপনাকে কাল আসতে হবে? (স্বগত) এমনি করেই তো আমাদের টাকাগুলো এঁরা লুটে নিচ্ছেন!

(ডাঃ গাঙ্গুলি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন, শেষের কথাগুলি তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল না। বাহিরের দরজায় অল্পক্ষণ পরে ধাক্কা পড়িল। ডাঃ গাঙ্গুলি নিজের ছড়ি ও টুপি লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন।)

ডাঃ গাঙ্গুলি। বাহিরের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।

বলাই। কে? ও, বোধ হয় ফণী হালদার। (ডাক্তারের প্রতি নিম্নস্বরে) লীনার সঙ্গে ওর বিয়ে হবার কথা, এক রকম ঠিকঠাক হ'য়েছিল।

ডাঃ গাঙ্গুলি। হাঁ আমি শুনেছি। লীনাও বলেছে।

[বলাই দরজা খুলিয়া দিতে গেল। ডাঃ গাঙ্গুলি কি ভাবিয়া পুনরায় বসিলেন। বলাই ও ফণী হালদার প্রবেশ করিল। ফণীর বয়স আন্দাজ তেইশ, দোহারা চেহারা, মোটের ওপর দেখিতে সুপুরুষ। হাব ভাবের মধ্যে আদব কায়দা আছে; অল্পেই মুখে হাসি দেখা যায়, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে হিসাবী কুটিল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কাপড় চোপড়ে সর্ব্বদা ফিটফাট, দেখিলেই মনে হয় শহুরে বাবু।]

বলাই। আমার একবার মনে হয়েছিল তোমার কাছে খবর পাঠাই, কিন্তু জানতাম তুমি আজ আসবে, তাই আর আগের থেকে ব্যস্ত করিনি।

ফণী। (হতাশার সুরে) বেশী কিছু হয় নি তো?

বলাই। (সন্দিগ্ধ ভাবে) তা কেমন করে বলবো? এই যে ডাক্তারের কাছেই জানতে পারবে। তুমি এঁকে চেনো না?

ফণী। (বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া) না, আগে কখনো আলাপ হয় নি। অবশ্য ওঁর নাম শুনেছি—

বলাই। ইনিই ডাঃ গাঙ্গুলি। আর এঁর নাম ফণী হালদার। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলো, আমি ততক্ষণ একবার লীনাকে দেখে আসি। সে বেচারা একলা রয়েছে।

ফণী। হাঁ, আপনি যান। বলবেন আমি এসেছি।

বলাই। তা বলবো বৈ কি! (চলিয়া গেল)

ডাঃ গাঙ্গুলি। (কিছুক্ষণ ফণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তুমি কি ডাউন কোম্পানীর অবনি হালদারের কেউ হও?

ফণী। (ঈষৎ হাসিয়া) আজ্ঞে হাঁ, তিনি আমার বাবা।

ডাঃ গাঙ্গুলি। ও, তুমি তার ছেলে?

ফণী। (গর্ব্বিতভাবে) আজ্ঞে হাঁ, আমিও ঐ কোম্পানীতে কাজ করি।

ডাঃ গাঙ্গুলি। মেয়েটিও, এই বলাইয়ের বড় মেয়ে, সেও ওখানে কি কাজ শিখতে গিয়েছিল শুনেছি?

ফণী। আজ্ঞে হাঁ, ওখানে ষ্টিনোগ্রাফার হয়েছিল। কলেজ থেকে পাশ করে বেরোবার পর আমার বাবাই ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ কাজ করছিলো, কিন্তু হঠাৎ ওর মা গেলেন মারা, কাজে কাজেই ওকে বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে সংসার দেখতে হোলো।

ডাঃ গাঙ্গুলি। বড়ই দুঃখের বিষয়। অতিরিক্ত খেটে খেটেই ওর রোগটা জন্মেছে।

ফণী। (সন্দিগ্ধ স্বরে) আমিও কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি,—ও দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। এই জন্যেই বুঝি? ওর বাপের দোষেই এটা হয়েছে, কিন্তু ওরও দোষ ছিল,—যখনই আমি বলতাম যে এটা অন্যায় হচ্ছে তখনই ওর বাপকে ও সমর্থন করতো। (ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া নিম্নস্বরে) লোকটা যেমন কঞ্জুষ, তেমনি স্বার্থপর, জানেন?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (ক্রুদ্ধস্বরে) মানুষ নয়, জানোয়ার, জানোয়ার।

ফণী। (মৃদু হাসিয়া) ঠিক বলেছেন। (গর্ব্বিত ভঙ্গিতে) একটু ভাল হয়ে উঠলেই লীনাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো। ব্যাপারটা কি জানেন, লীনা আর আমি ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি, অবশ্য আমরা আলাদা আলাদা ক্লাসে পড়তাম। এ বাড়ীর কারো মতন ও নয়! ও ভারী বুদ্ধিমতী, ক্লাসে বরাবর প্রাইজ পেয়ে এসেছে। আমাদের বাড়ীর সকলে ওকে ভালোবাসে।

ডাঃ গাঙ্গুলি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনাদের না কি বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে? বলাই বলছিলো।

ফণী। (লজ্জিত ভাবে) হাঁ, তাই বটে, তবে পাকাপাকি কিছু হয় নি এখনো। তার এখনো অনেক দেরী। ওটা আমাদের নিজেদের মধ্যেই এক রকম বোঝাপড়া মতন হয়ে আছে, বুঝলেন না! (লজ্জিতভাবে হাসিতে লাগিল)

ডাঃ গাঙ্গুলি। তা হ'লে আপনাকে সব কথা জানানো দরকার, তার কারণ আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। বলাইকে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। আপনাকে সব কথাই বলা উচিত।

ফণী। (সন্দিগ্ধ ভাবে) লীনার অসুখ সম্বন্ধে বুঝি?

ডাঃ গাঙ্গুলি। হাঁ, তাই।

ফণী। অসুখটা বুঝি খারাপ?

ডাঃ গাঙ্গুলি। হাঁ, অসুখটা টিউবার্কিউলোসিস্,—থাইসিস্।

ফণী। (ভয় পাইয়া) থাইসিস্? কী সর্ব্বনাশ! (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) একেবারে নিশ্চিত থাইসিস্, কোনো সন্দেহ নেই?

ডাঃ গাঙ্গুলি। না, কোনো সন্দেহ নেই। (ফণী ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল) রোগটা পাকাপাকিই ধরেছে, তবে এখনো সারবার আশা আছে। এখন কথা হচ্ছে ওকে এখনি স্যানাটোরিয়মে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। বলাই-তো প্রথমে কিছুতেই পাঠাতে রাজি হয় না। অনেক কষ্টে ওকে রাজি করিয়েছি বটে, কিন্তু তবু ও মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেই জন্যই বলছি যে আপনার সাহায্য দরকার হতে পারে। ওকে আপনিই বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে ওকে পাঠিয়ে দিলে সেটা ওর পক্ষেও মঙ্গল, আর বাড়ীর অন্যান্য সকলের পক্ষেও মঙ্গল।

ফণী। (অন্যমনস্কভাবে) আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। (হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া) কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! ওর যে এমন অসুখ সে কথা একবারও তো আমাকে জানায় নি। বলেছিল ঠাণ্ডা লেগেছে। আচ্ছা ডাক্তার, স্যানাটোরিয়মে গেলেই কি বাঁচবার—?

ডাঃ গাঙ্গুলি। (আশাপ্রদ স্বরে) নিশ্চয়। ওর সেরে ওঠবার খুবই সম্ভাবনা। স্যানাটোরিয়মের চিকিৎসা অতি চমৎকার। অবশ্য সেরে গেলেও ওকে চিরকাল সাবধানে

থাকতে হবে, তা নইলে চলবে না। দেখুন, আপনাকে সমস্তই খোলাখুলি বলছি, কারণ আপনিই ওর অভিভাবকের মতো। বলাইয়ের কথা ছেড়ে দিন। সেরে গেলেও আপনাকেই ওর সমস্ত ভার নিতে হবে, ওকে সাবধানে রাখতে হবে।

ফণী। (মনের কথা চাপিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে) হাঁ, ঠিক তো, ঠিক তো। আচ্ছা ডাক্তার, স্যানাটোরিয়ম এখান থেকে কত দূরে?

ডাঃ গাঙ্গুলি। ট্রেনে এখান থেকে আধঘণ্টার পথ। ষ্টেশন থেকে নেমে দু'মাইল রাস্তা যেতে হয়, গাড়ী পাওয়া যায়। সুন্দর জায়গা। ছুটির দিনে অনায়াসে গিয়ে ওকে দেখে আসতে পারবেন।

ফণী। (চোখে ভয়ের লক্ষণ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল) আচ্ছা, আপনি যে বললেন ওকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, তাতে অন্যান্য সকলের পক্ষেই ভালো?

ডাঃ গাঙ্গুলি। তা তো বটেই। টি. বি. রোগটা তো ছোঁয়াচে, সে তো জানেন! ভাই বোনগুলোর সঙ্গে এক-সঙ্গে থাকা কিংবা মাখামাখি করা তো ভাল নয়। (ফণী যেন অস্থির হইয়া উঠিল) আর বাড়ীটাও দেখুন না, খোলা বাতাস একটু ঢোকবার যো নেই, একটা জানালাও নেই। (উত্তেজিত স্বরে) টি. বি. হবে না তো কী, রোগ নিবারণের অতি সাধারণ উপায়গুলো পর্য্যন্ত যারা জানে না—

ফণী। (ডাক্তারের দিক হইতে দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া) আচ্ছা, তা হলে অন্যান্য ছেলে মেয়েগুলোর মধ্যেও তো ঐ রোগের বীজ ঢুকেছে, কত এঁটো খেয়েছে, মুখে মুখ দিয়েছে?

ডাঃ গাঙ্গুলি। ঐ রকম ভাবেই রোগটা সংক্রামিত হয় বটে।

ফণী। (ভয় পাইয়া) তা'হলে নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। কিন্তু এতো বড় ভয়ানক কথা। (হঠাৎ নিজের মনের চিন্তাধারা চাপিয়া লইয়া ব্যগ্রস্বরে) আচ্ছা ডাক্তার, আমি ওর বাপকে সব কথা খোলাখুলি বলবো। আমাদের কথা শুনতে সে বাধ্য।

ডাঃ গাঙ্গুলি। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আপনি আমায় কথা কাটাকাটির থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে বাঁচালেন। আমি তা'হলে আসি। বলাইকে দেখলেই আমার রাগ হয়ে যায়। তাকে বলবেন আমি কাল স্যানাটোরিয়মের সব ব্যবস্থা করে আসবো।

ফণী। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) তাই ভালো। আপনি আর কেন থাকবেন?

ডাঃ গাঙ্গুলি। মেয়েটিকে যথেষ্ট উৎসাহ দেবেন, যেন সে কোন ভয় না পায়। মনে বিশ্বাস আর আনন্দ থাকলেই সে সেরে উঠবে, এ রোগের ঐটেই সব চেয়ে ভাল চিকিৎসা। আপনার মুখ থেকে শুনলে তার আরো বিশ্বাস হবে।

ফণী। (তাড়াতাড়ি বলিল) আজ্ঞে হাঁ, হাঁ, তা আমি বলবো বৈ কি!

ডাঃ গাঙ্গুলি। (ফণীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া দয়ার্দ্র স্বরে) কিন্তু আপনিও যেন এই নিয়ে বেশি ভাববেন না। সেরে যাবার যথেষ্টই আশা আছে, এ আপনাকে ঠিক বলছি। ছ'মাস বাদেই দেখবেন ও আবার আশ্চর্য্য স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে।

ফণী। (দুঃখিত স্বরে) হঠাৎ এই রকম একটা খবর শুনলে মনটা কি রকম হয় বলুন! তা যাই হোক, আপনি তো আশাই দিচ্ছেন। আচ্ছা, তা হলে আসুন, নমস্কার।

ডাঃ গাঙ্গুলি। নমস্কার।

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ফণী দরজাটা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া হস্তে চিবুক সংলগ্ন করিয়া সম্মুখে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, চোখে ভীতিব্যঞ্জক দৃষ্টি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল, বলাই আসিয়া প্রবেশ করিল। মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব।]

বলাই। (চেয়ারে বসিয়া) ডাক্তারটা গেছে?

ফণী। (মুখ ভার করিয়া বলাইয়ের দিকে ফিরিয়া) হাঁ। উনি বলে গেলেন স্যানাটোরিয়মের সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে উনি কাল আবার আসবেন।

বলাই। (বিরক্তির স্বরে) তোমাকেও তাই বলে গেল বুঝি? মনে করেছে আমি বড্ড বোকা। লীনার অসুখের সম্বন্ধেও যা বলেছে সমস্ত মিথ্যা কথা! এই তো আমি লীনাকে দেখে আসছি, দিব্বি ফূর্ত্তিতে আছে, গাল দুটো লাল টক্ টক্ করছে।

ফণী। (রাগত স্বরে) কী বাজে বকছেন? ডাক্তার মিথ্যে কথা বলবে কেন? আমাকে স্পষ্টই সব কথা বলেছে।

বলাই। (ক্রুদ্ধ ভাবে) তোমাকেও বুঝি সব ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে? এইবার আমাদের ঘরের কথা পাড়া শুদ্ধ বলে বলে বেড়াবে আর কি!

ফণী। (চড়া গলায়) আপনাদের ঘরের কথা শোনবার জন্যে আমি ব্যস্ত হই নি জানবেন। আপনার কাছে ডাক্তার শুনেছে যে আমার সঙ্গে লীনার বিয়ের ঠিক হয়েছে, তাই আমাকে সে ঐ সব কথা বলেছে। আপনিই তো তাকে আমাদের গোপনীয় কথা জানিয়ে দিয়েছেন!

বলাই। (চীৎকার করিয়া) গোপনীয় আবার কি, গোপনীয় আবার কি? শহরের কে না জানে যে তোমরা ছেলেবেলা থেকেই দু'জনে এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি করো?

ফণী। (শ্লেষের ভাবে) আবার শহর শুদ্ধ লোক দেখবে—(হঠাৎ থামিয়া গেল)

বলাই। (অন্যমনস্কভাবে) শহরের লোকের কথা ছেড়ে দাও না, আমি এখন নিজের জ্বালায় মরছি। তা ডাক্তার লীনাকে হাঁসপাতালে দেবে বলে গেল বুঝি? আমি যদি না পাঠাই, সে কি করতে পারে? কিন্তু এদিকে লীনা আবার ধরে বসেছে, সে হাঁসপাতালেই যাবে। (রাগিয়া উঠিয়া) ঐ ডাক্তারটাই তো ওকে বিগ্‌ড়ে দিয়েছে, বলেছে যে ওর কাছে থাকলে অন্য ছেলেপুলেগুলোকেই ঐ রোগে ধরবে, সেইজন্যেই ও যেতে চাইছে!

ফণী। (গম্ভীর ভাবে) দেখুন, লীনার সত্য সত্যই এখান থেকে যাওয়া উচিত, তা নইলে ও সারবে না। ডাক্তার যা বলেছে তাই করুন। যদি ওকে না পাঠান তা হলে আপনার বিপদ ঘটবে। ডাক্তার বড় সোজা লোক নয়, ও আপনাকে জব্দ করতে পারে।

বলাই। (বিব্রত হইয়া) লোকটা সয়তান। আমার কি ও করবে? আমি তো মেয়ের বাপ, যদি না পাঠাতে চাই?

ফণী। (যেন নির্লিপ্ত ভাবে) ও যা বলেছে ঠিক তাই করবে, মিছামিছি কেবল ভয় দেখিয়েছে মনে করবেন না। খবরের কাগজে লিখবে, সকলকে বলে বেড়াবে, শেষে হয় তো আপনার মনিবকে বলবে, আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

বলাই। (তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া) মরুক্ গে, যা খুশি করুক, যেখানে খুশি পাঠাক। আমার আর কোনো কথায় দরকার নেই।

ফণী। সেই ভাল। ডাক্তার যখন বলছে যে লীনার ভালোর জন্যে ওকে পাঠানোই দরকার, তখন আপনার ওতে আপত্তি করবার কি আছে? মেয়ের যাতে ভালো হয় সেইটেই তো আপনার দেখা উচিত? তা যদি না দেখেন তবে আর আপনি কেমন বাপ হলেন?

বলাই। (ব্যস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, লীনা হয়তো শুনতে পাবে। তা সেই ভালো, যেখানে হোক গিয়ে ও ভাল হ'য়ে আসুক।

ফণী। (খুশি হইয়া) এই উচিত কথা। আমি জানতাম যে আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌লেই আপনি বুঝতে পারবেন। আপনিও আছেন, আমিও আছি, দুজনেই চেষ্টা করবো। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আচ্ছা, তা'হলে আমি যাই। লীনাকে বলবেন—

বলাই। সে কি, যাবে কেন? লীনা কাপড় ছাড়চে, এখনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে নীচে নেমে আসবে বলেছে। একটু বোসো সে এলো বলে।

ফণী। (হঠাৎ বিব্রত হইয়া উঠিয়া) না,—না,—আমার থাকবার উপায় নেই,—এখনি আমার যেতে হবে,—বিশেষ একটা কাজ আছে,—সত্য বলছি। আর ওরও তো বেশি ওঠাউঠি করা উচিত নয়, তাতে আরো শরীর খারাপ হবে। আপনার তাকে বারণ করাই উচিত ছিল।

[পিছনের দরজা খুলিয়া লীনা প্রবেশ করিল। বয়স আন্দাজ আঠার। কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন চুলের মাঝে সিঁথি কাটা, সামনের চুলগুলি কপালের কিয়দংশ এবং কান দুটি ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ঘাড়ের কাছে আলগা খোঁপা বাঁধা। মুখখানি লম্বাটে ধরণের কিন্তু থুঁতনিটা কিছু ভারি। চোখ দুটি বড় এবং টানাটানা, দৃষ্টিতে সারল্য, নির্ভরতা, এবং কোমলতা; ঠোঁট দুটি অর্দ্ধোন্মুক্ত, পরিপাটি দাঁতগুলি মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, ঠোটের দুটি কোণে ঈষৎ খাঁজপড়া, তাহাতে মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব সূচিত হয়; গায়ের বর্ণ টকটকে গৌর; দেহটা

শীর্ণ। পরণে কালো শাড়ি, গায়ে ফুলহাতা কালো জামা, হাত ও গলায় ফ্রিল দেওয়া। লীনা আসিয়া করুণ দৃষ্টিতে ফণীর দিকে চাহিয়া রহিল, ফণী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল। ইহাতে লীনা ভয় পাইয়া যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ডাক্তারের কথা মনে পড়িয়া গেল।]

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) এই যে, তুমি এসেছো। (উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সে ফণীর প্রতি চাহিল।)

ফণী। (অপ্রস্তুত হইয়া) হাঁ লীনা, বোসো। তাই তো, এ সব কী কথা? (কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অপ্রস্তুত ভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া লীনাকে ধরিয়া একটি চেয়ারে বসাইল) বোসো, বোসো, তোমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। শরীরের অযত্ন করলে আর চলবে না। আজ তোমার বিছানা ছেড়ে আসাই উচিত হয় নি।

লীনা। (স্থির হইয়া বসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। (লীনা ম্লানভাবে একটু হাসিল। ফণী তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া দূরে নিজের চেয়ারে বসিল।)

ফণী। (ব্যস্তভাবে) আমিই তো ওপরে গিয়ে কথা কইতে পারতাম। উঠে আসাটা তোমার মোটেই উচিত হয়নি।

(লীনা ফণীর কথার ভঙ্গিতে যেন আহত হইল)

বলাই। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) তা'হলে তুমি এখন একটু আছ তো ফণী? আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি। মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার।

(প্রস্থানোদ্যত)

লীনা। (ভর্ৎসনার সুরে) না না, বাবা, ছিঃ। এখনি এসো, বুঝলে?

বলাই। (রাগিয়া) হাঁ, তাই তো, যত বোঝা আমার ঘাড়ে পড়বে, আর আমি গলা শুকিয়ে পড়ে থাকবো? (জোরে জোরে পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল। লীনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।)

ফণী। (হঠাৎ বলাই তাহাকে এরূপ ভাবে ফেলিয়া যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়া) বাস্তবিক লীনা, তোমার বাবার এতটুকু আক্কেল নেই। তুমি যে কি করে সহ্য করো জানি না। এতো বড় স্বার্থপর—

লীনা। (মৃদুস্বরে) ছি ছি, ও রকম বলতে নেই। উনি এত বোঝেন না। (ফণী ঘৃণাসূচক একটা শব্দ করিল) না না, যাক গে ও কথা, বাবার কথা এখন থাক। আমরা দুজনে আবার কত কাল যে এমন একলা হবার সুবিধে পাব তার ঠিক নেই। তোমায় বুঝি বাবাই বললে না ডাক্তার বললে যে আমার—(ইতস্তত করিতে লাগিল)

ফণী। (অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া) সব কথাই আমায় বলা হয়েছে।

লীনা। (আশ্বাস দিয়া) তুমি অমন দুঃখ কোরো না, লক্ষ্মীটি! তুমি কষ্ট পাচ্ছো জানলে আমি আরো ভেঙে পড়বো। আমি নিশ্চয় সেরে উঠবো, দেখ না। ওরা যা যা বলে তাই আমি শুনবো, মাস কয়েক বাদে যখন ফিরে আসবো তখন এমনি মোটা হয়ে যাবো যে তুমি আমায় চিনতেই পারবে না।

ফণী। (বিমর্ষ ভাবে) তা তো হবেই, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি যে সেরে উঠবে তা আমি জানি।

লীনা। বেশি দিনও লাগবে না। আর তুমি যখন খুসি আমায় চিঠি লিখতে পারবে। যেখানে যাবো সেও বেশি দূর নয়, যদি তোমার মন হয় তো প্রত্যেক রবিবারেই আমার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারবে।

ফণী। (ব্যস্তভাবে) নিশ্চয়ই যাবো।

লীনা। (জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফণীর মুখের প্রতি চাহিয়া) তা তুমি ও রকম করে বেড়াচ্ছো কেন? আমার কাছে এসে বসছো না কেন? বসতে ভাল লাগছে না?

ফণী। (অপরাধীর মতো একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার পাশে বসিল) আমার—আমার মাথাটা কেমনতরো হয়ে গেছে লীনা। কি যে করছি তা নিজেই জানি না।

লীনা। (উহার হাঁটুর উপর একটি হাত রাখিয়া) আহা, তা তো হবেই। আমারো ছেড়ে যেতে ভাল লাগছে না। প্রথমে মনে করেছিলাম যাবোই না। গেলেই বাবার কষ্ট হবে, ছেলেমেয়েগুলোর কষ্ট হবে, বিশেষত মীরার। কিন্তু ডাক্তার বললে আমি না গেলে ওদের পক্ষেই বিপদ। ওদের মুখে চুমু খেতে পর্য্যন্ত আমায় বারণ করলে। (ঠোঁট

চাপিয়া সে উদ্গত অশ্রু দমন করিল, তৎপরে খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতে লাগিল। ফণী তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া উহার নিকট হইতে চেয়ারের অন্য পাশে সরিয়া বসিল, আতঙ্ক লুকাইবার জন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। লীনা নম্রস্বরে বলিতে লাগিল) সেই জন্যেই বাধ্য হয়ে স্থির করলাম যে আমাকে যেতেই হবে, আমার সেরে উঠা তো চাই, কেমন?

ফণী। (ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া) নিশ্চয়, নিশ্চয়, তাই তো উচিত!

লীনা। (বিমর্ষ স্বরে) ওদের ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে জানি। মা যাওয়া পর্য্যন্ত আমিই তো ওদের মায়ের মতো ছিলাম! (অকস্মাৎ ফুঁপাইয়া উঠিয়া লীনা ফণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধের উপর মুখ লুকাইল। ফণী কাঁপিয়া উঠিল, লীনাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার ইচ্ছা অতিকষ্টে দমন করিয়া চুপ করিয়া রহিল) কিন্তু তোমার জন্যেই তো আমার সব চেয়ে বেশি কষ্ট হবে! (চুম্বনের আশায় উন্মুখ হইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। ফণী মুখ নামাইতে গিয়া হঠাৎ মুখখানা সরাইয়া লইল, এমন ভান করিল যেন সে দেখিতে পায় নাই। ভয়ে লীনার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া সে দারুণ অভিমানের সহিত ফণীর দিকে চাহিল। কান্নাচাপা ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল) কেন,—কেন, অমন করে মুখ ফিরিয়ে নিলে কেন? ভয় হোলো বুঝি,—না? (একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল)

ফণী। (অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লীনার কাঁধ ছুটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া) না, না, সে কি কথা? তুমি কি বলছো কি? (লীনার মুখ ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু লীনা মুখ তুলিল না, কাপড় চাপা দিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল)

লীনা। (ফণীকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দিয়া চাপা গলায়) না না, তুমি আমার কাছে এসো না। আমারই ভুল হয়েছিল। ডাক্তার বুঝি তোমাকেও বারণ করে দিয়েছে, না না, ছেলেমানুষি কোরো না। আমার থেকে যদি তোমার কিছু হয় তো সে আফশোষ ম'লেও যাবে না। (ফণী এই কথায় সন্ত্রস্ত এবং বিরত হইয়া নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল। লীনা সজল চক্ষুতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল) কিন্তু আমার এই হাতখানা তুমি নিতে পারো, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। (মুখ লাল করিয়া ফণী উহার হাতে চুম্বন করিল। লীনা হাসিয়া বলিল) তোমার কাছ থেকে শেষে ঐটুকু নিয়েই আমায় খুসি হতে হবে। (পুনরায় উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া ঢোক গিলিয়া) ক্রমশ এও অভ্যেস হয়ে যাবে, নয় কি? *

ক্রমশঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

---

* আমেরিকার খ্যাতনামা নাট্যকার নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্ত ইউজিন ও-নীলের (Eugene O'neill) শ্রেষ্ঠ নাটক "The Straw" হইতে ছায়ানুবাদ।

চিত্রপট

"বাণীনাথ"

বেকার নাশন

কাহিনী যোগেন্দ্রনাথ রায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র শিল্পী—যতীন দাস

শব্দ যন্ত্রী—নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

ভূমিকা লিপি

রেবা—রাণীবালা
নায়েব গৃহিণী—দেববালা
মিঃ বোস—নরেশ মিত্র
সোমেন—জহর গাঙ্গুলি
রবীন - সুশীল রায়
জনার্দ্দন—হাদুবাবু
হাঁদারাম—কুমার মিত্র

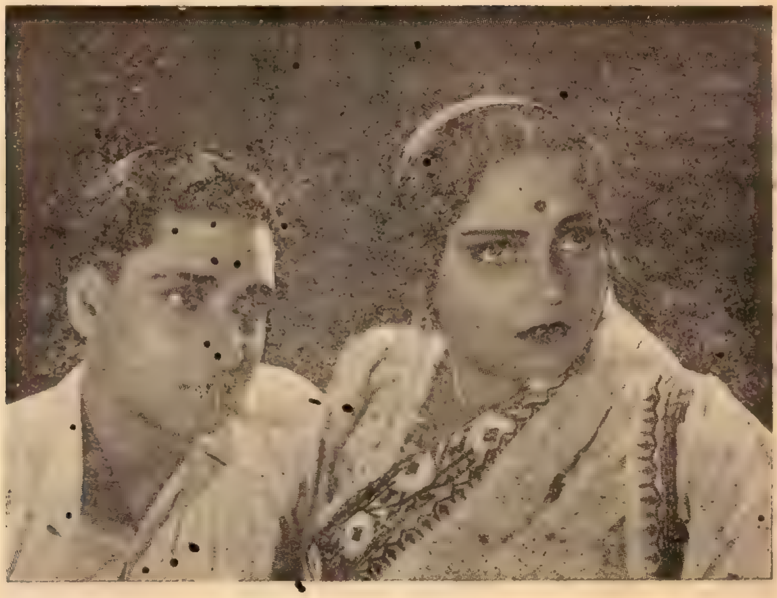

বেকার নাশন চিত্রে দেববালা ও সুশীল রায়

রাধা ফিল্মের তত্ত্বাবধানে মতিমহলের নূতন বাংলা চিত্র "বেকার নাশন" ১৩ই আগষ্ট উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

অভিজ্ঞান, চোখেরবালি যখন দর্শকদের ভাবনা ও চিন্তার নূতন পথ দেখিয়ে দিল সেই সময় "বেকার নাশন" পর্দ্দায় রূপ নিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট দর্শকদের একটু হাসির খোরাক যোগাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রদ হয়নি।

ভাল হাসির ছবি আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় কোন ফিল্ম প্রতিষ্ঠান হতে মুক্তিলাভ করে নি। সেই তুলনায় বিদেশী ছবি বহুদূর এগিয়ে আছে। হাসির ছবি তোলা কিছুমাত্র ব্যয়সাধ্য নয়। শুধু দর্শকদের বিশুদ্ধ আনন্দ

বিতরণের জন্ত পরিচালকদের যে শিল্পজ্ঞান থাকা দরকার সেটুকুর বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়। দেশীয় কোন হাসির ছবি দেখতে গিয়ে হাসির বদলে হতাশ মন নিয়ে আমরা প্রেক্ষাগৃহ হতে বিদায় নিতে বাধ্য হই। বাজে হাস্য ছাড়া যাঁরা সেটের ভিতর চলাফেরা করেন তাঁরাও কম দোষী নন। ভাঁড়ামী যদি সত্যিকার হাসির ছবির প্রধান গুণ হয় তবে এদেশের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সুখ্যাতি অর্জ্জন করা কিছুমাত্র কঠিন কথা নয়।

বেকার নাশন চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী রাণীবালা

রসাত্মক ছবির মূল কারণ, হয়ত আমাদের জাতীয় জীবনের আনন্দ ও স্ফূর্তির উৎস একদম ফুরিয়ে এসেছে; নয়, সত্যিকার হাসির উপযোগী সিনেমা কাহিনী পাওয়া যায় না। তবে বেশীর ভাগ এই শ্রেণীর বাজে ছবির জন্তে প্রধানতঃ অনভিজ্ঞ পরিচালকেরা দায়ী। পরিচালক

বেকার নাশন চিত্রখানিও গতানুগতিক পথ ধ'রেই নির্ম্মিত হয়েছে। চিত্রনাট্যে বিশেষ কিছু মৌলিক অভিনবত্ব না থাকাতে চিত্রখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেনি। ছবির প্রারম্ভ হতে পরিচালক চেষ্টা করেছেন এক শ্রেণী দর্শকদের হাসাতে। হয়ত সেইদিক দিয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হয়েছেন

বেকার নাশন চিত্রের একটি দৃশ্যে নরেশ মিত্র ও রাণীবালা

কিন্তু অপর শ্রেণী সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি। মোটামুটি গল্পাংশ হচ্ছে—রাণাঘাটের জমিদার নীতিবাগীশ জনার্দ্দনের পুত্র রবীন সখের থিয়েটারে হেলেনের ভূমিকায় অভিনয়ের পর সেই গুরুতর অপরাধের জন্যে পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। চাকরির সন্ধানে "বেকার নাশন" কোম্পানিতে গমনের পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে মহিলা পরিচালিত কাগজের অফিসে গিয়ে এ্যাটর্ণী-কন্যা সুন্দরী রেবার সঙ্গে পরিচিত হয়। তার পরেই প্রণয় কাহিনী এবং শেষ পর্য্যন্ত রবীনের সঙ্গে রেবার বিবাহ।

পরিচালক পুরাতন কাহিনীকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা একেবারেই করেন নি তা বলা অন্যায়, কিন্তু গল্পে Suspenseএর অভাবের দোষে সারা চিত্রখানি বেশ সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেনি। বহু অনাবশ্যক দৃশ্য সম্পাদককে কষ্ট দিয়েছে। সেই সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার আভাষ দিতে এঁরা সক্ষম হননি। গানও তেমন উৎকৃষ্ট হয় নি। রাণীবালার সব গানগুলি একই composition—ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া ছাড়া আর কোন actionই গানের মধ্যে নেই! সুশীল রায় লীলারাণী হিসেবে মন্দ না লাগলেও make-up এর উপর পরিচালকের আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা উচিত ছিল।

সু-অভিনয় দিক দিয়ে এ্যাটর্ণীর ভূমিকায় নরেশ মিত্র,

দেশের মাটি চিত্রে চন্দ্রাবতী ও টোনা রায়

রেবার ভূমিকায় রাণীবালা এবং রবীনের চরিত্রে সুশীল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নরেশ মিত্র সত্যিই উৎকৃষ্ট অভিনয় করেছেন। রাণীবালা উল্লেখযোগ্য—তবে ষ্টেজের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন নি। সুশীল অভিনয় খারাপ না করলেও মুখের ভাব বিকাশ চরিত্রোপযোগী হয় নি। হাঁদারায়ের ভূমিকায় হাসির খোরাক থাকলেও কুমার মিত্র বেশ একটু বাড়াবাড়ি করেছেন। দেববালা বেশ, কিন্তু হাঁদুবাবু একেবারে মঞ্চোপযোগী অভিনয় করেছেন। জহর গাঙ্গুলির—সোমেন চরিত্রাভিনয় মন্দ নয়।

আলোকশিল্পী যতীন দাস নিজের আদর্শ বজায় রাখেন নি। শব্দযন্ত্রীর কাজ উত্তম। সম্পাদন আরোও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

ষ্টুডিও সংবাদ ঃ—

নিউ থিয়েটার্স

দেশের মাটী—

দেশের মাটী চিত্র চিত্রা ও নিউ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে ১৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করবে। এই সর্ব্ব প্রথম নিউ থিয়েটার্সের বাংলা চিত্র একই দিনে নিউ থিয়েটার্সের দুই চিত্র গৃহে দেখাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ করে এই Propaganda film তোলা হয়েছে। কিছুদিন হ'ল দেশের মাটীর হিন্দী সংস্করণ "ধরিত্রী মাতা" বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর ইত্যাদি স্থানে মুক্তিলাভ করেছে এবং সকলের সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে

ষ্ট্রীট সিঙ্গার (সাথী) চিত্রের একটি দৃশ্যে কানন, বোকেন চট্টোপাধ্যায় এবং অমর মল্লিক

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হোলাম যে ভাগ্যচক্র ও প্রেসিডেণ্টের ন্যায় ধরিত্রীমাতা তেমন প্রশংসা ও সাফল্য লাভ করেনি। দেশের মাটী চিত্রের টেকনিক খুব উঁচু দলের হলেও গল্পের ধারা অভিজ্ঞ পরিচালকের হাতে কেমন রূপ নিয়েছে বলা শক্ত। পরিচালক নীতীন বোস এই ছবির পর নুতন ছবি "শত্রু" বা "দুসমন" আরম্ভ করেছেন। কোন কারণ বশতঃ বাংলা সংস্করণটির ছবিতোলা আপাততঃ বন্ধ হয়ে গেছে। "দুসমন" ছবিতে লীলা দেশাই তাঁর পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখবেন আশা করা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ক্লিনিক সেটে লীলা দেশাই, সায়গল ও নাজমল হোসেন কাজ করেছেন। ডাক্তারের ভূমিকায় সুশ্রী

বড়দিদি চিত্রের একটি দৃশ্য

অভিনেতা নাজমলকে দেখতে পাওয়া যাবে। বাংলা সংস্করণ আপাততঃ বন্ধ থাকায় উৎসাহী দর্শকদের উত্তেজনা কমে এলো বলা অন্যায় নয়।

অধিকার—

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া মাত্র চার মাসে অধিকার চিত্রখানি (উভয় সংস্করণ) শেষ ক'রে এক রেকর্ড করেছেন। এত অল্প সময়ে একটি উচ্চাঙ্গের চিত্র সম্পন্ন করে পরিচালক বড়ুয়া অন্যান্য পরিচালকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সন্দেহ নাই। ছবির পরেই প্রমথেশ বড়ুয়া ও শ্রীমতী যমুনা লণ্ডনে যাত্রা করেছেন। শোনা যাচ্ছে লণ্ডন ফিল্ম কোম্পানীতে বড়ুয়া কাজ করছেন। বড়ুয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশী 'উন্নত' চিত্র প্রতিষ্ঠানের চিত্র সম্বন্ধে উন্নততর জ্ঞানলাভ করে দেশে ফিরে আশা ডিসেম্বরের মধ্যে। অধিকার চিত্রের মূল আখ্যান-ভাগ চারটি চরিত্র নিয়ে গঠিত। চরিত্রগুলির নাম লিখিলেশ (বড়ুয়া), ইন্দিরা (যমুনা) রাধা (মেনকা) এবং রতন (পাহাড়ী)। চিত্রখানি "দেশের মাটীর" পরেই মুক্তিলাভ করবে।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার—

এতদিন পর হঠাৎ এর বাংলা নাম "সাথী" খুঁজে পাওয়ায় আমরা সুখী হোলাম। শ্রীমান ফণী মজুমদার "সাথী" চিত্রের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। বস্তিতে ভুলুয়া (সায়গল) ও মঞ্জুর (কানন) অতি দুর্দ্দিনে হঠাৎ অমরচাঁদের উপস্থিতি এবং তাঁরি সুপারিসে মঞ্জু থিয়েটারে চাকরি পেল। সুতরাং গান চাই এবং ভুলুয়া ও মঞ্জুর উৎকৃষ্ট গানগুলি চিত্রখানিকে জীবন্ত করে তুলচে সন্দেহ নাই। ছবির সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদনা কাজ দ্রুত চলেছে। ছবিখানি কোথায় মুক্তিলাভ করবে এখনও জানা যায় নি।

বড় দিদি—

সুরেন্দ্র অর্থাৎ পাহাড়ী দুর্ভাগ্য বশতঃ বিমাতার আদেশে

বিলাত না যেতে পারায় দুঃখিত চিত্তে একদিন গৃহত্যাগ করলেন। কিন্তু পাহাড়ী আশ্রয় পেয়েছে—বড় দিদির গৃহে অর্থাৎ মলিনার বাড়ীতে। কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী আশ্রয় মিলল না। কাজের অবহেলার শাস্তিস্বরূপ আবার সুরেন্দ্র ষ্টুডিয়োতে। ছবিখানির সুর দেবেন রাইচাঁদ বড়াল। কানন, মেনকা, পাহাড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অভিনেত্রী ও অভিনেতা এই চিত্রের কয়েকটি মূল চরিত্রের ভূমিকায় নাবেবন।

ক্যাথারিণ হেপবার্ণ—আর, কে, রেডিও

জমিদার ব্রজমোহনের বাড়ী হতে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। সুটিং ছাড়াও কয়েকটি গান তোলা হয়েছে পঙ্কজের তত্ত্বাবধানে।

বিষের বাঁশী—

দেবকী বসুর নূতন চিত্র শীঘ্রই আরম্ভ হবে দুই নম্বর

ভারতলক্ষ্মী পিকচাস

অভিনয়—

প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ করে এই চিত্রখানি মধু বোসের পরিচালনায় সমাপ্তি লাভ করেছে এবং ৩রা সেপ্টেম্বর রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। প্রায় ৫০ খানি মূল্যবান সেট এই চিত্রের হবে অমূল্য সম্পদ। সেট নির্ম্মাণে

রুথ চ্যাটারটন—কলম্বিয়া

এত অর্থ ব্যয় আর কোন বাংলা চিত্রে হয়েছে কিনা সন্দেহ। আশ্বিনের বিচিত্রায় এই চিত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হবে।

পরশমণি—

অভিজ্ঞ পরিচালক প্রফুল্ল রায় নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে দিয়ে আবার ভারতলক্ষ্মীর আশ্রয় নিলেন। এই চিত্র প্রতিষ্ঠান হতেই প্রফুল্ল রায়ের বিখ্যাত "চাঁদ সদাগর" মুক্তি-লাভ করেছিল। যামিনী মিত্রের কাহিনীকে অবলম্বন করে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের "কথা" শেখাচ্ছেন। চিত্রখানি শুধু বাংলা সংস্করণেই তোলা হবে—অতি শীঘ্র।

ম্যাডান থিয়েটার—

বর্ত্তমান টলিউডের জন্মদাতা ম্যাডান থিয়েটার আবার চিত্র নির্ম্মাণ কাযে আত্মনিয়োগ করেছেন। সর্ব্বসমেত পাঁচখানি হিন্দি ছবি এবং অভিজ্ঞ পরিচালক চারু রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম বাংলা ছবি "পথিক" তুলছেন। এই চিত্রের স্যুটিং প্রায় বার আনা শেষ হতে চলেছে কিন্তু একমাত্র ষ্টুডিয়োর লোক ছাড়া এই চিত্রের খবর আর কাউকে বোধ হয় জানান হয় নি। বিনা Publicityতে যে কোন প্রতিষ্ঠানের নামজাদা চিত্র বাজারে চলতে পারে না এ কঠোর সত্য বিচক্ষণ ব্যবসাদার ম্যাডানের কর্ত্তৃপক্ষদের নিশ্চয়ই অজানা নেই। এই পথিক চিত্রে শীলা হালদার, রমলা, ধীরাজ এবং ভোলানাথ মুখার্জ্জি দেখা দেবেন।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

নরনারায়ণ—

এই চিত্রখানির স্যুটিং দ্রুত চলছে—পরিচালনা করছেন জ্যোতিষ ব্যানার্জি। রাজকুমারী জম্বুবতী ও সখী জয়ন্তী রাজকুমার সত্যভামার সঙ্গে প্রথম মিলন দৃশ্যটি তোলা হচ্ছে। মিস রেণুকা রায়—জম্বুবতী, মিস শীলা হালদার—সত্যভামার এবং রাণীবালা—জয়ন্তীর ভূমিকায় দেখা দেবেন।

জনকনন্দিনী—

ফণী বর্ম্মার পরিচালনায় এই চিত্রের কাজ বেশ হচ্ছে। সীতার স্বয়ম্বর দৃশ্য তোলা হচ্ছে। পরবর্ত্তী সেটে বৈকুণ্ঠের দৃশ্য তোলা হবে। পরশুরাম ভূমিকায় মনোরঞ্জন এবং রাজা জনক চরিত্রে তুলসী চক্রবর্ত্তী নেবেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স—

যখের ধন—

হরি ভঞ্জের পরিচালনায় বাংলা দৃশ্য তোলা হয়ে গেছে। দস্যু করালী (অহীন্দ্র চৌধুরী) দলবল সহ রেখাকে (শীলা হালদার) হরণ করে নিয়ে গেল। দৃশ্যটি সত্যি রোমাঞ্চকর হবে সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী—

অহীন্দ্র চৌধুরী এই চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও রাধা কোম্পানী mythologyে film তুলে একশ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দেবেন সন্দেহ নাই।

বাণীনাথ

খেলা ধূলা

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী এম্‌-এ

টেষ্ট ম্যাচ—

ম্যাঞ্চেষ্টারে চারদিন ধরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তার ফলে আর কেউ বল আর ব্যাট নিয়ে বাহাদুরি দেখাতে পারে নি। ১৮৯০ সালে এইরূপ ব্যাপার হয়েছিল। সুতরাং ক্রিকেটে আরেকটি নূতন রেকর্ড হতে বেঁচে গেল।

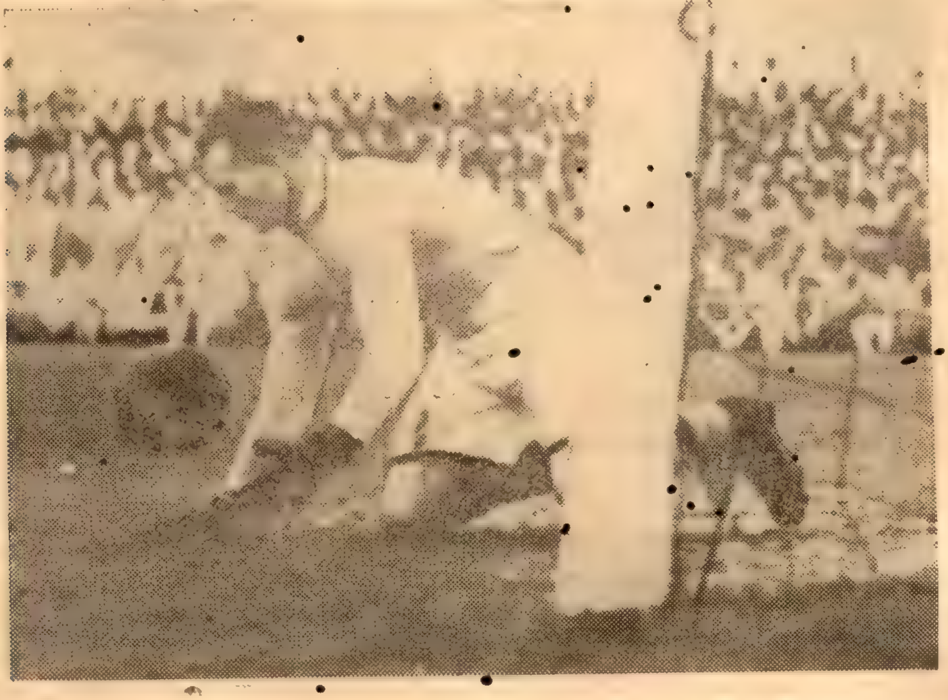

প্রথম দিনের খেলায় ইষ্টইয়র্কের গোলকিপার পটার গোল আটকাচ্ছেন

চতুর্থ টেষ্ট লীডস গ্রাউণ্ডে হয় কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ভাগ্য-দেবীর দোহাই দিয়ে যে ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখালেন তাতে ইংলণ্ড আর ফাঁকি দিয়ে দাঁড়াতে পারলেন না। ওরিলী, ওয়েট, ম্যাককর্মিকের ন্যায় বোলারদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে না পারায় ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ২২৩ এবং ২য় ইনিংসে মাত্র ১২৩ রাণ করে।

ব্রাডম্যান আবার ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিলেন আরেকটি সেঞ্চুরী রাণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার ১০৫ রানের মুখে পাঁচ উইকেটে ইংলণ্ডকে এইবার প্রথম পরাজিত করলেন। চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড শুধু সুদক্ষ বোলারের অভাবে সুযোগ পেয়েও জয়ী হতে পারল না।

আই, এফ, এ শীল্ড—

একমাত্র ফাইন্যাল গেম ছাড়া এই বিখ্যাত টুর্ণামেন্ট দর্শকদের মনে কোন উৎসাহ ও উত্তেজনাই জাগাতে পারে নি। অন্যূন ৪৫টি ক্লাব টুর্ণামেন্টে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেশীর ভাগই অতি নিকৃষ্ট ক্রীড়ার দ্বারা খেলার মাঠে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছে। শীল্ডের প্রথম মুখে বাংলার মফঃস্বল ও বিদেশের দুর্ব্বল টীমগুলি অতি বাজে খেলে বিদায় নেয়। একমাত্র খুলনা স্পোর্টিং নিজেদের ক্রীড়া গৌরবকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বহু সুযোগ পেয়েও গোল পর পর দুর্ব্বল টীমদের হারিয়ে পুরোন শত্রু কাষ্টমসের সম্মুখীন হয় সেমি-ফাইন্যালে। খেলায় কিন্তু কাষ্টমসের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটল। কাষ্টমসের বেষ্ট খেলোয়াড় টীমের রেবেলো আহত হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নেওয়ায় মহমেডান কাষ্টমসকে ৫-০ গোলে হারিয়ে দেয়। ই, বি, আর শুকনো মাঠে ইষ্টইয়র্ককে প্রায় হারিয়েছিল, শুধু পটারের আশ্চর্য্যজনক ক্রীড়া কৌশলের জোরে কোন মতে প্রথম দিন ড্র করে। তৃতীয় দিনে ভিজে মাঠে ইষ্টইয়র্ক ২-০ গোলে জয়ী হলো, ফাইন্যাল গেম সবদিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইষ্টইয়র্কের সুদক্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড ক্রমওয়েল চার্জ্জ করে গোল দিচ্ছে

দিতে না পারায় এঁরা সকলকে বিস্মিত করেছেন। শীল্ডের প্রথম চাঞ্চল্য আনেন মোহনবাগান হাওড়ার কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে, অন্যদিকে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ পর পর কালিঘাট ও রয়েল ফুসিলিয়ারকে হারিয়ে কৃতিত্ব দেখায়। ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয় রাউণ্ডে উঠেছিল কিন্তু সব আশা ভেঙ্গে দেয় হাওড়া। পেনালটি পেয়েও ইষ্টবেঙ্গল গোল দিতে পারে নি। ই, বি, আর আরগাইলস্‌কে হারিয়ে সেমি-ফাইন্যালে উপনীত হন। বি, সেন; নন্দী ভাল খেলেন। মহমেডান প্রথম দুইদিন ড্র হয়। এই দুইদিন মহমেডান ইষ্টইয়র্কের চেয়ে ভাল খেলেছিল। তৃতীয় দিনের খেলায় কিন্তু ইষ্টইয়র্ক মহমেডানকে একদম দাঁড়াতে দেয় নি। রহমৎ, রহিম, ওসমান কেউ তেমন খেলতে পারেন নি। খেলার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে অতি সুন্দর খেলে সহজে ২-০ গোলে মহমেডানকে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হলো ইষ্টইয়র্ক। ১৯৩৫ সালে ইষ্টইয়র্ক মহমেডানকে সেমি ফাইন্যালে হারিয়ে তারপর শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল।

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী

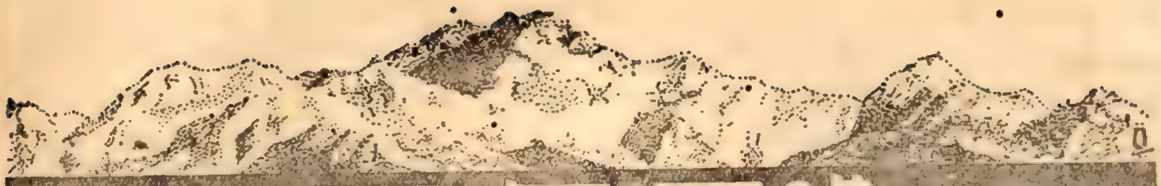

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

যুদ্ধবিরোধী দিবসের অনুষ্ঠান—

গত ১লা আগষ্ট তারিখে সমগ্র পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী দিবসের অনুষ্ঠান হইয়াছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির পুজারীগণ, গণতন্ত্র, সভ্যতা ও মানবতার সমর্থকগণ এবং পৃথিবীর শোষিত সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ ক্রমেই অধিকতর দৃঢ়তা ও সংঘবদ্ধতার সহিত এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের পশ্চাতে দাঁড়াইতেছেন। কাজেই, পূর্ব্ববর্ত্তী শান্তি আন্দোলনসমূহ হইতে বর্ত্তমানের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহা অনেক অধিক শক্তিশালী। চীন, স্পেন ও আবিসিনিয়ার নিদারুণ ধ্বংসলীলা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

১লা আগষ্টের সহিত বিগত মহাযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত। এই মহাসমরের পর হইতে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত প্রান্ত হইতে যুদ্ধ নিবারণের ইচ্ছা জাগিয়াছে ও চেষ্টা চলিতেছে।

যন্ত্রযুগ ও পণ্যশিল্পের দ্রুত উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে যন্ত্রবিজ্ঞানে অগ্রসর দেশগুলির মধ্যে পৃথিবীর বাজার লইয়া যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল তাহাই পরিণতি লাভ করিল বিভিন্ন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সৃষ্টিতে। সমগ্র পৃথিবীর ক্রয়শক্তিকে অন্যায়ভাবে আয়ত্ত করিবার অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে শোষণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং এই বিরোধই অবশেষে আত্মঘাতী যুদ্ধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

গত মহাযুদ্ধে ধনতন্ত্রের সমর্থক রাজনীতিকগণ প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে ধনতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ একদিন বিপুল ধ্বংসের মধ্যে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে পারে। তাই, যাহাতে পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারা লইয়া আবার কালক্রমে নিজেদের মধ্যে বিরোধ না বাধে, শোষণ ব্যবস্থাকে যাহাতে অব্যাহত রাখা যায়, পুরাতন ও যুদ্ধলব্ধ নূতন শোষণক্ষেত্রগুলি যাহাতে নিরাপদ থাকে সেইজন্য শান্তিরক্ষার নামে জাতিসংঘের সৃষ্টি হইল। বড় বড় কথায় ঘোষণা করা হইল বটে যে, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার দ্বারা পৃথিবী হইতে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইল, শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে বিজয়ী জাতিগুলি সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিবার যে অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহাতে তাহার বিলি ব্যবস্থা লইয়া নিজেদের মধ্যে আবার বিরোধ না উপস্থিত হয়, তাহারই ব্যবস্থা এইভাবে করিয়া রাখা হইল। কাজেই, জাতিসঙ্ঘের যে ব্যর্থতা ও অসামর্থ্য পুনঃপুনঃ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার বীজ ইহার গঠন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল।

বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী জাতিগুলির প্রবল অনিচ্ছা এবং জাতিসঙ্ঘের চেষ্টা সত্ত্বেও ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি যুদ্ধাবসানের পর কয়েক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ধনতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধকে আবার পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। আত্মপ্রসারের জন্য জাপান মাঞ্চুরিয়াকে কুক্ষিগত করিয়া জাতিসঙ্ঘের ক্লীবত্বের প্রথম প্রমাণ দিল, জার্ম্মাণী বিজয়ী দলের সকল হিসাব মিথ্যা করিয়া দিয়া, তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার তাঁহাদের নিখুঁত আয়োজনকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং উচ্চ-কণ্ঠে আত্মপ্রসারের দাবী জানাইতে লাগিল। ইটালী, শক্তি

বৃদ্ধির সহিত ভার্সাই সন্ধিতে তাহার প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের প্রতিবিধানের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে বিশ্বসমরের আশঙ্কা ঘনীভূত হইতে লাগিল। অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য ও শক্তি বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন সমস্যার আকারে দেখা দিল. ইহা সমগ্র বিশ্বে যে আদর্শের সংঘাত সৃষ্টি করিল, জগতের দুর্গত জনসাধারণের মনে যে আশার সঞ্চার করিল, ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধ দেশ সমূহের বেকার সমস্যা, অর্থাভাব ও বাণিজ্যিক মন্দা হইতে উদ্ভূত অসন্তোষের সহিত মিশিয়া সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই তাহা এক নূতন সমস্যার আকারে দেখা দিল।

শক্তিশালী, সুবিধাভোগী দেশগুলি ধ্বংসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বহু উচ্চারিত নীতি বিসর্জ্জন দিয়া আত্মপ্রসারেচ্ছু জাতিগুলির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, ইটালীর কাছে আবিসিনিয়াকে, জাপানের কাছে চীনকে, ফ্রাঙ্কোর নিকট স্পেনকে এবং সর্ব্বশেষে জার্ম্মানীর নিকট অস্ট্রিয়াকে উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু এইভাবে যুদ্ধের দিন পিছান গেলেও এড়ান যাইবে না। কারণ পৃথিবী অসীম নহে, মানুষের শোষিত হইবার ক্ষমতাও শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, অথচ যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পের যেরূপ দ্রুত উৎপাদন হইতেছে, এবং উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইয়া যেরূপে তাহা ক্ষুদ্র সমষ্টির হাতে গিয়া পড়িতেছে তাহাতে সহজেই তাহার প্রয়োজন পূর্ব্বকথিত সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। তাই শান্তির বাণীর অন্তরালে সকল দেশেই অস্ত্র বৃদ্ধির অশুভ প্রতিযোগিতা দেখা যাইতেছে, সেই জন্যই নানাস্থানে হীনতা ও অপমান নীরবে সহিয়াও দেড়শত কোটি পাউণ্ড ব্যয়ে দুর্ভেদ্য সামরিক শক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্রিটেনের দৃঢ় সংকল্প আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে। কাজেই প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা অন্য দিক হইতে না হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। আর এভাবে যদিই বা যুদ্ধ এড়ান যাইত তাহা হইলেও, যে শান্তির জন্য কোটি কোটি লোককে মানুষের সকল অধিকারে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে, তাহাকে শান্তি বলিয়া মানিতে পারিতাম না, অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভুশক্তির অব্যাহত নিরাপত্তাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম না এবং চীন ও স্পেনের ধ্বংসলীলাকে, আবিসিনিয়ার বিলুপ্তিকে, অস্ট্রীয়ার মানচিত্রের পরিবর্ত্তনকে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে নাৎসি অভিযানকে, গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ধ্বংসের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রকে শান্তির অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম না। সুতরাং যুদ্ধ নিবারণের এই যে চেষ্টা ইহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা দুই দিক হইতে চলিতেছে। সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে যুদ্ধ নিবারণের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে সেই দিকেই কিছু আশার আলো দেখা যাইতেছে। আজকার দিনে পৃথিবীর দুর্ব্বল ও শোষিত জনসাধারণ একথা বুঝিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের একটা অংশ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতামূলক ধনিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইলেও, দুর্গত ও শোষিত জনসাধারণের মধ্যে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই—তাঁহাদের স্বার্থ অখণ্ড ও অভিন্ন। দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে, জাতির নামে এই শ্রেণীর লোকেরা যে অন্যদেশের, অন্য ধর্ম্মের ও অন্য জাতির স্বশ্রেণীর লোকের সাথে লড়িয়াছেন সে কেবল পরস্পর বিরোধী ধনিকস্বার্থের প্ররোচনায়। স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য প্রত্যেক দেশেরই ধনিকগণ ইহাঁদিগকে নানা কৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাঁরাই কামানের খাদ্য হইয়াছেন, রাইফেল কাঁধে গৃহ পরিজন ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃহত্যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধাবিত হইয়াছেন, দলে দলে প্রাণ দিয়াছেন এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। এই সকল যুদ্ধে ধনীদের যতই লাভ হোক দরিদ্রদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। ইহাঁদের সেই বেকার জীবন বস্তির দুর্দ্দশা, স্বল্প মাহিনা, সেই দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ঘুচে নাই। ইহাঁরা বুঝিতেছেন আগামী যুদ্ধও ইহাঁদেরই রক্তের মূল্যে, ইহাঁদেরই গৃহ স্বজন সম্পদের মূল্যে, ইহাঁদেরই অতি সামান্য সুখ সাচ্ছন্দ্যের মূল্যে লড়া হইবে। কাজেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইহারা এবার পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতেছেন। দুর্ব্বল দেশকে বলি দিয়া নহে, অন্য দেশকে শোষণ করিয়া নহে, কূট রাজনৈতিক কৌশলে সঙ্কট এড়াইয়া নহে, পরন্তু নিজেদের স্বার্থের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ ও কারণ

বুঝিয়া এবং নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের দলে শ্রমিক আছেন, কৃষক আছেন, ছাত্র আছেন এবং গণতন্ত্র ও শান্তিতে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবির দল আছেন। ইহাদের সকলের সহায়তা ব্যতীত যুদ্ধ সম্ভব নহে, কাজেই, ইহাঁদের দিক হইতে যুদ্ধ নিবারণের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টাই একমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারে। ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের উপর নির্ভর করা ব্যতীত জগতের আর গত্যন্তর নাই। প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তিকে, যদি তিনি প্রকৃত অবস্থা এড়াইয়া যাইতে না চাহেন,—এই আন্দোলন সমর্থন করিতে হইবে।

যুদ্ধ নিবারণে ভারতবাসীদের হাত

আমরা ভারতবাসীরা নিজেরা পরাধীন ও দুর্বল, আজও আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাই নাই। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নিবারণে যে আমাদের হাত থাকিতে পারে এ কথাটা অনেকের নিকটই অদ্ভুত মনে হইবে। কিন্তু, আসন্ন সঙ্কটের মুহূর্তে আমাদের একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুদ্ধ নিবারণে ভারতবাসীদের অনেকখানি হাত রহিয়াছে এবং বিশ্বমানবের প্রতি ও নিজেদের প্রতি এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটীশ সরকারের বিশিষ্ট স্থান ও গুরুত্বের কথা অস্বীকার করিবার কাহারও উপায় নাই এবং এ কথাও অস্বীকার করা যাইবে না যে, আগামী যুদ্ধের ভাগ্য ও গতি ব্রিটীশ সরকারের পর রাষ্ট্রিক নীতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

এখন ব্রিটীশ সরকারকে যদি যুদ্ধে নামিতে হয় তবে একথা খুবই সুনিশ্চিত যে ভারতবর্ষের ধনবল ও জনবল ব্যতীত তাঁহাদের পক্ষে কোন প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারতবর্ষের সহায়তা লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যে ইংরেজের পক্ষে সম্ভব নহে, একথা ব্রিটীশ রাজনীতিকগণ ভালভাবে জানেন বলিয়াই আজ ভারতবর্ষকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা নানাবিধ সংস্কারমূলক, আপাত-প্রতীয়মান জাতিগঠনমূলক কার্য্য সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে নিয়মতান্ত্রিকতার গণ্ডীর মধ্যে আনিবার প্রয়াস পর্য্যন্ত বহুবিধ নীতি ও প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সুভাষচন্দ্র বারবার বলিয়াছেন যে, আজ আমরা এমন চমৎকার সুবিধার স্থানে রহিয়াছি যে শুধু যদি সংঘবদ্ধ হইয়া এক স্বরে দাবী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত জাতীয় দাবী মানিয়া লইতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে রাজী করিতে পারিতাম। একথা পুরাপুরি সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একথার মধ্যে এ ইঙ্গিতটি পুরাপুরি সত্য যে, বিশ্বপরিস্থিতির চাপ ইংরেজের উপর এমন ভাবে পড়িয়াছে যে, ভারতবর্ষের সহযোগিতা তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যে কোনও মূল্যে তাঁহাদিগকে তাহা ক্রয় করিতে হইবে। সৈন্য সংগ্রহে বাধাদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে যে আইন পাশ হইয়া গেল তাহা সম্পূর্ণ অন্য দিক হইতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আগামী যুদ্ধে ভারতবর্ষের সহায়তার অপরিহার্য্যতার কথাই প্রমাণিত করিতেছে।

সুতরাং ভারতবাসীরা যদি যুদ্ধে যোগদান না করেন, কোন প্রকারেই যুদ্ধের সহায়তা করিতে স্বীকার না করেন তাহা হইলে অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর সেই সেই দেশের জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত চাপের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবাসীদের এই যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা সফল হইতে পারে।

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের সহিতও এই যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

কি ভাবে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালান যাইবে—

একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে হইতে পারে যে, যুদ্ধ বিরোধী দিবসে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ, অথবা বৎসরের মধ্যে একটি দিন সভা শোভাযাত্রাদি করিয়া লোকের মনে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা, জনসাধারণের মনে কোন স্থায়ী

রেখাপাত করিতে পারিবে না। মুক্তি আন্দোলন—আমাদের দাসত্বকে স্থায়ী করিবার নানাবিধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনই বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এবং ন্যায্যতঃই আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনের শক্তি এখন ইহার জন্যই নিযুক্ত হইতেছে। এই সময় আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের দ্বারা যদি আমাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে জাতীয় মুক্তি প্রচেষ্টা তাহার দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে মাত্র। অন্যদিকে খুব বেশী লাভ কিছু হইবে না। এযুক্তি বিচারসহ নহে।

এই প্রকারের সকল আন্দোলনই সমপর্য্যায়ভুক্ত, একে অপরকে শক্তিশালী করে। আমাদের মুক্তি আন্দোলন বিশ্বপ্রভাবের বহির্ভূত নহে এবং বিশ্বের ঘটনাস্রোতের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি আন্দোলন সফল হইবে। পরাধীন দেশে সকল সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী আন্দোলনই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয়, মুক্তি আন্দোলনের মধ্যেই সফলতা লাভ করে।

সৈন্য সংগ্রহ বিরোধী আইন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সৈন্য সংগ্রহ বিরোধী আইন কংগ্রেসীদলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের সহায়তায় পাস হইয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার যে যুদ্ধের জন্য কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছেন এবং সেজন্য ভারতবর্ষের সাহায্য যে তাঁহাদের কতটা প্রয়োজনীয় ইহা কতকটা তাহারই প্রমাণ। আইনটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইহার দ্বারা গণতান্ত্রিক পৌর অধিকারের নীতিকে অস্বীকার করা হইয়াছে। যাহারা স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীতে যোগদান করিতে কাহাকেও নিষেধ করিবে তাহারা এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। যদিও সরকারী নীতির সদিচ্ছা-মূলক সমালোচনা এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইবে না বলা হইয়াছে তবুও কার্য্যক্ষেত্রে এই ফাঁকটুকুর উপর বড় বেশী নির্ভর করা যাইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

দেশে ধীরে ধীরে যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে সেই আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীগণই স্পষ্টতঃ এই আইনের লক্ষ্য। যাহারা আমাদের পৌর অধিকারকে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিবার অস্ত্র সরকারের হাতে তুলিয়া দিলেন, দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যবোধের অভাব দেখা যাইতেছে।

মিঃ জিন্না এবং মৌলনা সৌকত আলি এই আইনের সমর্থন করিতে যাইয়া অবশ্য যথেষ্ট বীর রসের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, সরকারের হাতে তাঁহারা অস্ত্র তুলিয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা দণ্ড গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবেন না। দণ্ড গ্রহণ করিতে ভয় করেন না বলিয়াই তাঁহারা এরূপ কার্য্যে সাহসী হইয়াছেন।

পূজার বাজার—

নানাবিধ দুর্গতি ও দুর্দ্দশার মধ্যেও পূজার সময় বাঙ্গালীরা কিছু জিনিসপত্র কিনিবেন। ক্রয় বিক্রয়ের এই মরসুম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বহু পুরাতন কথা হইলেও, আমরা বাঙ্গালীকে এই সময় স্বদেশজাত দ্রব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বিশেষ করিয়া আমরা এই সময় তাঁহাদিগকে বাংলার পণ্যশিল্প, কুটীরশিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলিতে চাই। যে অর্থ তাঁহারা ব্যয় করিবেন তাহার প্রত্যেকটি পয়সা যাহাতে এই দুর্দ্দিনে বাংলার চতুঃসীমার মধ্যে থাকিয়া যায় তাহার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমরা জানি, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও প্রাদেশিকতার ফল জাতির পক্ষে মারাত্মক এবং এই প্রাদেশিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াও আমরা বাঙ্গালীকে বাংলার জিনিস কিনিবার বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে সাহায্য করিবার পরামর্শ দিতেছি না। প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়াও যেমন আমরা সর্ব্বপ্রথম নিজেকে সাহায্য করি এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করি, তেমনই নিখিল ভারতীয় ব্যবসার ক্ষেত্রেও অন্যান্য প্রদেশবাসীদের ন্যায় বাঙ্গালীকেও আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার সময় বাঙ্গালীকে পরস্পরের সহযোগিতা করিতে হইবে, সহযোগিতা ব্যতীত ব্যবসাক্ষেত্রে পশ্চাদবর্ত্তী বাঙ্গালীর সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিবার আশা নাই। বিশেষ করিয়া যখন অন্যান্য প্রদেশ-বাসীরা এই নীতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছেন।

আমাদের দেশে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার এখনও অনেকটা বস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বিলাসের দ্রব্যাদি কিনিবার সময় আমরা স্বদেশী জিনিসের কথা মনে রাখি না। এই অমনোযোগের ফলে আমরা প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা বিদেশকে দিতেছি। এই টাকা ভারতবর্ষে এবং তাহার কতকাংশ বাঙ্গলা দেশে থাকিতে পারে এবং বহু ভারতবাসীর অন্নের ব্যবস্থা করিতে পারে। স্বদেশী দ্রব্যের অভাবে অনেক সময় আমরা বিদেশী জিনিস কিনিতে বাধ্য হই, একথা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এজন্য আমাদের ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতাই দায়ী। এমন বহু জিনিস আছে যাহা দেশে প্রস্তুত হইতে পারে ও হয়, অথচ সহানুভূতি ও চাহিদার অভাবে যাহার প্রসার হইতেছে না।

এইদিক দিয়া কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্বদেশী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে সময়োপযোগী হইয়াছে। একদিকে যেমন ইহাতে বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদ বহু তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে, তেমনই এখনও যে বাংলার কত অসংখ্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসের দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে বা হইতে পারে তাহা দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জিনিস কিনিবার সময় খরিদ্দারেরা যদি এখানে প্রদর্শিত জিনিস কিনিতে চাহেন তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা বাধ্য, এই সকল জিনিস দোকানে রাখিবার চেষ্টা করিবেন, ফলে কারিগরেরা উৎসাহ ও সুযোগ লাভ করিবেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া আমরা খেলনার উল্লেখ করিতে চাই। খেলনার বাজার বর্ত্তমানে জাপানের একচেটিয়া—আমরা জাপানী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি কিন্তু, জাপানী খেলনা না কিনিয়া উপায় নাই। কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানাবিধ চিত্তাকর্ষক খেলনা সে অভাব ঘুচাইতে পারিবে বলিয়া মনে হইল।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বৈদেশিক

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

গ্রেটব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি :—

গ্রেটব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি যে কি তাহা ইদানীং খুব দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সের সহিত গ্রেটব্রিটেনের সন্ধি রহিয়াছে, ইটালীর সহিত চুক্তি হইল, জার্ম্মানের সহিত একটা চুক্তির চেষ্টা কিছুদিন হইতে চলিতেছে—রাশ্যার প্রতি বর্ত্তমানে তাহার বিরুদ্ধভাবও নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, গ্রেটব্রিটেন যে নূতন সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেন চুপ করিয়া আছে মাত্র। বৃহৎ সমরোপযোগী আয়োজন যে ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপানের সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। জাপ-জার্ম্মানী-ইটালী এই ফ্যাসিষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে যে গ্রেটব্রিটেনকে সঙ্গীহীন হইয়া লড়িতে হইবে এমন নহে। গ্রেটব্রিটেন ফ্রান্স ও রাশ্যার সাহায্য তো পাইবেই, উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রও বেশি দিন দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাকেও ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে। সুতরাং, নূতন সমর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যে গ্রেটব্রিটেন চুপ করিয়া রহিয়াছে এ কথা ঠিক নহে। আসল কথা হইতেছে যে গ্রেটব্রিটেন যেমন ফ্যাসিষ্টদের চাহে না, তেমনি বলশেভিক রাশ্যাকেও পছন্দ করে না। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিষ্টদের বাধা দিতে গিয়া রাশ্যার শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহে না। গ্রেটব্রিটেন চাহে রাশ্যা ও ফ্যাসিষ্টতন্ত্র দুইই হীনবল হউক। অবশ্য ফ্যাসিষ্ট ও কমুনিষ্টতন্ত্র একে অপরের ধ্বংস করিয়া নিজের বনিয়াদ পাকা করিয়া লউক, ইহা গ্রেটব্রিটেন কিছুতেই সহ্য করিতে

পারিবে না। সুতরাং একদিকে ঐ দুই প্রকার রাষ্ট্রের ভিতর গণ্ডগোল লাগাইয়া রাখাও যেমন তাহার লক্ষ্য, তেমনি উহাদের মধ্যে প্রকৃত সমর যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার চেষ্টাও গ্রেটব্রিটেন করিবে। সংক্ষেপে, ফ্যাসিষ্ট ও কমুনিষ্ট-তন্ত্রকে শক্তিশালী না হইতে দেওয়া, এবং তাহার পৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রতি অপর কোনও রাষ্ট্রকে লোলুপ দৃষ্টি না হানিতে দেওয়া—এই দুইটাই হইতেছে বর্ত্তমান গ্রেট-ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি। গ্রেটব্রিটেন দুর্ব্বলও নহে, বুদ্ধি-হীনও নহে—তাহারা শুধু নিজের ক্ষতি করিয়া অপরের সুবিধা করিয়া দিতে নারাজ। সুতরাং যাঁহারা গ্রেট-ব্রিটেনের ন্যায়, অধিকার, দুর্ব্বল জাতিকে রক্ষা করিবার কথা প্রভৃতি বিশ্বাস করিয়া, গ্রেটব্রিটেনের নিষ্ক্রিয়তায় বিস্মিত হন; তাঁহারা একদম ভুল করেন।

কিন্তু, একথাও মনে করা ঠিক নহে যে গ্রেটব্রিটেন যেরূপ মনে করিতেছে ঘটনাচক্রও সেরূপভাবে চলিবে। যদি ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ ও রাশিয়ার মধ্যে সংগ্রাম বাধে, এক্ষণে গ্রেটব্রিটেনকেও ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে। কিন্তু, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতি প্রকৃতঃ সফল হইলে ব্রিটেনকে ফ্যাসিষ্টদের আওতায় পড়িতে হইবে। অনেকে মনে করেন ব্রিটেন তাহার পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা যে আবর্ত্ত সৃষ্ট করিয়াছে তাহারা সে ফাসিষ্টদের জালে আবদ্ধ হইয়াই পড়িয়াছে এই পররাষ্ট্রনীতির প্রধান পাণ্ডা যেমন চেম্বারলেন তেমনি ফ্যাসিষ্ট-অনুগমনের প্রধান পুরোহিতও হইতেছেন চেম্বারলেন। তবুও বলিতে হয় গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স কার্য্য তৎপরতা দেখাইলে যে ব্যাপারগুলির মীমাংসা প্রায় বিনারক্তপাতে সহজে হইয়া যাইত, সেগুলির মীমাংসার জন্যই পরে প্রচুর রক্তপাত ও বৃহৎ সমরানলের প্রয়োজন হইবে; বর্ত্তমান সভ্যতার মূলও উৎপাটিত হইতে পারে।

স্পেন—

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি ও ফ্রান্সের নিষ্ক্রিয়তা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সুবিধা করিয়া দিতেছে। ফ্রাঙ্কো সমুদ্রপথে পর্য্যন্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিতে পারিতেছে, কিন্তু তথাকথিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া পীরেনিজ সীমান্তের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় রিপাবলিকান স্পেন সরকার বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। দীর্ঘ দুই বৎসরের উপর ব্যাপিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইটালী ও জার্ম্মানীর প্রভূত সাহায্য পাইয়াও যে রিপাবলিকান সরকারকে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই ইহা হইতেও বুঝা যায় স্পেনের জন-সাধারণ ফ্রাঙ্কোকে কতটুকু চায়। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের নিরপেক্ষতা নীতি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্যদানের নামান্তর হইয়াছে মাত্র। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্পেন হইতে ফিরাইয়া আনার নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, ইটালীয়ান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিকাংশই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে।

ইতিমধ্যে এব্রো-নদীর নিকটে রিপাবলিকানরা একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে—তাহাতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ভ্যালেনসিয়া অভিমুখে গতি প্রতিহত হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলের যুদ্ধগুলিতে ইটালীয়ানরা যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাই ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির সফলতা প্রমাণ করিবে। "২৫শে জুলাই হইতে ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ইটালীয়ান স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী রিপাবলিকান বাহিনীর খুব ক্ষতি করিয়াছে। ১৫৮টী বোমাবর্ষণ কার্য্যে ইটালীয়ানরা যোগ দিয়াছিল উহাতে তাহাদের ৫৪১টি বিমানপোত এবং ও ৪৫৫০০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ব্যবহৃত হইয়াছিল⋯।" ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির সফলতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

চীন জাপান—

চীন জাপান যুদ্ধ কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়া, কখনও বা বৃহৎ সংঘর্ষের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ যত বেশিদিন ধরিয়া চলিবে চীনের ততই সুবিধা হইবার কথা। টোকিও হইতে জাপানের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যতই আশ্বস্তকর সংবাদ আসুক, অ-জাপানী বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন জাপানের আর্থিক অবস্থা সুবিধার নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ইতিমধ্যেই হ্রাস পাইয়াছে, অথচ সামরিক ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্যপক্ষে জাপান ভাবিয়াছিল চীনের ব্যাপারের মীমাংসা শীঘ্রই করিয়া ফেলা যাইবে, সুতরাং

দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে তাহারা যথেষ্ট ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নে করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জাপানের আর্থিক ব্যবস্থা যে অচিরাৎ ভাঙিয়া পড়িবে এমন আশাও কেহ করে না। সুতরাং, চীন জাপান যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা বলা শক্ত।

অন্যদিকে, বড় বড় সহর দখল করিলেই যে চীন বিজিত হইবে এমন মনে করিবার কারণও নাই। সাংহাই, নানকিং দখল করিয়াও যেমন চীন জয় করা হয় নাই, তেমন হাঙ্কা-উবের পতন দ্বারাও চীনের পরাজয় সূচিত হইবে না। সহর জয় করিতে করিতে জাপান যতই চীনের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিবে, জাপানের সৈন্যশ্রেণী ততই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে—সুতরাং যে গরিলা যুদ্ধের উপর চীনারা প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে, তদ্দারাই চীনারা জাপানের দীর্ঘায়িত সৈন্য শ্রেণীকে ব্যতিব্যস্ত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিতে পারে। অন্যদিকে চীনের অন্তর্দেশে পথঘাটের বিশেষ অসুবিধা: সুতরাং যান্ত্রিক সমরোপকরণ আনা-নেওয়ারও বিশেষ অসুবিধা; এদিক দিয়াও চীনের সুবিধা। চিয়াং-কাইশেক যেমন কম্যুনিষ্টদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়াও জয় করিতে পারেন নাই, জাপানও সেরূপ চীনের উপর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালাইয়াও চীন জয় করিতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়।

অন্যদিকে প্রধান শত্রুর সম্মুখে চীনের আভ্যন্তরীণ ভেদ, অন্ততঃ সামরিকভাবে, একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। জাপানীরা এদিকটার কথা পূর্ব্বে গণনার মধ্যে আনে নাই। জাপানের পাশবিক উৎপীড়ন—নারীধর্ষণ, গৃহ প্রজ্বালন প্রভৃতি—যে সকল স্থান সে জয় করিয়াছে সেখানকার চীনাদের জাপানের বিরুদ্ধে প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে;—যে সকল স্থল এখনও জয় করিতে পারে নাই সেখানকার অধিবাসীদের জাপানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। চীনারা দলে দলে নূতন সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে আপনা হইতেই জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে ও নানাপ্রকার সহায়তা করিতেছে। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলিলে জাপানী জনসাধারণের মধ্যে জাপানী অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে;—কিন্তু চীনাদের মধ্যে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই।

জাপান দুর্দ্ধর্ষ শক্তি হইলেও জাপানের সামরিক কর্ত্তারা চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের দুর্ব্বলতার দিকটা এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু স-সম্মানে জাপানীদের ফিরিয়া আসিবার পথও আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। জাপানের পক্ষে চীন-অভিযান 'সাপের ছুঁচা গেলা'র মতো হইয়াছে। সাংহাই নানকিং পতনের পর সন্ধির কথাবার্ত্তা উঠিলে জাপান সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিল, চিয়াং-কাই-শেক গবর্ণমেন্টের সহিত জাপান কোনও কথাবার্ত্তা চালাইবে না। একণে আবার যখন শুনা যাইতেছে গ্রেটব্রিটেন চীন-জাপানের মধ্যে সন্ধি ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন চিয়াং-কাই-সেক স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, চীনে চীনাদের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত না হইলে চীনারা কোনও সন্ধির কথাবার্ত্তায় যোগ দিবে না।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত জাপান চীন জয় করিতে পারিবে, কিন্তু সে জয়ও হইবে জাপানের পরাজয়ের নামান্তর। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন কি এশিয়ায় জাপানের একছত্র অধিকারলাভে বাধা দিবে না? রণশ্রান্ত জাপান কি এই সকল শক্তিকে দমাইতে পারিবে? তদুপরি জাপান নানারূপ সামরিক অত্যাচার দ্বারা নিজেকে যে ভাবে কলঙ্কিত করিয়াছে তাহাতে জাপান কি চীনাদের উপর নির্ব্বিরোধে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে?

চীনারাও জিতিয়া হারিতে পারে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতিরা, যাঁহারা আজ চিয়াং-কাইশেকের নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছেন, তাহারা পুনরায় স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়া দেশে অন্তর্বিরোধ ঘটাইতে পারেন। তবুও বলিতে হয় এ অন্তর্বিরোধ পুনরায় না ঘটিবারই সম্ভাবনা। জাপানের সহিত যুদ্ধে মহৎ দুঃখের ভিতর দিয়া চীন যে আজ শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাতে চীনা দলপতিদের অতঃপর অখণ্ড চীনা-শক্তি-নির্ম্মাণ কার্য্যে সহযোগিতা করিবারই সম্ভাবনা। অবশ্য এ সম্ভাবনা ফলবতী হইবে কিনা তাহা অনেকটা নির্ভর করিতেছে চিয়াং-কাই-শেকের উপর। তবে আশা করা যায় চিয়াংও এবার অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে কবি নেগুচি ও কবি রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের কথা একটু বলিতেছি। এই পত্রালাপ বর্ত্তমান রণ-সভ্যতা দেশের মহৎ ব্যক্তিদের উপরও যে কি বুদ্ধিবিধ্বংসকারী প্রভাব বিস্তার করে তাহারই পরিচয়। কবি নেগুচি কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্ব প্রতিভায়, মহৎ জনোচিত মনের উদারতায় তখন ভারতবর্ষ মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু চীন জাপান যুদ্ধ সম্পর্কে কবি নেগুচি রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে তথাকথিত স্বদেশপ্রেমিকতা মহৎ মনের উদারতাকেও সাময়িকভাবে কলুষিত করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নেগুচির পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে এদিকটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে বলিয়াছেন।

'ইহা চিন্তা করিতেও দুঃখ হয় যে, যুদ্ধের নেশা সৃজনী-শক্তিসম্পন্ন কলাবিদকে পর্য্যন্ত অসহায়ভাবে অভিভূত করে এবং প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন শক্তি নিজ মর্য্যাদা ও ন্যায়নিষ্ঠা যুদ্ধদানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করে।......

"আপনি এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিতেছেন, যাহা নরকপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে। 'আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাসবান; ইহা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু যে বীভৎস নরহত্যার কার্য্যে তৈমুরলঙ্গের হৃদয়ে আনন্দ স্পন্দিত, সেই কার্য্যের সহিত এই বাণী এক শ্রেণীভুক্ত করিবার কল্পনা আমি এখনও করি নাই।

"এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই নীতি আপনি আপনার পত্রে যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে উহা রাজনৈতিক লুণ্ঠনের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইউরোপের নিন্দনীয় অনুকরণ রহিয়াছে—রাজনৈতিক গণ্ডী ছাড়াইয়া যে বৃহত্তর মানবতা আমাদিগকে এক করিয়া দেয়, উহার মধ্যে তাহার কিছুই নাই।

"টোকিওর এক রাজনীতিবিদ সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহ পাঠ করিয়া আমি কৌতুক অনুভব করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে "ইতালী ও জার্ম্মানীর সহিত জাপানের সামরিক মৈত্রীবন্ধন উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণে হইয়াছে ও ইহার অন্তরালে পার্থিব লাভ ক্ষতির প্রশ্ন নাই।" ঠিক কথা। কিন্তু যে মনোভাব সামরিক স্পর্দ্ধাকে আধ্যাত্মিক বড়াইয়ে পরিণত করে, কলাবিদ ও চিন্তানায়কগণ সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিবেন, ইহা লঘুভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

"আপনি দরিদ্র জাপানীদের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয়; তাহাদের নীরব আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের কথা বলিয়াছেন এবং এই করুণ আত্মত্যাগের সুযোগ লইয়া সমরসজ্জা করিয়া প্রতিবেশীর উপর যে আক্রমণ চালান হইতেছে, অমানুষিক উদ্দেশ্যে মানবীয় শ্রেষ্ঠতার সম্পদ লুণ্ঠন করা হইতেছে; তাহা আপনি গর্ব্বভরে স্বীকার করিয়াছেন।

"কূটবুদ্ধিজালের পশ্চাতে রহিয়াছে স্বদেশ ভক্তির এক বিকৃত আদর্শ; সেই আদর্শে বিভ্রান্ত হইয়া বর্ত্তমান যুগের "বুদ্ধিজীবীরা" তাহাদের আদর্শবাদের বড়াই করে এবং তাহাদের দেশের জনসাধারণকে ধ্বংসের পথ অবলম্বনে বাধ্য করে।

"বর্ত্তমান চীনে যাহারা জাপানী সংস্কৃতির প্রতিনিধি, তাহারা মানবজাতি কলুষিত করার একটা ব্যাপক চক্রান্তজালে আবদ্ধ হতভাগ্য নরনারীদের উপর তাহাদের কূটকৌশল প্রয়োগ করিতেছে। চীন ও মাঞ্চুকুওতে যে নরনারীদের বলপূর্ব্বক (আফিম্ প্রভৃতি) নেশায় আসক্ত করিয়া তোলা হইতেছে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত সূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অথচ জাপান হইতে কোনও প্রতিবাদ আসে নাই—এমন কি জাপানের কবিরাও প্রতিবাদ করেন নাই।...

"যে গভর্ণমেণ্ট তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রে জীবনের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস সাধনে ব্রতী সেই গভর্ণমেণ্টের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হইয়া তাহার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে এড়াইয়া যাওয়াকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানোকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবীগণ কর্ত্তৃক মানবতার প্রতি কৃতঘ্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি।"

* * * *

উপরের লেখাগুলি প্রেসে থাকাকালীন সংবাদপত্রে দেখা গেল, আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সুদেতেনে গণ ভোট লওয়ার দিন ধার্য্য হইয়াছে এবং ঐ দিনই হের হিটলারের

সৈন্যগণ যুঝিতেন জার্মাণগণের স্বার্থরক্ষার্থ। অষ্ট্রীয়া অভিযানের পুনরভিনয় করিবে। হের হিটলার নাকি আশ্বস্ত করিতেছেন—এই ব্যাপার তাঁহারা তিন দিনের মধ্যেই শেষ করিবেন। ফ্রান্সে সামরিক তোড়জোড় লাগিয়াছে; বোধহয় হের হিটলারকে ভড়কাইবার জন্য। ওদিকে গ্রেটব্রিটেনের সংবাদপত্রসমূহ এই সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় ফ্রান্স-ব্রিটেনের তীব্র মনোভাব হের হিটলারকে জানাইবার জন্য বলিতেছে। হের হিটলার ভড়কাইবার লোক নহেন। চেম্বারলেন অধ্যুষিত বিটিশমন্ত্রীসভাও যে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌দিকে হেলিতেছে তাহাও অস্পষ্ট। সুতরাং মনে হয় হের হিটলারের নাজীবাদই জয়ী হইল।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন—নিরপেক্ষতা নীতি সম্পর্কে ব্রিটেনের প্রস্তাবে তিনি রাজী নহেন। ওদিকে পীরেনিজ সীমান্ত কিন্তু বন্ধই রহিয়াছে। চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্স কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু লোকে বুঝিতেছে তাঁহারা পরম নিষ্ঠার সহিত নিরপেক্ষতা নীতি মানিয়াই চলিবেন।

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

পুস্তক পরিচয়

পদাবলী মাধুর্য্য—রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট প্রণীত। ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৫৮ পৃষ্ঠা—মূল্য ১।০ সিকা।

আলোচ্য পুস্তকটী দীনেশবাবুর একটী বিশিষ্ট রচনা এবং ইহা বঙ্গভাষার অন্যতম প্রধান গ্রন্থরূপে পরিচিত হইবার যোগ্য। বাঙ্গালার নিজস্ব বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে কত মাধুর্য্য আছে তাহা দীনেশ বাবু বিশেষ করিয়াই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। পুস্তকে মাথুর, অভিসার, মান, মানমিলন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে পদাবলীর মাধুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে দীনেশবাবুর নিজের কথা কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পাঠের আনন্দ ব্যাহত হয় না। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় যে ইহা বিশেষভাবেই সাহায্য করিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রসপিপাসু, আনন্দলাভেচ্ছু প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকেই আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিতে বলি। পুস্তকের ছাপা ভাল—এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

বন্যাপ্লাবিত বঙ্গ—

এ বৎসরের ন্যায় ভীষণ দুর্দিন বাঙলা দেশে বহুকাল দেখা দেয় নি। বাঙলা দেশের অধিকাংশ স্থান বন্যার জলে মগ্ন। মানুষ আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন—শিশু এবং স্ত্রীলোকদের দুঃখ কষ্ট অবর্ণনীয়। অর্দ্ধাহার এবং কদাহার বশতঃ আমাশয় জ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এই বিপদের দিনে আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল বাঙালীর নিকট যথাশক্তি সহায়তার জন্য প্রার্থনা করছি। এক মুঠা চাউল, এক খণ্ড বস্ত্র, একটি মাত্র পয়সার মূল্যও আজকের দিনে কম নয়।

দেশী প্রতিষ্ঠানের নূতন প্রসাধন—হিমানী

এই সর্বপরিচিত প্রসাধন প্রতিষ্ঠানটি কিরূপে একজন বাঙালীর অদম্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে গত বিশ বৎসরের মধ্যে বর্তমান আকারে গ'ড়ে উঠেছে তা হয়ত অনেকেই অবগত নন। হিমানীর বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রীগুলি উৎকর্ষবশতঃ সর্বজনবিদিত হ'লেও সেগুলির স্রষ্টা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অনেকেরই ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নেই। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে যখন ধনী ও শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের প্রসাধনে হেজলীন স্নোর একচেটিয়া অধিকার ছিল তখন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ অদম্য উৎসাহের সহিত হিমানীর প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকালব্যাপী নিয়মিত ব্যবহারের ফলে উৎকৃষ্ট বিলাতী বস্তু যেখানে শিকড় ফেলে বসেছে তার মধ্যে প্রবেশ পাওয়া এবং অধিকার স্থাপন করা যে নিরতিশয় কঠিন ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজ 'স্নো'র কথা উঠ্‌লে সর্বাগ্রে হিমানীর নাম মুখে আসে। বাঙলা দেশের নিভৃত পল্লীগ্রামেও আজ 'হিমানী স্নো' চাহিদার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে বহু বেকার ভদ্রসন্তান 'স্নো' প্রস্তুত এবং বিক্রয় ক'রে দিনাতিপাত করছেন।

শুধু 'স্নো'ই নয়, অপর যত প্রকার অতি আধুনিক প্রসাধন দ্রব্য যথা নেল্‌-পলিশ, রুজ, লিপ্‌-ষ্টিক্ প্রভৃতি, যা বিদেশ হ'তে ভারতবর্ষে আমদানী হয়, তার প্রত্যেকটির যোগ্য 'পরিবর্ত্ত' সুলভ মূল্যে এঁরা বিক্রয় করছেন। ধনী এবং মধ্যবিত্ত সমাজে এই সকল প্রসাধন দ্রব্য আজকাল খাদ্য-পরিধেয়র মতো নিত্য ব্যবহার্য এবং অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে, সুতরাং এই শিল্পের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট আশাপ্রদ।

এরূপ অবস্থায় বহুলতর এবং উন্নততর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কারখানাটিকে সম্পূর্ণ আধুনিক ছাঁচে গ'ড়ে তোলার জন্য হিমানী প্রতিষ্ঠান বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে ৯০ ফুট পথ বিস্তৃতি বিশিষ্ট ২০ বিঘা জমি নূতন কারখানার জন্য ক্রয় করেছেন। গভর্মেণ্ট হাউস হ'তে নূতন কারখানার দূরত্ব ৭॥ মাইল হবে এবং নিকটে রেলষ্টেশন এবং বসতি আছে। আমরা অবগত হলাম, সবিশেষ উদ্যম সহকারে কারখানার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছে। এই কারখানার বৃহৎ কয়লার ট্যাঙ্ক এবং আধুনিকতম মেশিনারীর সাহায্যে অল্পব্যয়ে উচ্চ শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত হবে। বৃহদায়তন রসায়নাগার (Laboratory) এবং বিবিধ গন্ধপুষ্প ও আয়াপানের চাষের ব্যবস্থাও করা হবে। আয়াপান হিমানীর অন্যতম উপকরণ যা বিলাতী Witch Hazel-এর সমান উপকারী। গন্ধদ্রব্যের জন্য যাতে ভারতীয় পুষ্পসার প্রযুক্ত হ'তে পারে

সেজন্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্-সি বহুদিন হ'তে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। চাকরিজীবী বাঙালীর চাকরির পথ আজ রুদ্ধ হ'ল। এরূপ অবস্থায় এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার অন্নবস্ত্র সংগ্রহের নবতর এবং প্রশস্ততর পথ উন্মুক্ত হোক, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র শেঠ—

লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের পরলোকগমনে ভারতীয়, বিশেষত বঙ্গীয়, ব্যবসা-জগতে যে ক্ষতি হ'ল তা সহজে পূরণীয় নয়। বাঙলার ব্যবসাক্ষেত্রে তিনি একজন দিকপাল ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৯৯ সালে দমদমার নিকট সিঁথি গ্রামে তিনি সর্ব্বপ্রথম বিস্কুটের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে উন্নতি বশত বরাহনগরে তাঁকে কারখানা স্থানান্তরিত করতে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সেখানেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অবশেষে উল্টা-ডিঙ্গিতে ৩নং রমানাথ সেন লেনে বিস্তীর্ণ ভূমির উপর বৃহৎ কারখানা নির্মান করেন। এই কারখানায় বর্ত্তমানে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক লোক কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙালীর বর্ত্তমান বিড়ম্বিত জীবনে কত বড় আশা ভরসার স্থল তা বলা বাহুল্য।

বিস্কুট এবং বার্লির কারবার ক'রে শেঠ মহাশয় এই দুই বিষয়ে বিলাতী দ্রব্যের আমদানি প্রভূতভাবে কমিয়ে দিয়ে দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি সাধন করেছেন। এঁর প্রস্তুত বাজারে সুপরিচিত এবং সুপ্রচলিত প্রসাধন বস্তু, 'সুষমা' কেশ তৈলের নাম সকলেই অবগত আছেন।

প্রতাপচন্দ্র শেঠ প্রতিভাবান কর্ম্মী ছিলেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের দ্বারা তিনি বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল ক'রে গেছেন। তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে দেশ ভ্রমণ—

প্রতিবারের মত এ বৎসরও ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল কোম্পানী পূজার ছুটিতে দেশ ভ্রমণের সুবিধা ক'রে দিয়েছেন। অল্প মাশুলে ৪৫ দিন মেয়াদের যাতায়াতি টিকেট এবং ১৫ দিন মেয়াদের অবাধ ভ্রমণ টিকেট ত আছেই, তা ছাড়া ১৫০ মাইলের উপর তৃতীয় শ্রেণীর ৪৫ দিন মেয়াদের যাতায়াত ভাড়া পূজার ছুটিতে এই প্রথম কম করা হ'ল। পূজার দীর্ঘ অবসরে মাশুল কমিয়ে দেশ ভ্রমণের এরূপ সুযোগ ক'রে দেবার জন্য রেল কোম্পানী দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ বিচিত্রার বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় রেল কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

পরলোকে দীনেশ দাশ

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও বিচিত্রার সুপরিচিত লেখক শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীনেশের মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। দীনেশ ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের, সেণ্টজন অ্যাম্বুল্যান্সের স্কাউটদলের সভ্য ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি এডভোকেট পদের জন্য আর্টিকল্‌ড্ ছিলেন।

দীনেশের সহিত যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা জানেন তাঁর ন্যায় অদম্য উৎসাহ, প্রাণশক্তি ও স্বাবলম্বনশীলতা আমাদের যুবকদের মধ্যে সকলের থাকলে দেশের মঙ্গল অনিবার্য।

আমরা দীনেশের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪৫ | ৩য় সংখ্যা

শিবানী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

কে তুমি আসিলে পূজারিণী,
তোমারে ত কখনো দেখিনি।
হাতে লয়ে ফুল-ডালি শ্বাপদসঙ্কুল এই ঘন বনমাঝে
সাহসিকা, কি লাগিয়া একাকিনী এলে হেথা এ বিজন সাঁঝে ?
বিস্ময়ে শুধানু যবে উত্তরিলে সুমধুর হাসি',
—পূজার প্রত্যাশী
আসিয়াছি শিবালয়ে ; স্বপনে দেখেছি এই অরণ্যগভীরে
সুনিভৃত ভৈরব-মন্দিরে
ধ্যানাসনে শিবমূর্তি অমল পাষাণে বিরচিত
আছে সুরক্ষিত।

কহিনু তাহারে স্নেহভরে,
—স্বপ্নভীতা, এস মোর ঘরে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি তারপরে ফিরে যেয়ো ঘরে আপনার,
নাহি কোনো দেবালয় জানি আমি সুনিশ্চয় অরণ্যমাঝার।
আমি এই বনবাসী, পথহীন অরণ্য গহনে
কভু এ জীবনে
করিনি প্রবেশ-যাত্রা, কোনো পান্থ সে দুর্গমে পশিতে না পারে,
সে ভীষণ গহন আঁধারে
সূর্যালোক ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে দিবা-দ্বিপ্রহরে,
বক্ষ্যাস্তে শিহরে।

নীরবে চাহিলে মুখপানে
কি সুভাস হেরিনু নয়ানে !
মনে হ'ল দুটি স্বচ্ছ আঁখিতারা পথহারা বনে পথ করি
চলি যাবে অনায়াসে, শ্বাপদেরা পলাইবে সে আলোকে ডরি।
মনে হ'ল স্বপ্ন তা'র বুঝি সত্য, হয়ত মন্দির
আরণ্য তিমির
ধরিছে আপন বক্ষে, সে দেউলে মর্মরের মূর্তি দেবতার
হয়ত করিবে আবিষ্কার,
সৃষ্টি প্রহেলিকা মাঝে স্রষ্টা বুঝি রহস্য কুলায়ে
এমনি লুকায়ে !

চলিল সে অরণ্যের পানে
দেবতার দেউল সন্ধানে,
মন্ত্রমুগ্ধ চলিলাম পিছু পিছু ভয়ভীত কম্পিত চরণে
কি অমোঘ টানে যেন, আপন অরণ্যমাঝে দেবদরশনে।
অন্ধ হয়ে এল আঁখি স্তিমিত সে অটবী প্রচ্ছায়,
বাধা পায় পায়।
হেরি মোরে দৃষ্টিহীন মন্দগতি, কহিল ধরিয়া মোর হাতে,
—ভয় নাই, এস সাথে সাথে।
সে কর পরশে মোর অঙ্গে অঙ্গে খেলিল বিজলি
শঙ্কা গেল চলি।

অন্ধ সম চলিনু পশ্চাতে
মোর হাত রাখি তার হাতে,
না জানি কি মন্ত্র বলে অজানা পথে সে চলে লঘু ক্ষিপ্র পদে,
নাহি মানে বাধা বন্ধ নাহি কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না গণি বিপদে,
চলে অবলীলাক্রমে কি সহজে সে অকুতোভয়া
যেন সর্বজয়া।
বাম করে পুষ্পসাজি মোর হাতে সুকোমল সুদক্ষিণ পাণি,
চলে সুখে যেন বনরাণী।
তরুরাজি সারি' সারি' বীথিপথ রাখে কি বিছায়ে
কণ্টক সরায়ে ?

বনের গম্ভীরতম দেশে
উত্তরিনু হবে যাত্রাশেষে,
সহসা হেরিনু সেথা প্রসারিত তরুহীন ভূমি সমতল,
বনানীর বাহু ঘেরে তৃণাস্তীর্ণ সুকোমল শ্যামল শাদ্বল।
অদূরে মন্দির এক সে প্রাঙ্গনে নক্ষত্রকিরণে
জাগিল নয়নে।
থমকি থামিল বালা, কহিল সে,—'স্বপ্ন মোর হের মিথ্যা নয়,
বল মোরে, ঘুচেছে সংশয়'?
অবাক বিস্ময়ভরে সে মন্দির পানে চেয়ে রই,
গতিহারা হই।

অচিরে সে দেউল দুয়ারে
হাত ধরি নিল সে আমারে।
খুলি গেল রুদ্ধদ্বার, প্রদীপ উঠিল জ্বলি অপূর্ব কিরণে,
হেরিলাম মর্মরের শিবমূর্তি ধ্যানাসীন স্তিমিত লোচনে।
গললগ্নীকৃতবাসা পূজারিণী মূরতি সম্মুখে
প্রেমোৎফুল্ল মুখে
দাঁড়াইল জোড় পাণি। অনাবিল দরশের মন্দাকিনী ধারা
সে প্লাবনে হ'ল আত্মহারা।
নতজানু হয়ে বালা ফুলসাজি হ'তে পুষ্পভার
দিল উপহার।

মনে হল যেন মোর প্রাণ
নিল টানি মূরতি পাষাণ।
হেরিনু, সে আঁখি মেলি সমাদরে পুষ্পাঞ্জলি তুলি লয়ে করে
প্রণতার শিরোপরে ধীরে ধীরে সমর্পিল গাঢ় স্নেহভরে।
ভাবি মনে, বুঝি শিলীভূত শম্ভু অন্তরে আমার
পুষ্প উপচার
লভি' উঠিলেন জাগি, সংজ্ঞা তাঁর মূর্তি ছাড়ি' মোর চেতনায়
স্বয়ংপ্রভা দীপ্তিতে ঘনায়।
সদ্যোস্ফুট আঁখি মেলি হেরি যেন মোর শিবানীরে
নিভৃত মন্দিরে।

পূজারিণি পূজার গৌরবে
নির্নিমেষ নয়নের স্তবে
পূজা পুষ্পাঞ্জলি স্পর্শে পাষাণনিমুপ্ত শিবে জাগালে উল্লাসে,
যে দেবতা এতদিন সমাধিস্থ ছিল মোর গুপ্ত বনবাসে
সে আমারি শিবমূর্তি, সে আমি তোমার স্মরহর
শশাঙ্কশেখর।

সে দেউল অটবী প্রাচীরে
ছিল ঘেরা গহন তিমিরে
আমার দেবত্ব সেথা মর্ম্মরের শুচিশুভ্র শিবমূর্ত্তি ধরি
এতকাল ছিল বসি প্রতীক্ষায় তোমা লাগি অচল প্রহরী,
কবে তুমি আসি তার নিয়তির অভিশাপভার
করি বহিষ্কার
পূত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পাষাণ-স্তম্ভনভার দিবে মুক্ত করি
প্রাণস্পন্দে উঠিবে সে ভরি।
অভিশাপ অবসান এতদিনে শর্ব্বাণী আমার,
লভিনু উদ্ধার।

হে তরুণী ফিরে যাও ঘরে
মূর্ত্তি তব রাখি এ মর্ম্মরে,
এ শিব-মন্দিরে আজি শিবানী প্রতিমাখানি প্রতিষ্ঠিত করি
পূজায় বসিব তব, অর্দ্ধাঙ্গিকা হবে তুমি হে মোর শঙ্করী।
শক্তি আরাধনা করি শিবত্ব সিদ্ধ হবে,
চিরতরে রবে
ধ্যানের তিমির মাঝে স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিময়ী অচঞ্চল শিখা,
পূজারিণী হে অভিসারিকা।
ইন্দ্রিয়ের পরপারে প্রাণের অমৃত নিলয়নে
রবে সঙ্গোপনে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্মা

জয়

অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বালিগঞ্জে দত্ত সাহেবের প্রকাণ্ড প্রাসাদ। এই অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র তাঁর পালিতা কন্যা জোনাকি। সে বোধহয় কোনো মেমের পরিত্যক্তা কন্যা—ভারি ফর্সা, ভারি সুশ্রী।

দত্ত সাহেবেরা দুই ভাই—দেবার্চন আর নির্বাচন। অনেক দিন হলো নির্বাচন তার অংশ বেচে আমেরিকায় চলে গেছে।

প্রকাণ্ড প্রাসাদের বৈঠকখানাও প্রকাণ্ড, বহুমূল্য আসবাব দিয়ে আধুনিক রুচি অনুসারে সুসজ্জিত। এই ঘরের একটি সোফার উপর শুয়ে আছেন দেবার্চন, আর তাঁর কন্যা জোনাকি তাঁর পার্শে ব'সে আছে। দেবার্চনও বিপত্নীক, নির্বাচনও। নির্বাচনের একটি ছেলে আছে।

দত্ত সাহেব জোনাকিকে বলছেন—দেখ্ মা, এই সমস্ত সম্পত্তিই তোমার...

এমন সময়ে উর্দিপরা বেয়ারা এসে সাহেবের সামনে কার্ড-ট্রে ধরলে। তার উপরে দুখানা ভিজিটিং-কার্ড। দেবার্চন তুলে নিয়ে পড়লেন নির্বাচন দত্ত আর প্রফেসার জয় দত্ত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি।

জোনাকি উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠল—কাকা এসেছেন!

নির্বাচন ও জয় ঘরে এল। জোনাকি দুজনকেই প্রণাম করলে। বড় হয়ে জয়কে সে এই প্রথম দেখলে। প্রকাণ্ড দশাসই জোয়ান মানুষ, তার উপরে সুশ্রী। জোনাকির মন এক দৃষ্টিতেই অনুরক্ত হয়ে উঠল। দুজনে অল্প একটু হাসলে। জয় মুগ্ধ দৃষ্টিতে জোনাকির সুশ্রী চেহারার দিকে চেয়ে রইল।

দেবার্চন বললেন—এস নির্বাচন, এস জয়। অনেক দিন পরে দেখা। জয় কত বড়টি হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে।

নির্বাচন ও জয় দেবার্চনকে কোনো মতে প্রণাম করলে।

নির্বাচন বললে—দেখ দাদা, তুমি জানো আমি কাজের মানুষ। বিষয় সম্পত্তি আমার বাবার। তুমি একবার অর্দ্ধেকের দাম নিয়েছ। আর কিছু পাবে না। তবে জোনাকি যদি জয়কে বিয়ে করে তা হলে তোমরা যেমন আছ তেমনিই থাকবে।

দেবার্চনের মুখ পাণ্ডাশ বর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন—জোনাকির মনের উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার আমার নেই।

জয় রূঢ় দৃঢ় স্বরে ব'লে উঠল—বাবা, একজন ভদ্রমহিলাকে ভয় দেখিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে, আর তাতে মনে করছ যে আমরা সুখী হব? তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো।

নির্বাচন ধমক দিয়ে বললে—তুই ছেলেমানুষ চুপ ক'রে থাক। দাদা, তা হলে এ-সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আজকেই তোমরা অন্যত্র যেয়ো।

দেবার্চন দৃঢ়স্বরে বললেন—জোনাকি, তোকে আমি অনাথ-আশ্রম থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম; আবার আমি তোকে অনাথ ক'রে পথে দাঁড় করালাম।

দেবার্চন কাতর হয়ে হো হো ক'রে কেঁদে উঠলেন। জোনাকি তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ। আমাদের দুজনের জীবিকা আমি উপার্জন করতে পারব।

দেবার্চন কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ খাবি খেতে লাগলেন। এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু হলো, ডাক্তার ডাকারও অবকাশ পাওয়া গেল না।

জোনাকি কান্নায় লুটিয়ে পড়ল।

নির্বাচন হেসে বললেন—এই বেশ হয়েছে। মড়া বাড়ী থেকে বেরুবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বেরুবে, আর ফিরে আসবে না।

জোনাকি কান্না সংবরণ ক'রে বললে—এই বিষয় সম্পত্তি সবই যে আপনার, আর আপনিই যে নির্বাচন দত্ত তার প্রমাণ কি?

নির্বাচন হো হো ক'রে উচ্চ রবে হেসে উঠে বললেন—চালাক মেয়ে! প্রমাণ তোমার বাবা। তোমার সাক্ষাতেই আমার সকল দাবী তিনি মেনে নিয়ে মারা গেছেন। আরো সন্দেহ দূর করবার জন্যে ডাকো তোমাদের এটর্ণিকে। সে এসে আমাকে সনাক্ত করবে। তুমি কেবল আটপৌরে কাপড় ছাড়া আর কিছু নেবে না। গহনা টহনা সব খুলে রেখে যাবে।

জোনাকি ঘৃণার সহিত বললে—তাই যাব। আটপৌরে কাপড় যা নিয়ে যাব তার দাম আমি পরে আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।

নির্বাচন খুসী হয়ে হেসে বললেন—বেশ বেশ! খাসা মেয়ে।

জয় বিরক্ত স্বরে বললে—বাবা তোমার খুনের টাকা নিয়ে তুমি ভোগ করো। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক এইখানে শেষ।

জয় দৃঢ়পদবিক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্বাচন ব্যস্ত হয়ে ডাকতে লাগলেন—ও জয়! জয়! যাসনে! আমি কার জন্যে এই বিষয় সম্পত্তি দখল করলাম?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

২

পিতার শব সৎকার ক'রে সন্ধ্যাবেলা জোনাকি কলকাতা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। তাদের রোলস রয়স এখন নির্বাচনের কবলে।

ট্যাক্সির ছাদ থেকে জোনাকির সুটকেশ নামিয়ে নিতে এল জয়! সে হোটেলের চাকর। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসার। সে হোটেলী কায়দায় জোনাকিকে সেলাম করলে।

জয়কে দেখেই জোনাকির মুখ বিরক্তিতে কালো হয়ে গেল। জয়ের মুখও চুরি করতে ধরা পড়ার মতন অপ্রতিভ হয়ে গেল।

জোনাকির সুটকেস তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেই জয় ম্যানেজারকে বললে—আমার এ চাকরী ভালো লাগছে না। আমাকে বিদায় দিন। আমি চললায়।

জোনাকি তার বন্ধুবান্ধব সকলকেই নূতন ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখেছে। তার সই আলেয়া তাকে লিখেছে—

সই,

তুমি একবার এই পাড়াগাঁয়ে এসো না। তোমার সয়াও তোমাকে সাদরে সাদুনয়ে নিমন্ত্রণ করছেন।

তোমার সই আলেয়া

জোনাকি গেল সইর বাড়ী। নৌকা থেকে নেমে মাঝির কাঁধে সুটকেস দিয়ে জোনাকি আলেয়ার বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই দেখলে উঠানে খালি গায়ে কোমরে কাপড় বেঁধে পাড়াগেঁয়ে ধরণে জয় একটা নারকেল ছুলছে।

জোনাকির মুখ কালো হয়ে উঠল! জয়ের মুখ অপ্রতিভ হলো। সে নারকোল-ছোলা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে লুকাল।

জোনাকি আলেয়াকে প্রথমে সম্ভাষণই করলে—এমন বাবু চাকর কোথায় পেলে?

আলেয়া বললে—চাকরটি খুব ভাই! সব কাজ জানে। রান্না করে পাকা বাবুর্চি বাটলারের মতন। অল্প অল্প লেখাপড়াও জানে। আমার ছেলে মেয়েদের পড়া বলে দেয়।

জোনাকী সখীর কথা শুনে হেসে ফেললে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসার অল্প অল্প লেখাপড়া জানে বটে!

উভয় সখীর আলাপের পরে জোনাকি গেল স্নান করতে। আলেয়া রান্নাঘরে ফিরে এল।

জয় এসে মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বললে—মা, আমি আর কাজ করব না। আমার পাওনাটা আমি হিসেব করেছি তিন টাকা চোদ্দ আনা হয়েছে। ঐটা আমাকে দিন। আমি এখনি যাব।

আলেয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হয়ে বললে—এখনি যাবি কি রে? খেয়ে-দেয়ে যাস।

জয় দৃঢ়স্বরে বললে—না মা, আমার আর এক মিনিটও থাকবার জো নেই। আমার বিশেষ দরকার এখনি চ'লে যেতে হবে।

স্নান ক'রে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখলে আলেয়া খাওয়ার ঠাঁই করছে।

জোনাকি হেসে বললে—সই, তোমার সে বাবু চাকর কি? তুমি নিজে ঠাঁই করছ?

আলেয়া দুঃখিত স্বরে বললে—কি জানি ভাই, তার কি হলো! সে আমাকে বললে—আমাকে এখনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে। আমার পাওনা চুকিয়ে দিন। খাসা চাকরটি ছিল ভাই।

জোনাকির মুখ ম্লান হলো, একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। দু-দুবার তার জন্যে জয়ের চাকরি গেল।

জোনাকি ভাত খেতে বসেছে। তার কেবলই মনে হতে লাগল—এই দুপহর রৌদ্রে অস্নাত অভুক্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রে চলেছে জয়! ভাতের গ্রাস আর জোনাকির মুখে রোচে না।

৩

জোনাকি তার পূর্ব্বের প্রফেসারদের সুপারিশে লরেটোতে চাকরি পেয়েছে। সে তাদের বোর্ডিংএই থাকে।

একদিন বিকেলবেলা ট্রামে খুব ভিড়। মেয়ে-সিট খালি ছিল না। জোনাকিকে উঠতে দেখেই দুজন ভদ্রলোক পুরুষ-সিট খালি ক'রে উঠে দাঁড়াল। জোনাকি মৃদু হেসে থ্যান্‌কস জানিয়ে সেই বেঞ্চিতে বসল।

জানলার দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ একজন ইংরেজি-পোশাক-পরা লোক তার পাশে এসে বসল। জোনাকি মুখ ফিরিয়ে দেখলে জয়! সে এবার বিরক্ত না হয়ে হাসলে।

জয়ও জোনাকিকে দেখে বললে—আবার এখানেও আপনি! আপনার দুর্গ্রহ সঙ্গে সঙ্গে চলে! ভয় নেই! আমি উঠে চ'লে যাচ্ছি।

জোনাকি হেসে বললে—আমাকে এত ভয় কিসের? আমি দুবার আপনার চাকরি খুইয়েছি। ট্রামের সিটটা দুজনে ভাগাভাগি ক'রে যেতে পারব। আমি জানতে পারি কি আপনি কি করছেন। আমি লরেটোতে প্রফেসারি করছি।

জয় হেসে বললে—আমিও রিপন কলেজে ইংরেজীর প্রফেসার।

জোনাকি হেসে বললে—আমাকে দেখেই ছিটকে পালাবার মতন মনের অবস্থা যদি না হয়, তা হলে দুজনে একটি নীড় রচনা করি চলো। দুটো ছন্নছাড়া জীবন এক মালায় বাঁধা পড়ুক।

জয় কিছু না ব'লে হাসিমুখে জোনাকির হাত চেপে ধরলে।

—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌন

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

যা' কিছু বলিতে চাহি, সব যদি জান অন্তর্যামী ।
তবে কেন বলিবারে প্রাণ এত ওঠে আকুলিয়া ?
ভাষা সুর ছন্দ খুঁজি ফিরি শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া,—
কেমনে বলিব হায় বাণী মোর দীন অজ্ঞ আমি ।

দিনান্তের অন্ধকার হিয়াপরে ধীরে আসে নামি,
চুপে চুপে মর্ম্মে মম বেদনার নিঃশব্দ সঞ্চার,—
হৃদাকাশে থম্ থম্ পুঞ্জীভূত ঘন মেঘভার,—
অসাড় চেতনা মাঝে অস্ফুট গুঞ্জন গেল থামি ।

মোর নীরবতা সাথে ব্রহ্মাণ্ডের মৌন গেল মিশি ;
সপ্তর্ষি-মণ্ডল মাঝে কাণাকাণি তারায় তারায় ;—
কি যেন অশ্রুত গানে সহসা ভরিল দশদিশি,
আমারি ব্যথার তারে গুঞ্জরিয়া ওঠে মূর্চ্ছনায় ।

বলা ত হোল না কিছু, কিবা ক্ষতি তায় ? যদি জানি
মৌন মাঝে বাজে ধীরে আনন্দে বিশ্রুত বিশ্ববাণী ।

লুকোচুরি

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

খেলিবে চিরদিন, এ লুকোচুরি খেলা ?

চকিতে দাও ধরা, চকিতে যাও ছুলি,'
চকিতে হৃদি মাঝে আসিয়া যাও চলি,'—
আমার এ হিয়া বুঝি সাগর মাঝে ভেলা ?

* * * *

নিশীতে কেন জানি ভাঙিল ঘুমঘোর ;—
গোপনে শুকতারা চাহিয়া অনিমেষে,
প্রেমের প্রহেলিকা কহিল নিশি শেষে ;
জাগি সে আমা সাথে রজনী হোলো ভোর ।

দিগন্তে দেখা দিল অরুণ আলো শিখা,
হেরিনু আঁখি মেলি, শিশিরে ঝলমল
শ্যামল ধরণীর ললাটে জয়টিকা ;—
টুটিল লুকোচুরি হাস্যে কলকল ।

প্রণয়-খেলা তব পড়িল ধরা শেষে,
হিয়ার ভেলা মম ভিড়িল তীরে এসে ।

বৌদ্ধ যুগে শিল্প-শিক্ষা

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতে শিক্ষা-প্রচারে বৌদ্ধদের হাত খুব বেশী। বৌদ্ধ যুগে দেখিতে পাওয়া যায় হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের সহিত গৃহস্থদের তত বেশী সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু কিছু পরেই অশোকের সময়েই দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্মকে গৃহস্থের ধর্ম করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড চেষ্টা হইতেছে। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম মগধের একটী স্থানীয় ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল, মহাযান কিন্তু সকলকেই আশ্রয় দিয়াছিল, সেখানে ভিক্ষুক গৃহস্থের পার্থক্য ছিল না, সর্ব মনুষ্যই বোধিসত্ত্ব। মুক্তির দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রথম হইতেই বৌদ্ধ বিহার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এক-একটী বৌদ্ধ বিহারই ছিল এদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। বুদ্ধের সময় হইতে দীর্ঘকাল পর পর্যন্ত জেতবনবিহার বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্র ছিল। ফা-হিয়েনও তাঁহার সময়ে জেতবনের এই গৌরবের উল্লেখ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রের কুক্কুটারাম বিহার অশোকের সময়ে এবং তাঁহার পরেও খুব বিখ্যাত ছিল। এই সকল বিহারে বড় বড় ভিক্ষু, পণ্ডিত ও বহু শিল্পের সঙ্ঘ ছিল। সকল রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এখানে হইত। এই চর্চায় জাতিভেদের কোন বাধা ছিল না; অবশ্য ব্যাবহারিক শিল্পের এখানে স্থান ছিল না। আয়ুর্বেদ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা সেখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই রকম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ঐতিহাসিক চিহ্ন বোধ হয় পাওয়া যায় সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এক নম্বর বিহারটীকে বিহার বলিয়া মনে হয় না; বিহারগুলি চতুঃশালা হইত। এটা ঠিক তেমন নয়। ভিক্ষুদের অবস্থান স্থানও নিতান্ত অপ্রচুর; ইহার সম্মুখে বড় বড় চত্বর ছিল; বড় বড় দরজা ছিল। ইহা বিদ্যালয়রূপেই ব্যবহার হইত বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করিবার সময় প্রথমেই নালন্দার নাম করিতে হয়। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে নালন্দার তুলনা ছিল না। সে সময়ে এ রকম বিদ্যালয় আর কোথাও ছিল না। য়ুয়ন-চয়ঙ বলেন শক্রাদিত্য এখানে বিহার নির্মাণ করেন। অতঃপর বুধগুপ্ত ও পরে তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বালাদিত্য পুত্র প্রভৃতি বহু রাজা এখানে বিহারাদি নির্মাণ করেন। নালন্দার বিরাট্ প্রাসাদগুলির বর্ণনায় চৈনিক পরিব্রাজকরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন সপ্ততল প্রাসাদের চূড়া মেঘ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদের কারুকার্য্য দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়।

দূর দেশ-বিদেশ হইতে সকল ধর্মের ছাত্রেরা এখানে আসিত।

বিভিন্ন শিল্পের পরিচয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়—সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে নানাবিধ শিল্প, শিল্পিগণ ও শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়; ইহাদের অবলম্বন করিয়াই কলাশিক্ষার ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষতঃ বাৎস্যায়ন-কামসূত্রে সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞানের নাম দেওয়া হইয়াছে 'চতুঃষষ্টি যোগ'। রামায়ণে শিল্পাদির উদাহরণ আছে—যেমন, "গীতবাদিত্র-কুশলা নৃত্যেষু কুশলাস্তথা। উপায়জ্ঞাঃ কলাজ্ঞাশ্চ বৈদিকে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥" বাজসনেয়ি-সংহিতা, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ, হরিবংশ, ভবিষ্যপুরাণ এবং কথাসরিৎসাগরে শিল্প বুঝিতে প্রধানতঃ সূক্ষ্ম কলা বা চারু শিল্পই বুঝায়। শিল্পের আবার দুই প্রকার ভাগও দেখা যায়—চৌষট্টি বাহ্য-কলা ও চৌষট্টি আভ্যন্তর কলা। বাহ্যকলার উদাহরণ, ভাস্কর্য, নৃত্য, গীতাদি, ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি। আভ্যন্তর কলার উদাহরণ,

—চুম্বন, আলিঙ্গনাদি। এই কলার শ্রেণী-বিভাগ শাখ্যায়ন-ব্রাহ্মণে, মহাভারত ও মনুতে আছে। মহাভারতে সাধারণ অর্থেও শিল্পকলার প্রযোগ আছে। শৈবতন্ত্রে চতুঃষষ্টি কলার প্রত্যেকটীর নাম পাওয়া যায়। কামসূত্রে যে চতুঃষষ্টি-যোগ আছে তাহা ও চতুঃষষ্টি কলা একই। বাৎস্যায়ন ঐ যোগ নারীদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন; সে সকল নারী রাজগৃহে স্থান পাইবে অথবা শ্রেষ্ঠা গণিকা ইত্যাদি হইবে। ললিতবিস্তরে বুদ্ধদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে-নারী লিপিতে, কাব্য-রচনায়, সূত্র প্রভৃতিতে শিক্ষিতা হইবেন তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিবেন। জৈন কল্পসূত্রে মহিলাদের জন্য চৌষট্টি গুণ-চর্চার বিবরণ আছে। শ্রীধর স্বামী ভাগবত-পুরাণের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যাদব রাজকুমারেরা চৌষট্টি কলায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ঐ সকল কলা নারী বা পুরুষ কাহারও জন্য বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই; গুণ হিসাবে সকলেই উহাদের আহরণ করিতে পারিত। যে কোন জ্ঞান দ্বারা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় তাহাই শিল্প-কলা—এইরূপ কথাই শুক্রনীতিতে বলা হইয়াছে। বিভিন্ন কলা সমষ্টির নাম "বেদ", একরূপও কয়েকটী স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 'গন্ধর্ববেদে' নৃত্য, গীত, শয্যাশিল্প ইত্যাদি সপ্তকলা আলোচিত হইত।

খারবেল গান্ধর্ব বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তেরও এই বিদ্যায় বেশ দাবী ছিল। আয়ুর্বেদে দশকলার সন্ধান পাওয়া যায়; রন্ধন, উদ্যানতত্ত্ব, পুষ্পসারবিদ্যা প্রভৃতি এইরূপ দশকলা। ধনুর্বেদে যুদ্ধের অস্ত্র, বাহন, ব্যূহ-রচনা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া পঞ্চকলার ব্যাখ্যা আছে।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অনেক বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন প্রভৃতি আলোচিত হইত। সেগুলি কিন্তু শিল্পকলা-শিক্ষার স্থান ছিল না। সাংসারিক বিদ্যা বা শিল্প গণতন্ত্রীদের সভাতে আলোচিত হইত—কৌটিল্য এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতকগুলিতেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায় যে, বহু লোক শিল্প-শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় যাইত। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে লেখা আছে যে, ব্যবহার-শাস্ত্রের জন্য তক্ষশিলা বিখ্যাত ছিল। মহাভারতের আদি পর্বে আছে, তক্ষশিলার লোকেরা বিদ্যায় অদ্বিতীয়। রাজপুত্রেরাও শিল্প-শিক্ষার জন্য সুদূর তক্ষশিলায় গমন করিত। ভীমসেন-জাতকে পাওয়া যায় যে, ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লোকে তক্ষশিলায় গমন করিত। তক্ষশিলা আয়ুর্বেদের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে যে উত্তর-ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ; মাত্র শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র নয় সর্বশাস্ত্রের শিক্ষাপীঠ বলিয়াই ইহার প্রসিদ্ধি ছিল খ্রীষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতকে গান্ধার-মধ্যবর্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্তমান রাওলপিণ্ডি হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়িতে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দর ভাবে বাঁধান বই থাকিত। বর্ষ, উপবর্ষ ও পানিনি প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে গমন করেন। রাজশেখরের 'কাব্য মীমাংসা'য় একথা লেখা আছে।

শিল্পশিক্ষার একটি বিশেষ ধারা এই ছিল যে ইহার শিক্ষা পুরুষানুক্রমে চলিত। বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিপুত্র হইয়া ব্যবসায় করিতেন, চিকিৎসকের পুত্র হইয়া ব্যবসায় করিতেন—ইহাতে যে বিদ্যার একটা উৎকর্ষ নিতান্ত সম্ভব তাহা না বলিলেও চলে। বিদ্যায় যে গতানুগতিক ভাবও আসিতে পারে তাহাও অসম্ভব নয়। কামারের ছেলে শিশুকাল হইতেই কামারের কাজ দেখিতে দেখিতে একটা সহজ শিক্ষা লাভ করে; সে শিক্ষা নবাগতের পাইতে অনেক সময় কাটিয়া যাইত। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জাতিগত শিক্ষা অপেক্ষা ভাল উপায় পাওয়া যাইত না। প্রত্যেকের একটা পথ নির্দিষ্ট আছে; তাহার অন্নের ব্যবস্থা জন্ম হইতেই হইয়া আছে। তবে জাত ব্যবসায় বদল করাও কিছু কঠিন ছিল না। উচ্চ বর্ণের লোকেদেরও ব্যবসায় হিসাবে সাধারণ শিল্পকর্ম শিক্ষা করিতে দেখা যায়। জাতকে আছে,

একজন ক্ষত্রিয় প্রথমে কুম্ভকারের কাজ করে, ঝুড়ি তৈয়ারীর কাজ করে, মালাকারের কাজ করে, শেষে সে পাচকেরও কাজ করিয়াছিল। তাহাতে কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জাতকে এমনও পাওয়া যায় যে, কোন ব্রাহ্মণ একজন তীরন্দাজের সহকারী হইয়াছে; সেই তীরন্দাজ আবার পূর্বে বয়ন করিত। একটী আখ্যায়িকায় পাওয়া যায় যে, এক ব্রাহ্মণ শিকার করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। আর একটী আখ্যানে আছে, ব্রাহ্মণেরা রাখালের কাজ করিতেছে, আরও দেখা যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত আহার করিতেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ত্যক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করিতেছে।

দেখিতে পাই, বিশেষজ্ঞের নিকটও শিক্ষা লওয়া হইত। জীবক কুমারভৃত্য সাত বৎসর শিক্ষানবীশ থাকিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। জীবকের বিবরণে পাওয়া যায় যে, কোন শিল্প-বিদ্যা জানা না থাকিলে জীবন ধারণ করা কঠিন হইত। তবে রাজার গৃহেও লোককে শিল্পের কাজ শিখিতে হইত।

কারিগরের কারখানাই শিল্প-বিদ্যালয় ছিল। কারিগর যদি উত্তম শিল্পীকে রাজসমীপে আনিতে পারিত তাহা হইলে সে বিশেষ পুরস্কার পাইত।

শহরের এক একটা অংশে বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী বা কারিগরেরা থাকিত। বিশেষ বিশেষ শহর বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল; দূর দেশ হইতে লোকে সেখানে সেই শিল্প শিখিতে আসিত। বারাণসীর হস্তিদন্ত-কর্মের বোধ হয় বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। হস্তিদন্ত-শিল্পীরা নগরের একটা বিশেষ অংশে থাকিত। স্বর্ণকারীরা, গন্ধবণিকেরা শহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস করিত। শ্রাবস্তীর তন্তুবায়দের একটী বিশেষ স্থান ছিল। কখনও কখনও শিল্পীরা শহরের প্রান্তে বাস করিত। জাতকে এই সকলের ভূয়োভূয় দৃষ্টান্ত আছে। কুম্ভকার, ছুতোর, কামার ও নাবিকেরা নগরের প্রান্তদেশে বিভিন্ন অংশে বাস করিত। কৌটিল্য এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলেন, জাহাজ-নির্মাণ এবং বর্ম-নির্মাণ মাত্র রাজার জন্য হইত; বাহিরের লোকের এ সকল শিক্ষা করার সম্ভাবনা ছিল না। কথাটী ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রেষ্ঠীরা দেশ দেশান্তরে ব্যবসায় করিত। ছয় মাসের জন্য সমুদ্র-যাত্রা করিত; তাহাদের জন্য জাহাজ-নির্মাণ না হইলে চলিত কি করিয়া? ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধের পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়; তাহাদের বর্মই বা মিলিত কোথা হইতে? লবণ তৈয়ারীর একচেটিয়া অধিকার ছিল রাষ্ট্রের। শিল্পীদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, রাজাকে তাহা দেখিতে হইত। যদি কেহ তাহাদের ব্যবসায় কোন প্রকার হানির চেষ্টা করিত, তাহাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত।

বিনয়ের উপালির গল্পে, উপালিকে শিল্পবিদ্যা শিখাইবার কথা হইতেছিল। রূপ, লেখ, গণনা এই সকল শিখাইবার কথা হয়। রাজপুত্রদের শিক্ষা উপলক্ষ্যে বলিয়াছি রূপ শব্দের অর্থ মুদ্রাতত্ত্ব; ইহা ভাস্কর্য, চিত্রণ বা অভিনয়ও বুঝাইতে পারে। শিল্প-শিক্ষার্থীদের বাস হইত গুরুগৃহে; শিক্ষা হইত কারখানায়। কারখানা কিন্তু খুব বড় ছিল না; শিক্ষানবীশদের সংখ্যাও খুব বেশী হইত না। সে যুগে সহস্র সহস্র ছাত্র-সমন্বিত আচার্য বা কুলপতিদের কথা শোনা যায় না; তবে এক একজন গুরুর অধীনে ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কমও ছিল না। কখনও কখনও গুরুও একাকী তাহাদের দেখিয়া উঠিতে পারিতেন না। পুরাতন ছাত্রেরা 'পিট্ঠি আচরিয়' বা ছোট ছোট শিক্ষক হইয়া নবাগতদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিত। অন্তত এইরূপ ব্যবস্থার কথা ভিক্ষুদের বিষয়ে শোনা যায়। মনে হয় শিল্প-শিক্ষারও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

তক্ষশীলার পরেই বারাণসীর খ্যাতি। আধ্যাত্মিক বিদ্যাচর্চার স্থান বলিয়া বারাণসী বিশেষ করিয়া বিখ্যাত। জাতকের যুগে কাশী প্রবল প্রতাপশালী রাজ্য ছিল। বুদ্ধের জন্মের সময় হইতেই কাশীর নাম পড়িয়া যায়।

বোধ হয় উজ্জয়িনীর খ্যাতি ছিল বিদ্যাপীঠ বলিয়াই। জ্যোতিষচর্চার ইহা কেন্দ্র ছিল। উজ্জয়িনীর উল্লেখ বিশেষ করিয়া পাওয়া যায় জৈনসূত্রে।

অর্থশাস্ত্রের অধ্যায়ের পর অধ্যায় চলিয়াছে শ্রেণীগণ ও সঙ্ঘের ব্যবস্থা লইয়া। শ্রেণীগুলি যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। তাহাদের আভ্যন্তরিক বিধি-ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিত। উহাদের শিক্ষা-

নবীশী করিতে হইলে বা ছাত্র হইতে হইলে উহার অনুমোদন ভিন্ন সম্ভব হইত না। ছাত্রদের বিষয়ে নানারূপ নিয়মও ছিল।

কত প্রকারের গণ বা শ্রেণী ছিল ঠিক বোঝা যায় না; তবে বৌদ্ধ সাহিত্যে উহাদের সংখ্যা সকল সময়েই অষ্টাদশ বলা হইয়াছে; কিন্তু অষ্টাদশের অধিক সংখ্যক ব্যবসার সন্ধান উহাতেই পাওয়া যায়।

সংগ্রহ করিলে নানাস্থান হইতে বহু প্রকার শিল্পের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। রপ্তানীতে তুলার বস্ত্র, রেশমের কাপড়, কম্বল, লোমের সুন্দর পোষাক ইত্যাদি যাইত। এগুলি রং করিবার জন্যও শিল্পী ছিল। শ্রেষ্ঠীরা সুদক্ষ নাবিক ভিন্ন চলিত না। জাহাজের কাজে কাষ্ঠ-শিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যায়। জিনিসপত্র বহন করিতে গাড়ী, যানকার, রথকার প্রভৃতির কথা বহুবার পাওয়া যায়। চিত্রণ-বিস্তার কথাও গ্রন্থে বার বার মিলে। চিত্র-শিল্পীরও অভাব ছিল না। বিনয়ে Fresco-চিত্রণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তিদন্তের কারুকার্য ও শিল্পের কথায় বৌদ্ধ শাস্ত্র পরিপূর্ণ।

মেগাসম্থেনিস্‌ মগধের রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ফাহিয়েন প্রায় সহস্র বৎসর পরেও যে সকল প্রাসাদ দেখেন, তিনি বলেন, তাহাদের তুলনা কাহারও সহিত হইতে পারে না। এ সমস্তই ছিল কাষ্ঠ-শিল্পীর কাজ। ভাস্করের কাজের কথাও শোনা যায়। স্তম্ভ-নির্মাণ, চৈত্যের অপূর্ব কারু-কার্যময় রেলিং প্রভৃতি রচনা এবং সাধারণ গৃহ-নির্মাণেও শিল্পীদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহগুলি সাধারণতঃ কাষ্ঠেরই হইত। সৈন্য ও ক্ষত্রিয়দের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হইত এবং অন্য বহু কার্যে কামারের দরকার হইত।

অলঙ্কার-শিল্পের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের বিশেষ পরিচয় Bas-reliefএ মেলে। সাহিত্যেও নারী ও পুরুষের অলঙ্কার-প্রিয়তার পরিচয় আছে। চর্ম-শিল্পের উল্লেখও বহু স্থানে আছে। পাদুকা-ব্যবহার খুবই সাধারণ ছিল। ধনীরা সুবর্ণ-পাদুকা ব্যবহার করিত। পাচক, মোদক, রজক, নাপিত এবং অঙ্গ-সেবাকারীরও সংখ্যা বড় কম ছিল না। ঝুড়ি বোনা, এবং মাদুর বোনাও অনেকের কার্য ছিল। পুষ্প-শিল্প অনেকেরই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিত। একটী বিশেষ শ্রেণীর লোক মাহুত ছিল। লেখক বা কেরাণীর কাজও বেশ কদরের কাজ ছিল। হিসাব লেখকদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় গণিকাকেও শিল্পী বলিয়া সে যুগে লোকে স্বীকার করিত। এইরূপ সর্ববিধ শিল্পীরা অষ্টাদশ গণে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গণের বিশেষ প্রতিপত্তিও ছিল, প্রত্যেক দলপতির রাজসভাতে বিশেষ স্থান ছিল। শ্রেণীদের এমন সুনাম ছিল যে, তাহারা নিজে মুদ্রা চালাইতে পারিত; তাহাদের হুণ্ডি বা নোট সর্বত্র গ্রাহ্য হইত। শ্রেণীর ইতিহাস ও অবস্থা-ব্যবস্থার কথা বলিবার অনেক আছে, কিন্তু এখানে সেগুলি আলোচ্য নয়। আমি শুধু বলিতে চাই এইরূপ শ্রেণী বা গণ বা সঙ্ঘ থাকায় ব্যবহারিক শিল্প-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত।

এই সমস্ত যুগে বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্যের কথায় মনে হইতে পারে রাজকীয় সাহায্যে ছোট ছোট বিদ্যালয় চলিত; সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের সহিত বর্তমান শিল্প-শিক্ষায়তনের বা সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনা চলে না। আমরা যেমন মিথিলার খ্যাতি, নবদ্বীপের খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি, ঐরূপ ঐ সময়েও বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তখন সেখানে ঐ সকল বিশেষ বিষয়ে বড় বড় গুরু থাকিত; কিন্তু গুরুরা প্রত্যেকে পৃথক্‌। সকল গুরুর এবং সকল ছাত্রের কোন সমবায় বা সঙ্ঘ হয় নাই। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা এক গুরুর নিকটে হওয়াও সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হইত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৭

বৈকালে অমরেশ তার পাঠাগারে ব'সে দর্শন শাস্ত্রের একটা গ্রন্থে মগ্ন ছিল, এমন সময়ে চায়ের পেয়ালা হস্তে পূরবী এসে ডাক দিলে, "দাদা !"

পুস্তকের পাতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৃদুস্বরে অমরেশ বললে, "বুঝেছি ।"

সহাস্যমুখে পূরবী বললে, "কি বুঝেছ ?"

"চা এনেছিস্ ।"

চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর স্থাপন ক'রে পূরবী বললে, "বুঝেছ ত বই বন্ধ ক'রে খেয়ে ফেল। কালকের মত যেন ভুলে অর্ধেকটা ফেলে রেখে উঠে যেয়োনা ।" ব'লে হাসতে লাগল ।

পূরবীর কথা শুনে অমরেশ বিস্মিত হ'ল ; বললে, "তাই না-কি পূরবী ? কাল অর্ধেকটা ফেলে রেখেছিলাম ?" তারপর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে বললে, "তা হবে ! চা খেতে খেতে কাপড় বদলাতে বদলাতে হয়ত' শেষ না ক'রেই অন্য-মনস্ক হ'য়ে বেরিয়ে গিয়েছি ।"

পূরবী বললে, "সে চা-টুকু কিন্তু তাই ব'লে নষ্ট হয়নি; তোমার ছাত্রী সেটুকুর সদ্ব্যবহার করেছিলেন ।"

বিস্মিতকণ্ঠে অমরেশ বললে, "আমার ছাত্রী ? কে আমার ছাত্রী ?"

"কেন, বাসনা দিদি। বাসনা দিদি ছাড়া আর কে তোমার ছাত্রী আছে ।"

একথা শুনে অমরেশের বিস্ময় দশগুণ বর্ধিত হ'ল। বললে, "বাসনা ? বাসনা কি ক'রে সে চা খেলে ? আর, আমার এঁটো চা-ই বা সে খেতে গেল কেন ?"

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে পূরবী বললে, "তুমি বেরিয়ে যাবার বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাসনা দিদি এসে উপস্থিত। মনে হ'ল তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন। তুমি হয় ত তখনো আছ মনে ক'রে তোমার ঘরে দুজনে ঢুকে দেখি তোমার চটি জুতো প'ড়ে রয়েছে। বুঝতে পারলাম তুমি বেরিয়ে গেছ। টেবিলের উপর তাকিয়ে দেখি পেয়ালায় আধ কাপের বেশি চা প'ড়ে রয়েছে। বললাম, 'দেখ বাসনা দি, কি অন্যমনস্ক মানুষ আমার এই দাদাটি ! হয়ত কিছু ভাবতে ভাবতে এতখানি চা ফেলে রেখে চ'লে গেছেন।' টেবিলের নিকটে গিয়ে বাসনা দি বললেন, 'তা ভালই করেছেন, তেষ্টায় আমারো গলাটা শুকিয়ে রয়েছে, মিছে এটা নষ্ট হয় কেন, এই দিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।' ব'লে পেয়ালা তুলে একেবারে চুমুক।"

ঈষৎ বিরক্তিভরে অমরেশ বললে, "তুই মানা করলিনে কেন পূরবী ।"

পূরবী বললে, "মানা করবার সময় পেলাম কোথায় বল ? আর, তাই-কি মানাই করিনি ? বললাম, 'বাসনা দি, ওটা যে দাদার এঁটো চা।' বললেন, 'গুরুজনের এঁটো চা খেলে দোষ নেই।' বললাম, 'তা ঠাণ্ডাই বা খাচ্ছ কেন, গরম চা ক'রে দিচ্ছি তোমাকে।' বললেন, 'এখন ত ঠাণ্ডা খাই, পরে গরম চা দিয়ো।' ব'লেই মস্ত বড় এক চুমুকে একেবারে পেয়ালা শেষ। আচ্ছা, বল ত দাদা, এ লোককে কি ক'রে ঠেকাই ?"

ঠেকানো কঠিন, মনে মনে অনুভব ক'রে অমরেশ নীরবে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলে, তারপর গম্ভীরভাবে একটু

কিছু ভাবতে ভাবতে বড় বড় চুমুকে সেই তপ্ত চা দেখতে দেখতে নিঃশেষে শেষ ক'রে ফেললে। ভবিষ্যতে আবার কোনো পরমাশ্চর্য্য ঘটনার জন্য বোধ হয় একটি বিন্দুও প'ড়ে রইল না।

পূরবী বললে, "তারপর কিছুক্ষণ পরে যখন গরম চা ক'রে নিয়ে গেলাম, তখন বাসনা দিদির সেই সুন্দর মুখ যেন একটি বোলতার চাক হয়েছে। বললেন, 'আমি চললাম পূরবী। মাসীমার মুখে শুনলাম তোমার দাদা তোমাদের অনুমতি মাসীর বাড়ি গিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর ফিরতে রাত হবে।' আমি বললাম, 'তা তোমার জন্যে চা করলাম, চা খেয়ে যাও।' বললেন, 'ঐ ঠাণ্ডা চায়েই যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার নেই।' ব'লে সোজা একেবারে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। আচ্ছা, দাদা ?"

অমরেশ জিজ্ঞাসু নেত্রে পূরবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"বাসনা দিদি এমনি ত' বেশ ভাল লোক, কিন্তু একটু রাগী মানুষ, না ?"

"একটু।" ব'লে অমরেশ চট ক'রে চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে উঠে পড়ল।

পূরবীও উঠে প'ড়ে বললে, "খাবার না খেয়ে বেরিয়ো না দাদা। মা খাবার তৈরী করছেন।"

"আচ্ছা।"

সন্ধ্যার পর একটু চিন্তিত মনে অমরেশ বাসনাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল। সামনেই ছিল শৈলনাথের হেড খানসামা বদরী।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "সায়েব বাড়ি আছেন বদরী ?"

বদরী বললে, "আজ্ঞে না, মিনিট পাঁচেক হ'ল সায়েব বেরিয়েছেন।"

"মা ?"

"সায়েব আর মা দু'জনে এক সঙ্গে শ্যামপুকুরে দাদা-মশায়ের বাড়ি গেছেন।"

"আসতে দেরী হবে ?"

"তা' ত বলতে পারিনে হুজুর।"

একটু চিন্তা ক'রে অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "দিদিমণি বাড়ি আছেন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'ল না বদরীকে, অদূরে স্বয়ং বাসনাকেই দেখা গেল। দ্বিতলের বারান্দা থেকে অমরেশকে গৃহে প্রবেশ করতে দেখতে পেয়ে সে নেমে আসছিল, সিঁড়ির বাঁকের প্রশস্ত ধাপে অমরেশের সম্মুখীন হ'য়ে আহ্বান করলে, "আসুন।"

অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় ? ওপরে ?"

"হ্যাঁ, ওপরে।"

আর কোনো কথা না ব'লে বাসনাকে অনুসরণ ক'রে অমরেশ দ্বিতলের বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উপনীত হ'ল। সেখানে একটা বেতের গোল টেবিলের চারদিকে চারখানা বেতের চেয়ার পাতা ; একখানা চেয়ার অমরেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বাসনা বললে, "বসুন।"

অমরেশ উপবেশন করলে সে বললে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি এখনি আসছি।"

অমরেশ বললে, "আচ্ছা, এস।"

বৈশাখ মাস শেষের দিকে পদার্পণ করেছে। চৈত্র-বৈশাখের সায়াহ্নকাল বাঙলা দেশে বিধাতার আশীর্বাদ। সাগরসম্পৃক্ত সুশীতল দক্ষিণ পবন সেদিন সেই আশীর্বাদ অফুরন্ত ধারায় বহন ক'রে আনছিল। পাশে একটা বড় টবে একগাছ বেলফুল ফুটে তীব্র মধুর সৌরভে বারান্দার সেই দিকটা আবেশ-মদির ক'রে রেখেছে। একটা প্রকাশ-হীন উদ্বেগের স্তিমিত বেদনায় অমরেশের চিত্ত অলস হ'য়ে উঠল, চক্ষু এল মুদ্রিত হ'যে।

ক্ষণকাল পরে বাসনা যখন ফিরে এল তখন অমরেশের সাড়া-শব্দ নেই,—চেয়ারের পিছন দিকে মাথাটা হেলান দিয়ে নিশ্চল হ'য়ে প'ড়ে আছে। সন্তর্পণে একটা চেয়ার সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন ক'রে সে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তন্দ্রা কাটতে বেশিক্ষণ লাগল না, চক্ষু উন্মীলিত ক'রে বাসনাকে নিঃশব্দে ব'সে থাকতে দেখে অমরেশ সোজা হ'য়ে উঠে বসল ; বললে, "কতক্ষণ এসেছ ?"

"বেশিক্ষণ নয়।"

"তোমার এ জায়গাটার মোহ আছে বাসনা ; হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

বাসনা বললে, "ঘুম নয়, একটু তন্দ্রা এসেছিল। একটা ইজিচেয়ার আনিয়ে দেবো, একটু ঘুমিয়ে নেবেন?"

বাসনার প্রস্তাব শুনে অমরেশ আরো একটু খাড়া হয়ে উঠে বসল; বিস্ফারিত নেত্রে বললে, "বল কি বাসনা! আমি কি তোমাদের এখানে ঘুমাতে এসেছি?"

"তবে কি জন্যে এসেছেন?"

অদ্ভুত এই অতর্কিত অসুবিধাজনক প্রশ্ন! একটু বিমূঢ় বোধ ক'রে অমরেশ বললে, "কি জন্যে এসেছি তা হঠাৎ এক কথায় ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কিন্তু ঘুমোতে যে আসিনি তা বলা শক্ত নয়।" ব'লে হাসতে লাগল।

অপলক নেত্রে অমরেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাসনা বললে, "আমি কিন্তু বলতে পারি কি জন্যে আপনি এসেছেন।"

সকৌতূহলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি জন্যে এসেছি?"

"আমার আবেদন অগ্রাহ্য, সেই কথা বলতে।"

বিস্মিত স্বরে অমরেশ বললে, "তোমার আবেদন অগ্রাহ্য? কি তোমার আবেদন বাসনা?"

"সেদিন রাত্রে গাড়িতে ব'সে আপনার কানে কানে বলেছিলাম ত। ভুলে গেছেন এরি মধ্যে?"

স্নিগ্ধ অবিচলিত কণ্ঠে অমরেশ বললে, "না ভুলিনি, মনে আছে। তোমার সে কথাকে নিতান্তই যদি আবেদন বল, তা হ'লে তোমার সে আবেদনের কথা এই তিন চার দিনের মধ্যে অনেকবারই ভেবেছি, আর প্রতিবারই মনে হয়েছে সে আবেদন সম্পূর্ণ নিরর্থক; কোনো তার কারণ নেই, কোনো প্রয়োজন নেই।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাসনা বললে, "নেই? কে বললে আপনাকে নেই?"

তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমরেশ বললে, "তুমি ত' বিপন্ন নও বাসনা, তুমি ত আশ্রয়হীন নও—আমার শরণাগত হবার সত্যিই ত' তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

অমরেশের প্রতি বাসনা এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর আরক্ত মুখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "কিন্তু যদি বলি, আছে? যদি বলি, আপনি আমার পড়াশুনো বন্ধ ক'রে দেবার যোগাড় করছেন। যদি বলি, আপনার জন্যে এই বাড়ির আশ্রয় থেকে আমাকে হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বঞ্চিত হ'তে হবে, তা হ'লে?"

গভীর আর্ত কণ্ঠে অমরেশ বললে, "তা হ'লে আমি ভারী দুঃখিত হব,—কিন্তু আমার জন্যে, সে কথা স্বীকার করব না।"

দৃপ্ত স্বরে বাসনা বললে, "হ্যাঁ, আপনারই জন্যে! লেখাপড়া নিয়ে মনের আনন্দে আমার দিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটছিল, কেন আপনি তার মধ্যে এমন করে বিঘ্ন নিয়ে এলেন?"

"বিঘ্ন কেন বলছ বাসনা?"

"কেন বলছি, এখনো তা আপনি বুঝতে পারছেন না?"

"না, সত্যিই পারছিনে,—পারুলের সঙ্গে কোথায় তোমার বিরোধ সত্যিই তা আমি বুঝিনে।"

"তা হলে কোনো কথাই আপনার বুঝে কাজ নেই।" ব'লে চেয়ার ত্যাগ ক'রে বাসনা রেলিংএর ধারে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য ভেবে অমরেশ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে, এমন সময়ে দুই হাতে কাঠের ট্রে ধারণ ক'রে দূরে একজন ভৃত্যকে দেখা গেল। ট্রের উপর চায়ের বিবিধ সরঞ্জাম এবং কয়েক প্রকার খাদ্যের ডিশ্ সাজানো।

পদশব্দে ফিরে দেখে বাসনা চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল এবং ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হ'লে ট্রের উপর থেকে দ্রব্যগুলো নিয়ে অমরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখতে লাগল।

বিস্মিতকণ্ঠে অমরেশ বললে, "এসব কী বাসনা?"

বাসনা বললে, "বলছি, একটু সবুর করুন।"

ভৃত্য বললে, "চা-টা তৈরী ক'রে দিয়ে যাই দিদিমণি?"

বাসনা বললে, "না, তুই যা, আমি ক'রে দিচ্ছি।" তারপর ভৃত্য অদৃশ্য হ'লে চা তৈরী করতে করতে বললে, "এ-সব চা আর খাবার। নিন, খেতে আরম্ভ করুন।"

"কিন্তু বাড়ি থেকে এখনি যে আমি চা আর খাবার খেয়ে আসছি বাসনা।"

চায়ের পেয়ালাটা অমরেশের হাতের কাছে এগিয়ে

দিয়ে বাসনা বললে, "তা আমি জানি। আধ পেয়ালা চা ফেলে রেখে ছুটে আসবার মতো জায়গা আমাদের এ বাড়ি যে নয়, সে কথা আমাকে না বললেও চলে।"

এত গোলযোগের অবস্থাতেও বাসনার কথা শুনে অমরেশের মুখে হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল; বললে, "কিন্তু পুরো পেয়ালা চা খেয়ে এলেও আবার চা খাবার মতো জায়গা যে তোমাদের এ বাড়ি, সে কথাও তোমাকে না বললে বোধহয় চলে?"

বাসনা বললে, "সেটা ভয়ে, খুসি হ'য়ে নয়।"

কপট বিস্ময়ের সুরে অমরেশ বললে, "ও কথা বলো না বাসনা। ছাত্রীর ভয়ে গুরুমশাই খাওয়ার ওপর খায়, এ কথা জানতে পারলে লোকের কাছে গুরুমশায়ের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে।"

বাসনা বললে, "একটুও নষ্ট হবে না,—বদরাগী ছাত্রীদের গুরুমশায়রা ভয় করে, এ কথা সকলেই জানে।" ব'লে একটা ডিশ থেকে একখানা কাটলেট অমরেশের হাতে তুলে দিলে।

কাটলেটখানা হাতে নিয়ে অমরেশ বললে, "বিচার করলে নিজে, আবার দণ্ডও দিচ্ছ নিজের হাতে। তোমাকে হিংস্র হাকিম বললে রাগ করতে পারনা বাসনা।"

এ কথার উত্তরে বাসনা কোনো কথাই বললে না, শুধু একটা কিসের অনির্ণেয় আবেগে তার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

ভয়েই হোক আর খুসি হয়েই হোক, আহার পর্ব্ব শেষ হ'ল। বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে অমরেশ বললে, "এবার আমি উঠব বাসনা। কিন্তু তোমার বাবা যদি শীঘ্র ফেরেন তা হ'লে একটু ব'সে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।"

বাসনা জিজ্ঞাসা করলে, "তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার?"

"একটু কথা আছে।"

"কি কথা?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে অমরেশ বললে, "এসেছি যখন মুখে মুখেই তাঁর কাছে বিদায়টা নিয়ে যেতাম।"

বাসনার মুখ কালো হয়ে উঠল; বললে, 'বিদায় নিয়ে যেতেন? চিরদিনের জন্যে না-কি?"

"ভবিষ্যৎ ত অনিশ্চিত বাসনা, কি ক'রে বলব বল?"

"ও! সে কথা মনে ছিলনা। আচ্ছা, একটু বসুন, ফোন ক'রে জেনে এসে বলছি।"

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

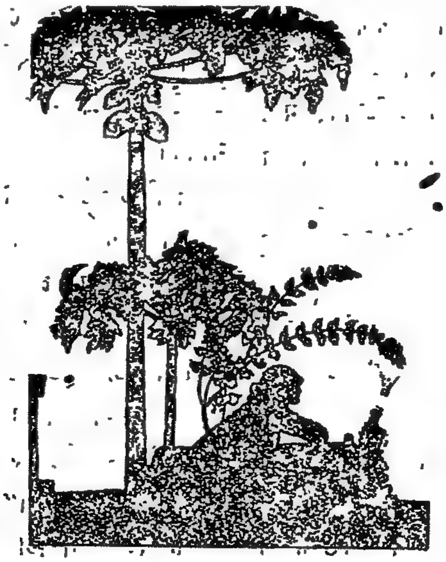

ভিয়েনা (Wien)

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনায় পৌঁছুলাম—রাত্রি ১১টার পরে পৌঁছুলাম। ষ্টেশনের খুব কাছেই হোটেল বেল ভিউ। সেখানে যাওয়া গেল। রাত্রির খাবার পথেই সেরে নেওয়া গিয়েছিল। কাজেই এখানে এসে শয়ন করা ব্যতীত অন্য কোনও কাজ ছিল না। নির্দিষ্ট কামরায় এসে জামা কাপড় খুলতে না খুলতে হোটেলের লোক এসে পাসপোর্ট নিয়ে গেল। সব হোটেলেই এই নিয়ম। পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরেই পাসপোর্ট নিয়ে গিয়ে পর্য্যটকের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় রেজেষ্ট্রী বইতে টুকে নেয়। বোধ হয় পুলিশ থেকে রীতিমত খবরাখবর নেবার প্রথা আছে।

পরদিন সকালে কুক কোম্পানীর অফিসে যাওয়া গেল—যদি দেশের কোনো চিঠি থাকে। কারণ আমার ভ্রমণপঞ্জী দেশেও জানিয়ে দিয়েছিলাম। কুকের অফিসে আমার পূর্ব্ব পরিচিত হাটবেড়ের (নড়াল) জমিদার জিতেন্দ্রনাথ রায় মশায়ের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর কাছ থেকে বন্ধুবর ডাঃ প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ঠিকানা জেনে নিলাম। প্রমথ-বাবুর চোখের ভারি অসুখ হয়েছিল। তিনি বুদ্ধির কাজ করেছিলেন এই যে অপেক্ষা না করেই ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলেন। ভিয়েনা অনেক দিন থেকে ভাল চিকিৎসক ও উন্নততর প্রণালীর চিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ। জিতেন্দ্রবাবুও সেইজন্য ভিয়েনায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খুব বেশী উপকার পাননি বললেন।

গয়টে স্মৃতি-উদ্যান

যা হোক্ কুক কোম্পানীর অফিস থেকে বেরুবার পূর্ব্বে ওদের দৈনিক ভ্রমণের টিকিট নিয়ে নেওয়া গেল।

বিকালে কুকের মারফতে সহর ঘুরে দেখা গেল। ভিয়েনা একটি বড় সহর। জার্মানীর সহরের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলি প্রকাণ্ড। রাস্তা প্রশস্ত। রাস্তার ধারে অনেক যায়গায় পার্ক বা উদ্যান আছে। এ ছাড়া

রাস্তায়ও গাছের সারি রয়েছে। ট্রাম বাস মোটরের হুড়াহুড়ি আছে। আমাদের গাড়ী সম্রাটের গ্রীষ্ম-প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলো। বিস্তৃত প্রাঙ্গন। তোরণের উপর প্রকাণ্ড গম্বুজ। প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেই দু'জন সেনাপতির প্রস্তর মূর্ত্তি।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়, বিচার-প্রাসাদ (Palace of Justice), পার্লামেণ্ট দেখে সেণ্ট ষ্টিফেনের প্রকাণ্ড গির্জার সম্মুখ দিয়ে গেলাম শনব্রান প্রাসাদে। পথে অনেকগুলি গির্জা দেখলাম। জার্মানীর কবি গয়টে, শিলার, সুর শিল্পী মোজার্ট, বেটোফেন, শুবার্ট প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি দেখলাম।

পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে; আবার জনশিক্ষার পথও সুগম ক'রে দিয়েছে। আমাদের দেশে মূর্ত্তি শিল্প ত মধ্যযুগে একরূপ ছিল না বললেই চলে। কারণ মুসলমান অধিপতিরা মূর্ত্তির পক্ষপাতী নন। তাঁরা বরং মূর্ত্তি ভেঙ্গেছেন, নিজেরা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন নি। ইংরেজেরা আমাদের দেশে অনেক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়েছেন। গড়ের মাঠে বহু ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি আছে। কিন্তু তাদের খবর আমরা রাখি না। ওঁরা যে রাখেন, তাও কেউ হলফ ক'রে বলতে পারে না। ওগুলি ওঁদের প্রাধান্যের পরিচায়ক হতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষেও সুবিধা হতে পারে। কিন্তু দেশের

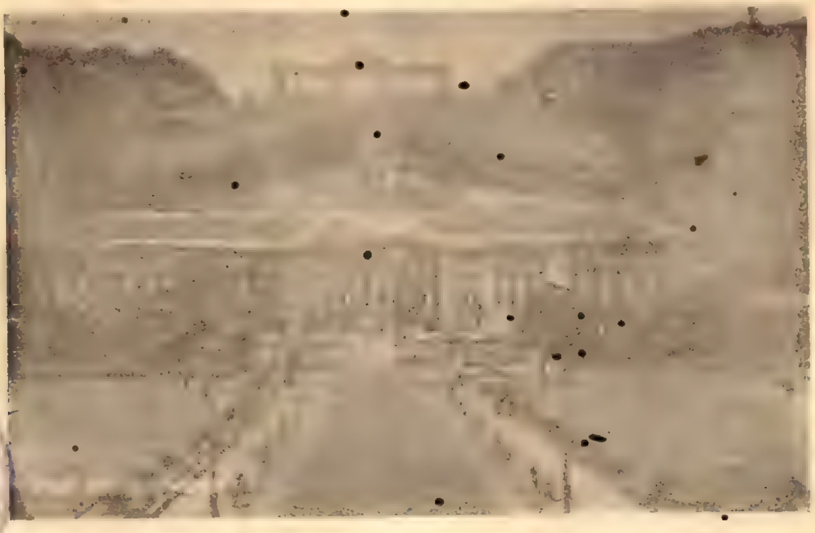

শনব্রাণ প্রাসাদ

বিলাতে ও ইউরোপের সহরগুলিতে এমন একটি রুচি ও প্রেমিকতার আদর্শ দেখা যায়, যা মনকে সম্ভ্রমে নত করে। প্রত্যেক জাতি তাদের নগরীকে পুষ্পোদ্যান ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিয়ে সাজাতে চেষ্টা করেছে। পুষ্পোদ্যানে পাওয়া যায়, তাদের রুচির পরিচয়, আর শিল্পগুলিতে পাওয়া যায় তাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের পরিচয়। যে সকল বীর আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের জন্য, যে সকল শিল্পী কবি ও রাজনীতিবিদ্ জগতের কাছে তাদের পরিচিত করেছেন, তাদের মূর্ত্তি গড়িয়ে ওরা একদিকে ওদের কৃতজ্ঞতা ও স্বদেশ প্রেমের

লোকের কৌতূহল, বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে হ'লে, দেশের লোকের মনে আত্মসম্মান জাগিয়ে তুলতে হলে অন্য রকম মূর্ত্তি চাই।

ভিয়েনায় বের্লিনের মত শ্রমিকদের জন্য প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরী হয়েছে। অল্প পয়সায় যাতে তারা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট থেকে করেছে। শুনলাম মাসিক ৩৫ শিলিং দিলেই একজন লোক সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে! যতদূর মনে হচ্ছে, তাতে ভিয়েনার ২৫ শিলিংএর সমান বিলাতের এক পাউণ্ড। তা হলেই প্রায়

এগারো বারো টাকা হলেই একজনের চলে যেতে পারে। বর্ত্তমান জগতের এই সকল অভিনব ব্যবস্থা। একথা স্বীকার করতেই হবে যে আগে গরীব গৃহস্থদের জন্যে এমন করে কেউ ভাবে নি। সমাজতান্ত্রিকতা ও শ্রমপ্রধান সামাজিক অবস্থার (Industrialisation of Society) জন্য এই সকল একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

এ সকল দেখে গেলাম শনব্রাণ বা শেণ ব্রাণ (Schonbrun) প্রাসাদে। ভিয়েনার চারিদিকেই পাহাড়। আমার হোটেলের জানালা দিয়েও পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়। সহরের উপান্তে এই পাহাড়ের সারি থেকে অল্প দূরে এই রাজপ্রাসাদ। বহুদূর বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদটি অবস্থিত। প্রাঙ্গন অতিক্রম করে' আমরা উপর তলায় উঠলাম। ভেরারসাইয়ের রাজপ্রাসাদের মত না হলেও এ প্রাসাদটিও দেখবার মত। তার পরে ইতিহাসের কাহিনী এই রাজভবনটিকে জড়িয়ে রেখেছে। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন মেরিয়া থেরেসা রাণী ছিলেন। এঁরই কন্যা মেরি এণ্টয়নেট করাসী বিদ্রোহের বহ্নিতে ভস্মসাৎ হয়েছিলেন। মেরিয়া থেরেসার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হয়েছিল। এঁর পুত্র ফ্রান্সিস জোসেফের (১ম) প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে। ইনি একজন পরাক্রান্ত রাজা হয়েছিলেন।

নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই এসে এই শনব্রানের রাজপ্রাসাদে বাস করতেন। তাঁর এক পুত্র যক্ষ্মারোগে এই ভবনের একটি কক্ষেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন এই প্রাসাদ যাদুঘর ও চিত্রশালায় পরিণত হয়েছে।

১৯২০ সাল থেকে ত অষ্ট্রীয়ায় রাজপাট উঠে গেছে। পূর্ব্বেই বলেছি মহাযুদ্ধের আগে অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ইউরোপের মধ্যে বিস্তৃতিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতো। কিন্তু মহাযুদ্ধের অবসানে যখন এদেশে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হলো, তখন আর সম্রাটও রইল না, সাম্রাজ্য রইল না। এখন অষ্ট্রীয়া ৮টি প্রদেশের একটি রাষ্ট্রসংঘ (Federation) মাত্র। একজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং সমস্ত শাসনতন্ত্র তাঁরই অধীন হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ডলফাস (Dolfus)। ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি তাঁর অফিসেই নিহত হন।

এখন যেরূপ হাওয়া বইছে, তাতে ডাঃ শুসনিগ্ ও ধরতে গেলে অষ্ট্রীয়ার ডিক্টেটার। অবশ্য হিটলার ও মুসোলিনির মত তাঁর প্রভাব নেই।

শনব্রাণ প্রাসাদের উদ্যান

ভিয়েনা থেকে প্রায় ৭০ মাইল গেলে সেনমারিং বলে এক অতি রমণীয় স্থান আছে। সেখানে ফানিকুলার রেলে পাহাড়ের মাথায় উঠতে হয় এবং তারের রেলওয়েতে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ঝুলে ঝুলে যাওয়া যায়। অবশ্য পড়ে গেলে ত হাজার ফুট নীচে। যাঁরা একটু 'স্নায়বিক', তাঁরা ঐ সময়টা চোক বুজে ইষ্টমন্ত্রের ধ্যান করেন। সেমারিং যায়গাটি অতি স্বাস্থ্যকর। ট্রেণে পাহাড়ের পাদদেশে আসা যায়। যায়গাটি অনেকখানি উঁচুতে। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে' হোটেল আছে কয়েকটি। তাঁকে ছ'মাসের উপর থাকতে হয়েছিল। বন্ধুবর সুরেন্দ্র দাসগুপ্তও বিলাতে ধর্ম্ম মহাসভায় যোগদান করবার পথে ভিয়েনায় গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে। তাঁর রক্তের চাপ পরীক্ষা করা, চোখের অবস্থা নির্ণয় করা প্রভৃতি অনেক ব্যাপার ছিল। তিনি ভিয়েনার বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। প্রমথবাবু সেপ্টেম্বর মাসে ফিরে এসেছেন—তাঁকে দেখে ভিয়েনার চিকিৎসকদের বলিহারি দিতে হয়।

প্রমথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভিয়েনার একজন

মেরিয়া থেরেসার স্মৃতিস্তম্ভ

পরদিন প্রাতে প্রমথবাবুকে দেখতে গেলাম হাসপাতালে। সেটি ঠিক হাসপাতাল নয়। রুদেলফিনার হাউস একটি মাঝারি গোছের বাড়ী। চোখের চিকিৎসার জন্য একজন এই বাড়ীটি করে' দিয়েছেন। প্রমথবাবুকে দেখে দুঃখ হলো। তিনি যে আর আরোগ্য লাভ করে' দেশে ফিরতে পারবেন এমন বোধ হলো না। তাঁর রেটিনা চোখের গহ্বর থেকে একদম ছেড়ে গিয়েছিল। এ রকম রোগ হলে যে কখনও সারে একথা ১৫।২০ বছর আগে কেউ বিশ্বাস করতো না। কিন্তু ভিয়েনার ধন্বন্তরিরা অসম্ভবকেও সম্ভব করে' তুলেছেন। প্রমথবাবু বেশ সেরে এসেছেন—কিন্তু মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো, তাঁর নাম মিসেস ফুলপ মিলার (Mrs. Heddy Fulop Mieller). ইনি ভারতের প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী দেখলাম। শ্রীযুক্ত সুভাস বসু যখন ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসেস মিলারের পরিচয় হয়েছিল। আমি শুনেছি যে মিসেস মিলার তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন। এই মহিলার মুখে সুভাস ও দিলীপ রায়ের সুখ্যাতি ধরে না। দিলীপ এবং সুভাসের ছবিও তিনি খুব যত্ন করে' রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ঘরে অনেক বাংলা বইও দেখলাম। অবশ্য মিসেস মিলার বাংলা জানেন না, কিন্তু তিনি বাংলা দেশের

কবি, বাংলা দেশের গায়ক এবং বাংলা দেশের নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখেন। আমি ও মিস্ বসু তাঁর ভবনে গিয়েছিলাম। একটি বাড়ীর তিন তলার একটি ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি আছেন। তাঁর বসবার ঘরটি বেশ রুচির সঙ্গে সাজানো। কিন্তু সে ঘরের আবহাওয়া যেন বাংলা-দেশের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ভারি ভাল লাগলো আমার। তাঁর ঘরে একটি গ্রামোফোন ছিল, তাতে বাংলা ও হিন্দী গানের রেকর্ড দেওয়া হলো। সেটি যখন বাজছিল, তখন মিসেস মিলারের অনুরাগরঞ্জিত মুখ দেখে আমার মনে হলো যে সত্যি তিনি বাংলাদেশ ও বাংলা দেশের লোকদের ভাল বাসেন। প্রমথবাবুকে তিনি প্রায় রোজই দেখতে যেতেন এবং প্রায় প্রতিদিনই তাঁর জন্য কিছু ফল মূল নিয়ে যেতেন। তাঁর নিজের স্বাস্থ্যের জন্য তিনি ইটালীর আব্বাসিয়া নামক স্থানে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু প্রমথবাবুকে একটু সুস্থ না দেখে তিনি যেতে পারছিলেন না বললেন। বিদেশে এমন বন্ধু খুব কমই পাওয়া যায়। তিনি আমাকে ও মিস বসুকে বলে দিলেন যে তিনি (মিসেস মিলার) সঙ্গে করে' আমাদের সব যায়গা দেখিয়ে দেবেন। তার পর দিন আমরা সেই অনুসারে অপেরার কাছে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সহর দেখে বেড়ালাম। প্রথম আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিলাম একটা হাঙ্গেরিয়ান রেস্তরাঁয়। সেখানকার খাদ্যের একটি বিশেষত্ব এই যে প্রায় আমাদের দেশের মত রান্না। মশলা মিষ্টি ও ঝাল দিয়ে রান্না মন্দ লাগে না। ওখান থেকে আমরা মিউজিয়মের পাশ দিয়ে গয়টে ও শিলারের প্রতিমূর্তি দেখলাম ও ছবি তুলে নিলাম। তারপরে একটা গির্জ্জায় গেলাম, তার সঙ্গে ছিল এক যাদুঘর। তার নাম কাইজার গ্রুফ্ট্ (Kaiser Gruft) অর্থাৎ অষ্টিয়ার রাজাদের সমাধি। মাটীর ভিতরে কক্ষ তৈরী করে' অনেকগুলি রাজার সমাধি তার মধ্যে রক্ষিত হয়েচে। কতকগুলি লোককে দেখতে যেতে দিচ্চে। সে দিন সোমবার, মিউজিয়ম বন্ধ। কিন্তু এই সমাধিস্থান দেখে আমরা কতকটা কৌতূহল চরিতার্থ করলাম।

আমরা এখান থেকে গেলাম ট্যাক্সিতে প্রোফেসার গিলডেনের বাড়ীতে। গ্রীষ্মের বন্ধে অনেক প্রোফেসারই তখন বাহিরে গেছেন। কিন্তু আমি ওখানে যাবার সংবাদ মিসেস মিলারের কাছ থেকে পেয়ে অধ্যাপক গিলডেন্ আমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সঙ্গে মিসেস মিলার ও মিস বসু ছিলেন। সহরের উপান্তে বিকাল বেলা আমরা সেই অধ্যাপকের বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীটি ছোট হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার উপরেই দরজা। কড়া নাড়তে ক্ললে দরজা খুলে গেল। তারপরে আমরা উপর তলার ঘরের মধ্য দিয়ে তিন তলার ছাতে গেলাম। বাড়ীর সঙ্গে একটু বাগান আছে এবং গির্জ্জার বাগানটি পাশে থাকায়, তিন

দড়ির রেলগাড়ী

তলার ছাতটি বেশ প্রীতিপ্রদ মনে হল। অধ্যাপক গিল-ডেনের সঙ্গে আর একজন অল্পবয়স্ক অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর নামটি মনে হচ্চে না। তিনি সাইনোলজি বা চৈনিক ইতি-হাসের অধ্যাপক। এদের সঙ্গে নৃতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হলো। জগতে সংস্কৃতির বিস্তারে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যায়—যেমন মেক্সিকোতে অনেক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। মেকসিকো উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক বিস্তৃত প্রদেশ। সেখানে আমাদের মত রাশিচক্র মন্দির প্রভৃতি কি করে' গেল—এটা একটা মস্ত রহস্য। তাই নিয়ে তাঁদের সঙ্গে

আলোচনা হলো। তাঁরা এবিষয়ে অভিজ্ঞ। কাজেই অনেক কথা শোনা গেল, তাঁদের মুখ থেকে।

আসবার সময় আর ট্যাক্সি নিলাম না। আমরা ট্রেণে করেই এলাম। মিসেস মিলারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাখলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে একটু ব্যথা অনুভব করলাম এইজন্য যে এমন একজন বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মহিলাকেও একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এঁর স্বামী একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর লেখা লেনিন ও গান্ধী, র‍্যাসপুটিন বা ধর্ম্মাত্মা সয়তান প্রভৃতি পুস্তক বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে ফেলে আমেরিকায় স্বচ্ছন্দ বিহার করছেন। মিসেস মিলার এই কয়েক মাস আগে কলকাতায় এসেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর ভবনে ছিলেন। আমরা তাঁকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে' আনন্দ করেছিলাম।

পরদিন আমি গেলাম ভিয়েনার অরণ্য দেখতে। ভিয়েনার অনতিদূরে এই বনভূমি পর্যটকদের আকর্ষণের বিষয় হয়েচে। আমি কুকের শ্যারাব্যাঙ্কে গেলাম এই বন দেখতে। প্রথমটা গেলাম একটি প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে (Bath), এ স্থানটির নামও ব্যাডেন (Baden) অর্থ Bath. জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং বেলজিয়মে কতকগুলি এইরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান আছে। অনেকে অসুস্থ হয়ে এই সকল স্থানে স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসেন। বাত এবং কাশির পক্ষে এই সব যায়গা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অনেকে এই সব ব্যাধির জন্য আসে বলে' এরা নানাপ্রকারে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে' স্থানগুলিকে উপভোগ্য করে রেখেছে। আমরা প্রথমে এক রেস্তরাঁয় গেলাম, তার নাম Rauhenstein (Hotel Restaurant u Cafe). সেখানে এত লোকের সমাবেশ হয়েচে যে লোক খাবার দিয়ে উঠতে পারছে না। কফি ও কিছু আইসক্রীম খাওয়া গেল। কিন্তু দাম নিতে আসবার ফুরসৎ তাদের নেই। নিজে উঠে গিয়ে একজনের কাঁধে হাত দিতেই সে বল্লে 'কফি ?' আমি ঘাড় নাড়তেই সে বললে এক শিলিং। তাই দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বিকালের রোদ ঝকমক্ করছে। পথে লোকের হাস্য কোলাহলে যেন ঐ রোদের রঙ লেগেছে। ব্যাডেন সহরটি ছোট, হাজার পঁচিশেক লোক বাস করে। কিন্তু বাড়ী ঘর বেশ বড়, সুরক্ষিত এবং সুরুচির পরিচায়ক। ভিয়েনা পর্য্যন্ত ট্রাম আছে। একটি ক্লাবে গেলাম ; সেখানে স্নানের ব্যবস্থা আছে। পাথর বাঁধানো পুষ্করণী। বাতের রোগীরা

জাতীয় পুস্তকাগার

সেখানে সন্তরণ করেন। ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে কেউ একবার, কেউ ছুবার তিনবার স্নান করতে পারেন। জল গরম। নীচে উষ্ণ ফোয়ারা। সেখান থেকে আমরা গেলাম যেখানে আদত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণটি রোম্যানরা আবিষ্কার করেছিলেন বহু প্রাচীন-কালে। তাঁরা দুধারে প্রাচীর নির্ম্মাণ করে' এই উষ্ণ প্রস্রবণের যে রাস্তা নির্ম্মাণ করেছিলেন, তার কতক অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। আমরা প্রথমে একটি উদ্যানে প্রবেশ করলাম। উদ্যানপথ দিয়ে একটি প্রশস্ত হলে যেতে জল খাচ্চে। জলের কি গুণ তা বলতে পারিনে। খাওয়া-মাত্র যে ভুক্ত অন্ন একেবারে ভস্ম হয়ে গেল, তা মনে হলো না। জলে পেলাম খানিকটা গন্ধক পোড়ার গন্ধ। মনে পড়লো আমাদের দেশের বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের কথা। চোখের সামনে জলে আগুন জলে আর জল টগবগ করে ফোটে। কিন্তু ক'জনই বা যায়, তা দেখতে। আর ক'জনই বা তার খোঁজ রাখে? তীর্থস্থান বলে' কতকগুলি অকেজো লোক এবং সিউড়ির জন কতক কৌতূহলী লোক ব্যতীত আর কেউ যে বড় যায় তা বোধ হয় না। কিন্তু

বীরগণের প্রমোদ উদ্যান

হয়। দেখলাম সে হলে সুন্দর ব্যাণ্ড বাজচে আর তিন চার শ' লোক তাই শুন্‌ছে। ভাবলাম এখানে যারা থাকে, তাদের প্রচুর অবসর। ওদেশের লোকের আমোদ করবার ক্ষমতাও বোধ হয় আমাদের দেশের চাইতে বেশী। যা হোক আমরা সেই জনমণ্ডলের পাশ দিয়ে কোনো রকমে রাস্তা করে' ভিতরে প্রবেশ করলাম। রোমানদের নির্ম্মিত পথে সেই উষ্ণপ্রস্রবণের নিকটে গেলাম। একটা পাতকুয়োর মত; উপরে জাল দিয়ে ঢাকা; কিছু ময়লা না পড়তে পারে। সেখানে একটু ফাঁক দিয়ে বড় চামচে করে' জল তুলে' গেলাসে ঢেলে দিলে। প্রত্যেকেই এক এক গেলাশ একটু ব্যবস্থা করে' যদি কেউ রোগ সারবার পথ করে' দেয়, তা হলে বোধ হয় অনেক লোক আকৃষ্ট হতে পারে। আজ-কাল গায়ে ভস্ম মাখলেই যে সাধুর পসার হয়, তা নয়; আর তীর্থ হলেই যে সেখানে লোকের ভীড় হয়, তাও নয়। সাধুর যদি রোগ সারাবার ক্ষমতা থাকে, আর তীর্থস্থানের যদি স্বাস্থ্যমাহাত্ম্য থাকে, তা হলেই আমাদের মন সে দিকে ধায়।

আমরা উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম উদ্যানটি, খুব সুন্দর সাজানো বাগান। কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, আর তার সঙ্গে ফোয়ারাও খেলছে। বহুলোক

সেখানে চলাফেরা করছে। ছুটি ছোট ছোট বালক বালিকার খেলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। তারা বাগানে লুকোচুরি খেলছে এবং ছুটে ছুটে মাকে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মনে হলো যেন বাগানেই সে দুটি ফুলের মত আপনি ফুটে উঠেছে। আমার মত আরও অনেকে তাদের দিকে চেয়েছিলেন। মানুষ যদি এমনি করে' লুকোচুরি খেলে' মাঝে মাঝে বিশ্বজননীর পানে ছুটে যেতো! তা হলে পৃথিবী হয়ত আর একটু অন্য ধরণের হতে পারতো। এখান থেকে যখন আমরা বেরুলাম, তখন অপরাহ্ণের সময়ে আমাদের গাড়ী এসে থামলো একটি কুটীর দ্বারে। ঝরণার জল বয়ে যাচ্ছে রাস্তার পাশ দিয়ে, আমরা গাড়ী থেকে নেমে সেই জলস্রোত ডিঙিয়ে প্রবেশ করলাম কুটীরে। সেখানেও বাজনা চলেছে। আর পল্লীর স্ত্রীপুরুষ মিলে নতুন চোলাই করা টাটকা মদ্য পান করছে। চার পাঁচটি যুবতী মদ্য সরবরাহ করছে এবং হাত পেতে দাম নিয়ে পকেটে ফেলছে। একটি রমণী ব্যাণ্ডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছেন, তিনিই গৃহস্বামিনী। গৃহস্বামীকে দেখতে পাইনি। রমণীটি সেই তাজা আঙুরের সদ্য চোলাই করা

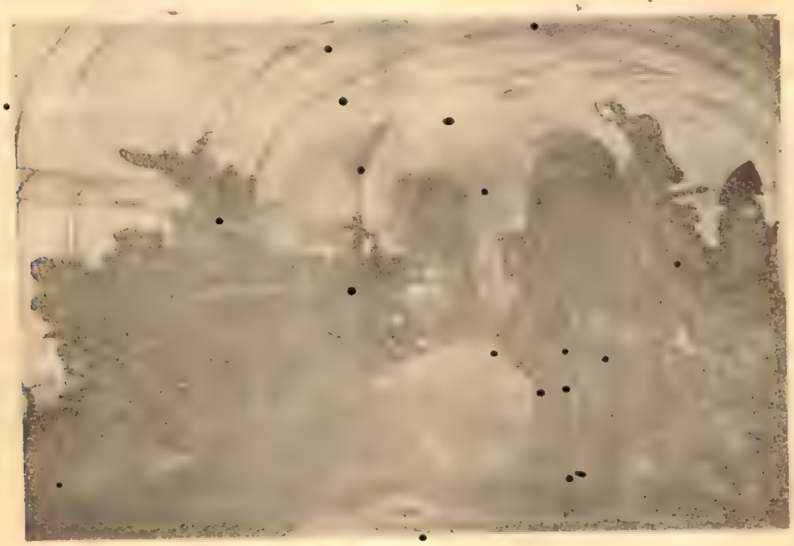

ক্যাপুচিন গির্জ্জার অভ্যন্তর

আলোক স্নিগ্ধ হয়ে আসছে। দুধারে দ্রাক্ষাবন, বহুদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই দ্রাক্ষাবন থেকে অপার আনন্দ এবং অজস্র অর্থ এই দেশের লোক অর্জ্জন করে। আমাদের দেশে বাতাসে ধানের ক্ষেতে সোণালি ঢেউ খেলে যায় বটে, কিন্তু যদি দেবতা প্রসন্ন হন, যদি কালে বৃষ্টি হয়। আর তা নইলে কৃষকেরা হাঁ করে' বসে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে। কিন্তু দ্রাক্ষালতা বোধ হয় বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করে না। পাহাড়ের উপর থেকে যেন সবুজের শ্যামলিমা গড়িয়ে পড়েছে প্রান্তরে। কিন্তু এত সবুজ থেকে সুরার লালিমা আসে কোথা থেকে তাই ভাবছি। এমন রস খেয়ে যেভাবে স্ফূর্ত্তি করছিলেন, তাতে গৃহস্বামী সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে খুব উদার মতাবলম্বী বল্‌তে হতো। কারণ যদিচ রমণীর বয়স যৌবনের সীমান্তপ্রদেশ বহুদিন পার হয়ে গেছে, তা হলে'ও তার অবাধ আনন্দ স্বামী নামক অন্তরায়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হলো। আমি এবং দুজন আইরিশ ভদ্রলোক এক টেবিলে বসলাম; তার এক-প্রান্তে একজন যুবক ও একজন যুবতী বসেছিল। স্বাস্থ্য তাদের উভয়েরই খুব ভাল। যুবতীটি ব্যাণ্ডের সঙ্গীতের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পূর্ণমাত্রায় যোগদান করছিল এবং আমাদের দিকে চেয়ে হাসছিল। আইরিশ বন্ধু দু'জন তার সেই

আনন্দ একটু ভুল বুঝলেন বোধ হলো। কারণ তাঁরা তিন গেলাশ মদিরার ফরমাস্ করলেন। দু'গেলাশ তাঁরা নিজে নিলেন, আর এক গেলাশ সেই যুবতীটিকে 'অফার' করলেন। যুবকটি সেই মুহূর্ত্তে উঠে গেল। সে বোধ হয় মোটর চালায়। তার গায়ে অয়েল সিল্কের কোটে আগাগোড়া মোড়া ছিল। সে উঠে যাবার একটু পরেই আমাদের 'গাইড্' এলো এবং আইরিশ ভদ্রলোকদুটিকে কাণে কাণে বললে যে যুবতী ঐ যুবকের পত্নী। তারা ভদ্র গৃহস্থ; সুতরাং তাকে পানীয় 'অফার' না করলেই ভাল হয়। যুবক ঐ আইরিশ আগন্তুকদিগকে না বলে' গাইড্‌কে দিয়ে বলালো—এতে তার সৌজন্যের প্রশংসা না করে' পারলাম না। একটি পরিচারিকা আমার কাছে তিনবার এসে' ফিরে গেল। আমি চুপ করেই বসে' আছি। আইরিশ বন্ধুগণ যখন তৃতীয় গেলাশ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি বিনীতভাবে সেটা সরিয়ে দিলাম। তার পরে দূর থেকে আমার নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করে' এলেন সেই গৃহস্বামিনী। আমার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি ব্যঙ্গের সঙ্গীতে গান করলেন এবং আমার প্রশংসাসূচক মস্তক সঞ্চালনে প্রশ্রয় পেয়ে পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করলেন। সে অতি ক্ষুদ্র একটি গেলাশে মদ্য নিয়ে এল। আমি তার আস্বাদ গ্রহণ করে দেখলাম বিস্বাদ নয় মোটেই। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। কতকটা অনভ্যাসের জন্য এবং কতকটা ভয়ের জন্য সে গেলাশ শেষ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। গৃহস্বামিনী তাতেই খুসী হলেন এবং দাম আমাকে সকলের মতই দিতে হলো। সে যাই হোক এই নূতন মদ্যের নবান্ন উৎসবে এত অবারিত আনন্দ দেখলাম যে বহুদিন ভুলতে পারবো না। সকলেই পান করছে, সকলেই হাসছে, সকলেই গাইছে, যেন আনন্দের ফোয়ারা। আজ পাষাণ কারা ভেঙে ছুটেছে মাতাল হয়ে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পরে সে গৃহস্বামিনী নাকি একজনকে চুম্বন করে' ফেলেছিলেন! গাড়ীতে তাই নিয়ে সব মহিলা ও ভদ্রলোক হেসে খুন। আমার কিন্তু ভাল লাগলো সেই যুবক যুবতীর সংযত আনন্দ। আনন্দ করছে এবং সেই সঙ্গে আপনার সম্ভ্রম রক্ষা করে' চলছে।

এ যায়গাটির নাম গুম্পোনড্‌র্স্ কার্খেন অর্থাৎ গুম্পোন্‌ডের গির্জ্জা। কিন্তু ঐ দেশের লোকেরা এমন ঘোরালো করে' এই নামটি উচ্চারণ করে যেন গলার কোথাও এসে আট্‌কে যাচ্ছে। আমি ও সেই আইরিশ বন্ধু দু'টি অনেকবার চেষ্টা করলাম অনুকরণ করতে। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না।

এখানে একটি ছোট রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। আমরা লাইন পার হয়ে ভিয়েনার দিকে ফিরলাম। পথে আরও দুটি গির্জ্জা দেখেছিলাম, একটি সিষ্টারসিয়ান সন্ন্যাসীদের (Cistercian Monks.)। বেশ বড় গির্জ্জা, সহরের উপকণ্ঠে। যায়গাটি নির্জ্জন, ভজন সাধনের অনুকূল বলে মনে হলো। আর একটি ছোট গির্জ্জা দেখলাম আরও নির্জ্জন স্থানে—সেখানে রুডলফ তাঁর প্রণয়িনীকে হত্যা করেছিলেন বলে' জনপ্রবাদ আছে। এখানে এখন কার্মেলাইট সন্ন্যাসিনীরা (Carmelite Nuns) বাস করেন। এই সকল মঠে পুরুষের গতায়াত নিষিদ্ধ; কারণ এই সকল সন্ন্যাসিনীরা পুরুষের মুখদর্শন করেন না। আমরা শুধু জানি যে পুরুষ সন্ন্যাসীরা মেয়েদের মুখ দর্শন করেন না। কিন্তু এদেশে একেবারে উলটো। কার্মেলাইট সন্ন্যাসিনীদের মঠে যদি পুরুষের প্রবেশ করতেই হয়,—যেমন জলওয়ালা কিম্বা রাজমিস্ত্রী, তা হলে তাদের ঘণ্টা বাজিয়ে ঢুকতে হয়। ঘণ্টার শব্দ শুনলেই সন্ন্যাসিনীরা সরে যান, তখন পুরুষ মানুষ প্রবেশ করতে পারে। এই সকল সাধ্বীরা যীশুখৃষ্টকে পতিত্বে বরণ করেছেন (Brides of Christ), তাঁরা শুধু তাঁরই মূর্ত্তি দেখেন। কি সুন্দর সাধনা। এঁদের মধ্যে বৈরাগ্য খুব প্রবল। রাত্রে এঁরা কফিনের মধ্যে শয়ন করেন। মৃত্যুর প্রতি ভীতির সঞ্চার স্বাভাবিক। এঁরা কফিনের মধ্যে শুয়ে সেই মৃত্যুভয়কে জয় করেন। কলিকাতায় এবং অন্য অনেক স্থলে কেউ কেউ 'শ্মশানে বসে' ইষ্ট ভজন করেন। 'শ্মশান-বৈরাগ্য' আমাদের অতি সুপরিচিত। কিন্তু শ্মশানবিহারী ভক্তেরা সেই শ্মশান-বৈরাগ্য মনে জাগিয়ে রাখতে চান চিরদিন।

লর্ড লীটন তাঁর পম্পিয়াইএর শেষ কয়টি দিন নামক উপন্যাসে একটি জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধার ছবি দিয়েছেন। সে গলিত-

নখদন্ত কঙ্কালাবশিষ্ট বৃদ্ধা বলেছিল যে আমি বাঁচতে চাই, তার কারণ জীবনে যে আমার কিছু সুখ আছে, তা নয়; আমি মরতে ভয় পাই বলেই বাঁচতে চাই।

এই কার্মেলাইট সন্ন্যাসিনীর দল প্রতিদিন শবাধারের মধ্যে শুযে ইষ্ট চিন্তায মৃত্যুকে জয করতে চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যার সময়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। বেলভিউ হোটেলের কাছেই একটি রেস্তঁরা ছিল। সেটা তখন আলোক মালায় উদ্ভাসিত হযেচে। বাজনাও বেশ মধুর শোনাচ্ছিল। হোটেল থেকে হাত মুখ ধুযে এসে সেখানেই বসে যাওয়া গেল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে কাটানো গেল। অর্থাৎ বহুক্ষণ বাজনা চললো। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিযে হোটেলে শুযে পড়লাম।

সহর হিসাবে ভিয়েনা বেশ বড। অনেক বাড়ীই প্রকাণ্ড। রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক রাস্তায় মাঝ-খানে ঘাসের সবুজ গালিচা। বৃক্ষ পল্লবে সেগুলিকে স্নিগ্ধ ও সুদৃশ্য করে' রাখা হযেছে। নিকটেই নীল ড্যানিয়ুব। ভিয়েনার কাছে ড্যানিউব তত নীল বলে' মনে হলো না। বুডাপেষ্টে ড্যানিয়ুব খুব নীল শুনেছি। ড্যানিয়ুব নদী বুডা ও পেষ্টের মধ্য দিযে বয়ে গেছে। সেখানে ভারি সুন্দর। 'নীল ড্যানিয়ুব' বলে একটা বাজনার গৎও আছে শুনেছি।

আমার এই ভ্রমণপঞ্জী লেখার পরে অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমার মন্তব্য অনেক দিন আগে লেখা। এখন মনে হচ্চে আমার আশঙ্কা বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে। এযে শুধু আমারই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির বাহাদুরী তা বলে' গর্ব্ব করবার বিশেষ হেতু নেই। কারণ যাঁরা মধ্য ইউরোপের অবস্থা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা সকলেই আমার মত বুঝতে পেরে-ছিলেন যে প্রবল প্রবলতর হবে এবং দুর্ব্বল অন্যের কবলে পতিত হবেই। একথা অস্বীকার করবার উপায নেই যে বর্ত্তমান যুগে ইটালী এবং জার্ম্মানী দুইটি দেশ যেরূপ অভূতপূর্ব্বভাবে শক্তি সঞ্চয করেছে এবং করছে, তাতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য ভরসারও কারণ বলা যেতে পারে। কেননা ইটালী এবং জার্মানী মনে করেন ইউরোপে সুদীর্ঘস্থাযী শান্তি স্থাপনের বাধা কেউ জন্মাতে পারবে না। কিন্তু আমি সেভাবে দেখি নি। আমার কেবলই মনে হয়েছে যে জার্মানী ও ইটালী ভীষণ বুভুক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্চে। চাই প্রভুত্ব, চাই শক্তি। ইউ-রোপীয় মহাসমরের স্মৃতি এ দুটি জাতির শিরাউপশিরায় জলন্তভাবে বইছে। ভেয়ারসাইয়ের সন্ধির অপমান এদের প্রাণে আগুন জেলে দিয়েছে। তার শোধ দেবার জন্য এদের আগ্রহের পার নেই। ইউরোপের তথা পৃথিবীর পক্ষে এই আগ্রহ একটি দুর্গ্রহ। যতদিন না জার্মানী তার নষ্টরাজ্য (উপনিবেশ) পুনরুদ্ধার করতে পারবে, যতদিন না ইটালী মেডিটারেনিয়ান আপন অধিকারে আনতে পারবে, ততদিন শান্তি নেই, অস্ত্রশস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ততদিন থামছে না। কিছুতেই না। এখন একটি সুবিধা হয়েছে ইটালী ও জার্মানীর বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের ফলে জার্মানী ইটালীকে তার জয়যাত্রার সহায় করে' নিয়েছে—এরই নাম রোম-বার্লিন axis। ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির চক্র এই axisএর উপর ঘুরবে বহুদিন। তার প্রথম ফল অষ্ট্রীযার স্বাধীনতা লোপ। অষ্ট্রিয়া এখন জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। অষ্ট্রিয়ার জনপ্রিয় নেতা (Dictator) সুস্‌নিগ্‌ এখন কারাগারে থাকুন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সুশান্ত সা

তৃতীয় পর্ব্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৩

বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সাবিত্রীকে ডেকে বললাম, "সাবিত্রী! ধনধান্য 'রতনসা'র জমিদারী এবার ছারখার হতে বসেছে।"

সমস্তই সাবিত্রীকে বললাম। সাবিত্রী চুপ ক'রে শুনেছিল, কোনও কথা কয়নি।

পরের দিন সন্ধ্যার পরে আমাদের পুকুরের উত্তরের পাড়ের ঘাটের উপর বসেছিলাম, সাবিত্রীও ছিল আমার কাছে। একটু চুপ করে থেকে সাবিত্রীই শুধালে, "শেষ পর্য্যন্ত কি হল?"

শুধালাম, "কোন্ বিষয় সাবি?"

জিজ্ঞাসা করলে, "বড়দাদাকে টাকা পাঠাবার বিষয়?"

বললাম, "জানি না। আর কোনও খবর নি নাই। ওকথা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোর না সাবি। ওকথার মধ্যে আমি একেবারেই থাকতে চাই না।"

সাবিত্রী যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটু দূরে আলীমিঞা ঘাটের কাছে এগিয়ে এলেন। সাবিত্রী আলীমিঞাকে দেখে উঠে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

আলীমিঞা এসে বাঁধান ঘাটের উপর বসে বললেন, "বাবু! কিছুই ফল হল না। পলতায় পাঠিয়েছিলাম ঘোষাল মশাইকে। তিনি পলতা থেকে ফিরে এসেছেন বড়বাবুর চিঠি নিয়ে। টাকা তিনি অবশ্য নিয়েছেন, কিন্তু লিখেছেন তিনি আমাদের অনুগ্রহের উপর হাত তোলা হয়ে কিছুতেই থাকবেন না। তিনি নবীন মুন্সীকেই তাঁর অংশের ম্যানেজারী দেবেন।"

আলীমিঞার গলা শুনে একটু অবাক হলাম। আলীমিঞার গলা স্বভাবতঃ গম্ভীর, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর বলে মনে হল।

শুধালাম, "আর, আর কি লিখেছেন বড়বাবু?"

বললেন, "সে অনেক কথা। সে সব কথা শোনবার আপনার কোনও প্রয়োজন নাই।"

আলীমিঞার কথার মধ্যে শুধু একটা অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্য্যই প্রকাশ পাচ্ছিল না, একটা অস্বাভাবিক রকমের জোরও ফুটে বেরুচ্ছিল। এই সহজ সরল একনিষ্ঠ মানুষটার জোরালো কথার মধ্যে যেন প্রাণের একটা অবলম্বন পেলাম বলে মনে হল।

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ চাপ ব'সে থাকার পর আমিই প্রশ্ন করলাম, "তা এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?"

আলীমিঞা বললেন, "কি জানি বাবু! আকাশ পাতাল ভাবছি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। বাবু! আপনার পিতাঠাকুরের পায়ের তলায় ব'সে আমি জমিদারীর কাজ শিখেছি; তিনি হাতে ধ'রে শিখিয়েছেন আমাকে সব। আমি বেঁচে থাকতে তাঁর সেই জমিদারী ছারখার হবে—এ আমার কিছুতেই সইবে না।"

কেন জানি না আলীমিঞার কথাগুলো শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন দুলে উঠল, চোখে জল আসতে চায়।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ চাপ। হঠাৎ আলীমিঞা প্রশ্ন করলেন, "বাবু! এক কাজ করব? বড়বাবুর মাথা খারাপ হয়েছে। বড়বাবুকে জোর ক'রে পলতা থেকে ধরে নিয়ে আসব মাধবপুরে? আমার হাতে লোক আছে—আমি তা পারি।"

বললাম "তাতে কি লাভ হবে আলীমিঞা? তা কি সম্ভব? জোর ক'রে ত আর তাঁকে এখানে ধ'রে রাখা যাবে না।"

আলীমিঞা কোনও উত্তর দিলেন না, চুপ ক'রেই বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কাতর ভাবে বললাম, "আলীমিঞা! আমি বড় ক্লান্ত—আমি আর পারি না। সবই ত বুঝতে পারছেন, যা করবার হয় আপনি করুন। রইল 'রতনসা'র জমিদারী, রইলেন আপনি—আমাকে ছুটী দিন। কেবল একটা অনুরোধ—।"

চুপ করলাম। আলীমিঞা কোনও কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে বললাম, "যেমন করে পারেন গন্নুকে আমার কাছে এনে দিন। আর আমার কিছু বলবার নেই।"

আলীমিঞা বসেছিলেন উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে হাত রাখলেন আমার কাঁধের উপরে। শান্ত গম্ভীর গলায় ধীরে বললেন, "বাবু! আমি সবই বুঝতে পারছি। ভাববেন না, যেমন করে পারি বর্ত্তমান অবস্থার বিহিত আমি করবই। তাতে যদি আমার প্রাণ দিতে হয় সেও স্বীকার। তিনদিনের মধ্যে খোকাবাবুকে আমি আপনার কাছে ফিরিয়ে এনে দেব এই কথা আমি আপনার কাছে আজ শপথ ক'রে যাচ্ছি।"

চোখের জল কিছুতেই সামলান গেল না, খাট ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলাম।

পরের দিন সকাল থেকে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম।—ঠিক যে কি রকম মনোভাব বোঝান কঠিন। আলীমিঞাকে আমি বিলক্ষণ চিনতাম। তিনি যে চুপ ক'রে বসে থাকবেন না, কিছু একটা বিহিত করবার চেষ্টা করবেন—সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহই ছিল না।—কিন্তু কি যে করবেন, অনেক ভেবেও কিছুই বুঝতে পারিনি। অথচ এমনই অদ্ভুত আমার মনোভাব হয়েছিল সে সময় যে, আলীমিঞাকে এ সব বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে বা এ সব ব্যাপার নিয়ে আলীমিঞার সঙ্গে আর কোনও আলোচনা করতে কেমন যেন মোটেই প্রবৃত্তি হয়নি। এমন কি দিন দুই বাড়ীর ভিতর হতে বৈঠকখানা বাড়ীতে গেলামই না একেবারে, পাছে আলীমিঞার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আলীমিঞার সঙ্গে কথা হওয়ার পরের দিন সকালে চাকরটা এসে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবু! বার বাড়ীতে যাবেন না একবার—আলীমিঞা শুধাচ্ছেন।" বলেছিলাম, "না।" অথচ কি যে হবে একটা অনিশ্চয়তার উত্তেজনায় প্রাণটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনকে বুঝিয়েছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থায় চলতে পারে না, কিছু একটা হওয়া দরকার। আলীমিঞা যখন ভার নিয়েছেন, কিছু একটা তিনি করবেনই। যা হয় করুন, আমি সে দিকে ফিরেও চাইব না—কি দরকার আমার। তবে, গন্নুকে একবার ফিরে পেলে চলে যাব দূর বিদেশে তাকে আর সাবিত্রীকে নিয়ে। রেখে যাব পিছনটা সম্পূর্ণ আলীমিঞার হাতে।

সাবিত্রীকেও এ সব কথা কিছুই বলিনি। কেমন যেন এ সব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে কোনও আলোচনা করতেই আমার ভাল লাগছিল না। নিজের মনে বাড়ীর মধ্যেই চুপচাপ শুয়ে ব'সে প্রায় দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম—বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগই যেন চাইছিল না আমার মন।

সাবিত্রী নিশ্চয়ই আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করেছিল কিন্তু সেও কোনও কথা আমাকে শুধায় নি, নিজের মনেই চুপচাপ ছিল। কেবল দ্বিতীয়দিন বিকেলবেলা আমি যখন আমার শোবার ঘরে বিছানার উপর চিত হয়ে শুয়ে একটা বই পড়বার চেষ্টা করছিলাম মাত্র, সাবিত্রী ঘরে এল।

বললে, "যাও না, একবার নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে এস না। বিকেল বেলা এ রকম চুপচাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে আছ কেন?"

উঠে বসলাম। বললাম, "ভাল লাগছে না—কুড়েমি হচ্ছে।"

সাবিত্রী বসল খাটের উপরে। একটু চুপ করে থেকে বললে, "কি হয়েছে তোমার বল সব খুলে আমাকে। লুকিও না।"

বললাম, "সত্যি, সাবি, বিশ্বাস করো, ভেবে দেখতে গেলে কিছুই হয়নি, তবুও মনটা মোটেই ভাল লাগছে না। কারণ আমি নিজেই জানিনা তা তোমায় কি বলব।"

সাবিত্রী বললে, "পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা আলীমিঞার সঙ্গে তোমার কি কথা হলো, কিছুই ত বলনি আমাকে।"

বললাম, "বিশেষ কোনও কথাই হয় নি। বর্ত্তমান অবস্থার বিহিত করবার ভার আমি সম্পূর্ণ আলীমিঞার হাতে তুলে দিয়েছি।"

শুধাল, "তিনি কি বিহিত করবেন?"

বললাম, "জানিনা, জানতে চাইও না।"

"তার মানে কি?"—কথা কয়টী ব'লে সাবিত্রী নিজের মনে খানিকক্ষণ চুপ করে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "যাও খানিকটা নদীর ধারে বেড়িয়ে এস।"

কোন প্রতিবাদ না ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। আলনা থেকে জামাটা গায় পরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে গিয়ে নিজের মনে পায়চারী করলাম খানিকক্ষণ। দেখলাম আমাদেরই ঘাটে একখানা পানসী নৌকা বাঁধা রয়েছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল লাগল না ফিরে এলাম বাড়ীতে। বাড়ীর মধ্যে না গিয়ে পুকুরের উত্তরের পারের ঘাটের উপর বসে পড়লাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে আলীমিঞা আসছেন ঘাটের দিকে। বুঝলাম—আমারই সন্ধানে।

উঠে যাইনি, ঘাটের উপরেই বসে রইলাম। আলীমিঞা ঘাটে এসে বললেন, "বাবু! আমি এখুনিই পলতায় রওনা হচ্ছি। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। খোকাবাবুকে নিয়ে আসব। কাউকে বলুন খোকা বাবুর জন্য একটা বিছানা নৌকায় দিতে।"

শুধু শুধালাম, "কখন ফিরে আসবেন?"

বললেন, "কাল সকালের আগেই ফিরে আসা উচিত। পলতায় যেতে আসতে ত বেশীক্ষণ লাগে না।"

চাকরটাকে ডাকলাম। একজনার মত চাদর তোষক বালিশ মশারী গুছিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে বললাম। চাকরটা ভিতরে চলে গেল।

আলীমিঞা বললেন, "বাবু! আর একটা কথা। দাস মশাইয়ের কাছে শুনলাম খোকাবাবুকে আনতে হলে হয়ত একটু জোর জবরদস্তি করার প্রয়োজন হবে। তাই তিনজন জোয়ালো বিশ্বাসী লোক আমি সঙ্গে নিচ্ছি। এরা আপনারই প্রজা।—তাই আপনার কাছ থেকে তাদের একটু ভরসা পাওয়া দরকার।"

এই কথা কয়টী ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিয়ে আবার বললেন, "এই টাকাটা আপনি রাখুন। সেই লোক তিনটিকে আমি একবার এখানে ডাকি তারা বার বাড়ীতেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের একটু ভরসা দিয়ে এই টাকাটা নিজের হাতে তাদের দিন। তা হলেই তাদের মনে আর কোনও দ্বিধা থাকবে না।"

আলীমিঞার কথার ধরণে বুঝলাম তিনি এসব বিষয় আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে কিংবা আমার অনুমতি নিতে আমার কাছে আসেননি। তাঁর মতে যা করা উচিত তার সমস্ত বন্দোবস্তে আমাকে দিয়ে যেটুকু কাজ করাবার দরকার সেইটুকুর জন্যই এসেছেন একবার মাধবপুরে আমাদের বাড়ীতে—পলতা রওয়ানা হওয়ার আগে।

একবার ইচ্ছা হল শুধাই যে দাদার বিষয় কি ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তেমন প্রবৃত্তি হল না। শুধু বললাম, "বেশ, ডাকুন তাদের।"

আলীমিঞা নিজেই বললেন, "আর বড়বাবুর সঙ্গেও একটা স্পষ্ট কথা ব'লে একটা বোঝাপড়া ক'রে আসব।—তাই যদি কাল সকালের মধ্যে না এসে পৌঁছতে পারি ত ভাববেন না। এখন ডাকি তাদের।"

এই ব'লে চ'লে গেলেন। আলীমিঞা চ'লে যেতে যেতেই সাবিত্রী এল ঘাটে।—এসেই একটু উত্তেজিত স্বরে আমাকে শুধাল, "বিছানা চেয়ে পাঠিয়েছ কেন? আলী-মিঞা কি বলছিলেন?"

বললাম, "সব কথাই একটু পরে তোমাকে বলব। আলীমিঞা এখুনিই এখানে আবার আসবেন। তুমি এখন একটু ভিতরে যাও।"

সাবিত্রী একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল; এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আমার পানে।

পরে বললে, "না। আমি এখুনিই সব শুনতে চাই। এসব কি ব্যাপার? বল সব খুলে আমাকে।"

এমন সময় একটু দূরে অস্পষ্ট অন্ধকারে আলীমিঞাকে দেখতে পেলাম—সঙ্গে তিনজন লোক। সাবিত্রীও সেই দিকে চেয়ে দেখলে। তাড়াতাড়ি বললাম, "ঐ আলীমিঞা এসে পড়েছেন, তুমি এখন ভিতরে যাও—লক্ষ্মিটী।"

সাবিত্রী কোনও কথা না বলে একটু দূরে সরে গিয়ে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাটের উপরেই বস্‌ল; ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিলে—সে এখন যাবেনা, শুনবে সে সব কথা।

আলীমিঞা বার দুই কেশে এগিয়ে এলেন। লোক তিনটী একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সাবিত্রীর দিকে চেয়ে আমাকে বললেন, "দু একটা গোপনীয় কথা ছিল আপনার সঙ্গে।"

আমিও একবার সাবিত্রীর দিকে চাইলাম, কিন্তু সাবিত্রীর উঠে যাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে আলীমিঞাকে বললাম, "তা বলুন না।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে আলীমিঞা বললেন, "ডাকব ওদের এখানে?"

বললাম, "ডাকুন।"

আলীমিঞা লোক তিনটীকে ডেকে আনলেন। লোক তিনটীর চেহারা আমি সে সময় মোটেই ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি। লোক তিনটি নত হয়ে আমাকে প্রণাম জানালে।

আলীমিঞা তাদের উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, "এই নাও নফর, বাবু তোমাদের আপাততঃ ৫০৲ টাকা বখশিষ দিচ্ছেন। এ বাবুরই কাজ। পরে আরও বখশিষ পাবে।"

আমি টাকা কয়টী নফরের হাতে তুলে দিলাম। নফর আর একবার লম্বা সেলাম ক'রে বলল, 'মহারাজের যখন ইচ্ছে, আমরা জান দিয়ে মহারাজের কাজ উদ্ধার করে দেব।"

আলীমিঞা একবার আমার দিকে চাইলেন—যেন এইবার আমার কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমার কোনও কথা বলার ইচ্ছা একেবারেই হল না। একটু পরে আলীমিঞা বললেন, "আচ্ছা, আমরা তাহলে এখন রওয়ানা হই বাবু। চল নফর, চল তোমরা। কই বিছানাটা ত এখনও আনল না। আচ্ছা নফর তোমরা এগোও নৌকার দিকে, আমি আসছি।"

এই ব'লে আলীমিঞা অন্দরের দিকে দু পা এগুতেই বংশী বিছানা নিয়ে বেরিয়ে এল। বংশীকে সঙ্গে নিয়ে আলীমিঞা নদীর দিকে চ'লে গেলেন।

সাবিত্রী এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল। আলীমিঞা চ'লে গেলে উঠে এল। আমার কাছে এসে সোজা আমার দিকে চেয়ে শুধাল, "এ সবের অর্থ কি?"

বললাম, "জানি না। এখন আমি কিছু বলতে পারছি না। পরে সব বলব।"

সাবিত্রী খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল। সাবিত্রীর সে চাহনির মধ্যে রাগ না দুঃখ, অভিমান না ঘৃণা, কি যে প্রকাশ পেয়েছিল অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারি নি।

* * * *

সমস্ত সন্ধ্যেটা মোটের উপর একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছিলাম। সাবিত্রীও আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নিজেকে একটু দূরেই রেখেছিল—বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হয়নি তার সঙ্গে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম ভাল হয়নি, মাঝে মাঝে কি রকম আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল—স্পষ্ট মনে আছে।

ভোর হতে না হতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও সমস্ত বাড়ী ঘুমন্ত। খানিকক্ষণ বারান্দায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অন্য-মনস্কে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম দূরের পানে—একটা অবসাদ ভরা প্রাণ নিয়ে। হঠাৎ টের পেলাম আমাদের অন্দরের উঠানের দরজায় কে যেন জোরে জোরে করাঘাত করছে।

চমকে উঠলাম। মনে হল—হয়ত গন্নুকে নিয়ে আলীমিঞা ফিরে এসেছেন। দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। উঠান পেরিয়ে দরজাটা ফেললাম খুলে।

আলীমিঞাই বটে। উস্কখুস্ক চুল, চোখ দুটী জবা ফুলের মত লাল—কেমন যেন এক রকম অস্বাভাবিক

চহনি। কোলে গন্নু—আলীমিঞার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে, একটা সাদা চাদর দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা।

হাত বাড়িয়ে গন্নুকে কোলে তুলে নিতে নিতে আলীমিঞাকে শুধালাম, "আপনার এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেন নি বুঝি?"

আলিমিঞা কোনও জবাব দিলেন না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গন্নু আমার কোলে আসতে আসতে একবার শুধু চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে মাথা এলিয়ে রাখল আমার কাঁধের উপরে। গন্নুকে কোলে নিয়েই বুঝলাম গন্নুর গা পুড়ে যাচ্ছে। বললাম, "একি? গন্নুর গা এত গরম কেন?"

কাঁধে মাথা রেখে গন্নুই বললে, "আমার জ-জ্বর হয়েছে যে। কাল থেকে ভা—ভাত খাইনি।"

আলীমিঞাকে বললাম, "আপনি এখন বাড়ী যান, একটু ঘুমিয়ে নিন গিয়ে। বিকেলে কথাবার্ত্তা হবে।"

আলীমিঞা বললেন, "বাবু! আপনার সঙ্গে আমার আর বোধ হয় দেখা হবে না।"

তাড়াতাড়ি শুধালাম, "কেন? কেন?"

আলীমিঞা একটু থেমে থেমে বললেন, "একটা দারুন দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড়বাবু আর নাই। বিশ্বাস করুন, ঠিক এ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। যাই হক; আমি বোধ হয় কিছুতেই রক্ষা পাব না।"

বজ্রাহতের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে আলীমিঞা বললেন, "বেশী কথা আমি বলতে পারছি না। একটা অনুরোধ রইল—ভগবতীতে সব যেন না খেয়ে মার' না যায়।"

* * * *

গ্রেপ্তার হলাম তার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। আগের দিনই থানা থেকে ঝি চাকরদের সব ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, শুধু চাকরটাকে আটকে রেখেছিল—ফিরে আসেনি।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমার শোবার ঘরের খাটের উপর বসে আছি, গন্নু পাশে শুয়ে আছে—তার তখন প্রায় ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। সে এক একবার আমার দিকে কাতর ভাবে চেয়ে, 'বাবা! একটু জ—জল খাব" ব'লে আবার চোখ বুজে চুপ ক'রে এলিয়ে পড়ছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না।

হঠাৎ একটা চাকর ঝড়ের মতন ছুটে এসে হাউ মাউ ক'রে কতকগুলো কথা বলে গেল। বুঝলাম পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করেছে, স্বয়ং ইনস্পেক্টর বাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

চাকরটার চীৎকারে গন্নু চোখ মেলে চাইলে। কি বুঝেছিল জানিনা, কাতর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বললে, "তুমি যে-যেওনা বাবা।" চাকরটাকে বললাম, "ইনস্পেক্টর বাবুকে উপরে ডেকে নিয়ে এস।"

ইনস্পেক্টর এল, সঙ্গে এল আরও ২।৪ জন পুলিশের লোক। এল তারা ঘরের মধ্যে।

আমি শুধালাম, "কি চাই আপনাদের?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আপনিই কি সুশান্ত সাহাচৌধুরী?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

বললেন, "আপনার দাদার খুনের অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি—মাপ করবেন।"

"আমাকে?" ব'লে একটু আশ্চর্য্য হয়ে চাইলাম। পরে বললাম, "তা আমাকে কি করতে হবে?"

"থানায় যেতে হবে।"

"কখন?"

"এখুনিই।"

"এখুনিই?"

"এখুনিই—পরে জামিন পান, ফিরে আসবেন।"

শুধালাম, "ছেলেটার যে বড্ড জ্বর ২।৪ দিন পরে গেলে হয় না?"

বললেন, "কি করব বলুন—আপনাকে রেখে যাওয়ার অধিকার আমাদের নাই। আপনার নামে পরওয়ানা আছে—চলুন।"

কাতরভাবে একবার গন্নুর দিকে চাইলাম।

সাবিত্রী—কোথায় ছিল জানি না, ধীর পদক্ষেপে এল ঘরে। বসল গিয়ে খাটে, গন্নুর পাশে; সস্নেহ হাত রাখল গন্নুর কপালে।

আমার দিকে চেয়ে বললে, "ভেবনা—গন্নু আমার কাছে রইল।"

চললাম পুলিশের সঙ্গে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই কাণে এল গন্নুর কণ্ঠস্বর, "বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

(ক্রমশঃ)

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

হায়দার আলি এবং তাঁহার ইউরোপীয় সেনানীবর্গ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

হায়দরের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি-সম্মিলন কেন সম্ভব হইয়াছিল বুঝিতে হইলে কিছু পূর্ব্ব কথা বলা আবশ্যক। তাঁহার দ্রুত উন্নতি নিজাম, মারাঠা বা ইংরাজ কাহারও পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। পাণিপথের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের শক্তিহীনতা হায়দারের অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ ছিল। মারাঠারা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিত। ইতিপূর্ব্বে উভয়পক্ষে যে দুই একবার শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল তাহাতে মারাঠারাই বিজয় লাভ করিয়াছিল। হায়দর কর্ত্তৃক এই সময় মহিশুরের প্রাচীন রাজবংশকে অপসারিত করিয়া রাজ্যের আধিপত্য স্বয়ং গ্রহণ মারাঠাদের বিষম আক্রোশের কারণ হইয়াছিল।

মোগল সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গদেশের দেওয়ানী লইবার কালে (১৭৬৫ খৃঃ) ইংরাজরা উত্তর সরকার প্রদেশের দেওয়ানী লইয়াছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী সমর মধ্যে তাঁহারা ফরাসীদের নিকট হইতে উহা জয় করিয়াছিলেন। বুসীর সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজাম সালাবৎজঙ্গ ঐ প্রদেশ ফরাসীদের জায়গীর দিয়াছিলেন। নিজাম আলির উহা তাহাদের দিতে ইচ্ছা ছিল না। ইংরাজরা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া বাদসাহের নিকট হইতে উহা লওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে হায়দর ও মারাঠাদের সহিত উহাদের বিরুদ্ধে দল সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইভ ভীত মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে মিত্রভেদের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে সে কার্য্য কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য হইবে না।

ইংরাজরা পূর্ব্ব হইতে হায়দরের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি খর্ব্ব করিতে সমুৎসুক ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া নিজামের নিকট সেই প্রস্তাব করিলেন। নিজাম আলি হায়দর, ইংরাজ বা মারাঠা কাহারও প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি সকলকারই উচ্ছেদ সমান কামনা করিতেন। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম"—নীতি অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সানন্দে ইংরাজদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পেশবা মধুরাওয়ের মত সুচতুর ব্যক্তির চক্ষে ধূলিপ্রদান করা নিজামের পক্ষে সম্ভব হইল না। মিত্রগণের সখ্যতার প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া তিনি উহারা রঙ্গভূমে দেখা দিবার পূর্ব্বেই লঘুগতি বার্গীসেনাসহ মহিশুর রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হায়দরের সীমান্ত প্রদেশের ফৌজদার বিশ্বাসঘাতক আলি রাজা খাঁ মারাঠাদের আগমন মাত্রে উহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। ইহা হায়দরের পক্ষে প্রচণ্ড আঘাত হইয়াছিল। তিনি উহাকে সবিশেষ প্রত্যয় করিতেন এবং অনেকে তাঁহাকে উহার সম্বন্ধে সাবধান করিলেও সে সকল কর্ণপাৎ করেন নাই। সীমান্ত প্রদেশের দুর্গসমূহ অবাধে শত্রুহস্তগত হওয়াতে হায়দর যে ভাবে প্রতিপক্ষকে বাধাদানের আয়োজন করিতেছিলেন অতঃপর তাহা আর সম্ভব নহে দেখিয়া রাজধানীতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে মধ্যবর্ত্তী জনপদ উৎসাদিত করা হইল;—কূপ সমূহের জল বিষযুক্ত, হ্রদ তড়াগাদির বাঁধ ভাঙিয়া দেশ জলপ্লাবিত এবং অধিবাসীগণকে নিজ নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। দে লা তুর বলেন ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, নবাব সকলকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, সকলে হাসিমুখে দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছিল।

মীর্জ্জার সৈনিকগণের সকলেই যে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল তাহা নহে। তাঁহার শতাধিক ফরাসী

গোলন্দাজ ছিল। উহারা তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দর সকাশে ফিরিয়া গিয়াছিল। কথিত আছে একজন অফিসর যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিল "মনে করিবেন না আমরাও আপনার মত নবাবের নিমকহারামী করিব। আমরা তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিব, তাঁহার বিপক্ষে কখন নহে। অতএব বিদায়।" হায়দর এই প্রভুভক্ত সৈনিকগণকে বহু অর্থদানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। অফিসরদের তিনি সুবর্ণ কঙ্কণ দিয়াছিলেন। মার্কসিরা এবং মধেবী দুর্গের রক্ষী সেনাদল মীর্জ্জার আদেশ অমান্য করিয়া প্রাণপণে আক্রমণকারীদিগকে বাধা প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফলতঃ উহাদের পথরোধের জন্য মারাঠাদের অগ্রগতির বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল এবং হায়দর আত্মরক্ষার্থ আয়োজন করিতে কিছু অবসর পাইয়াছিলেন। উহাদের প্রভুভক্তি ও বীরত্বে প্রীত হইয়া পেশবা দুর্গাধিকারের পর প্রচুর পুরস্কারসহ উহাদের যদিচ্ছগমনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

একসঙ্গে তিন পক্ষের সহিত যুদ্ধ করা সম্ভব নহে দেখিয়া হায়দর সুপ্রচুর অর্থদানে মারাঠাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। মধুরাও নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন সুহৃদগণ তাঁহার নিকট লাভের অংশ দাবী করিলে তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর হায়দর নিজামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মারাঠাদের যুদ্ধ পরিত্যাগের সংবাদে নিজাম আলি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিপক্ষের অশ্বারোহীগণের জন্য তাঁহার শিবিরে রসদ প্রাপ্তিতে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। নিজাম দরবারে হায়দরের সুহৃদ্বর্গের অভাব ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হায়দরের সহিত মিত্রতা করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজামেরও তাহা মনঃপূত হইয়াছিল। এইরূপে যে মিত্রতার উপর আশা করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সুখস্বপ্ন দেখিতে বিভোর ছিলেন হায়দর তাহা সুকৌশলে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুগপৎ শত্রুসৈন্য এবং ভূতপূর্ব্ব মিত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ প্রমাদ গণিলেন। "অতঃপর আত্মদোষস্খালনার্থ মাদ্রাজ সরকার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দিবার জন্য কৈফিয়তের সন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সব কিছুর দায়ীত্ব ফরাসীদের ষড়যন্ত্রের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ফরাসীদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। সত্য কথা বলিতে হইলে আমার বলা আবশ্যক যে হায়দর এবং নিজামের মধ্যে সন্ধিবন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি বা আমার কোন সৈনিক উহাদের সহিত কোন পত্র ব্যবহার করি নাই। ঐ ঘটনার পরে নবাব নিজে একটী এবং রাজাসাহেব একটী চিঠি পন্দিচেরীর গভর্ণরকে লিখিয়াছিলেন এবং হায়দর আলির অনুরোধে আমি নিজেও একখানি চিঠি লিখিয়া পত্র তিনখানি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।"

দে লা তুরের সুদীর্ঘ পত্র এখানে উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব। সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল। প্রথমে তিনি মিত্রদ্বয়ের এবং ইংরাজগণের বলাবল সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়া বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজদিগের বিশেষ যে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের মত এবারে সাগরোপকূল সন্নিকটবর্ত্তী অথবা নদীতটবর্ত্তী প্রদেশে যুদ্ধ না হইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে যুদ্ধ হওয়াতে ইংরাজেরা তাহাদের নৌবহরের সাহায্যে আবশ্যকমত রসদাদি পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইবে। তদ্ভিন্ন এ যুদ্ধ ঐ কারণে প্রধানতঃ অশ্বারোহী সেনাদলের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু ইংরাজদের ঐ ধরণের সৈন্য আদৌ নাই। তাঁহারা যদি নৈশ আক্রমণ, অতর্কিত আক্রমণ সেনানায়কবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ব্যাপারের উপর নির্ভর করেন তাহা হইলে তাঁহারা ঠকিবেন। সৈন্যদলের ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত থাকায় তিনি প্রথম দুইটি সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং মহিশুরী বাহিনীতে জায়গীর প্রথার প্রচলন না থাকাতে সকলে হায়দরকে তাহাদের একমাত্র প্রভু বলিয়া জানে, সেজন্য কাহারও পক্ষে বিশ্বাসভঙ্গ করা সম্ভব নহে। এই সকল কথা বলিয়া দে লা তুর গভর্ণর ল'কে বলিয়াছিলেন যে আসন্ন সময়ে ফরাসী গভর্ণমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ

নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা সমীচীন হইবে না, কারণ উহা কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিবে না। তখনকার মত হায়দরকে সামান্য সাহায্য পাঠাইয়া ভবিষ্যতে বড় রকম সাহায্য করিবার আশ্বাস দিতে বলিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে প্রতিকূল বায়ুর জন্য ইউরোপ হইতে পোত আসিতে বিলম্ব হইতেছে অস্তুহাত পরে দিলেই চলিবে। পন্দিচেরীর সৈন্যসংখ্যা অল্প বলিয়া তথা হইতে বিশেষ সাহায্য পাঠান সম্ভব না হইলেও তিনি পলাতক সৈনিকের বেশে কয়েকজন অফিসর ও গোলন্দাজ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহাতে ইংরাজদের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং ইংরাজরা যাহাতে কতকটা দাবে থাকে তাহা ফরাসীদের স্বার্থ। অতঃপর দে লা তুর হায়দর-চরিত তাঁহার সুপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া রাজভক্ত ফরাসী প্রজারূপে ল'কে পন্দীচেরীনগর সাধ্যমত সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কারণ যদি কখনও দৈবক্রমে নবাব উহার নিকটে যাইয়া পড়েন তখন নগরের অরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া তিনি তৎকৃত পূর্ব্ব সাহায্যের মূল্যস্বরূপ ফরাসীদের নিকট হইতে সমগ্র তোপখানা এবং অপর যাহা কিছু মূল্যবান বিবেচনা করিবেন সবই বলপূর্ব্বক গ্রহণে যত্নবান হইতে পারেন। তবে সে অবস্থা দেখা দিলে, সেনাপতি মহাশয় একথাও সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়াছিলেন যে তিনি অথবা তাঁহার সৈনিকগণ ফরাসীপতাকার অবমাননা সহ্য করিবেন না।

ফ্রান্স হইতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ বাধিতে পারে এরূপ কোন কার্য্য না করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার পক্ষে উহাঁদের কথামত কার্য্য করা সম্ভব হইবে না এ কথা গভর্ণর ল' যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে হায়দর আলি ও রাজা সাহেবকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দে লা তুরকে লিখিত পত্রের সুর অন্যরূপ ছিল। নবাবদ্বয়ের লিখিত চিঠি তাঁহাকে পাঠাইয়া ইংরাজদের সহিত বিরোধ বাধিতে পারে এরূপ কার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য ল' তাঁহাকে প্রথমে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে ফরাসী সরকারের তখন যে প্রকার অবস্থা তাহাতে ঐরূপ পত্র লেখা হইতে বিরত হইলে সেনাপতি মহাশয় জন্মভূমির মহদুপকার সাধন করিবেন সে কথা যেন মনে রাখেন। ইউরোপীয় জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে এ দেশীয়গণের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে আসন্ন সমর পূর্ব্বোক্ত নবাবদ্বয়ের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল হইবে না। উহাঁদের কোন রূপ সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে যে সম্ভব নহে সে কথা যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া তাঁহাদের জানাইতে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে সরাসরি চিঠি না লিখিয়া সাঙ্কেতিক ভাষায় ম্যসিয় ম—র মধ্যবর্ত্তিতায় লিখিবার জন্য দে লা তুরকে ল' আদেশ দিয়াছিলেন।

হায়দরের নিকট এ সময় প্রায় ৭৫০ ইউরোপীয় সৈনিক ছিল; তন্মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গোলন্দাজ ছিল। অফিসরগণ বাদে অবশিষ্ট সামান্য সংখ্যক সৈনিকদের দ্বারা ইংরাজদিগের মোহড়া লইবার উপযুক্ত পদাতিক বাহিনী গঠন সম্ভব নহে দেখিয়া দে লা তুর উহাদের লইয়া দুই কোম্পানী অশ্বারোহী পল্টন গঠন করিয়াছিলেন। হায়দরের নৌবহরের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ষ্টেনেট নামক জনৈক ইংরাজ উহার অধ্যক্ষ ছিল। দিনেমারদিগের নিকট হইতে হায়দর কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি বড় সমরপোত কিনিয়াছিলেন। তাঁহার ৩২ কামানবাহী ফ্রিগেট (frigate) তিনটি এবং ১৪ কামানবাহী ক্ষুদ্রায়তন রণতরী ১৮খানি ছিল। যুদ্ধারম্ভের কিছু পূর্ব্বে ষ্টেনেট নবক্রীত জাহাজখানি মেরামত করিবার জন্য বোম্বাইয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিবামাত্র ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হায়দর বরাবর এই ঘটনা উহাদের দাগাবাজির অন্যতম নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন।

দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কর্ণেল স্মিথ শত্রুরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কয়েকটী দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালোর হইতে ২২ক্রোশ দূরে অবস্থিত কৃষ্ণগিরির পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাকার কিল্লাদার কনষ্টাণ্টাইন নামক জনৈক জর্ম্মণসৈনিক

প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রতিহত করিয়াছিল।*

ইহার পর চেঙ্গামা নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। "নিজামের উজীর বিশ্বাসঘাতক রুকুনোদ্দৌলা তাঁহাদের আগমন সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে শত্রু শিবিরে প্রেরণ করায় হায়দরের পক্ষে স্মিথকে অতর্কিতে আক্রমণ করা সম্ভব হইল না। স্মিথ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত সৈনিকদের মুহুর্ত্তের জন্য বিশ্রামের অবকাশ না দিয়া হায়দর মহাবেগে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আক্রমণের সমস্ত বেগ গ্রিণাডিয়রদের উপর পড়িয়াছিল। ইংরাজরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উহাদের প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ইউরোপীয় অফিসরদের পরিচালনায় গ্রিণেডিয়র সিপাহীরা যে প্রকার সতেজে লড়িয়াছিল তাহাতে বিস্মিত শত্রু সেনাপতি এদেশীয়গণের সামরিক যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" পরদিবস মহিশুরীরা আবার প্রত্যাবর্ত্তননিরত শত্রু সেনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইউরোপীয় অশ্বারোহীরা পুরোভাগে অবস্থিত ছিল। উহারা ইংরাজসেনার বহু রসদ ও সমরসম্ভার হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। স্মিথ কোনমতে ত্রিণমালাইয়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

এই অভিযানে দে লা তুরের কৃতিত্বে প্রীত হইয়া হায়দর নিজামকে বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে দেবীকোটা অঞ্চলে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা আয়ের একটি জায়গীর দেওয়াইয়াছিলেন। ইহাতে অনেকের বিশেষ করিয়া রাজা সাহেবের ঈর্ষ্যা হইয়াছিল। তিনি তখনও কর্ণাটক প্রদেশের নবাবী প্রাপ্তির আশা মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। চক্রান্তকারীর অভাব হইল না। কিছুকাল হইতে দে লা তুর হায়দরকে পন্দিচেরীর অনতিদূরে অবস্থিত কুদ্দালুরে ইংরাজদের ফোর্ট সেন্ট ডেভিড দুর্গাধিকার করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মান্দ্রাজ নগরের প্রান্ত অবধি সমগ্র জনপদ উৎসাদিত করিয়া ফেলিবেন বলিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ নবাবকে বুঝাইল যে ফরাসী গভর্ণর ফরাসী সৈনিকদের তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পন্দিচেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন; সে জন্য কুদ্দালুরের নামে তথায় পলায়ন করাই ফরাসীদের আন্তরিক অভিপ্রায়। ফরাসী গভর্ণর যদি

---

* কনষ্টাণ্টাইন কলোন প্রদেশের আণ্ডারনেক নগরের অধিবাসী ছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সে প্রথম এদেশে আসে। তাহার পর্ত্তুগীজ জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাতা অসামান্যা রূপসী একটী কন্যা ছিল। অর্থ বিনিময়ে কনষ্টাণ্টাইন-দম্পতী বালিকাকে হায়দরের হস্তে প্রদান করিতেছে জানিয়া তাহার ক্রুদ্ধ সহকর্ম্মীগণ ইউরোপীয় নামের প্রতি একান্ত অবমাননাকর উক্ত কার্য্যের প্রতিবিধানে সমুদ্যত হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ হুগেল তাহাকে ঐ কথা সত্য কিনা প্রশ্ন করিলে সে সকল কথা অস্বীকার করিয়াছিল। অনেক তরুণ বয়স্ক সৈনিক তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে কনষ্টাণ্টাইন খুব কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাইয়াছিল। কিন্তু গোপনে হায়দরের নিকট হইতে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লইয়া স্বামী স্ত্রী কন্যাকে নবাবান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ইহার পর আর উহাদের পক্ষে স্বজাতীয়গণের সাহচর্য্যে বাস করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া হায়দর কনষ্টাণ্টাইনকে বাঙ্গালোরে ইউরোপীয় সমাগম হইতে দূরে পাঠাইয়াছিলেন। কৃষ্ণগিরির যুদ্ধের পর সমীপবর্ত্তী স্থলের অধিবাসীবৃন্দ শত্রু সেনার লুণ্ঠন ভয়ে তাহাদের যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপত্তার জন্য উহার রক্ষণাবেক্ষণে দুর্গ মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া কনষ্টাণ্টাইন একদিন তাহা লইয়া গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিল। গোয়া ও বোম্বাইয়ের পথে স্বীয় চৌর্য্য-বৃত্তিলব্ধ ধনরত্নাদিসহ স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র আয়াস সাধ্য হয় নাই। দে লা তুর লিখিয়াছেন যে নবাবের ফরাসী জাতীয় চিকিৎসকের নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে বালিকা তাহার নিকট বলিয়াছিল যে নবাবের নিকট বিক্রীত হওয়াতে সে নিজেকে কৃতার্থা বিবেচনা করিতেছে; কারণ তাহার অর্থপিশাচ পিতামাতা শেষ পর্য্যন্ত যে তাহাকে লইয়া কি যে না করিত তাহা বলা যায় না।

হায়দরের প্রস্তাব স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কিছু আশা দিয়া পত্রোত্তর দিতেন তাহা হইলে, ইংরাজদের অনুচরগণের পক্ষে তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার সম্ভব হইত না। যে কারণে হউক হায়দর ফরাসীদের পন্দিচেরীর অত নিকটে যাইতে দিতে সাহস করিলেন না। টিপু তখন পর্য্যন্ত কোন কৃতিত্ব দেখাইবার অবকাশ পান নাই বলিয়া একদল সাদিসেনাসহ তাঁহাকে মান্দ্রাজ নগরের প্রান্ত অবধি জনপদসমূহ ধ্বংসকার্য্যে পাঠান হইয়াছিল। মহিশুরী দরবারে ইংরাজদের গুপ্তচরের অভাব ছিল না। একজন ফরাসী সৈনিক অর্থলোভে তাঁহাদের সকল সংবাদ সরবরাহ করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি টিপুর যাত্রা সংবাদ ইংরাজদিগকে দিলেও তিনি যে অত সত্বর আসিতে পারিবেন সে কথা তাঁহারা মনে করেন নাই। অতি অল্পের জন্য গভর্ণর, প্রধান ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল কল, নবাব মহম্মদ আলি ও তাঁহার পুত্র টিপুর হস্তে বন্দীদশা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উঁহারা তখন নগরোপকণ্ঠে উদ্যানবাটিকায় বাস করিতেছিলেন। প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য তাঁহারা প্রতিদিনকার মত অশ্বারোহণের আয়োজন করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসঘাতক ফরাসী সৈনিক প্রেরিত একজন লোক আসিয়া তাঁহাদের টিপুর অদূরে আসিয়া উপনীত হইবার সংবাদ দিয়াছিল। এরূপ তাড়াতাড়ি তাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন যে গভর্ণর বাহাদুর স্বীয় টুপী ও তরবারি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। খাদ্যদ্রব্যাদি যেমনকার তেমনই টেবিলে সাজান পড়িয়া রহিল।

টিপুর আগমনে মান্দ্রাজ নগরে মহাতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। দলে দলে উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসীবৃন্দ আশ্রয়লাভার্থ রাজধানীতে প্রবেশ করায় নগর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের অন্ত রহিল না। এই সময় টিপু অনায়াসে মান্দ্রাজ অধিকার করিতে পারিতেন। তথায় মাত্র ২০০ গোরা এবং ৬০০ দেশীয় সিপাহী ছিল। টিপু তখন অষ্টাদশবর্ষীয় বালক মাত্র, সামরিক কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার তখন ছিল না। সকলে তাঁহাকে বুঝাইল হায়দর তাহাদের দেশ ধ্বংস করিতে বলিয়াছেন; মান্দ্রাজ অধিকার করিতে বলেন নাই; অনুমতিব্যতিরেকে ইংরাজদের তোপের মুখে নবাবজাদার প্রাণ বিপন্ন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি আনাইয়া পরে নগর অধিকারের চেষ্টা করাই সঙ্গত। দে লা তুর বলেন যে তিনি হায়দরকে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া চক্রান্তকারীদের প্ররোচনায় এই অভিযানে প্রেরিত হন নাই; কারণ তাহাতে অকারণ যুবরাজকে বিপদের সম্মুখীন করা হইত।

ইতোমধ্যে ত্রিণোমালাইয়ে (২৬।৯।১৭৬৭) উভয়পক্ষে আবার একটী ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল। চেঙ্গামার মত এ যুদ্ধেও হায়দর পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস লিখিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলা আবশ্যক যে সম্মিলিত মহিশুরী ও নিজামী ফৌজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কর্ণেল স্মিথ মহাবীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "ফরাসী সৈনিকরা অসম সাহসে শত্রুসেনাকে বারম্বার আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের সুতীব্র অগ্নি বৃষ্টিতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রত্যেকবারই পাছু হটিতে বাধ্য হইয়াছিল। মিত্রপক্ষে প্রায় ৪০০ লোকক্ষয় হইয়াছিল। একজন পর্ত্তুগীজ অফিসর আহত হইয়া শত্রুকরে বন্দী হইয়াছিল। যুদ্ধের পর নবাবী ফৌজ বিশেষতঃ নিজামের সৈন্যগণ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর উভয় নৃপতি পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরাজরা তাঁহাদের বাধা দিবার কোন চেষ্টা করিল না। সে কার্য্য করিবার মত তাহাদের তখন অবস্থা ছিল না।"

ইহার পর প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভাণিয়ামবাড়িতে ইংরাজসেনার পরাজয়। "ইউরোপীয় সেনাপতি সামান্য আহত হইয়াছিলেন বলিয়া হায়দর তাঁহাকে কিছুতেই রাত্রে তোপমঞ্চ বাঁধা পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেন নাই। তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং মিস্ত্রিদিগের কাজ দেখিতে লাগিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং বায়ুও যথেষ্ট আর্দ্র ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে কাটাইয়াছিলেন। বিপক্ষের গোলাগুলিতে কয়েকজন সৈনিক নিহত হইয়াছিল; হায়দর কিন্তু

একটুও ভয় পান নাই। বরং নানাপ্রকার মজার গল্প করিয়া সকলকে সমুৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।" তোপমঞ্চ বাঁধা শেষ হইলে সৈন্যগণ দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। শীঘ্রই প্রতিপক্ষের তোপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুর্গাধ্যক্ষ কাপ্তেন র—আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজরা যুদ্ধের মধ্যে আর অস্ত্রধারণ করিবে না অঙ্গীকার করিলে হায়দর তাহাদের যদিচ্ছগমনের অনুমতি দিয়াছিলেন। দে লা তুর লিখিয়াছেন প্রায় এক সহস্র দেশীয় সিপাহী, ত্রিশ জন ইউরোপীয় অফিসর, যোলটী কামান এবং প্রচুর গোলা-গুলি-বারুদ এবং আহার্য্য দ্রব্য হায়দরের হস্তগত হইয়াছিল। দুর্গ প্রাচীর ধ্বংস হয় নাই এবং তাহা সংস্কার করিবার মত লোকেরও দুর্গ মধ্যে অভাব ছিল না। তথাচ ইংরাজ সেনাপতি কেন যে অত সহজে অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন বলা যায় না।

ত্রিণমালাইয়ের যুদ্ধের ফলে নিজাম কতকটা হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। হায়দরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি অনতিবিলম্বে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে জলপথে প্রেরিত একদল ইংরাজসেনা মসলিপত্তনে অবতরণ করিয়া তাঁহার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার সন্ধিপত্র নূতন সন্ধির মূল ভিত্তি হইলেও কয়েক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল। তন্মধ্যে হায়দরকে পরস্বাপহারী ঘোষণা করিয়া মিত্রদ্বয়ের নিজেদের খেয়ালমত তাঁহার রাজ্য-লুণ্টন করিয়া লইবার ব্যবস্থাটিই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

ইহার অল্পকাল পরে একটি খণ্ডযুদ্ধে দে লা তুর ইংরাজ হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। শেভালিয়ে সেণ্ট্ লুব্যাঁ এবং অপর একজন বিশ্বাসঘাতক ফরাসী সৈনিকের সাহায্যে উহারা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অধিকাংশ সৈনিককে বশীভূত করিয়াছিলেন।

কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে সেণ্ট লুব্যাঁ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথম জীবনে তিনিও ফরাসীসৈনিকরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং কাউণ্টলালীর সেনাদলভুক্ত ছিলেন বলিয়া দে লা তুর উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথা সত্য হওয়াই সম্ভব। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কৈম্বাটুরে যখন হায়দর বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার নিকট আগমন করেন। এই আমাদের লুব্যাঁর সহিত প্রথম পরিচয়। হায়দরের নিকট তিনি ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর কাপ্তেন এবং Ordre Royale de St. Louis নামক মহামান্য রাজকীয় সম্মানের শেভালিয়ে বা নাইট বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ইউরোপ হইতে সার্থবাহকুলের সহিত স্থলপথে তিনি হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন ও পন্দিচেরী তাঁহার গন্তব্যস্থল। দে লা তুরের মনে উহাঁর সততা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার অনুরোধে হায়দর উহাকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে এক ব্যাটালিয়ন সেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লুব্যাঁ সম্বন্ধে যাহা জানা যায় দে লা তুরের নিজের ভাষাতে দেওয়া ভাল,—"পূর্ব্বোক্ত সম্মানচিহ্ন ক্রশটী ভিন্ন অনেকের দুর্ভাগ্যের হেতুস্বরূপ লোকটির মানবচিত্তাকর্ষণের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে আবশ্যকীয় কোন কিছুই উহাঁর ছিল না। সেনাপতি তাহাকে আহার্য্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন, এক কথায় বলিতে ভদ্রভাবে থাকিতে হইলে যাহা কিছু অপরিহার্য্য সবই দিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় একথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে ঐ ব্যক্তি উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাহা দূরে থাক লোকটী এতাদৃশ নীতিজ্ঞানবিগর্হিত এবং বিশ্বাসঘাতক ছিল যে তিন মাসের মধ্যেই সে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। ভিক্ষোপজীবীতে পরিণতপ্রায় হইয়া ঐ ব্যক্তি অতঃপর নবাবের ফরাসী সার্জ্জনের মধ্যবর্ত্তিতায় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য আবশ্যকীয় অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি লালীর সৈন্যদলে উহার সহকর্ম্মী ছিলেন এবং প্রথম দর্শনেই উহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় উহার অনুরোধে তাহার মুখোস খুলিয়া দেওয়া হইতে বিরত ছিলেন। শেভালিয়ে এইরূপে ভিষকে পরিণত হইয়া সকল কার্য্যসাধনক্ষম তাহার ক্রশটীর সাহায্যে এবার পর্ত্তুগালদেশীয় অর্ডার অব দি ক্রাইষ্টের পদবীধারীতে পরিণত হইয়াছিল। তাহার ক্রশটী কিন্তু আসলে সেণ্ট লুইয়ের ক্রশই ছিল। উহার এক

দিকের মিনা কবা সেণ্ট লুইয়ের প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া দিয়া তৎস্থানে অপর একটি ছোট আকারের ক্রশ বসান হইয়াছিল। অপর দিক যেমনকার তেমনই ছিল। ইহার কারণ স্বরূপ লুব্যাঁ বলিয়াছিল যে পর্ত্তুগালে থাকিবার সময় কতকটা ফরাসী ধাঁচ দিবার জন্য সে ক্রশটি ঐ ভাবে নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। অনতিকাল মধ্যে পুনরায় একটি চালাকি খেলিতে গিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। কয়েকজন বন্দী ইংরাজ অফিসর সর্ত্তাধীনভাবে মুক্তিলাভ করিয়া মান্দ্রাজ যাইতেছিলেন। চিরদিনের মত মহিশুর ত্যাগ করিবার অঙ্গীকার করাতে হায়দর লুব্যাঁকে মুক্তি দিয়া উহাদের সহিত যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কার্য্যটা কিন্তু উচিত হয় নাই। কিন্তু কথাতেই আছে মানুষ এক সঙ্গে সকল কথা ভাবিতে পারে না। তদ্ভিন্ন একটা অপদার্থের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা তাহার অন্যতম কারণ ছিল। লুব্যাঁর পক্ষ হইতে আশঙ্কার যে কোন কারণ থাকিতে পারে সে কথা কেহ মনে ভাবে নাই। পথিমধ্যে লুব্যাঁ সত্য মিথ্যা মিলাইয়া নানাবিধ কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ সৈনিক কাপ্তেন ম—র মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। উহার সকল কথা ঐ ব্যক্তি সত্য বলিয়া যথার্থই বিশ্বাস করিয়াছিলেন অথবা শুধু বিশ্বাসের ভাণ করিয়াছিলেন তাহা আমি ঠিক জানি না। লুব্যাঁ উহাকে বলিয়াছিল হায়দরের ইউরোপীয় সৈনিকগণ সকলে তাঁহার কর্ম্মে এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের অধ্যক্ষের প্রতি হতশ্রদ্ধ; এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কর্ম্মে গ্রহণ করিবেন অঙ্গীকার করিলে সে উহাদের ভাঙ্গাইয়া আনিতে পারে। বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবে মান্দ্রাজ সরকার হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন। এইরূপে মহিশুর হইতে বিতাড়িত ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক সহসা একেবারে গভর্ণর বুর্শিয়ে এবং নবাব মহম্মদ আলির পরম প্রিয়পাত্রে পরিণত হইয়াছিল।

"এই সময়ে অনেক ফরাসী সৈনিক পণ্ডিচেরী হইতে ইংরাজদের কর্ম্মগ্রহণ অভিপ্রায়ে মান্দ্রাজে আসিয়াছিলেন। কি জন্য বলা যায় না তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন না। ইংরাজেরা তাহাকে লুব্যাঁর প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া জানাইলেন যে ঐকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিলে পলাতকগণকে লইয়া যে দল গঠিত হইবে উহার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদসহ অধ্যক্ষতা তাঁহাকে উহারা দিতে সম্মত আছেন। অনন্তর ঐ ব্যক্তি হায়দর সকাশে গিয়াছিল। এদেশে উহার আত্মীয় স্বজনবৃন্দ যে প্রকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল সম্ভবতঃ সেই কারণে লব্ধ তাহার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া নবাবের ইউরোপীয় সেনাপতি (অর্থাৎ দে লা তুর স্বয়ং) পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতি কতকটা অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া অন্ততঃপক্ষ একজন সহকারী মিলিল ভাবিয়া তিনি হৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা সাহেব তাহাকে দরবারে পরিচিত করিয়াছিলেন; তিনি পূর্ব্ব হইতে উহাকে চিনিতেন। কিন্তু সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে হায়দর তাহাকে দেখিয়া স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; অথচ ইউরোপীয় সৈনিক লাভ করিলে তাঁহার প্রীতির কথা কাহারও অজানা ছিল না। মখদুম ইতিপূর্ব্বে উহাকে পণ্ডিচেরীতে দেখিয়াছিলেন। সে যে অত্যন্ত ভীরু কাপুরুষ তাহা তিনি জানিতেন এবং সে কথা হায়দরকে বলিয়াছিলেন। অশ্বারোহী পল্টনে কাপ্তেন-পদ উহাকে দিতে সেনাপতি ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু নবাবকে কোনমতে সম্মত করা যায় নাই। তাঁহার আপত্তির প্রকৃত কারণ সেনাপতির জানা ছিল না। সেজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে মখদুমই অকারণ নবাবের কান ভারী করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তির প্রতি স্বীয় আন্তরিকতা দেখাইবার জন্য তিনি তাহার নিকট প্রস্তাবিত কুদ্দাপুর অভিযানের কথা বলিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক পূর্ব্বাহ্নে ইংরাজদিগকে সংবাদ পাঠাইয়া কিরূপে তাহাদিগকে সতর্ক এবং গভর্ণর প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণকে বন্দীদশা হইতে রক্ষা করিয়াছিল সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

"ত্রিণমালাইয়ের যুদ্ধে অশ্বারোহীদলের অফিসরগণ দে লা তুরের অনুমতি লইয়া উহাকে তাহাদের পরিচালনভার লইতে আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হইয়া বরাবর হায়দর আলির পিছনে অবস্থিত ছিল। Hussar

পল্টনের অশ্বপৃষ্ঠে তাহাকে সমাসীন দেখিয়া নবাব বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং একজন মৃত পিণ্ডারী সৈনিকের ঘোটক দেখাইয়া দিয়া তাহাকে তাহাতে আরোহণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এ চূড়ান্ত অবমাননাতেও উহার বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় নাই।

"এই যুদ্ধের পর ফরাসীদের মধ্যে প্রথম অসন্তোষের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। এ যাবৎ উহারা সুবর্ণ মুদ্রায় বেতন লইত, অতঃপর তৎপরিবর্ত্তে সকলে রৌপ্যমুদ্রায় বেতন দাবী করিয়াছিল। বাটার হারের জন্য ইহাতে তাহাদের কিছু অধিক লাভের সম্ভাবনা ছিল। যোগ্যতা না দেখাইয়াও অধিক বেতন দাবী করার জন্য দে লা তুর সকলকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বিগত যুদ্ধে তাহাদের ব্যর্থতার কথা তুলিয়াছিলেন। তাহার সুযোগ লইয়া ষড়যন্ত্রকারীগণ সৈনিকগণকে এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একদিন সকলে সহসা শিবির পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্ররাও নামক জনৈক মারাঠা সর্দ্দার সমীপে গিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে হায়দর কর্ত্তৃক বিতাড়িত বহু ইউরোপীয়কে কর্ম্মদান করিয়াছিল। নবাবের বিরাগাশঙ্কায় উহার ইহাদের গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। এদিকে সেনাপতি সিপাহীসেনা লইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তখন উপায়ান্তরাভাবে বিদ্রোহীগণ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। শাস্তিস্বরূপ সকলে কয়েকদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবার পর হায়দর কর্ত্তৃক পুনরায় প্রতিগৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য ইউরোপে এ কার্য্য যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে না। কিন্তু নবাবের এবং সেনাপতির অবস্থা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। হায়দর তাঁহার ইউরোপীয় সৈনিকগণকে তাহাদের যথার্থ মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্য আরোপ করিতেন; উহাদের অস্তিত্বের প্রতি সেনাপতির নিজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। তদ্ভিন্ন এ ধরণের অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ এদেশে সৈনিক জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ বিবেচিত হইত; তাহাতে কেহই বিশেষ ব্যস্ত হইত না।

"কয়েক দিন বেশ শান্তিতে কাটিয়া গেল। তাহার পর আবার শুনা গেল সৈন্যদলে পুনরায় ষড়যন্ত্র দেখা দিয়াছে। চক্রান্তকারীদের নেতা কাহারা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এবং ঐরূপ ভাসা ভাসা খবরের উপর নির্ভর করিয়া কিছু করা সম্ভব ছিল না বলিয়া দে লা তুর ভাবিয়াছিলেন যে সুপবিত্র বাইবেল এবং ক্রুশের নামে নবাবের প্রতি অবিচল আনুগত্য, বিদ্রোহ বা অসন্তোষের আভাসপ্রাপ্তি মাত্র তাহা যথাস্থানে জ্ঞাপন এবং বিনানুমতিতে কোথাও না যাইবার শপথ সকলকে গ্রহণ করান ভিন্ন তখনকার মত তাঁহার আর কিছু করিবার নাই। সাধারণ সময়ে হয়ত ইহা যথেষ্ট হইত। কিন্তু ইংরাজেরা সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিল না। উক্ত শপথের জন্য সৈন্যগণের মধ্যে তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীগণ মাদ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিল যে তাঁহারা যেন মহিশুরদরবারস্থিত জেসুইট ধর্ম্মপ্রচারকগণকে ফরাসী গভর্ণরের নাম জাল করিয়া এমন একখানি পত্র লিখেন যেন তিনি যাবতীয় ফরাসী সৈনিককে পন্দিচেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিতেছেন। অচিরেই অভীপ্সিত পত্রখানি আসিয়া পৌছিয়াছিল। উহাতে লিখিত ছিল যে বিধর্ম্মীর কাছে কৃত শপথ বা প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই; রাজা বা রাজপ্রতিনিধির আদেশে তাহা অনায়াসে ভঙ্গ করা চলে, তাহাতে কোন পাপ অর্শে না। পাদ্রিপুঙ্গবগণ সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদিগের আয়ত্বের মধ্যে ছিল। উহাদের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘনের সাধ্য তাহাদের ছিল না। তাহারাও সে কথা সমর্থন করিয়াছিল। পত্রখানি সেনাপতিকে দেখাইতে বা তাঁহাকে এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ঐ মর্ম্মে একখানি চিঠি যে সৈনিকগণকে দেখান হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে কথা সকলেই জানে। পারী নগরে এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারেন। পত্রখানি কিন্তু জাল ছিল। কারণ গভর্ণরের উহা সেনাপতির নিকট হইতে গোপন করিবার কোন হেতু ছিল না। উহার স্বহস্তলিখিত বহু পত্র সেনাপতির নিকট সংরক্ষিত ছিল। হস্তাক্ষর মিলাইলে পত্রখানি জাল অথবা আসল নির্ণয় করা সহজ হইত।"

এইরূপে গোপনে গোপনে দে লা তুরের সৈন্যগণকে

বশীভূত করিয়া ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। হায়দর তাঁহার হস্তে ধৃত জনৈক ইংরাজ সৈনিক পুরুষের মারফৎ কিছু পূর্ব্বে মান্দ্রাজ সরকারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি তখন কতকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিলেন। আম্বুরের অদূরে উভয় পক্ষে একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। "আমাদের ইউরোপীয় অশ্বারোহী প্লটুন দ্রুতধাবনে বিপক্ষের কেন্দ্রদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শত্রুর কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইটি অশ্ব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইল;—তন্মধ্যে একটি অশ্ব প্রধান সেনাপতির। তিনি ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া আপনাকে স্বকীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং শত্রুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেখিলেন। উহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। পতনকালে সেনাপতির জঙ্ঘাদেশে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। উহা ক্রমে দুষ্টক্ষতে পরিণত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে প্রায় তিনমাস কাল মান্দ্রাজনগরে শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। জেনারেল স্মিথ তাঁহার বন্দীর প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজ শিবিরে আশ্রয় দিয়াছিলেন।" স্মিথ দে লা তুরকে বলিয়াছিলেন ফরাসীদের ভাঙ্গাইয়া লইবার জন্য তাঁহারা অনেকদিন হইতে চক্রান্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকগণের পলায়নের সুবিধা করিয়া দেওয়া ভিন্ন তাঁহাদের সেই অভিযানের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

দে লা তুর ইংরাজহস্তে বন্দী হইলে পরে মান্দ্রাজের গভর্ণর বুর্শিয়ে হায়দরকে মান্দ্রাজনগর অধিকার করিয়া অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিবার পরামর্শ দিবার অপরাধে তাঁহার বিচারের আদেশ দিয়াছিলেন। "কিন্তু ইংরাজদের গুপ্তচরগণের সাক্ষ্য ভিন্ন অপর কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল না। ন্যায়বিচারের সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত ধারণা এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী ইংরাজদিগের এই কার্য্য ভারতবর্ষে তাহাদের যথেচ্ছাচারের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন" বলিয়া দে লা তুর লিখিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পারীনগরে তাঁহার লিখিত "Histoire de Hyder-ally" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন আবার দক্ষিণ ভারতবর্ষে ইংরাজদের সহিত হায়দর আলি এবং ফরাসীদের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। সুতরাং ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে হায়দর আলি সম্বন্ধে জানিবার স্বাভাবিক কৌতূহল দেখিয়া দে লা তুর স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার প্রকৃত ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের অভিপ্রায়ে লেখনীধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিজ সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেও, "যে বিষয়ে লেখকের কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান নাই সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া নিরর্থক" বোধে তাঁহার আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছুই লিখেন নাই।

"সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে "কাহারও অথবা তোষামোদ অথবা বৃথা নিন্দাবাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। ইংরাজগণ যদি দেখেন যে লেখক গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের ছাড়িয়া কথা কন নাই তাহা হইলেও উঁহারা তাঁহাকে মিথ্যা-সৃষ্টির অপবাদ দিতে পারিবেন না। গ্রন্থকার স্বচক্ষে হিন্দুস্থানে ইংরাজ শাসনের যে নমুনা দেখিয়াছেন তাহা হইতে তাহার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিতে পারিতেন। তাঁহার স্বদেশবাসীগণের অপকর্ম্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাও লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে উহাদের আত্মপরিজনবর্গের কথা স্মরণ করিয়া তিনি তাহাদের নামোল্লেখ হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। এতদতিরিক্ত কোন প্রকার দয়াপ্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।". সকলেই বলিবেন যে দুষ্টগণের আত্মীয়বর্গের মনোবেদনার চিন্তা দে লা তুরকে অতটা বিচলিত না করিলে ভাল হইত। তাহা হইলে পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকের পক্ষে মহিশুর দরবারে ভাগ্যান্বেষণরত ফরাসীদের যথাযথ পরিচয়লাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইত।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অঙ্গীকার মত বিশ্বাস পলাতকগণকে লইয়া একটি "ফরেণ কোর" গঠন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গুপ্তচরকে তাহার অধ্যক্ষতা এবং

লুর্ব্যাকে কমিশনারের পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। হায়দরের ফরাসী চিকিৎসকও ইংরাজ সৈন্য বিভাগে সার্জ্জন-মেজর পদ পাইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই উক্ত দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। অনেকে নূতন ভাগ্যান্বেষণ ক্ষেত্রের সন্ধানে, অনেকে আবার পুরাতন কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিল। হায়দর তাহাদের পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এমন কি উহাদের দ্বারা অপহৃত অশ্বগুলিও তিনি পুনরায় মূল্যদানে কিনিয়া লইয়াছিলেন। দলের নবীন অধ্যক্ষও অধিক দিন সুখে কাটাইতে পারে নাই। তাহার নব প্রভুদের হস্তেই তাহার শাস্তি বিধান হইয়াছিল। কোর্ট মার্শালের বিচারে ঐ ব্যক্তি অবমাননার সহিত পদচ্যুত এবং বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

সেণ্ট লুর্ব্যার নিজ মূর্ত্তিও অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। দে লা তুরের কথা পক্ষপাতদোষদুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে ; সেজন্য ইংরাজ লেখক কর্ণেল উইলক্সের লেখার একাংশ প্রদত্ত হইল :—'১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলির সহিত সমর চলিবার সময় পণ্ডিচেরীতে সেণ্ট লুর্ব্যা নামে স্বয়ং-অভিহিত এক ব্যক্তি ইংরাজদের নিকট আসিয়াছিলেন। উহাদের নিকট তিনি বলেন যে ইউরোপ হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং হায়দরের দরবারে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার যাবতীয় পরিকল্পনা এবং বলাবল সম্বন্ধে তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এবং দেশীয় বা ইউরোপীয় মহিশুর দরবারের যাবতীয় রাজকর্ম্মচারীর উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। লুর্ব্যার সকল কথাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহাদের সৈন্য দলের সহিত পথ প্রদর্শক এবং প্রধান পরামর্শদাতৃরূপে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকল কার্য্য ও ব্যবস্থার উপর উহার অগাধ প্রভাব ছিল। তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কিছুই নিষ্পন্ন হইত না। এখানে বিস্তারিত ভাবে তাহার কলাফল সম্বন্ধে বলা অনাবশ্যক। তাঁহার পরামর্শমত চলিয়া এবং পদে পদে ঠকিয়া ইংরাজরা বুঝিয়াছিলেন যে উহার সকল কথা মিথ্যা এবং লোকটি আসলে ভণ্ডপ্রতারক।' *

ইহার পর দীর্ঘকাল আর সেণ্ট লুর্ব্যা সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারতবর্ষে উহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হায়দরের অন্যতম সেনাপতি জেনারেল লালী প্রসঙ্গে সে কথা বলা যাইবে।

দে লা তুরের বন্দীত্বে সমরের অবসান হয় নাই। সে সকলের দীর্ঘ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। কিছুকাল পরে কাপ্তেন নিক্সন পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য হায়দরের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। বন্দীগণের মধ্যে পূর্ব্ব বৎসর ভানিয়ামবাড়ির মুক্ত বন্দী কাপ্তেন র—ও ছিলেন। তিনি বোধ হয় মনে ভাবিয়াছিলেন দায়ে ঠেকিয়া প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। হায়দর মিথ্যাবাদী প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী সৈনিককে ফাঁসি দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আর কোন বন্দীকে কখনও মুক্তি দেন নাই।

অনন্তর হায়দর ইংরাজদিগকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করাইবার জন্য এক চাল চালিয়াছিলেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে তিন দিনে ১৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি অকস্মাৎ মান্দ্রাজ নগরের অদূরে আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন। রাজধানীতে তাঁহার আগমন সংবাদে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ হায়দরের সহিত বাধ্য হইয়া অতঃপর সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন (৪।৪।১৭৬৯)। স্থির হইল যে উভয় পক্ষ স্ব স্ব বিজয়লব্ধ অধিকৃত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে একপক্ষ কোন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই সময় হায়দর ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা আন্তরিকভাবে কামনা করিতেন। বাস্তবিক তিনি এই সময় যে প্রকার সুন্দর সমরকৌশল এবং রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, রাজোচিত যে ধৈর্য্য এবং সংযম দেখাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পক্ষান্তরে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট যে প্রকার হঠকারিতা, অপ্রকৃতিস্থমতিত্ব এবং দায়ীত্বজ্ঞানের অভাব দেখাইয়াছিলেন তাহারও তুলনা যে সহজে মেলে না সে কথাও বলা প্রয়োজন।

দুই বৎসর পরে মারাঠাদের সহিত হায়দর আলির

* "History of Mysore," vol. I, p. 337

আবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। পাণিপথের শোচনীয় পরাজয়ের দশ বৎসর পরে বিনষ্ট শক্তি কতকটা সম্বন্ধ করিয়া মারাঠারা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আবার নবোৎসাহে যুগপৎ আর্য্যাবর্ত্তে এবং দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছিল। উহাদের দিল্লী অধিকার করিয়া বাদসাহ সাহ আলমকে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার কথা ইতিপূর্ব্বে দি বইন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে উহারা চেরকুলি বা চিন্না-কুরালির ভীষণ যুদ্ধে মহিশুরী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিয়াছিল। "Walking Stuart" নামে অভিহিত জনৈক ইংরাজ সৈনিক এই যুদ্ধে হায়দরের এক কোর সেনা পরিচালিত করে। তাহার লিখিত যুদ্ধের বিবরণ "Asiatic Journal" পত্রের চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শী লিখিত বলিয়া উহা সাতিশয় মূল্যবান। তাহার একাংশমাত্র এখানে দেওয়া হইল ;—"দুই ঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর মারাঠারা রণস্থলের আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। হায়দরের সমগ্র তোপখানা, রসদাদি বহু সমরসম্ভার, অনেক প্রধান কর্ম্মচারী এবং ৫০ জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক উহাদের হস্তগত হইয়াছিল। হত্যা করিতে করিতে মারাঠারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আর দয়া করিয়া ইহাদের প্রাণবধ করে নাই।" ষ্টুয়ার্ট নিজেও বিষম আহত হইয়াছিল। মহিশুরী হাকিমগণ দেশীয় সৈনিকগণের চিকিৎসা করিতেন, আহত ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গিগণের জন্য কোনরূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় নাই। ষ্টুয়ার্টের একটি বালক ভৃত্য জল গরম করিয়া সমস্ত দিনে তিন চার বার তাঁহার ক্ষতস্থানগুলি ধুইয়া দিত। হায়দরের সৈনিকগণের মধ্যে অনেকে নিহত হইয়াছিল, যাহারা জীবিত ছিল মহাভয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে তৎপর হইয়াছিল। একটি মাত্র তোপাসি ব্যাটালিয়ান কোন মতে কতকটা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া উচ্চ এক ভূখণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের অধ্যক্ষ লেনে নামক একজন জর্ম্মণ ছিল। ঐ ব্যক্তি ওয়েষ্টফেলিয়া প্রদেশের অধিবাসী ছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দেশীয় ভাষাতে তাহার দখল ছিল। সেন্ত দে লা তুর তাহাকে প্রথমে দোভাষীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে গ্রিণেডিয়র বাহিনী গঠিত হইলে সে এক ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস দেখাইয়া ঐ ব্যক্তি সাংঘাতিক আহত হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পরে উক্ত উচ্চ ভূখণ্ডে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। অনন্তর মামু নামক জনৈক তরুণবয়স্ক মণ্টিজ্ঞ সৈনিক কোন মতে শ্রীরঙ্গপত্তনে উহাদের ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। মামু নিজেও স্কন্ধদেশে আহত হইয়াছিল। পন্দিচেরী হইতে নবাগত কতকগুলি ফরাসী অফিসর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আহত হইয়াছিল। কর্ণেল হুগেল বিষম আহত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হায়-দরের কর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হায়দর নিজেও আহত হইয়া কোন মতে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর বিপন্ন হায়দর পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট বিপদে পড়িয়া যে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে তাঁহাদের কোন বাসনা ছিল না। ইংরাজদিগের এই বিশ্বাস ভঙ্গ হায়দর জীবনে মার্জ্জনা করেন নাই। উহাঁরা যে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারেন তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই। ইহার পর হইতে তিনি ক্রমশঃ উহাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী জাতির প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন।

হুগেলের পর ম্যসিয় রাসেল হায়দরের ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। রাসেল নামটী কিন্তু ইংরাজী নাম। সুতরাং কাউণ্ট লালী, ল'-ভ্রাতৃদ্বয়, এডমিরাল মাকনামারা, মার্শাল ম্যাকডোনাল্ড, মার্শাল ম্যাকমেহান প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ফরাসীর মত তাঁহারও পূর্ব্বপুরুষ ষ্টুয়ার্টদিগের সহিত জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া ফ্রান্সে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়া ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে ফরাসীসৈনিকরূপে তিনিও যে এদেশে আসিয়াছিলেন সে কথাও অনায়াসে বলা চলে। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্যদল সম্বন্ধে ফরাসী ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর

ব্যারণ জ্যাঁ ল' দি লরিস্ত নিম্নলিখিত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন :—"এদেশে ফরাসীজাতীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের সংখ্যা খুব বেশী করিয়া ধরিলে আমার বিশ্বাস আটশতে দাঁড়াইতে পারে। দেশের অভ্যন্তরভাগে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট সুগঠিত বা সুসম্বদ্ধ কোন ফরাসী সেনাদল নাই। হায়দর আলির নিকট ম্যসির রাসেলের পরিচালনাধীনে সামান্য এক কোর অশ্বারোহী মাত্র আছে। উহারা সংখ্যায় প্রায় একশত হইবে; তন্মধ্যে অধিকাংশই ফরাসী। স্বয়ং হায়দর আলির নির্ব্বাচনানুসারে তিনি তদীয় কর্ম্মে মৃত হুগেলের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে তিন চারজন অফিসর আছে। উভয় নবাবের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা অথবা সত্য কথা বলিতে হইলে যে অদম্য ঘৃণা বিরাজ করিতেছে সেজন্য এ যাবৎ আমি মহম্মদ আলির নিকটে এই দলটিকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহস করি নাই। এই কোর ফরাসী রাজসরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই। অধ্যক্ষ এবং অফিসরগণ সকলেই ফরাসীরাজের নিকট হইতে কমিসনপ্রাপ্ত। হায়দর আলির কৃত প্রস্তাবসমূহ রিপোর্ট করিবার জন্য এবং মাহে বন্দরের সমীপবর্ত্তী তিনি এবং অন্যান্য নরপতিগণের সহিত যাহাতে আমাদের স্বার্থ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যও বটে, আমি বরাবরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ম্যসিয় রাসেলের সহিত পত্র ব্যবহার রাখিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহম্মদ আলির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া এবং ইংরাজদের যাহাতে ঈর্ষ্যাদ্রেকের কোন কারণ না ঘটে সেজন্যও আমি কথনও এই কোরটী সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাক্ষাৎভাবে লিপ্ত থাকা সমীচীন বিবেচনা করি নাই। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত আমি কয়েকবার মন্ত্রীমহাশয়কে জানাইয়াছি। তাঁহার নীরবতা হইতে মনে হয় তিনি উহা অনুমোদন করিয়াছেন। রাসেলের প্রতি এই প্রকার বাহ্যতঃ ঔদাসীন্য দেখাইলেও আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট সৈন্য প্রেরণ এবং আমার প্রতি যে দায়ীত্ব সমূহ পড়িয়াছে সেগুলি যথাসম্ভব সাধন করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই নাই।" *

রাসেল সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল লালী নিজাম দরবার হইতে হায়দর আলি সন্নিধানে আগমন করেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ইউরোপীয় সৈনিকদিগের অধ্যক্ষতা করেন। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে বলা হইবে।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* Etat Politique de l'Inde en 1777, pp. 142-43

দিদি

শ্রীকানাই সামন্ত

আমাদের সকলের দিদি—
বিধবা, শুচি, সুন্দরী ;
বাইশ তেইশ বছরের খেয়া
ঋতুর ঋতুর উপহার এনেছে জীবনের ঘাটে—
বসন্তে শুভ্র ভুঁইচাঁপা,
নিদাঘে শুভ্র করবী,
বর্ষায় বৃষ্টিবিধৌত-রজনীগন্ধার গুচ্ছ,
শরতে আকাশে-উড়ে-যেতে-চাওয়া কাশস্তবক—
পানপাতাড়ির ফুল—সাদা কন্ধে,
হেমন্তে শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা,
শীতের রাতে শিশিরসম্পৃক্ত কুন্দ
দলে দলে যার কান্নার শোভা হাসিতে বিধৃত।
একাহারে তপঃক্লিশা গৌরীর মত তাঁর তনু ;
শান্ত দু'টি চোখ,
দৃষ্টি তার দিনের আকাশে চাঁদের যেন কোণা
হাসিতে যার মায়া আছে মাদকতা নেই।

ছোট হই বড় হই আমরা তাঁর দাদা।
আমাদের থাকা না-থাকা এ ত অনিশ্চিত,
সংখ্যাও এত বেশী,
বড় মেজো সেজো ন' কোনো বিশেষণে বিশেষ যায় না চেনা।
তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাই আমরা ইংরেজের রাজশাসনকে
কেবল ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসার জোরে,
সহাস্য 'না' বলার ক্ষমতায়,
সত্যের প্রতি চরম আগ্রহে,

শত্রুর প্রতিও পরম আস্থায়—
অন্তরের অন্তরে সে মানুষ ব'লে।
ফলে দারোগা ও পুলিশের গাল খাই হাসিমুখে,
মাথা ফাটে যখন-তখন।
ভীরুর বাড়ে সাহস,
ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় সমব্রতী বন্ধু :
জোরের সঙ্গে বলে– না,
নিষ্কপর্দক সেবকদের ক্লেশবরণ দেখে
নিজেদেরও শেষ কড়ি খুইয়ে
সকল ক্লেশের জন্য হয় তৈয়ার।
ফলতঃ পল্লীতে পল্লীতে জাগে সাড়া,
আর আমরাও চলে যাই কারার আড়ালে
বলা নেই কহা নেই
সময় বা অসময় নেই
সহসা যে-কোনোদিন।
দিদি হয়তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবে একবার,
"নতুন দাদাকেও নে গেল মুখপোড়ারা।"
পল্লীগ্রামের মেয়ে ;
ব্যাকরণশুদ্ধ হয় না ভাষা,
শালীনতাও থাকে না সব সময়।
বলে রাখি তবু মুখপোড়া গাল শুনে
গফুর মিঞাও হত খুশী,
চটতো, বাপু, দশানন বললে।

দিদি আমাদের ত'রে
দুধ জাল দেয়, দৈ পাতে,
মুড়ি ভাজে, ভাত রাঁধে।
দুবেলা পরিপাটি ক'রে আসন পেতে
(দু একখানা থাকে শুণচটের থলে)

নিকোনো দাওয়ায় ভাত বেড়ে দেয় পরম যত্নে ;
কাঁচা আঁমের কচি আমড়ার অম্বল সাজিয়ে দেয়
হালের আমদানি এলুমিনামের বাটিতে ;
চৌকাট-গোড়ায় ব'সে জিগ্‌গেসে,
"আর কী লেবে, দাদা ?"
সব দাদাই মুখ তোলেন,
সম্বোধন হল কারে কে জানে।
বয়সে যদি হই ছোট, ব্যবহারও হয় সহজ হাসিখুশির,
খাওয়ানোর বেলায় যত গল্প দিদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখসুখের ;
আঁচিয়ে সুপুরি হাতে নিয়েও শুনতে হয় কিছুক্ষণ এক পা বাড়িয়ে
কত দাদা এসেছ্যালো, কত চলে গেছে ;
দিন যায়, নিত্য নূতন দাদাদের নিয়েই বিব্রত,—
সকলকে রয় না মনে
কেবল ভোলা যায় না শাস্তিকে :
সৎ ব্রাহ্মণের ছেলে, শ্যামবর্ণ ;
কথা জানে, কথা কয় না বেশী ;
মুচকে মুচকে হাসে,
মিষ্টি ক'রে কখনো
দিদির কথার করে অনুকরণ দিদির সুরে ;
আবদার করে ছল ক'রে।

বয়স কতই হবে—ষোলো-সতেরো ;
ছোট বেলায় কাঁদিয়ে গেছে যে ভাইটি
সে যদি থাকত আজ অত বড়টি হত ;
অমনি হাসিমুখে তুচ্ছ আবদার করত দিদিটির কাছে।
শাস্তিও থাকে না, ফিরে ফিরে জেলে যায় ;
কে জানে, বাপু, আছে এখন
কোন্ দমাদম্ ইস্পিশালে
কোন্ হিজলীতে।

শ্রাবণ ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন পড়তে সে এসবে
হৈমবতী মায়ের আগমনের আগে .
ভোরের পানে যখন ঘাটে যেতে শিউলিতলায়
ফুল বিছিয়ে থাকবে রাশি রাশি।

পালি ছাগলের ছানা ক'টিরে
স্নেহ করেই কাটে দিদির দিন
(আর আমাদের কাজে)।
বেলাশেষে ডেকে ডেকে আনে তাদের
এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে,
বুকে করে খায় চুমো কচিমুখে।
(আদরকারিণীর কপালের উপর থেকে
আলগা দুগাছি চুল হাওয়ায় ওড়ে;
চিবোতে চায় তাই অবোধ)
নিঃসন্তানের স্নেহ উথলে ওঠে বোবা জন্তুর
কালো চোখের আলোয় মা-ডাক শুনে.
বুঝতে পারে না ভালো,
আবার ভোলে—
গুন্-গুন্ স্বরে যে সঙ্গীত বেজে উঠতে চায়
বোবা বুকের ভিতর

ভোরে গোয়াল কুড়োয়;
সকালে গাই দোয় বাছুর বেঁধে ছাতিমতলায়;
মা ব'লে হাত বুলিয়ে দেয় পাটলা গাইয়ের চিকণ দেহে;
ভাই ব'লে শাসন করে দুরন্ত বাছুরটিরে।
সে একদিন
খাওয়া-দাওয়ার পর বিকালে
এক উঠোন রোদ রয়েছে তখনো,
বেলা রয়েছে পড়ে :
বর্ষাবাদলের জন্যে জ্বালানির সঞ্চয় চাই;
দিদি বসল তেঁতুলের ডালপালা নিয়ে দা হাতে।

এমন সময় পশ্চিমে উঠল কালো মেঘ,
আকাশের আধখানা দিল ঢেকে ;
তালের বাকলে ঝলক দিতে দিতে
কখন মিলিয়ে এল আলো ;
ঠাণ্ডা হাওয়া বইল ;
সজল শ্যাম মাঠের এদিকে ওদিকে
বক উড়ে পড়ল বাসার সন্ধানে।

কাজ ফেলে দুয়োর ধ'রে
দিদি কী দেখলে ক্ষণকাল ;
তারপর ছুটল মাঠ-পানে আল-পথে ;
বীজ ধানের ক্ষেত ডাইনে বাঁয়ে ;
পাকা সড়কের ওপারে নাবাল ভূমিতে
বেনা ও বাব্লার বনে বানের জল এসেছে দিন দুই হল ;
দূর হতে দেখা যায় আঁকাবাঁকা জলরেখা
শ্যামা পৃথিবীর বুকে ঝিক্ ঝিক্ করে যেন সাতনরী হারগাছি।

আষাঢ়ের সুরু হতেই
মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে, থামতে জানে না ;
দিনরাত যায় ভেসে খামখেয়ালী দেব্তার খুশিতে
অশান্ত বৃষ্টির ছাটে।

ভোরের দিকে আকাশের একটু ধরণ হয় ;
কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার এসে নামে বাদলা
দূরের বন পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে,
বাঁশবাগানে শন্-শন্ শব্দ জাগিয়ে,
নতুন টিনের চালে তড়্বড়িয়ে দড়্বড়িয়ে,
বড় বড় ফোঁটা ফেলে খড়ের পালুইয়ে,
কলুমে আমের পাতায় পাতায়
সারা উঠোনে।
গৃহস্থালির কাজের মাঝখানে
আর হয় না কাজ করা।

দিদির মনে পড়ে এই যে এত সব ভাই
এরা থাকবে না কেউ দু'দিন বাদে,
ডাকতে আসবে না দিদি বলে ;
আজ হোক্ কা'ল হোক্ থেমে যাবে লড়াই,
উঠে যাবে শিবির,
সংসার চলবে যেমন চলেছিল ;
তখন একলা ঘরে পড়ে থাকবে নিঃসঙ্গিনী দিদি—
নিঃসন্তান, বিধবা।
আহা, নিজের ভাইটি যদি থাকত
সে কি ফেলে যেতে পারত কোনো দিন ?
মনে পড়ে সেই আধভোলা মুখ, আধভোলা হাসি ;
ঘরে গিয়ে দিদি দুয়োর বন্ধ ক'রে কাঁদে।

কুইনাইন সেবন আবশ্যক ; জল চাইতে গিয়ে
শুনতে পাই গুন্-গুন্ গানের মত কী স্বর—
বেহুলার গীতা :
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ফিরে আসি।

কানাই সামন্ত

কণা

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

প্রেম যদি হত সঙ্কোচহীনা কিছু না রাখিত ঢাকি',
কভু কি পারিত হতে এত মনোহরা ?
কুসুমগন্ধ-স্পন্দনভরা বনতলছায়া মাখি'—
হের, পূর্ণিমা হয়েছে মধুরতরা॥

মর্মরধ্বনি কেন জাগিলরে

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-এ

সাতটা বাজতে অবনী শেষকালে বেরিয়েই পড়ে। সামান্য একটা নেমতন্ন রাখতে যাবে, তার জন্যে এত ভাবনা কিসের! এতক্ষণে সুরেন হয়ত ফিরেছে। সারাদিন খাটতে তাকে কম হয় না। ছোট্ট চিরুণীর কারখানা—কয়েকজন মাত্র কারিগর। কিন্তু সুরেনকে একাহাতেই মাল তৈরি, মাল বিক্রি আর লোক খাটানো—সব কাজ তদারক করতে হয়। রবিবারেও তার ছুটি নেই। সেদিন সে হিসেব পত্র ঠিক করে। লোকে বলে, পরাধীন চাকরি। কিন্তু এর চেয়ে অবনী—আশি টাকা মাইনের মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী অবনী—আছে বেশ। মনে মনে বন্ধু সুরেনের সঙ্গে নিজের এই তুলনাটা না করেও থাকতে পারে না। মাসের শেষে সুরেনের নিট আয় হয়ত এক শ টাকা বা আরো কিছু বেশি। বাজারের নিত্য-ওঠানামার কোন্ ফাঁকে একদিন হয়ত সৌভাগ্যের সুযোগ ঘটতে পারে—এই অনিশ্চিত আশায় এত হাড়ভাঙা খাটুনি ও কিছুতেই খাটতে পারত না। কিন্তু তবু অবনীর চেয়ে সুরেন ঢের সুখী—মীরার মত বোন পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সুরেনকে ভাবতে গেলে অবনী মীরাকে না ভেবে থাকতে পারে না। স্কুলে কোনদিন যায় নি কিন্তু পড়াশোনা ও ভালভাবেই করেছে। যেমনি কথাবার্তায় তেমনি চালচলনে—ওর কোন খুঁত পাওয়া শক্ত। চিররুগ্না মার সেবা আর সংসারের কাজ নিয়েই সারাদিন ও কাটিয়ে দেয়। আমাদের সমাজে তবু এমন মেয়ে ঘর পায় না। মীরার বিবাহিত জীবনের সব ও জানে না—তবু আভাসে ইঙ্গিতে এবং কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে যে দু-এক টুকরো দুর্ঘটনার কথা শুনেছে—তা ভাবলে অবনী চুপ করে থাকতে পারে না। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিন্তু সুরেনদের বাড়ীতে আজ রাত্তিরে নেমতন্ন যেতে আর ইচ্ছে করে না। কয়েকদিন থেকে সে লক্ষ্য করেছে তার মনে বসন্তের বনানীর চাঞ্চল্য। মীরা তার সঙ্গে আজকাল যেভাবে খোলাখুলি ব্যবহার করে। এতে অবশ্য অন্যায় কিছু নেই।—তরুণী মীরা এবং তরুণ সে। প্রথম তারুণ্যের অসতর্ক বছরগুলো অনেকদিন হল তারা পার হয়ে এসেছে। তরুণ তরুণীর স্বাভাবিক প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে কোথায় সীমারেখা টানিতে হয়, তা তারা দুজনেই জানে। সংসারের ঘাটে ঘাটে বিচিত্র আঘাত খেয়ে তাদের জীবনে অভিজ্ঞতা কিছু কম হয় নি। তবু পরশুদিন মীরার ব্যবহারটা যেন কেমন কেমন হয়ে উঠেছিল। আর একটু হলে সীমারেখা পার হয়ে যেত। কিন্তু সুরেনটা কি মানুষ! এত সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েও আবার আজ আমাকে নেমতন্ন করে পাঠায়! অবনী ভাবে, সুরেনের উচিত, বাধা দেওয়া—যেমন করেই হোক, আমাকে পরোক্ষে অপমান করেও। তবু ও নিজে নিজেকে রুখে রাখতে পারে না।

সুরেনদের বাড়ীতে এসে অবনী অবাক হয়ে যায়—যা ভেবেছিল তাই। একটা কিছু ঘটবেই, তা নাহলে আসবার সময় কেন বাঁ দিকে টিকটিকিটা অম্নিভাবে পড়বে! এতদিন এত মানুষ যা বিশ্বাস করে আসছে তার মধ্যে কিছু সত্য না থাকলে হয়। অবনী ভাবলে। মীরা তাকে দেখে বললে, 'আসুন, আসুন। দাদা আজ পাটনা গেছেন বিকেলের গাড়ীতে।'

—'হঠাৎ?' অবনী উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে।

—'একটু বিশেষ দরকারে। এত দেরি করলেন কেন? মা খোঁজ নিচ্ছিলেন।'

সুরেন নেই—আজ একটা রোমান্টিক সিচুয়েশান্ তৈরি হয়েছে দেখছি!—অবনী নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে খুশি

হয়ে ওঠে। সে ভাব গোপন করে বলে, 'মা আজ কেমন আছেন ?'

—'মার আর থাকাথাকি ! আজ বছর খানেক ধরে কি কষ্টই পাচ্ছেন। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন আজ শরীর তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পরে টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে মীরা অবনীকে বললে, 'আসুন, খাবার সাজিয়ে দিয়েছি। আজ বেশি কিছু আয়োজন করতে পারিনি—যা হোক করে পেটটা ভরিয়ে নেবেন।'

—'নাঃ, এত সামান্য আয়োজনে আমাদের মতন লোকের পেট ভরানো শক্ত। একে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি খাই, তাতে আজ আবার খিদেটা পেয়েছে খুব।' অবনী গম্ভীর হয়ে বলে।

মীরা তার তামাসা বুঝতে পারে, বলে, 'তাইত, নেমতন্ন করে বড় অন্যায় করেছি তো। বাড়ীতে চাকরকে বলে এসেছেন খাবার চাপা দিয়ে রাখতে ?'

—'আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। নেমতন্ন খেতে এলে জানি ছাঁদা বেঁধে ফিরতে হব। খাবার চাপা দিয়ে রেখে নেমতন্ন আসা আজিকালকার সহরে মেয়েদের অভ্যেস।'

—'বটে ! আজকালকার সহরে মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার তো টন্‌টনে জ্ঞান দেখছি। তবু তো কারোকে কখনো বাড়ীতে নেমতন্ন করে খাওয়ান নি।'

—'কি করি বলুন ? ব্যাচিলারের অগোছালো বাড়ীতে চাকরের শ্রীহস্তের রান্নার ওপর নির্ভর করে কারোকে নেমতন্ন করার ভরসা কোনদিন হয় নি। আর করলেই বা যেতেন কি ?'

—'সে জবাব আজ কেমন করে দেব, নেমতন্ন না পেলে ?'

—'বেশ, সুরেন ফিরে আসুক, তারপর দেখব কেমন আপনি যান।' অবনী জবাব দিল।

—'আচ্ছা, সে পরের কথা পরে হবে। এখনতো সুরু করুন। অনেক দেরি হয়ে গেছে।' গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে মীরা বললে। তা নিতে গিয়ে অবনীর হাত লাগল মীরার হাতে—ক্ষণিকের আকস্মিক উষ্ণ স্পর্শ। অবনীর সারা দেহে রোমাঞ্চের চাঞ্চল্য খেলে যায়। ও জানে, একদিন যা ছিল আকস্মিক, আজ আর তা তা-নয়। সপ্তাখানেক ধরে চলেছে ওদের এই লুকোচুরীর ভান। ওরা উপভোগ করতে চায় পরস্পরের স্পর্শের শিরায় শিরায় অনুরনন। হয়ত এর ভিতর দিয়ে চলে ওদের মন জানাজানি। আভাসের সূক্ষ্মতা প্রকাশের স্থূলতার চেয়ে ঢের বেশি চাঞ্চল্যকর।

খেতে খেতে অন্যপ্রসঙ্গ সুরু হয়। টেবিলের একদিকে মীরা আর একদিকে ঠিক সামনাসামনি অবনী। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সবই আছে তবু বিলাসিতার কিছু নেই। সামান্য আয়ে এমনভাবে সংসার চালানো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অবনীর মন মীরার ওপর শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

মীরা অনুযোগ করে, 'আজ কিছুই খাচ্ছেন না-যে। দাদা নেই, কে আপনাকে আর জোর করে খাওয়াবে ?'

—'কেন, দাদার বোনের জোরও তো কম দেখছিনা।' কথার পিঠে অবনীর মুখ থেকে উত্তর বেরিয়ে আসে। কিন্তু বলেই ও কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'আজকে পাশের বাড়ীর মাতালটার কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না ?'

—'না হয়ত এখনো ওর টাকা ফুরোয় নি। রাত্তিরে তো বাড়ী আসে শুধু বৌটাকে মারপিট করে টাকা আদায় করার জন্যে।'

—'মেয়েটির হাতে কিছু টাকা আছে নাকি ?'

—'এককালে ছিল। বড়লোকের মেয়ে। বড়লোকের মুখ্খু ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বাপ মা হয়ত ভেবেছিলেন সংসারে খাওয়ার অভাব না হলেই মেয়েরা সুখী। সেদিন দুপুরে মেয়েটি এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে—কত দুঃখের গল্প করলেন। কিন্তু আশ্চর্য ওঁর স্বামী। নিজে লম্পট তাই বিশ্বসুদ্ধ সকলেরই ওপর সন্দেহ। জানেন, পরের বাড়ীতে বেড়াতে আসার জন্যে শুনলুম মেয়েটিকে সেদিন লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে।'

—'এঁর উচিত এমন স্বামীর সব সংশ্রব ছেড়ে দেওয়া।' সহানুভূতির উত্তেজনায় অবনী রুখে বলে।

—'তা কি আপনি ভাল মনে করেন ?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'এমন মেয়েকে কি সত্যি মনে মনে কোন দিন আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ?'

—'এ রকম কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি ?' হাতটা থালার ওপর রেখে বিস্ময়ের সুরে অবনী জিজ্ঞেস করলে।

—'কারণ এ রকম বিদ্রোহ যারা করে সমাজ তো তাদের শ্রদ্ধা করে না। আর সেই সমাজ আপনাদের তৈরি,—মেয়েদের নয়।'

—'পুরোপুরি বিদ্রোহ এঁরা করবেন কেন—শুধু পাপের সংশ্রব ছাড়বেন।' প্রশ্নোত্তরের ফলে ওর ক্ষণিকের উত্তেজনা ক্রমে এসেছে।

—'ওঃ। নিন আর একটু মাংস নিন।' বলে মীরা মাংসের পাত্রটা এগিয়ে দিলে।

—'মাংস আমি নিচ্ছি। কিন্তু আলোচনাটা এমন ভাবে বন্ধ করে দিতে পারেন না। বলুন আপনার কি বলবার আছে।'

—'বলব আর কি বলুন ? দেখছি আপনারা সবাই সমান।'

—'অপর দশজনের সঙ্গে আমি একজন নই, আমি স্বতন্ত্র,—এ কথা শুনতে অবশ্য প্রত্যেক পুরুষ মানুষেরই ভাল লাগে। কিন্তু আপনি শ্লেষই করুন আর যাই করুন তবু আপনার মতটা শুনতে ইচ্ছে করে।''

—'কিন্তু আমাদের যে গোড়ার কথাতেই মিল নেই।'

—'কি রকম ?'

—'মেয়েদের যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তা আপনারা মানেন না।'

—'অর্থাৎ সমাজে মেয়ে ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা তুলছেন।'

—'দেখুন অধিকার যদি সত্যিকারের পাওয়া যায় তখন কেউ তার সূক্ষ্ম মাপ নিয়ে ওজন করতে যায় না। আমি বলছি, সমাজে মেয়েদের যে একটা স্বতন্ত্র অধিকার আছে—তারাও যে মানুষ, তাদেরও মন আছে, দেহ আছে, আর দেহমনের বৃত্তিগুলো ভোগ চায়,—এ কথা আপনারা কেউ স্বীকার করতে চান না।' মীরা বললে।

—'যে অভিযোগ করছেন তা এককালে হয়ত সত্যি ছিল, মীরা দেবী। আজ সমাজে অনেক কিছু অদল বদল হয়েছে।'

—'সে হয়েছে মুখে আর উপন্যাসের পাতায়। ঘটনার ক্ষেত্রে আজো সমাজে তেমি আছে।'

—'আপনার এ অভিযোগ মেনে নিতে পারলুম না, মাপ করবেন।'

—'মেনে নিতে পারবেন না তা জানি। কারণ, আপনি কোনদিন এ রকম ঘটনা দেখেন নি। আমি দেখেছি, তাই আপনি না মানলেও আমার কাছে এ সত্যি। তবে শুনুন।' অবনীর পাতে এক চামচ ঝোল তুলে দিয়ে সুরু করে তার গল্প :

'বাপ-মরা গরীবের ঘরের মেয়ে। ভাই যথাসর্বস্ব খরচ করে বড়লোকের বাড়ীতে বিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, বোন সুখী হবে। অভিভাবকহীন, বড়লোক স্বামীর খেয়ালের অন্ত নেই। মেয়েটি মুখ বুজে সব সহ্য করে। কিন্তু মন যার বাইরের দিকে তাকে ঘরের মধ্যে টেনে রাখবার শক্তি মেয়েটি পাবে কোথায়! কিছুদিন পরে বুঝতে পারলে স্বামীর মন কেড়ে নিয়েছে পাড়ার এক বিধবা মেয়ে। স্ব-ঘরের নয় তারা। বিয়ের আগেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। তবু স্বামীর আত্মীয়েরা লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন হয়ত এ মোহ ঘুচে যেতে পাবে এই আশা করে। একটি অপরিচিত মেয়ের জীবন যৌবন নিয়ে এমনভাবে ছিনিমিনি খেলতে একটুও তাঁদের দ্বিধা হয়নি। জানেন তো, যে মেয়েদের রূপ আছে তারা পুরুষের হাতে যৌবনের লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে না। মেয়েটি প্রাণপণে চেষ্টা করলে স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে। ফলে এই হ'ল, কিছুদিন পরে স্বামী সেই যুবতী মেয়েটিকে নিয়ে এলেন একেবারে অন্দর মহলে। খোলাখুলিভাবে তাকে দিলেন স্ত্রীর সব অধিকার। পরিবারে সকলের চেয়ে উঁচু আসন সে পেলে।'

—'তখন আত্মীয়েরা কিছু বললেন না ?' অবনী জিজ্ঞেস করলে।

—'হাঁ, পেছনে কেউ হাসলে, কেউ গালাগালি দিলে, সামনে বললে, দ্বিজুর সাহস আছে বটে। এই রকম মানুষই তো সমাজে চাই—যা করবে তা লুকিয়ে নয়।—তারা যে দ্বিজুবাবুর আশ্রিত! অবশ্য তাঁদেরই মধ্যে দু-একজন বংশের গৌরবের খাতিরে একটু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। শেষে বলতে লাগলেন, এমন পোড়া-কপালে বৌ ঘরে এসেছিল! মেয়েটি তখন নিরুপায় হয়ে বাপের বাড়ী চলে এল। দ্বিজুবাবু রথে এলেন স্ত্রীকে নিয়ে যেতে।' স্ত্রীকে অধিকার কিছু তিনি দেবেন না কিন্তু স্ত্রীর ওপর অধিকার তাঁর ষোল আনা চাই। স্ত্রী ফিরে গেল না। তখন তিনি স্ত্রীর নামে দিলেন ব্যভিচারের দোষ। পুরুষের শেষ অস্ত্র! কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট আমার কখন হয়েছিল, জানেন?'

অবনী কথা বলতে পারে না, শুধু ঘাড় তুলে জিজ্ঞাসু-চোখে চেয়ে থাকে। খাওয়া তাদের নিঃশব্দে যে কখন শেষ হয়ে গেছে তা দুজনের কেউই টের পায়নি।

মীরা আপন মনে বলে যায়, 'এত লাঞ্ছনার পর যখন বাড়ীতে জানালুম, তখন স্বামীর সঙ্গে পরোক্ষে বা অপরোক্ষে কোন ভাবেই আর সম্বন্ধ রাখতে চাই না,—আমি আইনের সাহায্য নেব। আত্মীয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, সে কি, হিন্দুর মেয়ে, স্বামী যদি অন্যায় করে থাকে তার জন্যে কি বিধিদত্ত সম্বন্ধ কাটা যায়।—তা আবার আদালতের সাহায্যে! পোড়া অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিলে, যা হয়েছে হয়েছে। সে কাহিনী আবার দেশময় চাউর করে আত্মীয়স্বজনদের আর মুখ পোড়ানোর চেষ্টা কেন! মেয়েমানুষ সহ্য করতে শেখ। আমি তর্ক তুললুম, মেয়েমানুষের মন বলে কিছু নেই বুঝি। তার জীবনে স্বাদ আহ্লাদ নেই। তার অধিকার শুধু সহ্য করার—এই সমাজের ফতোয়া। তারপর থেকে সত্যিকার পীড়ন সুরু হল। স্বামীর পীড়ন ছিল বরং বাইরের। অন্তত, তারমধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা থাকত যে একজন আমার ওপর অকারণে অন্যায় করছে। এই সংসার যদি কোন নিয়মের বাঁধা-ধরা শাসনে চলে, তাহলে একদিন তাঁকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কিন্তু সময়ে অসময়ে আত্মীয়দের সহানুভূতি আমার অসহ্য হয়ে উঠল। কোন শুভকাজে যোগ দিতে পারি না, কোন আমোদে আহ্লাদে আমার জায়গা নেই। আমাকে দেখলেই কারো চোখের জল গড়িয়ে আসে। কেউ বলে, এমন পোড়া অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিলি মা! আমি বলি, অদৃষ্ট আমার পোড়া হল কোথায়? আমি কোন অন্যায় করেছি? অপরে করলে দোষ, আর তার শাস্তিটা তোমরা সকলে মিলে আমার মাথায় তুলে দিচ্ছ। আমি যদি মুক্তি পেতুম তাহলে দেখতুম, জীবনে আমার কোন জায়গা নিয়তি রেখেছে কিনা।—আঃ, এ কি! উঠুন, উঠুন, কথা বলতে বলতে ভুলে গেছি, হাত ধোবেন চলুন।'

নিজের জীবনের কাহিনী অপরের নামে বলতে বলতে আবেগের ঘোরে কখন যে অজ্ঞাতে নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে, এ কথা বুঝতে পেরে মীরা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার মনের সেই চাঞ্চল্য ঢাকবার জন্যে ও হাত ধোবার সময়ে অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দেয়। এতক্ষণ ও যেন এ রাজ্যে ছিল না।—হঠাৎ চৈতন্য ফিরে পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে অবনী যখন যাবার জন্যে উঠল তখন মীরা বললে, 'আপনি যাদু জানেন। আজ কেমন আমার জীবনের সব কথা শুনে নিলেন।' নিজের গোপন কথা বলে ফেলার লজ্জা ওর মন থেকে কিছুতেই দূর হয় না।"

—'বললেন বলেই তো আজ একটা মস্তবড় সান্ত্বনার সন্ধান পেলুম। জগতে আমার মতন দুঃখীও আছে।'

—'আপনার আবার দুঃখ কি?' আধো উৎসুক, আধোশ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে মীরা জিজ্ঞেস করলে।

—'এই দেখুন, মানুষ কত ভুল করে। আপনি বুঝি ভাবেন, জগতে আপনিই একমাত্র দুঃখ পেয়েছেন। আজ এখানে আসার আগে ঠিক এই কথাটি আমিও ভাবতুম আমার নিজের সম্বন্ধে। জানেন, সমাজের হাতে আমি কত লাঞ্ছনা পেয়েছি?'

—'না, জানি না। আপনি বললে তবে তো জানতে পারব।'

—'আজ থাক। রাত হয়ে গেছে। আর একদিন বলব। মীরা, আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখ—।' অবনীর স্বর

গাঢ় হয়ে আসে : 'সমাজকে আমরা ভয় করি না—ভয় করি না বলেই এখনো বেঁচে থাকতে পেরেছি।' চকিতের মধ্যে অবনী মীরার ডান হাতের আঙুলগুলো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অপলকভাবে চাপ দেয়।

মীরা হাত টেনে নেয় না। ওর মুখে চোখে ভেসে ওঠে চাপা খুশির রেখা। বলে, 'ভীষণ রোমান্টিক আপনি আচ্ছা, কাল সকালে তো আসছেন। দাদা নেই, আর খবরটা ডাক্তারবাবুকে দিয়ে আসতে হবে। রইল আপনার চায়ের নেমতন্ন। আসবেন ঠিক। শুনব আপনার কাহিনী।'

সকালে তাড়াতাড়ি মীরা ভোরের কাজগুলো সেরে নেয়। আজ বসবার ঘরটা একটু বেশি মন দিয়ে সে সাজিয়েছে। চায়ের টেবিলে পাতা-ওড়না বদলেছে। কথা পর্যন্ত সাবধানে বলছে। যেন তার সমস্ত চলন-বলন কার প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে আছে। একথা ওর সচেতন মনের কাছে গোপন থাকে না। সংসারে যারা আঘাত পায় স্বভাবতই তাদের মন আশ্রয় নেয় নিজের মধ্যে। মনে মনে নিজেকে নিয়ে অহরহ তাদের চলে বিচার বিশ্লেষণ।

মা শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অবনীকে চায়ের নেমতন্ন করেছিস মনে আছে তো।'

মীরা নিজের মনে নিজেকে শ্লেষ করে বললে, এত বেশি মনে আছে যে শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মুখে জবাব দিলে, 'হাঁ, সব তৈরি করে রেখেছি তো। তুমি তাড়াতাড়ি দুধটা খেয়ে নাও। কাল রাত্তিরে তো বুকের ব্যথাটা খুব বেড়েছিল। আমাকে ডাকনি কেন ?'

—'তুই সবেমাত্র শুয়েছিলি তাই আর ডাকলুম না।'

—'কাল ভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জানো মা, একটা যা ভাল স্বপ্ন দেখেছি।'

—'কি ?' চিররুগ্ন মায়ের শুকনো মুখে এক কালি [illegible]ক্যের হাসি।

—'যদি ফলে তা'হলে আমায় কি দেবে বল।'

—'আঃ, জ্বালাস্‌নি, বল্‌না কি এমন স্বপ্ন।'

—'ভোর রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছি, দাদা পাটনা থেকে বিয়ে করে ফিরে এসেছেন—আর চারিদিকে হৈ-চৈ, লোকজন।' মীরার কণ্ঠে চপল সুর, ও যেন আজ ছেলে-মানুষ হয়ে গেছে। মন্ত্রবলে যেন ফিরে গেছে অতীতের গুটি পাঁচ-ছয় পার-হয়ে আসা বছরের পূর্বকূলে।

কিছুক্ষণ কেউ আর কথা বলে না। তারপর মা ডাকেন, 'মীরা।'

—'কি ?'

—'অতসীর কোন খবর জানিস ?'

—'অতসীর খবর। কেন, দিব্যি রমেশ বাবুর সংসার জমিয়ে তুলেছে। দাদার যেমন। ভাল যদি বেসেছ তো অত জাতের বিচার কেন ? বদ্যিদের মেয়ে বুঝি মেয়ে নয়। আচ্ছা, না-হয় বুঝলুম, অঘরে বিয়ে করে সমাজের বাইরে থাকার মতন অত সাহস তোমার নেই। বেশ, তাহলে স্বঘরেই বিয়ে কর। দেশে মেয়ের কি অভাব। সারাজীবন না-সংসারী না-সন্ন্যিসি হয়ে থেকে কি পৌরুষ জাগবে জানি না। অতসী তো দিব্যি ড্যাঙডেঙিয়ে বিয়ে করে ফেললে।'

—'খোকা কেন বিয়ে করতে চায় না, জানিস্ ?' মা বললেন।

—'কেন, আবার ? অতসীর ওপর নিষ্ঠা দেখাবার জন্যে।'

—'না, আমি একদিন বিয়ে করার জন্যে জোর করে ধরেছিলুম। বলেছিলুম, আমার তো এই অবস্থা। তোরা যত চিকিৎসাই করা—পয়সা কেবল জলে ফেলা। হঠাৎ একদিন এসে দেখবি, ধুকঁতে ধুকঁতে শেষ হয়ে গেছি। তবু তোকে সংসারী দেখে যদি যেতে পারতুম, খোকা। ও কি বললে জানিস ? কাল্পে, মীরাটা শুকনো মুখে ফিরে ফিরে বেড়াবে আর আমি তোমার বৌমাকে নিয়ে আমোদ করব ? ও কথা আমায় আর বলো না মা। কে ওর জীবনটা এমন ভাবে নষ্ট করে দিলে—তখন যদি বড়লোক আত্মীয়ের মোহ না হত।'

চা তৈরি করে দিতে দিতে মীরা জিজ্ঞেস করলে, 'কি এত করে দেখছেন ?'

অবনী একদৃষ্টে চেয়েছিল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বলে বসল, 'না, কিছু না তো।'

—'কিছু না তো! বলব কি দেখছিলেন?' ওর মুখে একটুকরো দুষ্টুমির হাসি।

—'বলুন না।'

—'আবার দস্তান-এর আমদানী কেন? কাল তো দিব্যি তুমি করে গেলেন।'

—'তুমির দিকে আমার বেশি পক্ষপাত। মনে যদি কিছু না কর তো এবার থেকে তুমিই কায়েমী হল।' মুচকে হেসে অবনী বললে।

—'বাঁচলুম। বেশি শ্রদ্ধা সম্মান পেলে হাঁফিয়ে উঠি। কিন্তু যা জিজ্ঞেস করলুম তার জবাব পাই নি এখনো।'

—'কি?'

—'কি দেখছিলেন এক মনে?'

—'তোমারই তো বলে দেবার কথা।'

—'আমি ভাল চা করতে পারি কিনা, চায়ের রং দেখে তা বিচার করার চেষ্টা করছিলেন।'

—'চায়ের ওপর আমার এত প্রীতি নেই।'

—'তবে?'

—'কি বল না।'

—'হার মানছি, বলতে পারব না।'

—'আচ্ছা হার মানবার দরকার নেই। আমিই বলছি। দেখছিলুম—।' একটু থেমে অবনী বলে ফেলে, 'কাপের ওপর তোমার লম্বা লম্বা মাধাসক আঙুলগুলোর খেলা।'

মীরার মুখখানা রক্তিম হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। চায়ের বাটি মুখে তুলে অবনী বললে, 'রাগ করলে মীরা?'

—'করব না?'

—'আচ্ছা, মাপ চাইছি।'

—'মাপ মিলবে যদি এবার আপনার গল্পটা সুরু করেন।'

—'আমার গল্প! না-হয় নাই শুনলে, মীরা। আমার ওপর তোমার যেটুকু শ্রদ্ধা আছে তাও হারাব।'

—'এমন অপলকা শ্রদ্ধা পেয়ে আপনার লাভ কি?'

—'সমাজে কেবল শুনেছি ছিঃ-ছিঃ। আত্মীয় স্বজন কারো কাছে কোনদিন শ্রদ্ধা পাই নি। তাই তোমাদের এই সম্বন্ধটা হারাতে চাই না। যদি বা এ মিথ্যে হয় হোক তবু সংসারে এমন মানুষও আছে যারা আপন জন কি তা জানে না। তাই মিথ্যে-আত্মীয়তা নিয়েও নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে ভালবাসে।'

—'ভূমিকা তো বেশ হল। এবার গল্প সুরু করুন। আপনারা এত আড়ম্বর ভালবাসেন। সার ছেড়ে ওপরটা নিয়ে এত মাতামাতি করেন।' মীরা হেসে বললে।

—'জীবনে শুধু সার সন্ধান করলে অনেকের অদৃষ্টে কেবল আঁটিই মেলে, শাঁসটা আর জোটে না। তোমরা জীবনে চাও কেবল যা স্পষ্ট, যা সোজা—ধরাছোঁবার মধ্যে। ভুলে যাও, শীতকালের সূর্যিওঠার মতন জীবনটাকে ঘিরে রাখে খানিকটা কুয়াসার সংকেত, তাকে বোঝা যায় না বলেই সংসার এত জটিল—এত বিচিত্র।'

—'তাবলে গল্পটাকে জটিল করে তুলবেন না যেন। হেঁয়ালি বোঝবার মতন ধৈর্য হয়ত শেষ পর্যন্ত থাকবে না।'

—'আমিও এতক্ষণ তাই ভাবছিলুম। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য তুমি রাখতে পারবে কিনা। আমি নিজেই একদিন রাখতে পারিনি।—যখন প্রথম সেই রহস্যের কথা শুনেছিলুম। নিজেকে দোষ দিই না। একুশটা বছর কেটেছিল সমাজের আশ্রয়ে। সমাজের শাসন বিচার না করেই মানতে শিখেছিলুম। একটানা মামুলি দিনগুলো কাটিয়ে কাটিয়ে ধারণা হয়ে গেছল, জীবন বুঝি তেমি সহজ। হঠাৎ ধাক্কা এল। কোলকাতার পাশে ছোট্ট গ্রাম—আধা সহর, আধা পাড়াগাঁ। পাড়াপড়শী মানুষগুলো সহরে উদারতাও পায়নি, আবার গ্রামের সরলতাও ভুলেছে। অদ্ভুত এই জীবজগত। সেইখানে ছিল আমাদের বাস। সামান্য মধ্যবিত্ত ঘর। টানাটানি করে সংসার চলে। কিন্তু একমাত্র সন্তান ছিলুম বলে বাপ মা কখনো অভাব কি তা জানতে দেননি। বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ একদিন বাবা মারা গেলেন।'

অবনীকে চুপ করতে দেখে মীরা বললে, 'তারপর?'

—'তারপর সমাজের সত্যিকারের রূপ দেখতে পেলুম। ক্রোশখানেক দূরে নদীর ধারে শ্মশান। বাড়ীতে একজন চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। মাকে সামলাবো, না,

পাড়াপড়শীদের খবর দেব। খবর পেয়ে অবশ্য একে একে মেয়েপুরুষ অনেকেই এলেন, কিন্তু মড়া ছুঁতে কেউ রাজি হন না। কেন—জিজ্ঞেস করলে কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেন না। অথচ কথার আভাষে জানিয়ে দেন, একটা কিছু যেন বাধা আছে। অনেকক্ষণ পরে জানতে পারলুম—।' একটু থেমে মনের দ্বন্দ্ব সামলে নিয়ে ও বলে, 'কথাটা সোজা করেই বলি মীরা। জানতে পারলুম, আমার জন্ম নাকি ঠিক সমাজের কড়া অনুশাসন মত হয় নি। পাড়াপড়শীদের আপত্তির কথা মা সব শুনলেন। আমার মন লজ্জায় ভরে গেল। কে যেন এক মুহূর্ত্তে আমার চারিদিকের বাতাস টুঁটি টিপে শেষ করে দিয়েছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দু-একজন সঙ্গী মিলল। তাঁদের সাহায্যে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে গেলুম। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সমাজের শেখানো সব কিছু শেষকৃত্য সেরে বাড়ী ফিরতে ভোর হয়ে গেল।—মার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।'

স্মৃতির প্রচ্ছদপটে অতীতের মরে-যাওয়া দিনগুলি যেন পুনরায় জেগে ওঠে। ঘরের হাওয়া গাঢ় হয়ে আসে। অবনী নিজেকে ভুলে যায়,—ভুলে যায় যে সে আজ কোলকাতায় তরুণী মীরার সামনে বসে গল্প বলছে। মীরার চোখদুটি অনুভূতিতে ছল-ছল করে আসে। সেই দরদী দৃষ্টির দিকে চোখ রেখে যেন অভিভূতের মত অবনী বলে যায়, 'ঘরের দরজা ভেঙে দেখলুম, মা শুয়ে আছেন, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ নীল হয়ে গেছে। বিপদের সময় মানুষের মনে আপনি বল আসে। মার শেষকৃত্যের জন্যে আবার প্রস্তুত হলুম। তাঁর হাতে জড়ানো ছিল একখানা চিঠি—আমাকে লেখা। সন্তানকে শেষ আশীর্বাদ দিয়ে জানিয়েছেন আমার জন্মরহস্যের ঘটনা। বাবা আর মারা কোলকাতায় কিছুদিন একই পাড়ায় থাকতেন। সেই সময় আমার জেঠামশায়ের [redacted] মার বিয়ের ঠিক হয়। দাদামশায় ছিলেন তখনকার দিনের ব্রাহ্মভাবাপন্ন হিন্দু। মার সঙ্গে জেঠামশাইকে মেলামেশা করতে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে জেঠামশাই বেঁকে বসলেন, বললেন, বিয়ে করব না। সন্ন্যেসী হব। শুনে প্রথমে তো সকলেই অবাক। পরে জানা গেল মার কলঙ্কের কথা। আমার বাবা তখন পড়তেন কলেজে। বড় ভায়ের অস্বীকার করা দায়িত্বের বোঝা তিনি মাথায় তুলে নিলেন—মার বিয়ে হল। চিঠিতে মা লিখেছিলেন, ভেবেছিলুম সমাজ করুণা করে হয়ত সেই পুরোনো কথা ভুলে গেছে, আমি বেঁচে থাকতে কথাটা তোমার কানে উঠবে না—এই ভরসা এতদিন করে এসেছি। হাজার হোক, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার যে মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। আজ তোমার মুখ দেখে বুঝেছি কত কষ্ট তুমি পেয়েছ। এর পর কি সান্ত্বনা নিয়ে তোমার কাছে বেরোব আমি। তাই শেষ করলুম এ যাত্রার খেলা। তবে এইটুকু মনে রেখ, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কোনদিন সমাজে তোমাকে জায়গা দেবার চেষ্টা করি নি। তোমার বাবা সব জানতেন—জেনে শুনেই তিনি আমাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।'

গল্প শেষ করে প্রকৃতিস্থ হতে ওদের সময় লাগে। মীরা প্রথম কথা বলে, "আপনার কাপে আর একটু চা ঢেলে দিই ?'

—'দাও।' কাপটা এগিয়ে দিয়ে অবনী ডাকলে, 'মীরা।'

চা ঢালতে ঢালতে মাথা না তুলেই মীরা বললে, 'কি বলছেন ?'

—'শুনলে, কেন আমি একলা একলা, নিঃসঙ্গে দিন কাটাই ? তুমি কতদিন জিজ্ঞেস করেছ, বিয়ে করি না কেন। আজ তার উত্তর মিলল ?'

—'কই না তো।'

—'আমাদের সমাজে এমন কে আছে আমার মত সমাজ-ছাড়া মানুষের ভার নিতে পাবে ?'

—'কোনদিন খুঁজে দেখেছেন কি ?'

—'খুঁজব। পাবার আশা থাকলে তবে তো মানুষ খোঁজে।'

—'তা করে সাধারণ মানুষেরা—জীবনে যারা কেবল সহজকে চায়,—যারা সাবধানে আঘাত এড়িয়ে চলে। আপনি তো তাদের দলে নন।'

—'না মীরা। আমি তাদেরই একজন। আঘাত পাছে পাই, এই ভয়ে কোন দিন মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি।'

—'বললে নিশ্চয়ই দেখতেন, এসে দাঁড়িয়েছে সে আপনার পাশে।'

—'আজ কি পাব সেই ভুল শোধরাবার অবসর? মুখ ফুটে তো বলতে আমি পারব না কিন্তু একজন কি এতদিনেও আমার মনের কথা জানতে পারেনি!'

—'উহু—হুঃ! দিলেন তো হাতটা পুড়িয়ে?' মীরা নিজের কাপে চা ঢালছিল। অবনী তার হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করতেই কেৎলিটা টেবিলের ওপর পড়ে গেল।

—'চাটা সব পড়ে গেল।' মীরা বললে, মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।

—'পড়ে গেল না তুমি ইচ্ছে করে ফেলে দিলে?' অবনী ক্ষুণ্ণ মনে জবাব দেয়।

সারাদিনটা তাড়াতাড়ি কেটে যায়। মীরার পৃথিবীর রংটা যেন অকস্মাৎ বদলে গেছে। সব জিনিস তার কাছে নতুন ঠেকছে—এতদিন এমনিভাবে যেন এদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। তার চলনে এসেছে ক্ষিপ্রতা—অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গের চাঞ্চল্য।

রাত্রে ঘুম আসে না। চিঠিখানা বারবার পড়েও ওর আশা মেটে না। বিকেলে অফিস থেকে ফেরবার পথে মার শরীর কেমন আছে খোঁজ নেবার ছলে অবনী এসেছিল, —বসেনি। হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়েই চলে যায়। ও যে এতটা ভুল বুঝেছিল, মীরা তা ভাবেনি। ও লিখেছিল, মীরা, তুমি গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে হেঁয়ালির মত হয়ে রইলে। তোমার মনে ঢোকবার রাস্তা আজো পেলুম না। মানুষকে ভালবাসলে যে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়, এর আগে তা জানতুম না। আজ সকালে যে আঘাত পেয়েছি তা ভুলতে অনেকদিন সময় যাবে। যে কথার মধ্যে ছিল আমার জীবনমরণের প্রশ্ন, তা-ই তুমি হাসির ঢেউ তুলে উড়িয়ে দিয়েছ। আমি যা দিয়েছি, কারু কাছ থেকে তা ফিরে পাবার আশা কোনদিন করিনা, তবু কারো উপেক্ষাও যে সহ্য করতে পাচ্ছি না।

মীরা বুকের মধ্যে চিঠিখানা চেপে ধরে। হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্তের জোয়ার খেলে যায়। মনে মনে বলে, ভুল, ভুল। তোমরা এত অন্ধ তা কি জানি! আমি তো ছিলুম অহল্যার মতন পাষাণী হয়ে। কে আমাকে জাগালে —কে আমার শিরায় শিরায় প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে! আমার শুকিয়ে যাওয়া পৃথিবীকে কে আবার নতুন করে সৃষ্টি করলে! সকালে আমার হাসির মধ্যে কি সেই কথাই ধরা পড়েনি! তোমরা কেবল মুখের কথা শুনতে চাও। কান পেতে কি জীবনের সব কথা শোনা যায়। অন্তরের ভাষা বুঝতে হয় অন্তর দিয়ে। আজ নয়, অনেকদিন আগেই যে আমার যা কিছু সব তোমাকে দিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু সব কি মীরা দিতে পেরেছে! কথাটা ভাবতেই ওর মনে জিজ্ঞাসা ওঠে। আজ যদি অবনী ডাক দেয় মীরা কি যেতে পারবে তার সঙ্গে—মা, ভাই, তার এই সংসার ছেড়ে! মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দে ও কি ভরিয়ে দিতে পারবে অবনীর জীবন, যৌবন, ইহকাল এবং ইহকালের শেষে যদি কিছু থাকে তা-ও। ও সহজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে না। দ্বিজেনকে কোনদিন ও স্বামী বলে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেনি। আর আজ তিন বছর পরে পুনরায় কোন যোগসূত্রের সম্ভাবনা কল্পনা করাও ওর পক্ষে কঠিন। নীচ, ব্যভিচারী, লম্পট, অভদ্র!

সকালে মীরা ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সারারাত্রি ভাল করে ঘুম হয়নি। ও যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সমস্যার মীমাংসা করেছে। ওর শরীর যখন ছিল ঘুমে নিস্তব্ধ, মন তখন আপন খেয়ালে কাজ করে গেছে। অবনী,—অবনী,—ক্ষণে ক্ষণে ওর অবনীর কথা মনে পড়ছে! অবনীর মূর্তিতে ভরে রয়েছে ওর ঘর দোর, আকাশ-বাতাস। এমন করে আত্মভোলা হলে তো ওর চলবে না,—ও নিজেই নিজেকে শাসায়। নিয়তি ওকে বঞ্চিত করেছে, মানুষের-গড়া, অর্থহীন [illegible] ওর চারিদিকে সৃষ্টি করে দিয়েছে নিষেধের জাল। সংকীর্ণ ওর সংসারের গণ্ডী,—তার মধ্যেই জীবনের লেনদেন শেষ হোক। বৃহত্তর পৃথিবীর ডাক কেন ওর কানে আসে! নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ও তো ভুলেই গিয়েছিল,—

ভুলে-যাওয়া কামনার বন্যা কেন আবার ওর ক্ষুদ্র পৃথিবীর সীমারেখা মুছে দিতে চায়।

চা খেতে খেতে ও অন্যমনস্কের মত খবরের কাগজ-খানা উল্টে যায়। রান্নাঘরে উনুন কামাই যাচ্ছে, এখুনি ভাতটা চড়িয়ে দিতে হবে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল কাগজের পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা,—'ঢাকায় জমিদারের অদ্ভুত কীর্তি!' ও চমকে ওঠে। এক নিঃশ্বাসে খবরটা পড়ে ফেলে। পরশু দিন ওরই স্বামী সেই মেয়েটিকে বিধবা বিয়ে করেছে।

এক নিমেষে ওর সকল দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায়। পুরুষের পাপকে সমাজ বাধা দিতে পারে না,—মেয়েদের কাছে চায় আত্মবলিদান। পুরুষ সমাজপতিদের গড়া এই বিধান ওর জন্যে নয়। ও নিজেকে পেয়েছে প্রকৃতির হাত থেকে—সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ওর শিরায় শিরায়। ও নিজেকে সৃষ্টি করবে, প্রকৃতি যা রেখে দিয়েছে সম্ভাবনায় অসমাপ্ত তা ভরিয়ে তুলবে ও নিজের চেষ্টায়। ভোগে জীবনের আনন্দ নেই, ত্যাগেই আনন্দ—এ শিক্ষা ওর সংস্কারগত। যুগ যুগ ধরে স্বার্থরত মানুষের মিথ্যাবুলি বিশ্বাস করে কত নরনারীর জীবন নিষ্ফল হয়ে গেছে। অসংযত ভোগে আনন্দ না থাকতে পারে—কিন্তু আত্মনিপীড়নের মধ্যেও আনন্দ নেই। মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস ভরে আছে প্রবঞ্চনার কাহিনীতে। রাগে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় মীরা মনে মনে গর্জে ওঠে, সমাজ যদি ব্যক্তির দিকে না তাকায়, মানুষেরও প্রয়োজন নেই সমাজের দিকে তাকাবার।

কোন মানুষেরও বিচার করতে হলে সব চেয়ে বড় মাপকাঠি হচ্ছে জীবনকে সে গভীর করে নিতে পেরেছে কিনা। সংসারের দিকে দিকে যে দুর্নিবার রহস্যময় শক্তির বিপুল প্রকাশ, তার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছে কিনা। মানুষের গড়া বিধি কে অক্ষরে অক্ষরে মানল,—কে [illegible] না, তা দিয়ে তো মনুষ্যত্বের বিচার চলে না। মানুষের অন্তরটিকে নিয়ে কবে কোন্ গোষ্ঠীপতি শান্তভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

গতানুগতিক, লঘুপক্ষ, চঞ্চল যে পঙ্গপাল সমাজকে আশ্রয় করে আছে,—তারা মানুক। অপরের শাসন মানতেই তারা জন্মেছে। কিন্তু তাদের গোষ্ঠির বাইরেও মানুষ আছে, তারা জীবনকে নিয়ে খেলা করে অপরের তত্ত্ব নির্ণয়ের উপাদান যোগাতে চায় না, তারা ভোগ করতে চায় দুনিয়ার আনন্দকে,—বুক দিয়ে বুঝতে চায় জীবনের রহস্যকে। সমাজ যদি তাদের দূরে ফেলে দিতে চায় দিক, তবু এই সমাজের সেবাতেই তারা ব্যগ্র হয়ে থাকবে। বাধা যদি আসে আসুক, অত্যাচার যদি সইতে হয় হোক। অপরের পীড়নকে তারা ভয় করে না—ভয় করে আত্মনিপীড়নকে। যুগে যুগে আমাদের সভ্যতার ঝড় ঝাপটা এরাই মাথা পেতে নিয়েছে। মাথা পেতে নিয়েছে বলেই গতানুগতিক মানুষদল বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পেরেছে। মীরা ভাবে, জীবনকে ভরিয়ে দেবার জন্যে ও দুঃসাধ্য মূল্য দেবে। এই মূল্য দিতে গিয়ে ওকে যদি ক্ষতবিক্ষত হতে হয়, তার মধ্যেও আনন্দের অনুভূতি আছে, তবু এই নির্জীবের মত বসে বসে অবমানকর হীনতার মধ্যে ও আর থাকতে পারবে না। ওর চারিদিকে পৃথিবী মেলে দিয়েছে তার ধন সম্পদ—ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে চলেছে সৃষ্টির বিচিত্র লীলা; আর ও বসে থাকবে পলে পলে বিন্দু বিন্দু আত্মহত্যার দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে। কেন ওর এই দুর্দ্দশা, ও নিজে কি কোন অন্যায় করেছে!

উত্তেজনার আবেগে মীরার মন থেকে মা-ভাই-এর কথাও মুছে যায়। অপরের প্রতি কর্ত্তব্যকরার মানে হয় যখন মানুষ নির্বিবাদে নিজের প্রতি কর্ত্তব্য করতে পারে। তা না হলে এ তো শুধু পরাধীনের আত্মবঞ্চনা। নিজের বিকাশকে যে মানুষ পূর্ণতর করে তুলতে পারে সেই তো সমাজের সবচেয়ে বড় সেবা করে—একটি একটি ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমাজ। ব্যক্তিত্বের যদি মরণ হয় তবে সমষ্টির স্ফুরণ হবে কেমন করে।

'মীরা তুমি মোটে ভেবে দেখনি—ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছ।' অবনী কৃত্রিম শান্তভাবে বলে, 'হিন্দু আইনে তো মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিয়ের বিধান নেই। আমাদের তা হলে মুসলমান হয়ে তারপর শুদ্ধি হতে হবে।'

—'কেন সমাজকে আমরা ঠকাতে যাব কেন? কৌশলে

নিজেদের রাস্তা সহজ করে নেব ? তার চেয়ে বরং যা সত্যি তাকেই আঁকড়ে থাকি। দুঃখ তাতে আসে আসুক, তবু নিজেদের কাছে আমরা খাঁটি থাকব। সমাজ যদি আমাদের কোন পথ ঠিক করে না দিতে পারে, সমাজের বাইরেই আমরা থাকব। মানুষের পড়া দুটো মন্ত্র না-হয় নাই পড়া হল।'

—'দেখ, এত কথা বলছি বলে মনে কর না যে আমার কোন আপত্তি আছে। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্ব নেবার আগে আমাদের দুজনেরই ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। সংসারে পদে-পদে যখন কাঁটা বিঁধবে তখন যেন এই বলে নিজেদের ধিক্কার দিতে না হয় যে ভুল করেছি।'

—'অনেক ভেবে তবে আমি মন স্থির করেছি। মনে কোন সন্দেহ থাকলে এমন ভাবে আজ সকালে কারোকে না বলে তোমার এখানে চলে আসতে পারতুম না। জানি, মাকে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে—সত্যি কথাই বলব। এখন তোমার নিজের মনের সঙ্গে বোঝা পড়া করে দেখ। মনে কর না, বাড়ী ছেড়ে আমি চলে এসেছি, মুখ ফুটে তোমায় জানিয়েছি আমার ভার নেবার জন্যে, তাই আমায় দয়া করবে। জগতে কারো দয়া আমি সইতে পারি না—তোমারও না।'

—'আমার সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই; মীরা,—তোমার ভাবনাও আর ভাবছি না দেখ, একটা জিনিস বিশ্বাস করি, যত বাধাই আসুক তবু নিরাশ্রয় একেবারে হব না। জীবন যদি আমাদের হয়ে পড়ে অসহ্য, তবু বাংলাদেশে একজনের কাছে পাব অভয়। আমাদের মতন নিরাত্মীয় মানুষদের তিনি শুধু কবিতায় আপন করে নেননি, জীবনে স্নেহের আশ্রয়ও দিয়েছেন অনেককে। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের সন্তানদের কথা। সমস্ত সমাজের উপেক্ষার বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত হবে ?'

—'কেন, মিথ্যের মধ্যে দিয়ে তো তাদের জগতে আনব না। তাদের আমরা শেখাব সত্যকে আঁকড়ে থাকার মর্যাদাবোধ। জীবনে দুঃখ হয়ত পাবে কিন্তু এমন কঠিন মানুষ করে তাদের গড়ে তুলব যে সমাজের নিয়মকানুনের আওতায় তেমন মানুষ সহজে মিলবে না। তারাই তো হবে আমাদের সমাজকে দেওয়া সত্যিকারের দান।'

—'মীরা, তোমার মতন যদি মনের জোর আমার থাকত। চিরদিন তোমার এই শক্তির মর্যাদা রাখতে পারব কিনা এই ভাবছি। মাঝে মাঝে নিজের ওপর আমার অবিশ্বাস জাগে। ভুলতে পারি না, দুর্বলতা আমার রক্তের সঙ্গে গাঁথা। আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তিনি গ্লানির ভয়ে তার চরম দায়িত্ব অস্বীকার করে পালিয়েছিলেন। তাই জন্যেই তো সংসারের উপেক্ষার মধ্যে তোমাকে টেনে আনতে আমার এত কুণ্ঠা।'

অবনী মীরাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। মীরা চুপ করে শুয়ে থাকে। হয়ত কান পেতে শোনে তার প্রিয়তমের অন্তরের গুঞ্জনধ্বনি।

বাড়ীতে আসতেই সুরেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ ?'

—'অবনীবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গেছলুম।' মীরা বললে, 'তুমি কখন এলে দাদা ?'

—'এই তো প্রায় আধঘণ্টা হবে। অবনী আছে কেমন ?'

—'ভালই আছেন।' মীরা জানে সুরেন তাকে এমন কোন প্রশ্ন করবে না যা অমর্যাদাকর। তাই নির্ভয়ে সত্যি কথাই বলে।

সুরেন যেন একটা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চায়। ভাবভঙ্গীতে দু-একবার কথাটা পাড়বার চেষ্টাও করে কিন্তু তেমন সুযোগ হয় না।

সাড়ে চারটে বাজতেই মীরা টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখলে—আজ সারা দুপুর বসে বসে অনেক রকমের খাবার তৈরি করেছে। সুরেনকে বলেছিল, সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে। ও জানে, সুরেন ওর কথা এড়াতে পারবে না—সংসারে এই দুঃখী বোনটিকে সুখী করতে পারার মতন আনন্দ আর কিছুতেও পায় না। মীরা আজ একখানা ভাল কাপড় পড়েছে। কে জানে হয়ত দাদাকে আজ জীবনে এই শেষ চা-খাওয়ানো। দশটায় গাড়ী হাওড়া থেকে ছাড়বে। মোড়ের মাথায় অবনী ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা

করবে। সব ঠিকঠাক। মার সেবা করে ওর যেন আজ আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিছানা ছেড়ে দেয়,—গায়ের চাদরটা বিছিয়ে দেয় ভাল করে, মাথায় পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বসে। কখনো বা বাড়ীটার চারিদিকে মীরা অকারণে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই ঘরগুলোর সঙ্গে তার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কাল এইখানে এরা এম্নি থাকবে—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্প না হয়। কলতলায় ছর-ছর করে খোলা পাইপ থেকে জল পড়ছিল। মীরা ব্যগ্রভাবে তা বন্ধ করে দিলে। এ কথাটা ও বারবার না ভেবে থাকতে পারছে না—কাল এখানে সবই থাকবে কিন্তু ও থাকবে না। আর যদি কখনো বাড়ীতে ঢুকতে পায়, ও কি আর আজকের অধিকার নিয়ে আসতে পারবে। ওঃ, যদি পদ্যের মিল করতে পারতুম, দিতুম একটা দু-পাতা-ভর্তি কবিতা লিখে। আপন মনে মীরা হেসে ওঠে।

খেতে বসে অবসর বুঝে সুরেন বলে, 'মীরু, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

—'আমারো তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দাদা।'

মীরার নিরুদ্বেগ হাসিখুশি ভাব দেখে অবনী অবাক হয়ে যায়। ও জানে, মীরা নিশ্চয়ই কাগজে সব পড়েছে। তবু ওর মনে এত খুশি কিসের। বলে 'কিরে, বল না।'

—'সত্যি কথা বলবে তো। তুমি পাটনায় যাওনি, গেছলে ঢাকায়। ঠিক কিনা? আমি কাগজে সব পড়েছি। আমাকে না জানিয়ে তোমার এমনভাবে যাবার কি দরকার ছিল দাদা? আর কি আশাতেই বা তাদের পায়ে ধরতে গেছলে?'

—'তখন অতটা বুঝিনি। মনে ভেবেছিলুম, অন্তত বিয়েটা যদি আটকাতে পারি তবু একদিন হয়ত আবার তোদের দেখাশোনার রাস্তা খুলে যেতে পারে। কিন্তু আমি পৌছুবার আগেই সব কাজ হয়ে গেছল।'

—'ছিঃ, দাদা, তুমি আমাকে এত নীচ ভাবতে? টাকার লোভে কোনদিন ওদের সংসারে আবার আমি ঢুকতুম?'

—'টাকার লোভে কেন মীরু? সংসারে মানুষে মানুষে মনোমালিন্যও হয়, আবার মিলিত হয়। তাইতো আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু, ও যে এত বড় নীচ শয়তান তা আমার ধারণা ছিল না।'

—'মানুষকে বড় ভাববার তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা।'

—'রাগ করছিস?'

—'করব না? তখন যদি আদালতে যেতে দিতে তাহলে আজ এতবড় অপমান চুপ করে সহ্য করতে হত না। ও নিশ্চয়ই ভাবছে, আমি ওর টাকার লোভেই এতদিন বসেছিলুম, আজ বিয়ে করে ও আমায় খুব জব্দ করেছে।'

—'ছ্যাৎ। তুই সব জিনিসকে বড় একরোখা ভাবে দেখিস। মেয়েপুরুষের অধিকারের তর্ক তোর মন থেকে ঘুচতে চায় না।'

—'আচ্ছা, দাদা?' মীরা একটু অন্যমনা হয়ে বলে।

—'কি রে?'

—'তোমার ভগ্নিপতি তো স্ত্রী বর্তমানেও আর একটা বিয়ে করলেন, তা তোমাদের সমাজ কিছু বলবে না?'

—'বিধবা বলে একটু-আধটু প্রথম প্রথম হাঙ্গাম হতে পারে তবে শাস্ত্রসম্মত বিয়ে যখন করেছে তখন বিশেষ কোন গণ্ডগোল হবে না।'

—'আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে?'

—'কি বল্ না।'

—'আজ বাড়ী এসে যদি শুনতে তোমার পাগলী বোন আর বাড়ীতে নেই, সে তার জীবনের সঙ্গী পেয়ে গেছে, তাহলে সমাজ কি তোমাদের একঘরে করত না?'

—সুরেন কোন কথা বলে না।

—'কি, দাদা, জবাব দিলে না যে?' মীরা জিজ্ঞেস করলে।

—'কি জবাব দেব মীরু? আমাদের সমাজে মেয়েদের সব অধিকার নেই তাতো জানি।'

—'ধর যদি কোনদিন সমাজের সেই মিথ্যে মুখোস ভেঙে দেবার চেষ্টা করে তোমার বোন?'

—'এ কথার জবাব দিতে পারব না। কারণ তুই ছাড়া আমাদের এ বাড়ী কল্পনা করতে পারি না।'

—'তোমরা তো এই করে আমাদের ভুলিয়ে রাখ।

কানে কানে কেবল শোনাও, আমরা অন্নপূর্ণার জাত, শ্রীহীন সংসারে আত্মত্যাগ দিয়ে শ্রীকে জাগিয়ে তুলি। কিন্তু আমাদের মধ্যেও একটা মানুষ তার কামনা, বেদনা নিয়ে জেগে থাকে।'

—'তা তো জানি। কিন্তু এ কথাও সত্যি, সব মানুষ এক নয়। সংসারে হাটের ভীড় সকলে সহ্য করতে পারে না। এ জগতে সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর মন নিয়ে আমার অনেক বিপদ, মীরু।'

—'বাধা, দুঃখ, অকারণ আঘাত নিয়েই তো জীবনের আনন্দ জড়িয়ে আছে।'

—'না, সকলের জন্যে সে আনন্দ নয়। এই কথাই তো আজ অবনীকে বলছিলুম।' সুরেন বলে যায়, 'খুব খানিকটা তর্ক হল। অফিস যায়নি,—বোট বাঁধছিল। বললে, অফিসের কি কাজে দু-চার দিনের জন্যে পশ্চিমে যাচ্ছে। আর একদিন আর একজনকেও ঠিক এই কথাই বলেছিলুম।' স্মৃতির পটে হয়ত কার মূর্তি ভেসে ওঠে, সুরেন ক্ষণকালের জন্যে অন্যমনা হয়ে পড়ে।

—'কাকে, অতসীকে?' মীরা জিজ্ঞেস করলে।

—'হাঁ। পাকা দেখার তিনদিন আগে দেখা হয়েছিল। বললে, এখনো সময় আছে। আমি বললুম, না, বিয়ে করে আমরা সুখী হতে পারব না। তুমি যে পথে চলেছ, আমাদের স্মৃতি একেবারে মুছে দিয়ে সে পথে যাও। তা না হলে দুঃখ পাবে।'

—'কিন্তু অতসী তোমায় সত্যি ভালবাসত।'

—'ভালবাসত বলেই তো বিয়ে হল না। এ নিয়ে অনেক ভেবেছিরে। ও বড়লোকের মেয়ে চিরকাল ভাল ভাবে মানুষ হয়েছে। বরাবরই ওর টাকার দিকে ঝোঁক। আমি তো কোনদিন এত টাকা উপায় করতে পারব না যা দিয়ে ওর সেই কামনা মিটতে পারত। বিয়ে করলে ও হত অসুখী আর আমিও সুখী হতে পারতুম না। কারণ ওর চাপা অনুকম্পা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতুম না।'

—'বাবা! তোমরা এত সূক্ষ্ম জিনিষ নিয়েও মাথা ঘামাও।'

—'সেই কথাই তো তোকে বলছি। আমরা যে এমনি সূক্ষ্ম মন নিয়ে জন্মেছি। অতসী বিদায় নেবার আগে বললে, আমি তো বিয়ে করছি, তাহলে তুমিও বিয়ে কর। তোমাকে অসুখী দেখে যে আমি একটুও শান্তি পাব না। বললুম ভুল করছ অতসী। সংসারে একদল মানুষ জন্মায় তাদের মনের গড়ন এত সূক্ষ্ম—এত স্বতন্ত্র যে জীবনে কারো সঙ্গে বনিয়ে চলতে তারা পারে না। এত স্পর্শকাতর তারা, যে যাকে ভালবাসে তার সামান্য গরমিলও তাদের অসহ্য মনে হয়। সংসারী হবার জন্যে তারা নয়। মীরু, ভুল করবি তুই, যদি ভাবিস্ ন্যিজেন না হয়ে আর কারো সঙ্গে বিয়ে হলে জীবনে সুখী হতিস। জীবনের সুখ তোর জন্যে নয়। সংসারে এমন কজন সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষ আছে যে তোর এই মনের সত্যিকার সন্ধান পাবে।—কে তোর মর্যাদা বুঝবে।'

—'দাদা, জন্মিছি আমি শক্তি নিয়ে। জীবনে যে সমস্যা উঠল আমার মত মেয়েও যদি তার মীমাংসা করতে পিছিয়ে যায় তাহ'লে এ সংসার এগোবে কি করে?'

—'জীবন তো আর আধুনিক উপন্যাসের প্লট নয়। মীমাংসা করার চেষ্টা করলেই এখানে সমস্যা শেষ হয়ে যায় না। তোর এই মনকে তুই মারবি কেমন করে। শুধু একটার মীমাংসা করতে গিয়ে আরো দশটা সমস্যা খুঁচিয়ে তুলবি। মীরু, মনে রাখিস, নিজেকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে সংসারে অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।'

ঘড়িতে দশটা বাজল। মীরা আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। মোড়ের মাথায় এতক্ষণ অপেক্ষা করে হয়ত অবনী হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত ও আসেই নি, ও যে কত দুর্বল, তা তো মীরা জানে। তাছাড়া মীরা যেমন করে ওকে ভালবেসেছে তেমন করে ও তো মীরাকে ভালবাসতে পারেনি। পুরুষ ও,—নূতনত্বের রোমাঞ্চের প্রলোভন ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মীরার কাছে এ যে ছিল জীবনের গূঢ়তম সমস্যা। সমাজের অবজ্ঞার চাপে দুদিনেই ওর হয়ত রোমাঞ্চের তৃষ্ণা মিটে যেত। কিন্তু মীরার অদৃষ্টে তখন—!

'দাদা, জীবনকে তুমি আমার চেয়ে ঢের গভীর করে বুঝেছ।'—মীরা মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। নিঃশব্দে ঘরে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, টিক, টিক, টিক।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ-দর্শন

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ব্যাপি আছে চারিধার,
নিরাশায় বাঙ্গলার হৃদয়-শ্মশান।
মালঞ্চে না ফুটে ফুল, শুষ্ক মৃত তরুকুল
পাখী সব ভয়াকুল, নাহি গায় গান।
বাঙ্গলার নরনারী, শবাকার দেহধারী,
নীরব নিশ্চল নাহি প্রাণের স্পন্দন।
হেন কালে তুমি এলে, ধ্যানযোগে কি লভিলে
"বন্দেমাতরম্" মন্ত্র মৃত-সঞ্জীবন।

আলোক উঠিল ফুটি, তন্দ্রাঘোর গেল টুটি,
নিমেষে পাইল সবে নূতন জীবন।
হে বঙ্কিম, তুমি ধন্য, দেশএকতা অগ্রগণ্য,
তব মন্ত্রে ভারতের নবজাগরণ।
দেশ শুধু মাটি নয়, হেরে সবে প্রাণময়,
জননীর রূপ ধরে সম্মুখে সবার।
মাতার বন্দনাগীতি, জাগায় হৃদয়ে প্রীতি,
ঐক্যসূত্রে দিল গাঁথি মিলনের হার।

ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ, খুলে ফেল মোহবন্ধ,
আঁখিভরে দেখ চেয়ে কিরূপ তাঁহার,
দশদিক আলো করি, দশপ্রহরণ ধরি',
সিংহসমাসীন মূর্ত্তি দশভুজা মার।
অশুভ দনুজ নাশি, মুখে মৃদুমন্দ হাসি,
সন্তানের তরে করে আছে বরাভয়,
বাহুতে আনিল শক্তি, হৃদয়ে উছলে ভক্তি,
নবীন উৎসাহ প্রাণে হইল উদয়।

বীণাপাণি কমলার, বহে ধারা করুণার,
জ্ঞানালোক সমৃদ্ধিতে উজ্জালিবে দেশ।
ওই দেবসেনাপতি, সিদ্ধিরূপী গণপতি,
ঘুচিবে অচিরে যত দৈন্য-দুঃখ-ক্লেশ।
স্বাস্থ্যসুখে বীর্য্যবান, জাগিবে দেশের প্রাণ,
সুজলা সুফলা বঙ্গে গোলাভরা ধান,
—সে দিন আগত প্রায়, দীপ্ত নবগরিমায়,
সবে মিলে গাহ আজ আনন্দের গান।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

শরতের বাণী

কমলরাণী মিত্র

শরতের বাণী নিলীম-গগনে,
শরতের বাণী স্বচ্ছ-সরে,
শরতের বাণী জ্যোৎস্না-রাকায়,
অমল শুভ্র সূর্য-করে।

কাশের গুচ্ছে, শেফালিমালায়
সে-বাণী দুলিলো ছন্দ-দোলায়,
সে-বাণী শুভ্র লঘু মেঘে-মেঘে,
ভাসিলো সুদূর-দিগন্তরে॥

সঘন-সবুজ কচি তৃণে-তৃণে
জাগিলো সে-বাণী—বিমল হাসি,
প্রভাতে, তপনে, চন্দ্রে, স্বপনে,
রূপ-আনন্দে উঠিল ভাসি';—

কেলি-কহ্লার, বিকচ-কমলে
ফুটিল হর্ষে নভে, থলে, জলে,
ফুটিল তোমার আমার কণ্ঠে
মধু-মিলনের স্বয়ম্বরে॥

কবিতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার পিছনে কেন দাঁড়ালে এসে
সকল ছন্দ মোর গেল যে ভেসে।
কবিতা রচিতেছিনু আপন মনে
আসিয়া দাঁড়ালে তুমি এমন ক্ষণে।

কথার মালিকা মোর গেল যে ছিঁড়ে
পরাব ভেবেছি যাহা কণ্ঠ ঘিরে।
ছিন্ন ছন্দ—সুতা,—টুকরো কথা
মাটিতে ছড়াল ফুল—ছিঁড়ল লতা।

চপলা কবিতা কোথা পালাল চুপে
পিছনে দাঁড়াল কিগো নবীন রূপে?
মিশিল ছন্দ মোর অঙ্গে তব
ছুটিল ঘরটি ভ'রে গন্ধ নব।

লুকাল যতেক ভাষা তোমার মুখে
লুকাল সকল ভাব তোমার বুকে।
কবিতা লুকিয়ে গেল তোমার মাঝে
কাব্য রচনা করা আর কি সাজে?

আজকে পড়িয়া থাক্ ছন্দ গাঁথা
শূন্য পড়িয়া থাক্ খাতার পাতা,
তোমার কবিতা রূপ নয়ন ভরে
দেখিব আজকে সারাদিনটি ধ'রে।

হে মোর কবিতা প্রিয়া, নতুনতর
কাব্য তুমিই এক রচনা কর।
আমার অধর 'পরে অধর রেখে
নতুন কবিতা এক দাও গো এঁকে।

হাসির হিলোল তব ছন্দ হবে
কথার মতন চুমা ফুটিয়া রবে,
মোদের দোঁহার, প্রিয়া, অমর প্রেমে
মূরতি ধরিয়া ভাব আস্‌বে নেমে।

ক্ষরিবে কাব্য-সুধা ওষ্ঠাধরে
অমৃত করিব পান হৃদয় ভরে,
ছন্দ থামিয়া যাবে থামিবে কথা
কবিরে জড়ায়ে শুধু কবিতালতা।

চিত্রশিল্পে হিন্দু মুসলিম সঙ্গম

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

হিন্দু মুসলমান সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত মেঘপটল সৃষ্টি করছে অশান্ত উত্তেজনার। সাময়িক সুবিধাবাদ চিরন্তন সমন্বয়ের সংহতিকে শিথিল করতে বার বার উৎসাহিত হচ্ছে। এ সময় একবার ইতিহাসের হিসেব নিকাশ দরকার। রূপ রচনার সুরম্য ক্ষেত্রে এ দুটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় যে অবিনশ্বর মিলন কাহিনী রেখে গেছে তাকে মুছে ফেলা অসম্ভব। মোগল জাতি পারিপার্শ্বিক সমাজের সহিত সখ্যস্থাপনে চিরকালই উৎসুক। গুণী ও বিজ্ঞানের সমাদর, ধীর ও বিচক্ষণের শ্রদ্ধা দ্বারা এদের শাসন দৃঢ়ীভূত হয়। চীনদেশে কোবলা খাঁ চীনের কবি ও শিল্পীদের আহ্বান করে' এক রসচক্র সৃষ্টি করেন। ভারতের মোগল বাদসাহেরাও প্রতিভাশালী শিল্পীদের সংগ্রহ করে' এক নূতন কলাচক্রের সূচনা করেন।

এসব সৃষ্টির ভিতর কোন ধর্ম্মগত বৈষম্য মুখ্য ব্যাপার হয় নি। বস্তুতঃ প্রাচীন মোগল ও রাজপুত চিত্রকলার ইতিহাস অতি বিচিত্র এবং কৌতুকপূর্ণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাইতে মনে হয় হিন্দু মুসলিম সমন্বয় সৌন্দর্য্যক্ষেত্রে এমন সহজ ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল যা আধুনিক যুগের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার।

মোগল চিত্রকলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক। অনেকের বিশ্বাস মোগল চিত্রকলার প্রধান চিত্রকরগণ নিশ্চয়ই মুসলমান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলিম রচনায় হিন্দুরা শুধু অগ্রগামী নয়—তারা শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। একথা কি বিস্ময়ের বিষয় নয়? অপর দিকে হিন্দুর রাজপুত চিত্রকলায় অনেক সময় মুসলমান চিত্রকরগণই শ্রেষ্ঠতর শিল্পী এটাও কি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? কাজেই

দীপালী

শিল্পী—সৈয়দ মির্জ্জা সাহেব

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

ভারতীয় ইতিহাসের রূপ রচনার অধ্যায়ে হিন্দু মুসলমানের এই সমন্বয় একটি বিশিষ্ট আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ছে।

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে সতের জন চিত্রকরের উল্লেখ করেছেন। তার ভিতর তেরজন হিন্দু ও চারজন মুসলমান। Waquiat-I-Babariতে বাইশ জন চিত্রকরের নাম আছে—তার ভিতর উনিশ জন হিন্দু এবং তিনজন মুসলমান। আইন-ই-আকবরীতে যে সব হিন্দু

উত্তরার্জ্জুন
শিল্পী—আবদুর রহমান চুঘতাই

চিত্রকরের নাম আছে তাদের নাম হচ্ছে—দাসবন্ত, বাসোয়ান, কেশব, লাল, মুকুন্দ, মধু, জগন্নাথ, মহেশ, ক্ষেমঙ্কর, হরিবংশ ও রাম। এরা মোগল চিত্রকলার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। কাজেই মুসলিম চিত্রকলায় এক সময় হিন্দুরাই প্রধান ছিল—একথা স্বীকার করতেই হবে।

মিঃ কড্রিঙ্টন (Codrington) বলেন: "Dasawant disputed with Basawan the first place among the painters of Akbar's court. In a short time he surpassed all painters and became the first master of the age" † কাজেই দেখা যাচ্ছে চিত্রকলায় এক সময় হিন্দুরা মুসলমান বিষয় নিয়ে চিত্র রচনা করে' শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। "Rama nama" ১৫৮৮ সালে রচিত হয়। এটি হচ্ছে পারস্য ভাষায় মহাভারত। বহু মুসলমান চিত্রকর এই গ্রন্থের চিত্র রচনা করে' যশ আহরণ করেছে। এ বই জয়পুর রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। "তাইমুর নামা" গ্রন্থ ১৫৮৫ সালে লিখিত হয়। এই গ্রন্থের ছবি মধু ও তুলসী নামক চিত্রকরের রচনা। ইহা বাঁকিপুরের Oriental Libraryতে রক্ষিত আছে।

১৫৬০ সালে লিখিত বাহারীস্থান গ্রন্থের বহু চিত্র বাসোয়ানের রচনা। ১৫৬৭ সালের আকবরনামা গ্রন্থের চিত্রাদি বাসোয়ান ও ছত্তর রচনা করে। কাজেই এ সমস্ত বিখ্যাত মুসলমান আমলের সচিত্র প্রবন্ধাদি হিন্দুচিত্রকর দ্বারা সুসম্পন্ন করা হয়েছে। বস্তুতঃ রূপশিল্পক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন ওঠেনি—এমন কি এই দুটি বৃহৎ সমাজের ভিতর এক অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছে। বহুলোকের এই পরম বিস্ময়জনক তথ্য জানা নেই। মোগল চিত্রকলা (Mogul painting) বলতে সাধারণত সকলেই মুসলমান চিত্রকরগণের রচনা বলে মনে করে। একথা অমূলক—এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। হিন্দু শিল্পী কল্পনার জাল সৃষ্টি করে মুসলমান চিত্রের বহুমুখী ভাবকে এমন ভাবে রূপায়িত করেছে যাতে হিন্দুমুসলমানে পার্থক্য বোঝা মুস্কিল। অনেক সময় মুসলমান চিত্রকর অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চিত্রাদি রচনা করে হিন্দু শিল্পীরা এক পরম সমন্বয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করেছে। দাসবন্তর খ্যাতি সমসাময়িক যুগে সকল শিল্পীদের হতপ্রভ করে দেয়।

অপরদিকে রাজপুত চিত্রকলার বহু রচনা মুসলমান শিল্পীর রচনা। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এজন্য এ শ্রেণীর চিত্রাদিকে "The so-called Rajput painting" বলেছেন *। তিনি বলেন: "What Dr Coomarswamy calls the Rajput school of painting is not a Hindu

† History of Indian Art. New Edition.

* Modern Review, October 1919

রাধাকৃষ্ণ

শিল্পী--আলাবক্স্

MON-ROOM

product nor has it any natural connection with Rajputana. The vassal Rajas of Moghul court used to enlist painters trained in the imperial court and employ them in painting scenes from the Hindu epics and romance and other subjects of purely Hindu character but the style and art-ideas of these painters are exactly the same as those of the painters employed by the Moghul court." স্যার যদুনাথ সরকার আরও বলেছেন—I have seen some beautiful and genuinely old Indo-Saracen Hindu pictures which represent the elders of Mathura dressed and armed like Mughul courtiers going out to meet Krishna" *

এমনি ভাবে রাজপুত চিত্রকলায় বহু মুসলমান শিল্পী নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য রচনা ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। সকলেই এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে মুসলমান চিত্রকরও ভারতের অধ্যাত্ম প্রেরণায় উপদিষ্ট হয়েছে। এ জন্য মুসলমান শিল্পী হিন্দুদের দেবমূর্ত্তি রচনা করতে গিয়ে সফল হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের প্রাচীন ধারাতেও এই সম্মিলন অক্ষত আছে। বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন সরা-অঙ্কন শিল্পের বহু শিল্পী মুসলমান। এসব শিল্পী অতি চমৎকার দেবমূর্ত্তি রচনা করে' সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে এসেছে।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় সুখ সুবিধা লাভের কলহ সাময়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। তবুও ভারতের রম্যকলাক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য-সাধকের চিত্ত হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের প্রাচীন বার্ত্তাকে বারবার নবীন করে' তুলছে। এ প্রেরণা ভারতীয় শীলতার শ্রেষ্ঠ দান। বাইরে বিভেদের অগ্নিশিখা, ভিতরে মিলনের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম, এই বিপরীত ব্যাপার তাই বার বার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আধুনিক হিন্দু শিল্পীর মুসলমান বিষয়ক ও মুসলমান ধারার রচনা অতুলনীয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। আবার নব্য মুসলমান শিল্পীর হিন্দু বিষয়ক রচনা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় এবং সৌকুমার্য্যে বিস্ময়জনক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পি চিত্ত সাহজাহান ও নুরজাহান প্রভৃতি আঁকতে গিয়ে তাঁর চরম অর্ঘ্য দান করেছে। বস্তুতঃ হিন্দুর চিত্তেও মুসলমান শীলতার আকর্ষণ বারবার ঝড় তুলেছে। হিন্দুর মুসলমান বিষয়ক রচনা অসংখ্য বলতে হয়। এ সব রচনার ভিতরকার নিগূঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা ও প্রেমের সংস্পর্শ সকলকেই

ওমরখৈয়াম চিত্র
শিল্পী—উপেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

বিস্মিত করে'। মোগল সাম্রাজ্য বিষয়ক রচনা ও মোগল ধারার পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা হিন্দুরাই করেছে। এ দেশের শিল্পীদের ওমর খৈয়মের চিত্রপর্য্যায় অতি মনোহর হয়েছে। হিন্দুর পক্ষে এ রকমের সাধনা একটা নিবিড় সামাজিকতা ও সমন্বয়ের বার্ত্তা উদ্ঘাটিত করে। বিস্ময়ের বিষয় মহিলা চিত্রকরেরাও এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যিকার মুসলমান-শ্রীকে উন্মুক্ত করেছে। আধুনিক মহিলা শিল্পীদের ভিতর

* Modern Review October 1919.

শ্রীকৃষ্ণ ও সুদর্শনচক্র

শিল্পী—আলাবক্স

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবীর "সের আফগানের কবর" এ শ্রেণীর রচনা। সমগ্র রচনাভঙ্গী, রেখা বিন্যাস, বর্ণলেপ মোগলাই আমলের যুগকে রূপায়িত করে তুলেছে।

অপরদিকে মুসলমান চিত্রকরদের হিন্দু রচনা আরও বিস্ময়জনক। কৃত্রিম ও লঘুভাবে এসব সৃষ্ট হয় নি। একটা গভীর প্রীতি ও আন্তর আলোক না থাকলে মুসলমান শিল্পী এরূপ অসাধারণ রচনা করতে সাহসী হতেন না।

সের আফগানের কবর
শিল্পী—শ্রীহাসিরাশি দেবী

পঞ্জাবের আলাবক্স কাঙড়া কলার সহিত যোগ স্থাপন করে কৃষ্ণ চরিত্রের বহুমুখী সৌন্দর্য্য অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন নিশ্চয়ই। প্রাচীন রাজপুত ভঙ্গী হতে মুক্ত হয়েও শিল্পী শ্রীকৃষ্ণের রূপলালিত্য ও জীবন-শ্রী অধ্যয়ন করতে ইতস্ততঃ করেননি। তাতে করে' আলাবক্সের শ্রীকৃষ্ণচিত্রাদি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। শিল্পীর "সুদর্শন চক্র" একটি মনোহর রচনা। শিল্পীর "রাধাকৃষ্ণ" আর একখানি সফল সৃষ্টি। বস্তুতঃ এ চিত্রখানির সুকুমার গতিভঙ্গী শিল্পীর মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। এরূপ সূক্ষ্ম লালিত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে' পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী ও শ্রীরাধার রূপলালিত্য এই মুসলমান শিল্পীর তুলিকা যেরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে তা' সচরাচর দেখা যায় না। সমগ্র রচনাটিই হিল্লোলিত মাধুর্য্যে সকলকে সহজেই আশ্চর্য্য করে এ 'কি করে' সম্ভব হল? আবদুর রহমান চুঘতাই এযুগের নব্যভারতীয় চিত্রকলার একজন প্রধান শিল্পী। এই শিল্পী হিন্দু বিষয় ও ক্রীড়া নিয়ে নানা চিত্র এঁকেছেন। এক্ষেত্রে মুসলমান শিল্পী হিন্দুশিল্পীদের অপেক্ষা কম কৃতিত্ব দেখাননি। শিল্পীর রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে বহু চিত্র আছে। রামসীতা অঙ্কনেও চিত্রকর অসামান্য প্রতিভা দেখিয়েছেন। এসব চিত্রের পেলব আকর্ষণ ও সূক্ষ্ম রসসম্পাত সকলেরই উপভোগ্য। সুপরিচিত প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যক্ষেত্রেও শিল্পী নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবদুর রহমান চুঘতাইর উত্তরার্জ্জুন চিত্রখানি উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন মুসলমান শিল্পীর পক্ষে এ শ্রেণীর রচনা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার দিক হ'তে এ ছবিখানি একটা অসামান্য সৃষ্টি। এসব প্রাচীন ও নবীন ছবি দেখে বার বার মনে হয় ভারতের হিন্দু ও মুসলমান চিত্তের ভিতর অলক্ষিতে একটা পরম সঙ্গম হয়েছে। সেই সঙ্গমের অফুরন্ত উৎস হ'তে রূপকলা-ক্ষেত্রে এই সমস্ত অভাবনীয় সৌন্দর্য্যসৃষ্টি উৎসারিত হতেছে। বাঙ্গলাদেশে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের কৃতী শিল্পী সৈয়দ সাদিক আলী মির্জ্জাসাহেব "দীপালী" প্রভৃতি চিত্রের সাহায্যে হিন্দুর শীলতার প্রতি মুসলমানের প্রীতি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন।

এমনি করে' হিন্দু মুসলমান শীলতার স্নিগ্ধ সঙ্গম চিত্রকলার রঙীন প্রাঙ্গনে বার বার দীপ্যমান হয়ে এসেছে। মুসলমান শিল্পীর রূপস্বপ্ন হিন্দু সভ্যতার জাগ্রত আহ্বানকে স্বাগত সম্ভাষণ করেছে। বস্তুতঃ অন্যোন্যের প্রতি এই প্রীতি অতি স্বাভাবিকভাবে নিজের চেয়েও পরকে আপন ও মহার্ঘতর করেছে। অজানার অসীম রহস্যের সঙ্গে যখন সত্যিকার সম্পর্ক হয় তখন তা জানার সম্পর্ক অপেক্ষা

অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়। অপরিচিত আনন্দ একান্তভাবে স্বপ্নের মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়—তাকে রচনা করার আনন্দ অনির্ব্বচনীয় ও অসীম। এজন্য মুসলমান শিল্পীর হিন্দুচিত্র এরূপ মনোহর এবং হিন্দুর মুসলমানচিত্র এরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। এমনি করে' ভারতের অজ্ঞাত ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছে।

বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রেই জাতির আত্মনিবেদন সহজেই ধরা পড়ে। তাজমহাল সমগ্র জগতের উপভোগ্য সৃষ্টি তা' একান্ত ভাবে মুসলমানের ব্যাপার নয়। জাতি বা ধর্ম্মগত যবনিকা এসব ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে দ্বিখণ্ড করেনি। এই মিলনের বার্ত্তা ভারতের অতুলনীয় রূপজগৎ বিস্মিত করে' তুলেছে। কৃত্রিমভাবে এ সমন্বয়কে ভাঙ্গা এবং তাকে আবার সংহত করার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া একটা পরম পরিহাসের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

নক্সী কাঁথা

শ্রীতারাপদ মুখটী

আমার কিশোরী প্রপিতামহীর শুভ-পরিণয়-কালে
যেই কাঁথাখানি যৌতুকরূপে জুটেছে তাঁহার ভালে,
তার মৌরুসী দখল করেছি আমরা বংশধর
পৃথিবীর এই পান্থশালায় যা'রা এনু পর পর।
সে-পুরাকালের কল্পসাক্ষী পুরাণো কাঁথাটি আজ
তুলিতেছি গায়ে, পরম সোহাগে, খুলিয়া জড়ানো ভাঁজ;—
হেন কালে মোর কুণ্ঠিতা প্রিয়া প্রবেশি' শয়ন ঘরে,
ভ্রূ-বাঁকাইয়া বিদ্রূপ হাসি করিল গরব ভরে।
ভাব তা'র এই,—জীর্ণ, ছিন্ন, দুর্ব্বাস ও-ই কাঁথা
কোন্ সমাদরে তা'র মাঝে গুঁজি' রাখিনু সিঁথির মাথা?
বুঝেছিনু তা'র মরমের ভাষা তথাপি মৌন আছি।
'সরে শোও', বলি ঠেলি' দিয়ে বলে, 'গন্ধে নাহি তো বাঁচি?'
যৌবন তা'র অঙ্গ ছাপিয়া ডেকেছে রূপের বান;
কুশ্রী, ক্লিন্ন সব কিছু আজ তা'র কাছে হত ম্লান।
কাশ্মিরী শাল, বনাত, বাফ্‌তা, বালাপোষ, লুই, লেপ—
এসব নইলে কাটে না-যে শীত, মিটে না মনের খেপ!
কোথা ছিল আগে বাতশাহী সেই বিলাসী বসনরাশি
নবীনা বধূর সাথে সাথে আজি যারা চলে পাশাপাশি?

কাঁথাটি খুলিলে চোখে ভাসে মোর কত-যে কাহিনী গাথা,
মোদেরি মতন সুখে-দুখে রাঙা রঙিন্ জীবন পাতা!
গেছে তা'রা চলে! পূত পদ চিন্ কাঁথার সিকতা তটে
হয়েছে মলিন; কিন্তু বিলীন হয়নি সীবনী-মঠে।
দিদিমা-মাতার কত রূপকথা, গালভরা হাসি গান
এই কাঁথা তলে শুয়ে কত শিশু শুনেছে পাতিয়া কান!
তারপর তারা হয়ে গেছে বড়,—ভাইয়ে বোনে ছাড়াছাড়ি;
শূন্য আসর জমায়েছে আসি' কচি মুখ পথচারী।
বিরহিণী-প্রিয়া নয়ন-নিকষে পরখিতে পতি প্রেম,
ফেলিয়াছে দাগ কাঁথার অঙ্কে গলিত-অশ্রু-হেম।

কাঁথার মাঝারে অঙ্কিত ছিল হরধনু-ভাঙা-ছবি,
কোথা বা পুরাণ-আলেখ্যচয় শোভিছে জনম লভি'।
এদিকে মরাল কাটিছে সাঁতার পদ্মপাতার দলে
ওদিকে নবীনা কিশোরী ঘাটেতে কলসী দিয়েছে জলে
ভেসে গেছে ঘড়া, উঠি' লাজে ত্বরা দু'কর পসারি' তায়
ধরিতে এলায়ে ঋজু তনুখানি চকিতে পিছনে চায়!
অতীত দিনের পল্লীজীবনী কাঁথার ফলক ভরি'
খুদিয়া রেখেছে ভাস্কর সম আহা! কিবা কারিগরি!!
সেই ভাষা যেই পারে না পড়িতে, নাই যা'র সেই আঁখি,
তা'র কাছে এই পরশরতন কেমনে জীয়ায়ে রাখি?
পরিহাস তা'র বৃথা যায় দেখি গরজিয়া অভিমানে
কেড়ে নিয়ে কাঁথা ছুড়ি' ফেলে দিল মেঝের কঠিন শাণে।
উলুবনে যেন পড়িল মুক্তা—নাহি তা'র কোন দাম,
ক্ষমা-সুন্দর চোখ তুলি আমি প্রিয়া পানে চাহিলাম।
বলিনু তাহারে "শুনো গরবিণী এমনি মানের মালা
কত আছে গাঁথা এ' কাঁথার কোলে! আজি সুরু তব পালা।"

শ্রীতারাপদ মুখটী

পদ্মা: প্রমত্তা নদী

শ্রীসুবোধ বসু

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী জমিদার; পূজার সময় নৌকাপথে নিজ মহাল হইতে পদ্মার তীরবর্ত্তী স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। পদ্মার তখন ভাঙন সুরু হইয়াছে; রুদ্রমূর্ত্তিতে রাক্ষুসী নদী মাটি গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুর্গাপ্রসন্নের পত্নী চিরদিন স্নায়ুরোগ-গ্রস্তা। পদ্মার জন্য এক সুগভীর আতঙ্কে তিনি চিরকাল তটস্থ; পদ্মার এই মার মুর্ত্তি দেখিয়া এই স্নায়ুরোগগ্রস্তা এইবার ভয়ে বিকৃত-মস্তক হইয়া উঠিলেন। পদ্মার এই উন্মাদনা শুধু একজন মাত্র সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে লাগিল: সে দুর্গাপ্রসন্নের পুত্র রজত-প্রসন্ন, ওরফে রাজা। পদ্মার মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে; তাই এই শিশুপুত্র ঝড়ের পদ্মায় নৌকাডুবি উপভোগও করে, আবার প্রশস্ত উদারতায় পদ্মার মতই তার বুক পরিপূর্ণ। দুর্গাপ্রসন্নের বাড়ি এই প্রাণবন্ত বালক নিজের ব্যক্তিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই সময় পদ্মার আতঙ্কে অভিভুতা স্নায়ুরোগগ্রস্তা দুর্গাপ্রসন্নের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। কিছুটা পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য কিছুটা গ্রাম এবং নিজবাটী পদ্মায় অনেকটা বিলীন হওয়ার দরুণ দুর্গাপ্রসন্ন স্বগ্রাম ত্যাগ করিলেন, এবং পদ্মা হইতে কিছু ভিতরে খালপাড়ের এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আম্রবণ ক্রয় করিয়া সেখানে নতুন গ্রাম পত্তনে লাগিয়া গেলেন। যে-পদ্মা তাঁহার গৃহ হরণ করিয়া লইয়াছে তাহার জন্য এক অব্যক্ত আক্রোশে, তিনি নতুন গৃহ এবং গ্রাম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন—কোটালনগর তাহাকে দুর্ব্বার নেশার মত পাইয়া বসিল।

এই কোটালনগর রাজার নতুন বিচরণ ক্ষেত্র হইল। সর্ব্বত্র সে ঘুরিয়া বেড়ায়; সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সে পরিচয় করে; এবং নিজের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি এবং শিশুসুলভ নিরভিমান সরলতায় সকলকে সে মুগ্ধ করে: ছুতার মিস্ত্রীদের কাজ দেখিতে দেখিতে সে তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লয়। তামাকের সার্থকতা কি ভাবিয়া পায় না; সগর্ব্বে প্রচার করে থিয়েটারের বাড়ী প্রস্তুত হইলে সে সীন্ টানিবে। জেলেদের ছেলের সঙ্গে তার ভাব। আখড়ার বৈষ্ণবীকে সে বাৎসল্য রসে সিক্তিত করিয়া তোলে। মরা পাখীর জন্যে অত্যন্ত সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া সে তাহার সৎকার করিতে যাইয়া গৃহের একপ্রান্তে আগুন লাগাইয়া দেয়। ভূত দেখিবার ভয়মিশ্রিত আকর্ষণে বহুদিনের পতিত বাগানে ভাঙ্গা কালী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের কাছে যাইয়া রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে।]

নয়

দুর্গাপ্রসন্নের শরীর তেমন ভাল যাইতেছিল না। তবু কিন্তু তাঁর উৎসাহ এবং পরিশ্রমের বিরতি নাই। কোটাল-নগরকে তিনি স্বপ্ন-নগর করিয়া তুলিবেন, জগতকে তাক্ লাগাইয়া দিবেন; শ্রদ্ধা এবং কল্পনা থাকিলে জঙ্গলকে কি সুন্দর করিয়া তোলা যায়, তাহা দেখাইবেন। লোকেরা সম্মুখে বলিল—ধন্য, ধন্য ক্ষমতা, ধন্য বদান্যতা! এবং আড়ালে বলিল—পাগল, পাগল, আস্ত পাগল! কিসের নেশায়, কোন্ উদ্দেশ্যে, কি আক্রোশে দুর্গাপ্রসন্ন এই অদ্ভুত সৃষ্টিকার্য্যে মাতিয়াছেন, বাহিরের লোক তার কিছুই জানিল না। তিনি অর্থের মায়া করিলেন না, শরীরের মায়া করিলেন না,—এক দুর্নিবার শক্তিতে নতুন পৃথিবী গড়িতে লাগিলেন।

হৈমন্তী লিখিয়াছে—অম্বিকা-দার চিঠিতে জানিতে পারিলাম, তোমার শরীর তেমন ভাল যাইতেছে না। শুনিয়া আমরা অতিশয় চিন্তিত হইলাম। উনি বলিলেন যে এ অবস্থায় আমার অবশ্য যাওয়া দরকার। যদিও এখন কতগুলি জরুরী মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ত আছেন, তবু, বলি-লেন যে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একবার সময় করিয়া আমাকে কোটালনগরে পৌছাইয়া দিয়া আসিবেন। আমার চাইতে তোমাদের জামাইয়ের উদ্বেগ কম নয়; উনি বারবার

বলিতেছেন যে আমি গেলে তোমার আদর যত্ন হইতে পারিবে এবং অসুস্থ শরীরের পক্ষে সেবার প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশি।...আশা করি রাজা ভাল আছে ; আমাদের একমাত্র ভয়, ও একেবারে গেঁয়ো না হইয়া ওঠে। উনি তো প্রত্যহ একবার করিয়া ওকে এলাহাবাদে লইয়া আসিবার কথা বলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

'রাজা, তোর দিদি আসচে যে রে!' দুর্গাপ্রসন্ন রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন।

'দিদি? ধ্যেৎ! কবে?' রাজার দুই চোখ সামান্য অবিশ্বাস এবং প্রভূত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

'এই আট দশ দিনের মধ্যেই।' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

'ফাঁকি দিচ্চ না তো?' রাজা এক গাল হাসিয়া কহিল —'ঈস্, কী মজা রে; কতোদিন দিদি আসে না, না বাবা? জহর আর মিলিও আসবে, না? হি হি হি,— ভারি মজা হবে তো! মিলিটা বলে—মাম্ মা—হি হি— এখন বড় হয়ে গেছে, না?—

'তা হয়েচে বৈ কি।'

'লিখে দাও না, বাবা, আট দশ দিনের আগেই আসুক, নইলে কাঁচা আম আবার সব ফুরিয়ে না যায়; আম কুড়িয়ে কুড়িয়ে দিদি যা চমৎকার মাখতে পারে! দিদিকে দেখতে যেন মায়ের মতন, না?'

'হু।'

ইহার পর রাজাকে বাড়িতে ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইল। আশে পাশে যাহাকেই সে পাইল, তাহাকেই এমন উৎসাহের সঙ্গে এই অভাবনীয় ব্যাপারটা বিবৃত করিয়া শুনাইল যে ব্যাপারটা প্রায় বোধগম্যই হইল না। দাবাগ্নির মত রাজা এ-পাড়ায় ছুটিল, ও-পাড়ায় ছুটিল—তার দিদির আসিবার অমূল্য সংবাদটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে একটু মাত্র বিলম্ব হইল না।

'জানিস, আমার দিদি আসবে—জামাই বাবুর সঙ্গে; জামাইবাবু ব্যারিসটর সাহেব। আর জহর আর মিলি না, সারাক্ষণ কেবল—মামা, মামা। দেখাব অখন দিদিকে,— যা ফর্শা দেখতে, দেখিস অখন!

'শুনচেন, আমার দিদি না, এই আট দশ দিনের মধ্যেই এসে পড়বে; এবার ঠিক আসবে, দেখবেন। জামাইবাবু ব্যারিসটরি চাকরি করে কিনা, তাই—'ব্যারিসটরি চাকরি করে, এই কথাটা জানাইয়া দিবার জন্যই ব্যারিসটর কথাটার আমদানি করিয়াছিল; তাই কি, তাহা ঠিক রকম সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কহিল—তাই আসতে পারে না; তবে এবার আসবেই লিখেচে। জহর আর মিলি কেবলই বলে—মামা, মামা; এমন ভাল লাগে ওদের—'

সেদিন বিকালে রাজা খালপাড়ে হাঁটিতে গিয়াছিল। উৎসুক আগ্রহের সঙ্গে নৌকার পর নৌকা লক্ষ্য করিবার পর সে সম্পূর্ণ হতাশ হইল—একটামাত্রও ঘোম্‌টা-টানা বউ দেখিতে পাইল না। ঝাঁকি-জাল দিয়া কটা লোক মাছ মারিবার ফন্দিতে ছিল, কিন্তু মাছরা বুদ্ধি খরচ করিয়া জালগুলি এড়াইয়া গেল। তাই ওদিকেও রাজার আকর্ষণ রহিল না।

খালের জলে পাড়ের গাছপালা জঙ্গলের ছবি অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া কাঁপিতে থাকে; নলখাগ্‌ড়া বনের কাছটায় দু'একটা বক ধার্ম্মিকের মত বসিয়া মন্ত্র জপ করিতে থাকে—একটা মাছ ঠোঁটে ধরিয়া উড়ান দিলে তবে তাদের চেনা যায়; এমন চালাক—রাজা মনে মনে বলে। আর এই যারা নৌকায় দাঁড় বাহিতে বাহিতে সুর উঠায়, রাজার বড় ভাল লাগে তাদের; ওদের গান শুনিলে মন যে হু-হু করিতে থাকে; ওদের সঙ্গে অনেক দূরের সব দেশে যাইতে ইচ্ছা হয়— নদীর আর সমুদ্রের সুর যেন এই গানগুলির সঙ্গে জড়ান আছে, মনটা কেমন করিয়া দেয়। এই অপূর্ব্ব ধূসর পথ দিয়া ঘোমটা-টানা বউয়েরা কোন্ রহস্যের দেশে যায়?

সমবেত ক্লারিওনেট, ফ্লুট, পাখোয়াজ এবং তবলা প্রভৃতির ঐক্যতানে সহসা রাজার চমক ভাঙ্গিল; ভাটিয়ালি লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করিল, এবং রাজা বুঝিতে

পারিল, মিলনীতে থিয়েটারের মহলা শুরু হইয়াছে। এ বিষয়ে অবশ্য পূর্ব্বেই সে সংবাদ পাইয়াছিল, কিন্তু মোশন মাষ্টার নটুবাবুর ব্যবহার সম্বন্ধে ইস্কুলের সহপাঠীদের কাছে যে রিপোর্ট পাইয়াছিল, তাহাতে ও-দিকে ঢুঁ মারিতে বড় বেশি একটা ভরসা পায় নাই। কিন্তু এই অপূর্ব্ব ঐক্য-তান শ্রবণ করিয়া তার পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করা আর সম্ভবপর রহিল না—মিলনীর দিকে সকৌতূহলে অগ্রসর হইল।

মোশন-মাষ্টার ও অভিনয়-শিক্ষক নটুবাবু একজন কম যোগ্য লোক নয়। জীবনে তিনি বহুস্থানে বহুবার অভিনয় করিয়া যেমন দক্ষতা তেমনি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন; একাধিক সখের অভিনয় পরিচালনা করিয়া সহরেও নাকি তিনি রীতিমত নাম কিনিয়া আসিয়াছেন, এবং শুধু তাহাই নহে, কলিকাতার পেশাদারী থিয়েটারে একসময়ে তিনি গেটে দাঁড়াইয়া টিকিট পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতেন। এত সকল কৃতিত্বের পর তিনি যে মিলনীক্লাবের অভিনয়-সম্প্র-দায়ের পাণ্ডা হইয়া বসিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানে এবং দক্ষ পরিচালনায় 'চন্দ্রগুপ্তের' অভিনয় যে অভিনয়-কলার চরম উৎকর্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই।

কিন্তু নটুবাবুর কাজ সহজ নয়; প্রথম হইতেই চন্দ্রগুপ্ত সাজিবার জন্য অভিনেতাদের মধ্যে যেমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, নন্দ সাজিবার জন্য তেমনি লোকের অভাব হয়। এত অভিজ্ঞতাসত্ত্বেও ইহা নটুবাবুর নিকট পরম বিস্ময়কর মনে হইল,—কেননা, সহরে সে দেখিত চাণক্য সাজিবার জন্যই যত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়,—একটু বোকাটেগোছের লোক ছাড়া চন্দ্রগুপ্ত সাজিবার জন্য অন্যদের কখনও বিশেষ একটা আগ্রহ সে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কোটালনগরে অতি-অতি-বুদ্ধিমান-দেরও চন্দ্রগুপ্তের জন্য এই লোলুপতা দেখিয়া সে ভারি বিস্ময় বোধ করিল; ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া কহিল—আহা হা,—ওর জন্য আর ঝগড়া করচেন কেন! চন্দ্রগুপ্ত তো আর এখন রাজা নয়, নন্দই রাজা। চন্দ্রগুপ্ত মোটেই রাজা হবে কিনা, সবই নির্ভর করচে, ঐ আপনার চাণক্য পণ্ডিতের ওপরে; চাণক্য যদি একবার বেঁকে বসে, তবে নাও হ'তে পারে—।

শুধু কি তাই! মোশন ঠিক করিয়া দেওয়া কি সোজা কথা! উপযুক্ত ভাবভঙ্গি কি, সে সম্বন্ধে কাহারও কি ছাই কিছু জ্ঞান আছে! প্রত্যেকটা 'পশ্চার' দেখাইতে নটুবাবুর মেহন্নতের একশেষ হইল। তবে তার উদ্দেশ্যটা এই যে শিক্ষাদানের কৃতিত্ব দেখাইয়া দুর্গাপ্রসন্নকে মোহিত করিয়া ফেলিবে এবং অভিনয় শিক্ষকের একটা স্থায়ী পদ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইবে। অবশ্য তার পরিশ্রমের কথাটা ভাবিয়া দেখিলে সংকল্পটা এমন কিছু দোষনীয় মনে হয় না, এবং অভিনেতা-দের অজ্ঞতা একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

কাত্যায়নের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নটুবাবু হতাশ হইল। কহিল—শুনচ, গদাধর, ও কি যাতা করচ! অভিনয় করা একটা সহজ কথা নয়, রীতিমত মাথা ঘামিয়ে পার্ট করতে হয়। অমন গদগদ স্বরে বলচ—'পানিনি বলেচেন—;' অমন কাঁদকাদস্বরে পানিনির নাম বল্লে ধমক খেয়ে মরবে যে! গর্ব্বের সঙ্গে বলবে, তবেই যদি চাণক্য পণ্ডিতের শ্রদ্ধা হয়—

গদাধর কিন্তু মোশন-মাষ্টারের এই অন্যায় নির্দ্দেশ মুখ বুজিয়া বরদাস্ত করিয়া গেল না; কহিল—গদগদ করে বলচি, তাতে দোষটা হলো কি? নিজের ইস্ত্রীর নাম সবাই অমনধারা করে বলে,—এ আর না জানে কে—

নটু আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—ইস্ত্রী! পানিনি!

গদাধর কহিল—নয় তো আর কি? নইলে আর চাণক্য পণ্ডিত অত চটে উঠবে কেন? নিজের ইস্ত্রী নেই কিনা, তাই পরের ইস্ত্রীর নাম সহ্য করতে পারে না; এতো একেবারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে—

নটু বারম্বার ঢোক গিলিয়া তবে নিজের কণ্ঠস্বরের উপরে দখল পাইল। কহিল—স্ত্রী? আরে গর্দ্দভ, পানিনি একজন জ্যোতিষী, হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারত; তার নিজের হাতের লেখা পুঁথি পর্য্যন্ত আমি কলকাতার যাদুঘরে দেখে এসেচি।

গদাধর গজর গজর করিতে লাগিল। স্ত্রী হইলেই

সে বেশি পছন্দ করিত এবং অভিনয়ও ঢের সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারিত; কিন্তু যে স্বচক্ষে সেই জ্যোতিষীয় পুঁথি দেখিয়া আসিয়াছে, তার কথা অবিশ্বাস করে কি করিয়া। কাজেই চাণক্যের নিকট পানিনির নাম এখন আর সে গদগদ স্বরে উচ্চারণ করে না,—মোশন-মাষ্টার নটুবাবুর নির্দ্দেশ মত নিজের করতল চাণক্য-পণ্ডিতের চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে এই কথাটা বুঝাইতে চায় যে মানুষের সমস্ত ভাগ্য হাতের পাতায় অতি সংক্ষেপে লেখা আছে, এবং এবিষয়ে পানিনির গণনাই নিঃসন্দেহে প্রামাণিক।

ষ্টেজের উপর সতেজ রিহার্সাল চলিতেছিল; নিচে ষ্টেজেরই সম্মুখে চেয়ার এবং বেঞ্চি টানিয়া আনিয়া সমজদারেরা বসিয়া ভালমন্দ বিচার করিতেছিল; ষ্টেজের উপরে মোশন-মাষ্টার নটুবাবু প্রতি ভঙ্গি অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যাহাতে কাহারও একটু ভুলচুক না থাকে। ওদিকে এক দৃশ্যশিল্পী দেওয়ালে ক্যাম্বিস টাঙাইয়া রাজসভা আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিলনীর দ্বারোদ্ঘাটনের আর দেরি নাই, তাই সকলকেই তাড়াতাড়ি করিতে হইতেছে।

রাজা ভিতরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে সীন দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চাণক্য-পণ্ডিত যেমন গর্ব্বসহকারে নন্দবংশ ধ্বংস করিতে লাগিল তাহাতে রাজা আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না। চুপে চুপে সে শ্রোতৃমণ্ডলীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতিশীঘ্রই অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে হেলেন রঙ্গমঞ্চে আসিল। বেচারার মুখে কতগুলি দুষ্ট ব্রণ হওয়াতে এক পক্ষের অধিককাল সে দাড়ি কামাইতে পারিতেছে না; আধ ইঞ্চি লম্বা লম্বা দাড়িতে তার সারা গাল আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যথাবিহিত যুবতী-সুলভ দম্ভভরে সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় এন্টিগোনাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

হেলেনের দাড়ি দেখিয়া হাসিতে রাজার পেটটা এক মুহূর্ত্তে মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল। ভারি মজা তো,—এক গাল দাড়ি—মেয়েমানুষের—কাণ্ড দেখ! পরিশ্রম সহকারে রাজা গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিল; কিন্তু হেলেনের যা হাবভাব তাহাতে হাসি অধিকক্ষণ চাপিয়া থাকা সহজ কথা নয়।

এন্টিগোনাস তখন বীরদর্পে বলিতেছে—আমি জানতে চাই, হেলেন, তুমি আমায় বিবাহ করবে কিনা,—আমি জানতে চাই—

পিছন হইতে সহসা একটা তীব্র হি হি হি সমস্ত ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে হাসি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অফুরন্ত; কাঁপিয়া কাঁপিয়া উচ্চ হইতে উচ্চ গ্রামে বাঁশির মত সেই হাসি পরম পুলকের আবেগে লুটোপুটি খাইতে লাগিল। চকিতে দর্শকমণ্ডলী ফিরিয়া চাহিল। মোশনের মধ্যে বাধা পাইয়া নটুবাবু হুঙ্কার করিয়া উঠিল—কে রে, কোন্ শূয়ার এসেছে এই—ওঃ, ছোটবাবু—কখন এলে, এস এস, এগিয়ে এস।—তা এরকম একগাল দাড়ি নিয়ে হেলেনের পাট করতে এসেচিস, দাসু,—ওতে তো আমারই হাসি পায়, আর ছোটবাবু তো ছেলেমানুষ! এসো, এদিকে এগিয়ে এস—বেশ বেশ, বড় হাসালে সবাইকে—

এমন গর্ব্বিত রাজা জীবনে আর কখনও বোধ করে নাই; স্বয়ং চাণক্য পণ্ডিত তাহাকে নন্দের সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিলেও সে এতটা কৃতার্থ বোধ করিত না। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না; সগর্ব্বে অগ্রসর হইয়া সে ষ্টেজে উঠিয়া গেল এবং শীঘ্রই নটুবাবুর শিক্ষাদান নৈপুণ্য দেখিয়া সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া গেল।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ আনন্দ ভোগ করা তার কপালে লেখা ছিল না; গ্রামের নানান দিক হইতে শাঁখের শব্দ উত্থিত হইল—সন্ধ্যার আবির্ভাব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না; বাবার শাসন এবং পিসিমার ক্রন্দনের ভয়ে এই অপূর্ব্ব এবং বিস্ময়কর রিহার্সেলের মধ্যপথেই রাজাকে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে হইল।

রাত যাইবে, সকাল হইবে, তবে না ইস্কুল বসিবে। নটুবাবু নিজে, স্বয়ং তাহাকে ষ্টেজের উপর ডাকিয়া লইয়াছিল,—বিশ্বাস করো, আর নাই কর। নটুবাবুর এই

অনুগ্রহের খবরটা সহপাঠী মহলে প্রচার করিবার দুরন্ত আগ্রহে রাজা ছটফট করিতে লাগিল; সন্ধ্যা না হইয়া গেলে দুয়েক বাড়িতে এরই মধ্যে খবরটা সে নিশ্চয়ই দিয়া আসিত! হ্যা, বলিবে, নিশ্চয়ই বলিবে,—নটুবাবু বাবাকে যাহা বলিতে বলিয়াছে, সব সে বলিবে; 'একেবারে গাধা গরু পিটিয়ে মানুষ করতে হচ্ছে,—বলতে হলে একলার পরিশ্রমেই প্লেটা দাঁড় করাচ্চি'—এ কথাটাও সে বাবাকে বলিবে। শুধু নটুবাবুর একটা কথা রাজার মনঃপূত হয় নাই। নটুবাবু বলিল—'প্লের দিন এসো কিন্তু ছোটবাবু, —দেখো, এই সব রদ্দি মাল দিয়ে কি একখানা প্লে আমি দাঁড় করাই,—সবার তাক লেগে যাবে—'। নটুবাবু কি ছাই ঘুণাক্ষরেও জানে যে এই প্লের সকল 'সীন' রাজা নিজ হাতে ফেলিবে, তবে না নাটক হইবে!

তিথিটা পূর্ণিমার দিকে ছিল; খালের উপরে এক টুকরা চাঁদ উঠিয়াছে। রূপার মত চকচকে জ্যোৎস্না রাজার বড় ভাল লাগে; গানটা সে জানে না এই যা দুঃখ, নইলে অনায়াসে সে গান উঠাইতে পারিত, এমনি তার মনের অবস্থা। কিন্তু সঙ্গীতের সুর তাহার শ্রুতিগোচর হইল। রাজা কৌতূহলী হইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া গতি স্তিমিত করিল, কিন্তু জনমনুষ্য দেখিতে পাইল না। পরীর গান না কি রে,—হি হি—লোক দেখতে পাচ্চি না যে—রাজা মনে মনে কহিল। তার কৌতূহল অসম্ভব বাড়িয়া গেল।

খালের পাড় অমনি সন্ধ্যা হইতে না হইতে জনবিরল হইয়া ওঠে; তারপর ও-জায়গাটায় সড়ক প্রায় শেষ হইয়া মোড় ফিরিয়াই জমিদার বাড়ির ফটকে প্রবেশ করিয়াছে—জমিদার বাড়িতে প্রয়োজন না থাকিলে এ-সময় বড় একটা কেউ এদিকে আসে না। মোড়ের কাছে কোনও রহস্যময় স্থান হইতে এই সঙ্গীতের উৎপত্তি, এ বিষয়ে রাজা ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইল,—শুধু মানুষ গাহিতেছে, না, আকাশের কোনও পরী বা অপ্সরা গাহিতেছে, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইল না; উৎসুক চোখে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

যে-খানে বুড়া তাল গাছটা ক্ষুদ্র তালগাছগুলিকে কনুই দিয়া পিছনে ঠেলিয়া খালের উপরে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে সহসা রাজার দৃষ্টি পড়িল; দেখিল এক ছায়ামূর্ত্তি বুড়া তাল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া দিব্য আনন্দে গান উঠাইয়াছে—এবং গানটা এমনি করুণ এবং সানুনাসিক মনে হইল যে রাজা উল্টা দিকে ফিরিয়া এক ছুট লাগাইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আগাইয়া গেল এবং অকস্মাৎ কণ্ঠস্বরটা চিনিতে পারিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়; সহসা একটা মতলব মনে খেলিয়া গেল। হাসি বন্ধ করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া বুড়া তাল গাছের দিকে অগ্রসর হইল; শুধু মনে মনে বলিতে লাগিল—কি পাগলারে, বষ্টুমিটা, একবার কাণ্ড দেখ, কোথায় এসে গান ধরেচে;—যেন এই রাত্তিরে এই গাছ তলায় এসে লোকে ওকে চাল দিয়ে যাবে—হি হি হি—

যমুনা বৈষ্ণবী তাল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া, খালের জলে পা বাড়াইয়া দিয়া তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল; চোরের মত চুপি চুপি রাজা পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।—এমনি গানে মনোযোগ, কিন্তু টের পায় নি—ভারি হাসি পায়; একটু ঠেলে দিলেই ঝুপ করে জলে পড়ে যাবে—রাজা ভাবিতে লাগিল। কাণেতে ভূতের ফুঁ এবং ঘাড়েতে ভূতের আঙ্গুলের আঁচড় দিয়া যমুনাকে সে ভয়ানক চমকাইয়া দিবে এবং অপার কৌতুকে সেই দৃশ্যটা উপভোগ করিবে, রাজার উদ্দেশ্যটা ছিল এই। কিন্তু সহসা বৈষ্ণবীর সঙ্গীতে সে যেন একটা নতুন সুর শুনিতে পাইল, এবং বিস্মিত হইয়া পিছনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল।

বৈষ্ণবী বারম্বার গানের ধুয়াতে ফিরিয়া আসিতেছে :—

মনের মধ্যে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়॥

'পাখীর পায়?—হি হি হি—পাখীর পায়—বেশ তো গানটা, পাখীর পায়!' সহসা অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া রাজা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যমুনা চকিতে গান বন্ধ করিল; পিছনে ফিরিয়া সবিস্ময়ে কহিল—রাজা! তুমি! কখন তুমি এলে? কি করে তুমি এলে?—আমার স্বপ্নের মধ্যে থেকে এলে নাকি?

রাজা কহিল—আর তুমিই বা এখানে এলে কেন এখন? রাত্তিরে বুঝি আবার কেউ চাল দেয়? বলিয়া যমুনার পাশেই বসিয়া পড়িল।

'চাল চাইতে আসিনি, রাজা।'

'তবে কেন এসেছ?'

'তোমাকে দেখতে পাব, তাই এসেচি।'

'দূর্।'

'বালগোপালকে না দেখে দিন যে আমার কাটে না, রাজা; তাই তো পথের ধারে বসে আছি। রাত বিরেতের ভয় করলে কি আমার চলে!'

'ধ্যেৎ পাগলী, কেবল মিছে কথা' রাজা কহিল।

যমুনা একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল; অদ্ভুত এক স্নেহবুভুক্ষু দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তার চোখ স্তিমিত হইয়া উঠিল, এবং যেন চেষ্টা করিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—মিছে কথা নয়, রাজা—মিছে কথা নয়!'

'রাজা বাবু?'

'কি?'

'আখড়াতে আর তো তুমি গেলে না; আমি কত আশা করে পথ চেয়ে থেকেচি; ভেবেচি—ছোটবাবু বলে গেছে, আসবে, ঠিক আসবে; কিন্তু তোমার মনেও ছিল না, না?

বস্তুত রাজার আখড়ায় যাইবার প্রলোভনের কারণ আর বিদ্যমান ছিল না। আজকাল যেখানে সেখানে অজস্র কাঁচা আম পাওয়া যাইতেছে; এমন কি নিজেদের গাছতলা হইতে যত কাঁচা আম মালীরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয় তাহা রাজা এবং রাজার পিসিমার পক্ষেও যথেষ্টের চাইতে বেশি। কিন্তু সত্য কথাটা বলিতে রাজার কেমন জানি মায়া হইল,—মনে হইল, প্রকৃত কথাটা বলিলে, বৈষ্ণবী যেমন করিয়াই হোক্, আহত হইবে।

'বাঃ রে, পড়াশুনো আছে না বুঝি!'

'ওঃ;—তা তো আছেই। আমারই মনের রাশ নেই কিনা, তাই পাগল হয়ে উঠি; অন্যের যে মেলাই কাজ, ভুলে যাই।'

'বষ্টুমি, তোমার ছেলে আছে?'

'ছেলে!' যমুনা বৈষ্ণবী অসম্ভব রকম চমকাইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল—ছেলে! হাঁ, আছে, ছিল,—মানে এখানে নেই, কিন্তু আছে, সত্যি আছে, তোমাকে মিথ্যা বলচি না, বিশ্বেস কর, সত্যি আছে।' এক অদ্ভুত আবেগোচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর যুগপৎ সজল এবং অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'সব ছিল রাজা, সব ছিল; কি আমার ছিল না? আমার স্বামী ছিল, আমার ছেলে ছিল—

'তবে?' রাজা বৈষ্ণবীর এই উচ্ছ্বাসে কিছুটা ভড়কাইয়া গিয়া কহিল। 'তাদের কি হলো?'

যমুনার সহসা আর্তনাদ করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল; অতি কষ্টে নিজেকে দমন করিল। অশ্রুবিকৃত গলায় কহিল—তুমি বুঝবে না, রাজা। তুমি বুঝবে না—

রাজা বোদ্ধার মত কহিল—সে ছেলে মরে গেচে, না?'

ভীতস্বরে যমুনা চেঁচাইয়া উঠিল। কহিল—ষাট, ষাট, সে মরবে কেন; যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে চিরকাল সে বেঁচে থাক; আর ছায়ার মত শুধু তার কচি মুখটা মনে পড়ে; এতদিনে তোমারই মত ডাগর হয়েচে। ভাবচি, তোমারই মত এমনি ডাগর-ডুটো চোখ হয়েচে কি না? এমনি তার বুদ্ধি হয়েচে, এমনি সুন্দর হয়েচে আমার খোকা!—একটা কাজ করবে, রাজাবাবু?

'কি?' রাজা শুধাইল।

কিন্তু যমুনা বৈষ্ণবী বহুক্ষণ কোনও জবাবই দিল না; যেন এক বিগতযুগের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি চোখের সমুখে টানিয়া আনিয়া আতুর লোলুপতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহসা রাজার দিকে চাহিয়া অতি মিষ্টস্বরে ডাকিল—গোপাল!

'কের!'

'গোপাল, তোমার মাথাটা এই আমার বুকের ওপর একটু রাখবে? শুধু একটু, শুধু একটু, একটু ক্ষণের জন্য; মায়ের বুকটা যে জলে যাচ্চে, একটু একটু করে পুড়ে যাচ্চে; শুধু একবার, গোপাল, শুধু একটি মুহূর্ত—' যমুনা তার দুইটা ব্যাকুল বাহু রাজার দিকে প্রসারিত করিয়া দিল; দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—যমুনা বৈষ্ণবী এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল।

'ধ্যেৎ' বলিয়া রাজা উঠিয়া পড়িল। কহিল—ধ্যেৎ, তুমি একদম পাগ্‌লী, বষ্টুমি; দূর্—' এবং চক্ষের পলকে হরিণের মত ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

যমুনা আখড়ার অর্দ্ধেকটা পথ তখন অতিক্রম করিয়াছে; এমন সময় পিছন হইতে একটা ডাক শুনিয়া চমকিয়া পিছনে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ম্লান জ্যোৎস্নায় ঈষৎ অন্ধকার পথ দিয়া কে একজন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে।

'বষ্টুমি, শুনচ, দাঁড়াও,—একটা কথা আছে।'

রাজার গলা চিনিতে যমুনার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। এবং পরমুহূর্ত্তে রাজা নিজেও হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—তুমি এমন পাগলার মত করতে পার! ধ্যেৎ, অমন করে বুঝি!—এই নাও, হলো তো—' বলিয়া হতবাক যমুনার বুকের উপরে রাজা গভীর স্নেহভরে মাথাটা রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—ছোট মা!

'ছোট মা! গোপাল!' বলিয়া যমুনা বৈষ্ণবী তার পুত্রস্নেহবুভুক্ষু বুকের মধ্যে রাজার মাথাটা সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল। যখন জ্ঞান হইল, দেখিল, পথের একপ্রান্তে বসিয়া আছে,—রাজা কখন চলিয়া গিয়াছে, টের পায় নাই।

পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাস্তিমিত অন্ধকারে যমুনা বৈষ্ণবী পাগলের মত নৃত্য করিতে করিতে চলিল—ছোট মা!—আমি ছোট মা! মা!

দশ

হৈমন্তী দুদিন হয় কোটালনগরে আসিয়াছে। স্বামী অর্দ্ধেন্দু আর কদিন থাকিয়াই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবে; হৈমন্তী হাইকোর্টের দীর্ঘাবকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, এমনি কথা আছে। ইহাদের আগমনে দুর্গাপ্রসন্নের বাড়িতে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। গয়লা আসিয়া দুধ ক্ষীর দিয়া যায়, জেলে মাছ পৌঁছাইয়া দেয়, ময়রা খাবার লইয়া আসে; রাঁধুনী এবং দাসী মহলে উত্তেজনার আর অন্ত নাই: সমস্ত বাড়ি গমগম করিয়া উঠিল।

কোটালনগরের ইতর সাধারণ আর রাজার দেখা পায় না। জহর আর মিলিকে লইয়া সে অতিশয় ব্যস্ত আছে; এমন কি থিয়েটারের রিহার্সাল শুনিতে যাইবার পর্য্যন্ত সে ফুরসুৎটুকু পায় না। তবে ইতিমধ্যেই জহরকে সে সগর্ব্বে জানাইয়াছে যে মিলনীতে থিয়েটার হইবার সময় সীন্ সে-ই ফেলিবে। নিজের এয়ার-গানটাও সে জহরকে দিয়া দিয়াছে, এবং সাবধান করিয়া দিয়াছে যে পাখীর দিকে যেন গুলি না ছোঁড়ে—অনেক সময় হঠাৎ ওদের গায়ে ছররা লাগিয়াও যাইতে পারে! মিলি এখন আর 'মাম মা' বলে না—ব্যাপারটাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সে মামা বলিতেই শিখিয়াছে, কিন্তু রাজার খুসি তাতে একটুও কম নয়। নিজের সমস্ত পুরাতন খেলনা মিলিকে সে উজাড় করিয়া দিল, এবং শুধু তাহাই নয়, গঙ্গারাম কুমোরের কাছে চুপে চুপে ফরমাস দিয়া রাঁধিবার যাবতীয় বাসনকোসন আনিয়া দিল এবং মিলির হাতের ঘাস পাতার অপূর্ব্ব রান্না খাইয়া বিশেষ তৃপ্তি প্রকাশ করিল। কহিল—দৈ রাঁধতে জানিস না বুঝি? শিখিয়ে দেবো অখন তেলাকুঁচের পাতা দিয়ে কেমন সুন্দর দই হয়! একটু সবুজ দৈ হয় এই যা—হি হি—

দুইটী শিশুও বালক-মামার অদ্ভুত ভক্ত হইয়া উঠিল। সারা দিন ওরা রাজারই সঙ্গে আছে; রামধনি বেয়ারা খবরদারি করিতে আসিলে রীতিমত আপত্তি জানায়। রাজার ভারি ইচ্ছা করে ডিঙিতে করিয়া ওদের একদিন খালের মধ্যে বেড়াইয়া আনে,—কিন্তু দিদি বারম্বার সাবধান করিয়া দিয়াছে—'খবরদার, রাজা, ওদের জলের ধারে কক্ষনো নিবি না—সাবধান—খালের আশে পাশেও নয়!' তাই রাজা সে চেষ্টা করে নাই, শুধু মনে মনে ভাবিয়াছে—দিদিটা ভারি ভীরু! কেউ যদি জলে পড়েই যায়, তবে বুঝি আমি আর তুলতে পারব না! কত ছোট বেলায়ই পেরেছিলাম; যেন আমি কম সাঁতার জানি—

এদিকে হৈমন্তী পিতার সেবায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করিল। খাওয়া শোওয়ার এমনি সে বাঁধাবাঁধি করিয়া দিল, ছুটাছুটি এমনি বন্ধ করিল যে দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমটায় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তবু বহুদিন পরে আপনার জনের সেবার স্পর্শ পাইয়া অকস্মাৎ আজকাল স্ত্রীর কথাটা কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। শুধু হৈমন্তীকে কহিলেন—এত করিস নি, মা,—এত করিস নি; এ আমার সইবে না।

'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে থাকি বাবা, একটু তোমার সেবা করব, তার অবসর পাই কোথায়? কিন্তু সারাক্ষণ ভেবে মরি—দেখবার কেই বা আছে!' বলিয়া হৈমন্তী ডালিমের রস ছাঁকিতে লাগিল।

'দেখবার লোক হবে বৈ কি, মা, হবে; কেমন মজবুত করে আমি ঘর বানাচ্ছি, দেখচিস না? এই ঘরে রাজার বৌ এসে দেখিস আমার কত আদর করে—বুড়াকে নিয়ে কত খেলাই সে খেলে, দেখিস।'

'রাজার বৌ' বিস্মিত হইয়া কহিল, 'সে কি দু পাঁচ দিনের কথা নাকি?'

'দেখিস্, ওকে আমি শীগগিরই বিয়ে দেওয়াব—এন্ট্রান্স পাশ হলেই। রাজা যাবে কলেজে পড়তে, আর এই কোটাল-নগরে থাকবো আমি আর বৌমা, বৌমা আর আমি। দেখিস কেমন মজা হয়—কেমন লক্ষ্মীর মত একটা বউ আমি আনি দেখিস।

'আর ছেলে মেয়ে দুটোও এমন হয়েচে', হৈমন্তী কহিতে লাগিল, 'সারাক্ষণ কেবল—দাদু, দাদু—বিশেষ করে জহর; যেন বাপ আমার নয়, ওর। শাশুড়ি বলেছিলেন ওদের রেখে আসতে; আমি কি রাজি হই; বল্লুম—ওরা গেলে তবু বাবার মন অনেকটা হাল্কা হবে, বলে আমি নিয়ে এলুম।—

'বেশ করেচিস মা, খুব ভাল করেচিস।'

'কিন্তু এখানে এসে অবধি তোমার কাছেও ঘেঁষতে দেখি না—লজ্জা পায় বোধ হয়, কতোদিন দেখেনি।'

দুর্গাপ্রসন্ন একটু সস্নেহ মৃদু হাসিলেন; কহিলেন—মামার সঙ্গে খুবই ভাব হয়েচে—তার সঙ্গেই সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়; ছোট ছেলে মেয়ে, যাতে ওরা খুসি হয়, তাই করুক—তাতেই আমি খুসি হবো।'

রাজা কহিল—তারপর জানিস্ সেই ভূতটা না, এগিয়ে আসতে লাগল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—আর দেখি তোর সাহস কত—দূর, ভয় পাচ্চিস কেন রে মিলি, আয়, আয়, আমার পাশে এসে বোস্— আয় দেখি তোর সাহস কত? ভয়ে ভূতটা তো আর কাছে এগোয় না। এমন আমার ভূতটাকে ধরতে ইচ্ছে হল কি আর বলব!—খাঁচাতে ভরে রাখলে কতলোক এসে দেখতে পারবে। কিন্তু ভূতটা পিছনে না ফিরে সে যা ছুট—ছুটতে ছুটতে—হি হি হি—

সন্ধ্যার সময় নিজের বসিবার ঘরে নির্জ্জনে ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়া দুর্গাপ্রসন্ন তামাক টানিতেছিলেন। গড়গড়ার ধূমের মধ্য হইতে কোটালনগরের ভবিষ্যতের বহু স্বপ্ন তাঁর দুই চোখে ভাসিয়া ওঠে; তার কিছুটা তিনি বাস্তবে রূপ দেন, কিছুটা ভবিষ্যতে রাজা করিবে বলিয়া রাখিয়া দেন। মনে মনে সংকল্প আছে, কোটালনগর সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত অসমাপ্ত কল্পনা তিনি পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবেন যাহাতে রাজা ভবিষ্যতে তাঁর আশাগুলিকে রূপ দিতে পারে।

এমন সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া মুখ হইতে নল সরাইয়া দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন—এস বাবা, বস।—এই চেয়ারটায় বস।

অর্দ্ধেন্দু বসিয়া পড়িয়া সামান্য একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন—রাজার সম্বন্ধে একটু আলোচনা আমি করতে চাই; ও আমাদের সকলের প্রিয়, তাই ওর বিষয়ে—আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো এখন?'

'না, না, কিছু নয়। তুমি কি বলবে, বল—রাজার বিষয়ে বলবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।—আমার মনে হচ্চে, গ্রামে ওর উপযুক্ত রকম শিক্ষা, মানে ট্রেনিং, তেমন হচ্চে না,—অর্থাৎ সেই রকমই আমার সন্দেহ হচ্চে—'

দুর্গাপ্রসন্ন নল টানিতে টানিতে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিলেন, এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর বিষয়টা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া চলিলেন—'আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করচি, পড়াশুনোয় ওর মন নেই—বরঞ্চ সারাদিন চারদিকে খেলে বেড়ায়; তাছাড়া যাদের সঙ্গে ও মেশে তাদের মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যা কম। যত রাজ্যের জেলে, তাঁতি, বষ্টম ওদের সঙ্গেই ওর যত মাথামাথি! প্রথমত, মনঃশিক্ষার দিক থেকে এই সব অন্ত্যজের সঙ্গ ওর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর;

শ্রীশ্রীদুর্গা

P.G.A. COMMON-ROOM
P.G.A. COMMON-ROOM

দ্বিতীয়ত, আপনার সম্মান, মানে প্রেষ্টিজের দিক থেকেও এটা—কি বলে—একটু দৃষ্টিকটু।—

দুর্গাপ্রসন্ন অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে ভাবিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন—তুমি কি করতে বল ?'

'আমরা বলছিলাম,—আমাদের সঙ্গে ও না হয় এলাহাবাদে চলুক, ভাল ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া যাবে, এবং সামাজিক আদবকায়দায় অভ্যস্ত হওয়া ওর পক্ষে সহজ হবে। অবশ্য আপনার কথাটাও ভাবা দরকার—কিন্তু ওর ভবিষ্যতটাই তো আমাদের সকলের অধিক কাম্য—

'না, বাবা, তা হয় না।' দুর্গাপ্রসন্ন সহসা স্থিরচিত্তে এবং নিষ্পত্তির স্বরে কহিলেন। 'হয় না, এই জন্য নয় যে আমার স্বার্থপর স্নেহের জন্য ওর ভবিষ্যৎটা আমি নষ্ট করতে চাই; তার কারণ এই যে আমি মনে করি শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে যে-শিক্ষা পায়, সে শিক্ষার তুলনা নেই—তেমন শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। জীবনের প্রথম দিকটায় প্রকৃতির নিজের পাঠশালায় শিক্ষা পেলে মানুষের মন, বুদ্ধি, শক্তি অধিকতর বিকাশ পায় বলে আমার বিশ্বাস।'

'ওঃ, তবে আর কোনও কথাই ওঠে না।' অর্দ্ধেন্দু বিনীতস্বরে কহিলেন। 'আর একটা কথা—আমি জিজ্ঞেস করতে একটু ইতস্তত করচি—তবে রাজারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে জিজ্ঞেস করচি—'

'বল।'

'আপনার কি উইল করা হয়ে গেচে ?'

'আমার তো অনেক ওয়ারিশ নেই, উইলের কি দরকার ?'

'তবু, মানে, স্পষ্ট একটা বিবৃতি থাকা সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। তাতে ভবিষ্যতে যেমন কোনও ফ্যাকড়া বাঁধবার অবকাশ হয় না, তেমনি উইলকারকের প্রতি খুঁটিনাটি ইচ্ছাটি ওয়ারিশকে জানিয়ে দেওয়া যায়; আর বিশেষ করে আমি এই কথাটাই ভাবচি,—রাজা এখনও নিতান্তই না-বালক, সাবালক হতে ওর অনেক দেরি—এ অবস্থায় খুব বিবেচনার সঙ্গে একজিকিউটার নিযুক্ত করে যাওয়া উচিত—যাকে তাকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত বিপদজনক বলে আমার কাছে মনে হয়; অবশ্যি সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন—তবে কর্ত্তব্যের খাতিরে—'

'এ-বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো, বাবা।'

সে-রাত্রে শুইতে আসিয়াই অর্দ্ধেন্দু স্ত্রীকে কহিলেন—সে-কথাটা কালকেই তুমি উঠিও, বুঝলে ?

আয়নার সমুখে দাঁড়াইয়া হৈমন্তী চুল আঁচড়াইতেছিল, কহিল—আমার ভারি লজ্জা করে।

অর্দ্ধেন্দু, ঈষৎ বিরক্তির স্বরে কহিলেন—লজ্জা করে! এতে লজ্জার কি আছে শুনি ? চিরকাল তুমি এমনি বোকা; বিচার বিবেচনা বলে একটা জিনিষ—

'বেশ, বেশ, বলবো'খন।' বলিয়া হৈমন্তী নিজের চুলের মধ্যে নির্দ্দয়ভাবে চিরুণী চালাইতে লাগিল।

নিশ্চিন্ত হইয়া অর্দ্ধেন্দু কহিলেন—এ আর কার জন্য, তোমার ছেলেপুলের জন্যেই তো—শুনচ, চুরুটের বাক্সটা একটু এগিয়ে দেবে ?—

দুর্গাপ্রসন্নের ডান পায়ের গোড়ালিতে সামান্য ব্যথা হইয়াছিল। ভোরবেলা হৈমন্তী তাহাতে কবিরাজি তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন,—তেল মালিশ করিয়া দিবার লোকের অভাব কি; কিন্তু হৈমন্তী কিছুতেই শুনিল না, ঘরের মেঝেতে বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট দুর্গাপ্রসন্নের পায়ে জোরে ওষুধ ঘষিয়া দিতে লাগিল। সুখ দুঃখের অনেক কথাই হইল।

'হয়েচে, মা, হয়েচে, যথেষ্ট হয়েচে।' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন। 'আর দরকার নেই।'

'কেবল তোমার ফাঁকি দেওয়া বাবা,—ভাবচ, হৈমের বুঝি খুবই কষ্ট হচ্চে; কিচ্ছু নয়; ওখানে শ্বশুর-শাশুড়িকে আমি কত সেবা করি, এতে আমার একটুও—এই শুনচিস্, জহর, যাচ্চিস্ কোথা, শুনে যা—

জহর বারান্দা দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, মায়ের ডাক শুনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া কহিল—কি, ডাকচ কেন ? আমার একটু সময় নেই; মামা টিয়েপাখী ধরতে গাছে উঠেচে—আমি চল্লুম—

'দাদুর কাছে কখনও আসতে নেই, নারে দুষ্টু ছেলে? এলাহাবাদে সারাক্ষণ তো শুধু দাদু দাদু করতিস!—আর দাদুর সঙ্গে ভাব করলেই লাভের আশা আছে, হাবা ছেলে। দেখ, দাদুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যাদু ক'রে' এক টুকরা জমিদারী আদায় করতে পারিস কিনা।—সোনারূপো যতই থাকুক, জমিদারি না থাকলে অত আর মানমান্যি হতে হয় না,—জমিদার হওয়ার সম্ভ্রমই আলাদা রকম—

'আমি গেলাম', জহর যাইবার উদ্যোগ করিয়া কহিল।

'ফের দুষ্টুমি? দাদুর কোলে এসে বোস। রোজ ভোরে উঠে দাদুকে পেন্নাম করতে বলেছিলাম সেই এলাহাবাদে থাকতে,—করিস?'

ধর, মামা যদি একটা মাত্র টিয়া ধরিতে পারিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেটা মিলিই দখল করিবে, কেননা সে কাছে আছে; কিন্তু অনায়াসেই সে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিত, এবং কাড়াকাড়িতে মিলি তার সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। অথচ এইরূপ অন্যান্য ভাবে অকিঞ্চিৎকর কারণের জন্য তাকে আটকাইয়া রাখা মিন্নির উপর মায়ের পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই না।

জহরের অবস্থা দেখিয়া দুর্গাপ্রসন্ন কৌতুক বোধ করিলেন; কহিলেন—দে, দে, ওকে যেতে দে হৈম; কেমন ছটফট করচে, দেখ!

হৈমর আর মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না; দাদুর নির্দ্দেশ শোনা মাত্র জহর পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হৈম কহিতে লাগিল—শাশুড়ি রোজই শোনায়, 'দাদু কিছু দিয়ে যাবে না।' যা আমার রাগ হয়; জহরের দাদুকে চিনত তবে আর এমন কথা বলত না। বলে 'এতো বড় সম্পত্তি ছেলেমেয়েকে সমানভাগে ভাগ করে দিলে তবে না ন্যায়ের কাজ হতো দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরীর উপযুক্ত কাজ হতো—তা মেয়েকে তো কিছুই দিলে না—

'কেন মা, তোর বিয়েতে আমি তো কম পক্ষে ষাট সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করেচি।' দুর্গাপ্রসন্ন অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন। 'ত্রিশ হাজার টাকা আমি তো নগতই দিয়েচি; তবে এমন কথা ওরা বলবেন কেন?—'

'কিন্তু এ-কথাও ঠিক বাবা' হৈমন্তী তাড়াতাড়ি কহিল, 'এমন তফাৎই বা তোমরা করবে কেন? মেয়ে তো নিজেরই সন্তান বটে, তবে এই বৈষম্য কেন? তোমার এতো আছে, সামান্য কটি টাকা দিয়ে আমাকে বিদেয় করে দেবে তুমি? —এলাহাবাদে আমাদের মহিলা সমিতিতে তো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কত প্রস্তাব পাস্ করেচি।—কিন্তু এ-ও আমি তোমার কাছে আব্দার ধরলুম, জহরকে একটা সম্পত্তি তোমার লিখে দিতেই হবে, কোনও ওজরই আমি শুনব না। জমিদারের মেয়ে আমি, জমিদারের মাও হতে চাই—

দুর্গাপ্রসন্ন একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন আমি ভেবে দেখব, মা, ভেবে দেখব। বেশ, আমি ভেবে দেখি—

সত্যই তিনি ভাবিলেন। হৈমের কথার মধ্যে নিশ্চয়ই খানিকটা সত্য আছে; মেয়ে বলিয়াই না তিনি সম্পত্তির অতি সামান্য অংশ দিয়া তাকে বিদায় করিতে চান,—কিন্তু মেয়ে তো নিজেরই সন্তান; কোন্ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তিনি এই বৈষম্যের সাফাই দিবেন? অথচ ইহাও সত্য যে-রহস্যময় কারণের জন্যই হোক্, রাজার জন্য সমস্ত কিছু জমাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে, একটুও ভাগাভাগি করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; সমস্ত সম্পদ এক সঙ্গে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে,—এই বিপুল সম্পত্তির প্রতিটি অংশ রাজা একক ভোগ করুক সমস্ত অন্তর যেন ইহাই চাহিতেছে। সমস্ত জমাইয়া তিনি একটিমাত্র গৃহ তৈয়ারী করিতে চান, সে গৃহের একটিমাত্র মালিক থাকিবে।

কিন্তু হৈমের কথাগুলি যেন তাঁর দুর্বলতা এবং পক্ষপাতিত্বকে নিজের কাছেই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল; তাঁর বিবেকের এক অখ্যাত কোন্ হইতে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন আসিতে লাগিল—তাইতো, তাইতো—। কিন্তু তাঁর মনটা পরমুহূর্ত্তে হিংস্র হইয়া বলিতে লাগিল—'না, তা নয়,—তা নয়। আমার সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সঞ্চিত করিয়া আমি রাজার জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়াছি, এতে একটু হাত দিবারও কাহারও অধিকার নাই।—কিন্তু হৈমর কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিবার মত। কোন্ ন্যায়ে আমি

তাহাদের উপেক্ষা করিতে পারি? আইনের উপরেও তো একটা জিনিষ আছে—নাঃ, জহরকে অন্তত কিছুটা আমাকে দিতেই হইবে—

গভীর রাত্র; সামান্য কিছু পূর্ব্বে কাছারিবাড়ির ঘণ্টাতে বারটা বাজিয়াছে। এবং সেই ঘণ্টা শুনিবার পর হইতেই রাজা বিছানায় ছটফট্ করিয়া মরিতেছে। কথা আছে, এই সময় মাণিক রাজার ঘরের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া শিস দিবে; কিন্তু মাণিকের আসিবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। অতি সতর্ক হইয়া সে কাণ পাতিয়া রহিল; দমকা বাতাসের প্রতিটি হিস্ হিস্ শুনিতে পাইল, কিন্তু মাণিকের শিষের আর দেখা নাই।

অধৈর্য্য হইয়া অবশেষে পা টিপিয়া টিপিয়া রাজা দোতলার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল; এবং সমুখে চাহিয়াই দেখিল সুদূর খালের ধারে একটা ডিঙি ভিড়িয়াছে। ডিঙিতে অস্পষ্ট ছায়ার মত একাধিক লোক দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই ছায়ার মধ্যে একটি পাড়ে নামিয়া ক্রমেই এদিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। রাজাকে আর বলিতে হইল না,—যথাসম্ভব পা টিপিয়া টিপিয়া সে সিঁড়ি দিয়া একতলায় নামিয়া পড়িল।—এমন দেরি করতে পারে মাণিকটা; একবারে রাগ ধরে যায়। কিন্তু পদ্মায় মাছ ধরতে যাওয়া ভারি মজা—হি হি—

নিঃশব্দে জেলেডিঙি ছাড়িয়া দিল। মাণিক কহিল—বড়কর্ত্তায় ঠিক কইচে তো—দেইখো!

রাজা গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া কহিল—হ্যা হ্যা, হয়েচে,—চল্ এখন।

মাণিকের বাবা মশায় ও খুড়ামশায় আজ গাঙে যাইবে না। বাড়িতে কুটুম আসিয়াছে; তাহার আদর আপ্যায়নের জন্য আজ তাহারা কাজে কামাই দিল। তবে শুধু মাণিক নয়, ও বাড়ির আরও দুই জন জেলে সঙ্গে চলিয়াছে। তাদের সঙ্গে রাজার ভাব নাই, কিন্তু মাণিক জানা থাকিলেই তার চলে। কেউ জানা না থাকিলেও এমন কিছু আসিয়া যায় না; জেলেডিঙি চড়িয়া পদ্মায় মাছ ধরিতে যাইতে পারিলেই হইল। অবশ্য বাবামশায় এবং খুড়ামশায় উপস্থিত থাকিবে না বলিয়াই মাণিক রাজাকে লইতে সম্মত হইয়াছিল। আজ সে-ই দলের সর্দ্দার; তার গানের উৎসাহের বাড়াবাড়িতেই সেটা টের পাওয়া গেল—

'যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি
মথ্‌সুদাবাদ করবে অন্বেষণ।

'শুনচ হরিমণ্ডল, একটু জোরে বাও—ঐরে বৃন্দাবন, ঘুমাস নাকি—খ্যাষের লাইন দুইটা একটু শুইনো ছোট-কর্ত্তা—

'আছে কলিতে কলিকাতা, তিনসহরে আঁটা
সাঁতার দে যায় রসিক যে-জন॥'

শুধু ঘুমন্ত খালের মধ্য দিয়া বিচিত্র ঝোপ-ঝাড়ের তলে তলে বিচিত্র প্রাণস্পন্দ তুলিয়া জেলেডিঙি পদ্মার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। এমন অপূর্ব্ব লাগিতে লাগিল এই নিদ্রিত পৃথিবী, এই রহস্যময় জলপথ, এই অত্যদ্ভুত সঙ্গীরা এবং পদ্মায় যাইয়া মাছ ধরা দেখিবার স্বপ্ন যে রাজা কোনও বাক্যালাপই করিল না—মুগ্ধ বিস্ময়ে সমুখ দিকে শুধু চাহিয়াই রহিল।

ওদিকে তখন হরি মণ্ডল তামাক টানিতে টানিতে বৃন্দাবনকে কহিতেছে—আইজ যদি শালারা ডিঙ্গির সমুখ কাইটা যায়, তবে কিন্তু আইজ একটা দাঙ্গা হইব,—কইয়া দিলাম।

বৃন্দাবন কহিল—আরে দাঙ্গা করুম ক্যান্, মণ্ডলের পো, আমরাই ওগো সমুখ দিয়া ক্যাপ ফালামু—দেখি জব্দটা হয় কে? নাওয়ের আগ কাটতে বুঝি আর আমরা জানি না।—

'জানুম না আর ক্যান্—জানি সবই। সর্দ্দারেরা ডরে মরে, সাধে কি আর চুপ মাইরা থাকি? নাইলে কও দেখি, কুসুমপুরের বিরাট জাউলা আমাগো থন্ কোন্ কুলিনটা? না হয় কর্ম্মকারের বাড়িতে মাইয়্যা বিয়া দিলই। কর্ম্মকার এমন কোন্ কুলিন আইল।'

'দেইখো, আজ আমরাই কেমুন ওগো আগ কাটি। জালের মাছগুলি ছিনাইয়া লইলে বুঝুক কেমুন রাগটা হয়—'

মাণিক গানের মধ্যে একটু ছেদ টানিয়া কহিল,—ফিস্

ফিস কইরা কি কওয়া কওনি লাগাইছ? গাও নাগাইয়া যাও না—

আছে কলিতে কলিকাতা তিন সহরে আঁটা—

ডিঙি পদ্মার মোহানায় আসিয়া পড়িল। আকাশে সামান্য মেঘ করিয়াছে,—একটু হাওয়াও আছে। ওরা পাল উঠাইল এবং দেখিতে দেখিতে পদ্মার বুকে যাইয়া প্রবেশ করিল। অসংখ্য জেলেডিঙি ইতস্তত জাল নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে—দূর হইতে তাহাদের অস্থির মৃদু আলো-গুলিকে আলেয়ার মত মনে হয়। এই ডিঙির ভিড়ের মধ্যে মাণিকের ডিঙিও মিশিয়া গেল।

আকাশের প্রান্তে মেঘ থাকিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু গর্জ্জন করিতে লাগিল; দু'এক বার বিদ্যুৎ উঁকি দিয়া শাসাইয়া গেল, এবং পদ্মার অন্তহীন বারিরাশির বুকে কতগুলি নির্ভীক মানবসন্তান অদ্ভুত কৌশল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সহস্র সহস্র রৌপ্যবর্ণ ইলিশ মাছ জালের মধ্যে বন্দী করিতে লাগিল। জেলেদের ছিপ নৌকাগুলি যেন মানুষে চালাই-তেছে না, মানুষগুলি যেন এই জালগুলি নিক্ষেপ করিতেছে না; নৌকাগুলি যেন যন্ত্রের মত সুনির্দ্দিষ্ট পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে এবং জলরাশি নিস্পেষিত করিয়া এই জাল-যন্ত্রেরা মৎস্য উৎপন্ন করিয়া নৌকার পাটাতনের তলায় নিক্ষেপ করিতেছে—এমনি এই সকল জেলেদের দক্ষতা। বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শীত গ্রীষ্ম নাই, এই জল-কৃষকেরা পদ্মার জল চাষ করিয়া মাটীর মানুষের জন্য অজস্র খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে ইহাদের কর্ম্মতৎপরতা সভ্য মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না; ধরণীর এই বীরপুত্রদের কথা এমন কি কবিদের কাব্যেও স্থান পায় না, ইতিহাসে স্থান পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু এই অ-স্তুত বীরেরা অতি সামান্য এক মুঠা উদরান্নের জন্য অস্থির এবং হিংস্র জলরাশির মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয় দেয়,—জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধরিত্রীর সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র আবেষ্টনের মধ্যে অবহেলায় সংগ্রাম করিয়া ফিরে।

সহসা সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে একটা কর্কশ হুঙ্কার শোনা গেল—নাওয়ের আগ কাট্‌লি, শালা,—চউখে দেখচ না? নাওয়ের আগ কাট্‌লি, অ্যা?

'বেশ করচি, করুম না, একশোবার করুম।' প্রত্যুত্তর আসিল। 'রোজ যখন আমাগো আগ কাইটা যাও, তখন কেমন? সেই কথাটা মনে নাই—?'

'খপরদার কইলাম' নিঃশব্দ জলরাশিতে পূর্ব্বের সেই কণ্ঠস্বর পুনর্ব্বার প্রতিধ্বনিত হইল—'সাবধান, পরিণাম ভাইবা কথা কইও।'

'ওরে আমার ই রে।' সব্যঙ্গে জবাব আসিল।

'যা, যা দেখি আবার! কেমুন মরদের পো দেখি, কাট দিয়া আবার নাওয়ের আগ; আমি কুসুমতলির বিরাট জাউলা, হুঁস থাকে য্যান্!—'

'থামুনা, হাজারবার যামু', হরিমণ্ডলের গর্ব্বিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যেমুন ইচ্ছা যামু—কেঐর বাপের জাগা দিয়া কিনা যাই? আগে লাগা বৃন্দা—'

মাণিক শঙ্কিত হইয়া কহিল—আরে কর কি মণ্ডলের পো —কাইজ্জা বাধাইলা যে—কি মস্কিল—আ হা হা কর কি—

'করি, বেশ করি। চুপ কইর‍্যা থামু? বা' বা' বৃন্দা, আগ কাট্—'

চক্ষের পলকে ডিঙি অন্য ডিঙিটার সমুখ দিয়া শাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং হরি মণ্ডলের দক্ষতায় এক জাল ইলিশ মাছ চক চক করিয়া উঠিল।

'গেলি!' বিরাট জেলে বীভৎস হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

'গ্যালাম।' হরি মণ্ডল তেজের সঙ্গে জবাব দিল।

'তবে রে শালা, মজাটা বোঝ।' সঙ্গে সঙ্গে বিরাটের ছিপটা এই ডিঙিটার প্রায় গায়ের আছে আসিয়া ভিড়িল। পলকের মধ্যে চার চার জোয়ানের হাতে চার চারটা সড়কি ঝলসাইয়া উঠিল। 'শালার পো শালা' ভীমদর্শন বিরাট জেলে ডাকাতের সর্দ্দারের ভঙ্গিতে গর্জ্জন করিয়া কহিল—'আগ কাটস—জলের মইধ্যে পুইতা ফালামু না—'

হরি মণ্ডলও জেলের বাচ্চা; সেও কম যায় না। চক্ষের পলকে সেও পাটাতনের তলা হইতে একটা সড়কি বাহির করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল, এবং বৃন্দাবন বৈঠাটা মাথার উপর উদ্যত করিয়া ঘুরাইতে সুরু করিয়া দিল।

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বিরাট আদেশ দিল—লাগা,—শালা গো মাথা বরাবইর লাগা—

'এই, শুনচ?'

যুদ্ধমান দুই দলই সহসা চমকিয়া চাহিল।

'এই, কে তোমাদের ঝগড়া করতে বলেছে? থাম, থাম বলচি—এক মিনিটে সড়কি নামিয়ে নাও,—নামাও, কেউ ঝগড়া করতে পারবে না—ব্যস্!

দুই হাতের দুই কনুই দিয়া পাশের লোক সরাইয়া রাজা সমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকটা সমুখ দিকে ফুলাইয়া দিয়াছে, মাথাটা আধিপত্যের গর্ব্বে উদ্ধত, কণ্ঠে তাহার আদেশের স্বর।

'কে আমি জান? জমিদার দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি আমার বাবা। আমার বাবা বাঘ, জান, বাঘ; তার যদি একটু রাগ হয়, ঘাড়ের ওপর তবে আর কারুর মাথা থাকবে না। সেই আমি বলচি,—খবরদার, একটু ঝগড়া করতে পারবে না—ব্যস্!'

বিরাট জেলে শুধু যে দুর্গাপ্রসন্নের প্রতাপের কথা জানিত তাহাই নহে, উৎসব উপলক্ষে একাধিকবার জমিদার চৌধুরীদের বাড়িতে মৎস্য সরবরাহ করিয়াছে; এবং যাত্রাগান শুনিতে কতবার যে সেখানে গিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। রাজাকে দেখিয়া বিস্ময়ে সে হতবাক হইয়াগেল। কহিল—ছোটবাবু! আরে রে, আপনে আইলেন ক্যাম্‌তে?

'আমি মাছধরা দেখতে এসেচি। নামাও, সব সড়কি নামাও,—দুদলই নামাও—ব্যস্!' রাজা আর ক্ষুদ্র বালক নয়; সে প্রভু, সে হুকুম করিতে জানে। পলকে সমস্ত সড়কি নত হইল।

বিরাট কহিল—কিন্তু ওগো কাণ্ডটা দেখলেন তো, হুজুর? আগ কাইটা এই যে মাছ লইয়া গেল, এইর কোনও বিচার হইব না?'

'কাল বিচার হবে—যাবে আমার বাবার কাছে। কিন্তু খবরদার, নিজেরা ঝগড়া করবে না।—যাও, মাছ ধর গিয়ে, —আর শুনচ, দুদলই আমাকে পাঁচ পাঁচটা করে ইলিশ মাছ দেবে, বুঝেচ? আমার দিদি এসেচে কিনা,—কমে হবে না।'

যুদ্ধের মেঘ মন্ত্রবলে উড়িয়া গেল। পাটাতনের তলায় সড়কিগুলি অদৃশ্য হইল; দুই ডিঙি বিভিন্ন দুইদিকে মৎস্য-শিকারে ছুটিল। শুধু বিরাট দূর হইতে চিৎকার করিয়া শুনাইয়া দিল—'বড় বাঁইচা গেলিরে, বড় বাঁইচা গেলি।' কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় চুপ করিয়া গেল।

অসম্ভব রকম ইলিশমাছ সেদিন উঠিতে লাগিল; এত মাছ সচরাচর কোনওদিনই ওঠে না। সারা রাত তারা মাছ ধরিল, এবং যখন থামিল, অন্ধকার আর তখন নাই।

(ক্রমশঃ)

সুবোধ বসু

বঙ্গ-সাহিত্য ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রীতর্কতীর্থ

মহাকবি গেটের সমালোচনায় এমার্সন বলেছিলেন,—Gothe was the internal life of the nineteenth century. বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও এ কথার পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতীচ্য সভ্যতার উদগ্র রূপ-শিখা সমগ্র বাঙ্গালীর চোখে এক মরীচিকার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা জীবনে ও মনে যাকে সত্য বলে মেনে নিতে চেয়েছিলেন তার প্রতিক্রিয়ায় সমাজে রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে এলো বিপ্লব। পূর্ব্বাচরিত সমাজ বন্ধনে এলো ভাঙনের পালা, ধর্ম্মে অবিশ্বাস। বিজয়ী জাতির অনুকরণস্পৃহা হলো প্রবল, জাতির আপন সত্যনিষ্ঠা গেল হারিয়ে। এই বিপ্লবের ফলে উঠল গ্রামে গ্রামে নিরন্ন পল্লীবাসির হাহাকার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের নির্ম্মম অত্যাচার।

বাংলার, তথা ভারতের এই সঙ্কটের দিনে, এই আত্ম-বিলোপের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। তিনি মানুষী প্রতিভার সমগ্র অধিকার নিয়েই এসেছিলেন,—আত্মমর্য্যাদাহীন পরানুসরণতৎপর নির্জ্জীব জাতির ক্ষীণ কঙ্কালে নব জীবনের উদ্বোধন করতে। সর্ব্বভাবে নিপীড়িত জাতির মর্ম্মবেদনাই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনের কারণ, এই হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম এক বিশিষ্ট যুগকে উপলক্ষ্য করে, সাধারণের নিয়মে নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় এই সাধারণ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ও তাহার সৃষ্টি প্রতিভার কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। পশ্চিমের আচমকা আলোয় জাতি যখন আপনার সম্বিৎ ফেললো হারিয়ে, সর্ব্বনাশের নেশায় উঠলো মেতে, সে-আলোয় জাগলো বঙ্কিমের নব-চেতনা, তিনি সে আলোর দেখতে পেলেন, সমাজে রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে জাতির দৈন্য. আর দেখতে পেলেন এই অমাবস্যার ঘনান্ধকারে ক্রন্দনরতা অশ্রুময়ী স্বদেশ-জননীকে। জননীর এই বেদনমুখর আর্ত্তনাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে আরো সচেতন করে তুললো, তিনি এই সর্ব্বনাশী আত্মঘাতী বিভীষিকার হাত থেকে জননীকে মুক্ত করতে কৃত সঙ্কল্প হয়ে ধ্যানতন্ময় হলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁর অবচেতনায় গেল বিলুপ্ত হয়ে, বহির্জ্জগতের রূপ রস তাঁর প্রাণে তুললোনা কোনো আন্দোলন, তিনি আপনার মর্ম্মমূলে পরমারাধ্যের রূপ প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধি কামনায় প্রশ্ন করলেন,—

"আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না ?"

শব্দ হইয়া সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে এ অরণ্য মধ্যে মনুষ্য শব্দ শোনা গিয়াছিল। কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না ?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল, তখন উত্তর হইল,—"তোমার পণ কি ?" প্রত্যুত্তর বলিল, 'আমার জীবন সর্ব্বস্ব'। প্রতিশব্দ হইল,—'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

"আর কি দিব ?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি !"

জীবন-সর্ব্বস্বদান শ্রেষ্ঠ দান নয়, কারণ মানুষ ভোগা-কাঙ্খার বা যশোলিপ্সায় জীবন দিতে পারে। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তির চরম অবস্থা প্রেম, প্রকৃত প্রেম না হলে কোনো সত্যানুষ্ঠানই হতে পারে না। আপন অভীষ্ট দেবতার প্রেমঘন মূর্ত্তি যখন প্রতি মানবে পরিদৃষ্ট হয় তখনই মানব সেবার অধিকার লাভ করে। তখন আর আত্মগরিমার অবকাশ থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম, এই প্রেম। এই প্রেমে স্বার্থের কুহক নেই, ভোগের আবিলতা নেই, ছোট বড় উচ্চনীচ ভেদ বুদ্ধি নেই,—আছে কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণানন্দময়ী ভক্তিপূতা আত্মতৃপ্তি।

অষ্টাদশ শতকের বঙ্গভাষা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী ছিল না, বিদ্যাসাগরের স্নেহপুষ্টা ভাষা জননী সবেমাত্র আধ আধ কথায় দিদিমার রূপকথা শুনছিল, সহজ সচ্ছন্দ গতিলাভ তখনো কর্ত্তে পারেনি, আপনার সুখদুঃখের আনন্দ নিরানন্দের কোনো কথাই সে বলতে শেখেনি, সুন্দরের আবাহন বাণী তাঁর অন্তরে নব নব ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করলেও সে বোবা মেয়ের মত নীরবই থাকত, আপনাকে প্রকাশ করতে পারতো না, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম তাঁকে কথা বলতে শেখালেন, তাঁর গতির প্রসারতা দিলেন বাড়ায়ে, হাসিকান্নার আনন্দরূপ বেদনায় তাঁকে করলেন মুখরা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন বের করেন, বঙ্গদর্শন নামটীও সুসঙ্গত ছিল,—কারণ বাংলাকে দেখতে গেলে ইহাই ছিল একমাত্র দর্পণ, এই দর্পণেই প্রথম রূপ পেলো বাংলার সকল সুখদুঃখের কথা, দর্শন-বিজ্ঞানের কথা, বাঙালী নিজেকে নিজের দেশকে নিজের সাহিত্যকে বোঝাবার এই পেলো প্রথম সুযোগ। জাতির প্রাণে নূতন প্রেরণা ফিরিয়ে আনলো বঙ্গদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল রাষ্ট্রগত মুক্তিকেই সব চেয়ে বড় মনে করতেন না। তিনি দর্শন-বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতিতেও জাতির অবাধ স্বাধীন মনোবৃত্তির কামনা করতেন। বহিরান্দোলনে অনাসক্ত জাতীয়তার মন্ত্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র জাতির প্রাণে অমেয় শক্তি জোগায়েছিলেন বলে বর্ত্তমান রাষ্ট্র আন্দোলনও অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয়না। তাঁর অজেয় বলিষ্ঠ

প্রাণপুরুষ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিল। তিনি কোনো একটী বিশেষ বিষয়ে নিজেকে বদ্ধ রাখিতে পারেন নি, রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাজসংস্কার সাহিত্য সৃষ্টি প্রভৃতিতেও আপনার সাধনা নিয়োগ করতঃ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাণহীন কুসংস্কারের মোহ থেকে তিনি সর্ব্বাংশে মুক্ত ছিলেন। সমাজের অন্ধ কুসংস্কারকে পদদলিত করতে তিনি যেমন নির্ভীক ছিলেন তেমনি অকুণ্ঠ উদারতার পরিচয় দিতেন সত্যের নূতন রূপকে বরণ করতে।

মানুষের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠগুণের সমাবেশ তাঁর ভেতর ছিল। হুগলী কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক। সে সময়ের রচিত ললিতা ও মানস কাব্যগ্রন্থ বিশিষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। দুর্গেশনন্দিনী ত্রয়োবিংশতি বর্ষে লিখা, ইহাতে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল সৃজনী প্রতিভা সূচিত হয়, তার পরেই রচিত হয় কপালকুণ্ডলা, তখন তিনি সপ্তবিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবক, কল্পনার রঙে রঙীন। কপালকুণ্ডলার শিল্পরূপ অতুলনীয়। ঊনবিংশতি শতাব্দী Romanticismএর যুগ। এ যুগের সাহিত্য অনেকাংশে কল্পনার অ-লোক মহিমায় মহীয়ান্। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্যে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বা সাহিত্যিকগণও ভূঁইফোড় নন, তাই তাঁরাও যুগধর্ম্মী। কপালকুণ্ডলায় ইহার পরিণতি, তাই কলালকুণ্ডলা রোমাণ্টিক। ইহার আখ্যানভাগ অলৌকিক প্রায়, সাধারণতঃ ইহা ঘটেনা। অসাধারণ পরিকল্পনায় ইহা রোমাণ্টিক।

নারীর মঙ্গলকামনা পুরুষের চিরন্তন রীতি, কামনার পরিপূর্ত্তি যেখানে ব্যাহত হয় সেখানেই ট্রাজেডির সূত্রপাত। নবকুমার সঙ্গিনীরূপে কপালকুণ্ডলাকে চায়, কিন্তু কপালকুণ্ডলা আজন্ম উদাসিনী। মুক্ত প্রকৃতির অঙ্কেই সে জাত, প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত। প্রকৃতির অবাধ মুক্তসঙ্গ ছাড়া অন্য সঙ্গকে সে জান্‌তে পারলেও সম্যক মান্‌তে পারে না। সাবলীল ঝরণা ধারার মত তার অশান্ত গতি, থামা তার স্বভাব নয়। কিন্তু পুরুষ তাতে সুখী নয় সে চায় নারীর অচঞ্চল সঙ্গ, যখন নবকুমার তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেও উদাসিনী কপালকুণ্ডলার অচঞ্চল সঙ্গলাভ করতে পারলোনা, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের মত সে যখন অতর্কিতে হল অন্তর্দ্ধান তখনই জীবনের চরম ও পরম বেদনা উঠল মূর্ত্ত হয়ে। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা হলেও যেরূপ ভাবরসসমৃদ্ধ তা' অনেক পরিণতবয়স্ক সাহিত্যিকের রচনাতেও দুর্লভ। অন্যান্য উপন্যাসগুলির আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করে আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপন করবো।

আমরা জানি—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুগণের পরিত্রাণ দুস্কৃতকারীর বিনাশসাধন ও ধর্ম্ম-সংরক্ষার নিমিত্ত ভগবানের অবতরণ। ধর্ম্মসংরক্ষণ কথাটী সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই, এবং নেই বলেই আমরা সুবিধামত অর্থ করে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র অর্থ করিলেন—"আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফুর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম" কিন্তু এ ধর্ম্মপালন উপদেশগম্য নয় যে কর্ম্মদ্বারা মানসিক শারীরিক বৃত্তিসমূহের যথার্থ পরিণতি লাভ হয়, মানুষের সে কর্ম্ম করা অনেক সময় অসম্ভব। আদর্শ গ্রহণ না হইলে এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হতে পারে না।" বঙ্কিমচন্দ্রের মতে,"সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।" তাঁহার মতে "প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"

কিন্তু নির্গুন নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের অবতরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব, কি করেই বা সীমাহীন তিনি মানুষরূপ ধরে অবতীর্ণ হবেন, এ বিরোধের মীমাংসা বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাবে করলেন, —যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না, কর্ম্ম কিরূপে করিলে ইহা ধর্ম্মে পরিণত হয় তাহা জানে না, ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন ইহার অসম্ভাবনা কি ?"

কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষা আমাদের সে বিশ্বাস রাখেনি, আমাদের হৃদয়ের সমগ্র ভক্তিভাব বিনষ্ট করে ক্ষুদ্র হীন যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাই আমরা আমাদের সেই বৈদিক সত্যকে হারিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র এই শতাব্দীর শিক্ষাকে লক্ষ্য করে বলছেন,—"উনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাঠি হইয়াছে তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সকল সম্পত্তিই হারাইতেছি।" বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার যা ব্যাখ্যা করেছেন তা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ বলেই মনে হয়, অথচ এ'নিয়ে আমাদের সভ্য সমাজে আন্দোলনের অবধি নেই, অবিশ্বাসী আমরা শাস্ত্রাদির কদর্থ বের কর্ত্তে পারলেই যেন অপূর্ব্ব আনন্দ পাই। বঙ্কিমবাবুর মতে,—'রাসলীলা গোপীগণের ঈশ্বরোপাসনা। একদিকে অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্য বিকাশ, আর একদিকে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির চরম অনুশীলন। সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেননা বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য; কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি কথিত হইয়াছে,—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত অনুরাগ মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়, এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা।"

লোকরক্ষা বা লোকহিতই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। এই হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক যুগের ধর্ম্মগুরুও বলা যায়। হিন্দুদর্শনে একথা নূতন না হলেও বিরাট ব্যক্তিত্ব সহকারে তিনিই এই মন্ত্রের প্রথম প্রচারক। আমাদের অবনতির কারণ তিনি নির্দ্দেশ করছেন,—'শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্য ব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে যদি হিন্দু-সমাজ প্রভাবান্বিত হইয়া উঠে তাহা হইলে ভণ্ডামিজাত মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্ট চেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব ও মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ, আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন জাতি অধঃপাতে যাইবে।"

আপনার হৃদয়ের প্রতি পরমাণুতে তিনি জাতির দুঃখ-দৈন্য অভাব অনুভব করতেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কেবল জাতির জন্যই নিঃশেষ হয়েছে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্যের অবজ্ঞা তাঁকে বজ্রের মত বাজত তাই তিনি দুরূহ ঐতিহাসিক তত্ত্বনিরূপনেও পরাঙ্মুখ হয়েননি।

সর্ব্বপ্রকারে অহিংস না হলে লোকহিত সাধিত হয়না, তিনি অহিংসার নূতন ভাষ্য করলেন, যা' বীরধর্ম্মানুমোদিত, তিনি বললেন,—যে মৃগ যে কুক্কুট তোমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরভরি যে তাহাকে বধ করিয়া খায় সে অধর্ম্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব, মৎস্য জলপ্রবাহের উপরিচর জীব, আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই তাহা হিংসা তাহা অধর্ম্ম। অহিংসার তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম, নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে, বরং পরম ধর্ম্ম।

আজ শতবর্ষ পরে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্পণ করে আমার বক্তব্য সমাপন করলুম।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী

---

* চট্টগ্রাম বঙ্কিম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পঠিত

নব্য জাপানের অতি আধুনিক খুঁটিনাটী

যাদুকর—পি সি সরকার

অল্প কয়েকমাস হইল জাপান হইতে ফিরিয়াছি। আমার জাপান ভ্রমণের 'সচিত্র প্রবন্ধ' ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি কয়েকটী মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিতও হইয়াছে। পাঠকবর্গের নিকট হইতে এখনও জাপানের আভ্যন্তরীন খুঁটীনাটী, উন্নতির কারণ প্রভৃতি জানিবার জন্য অজস্র অনুরোধ পত্র পাইতেছি। নব্যজাপানের আধুনিক জয়যাত্রাই বোধহয় উহার অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমানে জাপান প্রাচ্যজগতের একটী বিরাট প্রহেলিকা হইয়া পড়িয়াছে। জগতের সমস্ত প্রবল বিরুদ্ধ জাতির সম্মুখে নব্যজাপান এক অভূতপূর্ব্ব ও অলৌকিক ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বের সমগ্র প্রধান প্রধান শক্তিই আজ জাপানের নবজাগরণে ভীত ও ত্রস্ত। যুদ্ধোপকরণেই শুধু নহে—অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎপন্ন শিল্প-সম্ভার সাহায্যে অর্থনৈতিক জগতেও সে সকলের ভয় জন্মাইতেছে। ব্যবসায়ের আন্তর্জ্জাতিক বাঁধা ও অস্বাভাবিক উচ্চহারের Tax ও Duty দেওয়া সত্ত্বেও জাপানী পণ্যই পৃথিবীতে আজ সর্ব্বজন-সমাদৃত ও নিরতি-শয় সস্তা। সংগ্রাম ও সঞ্চয়-জগতে জাপান নিজের সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থাবান বলিয়াই আজ সে গর্ব্বিত চিত্তে বলিতে সাহসী হইয়াছে যে—'এশিয়া মহাদেশ হইতে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির উচ্ছেদ করিতে হইবে।' ইহা তাহাদের মদোন্মত্ত চিত্তের প্রলাপ উক্তি, না তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে করণীয় কার্য্যের প্রথম সূচনা ঘোষণা তাহাই ভাবিবার বিষয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম সন্ধ্যাতেই জাপান সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিশ্বের অপরাপর প্রবল জাতির সহিত তাল মিলাইয়া সমান সমান চলিয়াছে। প্রাচ্য জাতি সমূহ (বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও হিন্দুরা) স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্বের ধ্যানী। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জাপান বিদেশীয়দের নিকট হইতে অর্থহীন প্রশংসা বাণী শুনিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যে বিমুখ হয় নাই। লঘুচিত্ত ভারতীয়রা যখন পাশ্চাত্য জাতির চক্ষুতে 'Nation of Philosophers' সাজিয়া,—'পাত্রাধারে তৈল,—না তৈলাধারে পাত্র'—'তাল পড়িয়া ঢিপ করে,—না ঢিপ করিয়া পড়ে'—ইত্যাদি সমাধানে ব্যস্ত,—জাপান ততক্ষণ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনকে অবলম্বন করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে।

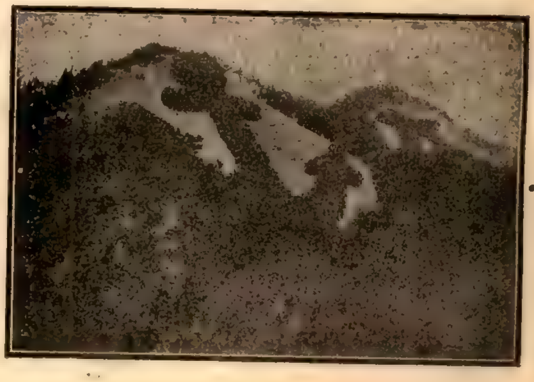

জাপানে পাহাড়ের গায়ে গাছের বিজ্ঞাপন

পরাধীন মনোবৃত্তির একটী প্রধান লক্ষণ এই যে তাহারা যে-কোন বিষয়ের একটী দোষ বাহির করিয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে গোপন করিবার হীন প্রচেষ্টা করে। তাই যখন যান্ত্রিক সভ্যতার কথা এদেশে উত্থাপন করা হয় তন্মুহূর্ত্তে এক বিরাট ধ্বনি উঠে, "না—না—উহাতে কোনও প্রয়োজন নাই। ইউরোপে যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে আজ সেখানে অসম্ভব অসুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে।" কিন্তু ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করা বাতুলতা নয় কি? তাহারা

যন্ত্রজগতের চরম উপাসকরূপে অন্যান্য দেশ চুবিয়া খাইয়া ধনকুবের সাজিবার পর যদিই বা কোন অসুবিধা তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়—এই উপবাসক্লিষ্ট নিরন্ন ভারতবাসীর পক্ষে কি তাহাই প্রযোজ্য ? আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে আমরা কিছুই জানি না এবং জানাইয়া দিলেও 'বুঝিব না'। চার্লি চ্যাপলীনের "মডার্ন টাইমস্" চিত্রটী যখন প্রথম প্রকাশিত হইল—সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী উহা কি অসম্ভব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতার চিত্র-রঙ্গমঞ্চে সপ্তাহের পর সপ্তাহব্যাপী পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে উহা প্রদর্শিত হইল। ভারতীয় মনের সহিত উহার আন্তরীক যথেষ্ট যোগ-সূত্র ছিল বলিয়াই উহার এত প্রশংসা, এত সমাদর হইয়াছিল, কিন্তু অপর পক্ষে জার্ম্মানী ও জাপান উক্ত চিত্রটী নিজেদের দেশে প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিল। চিত্রটীতে যান্ত্রিক সভ্যতার অসুবিধাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া উহা এদেশে এত সমাদৃত হইয়াছিল এবং উক্ত দোষে দুষ্ট হইয়াই উহা পূর্ব্বোক্ত দেশ দুইটীতে স্থান পায় নাই।

এ দেশের গোড়াতেই গলদ। শিক্ষার পেছনে প্রধান আদর্শই দাসবৃত্তি বা চাকুরী। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি M. Sc., B. Sc. লাভ করিয়া যে জাতি অক্লেশে B. L. পরীক্ষা দিয়া বটতলায় বসিতেছে, বিজ্ঞান সে দেশে কত অনাদৃত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাশ করিবার পর তাহাদের প্রকৃত কর্ম্মজীবনের সূচনা হয়। পাঠ্যাবস্থায় Practical Classএ যোগ দিয়া সমস্ত বিষয়ে অভ্যস্ত হয় বলিয়া পরে আপন ইচ্ছায় গবেষণা কার্য্য চালাইতে থাকে। আর এ দেশে পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিনই সন্ধ্যা বেলায় সমস্ত পুস্তক old book shopএ বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ডিগ্রিটী লাভই যেন ইহাদের পরম লক্ষ্যের চরম সার্থকতা। এই ডিগ্রির মোহই এ দেশকে দিন দিন রসাতলে টানিতেছে। জাপানের ছেলেরা জাহাজে কুলিবৃত্তি করিয়া বিদেশে যায়। বিদেশে বহুকষ্টে দিন যাপন করিবার কালে শিখিয়া আসে সে দেশের কার্য্যপ্রণালী, রীতিনীতি। পরে হয়ত সেই জাহাজের কুলিই জাপানে ফিরিয়া নূতন জাহাজ তৈয়ার করিবার পরিকল্পনা দিতেছে। এদিকে ভারতীয়রা পিতার বা স্থানীয় অভিভাবকের অজস্র অর্থের অপব্যয় করিল—বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশে যাইয়া শিখিয়া আসে তাহাদের

জাপানের বাজার

জাপানের কর্ম্মব্যস্ত থিয়েটার ষ্ট্রীট

মাথার উপর দিয়া গমনকারী রেলগাড়ী

বাহ্যিক দোষগুলি, সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে ডজনখানেক বিলাতী ডিগ্রি ও বটতলায় বসার সাজসরঞ্জাম। প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণা যেখানে নাই সেখানে বিদ্যার আসন ঐ ডিগ্রিতেই শুধু পর্য্যবসিত হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে যত কলকারখানা বা ফ্যাক্টরী আছে প্রত্যেকটি বিরাট দৈত্যের মত। ঐরূপ বিরাট যন্ত্রপাতি সাহায্যে উৎপন্ন করাই সেখানকার প্রথা, এবং এদিকে জাপানে যান্ত্রিক সভ্যতাকে পোষ মানাইয়াছে

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সাথে। জাপানের ঘরে ঘরে ছোট ছোট পরিমাণে জিনিষ গঠিত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে বিদেশে রপ্তানী হয়। পেছনে আছে 'গভর্মেণ্ট' রক্ষাকর্ত্তা। সে দেশে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাবান এবং একে অপরকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেছে। সেইজন্যই জাপানের প্রত্যেক কারখানা হইয়াছে উহাদের ফুলের

যাদু সম্রাট পি, সি, সরকার

বাগানের মতই রমণীয় ও সুন্দর। পরস্পরে এত মিল আছে বলিয়াই জাপানের কুটীর শিল্পও এত প্রধান হইয়াছে। বেচারা ভারতবর্ষেরই বা দোষ কি? এ দেশের ধর্ম্মের আদর্শ লইয়াই গোলমাল। একজনে বলিবেন মূর্ত্তিপূজা ভাল অপরজনে বলিবেন উহা বর্ব্বরতার পরিচায়ক। আবার ঐ এক মূর্ত্তিপূজাতেই একজনে খাইবেন পাঁঠা মাংস ইত্যাদি অপরজনে বলিবেন খাইতে নিরামিষ ডাঁটা শাক আর পুঁই চচ্চরী। যেখানে দেবতা দেবতাতে বিরোধ সে দেশের দেবতার সেবাইতে সেবাইতে ঝগড়া হওয়া বিচিত্র নয়। মতের মিল না হইলে মনের মিল করা কষ্টকর। আমাদের ধর্ম্ম নাই—আছে শুধু ধর্ম্মের গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামিও অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ববাদই আমাদিগের পথের প্রকাণ্ড বাধা।

Palmist, Astrologer প্রভৃতি হাত দেখার জ্যোতিষী জাপানে মোটেই আদর পায়না। ভারতীয়দের ন্যায় অদৃষ্টবাদী তাহারা নহে—তাহারা জানে পুরুষকার, তাহারা জানে উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীকে লাভ করিতে পারে—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' এখনও এত কষ্টে হাসি পায় যখন কলিকাতার হেদো পুকুরের ধারে জ্যোতিষীদের কথা মনে হয়। ভদ্রলোকের ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া বেকার বসিয়া আছে—কোনভাবে উদরান্নের সংস্থান না করিতে পারিয়া হাতদেখার ফাঁদ পাতিয়াছে। মাত্র দুই আনা পয়সা লইয়া ভবিষ্যৎ (?) বলিয়া দিতেছে। বেকারের উপর আবার বেকার! অপর শিক্ষিত বেকারদল চাকুরী না পাইয়া অধোবদনে ঐ জ্যোতিষীদের নিকট হাত গণাইতেছে

জাপানের একটী জলপ্রপাত

"চাকুরী হইবে কবে?" জাপানের যুবকরা কখনও ঐরূপভাবে বসিয়া কাটায় না, তাহারা এ ঘর হইতে ওঘর যাইবার

কালেও তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া যায়—সময়ের মূল্য তাহাদের বেশী।

সে যাহাই হউক, বক্তব্যবিষয় ছাড়িয়া বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। চীন ও জাপান পাশাপাশি দুইটী রাজ্য হইলেও উভয়ের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি এক হইলেও—পার্থক্য উহাদের মধ্যে অনেক বেশী। সমগ্র জাপানীরা এক ভাষায় লেখাপড়া করে ও এক ভাষায় কথা বলে। কিন্তু চীন এমনই হতভাগ্য যে একে অন্যের কথা বুঝিতেও পারে না। ক্যাণ্টনের কথা আময়ের কথা ও সাংহাইর কথা সবই বিভিন্ন, অথচ সবই চীনা ভাষা। নিজেদের দেশের লোকজনের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহা সেখানে অসম্ভব, কাজেই পরস্পরের ভেদবুদ্ধিই সেখানে এ যাবৎকাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাদের লিখিবার ভাষাও বিভিন্ন ছিল। কিছুদিন হয় উহাদের রাষ্ট্রপতি সান-ইয়াৎ-সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বর্ণমালার অক্ষর সমগ্র চীনে এক করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থাও অনুরূপ—বাঙ্গালী আজ বোম্বাই বা মান্দ্রাজ বা পঞ্জাবে (এমন কি ঘরের কোণে উড়িষ্যায়) গেলে ইংরাজীতে উভয়ের আলাপ আলোচনা করিতে হয়। ভারতবর্ষের নিজস্ব এমন একটী রাষ্ট্রীয় ভাষা নাই যাহা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী চলিবে। উহা আমাদের পক্ষে কতটা লজ্জার কথা! বর্ত্তমানে যেরূপ সমগ্র ভারতীয়ে ভারতীয়ে মিলনের প্রচেষ্টা হইতেছে তৎসঙ্গে ভাষার ঐক্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন। নিখিল ভারতবর্ষকে এক ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাতলে সমবেত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয়কে এক ভাষাভাষী করিবার চেষ্টা হওয়ার প্রয়োজন—নতুবা এ দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত।

কোবে সহরে একটী রোপ-ওয়ে

লঘুচিত্ত ভারতীয়রা বিদেশীয়দের নিকট হেয় ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে যে দেশে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহামানবের জন্ম হইয়াছে—তাঁহাদিগের জীবদ্দশায়—তাঁহাদেরই জন্মভূমিবাসীদের সম্বন্ধে প্রবেশদ্বারে লেখা থাকে—"Dogs and Indians are not allowed". ভারতীয়ের প্রতি জাপানী মনোবৃত্তি এখান হইতেই ধরা

পড়ে। এ দেশ সং সাজিবার দেশ, যন্ত্রজগতের পরম পূজারীর রাজ্য হইতে আসিয়া সেদিন নোগুচি ঢিলা জামা পরিয়া 'বুদ্ধদেবের রূপকথা' শুনাইয়া গেল। আমরা দলে দলে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন দিয়া বরণ করিলাম—ভ্রমেও মনে হইল না বা জিজ্ঞাসাও করিলাম না তাহাদের দেশে (জাপানে) কি হইতেছে? বুদ্ধদেবের দেশে আসিয়া সেই প্রবাদের 'মায়ের কাছে মামার বাড়ীর গল্প' বলিয়া

তাঁহারও দোষ দেওয়া চলে না, Mother India লেখিকাকেও নহে। আমাদের লক্ষ্য বৈরাগ্যভাবাপন্ন—রাজসিকতার লেশমাত্র ইহাতে নাই। যখন জাপানের রাষ্ট্রপতি অজস্র বন্দুক কামানের ও যুদ্ধ জাহাজের সারি সারি দ্বারা অভিনন্দিত হয়, যখন ইতালীয় রাষ্ট্রপতি কামানের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন, চতুর্দ্দিকে যখন সকলে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যুগের আবেষ্টনে আছেন—

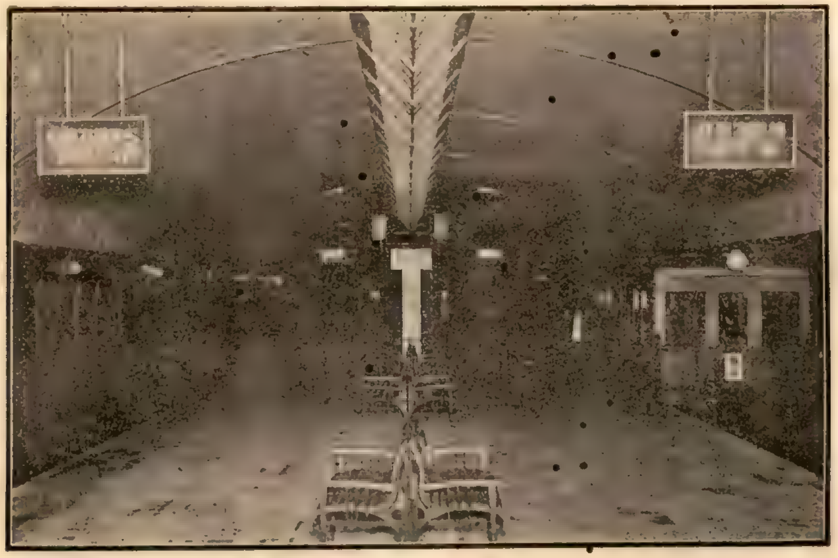

মাটীর নীচে রেলষ্টেশন

বাহাদুরী লইয়া গেল। অথচ তাহারা নিজের দেশে ত কেহ বুদ্ধদেবের গল্প শুনে না বা ঢিলা জামা পরিয়া বেড়ায় না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি তাহাদের বর্ত্তমান পোষাক কোট-প্যাণ্ট-সুট ও মেয়েদের বিলাতী ধরণের গাউন। আমরা সাধুর বেশে মুগ্ধ হইয়া যাহাকে সাধুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম—সেই ব্যক্তিই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া—যাহাদের মালা চন্দন পাইয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে লিখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে—"India is a country of beggars."

আমাদের রাষ্ট্রপতি তখন গরুর গাড়ীতে চড়িয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করেন।

ভারতীয় সভ্যতা, রীতিনীতি সমস্তর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। নিখিল ভারতের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নব্য জাপানের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ভারতীয় মনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করুক।

পি সি সরকার

প্রশ্ন

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

মনে যেন হয় জীবন ভরিয়া,—
আমার হিয়ার তলে,
কতবার আসি' দিয়া গেছো ডাক—
গভীর কৌতূহলে।

শুনেছি কভু বা কভু শুনি নাই,
চরণচিহ্ন হেথা সেথা পাই,
বিস্ময়ে আমি ভাবি ব'সে তাই,
আসো যাও কোন ছলে।
গগনে হেরিনু কিরণ তোমার,—
আলোক-ধারায় ঝলে।

শতবার তোমা হেরি' শতরূপে,
পরিচয় নাহি যেন—
হে বিশ্বদেব, নিঃস্বের দ্বারে
আগমন তব কেন ?

আমারি বিশ্ব ভরি' দিলে তব
অপরূপ দানে নিতি নব নব,
পরশ তোমার করি অনুভব,
দিনে রাতে প্রতি পলে।
রহস্যময় তব কেন তুমি
হিয়ার গহন-তলে ?

বুক-ঝাঁপ

শান্তি পাল

এই বুক-ঝাঁপ শিক্ষা করিবার সময় ঝম্পী প্রথমত সরল ভাবে ঝম্প-মঞ্চের উপর এমন ভাবে দাঁড়াইবেন, যাহাতে পায়ের আঙুলের টিপ মঞ্চের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। সাধারণ সন্তরণ ও যাত্রার পূর্ব্বে এই কায়দা প্রযোজ্য। পদদ্বয়ের বলে ঝম্পী মঞ্চের উপর দৃঢ়ভাবে চাপিয়া অবস্থান করিবেন। ঝাঁপাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ফুসফুসের স্ফীতির দিকে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিবেন। হাঁটু দুইটি ঠিক পাশাপাশি রাখিবেন এবং শরীরের ভার সমভাবে দুই পায়ের বলের উপর স্থাপন করিবেন। তারপর হাত দুইটি ধীরে ধীরে একবার সম্মুখে ও একবার পশ্চাতে দোলাইয়া ধীরে ধীরে প্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেকবার হাত সম্মুখের দিকে দোলাইবার সময় গোড়ালিদ্বয় মঞ্চের সামান্ত উপরে উঠাইবেন। প্রশ্বাস গ্রহণ অল্প ও নিশ্বাস ত্যাগ দীর্ঘ হইবে। এইভাবে ফুসফুস উত্তমরূপে পরিষ্কার হইবার পর একটা সুদীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া ঝম্প প্রদান করিবেন। পদদ্বয় মঞ্চ পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি শরীরের সহিত সরল রেখায় মস্তকের উপরদিকে স্থাপন করিবেন। ঝম্প প্রদান করিবার সময় দেহ এমন ভাবে রাখিবেন যেন মঞ্চ হইতে দশ বারো ফুট দূরে দেহ জল-প্রবেশ করে এবং জলের মধ্য দিয়া পঁচিশ হইতে তিরিশ ফুট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া সম্মুখের দিকে সেই গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন দেহ যেন বেশি গভীর জলে প্রবেশ না করে। জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সময় দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিয়া আঙুলগুলি সোজা রাখিয়া হাতের পাতা দুইটি প্রসারিত রাখিবেন। পায়ের পাতাও যতদূর সম্ভব উপর দিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া রাখিবেন এবং শরীরও যতদূর সম্ভব শক্ত করিয়া সরল রেখার ন্যায় রাখিবেন। জলের মধ্যে শরীরকে কি ভাবে কোন চাপে রাখিবেন সে অভিজ্ঞতা ধারাবাহিক অনুশীলনে লাভ হয়।

দেহ যে সময় জলের উপর উঠিবে, তখন লক্ষ্য রাখিবেন হাত এবং মাথা যেন জল হইতে বেশী উর্দ্ধে না উঠিয়া ঠিক জলরেখার উপরেই থাকে। এই সময় যুক্ত হস্তদ্বয় ও মস্তকের দ্বারা দিক ঠিক করিয়া লইবেন। লক্ষ্য রাখিবেন দেহ ও মাথা যেন বেশী ভাসিয়া না উঠে। যদি পদদ্বয় ভাসিয়া না থাকিয়া ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করে, তাহা হইলে হাঁটু ঈষৎ ভাঙিয়া পা দুইটি সামান্য বাঁকাইয়া রাখিবেন। এই কায়দায় ঝম্পী শরীরের তোল বা 'ব্যালেন্স' পাইবেন।

ভাল ঝম্পী হইতে হইলে নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজন। মঞ্চের উচ্চতার তারতম্যের সহিত ঝম্পী কি ভাবে কোন্ চাপে বা 'এ্যাঙ্গেলে' দেহ স্থাপন করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন বা জলে প্রবেশ করিবেন বা জল-নিম্ন হইতে উঠিবেন বা জলে উত্তমরূপে ভাসিবেন বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে, শ্বাস ক্রিয়ার অনিয়মতা ঝম্পীর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেইজন্য ঝম্প প্রদান করিবার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব ফুসফুসে বিশুদ্ধ বায়ু পূর্ণ করিবেন।

আজকাল প্রতিযোগীতার তালিকায় বুক ঝাঁপ দেখা যায় না। আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিকেও ইহার স্থান নাই। কিন্তু ইহাকে আলঙ্কারিক সন্তরণমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

খড়কুটো

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য পরিচয়

স্যানাটোরিয়মের বাহিরের অভ্যর্থনা গৃহ। প্রশস্ত ঘর, দেয়াল-গুলির রং সাদা। বাঁ দিকের দেয়ালে চারটি জানলা, একটি প্রবেশ দ্বার। পিছনের দেয়ালের দরজার মধ্য দিয়া শয়ন গৃহ দেখা যাইতেছে, সেখানে রোগীদের সারি সারি বিছানা, দু একজন রোগীর মুখও দেখা যাইতেছে, তাহারা গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। দরজার পাশে বইয়ের আলমারি। ডান দিকের দরজা দিয়া রোগীদের পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ দিকেই সামনের দরজা দিয়া আফিসগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার পাশেই রোগীদের খাইবার ঘর। ঘরের মাঝে একটি গোল টেবিল, তাহার উপর সবুজ শেড্ দেওয়া একটি ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্প। দেয়ালের গায়ে গায়ে আরো কয়েকটি ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে। টেবিলের উপর নানাপ্রকার ম্যাগাজিন স্তূপীকৃত, উহার চারিদিকে কয়েকটি চেয়ার এবং ইজি চেয়ার, জানলার ধারে ধারে কয়েকটি রকিং চেয়ার। বাঁ দিকের দেয়ালের কাছে ছোট টেবিলের উপর একটি গ্রামোফোন।

সময়, শীতকালের সন্ধ্যা, রাত্রি ৮টা, পূর্ব্ব ঘটনার এক সপ্তাহ পর।

যবনিকা উঠিতে দেখা গেল মুরারী সোম বাঁ-দিকের একটি চেয়ারে বসিয়া আছে। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, লম্বাটে রোগা চেহারা, মুখটা কিছু ফ্যাকাশে, চোখের কোল বসা, গালে টোল পড়িয়াছে, এত অল্প বয়সের পক্ষে শরীরটা কিছু ভগ্ন বলিয়া মনে হয়। চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিদীপ্ত, অসতর্ক অবস্থায় থাকিলে ক্লান্ত ও বিমর্ষ দেখায়, কিন্তু এ-ভাব কাহারো নিকট ধরা পড়ে না, লোক দেখিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহাতে হাল্কা হাস্যবিদ্রূপের ভাব আসিয়া পড়ে। মুখেরও সেই ভাব হয়, বিমর্ষতা এক মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া গিয়া ভালমানুষি হাসির রেখা দেখা দেয়। নিজের জীবনে যেন সে খুসি নয়, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত এত বেশি তিক্ত হইয়া ওঠে নাই যাহাতে পরের কাছে সেটা প্রকাশ পাইয়া যায়। কথাবার্ত্তায় হাবভাবে সর্ব্বদাই মুখর ও চঞ্চল, কিন্তু এটা যেন চেষ্টাকৃত, আসল প্রকৃতিটা এরূপ নয়। যখন দাঁড়ায় তখন সম্মুখে অল্প ঝুঁকিয়া পড়ে, কাঁধ দুইটি গোল হইয়া যায়। পরণের পোষাক পরিচ্ছদ কতকটা অযত্ন বিন্যস্ত। এখন সে চেয়ারে বসিয়া হাতে একটি বই খুলিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দৃষ্টি সে দিকে নাই, অন্যমনস্কভাবে সম্মুখে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে। গ্রামোফোনে একটা কি গৎ বাজিতেছে। একপাশে আফিসের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া মিস্ গীতিকা মিস্ হেমপ্রভার সহিত মৃদুস্বরে কি কথা বলিতেছে। মিস্ গীতিকার বয়স হইয়াছে, মুখের ভাব কঠিন কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত, মুখের ভাব দায়িত্বপূর্ণ এবং গম্ভীর, কিন্তু চোখে কোমল দয়ার্দ্র দৃষ্টি। মিস্ হেমপ্রভার বয়স আন্দাজ কুড়ি, লম্বা রোগা চেহারা; সৌন্দর্য্য আছে এবং সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন, নিজের স্বভাবগত চাঞ্চল্যকে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। দুজনের পোষাকেও কিছু পার্থক্য আছে। মিস্ গীতিকার পোষাক আগাগোড়া শুভ্র, পুরা সিস্টার নার্সের মতো এবং মাথায় তদুপযুক্ত টুপি। মিস্ হেমপ্রভার গায়ে নীল ইউনিফর্ম আঁটা, শিক্ষানবীশের উপযুক্ত পোষাক। গ্রামোফোনের রেকর্ড শেষ হইয়া গেল। মুরারী কেবল একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; গ্রামোফোনের কল ঘুরিতে থাকিলেও উহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য উঠিল না। মিস্ হেমপ্রভা তাড়াতাড়ি গিয়া কলটি বন্ধ করিয়া দিল। মিস্ গীতিকা আফিসের ভিতরে চলিয়া গেল।

মিস্ হেমপ্রভা। (গ্রামোফোন হইতে রেকর্ডটি খুলিয়া লইয়া কৃত্রিম কোপের সহিত) আপনি তো বেশ, বাজনা কখন শেষ হয়ে গেছে তবু কলটা বন্ধ করলেন না, গ্রামো-ফোনটা নষ্ট হয়ে যেতো যদি?

মুরারী। (হাসিয়া) বাঁচা যেতো তা হলে। (মিস্ হেমপ্রভা একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিলেন। মুরারী ঠাট্টা করিয়া হাসিমুখে বলিল) ঐ কলের বাজনাটা ক্রমাগত বাজে, আর আমাকে আপনার গলার সুরটা শুনতে দেয় না। অথচ আসল সঙ্গীত তো তাই, ওটা তো কেবল কলের আওয়াজ।

মিস্ হেমপ্রভা। (হাসিতে হাসিতে মুরারীর চেয়ারের নিকট আসিল) দেখুন আপনাকে আমার কি মনে হয় বলবো? আপনি হচ্ছেন হাড় খোষামুদে। আমি শুনেছি, খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ঐ রকমই খোষামুদে হযে থাকে।

মুরারী। ভয়ানক অন্যায় কথা বলচেন। (কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত) আর আমার পেট চালানোর কাজের সম্বন্ধে কোনো কথা উল্লেখ করাই আপনার উচিত নয়। এখানে যতদিন আছি ততদিন আমার ছেঁড়ালেঠা কাজের কথা ভুলেই থাকতে চাই।

মিস্ হেমপ্রভা। (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু লেখার কাজ তো খুব ভাল! লিখতে পারা সহজ কথা নয়, এ একটা গর্ব্বের বিষয়! আমি যদি লিখতে পারতাম তা হলে তো খুসিই হতাম।

মুরারী। (মুখ ভাব করিয়া) আমি খুসি হই না। আর আমি যে কাজ করি সেটা ঠিক সাহিত্যের কাজ নয়, খবরের কাগজে খবরগুলো লিখি মাত্র। (অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে) যাক্। আমি একটা কথা জানতে চাই। কতদিনে আমাকে এখান থেকে সবিযে আলাদা কটেজের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে জানেন?

মিস্ হেমপ্রভা। বোধ হয় শীঘ্রই যাবেন, তার জন্যে ব্যস্ত কি? (মুরারী একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চেয়ারে নড়িয়া চড়িয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিল) কেন, হোলো কি আপনার? এখানে থাকতে বুঝি ভাল লাগছে না, আমাদের বুঝি আর পছন্দ হচ্ছে না?

মুরারী। (হাসিয়া) ও, আপনার কথা ছেড়ে দিন,—আপনাদের খুবই ভাল লাগে। (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু এ রকম সকলকার সঙ্গে থাকতে আমার ভাল লাগে না। (শয্যাগৃহের দিকে হাত দেখাইয়া) পাশাপাশি কত রোগী শুয়ে আছে। তার মধ্যে থেকে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। কত লোকের কত কষ্ট হচ্ছে দেখি, অথচ তার কিছুই করতে পারি না; কেমন যেন বিশ্রী লাগে।

মিস্ হেমপ্রভা। কি করবেন বলুন, এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম। সকলকেই প্রথমে এখানে এসে কিছুদিন থাকতে হয়, তার পর যখন ডাঃ সরকার বুঝতে পারেন যে রোগী এখান থেকে কটেজে বদ্‌লি করার উপযুক্ত হয়েছে, তখন তাকে এখান থেকে সরিয়ে কটেজে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আপনি এখন ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারছেন আর ওরা বিছানায় শুয়ে আছে, তবু আপনার অসুখের অবস্থাটা এখনো ওদেরই মতো, তা ভুলে যাবেন না।

মুরারী। আমি তা জানি। কিন্তু ওদের অসুখ যতটা বেশি আমারো যে ততটা বেশি, তা কিছুতেই মনে হয় না।

মিস্ হেমপ্রভা। (বিজ্ঞের ন্যায়) ওরাও কেউই সে কথা ভাবে না।

মুরারী। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্লেষের স্বরে) ঠিক বলেছেন। একটা আশার স্বপ্ন আমাদের সকলকেই ঠিক সমান ভাবে ভুলিয়ে রাখছে, নয় কি?

মিস্ হেমপ্রভা। না না, আপনার তো খুসি থাকাই উচিত। আপনার ভাগ্যটা খুব ভাল তা জানেন? (নিম্নস্বরে) চুপি চুপি বলি শুনুন, আপনার টিকিটের সমস্ত চার্টগুলো আমি দেখেছি, আপনার সত্যি সত্যিই ভাবনার কিছু নেই। ডাঃ সরকার আপনার কথা নিয়ে সেদিন ঠাট্টা করছিলেন। তিনি বলছিলেন আপনার কেসটা তাঁর পক্ষে দেখবারই উপযুক্ত নয়, আপনার রোগটা এত তুচ্ছ।

মুরারী। (খুসি হইল কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া শান্তভাবে) ও, তা হবে। ডাক্তার সরকারের রহস্যবোধ আছে দেখছি।

মিস্ হেমপ্রভা। আমি জানি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। প্রায় এক সপ্তাহ হোলো এখানে এসেছেন, এখানে সকলেই শুযে আছে আর একা একাই আপনাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, কথা বলবার কেউ লোক নেই। কিন্তু আজ এখানে আর একজন নতুন রোগী আসছে, একটি মেয়ে। সে হয়তো আপনার সঙ্গে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে। (হাতের রিষ্ট ওয়াচ দেখিয়া লইয়া) এতক্ষণে তার এসে পড়া উচিত, নইলে আর তো ট্রেণ নেই!

মুরারী। (আগ্রহের সহিত) একটি মেয়ে বুঝি?

মিস্ হেমপ্রভা। হাঁ।

মুরারী। (মৃদু হাসিয়া) বয়স কম বুঝি ?

মিস্ হেমপ্রভা। আন্দাজ ১৮।১৯ হবে। (বিদ্রূপ সহকারে) এইবার বুঝি জানতে চাইবেন মেয়েটি সুন্দরী কি না ? পুরুষ মাত্রেই এমনি বটে, তা রোগীই হোক আর নীরোগীই হোক। মেয়েটি চৌধুরী, এ খবরটুকুও জানি, কিন্তু আর কোনো খবর এখনো জানতে পারি নি।

মুরারী। চৌধুরী ? কোথাকার ?

মিস্ হেমপ্রভা। আপনি তাকে নিশ্চয় চেনেন না। আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানকার লোক নয়, অন্য জায়গা থেকে আসছে।

মিস্ গীতিকা। (আফিসের দরজার কাছে আসিয়া) মিস্ হেমপ্রভা !

মিস্ হেমপ্রভা। এই যাচ্ছি। (চুপি চুপি মুরারীকে) এইবার আপনাদের সেই বিশ্রী তেতো পথ্যগুলো খাবার সময় হয়েছে, বুঝলেন ?

(মিস্ হেমপ্রভা তাড়াতাড়ি আফিসের দিকে চলিয়া গেল, এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া শয্যা গৃহের দিকে প্রবেশ করিল। বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়ানোর শব্দ হইল। কিছুক্ষণ পরে দরজায় ধাক্কা পড়িল এবং কলিং বেল্ বাজিয়া উঠিল। কয়েকটি মানুষের গলায় তর্কাতর্কির শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলী হইয়া মুরারী চেয়ারের উপর উঠিয়া বসিল। মিস্ গীতিকা আফিস হইতে আসিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। লীনা প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে সুটকেস হাতে ফণী ও বলাই আসিল।)

লীনা। আমার নাম লীনা চৌধুরী। ডাঃ গাঙ্গুলি বোধ হয় আমার সম্বন্ধে আপনাদের—

মিস্ গীতিকা। (হাত ধরিয়া মিষ্টস্বরে) হাঁ, সমস্ত দিনই আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। আমার নাম মিস্ গীতিকা। তুমি বুঝি লাষ্ট্ ট্রেণে এলে ?

লীনা। (মিস্ গীতিকার হৃদ্যতায় মুগ্ধ হইয়া নমস্কার করিয়া) হাঁ, মিস্ গীতিকা। ইনি আমাদের বন্ধু।

(মিস্ গীতিকা উঁহাদের নমস্কার করিল। উহারা দুইজন হাঁ করিয়া এখানকার ঘর দুয়ার দেখিতেছিল। বলাই মদ্যপান করিয়া আসিয়াছে, মুখটা লাল হইয়াছে, ভারী গলায় বোকার মতো কথা কহিতেছে। ফণীর ভাবটা সর্বদা সন্ত্রস্ত, যেন একটা বিরক্তিকর কর্তব্য পালন করিতে আসিয়াছে, বিরক্তিটা কোনো রকমে চাপিয়া আছে, কাজ শেষ করিয়া সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত। বলাইকে লইয়াও সে যেন বিব্রত, মধ্যে মধ্যে তাহার দিকে ঘৃণাভরে ক্রূদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।)

মিস্ গীতিকা। (বাঁ দিকের জানলার পাশের চেয়ারগুলি দেখাইয়া দিয়া) আপনারা এইখানে বসুন না, দাঁড়িয়ে রৈলেন ? (বলাই একটা শব্দ করিয়া নিকটস্থ চেয়ারে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ফণী ইতস্তত করিতে লাগিল, সুটকেসটা কোথায় রাখিবে ভাবিতে লাগিল। মিস্ গীতিকা লীনার দিকে চাহিয়া) এখনি তোমার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এসো। তোমার ঘরটর সব ঠিক করা আছে। আমার সঙ্গে তুমি চলে এসো—(পিছনের দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

লীনা। (ফণীর প্রতি) এইবার সুট-কেসটা আমাকে দাও।

মিস্ গীতিকা। (তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া) না না; সর্বনাশ, তুমি নেবে কি ? আপনি সুট-কেসটা ঐখানেই নামিয়ে রাখুন। ওটা লীনার ঘরে এখনি নিয়ে যাওয়া হবে। (লীনার প্রতি তর্জ্জনী হেলাইয়া মিষ্ট ভৎ‌সনার স্বরে) এখানকার এই প্রথম নিয়মটি শিখে রাখো—পরিশ্রমের কোনো কাজই তুমি করতে পাবে না। এ নিয়মটি মানা অত্যন্ত দরকার। তুমি দেখতে পাবে আলস্য করাটা আমাদের কাছে নিন্দার জিনিষ নয়, ঐটেকেই আমরা মস্ত গুণ বলে থাকি।

লীনা। (অপ্রস্তুত হইয়া) আমি—আমি জানতাম না—

মিস্ গীতিকা। (হাসিমুখে) তাই তো তোমায় জানিয়ে দিলাম। আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে। তোমার ঘর দেখবে এসো। সেখানে গিয়ে তোমার একটা টিকিট করে দেবো, আর এখানকার নিয়মগুলো সব তোমায় বুঝিয়ে দেবো। ততক্ষণ ওঁরা বসে গল্পটল্প করুন। আমরা আবার এখনি ফিরে আসছি, বেশি দেরী হবে না।

ফণী। (কিছু বলা প্রয়োজন ভাবিয়া) হাঁ, হাঁ, আপনারা ঘুরে আসুন না, আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করচি।

(বলাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ফণী তাহার পাশে গিয়া

বসিল। মিস্ গীতিকা ও লীনা চলিয়া গেল। মুরারী নিজের চেয়ারটা ঘুরাইয়া লইয়া এমনভাবে বসিল যাহাতে বই পড়িবার ভাণ করিতে করিতে উহার এই দু'টি লোককে আড়চোখে দেখিবার সুবিধা হয়।)

বলাই। (চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া নিজের ওভারকোটের পকেটে হাত ভরিয়া কি খুঁজিতে লাগিল) ক্যারকেরে মাগীটা গেছে বাঁচা গেছে, এইবার এক ঢোঁক খেয়ে নিই, পেটটা কেমন যেন করচে। (পকেট হইতে বোতল বাহির করিল)

ফণী। (ব্যস্ত হইয়া) না না, বের করবেন না, ওটা পকেটে শিগ্‌গির ঢুকিয়ে রাখুন। (নিম্নস্বরে) দেখছেন না, ঐ চেয়ারে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন ?

বলাই। (তাড়াতাড়ি এক ঢোঁক পান করিয়া লইয়া) আঃ, ওতো বেটা ছেলে, ওকে আবার ভয় কি ? পেলে ওই হয় তো এক ঢোঁক খেয়ে নেবে। (বোতল লইয়া মুরারীকে পান করিতে দিতে অগ্রসর হইতেছিল, ফণী তাহার হাত চাপিয়া ধরিল)

ফণী (চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল যে মুরারী একমনে বই পড়িতেছে) বসুন, বসুন। দেখচেন না এ লোকটিও একটি রোগী, এ সব খাওয়া ওর বারণ—

বলাই। (বিরক্তভাবে) হাঁঃ, রোগী তো রোগী ভারী ভদ্রলোক, অসাড় হয়ে কেবল বইই পড়া হচ্ছে মুখে একটা ভদ্রতার কথা নেই! আর এখানকার ব্যবস্থাই বা কি রকম, রোগীদের কেবল বই পড়তে দিয়ে আরো খারাপ করে ফেলে! এমনি করে কুঁড়ের মতো বসে বই প'ড়ে প'ড়েই তো আমাদের ঘরের মেয়েগুলো এই সর্ব্বনাশ ঢোকালে! (গলা চড়াইয়া) হাঁসপাতাল না ছাই, যত সব চোরের আড্ডা, কেবল লোকের সর্ব্বনাশ করে!

ফণী। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) বোতলটা রাখবেন কি না বলুন তো। আর এমন করে অভদ্রের মতো চেঁচাবেন না, এটা তাড়িখানা নয়।

বলাই। (চেষ্টাকৃত শান্তস্বরে) আমার যখন হয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই বোতল রেখে দেবো, তোমায় অত উপদেশ দিতে হবে না।

ফণী। (বিরক্ত হইয়া) ছি ছি, আপনি বেজায় মাতাল হয়েছেন।

বলাই। (রাগিয়া উঠিয়া) মাতাল,—আমি মাতাল ? নিজেও কি কম মদটা খাও বাবা যে আমায় বল মাতাল ?

ফণী। (চেয়ার হইতে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় জোড়হাত করিয়া) আপনাকে জোড় হাত করছি, একটু চুপ করুন, ভেবে দেখুন কোথায় এসেছেন আপনি। লীনা শুনলে বলবে কি ? প্রথম দিনেই যদি আপনি এই পরিচয় দেন, তার পক্ষে কি সেটা ভাল হবে ?

বলাই। (বোতলটি পকেটে রাখিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মতো চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল) এখানকার কাণ্ড-কারখানা যা দেখছি, যেন একটা মস্ত বড় হোটেল, বড় লোকদের স্ফূর্ত্তি করবার জায়গা। এ-তো গরীবদের হাঁসপাতাল নয়, অথচ গরীবদের এর জন্যে গাঁঠের পয়সা খরচ করতে হবে।

ফণী। (ভয় পাইয়া) শ্ শ্—এবার একটু চুপ করুন!

বলাই। আর শ্ শ্ শ্ করতে হবে না। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি ? হতভাগা ডাক্তারটা আমাকে যদি না শাসিয়ে রাখতো তা হলে আজই এই রাত্রেই আমি লীনাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেতাম।

ফণী। (ব্যস্তভাবে চাহিয়া) ওরা কত দেরী করছে ? গাড়ীটা আমাদের জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, ফিরে যাবার লাষ্ট ট্রেণটা ধরতে হবে। ট্রেণটা ফেল করলেই মুস্কিল!

বলাই। (রাগান্বিতভাবে) হাঁ, ওকে এখানে ফেলে কোন রকমে পালাতে পারলে বুঝি বাঁচো ? অথচ ওকে বিয়ে করবার জন্যে প্রস্তুত, ভালবাসার বুঝি ভাণ করো ? (ফণী যেন অপরাধীর মতো মুখে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুরারী কাণ খাড়া করিয়া রহিল এবং মধ্যে মধ্যে ফণীর দিকে আড়চোখে চাহিতে লাগিল। ফণী ইহা দেখিতে পাইল, চোখে চোখ পড়িতেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। বলাই ইতিমধ্যে বলিয়া যাইতে লাগিল) বুঝেছি, তোমার হৃদয় ব'লে কোন পদার্থই নেই,—ও বেচারা এতদিন

ধরে তোমার পিছু পিছু ঘুরেছে—এখন যেমনি শুনেছো ওর থাইসিস্ হয়েছে,—অমনি ওকে ফেলে সরে পড়বার জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত।

ফণী। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া) মিথ্যে কথা! (হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কম্পিতস্বরে) কি বলবো, আপনার এখন কোনো জ্ঞান-চৈতন্য নেই, নইলে—(মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলাইয়ের কথা চাপা দিবার জন্য বলিল) দেখে আসি গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে কি না। (বাহিরে চলিয়া গেল)

বলাই। (উহার যাইবার পথে চাহিয়া চাহিয়া) যা, যা, যা,—তুই আবার একটা মানুষ না কি? (এইবার মুরারীর দিকে চাহিয়া নম্র গলায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল) হাঁ বাপু ইয়ংম্যান, তুমিও বুঝি একজন থাইসিস রোগী?

মুরারী। (খুসি হইয়া হাসিয়া) আজ্ঞে হাঁ, আমিও একজন থাইসিস রোগী।

বলাই। আমার নাম হচ্ছে বলাই চৌধুরী। তোমার নামটা কি জানতে পারি?

মুরারী। আমার নাম মুরারী সোম।

বলাই। (দুই হাতে জানু চাপড়াইয়া) অর্থাৎ কায়স্থ, আমার জাত ভাই। (মুরারী স্বীকার করিয়া মাথা নাড়িল। বলাই বেজায় খুসি হইয়া অন্তরঙ্গভাবে বলিল) তুমি তো তা হলে আমার আপন জন। লীনাকে তুমি দেখা শোনা করতে পারবে। ঐ যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে এলো, ও হচ্ছে আমার নিজের মেয়ে। তোমারও যেমন থাইসিস হয়েছে, ওরও তেমনি থাইসিস হয়েছে।

মুরারী। তা দেখাশোনা করবো বৈ কি, আমার যথা-সাধ্য করবো।

বলাই। করবে বৈ কি, করবে বৈ কি। তা ছাড়া যে রকম ব্যাপার দেখছি, এখানে তো ও থাকাই থাকবে। (করুণ স্বরে) আমার কপালেই যত কষ্ট, বুঝলে না? সংসারে স্ত্রী নেই, চারটি কচি-কাচা ছেলেমেয়ে, তার ওপর লীনাও এখন থাকবে না, সংসার আগলাবার জন্যে পয়সা খরচ করে লোক রাখতে হবে; আবার লীনার চিকিৎসার খরচও জোগাতে হবে, এই বুড়ো বয়সে ব্যাঙ্কে যা কিছু পুঁজি ছিল সবই খোয়াতে হবে! এ কি কম আপশোষের কথা? আমার কপালটা কেমন দেখছো তো?

মুরারী। (এই সকল ঘরোয়া কথায় অস্বস্তি বোধ করিয়া) তা দেখুন, দুঃসময় যখন মানুষের আসে তখন এমনি ভাবেই নানারকম কষ্ট এক সঙ্গে এসে পড়ে। (কথাটা চাপা দিবার জন্য এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, পরে দরজার দিকে দেখিয়া) ঐ যে, আপনার মেয়ে এবার আসছে।

বলাই। (লীনা প্রবেশ করিল দেখিয়া) দাঁড়ান, আগে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই লীনা, এদিকে আয়। (লীনা কাছে আসিল, তাহার বাপ মত্তাবস্থায় ভদ্রলোকের সহিত বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া সে লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল। মুরারী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।) এঁর নাম হচ্ছে মুরারী সোম। আর এটি আমার মেয়ে লীনা। এঁর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় করে নাও। ইনিও হচ্ছেন আমাদের জাত ভাই, এখানে থাকতে তুমি এঁর কাছে অনেক সাহায্য পাবে। আহা, এ বেচারীরও তোমার মতো থাইসিস হয়েছে।

লীনা। (ব্যথিত হইয়া) ছি বাবা, কী যে তুমি বকো! (মুরারীর প্রতি চাহিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষার দৃষ্টিতে) আপনার সঙ্গে আলাপ হোলো, খুব ভালই হোলো।

মুরারী। (সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টিতে লীনার প্রতি চাহিল, লীনা লজ্জা পাইয়া চোখ নামাইয়া লইল) আমিও খুব খুসি হলাম।

(প্রবেশ দ্বার দিয়া ফণী শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ করিল। সকলের প্রতি চাহিয়া উহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ভ্রুকুটি করিতে লাগিল।)

বলাই। (উহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিদ্রূপ সহকারে) ও, তা হলে তুমি ফিরে এলে দেখছি। (ফণী অপ্রসন্ন ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। বলাই ফণীর প্রতি একটি তির্য্যক কটাক্ষ করিয়া লীনাকে বলিল) আমি মনে করলাম, ফণী বেচারা বুঝি একা একাই এই ঠাণ্ডায় ষ্টেশনের দিকে দৌড়েছে, বেচারা এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। দেখ না শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে,

একেই তো প্রাণের ভয়ে অস্থির, তার ওপর ঠাণ্ডা লাগিয়ে এই রোগের কুঠিতে এসে হাজির হয়েছে, হঠাৎ ওকেই না রোগটা ধরে ফেলে!

(এরূপ রূঢ়ভাবে তাহার মনের কথা ব্যক্ত হইয়া যাওয়াতে ফণীর মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, রাগ দমন করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল)

লীনা। (ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া) না, না, বাবা ওসব কী কথা! (তাতাতাড়ি ফণীর কাছে গিয়া) বাবার কথার কিছু মনে কোরো না, লক্ষীটি; জানো তো এখন ওঁর কোনো কথার ঠিক নেই। এখন যা বলচেন তার এক বর্ণও ওঁর মনের কথা নয়।

ফণী। (আহত স্বরে) তুমি বলবে না কেন? কিন্তু আমি কখনো এ কথা ভুলবো না। কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে—আর এই রকমী মাতাল লোকের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না!

লীনা। (সঙ্কুচিত হইয়া) ছি ছি, এ কী কথা বলছো তুমি?

ফণী। (মুরারীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আর দেখ না, কে কোথাকার একটা হতভাগা লোক তার ঠিক নেই। ওর সামনে বেফাঁস ভাবে সব কথাই বলে যাচ্ছেন, মুখে আটক নেই।

লীনা। (কাঁচুমাচু হইয়া) ও লোকটি বেশ ভাল।

ফণী। ও, এর মধ্যেই ওর দিকে নজর পড়ে গেছে? বেশ বেশ, এইবার জমিয়ে নাও, এখানে তোমার দিনগুলো তা হলে বেশ ফূর্ত্তিতেই কাটবে।

লীনা। আবার যা তা বলছো?

ফণী। না না, ঠিক কথাই বলছি। ভাবসাব করে নাও না, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি তো তাহলে—(লীনার মুখে বেদনার চিহ্ন দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। নিজের ঘড়িটার প্রতি চাহিয়া উচ্চস্বরে) ট্রেনটা নিতান্তই ফেল করতে হবে,—যত সব—

লীনা। অশ্রুপূর্ণ স্বরে) তবে আর দেরী কোরো না। (অশ্রু দমন করিয়া চাপা গলায় বাপের প্রতি) বাবা, এইবার তোমরা যাও। আর একটুও দেরী করলে ট্রেণ ধরতে পারবে না।

বলাই। (মুরারীর হাত ধরিয়া) আচ্ছা, তা হলে আসি। মেয়েটার দিকে একটু নজর রাখবেন। আমি শীঘ্রই ওকে আবার দেখতে আসবো, তখন আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা যাবে।

মুরারী। ভালই তো! আসুন তা হলে, নমস্কার। (উহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইবে ভাবিয়া গৃহের এক প্রান্তে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল)

লীনা। (পিতার বাহুসংলগ্ন হইয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে) বিলুকে, আর কেষ্টকে, আর মীরাকে আর নীরাকে সব্বাইকে আমার চুমু দিও বাবা—আর ওদের এখানে নিশ্চয় একবার আনবে, বুঝলে? তুমি যেন এখানে আসতে অনেক দিন দেরী কোরো না। আর বিনোদিনী মাসীকে আনিয়ে নেবে, আমি যা যা বলে দিয়েছি সব তাকে বুঝিয়ে দেবে। মীরা কবে কবে স্নান করে কেষ্টকে কি কি খেতে দিতে হয়,—

বলাই। (বিরক্ত হইয়া) তাকে অত করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারবো না বাপু, সে কি কিছু জানে না,—তার কি নিজের ছেলেপুলে মানুষ করতে হয়নি? তোর যত সব বাড়াবাড়ি।

লীনা। (হতাশ ভাবে) যাক গে, তোমার আর তাহলে কিছু বলে কাজ নেই। আমিই সব কথা তাকে লিখে পাঠাবো।

বলাই। না না, তাতে কাজ নেই। সে আবার হয়তো মনে করবে তার কাজের ওপর তুমি হুকুম চালাচ্ছো।

লীনা। (বিস্মিত হইয়া) তার কাজ মানে? (মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু সমস্ত অভিমান দমন করিয়া শান্তভাবে দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত গেল এবং বাপের পায়ের ধূলা লইয়া শান্তস্বরে বলিল) আচ্ছা তা হলে যাও বাবা।

বলাই। (ভৎসনার স্বরে) যাও বাবা? চোখে এক ফোঁটা জলও তোর নেই? কী পাষাণ মেয়ে রে বাবা! (মাতালের উপযোগী কান্নার আতিশয্য দেখাইয়া) আর তোর আপন বাপ ফিরে যাচ্ছে তার শূন্য ঘরে, একটা অপর লোকের আশ্রয়ে?

লীনা। (আবেগবিহীন ক্লান্তস্বরে) আর দেরী করলে কিন্তু ট্রেণ পাবে না।

বলাই। (রাগিয়া উঠিয়া) যাচ্ছি রে যাচ্ছি। চলে এসো ফণী। আমরা গেলেই ও বাঁচে,—কী কুক্ষণেই ওকে নিয়ে এসেছিলাম!

(সশব্দে চলিয়া গেল)

লীনা। (পূর্ব্ববৎ স্বরে) তুমিও এসো।

ফণী। (দুঃখিত স্বরে) কিছু মনে কোরো না লীনা, তোমার বাপের সম্বন্ধে অনেক কড়া কথা বলেছি। ওঁর কাণ্ড কারখানা দেখলে রাগ চাপা যায় না। আমায় ক্ষমা করলে তো?

লীনা। (অবিচলিত স্বরে) করেছি।

ফণী। আমি শীঘ্রই আসবো,—পারি তো আসচে হপ্তাতেই আসবো। আচ্ছা, তা হলে এখন যাই? (লীনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু লীনা তাড়াতাড়ি অনেকটা দূরে সরিয়া গেল)

লীনা। (ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে) না না, আমার অত কাছে এগিয়ে আসা উচিত নয়। আমার অত কাছে আসা বারণ সেটা ভুলে যেও না।

ফণী। (হঠাৎ বাধা পাইয়া) ও, তাই যদি তোমার এখন মনে হয়—

(রাগত ভাবে প্রস্থান করিল। লীনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, মুখে অভিমানজনিত কাঠিন্য, চক্ষে মৃতবৎ দৃষ্টি। একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে মুখে হাত চাপা দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার স্কন্ধ দুইটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কান্নার শব্দ শুনিয়া মুরারী মুখ ফিরাইয়া চাহিল এবং লীনার চেয়ারের নিকট আসিল।)

মুরারী। (কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সহানুভূতির স্বরে) দেখুন, মিস্ চৌধুরী, কেঁদে কিছুই হয় না। গ্লানি প্রথমটায় কিছুতে সহ্য করা যায় না,—কিন্তু এত বেশী কাঁদলে আপনার ক্ষতি হবে। এখনি হয় তো জ্বর এসে পড়বে,—আর ওরা আপনাকে বিছানায় ফেলে রাখবে,—সে অত্যন্ত খারাপ লাগবে। তার চেয়ে নিজেকে সামলে নিন। দু একদিন বাদেই দেখবেন, এখানেও আপনার ততো খারাপ লাগবে না। (অপরিচিতের সম্মুখে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় লীনার লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গেল, সে আরো জোরে বুকভাঙা কান্না কাঁদিতে লাগিল। মুরারী বিব্রত বোধ করিয়া ইতস্তত পায়চারী করিতে লাগিল। অবশেষে একটা উপায় ঠাওরাইয়া লইয়া বলিল) দেখুন, এখনি একজন নার্স আসছে এখানে। ওরা যদি আপনাকে এ রকম দেখে, সেটা কি ঠিক হবে?

লীনা। (কান্না থামাইয়া লইয়া চোখ মুছিয়া মুখ উঠাইল এবং হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল) আমাকে মাপ করবেন,—এতটা অধৈর্য্য হওয়া আমার উচিত হয় নি। কিন্তু কিছুতে আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না।

মুরারী। (ঠাট্টার ভাবে) তা ভালোই করেছেন, লোকে বলে যে খুব খানিকটা কাঁদতে পারলে তাতে অনেক উপকার হয়।

লীনা। (ঈষৎ হাসিয়া) হাঁ তাই, আমিও এখন অনেকটা হাল্কা বোধ করছি।

মুরারী। (মুখে দুষ্টামির হাসি আনিয়া কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত) আপনার ঐ বন্ধুটি যে রাগ করে চলে গেলেন সে জন্যে মন খারাপ করবার কোনো কারণ নেই। কালই দেখবেন ওঁর মনও নরম হয়ে গেছে, আর আপনার মনও নরম হয়ে গেছে। কালই উনি ক্ষমা চেয়ে লম্বা একখানা চিঠি লিখবেন, আপনিও ঠিক তাই করবেন। ফলে সব আবার ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে।

লীনা। (পীড়িত ও গর্ব্বিত দৃষ্টি সহকারে) কী সব বলছেন আপনি?

মুরারী। (লজ্জিত ও নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মাথা নীচু করিয়া) অন্যায় হয়ে গেছে, আমায় ক্ষমা করুন। সময়ে সময়ে আমি কেমন অভদ্র হয়ে পড়ি, এমনি এক একটা বেখাপ্পা কথা বলে ফেলি যার কোনো মানে থাকে না। (লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুখে পুনরায় একটা ঠাট্টার ভাব আনিয়া) আর আমি যদি কিছু বেফাঁস কথাই বলে থাকি, তার জন্যেও দায়ী আপনার বাবা। তিনি আমাকে আপনার গার্জেন করে দিয়ে গেছেন; জানেন তো? আপনাকে সামলে রাখবার ভার দিয়ে গেছেন আমার ওপর।

লীনা। (মনখোলা ভাবে হাসিয়া) ও বাবার কথা ছেড়ে দিন! (লজ্জিত হইয়া) বাবা আজ যে রকম ব্যবহার করে গেলেন, তাতে যেন কিছু মনে করবেন না।

মুরারী। (অন্যমনস্কভাবে) ওঃ, ভদ্রলোক একেবারে চুবচুরে হয়েছিলেন। বেশ আমোদ হচ্ছিল দেখে। (লীনার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুরারী ইহা দেখিয়া সচেতন হইয়া উঠিল এবং পুনরায় নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া) ছি ছি, ঐ দেখুন আবার সেই নিজের ফাঁদেই পা দিলাম, যা তা কি একটা বেফাঁস কথা বলে ফেল্‌লাম! (হাসিতে হাসিতে) এই হচ্ছে আমার রোগ, আমার জিভের একটা অপারেশন করানো দরকার। (উচ্চ হাসিতে হাসিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

লীনা। (চেষ্টাকৃত ভাবে হাসিয়া) তা হোক, আপনি সব খোলাখুলি বলে ফেলেন দেখছি।

মুরারী। আমাকে যেন তা বলে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার বাবার একটুও নিন্দে করছিলাম না, তাঁর ফূর্ত্তি দেখে আমার সত্যিই খুব আমোদ হচ্ছিল। আমিও যখন প্রথম এখানে আসি তখন আমারো ঐ রকম ফূর্ত্তি হয়েছিল, সত্যি বলছি। এখানে এসেই সব নার্সদের সঙ্গে খুব ভাব করে ফেল্‌লাম, সময়টা চমৎকার কেটে গেল।

লীনা। হাঁ, ঐ রকম করে কাটিয়ে দিতে পারলে নিজের কষ্টগুলো বেশ ভুলে থাকতে পারা যায়।

মুরারী। তা ঠিক নয়, আমি কষ্ট ভোলবার জন্যে কোনো চেষ্টা করিনি। দুঃখ চাপবার জন্যে নয়, বেশ মজা লাগছিলো বলেই ফূর্ত্তি করছিলাম।

লীনা। (নিজের শোক ভুলিয়া গিয়া এই লোকটির কথায় বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া) এখানে এসে আপনার মজা লাগছিলো? আপনারও তো আমার মতো অসুখ?

মুরারী। টি বি? হাঁ তাতো বটেই। (বিশ্বস্ত ভাবে) কিন্তু এটা কেবল সময়ের ব্যাপার, চিকিৎসার ঐ সময়টুকু কেটে গেলেই আমি আবার আগেকার মতো ভাল হয়ে উঠবো। একটু যদি বরং দেরীও হয় তো সেই আমার পক্ষে ভালো। আমার কিছুদিন বিশ্রাম নেবার বড় দরকার ছিল, বেশ অনেক দিন চুপ চাপ বসে থাকবো, যা খুসি তাই ভাববার ফুরসৎ পাবো। যতদিন এখানে থাকবো ততদিন আমার কিছু অভাব থাকবে না, যখন যা দরকার তখন তাই বিনা চেষ্টায় এসে হাজির হবে। এই সব দেখেশুনেই আমার খুব মজা লাগছিলো।

লীনা। (অবাক হইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে) সত্যি সত্যিই আপনি এতেই এত—আপনি যা বলবেন তা—

মুরারী। আমি যা বলচি তা সব সত্যি কথাই বলচি, এর এক বর্ণ বাড়ানো কথা নয়।

লীনা। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমি তো ধারণা করতেই পারছি না, এই রকম জায়গায় এসেও কেউ যে আবার—(হঠাৎ পিছন দিকে চাহিয়া) কিন্তু আমার এখানে আর থাকা উচিত নয়, মিস্ গীতিকার কাছে এতক্ষণ যাওয়া উচিত ছিল। নইলে তিনি আবার হয়তো—(চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে গেল)

মুরারী।—(ব্যগ্রভাবে) না না, এখন যাবেন না, আর একটু বসুন। (দোমনা ভাবে লীনা উহার প্রতি চাহিল, তৎপরে বসিয়া পড়িল) সে জন্যে কিছু ভাবতে হবে না, দেখুন না, এখনি ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা আপনাকে এক বাটি দুধ খাইয়ে দেবে, তার পর একটা ঠাণ্ডা বিছানায় শুইয়ে দেবে। এখানকার কোনো রকম নিয়মভঙ্গ যাতে আপনি না করেন সে বিষয়ে আমারো লক্ষ্য আছে। (চেয়ারটা লীনার চেয়ারের কাছে সরাইয়া আনিয়া) আপাতত কিছুক্ষণ তো এখানে বসুন। এক হপ্তা কেটে গেল, এখানে এসে কারো সঙ্গে দু দণ্ড কথা কইতে পাইনি। আমি একটু আগে যা বলছিলাম তা বুঝি আপনার বিশ্বাস হয় নি—নয়?

লীনা। (মৃদু হাসিয়া) ঐ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? আপনি বললেন যে সেরে উঠতে দেরী হলেই নাকি আপনার পক্ষে ভালো!

মুরারী। সত্যি কথাই বলেছি। এ জায়গাটা যেন আমার পক্ষে স্বর্গ, যতদিন আপনি আসেন নি ততদিন এটা ছিল আমার নির্বান্ধব স্বর্গপুরী। (লীনা অপ্রস্তুতের মতো হইল) তা হবে নাই বা কেন? নিজের অসুখের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোনো ভয় ছিল না। আগে শুনুন যে কী যন্ত্রনার হাত থেকে আমি বেঁচে গেলাম—(তিক্তহাসি হাসিয়া) আপনি জানেন কি সে কী কষ্ট হয়, যদি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত তিনটে পর্য্যন্ত খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজ করতে হয়,—পুরো দশটি বছর ধরে?

আপনি বুঝতেই পারবেন না, আপনার সে ধারণাই নেই। এই ঘানিগাছে যাকে জোতা হয়েছে সে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। সেই ঘানিগাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি যে কত খুসি হলাম তা আর কি বলবো,—হলেই বা টি বি,—আপাতত তো বেঁচে গেলাম। দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, ভাবনা চিন্তা নেই।

লীনা। (কৌতূহলের সহিত) কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল যে খবরের কাগজে যারা লেখে তাদের কাজ খুব ভাল।

মুরারী। (তিক্তভাবে হাসিয়া) ভাল কাজ? খবরের কাগজে ছাই ভস্ম লিখে পাতা ভরানো? প্রথম প্রথম মাস খানেক হয় তো লাগে ভাল,—কিন্তু ভেবে দেখুন তো, দশ বছর যদি একাদিক্রমে ঐ কাজই করতে হয়? হপ্তার মধ্যে কেবল শনিবারের রাত্রিটা ছুটী, মাইনে সেই একই, দু চার বছর বাদে দু এক টাকা বাড়লো কি না বাড়লো! (হাসিয়া উঠিয়া) এই কাজ হোলো ভাল! কোথায় কর্পোরেশনের মিটিং বসেছে, ছোটো সেখানে,—কোথায় সভাসমিতি বসেছে, নামজাদা জাঁদরেলরা বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছে, টুকে নিয়ে এসো সেগুলো,—কোথায় রাজ্যলোপের পরামর্শ হচ্ছে, কোথায় খড়ের নৌকোয় আগুন লাগলো, কোথায় অমুক দেশের মহারাজা সদল বলে এসে হাজির হলেন,—এই সব সন্ধান নিয়ে নিয়ে বেড়াও। দশ বছর এই কাজ করে করে আমার আর কোনো পদার্থ নেই। তাও কি একটা খবরের মতো খবর পাওয়া যায়? না করে কেউ আত্মহত্যা, না করে কেউ কাউকে খুন, বাজে খবরকে বানিয়ে বানিয়ে বড় করে তুলতে হবে।

লীনা। (হাসিয়া) বড্ডো একঘেয়ে কাজ তো দেখছি? ভালো লাগবার মতো কিছুই বুঝি ছিল না?

মুরারী। একেবারে না। নতুন কিছুই নেই, সমস্তই আমার মুখস্থের মতো হয়ে গিয়েছিল। (বিরক্তমুখে) তা, আমারই দোষ বলতে হবে। আমি তো ছেড়ে দিলেই পারতাম! রোজই মনে করতাম এইবার ছেড়ে দিই, কিন্তু পারতুম না। গড্ডালিকার মতো হয়ে গিয়েছিল। সকলেরই এই রকম হয়, কাজ করতে করতে সেইখানে শিকড় গেড়ে যায়। আমার প্রথমে হলো প্লুরিসি, তার পর হোলো টি বি, তবে আমি নিষ্কৃতি পেলাম।

লীনা। (কৌতূহলী হইয়া) কিন্তু আপনার বাড়ীর লোকেরা,—তারা কি করতো?

মুরারী। আমার আপনার বলতে তেমন কেউ নেই। খুব অল্প বয়সেই মা মারা গেছেন। যখন আমি কলেজে পড়ছি তখন বাবা গেলেন মারা। বিশেষ কিছু রেখে যান নি, কাজে কাজেই ঐ খবরের কাগজে ঢুকলাম। আমার দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে থা হয়ে গেছে, নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত। কালে ভদ্রে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তারাই এখানকার খরচ জোগাচ্ছে, সুতরাং আমি আপাতত নিশ্চিন্ত। (শ্লেষের স্বরে) আর আপনার লোক থাকলেও যে বিশেষ কিছু তফাৎ হোতো তা নয়। অনেক তো দেখলাম, লোকে যে বলে রক্তের টান, লোকে যে বলে জলের চেয়ে রক্ত ঢের গাঢ়, এ সব একেবারে ভুল কথা। আমি তো দেখছি হোটেলে যে মাছের ঝোল খেতে দেয়, আপনার লোকের রক্ত তার চেয়েও পাতলা। আমার কথাটা যে সত্যি তা আপনি নিজের বেলাও তো কতক কতক দেখতে পাচ্ছেন!

লীনা। (ব্যথিত ভাবে) এটা আপনি অন্যায় কথা বলচেন। আপনি কতটুকুই বা জানেন?

মুরারী। হয় তো কিছুই জানি না কিন্তু এখানে তিন চার মাস কাটুক আগে, তার পর দেখবেন হয় তো, আপনি যে জায়গাটা ফাঁক রেখে এসেছিলেন সেটা বেমালুম ভরাট হয়ে গেছে, আপনার জন্যে একটুও আর জায়গা নেই। দেখবেন তখন।

লীনা। (ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত স্বরে) এইবার আপনি পাগলের মতো যা তা বকচেন! (অশ্রু দমন করিয়া) দেখলেন আমার কত কষ্ট হচ্ছিল,—তবু ঐ সব কথাই আপনি বলবেন?

মুরারী। (বিব্রত হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায়) শুনুন, শুনুন, মিস চৌধুরী,—আমি আপনাকে আঘাত দেবার জন্যে কিছু—আমার কথাটা আগে শুনুন,—অত রেগে উঠবেন না। কথার ছলে বলে ফেলেছি বৈ তো নয়।

আমি লোকটাই হচ্ছি ঐ রকম। সব কথাই কি অত সিরিয়াসলি নিতে হয়?

লীনা। (তথাপি অপ্রসন্ন ভাবে) কি জানি কেমন করে আপনি ঐ সব কথা বলতে পারেন। এই মাত্র আপনি বললেন যে আপনার নিজের বলতে কেউ নেই,—তা হলে আপনি কেমন করে এ সব কথা জানবেন, আপনার পক্ষে তো জানা সম্ভবই নয়।

মুরারী। (লীনাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে) তা সম্ভব নয়। বাস্তবিকই আমার ও বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আপনি কি বলেন তাই দেখবার জন্যে যা খুসি তাই বলে যাচ্ছিলাম।

লীনা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আপনার দুটি বোন আছে বলছিলেন না? তাদের কোনো ছেলেপুলে হয়েছে?

মুরারী। একটি বোনের দুটি ছেলে আছে, কদাকার বাঁদরছানার মতো দেখতে।

লীনা। (অসন্তুষ্ট ভাবে) আপনি বুঝি ছোট ছোট ছেলেদের পছন্দ করেন না?

মুরারী। (তৎক্ষণাৎ) মোটেই না। আমার কেমন কেমন লাগে। ছোট ছেলেদের সঙ্গে আমার মোটেই বনে না।

লীনা। (হাসিয়া) আপনি এক আশ্চর্য্য রকমের মানুষ দেখচি। (মাতৃবৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত) আমার মনের অবস্থাটা তাই আপনি মোটেই বুঝতে পারেন নি। আমার ভাই বোন আছে চারটি,—যদিও তারা আমার কাছে খুব ছোটোই, কিন্তু তাদের নেহাৎ কচি বয়স নয়। বিন্নুর বয়স চোদ্দো, নীরার বয়স এগারো, কেষ্টর দশ, আর সব চেয়ে ছোটো মীরা, তার বয়স আট। আমাদের মা নেই,—আমিই তাদের মায়ের মতো ছিলাম। (দুঃখিত স্বরে) আমি তো ছেড়ে চলে এলাম, কে যে তাদের দেখাশোনা করে তার ঠিক নেই।

মুরারী। (বিদ্রূপের স্বরে) হাঃ,—তা—দের—(যাহা বলিতে যাইতেছিল তাহা হঠাৎ সম্বরণ করিয়া লইয়া মৃদুস্বরে) তাদের এক রকম ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

লীনা। (গাম্ভীর্য্যের সহিত) আপনি তো বলে দিলেন! ছেলেপুলেদের মানুষ হওয়া যে কী ব্যাপার, তারা যে কত অসহায়, পরের ওপর কতটা যে তারা নির্ভর করে, তার আপনি কি বুঝবেন? মেয়েমানুষ যদি হতেন তো বুঝতেন।

মুরারী। (হাসিয়া) আপনি বুঝি সেই মেয়েমানুষ? একেবারে পাকা গিন্নি, আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি? আমিও তো এখনো খুব ছেলেমানুষ আছি। আমাকে একটু মানুষ করে দিন না?

লীনা। (লজ্জিত হইয়া হাসিয়া) তা বটে, আপনার ভারটা একজন কারুর নিলে ভাল হয়। (বিষয় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য) কিন্তু আপনার কাজের সম্বন্ধে যা বলছিলেন, তাতে আমার বড় দুঃখ হোলো। আমি তো ভাবতাম যে লেখাপড়ার কাজ করতে খুব ভালোই লাগে।

মুরারী। আমার কাজটা তো ঠিক লেখাপড়ার কাজ ছিল না। লেখাপড়ার কাজে সত্যিই আমোদ আছে বটে। আমারও চিরকাল সেই কাজ করবারই ইচ্ছে ছিল। আমার মাথায় অনেক রকম আইডিয়া ছিল,—নানারকম গল্প লেখা, সাহিত্য সৃষ্টি করা। (হাসিয়া) কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, মনে মনেই কেবল ভাবি, কাজে কখনো করতে পারি না। দু একবার চেষ্টাও করেছি,—তারপর হয় এসেছে একটা কোনো বাধা, না হয় কুঁড়েমি—(স্কন্ধদেশ ঝাঁকাইয়া থামিয়া গেল)।

লীনা। তা যেন হোলো, কিন্তু এখন তো আপনার হাতে অনেক সময় রয়েছে? এখন কেন চেষ্টা করে দেখুন না?

মুরারী। (এই প্রস্তাবনায় চমকিত হইয়া) আপনি বলচেন,—এখানে থাকতে থাকতে আমি ঐ সব জিনিষ লিখবো,—তাই বলচেন? (লীনা ঘাড় নাড়িল। মুরারী উত্তেজিত হইয়া উঠিল) ঠিকই তো! ভারী চমৎকার আইডিয়া তো! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার নিজের মাথায় কখনো এটা আসতো না। (লীনা খুসী হইয়া উঠিল) সত্যিই তো এখানে অফুরন্ত সময় আমার হাতে রয়েছে, সমস্তদিন ধরে বসে বসে করবোই বা কি?

লীনা। তা হলে সত্যি সত্যিই এবার লেখবার চেষ্টা করবেন তো?

মুরারী। (দৃঢ় ভিত্তে) নিশ্চয়, অবশ্য করবো। জীবনের উন্নতি করবার একটা কিছু ভালো রকম চেষ্টা তো একদিন করতেই হবে, চিরকাল তো এ ভাবে চালানো যাবে না! এখনই তো তার সুবিধে রয়েছে! শরীরেই না হয় অসুখ আছে, মনের তো কোনো অসুখ হয় নি!

লীনা। (উত্তেজিত হইয়া) তা হলে কিন্তু খুব চমৎকার হয়।

মুরারী। (আন্তরিকতার সহিত) শুনুন। গেল দু বছর ধরে আমার মাথায় কতকগুলো ছোটো গল্পের ভাল ভাল প্লট ঘুরচে—তার মধ্যে অনেকগুলো সত্যি ঘটনাও আছে, নিজের চোখে যে সব জিনিষ দেখেছি। শহরের জীবন সম্বন্ধে আমার অনেক অভিজ্ঞতা জন্মেছে। সেই গুলো নিয়ে আমি সুন্দর সুন্দর গল্প লিখতে পারবো। কোনো মাসিক পত্রে যদি একবার একটা গল্প বিক্রি হয়, তবে পরে পরে আরো অনেক লিখতে পারবো, আরো অনেক বিক্রি হবে। সে বেশ হবে। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে হবে তা বলে দিচ্ছি,—আপনাকে আমার সমালোচক হতে হবে,—আগে আপনি সে গুলো পড়বেন, কোথায় কোথায় দোষ হচ্ছে দেখিয়ে দেবেন।

লীনা। (খুসি হইয়া লজ্জিতভাবে) না না, কী যে আপনি বলেন! তা আমি পারবো কেন, আমার বিদ্যে তো ভারী!

মুরারী। যে বিদ্যে আছে তাতেই হবে। আপনি হচ্ছেন সাধারণ পাঠকের দলে, আপনার চোখেই ঠিক বিচার হবে। আর আপনিই তো আইডিয়াটা প্রথমে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন, এখন আপনাকে সাহায্য করতেই হবে, উপায় নেই। (হঠাৎ কি ভাবিয়া) কিন্তু আমার হাতের লেখাটা যে বড় খাবাপ?

লীনা। তাই বুঝি? তা আমার হাতের লেখা মন্দ নয়, সকলেই এ কথা বলে। আমি যদি কপি করে দিই তা হলে কি চলবে?

মুরারী। তা হলে তো চমৎকার হয়! এরা হয়তো আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে দেবে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যখন ছাড়া পাবেন তখন করতে পারবেন। আমি যেটা এক সপ্তাহে লিখবো আপনি সেটা এক সপ্তাহে কপি করবেন। পয়সা তো পাওয়া যাবে, আমরা সেটা ভাগাভাগি করে নেবো—

(মিস্ গীতিকা প্রবেশ করিল, উহাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল)

লীনা। (ব্যস্তভাবে) না না, আমি পয়সা নেবো না। আমিও তো একটা মজার কাজ পেয়ে যাবো—(কাসিতে লাগিল)

মুরারী। (হাসিয়া) কাজ বড় সোজা নয়, একবার আমার হাতের লেখা দেখলে পয়সা পেলেও ও কাজ করতে চাইবেন না।

মিস্ গীতিকা। লীনা, একবার এদিকে এসো তো, একটু কথা আছে। (কিছুদূরে লইয়া গিয়া লীনাকে নিম্নস্বরে যেন ভৎর্সনা করিল। লীনার মুখ শুকাইয়া গেল, সে মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। মিস্ গীতিকা পুনরায় অফিসে প্রবেশ করিল)

মুরারী। (লীনার প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ব্যাপার কি? কী বলছিলেন উনি?

লীনা। (কম্পিত কণ্ঠে) উনি আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন, যেন কাস্‌বার সময় মুখে রুমাল চাপা না দিয়ে কখনো না কাসি।

মুরারী। (শান্ত স্বরে) ও এই কথা? এখানকার ঐ হচ্ছে নিয়ম, ওটা মেনেই চলতে হবে।

লীনা। (ম্লানমুখে) উনি আরো বলছিলেন যে সর্ব্বদা আমাকে একটা কি কাপ হাতে নিয়ে বেড়াতে হবে,—যখনি কাসি হবে তখনি তার মধ্যে—(বলিতে বলিতে থামিয়া গেল)

মুরারী। (শান্ত ভাবে) তাতে আর হয়েছে কি? ওটা অভ্যেস হয়ে যাবে। জিনিসটা ঠিক কাপ নয়, একটা কাগজের ঠোঙার মতো, পকেটের মধ্যে রেখে দেবেন, দরকার হলে বের করবেন।

লীনা। (অন্যমনস্ক ভাবে) কিন্তু এসব অতি বিশ্রী ব্যাপার। (হঠাৎ সচকিত হইয়া) আচ্ছা, এখন তা হলে চললুম, আমাকে নিজের ঘরে যেতে বলে গেছেন।

মুরারী। (আগ্রহের সহিত) আজ প্রথম দিন কি না, তাই এগুলো আপনার ভাল ঠেকছে না। ও নিয়ে কিছু ভাববেন না, কয়েকদিনের মধ্যেই সব অভ্যেস হয়ে যাবে। আমারো প্রথমে ঐ রকম মনে হয়েছিল। (তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) মনে থাকে যেন, আমি আপনার গার্জ্জেন, যা বলবো তাই মেনে চলতে হবে! আচ্ছা আসুন, কাল সকালে দেখা হবে।

(লীনা শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেল। মিস্ হেমপ্রভা প্রবেশ করিল, হাতে একগ্লাস দুধ)

মিস্ হেমপ্রভা। নিন্, আপনার পথ্যটা খেয়ে নিন। শুতে যাবার সময় হয়েছে। (মুরারী গ্লাসটি তুলিয়া লইল। মিস্ হেমপ্রভা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল) প্রথম দর্শনেই গভীর প্রণয় না কি ?

মুরারী। (স্মিত মুখে) ঠিক বলেছেন! জেনে রাখুন যে আপনি এবার ছেঁটে বাদ পড়ে গেলেন, আর কোনো রকম আশা নাই। (গ্লাসটি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া যে পথে লীনা চলিয়া গিয়াছে সেইদিকে উদ্দেশ করিয়া টোষ্ট দিবার ছলে)—

একগ্লাস দুধ, আর তুমি যদি সখি
কাসিতে কাসিতে বোসো আমার সমীপে,
স্বর্গসম হবে এই ছার হাঁসপাতাল—
(এক চুমুক দুধ পান করিয়া লইল)

মিস্ হেমপ্রভা। (তাচ্ছিল্য ভরে) ওতো পচা পুরোনো কথা। ওমার খৈয়াম যা বলেছে তারই প্যারডি করে বলচেন, ভারী তো!

মুরারী। হায় হায়, তাও ধরে ফেললেন, আপনাকে এঁটে ওঠবার জো নেই দেখছি! (মিস্ হেমপ্রভা হাসিতে হাসিতে গর্ব্বভরে মুখ উঁচু করিয়া প্রস্থান করিল)

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

দুগ্ধাভাব

শ্রীবঙ্কিমবিহারী বসু, বি-এস-সি

কোন একটী সহরে কোন কারণে গোয়ালারা দুগ্ধ সরবরাহ করা বন্ধ করিয়া দিল। প্রাতে দুগ্ধাভাবে দুগ্ধ-পোষ্য শিশুগণের ক্রন্দনের রোলে সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। কি করিব, কোথায় যাইব, এই বলিয়া সকলে শিরে করাঘাত করিতেছেন। জনৈক যুবক একটী পাত্র হস্তে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দরবিগলিত ধারে অশ্রু নিপতিত হইতেছে; যুবক করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে স্বীয় কেশরাজি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার এই দুঃখে বিগলিত হইয়া জনৈকা বৃদ্ধা তাঁহার হাত হইতে পাত্রটী লইয়া তাঁহার অতি কষ্টে সংগৃহীত দুগ্ধ হইতে অল্প একটু দুগ্ধ আনিয়া দিলেন।

যুবক নতজানু হইয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন—"মা, আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, তা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"এ আর কি উপকার করলাম বাছা! তুমি শীঘ্র যাও, তোমার শিশুটী দুধ না পেয়ে কাতর হয়ে না জানি কতই কাঁদছে। আহা কত বেলা হয়েছে;—দুধ গরম আছে, এখনি তাকে খাইয়ে দাওগে।"

যুবক বলিল—"না মা, আমি তাকে এক পয়সার লজন-চুষ কিনে দিয়ে এসেছি, সে তাই চুষছে; এ দুধটুকু নিয়ে যাচ্ছি—আমি চা খাব বলে।"

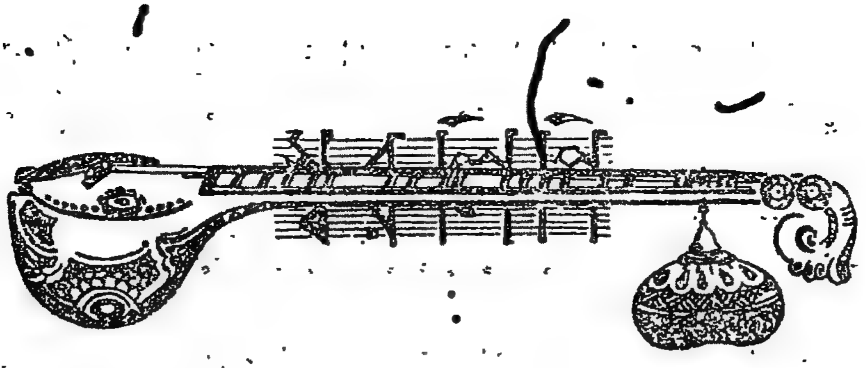

মিশ্র—কাফী কানাড়া—কার্ফা (বিলম্বিত লয়)

বেদনার পারাবার করে হাহাকার
তোমার আমার মাঝে প্রিয়তম,
অনন্ত এই বিরহের নাহি পার
হবে না মিলন আর এ জনম
প্রিয়তম।
এই বুঝি হায় বিধির লিখন
দুকূলে থাকি কাঁদিব দুজন

রাতের চখাচখীর সম
প্রিয়তম।
নিহুতি রাতে তাবার চোখে
দলিত ফুলে ঝরা কোরকে ;
খুঁজিও আমায় ফিরিয়া যদি
আস এ ঘরে প্রিয় মম
প্রিয়তম।

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইস্‌লাম   স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী

II রা মজ্ঞরজ্ঞা মা পা I পদা . ম্ভদা পা পা | রজ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞা রা I সা -া -া -া |
বে দ০০০ না র পা০ রা০ বা র | ক০ রে০০ হা হা কা ০ ০ র |

সা সগরা রা গা I মা পধপা মগা মা | জ্ঞরা জ্ঞা -া -া I -া -া র্রা সা |
তো মা০০ র আ মা ০০র মা০ ঝে | ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

[পা]
সরা রমা মা মজ্ঞরসা I সা -া -া -া ||{ সা র্সা র্সা র্সা I ণা ণা পধা মা |
প্রি০ ০০ য় ত০০০ ম ০ ০ ০ ||{ অ ন ন্ ত এ ই বি০ র |

পা ণদা ণা র্সা I ণদা ণদা পা পা } | ণা ধপধা ধপমা মধপা I জ্ঞমা জ্ঞমা রা রা |
হে০ ০র না হি পা০ ০০ ০ র } | হ বে০০ না০০ মি০০ ল ন০ আ র |

রজ্ঞা রা জ্ঞা দা I পা -া মজ্ঞা রা | রজ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞা রা I সা -া -া -া II
এ০ ০ জ ন ম ০ ০০ ০ | প্রি০ ০০০ য় ত ম ০ ০ ০ II

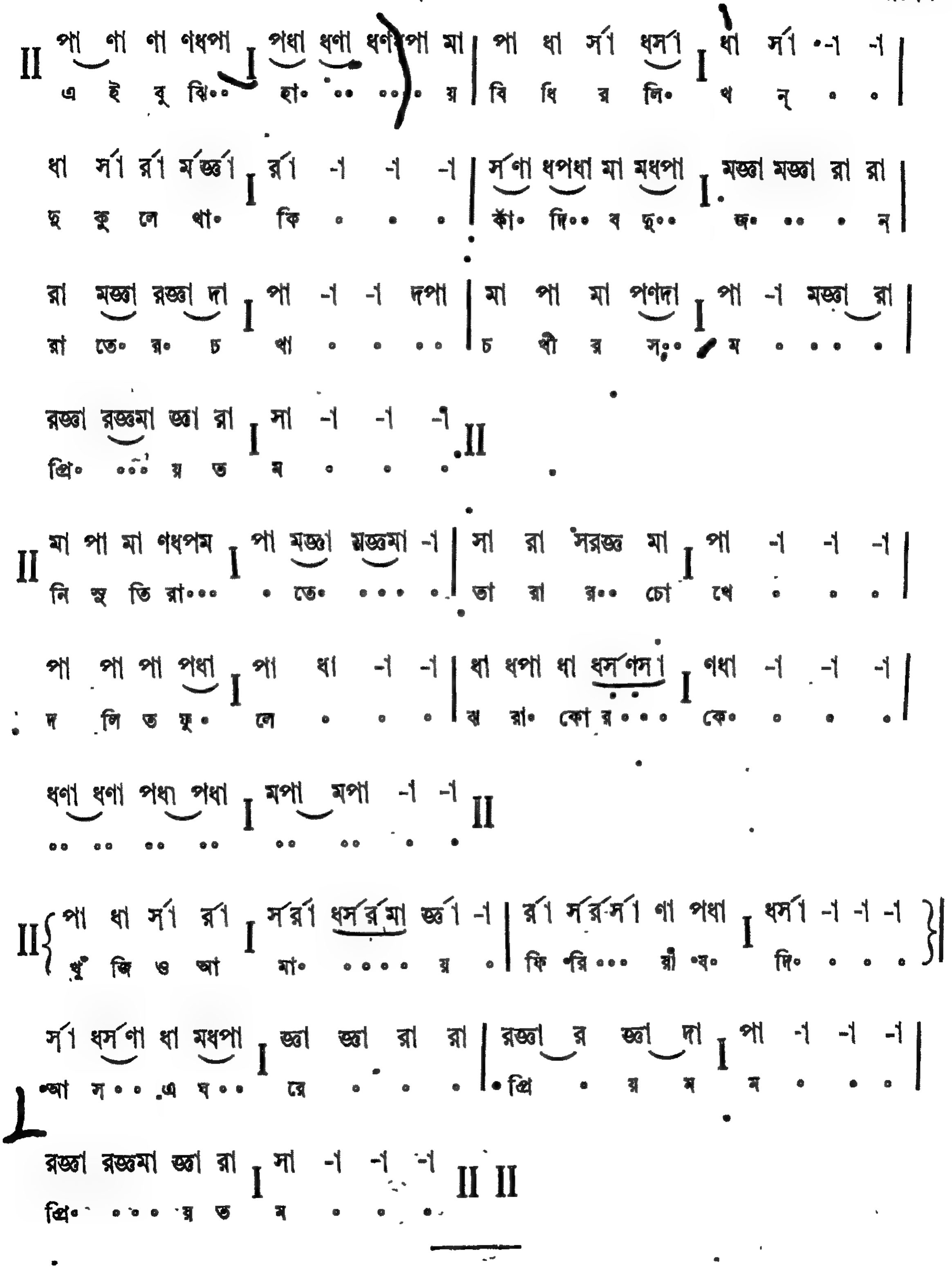

পত্রাবলী

"ভাস্কর"

১

শ্বশুরবাড়ী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

শ্রীচরণেষু,

মামণি, তোমার ও বাবার পত্র পেয়েছি। সময়াভাবে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। তোমরা হয়তো ভাবছ, আমার এত সময়াভাব কেন। সত্যি, দিবারাত্র একটু অবসর নেই। খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব, কাপড় পরা, চুল বাঁধা, এখানে যাওয়া, সেখানে যাওয়া—সারাদিন একটুও অবসর নেই। আমার শ্বশুর শাশুড়ী আমাকে এত ভালবাসেন, এত আদর করেন। ননদরা এক মুহূর্ত কাছ ছাড়া হয় না। খালি গান গাও আর গান গাও। সত্যি, সমস্ত দিন আমার আনন্দে ভরে আছে। শুধু, যখন তোমাদের কথা ভাবি, খুকু আর ভুলুর কথা ভাবি, তখনই মন কেমন করে ওঠে। থাক্, শিগগিরই তো যাব। তোমরা আমার জন্য ভেবো না। আমি আনন্দে আছি এতেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে। এখুনি সিনেমায় যাবার জন্য সাজতে হবে, আজ আর কিছু লিখতে পারলুম না। কিছু মনে করো না। আমি খুব ভাল আছি। শিগগিরই যাব। আমার প্রণাম নিও। বাবাকে প্রণাম দিও। খুকু আর ভুলুকে আমার ভালবাসা জানিও। ইতি

প্রণতা ফুলু

২

শ্বশুরবাড়ী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

শ্রীচরণেষু,

মামণি, অনেকদিন পত্র লিখিনি বলে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়েছ, তা তো হবারই কথা। কিন্তু আমার যে পত্র লেখার উপায় ছিল না। ভাতের ফেন গাল্‌তে গিয়ে দু'মাস আগে আমার ডান হাতের চারটে আঙুল আর পায়ের পাতা পুড়ে যায়। পনের দিনের মধ্যে কোন চিকিৎসাই হয় নি। একটু নারকেলের তেল দিয়ে বাঁধতুম আর দিবারাত্র যন্ত্রণায় ছটফট করতুম। শাশুড়ী বললেন, অমনি সেরে যাবে। যখন ক্রমেই ঘা বেড়ে যেতে লাগল, তখন একজন ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, তাঁর দেওয়া মলম লাগিয়ে লাগিয়ে এখন ঘা-টা সেরেছে। কিন্তু হাত ও পায়ের চামড়া কুঁচকে আছে। এই নিয়ে আবার মসলা-বাটা আর ভাতের ফেন-গালা আরম্ভ করেছি। মাঝে যে কয়দিন বাদ গিয়েছিল, তার জন্য এ বাড়ীর সকলের কাছেই দিন রাত বকুনি খেয়েছি। আমি তোমাদের কাছে এ খবর লিখব এই ভয়ে এরা আমাকে এতদিন চিঠিই লিখ্‌তে দেয় নি। আজ অনেক চেষ্টা করে এই চিঠিখানা লিখ্‌ছি, আবার যে কবে লিখ্‌তে পারব, জানি নে। এখানে সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে হেঁসেলেই থাকতে হয়। পড়াশুনা, গান-বাজনা চুলোয় গেছে। শুধু যে অবস্থার গতিকে, তা নয়। এদের ধারণা মেয়ে মানুষের রান্নাঘরের বাইরে আর কোন কাজ থাকতে পারে না। আমার শরীর এখনো শক্ত আছে। কিন্তু কতদিন যে এ বোঝা বইতে পারব, জানি নে। এখন ভাবি, কেন লেখাপড়া শিখেছিলুম, কেন গান-বাজনা শিখেছিলুম! মনে কত আশা ছিল, কত কল্পনা ছিল! কাজকে আমি কখনই ভয় করি না, তা তো তুমি জান। কিন্তু দিবারাত্র একঘেয়ে হৃদয়হীন, কল্পনাহীন, সমবেদনাহীন দাসীত্ব—এ যে দুঃসহ।

আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় মসলা বাটতে আর ফেন গাল্‌তে। এদের বলেছিলাম একটা কুকার কিন্‌তে। এরা বলে, ওসব সাহেবিয়ানা এ বাড়ীতে চল্‌বে না। বলেছিলাম,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে গুঁড়া মসলা এনে দিতে। শাশুড়ী বল্লেন, সোমত্ত বউ থাকতে বাজারের ধুলো বালি মেশান গুঁড়ো মসলা খেতে যাব কেন? ওতে কি কাঁচা বাটা মসলার মত স্বাদ হয়? বউয়ের হাত পা-পোড়াটা এদের কাছে এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়, যার জন্ত কোন ব্যবস্থা করা দরকার মনে হতে পারে।

আমার কষ্টের কথা লিখে তোমাদের মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু না দিয়েও পারলাম না। সত্যি বলছি, ক্রমে আমার যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। এই তো বেলা পড়ে এলো, এখনই সুরু হবে কাজের পালা—আবার সেই মসলা বাটা—আবার সেই ফেন গালা—মনে হলেই আমার অন্তরাত্মা গুমরে কেঁদে ওঠে।

যাক্ আর কিছু লিখ্‌ব না। এ চিঠি বাবাকে দেখিও না। মুখে যা' হয় ব'লো। এ চিঠি পেয়ে তুমি কত কাঁদ্‌বে তাই ভেবে আমার আরো আতঙ্ক হচ্ছে।

আমার প্রণাম জেনো। ভুলু ও খুকুকে বড় দেখতে ইচ্ছা হয়। ইতি—

প্রণতা ফুলু

৩

বাপের বাড়ী

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

প্রিয়তম,

পলাতকা সহধর্মিণীর নিকট থেকে এই সম্ভাষণ তোমার কাছে হয়তো নিতান্ত উপহাসের মতই শোনাবে। কিন্তু আমি উপহাস করছি নে, বিশ্বাস করো। আমার অভিমান, আমার অভিযোগ তোমার পারিবারিক সংস্কারের উপর, তোমার উপর নয়। তোমার ভালবাসায় আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার ভালবাসা তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংস্কার থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে না। এটা যদি আকস্মিক বা সাময়িক হতো, তা হলে আমি এত সহজে হার মানতুম না। কিন্তু তোমাদের সংস্কার ও অভ্যাসের প্রাচীর আমার কাছে একেবারেই দুর্ভেদ্য। মসলা-বাটা আর ফেন-গালা তোমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। ও ছাড়া জীবনের কল্পনা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা জীবনের পক্ষে একেবারেই প্রয়োজনীয় নয়। যাহারা ওতে অভ্যস্ত তাহারা যাহাই মনে করুক, আমার পক্ষে ওটা একেবারেই দুঃসহ। আমি যে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছি, যেটুকু গান বাজনা ছবি-আঁকা, নাচা, প্রভৃতির চর্চা করেছি, তার একটা বৃহৎ, একটা মহৎ পরিণতি আমার জীবনে কল্পনা করেছিলুম, সে কল্পনা আমার প্রায় ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। নিজেকে যেন আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্যই তোমাদের ছেড়ে এসেছি—নিন্দার বোঝা মাথায় করে।

আমি কি করব বা না করব, কিছুই ঠিক করিনি। মানুষের কাছে পরিচিত হবার যোগ্যতা যদি অর্জন করতে পারি, তবেই আমার সংবাদ আবার পাবে, নচেৎ এই শেষ পত্র। আমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কোন প্রকার অনুরোধ বা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করো না, তাতে কোন লাভ তো হবেই না, বরং গুরুতর ফল হতে পারে। প্রণাম নিও। ইতি

তোমারই ফুলু

পুঃ—মসলা বাটতে আর ফেন গালতে অভ্যস্ত কোন মেয়েকে যদি তোমার পছন্দ হয় তবে বিয়ে করো। আমার কোন আপত্তি নেই। ইতি—

৪

হলিউড (ইউ. এস্. এ)

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

প্রিয়তম,

বহুদিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমার সমস্ত শরীর মন যেন পুলকে শিউরে উঠছে। এখানে বসে তোমার চিঠি পাব এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত।

মেট্রোতে ছবি দেখতে গিয়ে পর্দায় আমার ছবি দেখে চিন্‌তে পেরেছ, তারপর আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠি লিখেছ, এযে আমার কত সৌভাগ্য তা তোমাকে কেমন করে বোঝাব। তোমার চিঠি থেকে মনে হচ্ছে তুমি আর বিয়ে কর নি। আমার জন্য তোমার যে চিন্তা, যে কাতরতা,

STUDENTS' P.G.A. COMMON ROOM

যে উদ্বেগ, যে আকর্ষণ তোমার চিঠির প্রতি লাইনে ফুটে উঠেছে, তাতে মনে হয় যেন আমাকে পুনরায় গ্রহণ করতেও তোমার আপত্তি নেই। এ সবই আমার কাছে একটা স্বপ্ন, একটা ইন্দ্রজাল বলে মনে হচ্ছে। কত কথা যে আজ বুক ফেটে বেরুতে চাচ্ছে! তুমি কুকার কিনেছ, শিল নোড়া ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছ, সে খবরও চিঠিতে দিতে ভোল নি।

আমার সব খবর জানবার জন্য আগ্রহ জানিয়েছ। কি করে একটি পাদ্রীর আয়া হয়ে বিলেতে এলাম, সেখান থেকে আর এক পাদ্রীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এলাম, সেখানে আমার নাচ দেখে এক ভদ্রলোক আমাকে কেমন করে নানাস্থান ঘুরিয়ে হলিউডে নিয়ে এলেন, কি করে এখানে ভর্তি হলাম, সে সব গুছিয়ে লিখতে হলে একখানা প্রকাণ্ড বই হয়ে পড়বে। সে চেষ্টা আমি আজ করব না। যদি ভাগ্যে থাকে তবে সবই তোমাকে একদিন মনের মত করে শোনাব। যে ছবি দেখে তুমি আমাকে আবার মনে করেছ, সেই ছবিখানির তোলার ইতিহাসটাই শুধু আজ তোমাকে লিখব।

একদিন দেশের কথা মনে করে সত্যিই মনটা অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠল। এত খারাপ লাগতে লাগল যে সে দিন ডিরেক্টরকে বলে ছুটি নিয়ে এখানকার বাগানের একটা কৃত্রিম ঝরণার ধারে বসে দেশের কথা, তোমাদের কথা, বাবা মার কথা ভাবতে লাগলাম। তবু ভাল লাগল না। উঠে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম, মেডকে বলে দিলাম আজ কিছু খাব না।

ঘুম আর আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করবার পর একটু তন্দ্রা এল। তার পরেই স্বপ্ন। অদ্ভুত স্বপ্ন সে। দেখি, মালকোঁচা বেঁধে তুমি বারান্দায় বসে মসলা বাটতে আরম্ভ করেছ। পাশেই দেখি, মা মসলা বাটছেন। তার-পরেই দেখি, আমাদের চাকরটা ইলিশ মাছের ঝালে দেবার জন্য সরষে বাটছে। ফিল্মে যেমন ছবির পর ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি একের পর এক ওই ছবিগুলো ভেসে উঠতে লাগল। জগন্নাথ উড়ে কপালে তিলক কেটে, টিকিতে ফুল গুঁজে, মসলা বাটছে আর ঠোঁটের দুই কস বেয়ে পানের পিক [illegible] শিলের ওপর ঝরে পড়ছে; কুস্তিগীর তেওয়ারি নিজের ঠোঁটে খইনি চেপে বীরবিক্রমে মসলা বাটছে, নতুন বউ অরুণা হাতের তাগা আর চুড়ি দুলিয়ে প্রাণপণে মসলা বাটছে আর মাঝে মাঝে নীরবে আর পারিনে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে; বিধবা সৌদামিনী খালি হাতে খালি গলায়, পিঠের উপর চুলের রাশ ছড়িয়ে মসলা বাটছে আর মনে মনে বলছে, পোড়া কপালে কিছুই সইল না, কিন্তু শিল নোড়া গলায় ঝুলেই রইল; কেরাণীর এম-এ-পাশ গৃহিণী শিল-নোড়া থেকে সেক্সপীয়রের রস নিংড়ে বার করতে চেষ্টা করছেন; ক্ষেন্তি ঝি মসলা বাটছে, নোড়ার তালে তালে ঠাকুরের সঙ্গে বক্ বক্ করছে, আর মাঝে মাঝে শিলের দুই পাশ থেকে গত ছয় মাসের সঞ্চিত ধুলো, কাদা আর মসলার মিকশ্চার তুলে তুলে শিলের উপরে মসলার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে; কাদের বাড়ীতে পাইকারী পরিমাণে মসলা বাটবার জন্য সারি সারি পালোয়ান আর পালোয়া-নীরা বসে গেছেন, আর তাদের হাসি গল্পের মধ্যে মুখের থুতু ছিটকে এসে শিল-নোড়াগুলিকে পবিত্র করে তুলছে; বিরাট বোর্ডিংএ পাঁচখানি শিল-নোড়া যুগপৎ চলছে আর পাঁচ মিনিট অন্তর রামচরণের শরীর থেকে Aqua Perspiratio cum fluid eczema পাঁচ মিনিম করে ঝরে পড়ে স্বাদু মসলা স্বাদুতর করে তুলছে; বিশুদ্ধ হোটেলের কেষ্ট প্রাণপণে রশুন বাটছে, ক্রমাগত নাক ঝাড়ছে আর সেই হাত দিয়ে শিল থেকে মসলা চেঁছে নিয়ে তুলে রাখছে, এমনি আরো কত ছবি যেন একসঙ্গে ভীড় করে আসতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, আমি যেন মসলা বাটতে বাটতে শিলের উপর পড়ে গেলাম আর কপালে খুব চোট লাগল। ঘুম ভাঙতেই দেখি খাটের একপাশে এসে পড়েছি আর খাটের শিয়রের দিকের একটা কাঠে মাথাটা ঠুকে গেছে। সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে সুস্থ হয়ে একটা আইসক্রীম সোডা খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই আবার স্বপ্ন!

দেখি, বিরাট কাঙালীভোজন, প্রকাণ্ড ভিয়েন, তারি পাশে প্রকাণ্ড একটা অ্যালুমিনিয়মের ডেকচির দুইপাশে

প্রকাণ্ড দুইখানি বাঁশ, প্রকাণ্ড চারজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ওই বাঁশের সাহায্যে ডেকচি কাত করে ফেন গালিয়ে আর নাতিধন শুভ্র উত্তপ্ত ধূমায়মান ফেনস্রোত সমুৎকর্তিত নর্দমা দিয়ে তরতর বেগে বয়ে যাচ্ছে; এক জায়গায় দেখি বিশাল ডেকচিগুলি সরাঢাকা দিয়ে চাটাইয়ের উপর উপুড় করা রয়েছে, আর তার থেকে ফেন বের হয়ে চাটাই ভেদ করে নীচের নালায় গিয়ে পড়ছে; আমাদের পুরাণো পাড়ার একটা বাড়িতে দেখি, বুড়ো গিন্নী লোহার বেড়ী দিয়ে পিতলের বোক্‌নো কাত করে ফেন গালছেন; পাশের বাড়ীর রাঙাবৌ মাটির হাঁড়ির মুখে অ্যালুমিনিয়মের সরা বসিয়ে দুখানি কাল কুচকুচে ন্যাতা দিয়ে দুপাশ চেপে ধরে হাঁড়ি কাত করে ফেন গালছেন, গালদুটো কোলা ব্যাঙের মত ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে একশ ডিগ্রী উত্তপ্ত বাষ্প ক্রমাগত সরিয়ে দিচ্ছেন, আর এই চেষ্টায় তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে; বোসেদের বাড়ীর আইবুড়ো মেয়ে ললিতা ফেন গালতে গিয়ে হাঁড়ি ভেঙ্গে গরম ভাত আর ফেন পড়ে পা পুড়িয়ে ফেলেছে, পায়ের দাগ আর কুচকোনো চামড়া দেখে কেউ মেয়ে পছন্দ করছে না; অমিদের বাড়ীর মেজ বৌ পিতলের হাঁড়ির মুখে মাটির সরা বসিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে ফেন গালছে, এমন সময় তার কোলের ছেলেটি হামা দিতে দিতে সেই ফেনের মধ্যে পড়ে হাত পা মুখ পুড়িয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে; চালের পুষ্টিকর অংশটা ফেনের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বলেই, বাঙালীরা খুব ভাল করে ফেন না ঝরিয়ে ভাত খান না, তাই সেদিন রামবাবুর বাড়ীর ঠাকুরকে ভাতের ফেন ভাল ঝরাতে পারে না বলে চাকরি থেকে বিদায় নিতে হল; প্রতি বাড়িতে ফেনবাহী নালা বা নর্দমা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত ফেন-কর্দমে যে ক্ষুদ্র স্বর্গ সৃষ্ট হয়েছে তার সুবাস যেমন পথিকের মনোহরণ কচ্ছে, তেমনি সন্নিকটবর্তী গৃহসমূহের স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি করছে; এমনি কত কি যে দেখতে লাগলাম, সব ভাল করে মনেও নাই। মোট কথা এমনি সব স্বপ্ন দেখতে দেখতেই সে রাত কাটল।

পরদিন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। এই ডিরেক্টর মহাশয় অন্যের কাছে যাহাই হোন-না কেন, আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। হলিউডেও যে ভদ্রলোক থাকতে পারে, তা এঁকে দেখবার আগে বিশ্বাস করতে পারিনি। এও আমার কপাল বলতে হবে। যাক্‌, তিনি সব শুনে বললেন, দেখ, একটা ছোট প্লট খাড়া করতে পার?

ভেবে দেখি।

আচ্ছা, আমিও ভেবে দেখি।

তারপর প্রায়ই আমাদের এসম্বন্ধে আলোচনা হত। ফলে একটা প্লট দাঁড় করান গেল। ছবিখানার নাম হল, Batna-butting and Phan-gulling in Bengal. আমি বলেছিলাম একটা ইংরাজি নাম দিতে, কিন্তু ডিরেক্টর বললেন, নাম যাই দাও, ছবি না দেখা পর্য্যন্ত তোমাদের ওই দুটো স্বর্গীয় ব্যাপার কেউ বুঝতে পারবে না; সুতরাং প্রকাণ্ড একটা দশ লাইন জোড়া শিরোনামা দিয়ে কাজ নেই। ছোট আনুষঙ্গিক ছবি হিসাবে এখানা এদেশে বেশ চলছে। তোমাদের কেমন লাগছে জানি নে।

আমার হাতে আর একটা কন্‌ট্র্যাক্ট আছে। সেটা শেষ হলেই দেশে ফিরবো। মনে মনে একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আর কোন দ্বিধাই নেই। জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসিনি—আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ভালবাসা আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে করছি। এখন কবে দেশে ফিরব এ চিন্তা ছাড়া আমার আর কোন চিন্তাই রইল না। আমার প্রণাম নিও। ইতি

তোমারই ফুলু

"ভাস্কর"

ছায়াপট

"বাণীনাথ"

অভিনয়

কাহিনী—মন্মথ রায়
পরিচালক—মধু বোস
শব্দযন্ত্রী—চার্লস ক্রীড
আলোক-চিত্র-শিল্পী—বিভূতি দাস, গীতা ঘোষ
সুর-শিল্পী—হিমাংশু দত্ত
নৃত্য-পরিকল্পনা সাধনা বোস

চরিত্রলিপি

মনীষা—সাধনা বোস
পীতাম্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী
হীরক—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
রত্না—প্রতিমা মুখার্জ্জি
অজয়—প্রীতি মজুমদার
রতনগড়ের রাজা—বিভূতি গাঙ্গুলি
থিয়েটার ম্যানেজার—তুলসী লাহিড়ী

...NTS' ... G. A. ... MMON-ROOM

শনিবার ৩রা সেপ্টেম্বর রূপবাণী চিত্রগৃহে ভারতলক্ষ্মীর নবতম অবদান "অভিনয়" মুক্তিলাভ করেছে। প্রায় দেড়লাখ টাকা খরচ করে বাবুলাল চোখানি এই অনবদ্য উৎকৃষ্ট চিত্রখানি উৎসাহী দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। বাংলার ফিল্ম ইতিহাসে একই সংস্করণ চিত্রগঠন কার্য্যে এত অধিক ব্যয় বোধহয় কখনও হয় নি।

অর্থলোভী চিত্র ব্যবসায়ীদের মত এই চিত্রের প্রযোজক বিশেষ কিছু লাভবান না হলেও চিত্রশিল্পের দিক দিয়ে অভিনয়ের মত একটি উচ্চাঙ্গের ছবি দরকার ছিল। নিউথিয়েটার্স বা অন্যান্য নামজাদা প্রতিষ্ঠানের ছবির কাছে মধু বোসের অভিনয় কোন অংশেই হীন নয়; বরং অভিনয়, সেট, সাজ সরঞ্জাম, নৃত্য—প্রভৃতি ছবির সকলগুলি বিশেষত্ব বাংলার অন্য কোন উৎকৃষ্ট ছবিতে একসঙ্গে দেখা যায়নি। অভিনয় চিত্রের কলাকৌশল খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও দর্শকদের পরিপূর্ণ আনন্দ জোগাবার উপাদান ইহাতে যথেষ্ট ছিল।

গল্পাংশ :—

কিষণগড়ের তরুণ জমিদার হীরক রায় বন্ধুগণ সহ রেল ভ্রমণ করছিলেন। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে 'জাগ্রত-ভারত' নামক একখানি কাগজের এক নারী-চিত্রের প্রতি ইহার হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষিত হল। মেয়েটির নাম মিস্ বেঙ্গল ওরফে মিস মনীষা—প্রফেসর পিতাম্বর চৌধুরীর কন্যা—সৌন্দর্য্য প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ছবি দেখে খেয়ালী হিরক বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রাখল—এই সুন্দরী মেয়েটীকে সে বিয়ে করবে। হীরক আবার পাটনা কলেজে প্রফেসর পীতাম্বরের একদিন ছাত্র ছিল। সুতরাং পুরাতন আলাপ আবার নূতন করে জমে উঠল এবং প্রজাপতির অনুগ্রহে একদিন হীরক ও মনীষা পরস্পরের মধ্যে বাঁধা পড়ল।

দিন চলে যায়। মেয়েদের যা কিছু কাম্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য সব কিছুই হীরক মনীষাকে দিয়েছিল শুধু সে দেয় নি তার একনিষ্ঠ প্রেম। এদের জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হ'ল—যেদিন মনীষার জন্ম দিন। স্থির হ'ল ঐ উৎসব দিনে প্রফেসর পীতাম্বর চৌধুরীর লেখা "শকুন্তলা" নাটক অভিনয় কর্ত্তে হবে। হীরক পার্ট নেবে 'দুষ্মন্তের' আর মনীষা 'শকুন্তলার'।

নিমন্ত্রণের চিঠি গেল হীরকের বাবার এক বন্ধু রতনগড়ের রাজা ও রাজকুমারী রত্নার কাছে। একদিন রত্নাই ছিল হীরকের প্রথম প্রণয়ী। বিলেত থাকতে এঁর সম্বন্ধে

অভিনয়ের একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, সাধনা বোস এবং প্রীতি মজুমদার

অভিনয়ের পীতাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

দু' একটি বাজে কথা শুনে রত্নার মন বিগড়ে যায়। হীরক প্রতিশোধ নিল মনীষাকে বিয়ে করে। কিন্তু রত্নার সঙ্গে দেখা হবার পর হীরকের ভুল ভাঙ্গল। প্রথম প্রণয় আবার হয়ে উঠল পল্লবিত। মনীষার কাছেও এ সব আর লুকোচুরি কিছু রইল না। Hot-house-এর সামনে মনীষা শুনতে পেল হীরক ও রত্নার কথা। হীরক মনীষাকে বিয়ে দেবী নাম নিয়ে মনীষা অভিনয় করছে তার বাল্য বন্ধু অজয় এ খবর পেলে। গৃহে বৃদ্ধ পীতাম্বর কন্যা শোকে অন্ধ। তিনি পাটনা হতে কলকাতায় চলে এলেন অজয়ের কাছে।

হীরক কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রত্নাকেই বিয়ে করবে বলে ঠিক করল। হঠাৎ "কচ ও দেবযানী" নাটকের চরিত্রলিপির মধ্যে মনীষার একখানা ছবি দেখে সে চকিত হয়ে উঠল।

আর, কে, রেডিয়োর নূতন চিত্র 'Condemned Women' চিত্রের একটি দৃশ্য

করেছে শুধু বাজী রেখে—সে শুধু নামেই তার স্ত্রী। গভীর উত্তেজনায়, রাগে দুঃখে মনীষা স্বামীর ঘর ত্যাগ করল—জানিয়ে গেল স্বামীর পরিচয় নিয়ে সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। আজ হ'তে সে স্বাধীন—সে মুক্ত। ইহার পর কিছুদিন যাবত মনীষার আর খোঁজ খবর মিলল না। সকলে মনে করলো যে মনীষা আত্মহত্যা করেছে। এদিকে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে "কচ ও দেবযানী" নাটকে ইন্দ্রাণী এবং ব্যাকুল ভাবে ছুটল ঐ নাটকের অভিনয় দেখতে। অভিনয়কালে দেবযানীকে দেখে সে বুঝতে পারল—দেবী ইন্দ্রাণী আর কেহ নহেন—তার স্ত্রী মনীষা। ইহার পর প্রথমতঃ নানা ছলে হীরক চেষ্টা করল মনীষাকে আবার কাছে পেতে কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর সে অপর এক কৌশল অবলম্বন করল। ম্যানেজারকে টাকার লোভ দেখিয়ে বাসব রায় নামে সে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল।

অভিনয়ের একটি দৃশ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য এবং প্রতিমা মুখার্জ্জী

এদিকে রত্না দেখে হীরক কোলকাতা থেকে আর ফেরে না। সে ব্যস্ত হয়ে কোলকাতায় এসে দেখে হীরক এক অভিনেত্রীর প্রেমে পাগল! দেবী ইন্দ্রাণী যে হীরকের স্ত্রী সে তা জানত না। আবার হীরক ও মনীষারও অভিনয়ে আর মন বসছিল না। তারা দিন দিন হাঁফিয়ে উঠছিল। তারা করে দিল। মনীষাকে ড্রেসিং রুমে একলা পেয়ে সে জানাল সে হীরকের শুধু বাগ্‌দত্তাই নয়—সে সন্তান-সম্ভবা মা। অভিনয়-জীবনে মনীষার নারী জীবনে আবার এল ত্যাগ—গভীর এক উচ্ছ্বসিত মর্ম্মবেদনা। সে কাঁদতে কাঁদতে আবার বাবার কাছে ফিরে গেল।

আর, কে, রেডিয়ো চিত্র প্রতিষ্ঠানের আগামী আকর্ষণ 'কেয়ার ফ্রি' চিত্রে জিঞ্জার রজার্স এবং ফ্রেড এ্যাসটেয়র

স্থির করলে অভিনয় আর তারা করবে না। সে দিন পীতাম্বরের "শকুন্তলা" নাটকের শেষ রজনী। অন্ধ পীতাম্বর এসেছেন আর এসেছে রত্না। অভিনয়ের শেষে দর্শকদের ভীড় কমে এল—হীরক অপেক্ষা করছে মনীষাকে নিয়ে সে কিষণগড়ে আবার ফিরে যাবে। কিন্তু রত্নাই সব অভিনয় শেষ

অভিনয় চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন মন্মথ রায়। ছবিখানিতে ষ্টেজের প্রভাব বেশ আছে। বিজ্ঞ নাট্যকার ভোল বদলিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ চিত্র-নাট্যকার হতে পারেন নি। রচনার অভিনবত্ব আছে কিন্তু চিত্রনাট্য গঠনের মুখে বহু অনাবশ্যক দৃশ্য মূল চিত্রে স্থান দিয়ে ছবির

অভিনয়ের একটি দৃশ্যে ললিত মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সাধনা বোস

গতি ও সম্পদকে নষ্ট করেছেন। ছবির প্রথম মুখে আনন্দ এবং কৌতূহল উদ্রেক করে তেমন ঘটনার সমাবেশ কিছুই নাই। রত্নার আবির্ভাবে গল্পের জটিলতা বেড়ে গেলেও মনীষা নটী দেবী ইন্দ্রাণী হিসেবে দর্শকদের কাছে দেখা দেবার পরই 'অভিনয়' সব দিক দিয়ে সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে। পরিচালক মধু বোস সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে গল্পটিকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। যে আধুনিক রুচি নিয়ে এই ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে পরিচালক অতি কৃতিত্বের

আরেকটু close up দেখালে নৃত্যের মুদ্রাগুলি আরো উপভোগ্য হতো। ছবির দু'একটি দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিকে আঘাত করেছে। রাজা রতনগড়ের বৃহৎ প্রাসাদে মাত্র তিন চারটি দারোয়ান ছাড়া অন্য লোকের অল্পতা বড় চোখে লাগে। দ্বিতীয় পীতাম্বরের কাছে বর ও বধূ বিদায় নিল এসে একেবারে বাড়ীর গাড়িবারান্দায়। কিন্তু মনীষা চলে যাবার পর কার সুবুদ্ধিতে হীরক মোটর করে মাঝ ষ্টেশনে মনীষার সঙ্গে দেখা করল—এইটাই সব চেয়ে

ষ্ট্রীট সিঙ্গার চিত্রের একটি দৃশ্যে কানন এবং শৈলেন চৌধুরী

সঙ্গে রূপালী পর্দায় ফুটিয়ে তুলে শিল্পীর গভীর কলা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের একটি বিশিষ্ট সম্পদ অতি উচ্চাঙ্গের সেট ও সাজ সরঞ্জাম। শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর কায সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে ছবির সাজ সরঞ্জাম ও decorations. এত কলাময় ও উন্নত রুচির পরিচয় আমরা ভারতীয় কোন চিত্রে পাইনি। নৃত্যের দিক দিয়ে কচ ও দেবযানী নৃত্য সকলের নিকট বাহবা পেয়েছে। সাধনার নৃত্যগুলি

কেমন ঠেকেছে। আবার "বাজী রেখে বিয়ে" এই ছোট্ট কথাটির ওপরই এত বড় একখানা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। মনীষা ও হীরকের গভীর প্রেম সম্বন্ধটুকু হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল তার সূচনা তেমন প্রাণস্পর্শী হয়নি। এ ছাড়া ছোট খাট দোষ ত্রুটিও বড় কম নয়।

সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে মনীষার চরিত্রাঙ্কণে সাধনার অতুলনীয় অভিনয় ভুলবার নয়। সুললিত কথা-বার্তা, নৃত্য-গীত, ছন্দময়ী গতিবিধি এবং নিপুণ নটীর ভঙ্গিমায়

অভিনয়ের নানা রসের অবতারণা সকলের প্রাণকে স্পর্শ করে। মনীষার জীবনের দুইটি বিভিন্ন ধারাকে প্রকাশ করতে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা যে কোন শিল্পীর শ্লাঘার বিষয়। তিনি যে নিখুঁত অভিনয় করেছেন সে তিনি বেশ প্রমাণ করেছেন অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে হীরকের কাছে বিদায় নেবার মুখে—'আমি নিখুঁত অভিনয় করেছি।" ক্যামেরার কাছে প্রতিমা মুখার্জ্জীর এই বোধ হয় প্রথম 'মিলন।' তাই একটু জড়সড় ভাব এখনো কাটেনি। চেহারার দিক দিয়ে রত্নার ভূমিকায় প্রতিমা মুখার্জ্জীকে মানিয়ে ছিল অতি চমৎকার, কথা বার্ত্তায় বেশ একটু উচ্চতর স্বাতন্ত্র্য। পীতাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী একাধারে নাট্যকার, স্নেহান্ধ পিতা ও শোকান্ধ বৃদ্ধের বিভিন্ন রূপগুলি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'পীতাম্বর' ছায়াচিত্রে একটি স্মরণীয় চরিত্রাঙ্কন হয়ে রইল। ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের হীরক বেশ মানিয়েছে তবে সাধনার কাছে এঁর পৌরুষত্বের গর্ব্ব যেন কিছু ম্লান হয়ে গেছে। গানগুলি তেমন উৎকৃষ্ট নয়। প্রতিমাকে দিয়ে দু'একটি গান গাওয়ান উচিৎ ছিল কারণ তিনি সুগায়িকা। রতনগড়ের রাজার ভূমিকায় বিভূতি গাঙ্গুলি নিজের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার "নুইসেন্স" কথাটি অনেকদিন আমাদের মনে থাকবে। ম্যানেজারের ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী সত্যিই হাসিয়েছেন। ইনি যে একজন উৎকৃষ্ট নট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অজয়ের বেশে প্রীতি মজুমদার বেশ করেছেন। লুকিয়ে ছবি তোলবার মুখে হাত থেকে ক্যামেরাটি পড়ে যাওয়া এবং অজয়ের পলায়ন বেশ লেগেছিল। পীতাম্বরের বন্ধু ও ললিত মিত্রের শেষ অভিনয় "অভিনয়" চিত্রে যা একটু দুঃখের কারণ।

অধিকার চিত্রের একটি দৃশ্যে যমুনা, মেনকা, পাহাড়ী এবং শৈলেন চৌধুরী

সুরশিল্পী হিমাংশু দত্ত ইংরেজী ছবির ধরণে গীতগুলির সুর সংযোজনায় সফলকাম হয়েছেন। সেই এক ঘেয়ে "সিনেমা গানের" পরিবর্ত্তে এই নূতন প্রবর্ত্তনায় দর্শকগণকে অধিক আনন্দ দিতে পেরেছে। আলোক-চিত্রশিল্পীদ্বয়ের কায বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শব্দযন্ত্রীর কায প্রশংসনীয়। সম্পাদনা অতি নিম্নদরের কিন্তু নৃত্য-কল্পনা বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

নাচ, গান, অভিনয়ে ভারতলক্ষ্মীর "অভিনয়" চিত্রখানি

ভারতীয় চিত্রের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল সন্দেহ নাই।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ ঃ

নিউ থিয়েটার্স

ষ্ট্রীট সিঙ্গার—

পরিচালক ফণী মজুমদার আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই ছবিখানির উভয় সংস্করণ (বাঙলা ও হিন্দী) শেষ করবেন। বেশ তৎপরতার সঙ্গে ফণী মজুমদার অতি অল্প দিনে ছবিখানি প্রায় শেষ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বজবজের একটি ভীষণ বন্যাপ্লাবিত অংশের চিত্র গ্রহণ করবার পর, বোটানিকাল উদ্যানে মঞ্জু ও অমরচাঁদের শেষ দৃশ্য তোলা হয়। অমরচাঁদ মঞ্জুকে ভালবাসত এবং তাঁর সেই ভালবাসাকে আঘাত দেয় মঞ্জু তার পূর্ব্বেকার সাথী ভুলুয়াকে (সাইগল) মনে করে। এই চিত্রের শেষ সেটের কায আরম্ভ হয়েছে। এটি হচ্ছে ষ্টেজ। "অভিনয়ের" সঙ্গে এর খানিকটা মিল থাকলে আমরা খুব বিস্মিত হব না।

বিষের বাঁশী—

দেবকী বসুর নূতন ছবির চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। বিষের বাঁশীর কাহিনী প্রাচীন ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে রচিত। চিত্রের উপযোগী করে কাহিনী লিখেছেন কাজী নজরুল। ক্যামেরার কাজ করছেন ইউসুফ মুল্জী এবং শব্দযন্ত্রী হচ্ছেন এ, চাটার্জ্জি। সুর

দেশের মাটি চিত্রে সায়গল অজয়ের ভূমিকায় দেখা দেবেন

দেশের মাটি চিত্রে অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী

সংযোজনা করছেন রাই বড়াল। এই ছবির জন্য নট-নটী নির্ব্বাচিত হয়েছেন কানন, মেনকা, মনোরঞ্জন, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। প্রথম সেট হয়েছে মনসা জঙ্গল। ষ্টুডিয়োর ভিতর যেন সত্যিকার পাহাড়ের কোল বেয়ে জঙ্গল তৈয়ারী হয়েছে। সাপুড়ের সর্দ্দার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দলবল নিয়ে এই সেটে কাজ করছেন।

বড়দিদি—

এর কায মাঝে বন্ধ ছিল। সুরশিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। বড়দিদির দুইটী বিভিন্ন ভূমিকায় যথাক্রমে মাধুরী ও জনৈক বৈষ্ণবের বেশে দেখা দেবেন চন্দ্রাবতী ও বিনয় গোস্বামী।

দেশের মাটী—

দেশের মাটী চিত্র ১৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার চিত্রা ও নিউ সিনেমায় যুগপৎ মুক্তিলাভ করবে। ছবির গতি, ও আনন্দ রস পরিবেশন ক্ষমতা কমে না যায় সেইদিক দিয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এই চিত্রের কর্মকর্ত্তারা। বহু অর্থ ব্যয়ে

ফক্স কোম্পানীর আগামী আকর্ষণ 'We are going to rich' চিত্রের একটি দৃশ্য

তোলা এ ছবিটী সাধারণের কাছে পূর্ণ সমাদর লাভ করলে আমরা আনন্দিত হব। দেশের মাটীর পর বড়ুয়ার পরিচালনায় তোলা "অধিকার" দেখান হবে। সুতরাং ততদিন বড়ুয়ার ভক্তরা একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন।

দুসমন—

নীতীন বসুর পরিচালনায় এর কায দ্রুত চলেছে। শোনা যাচ্ছে ডিসেম্বরের মধ্যে এই ছবিখানি সমাপ্তি লাভ করবে। একমাত্র হিন্দি সংস্করণ হওয়ার জন্যে বহুদিন পর গীতা দেবীর ভূমিকায় লীলা দেশাইয়ের উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখা হতে দর্শকগণ বঞ্চিত হবেন।

দেবদত্ত ষ্টুডিয়ো—

"গোরা"র আশ্চর্য্যকর সাফল্য লাভ হওয়াতে দেবদত্ত

ফক্স কোম্পানীর 'In old Chicago' চিত্রের একটি দৃশ্য

ফিল্ম আবার পূর্ণোদ্যমে কার্যক্ষেত্রে নাবচেন। শোনা যাচ্ছে, মন্মথ রায়ের একখানি অভিনব কাহিনী এঁদের হাতে শীঘ্রই চিত্রে রূপ নেবে।

মেট্রোপলিটন পিকচার্স—

খনা—

এই চিত্রখানির প্রায় সমাপ্তি হয়ে এলো। পরিচালনা করছেন জ্যোতিষ বানার্জ্জি। খনা চিত্রখানি সব দিক দিয়ে মুগ্ধকর হবে বলে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। খনা—ছায়া দেবী, বরাহ—অহীন্দ্র চৌধুরী এবং মিহির—সুশীল রায়। চিত্রখানি শীঘ্রই উত্তরায় মুক্তিলাভ করবে।

টলিউড পিকচার্স—

পথিক—

টলিউড ষ্টুডিওতে পরিচালক চারুরায়ের পরিচালনায় এই ছবিখানি প্রায় শেষ হয়ে এলো। "গ্রহের ফের" চিত্রের নায়িকাদ্বয় শীলা হালদার এবং রমলা বেশ উন্নত অভিনয় করছেন।

বাণীনাথ

TS G. A MMON-ROOM

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জী—

১৯৩৫ সালে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে প্রবেশ করিবার পর লীলা চ্যাটার্জ্জী সুবিখ্যাত সাঁতারু শান্তি পালের অধীনে সন্তরণ শিক্ষা আরম্ভ করেন। সন্তরণে এঁর কয়েকটি নিজস্ব রেকর্ড আছে। বর্ত্তমান বর্ষে লীলা চ্যাটার্জ্জী ১০০ মিটার সন্তরণে ভারতে একটি নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করিতে লীলা চ্যাটার্জ্জীর সময় লাগিয়াছে

কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জী

১ মিঃ ২৮ সেঃ মাত্র। এত অল্প বয়সে সন্তরণ বিষয়ে ইনি যা দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়জনক।

ভারতবর্ষ অভিমুখে গ্রিমেট—

অষ্ট্রেলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোলার গ্রিমেট আগামী শীতকালে জাঠ মহারাজার ক্রিকেট খেলার শিক্ষক হিসাবে ভারতবর্ষে আসিবেন। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। এখানে প্রায় চার মাস অবস্থান করিয়া ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষী স্বদেশাভিমুখে রওনা হইবেন।

মণ্টগোমারী এসোসিয়েশন হকিদল—

মণ্টগোমারী এসোসিয়েশন হকিদল কলিকাতায় আসিয়া কয়েকটি প্রদর্শনী-হকিম্যাচ খেলিয়াছে। প্রথম খেলায় উক্ত হকিদল মোহনবাগান দলের নিকট ৩-২ গোলে পরাজিত হয়। মোহনবাগান পক্ষে এম, এ, খাঁ একাই তিনটী গোল করিয়া অশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় খেলা অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ বন্ধ থাকে। তৃতীয় খেলায় মহমেডান দলের সহিত ড্র হয় এবং চতুর্থ বা শেষ খেলায় এস, কে, সিংহের একাদশের কাছে উক্ত এসোসিয়েসন হকিদল ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে।

মানভাদার হকি দল—

মানভাদার হকি দল আগামী অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিবে। তাহাদের নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণ শেষ হইয়া গিয়াছে। মানভাদার হকি দল সেখানে ৩১টী খেলায় যোগদান করে, তার মধ্যে একটি খেলা ছাড়া তাহারা প্রত্যেকটি খেলায় জয়ী হয়। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত হকি দল ভারতের বাহিরে খেলিতে গিয়াছে তাহার মধ্যে কোন দলই কাহারও কাছে হারে নাই, সেই হিসাবে ভারতবর্ষের সম্মান একটু ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়াই মনে হয়। তাহারা ৩১টী খেলায় যোগদান করিয়া স্বপক্ষে ২৩২টি গোল করিয়াছে এবং তাহাদের বিপক্ষে হইয়াছে মাত্র ১৭টী গোল।

ভারতবর্ষের হকি ফেডারেশনের সম্পাদক এস, চ্যাটার্জ্জী একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে মানভাদার হকি দল ১লা এবং ৩রা অক্টোবর মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে আসিয়া পৌছিবে। উক্ত হকি দলের সঙ্গে দুইটী প্রদর্শনী-খেলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রথম খেলাটি হইবে মাদ্রাজ প্রাদেশিক একাদশের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি বোম্বাই কাষ্টমসদের সঙ্গে।

ক্রিকেট—

এই বৎসরের মত ইংলণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্রিকেট খেলা শেষ হইয়াছে। এবারও ব্যাটিংএ গড়পড়তা রানের হিসাবে ব্রাডম্যান শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এ কৃতিত্ব ব্রাডম্যানের নূতন বা প্রথম নয়, ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ব্রাডম্যান তিনবার ইংলণ্ডে আসিয়াছেন এবং কোনবারেই তিনি ব্যাটিংএ প্রথম স্থান ছাড়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। এইবারের বিশেষত্ব যে, তিনি গড়পড়তা রানের হিসাবে তাঁহার পূর্ব্বেকার রেকর্ড অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ব্রাডম্যান এইবারকার টেষ্ট খেলায় কোন না কোন ইনিংসে শতাধিক রান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ব্রাডম্যান ১৫ বার শতাধিক রান করিয়াছেন—এমন কি হবস্ সারা জীবনে ১২ বারের বেশী যাহা পারেন নাই। ব্রাডম্যান সর্ব্বশুদ্ধ রান করিয়াছেন ২,৪২৯ এভারেজ ১১৫'১৬। ওরিলি ১০৪ উইকেট নিয়ে বোলিং হিসাবে সর্ব্বোচ্চ এভারেজ করিয়াছেন ১৬'৬৫।

ট্রেডস কাপ

দীর্ঘ তিরিশ বৎসর পরে এবার মোহনবাগান ২—০ গোলে টাউন ক্লাবকে পরাজিত করিয়া ট্রেডস কাপ বিজয়ী হইয়াছে। প্রথম দিনের খেলায় শেষ নিষ্পত্তি না হওয়ায় উভয় দলকেই আর একদিন খেলিতে হয়। এই দিনকার খেলায় মোহনবাগান দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেলিয়া টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে। এস গাঙ্গুলী দুটী গোলই করেন। গত বৎসর নেপিয়ার স্পোর্টিং ক্লাব বিজয়ী ছিল।

কুচবিহার কাপ

১৯৩০ সালে বিজয়ী হইবার পর ই, বি, রেল দল এই প্রথম ৩-০ গোলে ভবানীপুর ক্লাবকে অবনমিত করিয়া কুচবিহার কাপ বিজয়ী হইল। প্রথম দিন গোল-শূন্য ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় রেল দল জয়ী হয়। তিনটী গোলের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গলের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় নিধু মজুমদার দু'টী এবং বিখ্যাত খেলোয়াড় সামাদ একটী করিয়া গোল করেন। গত বৎসর বিজয়ী ছিল টাউন ক্লাব।

ইঁয়ঙ্গার কাপ

মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় উপস্থিত না থাকায় রেঞ্জার্স ওয়াকওভার পাইয়া বিজয়ী হইয়াছে। গত দু'বৎসর মোহনবাগান বিজয়ী ছিল।

রাজা শীল্ড

রেঞ্জার্স অতি সহজে ৫-১ গোলে রবার্ট হাডসন দলকে হটাইয়া আলোচ্য বৎসরের জন্য রাজা শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে। গত বৎসর বিজয়ী ছিল মোহনবাগান।

লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড

রেঞ্জার্স ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে নিম্নে নামাইয়া লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে। রেঞ্জার্সের খেলোয়াড় ব্রীজ খেলার শেষ সময়ে জয়সূচক গোলটী দিলে খেলার নিষ্পত্তি হয়। পূর্ব্ব বৎসর কাষ্টমস বিজয়ী ছিল।

গ্রীফিথ শীল্ড

পূর্ব্ব বৎসরের বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং এবারও ২-০ গোলে কে, ও, এস, বিকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিজয়ী হইয়াছে।

ইলিয়ট শীল্ড

রিপন কলেজ ২-১ গোলে প্রেসিডেন্সী কলেজকে পরাস্ত করিয়া উক্ত শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে এবং উহাই তাহাদের প্রথম শীল্ড জয়। পূর্ব্ব বৎসর বিজয়ী ছিল বিদ্যাসাগর কলেজ।

বেল চ্যালেঞ্জ কাপ—

১২ই সেপ্টেম্বর ই, আই, আর ডিভিসন্যাল স্পোর্টিংস মাঠে বেল কাপের ফাইন্যাল খেলা শেষ হইয়াছে। কলিকাতার রেঞ্জার্স ও ঐখানকার স্থানীয় পাওয়ার হাউস

দল উক্ত কাপের ফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ফাইন্যাল খেলায় রেঞ্জার্স ৩-১ গোলে পাওয়ার হাউস দলের নিকট পরাজিত হয়।

জবাকুসুম কাপ—

পুলিশ এ, সি, অতিকষ্টে ১-০ গোলে রবার্ট হাডসন দলকে পরাজিত করিয়া জবাকুসুম কাপ বিজয়ী হইয়াছে। খেলার শেষে কলিকাতার মেয়র মাননীয় মিঃ এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন।

রোভার্স কাপ—

পূর্ব্ব বৎসরের বিজয়ী বাঙ্গালোর মুসলিম দল এবারও রোভার্স কাপ বিজয়ী হইয়াছে। বাঙ্গালোর মুসলিম দল ছাড়া আর কোনও অসামরিক দল রোভার্স কাপে এর আগে বিজয়ী হয় নাই, সেই কারণে উপর্য্যুপরি দু'বৎসর বিজয়ী হওয়া বাঙ্গালোর মুসলিম দলের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। ফাইন্যাল খেলায় আর্গাইল দলকে পরাজিত করিয়া উহারাই এ বৎসর কাপ বিজয়ী হয়।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সুখ দুখ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন বি-এ

নিজে নিয়ে আত্মভোলা নাহি সুখ দুখ;
খেলা ঘরে করি খেলা আপনা বিভোর;
দুই এক করে ক্রমে সাথী বেড়ে যায়;
কি আছে তাদের, আর আমার কি নাই,
এই নিয়ে শিখি যবে করিতে তুলনা,
তখনি সুখের আর দুখের জনম;
সবল সহজ হাসি নাহি শোভে মুখ,
বারে বারে ব্যথা পেয়ে মন হয় চোর,
ঘুরি ফিরি খুঁজি সুধু পাবার উপায়,
নিতে চাই, যাহা পাই, আর কি বিলাই।
চাও কিছু? কাছে এস, কথাটি তুল'না;
নীচু পানে চেয়ে সুখ, উচু পানে দুখ;
যেই ভাবি সুখী নিজে, গর্ব্বে ভরে বুক।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বেরি-বেরি ও ভেজাল তৈল

যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ন্যায় বেরি-বেরিও বাঙ্গালীর নিত্য ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা সহরের ব্যাধি ছিল, বর্ত্তমানে পল্লীতেও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকার বা প্রতিরোধের কোন সঠিক উপায় এ পর্য্যন্ত চিকিৎসকেরা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দূষিত চাউল হইতেই ইহার জন্ম, এতদিন চিকিৎসকেরা এই কথা বলিয়া আসিতেছিলেন যদিও টাটকা ঢেঁকিছাটা চাউলভোজীদের মধ্যেও এই রোগের প্রসার অল্প নহে। সম্প্রতি কতকটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে ভেজাল তৈলই এই ব্যাধির কারণ। কল-ওয়ালারা একপ্রকার বর্ণগন্ধহীন মেটে তৈল সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিতেছে। এই ভেজাল নাকি রাসায়নিক পরীক্ষাতেও ধরা পড়িতেছে না। বেরি-বেরিতে আক্রান্ত রোগীদের শুধু তৈল বন্ধ করিয়া দিয়াই নাকি চিকিৎসকগণ উপকার লক্ষ্য করিতেছেন। ঘানির তৈল বলিয়া যাহা চলে, তাহাতে অনেক সময় এই ভেজাল থাকে। কাজেই খুবই বিশ্বাসযোগ্য স্থানে প্রস্তুত তৈল ব্যতীত তৈল ব্যবহার নিরাপদ নহে। যাহারা তৈল ব্যবহার করে না, এমন লোকদের কখনও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য বোধ হয় নিম্নতম স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহার উপর যাহারা আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের মূল্যে নিজেরা বড়লোক হইতেছে তাহাদের অপরাধের মার্জ্জনা কোথায়। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির দোহাই দিবার আর দিন নাই। দেশের রাজ সরকারের এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

বন্যাপ্লাবিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, স্থায়ী চিররুগ্নকারী ব্যাধির প্রকোপ কিছুই নূতন নহে। আমরা অনাহার, ব্যাধি, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ প্রভৃতিতে এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, ইহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া আর আমাদের মনে হয় না। এ সকল যে নিবারণ করা যাইতে পারে, অন্যান্য সভ্যদেশের লোক যে বহুদিন এই সকল উৎপাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বাস্থ্যে ও পুষ্টিকর পর্য্যাপ্ত আহারে যে আমাদেরও পূর্ণ অধিকার আছে একথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি।

কিন্তু বাংলায় এবারকার বন্যার আবির্ভাব যেরূপ প্রবল, বহুব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং সর্ব্বধ্বংসকর, বাংলার দুর্দ্দৈবের অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ ইতিহাসেও তাহার তুলনা নাই। প্রথমে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে অতিবর্ষণে আশুধান্য এবং পাটের ফসল অধিকাংশ স্থানে নষ্ট হইয়া যায়, পরে বন্যার প্রকোপে ভবিষ্যতের ফসলের সম্ভাবনাও সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। বহুলোক নিরাশ্রয় হইয়াছে, কিছু লোক এবং বহু গৃহপালিত পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, পল্লী অঞ্চলে অনেককে অনাহারে এবং প্রায় সকলকেই স্বল্পাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে, গৃহপালিত পশু খাদ্যের অভাবে শুষ্ক স্থানের অভাবে দলে দলে মরিতেছে এবং নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তা লোককে হতবুদ্ধি ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এই সকল দুর্দ্দশার কবলে পতিত হয় নাই, অথবা যাহারা অপেক্ষাকৃত কম দুর্দ্দশাগ্রস্ত আছে তাহাদিগকে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে, নিরন্নদিগকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, মাতা,

ভগিনী কন্যাদের লজ্জা নিবারণের ভার লইতে হইবে এবং বিপন্নদের প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থ, শারীরিক সামর্থ্য এবং সহানুভূতির সমবায় ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে। সুতরাং কোন না কোন প্রকারে আমরা সকলেই পরিত্রাণ চেষ্টার সহায়তা করিতে পারি। বাংলার যুবশক্তি, বাংলার সেবাশক্তি, বাংলার বদান্যতা আর্ত্তরক্ষায় (আরও সঠিক ভাবে আত্মরক্ষায়) কোনদিন পশ্চাৎপদ হয় নাই। এবারেও আশা করা যাইতে পারে যে, এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালনে সকলে অগ্রসর হইবেন এবং কেহই কোন প্রকার অজুহাতে দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিবেন না।

অনেকে অভিযোগ করিতেছেন, এবার আশানুরূপ সাড়া মিলিতেছে না। না মিলিবার অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে। আকস্মিক প্রয়োজনেই লোকে অভ্যাসাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়; প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জন্য তাহা সম্ভব হয় না। আকস্মিক দুর্দ্দৈব বাংলার আজ নিত্য সঙ্গী হইয়াছে। কাজেই, সাহায্যের জন্য আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া অস্বাভাবিক কথা কিছু নহে। তাহা হইলেও, কোন কারণ দেখাইয়াই আত্মরক্ষার চেষ্টা হইতে বিরত থাকা যায় না। এবারেও জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সকলে সমবেতভাবে সচেষ্ট হইবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রতি বৎসর বন্যা আসিবে, দেশ ধ্বংস হইবে তাহার পর সাহায্য দিবার জন্য কিছু চেষ্টা চলিবে, এইভাবে ক্ষীণজীবি, দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে অধিক দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে। কাজেই, বাঁচিতে হইলে ব্যাধির মূল কোথায় তাহা দেখিতে হইবে এবং তাহাই দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাংলায় প্রতি বৎসর এই যে প্লাবন হইতেছে, ইহাকে প্রকৃতির কঠোর সতর্ক বাণী বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সাবধান হইবার সময় অনেক পূর্ব্বেই আসিয়াছে, এখনও যদি তাহা না হই তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ হইতেছে ধ্বংস। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা করুণ কথা হইতেছে এই যে, এই কারণ দূর করিবার ব্যবস্থা আমাদের হাতে নাই। অনেক নদী মরিয়া গিয়াছে; বহু নদীতে বাঁধ ও ব্রিজ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবার ফলে তাহারা আর পূর্ব্বের মত জল টানিতে পারিতেছে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন পথ দিয়া জল প্রবাহিত হইবে। নদী গর্ভে স্থান নাই। কাজেই প্রবহমান জলরাশি কূল প্লাবিত করিয়া দেশ মগ্ন করিতেছে,—ইহা না হইয়া উপায় নাই। নদীগুলির সংস্কার হইলে, খাল কাটিয়া জল প্রবাহকে বিভিন্ন পথে চালিত করিয়া জলের চাপ কমাইয়া দিতে পারিলে, বন্যা ও ব্যাধির হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইবে এবং দেশের শস্য বৃদ্ধিও হইবে। দেশের জাগ্রত জনমতই সরকারকে এদিকে অবহিত করিতে পারে।

বাংলায় নারী হরণের সংখ্যা ও তাহার অন্য দুই একটি দিক

বঙ্গীয় আইন পরিষদে মৌলভী মনিরুদ্দীন আকন্দের বাংলার বিভিন্ন জেলায় নারীহরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে তালিকাভুক্ত যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল। (৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিভিন্ন জেলায় নারীহরণের যে সংখ্যা উদ্ধৃত হইল তাহা ভয়াবহ হইলেও, এই সংখ্যা নারীঘটিত অপরাধের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার পরিমাপ নহে। লোকলজ্জা, গুণ্ডাদের ভয়, সামাজিক লাঞ্ছনার আশঙ্কা, আইনের নানাবিধ সূক্ষ্মতা ও জটিলতা এবং ফৌজদারি মোকর্দ্দমার অপরিহার্য্য কদর্য্যতা প্রভৃতির জন্য আইনের আশ্রয় লোকে সহসা লইতে চাহে না এবং ইচ্ছা থাকিলেও সব সময় তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধী এবং উৎপীড়িত একই সম্প্রদায়ভুক্ত এমন অনেকস্থলেই উভয়-পক্ষের লোকেরা ব্যাপার অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিতে চাহেন না এবং উৎপীড়িতাদের নিরাশ্রয়তা এবং দারিদ্র্য অধিকাংশস্থলে প্রতিকারের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত সংখ্যা অপেক্ষা উৎপীড়িতাদের সংখ্যা যে বহুগুণ অধিক তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

যদিও, সংখ্যা এবং তথ্যের দ্বারা একথা বরাবরই দেখা গিয়াছে যে অত্যাচারিতাদের সকলে বা অধিকাংশ হিন্দু নহেন,

জেলার নাম	নারী হরণ—সাধারণ				নারী হরণ—হিন্দু			
	মোট সংখ্যা	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি হইয়াছে	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীরা মুক্তি পাইয়াছে	যে সকল মোকর্দমা শেষ হয় নাই বা যাহা অন্য ভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে	মোট সংখ্যা	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি হইয়াছে	যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধীরা মুক্তি পাইয়াছে	যে সকল মোকর্দমা শেষ হয় নাই বা যাহা অন্য ভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে
ঢাকা	১৯	৩	১	১৫	৫	...	...	৫
মৈমনসিং	২৮	৯	১৫	৪	৬	২	৪	...
ফরিদপুর	২৯	৩	২৬	...	৭	১	৬	...
বাখরগঞ্জ	৩৭	১২	৭	১৮	৪	২	১	১
চট্টগ্রাম	১৯	১	৫	১৩	২	...	১	১
ত্রিপুরা	১৬	৩	১	১২	৪	...	১	৩
নোয়াখালি	২	১	১	...	২	১	১	...
রাজসাহী	৪৫	৮	১০	২৭	৮	...	৩	৫
দিনাজপুর	১৭	৭০	১০	...	৭	৪	৩	...
জলপাইগুড়ি	৪	১	৩	...	৩	১	২	...
রংপুর	২২	৪	১৪	৪	১২	২	৮	২
বগুড়া	৬	৩	৩	...	৩	১	২	...
পাবনা	১৭	২১	১৫	১১	৬	৪	২	...
মালদহ	৮	০	৪	৪	৫	০	১	২
দার্জ্জিলিং	২	২	০	০	০	০	১	০
ঈসটার্ণ বেঙ্গল ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়েজ সৈয়দপুর	১	০	১	০	০	০	১	০
বর্দ্ধমান	৩	১	০	২	৩	১	০	২
বীরভূম	১	০	১	০	০	০	১	০
বাঁকুড়া	৩	০	০	৩	২	০	১	০
মেদিনীপুর	৪	৩	১	০	৩	২	১	০
হুগলি	৪	৩	১	০	৩	২	১	০
হাওড়া	৬	১	১	৪	৪	১	১	৩
ই-আই রেলওয়ে হাওড়া	০	০	০	০	১	১	০	০
২৪ পরগণা	২২	৮	২	১২	১৬	৫	২	৯
নদীয়া	১০	২	৭	১	১	০	১	০
মুর্সিদাবাদ	৬	৩	৩	০	৪	৩	১	০
যশোহর	১৭	১১	৪	২	৯	৭	১	১
খুলনা	৯	৪	২	৩	৩	২	১	০
ই-বি রেলওয়ে শিয়ালদহ	৪	২	৩	০	৩	২	১	০
কলিকাতা	১৯	১১	৮	০	১৪	৮	৬	০
সমগ্র বাংলাদেশ	৪৯০				৪৯০			

ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই এবং ইহা সর্ব্ব শ্রেণীর পক্ষেই সমান সমস্যা তবুও ব্যাপারটির সহিত যে সাম্প্রদায়িকতার কিছু সম্পর্ক আছে, এই প্রকার অমূলক সন্দেহ অনেকের মনে আছে। উৎপীড়িতারা যদি সকলেই বা অধিকাংশ হিন্দু হইতেন তাহা হইলেও সমস্যাটি মাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত না, কারণ, উৎপীড়িত হওয়াও যেমন কাপুরুষতা ও সামর্থ্যহীনতার নিদর্শন, উৎপীড়ক হওয়াও তেমনই গৌরবের কথা নহে, তাহাও বর্ব্বরতার নিদর্শন। কিন্তু উদ্ধৃত তালিকা হইতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে, শুধু হিন্দু সমাজের নারীরাই নহেন, অন্যান্য সমাজের নারীরাও সমান বিপন্না এবং এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই সমান।

যৌন অপরাধী অন্যান্য দেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আছে, কিন্তু দলবদ্ধভাবে নারীর উপর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত আর কোন স্থানে নাই। ইহা বাংলার পুরুষ চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গভীর লজ্জার কথা। ইহার প্রতিকারের জন্য কঠোর আইনের বিধানের কথা বাংলার জনমত অনেক দিন হইতে দাবী করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন কোনও দেশে এই প্রকার কঠোর আইনের সুফলের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কঠোর আইন প্রণয়নের সহিত দেশের সকল নৈতিক জনমতকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। অপরাধীরা যদি জানে, আইনের বিচারে যাহাই হোক, এই প্রকার অপরাধীকে সমাজ কোন দিন ক্ষমার চক্ষে দেখিবে না, কাহারও নিকট হইতে সহানুভূতি লাভের আশা নাই, কাহারও নিকট হইতেই তাহারা মানুষের মর্য্যাদা পাইবে না, তাহা হইলে দুই একজন স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত ব্যতীত এই প্রকার ব্যাপারের সহিত জড়িত হইতে সহসা কেহ সাহসী হইবে না। তবে আপাতত কিছুদিনের জন্য যে কঠোর আইনের বিধানের এবং তাহার সরস প্রয়োগ ব্যবস্থার আবশ্যকতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রকার অপরাধ প্রবণতার দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরে (উচ্চস্তরেও) নারীর প্রতি মর্য্যাদাবোধের অভাব সূচিত হয়। সমাজের উপর দূর প্রসারী ব্যাপক ফলের কথাও আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে নারী স্বাধীনতার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। জীবনযাত্রার অনিবার্য্য প্রয়োজনে সহরে মেয়েদের স্বাধীনতার সীমা ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু, এখনও আমাদের অধিকাংশ পল্লীতে বাস করে, অথচ দূর পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের স্বাধীন গতিবিধি যদি নিরাপদ না হয় তাহা হইলে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের গণজীবনে ও অর্থনীতিক জীবনে তাহা আমাদের শক্তিহীনতার কারণ হইবে। আবার একথাও সত্য যে, মেয়েদের বর্দ্ধিত স্বাধীনতা ও আত্ম-সচেতনতা অপরাধীদের অনেকখানি সংযত করিবে। বর্দ্ধিত স্বাধীনতা একদিকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বাড়াইয়া দিবে এবং অন্যদিকে অপরাধীদিগকে নিজেদের আত্মীয়দের নিকটে সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠাহানির ভয় করিতে হইবে।

নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনমতকে সচেতন ও জাগ্রত করিবার যে দায়িত্ব সকলের আছে, সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও প্রধানগণ তাহা ঠিকভাবে পালন করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

নাৎসী 'রক্তশুদ্ধি' মতবাদ—

'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েসন' এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক 'সায়েন্স এণ্ড কালচার'এ উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অধ্যাপক সাহা প্রথমেই জাতি সম্পর্কে নাৎসি মতবাদের উল্লেখ করেন। একটি প্রামাণ্য উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক সাহা বলেন যে, যখন কোন জাতি বড় হয় তখন সাধারণতঃ সেই জাতি অন্য জাতিদের ঘৃণার চক্ষে দেখে। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ যুগে এরিস্টটল নিজের নিকট এই প্রশ্নের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমের অসভ্যেরা এমন জল বায়ুতে বাস করে যে তাহার সহিতই তাহাদিগকে

সারা বৎসর লড়াই করিতে হয়। মরুভূমিতে বসতি বলিয়া আরব ও মিশরীয়গণ সম্বন্ধেও এরিসটটল্ অনুরূপ মন্তব্য করেন। গ্রীস তাহার পরে উল্লেখযোগ্য আর কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু আরব ও দক্ষিণের অন্যান্য জাতিরা যে সভ্যতার সৃষ্টি করেন তাহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থায় ছিল। বিজ্ঞান ও দর্শনে ইস্লামের দানের কথা বিবেচনা করিলে তাহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে। পশ্চিমের অসভ্যেরা বলিয়া অভিহিত করিয়া এরিস্টটল্ ইংরেজ, ফরাসী এবং জার্ম্মেনিদের বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন অধ্যাপক সাহা অনুভব করেন না এবং তিনি বলেন যে শ্রীযুক্ত বসু কর্ত্তৃক উত্থাপিত জাতিশুদ্ধি সম্বন্ধে নাৎসি মতবাদের উত্তর ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

নিগ্রোদের শারীরিক মাপ এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা শ্বেতকায়দের অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। কে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে যে আফ্রিকার নিগ্রোরা এক নূতন এবং শক্তিশালী সভ্যতার স্রষ্টা হইবে না। মনুসংহিতা রচনার পর হইতে বিবাহে যে সব কৃত্রিম বিধি নিষেধ চলিয়া আসিতেছে অধ্যাপক সাহা তাহার উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রক্ত মিশ্রনের বিরুদ্ধে অনেকে যে সব প্রতীয়মান বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, এবং তাহার সমর্থনে রাজনীতিক প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত নাৎসি মতবাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত ডাঃ সাহা সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ কথায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। মানুষের জাতি শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অন-ঐতিহাসিক ও অহমিকা-প্রসূত হইলেও তাহা যে সমাজের বৃদ্ধি ও পোষণের পক্ষে কতটা মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে, হিন্দু-সমাজের বিবাহ-বিধির বহুবিধ কঠোরতার মধ্যে তাহার অনেক বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

কুটীর শিল্প বনাম কারখানা

কুটীর শিল্প বা কারখানা শিল্পের মধ্যে কোনটি আমাদের দেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী, যন্ত্রের বর্ত্তমান উন্নতির যুগে একথা অনেকটা অবাস্তব মনে হইত যদি না মহাত্মাজী প্রভাবিত কংগ্রেস মনে করিতেন যে কুটীর শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই আমাদের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক মুক্তি সম্ভব হইবে। আমাদের দেশের প্রাক-যান্ত্রিক যুগের অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত যান্ত্রিক যুগের প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে আমরা পরাজিত হইয়াছি ও হইতেছি। কাজেই, যন্ত্র শিল্পের উপর আমাদের বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক; যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনের সহিত সমাজ ব্যবস্থার সহিত তাহার বৈষম্যও আমাদিগকে শঙ্কিত করিয়াছে। কাজেই, মহাত্মা গান্ধী যখন কুটীর শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা এবং প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলিলেন, তখন নূতনকে গ্রহণ করিবার যে সংশয় ও অনিশ্চয়তা তাহাকে এড়ান যাইবে এই আশায় দেশের জনসাধারণ এই মতবাদকে বিশেষ জোরের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিল।

অসহযোগ আন্দোলন এই মতবাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল এবং চরকা তাঁত হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিষয়ে ইহার পরীক্ষা চলিয়াছিল। কাটুনি সংঘ, গ্রাম উদ্যোগ সংঘ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে এই সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য। তবুও বর্ত্তমান এবং যন্ত্র যুগের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কুটীর শিল্প আমাদের স্বজাতিকতার সহায়তায় কিছু পরিমাণ লোকের জীবিকার সংস্থান করিতে পারিলেও যে, যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত গত্যন্তর নাই একথা দেশের জনসাধারণ কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের আংশিক ব্যর্থতা হইতে পুনরায় বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু কংগ্রেসের সরকারি মনোভাবের এ সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা, তাহার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নাই। অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করায় এবং তাঁহাদের মতকে কর্ম্মে রূপ দিবার আংশিক ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে থাকায় এ বিষয়ে তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্তে আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় ডাঃ সাহার প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোদ্ধৃত উত্তর দিয়াছেন;

"আমাকে একথা বলিতে হইবে যে যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সকল কংগ্রেসী একই মত পোষণ করেন না। কিন্তু একথা আমি কোন প্রকার অতিরঞ্জন না করিয়া বলিতে পারি যে তরুণ কংগ্রেসীদিগের ধারণা ও চিন্তা যন্ত্রশিল্পের দিকেই ধাবিত হইতেছে। নানা কারণে আমরা যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতায় বিশ্বাস করি। প্রথমতঃ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইতে পারে না—যদিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং যাইবেও, তবুও তাহাতে আমাদের জনসাধারণের খাদ্যাভাব মিটিবেনা। যদি আমরা অন্যান্য দেশের কৃষিকার্য্যে বিরত এবং শ্রম শিল্পে বিরত জনসংখ্যার সহিত আমাদের দেশের তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, যদি আমরা সত্যই জনসাধারণের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে চাই তাহা হইলে, আমাদের শস্যোৎপাদন হইতে পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক লোক লইয়া যাইতে হইবে। যন্ত্রশিল্পে বিশ্বাস করিবার আমাদের আরও কারণ রহিয়াছে; রাজনীতিক চিন্তার দিক দিয়া আমাদের তরুণেরা সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করিতেছেন। হয়তো ইঁহারা ঠিক কি প্রকারের সমাজতন্ত্র চাহেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহাদের মধ্যে একটা বিষয়ে ঐক্য আছে যে যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন প্রকার সমাজতন্ত্র আদবেই প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। আমাদের দেশের তরুণদের চিন্তা যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তার অনুকূলে যাইবার আরও একটা কারণ আছে। সাধারণ বুদ্ধির কথা হইতেছে যে যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা এমন অবাঞ্ছনীয় অবস্থা যে, ইহার হাত হইতে কোন পরিত্রাণ নাই। ভালোর জন্যে হউক অথবা মন্দের জন্য হউক জাতীয়তার সীমারেখা ও প্রাচীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া গিয়া অর্থনীতির দিক দিয়া সমগ্র পৃথিবী এক হইয়া যাইতেছে। যদি আমরা স্বাবলম্বী এবং স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাই তাহা হইলে যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাহিরে যন্ত্রশিল্পের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই সকল যুক্তি তরুণদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছে যে ভবিষ্যৎ ভারতের কথা ভারতের ভবিষ্যৎ যন্ত্রশিল্পের উপর নির্ভর করিতেছে।"

আমরা কংগ্রেসের সরকারী নীতিতে এই কথার সমর্থন ও তদনুযায়ী কর্ম্মপন্থার পরিকল্পনা চাই।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বৈদেশিক

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

মধ্য ইউরোপে অশান্তি

মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক সঙ্কট গত দুই সপ্তাহ হইতে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি তথায় নিবদ্ধ করিয়াছে। চীন-জাপান সংগ্রাম, স্পেনীয় সংগ্রাম, প্যালেষ্টাইন সমস্যা এ সকল সমস্যা যেন চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কটে তল পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, ফ্রান্স ও ব্রিটেন নিজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া স্পেনীয় সমস্যাকে এখনও পর্য্যন্ত স্পেনের সীমান্তেই আবদ্ধ রাখিয়াছে; চীন-জাপান বিরোধ এখনও চীনে আবদ্ধ; প্যালেষ্টাইন লীগ অব্ নেশন্সএর অধীন হইলেও সেখানে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে ব্রিটেনকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার পথে কেহ বাধা জন্মাইতেছে না। কিন্তু, চেকো-শ্লোভাকিয়ায় যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যদি ফ্যাসিষ্টদের দাপটে নিজের নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ না হয়, বিশ্বব্যাপী সমর আসন্ন বলিয়াই মনে হয়।

গত মহাযুদ্ধের পর ভাঁসাই সন্ধি দ্বারা যে সকল নূতন

রাষ্ট্র গঠিত হয় চেকো-শ্লোভাকিয়া তাহাদের অন্যতম;—যদিও এই রাষ্ট্রের গঠনে,—বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেসিয়া, শ্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়া। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি প্রদেশের কোন কোনও অংশে সুদেতেন জার্ম্মাণগণের বাস। চেকো-শ্লোভাকিয়ার জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি, তন্মধ্যে ৩২ লক্ষ সুদেতেন জার্ম্মাণ। এখানে মনে রাখিতে হইবে সুদেতেন জার্ম্মাণদের মধ্যে অন্য জাতিও বাস করে এবং এই রাষ্ট্রের কয়লার খনি ও প্রধান শিল্প অঞ্চলগুলি অংশতঃ সুদেতেন জার্ম্মাণগণের বাসস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। এই রাষ্ট্র সকল বিষয়েই প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা অনুপাত গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশ্ব-আর্থিক সঙ্কটের দিনে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার ফলে এই রাষ্ট্র বিশেষ আঘাত পায় নাই।

এই সকল উন্নতি সত্ত্বেও হিট্‌লার ও নাজীবাদ জার্ম্মানীতে সু-প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই হিট্‌লার ও নাজীদের উস্কানিতে সুদেতেন জার্ম্মাণগণ প্রকৃতপক্ষে চেকো-শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছে। হিট্‌লারের ইচ্ছা অষ্ট্রিয়ার অনুরূপভাবে এখানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ বাধাইয়া জার্ম্মাণ-রক্ষার্থে নাজীগণ প্রাগে হানা দিয়া চেকো-শ্লোভাকিয়াকে অষ্ট্রিয়ার ন্যায়ই করতলগত করিবে। ইহাতে জার্ম্মাণীর বিশেষ সুবিধা—তাহার জনবল, খনিজ সম্পদ বৃদ্ধি তো পাইবেই, অনেকে বলিতেছেন এই রাষ্ট্রকে হস্তগত করিতে পারিলে বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীতে যে খাদ্য সঙ্কট ঘটিয়াছিল ভবিষ্যৎ কোন মহাসমরের দিনে জার্ম্মাণীকে সেরূপ খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

ফ্রান্স ও ব্রিটেন ফ্যাসিষ্টদের দাপটের সম্মুখে যে ভাবে তাহাদের মর্য্যাদা ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতেছে তাহাতেই ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রত্যহ নব নব সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র-সমূহ যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিতেছে—আর গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রত্যেক বারই একটু আধটু প্রতিবাদ তুলিয়া সব সহ্য করিয়া লইতেছে। তদুপরি, ইডেনের পদত্যাগের পর হইতে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভার উপর ফ্যাসিষ্টদের প্রভাব অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছে।

সুদেতেন জার্ম্মানগণের প্রথম দাবী—

প্রধানতঃ জার্ম্মানীর উস্কানিতে সুদেতেন জার্ম্মানগণ যে সকল দাবী উত্থাপিত করিয়াছিল সেগুলি কার্লস্‌বাদ দাবী নামে খ্যাত। এই দাবী সুদেতেনগণ এই মনে করিয়াই করিয়াছিল যে চেকো-শ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্র-কর্ত্তাগণ এই সকল আব্দার রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না, ফলে যখন কলহ ঘোরালো হইয়া উঠিবে তখন নাজীগণ সুদেতেন জার্ম্মানগণের স্বার্থ রক্ষার নামে প্রাগে আসিয়া চেক রাজ্য দখল করিবে। কিন্তু, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মৌনতায় শঙ্কিত হইয়া চেক-রাষ্ট্র ঐ সকল দাবী প্রায়গুলিই মানিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কেবল যেগুলির দ্বারা রাষ্ট্র হিসাবে চেক রাষ্ট্রের মর্য্যাদা নষ্ট হয় কিংবা রাষ্ট্রের সংহতি সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় সেগুলি সম্বন্ধেই রাষ্ট্রকর্ত্তাগণও সুদেতেন নেতৃবর্গের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। কার্লস্‌বাদ দাবীর তিনটি দফা লইয়া উভয় পক্ষের ভিতর মতভেদ চলিতেছিল। তিনটি দফা হইতেছে—

প্রথম দফা; Full Equality of States between Czechs and Germans অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিতর জার্ম্মান ও চেকগণের পৃথক সত্বার সমান অধিকার থাকিবে।

দ্বিতীয় দফা; Guarantee of equality by recognition of the Sudeten Germans as a legal entity অর্থাৎ আইনে সুদেতেন জার্ম্মানগণের পৃথক সত্বা স্বীকার করিয়া সমান অধিকার দিতে হইবে।

অষ্টম দফা; Full liberty to profess German nationhood and German political philosophy.

অর্থাৎ সুদেতেনগণকে জার্ম্মাণ জাতি হিসাবে মানিয়া লইয়া জার্ম্মাণ রাজনৈতিক আদর্শানুযায়ী চলিবার অধিকার দিতে হইবে। দ্বিতীয় ও অষ্টম দফা মিলাইয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে চেকো-শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে সুদেতেনগণ আর একটি কার্য্যতঃ স্বাধীন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহে। পুলিশ ও সৈন্য হাতে রাখিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত জনগণের নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চেক-রাষ্ট্রকর্ত্তাগণ এই দুইটী দাবীও মানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রথম দফা স্বীকার করা যে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই অসম্ভব। ইহার অর্থ হইতেছে বিনা রক্তপাতে চেকো-শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রকে হিটলারের হস্তে তুলিয়া দেওয়া। কারণ সুদেতেনগণকে যে সকল সুবিধা দিতে হইবে সে সকল সুবিধা অন্য জাতিগুলিকেও দিতে হইবে। এবং এই সকল জাতিসমূহের প্রায়গুলির উপর জার্মানী প্রভাবান্বিত পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহ যথা পোলাণ্ড, রুমানিয়া প্রভৃতির প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে। ফলে, চেকগণ সংখ্যাগুরু হইয়াও সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে। সুতরাং, রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাজীগণের হস্তে গিয়া পড়িবে।

কাল স্বাদ দাবীর উত্তরে রাষ্ট্রকর্ত্তাগণ নয় দফায় বর্ণিত যে অধিকার সুদেতেনগণকে দিতে চাহিয়াছেন সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে পৃথিবীর কুত্রাপি সুদেতেনগণের ন্যায় সংখ্যালঘুদলের এত অধিকার ও সুবিধা স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি যে সুদেতেনগণ এই সকল অযৌক্তিক দাবী করিয়াছিল তাহার অর্থ, তাহারা কোনও মিটমাট প্রকৃত পক্ষে চাহিতেছে না—তাহারা শুধুমাত্র হিটলারের ইঙ্গিত অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, কোন কোন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মতে এক-তৃতীয়াংশ সুদেতেন জার্মাণের এই সকল দাবীর সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, বা সুদেতেনগণের নেতা হের হেনলাইনের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা চেক-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেও চাহিতেছে না; যদিও সুদেতেন নেতৃবর্গ বলিতেছেন সকল সুদেতেনগণই নেতৃবর্গের দাবীর পিছনে রহিয়াছে।

ফ্রান্স ও ব্রিটেন—

চেকো-শ্লোভাকিয়ায় যখন সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল তখন ব্রিটেন চুপচাপই ছিল। কেবলমাত্র লর্ড রান্সিম্যানকে বে-সরকারী ভাবে মিটমাটের জন্য চেকো-শ্লোভাকিয়ায় পাঠান হইয়াছে। ব্রিটেন ফ্যাসিষ্ট পক্ষ এত ঘেঁষিয়াছে যে লর্ড রান্সিম্যান চেক-রাষ্ট্রকে সুদেতেনগণের দাবী মানিয়া লইতেই উপদেশ দিবেন বলিয়া মনে হয়। অন্য পক্ষে ফ্রান্সও প্রথমটা চুপচাপ ছিল, যদিও পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য চেক, ফ্রান্স ও রাশ্যা এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটা চুক্তি রহিয়াছে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের এই মৌনতায় চেক-রাষ্ট্র সঙ্কটের চাবিকাঠি হিটলারের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। পরে ঘটনাসমূহ যখন হিটলার কর্ত্তৃক প্রাগ-অভিযানের অনুকূলে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ফ্রান্স হঠাৎ চেক-রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির কথা স্মরণ করিয়া ঘোষণা করিল জার্ম্মানী কর্ত্তৃক চেক-রাষ্ট্রের উপর কোনও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ফ্রান্স সহ্য করিবে না। এবং ফ্রান্স সমরোপযোগী উদ্যোগ আয়োজনও করিতে লাগিল। ফ্রান্স যদি কোনও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় গ্রেটব্রিটেনও ফ্রান্সের সহিত যোগ দিবে বলিয়া শোনা গেল। ব্রিটেনেও সমরের আয়োজন চলিতেছে—যদিও মন্দ ভাবে।

ফ্রান্স যদি জার্ম্মানির প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ না করিত তবে এতদিন চেকো-শ্লোভাকিয়া হিটলারের হস্তগত হইত। কারণ চেকো-শ্লোভাকিয়া হস্তগত করিবার নিমিত্ত জার্ম্মাণ বহু পূর্ব্বেই পূর্ব্বসীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে ও পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করিয়াছে। ফ্রান্সের সতর্ক বাণী উচ্চারণের পর হের হিটলার নুরেমবার্গে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে সুদেতেনগণকে অষ্ট্রিয়ার ন্যায় গণভোট দাবী করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য চেক-রাষ্ট্র হইতে হিটলার সরিয়া দাঁড়ান নাই—গোয়েরিংএর নেতৃত্বে সম্ভাব্য সংগ্রামের নিমিত্ত জার্ম্মাণী দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

অন্যদিকে মুসোলিনী ও জাপান জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; আর চেক-রাশ্যা সন্ধি সম্পূর্ণ পালন করিবে বলিয়া রাশ্যা ঘোষণা করিয়াছে। মোটামুটিভাবে ইউরোপের সমস্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে চেকো-শ্লোভাকিয়ার সঙ্কটের সূত্র অনুসরণ করিয়া যে কোনও সময় বিশ্বব্যাপী মহাসমর বাধিতে পারে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—বিশেষতঃ চেম্বারলেন অধ্যুষিত ব্রিটিশমন্ত্রীসভা যেরূপ শান্তির নামে ফ্যাসিষ্টদের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতেই বর্ত্তমানের এই বিশ্বব্যাপী সমর সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, চেক-সুদেতেন সমস্যা উদ্ভব হইতেই যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্স

একযোগে জার্ম্মাণীর প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিত তাহা হইলে যে সমর-সম্ভাবনার কালোছায়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার উদ্ভবই হইত না।

স্লদেতেন চেক দাবী—

কার্লসবাদ দাবী ও চেক গভর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত ঐ সকল দাবী পূরণ করিতে রাজি ছিলেন সে সম্পর্কে কোনও সন্তোষজনক মিটমাটের আশায় যখন উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল, তখন সুদেতেনগণের নেতা হের হেনলাইন হিটলারের পরামর্শ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হিটলার কি পরামর্শ দিয়াছেন তাহা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইবার জন্য হের হেনলাইনের যে হিটলারের পরামর্শ আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতেই হিটলার ও সুদেতেন জার্ম্মাণগণের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়াছে। অবশ্য বহু পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞ সাংবাদিকগণ অষ্ট্রীয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রতি হিটলারের লোলুপ দৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতেছিলেন। হেনলাইনকে হিটলার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত না হইলেও, ২।১ দিন পরেই হের হিটলার নুরেমবার্গে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা হইতেই এই পরামর্শের প্রকৃতি ধারণা করা যায়। স্পষ্ট না বলিলেও হিটলারের বক্তৃতা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি গণ-ভোট দাবী করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। সুতরাং যে আপোষের আলোচনা চলিতেছিল তাহা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রথম অজুহাত উপস্থিত হইল চেক পুলিশের হাতে এক সুদেতেনের লাঞ্ছনা। সুদেতেনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই ব্যাপারের সহিত জড়িত পুলিশ সম্পর্কে চেক সরকার কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও, পরে প্রকাশ পাইয়াছে নাজী গুপ্তপুলিশ দ্বারাই এই প্রকার অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। নাজী গুপ্তপুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। দেখিতে দেখিতে সুদেতেন ও চেকগণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। কোনও সভ্য রাষ্ট্রই এই জাতীয় অরাজকতার সহায়তা করিতে পারে না—সুতরাং চেক গভর্ণমেণ্ট এই সকল সংঘর্ষ সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ওদিকে সুদেতেনগণ মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে এই সকল কড়া ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবার দাবী জানাইল। চেক গভর্ণমেণ্ট বলিলেন সুদেতেন নেতৃবৃন্দ সুদেতেনগণকে অশান্তি সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিলেই, তাঁহারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সকল প্রত্যাহার করিবেন। এই সকল সংঘর্ষ ঘটামাত্রই সুদেতেন নেতৃবৃন্দ গণভোট ও চেক রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী করিতেছেন।

সর্ব্বশেষ খবরে প্রকাশ চেক-সরকার সমস্ত সুদেতেন অঞ্চলে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র সরকারের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন। ঘোষণা অনুযায়ী কাজও করা হইতেছে ও সুদেতেনদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। ওদিকে আস্কে (Asch) তীব্র রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য হের হেনলাইনের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে ও হের হেনলাইন জার্ম্মানীতে পলায়ন করিয়াছেন। সুদেতেন অঞ্চলে সংবাদপত্রাদি প্রকাশ করা স্থগিত রাখা হইয়াছে। জার্ম্মানীর সংবাদপত্রসমূহে চেক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার চলিতেছে।

চেম্বারলেন হিটলারের সহিত প্রাথমিক সাক্ষাৎ সারিয়া পরামর্শ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়াছেন, ও দিকে জরুরী তলব পাইয়া লর্ড রান্সিম্যানও লণ্ডনে আসিয়াছেন। কথা রহিয়াছে চেম্বারলেন পুনরায় হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পরামর্শ করিবার জন্য ফ্রান্সকেও আহ্বান করা হইয়াছে। এখানে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়, চেক রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের সহিত রাশ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও, চেম্বারলেন রাশ্যার পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

উপরে আমরা চেক সুদেতেন বিরোধের ঘটনাবলী কতকটা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি। ইহা হইতে চেক সুদেতেন সমস্যা যে আসলে হিটলারের কবল হইতে চেক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার চেষ্টা ইহা সুস্পষ্ট হইবে। তদ্ব্যতীত চেম্বারলেন হ্যালিফাক্সের অধিনায়কত্বে গ্রেটব্রিটেন এ সম্পর্কে যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে চেক গ্রাসে হিটলারকেই সাহায্য করা হইতেছে তাহাও বুঝা যাইবে।

এখানে চেম্বারলেন যে নীতি অনুসারে চলিতেছেন তাহা খুব বেশি দূর অনুসরণ করিলে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি ইটালী ও জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে পরিচালিত করিতে হইবে। জাপান, জার্ম্মানী ও ইতালী যে যুদ্ধভীতি দেখাইয়া প্রতিবারেই গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সকে ভড়কাইয়া ও পরোক্ষভাবে তাহাদের সহায়তা লইয়া স্ব স্ব স্বার্থ উদ্ধার করিতেছে, এবারও চেম্বারলেনীয় নীতির দ্বারা জার্ম্মাণীকে পূর্ব্ব-অনুসৃত নীতি অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হইল। অবশ্য ফ্রান্সকে প্রত্যেকবারেই গ্রেটব্রিটেনের চাপে পড়িয়া ফ্যাসিষ্টদের জবরদস্তি সহ্য করিতে হইতেছে। গ্রেটব্রিটেনের চাপে পড়িয়াই তাহাকে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াও পীরেনিজ সীমান্ত বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। এবারও কি চেম্বারলেন পরোক্ষভাবে ফ্রান্সকে ফ্যাসিষ্ট জবরদস্তি সহ্য করিবার জন্য পরোক্ষ চাপ দিতেছেন না? চেম্বারলেন ফ্রান্সের সহিত পরামর্শ করিয়া হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ফ্রান্সের কোনও হাত নাই। চেম্বারলেন যদিও না চাহেন, তাঁহার অনুসৃত নীতি হিটলারকেই সাহায্য করিতেছে।

গ্রেটব্রিটেন—

ফ্রান্স চেক সমস্যা সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছে বটে কিন্তু গ্রেটব্রিটেন এখনও অব্যবস্থিত চিত্ত। অবশ্য ফ্রান্সকে যদি এই সমস্যা সম্পর্কে জার্ম্মানীর সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হয়, তবে গ্রেটব্রিটেনকে ফ্রান্সের পক্ষেই যোগ দিতে হইবে, এর কারণ ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত কোনও পাকা সন্ধি না করিতে পারিলে ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব ব্রিটেন বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কিন্তু গ্রেটব্রিটেন এখন চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত তাহাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে না হয়। অবশ্য গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স যদি প্রথমেই যুক্তভাবে জানাইয়া দিত যে চেক-সুদেতেন সমস্যা সম্পর্কে জার্ম্মানীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ তাহারা কিছুতেই সহ্য করিবে না, তবে হিট্‌লারকে চুপ করিয়া যাইতেই হইত। কিন্তু ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, ব্রিটেন যেমন বর্ত্তমানে ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্বও বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে না, তেমনি ভবিষ্যতের আশায় জার্ম্মানীর বিরাগভাজনও হইতে চাহে না। চেক-সম্পর্কে নাজী জার্ম্মানীর মনোভাব সুস্পষ্ট, তথাপি চেম্বারলেন যাচিয়া হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন কেন? অবশ্য ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে এই যাচিয়া সাক্ষাতের জন্য চেম্বারলেনকে সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার দ্বারা কি ইহা দেখান হইল না যে সুদেতেন জার্ম্মানগণের দাবী যৌক্তিক, জার্ম্মানীর চেক-সঙ্কট সৃষ্টি করার ভিতর খানিকটা ন্যায় আছে? ইহা দেখানর ফলে ফ্রান্সে ও ব্রিটেনে চেক-গভর্ণমেন্টের অনুকূলে যে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অন্ততঃ খানিকটা কি লাঘব হয় নাই? এখানে সুদেতেনদের অন্যতম নেতা ডাঃ কুণ্ডের (Kundt) মন্তব্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। চেম্বারলেনের যাচিয়া জার্ম্মাণীতে যাওয়া সম্পর্কে ডাঃ কুণ্ড মন্তব্য করিয়াছেন, এই দেখা করিতে যাওয়াটাই হইতেছে আসল খবর; এ সম্পর্কে আর সকলই বাজে।" অর্থাৎ চেম্বারলেন যে হিটলারের সহিত যাচিয়া দেখা করিতে গিয়াছেন তাহাতেই হিটলার-সুদেতেন ষড়যন্ত্রের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইতেছে। হিটলার-চেম্বারলেন কথাবার্ত্তায় চেক-সুদেতেন সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না—কারণ এ সম্পর্কে হিটলার ও সুদেতেন কোন পন্থা গ্রহণ করিবেন তাহা পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে (?)।

এখন দেখা যাউক এই সাক্ষাৎ দ্বারা সুফল কিছু হইয়াছে কি না। ঘটনা যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে হিট্‌লারের দাবী মানিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত হিট্‌লার নিরস্ত হইবেন না নিশ্চিত। সুতরাং হয় ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে ফ্যাসিষ্টদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখীন হইতে হইবে, নতুবা চেক-রাষ্ট্রকে হত্যা করিয়া নাজী জার্ম্মানীর নিকট সুদেতেনকে সমর্পণ করিতে হইবে। সুতরাং এই সাক্ষাৎকার দ্বারা সুফল কিছু ফলে নাই—কেবল এই মাত্র হইতে পারে যে এখনও ফ্রান্স ও ব্রিটেন দৃঢ়ভাব অবলম্বন করিলে ফ্যাসিষ্ট ও গণশক্তির মধ্যে যে সংঘাত এখন আসন্ন, তাহা দুচার মাস পরে ঘটিতে পারে। অন্যপক্ষে, অ-ফ্যাসিষ্টদের দুর্ব্বল

করিবার নিমিত্ত হিটলার এক কূট চাল চালিয়াছেন, এবং সেই চালে চেম্বারলেন ধরা দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিছুদিন হইতে চেম্বারলেন হ্যালিফ্যাক্সের নেতৃত্বে গ্রেট-ব্রিটেন ইটালী ও জার্ম্মানীর সহিত যে সৌহৃদ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সুযোগ লইয়া ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয় গ্রেট-ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ জার্ম্মানী ও ইটালী গ্রেটব্রিটেনের কর্ত্তাদের বলিতেছে যে ইউরোপের শান্তিরক্ষার জন্য জার্ম্মাণী, ইটালী, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই চারটি শক্তির মধ্যে চুক্তি হউক। ইউরোপের শান্তি রক্ষা এই চালের উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স হইতে রাশ্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা। ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে রাশ্যা অন্যতম—তাহার সমরোপকরণ ও জনবল হীন নহে। এবারও চেক-সুদেতেন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে হিটলার সেই চালই চালিয়াছেন। অবশ্য এই চালের বিরুদ্ধে ফরাসী জনমত খুব প্রবল; সম্ভবতঃ রাশ্যাকে বাদ দিয়া ফ্রান্স কিছু করিতে চাহিবেনা। তথাপি ইহা দ্বারা এক পক্ষে যেমন চেম্বারলেন হ্যালিফ্যাক্সের পররাষ্ট্রনীতির দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হইতেছে, অন্যপক্ষে তেমনি হিটলার ও মুসোলিনির স্ব স্ব রাষ্ট্রের শক্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে এই কূটচালের কথা জানা যাইতেছে।

সংগ্রাম বাধিলে—

চেক-সুদেতেন বিরোধ যেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, এবং জার্ম্মানীতে নাজীগণ ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার সুদেতেন নেতৃবৃন্দ সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে প্রচার কার্য্য ও সংঘর্ষ বাধাইতেছে, তাহাতে জার্ম্মানীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ কিছু অসম্ভব নহে। অবশ্য হিটলার প্রথমেই চেষ্টা করিবেন যাহাতে ব্যাপারটা একবার আরম্ভ করিলে তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলা যায়। কিন্তু ফ্রান্স ও রাশ্যা যে দৃঢ়তার অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে মনে হয় হিটলারের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঘটিলে, তাহারা হিটলারকে বাধা দিবে। সুতরাং জার্ম্মানী নিজেকে সংযত না করিলে আর একটা মহাসমর নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং বিরোধী শক্তিবর্গের সমরশক্তির কিছু পরিচয় লওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কয়েকদিন পূর্ব্বে সুস্পষ্ট ভাবে রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন ইউরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দর্শক হিসাবে বসিয়া থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হইবে না। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় সংগ্রাম বাধিলে যুক্তরাষ্ট্র বেশিদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না, তাহাকে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যোগ দিতেই হইবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্স-ব্রিটেন রাশ্যার মিত্রশক্তি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

বিখ্যাত ফরাসী মহিলা সাংবাদিক মাদাম ট্যাবুই তাঁহার "Blackmail of war" নামে পুস্তকখানিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমরশক্তির পরিচয় দিয়া যে উপসংহার করিয়াছেন, সেই উপসংহার হইতে আমরা নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

ডেমোক্রেটিক (গ্রেটব্রিটেন ইত্যাদি) রাষ্ট্রের সৈন্য-সংখ্যা ২,৯১৬,৮৫০, এবং সমরকালে যে সৈন্যসংখ্যা সংগ্রহ করা যাইবে তাহার মোট সংখ্যা ৭৫,৫০০,০০০। ইহার মধ্যে রিপাবলিকান স্পেনের সৈন্য সংখ্যা, অনুমিত ৫০০০০০ ও চীনের সৈন্য সংখ্যা ধরা হয় নাই।

ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সৈন্য সংখ্যা ২,৩৭৪,৯০০; মোট ৪৮,৩৫০,০০০ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গারী ও গ্রীসকে ধরা হয় নাই।

ডেমোক্রেটিক দেশসমূহের নৌবহরের 'টনেজে'র পরিমাণ ৪,২২১,৪১০; ফ্যাসিষ্টদের ১,৪০৬,৭৭৬।

ডেমোক্রেটিক দেশসমূহের উড়ো জাহাজ (যুদ্ধের নিমিত্ত) ১১,৩৮৫; ফ্যাসিষ্টদের ৭,৮০০।

সুতরাং দেখা যাইতেছে গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতির সমরোপকরণ, ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের অপেক্ষা অনেক বেশি। তদভিন্ন, খাদ্য সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রথমোক্তদের সহিত ফ্যাসিষ্টদের তুলনাই হয় না। এতদ্ব্যতীত, তিনটি প্রধান ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে।

সংগ্রাম যদি সংঘটিত হয়ই, তাহা হইলে তাহা এখনই সংঘটিত হওয়া ডেমোক্রেটিকদের অনুকূল হইবে। প্রথমতঃ অন্যতম প্রধান শক্তি জাপান এখন চীন লইয়া বিব্রত এবং চীন জয় করিতে যাইয়া তাহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ইটালীও এখন আবিসিনিয়ার ধাক্কা সামলাইতে পারে নাই। অন্য পক্ষে, এখন সমর বাধিলে স্পেনে ফ্যাসিষ্ট অভিযান, ও চীনে জাপানী অভিযান ব্যাহত হইবে—সুতরাং ভবিষ্যতে গ্রেটব্রিটেনের ভূমধ্য-সাগরস্থ পথ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপান ভীতি লইয়া বিব্রত হইতে হইবে না। ফ্রান্সেরও পীরেনিজ সীমান্ত ও ভূমধ্যসাগরে ফ্যাসিষ্টদের প্রবল প্রভাব লইয়া বিব্রত হইতে হইবে না। এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করিতেছেন রাশ্যায় গণতন্ত্র-বিরোধী চক্রান্তকারীদের, যাহাদের অনেকে সৈন্য বিভাগের উচ্চপদে ছিল, বিতাড়নের ফলে রাশ্যার যুদ্ধ শক্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাপার তাহা নহে—চক্রান্তকারীদের বিতাড়নের ফলে রাশ্যার যুদ্ধশক্তি প্রবলতর হইয়াছে।

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ—প্রকাশক শ্রীরাধেশ রায়, রসচক্র সাহিত্যসংসদ্। রচয়িতা শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, পি, আর, এস। মূল্য দুই টাকা। ২১৪ পৃষ্ঠা, ছাপা ও কাগজ চলন সই।

বইখানিতে ট্র্যাজেডি ও বৈষ্ণব কবিতাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের উপর প্রভাব, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্র প্রভৃতির উপর ৯টি নাতি-বিস্তর প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। ইহা লেখকেব প্রথম উদ্যম, কিন্তু ইহার কোনও কোনও প্রবন্ধে সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে লেখক যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাতে যে সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, কোনও এম, এ, পি, আব, এসের প্রথম উদ্যম হইতে তাহা আশা করা যায় না। তাঁহাব সকল মত সম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য থাকিলে বইখানি লিখিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। বইখানির এইখানেই বিশিষ্টতা যে ইহাতে গুটিকতক কথা অন্ততঃ এমন আছে যাহা ফেলিবারও নয়, সহসা গ্রহণ করিবারও নয়,—অথচ তাহা আমাদেব তর্ক বুদ্ধিকে ঈষদ্বিদ্রোহে কণ্টকিত করিয়া তুলিতে চায়। অনেক স্থলে আমার নিজের সাহিত্যিক মতের সহিত ইহার সাম্য আছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমি মত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। বাঙলায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক পড়িয়াছি বলিযা মনে হয় না। ইঁহার বয়সে সাহিত্য সমালোচনায় ব্রতী হইতেই অনেকে সাহস পান না। বইখানি ভাল হইয়াছে বা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিলে ইহার সুখ্যাতি করা হয় না। বইখানি সাহিত্যসেবিদের পড়া উচিত ও ইহাতে ব্যাখ্যাত মতগুলির সম্বন্ধে প্রনিধানপূর্ব্বক অলোচনা করা উচিত এবং ইহার মতগুলিতে অনেক স্থলে নবীন চিন্তার রেখাপাতের চিহ্ন আছে, এই জন্যই তরুণ লেখকের অভ্যুদয় কামনা করিয়া ইহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। কোনও কোনও প্রবন্ধের লেখার রীতি অতিশয় হৃদ্য হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে বৈশাখী ফলের কাঁচা পাকার আস্বাদ নাই এমনও বলা যায় না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

কাশীরাম দাস—মহাভারত—দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ সম্পাদিত, সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত। প্রকাশক—শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের একত্র মূল্য সাত টাকা (এক খণ্ড পৃথক্ ভাবে বিক্রয় করা হয় না)।

এই সুবৃহৎ এবং সুসম্পাদিত গ্রন্থখানি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইযাছি। একদিকে উদ্ভটসাগর মহাশয়ের মতো সুপণ্ডিত ব্যক্তির দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম এবং গবেষণা, এবং অপর দিকে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মতো সম্পন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের শক্তি এবং সামর্থ্যের অকুণ্ঠিত প্রয়োগ,—এই উভয়ের যোগ ফলে গ্রন্থখানি সত্যই অপূর্ব হইয়াছে। গ্রন্থখানির বস্তুভাগের একটু পরিচয় দিলেই কথাটা সুস্পষ্ট হইবে।

দুই খণ্ডে ১৬৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে আছে—৩৫টি নূতন উপাখ্যান যাহা অন্য কোনও কাশীরাম দাস-মহাভারতে নাই, মোট ৪০,২৭টি শ্লোক, বিবিধ কৌতুকাবহ তথ্য সমন্বিত একটি দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা। প্রাঞ্জল এবং বিস্তৃত টীকা টিপ্পনী, কাশীরাম দাসের বিস্তৃত জীবন চরিত, ব্যাসদেবের সহিত কাশীরাম দাসের ঘটনা-বর্ণন পার্থক্য। মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষের একটি বিস্তারিত মানচিত্র। সংস্কৃত-মহাভারত হইতে টীকায় উদ্ধৃত শ্লোক, অন্যান্য কাশীরাম দাস মহাভারত অপেক্ষা অধিক প্রায় ২৫০০ কবিতা, ১০৩ খানি বহুবর্ণ চিত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাশীরামদাস মহাভারত সম্পাদনায় উদ্ভটসাগর মহাশয়

পূজা-মাঙ্গলিক

আপনার সঙ্কল্প

এবং

'হিন্দুস্থান'এর সাধনা

এক হউক

আপনার গৃহ-সংসার

শারদ-লক্ষ্মীর পুণ্য আশীর্ব্বাদে সচ্ছলতায় চিরদিন হাসিতে থাকুক, দায়িত্ব-পালনের তৃপ্তি ও আনন্দে আপনার জীবন মধুর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, জাতির আর্থিক স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন সফল ও সার্থক হউক।

এক কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকার উপর দাবী মিটান হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষের উপর দেশবাসী হিন্দুস্থানে বীমা করিয়া আর্থিক সংস্থান করিয়াছেন এবং সেই চলতি বীমার পরিমাণ প্রায় তের কোটি টাকা। হিন্দুস্থানের মোট সংস্থান দুই কোটি ষাঠ লক্ষের উপর। বীমা তহবিল দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকার উপর। বার্ষিক প্রিমিয়ামের আয় বাষট্টি লক্ষের উপর।

১৯৩৭-৩৮ সালে নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে তিন কোটি টাকার উপর

বোনাস—১৮৲ (মেয়াদী বীমায়) প্রতি বৎসর

বোনাস—১৫৲ প্রতি হাজার (আজীবন বীমায়

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস:—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ:—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি:—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইঃ আফ্রিকা।

প্রভৃত যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন। বিভিন্ন ও বহুসংখ্যক পুঁথির পরীক্ষা এবং সমন্বয়ের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রণয়নের জন্য তিনি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের' ৪৪৪ খানি, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারের' ৪৯৩ খানি এবং নড়াল হাটবেড়িয়া গ্রন্থাগারের ৩ খানি সর্ব্বসমেত ৯৪০খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি নিজের আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। এতগুলি পুঁথি অবশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা সম্ভবপর নয়, সেইজন্য ২০।২৫ খানি পুঁথি তন্নতন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়া যাহা কিছু নূতন এবং গ্রহণযোগ্য পাইয়াছেন তাহা এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। যে সকল স্থানে পাঠদুষ্ট ছিল, সে সকল স্থানও উদ্ভটসাগর মহাশয় শিষ্ট এবং সমীচীন করিয়া দিয়াছেন।

মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কাশীরামদাস মহাভারতের স্থানে স্থানে বিরোধ আছে। তৎতৎস্থানের সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক উদ্ভটসাগর মহাশয় যথোচিত বিচার বিতর্ক করিয়াছেন। মোট কথা, পাণ্ডিত্যের সহিত পরিশ্রমের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম এই বইখানিকে সরস পবিত্র এবং সুন্দর করিয়াছে।

পুস্তকটির বহিরবয়বও যৎপরোনাস্তি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মূল্যবান পুরু মসৃণ কাগজে বড় বড় অক্ষরের পরিচ্ছন্ন ছাপা, বহুমূল্য আর্টপেপারে মনোরমভাবে মুদ্রিত ১০৩ খানা বহুবর্ণ চিত্র এবং সিল্করুথ দিয়া মেশিনের সুদৃঢ় এবং সুদৃশ্য বাইণ্ডিং—সকলই সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের সমুন্নত আদর্শের পরিচায়ক।

আশা করি ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বাঙলার ঘরে ঘরে স্থান লাভ করিয়া বাঙালীর গ্রন্থভাণ্ডারকে পূত এবং সমৃদ্ধ করিবে। বস্ত্র এবং সৌষ্ঠবের তুলনায় পুস্তকের সাত টাকা মূল্য অসঙ্গত হয় নাই।

বেঁটে বক্কেশ্বর—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, বলাই সেন। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এ বইখানি ছোট ছেলেদের গল্পের বই। 'কুঁড়ের বাদসা', 'নিদ্রাবতী-রাজকন্যা', 'রাক্ষস জামাই, 'অ-র-দ-গ-ব' প্রভৃতি শিশু পুস্তকাবলীর প্রণেতা সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবু শিশুমহলে সুপরিচিত এবং সমাদৃত। এই বইখানিও ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আলোচ্য বইখানি 'বেঁটে বক্কেশ্বর', 'বামন সর্দ্দার, 'দৈব সুচ,' 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট' প্রভৃতি ১৩ খানি গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেক গল্পটিতেই বালক চিত্তের খোরাক যথেষ্ট আছে, এবং গল্পগুলির সমস্তার উৎকণ্ঠা শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনকে অভিভূত করে রাখে। পুস্তকে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি উন্নত প্রণালীতে অঙ্কিত। ছাপা, প্রচ্ছদ এবং বাঁধাইও সন্তোষজনক। ছেলেমেয়েদের হাতে একখানি করে বেঁটে বক্কেশ্বর পড়লে তাদের পূজার আনন্দ বৃদ্ধিলাভ করবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

প্রচ্ছদের উপর 'বক্কেশ্বর' কথার "শ্ব" অক্ষরটি ভাল হয় নি,—ঠিক যেন 'ধ' মনে হয়। পরবর্তী সংস্করণে এটি সংশোধিত করা উচিত হবে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শিশুখাদ্য—ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম-বি প্রণীত ১০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা, স্বাস্থ্য কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক আনা। ১০০ কপি ৪৲ টাকা।

শিশুর স্বাস্থ্য, সুতরাং শিশুপালন এবং শিশু খাদ্য জাতি সংগঠনের পথে যে কত প্রয়োজনীয় কথা তা বলা বাহুল্য। ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর কলিকাতার একজন বিচক্ষণ এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁর সম্পাদিত "স্বাস্থ্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-মাসিক দেশের কত কল্যাণ করছে তা কারো অবিদিত নেই। তিনি "শিশু খাদ্য" বিষয়ক যে পুস্তিকাটি লিখেছেন তা বাঙলা দেশের জননীর নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত। এই পুস্তকে শুধু শিশুদের খাদ্যই বর্ণিত হয় নি, প্রসূতিগণের খাদ্যও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। মূল্যের হিসাবে পুস্তকখানির উপকারিতা অতুলনীয়। আমরা প্রত্যেক গৃহস্থকে একখানি এই পুস্তক গৃহে রাখবার পরামর্শ দিই।

তুমি আছ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

মনের পাখীটি একেলা ঘুরিয়া মরে,
অসীম শূন্যে শুধু ধায়—শুধু ধায়,—
নিমেষের লাগি বিশ্রাম লাভ তরে
কোথা এতটুকু আশ্রয় নাহি হায়।
নিম্নে সাগরে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ,—
নিশ্চল তারে নাহি দেখিয়াছে কেউ,—
যে দিকে নিরখে চঞ্চল চরাচরে
যাহা কিছু শুধু আসে আর শুধু যায়,—
কোথা ঠাঁই হেথা মনে বসিবার তরে,—
মনের পাখীটি শুধু ধায়—শুধু ধায়।

শ্রান্ত আকুল মনের পাখীটি চলে,—
শুধু ধায় আর শূন্যে উঠিছে ডাকি,—
জীবনের মোর যত কথা কোন্ ছলে
শূন্যের মাঝে তাহারে ধরিয়া রাখি।
তুমি আছ—মোর বসিবার মত ঠাঁই,—
সত্য মিথ্যা কিছু আর জানি নাই ;—
জীবনের ভার রাখিনু চরণ তলে,—
নহিলে জীবনে রহিল চলার ফাঁকি।
তুমি আছ,—ওগো তুমি আছ শুধু বলে
শূন্য আকাশে আকুল মনের পাখী।

নানা কথা

শারদীয় পূজায় বাঙালীর কর্তব্য

আজ বাঙালী জাতি নানাপ্রকার কঠিন সমস্যায় বিড়ম্বিত। সমস্যার পর সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভই করছে—অথচ সন্তোষজনক ভাবে কোনোটার সমাধান হ'তে দেখা যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজ এবং শিক্ষা-নৈতিক—এ সকল সমস্যা ত' স্থায়ী বাসা বেঁধে আছে—তদুপরি উপস্থিত বন্যা-সমস্যা বোধ করি দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কঠিন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত এবং প্রভাবশালী লোকের কলিকাতা অথবা অপর কোনো বড় সহরে কার্যব্যপদেশে বাস করতে হয়। এ বৎসর পূজার ছুটিতে অবাঙলা দেশে দেশভ্রমণ এবং অবকাশ যাপনের জন্য না গিয়ে তাঁরা যদি নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে কি ক'রে পাকাপাকি ভাবে বন্যা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা এবং উপায় উদ্ভাবন করেন, এবং পরে এ বিষয়ে গভর্মেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট এবং লোকাল বোর্ড, স্থানীয় জমিদার সম্প্রদায় প্রভৃতির সহানুভূতি এবং সহায়তা লাভের জন্য চেষ্টা করেন তা হ'লে আমাদের মনে হয় এবারকার শারদীয় পূজার অবকাশে বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করা হয়। বন্যায় দেশবাসীর যে কষ্ট এবং দুর্দশা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। সে দুঃখ যাঁরা সচক্ষে দেখে এসেছেন তাঁদের মুখে বর্ণনা শুনলে অশ্রু রোধ করা যায় না। আগে মানুষ বাঁচুক, তারপর মানুষের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক সমস্যা।

পূজার বাজার—'বাঙলার কেনো'

পূজার সময়ে প্রতিবৎসর বাঙলা দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যের খরিদ বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে বস্ত্র এবং প্রসাধন দ্রব্যই অধিক। এই দুটি বিভাগেই দেশী এবং বাঙলা-জাত দ্রব্যের অভাব নেই। পূজার বাজারের ক্রেতাগণের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন অনুগ্রহ ক'রে সর্বাগ্রে বাঙলার শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করেন—অভাবে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের। 'বাঙলার কেনো'—এবারকার পূজার বাজারে এইটেই যেন মূলমন্ত্র হয়।

পরলোকে রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সুপরিচিত সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৩২ শে শ্রাবণ বেরিবেরি রোগে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হয়েছিল। বাঙলার বিভিন্ন মাসিকপত্রে তাঁর লিখিত বহু গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত বহুকাল তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং 'অত্রি' নামক মাসিক পত্র তিনি সম্পাদন করেছিলেন।

আমরা তাঁর শোকাকুল আত্মীয়বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরলোকে ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৫শে ভাদ্র রবিবারে স্বনামখ্যাত ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। কিছু দিন থেকে রক্ত-চাপ রোগে ইনি পীড়িত ছিলেন। সেই রোগেই অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেশপূজ্য মনস্বী স্বর্গীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবীর সহিত এঁর বিবাহ হয়। শ্রীমতী এষা দেবী এঁর একমাত্র কন্যা সন্তান।

ভবশঙ্কর উচ্চ প্রকৃতি এবং উদার অন্তঃকরণের ব্যক্তি ছিলেন। বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি নানাপ্রকার সহায়তা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে রিপন কলেজ এবং অপরাপর প্রতিষ্ঠান, যেগুলির সহিত তাঁর যোগ ছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমরা ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পূজায় বিচিত্রা কার্য্যালয় বন্ধ

শারদীয় পূজা উপলক্ষে বিচিত্রা কার্য্যালয় আগামী ১১ই আশ্বিন হ'তে ২৫শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই কয়দিনের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি আসবে তার বিলি-ব্যবস্থা ছুটি শেষ হ'লে করা হবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, ১৩৪৫] জননী [শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪৫ | ৪র্থ সংখ্যা

পানের বরজ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পাকাঠি প্রাচীরে ঘেরা পাকাঠির ছাদ সমতল,
আলোকের ঝাঁঝরা কেবল ;
এই ঘেরাটোপ মাঝে গোপনে বিরাজে
নধর চিক্কণ-শ্যাম কি স্নিগ্ধ শোভা যে,
বর্ণিতে বচন হারে, মুগ্ধ হিয়া মৌনী হয়ে রয়,
দেখেনি যে কভু তারে এ শোভা যে-বুঝাবার নয়।
লতা বিতানের হেন শ্যামল কোমল
রূপে ঢলঢল
অপার্থিব ত্রিদিব সুষমা
বিশ্বে নিরুপমা।

শাখা-উপশাখাহীন স্তরে স্তরে পলাশ সম্ভার
উন্নত সরল রেখাকার,
সারি সারি দাঁড়াইয়া সম-অন্তরালে
পত্র শ্লোকাবলী লিখা আকাশের ভালে
দোদুল রয়েছে শূন্যে ছত্রে ছত্রে ঋজু রেখাটানে।
হরিৎ পল্লবপুঞ্জ অনিমিকে চূর্ণালোক পানে
আয়ত করুণ আঁখি চৌদিকে মেলিয়া
রয়েছে চাহিয়া,
অবচনা শ্যামলী-কিশোরী
লক্ষ আঁখি ধরি।

চির অবরোধ মাঝে সরল নির্ম্মল হিয়াখানি
দিকে দিকে প্রসারিত মানি ;
পাতায় পাতায় যেন অনূঢ়া হৃদয়
সবুজের আলিপনে শূন্যে আঁকা রয়।
স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি সম চারিদিকে করে ঝিকিমিক্
যেদিকে ফিরাই আঁখি মুগ্ধনেত্রে পড়ে না নিমিক !
মনে হয় স্পর্শাতীত পেলবতা মাখা
থরে থরে রাখা
দেবতাবাঞ্ছিত সুকুমার
পূত অর্ঘ্যভার।

এ কুঞ্জে ফোটে না ফুল, পথ ভুলে আসে নাক অলি,
কিম্বা প্রজাপতি ঝলমলি।
পান্থহীন বীথিগুলি করিতেছে ধূ ধূ
মৌন ছায়ালোক হেথা খেলা করে শুধু,
এ নিভৃত অন্তঃপুরে কাহারও নাহিক গতিবিধি !
রত্নাগারে সুরক্ষিত অগণিত কি অমূল্য নিধি !

য'বে পরে ছড়াইয়া কত ঘরে ঘরে
অধরে অধরে,
মদির-খদির-রস রাগে
নব অনুরাগে।

আপনারে নিপীড়িয়া নিঙাড়িয়া দিবে প্রাণধারা
মধুরসে হবে আত্মহারা,
কি অমৃত রসায়নে লভিবে নির্ব্বাণ
অধরে ও রসনায় রাখি অভিজ্ঞান,
রক্তিম অন্তিম তরে রুদ্ধ ঘরে কাটায়ে যৌবন
জীবনের ব্রতটিরে মরণে করিবে উদ্‌যাপন।
নিখিলের বিম্বাধরে মুখ অরুণিমা
তোমার শোণিমা
রঞ্জিবারে আছ ধৈর্য্য ধরি,
তাম্বুলবল্লরী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

রাসলীলা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর, এম্‌-এ

শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তাহার মধ্যে রাসলীলা সর্বোৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই নয় যে আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে রাসলীলাটি বেশী উপভোগ্য। কারণ এই যে, আনন্দময়ের বিকাশ এই লীলাটিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা 'সর্বলীলোৎসব মুকুটমণি'।

পরব্রহ্মকে লাভ করিবার যে বিবিধ পন্থা আছে ইহা সর্বজনবিদিত। কেহ মনে করেন যাগযজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়, কেহ মনে করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লভ্য। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি পরম আস্বাদ্য। তাঁহার চিন্তনে, মননে, ধ্যানে হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠে। যাঁহারা যাগযজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে বা পরমপদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বলেন 'অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়।' যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী, তাঁহাদের মতে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। ইঁহারা নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম স্বরূপ চিন্তা করিয়া এক অখণ্ড জ্ঞানময় রাজ্য লাভ করেন; সেখানে সকল ভেদ দূরীভূত হইয়া গিয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মভূত এই আত্মা দুঃখ শোকের অতীত, তাহার সমস্ত বাসনা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

কিন্তু একদিন ঋষি বলিয়া উঠিলেন যে ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানময় নহেন, তাঁহাকে জানিলে যে সকল সংশয়ের অবসান হয়, সকল বন্ধনের মোচন হয়, শুধু তাহাই নহে; তিনি আনন্দ স্বরূপ। রসো বৈ সঃ। তাঁহাকে জানিলে আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য, ধরিবার জন্য হৃদয়ে লোভ জন্মে। সাহিত্যদর্পণকার মতে রস অর্থে যাহা আস্বাদন করা যায়। কিন্তু আমাদের আস্বাদ্য কি? স্থূলভাবে দেখিতে গেলে, আস্বাদ্য—কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর। ইহার সাধন আমাদের জিহ্বা। সেই জন্য তাহার নাম রসনা। সমস্ত জন্তুরই রসনা আছে। কাজেই ইহার আস্বাদন অত্যন্ত স্থূল। এই প্রাথমিক স্তরের উপরে উঠিবার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই আছে। সেই জন্য মানুষের পক্ষে অপর একটি বিরাট রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে—তাহার নাম আধ্যাত্মিক রাজ্য। এ রাজ্যে অপর কোনও জীবের প্রবেশাধিকার নাই। এই আধ্যাত্মিক রাজ্যের বাহ্যপ্রকাশ সাহিত্য। সাহিত্যে আস্বাদনের উপকরণ বহু। অলঙ্কার শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞান সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন রস নয় প্রকার—শৃঙ্গার বা আদি, বীর, রৌদ্র, করুণ, বীভৎস, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও শান্ত। কাহারও মতে বাৎসল্য রসও গণনীয়। এই সকল রসের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে একটি সামগ্রী অন্তর্নিহিত আছে যাহা সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি ও কল্পনার বিলাসকে আস্বাদ্য করিয়া তুলে। তাহার নাম আনন্দ। সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম। যে আনন্দ হইতে সমস্ত ভূতনিবহ জন্মলাভ করে, যে আনন্দ লাভ করিয়া তাহারা আহ্লাদিত হয়, আবার যে আনন্দে তাহারা বিলীন হয়, সেই আনন্দই ত ব্রহ্ম। এই আনন্দ নহিলে প্রাণিকুল বাঁচে না। মানুষের আত্মা আনন্দের সন্ধানেই ব্যাপৃত।

পরব্রহ্মকে যখন আনন্দময়, মাধুর্যময়, পরম আস্বাদ্য বলিয়া জানা গেল, তখনই ত তিনি রূপে রসে মূর্তিমান হইয়া উঠিলেন। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। তিনি মূর্তিধারী পরম মনোহর, সুন্দর রূপশ্রী সমন্বিত পুরুষ। সুন্দর বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ। কারণ তাঁহার আকর্ষণী শক্তিতে বিশ্ব বিমুগ্ধ। তাহা হইলেই বুঝিলাম যে, একদিকে ভগবান তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অপর দিকে সমস্ত বিশ্বের চিত্ত লোলুপ হইয়া তাঁহার দিকে

অনাদিকাল হইতে ধাবিত হইতেছে। ইহাই রাসের মর্ম্মকথা বলিয়া বোধ হয়। *

এই তত্ত্বের স্ফুরণ লীলায়। তত্ত্ব আর লীলা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দুইয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্ত্ব না জানিলে লীলা শুষ্ক ইতিহাসের উপাদান হইয়া পড়ে। আবার লীলায় প্রবেশ না করিলে তত্ত্ব নীরস তর্কে পর্য্যবসিত হইবার আশঙ্কা থাকে। ভগবদ্‌গীতা ভক্তিতত্ত্বের সমুদ্র; মহাভারত লীলার খনি। এই তত্ত্ব ও লীলার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়াছেন। এ দুইয়ের মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাহা তাঁহারা কখনও স্বীকার করেন না। আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। আমরা যখন বৈদান্তিকের দৃষ্টি লইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে যাই, তখন লীলার অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ি। আর যখন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া লীলার আলোচনা করিতে যাই, তখন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের মত লীলার কামায়নপরতা (Eroticism) প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হই। †

মনে রাখিতে হইবে, কৃষ্ণলীলাকে বিষয়বস্তু করিয়া আমাদের দেশে নানা পুরাণ, কাব্য ও সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। পুরাণকার এবং কবি নিজ নিজ কল্পনার আলেখ্যে রঙ চড়াইয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যে শুধু কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। মহাভারতের ন্যায় সুনীতিপূর্ণ গ্রন্থে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কেন হইল কে বলিবে? ঐতিহাসিকেরা ইহার মধ্যে আদিম মানব সভ্যতার লুপ্তাবশেষ দেখিলেও আমাদের সংশয় ঘুচে না। যিনি সতী সাধ্বী বলিয়া আমাদের পূজা পাইতেছেন, যাঁহার কাতর প্রার্থনায় শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া বস্ত্রোন্মোচনের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে এই অদ্ভুত বিধিলিপি কি করিয়া লিখিত হইল, তাহা কেবল কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বলিতে পারেন। রামায়ণে সর্ব্বশক্তিমান সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নীহরণের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা একবার মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ভাগবতে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা পত্নীগণের দস্যুহস্তে নিপীড়ন কি এমনই অপরিহার্য ছিল? বুঝিতে পারা যায় না। কালিদাস পার্ব্বতীপরমেশ্বরের লীলায় এরূপ ভাবে আদিরসের ছড়াছড়ি কেন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। সমালোচকগণ এজন্য তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই। বৈষ্ণব কবিরা খণ্ডিতায় শ্রীকৃষ্ণের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ভগবল্লীলার কোন্ অংশে আলোকপাত করে, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন। নিরঙ্কুশ কবিরা যাহাই কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আমরা লীলা বলিয়া গ্রহণ করি। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশে চিরদিনই কাব্য এবং ধর্ম্মতত্ত্বের দুইটি সমান্তরাল ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া পুরাণগুলিতে এই ধর্ম ও কাব্যের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। রস নহিলে কাব্য হয় না। রসের মধ্যে আদি রস শ্রেষ্ঠ—আদ্য এব পরোরসঃ। সেই জন্য জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মগ্রন্থের সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছে। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে বসেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন শৃঙ্গাররসের আদর্শস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রিত করিতে। তাঁহার কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররস—শৃঙ্গাররসের অধিদেবতা। শৃঙ্গার রস কাহাকে বলে তাহা অলঙ্কারশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত রসকে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার ব্রজরসকেলির মধ্য দিয়া না ফুটাইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিংশ শতাব্দীর নৈতিক কাণ্ডজ্ঞান তাহাতে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা ভাবি যে, যিনি এমন সুন্দর দশাবতার স্তোত্র গ্রথিত করিয়াছেন, যিনি প্রতি সঙ্গীতের শেষে শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত ভক্তির সহিত

* বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'রাসলীলা গোপীগণের ঈশ্বরোপাসনা। একদিকে অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যবিকাশ, আর একদিকে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা…'

† যাহাকে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন "Undiluted mass of Sexuality".—Introduction to 'Symbolism of Vidyasundara'—by Nibaran Chandra Bose.

'It is eroticism run wild'—রাসলীলা ৬৫ পৃঃ

প্রণাম করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ভগবানের লীলা এমন কামকলায় পরিণত হইল কেমন করিয়া ?

এ শুধু আমাদের দেশে নহে, ইয়ুরোপেও ভগবানের সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ কল্পনা কল্পিত হইয়া মানবের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক অপর এক দার্শনিকের ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'অনন্ত' এমনই একটি বিরাট ড্রেণ যাহাতে সকল রকমের বিরোধের স্রোত একত্র বহিয়া চলিয়াছে। * ভগবান এক অথচ বহু, তিনি অসীম অথচ সসীম, তিনি অরূপ অথচ পরম রূপবান, তিনি পরম দয়াল আবার কঠোর করাল, তিনি সমস্ত ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা সংস্থাপয়িতা, আবার সমস্ত নীতির উচ্ছেদ-কর্ত্তা। তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, অথচ তিনি ঘরে ঘরে মাখন চুরি করিতেছেন, স্তনপানছলে নারীবধ করিতেছেন, তপস্যার জন্য শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিতেছেন, অসংখ্য নরনারী লইয়া কেলি করিতেছেন। সুতরাং ইতিহাস বা চরিত্রনীতির ধারা দিয়া ভগবানের লীলা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল বিরোধী ধর্ম ভগবানে আরোপিত হইলেও, আমাদের ধর্মবুদ্ধির স্রোত কখনও রুদ্ধ হয় নাই, কখনও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ তর্কে তাঁহাকে না পাইলেও, আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি যোগে, পাইয়াছি ধ্যানে, পাইয়াছি বিশ্বাসে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বৈষ্ণবেরা অধিকারবাদ মানেন। তাঁহাদের মতে সকলের সকল বিষয়ে অধিকার নাই। যাঁহাদের যে রসে অধিকার, সেই রসের অনুশীলন লইয়াই তাঁহারা থাকিবেন, অন্য রসের কথায় তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গভেদে অধিকারী দ্বিবিধ। রাসলীলা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরই আস্বাদ্য; ইহাতে বহিরঙ্গের প্রবেশাধিকার নাই। বৈষ্ণবদের মধ্যে এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা শৃঙ্গার বা মধুর রসের গান শ্রবণ করেন না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা শুনিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করেন। তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের অধিকারী। আবার দেখিয়াছি অনেকে মধুর রস বা প্রেমলীলার আস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়েন, অনেকের সম্বিৎ থাকে না। ইহার মধ্যেও আবার অধিকারভেদ আছে। বিপ্রলম্ভের যে চারি প্রকার রসবিভাগ আছে যথা পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস, তাহার মধ্যে 'প্রবাস' বা বিরহ কেহ কেহ শুনিতে চাহেন না।

যাহা হউক, রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যদি কেবল রিরংসা লইয়া ভগবচ্চরিত্রে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই সমস্ত কর্ত্তব্যের অবসান হয় না। কৃষ্ণলীলার মধ্যে রাসলীলাই সব নহে, অন্যান্য অনেক লীলা আছে। 'রাস' চৌষট্টি রসের মধ্যে একটি বটে। ইহা ব্যতীত সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসেরও বহু লীলা রহিয়াছে। সে সবই যে কামায়ন-প্রচুর এমন নহে। তার পর যে বিরহে বৃন্দাবন লীলার অবসান, তাহাতেও কি কামায়নের প্রাচুর্য আছে? যে বিরহে কাব্যলক্ষ্মী অশ্রু বিসর্জন করিয়া কুল পান নাই, যে বিরহে কবিরা বেদনার গীতা রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সে বিরহেও কি কামের বৈজয়ন্তী উড়িয়াছে? যদি তাহা না হয়, তবে রাসলীলাকে পৃথক করিয়া দেখা উচিত নহে; পরন্তু সমস্ত লীলার সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ পরমরূপবান পুরুষ; তাঁহাকে দেখিলে সাধ হয় এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয় যদি নয়নে পরিণত হইত! এই রূপ দেখিয়া কি হয়? রমণীরা কামমোহিত হয়। দলে দলে তাঁহার পায়ে আত্মদান করে।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।

স্ত্রীলোকের সাররত্ন যে যৌবন, তাহাও ডালি দিতে ইচ্ছা করে। ইহাই রূপের প্রভাব। রূপ যদি অপরের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া লালসা না জন্মায়, তবে সে রূপ-রূপই নহে। এই রূপ দেখিয়া যে অনুরাগ হয়, তাহাই পূর্বরাগ। ইহা প্লেটনিক লভ হইলে অনেক যুক্তিবাদী হয়ত সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু ইহা সেরূপ উন্মত্ত প্রলাপ নহে। রূপ দেখিয়া রতি জন্মে। রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।

* His Infinite is a grand sewer in which all contradictions flow together—Hegel on Spinoza's Doctrine of Substance.

মিলনই তাহার পরিণাম। ইহা আধ্যাত্মিক মিলন মাত্র নহে। ইহা সর্বাত্মা, সর্বেন্দ্রিয় সর্বাঙ্গের মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। সেইজন্য একটি অনবদ্য কাব্য সম্ভব হইযাছে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গের তরঙ্গ খেলিতেছে। সুতরাং অবাধ অফুরন্ত চিরন্তন মিলন ব্যতীত এ প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে না। তাই মিলনের জন্য দৈহিক আত্মিক সর্ববিধ লালসা। কোথায়ও এতটুকু উহ্য নাই, অভাব বা ফাঁক নাই। এ যে আত্মহারা, পাগল করা, সর্বস্বপণ প্রেম। এখানে দেহের, মনের, প্রাণের, আত্মার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। কাজেই দেহ পশ্চাতে ফেলিয়া মন ছুটিল আগে;—যখন বাঁশী বাজিল, তখন

শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল-লোলনী।

যেখানে দূরে বাঁশী বাজিতেছে সেখানে গিয়া কৃষ্ণ দর্শনে ত বিলম্ব ঘটিবে। তাই ব্রজগোপীরা মনে মনে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে ছুটিলেন। এখানে অর্থ এত বিস্পষ্ট যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গেলে কাব্যরস সব মাটী হইয়া যাইবে। কিন্তু ইঙ্গিতের অভাব নাই। সহস্র সহস্র ব্রজগোপী ছুটিলেন—বাঁশীরবের সন্ধানে। কিন্তু কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বলা বাহুল্য সাধন পথের পথিক অনেক। কিন্তু সকলেই আপন মনে পথ চলেন। কেহ কাহাকেও দেখিতে পান না।

—কেহ কাহুক পথ না হেরি।

কাব্য রসটুকু বজায় থাকিল অথচ অব্যর্থ ইঙ্গিতও রহিল। শরতের পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে, রাশি রাশি মল্লিকা ফুল ফুটিয়াছে, যমুনার কালো জলে চন্দ্র কিরণের রজত ঢেউ খেলিতেছে, ফুলে ফুলে অগণিত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। এমনই সময় ব্রজগোপীদের ভ্রমাভিসার। কৃষ্ণ যমুনার কূলে নীপমূলে ললিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। গোপীকুল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে রূপ দেখিল, সে বাঁশী শুনিল, তাহারা মাধুর্যের বর্ণধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া পাগল হইল।

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অনেক নীতি কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তোমাদের পতিরা গৃহে রহিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অসময়ে তোমরা বনে আসিলে কেন? এমন অধর্ম করিতে নাই ইত্যাদি। ব্রজগোপীরা যে উত্তর দিলেন, তাহার সারার্থ উপনিষদে পাওয়া যায়: পতিঃ পতীনাং তুমি যে পতিরও পতি, জগৎপতি। পুত্র-কন্যা সংসার কি ছার? তুমি যে প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ। কিন্তু আমরা এখানে তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিতে চাহি না। আমরা এই শারদীয় রাসের কাব্য আস্বাদন করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি। ভাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, (প্রচলিত) ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ এখানে কাব্য কথাই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

জয়দেব এই শরৎকালীন রাস পরিত্যাগ করিয়া বসন্ত-বন বর্ণন আরম্ভ করিয়া বসন্ত রাসের প্রবন্ধ করিয়াছেন। ভাগবত এবং গীতগোবিন্দ উভয়েরই ইচ্ছা বোধ হয় এই যে অনবদ্য নৈসর্গিক শোভার মধ্যে এই সুন্দর কাব্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন। উভয়েই শৃঙ্গার রসের আতিশয্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই কাব্যের দিক দিয়া অনিবার্য। কারণ রূপানুরাগ, অভিসার ও মিলনের পরে এই রাসেই আনন্দলীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে।

কাব্যের দিক দিয়া ইহার সার্থকতা দুইটি: প্রথম, প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতে হইলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। রাসে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রেমাধিক্য সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কেননা—

অনেনারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

শ্রীগীতগোবিন্দে বসন্তঋতুতে যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপি-দিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তিনিও শ্রীরাধার রূপ হৃদয়ে লইয়া অন্য ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। ইহাতে রাধার প্রতি প্রেমাতিশয্য সূচিত হইল।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।

কেনই বা না করিবেন? শ্রীকৃষ্ণকে অন্য রমণীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়াও শ্রীরাধা তাঁহার পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনোমম কৃতপরিহাসম্॥

শরৎকালীয় রাসে তিনি আমার সঙ্গে যে সকল লীলাবিলাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার সহিত যে হাস্য-পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া আমি তাঁহারই মিলন কামনা করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, লীলার সহিত তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান এই সকল কবির এক অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য। বহুবল্লভ যিনি, তাঁহাকে পাইতে হইলে একান্ত আনুগত্যের প্রয়োজন। কবি কৌশলে তাহাই দেখাইয়া তাঁহার বসন্তসময় বনবর্ণন সমন্বিত রাসলীলাকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিলেন। ভাগবতে রাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানও এই সমন্বয়ের উদাহরণ। প্রেম পরম রমণীয় সামগ্রী বটে। কিন্তু অভিমান থাকিলে প্রেম সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। সেই জন্যই রাসের অন্তর্ধান। গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়া সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি—

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।

তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই অন্তর্ধান করিলেন। আবার শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ যখন বনান্তরালে গেলেন, কুসুম তুলিয়া, কেশ বাঁধিয়া এবং অন্যান্য বিলাস রচনা করিয়া যখন আনন্দে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন রাধার মনে গর্ব হইল যে আমিই সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী। তিনি বলিলেন আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে কাঁধে করিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া চল। নয় মাং যত্র তে মনঃ। ইহা বলাতে কৃষ্ণপ্রেমগরবিণী রাধার কি খুব বেশী অপরাধ হইল? মনে ত হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বিধান করিয়া কবি এখানে যে বিরহরসের অবতারণা করিলেন, তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে। তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া কবি তুলির দুই একটি টানে যে চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে রাসের নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

তত্ত্বের দিব দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, শ্রীরাধা ভক্ত, মূর্ত্তিমান মহাভাব। কাব্যের দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ নায়ক, শ্রীরাধা প্রেমিকা। শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্রচূড়ামণি, শ্রীরাধা রসিকাশিরোমণি। নব নব সৌন্দর্য মাধুর্যের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা যেন অবারিত স্রোতে বহিয়া গিয়াছে।

কবিত্বের দিক ছাড়িয়া দিয়া কেবল তত্ত্বের দিক দিয়াও রাসলীলা আস্বাদন করা যাইতে পারে। বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু উপভোগ্য, তাহা ত ভগবানেরই বিভূতি। যেখানে একটু আলো, একটু গীতিগন্ধ, যেখানে একটু সৌন্দর্য্য সেখানেই আনন্দময় ভগবানের কিরণ-সম্পাত। তাই বিশ্ব আলোকে পুলকে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাই এত হাসি, এত গান, এত কলরব। ইহাদের কাহারও ত স্বাধীন সত্তা নাই। সমস্তই ভগবানের আনন্দময় বিকাশের কণা।

তমেব ভান্তংঅনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমেব বিভাতি।

সূর্য্য চন্দ্র তাঁহাকে আলোকিত করে না। চন্দ্রের কৌমুদীতে পৃথিবী আলোকিত। সে চন্দ্র আবার সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত। কিন্তু সূর্য্যচন্দ্র যাঁহার কিরণে উদ্ভাসিত তিনিই ব্রহ্ম। এই যে বিশ্বে বর্ণের খেলা, সূর্য অস্ত গেলে বর্ণ থাকে কোথায়? এই যে বিশ্বে এত আনন্দ, এত হাসি, ইহা ভগবানেরই লীলা খেলা। রাসলীলা তাহারই কাব্য, তাহারই ইতিহাস।

মানবীয় প্রেমের আদর্শে ভগবানের লীলা কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং দোষসম্পৃক্ত আদর্শের (anthropomorphism) বাধা একেবারে তিরোহিত হয় না। তাই আমরা সময়ে সময়ে সংশয়ে সন্দেহে আকুল হইয়া পড়ি। কিন্তু বৈষ্ণবেরা এই প্রেমের আদর্শকে উচ্চতম কোঠায় স্থাপন করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী বসন্ত রাসের বর্ণনায় কি সুন্দর ভাবে এই প্রেমের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন! বসন্তরাসে গোপীরা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ছুটিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ বেগতিক দেখিয়া কুঞ্জাভ্যন্তরে গিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিলেন। তখন গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া

প্রণাম করিল এবং বলিল, ঠাকুর আমাদের কৃষ্ণ কোথায় ? তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিয়া আমাদের দুঃখ দূর কর।

নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ।

তুমি নারায়ণ তোমাকে প্রণাম করি। কিন্তু আমরা তোমাকে চাই না, বল, বল, আমাদের কৃষ্ণ কোথায় ? কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে শ্রীরাধা যখন আসিলেন, তখন আর তাঁহার ছদ্মরূপ রহিল না, তাঁহার অতিরিক্ত দুইখানি হস্ত মিলাইয়া গেল।

সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্বাহুতা।— উজ্জ্বলনীলমণি।

লীলার দিক দিয়া ইহার অর্থ হইল প্রেমের এই লুকোচুরি খেলায় কৃষ্ণ হইলেন পরাভূত। আর তত্ত্বের দিকে ইহার অর্থ হইল এই যে, প্রেমের নিকট ঐশ্বর্য (ঈশ্বরত্ব) টিকিতে পারে না। চতুর্বাহুত্ব ঐশ্বর্যের লক্ষণ। দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ প্রেমের অধিদেবতা। এখানে কি কামায়নতার প্রাচুর্য ? 'উত্তুঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গে'র * মধ্য দিয়া যে সত্যটি বৈষ্ণবেরা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা কি ঐ তরঙ্গকে অতিক্রম করিতে পারে নাই ?

আর একটি কথা বলিয়া আমার এ প্রবন্ধ শেষ করিব। ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্তে বা গীতগোবিন্দে যে আদিরসের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা অনেক সংযত হইয়াছে। সেখানে রিরংসার কথা বড় একটা নাই—আছে প্রেম, আছে নাচগান আমোদ আহ্লাদ।

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ হেরি ভোর।

রাস অর্থে এই নৃত্য। রাস অর্থে যেমন রসের প্রগাঢ়তা বুঝায়, তেমনি আর এক অর্থে মণ্ডলাকারে নৃত্য বুঝায়। ব্রজ গোপীরা বাঁশীর স্বরে আত্মহারা হইয়া যমুনাতীরে নীপকুঞ্জে মিলিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের আকুলতা দর্শন করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। রাসমণ্ডল বা হল্লীশ অর্থে মণ্ডলী বন্ধন করিয়া নৃত্য—কৃষ্ণ মধ্যস্থলে, ব্রজ গোপীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এই নৃত্যকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিবার জন্য যোগেশ্বর কৃষ্ণ আপনাকে বহুতে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। এইরূপে কবির কাব্যে এক অপূর্ব চিত্র উদ্ঘাটিত হইল।

তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা।

একটি স্বর্ণময় মণি তার পাশেই একটি মরকত, একটি মেঘখণ্ড তার পাশেই একটি তড়িৎপ্রবাহ, একটি চাঁদ তার পাশেই আঁধার—চমৎকার চিত্র! এই কাব্যের রস আস্বাদন করিতে করিতে অপূর্ব অপার্থিব আনন্দে মন ভরিয়া যায়। ধর্মতত্ত্বও মনে পড়ে না, নীতিকথাও ভাল লাগে না। ভুলাইয়া দেয় রাসলীলা কি ; কামক্রীড়া, না প্রেমোৎসব।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

* 'রাস লীলা'য় হীরেন্দ্র বাবু ইহাকে 'উত্তুঙ্গ অনঙ্গরঙ্গ' বলিয়াছেন।

সুশান্ত সা

তৃতীয় পর্ব্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৪

দায়রা আদালতে বিচার সুরু হল বেলা ১১টা আন্দাজ। আদালত গৃহ এবং পার্শ্বস্থিত বারান্দা যতদূর দেখা যায় জনতায় ভরা—যেন দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে আমার বিচার দেখবার জন্য। আমি কারোও দিকে চাইনি, চাইবার প্রবৃত্তিও হয়নি। স্তব্ধ হয়ে মাথা নীচু করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, সঙ্গে ছিল আরও দুজন, আলীমিঞা ও নফর। আরও দুজন লোকও আসামী শ্রেণীভুক্ত ছিল—মদন সেং ও গোলাপ মণ্ডল। তার মধ্যে মদন সেং সুরু থেকেই পলাতক, তাকে পুলিশ ধরতে পারেনি এবং গোলাপ মণ্ডলকে আমাদের মধ্য হতে আলাদা করে ভিন্ন স্থানে রাখা হয়েছিল কেননা সরকার পক্ষ থেকে তাকে করা হয়েছিল রাজসাক্ষী অর্থাৎ approver.

সম্মুখে উচ্চমঞ্চে জজ সাহেবের বসবার আসন, এবং তার সামনে কিঞ্চিত নীচুতে আমাদের দিকে পিছন ফিরে সারি সারি চেয়ারে বসেছিলেন উভয় পক্ষের উকীলরা—কেবল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে আগত ব্যারিষ্টার। বিশেষ ক'রে এই মকোদ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করবার জন্য হরিশ তাঁকে কলিকাতা থেকে খুলনায় নিয়ে এসেছে। নাম শুনেছিলাম মিঃ নাগ। শুনেছিলাম তিনি নাকি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নামজাদা কৌঁসুলী—ফৌজদারী মকদ্দমায় তাঁর বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার খ্যাতি নাকি ছিল দেশবিখ্যাত। আদালত গৃহে জজ সাহেব প্রবেশ করবার আগে হরিশ তাঁকে আমার কাছে একবার নিয়ে এসেছিল এবং দু একটা কথার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন "বিচারের ফলাফল আমার হাতে নয়, তবে আমরা আপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ভগবান নিতান্ত বিমুখ না হলে এ মকোদ্দমায় আপনার কিছুই হবেনা, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

লোকটীর প্রবীণ সৌম্য চেহারার দিকে চেয়ে এবং তাঁর সঙ্গে দু একটী কথা বলেই আমার তাঁর উপর কেমন যেন একটা বিশ্বাস হয়েছিল সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর প্রশস্ত ললাটের নীচে বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ আঁখি দুটী, সমুন্নত নাসিকা, দেহের নাতিস্থূল সুদীর্ঘ গড়নের পারিপাট্য, কথা বলার ভঙ্গীমার বিশেষত্ব—সমস্ত মিলিয়ে এমনই একটা আত্মশক্তির প্রভাব পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে যে, মন তাঁর উপর নির্ভর ক'রে যেন নিশ্চিন্ত হয়। তাই তাঁর দু একটী কথাতেই মন অনায়াসে আশ্বস্ত হয়েছিল, বিনা দ্বিধায়। একটা ভরসায় মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল—হয়ত আমরা মুক্তিই পাব, কিছুই হবে না এ মকোদ্দমায়।

হরিশকে ডেকে চুপি চুপি বলেছিলাম, "লোকটীত চমৎকার। এঁর পারিশ্রমিক কত ঠিক হয়েছে?"

হরিশ বলেছিল, "অনেক সুপারিশ ধরে খুব সুবিধারই বন্দোবস্ত করেছি। ২৫৫৲ টাকা করে রোজ দিতে হবে এঁকে। মিঃ নাগ আজকাল রোজ ৫১০৲ টাকার কমে কিছুতেই কাজ নিতে চান না।"

শুধালাম, "সুপারিশ? কি সুপারিশ জোগাড় করলে?"

হরিশ বলল, "তোমার বন্ধু কাশীর ডাক্তার ললিতকে মনে পড়ে ত? তার বোন, যাকে তুমি 'সুলোচনা দিদি' বল, তাঁরই আপন ননদ হচ্ছেন মিঃ নাগের স্ত্রী। তোমার সুলোচনা দিদি নিজে কলকাতায় এসে মিঃ নাগকে অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অবাক হলাম। সুলোচনাদিদি—তিনিও এসব জানেন।

হরিশকে শুধালাম, "তুমি তাঁর সন্ধান পেলে কি করে?"

হরিশ বলল, "আমি তাঁর সন্ধান করিনি, তিনিই আমাকে খুঁজে বার করেছেন। তোমার এ মকোদ্দমায় যখন কলকাতায় জামিনের দরখাস্ত করি, তখন যে সব কথাই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। সে সব অনেক কথা, বিস্তারিত পরে বলব। কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে তোমার এই সুলোচনাদিদি। তোমার আপন বোন থাকলেও তোমাকে এত বেশী ভালবাসত কিনা সন্দেহ।"

সেই সুলোচনা দিদি।—মনটা হঠাৎ কেমন যেন দুলে উঠল।

জজসাহেব আদালত গৃহে ঢুকলেন, বসলেন উচ্চমঞ্চের উপরে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

উভয় পক্ষের উকীল ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ২।১টী কথবার্ত্তার পরে জজসাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে জজ সাহেবের পেস্কার আমাদের একে একে প্রশ্ন করতে লাগল। আমাকে শুধাল যে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ অর্থাৎ আমি আলিমিঞা প্রভৃতির সঙ্গে আমার ভাই প্রশান্ত সাহা চৌধুরীর খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমি তাতে দোষী না নির্দ্দোষী।

আমি বলেছিলাম, "আমি নির্দ্দোষী, বিচার চাই।" আমার পর আলীমিঞা, তার পর নফর, সকলকেই একে একে প্রশ্ন করা হল; সবাই বলেছিল "নির্দ্দোষী—বিচার চাই।" তবে যতদূর আমার মনে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্রেরই নয় খুনের অভিযোগও ছিল।

জুরী বাছাই হল। ৭ জন জুরী জজ সাহেবের বাম পার্শ্বে উচ্চমঞ্চের একধারে গিয়ে বসলেন। জজ সাহেবের নির্দ্দেশমত একজনকে তাঁরা ঠিক করে নিলেন নিজেদের foreman, অর্থাৎ—অগ্রদূত। লোকটী বৃদ্ধ, মাথায় প্রকাণ্ড টাকের চারিপার্শ্বে পাতলা পাতলা পাকা চুল, হৃষ্ট পুষ্ট গড়ন, গৌরবর্ণ গায়ের রং এবং মুখের ভঙ্গীতে একটা সহৃদয়তা, একটা দাক্ষিণ্যের প্রকাশ বেশ স্পষ্টই ফুটে বেরুচ্ছিল। শুনেছিলাম লোকটী নাকি কোন এক গ্রাম্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অনেকবার জুরী হয়ে বিচারাসনে বসেছেন এবং সহজে নাকি আসামীকে দোষী বলার পক্ষপাতী তিনি নন্। একবার হরিশ এসে চুপি চুপি আমাকে বলে গেল "জুরী বাছাই ভাল হয়েছে। তিনজন ত আমার বিশেষ চেনা এবং লোকও ভালো। ফোরম্যানটী ত নাম করা ভাল লোক।"

জুরীরা সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে ন্যায্য বিচার করে যথাযথ রায় দেওয়ার হলপ নিয়ে নিজ নিজ স্থান দখল করে বসার পর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জুরীদের শুনিয়ে দেওয়া হল। এবং তার পর বিপক্ষের বৃদ্ধ উকীল উঠে দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষের মোকদ্দমার বিষয় জুরীদের বলতে সুরু করলেন। আইনের যে সব ধারায় আমরা অভিযুক্ত সেই ধারাগুলি জুরীদের কাছে যথোচিত ব্যাখ্যা করে সরকার পক্ষের মোকদ্দমার কাহিনীটি বিস্তারিত করে জুরীদের দিলেন বুঝিয়ে। মোটামুটি তাঁর বক্তব্যটী সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি। সরকারী উকীলের কথা অনুসারে—

আমি সুশান্ত, আমি অতিশয় পাষণ্ড ও দুশ্চরিত্র লোক। সতীসাধ্বী রূপবতী আমার স্ত্রী—তাঁর চরিত্রে অযথা সন্দেহ করা এবং তাঁর উপর নির্ম্মম অত্যাচার করা আমার চিরদিনের স্বভাব। আমার দাদা স্বর্গীয় প্রশান্তচন্দ্র সাহা-চৌধুরী ছিলেন অতিশয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি চিরদিনই আমার অযথা অত্যাচারের হাত থেকে আমার স্ত্রীকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাই আমি তাঁর উপরও হয়ে উঠেছিলাম বিরূপ। ক্রমে আমি আমার দাদা ও আমার স্ত্রীর উভয়ের নির্ম্মল মধুর সম্পর্কটীও অত্যন্ত কলুষিত সন্দেহের চক্ষে দেখতে সুরু করলাম। এবং এই নিয়ে স্ত্রীকে নানানভাবে নির্যাতন করতে এতটুকুও দ্বিধা করি নি। শুধু তাই নয়, এত বড় দুর্বৃত্ত আমি যে একটী কুলত্যাগিনী বিধবাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে আশ্রয় দিয়ে নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট অগ্রাহ্য করে, সকলের সম্মুখে সেই বিধবাটীর সঙ্গে একটা দুষিত ঘৃণ্য সম্পর্কে জীবন যাপন করতে সুরু করেছিলাম—আমাদেরই সেই মাধবপুরের বাড়ীতে।—এত বড় অপমান, আমার এই অমানুষিক দুর্ব্যবহার সবই আমার সাধ্বী স্ত্রী নীরবে সহ্য করে সংসারের একপাশে কোনও রকমে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ক্রমে সেই বিধবাটীর অত্যাচার তাঁর পক্ষে হয়ে উঠল

অসহ্য। তখন আমার দাদা সমস্ত অবস্থা বুঝে সেই বিধবাটীর অত্যাচারের হাত থেকে আমার স্ত্রীকে একটু শান্তি দেওয়ার জন্যে, ব্যবস্থা করে তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ী পলতায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজেও কষ্টে ঘৃণায় দেশের বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বসবাস সুরু করেন। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে অভিভাবক কেহ ছিল না। আমার স্ত্রীর মাতা রোগে শয্যাশায়ী ও পঙ্গু। তাই আমার দাদা আমার স্ত্রীর ও আমার বালক পুত্রটীর তত্ত্বাবধানের জন্য মাঝে মাঝে পলতায় গিয়ে তাদের দেখাশুনা করে আসতেন। আমার ছেলেটী নাকি ছিল আমার দাদার নয়নের মণি। নিজের সংসার ছিল না, পুত্র-কন্যা ছিল না, তাই আমার এই পুত্রটীকে প্রাণের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে স্নেহ দিয়ে জীবনের একমাত্র সম্বল বলে আমার দাদা আঁকড়ে ধরেছিলেন—এবং সেজন্যও মাঝে মাঝে তার মুখখানা দেখবার জন্য তিনি ছুটে যেতেন পলতায়।

সরকারী উকীল আরও বললেন যে, যদিও আমি বিনা বাধায় মাধবপুরের বাড়ীতে সেই বিধবাটীর সঙ্গে পরম সুখে বসবাস করছিলাম, কিন্তু তবুও এতই নীচ এতই কলুষিত আমার মন যে আমার দাদার মাঝে মাঝে পলতায় গিয়ে আমার স্ত্রী পুত্রের তত্ত্বাবধান করা পর্য্যন্ত আমার পক্ষে হল অসহ্য—ক্রোধে আত্মহারা হলাম। জমিদারী টাকা কড়ি সবই ছিল আমার হাতে, তাই দাদার মাসোহারা বন্ধ করে তাঁকে হুকুম করে পাঠালাম—তিনি যেন পলতা মুখো আর কখনও না হন। আসামী আলীমিঞা ছিলেন আমার এবং দাদার উভয়ের পক্ষের জমিদারীর ম্যানেজার কিন্তু বিশেষ করে আমারই হাতের লোক, আমারই অনুগত। এবং দাদা যখন নিরুপায় হয়ে টাকার জন্য আলীমিঞাকে পত্রের পর পত্র দিয়েও আলীমিঞার কাছ থেকে টাকা কড়ি পেলেন না, এবং যখন বাধ্য হয়ে দু আনীর ম্যানেজার নবীনমুন্সীকে নিজ তরফের তহশীলের জন্য আমমোক্তার নামা দেওয়ার বন্দোবস্ত করছিলেন, তখনই কোনও দিক দিয়ে দাদাকে সংযত করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলাম আমি ও আলীমিঞা। এবং এই ষড়যন্ত্রের ফলেই আলীমিঞা তিন জন গুণ্ডা নিয়ে পলতায় রওয়ানা হলেন একদিন সন্ধ্যার পরে। পলতায় আমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে পৌছতে পৌছতে রাত ১১টা হল। পলতায় আমার শ্বশুরবাড়ীটি বিশেষ বড় নয়—নদীর খুব নিকটেই। তবে বাড়ীটি পাকা, তিনখানি ঘর ও সম্মুখে একটী লম্বা টানা বারান্দা, খোলা নয়, ঘর হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তার সম্মুখে একটী রোয়াক। দাদা মাঝে মাঝে যে সময় পলতায় যেতেন এই সামনের টানা বারান্দাটীর একপাশে একখানা তক্তাপোষের উপর শুতেন এবং রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা ছিল তাঁর নিত্য অভ্যাস।

সরকার পক্ষের কথানুযায়ী ঘটনার দিন রাত্রেও রাত ১১টা আন্দাজ দাদা সদর দরজা বন্ধ ক'রে বারান্দার বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন এবং আমার স্ত্রী একটা ঘরে রুগ্ন ছেলেটীকে নিয়ে তাঁর মার সঙ্গে একই বিছানায় একটু তন্দ্রার ঘোরে ছিল শুয়ে, এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দাদা শুয়ে শুয়ে শুধালেন "কে?" এবং আলীমিঞা নিজের পরিচয় দিয়ে দাদাকে ডাকলেন। দাদা অতরাত্রে আলীমিঞার গলা শুনে বোধহয় একটু আশ্চর্য্য হয়ে উঠে এসে সদর দরজা খুলে ফেলে বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়াতেই নফর তাঁর মাথায় জোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিল। দাদা চীৎকার করে সেইখানেই রক্তাক্ত শরীরে রোয়াকের উপর গেলেন পড়ে। আলীমিঞা প্রভৃতি লোকগুলী সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় অসুস্থ ছেলেটীকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নৌকায় ফিরে এসে তৎক্ষণাৎ নৌকা দিল খুলে।

ঘটনার বিষয় মোটামুটি এই কথাগুলি বলে বৃদ্ধ সরকারী উকিলটী পুলিশের অসাধারণ নিপুণ তদন্তের ফলে কেমন করে এই মকোদ্দমাটীর সত্য রহস্য প্রকাশ হয়েছে, কেমন করে আসামীরা একে একে গ্রেপ্তার হল ইত্যাদি সবই সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে যদিও আমি কারও দিকে চাইনি, তবুও মনে হল স্তব্ধ আদালত গৃহের হাজার হাজার দৃষ্টিবাণে বিঁধে বিঁধে আমার দেহ মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে—কাঠগড়ায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা দায়।

আলীমিঞা যখন আমাকে চুপি চুপি বললেন, "চমৎকার মিথ্যা মকোদ্দমা সাজিয়েছে ত এরা। বড়বাবু বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে রোয়াকে বসে বসে কথাবার্ত্তাইত বলেছিল প্রায় এক ঘণ্টা।" তখন তাঁর এ কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করিনি—একটা কথা বলারও যেন শক্তি ছিল না আমার।

সাক্ষী ডাকা হল। প্রথম সাক্ষী এল গোলাপ মণ্ডল। সত্য কথা বলার হলপ নিয়ে সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে সে সরকার পক্ষের মকোদ্দমাটা ষোল আনা সমর্থন করে গেল। বলে গেল যে তার বাড়ী ভগতীরই পাশের গ্রামে এবং সে চিরকালই আলীমিঞার বিশেষ আশ্রিত লোক। এ খুনের ষড়যন্ত্রে তাকে প্রথম ডেকে নেয় আলীমিঞা। আলীমিঞার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং বিশেষ করে, আমি জমিদার, আমার কথার অবহেলা করার সাধ্য না থাকার দরুণ সে এই খুনের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। খুন হওয়ার প্রায় দিন পনেরো আগে থেকে আমাদের বাড়ীতে একটু বেশী রাত্রে আমাদের পুকুরের পুবের পারের বাঁধাঘাটের উপর এই খুনের বিষয় ষড়যন্ত্র হত এবং আমিও এই ষড়যন্ত্রে সব সময়ই নাকি উপস্থিত থাকতাম। খুনের দিন পাঁচেক আগে একদিন রাত্রে কি ভাবে কি করা হবে না হবে এই বিষয় কথাবার্ত্তা চলেছে এমন সময় পুকুরের পারের রাস্তা ধরে একটা লোক আসছে দেখা গেল। লোকটাকে দেখেই আমরা চুপ করে গেলাম এবং আলীমিঞা ডেকে শুধালেন "কে?" লোকটা "আমি" বলে ঘাটের উপর এল।

প্রশ্ন হল "লোকটাকে চিনতে পেরেছিলে?"

উত্তর এল "আজ্ঞে হ্যাঁ। ছ আনীর ম্যানেজার নবীন মুন্সী।"

প্রশ্ন হল "তার পর?"

উত্তরে গোলাপ মণ্ডল বলে যেতে লাগল যে নবীন মুন্সী অত রাত্রে আমাদের ঘাটের উপর বসে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল "আপনারা এত রাত্রে ঘাটে বসে?" আলীমিঞা নাকি উত্তর দিয়েছিলেন "একটা জমিদারী বিবাদের সালিসি করা হচ্ছে।" নবীন মুন্সী আর বিশেষ কিছু না বলে চলে গেল।

তারপর গোলাপ মণ্ডল নৌকা করে পলতায় রওনা ইত্যাদী সরকার পক্ষের গল্পটা পুনরাবৃত্তি করে গেল। তার গল্প শেষ হলে সরকারী উকীল আবার প্রশ্ন করলেন—

"এর জন্য কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলে?"

উত্তর হল "আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবু নিজের হাতে আমাদের ৫০৲ টাকা করে বখশীষ দিলেন।"

প্রশ্ন হল "কোথায়?"

উত্তর এল "বাবুর বাড়ীর পুকুরের উত্তরের পারের ঘাটে।"

প্রশ্ন, "কখন?"

উত্তর, "যেদিন পলতায় রওয়ানা হই সেই দিনই সন্ধ্যার সময়।"

প্রশ্ন, "সেখানে তখন কে কে ছিল?"

উত্তর, "বাবু, আলীমিঞা, আমি, নফর, মদন ও আর একটা বিধবা স্ত্রীলোক।"

প্রশ্ন, "তাঁকে তুমি চেন?"

উত্তর, "আজ্ঞে বাবুর বাড়ীতেই তাঁকে দেখেছি।"

প্রশ্ন, "তিনি কি করছিলেন?"

উত্তর, "তিনি ঘাটের পরে একটু দূরে বসেছিলেন।"

প্রশ্ন, "বাবু টাকা দেওয়ার সময় কিছু বলেছিলেন?"

উত্তর, "বললেন—আপাততঃ এই নাও, কাজ হাঁসিল হলে এর দশগুণ টাকা দেব।"

গোলাপ মণ্ডলের বক্তব্য শেষ হলে আমার পক্ষের ব্যারিষ্টার তাকে জেরা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই প্রথম প্রশ্ন করলেন

"তুমি কি জীবনে কখনও কাউকে খুন করেছ?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছ জীবনে কখনও?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "তোমাদের দেশে খুনে বা দাঙ্গাবাজ বলে তোমার কি কোনও রকম সুনাম বা দুর্ণাম আছে?

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "আলীমিঞার অধীনে কোন জমী রাখ?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "আলীমিঞার কাছে কি টাকাকড়ি ধার ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "তুমি হিন্দু, আলীমিঞা মুসলমান। আলীমিঞার সঙ্গে জীবনে কোনও দিন কোনও কাজে লিপ্ত হয়েছিলে ?"

উত্তর, "এইবার একসঙ্গে গিয়েছিলাম পলতায়।"

প্রশ্ন, "এর আগে কোনও দিন ?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "খুনে বা দাঙ্গাবাজ বলে তোমার কোনও সুনাম নাই, আলীমিঞার সঙ্গে কোনও বাধ্য বাধকতাও নাই, কখনও একসঙ্গে কোনও কাজও কর নাই, হঠাৎ আলীমিঞা এত বড় খুনের ষড়যন্ত্রে তোমাকে কেন ডেকে নিলেন এর কোনও কারণ দেখাতে পার ?"

উত্তর, "আলীমিঞাই জানেন।"

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে জেরা করা হল। মোটের উপর জজসাহেবকে এবং জুরীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হল যে মকোদ্দমার যে কাহিনী সাক্ষী তাঁদের সামনে বলে গেল, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা —একটা শেখান গল্প। ছ-আনীর জমিদার মুকুন্দ সাহার সঙ্গে জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার ও আলীমিঞার গুরুতর বিবাদ থাকার দরুন পুলিশের সঙ্গে সে এবং তার ম্যানেজার নবীন মুন্সী এই মিথ্যা মকোদ্দমাটা সাজিয়েছে। এক কথায় আমাদের পক্ষের ব্যারিষ্টার জেরার প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে খুনের ষড়যন্ত্রের গল্পটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমি,—সুশান্ত—কোনও ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত ছিলাম না; আলীমিঞা লোকজন নিয়ে পলতায় গিয়েছিলেন ছেলেটাকে নিয়ে আসার জন্য, কেননা ছেলেটার লেখাপড়া শেখবার বয়স হয়েছে অথচ আমার অর্থাৎ সুশান্তর বিশেষ অনুরোধ ও চেষ্টা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী কিছুতেই তাকে আমার কাছে পাঠাতে রাজী হননি। তাই আলীমিঞা ২।৩ জন লোক নিয়ে পলতায় গিয়েছিলেন, একটু ভয় দেখিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসার জন্য আর কোনও উদ্দেশ্যে নয়। এবং ঘটনার দিন রাত্রে ছেলেটাকে নিয়ে আসার সময় বড়বাবু অর্থাৎ—আমার দাদা বাধা দেওয়ার মানসে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করতে এলে, নফর নয়, সাক্ষী গোলাপ মণ্ডলই আত্মরক্ষা করার জন্য লাঠীর আঘাতে দাদাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়—আলীমিঞা বা নফরের এ ব্যাপারে কোনই হাত ছিল না বা তাদের কোনও রকম প্ররোচনায় বা সম্মতিক্রমে এ ঘটনা ঘটে নাই।

জেরা করতে করতে এক সময় হঠাৎ আমাদের ব্যারিষ্টার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"ঐ যে ভদ্রলোকটী সরকারী উকিলবাবুর ঠিক পিছনে চেয়ারে বসে আছেন, ওঁকে চেন ?"

উত্তর হল "হাঁ"।

প্রশ্ন, "কে উনি ?"

উত্তর, "উনি ছ-আনীর জমিদার মুকুন্দ বাবু।"

প্রশ্ন, "উনি এ মকোদ্দমায় সরকার পক্ষের তদ্বির করেছেন—কেমন ?"

উত্তর, "তা জানিনা।"

প্রশ্ন, "দেখতেই ত পাচ্ছ সরকার পক্ষের উকিলবাবুর পিছনে বসে আছেন, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছেন—পাচ্ছ ত ?"

উত্তর, "তা জানিনা।"

প্রশ্ন, "কি জাননা ?"

উত্তর, "উনি এ মকোদ্দমায় তদ্বির করছেন কিনা জানিনা।"

প্রশ্ন, "সে কথা ত আমি এখন তোমায় জিজ্ঞেসা করছি না। আমার আপাততঃ প্রশ্ন হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা—উনি সরকার পক্ষের উকীলবাবুর পিছনে বসে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে চুপি চুপি পরামর্শ করছেন ?"

উত্তর, "জানি না।"

প্রশ্ন "তুমি যা চোখের সামনে দেখছ তাও জাননা ?"

উত্তর, "আজ্ঞে জানিনা।"

যাইহোক, নানান বিষয় নানান রকম প্রশ্ন করার পর আমাদের ব্যারিষ্টার তাঁর জেরার শেষের দিকে সাক্ষীকে শুধালেন—

"যখন খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তখন বুঝতে পেরেছিলে তুমি একটা অন্যায় কাজ করছ ?"

উত্তর, "কি করব বলুন, জমিদারের অনুরোধ এড়াই কি করে।"

একটু ধমকের সুরে প্রশ্ন হল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি বুঝতে পেরেছিলে কিনা যে অন্যায় কাজ করছ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "খুনের শাস্তি ফাঁসী—এটাও জানতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে এখানে যে গল্পটী বলেছ এসব কথা প্রথম তুমি কাকে বল?"

উত্তর, "মনে নাই।"

প্রশ্ন "কতবার ক জায়গায় বলেছ সেটা তোমার মনে আছে?"

উত্তর, "না"।

প্রশ্ন, "অনেকবার বলেছ, বারে বারে বলেছ—কেমন?"

উত্তর, "মনে নাই।"

প্রশ্ন, "এখানে বলেছ, নিম্ন আদালতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছ—এর আগে আর এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পুলিশ তোমাকে স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করাবার জন্য নিয়ে যায়, তাঁর কাছে বলেছ কেমন?

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "তার আগে পুলিশের কাছেও বলেছ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "বরাবর সত্যকথা বলে এসেছ?"

উত্তর, "আজ্ঞে সত্যকথা বলেছি।"

প্রশ্ন, "প্রথম পুলিশের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করেছিলে না নিজেকে বাঁচিয়ে অন্য গল্প বলেছিলে?"

উত্তর, "আজ্ঞে বরাবর সত্য কথা বলেছি?"

প্রশ্ন, "প্রথম থেকেই নিজের দোষ স্বীকার করেছ কেমন?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "পুলিশ তোমাকে ভয় দেখিয়ে স্বীকার করিয়েছিল?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "পুলিশ তোমার উপর কোনও রকম অত্যাচার করেছিল?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "মুকুন্দ বা তার কর্ম্মচারী নবীন মুন্সী তোমাকে কোনও রকম ভয় দেখিয়েছিল বা তোমার উপর কোনও রকম অত্যাচার করেছিল?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "পুলিশ তোমাকে কোনও প্রলোভন দেখিয়েছিল—সত্যকথা বললে তোমাকে ছেড়ে দেব বা ঐ রকম কিছু?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "মুকুন্দ বা নবীন মুন্সী তোমাকে কোনও প্রলোভন দেখিয়েছিল?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "তবে কেন সব স্বীকার করেছিলে?"

উত্তর, "সত্য কথা বলেছি।"

প্রশ্ন, "কেন? হঠাৎ সত্য কথা বলার এ প্রবৃত্তি তোমার হ'ল কেন? স্ব ইচ্ছায় শাস্তি নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল কি?"

উত্তর নাই।

প্রশ্ন, "তুমি জানতে তোমার কথা যদি সত্য হয় তোমার ফাঁসী হতে পারে, তবুও তুমি কেন স্বীকার করেছিলে এর কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পার?

উত্তর নাই।

ধমকের সুরে প্রশ্ন, "উত্তর দাও। কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পার—কেন স্বীকার করেছিলে?"

অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উত্তর এল, "না"।

প্রশ্ন, "আমি বলি পুলিশ, মুকুন্দ ও নবীন মুন্সীর সহযোগে এই সব কথা তোমাকে শিখিয়েছে, প্রলোভন দেখিয়েছে যে এসব কথা বললে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে—কেমন?"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর, "না।"

গোলাপ মণ্ডলের জেরা শেষ হল। মনে একটা আশা হল যে হয়ত এর কথা জুরীরা বিশ্বাস করবে না। এ লোকটি যে মোটের উপরে একটা শেখান গল্প বলেছে—এটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল আমার পক্ষের ব্যারিষ্টারের জেরায়। আকুল নয়নে জুরীদের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম তাদের মধ্যেও নীচু গলায় চুপি চুপি আলোচনা চলেছে—নিশ্চয়ই সাক্ষীর কথা নিয়ে। হরিশের দিকে চাইলাম, দেখলাম হরিশ আমাদের ব্যারিষ্টারের সঙ্গে গোপনে গভীর পরামর্শে ব্যস্ত।

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকা হল—নবীন মুন্সী। নবীন মুন্সী নিম্ন আদালতে অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাক্ষী দিয়েছিল, তাই সে যে কি কথা বলবে—আমি সবই

জানতাম। জানতাম যে সে প্রথম সাক্ষীর ষড়যন্ত্রের গল্পের পোষকতায় ঘাটের পারে একদিন রাত্রে আমাদের দেখেছিল সেই কথাই হলপ নিয়ে বলতে এসেছে।

নবীন মুন্সীকে হলপ দেওয়া হল। সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তরে সে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যা যা বলেছিল সব কথাই বলে গেল। কেবলমাত্র আমার কথায় বলে গেল—অন্ধকারে ঘাটের পারে সে আমাকে ঠিক চিনতে পারেনি, তাই হলপ নিয়ে বলতে পারে না আমি সেই ষড়যন্ত্রে ঠিক ছিলাম কিনা।

সত্য সত্যই অবাক হলাম। কথাটা নতুন এই দায়রা আদালতেই সে প্রথম বলল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও সে স্পষ্ট বলে গিয়েছিল যে সে আমাকে ঘাটের পরে দেখেছিল। নবীন মুন্সীর হঠাৎ আমার উপর এ করুণার যে কি কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে আশ্চর্য্য হয়ে নবীন মুন্সীর দিকে চেয়ে রইলাম।

সরকারী উকীল ধমক দিয়ে তার হলপের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে বারে বারে প্রশ্ন করাতেও কোনই ফল হল না। সে দায়রা আদালতে নিজের কথা ঠিকই রেখে গেল—এতটুকুও এদিক ওদিক হল না।

সরকারী উকীল জজ সাহেবকে তখন কি যেন একটা কথা বললেন—ঠিক শুনতে পাইনি। জজসাহেব তখন নবীন মুন্সীকে প্রশ্ন করলেন—

"তুমি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একথা বলেছিলে যে আসামী সুশান্ত সাহা সেদিন রাত্রে ঘাটের পরে ছিলেন।"

উত্তর, "আজ্ঞে না, ঠিক ও কথা ত বলিনি।"

প্রশ্ন, "সেই কথা তুমি বলেছিলে বলে লেখা রয়েছে।"

উত্তর, "তাহলে ভুল লেখা হয়েছে। আমি বলেছিলাম—হতে পারে সুশান্তবাবু সেদিন রাত্রে সেখানে ছিলেন।"

প্রশ্ন, "তুমি তাঁকে চিনতে পারনি?"

বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যা লেখা হয়েছে তা পড়ে, ঠিক লেখা হয়েছে বলে তুমি সই করেছিলে?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ইংরাজী ত আমি ভাল জানি না হুজুর। আমাকে মনে করে যা বুঝিয়ে দিয়েছিল আমি ঠিক বলে তাই সই করেছিলাম।"

জজসাহেব আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

আমাদের ব্যারিষ্টার প্রায় এক ঘণ্টা নবীন মুন্সীকে জেরা করলেন। বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তার সাক্ষী সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথম সাক্ষীর কথার পোষকতায় প্রমাণের দরকার, নতুবা আইন অনুসারে তার কথা বিশ্বাস করা চলে না—তাই নবীন মুন্সী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে প্রথম সাক্ষীর কথার পোষকতায় প্রমাণ দিতে এসেছে।

ব্যারিষ্টারের জেরার দিকে আমার তখন মন ছিল না। কেবল ভাবছিলাম—নবীন মুন্সী আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গেল কেন? হঠাৎ আমার উপর তার এ করুণার কারণটা কি? নবীন মুন্সী, সেই আমার চিরদিনের শত্রু নবীন মুন্সী তারই আত্মীয় মনিব মুকুন্দ সরকার পক্ষের সকোদমার তদ্বির করছে, সশরীরে কোর্টে উপস্থিত—অনেক ভেবেও কিছুই বুঝতে পারলাম না। শেষ পর্য্যন্ত হরিশকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "হরিশ! নবীন মুন্সী আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গেল কেন বলত?" হরিশ একটু হেসে চুপি চুপি আমাকে বললে "বলেছে কি আর সাধে। দু হাজার টাকা খাওয়াতে হয়েছে। যাক, এইবার তোমার বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বোধ হয়। প্রথম সাক্ষীর কথার পোষকতায় তোমার সম্বন্ধে আর ত কোনও প্রমাণ নাই।"

শুধালাম "তার মানে কি?"

হরিশ বললে, "আইন বলে approver অর্থাৎ যে নিজেই দোষী তার সাক্ষ্যর পোষকতায় ভাল প্রমাণ না থাকলে, কেবলমাত্র তার কথার উপর বিশ্বাস করে কোনও আসামীকেই দোষী বলা চলে না। ওরকম লোকের কথা যে সত্য তারই বা বিশ্বাস কি?"

ব্যাপারটা বুঝলাম। মনে মনে নবীন মুন্সীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম কি না জানি না তবে মুক্তির আশায় মনে মনে যে খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম সে বিষয় সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সাক্ষী ডাকা হল—তুষারবালা। সমস্ত আদালতে একটা চাপা চাঞ্চল্যের ঢেউ যেন গেল বয়ে—বারে বারে এসে লাগতে লাগল আমার অন্তরের প্রত্যেক শিরায় শিরায়।

জজসাহেব ঘড়ীর দিকে চাইলেন—দেখা গেল বেলা সাড়ে চারিটা বেজে গেছে। জজসাহেব সেদিনকার মতন বিচার বন্ধ করে, পরের দিন বেলা ১০টায় বিচার শুরু হবার হুকুম দিয়ে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তুষারবালার সাক্ষ্য সেদিন আর নেওয়া হল না।

* * *

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সন্ধান

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

তুমি আছ সবখানে
সে কথা হ'য়েছে শেখা ;
তবু কই মন মানে—
এখনো হোলো না দেখা !

দিনের প্রখর আলো
আঁখিতে লাগায় ধাঁধা ;
দীপশিখা কে নিভালো,
কে রচিল এত বাধা ?

আমার বেদনা ঘিরে
কোন্ মায়ামন্ত্র বলে,
নিশীথের বুক চিরে
হাজার তারকা জ্বলে।

সেথায় জাগিব একা,
তখন কি হ'বে দেখা ?

বাণী

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

তোমার আশায় বসে থাকিনি,
ভুলেছি তোমারে কত না কাজে ;
পশেনি শ্রবণে কত রাগিণী
অন্তর তলে গোপনে বাজে !

ঘোর ঘর্ঘরে কেটেছে দিন,
ক্লান্তি এনেছে আঁধার রাতি ;
একেলা জাগিয়া তন্দ্রাবিহীন
বৃথাই কেঁদেছি খুঁজিয়া সাথী।

ঠেলিয়া মানুষে রোষে ঘৃণায়
বসানু তোমারে বক্ষে আনি ;
দয়াময় ! মম আরাধনায়
শুনিনু তোমার স্নেহের বাণী :

"অবুঝ ! নিজেরে দিস্ নে ফাঁকি,
মানুষেরি হৃদে আমি যে থাকি।"

সৃষ্টি

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

তোমার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আমার এ প্রাণ চাহে আপনারে দিতে ছড়াইয়া,
সম্মুখে পশ্চাতে হেরি সুদূর দিগন্তপারে অগণিত দিগন্তবিস্তার,
ঊর্দ্ধে নিম্নে আঁখি ধায় আরো ঊর্দ্ধে আরো নিম্নে,—দিশাহারা অনন্ত বিথার,
আদি অন্ত শীর্ষ তল সব সীমা আত্মহারা একাকার অসীমে মিশিয়া!

আমার এ বর্ত্তমান মহাকালরথে তব যুগ যুগ চলে বিরচিয়া,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা অবিশ্রান্ত চক্রে, মম হিয়ার অর্গল দেয় টুটি,
মোর দুটি আঁখিতারা সহস্র নক্ষত্ররূপে আঁধারের গায়ে ওঠে ফুটি,
তোমার প্রোজ্জ্বল জ্যোতি অন্ধকার নাশি মম অন্তরে উঠিল বিচ্ছুরিয়া।

হারাই সম্বিৎ; হেরি ধরিত্রীর গিরি-গাত্র সুবর্ণ আলোকে ওঠে জ্বলি,
ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে মাঠ বন উপবন রঙে রঙে নিত্য ওঠে রাঙি,
উন্মাদিনী স্রোতস্বিনী ছুটে চলে অবিরাম ছল ছল দু'কূল উচ্ছলি,
বেলাভূমি সমুদ্রের আছাড়িয়া ঊর্মিমালা আপন-লীলায় পড়ে ভাঙি।

চিরন্তন এই লীলা নিত্য নব; মহাকাল প্রতিটি নিমেষে তাই ভরা,
তোমার অনন্তসৃষ্টি অপার বিস্ময়ে মম ক্ষুদ্র প্রাণে আসি দেয় ধরা।

———

STUDENTS' A.C. COMMON ROOM

গীতায় শাস্ত্রবিধি

শ্রীঅনিলবরণ রায়

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার "গীতা ও শাস্ত্র" প্রবন্ধের যে উত্তর দিয়াছেন সেইটি নানাদিক দিয়া বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। বিষয়টি গুরুতর, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ইহা জীবনমরণ সমস্যা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অতএব আশা করি এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিলে "বিচিত্রা"র সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। হিন্দু সমাজ আজ নানা অপ্রথা ও কুপ্রথায় জর্জ্জরিত। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবস্থা অপেক্ষা শোচনীয় সামাজিক দুরবস্থা অন্য কোন সভ্য মানব সমাজে নাই, হইতেও পারে না।" বাংলার হিন্দুদের মধ্যে শতে ১৩ জন মাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি, ষোলজন নবশাখ ও সচ্ছুদ্র, বাকী সব তদধম ও "ছোট লোক"। তাহাদের অনেকেরই জল আচরণীয় হওয়া ত দূরের কথা, স্পৃশ্য নহে। অনেকের ছায়া মাড়াইলেও নাকি স্নান করিতে হয়। মনুষ্যত্বের এই অপমানে এই সব "ছোট" জাতির হৃদয় কিরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ আর কাহাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। দলে দলে লোক মুসলমান হইয়াছে ও হইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে হিন্দু ছিল শতকরা ৫৫, মুসলমান ৪৫, এখন ইহার ঠিক বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা এখনও মুসলমান হয় নাই তাহারাও আইন সভায় মুসলমানদের সহিত যোগ দিয়াছে, বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে। সেদিন ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দুদিগকে মোমবাতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহার একদিকে জ্বলিতেছে মুসলমান, আর একদিকে জ্বলিতেছে খ্রীষ্টান। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্য বিবাহ, বিধবানিগ্রহ, স্ত্রী-অবরোধ প্রভৃতি যে সব কুপ্রথার জন্য হিন্দুসমাজ আজ জগতের সকল সভ্য সমাজের নিকট হেয় হইয়াছে, এবং হিন্দুদের নিজেদের কন্যাদায়, অন্নাভাব প্রভৃতি দুর্দ্দশার চরমতম অবস্থা হইয়াছে, ঠিক সেইগুলিকেই আজ এক শ্রেণীর হিন্দু সনাতনধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং নিজদিগকে বর্ণাশ্রমী, সনাতনী বলিয়া আত্মগৌরব লাভ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর "সনাতনী" হিন্দুদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি তাঁহার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া অতি উৎসাহের সহিত এই মত সমর্থন করিতেছেন। তাঁহার "গীতার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে তিনি যে-সব যুক্তিতর্কের উত্থাপন করিয়াছেন সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় যে এই মতের মধ্যে সত্য ও সারবস্তু কতখানি আছে। বসন্তকুমারের যুক্তিটি সংক্ষেপে এই, গীতা বলিয়াছে শাস্ত্রই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রমাণস্বরূপ। মনুসংহিতা শাস্ত্র। অতএব মনুসংহিতাতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাই প্রামাণ্য এবং অনুসরণীয়। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে তুলিয়া দিয়াছেন মনুর সকল ব্যবস্থা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, বসন্তকুমারের এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, এই যুক্তির মধ্যে কতগুলি গলদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, গীতা যে বলিয়াছে শাস্ত্র প্রামাণ্য তাহা সকল অবস্থায় প্রযুজ্য নহে, ঠিক পরের শ্লোকেই গীতা কোন অবস্থায় শাস্ত্র লঙ্ঘন করা চলে তাহাও বলিয়া দিয়াছে, আর গীতার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরম শিক্ষা তাহা হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে যেখানে যত কিছু বিধিবিধান আছে সব বর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অতএব গীতার অন্যান্য অংশের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয়, গীতা যে বলিয়াছে শাস্ত্র প্রমাণ ইহা

কেবল একটি বিশেষ অবস্থায় প্রযুজ্য, সকল ক্ষেত্রেই নহে। দ্বিতীয়তঃ, গীতা শাস্ত্র বলিতে কোন বিশেষ শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করে নাই। বসন্তকুমার বলিয়াছেন শাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি বুঝায়, অতএব গীতার অর্থ তাহাই বুঝিতে হইবে। বসন্তকুমারের একথা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, গীতা যে উদ্দেশ্যে শাস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে ইহার অর্থ প্রসারিত করিয়া ইহার মধ্যে বাইবেল, কোরাণ বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করিলে গীতার বক্তব্যের কোন হানি হয় না, এবং এইটিই গীতার বৈশিষ্ট্য। যদিও ইহা হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুদের জন্যই প্রচারিত হইয়াছিল, তথাপি ইহার শিক্ষা সকল দেশের, সকল সমাজের পক্ষেই উপযোগী। যজ্ঞ সম্বন্ধে গীতার শিক্ষা এই বিষয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত। গীতা বলিয়াছে যজ্ঞ করিতে হইবে। এখানে যজ্ঞ বলিতে যদি কেবল বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বুঝা যায় তাহা হইলে এখনই গীতাকে আমাদের জীবন হইতে বিদায় দিতে হয়, কারণ সে-সব বৈদিক যজ্ঞ এই ভারতবর্ষ হইতেই বহুপূর্ব্বে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু গীতা যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহার করিলেও ইহার উদার অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, সে অর্থে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রক্তপাতও যজ্ঞ, যে-কোন কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে ভগবানে ফলাফল অর্পণ করিয়া করা যায় তাহাই যজ্ঞ, আর গীতার এই শিক্ষা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য।

বেদে আছে মনুর কথা ঔষধতুল্য উপকারী। এই মনু নিশ্চয়ই বৈদিক যুগের সমসাময়িক অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু বর্ত্তমান মনুসংহিতার ভাব, ভাষা, চিন্তাধারা, রচনা-প্রণালী প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে মনুসংহিতা বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, মনুসংহিতার রচনাকাল খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতকের মধ্যে। বেদের রচনাকাল ইহার অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। বস্তুতঃ পক্ষে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রগুলি শুধু নামেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য; উহারা এই সব বৈদিক ঋষির দ্বারা রচিত হয় নাই, পরবর্ত্তী সমাজকর্ত্তাগণ নিজেদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিধি বিধান প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য মনু প্রভৃতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩৩৬ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, স্বায়ম্ভুব মনু প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে। নারদ সংহিতাতে আছে যে, ভগবান মনু লক্ষ সংখ্যক শ্লোকে যে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পর তিনবার নূতন করিয়া মনুসংহিতা রচিত হইয়াছে, অতএব, বেদে যে বলা হইয়াছে মনু যাহা বলিয়াছেন সবই ভেষজ তুল্য এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান মনু-সংহিতার যাহা কিছু আছে সবই প্রামাণ্য বলা এই যুক্তিতে সারবত্তা কিছুই নাই। বসন্তকুমারের সকল যুক্তিই এইরূপ দুর্ব্বল।

শ্রীকৃষ্ণ মুখে শাস্ত্র মানিতে বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে শাস্ত্র মানিতে হইবে না—বসন্তকুমারের মতে এইটিই ছিল আমার "গীতা ও শাস্ত্র" প্রবন্ধের বক্তব্য। আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, এক বসন্তকুমার ব্যতীত আমার এ প্রবন্ধের এইরূপ অদ্ভুত অর্থ আর কোন পাঠকেরই মনে উদিত হয় নাই।

গীতার সাধনায় স্তরভেদ আছে, যে শিক্ষা এক স্তরে প্রযুজ্য তাহা আর এক স্তরে প্রযুজ্য নহে, এই কথাটি স্মরণ না রাখিলে গীতার কথার মধ্যে নানা বিরোধ রহিয়াছে মনে হইতে পারে। গীতায় প্রথমে অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়লাভ করিলে রাজ্যভোগ করিবে, অতএব যুদ্ধ কর—এখানে স্পষ্টই ফলের আশায় কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে। আর এক স্থলে বলা হইয়াছে, কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে কোন অধিকার নাই, অতএব ফলের আশায় কোন কর্ম্ম করিও না। আবার আর এক স্থলে বলা হইয়াছে কর্ম্মেও তোমার অধিকার নাই, প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে, যাহারা মনে করে "আমি কর্ম্ম করিতেছি" তাহারা মূঢ়। যাহারা তামসিক অবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহাদিগকে ফলের আশা দেখাইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হয়। অর্জ্জুনের প্রথমে সেই অবস্থাই হইয়াছিল। তাহার পর ফলের আশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হয়। এই ভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, তখন "আমি কিছুই করিতেছি না, ভগবান আমার

প্রকৃতিকে যন্ত্র করিয়া আমার ভিতর দিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতেছেন” এই ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাই গীতার শিক্ষার ক্রম। ঠিক এই ভাবেই গীতা শাস্ত্রবিধি পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছে। যখন ইন্দ্রিয়গণ প্রবল, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ উদ্দাম, তখন তাহাদিগকে সংযত করিবার জন্য বাহ্যিক কোন বিধি নিষেধ অনুসরণ করা আবশ্যক—এবং এইখানেই শাস্ত্র অনুসরণের উপযোগিতা। যখন রিপুগণ সংযত হইয়াছে, চিত্ত শান্ত ও নির্ম্মল হইয়াছে, তখন বাহির হইতে নির্দ্দেশ গ্রহণ না করিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী অনুসরণ করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। বসন্তকুমার এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন, “অনেক সময় মানব যাহা ভিতর হইতে অনুপ্রেরণা মনে করে তাহা তাহার আসক্তি বা বিদ্বেষপ্রসূত। বিদ্বান ব্যক্তিরও আসক্তি ও বিদ্বেষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করা অতিশয় দুরূহ।” কিন্তু দুরূহ হইলেও যোগ সাধনার দ্বারা এইরূপ মুক্তিলাভ করা যায় এবং তাহাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

“বেদাঃ বিভিন্না; স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ” এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া আমি দেখাইয়াছিলাম যে শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চরম মীমাংসা হয় না। বেদ ও স্মৃতির মধ্যে নানা বিরোধ রহিয়াছে এইরূপ উপলব্ধি যতদিন না হয় ততদিন শ্রদ্ধার সহিত যে কোন শাস্ত্র মানিলেই চলিতে পারে। কিন্তু যখন ঐরূপ বিরোধ দেখা যায়, শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা থাকে না, তখন আর অন্ধভাবে গতানুগতিক ভাবে তাহার অনুসরণ করা ঠিক নহে। বসন্তকুমার বলিয়াছেন, বেদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না, কিন্তু না থাকিলেও আমার বুদ্ধি যদি সব সমন্বয় করিতে না পারে তাহা হইলে আমি কি করিব? ঠিক এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই মহাভারতে ঐ শ্লোকটি কথিত হইয়াছে। বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, নানা মুনির নানা মত, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাঁহাই পন্থা। এখানে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা পন্থা নির্ণয় হয় না। বসন্তকুমার কূট তর্কের দ্বারা মহাভারতের এই শ্লোকটির সহজ সরল সুস্পষ্ট অর্থকে উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বিভিন্ন আইন আছে, এক আইনের অনেক ধারা আছে—আমি কোন আইন মানিয়া চলিব? এইরূপ আপত্তি যেমন চলে না, বিভিন্ন শাস্ত্র আছে বলিয়া শাস্ত্র মানিব না এরূপ আপত্তিও চলে না। বসন্তকুমারের এই দৃষ্টান্তটি ঠিক হয় নাই। যদি এক দেশে Penal code তিন রকম থাকে, Civil code পাঁচ রকমের থাকে—তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বলিবার অধিকার থাকে যে, এরূপ ক্ষেত্রে আইন মানিয়া চলা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। বস্তুতঃ আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এইরূপই বিভিন্ন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী “দৈনিক বসুমতী”তে “স্মৃতিশাস্ত্র ও দেশাচার” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “কালক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয়ের মধ্যে কোন একটি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কাজেই এখন আর মিল হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ও আপস্তম্ব-সংহিতা মিলাইয়া দেখিলে এ ধারণার দৃঢ়তা ঘটিবে। তারপর স্মৃতি-সংগ্রহকার রঘুনন্দন, হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির যে সকল গ্রন্থকে আমরা স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া জানি ও মানি, সেই সকল গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই পরস্পর-বিরোধী। ইহাদিগের গ্রন্থে এমন অনেক শ্লোক আছে—যাহাদের মূল কোথায় তাহার সন্ধান একেবারে পাওয়া যায় না; এমন কি, যে সংহিতার নাম করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সংহিতায় তাহা আদৌ পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত একের উদ্ধৃত শ্লোক অন্য কেহ অমূলক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে না।” বসন্তকুমার কি বলেন?

শ্রুতি ও স্মৃতি যতই সত্য হউক না কেন, তাহাদের ব্যাখ্যা এত লোকে এত প্রকারে করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন যে, তাহাদের দ্বারা মানুষের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া উঠিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বসন্তকুমার বলিয়াছেন, আপাতবিরোধী বেদবাক্যের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া করিতে হয় মীমাংসা দর্শনে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, মীমাংসা দর্শনের মীমাংসা শঙ্কর গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তাহা হইলে সে মীমাংসা সাধারণ লোকে কেমন করিয়া মানিবে? শাস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে যাইয়া মানুষের বুদ্ধি যে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে একথা গীতায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ (২।৫৩)। বসন্তকুমার হয়ত বলিবেন, এখানে "শ্রুতি" শব্দে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদ না বুঝিয়া অন্য কিছু বুঝিতে হইবে। কিন্তু গীতার নানাস্থানে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

মহাভারতের উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা পন্থা নির্ণয় করা দুরূহ, মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ। গীতাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছে, "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন অন্যান্য লোকে তাহাই করে। তিনি যে আদর্শ দেখান, লোকে তাহাই অনুসরণ করে।" (৩।২১) আর শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে নিজেকেই এইরূপ আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তবু আমি কর্ম্ম করি, অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম্ম করিয়া আমি লোক সকলকে কর্ম্ম মার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখি।" অতএব বসন্তকুমার যে গীতার একটি শ্লোককে (১৬।২৪) গীতার অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাতে আপনি পূর্ণ একটি সত্য বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, গীতার অর্থ এইভাবে করিলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। গীতার অন্যান্য অংশ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ মিলাইয়া এই বিষয়ের সার সিদ্ধান্ত এই হয়,—যতক্ষণ তোমার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় নাই, আসক্তি ও বিদ্বেষ দূর হয় নাই, ততক্ষণ তোমার ভিতরে যে প্রেরণা আসিবে তদনুযায়ীই কর্ম্ম না করিয়া কোন বাহ্য আদর্শ মানিয়া চলিবে, আর শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ বিধিনিষেধের আদর্শ লিপিবদ্ধ আছে। যদি শাস্ত্র হইতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পার, সংশয় দূর না হয়, তাহা হইলে যে সকল মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা যে পথ দেখান তাহাই অনুসরণ করিবে। এইভাবে কর্ম্ম করিয়া যখন চিত্ত শুদ্ধ হইবে, তখন তুমি নিজের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের বাণী শুনিতে পাইবে, তখন তুমি সকল শাস্ত্রের উপরে উঠিবে, শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে (৬।৪৪)। হৃদয় হইতে বেদের উৎপত্তি, একথা বেদের মধ্যেই আছে, সদনাৎ ঋতাখ্য গুহায়াম্। বেদ সনাতন সত্য, কিন্তু সে সত্য দৃষ্ট হয় শুদ্ধ হৃদয়ের মধ্যে; ঋষিরা এই ভাবেই বেদের সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান বলিয়াছেন, আমি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, আমা হইতেই সকল স্মৃতি ও জ্ঞান উদ্ভূত (গীতা ১৫।১৫) যে কেহ এই হৃদিস্থিত ভগবানের সহিত যুক্ত হইবে, সেই সত্য সকল দর্শন করিবে। কেবল বৈদিক ঋষিরাই সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, আর বেদে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহা ছাড়া আর কোন সত্য দেখিবার বা জানিবার নাই—এরূপ কথা বলা গোঁড়ামি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমি বলিয়াছি, তিন প্রকার শাস্ত্র লঙ্ঘন করিবার কথা গীতায় আছে। কোথায় ইহা আছে তাহা বলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও বসন্তকুমার গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৭,৮,৯ শ্লোক ধরিয়া এ বিষয়ে অনেকখানি অবান্তর আলোচনা করিয়াছেন। গীতা ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে যথেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছে, আর ঠিক তাহার পরে সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যথেচ্ছাচারিতার বশে নহে, পরন্তু শ্রদ্ধার সহিত যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করেন তাহাদের সেই নিষ্ঠার স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন যে, তাহাদের শ্রদ্ধা তামসিকও হইতে পারে, রাজসিকও হইতে পারে, আবার সাত্ত্বিকও হইতে পারে। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি এই শ্লোকটিই ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লইয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা যায় ইহা গীতার অভিমত। তাহার পর আমি মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাঁহারা শাস্ত্রবিধিকে সম্মান করিলেও প্রয়োজন মত তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমি প্রথম দৃষ্টান্ত দিয়াছি হিন্দুর পরম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের। বসন্তকুমার এই প্রসঙ্গে রাসলীলার কথা উত্থাপন করিয়াছেন, উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে উহা কি মানবের কর্ত্তব্য? শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রী লইয়া ব্যাভিচারে রত হইয়াছিলেন, রাসলীলার এই ব্যাখ্যার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের যে কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। বসন্তকুমারের ন্যায় বিদ্বান ও বিচক্ষণ

ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সকল সাধক মহাপুরুষই বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হইতেছে একটি পরম কবিত্বময় শক্তিশালী রূপক, ভগবানের সহিত জীবের যে একান্ত আত্মসমর্পণ ও প্রেমের সম্বন্ধ, যাহার দ্বারা এই স্থূল রক্ত-মাংসের শরীরের প্রতি কোষে দিব্যতম অধ্যাত্ম আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়, রাসলীলা হইতেছে তাহারই স্থূল রূপক। বস্তুতঃ মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ মানবীদিগকে লইয়া ব্যভিচার করেন নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবজীবনের যে ইতিহাস আছে তাহাতে কোথাও রাসলীলার উল্লেখ নাই, আর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজের আচরণকেই মানবের পক্ষে আদর্শস্বরূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমরা উপরে দেখিয়াছি। বসন্তকুমার বলিয়াছেন, অবতারের আচরণ অনুকরণীয় নহে, তাঁহার আদেশই পালনীয়। কিন্তু তাহা হইলে ভগবানের মানবদেহ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে, মানবদেহ গ্রহণ না করিয়াও তিনি আদেশ দিতে পারেন, যেমন বেদাদি শাস্ত্রে আছে। এই জড়দেহই যে ভাগবত চৈতন্যের আধার হইতে পাবে, মানবদেহ, প্রাণ মনই দিব্য শান্তি, শক্তি, জ্যোতি ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতে পাবে, মানুষ ভাগবত জীবনের মধ্যে উঠিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য ভগবান মানবদেহ, প্রাণ, মন লইয়া অবতীর্ণ হন, তাঁহার এই দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম যাহারা জানেন তাঁহারাই অবতারের আগমনের পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন (গীতা—৪।৯)।

মহাপুরুষরা যে শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন, তাহাই আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছি, কিন্তু তাহার ফলাফল কি হয় তাহা এ প্রসঙ্গে অবান্তর হইলেও বসন্তকুমার সেই আলোচনা করিয়া গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বেদবিরোধী মত প্রচার করাতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, ইহাই বসন্তকুমারের বক্তব্য। কিন্তু ইতিহাস ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিতেছে। বৈদিক ধর্ম্মের মর্ম্ম ভুলিয়া মানুষ যখন কতকগুলি গতানুগতিক আচারকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করিতেছিল, সেই সময় বুদ্ধদেব আসিয়া নূতন অধ্যাত্মশক্তির সঞ্চার করিলেন। তাহার পর ভারতীয় জাতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে সকল দিকে যে উন্নতি করিয়াছিল ভারতের ইতিহাসে সেরূপ ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি আর কখনও দেখা যায় নাই—বস্তুতঃ ঐটিই হইতেছে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। আলেকজেণ্ডার ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেন। তাহার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক বিজয়ের সমস্ত চিহ্ন ভারত হইতে মুছিয়া দেন, চাণক্যের সাহায্যে যমুনা উপত্যকা হইতে পারস্য, সিন্ধু মোহনা হইতে মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য বিভিন্ন বংশের অধীনে এক সহস্র বৎসর ধরিয়া যে শক্তি ও সমৃদ্ধি দেখাইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে, আর কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে না। যখন আচার্য্য শঙ্কর আসিয়া লক্ষ্মীকে ছেঁড়া কাঁথার ন্যায় নিন্দা করিতে বলিলেন, এবং প্রাচীন বর্ণাশ্রমের নামে হিন্দু সমাজকে অসংখ্য বিধিনিষেধের কঠিন নিগড়ে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলেন সেইদিন হইতেই ভারতের লক্ষ্মী ছাড়িল, বসন্তকুমার ইতিহাস মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, এই কথার উত্তরে বসন্তকুমার তাঁহাদের শাস্ত্র অনুসরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে, তাঁহারা একেবারেই শাস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারাও শাস্ত্র মানিতেন, কিন্তু নিজেদের অধ্যাত্ম বিকাশের প্রয়োজনে যেখানে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করিয়াছেন তাহা করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন নাই। বসন্তকুমার বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতেছেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্পষ্ট ভাষায় কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি শঙ্কর ও চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসন্তকুমার বলিতেছেন, "কলিতেও সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত এইরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল।" স্পষ্ট শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের বিশ্বাস মত চলিলে, আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কি স্বীকার করা হইল না? যতদিন বর্ণবিভাগ লোপ না পায় ততদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়,

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই মত হইলে নিশ্চয়ই তাহা ঐ স্থানে উল্লিখিত হইত। অতএব শঙ্কর, চৈতন্য যে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কুতর্কের দ্বারা এই বাস্তব সত্যটি উড়াইয়া দেওয়া চলে না। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাই। শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করা, শূদ্রের দান গ্রহণ করা, ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিতেন, তাই তিনি আবদার করিয়া জগন্মাতাকে বলিতেন, "মা, আমাকে কৈবর্ত্তের ভাত খাওয়ালি !"

এ-সম্বন্ধে আর বসন্তবাবুর কূট তর্কগুলির আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। মনুসংহিতা যে বেদমূলক তাহা আমি স্বীকার করি, মনুসংহিতার সমাজের উন্নতির জন্য যে-সব বিধি বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে গ্রন্থকারের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। মনুসংহিতা যে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, জার্ম্মাণ দার্শনিক নীট্‌শে মনুসংহিতাকে বাইবেলেরও উপরে স্থান দিয়াছেন। তবে আমার বক্তব্য এই যে, উহা যে যুগের পক্ষে উপযোগী ছিল তাহা বহুকাল গত হইয়া গিয়াছে। মনুর ব্যবস্থা মানিয়া চলা এখন আর সম্ভব নহে এ-কথা বসন্তবাবুই স্বীকার করিবেন। অতএব বেদ উপনিষদের সনাতন শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া দেশ কাল পাত্রের উপযোগী নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলন করিলে তাহাতে ধর্ম্মহানি হইবে না, ভারতে যুগে যুগে এইরূপ হইয়াছে। নারদ সংহিতায় আছে যে মনুসংহিতা তিনবার নূতন করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "পরবর্ত্তী মুনি ঋষিগণ অধীত মনুসংহিতাকে উপজীব্য করিয়া আবশ্যকমত দেশভেদে এবং কালভেদে ব্যবহারজ্ঞাপক- প্রভৃত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।" আজকাল যাঁহারা নিজদিগকে বর্ণাশ্রমী বা সনাতনপন্থী বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারাও সেই প্রাচীন বর্ণাশ্রমের আদর্শ বা মনুর বিধান অনুসরণ করিতেছেন না। শাস্ত্রে চারি আশ্রমের কথা আছে. ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আমাদের সনাতনীরা যে বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং পঞ্চাশের পর বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন তাহার কোন লক্ষণই নাই। মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে আপদকালে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করা চলিতে পারে, কিন্তু শূদ্রের বৃত্তি নহে। কিন্তু আজকাল কত ব্রাহ্মণই বেতন লইয়া চাকুরী করিতেছেন—ইহা শূদ্রের বৃত্তি, অথচ নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। মনু মানুষের সম্মুখে খুব উচ্চ আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মানুষের দুর্ব্বলতার দিকে অন্ধ ছিলেন না, মানুষ একেবারেই মুনি ঋষি হইয়া উঠিতে পারে না, তাই তিনি সমাজে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গর্ভিনী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা, কুমারীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে গ্রহণ করা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ এ-সব সে-সমাজে চলিত। মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ প্রশস্ত বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু, মেয়েরা যৌবন প্রাপ্ত হইলে নিজেরাই নিজেদের পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে, যে কোন জাতিতে বিবাহ করিতে পারিবে—এসব ব্যবস্থা স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যেই আছে। ব্রাহ্মণরা ব্যবহারের দোষে শূদ্র হইত, শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণ হইত। একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অভিশপ্ত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইত, চণ্ডালেও মুক্তিলাভ করিত। মতঙ্গ নাপিতের ঔরসে প্রমত্তা ব্রাহ্মনীর গর্ভে জন্মিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি যজ্ঞে ঋত্বিক কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণাচার পালন করিতেন এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা সুদুর্লভ ঋষিত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বজন-পূজ্য হন। পূর্ব্বে বৈদিক সংস্কার বহির্ভূত ব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে চণ্ডাল বলা হইত। ব্রাহ্মণের অন্য বর্ণজ সন্তানও ব্রাহ্মণ হইতে পারিত। কার্যবৈগুণ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইত।"

অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে না। আমাদের সনাতনীরা প্রকৃত পক্ষে স্মৃতি শাস্ত্রের ঐ সকল কল্যাণকর ব্যবস্থা মানিয়া সমাজকে প্রগতিপর করিতে চান না। তাঁহাদের মত হইতেছে এই যে, সমাজে এখন যাহা চলিতেছে এইটিই ঠিক, ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। এইরূপ মনোভাব হইতেছে তামসিকতার অভ্রান্ত লক্ষণ। এই মনোভাব দূর করিতে না পারিলে

তামসিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল ধ্বংস হইতে হিন্দুসমাজকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, "হিঁদুর এখনকার ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই; ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। এখনকার হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে,—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না।"

গীতায় বলা হইয়াছে যে শ্রদ্ধাবিরহিত হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে তাহাতে ইহকাল পরকাল কিছুই হয় না। বসন্তকুমার গীতার এই মহান বাক্যটিকে অসার প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"চুরি করা অন্যায়।" এই নিয়মে অনেক চোরের শ্রদ্ধা নাই। সে জন্য কি তাহাদের পাপ হইবে না? ইহার উত্তর হইতেছে এই যে, যদি কোন চোরের বাস্তবিকই এ বিশ্বাস থাকে যে, চুরি করা অন্যায় নহে, তাহা হইলে চুরি করিলেও তাহার পাপ হইবে না। পাপ পুণ্য বাহিরের কোন আচরণের উপরেই নির্ভর করে না, কোন্ কর্ম্মের পশ্চাতে কি মনোভাব থাকে, অন্তরের মধ্যে তাহার কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার উপরেই পাপপুণ্য নির্ভর করে। এই সত্যটি উপলব্ধি না করায় সমাজে নির্দ্দোষীর উপর যে কত অত্যাচার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার একটি দৃষ্টান্ত, ধর্ষিতা নারী। ধর্ষিতা নারীকে হিন্দু-সমাজ গ্রহণ করে না, আর কোন অবস্থাতে গ্রহণ করিলেও তাহাকে এমন পাপী ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করে যে তাহার জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ঐ ধর্ষিতা রমণীকে বিন্দুমাত্রও পাপ স্পর্শ করে নাই। অনেকে ধর্ষিতা রমণীকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গ্রহণ করিবার বিধান দেন। কিন্তু যেখানে পাপই নাই, সেখানে আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের? বরং যে গৃহস্থ ধর্ষিতা রমণীকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবে না বা গ্রহণ করিয়াও অপমান করিবে সেই সমাজের পরম অহিতকারী, তাহারই কঠোর সামাজিক দণ্ডের বিধান হওয়া উচিত।

বসন্তকুমার মাঝে মাঝে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বচন উদ্ধৃত করেন তাই আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি ঐটিকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন। এখন তিনি তাহা অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবেরা চৈতন্যচরিতামৃতকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন, এবং বাংলার হিন্দুদের মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে। বসন্তকুমার শাক্তও নহেন কারণ শাক্তগণ তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন, বসন্তকুমার শাস্ত্রের যে তালিকা দিয়াছেন তাহার মধ্যে তন্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। বর্ণ-বিভাগ ও চারি আশ্রমের আদর্শও তিনি অনুসরণ করিতেছেন না। তবে তিনি অনুসরণ করিতেছেন কোন শাস্ত্র? কোন আচার?

শ্রীঅনিলবরণ রায়

খড়কুটো

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চার মাস পরে জুন মাসের একটি প্রাতঃকাল। স্থান, স্যানাটোরিয়মের সাধারণ সমিতি গৃহ। ঘরটি সুবৃহৎ, চারিদিকে দরজা জানলা, যথেষ্ট আলো বাতাস। বামদিকে একটি ইজিচেয়ার পাতা আছে। পশ্চাতে প্রধান হলঘরে যাইবার দরজা। দরজার পাশে উঁচু প্লাটফর্মের উপর একটি টেবিল হার্মোনিয়ম রহিয়াছে। ইহার পাশেই আফিস গৃহের দ্বার। পশ্চাতের জানলা দিয়া স্যানাটোরিয়মের ফুলের বাগান দেখা যায়। ভিতরেও কয়েকটি ফুলের টব। একপাশে বইয়ের আলমারি সাজানো। ঘরের মধ্য ভাগে একটি চতুষ্কোণ টেবিল, এবং ঐ টেবিল ঘেরিয়া অনেকগুলি চেয়ার ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে সাজানো,—যেন টেবিলটি লেকচার দিবার জায়গা, এবং চেয়ারগুলি শ্রোতাদের জন্য।

পশ্চাতের খাবার ঘর হইতে বাসনকোসন নাড়ানাড়ি ও চায়ের সরঞ্জামের শব্দ শোনা যাইতেছে, অনেক মেয়ে পুরুষের গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে,—সকলে মিলিয়া তথায় খাইতে বসিয়াছে বোধ হয়।

যবনিকা উঠিবার পর ডাঃ সরকার প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে একজন অভ্যাগত আগন্তুক মিষ্টার শোভান্, পশ্চাতে পশ্চাতে ডাঃ সেন। ডাঃ সরকারের বয়স আন্দাজ ৪৫, দেখিতে সুপুরুষ, মুখে গাম্ভীর্য্য ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট রেখা, চোখে স্নিগ্ধ সহাস্য দৃষ্টি। চোখ দেখিলে মনে হয় অনেক দুঃখের সহিত পরিচয় ঘটিয়া তাহা যেন কারুণ্যমণ্ডিত, কষ্ট দেখিলেই সে চোখ তাহা বুঝিতে পারে, কষ্টে সহানুভূতি করিতে পারে। সেই চোখের দৃষ্টি মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়, নির্ব্বাক আশ্বাসের সহিত অপরের দুঃখের ভার গ্রহণ করে। গলার স্বর গম্ভীর অথচ কোমল। ডাঃ সেন অল্পবয়স্ক, সুশ্রী চেহারা, মুখটা লম্বাটে, চোখের দৃষ্টি, এবং চালচলনের ভঙ্গি আত্ম-গরিমার দৃপ্ত। মিষ্টার শোভানের বয়স আন্দাজ ৫০, মোটাসোটা চেহারা, পোষাকের যথেষ্ট জাঁক জমক আছে। ইনি একজন ধনী ব্যবসাদার, ইঁহারই প্রচুর দানে স্যানাটোরিয়মটি সমৃদ্ধ হইয়াছে।]

ডাঃ সরকার। (প্রবেশ করিতে করিতে) এই ঘরটির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাসেম্ব্লি রুম, অর্থাৎ সাধারণের একসঙ্গে মিলবার যায়গা, বুঝলেন মিষ্টার শোভান? স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিবাদে সকল রোগীই এখানে এসে মেলামেশা করতে পারে যখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, যেমন মনে করুন খাওয়া দাওয়ার পর, কিংবা সন্ধ্যেবেলা কিছুক্ষণের জন্যে।

মিঃ শোভান। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) চমৎকার ঘরটি, চারদিকে বেশ আলো বাতাস আছে। (পশ্চাৎদিকের দরজা দিয়ে খাবার ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া) ও, রোগীরা সব খেতে বসেছে দেখছি।

ডাঃ সরকার। (ঈষৎ হাসিয়া) হাঁ খিদেটা ওদের কিছু অতিরিক্ত, দেখচেন না কি রকম হট্টগোল করে খাচ্ছে। (গর্ব্বমিশ্রিত হাস্যের সহিত) যদি ওদের তেমন সুযোগ দেওয়া যায় তা হলে একবেলাতেই আমাদের রান্নাবাড়ি একেবারে ফাঁক করে দিতে পারে, কিছু পড়তে পায় না। তাই না ডাঃ সেন?

ডাঃ সেন। (হাসিয়া সমর্থন করিয়া) হাঁ স্যার, সে কথা মিথ্যে নয়।

মিঃ শোভান। (মৃদু হাসিয়া) খুব সুখের বিষয় বলতে হবে। আচ্ছা এখানে উঠে এসে যারা খাচ্ছে, ওদের অবস্থা তত খারাপ নয়, ওরা সবাই নিশ্চিত সেরে উঠবে, নয়?

ডাঃ সরকার। (কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া) তা বলা যায় না। এ রোগে নিশ্চিত সেরে উঠবে এ কথা বলাই ভুল, মিষ্টার শোভান। যে সব রোগীকে আমরা এখান থেকে 'সেরে গেছে' বলে ছেড়ে দিই,—তাদের পক্ষে আমরা বলি যে রোগটা অ্যারেষ্টেড্ হয়েছে মাত্র,—অর্থাৎ রোগটা দমন হয়ে গেছে, চাপা পড়ে গেছে ভিতরে যে ঘা ছিল সেটা শুকিয়েছে। কিন্তু এই ভাবটা ভবিষ্যতে স্থায়ী

হবে কিনা, সেটা নির্ভর করে রোগীর নিজের ওপর, সে যদি চিরকাল সাবধানে থাকে তবেই। কিন্তু সেটা খুব কঠিন কাজ নয়। এখানে যে নিয়মগুলো তারা শিখে যায় সেইগুলো যদি ভবিষ্যতে মেনে চলে, আর বিশেষ কিছু অত্যাচার না করে, তা হলেই যথেষ্ট। আমরা যে সব বিষয়ে সাবধান হতে বলি তাও খুব সহজ, তাতে কারো কাজ কর্ম্ম করবার কিংবা সমাজে মেশবার কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের যে সব পুরোনো রোগী এখান থেকে চলে গেছে তারা সচ্ছন্দে নিজেদের কাজকর্ম্ম করচে, আমরা তাদের সন্ধান নিই আর আমাদের খাতায় রিপোর্ট লিখে রাখি, সেই রিপোর্টগুলো খাতা খুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

মিঃ শোভান। (হাত নাড়িয়া) খাতা দেখাবার কোনো দরকার নেই। আপনার যে সুনাম চারিদিকে রটেছে—(ডাঃ সরকার মাথা নীচু করিলেন। মিঃ শোভান পুনরায় খাবার ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কিন্তু এখানে যারা খেতে বসেছে, তারা অনেকটা সেরে এসেছে বলতে হবে তো?

ডাঃ সরকার। মোটের ওপর তাই বলা যায় বটে, কিন্তু তবু জোর করে বলা যায় না। এমনও হয় যে কোনো একজন রোগী চমৎকার সেরে আসছে দেখা গেল, হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, আবার সে ভেঙে পড়তে লাগলো, তখন তাকে আবার একেবারে শয্যাগত করে ফেলে রাখতে হোলো। তবে এরকম খুব কম হয় অবশ্য। এ কথা বলা যেতে পারে যে এখানে যারা খেতে বসেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছ'মাসের মধ্যে এখান থেকে মুক্তি পাবে, তার পর স্বাভাবিক ভাবে নিজেদের কাজকর্ম্ম করতে থাকবে।

মিঃ শোভান। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলা যায় না, নয়? (হঠাৎ) কিন্তু এদের চেয়ে যাদের অবস্থা খারাপ, তাদের সম্বন্ধে,—তাদের মধ্যে বুঝি অনেকেই মারা যায়?

ডাঃ সরকার। (গম্ভীর ভাবে) না, তাও নয়। এখানকার নিয়ম এত কড়া, আর আমরা এতই নিখুঁতভাবে সেগুলো বজায় রাখতে চেষ্টা করি, যে পারতপক্ষে তা হতে পারে না। ও বিষয়ে আমরা একেবারে নির্দ্দয়। আমরা ছ'মাস পর্য্যন্ত দেখি, যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তবুও যদি কোনো রোগীর তাতে উন্নতি না দেখা যায়, যদি দেখি রোগী ভাল না হয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ যদি দেখি কেসটা হোপলেস, তা হলে এখানে আর তাকে জায়গা দিই না, ফেরৎ পাঠিয়ে দিই। এ ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এ স্যানাটোরিয়মে কখনো জায়গা খালি থাকে না, অনেক রোগীকে বহুদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়, তবে এখানে ঢুকতে পায়। তাদের জন্যে আমাদের জায়গা খালি করতেই হয়। যে সব রোগী সারবার নয় তাদের বেখে অনর্থক জায়গা জুড়ে রাখতে পারি না। তারা যে একেবারেই সারবে না তা নয়, হয় তো চেঞ্জে গেলে কিংবা অন্য রকম চিকিৎসা করলে তারা সারতে পারে, সে কথা কিছু বলা যায় না। কিন্তু আমাদের ঐ হচ্ছে বাঁধা নিয়ম। সকলকার মুখ চেয়ে আমাদের কাজ করতে হয়।

মিষ্টার শোভান। সে কথা ঠিক বলেছেন। (হার্মোনিয়ম দেখিয়া বিস্মিতভাবে) বা বা, এখানে আবার টেবিল হার্মোনিয়মও আছে দেখছি।

ডাঃ সরকার। হাঁ, রোগীরাই বাজায়, গান করে। (হাসিয়া) সব সময় যে তা গানের মতো শোনায় তা নয়, অনেক সময় কেবল হট্টগোল হয়।

মিষ্টার শোভান। তা বুঝেছি। (চারিদিকে চাহিয়া) কেবল এইখানেই বুঝি পুরুষ আর মেয়েদের এক সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয়?

ডাঃ সরকার। হাঁ।

মিষ্টার শোভান। (হাসিয়া) তা হলে এখানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম ট্রেমের মতো কোনো ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা নেই?

ডাঃ সরকার। (গম্ভীর ভাবে) যাতে সে রকম কিছু না হয় সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সাবধান থাকি। ও-বিষয়েও আমাদের কড়া আইন আছে, যদি দেখি কোথাও সাধারণ বন্ধুত্বের মাত্রা অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা সেটা জোর করে বন্ধ করে দিই। এখানে যারা থাকবে তাদের একমাত্র চেষ্টা হবে কিসে তারা ভাল হয়ে সেরে ওঠে,—এ ছাড়া অন্য কোনো রকমের চেষ্টাই তাদের থাকবে না, এই আমরা চাই।

মিষ্টার শোভান। (কতকটা অপ্রস্তুত ভাবে) হাঁ, এখানকার পক্ষে এই নিয়মটাই যে উপযুক্ত তাতে আর সন্দেহ কি ?

ডাঃ সরকার। (হাসিয়া) হাঁ, মদন দেবতার এখানে একেবারে প্রবেশ নিষেধ (দরজার দিকে চাহিয়া) আচ্ছা মিষ্টার শোভান, যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি এবার বিদায় নেবো, আপনি এইবার নিজে নিজে একটু দেখাশোনা করে বেড়ান। আজ আমি খুব ব্যস্ত থাকবো। আজ হচ্ছে শনিবার, এই খাওয়া দাওয়াটা হয়ে গেলেই রোগীদের প্রত্যেকের ওজন নিতে হবে।

মিষ্টার শোভান। প্রত্যেক শনিবারে ?

ডাঃ সরকার। হাঁ প্রত্যেক শনিবারে। এই ওজনটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি রোগীর অবস্থা কেমন দাঁড়াচ্ছে। ওজনটা যদি বেড়ে যায় কিংবা সমান থাকে, তা হলে বুঝি ভালই আছে। আর যদি প্রত্যেক সপ্তাহে ওজন কমে যেতে থাকে অথচ তার কারণ কিছু দেখতে পাই না, তা হলেই ভাবনার কথা হয়ে পড়ে। ঐ দেখেই আমরা সাবধান হয়ে যাই, তখন নানা বিষয় লক্ষ করতে হয়।

মিষ্টার শোভান। (হাস্যমুখে) অনেক কিছু শিখলাম আপনার কাছে। আচ্ছা তা হলে আর আপনাকে আটকে রাখবো না, আপনাদের বাগানের পথটা দেখিয়ে দিন, সেখানে একটু বেড়িয়ে আসি। আজকের দিনটা বড় চমৎকার।

ডাঃ সরকার। তাই চলুন, আমার কাজ সারা হলেই আপনাকে—(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরেই লীনা খাবার ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে, মুখে চোখে রক্তিমা লাগিয়াছে। কিন্তু এখনো যেন মনে হয় সে কিছু গুরুভাবে পীড়িত। প্রবেশ করিয়া সে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার হাবভাব দেখিলে মনে হয় কোনো মানসিক চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে; বসিয়া বসিয়া সে আঙুল মটকাইতে লাগিল; চোখে উদাস দৃষ্টি; মধ্যে মধ্যে ঠোঁট কামড়াইতেছে। বেশিক্ষণ সে বসিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া হারমোনিয়মের নিকট গেল। ইতস্তত করিয়া হারমোনিয়মে বসিয়া গান করিতে লাগিল)

মাঘের শেষে—

এই কি আমি ফুরিয়ে গেলাম মাঘের শেষে,
বনের শ্যামল শুধালো হায় মলিন হেসে, মাঘের
শেষে।

ফুরালো রে ফুল ফোটানোর পালা,
শুকালো হায় শ্রাবণ রাতে শারদ প্রাতের জুঁই
শেফালির মালা,
সুরগুলি তাও ফুরালো কি এক নিমিষে, মাঘের
শেষে।

ফুরালো যে জানে সেও জানে,
তবু আহা তবু শুধায় সবার কানে কানে,
জানে না সে রিক্ততা তার ভরবে কিসে, কী উদ্দেশে,
বনের শ্যামল শুধালো হায় মলিন হেসে, মাঘের
শেষে।

(গান শেষ করিবা সে নিজেকে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় মুরারী এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিল, লীনাকে দেখিয়াই তাহার কাছে গেল। তাহার স্বাস্থ্যের খুবই উন্নতি হইয়াছে, মুখে চোখে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য, কী এক আনন্দের দীপ্তি)

মুরারী। (উত্তেজিত ভাবে) এই যে লীনা। তুমি টেবিল ছেড়ে কখন এলে আমি জানি। ফাঁক পেয়ে তাই চলে এলাম। একটা খবর বলি শোনো। কাল রাত্রেই জানাতাম, কিন্তু তখন তুমি ঘরে চলে গেছ। কাল রাত্রেই খবরটা এসেছে। বলো দেখি কি খবর ?

লীনা। (হাসিয়া ফেলিয়া) আমি জানি। গল্পটা বিক্রি হয়ে গেছে।

মুরারী। (আনন্দে) ঠিক ধরেছো। কিন্তু প্রথম গল্পটাই এত চট্ করে কাগজে নিয়ে নিলে, কী আশ্চর্য্য।

লীনা। (খুসি হইয়া) আশ্চর্য্য কিছুই নয়। আমি জানতাম ও-গল্প নিশ্চয়ই নেবে। গল্পটা সত্যিই চমৎকার হয়েছিল কি না।

মুরারী। তুমি হয় তো তাই মনে করেছিলে, কিন্তু আমার তো কোনো আশাই ছিল না। কী এমন লেখা—

(হঠাৎ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখনো আসল ভাল ভাল গল্পগুলো লিখতে বাকি আছে। কাগজওয়ালারা যখন সেগুলো দেখবে তখন একেবারে অবাক হয়ে যাবে। আর আমায় থামায় কে? কাগজের সম্পাদক কি লিখেছে জানো? লিখেছে যে গল্পটা তার খুব পছন্দ হয়েছে, এ রকম গল্প পেলে সে আরও নিতে রাজি আছে।

লীনা। কেন, আরো তো তিনটে লেখা শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো এবার পাঠিয়ে দিন না।

মুরারী। তা তো দেবোই। সবই তো তুমি কপি করে ফেলেছো! ভাগ্যিস তুমি বলেছিলে, তাই তো হোলো। (চারিদিকে চাহিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি লীনার হাতখানি উঠাইয়া লইয়া চুম্বন করিল) এখানকার আইন ভঙ্গ করচি বটে, কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতাটা জানাতে হবে তো।

লীনা। (লজ্জিত হইয়া) যান, ও-সব কি। কেউ যদি দেখে ফেলে?

মুরারী। (দৃপ্ত ভাবে) দেখুক গে, বয়ে গেল।

লীনা। আপনার মনে নেই বুঝি, ওরা আমাদের এতটা বেশি বেশি মিশতে বারণ করে দিয়েছে?

মুরারী। মরুক্ গে আমরা তো এই জেলখানা থেকে শীঘ্রই খালাস পেয়ে যাবো। (লীনা মৃদুভাবে মাথা নাড়িল, মুরারী উহা লক্ষ্য করিল না) আমায় যে দিন ছেড়ে দেবে সেদিন যদি তোমাকেও ছেড়ে দেয় তো বেশ হয়, দুজনে এক সঙ্গে যাই।

লীনা। কাল রাত্রে তাই ভাবছিলাম যে আপনাকে তো এইবার দুদিন বাদেই ছেড়ে দেবে, আপনার শরীর এক দম ভাল হয়ে গেছে,—আচ্ছা, খুব শীঘ্রই বুঝি আপনার ছুটী হবে?

মুরারী। নিশ্চয়। আমি মোটা হয়ে গেছি, আর কেন আমাকে রাখবে? কাল ডাঃ সরকারকে আমি তাই জিগেস করছিলাম।

লীনা। (উৎকণ্ঠার সহিত) তিনি কি বললেন?

মুরারী। তিনি হেসে বললেন—"দেখি আগে তোমার কালকের ওজনটা"। চোখেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তবুও ডাঃ সরকার সহজে ছাড়তে চান না। তবে তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝলাম এইবারকার ওজনটা বেশী হলেই নিশ্চয় আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

লীনা। (ধীরে ধীরে) ও ওজন যদি বেড়ে যায়—তা হলেই—

মুরারী। হাঁ, তা হলে নিশ্চয়ই এবার ছাড়বে। আর আমায় আটকে রাখতে পারবে না।

লীনা। তা হ'লে এইবার আপনি চলেই যাবেন?

মুরারী। নিশ্চয়। ছুটির খবরটা পেয়ে গেলে আবার ভাবনা কি?

লীনা। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) এটা খুবই আনন্দের কথা তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমি কি স্বার্থপর দেখুন, আপনি চলে যাবেন শুনেই মনে হচ্ছে আমি একা পড়ে রইলুম।

মুরারী। (সান্ত্বনা দিয়া) তুমিও শীঘ্র ছাড়া পেয়ে যাবে নিশ্চয়। (লীনা মাথা নাড়িল, কিন্তু মুরারী তাহা দেখিতে পাইল না) লীনা, তুমি জানো না, গল্পটা বিক্রি হয়ে যাওয়াতে আমার কতটা সুবিধে হয়ে গেল। এইবার আমি একেবারে কলকাতায় চলে যাবো, ভালো ভালো লোকের সঙ্গে মিশবো, আরো আমার উন্নতি করবার সুবিধে হবে। (বিচলিত ভাবে) তুমি জানো না লীনা, তোমার কাছে আমি কতটা কৃতজ্ঞ থাকবো, তুমিই তো আমায় পথ দেখালে। ও কপি করার কথা বলছি মনে কোরো না, তোমার কাছ থেকেই লেখবার প্রথম প্রেরণা পেয়েছি। নিজের থেকে আমার কখনো এটা সম্ভব হোতো না। তুমি না থাকলে এ রকম করে আমার লেখাই হয় তো কখনো হয়ে উঠতো না।

লীনা। (অশ্রুদমন করিয়া) আমি আর কীই বা করেছি?

মুরারী। (মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) না না, সে কথা অস্বীকার করলে চলবে কেন? কিন্তু তুমি কাঁদলে বুঝি? (পিঠে হাত রাখিয়া) তোমার কি হয়েছে লীনা বলতো। আজ মোটেই কিছু খেলে না, ব্যাপারটা কি? ঐ রকম করলে বুঝি তোমার ওজন বাড়বে? খুব বেশি করে খেতে হবে, এই হচ্ছে তোমার গার্জ্জেনের হুকুম, বুঝলে?

লীনা। (হতাশ ভাবে) আমি জানি, আমার ওজনটা এবার কমে যাবে। গত তিন সপ্তাহ ধরে ওজন অল্প অল্প কমেই যাচ্ছে।

মুরারী। না না, ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি। আগে তো বেশ ওজন বাড়ছিলো! চার মাসে তোমার অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। এমন কি ডাঃ সরকারও তো খুসি হয়ে বললেন তোমার খুব উন্নতি হচ্ছে। এখন ওরকম হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন?

লীনা। (ম্লানভাবে) যাক্ গে,—শরীরের দিকে যত্ন করে এখন আর কীই বা এমন লাভ আছে?

মুরারী। সে কি কথা? কেন, এখন তোমার হোলো কি? হঠাৎ কী এমন ঘটলো যে মন টন এমন বিগ্‌ড়ে গেল?

লীনা। (ফাঁকা ফাঁকা ভাবে) কী আবার হবে? সে সব কথা আপনার জেনে কাজ নেই।

মুরারী। (হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া) বুঝতে পেরেছি, আমায় আর বলতে হবে না। বাড়ীর থেকে আবার কিছু চিঠি এসেছে,—না হয় তো সেই হতভাগাটা আবার কিছু লিখেছে, এই তো?

লীনা। (মাথা নাড়িয়া) না না, ও সব নয়। (মুরারীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল)

মুরারী। (রাগত স্বরে) নিশ্চয় তাই, তুমি না বললে কি হয়। তুমি তো ঐ রকম করে সব লুকিয়ে রাখো। কিন্তু তুমি কি মনে করো আমার চোখ নেই, আমি কিছু দেখতে পাই না? যতদিন এখানে রয়েছো ততদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, যেমনি একটা চিঠি আসে অমনি তুমি কেমন হয়ে যাও; যদি একদিন ওদের কেউ দেখা করতে আসে তো অমনি তুমি মুসড়ে যাও। যত সব স্বার্থপরের দল!

লীনা। ছি ছি, ও কথা বলবেন না।

মুরারী। (গ্রাহ্য না করিয়া) ছি ছি আবার কি, সত্যি কথাই বলছি। এতদিন তো দেখলাম, তোমার কাছেও অনেক কথা শুনলাম, তাতে কি আর বুঝতে বাকি থাকে? কেবল তোমাকে কষ্ট দিতে চায় আর তোমার দুঃখগুলো বাড়িয়ে দেয়, তুমি যে সেরে ওঠো সে তো ওদের মতলব নয়।

লীনা। (ক্ষীণস্বরে) আপনি তাদের ওপর অবিচার করছেন।

মুরারী। মোটেই না। আমি সব জানি। তোমার বাবা এসে বলবে টাকার টানাটানি, নয় ছেলেগুলো উচ্ছন্ন যাচ্ছে, নয় সংসারে গোলমাল হচ্ছে,—আর সেই হতভাগা ফণী এসে কতকগুলো বেমালুম মিথ্যে কথা বলে যাবে। এবারের ব্যাপারটা কি শুনি?

লীনা। (করুণ স্বরে) ও সব কিছুই নয়, কিছুই নয়।

মুরারী। (রাগিয়া) কিন্তু ঐ যে হতভাগাটা জুটেছে! দাঁড়াও না, আমি এখান থেকে আগে বেরোই, মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে এমন মিষ্টি মিষ্টি কতকগুলো কথা তাকে বলে আসবো!

লীনা। (ব্যস্ত হইয়া) না না, ও-সব আপনি কিছু করবেন না। তার আর দোষ কি? আপনি বুঝতে পারছেন না—(থামিয়া গিয়া চোখ নীচু করিল)।

মুরারী। (রুক্ষ স্বরে) বুঝতে সবই পারছি। যতই তার দোষ ঢাকা দাওনা কেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে তোমার মতো এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে কী দেখে তাকে—কিন্তু ও কথা বলে আর লাভ কি? অপাত্রে পড়ে তোমার জীবনটাই নষ্ট হতে বসেছে। ভালবাসা যে অন্ধ বলেছে, সে কথা একশোবার সত্যি। আবার তুমি নাকি বলো যে তাকে তেমন ভালবাসো না? এ কথার জবাব কি?

লীনা। (অসহায়ভাবে মাথা নাড়িয়া) তার প্রতি আমার একটা স্নেহ জন্মেছে বৈ কি! এত বছর ধরে তার সঙ্গে মেলামেশা করেছি! সেইজন্যে তাকে কিছু বলতে পারি না, তার গর্ব্বে আঘাত দিতে পারি না—

মুরারী। বেশ, তা হলে সে রকমভাবে যখন তাকে ভালবাসো না, তা হলে এক কথায় ছেঁটে তাকে বাদ দিয়ে দাও না কেন? (লীনা মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না। অস্থির হইয়া উঠিয়া মুরারী কর্কশ ভাবে বলিল) বলতে বুঝি মায়া হয়, বললে যদি তার বুকটা একেবারে ভেঙে যায়? তোমার মতো বোকা আর দুটি নেই। তার তো একেবারে আহার নিদ্রাই ঘুচে যাবে!

লীনা। (হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া) যাক্‌গে, ও-সব কথা ছেড়ে দিন। এখানে আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু। এ সব কথা তুলে আমাদের এমন মধুর সম্পর্কটা তেতো করে দিয়ে আর কাজ কি?

মুরারী। (দুঃখিত স্বরে) ক্ষমা করো লীনা। কথার ছলেই কেবল বলছিলাম, কিন্তু যাক্‌গে, ও কথা আর আমি তুলবো না। কিন্তু তোমার এ রকম অনিষ্ট হচ্ছে দেখে নিতান্ত চুপ করেও থাকা যায় না—

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) হোক্‌গে। শীঘ্রই তো এবার সমস্তই শেষ হয়ে যাবে—

মুরারী। (সন্দিগ্ধ ভাবে) কী শেষ হয়ে যাবে?

লীনা। (চেষ্টাকৃত শান্তস্বরে) না, কিছুই না। আপনি ও বুঝবেন না। (হঠাৎ মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত) আপনি যদি জানতেন তা হলে বুঝতে পারতেন, আপনি যা যা বলছেন সমস্তই ভুল। আমার সম্বন্ধে যা বললেন তা সবই ঠিক কিন্তু আপনি যা মনে করেছেন তা মোটেই নয়। আসল কথা ও নয়,—সে অন্য জিনিষ, অন্য কথা,—আমি, আমি, বলতে পারবো না।

মুরারী। (অনুনয়ের স্বরে) বলোই না লীনা।

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) না, সে আপনার শুনতে হবে না।

মুরারী। বলতেই হবে আমাকে। আমি হয়তো একটা কিছু উপায় করতে পারবো।

লীনা। না, সে কথা বলে কোনো লাভ নেই।

মুরারী। (অভিমানের স্বরে) কেন, আমায় বলে লাভ নেই কেন? আমার দ্বারা কখনো কিছু উপায় হয় নি বুঝি?

লীনা। তা হয়েছে বৈ কি, কিন্তু এটা অন্যরকম—

মুরারী। তাই তো শুনতে চাইছি। বলে ফেলো দেখি, এটা কী কথা।

লীনা। না, না, এখানে সে কথা বলা যায় না। এখনি ওরা সব এসে পড়বে।

মুরারী। তবে কখন বলবে বলো। কোথায় বলবে?

লীনা। তা বলতে পারি না। বলতে পারবো কি-না তাও জানি না। হয় তো আপনার যাবার আগে শুনেও যেতে পারেন।

মুরারী। কিন্তু আমি কালই তো চলে যেতে পারি,—যদি আজই আমার ওজন দেখে ডাক্তার ছেড়ে দেয়।

লীনা। (বিষণ্ণ হইয়া) ও, ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি চলেই তো যাচ্ছেন। তা হলে কখনই হয়তো আর বলা হবে না। যাক্ গে, ঐ দেখুন ওরা সব আসছে, ও কথা এখন থাক।

মুরারী। (নাছোড়বান্দা হইয়া) কিন্তু তুমি কথা দিচ্ছো যে আমায় বলবে? তোমাকে বলতেই হবে।

লীনা। (অসংলগ্ন ভাবে) হয়তো বলবো। দেখা যাক—

(অনেকগুলি রোগী ভিড় করিয়া কলরব করিতে করিতে প্রবেশ করিল। মেয়েরা এবং পুরুষরা তফাৎ হইয়া ষ্টেজের দুই পাশে চেয়ার প্রভৃতিতে বসিল বা দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেরই বয়স যৌবন সীমার মধ্যে, সকলেরই শরীরে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সকলকেই অল্প বিস্তর দরিদ্র বলিয়া মনে হয়। সকলেরই মুখে চাঞ্চল্য, অধিকাংশের মুখেই হাসি। মুরারী ও লীনা উহাদিগকে এড়াইয়া একটু দূরে সরিয়া আসিল)

মুরারী। (চাপা গলায়) দেখছো ওরা সবাই হাসছে? লক্ষ্য করে দেখেছো কি, প্রত্যেক শনিবারে ওজন হবার আগে ওরা এই রকম জোর করে পরস্পরের কাছে হাসতে চেষ্টা করে?

লীনা। (অন্যমনস্ক ভাবে) না, অতো লক্ষ্য করি নি।

মুরারী। এইবার বলো না সেই কথাটা, কেউ এখানে শুনতে পাচ্ছে না।

লীনা। (আকুল ভাবে) না না, কেমন করে বলি বলুন তো? ও কথা আর জানতে চাইবেন না।

(হঠাৎ সকলে চুপ করিয়া গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিতে লাগিল।)

জনৈক রোগী। (চাহিয়া চাহিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিয়া পাশের একটি রোগীকে বলিল) এখনো ওদের আসতে দেরী আছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আর পারা যায় না। পতিতপাবন বাবু, একটা গান করুন না ততক্ষণ।

(পতিতপাবন অগ্রসর হইয়া আসিল। বোকার মতো মুখ, মুখ লোকাইয়া এবং চোখ পিট্ পিট্ করিয়া মধ্যে মধ্যে এক প্রকার মুদ্রা দোষ করে। তাহাকে অগ্রসর দেখিবামাত্র সকলে হল্লা করিয়া উঠিল —"লাগান, লাগান পতিতপাবন বাবু! একটা আল্ট্রা-মডার্ণ প্রেমের গান লাগিয়ে দিন! একটা বেশ ফুর্ত্তির গান করুন দেখি! বসুন ঐ হার্মোনিয়মে! পতিতপাবন বাবু খাসা লোক। গান করতে বললে কখনো না বলেন না!" ইত্যাদি।)

পতিতপাবন। আর গান করবার সময় আছে কি? দেখি।

(গান করিবার সময় রোগীরা কেহ কেহ তাল দিতে লাগিল, কেহ মাথা নাড়িতে লাগিল, কেহ নাচের ভঙ্গিতে পা ঠুকিতে লাগিল, কেহ মধ্যে মধ্যে শিষ দিতে লাগিল। গান শেষ হইলে রোগীরা এক সঙ্গে হাততালি দিয়া উঠিল। ডাক্তার সরকার ও ডাঃ সেন প্রবেশ করিলেন, সকলে এক মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিল।)

ডাঃ সরকার। (গলা চড়াইয়া) সকলেই এখানে একসঙ্গে এসে জুটেছেন তো? ডাঃ সেন, এইবার আমাদের কাজ সুরু হোক।

(তরঙ্গিনী মেট্রন প্রবেশ করিল। বয়স অনেক বেশি। মাথায় পাকা চুল, মোটাসোটা চেহারা। ডাঃ সরকারের আদেশ শুনিয়া)

তরঙ্গিনী। ওজন নেবার সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচার নেওয়া হবে তো?

ডাঃ সরকার। হাঁ মেট্রন। আজ টেম্পারেচারগুলো নেওয়াই হোক।

তরঙ্গিনী। আচ্ছা, আমি নিচ্ছি।

(ডাঃ সরকার ও সেন পাশের দরজা দিয়া ভিতরে গেল। তরঙ্গিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোগীদের মুখের দিকে চাহিয়া প্রত্যেককে সাহস দিতে লাগিল এবং মিষ্ট হাসি হাসিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিল। সকলেই তাহাকে দেখিয়া জোর করিয়া একটু হাসিল। পতিতপাবন এতক্ষণ অতি মৃদু মৃদু হার্মোনিয়ম বাজাইতেছিল এবং উৎসুক দৃষ্টিতে মেট্রনের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল বাজনা থামাইতে বলে কিনা, কিন্তু মেট্রন হাসিয়া তাহাকে গান করিতে ইঙ্গিত করিল, উত্তেজিত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ একটি গান ধরিল।)

মুরারী। (জনান্তিকে) দেখছো, বুড়ি কেবল আমাদের দিকে চাইছে? আমরা দুজনে আবার একসঙ্গে জুটেছি, তাই বুঝি নজর পড়েছে?

লীনা। না তা নয়, ও আমার দিকেই চাইছে।

মুরারী। কেন, তোমার দিকে কেন?

লীনা। কাল আমার একটু জ্বর উঠেছিল কি না। প্রায় ১০০° ডিগ্রীর কাছাকাছি হবে।

মুরারী। (নম্র ভৎর্সনার স্বরে) তুমি কেবল খারাপটাই ভাবো। কেমন করে জানলে জ্বর হয়েছিল? থার্মোমিটারে দেখেছো না কি?

লীনা। না তা দেখিনি, কিন্তু শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল, কেমন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছিল।

মুরারী। না না, ও কিছু নয়। জ্বর হলে কি বিছানা ছাড়তে দেয়?

লীনা। সেই জন্যেই তো আমার দিকে চাইছে। (করুণ ভাবে) আবার যদি আমায় বিছানায় শুয়ে থাকতে বলে তা হলে কি হবে? এখন যদি জ্বরটা ছেড়ে গিয়ে থাকে তা হলেই বাঁচি। (হতাশ ভাবে) কিন্তু এখনো কেমন—রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারি নি—কেবল শুয়ে ভেবেছি—

মুরারী। (ধমক দিয়া) জ্বর না হাতী, এখনি হয়তো বলে বসবে তোমার সান্নিপাতিক হয়েছে। নিজের মনে মনেই সব ভেবে নিয়ে মুস্কিল করো। এখনই দেখতে পাবে তোমার ওজনটাও বেড়ে গেছে।

(লীনা মাথা নাড়িল। অন্তরাল হইতে ভারী ধাতব সরঞ্জামের নাড়ানাড়ি শুনিতে পাওয়া গেল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল)

তরঙ্গিনী। পতিতপাবন বাবু!

পতিতপাবন। এই যে!

(হার্মোনিয়ম বাজানো ছাড়িয়া দিয়া সে সকলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ডাঃ সরকার অগ্রে প্রবেশ করিল, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া গিয়া ডাঃ সেনকে সাহায্য করিতে দুজনে মিলিয়া একটি ওজনের যন্ত্র টানিয়া আনিল এবং উহা মধ্যে স্থাপন করিল। ডাঃ সেন ওজনের বাটখারাগুলি সাজাইতে লাগিল)

ডাঃ সরকার। (হাতের খাতা খুলিয়া পকেট হইতে কলম লইয়া) ঠিক হয়েছে তো?

ডাঃ সেন। একটু দাঁড়ান স্যার।

(রোগীরা সকলেই অল্প বিস্তর কাসিতে আরম্ভ করিল এবং তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া মুখে চাপা দিতে লাগিল।)

মুরারী। (হাসিয়া) এইবার দেখা যাবে, ওজন নিশ্চয়ই বেড়েছে।

লীনা। সে ত চোখেই দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওজন বেড়েছে।

মুরারী। আমি বুঝি আমার নিজের কথা বলছি? আমার তো জানাই আছে, আমি তোমার কথা বলছি। আমার ওজন তো বাড়বেই, না হলে তো সব মাটি হয়ে যাবে।

লীনা।—হাঁ, এখনি শুনবেন আপনি—(থামিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল)

ডাঃ সেন। (খাড়া হইয়া) এইবার রেডি স্যার।

ডাঃ সরকার। (মাথা নাড়িয়া খাতায় নাম পড়িয়া) অবনী গুপ্ত।

(একটি রোগী ওজনের কলের উপর উঠিল। ডাঃ সেন ওজন করিতে লাগিল, ডাঃ সরকার খাতা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। অবনী হাসি মুখে নামিয়া গেল, তাহার ওজন বাড়িয়াছে,—সে পাশের রোগীকে বলিল—"আধ পাউণ্ড বেড়েছি"। পাশের রোগী একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিল।)

ডাঃ সরকার। বিলাসিনী দাস। (একটি মেয়ে ওজন হইতে গেল)

মুরারী। এই মেয়েটিকে রোগা দেখাচ্ছে, নয়?

লীনা। হাঁ, ওরও ওজন কমছে।

মুরারী। তোমার নিশ্চয় বাড়বে। মনে থাকে যেন।

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) আচ্ছা, মনে করেই রাখলুম।

(বিলাসিনী নামিয়া গেল। মুখে হতাশার ভাব, হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস। সকলে করুণ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিল)

লীনা। বেচারার ওজন আবার কমলো। আমার যদি আজ ওজন না হোতো তা হলে বেশ হোতো—

ডাঃ সরকার। লীনা চৌধুরী।

(লীনা চঞ্চল হইয়া উঠিল)

মুরারী। সাহস করে যাও! মনে থাকে যা বলেছি।

(লীনা দ্রুতপদে অগ্রসর হইল, মুখে নির্লিপ্ততার ভাব আনিবার চেষ্টা করিল। কলের উপর উঠিলে ডাঃ সেন ওজন দেখিয়া নিম্ন স্বরে ডাঃ সরকারকে উহা জানাইল। লীনা কলের পুতুলের মতো নামিয়া পড়িল, হতাশ ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল)

মুরারী। ড্যাম্ ইট্!

(ডাঃ সরকার ওজন লিখিয়া লীনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, পরে তরঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন)

ডাঃ সরকার। সুশীলকুমার বোস।

(ঐ রোগী অগ্রসর হইল)

তরঙ্গিনী। লীনা, তুমি আমার কাছে এসো।

লীনা। (মুখ চুণ করিয়া) যাই।

(তরঙ্গিনী উহাকে একপাশে লইয়া গেল। অন্যান্য রোগীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ডাঃ সরকার নাম পড়িতে লাগিলেন এবং রোগীরা একে একে ওজন হইতে লাগিল। অনেকেই উন্নতি করিয়াছে, সকলের মুখেই হাসি। ডাঃ সরকারের গলার মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতেছে—বীণা ব্যানার্জি, চন্দ্রশেখর বোস, নীলরতন কর, ইত্যাদি)

তরঙ্গিনী। (লীনার কাঁধে হাত দিয়া) তোমার শরীরটা কদিন থেকে মোটেই ভাল থাকচে না, কেন বলতো?

লীনা। (জোর গলায়) কেন আমি তো ভালই আছি।

(চঞ্চলভাবে সে মুরারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

তরঙ্গিনী। এবারেও তোমার ওজনটা কমেছে, জানো তো?

লীনা। তা জানি বটে,—কিন্তু—

তরঙ্গিনী। গত চার সপ্তাহ ধরেই তোমার ওজন কমছে।

লীনা। হাঁ,—আমি জানি তো,—

তরঙ্গিনী। আমি লক্ষ্য করছি, তোমার মনে মনে কি একটা কষ্ট আছে। এমন কিছু হয়েছে সেটা আমরা জানি না।

লীনা। (ব্যস্তভাবে) না না, তা কিছু নয়। কয়েক-দিন থেকে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। সেই জন্যেই হয় তো হয়ে থাকবে।

তরঙ্গিনী। নিজের অবস্থার কথা দিবারাত্র ভাবো বুঝি, তাই ঘুম হয় না?

লীনা। কৈ, এমন কিছু ভাবি না তো।

তরঙ্গিনী। ঠিক বলছো তো?

লীনা। হাঁ ঠিকই বলছি।

তরঙ্গিণী। যাই হোক, আমি বলে দিচ্ছি, মোটেই আর ভাববে না। এই যে একটু ব্যাঘাত হোলো, এটা কিছুই নয়, সকলেরই এমন একটু আধটু বাধা বিঘ্ন এসে পড়ে। আবার কিছুদিন বিছানায় শুয়ে ভাল রকম বিশ্রাম নিলেই দেখবে যে আবার তোমার উন্নতি সুরু হয়ে গেছে।

লীনা। (মুখ শুকাইয়া গিয়া আতঙ্কের সহিত) আবার শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়? না না, তা পারবো না আমি।

তরঙ্গিণী। (শান্ত ভাবে) তা ছাড়া তোমাকে ভালো করা যাবে না, ডাঃ সরকার এই কথা বলেছেন। সুতরাং তাই তোমায় করতে হবে, আজ ঘরে গিয়েই—

লীনা। না না, আজকের দিনটা ছেড়ে দিন, আজ থেকেই সুরু করবেন না।

তরঙ্গিণী। কাল তোমার জ্বর হয়েছিল তা বুঝতে পারোনি? আজও তোমার মুখখানা থম্ থম্ করচে (লীনার কপালে হাত দিয়ে দেখিতে গেল, লীনা তাড়াতাড়ি মুখ সরাইয়া লইল)

লীনা। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি বলে ঐ রকম দেখাচ্ছে। তা ছাড়া মনটাও একটু খারাপ হয়েছে, ও ভাব শীঘ্র কেটে যাবে।

তরঙ্গিণী। (আশ্বাস দিয়া) চুপ করে শুয়ে থাকলেই সব সেরে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

লীনা। (মুরারীর দিকে করুণ ভাবে চাহিয়া) কিন্তু দেখুন, আজকের দিনটা যেতে দিন, জোড় হাত করে বলছি।

তরঙ্গিণী। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) তোমার কি একটা হয়েছে দেখছি। মনে মনে কি একটা লুকিয়ে রাখছো, আমাদের জানতে দিতে চাও না, নয়? কিন্তু আমায় বলতে কোনো দোষ নেই। (মৃদু হাসিয়া) লোকের মনের দুঃখ আমি বুঝি। আমার এতটা বয়স হয়েছে, রোগীরা সব দুঃখের কথা আমায় বলে, আমি তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করি। আমার কাছে বলতে তোমার দোষ কি? (লীনা মুখ নীচু করিয়া রহিল। তরঙ্গিণী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুরারীর দিকে চাহিল, দেখিল মুরারীও উহার দিকে চাহিয়া আছে। অতঃপর তরঙ্গিণী দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল) তুমি যদিও না বলো, কিন্তু মনে কোরো না যে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। এই ক'দিনের শরীর খারাপটা তোমার নিজের দোষেই হয়েছে। নিজের শরীর ভালো করার চিন্তা ছাড়া অন্য রকমের চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকেছে। আমি কয়েকবার তোমায় যা বারণ করেছিলাম সে কথায় তুমি মোটে কান দাওনি।

লীনা। (মুখ লাল করিয়া) কিছুই তো আমি করিনি। আর সে কথার সঙ্গে শরীর খারাপের সম্পর্ক কি?

তরঙ্গিণী। তবে কেন এমন হোলো তোমার?

লীনা। (মিথ্যার আশ্রয় লইয়া) আমাদের বাড়ির কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ হয়েছিল বটে। তারা চিঠিতে নানা রকম কথা লেখে, আমার ভাবনা বেড়ে যায়, তাতে হয়তো কিছু হয়ে থাকবে।

তরঙ্গিণী। (বিশ্বাস করিবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত) তোমার বাবা বুঝি ঐ সব খবর দেন?

লীনা। তিনিও বটে, আরও সকলে। (মনের কথা চাপা দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া) আর ঐ যে আর-একজন আসেন, যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে—

তরঙ্গিণী। (বিস্মিত ভাবে) ও, তোমার বিয়ের কথা হয়ে আছে বুঝি? (সংশয় দূর করিয়া) ত' আমি জানতাম না, তা হলে কখনো এই সব কথা বলতাম না। (কাঁধে হাত দিয়া) যাক্ গে, তোমার মনের ভেতর কি হচ্ছে সব কথাগুলো এইবার আমায় বলবে তো?

লীনা। (কৃতসংকল্প হইয়া) আচ্ছা, সমস্তই বলছি।

তরঙ্গিণী। (বাধা দিয়া) না না, এখানে নয় লীনা। এ বেলাটা আমি ব্যস্ত আছি, আজ বিকেলে তুমি আমার ঘরে এসো না। কেমন, তাই আসবে তো?

লীনা। আচ্ছা তাই যাবো। (খুসি হইয়া) তা হলে আজ এখন থেকেই আমার বিছানায় পড়ে থাকতে হবে না তো?

তরঙ্গিণী। না, কিন্তু একটি কথা তাহলে রাখতে হবে। এখন থেকে আর নড়াচড়া কোরো না, ঘুরে বেড়িও না, চুপটি করে তোমার ঈজিচেয়ারে বসে সমস্ত দিন বিশ্রাম

নাও। আর কাল সকালে বিছানা থেকে উঠো না। আর আমাকে কথা দাও যে আপাততঃ কোনো রকম দুশ্চিন্তা তুমি করবে না।

লীনা। তাই কথা দিচ্ছি।

তরঙ্গিণী। (হাসিমুখে) সেই বেশ কথা। এইবার তুমি যাও, বিকেলে আমার কাছে এসো।

লীনা। আচ্ছা।

(তরঙ্গিণী অতঃপর বিলাসিনীকে ডাকিল, এবং এক পাশে লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল। লীনা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছিল,—তৎপরে মুরারীর দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে পতিতপাবন আসিয়া মুরারীর সঙ্গে কথোপকথন সুরু করিল)

পতিতপাবন। (মুদ্রাদোষ সহকারে মুখের বিকৃতি করিয়া) তাই তো, লীনা মেয়েটির ওজন ভয়ানক কমে গেছে শুনছি। দেখলে তো, মেট্রন মাগীটা চুপি চুপি ওকে কী সব বলছিলো? নিশ্চয় ওকে এইবার বিছানায় ফেলে রাখবে, কি বলো?

মুরারী। (বিরক্ত হইয়া) আমি তার কি জানি?

পতিতপাবন। (ঠাট্টা করিয়া) ও, ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুই বুঝি তুমি খবর রাখো না? আমার কাছে লুকিয়ে আর ফল কি বাবা?

মুরারী। (তীব্র কটাক্ষ করিয়া) দেখ পতিতপাবন, দিন দিন তুমি অসহ্য রকমের অভদ্র হয়ে উঠছো। লোকের ওজন কমতে দেখলে বুঝি তোমার ভারী সুখ হয়? যাও, দূর হও আমার কাছ থেকে।

পতিতপাবন। (পশ্চাৎপদ হইয়া) আর কারো না হোক, তোমার ওজনটা যদি কমে তাহলে আমি খুব খুসি হই বটে।

(পতিতপাবন সরিয়া গিয়াছে দেখিয়া লীনা পুনরায় তাহার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বীণা আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পুরুষদের ওজন হইতেছে।)

ডাঃ সরকার। অতুলচন্দ্র সেন।

(একটি রোগী ওজনের যন্ত্রে গিয়া উঠিল। বীণা লীনার সহিত কথা বলিতে লাগিল)

বীণা। তোমার ওজন কমে গেছে না কি? আবার বিছানায় শুয়ে থাকতে বলবে না কি?

লীনা। হাঁ, তাই বোধ হয়—

বীণা। ছি ছি, ঐ ওদের বড় দোষ। আমার ভাই আজও আবার ওজন আধ পাউণ্ড বেড়েছে। মোটা হয়ে পড়ছি এবার। তোমার ওজন কতটা কমেছে ভাই?

লীনা। তিন পাউণ্ড।

বীণা। তাই তো। তা কি আর হয়েছে তাতে? বিশ্রাম নিলেই দেখবে আবার বেড়ে গেছে। ঐ নিয়ে যেন বেশি ভাবনা চিন্তা কোরো না। ভাবনা করাই হচ্ছে সব চেয়ে খারাপ। আমি ও সব বিষয় নিয়ে একদম মাথা ঘামাই না।

ডাঃ সরকার। বেণীমাধব বোস। (রোগী অগ্রসর হইয়া গেল)

(লীনা পুনরায় মুরারীর দিকে অগ্রসর হইল, এমন সময় সুশীলকুমার মুরারীর কাছে গিয়া কথা কহিতে লাগিল। লীনা হঠাৎ থামিয়া গেল, এদিক ওদিক চাহিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া কুম্পিত হাত দুখানি কচলাইতে আরম্ভ করিল)

সুশীল। শুনচি নাকি এবার ওজন বাড়লেই তোমার ছুটি?

মুরারী। (বিরক্ত হইয়া) আমার চেয়ে তোমরাই বেশি জানো দেখতে পাচ্ছি, তবে আর জিগেস করছো কেন?

সুশীল। (হাসিয়া) তা ভালোই তো ভাই, ছুটি পেলেই তো বেঁচে গেলে।

মুরারী। (খুসি হইয়া) তা তো নিশ্চয়ই। আমার ওজন এবারেও বাড়বে, কিন্তু ছুটি দেবে কি না—(ঘাড় কাঁপাইবার ভঙ্গি করিল)

ডাঃ সরকার। সুশীলকুমার।

সুশীল। এইবার আমার পালা। নিশ্চয়ই ওজন বেড়ে যাবে, আজ যা পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি।

(সুশীল ওজন হইতে গেল। সুযোগ পাইয়া মুরারী লীনার কাছে যাইবে, এমন সময় বিলাসিনী তরঙ্গিণীর নিকট বিদায় লইয়া লীনার কাছে আসিল। রাগে মুখ লাল করিয়া মুরারী নিবৃত্ত হইল। লীনা ও মুরারী পরস্পর হতাশভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল)

বিলাসিনী। (নিজের মতো অবস্থার আর একজনকে পাইয়া ব্যগ্রভাবে লীনার আঁচল ধরিয়া টানিয়া) লীনা, তোমাকেও বুঝি আমার মতো বিছানায় গিয়ে পড়ে থাকতে হবে?

লীনা। (অন্যমনস্ক ভাবে) বোধ হয় তাই।

বিলাসিনী। বোধহয় মানে? তোমাকেও তো ডেকে নিয়ে তাই বলে দিয়েছে? এসো আমরা এখান থেকে দুজনে চলে যাই।

সুশীল। (চীৎকার করিয়া মুরারীর কাছে গিয়া) আমার দু পাউণ্ড, বুঝলে? চালাকি নয়। (হাসিতে হাসিতে মুরারীর কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকিয়া দিল। সুশীলের অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া ডাঃ সরকার ও অন্যান্য সকলে হাসিতে লাগিল)

বিলাসিনী। চলো না ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি লাভ?

লীনা। (বিরক্ত হইয়া বিলাসিনীর ধৃত হাতখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) আমাকে ছেড়ে দাও না, কেন টানাটানি করছো? আজ থেকে নয়, আমার কাল থেকে বিছানায় শোবার হুকুম হয়েছে।

বিলাসিনী। (রাগিয়া) কেন? তোমার তো জ্বরও হয়েছিল শুনলাম, আমার তো বরং জ্বর হয়নি। এ কি অবিচার? একজনের বেলা এক রকম নিয়ম, অন্যের বেলা অন্য রকম নিয়ম? আমিও তা হলে শুতে যাবো না। দেখি না আমার কি করে!

লীনা। যাও বাপু যাও, আমাকে ছেড়ে দাও না। (সরিয়া গেল)

বিলাসিনী। (যাইতে যাইতে) আচ্ছা বেশ, বেশ ন্যায় বিচার এখানকার। বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাবো। দেখি কি হয়।

(প্রস্থান। লীনা হতাশভাবে টেবিলের ওপর হাতে ভর রাখিয়া দাঁড়াইল। মুরারী যেন অন্যমনস্কভাবে তথায় গেল)

মুরারী। বাবাঃ, এতক্ষণে আসতে পারলাম। কিছুতেই এরা তোমার কাছে আসতে দেবে না। বুড়ীটা তোমাকে কী বলছিলো বল তো? যে কটমট করে চাইছিলো। আমাদের দুজনের সম্বন্ধে সেই পুরোনো কথা বুঝি? (লীনা চোখ নীচু করিয়া মাথা নাড়িল) কি বললে? টপ করে বলে ফেল, এইবার আমার ডাক পড়বে।

লীনা। (ব্যাকুল ভাবে) দেখুন, আপনার ছুটি না হলেই কিন্তু আমি খুসি হই।

মুরারী। (চঞ্চল ভাবে) হয়তো ছুটি হবে না। দেখা যাক্‌না কি হয়—

ডাঃ সরকার। মুরারীমোহন সোম।

মুরারী। এই খানে দাঁড়িয়ে থাকো লীনা।

(মুরারী ওজনের যন্ত্রের উপর উঠিল। লীনা সেইদিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্র প্রতীক্ষায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুরারীর ওজন বাড়িয়াছে। তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। লীনা হঠাৎ যেন ইহা বুঝিতে পারিল, তাহার মাথাটি নীচু হইয়া গেল, শরীর সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মুরারী হাসিমুখে ওজনযন্ত্র হইতে নামিল। ডাঃ সরকার হাসিতে হাসিতে নিম্নস্বরে কি বলিলেন। মুরারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল এবং লীনার দিকে অগ্রসর হইল)

মুরারী। (উদ্বেগ দমন করিয়া) জিতে গেছি। ডাঃ সরকার বলে দিলেন তাঁর আফিসে গিয়ে দেখা করতে। বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন, তার পর ছুটি দেবেন।

লীনা। (ম্লানমুখে) ওজন বেড়েছে?

মুরারী। হাঁ, তিন পাউণ্ড।

লীনা। আশ্চর্য্য, আমার ঠিক তিন পাউণ্ডই কমেছে। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আমার ওজনটাই তুমি পেয়েছো তা'হলে? (কম্পিত স্বরে) এইবার তা'হলে নিশ্চয়ই তোমার ছুটি?

মুরারী। (লীনার মুখ দেখিয়া তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল)—সেই রকমই মনে হচ্ছে লীনা।

লীনা। (অশ্রুদমন করিয়া কম্পিত ভাঙা ভাঙা স্বরে) আমার খুব আনন্দ হচ্ছে,—যতটা আমার কমেছে,—ঠিক ততোটাই আপনার বাড়লো,—সত্যিই তাই,—খুব আনন্দ—(হঠাৎ হাত দিয়া মুখ চাপা দিল)

মুরারী। (ভয় পাইয়া) লীনা! কি হোলো কি?

চুপ করো, চুপ করো। আঃ, এখনি ডাঃ সরকার দেখতে পাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক
দ্বিতীয় দৃশ্য

(ঐ দিন মধ্যরাত্রি। স্তানাটোরিয়মের নিকটস্থ একটি চৌমাথা। দুই দিক হইতে দুইটি রাস্তা এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। পথের দুই দিকে জঙ্গল। চৌমাথার মাঝে একটি সাইনপোষ্ট দেওয়া আছে, তাহাতে দুই দিকের পথের নির্দেশ লেখা আছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে, সেই আলোকে পথের রেখা সুস্পষ্ট এবং শুভ্র দেখাইতেছে। একপাশে কতকগুলি পাথর পড়িয়া আছে।

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল, লীনা চৌমাথার মোড়ে একা দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাম দিকের পথের অভিমুখে চাহিয়া আছে। শরীরটা ভয়ে আড়ষ্ট করিয়া স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে, যেন কিছুমাত্র শব্দ হইলে কোনো অজানিত প্রাণী তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিবে। অন্ধকার জঙ্গলের নিকট হইতে একটু তফাতে গিয়া সে একপাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। দূরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লীনা তৎক্ষণাৎ উন্মুখ হইয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ সে ভয় পাইল, ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে জঙ্গলের পাশে আসিয়া ছায়াতে লুকাইয়া দাঁড়াইল।

মুরারী প্রবেশ করিল। সাইনপোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়া সে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। তৎপরে অস্ফুটস্বরে ডাকিল)

মুরারী। লীনা! লীনা!

লীনা। (আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া) এসেছো? এতক্ষণে? (তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সে যেন বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, কিন্তু লজ্জা পাইয়া থামিয়া গেল। মুরারী হাত বাড়াইয়া তাহার হাতদুখানি ধরিল)

মুরারী। এতক্ষণে কি রকম? এখনো নিশ্চয় বারোটা বাজেনি। এখনো ঘড়ির আওয়াজ শোনা যায়নি।

লীনা। তা'হলে আমি আগেই এসেছি। মনে হচ্ছিল যেন কতক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে। এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম—

মুরারী। তোমার হাত যে এত কাঁপচে? ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

লীনা। (হাসিয়া) একটু। চারিদিকে জঙ্গল কিনা! কিন্তু আর ভয় নেই।

মুরারী।—বোসো এইখানে। একটু বিশ্রাম নাও। (ভর্ৎসনার স্বরে) তোমায় একটু বকুনি দিতে হবে। এতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার উচিত হয়নি। জ্বর হচ্ছিলো না? আর তার ওপর এই রাত জাগা? এমনি করলে বুঝি সেরে উঠতে পারবে?

লীনা। (বিমর্ষ ভাবে) ও সব কথা আমি জানি না—

মুরারী। (বিরক্ত হইয়া) দেখ লীনা, ঐ রকম কথাগুলো ভাল হচ্ছে না। এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়। আজকাল তোমার হোলো কি? দোহাই তোমার, শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য করো। তুমি সন্ধ্যার সময় আমার হাতে যে চিঠিখানা দিলে, সেটা পড়েই তো আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। যখনি পেলাম তখনি যদি পড়তাম, তা'হলে নিশ্চয়ই তোমাকে এখানে এতরাত্রে আসতে বারণ করে দিতাম। কিন্তু তখন পড়বার সুযোগ পাই নি, জিনিষপত্রগুলো বাঁধাছাঁদা করছিলাম। তারপর যখন পড়লাম তখন আর তোমাকে কোথায় পাবো? কাজে কাজেই আসতে হোলো, আমি জানি তুমি এখানে এসে অপেক্ষা করবে। অন্যায় কাজ করেছো লীনা। তোমার এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা উচিত, আর তা না হ'য়ে কিনা—? নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারো না?

লীনা। (বিনীত ভাবে) কিন্তু আমায় অমন করে আর বোকো না।

মুরারী। তোমার মাথায় এসব বুদ্ধি এলো কেমন করে? এই রাত দুপুরে এখানে এসে আমার সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করা?

লীনা। মনে নেই, তুমি একদিন বলেছিলে, তুমি একবার রাত্রে চুরী করে পালিয়েছিলে, এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলে? আমি তাই ভাবলাম, একদিন মাত্র তো রাত্রে বেরুচ্ছি, এতে আর ক্ষতি কি?

মুরারী। কিন্তু আমি খুব ভাল ছিলাম তখন। আর তোমার কথা হচ্ছে আলাদা। সত্যি লীনা, রাত জেগে তোমার শরীর নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নয়। এ ভয়ানক অন্যায়।

লীনা। আচ্ছা আর বোকো না। আমি এটা শুধরে

নিতে পাববো। তুমি যখন চলে যাবে তারপর আমি সমস্ত দিনরাত চুপচাপ করে পড়ে থাকবো, একটুও নড়বো না। তোমাব সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল,—চারিদিকে যখন লোকজন থাকে তখন কথা বলবার সুবিধে হয় না,—তুমি সন্ধ্যাবেলা বল্লে কিনা যে তোমার ছুটি হয়ে গেছে, ভালই তুমি চলে যাচ্ছো—(দূরে ঘড়ি বাজিতে লাগিল) ঐ শোনো, কটা বাজলো।

মুরারী। এই বারোটা বাজলো। দেখেচো তো আমি আগেই এসেছি।

(ঘড়ি বাজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুজনে চুপ করিয়া রহিল)

লীনা। (চাপা গলায়) এখন আর "কাল" রইলো না, এখন থেকে "আজকের দিন" সুরু হয়ে গেল, না কি ? এই আজই তুমি চলে যাবে।

মুরারী। (লীনার গলার স্বরে কি ভাবিয়া মুখ নীচু করিয়া লীনা যে পাথরের উপর বসিয়াছে উহাকে আস্তে আস্তে পা ঠুকিতে লাগিল)—তা তো হোলো, কিন্তু তুমি সব দিক সাম্‌লে এসেছো তো, যাতে এই পালিয়ে আসা তোমার ধরা পড়ে না যায় তার ব্যবস্থা করে এসেছো তো ?

লীনা। তুমি যেমন চালাকি করেছিলে আমিও তাই করে এসেছি,—পাশ বালিশের ওপর গায়ের কাপড় চাপা দিয়ে এমন করে রেখে এসেছি যাতে কেউ দেখলেই মনে করবে বিছানায় মানুষ শুয়ে আছে।

মুরারী। পাশের রোগীদের মধ্যে কেউ তোমাকে উঠে আসতে দেখেনিতো ?

লীনা। না। আমি যখন আসি তখন সকলেই ঘুমিয়েছে।

মুরারী। তবে আর কোনো ভয় নেই। ওদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। (দুজনে চুপ করিয়া রহিল। মুরারী লীনার বক্তব্য শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এদিক ওদিকে দৃষ্টি ফিরাইয় সে গাছপালা দেখিতে লাগিল, মুক্ত বায়ুতে সজোরে নিশ্বাস লইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল। লীনা মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল) রাত্রিটা বড় চমৎকার, নয় ? এমন রাত্রে জেগে থাকতেই ইচ্ছে হয়।

লীনা। (অন্যমনস্ক ভাবে) ইচ্ছেই তো হয়। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল) সকালেই যাচ্ছো ?

মুরারী। দশটা চল্লিশের ট্রেণ। এখান থেকে দশটায় বেরুবো।

লীনা। সোজা বাড়ি চলে যাবে ?

মুরারী। বাড়ি ? মানে কাজের জায়গায় ? না। আগে যাবো আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে। যাওয়া উচিত। সেখানে দু' একদিন থাকবো।

লীনা। তোমার বোনেরা তোমায় নিশ্চয় ভালোবাসে, যতটা মনে করো যে তোমার কেউ নেই, সত্যিই তা তো নয়।

মুরারী। তা হতে পারে, কিন্তু তাতে লাভ কি ? আমার ভেতরটা কেউ বোঝে না। আমার আসল "আমি"-টাকে কেউই চেনে না।

লীনা। (অন্যমনস্ক ভাবে) তোমার আসল "আমি"টা কী বলো তো ? (মুরারী কোনো উত্তর দিল না, ছড়ি দিয়া পাথরের উপর আঘাত করিতে লাগিল। লীনা অন্য প্রসঙ্গ তুলিবার জন্য বলিল) তারপর বুঝি সহরে যেখানে ছিলে সেইখানে যাবে ?

মুরারী। (সচকিত হইয়া) হাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

লীনা সেখানে গিয়েই আবার লেখা সুরু করবে ?

মুরারী। এখন নয়। এখন যে টাকাগুলো জমেছে তাই নিয়ে কিছুদিন আমোদ করে বেড়াবো। হাতে যথেষ্ট টাকা আছে,—বাকি গল্পগুলোও যদি বিক্রি হয় তা'হলে তো আমি বড়লোক। তা'হলে একটা কোনো নির্জ্জন গ্রামে গিয়ে বাসা নেবো,—সেখানে একা একা থাকবো আর লিখবো। (নিজের কল্পনায় খুসি হইয়া উঠিয়া) এ খুব চমৎকার প্ল্যান, কি বলো ?

লীনা। (খুসি হইবার চেষ্টা করিয়া) তোমার কাজের পক্ষে খুব উপযুক্ত বটে। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) যে গল্পগুলো তুমি লিখছো তা ভারী সুন্দর, ঠিক একেবারে তোমার নিজেরই মতো। যদি আমি না জানতাম তা'হলেও বলে দিতে পারতাম এ গল্প তুমিই লিখেছো।

মুরারী। (খুসি হইয়া) আরো গল্প লিখি দাঁড়াও না, তখন দেখবে। (থামিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে হাসিয়া) কিন্তু দেখচো তো, আমি কেবল নিজের কথাই বলে যাচ্ছি! আচ্ছা, আমি যখন এমনি কেবল নিজের কথা বকে যাই তখন আমায় থামিয়ে দাও না কেন? নিজের স্বপ্নগুলো একটা একটা সফল হয়ে যাচ্ছে দেখলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই, আমার আর কোনো জ্ঞান থাকে না।

লীনা। (বিমর্ষ ভাবে) তা হোক, তুমি নিজের কথা যখন বলে যাও তখন আমার তা শুনতে ভালই লাগে।

মুরারী। (লজ্জিত হইয়া হাসিয়া) আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে,—সব কথাই তো সেইজন্যে তোমাকেই বলি। তোমার কাছে এলেই আমার নিজের কথা তাই—(হঠাৎ থামিয়া) কিন্তু তুমি ঐ চিঠিখানাতে লিখেছিলে যে আমার সঙ্গে কী দরকারী কথা আছে, তা তো বললে না? (লীনার পাশে বসিয়া) বুড়ীর সঙ্গে যা কথা হয়েছে সেই সম্বন্ধে না কি?

লীনা। না, সে আর এমন কি কথা? আমার কাছে সে ভেতরকার কথা জানতে চায়, খানিকটা সে আন্দাজি ধরেছে। সামান্য কিছু তাকে বলেছি যাতে সে আজকের দিনটা আমাকে ছেড়ে দেয়, আর আমাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না করে।

মুরারী। (তাড়াতাড়ি ও কথা চাপা দিয়া) তবে, আর কি কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলে?

লীনা। (বিমর্ষ ভাবে) যা বলতে চেয়েছিলাম তা এখন আর তেমন দরকারী বলে মনে হচ্ছে না। কী একটা ছেলে-মানুষী করলাম, মিছেমিছি তোমায় রাত্রে এখানে টেনে আনলাম। সে কথা শুনে তোমার বিশেষ কিছু লাভ হবে না।

মুরারী। কেমন করে জানলে আমার কোনো লাভ হবে না?

লীনা। (থামিয়া থামিয়া) আমি ভাবলাম,—তুমি—হয় তো—জানতে চাও।

মুরারী। কি জানতে চাই? কথাটা কী? বলো না যদি কিছু করতে পারি—

লীনা। না থাক্। (কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া) তাকে আমি আজ পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি।

মুরারী। কাকে?

লীনা। তুমি যেমন ভাবে তাকে লিখে জানিয়ে দিতে বলেছিলে।

মুরারী। (হঠাৎ যেন কিছু ভয় পাইয়াছে, এরূপ ভাবে) ও, ফণী হালদারকে না কি?

লীনা। হাঁ।

মুরারী। (অসম্বদ্ধ ভাবে) অর্থাৎ—সম্বন্ধটা কাটা-কাটি করে, চুকিয়ে দিয়ে?

লীনা। হাঁ, ও একেবারে চুকিয়ে দিলাম। (মুরারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুরারী চুপ করিয়া রহিল। লীনা যেন কিছু বুঝিল, বলিল) তুমি তো কিছু বলছো না! আমি ভাবলাম, এ কথা শুনলে তুমি খুসি হবে। তুমি আমাকে বরাবরই বলে এসেছো যে এইটেই করা উচিত।

মুরারী। (গম্ভীর ভাবে) তা তো বলে এসেছি! কত কথাই তো আমি বলি! (হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া) চিঠিখানা ডাকে দেওয়া হয়ে গেছে?

লীনা। হাঁ, কেন?

মুরারী। নাঃ, কিছু না।

লীনা। (ব্যথিত স্বরে) তুমি কি বলছো যে এটা অন্যায় হয়েছে? তুমিই তো আমাকে তাই উপদেশ দিয়েছিলে।

মুরারী। অন্যায় বলছি কি, তা নয়। তোমার যদি মনে হয়ে থাকে এটা করা উচিত, অর্থাৎ যদি জানো যে তুমি তাকে তেমন ভালো বাসো না, তা হলে অন্যায় কিছুই হয় নি। কিন্তু যদি বলো যে আমি বলেছি বলেই তুমি এটা করলে, তা'হলে আমার তা মোটেই ভাল লাগবে না। আসলে আমি ওর মধ্যে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে চাই নি। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কতটা কি আছে, আমি তার কতটুকু জানতে পারি?

লীনা। (আহত ভাবে) কিন্তু আমি সবই তো তোমায় বলেছি!

মুরারী। হাঁ, সবই তুমি বলেছো, তা জানি। কিন্তু

সেগুলো কেবল তোমার দিকের কথা। তার দিকের কথা আমি কিছুই জানি না। একবার তো মাত্র তাকে দেখেছি। হয় তো আমি যে রকম ভাবি তা সে মোটেই নয়। তার প্রতি আমার অবিচার করা উচিত নয়।

লীনা। অবিচার কিছুই করো নি। আর দুঃখ করবারও তোমার কোনো কারণ নেই। একেবারে তোমার কথা শুনেই যে আমি লিখেছি তা মনে কোরো না। তুমি বলবার অনেক আগের থেকেই আমার এ কথা মনে হয়েছিল।

মুরারী। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) যাক, তা হলেই হোলো। আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিলো। যাকে মোটেই জানি না তার বিরুদ্ধে আমার কোনো কথা বলাই উচিত নয়।

লীনা। তুমি কিন্তু বলেছিলে যে তার চিঠিগুলো পড়ে তার স্বভাবটা একেবারে জলের মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো।

মুরারী। (কথাটা উড়াইয়া দিবা) ও আমি কত যা তা বলি না বুঝে সুঝে!

লীনা। (রাগতস্বরে) কিন্তু হঠাৎ তোমার তার সম্বন্ধে মতটা এমন বদলে গেল কেন? যা তখন বলেছিলে তাই তো ঠিক।

মুরারী। (আলগা আলগা ভাবে) তা কে জানে? ভুলও তো হতে পারে?

লীনা। (দৃঢ়স্বরে) না, ভুল হতে পারে না। তুমি দেখবে, চিঠিখানা পেলে সে খুসিই হবে। আমার অসুখ হবার পর থেকে তার মন বদলে গেছে, এখন আমার কাছ থেকে ছাড়া পেলেই সে বেঁচে যায়, কেবল লোকে কি বলবে এই ভেবেই সে কিছু করতে পারে না। আজকাল আমাকে চিঠিও লেখে না, দেখতেও আসে না। আমিই কেবল তবুও ভাবতাম যে সে এখনো আমাকে ভালবাসে, কিন্তু সত্যি সত্যি তা নয় আসলে সে কেবল নিজেকেই ভালবাসে, অন্য কাউকেই সে ভাল বাসতে পারবে না। কিন্তু এতে তার আর দোষ কি? অধিকাংশ লোকই তো এই রকম। ভবিষ্যতে এই কথাটাই আমার মনে থাকবে যে তার সঙ্গে আমি অনেক কাল একত্রে কাটিয়েছি, আমার প্রতি তার এক সময় কিছু স্নেহ মমতা হয়েছিল, এই পর্য্যন্ত, আর কিছু না। (ব্যগ্রভাবে) কিন্তু এই সব কথাই তো তোমায় বলেছি, সব চিঠিই তো তোমায় দেখিয়েছি, তবু কেন তুমি বুঝতে পারছো না?

মুরারী। (থামিয়া থামিয়া) হাঁ,—আমিও তো তাই বুঝেছিলাম,—তাই বলেছিলামও সত্যি,—কিন্তু তুমি নিজের থেকে এটা আপনা আপনি অনুভব করো, এই আমি চেয়েছিলাম।

লীনা। (ব্যস্তভাবে) আমি তো নিজের থেকেই অনুভব করছি, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছে না?

মুরারী। হাঁ, তাই দেখছি। যাক, তুমি নিজের থেকেই যে তাকে ছাড়লে, এটা সুখের বিষয়। আমি বরাবরই জানতাম ও লোকটা তোমার উপযুক্ত নয়। (ঠাট্টার স্বরে) তা'হলে, এইবার একটা উপযুক্ত বর খোঁজা উচিত।

লীনা। (হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ব্যথিত স্বরে) কী বললে?

(মুরারী মুখ ফিরাইয়া লইল, লীনা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল)

মুরারী। (থতমত খাইয়া) ও লোকটা তোমার উপযুক্ত ছিল না, যাই বলো। তোমার উপযুক্ত লোক মেলা বড়ো সহজ নয়।

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) বাজে কথা বোলো না। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু মুরারী কোনো কথা না বলায় ভগ্নাশা হইয়া অবশেষে মৃদুস্বরে বলিল) যাক, আমার যা বলবার ছিল সব বলেছি। এইবার আমি যাই?

মুরারী (অন্যদিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে) হাঁ, এইবার যেতে হবে। বেশিক্ষণ রাত জাগা উচিত নয়। সকালে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

লীনা। (পুনরায় মুখের প্রতি চাহিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, মুরারী নীচের দিকে চাহিয়া রহিল। লীনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, মৃদুস্বরে বলিল) আচ্ছা তা'হলে আসি।

মুরারী। (রুদ্ধকণ্ঠে) আচ্ছা, এসো লীনা।

লীনা। (কিছু অগ্রসর হইল, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুরারী তখনো মুখ তোলে নাই। হঠাৎ লীনা ফোঁপাইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া সে মুরারীর দিকে ফিরিয়া আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল) ও গো। আর একটু দাঁড়াই।

মুরারী। (লীনা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া) লীনা। লীনা।

লীনা। (ভগ্নস্বরে) তোমায় আমি ভালবাসি,—বড্ডো,—বড্ডো বেশি ভালবাসি,—এই বলতেই আমি এসেছিলাম।

(লীনা মুরারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল মুরারী যুগপৎ আনন্দে ও বেদনায় অবাক হইয়া রহিল)

মুরারী। (যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই ঘটিল দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে) ও কি লীনা।

লীনা। (জোর করিয়া মুরারীকে জড়াইয়া ধরিয়া) নিশ্চয় বলবো। একশোবার বলবো। আমি তোমায় ভালবাসি। শুনলে তো? (হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া ত্রস্ত ভাবে) না, তোমার এতটা কাছে আসা উচিত নয়, আমার এখন অসুখ, আর তুমি এখন সেরে উঠেছো। হয় তো তোমার—

মুরারী। লীনা! কী বলছো যা তা কথা? আমি কি মানুষ নই? (মুরারী লীনাকে জড়াইয়া ধরিল)

লীনা। (অতিরিক্ত আনন্দে অধীর হইয়া) তাই কি আমি বলছি? আর একটু আমায় এমনি করে ধরে থাকো—তারপর তো—

মুরারী। (কম্পিত স্বরে) লীনা। অমন করে আর বোলো না। আমি সহ্য করতে পারি না।

লীনা। (স্নেহার্দ্র স্বরে) শোনো, শোনো,—তোমার একটিও কথা আর বলতে হবে না,—আমি যা বলি তাই শোনো,—আমার অনেক কথা তোমায় বলবার আছে, কিন্তু যতদিন না আমি ভাল হয়ে উঠি ততদিন তুমি অপেক্ষা করবে বলো,—কেমন তো?

মুরারী। (আবেগনিরুদ্ধ স্বরে) তুমি যা বলবে তাই শুনবো।

লীনা। দেখ, আমি তোমার মনের কথা সব জানি। তুমি আমাকে তেমন ভালবাসো না,—কেমন, তাই নয় কি? (মুরারী একটা অস্ফুট শব্দ করিল) থাক্ থাক্, তোমায় কিছু বলতে হবে না। তাতে আর কী হয়েছে? তোমার মনে সে ভাব আসেনি, তাতে আর তুমি কী করবে বলো। আমি এটা গোড়ার থেকেই জানি। কিন্তু আমি গোড়ার থেকেই তোমায় ভালবেসে মরেছি, মনে হয় যেন কত কাল থেকে তোমায় এমনই বরাবর ভালবেসে আসছি। তুমি আমার এটা বুঝতে পেরেছিলে, নয় কি? চুপ করো, তোমায় কিছু বলতে হবে না। তুমি বুঝতে পেরেছিলে ঠিকই, কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই সেটা জানতে চাইতে না, কারণ তোমার নিজের মনে ওরকম ভাবটা জাগেনি। সেইজন্যেই তোমায় চোখ বুজে থাকতে হোতো মিথ্যা অভিনয় করতে হোতো। কিন্তু আমি সব টের পাচ্ছিলাম। না, না, ভয় পেও না,—শোনো লক্ষ্মীটি, তোমায় আমি একটুও দোষ দিচ্ছি না। তোমার মনে যে রকম হয়েছিল তাই বলছি। প্রথমটা তোমার মনে হয়েছিল বেশ একটা খেলা করছি, কতকটা ফ্লার্ট করার মতো, বেশ কতকটা মজা লাগছিলো। নয় কি? আমি তা জানি, জানি। ও কি, অমন করে আমার দিকে চেয়ো না! তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? কষ্ট দেবার জন্যে বলছি না, তোমায় কি আমি কষ্ট দিতে পারি? তা যেন মনে কোরো না। তার পর তুমি দেখলে আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা সুন্দর বন্ধুত্ব জমে গেল,—দুজনেই দু'জনের সহায় হয়ে পড়লাম—তুমি মনে করলে এই বন্ধুত্বের ভাবটাই চিরকাল সমান ভাবে বজায় থাকে, বেশ চমৎকার একটা নিঃস্বার্থ নির্দোষ বন্ধুত্ব,—তাই না? তাও আমি জানতাম। কিন্তু তার পরে আমিই সব নষ্ট করে দিলাম,—ঐখান পর্য্যন্তই না থেমে আমি তোমায় একেবারে ভালবেসে ফেললাম,—নয় কি? আমি জানতাম যে আমার এটা বোকামি,—তোমার মনে কত স্নেহ, কত সৌহার্দ্দ, আমাকে সহায় পেয়ে তুমি কত খুসি হয়ে উঠলে, কত শিখলে,—অন্য কোন ভাব তোমার ছিল না, কিন্তু আমি যে না ভালবেসে থাকতে পারলাম না। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা তুমি দেখেও দেখতে চাইছো না,—তাই আমিও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম যাতে তোমার কাছ থেকে এটা লুকিয়ে

রাখতে পারি,—চেষ্টা করি নি কি,—বলো তুমি? তুমি তো আজ পর্য্যন্ত সেটা ভালো করে টের পাও নি,—নয় কি? যখন শুনলাম যে তুমি এইবার নিতান্তই চলে যাবে, তখন আর থাকতে পারলাম না। কিন্তু এর আগে কি তুমি জানতে পেরেছিলে? বলো?

মুরারী। (দুঃখিত স্বরে) না। কিন্তু কী আর বলবো, আমার ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে।

লীনা। (বাধা দিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে) দুঃখ হচ্ছে? কেন? না না, এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। তুমি জানো না, কত আনন্দ আমি পেয়েছি! আমার কোনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু তুমি চলে যাচ্ছো দেখেই আমার যত মুস্কিল বাধলো। তোমার সঙ্গে আজ রাত্রে দেখা করবার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠলাম,—তুমি আমার কথাটা একেবারে না জেনেই চলে যাবে, একেবারে কিছু জানবেই না, এ আমার সহ্য হোলো না। আরো কি ভাবলাম জানো,—তাকে যে চিঠিখানা লিখে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি—মনে করলাম এ কথাটা যদি তোমাকে জানাই, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়ে যাবে। (মুরারী একটা অস্ফুট শব্দ করিল,—লীনা অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল) পাগল, পাগল, পাগলের মতো যা তা ভাবছিলাম আর কি! তুমি যখন আমায় ভালোই বাসো না, তখন ও কথা শুনলেই বা কি, আর না শুনলেই বা কি? চুপ করো, চুপ করো, আগে আমার কথাগুলো শোনো। দুঃখ করতে পাবে না, —একটুও না। যে আনন্দ আমি এতে পেয়েছি তা আর জীবনে কখনো পাই নি,—আমি তোমার মনের সব কথাই জানতাম, জেনে শুনেও এ আনন্দ পেয়েছি। এখন সব তোমায় বলেই ফেললাম,—দোষ করলাম হয় তো, কিন্তু তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি! এখন সব চেয়ে আমার কষ্ট এই যে তোমাকে আর আমি কখনো দেখতেই পাবো না। কেবল মনে হবে—আমার কেউ নেই।

মুরারী। (আর্দ্র স্বরে) কিন্তু আমি তো আবার আসবো,—তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো নিশ্চয়। তারপর তুমি যখন এখান থেকে ছুটি পাবে,—তখন—

লীনা। (ভগ্ন স্বরে) আঃ, চুপ করো না, আমায় কথাগুলো শেষ করতে দাও না। তুমি জানো, জগতে আমি আজ কত একা। বাবা তো নিশ্চয় সেই বিনোদিনী মাসীকে আবার বিয়ে করবেন,—আর ভাই বোনেরা আমাকে এতদিনে ভুলেই গেছে। আমাকে আর ওদের কোনো দরকারই নেই। আমি ওদের কাছে এখন মরার সমান,—বাড়ী ফিরেও আর হয়তো জায়গা পাবো না, সবাই আমাকে ঘরে নিয়ে রাখতে ভয় পাবে, মনে করবে আমার কাছ থেকে রোগের ছোঁয়াচ লাগবে। আর তার কথা তো ছেড়েই দাও,—তার সঙ্গে সব চুকেই গেছে, সে এখন আর ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এ-সব কথা শুনে হয়তো আবার তোমার কষ্ট হচ্ছে। না না, আমায় ক্ষমা করো। তুমি যে আমার কতখানি ছিলে, তাই কেবল জানাচ্ছি,—তুমি চলেই তো যাবে—কিন্তু একেবারে যেন ভুলে যেয়ো না! একটু মনে কোরো!

মুরারী। (ব্যথিত কণ্ঠে) ভুলে যাবো? লীনা! আমি এতই কি—

লীনা। জানি জানি, সে রকম ভাবে না হোক, তবু তুমি আমায় যথেষ্ট ভালোবাস, তাই না? (মুরারী পুনরায় লীনাকে জড়াইয়া ধরিল) আ—ঃ! এইবার বুঝি বিদায় নেবে? কাল সকালে আর আমার কাছে যেন এসো না। সবাই সেখানে চেয়ে চেয়ে দেখবে—সে আমি সহ্য করতে পারবো না। কিন্তু তুমি আমায় চিঠি লিখবে তো? (ক্রন্দনের স্বরে) চিঠিটা অন্তত লিখো, কেমন?

মুরারী। নিশ্চয় লিখবো! নিশ্চয় বলছি! তারপর তুমি এখান থেকে সেরে আগে বেরিয়ে পড়ো—তারপর দেখা যাবে। (জড়াইয়া ধরিতে গেল)

লীনা। (ছাড়াইয়া লইয়া দূরে সরিয়া) আর না, এবার তুমি যাও। মনে একটু রেখো। হয়তো এর পরে তোমার মনে যদি কিছু,—ভগবানকে ডাকতে ডাকতে যদি কোনো রকম—। হয়তো বাজে কথা, কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি আশা ছাড়বো না কিছুতে।

মুরারী। (আহত স্বরে) ও কি কথা লীনা?

লীনা। (গভীর দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে) মনে রেখো— যদি আমার কোনো রকম সাহায্য তোমার কখনো দরকার হয়,—আমি চিরকালই তা করবো,—প্রাণ দিয়ে করবো,— সে যতই শক্ত হোক। তুমি আমায় যেন ঘৃণা কোরো না, লক্ষ্মীটি। আমি ভালবাসি!

(লীনা দৌড়িয়া পলাইল। মুরারী পশ্চাদ্ধাবন করিতে গেল, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল, হাত শক্ত করিয়া মাটিতে পা ঠুকিতে লাগিল, তিক্ত স্বরে বলিল)—হা ভগবান! (ক্রমশঃ)

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

সত্য মিথ্যা

শ্রীবিভু কীর্ত্তি এম্‌-এ

আমিই একা ভুল করেছি ? ভুল বা বলি কারে— ?
ইচ্ছা করে ভুলিয়ে দিলাম তোমার দেবতারে
—এই ত অভিযোগ ?
সত্য মিথ্যা যাহাই মনে হোক ।

আমি বুঝি নোংরা হাতে ছুঁয়েছিলাম তোমার দেবতারে— ?
মলিন বুঝি করেছিলাম তাঁরে ?
আমার হল সেই অপরাধ—তোমার হ'ল সাজা ?
তুচ্ছ আমি ছিলাম বলেই তোমার ঘরে এলেন না'ক রাজা ?
—তবু তুমি কইলে না'ক কথা ?
তোমার বুকের যে ভগবান—আমার লাগি তিনি পেলেন ব্যথা ?
তোমার ভাবরূপের ছায়া আমি দিলাম মুছে— ?
এ জীবনের গর্ব্ব তোমার সবই গেল ঘুচে
আমার অত্যাচারে ?
তোমায় আমি টেনে নিলাম মাটীর বুকে আমার অন্ধকারে ?

আমিও আজ শুধাই তোমায়—কেন তুমি সইলে অত্যাচার ?
ঘরে না হয় আমি ছিলাম—মুক্ত তবু ছিলো ঘরের দ্বার ।
আসতো হাওয়া আসতো আলো—আসতো পাখীর গান—
প্রচুর হাসি প্রচুর কলতান ;
আমি হরণ করি নাই ত উদার আকাশখানি—
মহাকালের মন্ত্রপূত বাণী ।
দু'হাত দিয়ে রুদ্ধ করে দিইনি তোমার মুক্ত বাতায়ন
তোমার প্রদীপ-শিখার পরে ফেলি নাই ত আমার আবরণ ।
—সবই আমার দোষ— ?
মক্ষিকা ত অনেক ছিলো—পূর্ণ কেন হয়নি মধুকোষ ?

সাহস আমার আছে—
সত্য কথা সত্য বলেই মানবো তোমার কাছে ;
স্খলন পতন ত্রুটী আমার নেব স্বীকার করে

যা কিছু ভুল ছিলো আমার বাহিরে অন্তরে ;
তোমার অভিযোগের পরেও বলবো আমি তবু
—ভুল ত আমার ঢের দেখেছো—আমায় তুমি চেনোনাইক কভু।
ভেবেছিলে একটিবারও আমারো যে দুঃখ কিছু আছে—
ভেবেছিলে চাইতে পারি আমিও যে কিছু তোমার কাছে ?
আজকে দোষী আমি !
তুমি নাকি আমার তরেই কোথা হ'তে কোথায় এলে নামি।
আমিই নাকি জ্বালিয়ে ছিলাম খেলার ঘরে স্ফটীক দীপাধার—
তাতেই নাকি ছাই হ'ল সব ঊর্দ্ধগতি তোমার আত্মার।

তর্ক করে শেষ হবে না—বাড়বে শুধু জ্বালা।
—তোমার গলায় সেই যে কবে পরিয়েছিলাম আমার বরণমালা—
তারপরেতে কত যে দিন গেছে—
মালাখানি লুপ্ত হ'ল তুমি আমি আজও আছি বেঁচে ঃ
দু'টি প্রাণের সুর মেলে না—শুধুই বারে বারে
রুদ্ধপ্রাণের ব্যথা দুটি ঝঙ্কারিয়া উঠ্‌ছে তারে তারে ;
মর্ম্মবেঁধা আঘাত হানি তুমিও দাও জ্বালা—
হায়রে বরণমালা।

গভীর রাতে একলা জেগে থাকি—
মনে জানি কত দিকেই কত দিলেম ফাঁকি।
তোমার কথা ভাবি—
আমিও ত দিলাম না'ক—তুমিও ত করলে না'ক দাবী ;
রিক্ত দু'টি প্রাণ
পরস্পরকে রইলো ভুলে—কোথায় ভগবান ?

জ্যোৎস্নামাখা করুণ আকাশখানি।
প্রভু তুমি ব্যথাই দিলে—এবারে দাও বাণী।
কে যেন মোর বুকের মাঝে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদে—
সান্ত্বনা নাই ;—হৃদয় বাঁধা মৌনতারি ফাঁদে।
—বলবো বলো কি বা ?
আসবে আলো—আসবে ভাষা—আসুক আগে দিবা।

শ্রীবিভু কীর্ত্তি

প্রতিমা

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

আপনার অন্তর্লোকে ধ্যাননয়নের অবলোকন পথে যে দেবতা রূপায়িত হইয়া ওঠেন, শিল্পীর প্রসাদগুণে বাস্তব জগতে তাঁহারই প্রতিমূর্তির আবির্ভাব হয়; উহাই প্রতিমা। উহা দেবতা নহে, দেবতার প্রতিবিম্ব, প্রতিযাতনা বা প্রতিনিধি। কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা এই প্রতিমায় দেবতার আবির্ভাব পরিকল্পনা করিয়াই আমাদের পূজা; প্রতিমাকে ক্ষেত্র করিয়াই দেবতা আমাদের পূজা, আমাদের ভক্তি ও অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। পূজাব্যবসিতকালে দেবতা ও প্রতিমার অস্তিত্ব অভেদ্য।

মূলতঃ একেশ্বরবাদী হিন্দু কোন্ সুদূর কাল হইতে প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া আসিতেছে, সে ইতিহাস আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। বেদাতীতযুগের প্রাচীন ভারতীয়গণও প্রতিমার ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের অর্চনা করিতেন ইহা অসম্ভব নহে আর বেদপরবর্তী যুগে অর্চনা ব্যপদেশে গঠিত দেবমূর্তির গঠন সৌকর্য্যের অপ্রমেয়তা দৃষ্টে মনে হয়, হিন্দুর প্রতিমা পূজা কোন্ সে উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিল। ঐশীশক্তিকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া, অসংখ্য উপকরণে তাঁহার পূজা করিয়া, ধ্যাননেত্রে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ও বস্তুতান্ত্রিকতার অতীত সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহার বহু নিদর্শন আজও তাঁহাদের লুপ্তাবশেষ সাহিত্যে ও ধ্বংসাবশেষ মূর্তিশিল্পে পর্যবসিত হইয়া ভারতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া আছে।

বস্তুতঃ মূর্তির নির্ম্মাণোৎকর্ষ, প্রতিমার ভাবব্যঞ্জনা, রেখা ও রূপের সৌকুমার্য্য, ধ্যানীর আধ্যাত্মিক স্তরারোহণের ও আনন্দ রসাস্বাদনের প্রতিমান স্বরূপ। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও ভারতের নানাস্থানে রূপ ও ভাবব্যঞ্জনার দ্যোতক বহু মূর্তি ও প্রতিমা গঠিত হইয়াছে—আর অতীতে বাংলা দেশে নির্ম্মাণ সৌন্দর্য্যে ও ভাবদ্যোতনায় মূর্তিশিল্প এত উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে বাঙ্গালী শিল্পীর খ্যাতি বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া বহু দূরদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিক তারানাথ বাঙ্গালী শিল্পী ধীমান ও বিতপালের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।

মনে হয় প্রতিমা গঠন করিয়া পূজায় অধুনা ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে বাঙ্গালীই অধিকতম উৎসাহশীল। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বহুস্থানে পুরাতন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী প্রাচীন দেবতাগণ আজও জাগ্রত বৈভবে অসংখ্য ভক্তের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকেন। মন্দিরের নৈমিত্তিক ঐশ্বর্য্য ও প্রতিমার পট স্থাপন ও ভাব সৌকুমার্য্য প্রাচীন শিল্পীর ধ্যান কল্পনায় প্রতিখ্যাত হইয়াছিল ও সেই হেতু বাঙ্গলার বাহিরের ভারতীয়গণের ভাবদৈন্যে সবিশেষ পীড়িত হইতে হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্ন প্রকার। সাহিত্যের অকৃপণ বর্ণনায় বঙ্গমাতার গগনচুম্বী মন্দিররাজির অভাব নাই, সে মন্দিরের ও মন্দিরস্থিত দেবতার অপরূপ রূপরাশির বর্ণনায়ও সাহিত্য অনুদার নহে। কিন্তু বাংলা ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, সেই ইতিহাস-বিশ্রুত মন্দিরের আজ একটিও অবশিষ্ট নাই। কিছু বা কালের প্রভাবে প্রকৃতির অপক্ষপাত ক্রূরপ্রলেপে ও অধিকাংশ মনুষ্যের হিংসাবশে বাংলার ঐশ্বর্য্যস্থলগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণিত কুমুদকহ্লারহসিত, সরোবরশোভিত অসংখ্য মন্দিরাবলির কয়টি ইষ্টক প্রস্তর আজও দেবিকোটে ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ভাগীরথীর তীরে কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসরাজিতে কত শিল্পকাকমনোহর মূর্ত্তিরাজি আজও পড়িয়া আছে—গৌড়বঙ্গের প্রতিমাশিল্পের কত না নিদর্শন বরেন্দ্রীর পথে পথে, বঙ্গের কর্ষিত ক্ষেত্র তলে ও

বর্দ্ধমান তাম্রলিপ্তির উষরতায় লুপ্ত হইয়া আছে। কতটুকুই বা তাহার সন্ধান হইয়াছে ?

মন্দিরহীন, প্রতিমাহারা হইয়া বহুদিন অতীতেই বাঙ্গালী মৃন্ময়ী মূর্তির প্রচার পূজার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কাষ্ঠ, প্রস্তর ধাতুময়ী, লেপ্যা লেখ্যা পৈষ্টি ও সৈকতী মূর্ত্তির আর প্রচলন নাই। বাঙ্গালী শিল্পী আর প্রস্তর কুঁদিয়া প্রতিমা গড়ে না, অষ্টধাতুর মূর্তি নির্ম্মাতার বংশ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। কিন্তু মৃত্তিকায় কি শিল্পী তাহার সুনাম বজায় রাখিতে পারিয়াছে ?

বিজাতীয় বেশভূষায় শোভিত পুজনীয় মূর্তিতে ভাবের দৈন্য অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে' স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে প্রতিমা হইবে সুন্দর, অধিকন্তু শিল্পীর দোষে অবসর সন্নিবেশে ব্যতিক্রম ঘটিলে সাধকের আয়ু, ধন ও সুখ বিনষ্ট হইবে।

যথোক্তাবয়বৈঃ পূর্ণাপুণ্যদা সুমনোহরা।
অন্যথায়ুর্ধনহরা নিত্যং দুঃখবিবর্দ্ধিনী ॥
(৪।৪।১৩)

আজ আমাদের পূজাগ্রহণকারিণী প্রতীমাসমূহে মনোহর সৌন্দর্য্যের ও ভাবমাধুর্য্যের অভাব বিশেষরূপে প্রকট। মানুষের শিল্পোৎকর্ষ তাহার সত্যতা ও হৃদয়ের উচ্চতার প্রতীক! অদূর অতীতে একদা কোনও এক অশুভক্ষণে বাঙ্গালী তাহার শিল্পবোধকে বিসর্জ্জন দিয়াছিল, আজও সে শিল্পবোধ তাহার ফেরে নাই। তাই এই ভাবদৈন্য লইয়াও প্রতিমা তাহার পূজা পাইতেছে। নিঃসন্দেহে পূজকের ধ্যানবিভ্রম ঘটিয়াছে, অধঃপতন হইয়াছে। ধ্যানলোকে ঈশ্বরের রূপাতীত রূপের যে কল্পনা তাহার প্রতিবিম্ব আজ আর বাঙ্গালীর প্রতিমায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জাতশিল্পীর গতানুগতিক পদ্ধতিতে রচিত প্রতিমায় তবুও কিছু উচ্চস্তরের শ্রদ্ধেয় নরনারীর রূপ ফুটিয়া উঠে, দেবীর মূর্তিতে ভাবমণ্ডিত গৃহজননীকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রেণেসাঁসের রোঁয়েদাদে যে অপরূপ Indian artএর আবির্ভাব হইয়াছে উহা বাঙ্গালীকে, মনে হয় আরও অধঃপতনের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিবে। বস্তুতঃ গৃহের নিজস্ব বৈভব ত্যাগ করিয়া ইহারা কোন্ মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সহস্র বৎসরের অধঃপতনের পর, সুউচ্চ ও অদ্যাপি অনতিক্রান্ত সভ্যতায় অধিষ্ঠিত পূর্ব্বপুরুষগণের হাস্যকর ও নির্ব্বোধ অনুকরণ ভিন্ন বর্তমানের এই অজ্ঞান প্রচেষ্টাকে আর কিছুই বলিতে পারা যায় না! ধ্যানভ্রষ্ট বাঙ্গালীর ইহা এক অভূতপূর্ব্ব চিত্তবৈক্লব্য, সর্ব্বতোমুখী ভাবদৈন্যের ইহা এক অচিন্তনীয় প্রকাশ।

বাংলার সাধনধারার রূপ
—তারা

এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে হইলে একটু অনুধাবনশীল হইতে হইবে। গৃহে গৃহে আজ পূজার আয়োজন, দেবীর আবির্ভাবে আনন্দ আজ গৃহভেদী বিভিন্ন দুঃখে অমূর্ত্ত হইয়া উঠিলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে বাঙ্গালীর ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ইহাই একমাত্র সর্ব্বজনীন উৎসব। আজ যদি আবার অতীতের কথা মনে হইয়া থাকে, আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার প্রয়োজন জাগিয়া থাকে তবে অতি-সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সুদূর অতীতের যাহাকিছু মোহনীয় তাহাই অনুকরণীয়

হইয়া উঠিতে পারে না কারণ ইংরাজ আগমনের পর অতি দুঃস্পাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা পুনরুজ্জীবনের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার কতটুকু ক্ষমতা ইহাদের আছে তাহা বিচারযোগ্য। আর অসংখ্য মূক জনসাধারণ, তাহাদের সহস্র বৎসরের পরাধীনতা, কলুষিত উচ্চবর্ণের আত্মদম্ভজনিত নির্য্যাতনে প্রায় মনুষ্যত্বহীন—ইহাদিগকে দ্রুত টানিয়া না তুলিলে সত্বর ইহারা হিন্দুত্বের তরণী ভরাডুবি করিয়া দিবে। বাঙ্গালী হিন্দুকে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইতে হইলে আন্তরিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উৎসব পূজার আয়োজন করিতে হইবে; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় ধ্যান প্রতিবিম্বিত ভাবদ্যোতনাময় প্রতিমা।

এই প্রতিমা কিরূপে নির্ম্মিত হইবে? জনসাধারণ, যাহাদের পূজা, তাহারা শিক্ষা সাধনায় জাগ্রত না হইলে অর্চনার প্রকৃত আধার প্রস্তুত হইবে না। মনে রাখিতে হইবে প্রতিমা যন্ত্র, উহা ভাবময়ী হইয়া সাধকের হৃদয়ে আপনার আসন গ্রহণ করে, আত্মস্থ পরমদেবতার সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করিতে সাহায্য করে। প্রতিমার নির্ম্মাণ-পরিকল্পনার দৈন্য দৃষ্টে সর্ব্বতঃই ধারণা করিতে পারা যায়, ভগবানের প্রেরণা লাভ করিবার, দেবতাকে আপন গণ্ডীর মধ্যে অনুভব করিবার প্রথম সোপান যে পূজা তাহাই অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের অধঃপতনের উহা অন্যতম কারণ কিম্বা উহা আমাদের অধঃপতনজনিত ফল। ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না ও ভাবহীন মূর্ত্তিতে ভক্তি আরোপ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং ভক্তিই কি বাঙ্গালী সাধকের সহস্র বৎসরব্যাপী সাধনার একমাত্র উপজীব্য নহে? মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ভাব, প্রেরণা ও উদ্দীপনাময় না হইলে তাহাতে ভক্তি আরোপিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

তবে, মূর্ত্তিকে কিরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিব? ইহাই প্রশ্ন। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সহজ ব্যাপার নহে, সহস্র মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভূত করাইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। শিল্পীর কার্য সমধিক কুশলতা সাপেক্ষ, কঠিন। শিল্পীই প্রধানতম সাধক, তাহার ধ্যানমানসে দেবতার যে রূপ প্রতিভাত হইবে মূর্ত্তিতে আমরা তাহারই প্রতিবিম্ব পাইব, এবং উহার সাহায্যে দেবতা আমাদিগের মানসগোচর হইবেন—এই গুরুতর কার্য সংসাধিত করিবার জন্য প্রাচীন যুগে শিল্পীকে পথ দেখাইতে বহু শাস্ত্র বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আজ সে সকল শাস্ত্র ও গ্রন্থের সংবাদ কয়জন শিল্পী রাখিয়া থাকেন? সেই সকল সুনির্দ্দিষ্ট শাসনাবলীর মধ্যে থাকিয়াও শিল্পী আপনার প্রতিভাস্পর্শে কত সুন্দর মূর্ত্তি-ই না প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুতরাং শিল্পীর নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিমা পাইতে হইলে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে, অন্তত সেই সকল সংস্কৃত শাস্ত্র ও গ্রন্থের প্রবচনগুলি সহজ করিয়া তাহাদের নিকট ধরিতে হইবে, নতুবা এই গতানুগতিকতা হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। এই ত গেল শিক্ষার দিক। কিন্তু সাধনার দিকও উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ শিক্ষা গৌণ, সাধনাই মুখ্য। যে শিল্পী আমাদের জন্য প্রতিমা প্রস্তুত করিবে তাহার যদি সাধনা না থাকে, যদি গঠনীয় দেবতা তাহার ধ্যানমানসে প্রতিবিম্বিত না হয়, তবে ত তাহার মূর্ত্তি গঠন করা বৃথা, তাহার গঠিত মূর্ত্তিতে আমাদেরই বা কি উপলব্ধি হইবে?

এইখানেই তথাকথিত রেনেসাঁসপ্রয়াসী নব্য শিল্পীকুলের অসাফল্যের কারণ। ইহাদের শাস্ত্রশিক্ষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত সাধনার অভাবও কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সহস্র বৎসরের বংশানুক্রমিক অভ্যাস ও কুশলতায় সঞ্চিত যে শক্তি আমাদের জাতশিল্পীর রহিয়াছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও ইহারা কোন যাদুর প্রভাবে যেন তাহাদিগকে রাতারাতি অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহেন।

বস্তুত চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহ এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন সাহায্যই করিবে না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মূর্ত্তি সমূহের ভাববৈভবের বিভেদ তাঁহাদের উপলব্ধি হইবে না। যুগবিভেদে মূর্ত্তির প্রকাশভঙ্গির তারতম্য পরিলক্ষণের ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। ফলে যে অনুকরণ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে গুপ্তযুগীয় মূর্ত্তির সহিত পালযুগের গৌড়ীয় রীতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ও এমনি বহু অসম্ভব

পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তদুপরি ছাত্রসমাজের পূজোপলক্ষে যে অজস্র দেবী সরস্বতীর মূর্তি নির্ম্মিত হয় তাহাতে গ্রীসীয় লীডিয়ার প্রভাবের ছাপ দেখিয়া বিরক্ত না হইয়া উপায় নাই। হায়, অল্পশিক্ষা কিরূপ ভয়ঙ্করী! হিন্দুর পুরাণোক্ত দেবী ও হেলেনীয় পুরাণের লিডিয়ার পার্থক্য বুঝিবার শক্তি এই রেনেসাঁসের ফলে আজও যদি আমাদের না হইয়া থাকে তবে এ শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দেওয়াই ভাল।

তাহার পর, পুস্তক ও শাস্ত্রগত শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই চলিবে না, বিভিন্ন যুগের ভাব তারতম্যবিশিষ্ট মূর্তিগুলিও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহনীয় দিনগুলিতে যে পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে ভাব আত্মস্থ করিয়া পরিচালিত হইলেও চলিবে না। কারণ, উহা জনসাধারণ, এমনকি তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতেরও অনুধাবনার অতীত। কারণ সে যুগ ভারতবর্ষের সভ্যতার পরিপূর্তির যুগ, যুগব্যাপী সাধনার ধ্যান ধারণার ও ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ের সুপরিপক্ব ফলস্বরূপ। উহাকে সম্যকরূপে বুঝিবার ও অনুধাবনা করিবার মত শিক্ষার আধুনিক যুগে নিতান্তই অভাব অধিকন্তু সে যুগকে জানিবার কতটুকু উপাদানই বা আমাদের আছে?

অন্যদিকে আমাদের নিজেদের দেশেও পাল-পূর্ব্ব, পাল ও সেন যুগসমূহে যে সকল অসংখ্য মূর্তি প্রস্তুত হইয়াছে উহাদিগের মধ্যে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারা যায়। বলিতে কি, সভ্যতার একটা যুগ আসিয়া যেন গুপ্তযুগে পূর্ণতা লাভ করিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পরে স্বাভাবিক নিয়মের ফলেই যে অধঃপতন (decadence) আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে বহু কালের জন্য উত্তর ভারতের সৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিলেও বাংলা সে স্তব্ধতা স্বীকার করিয়া লয় নাই। শাস্ত্রগুলি তৎপূর্ব্বেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভাবরসে নিমজ্জিত সাধক শিল্পীর বংশও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাই দেখিতে পাই সেই স্বর্ণযুগের অবসানের পর বাংলা শিক্ষা ও সাধনায় আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। এ প্রতিষ্ঠা মুসলমান আগমন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। তাহার পরই এই অধঃপতনের যুগ আরম্ভ।

মধ্যদেশীয় ও গৌড়ীয় শিল্পীর শিল্পপ্রেরণার উৎস মূলতঃ এক হইলেও তাহাদের আপাতপার্থক্যও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য—ইহা মধ্যদেশীয় ও বাঙ্গালী স্বভাবের তারতম্যের ফল, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যজনিত সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম দেশীয় সভ্যতা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার চূড়ান্ত ফল। একটা সাধনা, একটা জীবনযাত্রার ধারা আসিয়া যেন পূর্ণতার শীর্ষে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের সৃষ্ট শিল্পও তাই আপনাতে পরিপূর্ণ। তখনও প্রতিমা যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই, প্রতি মানুষই বুদ্ধত্বের অধিকারী, পূজক ও পূজিত অভেদ। আপনাতে আপনি পর্য্যবসিত এযুগের মূর্তি তাই ভাবপরিকল্পনার চূড়ান্ত। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর কলকল্লোল আর শুনিতে পাওয়া যায় না, স্থির অতলস্পর্শ মহাসাগরের মত সকল ভাব, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল পরিকল্পনা, পার্থিব সকল কিছুই যেন সাধন প্রভাবে প্রতিমার অন্তস্থলে অবগাহন করিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, হিন্দুর সকল পরিকল্পনার সকল যাত্রার উহাই পরিসমাপ্তি, মানুষ আপনি দেবতা হইয়া সেই মহাসাগরের অন্তস্থলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, উহাই সে যুগের প্রতিমা—বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা দ্বারা এই অবস্থাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ মূর্তিসমূহ আমাদিগকে আনন্দদান ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিবে না—চিত্রশালাই উহাদের স্থান, পূজাগৃহ নহে। কিন্তু বাংলা সেই যুগে জ্ঞান সম্বলিত হইয়া পরবর্তী অধঃপতনের যুগে আপনার শিক্ষা ও সাধনায় যে ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল, তাহার চিহ্ন অসংখ্য গৌড়ীয় প্রতিমায় আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের সাধনার ধারা হইল ভিন্ন, দেবতা দেবতা, মানুষ অধিষ্ঠিত হইল সাধকরূপে, ভক্তি হইল দেবপূজার উপজীব্য। তাই দেখিতে পাই এ যুগের প্রতিমার ধ্যানস্তিমিত নয়ন হইতে স্বর্গীয় করুণার ধারা অজস্রধারে চন্দ্রকরোজ্জল রজনীর সুধার মত ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দেবতা মৃদু হাসিতেছেন, ভক্ত আপনার ধ্যানে সেই হাসি দেখিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে।

ইহাই বাংলার নিজস্ব। আমাদের যুগে করুণাময় দেবতার প্রসাদ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় তুমি শিল্পী, আপন সাধনার বলে আর একবার কি তুমি স্বর্গের দেবতাকে আমাদের গৃহমণ্ডপে আনিতে পারিবে না? হীনতা, মূর্খতা, মূঢ়তা ও অসভ্যতা হইতে আমাদের উদ্ধারবার্তা শুনাইতে পারিবে না? আমরা তোমারি আসার অপেক্ষায় রহিলাম।

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অপেক্ষায়

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণী লিখিয়াছে—

ছোট্ট চিঠি, কিন্তু এই কয়টি লাইনের মধ্য দিয়াই ওর আনন্দ-রূপোজ্জল মূর্তিখানি যেন রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওর রহস্য-গভীর দুটি কালো চোখের মায়া, ওর হাসির বিচিত্র লীলাতরঙ্গ আসিয়া অনেক দিন পরে প্রভাষের মনকে আবার দোলাইয়া তুলিল। ওর অন্তরের প্রসুপ্তি-মগ্ন নীরবতা কেমন করিয়াই যেন সুরে সুরে মুখর হইয়া উঠিতেছে।

জানালার বাহিরে পৃথিবী সদ্য-প্রভাতের আলোয় স্নান করিয়া যেন নব-চেতনার উন্মেষে শিহরিয়া উঠিতেছিল,—কৃষ্ণচূড়ার শ্যামশ্রী মঞ্জরীর রক্তরাগে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকাশের ওপারে খানিকটা উজ্জ্বল নীলিমা চোখে পড়িতেছে, সেখানে মেঘের লেশ মাত্রও নাই। টব-বারান্দায় ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস আসিতেছে, ফুল ও অর্কিডের পাতাগুলি কাঁপিতেছে, ঝল্মল করিয়া দুলিতেছে প্রভাতী-সূর্যের আলো।

প্রভাষের মনে হইতে লাগিল : বাহিরের পৃথিবীর এই সহজ দ্বিধাহীন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আজ ওর মনের ছন্দ কেমন করিয়াই যেন মিলিয়া গেছে, বাজিতেছে এক বিচিত্র ঐক্যতান। অন্তরের সঞ্চিত যত বোঝা এক মুহূর্তেই যেন লঘু হইয়া গেছে ও নিজেকে দিকে-দিগন্তে প্রসারিত করিয়া জগতের আনন্দ-স্পন্দন একাগ্রভাবে অনুভব করিতে পারিতেছে। এই যে লবঙ্গ-লতিকার বল্লরী জানালা বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে, এই মুহূর্তে যে প্রজাপতিটা তার চিত্র করা রঙীন হালকা পাখা মেলিয়া ওর সামনে দিয়া উড়িয়া গেল, সকলেই সেই অন্তরোৎসারী সঙ্গীতের সঙ্গে যেন তাহাদের সুর মিলাইয়া দিল।

কল্যাণী লিখিয়াছে—

বাস্তবিক, ওর হাতের লেখাগুলো ভারী সুন্দর, যেন সারি সারি মুক্তো বসানো রহিয়াছে। প্রভাষের মনে হইল উপমাটা একটু সেকেলে হইয়া গেল হয়তো; কিন্তু সেকেলে হইলেও কথাটা অস্বীকার করিবার যো নাই। ও যেন অক্ষরগুলোকে লেখে নাই, বহুক্ষণ ধরিয়া বহু যত্নে আঁকিয়া রাখিয়াছে। হাঁ,—কল্যাণী ভালো ছবি আঁকিতে পারে বৈকি! ইজেলের উপর দিয়া ওর রঙের তুলিটা লীলায়িত গতিতে বহিয়া যায়, রেখায় রেখায় ছবি অনুপম শ্রী-সৌন্দর্যে প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে। ওর ছবি দেখিলে মনে হয়, কোথাও একটু রঙের বাহুল্য নাই, কোথাও একটি রেখার অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্টের সংজ্ঞাও জানে না, শিল্প-কলা সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা শিল্প রসিকতার পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। নিছক ভালো লাগাটাই সৌন্দর্য বিচারের মাপকাঠি হইলে কল্যাণীর ছবির সৌন্দর্যের তুলনা নাই, একথা ও মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারে।

কল্যাণী ছবি আঁকে, ছবির চাইতে ওর আঁকা দেখিতেই ও বেশি ভালোবাসে হয়তো। ওর ধ্যান-নিমগ্ন আত্মস্থ মুখখানির উপরে কেমন যেন একটা আভা ছড়াইয়া পড়ে, ওর আয়ত কালো চোখ দুটি সৃষ্টির প্রেরণায় স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া যায়। ওকে যেন চিনিতে পারা যায় না। হয়তো প্রভাষ নিঃশব্দ-চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ওর পেছনে আসিয়া দাঁড়ায়, আত্মমগ্না কল্যাণী ওর আবির্ভাব জানিতেও পারে না। মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রভাষ ওর সতর্ক সৃষ্টিমগ্ন অনুপম আঙুলগুলির দিকে চাহিয়া থাকে। হয়তো এক সময়ে রঙের বাটিতে তুলি ডুবাইতে গিয়া কল্যাণী ওর আবির্ভাব বুঝিতে পারে। সলজ্জে তুলিটা রাখিয়া দিয়া মৃদু সঙ্কুচিত হাসিয়া অনুযোগ করে: "কখন এলে প্রভাষ দা? ছিঃ এমনি চুরি করে এসে দাঁড়ানো—এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়, অন্যায় জানো?"

প্রভাষ হাসে: "চুরি না ক'রলে পৃথিবীর অনেক ভালো জিনিষ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় যে।"

—কিন্তু কল্যাণী লিখিয়াছে:

চিঠি ছোট হইলেও কোথাও এতটুকু অবান্তর নাই, অসম্পূর্ণতা নাই। ওর ছবির মতোই নিজের সীমাকে কোথাও অতিক্রম করিয়া যায় নাই। প্রভাষ আবার চিঠিটা পড়ে:

"প্রভাষ দা,

আজ ছ'মাস দেখা নেই। তুমি এত বিষয়ীলোক হ'য়ে উঠেছ যে কোল্‌কাতা আসবার সময়ই মোটে পাওনা; কিন্তু আমি জানি, এর ভেতরে অভিমানের কথাটাই সব চাইতে বড়। সে অপরাধের জের এখনো মিটল না, কী সর্ব্বনেশে লোক তুমি।

কথা দিয়েছ, বড়দিনে কোলকাতা আসবে, এসো কিন্তু। মা তো সর্ব্বদাই তোমার কথা বলেন। বাবাও সেদিন বল্‌ছিলেন: প্রভাষ এম-এ দিয়ে দেশে গেল, ভেবেছিলুম, মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রবে, কিন্তু নিজের জমিদারী 'ম্যানেজ' কর্‌তে আজকাল বোধ হয় এত ব্যস্ত, যে বাইরে পা বাড়াবার আর সুযোগই পায় না।—হবেও বা।

আমরা আপাততঃ পুরী চ'ললুম—মাস দু'য়েকের মতো। পরশু সকাল সাড়ে ছ'টার ট্রেণে অ্যাটেণ্ড কোরো, আধঘণ্টা ষ্টপেজ, অনেক কথা রইলো। না এলে বুঝব অভিমান এখনো যায়নি; আর একথাও মনে রেখো ও জিনিষটা শুধু তোমার একারই নয় আরো অনেকেরও থাকতে পারে। ষ্টেশনে থেকো নিশ্চয়। ভুল না হয় যেন।

আচ্ছা কতদিন তো হ'য়ে গেল, একবার দেখতেও কী ইচ্ছে করে না; প্রণাম জেনো—

কল্যাণী"

সত্যি, কী সুন্দর কথা গুছাইয়াই ও লিখিতে পারে, হাজার চেষ্টা করিলেও কখনো প্রভাষের এমনটি হয় না। কোনো কথা বলিতে গেলেই ও সমস্ত চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলে, অনেক কিছুই বলা হইয়া যায়, কিন্তু আসল কথাটিই হয়তো আত্মপ্রকাশ করিতে পায় না। প্রভাষ ভাবে: ও যদি কখনো কবিতা লেখে, তাহা হইলে ছন্দ ও কথার আচ্ছাদনটাই সেখানে সকলের চাইতে বড় হইয়া উঠিবে, অন্তশ্চারিণীটির সন্ধান কোনোমতেই হয়তো মিলিবে না।

কিন্তু কবিতা লেখার কী দরকার—জীবনটাই তো একখানা অভিনব সুরে সৌন্দর্যে রচিত কাব্যের মতো খোলা রহিয়াছে। আকাশ যদি কখনো শ্রাবণের মেঘে কালো হইয়া ওঠে, তখন যে বিরহিণী তরুণীর বেদনাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি শূন্য মন্দিরে অশ্রুপ্লাবিত হইয়া যায়; বসন্তের স্বপ্ন বিন্যাসের সাথে সাথে যাহারা আবীর কুঙ্কুম চন্দনের রঙ্‌ মাখিয়া প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইয়া ওঠে, তাহাদের কাব্য ছন্দে, কল্পনায় প্রকাশ না পাইলেই বা ক্ষতি কী। সে কাব্য যুগে যুগান্তে নরনারীর অন্তরেই রচিত হইয়া চলে, সুন্দরের লীলাচ্ছলনায় তাহার গীত-ঝঙ্কার উচ্ছল হইয়া বহিয়া যায়।

হাঁ জীবনটাই কাব্য! কল্যাণী ওকে ভালোবাসে, এই চেতনাটা যখন মনের মধ্যে সহসা নিঃস্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ওর শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে যে কলধ্বনি ঝঙ্কিয়া উঠিয়াছিল, কোন্ মন্দাক্রান্তা ছন্দ সে ছন্দের চেয়ে মধু মাদকতায় পরিপূর্ণ। বিয়েট্রিসের জন্য দান্তের অপূর্ব্ব প্রেম কল্পনা, ব্যর্থ প্রেমিক কীটসের সকরুণ বেদনাভার, শিলারের সুর-বিন্যাস, শেলীর উচ্ছল 'ইমোশান', ব্রাউনিঙের আলো-আঁধারি, রবীন্দ্রকাব্যের ইন্দ্রিয়-সীমার অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতি, কালিদাসের বিরহ-মিলনের অপরূপ সুরোল্লাস জীবনে প্রথম প্রেমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কী নিষ্প্রভ হইয়া যায় না? কাব্যের বাহিরে মানবচিত্ত সেদিন যে অনাস্বাদিত আনন্দ ধারা পান করিয়া সহসা আত্মহারা হইয়া যায়, তাহার কাছে 'ডিভাইন কামেডী' 'ডন জুয়ান' যেমন দীপ্তিহীন, তেমনি অর্থহীন ইলিয়ট লরেন্সের অবাস্তব বাস্তববাদ।

কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা ওর মনে পড়িতেছে। সে আজ তিন বছরের কথা, ও তখন প্রেসিডেনসি কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। ওর কয়েকটা রচনা পড়িয়া প্রফেসার মুখার্জি অত্যন্ত খুসি হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, হাজরা রোডে ওঁর বাড়িতে আসিয়া দেখা করিতে। চিরকালের লাজুক প্রকৃতির প্রভাষ অত্যন্ত

সঙ্কুচিত চিত্তে বড় বাড়িটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ঢুকিবে কিনা ইতস্তত করিতেছিল, এমনি সময় মোটর হইতে নামিয়া আসিল কল্যাণী, ওকে ও ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কী ভাবিল কে জানে, সোজা সামনে আসিয়া প্রশ্ন করিল: "আপনি প্রফেসার মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বোধ হয়?"

প্রভাষ নিজের মধ্যে আরো সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

অত্যন্ত সহজ ভাবে কল্যাণী বলিল: "আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

প্রভাষ বাঁচিয়া গেল, কিন্তু ওর স্বভাব-লাজুক কণ্ঠ হইতে একটা ধন্যবাদও বাহির হইল না। নিঃশব্দে কল্যাণীকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইল।

প্রফেসার ওকে দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, বসাইয়া বলিলেন, "এই যে ছেলেটি, যা'র কথা সেদিন তোমায় বলেছিলুম কল্যাণী। সেই Modern culture সম্বন্ধে—"

কল্যাণীর চোখে মুখে সশ্রদ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল: "ইনিই?···নমস্কার, প্রভাষবাবু, বাবার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে আর অপরিচিত ব'লে মনেই হয় না, তাই নয় বাবা?"

প্রফেসার হাসিমুখে মাথা নাড়িলেন।

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা বা জড়তা নাই। তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া প্রভাষের স্বভাব ভীরু চিত্ত নিজের সঙ্কোচে নিজেই অত্যন্ত লজ্জা পাইল। ওর মুখের উপর যে আরক্ত আভাটুকু গোলাপী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কল্যাণীর দৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যায় নাই।

—"আমি চায়ের ব্যবস্থা ক'রতে বলি" বলিয়া মৃদু হাসিয়া কল্যাণী বাহির হইয়া গেল।

প্রফেসার সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে আলোচনা যেন ওর মস্তিষ্কের বা মনের কোথাও আসন গাড়িতে পারিতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া এই সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়েটির উজ্জ্বল মুখশ্রীই শুধু ওর মনের মধ্যে সেদিন জাগিয়া উঠিতেছিল।

—এইখানে-প্রথম অধ্যায়।

খোলা জানালার সামনে একটা টেবিলের উপর পা মেলিয়া দিয়া প্রভাষের মন আবার সেই পুরোনো দিনগুলির দিকেই ফিরিয়া চলিয়াছিল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা হইতে যে সরু নীলাভ ধোঁয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতেছিল, সেই ধোঁয়াটুকুর সঙ্গে সঙ্গে যেন মনের মধ্যেকার অনেক দিনের খুঁটি নাটি চিন্তা ভাবনার পাক একে একে খুলিয়া যাইতেছিল। কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল-পল্লব ঝুর ঝুর করিয়া কাঁপাইয়া বাতাস আসিতেছে, ওর অন্তর রাজ্যে একে একে যেন পট পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে।

তা'র পরবর্তী ইতিহাস হয়তো চিরাচরিত। প্রফেসার মুখার্জির সঙ্গে সাহিত্যালাপ ওইখানেই সেদিন শেষ হইয়া যায় নাই, যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়াছে, টেনিসন, রসেটি, মেরিডিথ, মুর অথবা মেসফিল্ড, ইয়েটসের বাহিরে সত্যকারের কাব্য সৃষ্টি এবং কবিতার রসাস্বাদন ঘটিয়াছে। অপরের ভাব কল্পনা বা অনুভূতি দিয়াই নয়, ম্যাথু আর্ণল্ড, আনাতোল ফ্রাঁসের সমালোচনায়ও নয়, সে রসাস্বাদন একান্তই নিজের।

ওর আবার মনে পড়িল: জীবনটাই একটা কাব্য!

—কাব্য নয় তো কী! সেদিন শনিবার, সন্ধ্যার সময় প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া জানিল, অসামাজিক ভদ্রলোক নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বন্ধু বান্ধবদের একান্ত টানাটানিতে কোথায় একটা চায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। ফিরিতেছিল, কল্যাণী আসিয়া বলিল, "আসুন না প্রভাষদা, একটু গল্প ক'রবেন।"

···সেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া গিয়াছিল। নির্জন বারান্দাটা জুড়িয়া চাঁদের আলো ঝলকে ঝলকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কবিতায় যেমন লেখা থাকে, তেমনি কোথাও একটা পাপিয়াও ডাকিতেছিল বোধ হয়। বাতাসে হাস্নুহানার গন্ধের মাদকতা, সমস্ত আকাশ যেন নেশায় ঝিমাইয়া পড়িয়াছে!

পৃথিবীর সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাঝখানে দু'টি তরুণ মন অকস্মাৎ আনন্দ জাগরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ওর হাতের মধ্যে কল্যাণীর এক রাশি ফুলের মতো নরম হাত

দু'টি ধরিয়া রাখিয়া ও বলিয়াছিল, "জীবনে এর চাইতে বড় সত্যি কী আছে ব'লতে পাবো ?"

কল্যাণী আবিষ্ট গভীর চোখ দু'টি ওর মুখের ওপরে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বলিয়াছিল, "জানিনে।"

প্রভাষ দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটা জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। বাহিরে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতেছে, ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে কৃষ্ণচূড় গাছের ছায়াটা। কী একটা পাখী এ পাশের ডালটায় আসিয়া উড়িয়া বসিল, ঝরিয়া পড়িল কয়েকটা ফুলের পাপড়ী...

প্রভাষ কল্যাণীর চিঠিটা তুলিয়া লইল :—"অভিমানের কথাটাই সব চাইতে বড়"—হাঁ, অভিমান বই কি! এম-এ পরীক্ষা সেদিন শেষ হইয়াছে, আসিয়াছিল কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করিতে। আসিয়া দেখিল, কল্যাণী বাড়িতে নাই, কোথায় বাহির হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর কল্যাণীর সাক্ষাৎ মিলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? আমি তোমার জন্তে কতক্ষণ থেকে ব'সে আছি, কী অন্যায় বলো তো ?"

সহসা কল্যাণী অপ্রত্যাশিত জবাব দিয়া ফেলিল ;—"আমার চলা ফেরা সব তোমার মর্জি মতো ধরা বাঁধা থাকবে, আমার নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য থাকবে না, তোমার এ দাবী অত্যন্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত।"

কথাটা এত তীব্র এবং আকস্মিক যে প্রভাষ কয়েক মুহূর্ত যেন বিমূঢ় হইয়া রহিল। ইহা বিদ্রূপ অথবা সত্য, হয়তো সেটা যাচাই করিবার জন্যই ম্লান মুখে বলিতে চাহিল ; তোমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার মূল্য সকলের আগেই, সেকথা কে না স্বীকার ক'রবে, কিন্তু সত্যিই কী তুমি আমাকে এতটুকুও দাবী দাওয়ার অধিকার—"

কিন্তু কল্যাণীর তীব্র কণ্ঠস্বরে শেষ কথাটা ডুবিয়া গেল : 'যদি দিয়েও থাকি, তবে তা' আজ নয়, এখনো তার দেরী আছে। এখনো এ সম্বন্ধে কিছু বলা যে তোমার সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা, এ কথা আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য হ'চ্চি প্রভাষ দা!"

প্রভাষ নতমুখে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "নমস্কার, আমি আসি তা' হ'লে। পারো তো অপরাধটা ক্ষমা কোরো। স্যারের সঙ্গে আর দেখা করবার সময় হোলো না, তাঁকে বোলো, আমি কালকেই দেশে যাচ্চি।"

দরজা দিয়া পা বাড়াইতেই কল্যাণীর উচ্ছ্বসিত হাসির কল-তরঙ্গ ওর কাণে আসিয়া আঘাত করিল, পেছন হইতে ডাক আসিল : "প্রভাষ দা, যেয়োনা, যেয়োনা, শোনো, শোনো—"

কিন্তু প্রভাষ আর দাঁড়ায় নাই।

যে অপ্রত্যাশিত ব্যথার আঘাত ওকে জর্জরিত করিয়া দিয়াছিল, তার যন্ত্রণায় ও পরের দিন পর্যন্তও অপেক্ষা করে নাই, দু' ঘণ্টার মধ্যেই জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া মেলে উঠিয়া বসিয়াছিল। মনে হইয়াছিল—এক মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ একান্তভাবে বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে, আকাশের সমস্ত প্রসন্ন সৌন্দর্য যেন বর্ষার মেঘে কালো হইয়া গেছে। সে রাত্রে মেলে কলিশান হইয়া যদি ধ্বংসের তাণ্ডব ঘটিয়া যাইত, তাহাতেও ওর বিন্দুমাত্রও আপত্তি হইত না নিশ্চয়।......

কিন্তু সে দুর্দিন বেশিক্ষণ থাকিতে পারে নাই, হাসির আলোয় কাটিয়া গেছে। কল্যাণী ওর মারাত্মক পরিহাসের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাহিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে চিঠিতে, ওদের মধ্যবর্তী প্রবাহিনী আবার স্বচ্ছতোয়া, সানন্দা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কাযে জড়াইয়া পড়িয়া ছ' সাত মাস যাবৎ কলিকাতায় যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই, ঠিক করিয়াছে, আর মাস তিনেকের পরে হাতের জমানো কাজগুলি যখন কমিয়া যাইবে, তখন কলিকাতায় গিয়া প্রফেসারের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ওদের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। ওদের মনের লীলা খেলার সংবাদ হয়তো এই অসাংসারিক বাণী-সেবকের অজ্ঞাত, কিন্তু কল্যাণীর মা'র তাহা অবিদিত নাই। তাঁহার সানন্দ অনুমোদন তো আছেই, প্রফেসারও নিশ্চয় খুব খুশি হইবেন, নিঃসন্দেহ।

কাল সকাল সাড়ে ছ'টার ট্রেণে ষ্টেশানে অ্যাটেণ্ড করিতে হইবে বই কি! সত্যিই তো, কতদিন দেখা হয়

নাই, কল্যাণীর এই ক'মাসের মধ্যে কতখানি পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, কে বলিবে! আবার হয়তো কিছুই হয় নাই। ওর আয়ত নিবিড় চোখ দুটি তেমনি কৌতুকে টলমল করিতেছে, ওর হাসি তেম্‌নি বিদ্যুতের মতো মনের মাঝে শিহরণ জাগাইয়া বহিয়া চলিয়া যায়। ওর অর্দ্ধ-সমাপ্ত পদ্মার ছবি হয়তো কবে আঁকা শেষ হইয়া গেছে, ওর পরিকল্পিত "বসন্তের আবির্ভাব" ছবিটী হয়তো অপরূপ হইয়া রেখায় রেখায় ফুটিয়া ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ওর আঁকা "কাল-বৈশাখী"'র ছবিখানা হয়তো চন্দননগর একজিবিশানে উচ্চশ্রেণীর প্রশংসা অথবা পুরস্কার পাইয়াছে!

—অভিমান! নাঃ, সে অভিমান ওর কবে ভাঙিয়া গেছে। কল্যাণীর উপরে অভিমান করিয়া ও কখনো থাকিতে পারে নাকি? হালকা-মেঘ বাতাসে উড়িয়া যাইতে কতটুকুই বা সময় লাগে—লাগে নাকি কোনো দিন?

সাড়ে ছ'টার ট্রেণ! সত্যি আজকাল ওর ঘুম ভাঙিতে বড় দেরী হইয়া যায়, আটটার আগে ও উঠিতেই পারে না। এ যে কী বদ্‌-অভ্যাসেই ওকে পাইয়া বসিয়াছে! হোষ্টেলে থাকিতে কিন্তু ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙিয়া যাইত, ব্যতিক্রম হইত না কখনো। কিন্তু কল্যাণী যদি ওর এই বর্ত্তমান নিদ্রালুতার সংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে ভাবিবে যে কী! হয়তো খিল্‌খিল্‌ করিয়া খানিকটা মিষ্টি হাসি চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে,—কী বলিবে? বলিবে: "প্রভাষ দা আজকাল রীতিমত জমিদার হয়ে উঠেচে কিনা, তাই ঘুমটাও জমিদারী প্যাটার্ণের হয়ে দাঁড়িয়েচে।"

জমিদারী প্যাটার্ণের ঘুম। প্রভাষের হাসি পায়। কিন্তু কালকের দিনটায় ওর জমিদারী ঘুমটা স্থগিত রাখিতে হইবে নিশ্চয়। কাল যদি ষ্টেশানে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা না হয়, তাহা হইলে কল্যাণীর ক্ষোভ-দুঃখের সীমা থাকিবে না—ওর নিজেরই থাকিবে নাকি? অভিমানের রূপে মিথ্যা আনিয়া সহজেই 'কমেডি'কে 'ট্র্যাজিডি' করিয়া তুলিবে।......

কিন্তু কী পাগলামি! দেখা না হইবেই বা কেন? এই তো এখানে ষ্টেশান, দুই পা বাড়াইয়া দিলেই। আর ঘুম যদি নেহাৎই না ভাঙে, ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়া রাখিলেই তো চলিবে।

বেলা বাড়িয়া চলে। চাকর আসিয়া বলে, "বাবু, স্নানের জল দিয়েচি।"

প্রভাষ উঠিয়া পড়ে। কাল সকাল সাড়ে ছ'টার ট্রেণ, কল্যাণী আসিবে! কেমন করিয়া ওকে অভিনন্দিত করিবে কে জানে, হয়তো অনুতপ্ত চোখ দুটি ওর মুখের পরে রাখিয়া চাপা সুরে বলিবে, "আর রাগ নেই তো প্রভাষ দা?"

ও তেম্‌নি চুপি চুপি বলিবে, "না।"

...অলস-কল্পনার মধ্য দিয়া দিনটা কাটিয়া যায়।

সন্ধ্যা আসে, রাত্রির বিচিত্র মায়াজাল অন্ধকারকে জড়াইয়া জড়াইয়া ছড়াইয়া পড়ে। রাস্তায় বিজলী আলোর দীপালি সুরু হইয়া যায়, শুধু একা কৃষ্ণচূড়া গাছটা অন্ধকার মাখিয়া প্রেত মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া থাকে। ঝিঁঝিঁর একটানা সুর রাত্রির দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কাণে ভাসিয়া আসে!

—কল্যাণী!

এই শান্ত-স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সঙ্গে ওকে যেন মিলাইয়া লওয়া চলে। ওর মাঝখানে রহিয়াছে এমনি একটা স্নিগ্ধতা, এমনি প্রশান্তি, পৃথিবীতে শুধু এই নিবিড় স্বপ্নালস-মুহূর্ত্তটিতেই যেন ওর সঙ্গে মনের সত্যকারের পরিচয় ঘটে। বাহিরের উজ্জ্বল অত্যুগ্র আলোর মাঝখানে কল্যাণীর কল্যাণ-মূর্ত্তিটি চোখে পড়ে না, ও তখন দূরে সরিয়া যায়; কিন্তু এই রাত্রি-দিনের ছায়াবর্ণী সন্ধি-লগ্নে ও অন্তরের প্রিয়তমা হইয়া আসিয়াই মনকে অধিকার করিয়া বসে।

—খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া যায়, রাত্রি বাড়ে।

ওর মনের মধ্যে নিঃশব্দে কতকগুলি হারাণো দিন অভিসার করিতে থাকে,—সিনেমা, লেক, কবিতার বই, জুয়োলজিক্যাল গার্ডেন। ঘুম আসিতে চায় না। ঘড়িতে ও পাঁচটার অ্যালার্ম দিয়া রাখিয়াছে। ষ্টেশান তো এখান হইতে এখানেই, তবু দেড় ঘণ্টা সময় হাতে রাখা ভালো, কিসে দেরী হইয়া যায়, কে জানে?

বিনিদ্র রাত্রিকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনার একটি সংসার গড়িয়া উঠিতে থাকে। ও জাগিয়া জাগিয়াই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। কল্যাণীর কল্যাণ স্পর্শে জীবন তখন রূপে রসে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও একটু অভিযোগ

নাই; এতটুকুও অপূর্ণতা নাই। জীবন ঝর্ণার মতো কলচ্ছন্দে বহিয়া যায়—

—ওর অজ্ঞাতেই হয়তো রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া যায়—বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে ধীরে ধীরে তন্দ্রা ওকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। স্বপ্নের মধ্য দিয়া নিঃশব্দচারিণী কল্যাণী ওর পাশে আসিয়া বসে, হাসিয়া ধীরে ধীরে ওর মুখের ওপরে মুখ নামাইয়া আনে……

বাইরে অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছে, ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজে—পাঁচটা। ওর সম্ভোগভীর নিদ্রা ঘড়ির গুঞ্জনে এতটুকুও ব্যাঘাত পায় না, অ্যালার্ম বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া যায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া চলে,—পাঁচটা—সাতটা—আটটা—

কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সকালের খানিকটা রোদ ঝিলমিল করিয়া আসিয়া ওর ঘুমন্ত মুখের উপরে লুটাইয়া পড়ে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

STUDENTS' ... P. C. ... CHROM...

হৈমনী

অধ্যাপক শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী এম্‌-এ

ডাক

ডাক্ দিয়েছে ধানের শীষে
পাক ধরানো হৈমনী—
আকাশ জুড়ে শাঁখ বেজেছে,—
উঠ্‌ল ধরা চন্‌মনি'!
জরদা গাঁদা পরদা তুলে
ফুলবাগানে উঠ্‌ল দুলে;
প্রজাপতি পাক্ ঘুরলে
পাখার নাচন্ কন্‌বনি!
হারিয়েছে আজ হিয়া গাঁয়ের
ঢেউ-খেলানো পথটিতে—
অবাক চেয়ে ধানের ভারায়—
ভরা জলের কলসীতে।
ওই ওখানে ব্যাকুল দেখি
ঝাড়্‌ছে কুলা—পড়্‌ছে ঢেঁকি,—
ওই প্রচুরের মূর্তি একি!
রমার চরণ-রনুরণি!
কাস্তে হাতে চল্‌ছে মাঠে
সরল গীতের ভঙ্গীতে—
ক্লিষ্ট দিনের স্বপ্ন মিলায়
স্মিতমুখের সঙ্গীতে,—
দুপুর রোদের চঞ্চলতা
পোহায় সুখে কুঞ্জলতা;—
খনির গোপন আজ আর কোথা?—
বাইরে ভাসে ওই মণি!
ডাক্ দিয়েছে ধানের শীষে
পাক-ধরানো হৈমনী!

শীষের দোলা

আজ আমাদের আনত শির
ধরার বুকে,—
পৌছেচি আজ পরিণতির
চরম সুখে।

ধন্ত ধরার স্তন্যপানে
ফুটেছি সব সোনাব ধানে,
হাওয়ার দোলা লাগছে প্রাণে
সকৌতুকে!
লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বাঁচাব
সগৌরবে!
'দাতার জগৎ—পাতাব জগৎ'—
সবাই ক'বে!
কতদিনের রিক্ততা যে
ভাঙবে চাষার হিয়ার মাঝে!
ফুট্‌বে আশা মুক্ত সাজে
হাস্য-মুখে!
আনন্দে আজ দোল্ সবে ভাই
হাওবার দোলে—
আনন্দে আজ লুটিয়ে পড়ি
মায়ের কোলে!
বেণুবন আজ মুখর শিষে;—
দেবীর আশিষ বইছে কি সে?
সব তেয়াগি' হারাই দিশে
দানের সুখে
লক্ষ-প্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে
ধরার বুকে।

প্রজাপতির উড়াল

ঝরকায় কর কার?—
চঞ্চল চিত্ত!—
চুম্‌কির চমকানি—
বিদ্যুৎ নৃত্য!
আস্‌মান ওড়্‌নায
সোনালীর রঙ্গ!
কুসুমের দোল্‌নায
সুষমার ভঙ্গ!
পাখ্‌নার ঝলমল্—
নশ্বর বিত্ত!
ঝর্‌কায় কর কাব?—
চঞ্চল চিত্ত!
কম-জল সরসীতে
চিক্‌মিক্ কল্লোল!
কাশফুল শিরে পেঁজা
শুভ্রের হিল্লোল!
ভোর বেলা কোয়াসায়
লেপ-চাপা ঝাউবন,—
টুপ্‌টাপ্ শোনা যায়
বিন্দুর গুঞ্জন!—
শূন্যের হাওয়া ঘরে
জাফরাণি নৃত্য!
ঝর্‌কায় কর কার?—
চঞ্চল চিত্ত!
শান্তির স্তব্ধতা—
পাথরের—পঙ্গুর!
রসিকের রস চাই—
হোক্ ক্ষণভঙ্গুর!
অপলক শাশ্বত,—
অচপল সাড়হীন,—
তার চেয়ে ঢের ভাল
নিমেষের তাজা দিন!
চায় হ'তে ক্ষণিকের
হর্ষের ভৃত্য!
ঝর্‌কায় কর হেরি'
চঞ্চল চিত্ত!

খঞ্জন নৃত্য

খঞ্জন নেচে চলে উচ্চ পুচ্ছ দোলে টিক্ টিক্
অঞ্জন কোয়াসায় পুঞ্জিত ধোঁয়াভরা দশ দিক্
অঞ্জন আঁখিঠারে বিদ্যুৎ চমকায পর্‌দায়,
খঞ্জন নেচে চলে অঞ্জন কোয়াসাব ঝর্‌ণায়!
সঞ্চিত যত গান অন্তরে ভরি' উঠে চঞ্চল,
ছন্দের তালে তালে কম্পিত অম্বরী- অঞ্চল!

এ নীলাম্বরী কার উড়ে বায়ু হিল্লোলে দমকায় ?
অঞ্জন আঁখি কার ঘুরে ফিরে উল্লসি' চমকায় ?
সন্ধান করে চোখ্ কোন্ প্রিয় বন্ধুকে অনিমিখ ?
খঞ্জন নেচে বলে "ওই হোথা ওই হোথা ঠিক্ ঠিক্।"—
অঞ্জন কোয়াসায় ঝরণায় গান যদি শোনা যায়,
দম্পতী প্রণয়ের স্বপ্নের তন্ত্রটি বোনা যায়।—
হৈমনী দিল ডাক্ হিয়া উঠে চন্‌মনি সেই ক্ষণ—
অঙ্গম সাতনরী বাবদুব হ'যে উঠে কঙ্কন।
গুঞ্জিত নূপুরের পুঞ্জিত ওই শোন্ প্রিয়ভাষ ;
শিঞ্জিত ওড়নায় উৎসবে উঠে কোন্ মৃদুহাস।
বন্ধুরে মিলে বুঝি ঈপ্সিত বন্ধুর দর্শন,—
কিঙ্কিনী তালে উঠে নন্দিত হৃদয়ের হর্ষণ।
মণ্ডিত পর্দায় কুণ্ঠিত কোয়াসায় দশদিক্,
অঞ্জন আঁখি ঘুরে— খঞ্জন পাখী ঘুরে— সুরসিক।

বটের ঝুরি

নামিল বৃদ্ধ বট
হেমন্তে এ নবীন ঝুরি।
কে এলে গোপন খোপে
খুঁজিতে তার পরীর পুরী ?
ভোলা মোর কোন্ সে বাণী,
হারাণো কি সুরখানি,
কে খুঁজে আন্‌লে টানি'—
জাগল সাড়া আবার ঘুরি' ?
ওরে ও বিহঙ্গমী
বাঁধবি বাসা আমার শাখে ?
শুনাবি সঙ্গীরে তোর
অশোক বাণী কুশল ডাকে ?
তা হ'লে তোদের পরে
জীবন উজান ব'য়ে
এখনো ছন্দে লয়ে
আন্‌ব জিনে সব মাধুরী।
ও পারে ঝাউবনে আজ
ঝাপসা হ'য় দিনের আলো।
কত যে মদির আশা
কত দিনের সব মিলালো।
তবু এ দিনের শেষে
রব না দীনের বেশে
তোদের এ উৎসবে সে
নাচবে মম মন-ময়ূরী
নামিল বৃদ্ধ বটে
হেমন্তে কী দোদুল ঝুরি।

জরদা পরীর নাচ

জরদা পরী নাচেরে ওই
জরদা পরী নাচে।
ফুলবাগানে গাঁদায় গাঁদায়
পাখনা মেলিয়াছে।
ধানের গোলায় আঙিনাতে
স্বর্ণ-কপিশ চরণ পাতে
হেমন্তে আজ চাঁদনীরাতে
লক্ষ্মী এল কাছে।
রাধাপদ্ম সূর্য্যমুখী
চন্দ্রমল্লিকায়
পীতধড়ার ভিড় লেগেছে
কুঞ্জ কুটীর হায়।
নাগকেশরে পরাগ উড়ে,
জরদা গুঁড়ায় আবীর ছুঁড়ে
দিগ্বধূরা আকাশ জুড়ে
দোল খেলিয়া বাঁচে।
জরদা পরী নাচেরে ওই
জরদা পরী নাচে।
ফাগুন দিনের আগুন হাওয়ায়
ক্লান্তি আসে পাছে
তাই সহে না হেমন্তে তাই
নাচেরে ওই নাচে।

হেমন্ত ও সকলে

হেমন্ত— অন্নপূর্ণা এসেছে আজ
সবার ঘরে।
শুনেছ কি চরণধ্বনি
হাওয়ার পরে ?
শুনেছ কি হৈমনীগান—
"কে বিলাবি বিলারে প্রাণ
বাঁচে বটে সেই যে বাঁচে
পরের তরে" ?

ধানের শীষ— শুনেছি তাই সবায় বিলাই
জীবনটিরে।

প্রজাপতি— শুনেছি তাই উড়ে বেড়াই
পুষ্পে ঘিরে।

খঞ্জন— শুনেছি তাই নাচের বাহার—
আহার খুঁজে নয় !—
নইলে কি আর কবির চোখে
লাগিত বিস্ময় !

বট— শুনেছি তাই বিহঙ্গমী
শাখায় বাঁধে বাসা।

জয়দা পরী— শুনেছি তাই মোদের নাচে
ভরসা পেল চাষা।

চাষার গান

বঁধু তোমার কথা আমার নিতুই জাগে প্রাণে ;
এখন আমার দিল্ খুলেছে পাক্না সোনার ধানে !
ছ'পণ ধানে মাথার কাঁটা ছয়পণে আজোট্—
ছ'পণ ধানে গড়িয়ে দোবো ঝুমকো তোমার কানে !
পৈঁছা বাজু বিছা দোবো দোবো সে সাতছরী—
ছরীর মত ঘুরবে তুমি বিঁধে নয়ান বাণে।

শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি নওকো লেনিন্ কামালপাশা সানিয়াৎ সেন্ জগলুল্,
শুনালে বিশ্বে কিবা বাণী। যবে হিংসায় ধরা মশ্গুল্ !
সত্যসারথি, কাঞ্চনগিরি শিখরে দাঁড়ায়ে আজি,
বাজাও বিষাণ উড়াও নিশান বিজয়ীর সাজে সাজি।

পদ্মা প্রমত্তা নদী

শ্রীসুবোধ বসু

এগারো

রাজার অন্তর্দ্ধানের বিষয় শেষ রাত্রে ধরা পড়িয়া গেল; এবং তারপর হইতে সারা বাড়িতে এবং ক্রমে সারা গ্রামময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শেষরাত্রে দুর্গাপ্রসন্ন প্রথামত প্রার্থনা করিতে উঠিয়াছিলেন এবং প্রথামতই তিনি পার্শ্বের ঘরে নিদ্রিত পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন, রাজা নাই; সামান্য বিস্মিত হইয়া বারান্দায় খোঁজ করিতে গেলেন, এবং সেখান হইতে ক্রমে নিচে নামিয়া সভয়ে আবিষ্কার করিলেন, নিচের বড় দরজা বন্ধ নয়, আলগোছে ভেজানো মাত্র রহিয়াছে। তারপর হইতে কী যে বিরাট অন্বেষণ সুরু হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। গ্রামের প্রতি পাড়া, প্রতিটি বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা হইল; জেলে নামাইয়া প্রতিটি পুষ্করিণী জাল দিয়া ছাকিয়া ফেলা হইল—যদিও রাজা জলে ডুবিবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম; এমন কি জেলেরা খালের মধ্যে পর্য্যন্ত ইতস্তত জালের ক্ষেপ ফেলিয়া চলিল। কিন্তু রাজার কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না—সম্পূর্ণ রহস্যজনক ভাবে সে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কেবলই মাথা চুলকাইয়া হয়রাণ হইতেছেন—অদ্ভুত ছেলে, অদ্ভুত শিক্ষা পেয়েচে পাড়াগাঁয়ে—অবাক্ হয়ে যাচ্ছি, দেখতো একবার কাণ্ডটা—ট্রেনিং-এর অভাব, ট্রেনিংএর অভাব ছাড়া আর কিছু নয়; জহর মিলি ওদেরকে এমন করে ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া কিছুতেই আর সেফ্ হবে না—

হৈমন্তী সত্যিকারেরই ভয় পাইয়া গেল, এবং আন্তরিক উদ্বেগে রাজার উপর সহসা তার অত্যন্ত ক্রোধ হইতে লাগিল—হাড় দুষ্টু ছেলে, একবার কাণ্ড দেখ তো! কোথায় গেল, কি হল, তার কি একটু পাত্তা আছে!—ও অম্বিকাদাদা, একবার নেড়ানেড়ীর আখড়ায় লোক পাঠাও না—শুনেচি ওদিকে ওটা—

'তা কি আর এতক্ষণ বাকি আছে, দিদিমণি—কিন্তু তার টিকিরও দেখা নেই; ভোজবাজির মতন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নিজে না বেরিয়ে এলে অন্যের সাধ্য কি খুঁজে বের করে, আমার তো এমনও মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই কোথাও লুকিয়ে আছে—চালাক ছেলে, দিদিমণি—ওর অনিষ্ট করা কারুর পক্ষে সহজ নয়। ওদিকে কর্ত্তা তো মুখ দিয়ে আর কথাটুকু বের করতে পারছেন না,—একেবারে স্তব্ধ মেরে গিয়েচেন—

ইন্দির ঠাকুরাণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তার সনাতন পদ্ধতি অনুসারে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন উঠাইলেন—বৌমা গো, আমার সোনার প্রিতিমা গো, তোমার নয়নের মণি আমি নিজ অবহেলায় হারাইলাম গো—কেমনে তোমারে মুখ দেখামু—

সমস্ত বাড়ির যখন এই অবস্থা এমন সময়ে দুই হাতে অত্যন্ত মুস্কিলের সঙ্গে পাচ পাঁচটা ইলিশ মাছ বহন করিয়া রজতপ্রসন্ন খালের দিক হইতে প্রসন্ন বদনে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলেন। বেলা নয়টা কিম্বা সাড়ে নয়টা হইয়াছে; অতি দ্রুত ডিঙি বাওয়ার ফলেই এত শীঘ্র আসা সম্ভব হইয়াছে। ব্যাপারীদের কাছে মাছ বিক্রি করিতেই বেলা হইয়া যায়, রৌদ্র জমিয়া ওঠে; তারপর খালের পথে

STUDE... COMMON...

তিন ক্রোশ পথ ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যে আসা কম উত্তমের কথা নয়।

রাজার বিশ্বাস ছিল, পাঁচ পাঁচটা ইলিসমাছ তার পক্ষে দুর্ভেদ্য বর্ম্মের কাজ করিবে। বাবা যদি ধমক দেন বা দিদি যদি বলে—'কোথায় গিয়েছিলি', সে বলিবে, দিদির জন্য পদ্মা হইতে তাজা ইলিশমাছ আনিতে গিয়াছিল—কেমন বড় বড় মাছ নিজহাতে বেছে এনেছি, দেখ। কিন্তু রাজাকে দেখা মাত্র একটা অতিশয় সুপুষ্ট জনতা হইতে যে প্রকার উচ্চগ্রামের বাক্—ঐক্যতান উত্থিত হইল তাহাতে রাজার ভরসা করিবার বিশেষ কিছুই আর বজায় রহিল না।

হৈমন্তী সর্ব্বপ্রথমে ছুটিয়া আসিল। চেঁচাইয়া কহিল—ওরে ডাকাত, গিয়েছিলি কোথায়? সারারাত ছিলি কোথায়? ওরে তুই যে মানুষ খুন করতে পারিস্।

'দ্যাখো না, দিদি, একবার চেয়ে—কেমন পাঁচ পাঁচটা মাছ নিয়ে এলাম; পদ্মার থেকে তুলেচি আর নিয়ে এসেচি;—একটু আগেই নড়ছিল—

'পদ্মায় গিয়েছিলি কিরে, ডাকাত। আরে ওরে বলিস কি তুই?'

'নইলে খালে বুঝি আবার ইলিশমাছ ধরা যায়।' অবজ্ঞার সঙ্গে এই কথা বলিয়া রাজা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। তার বড়ই ঘুম পাইয়াছে; তাছাড়া এত ক্ষিধে পাইয়াছে এবং দুর্ব্বল লাগিতেছে যে বলিবার নয়। কিন্তু অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নয়; বাধা পাইয়া সে দেখিল, অভিমন্যুর মত চতুর্দ্দিকে শুভাকাঙ্খীদের জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত উপদেশ এবং মন্তব্যগুলি একসঙ্গে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে।

'অদ্ভুত ছেলে হয়েচে—ঠিক মতন ট্রেনিং পাচ্চে না।' 'ও আমার নয়নের মণি, এমুন কইরা কই গেছিলিরে।' 'বড্ড দুরন্ত ছেলে, কিন্তু চালাক আছে; এই তো পাঁচ পাঁচটা মাছ জোগাড় করে নিয়ে এসেচে।' 'বলিহারি যাই সাহসের! শ্রাবরাত্রে পদ্মার গিয়া মাছ ধইরা লইয়া আইল, বলি, দেখচোনি বুকের পাটা—

'সর্ না, মোক্ষদা,—পথ আটকে রেখেছিস্ কেন? মানুষের বুঝি ঘুম পায় না; নিজেরা মজা করে সারারাত ঘুমিয়েচেন কিনা—'

'মোক্ষদা, বাঁদরটাকে নিয়ে যা—খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দেগে; আগে একটু সুস্থ হোক, তারপর দেখা যাবে—' কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজা শিহরিয়া উঠিয়া আড় চোখে চাহিয়া দেখিল বাবা—এবং ওদিকে আর চোখ না তুলিয়া সটান্ দালানের দিকে হাঁটিয়া চলিল এবং মোক্ষদার হাতে অমূল্য ইলিশমাছগুলি জিম্মা করিয়া বরাবর দোতলায় উঠিয়া গেল।—মিছিমিছি সবাই রাগ দেখাইতেছে; পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ জোগাড় করিয়া আনিল, একটু প্রশংসাও যদি কেউ করিল—রয়ে গেল—

দুর্গাপ্রসন্ন যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; বুকের মধ্য হইতে পাথরটা নামিয়া যাইয়া তাহাকে মুক্তি দিল—দ্রুত নিঃশ্বাস টানিয়া তিনি বুক পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রে তিনি একপ্রকার মনস্থির করিয়াছিলেন যে জমিদারির একটা অংশ হৈমের পুত্র জহরকে লিখিয়া দিবেন; কিন্তু রাজার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটার পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল, এবং অবশেষে রাজার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশা করিবার যখন আর কিছুই রহিল না তখন অকস্মাৎ তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—না, একটুও না,—প্রত্যেকটা টুকরা আমার রাজার, তার একোণও আমি বিলিয়ে দেব না; সব তার—সব তার, সব কিছু তার। অন্যকে উপহার আমি দিতে পারি, কিন্তু সত্যি বলচি, রাজা, সম্পত্তির একভাগও তোর ছাড়া আর কারুর নয়,—তুই রাগ করিস না—

রাজা আসিয়া পৌঁছানয় বাড়িতে আলোচনা থামা দূরের কথা সেটা ক্রমেই অধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুরুষ মহল এবং স্ত্রী মহলে চাঞ্চল্যকর সব গল্প উঠিল, এবং রাজার অন্যান্য বহু দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনিয়া কেহ বা চমৎকৃত, কেহবা শিহরিত, এবং কেহবা রাগান্বিত হইয়া উঠিল।

বেলা আন্দাজ বারটা হইবে; রাজা এখনও অকাতরে

নিদ্রা যাইতেছে। কাছারি বাড়িতে বসিয়া দুর্গাপ্রসন্নও তখনও লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন; বেলা একটা দেড়টার পূর্ব্বে মধ্যাহ্নের আহার হয় না; ভোর হইতে এই দ্বিপ্রহর অবধি তিনি জমিদারির কাজকর্ম্ম দেখেন, এবং নানাস্থানের প্রজা, অর্থী প্রত্যর্থী, পণ্ডিত এবং অন্যান্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

'আইজ্ঞা কর্ত্তা নমস্কার—আমি কুসুমতলির বিরাট জাউলা—'

দুর্গাপ্রসন্ন ফিরিয়া তাকাইলেন। দেখিলেন প্রৌঢ়াকৃতি বলিষ্ঠকায় এক জেলে বেতের আঙটায় বাঁধা বড় বড় পাঁচটা ইলিশ মাছ হাতে ঝুলাইয়া দণ্ডবৎ দিয়া উঠিল।

'কি চাই তোমার?' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

"আইজ্ঞা হুজুরের বাড়িতে আমি বিয়াখাওয়ায় কতবার মাছ দিছি; আমি কুসুমতলির জাউলার সর্দ্দার—'

'কিন্তু এখন তো মাছের আর কোনও দরকার নেই, বিরাট।'

'আইজ্ঞা, তা না।—ছোটবাবু কাইল গাঙে গেছিল কিনা মাছ ধরন দেখতে,—কইয়া দিছিল পাঁচটা মাছ দেওনের লাইগা; একটু দেরি হইয়া গেল, কর্ত্তা,—কিন্তু ছোটবাবু কৈ?—'

'ঘুমাচ্ছে; কিন্তু তোমারই সঙ্গে কি পদ্মায় গিয়েছিল?'

'আইজ্ঞা না; গেছিল পদ্ম জাউলার পোলা মাইনকার ডিঙিতে। কিন্তু হুজুর, অমুন আর যাইতে দিবেন না—বড় সর্ব্বনাশের কথা। ক'ইলই তো দাঙ্গা বাঁধছিল বইলা; এমুন সময় ছোটবাবু উইঠ্যা দাড়াইয়া নি দুই ধমকে আমাগো থামাইয়া দিল; এত্তটুকু পোলা, তার ত্যাজ কি, কর্ত্তা! বকা খাইয়া নি আমরা থ' হইয়া গ্যালাম!' বলিয়া বিরাট আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া আতঙ্কে, বিস্ময়ে, এবং তারপর অকস্মাৎ এক পরম গর্ব্বে দুর্গাপ্রসন্ন শিহরিয়া উঠিলেন। রাজা! রাজা যে এতটুকু ছেলে! ওরে, তোরা বলিস্ কি—

'পদ্ম জাউলার বিরুদ্ধে আমার এই নালিশটা আমি হুজুরের কাছে নিবেদন কইরা গ্যালাম।' অবশেষে বিরাট কহিল।

'আচ্ছা আমি দেখব, নিশ্চয়ই দেখব;—তুমি পেয়াদাদের ঘরে বিশ্রাম কর গিয়ে, না খেয়ে যেয়ো না কিন্তু;—অম্বিকা, যাবার সময় একে নতুন একজোড়া কাপড় দিতে ভুলো না যেন—অদ্ভুত, অদ্ভুত তো—এতোটুকু ছেলে—রাজা যে এত্তোটুকু ছেলে।

'ও ইন্দির দিদি, করচে কি সে—জেগেচে?'

'না, অখনও ঘুমায়।'

'ঘুমাক্, ঘুমাক্,—বেশ করে' ওকে ঘুমোতে দাও—কেউ যেন ওকে জাগিয়ে না দেয়; এত্তোটুকু ছেলে, কী ওর কাণ্ড, কী বীরত্ব দিদি—প্রায় বিশ্বেস হয় না—।' সহসা পরলোকগতা স্ত্রীর জন্য দুর্গাপ্রসন্নের দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল—দেখে যেতে পারল না, ওর মানুষ হয়ে ওঠা দেখতে পেল না—

নিদ্রা হইতে উঠিতে রজতপ্রসন্নের বিকাল হইল; দেখিল চতুর্দ্দিক কেমন ছায়াচ্ছন্ন; বিস্মিত হইয়া সে এধার ওধার তাকাইতে লাগিল। ঠিক পিছনেই ইন্দির পিসিমা বসিয়াছিলেন, পরম স্নেহের সঙ্গে রাজার পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

'মেঘ করেচে, পিসিমা?'

'ম্যাঘ? ম্যাঘ দেখলি কই? আরে, পোলাপ বকস্ নাকি?'

'ধ্যেৎ! তবে তেল আন, চান করব।'

'চান করবি? কস্ কি। আরে, বিকাল পড়চে যে, চান কইরা অরজারি কর আর কি।'

'বিকাল!' সবিস্ময়ে রাজা কহিল। 'দুপুরে খেলাম কই আমি?—বাঃ রে, আমার ইলিশ মাছের ঝোল! এতো হাঙ্গামা করে আনলাম—বেশ তো, আমাকে খেতেই দিলে না,—বেশ তো!—

'সব আছে, যাদু, সব তোমার লাইগা তোলা আছে; খাইবা চল। আমার সোনার বাছা, মুখটা কতটুক হইয়া গেছে—'

পিসিমার সঙ্গে যাইয়া রাজা পিঁড়ির উপর জাঁকিয়া বসিল,—এবং তারপর এমনই গোগ্রাসে সে ভাত গিলিতে আরম্ভ করিয়া দিল যে স্পষ্ট মনে হইল যেন এক মহা-দুর্ভিক্ষের দেশ হইতে সে সদ্যমাত্র পালাইয়া আসিয়াছে। সমস্ত পদ একই সঙ্গে ভাতের উপর ঢালিয়া লইল—আলাদা আলাদা মাখিবার মতন সময় অপব্যয় করা পেটের এই অবস্থায় সম্ভব নয়। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভাত এবং তরকারি অদৃশ্য হইয়া গেল। কহিল—কী চমৎকার ইলিশ মাছ,—কোনও জন্মে আর এমন মাছ খাইনি—যা স্বাদ! কত হাঙ্গামা করে আনলুম—তা কেউ কি একটু ভাল বল্লে—

'ছোটবাবু, কর্ত্তায় তোমারে ডাকচে।'—রাজা আঁচাইতেছিল, নিশার স্বপন সম মোক্ষদা আসিয়া এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। পলকে ইলিশ মাছের এই অপূর্ব্ব স্বাদ পর্য্যন্ত রাজার মন হইতে তিরোহিত হইয়া গেল; এমন আহ্বান যে মোটেই লোভনীয় নয় তাহা বুঝিতে তার একটুও বিলম্ব হইল না। বাবার তখনকার চোখের সেই দৃষ্টি দেখা অবধি রাজার মনে আর শান্তি ছিল না।

'কেন?'

'তার আমি কি জানি,—ডাকচে যাও।'

'ডাকচে, যাও!' রাজা ভেঙচাইয়া কহিল। 'কোথায়?'

'ঐ খালপাড়ে তেনি খাড়াইয়া আছেন, বাদাম গাছের তলে—তড়াতড়ি যাইতে কইচেন।'

ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে যাইবার সময় কয়েদী যেমন যায়, রাজা মুখখানা তেমনি বিরস এবং মরীয়ার মত করিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছুক পদক্ষেপে খালের দিকে অগ্রসর হইল। বেশ, মারুক, যত ইচ্ছা মারুক—একটাও সে কথা বলিবে না, একটুও কাঁদিবে না, একটুও চেঁচাইবে না—মিছিমিছি সবাই মারবে—এমন পদ্মায় গিয়ে মাছ ধরা দেখে এলুম—এমন পাঁচ পাঁচটা মাছ মাণিকের কাছ থেকে নিয়ে এলুম—বিরাট জেলেটা ভারি কিপ্‌টে, দিলে না মাছ, নইলে সবশুদ্ধ দশটা হত—তা একদিন না হয় গেলুমই, ডুবে তো আর যাইনি—

'রাজা!'

দুর্গাপ্রসন্নের ডাকে রাজা চমকিয়া থামিল। দেখিল বাবার মুখ অতিশয় প্রসন্ন, ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই।

'রাজা, কাছে আয়, বাবা।' এ কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজার আর সন্দেহমাত্র রহিল না। এ তো তিরস্কারের কণ্ঠস্বর নয়, এ যে স্পষ্ট আদরের ডাক। এইটুকু বুঝিতে পারিয়াই হাসি চাপা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল—কি ভয়ে ভয়েই না আসিয়াছিল! হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে সে কহিল—কেমন তামাসা করে এলাম, না বাবা—হি হি হি—এই বারটি তুমি বকো না বাবা। কেমন, ইলিশমাছগুলি খুব ভাল নয়?—খুব স্বাদ—

'হাঁ, খুব।'

'তবু তো বিরাট্ জেলেটা মাছ দিয়ে গেল না; ওটা ঝগড়া বাঁধাতে এসেছিল সড়কি নিয়ে,—আমি বল্লুম,—খবরদার, ঝগড়া করতে পারবে না, ব্যস্,—আমার বাবা বাঘ; যদি শোনে, তোমাদের কাঁধে একটিও আর মাথা থাকবে না—হি হি হি—আমি এমন ধম্‌কে দিলাম—'

'বিরাট তোর মাছ দিয়ে গেচে।'

'ক'টা? পাঁচটাই দিয়েচে তো?' রাজা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

'রাজা!'

'বাবা।'

'আমি যখন মরে যাব, এত সব প্রজাকে তুই শাসন ক'রে রাখতে পারবি তো?'

'খুব। কিন্তু তুমি মরবে না—ধ্যেৎ!'

'শুধু শাসনই নয়, এদের কত সাহায্যও তোকে সর্ব্বদা করতে হবে। বড় গরিব ওরা, বড় সহায়হীন; ওরা যাতে উপোস করে না মরে, তোকে দেখতে হবে; ওরা যাতে বিনা চিকিৎসায় না মরে, তোকে দেখতে হবে।'

'করবই তো।' রাজা সগর্ব্বে কহিল।

'সব তোকে আমি দিয়ে যাব—সব তোকে দিয়ে যাব; আমি নিশ্চিত জেনেচি, তুই পারবি, ঠিক পারবি।'—সহসা বাষ্পোচ্ছ্বাসে দুর্গাপ্রসন্নের কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। রাজা বিস্মিত হইয়া বাবার মুখের দিকে তাকাইল,

কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সহসা উচ্চৈস্বরে তাহার স্বভাবসুলভ হি হি আরম্ভ করিয়া দিল। সেই হাসিতে খালের জল এবং শস্যপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর অট্টালিকা এবং আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

'রাজা, আমার আরও কাছে আয়।'

রাজা অগ্রসর হইয়া বাবার গায়ের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইল। স্বভাবতই গম্ভীর-প্রকৃতি দুর্গাপ্রসন্ন সহসা গাম্ভীর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন, রাজার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন; দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।—রাজা আর অসহায় শিশু নয়, সে আদেশ করিতে শিখিয়াছে;—ক্রুদ্ধ জনতাকে সে ব্যক্তিত্বের তরবারি দ্বারা শাসন করিতে পারে। এ গর্ব্ব দুর্গাপ্রসন্ন আজ কোথায় ধরিয়া রাখিবেন।

সহসা রৌদ্রকরোজ্জ্বল পদ্মার মহিমাময় দৃশ্য দুই মুদ্রিত চোখে ভাসিয়া উঠিল।—কত প্রাণ, কত সঙ্গীত, কত গাম্ভীর্য্য, কত গৌরব এই রহস্যময়ী নদী অকাতরে বিলাইয়া দিতেছে; পদ্মা নিজ হাতে যাকে শিক্ষা দেয় তাহার চাহিবার আর কিছুই বাকি থাকে না; শৌর্য্যে তার বুক পূর্ণ হয়, মহত্ত্বে মন হয় উদার, মর্য্যাদায় সে সকলের উর্দ্ধে ওঠে—একই সঙ্গে সে হাসে এবং শাসন করে। পদ্মার জন্য এক অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা বোধে আজ দুর্গাপ্রসন্নের চিত্ত আপ্লুত হইয়া উঠিল। মনে মনে শুধু বলিতে লাগিলেন—এতোই যদি মা তুই দিস্, এতই যদি শক্তি ধারণ করিস্, এতই যদি তোর কৃপা, তবে কেন এমন করিয়া আমার ঘর ভাঙিয়া দিলি?

রহস্যময়ী নদী এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না; পৃথিবীর তটপ্রান্তে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল—ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্—

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত (ক্রমশঃ)

সুবোধ বসু

সনেট

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী

হে চির-একাকী, কোথা তব শান্তিময়
গহন আবাস? স্তব্ধ গিরির শিখরে?
আছ কিগো বনপ্রান্তে সমুদ্র-তন্ময়?
অশ্রান্ত সঙ্গীতি-রত ধবল নির্ঝরে
লুকায়ে রয়েছ বুঝি অনন্ত উদাসী
অন্ধকার লোকারণ্য হ'তে? রিক্ত হিয়া
কেন ওই ছুটিয়াছে মিলন-তিয়াসী
পর্ব্বতে কন্দরে! মর্ম্মমাঝে অন্বেষিয়া
বল্লভেরে নাহি মিলে যদি, সুনির্জ্জনে
মিলিবে কি মণিকান্ত ঘন-ইন্দ্রনীল?
হে সুপ্ত হৃদয়শায়ী, কোন্ পূর্ণক্ষণে
লভিবে সন্ধান তব উদ্‌ভ্রান্ত নিখিল?—
হেরিয়া প্রশান্তি-নভে অপর্ণের নীড়
ঘুচে যাবে দূর-ভ্রান্তি স্বপ্ন-বৈরাগীর?

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন ও যশোর রাজবংশ

শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাধিপ্‌ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তদীয় খুল্লতাত শ্রীমম্মহারাজ বসন্তরায়ের বংশীয়গণ কে কোথায় কি ভাবে ছিলেন বা দেশের নানাবিধ অবস্থা বিপর্য্যয়ে কে কি অবস্থায় আছেন তৎসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক বা লেখক অদ্যাবধি তাহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই অথবা করিবার জন্য সচেষ্ট হন নাই। কিন্তু ইহা জ্বলন্ত সত্য যে, কোন প্রাচীন রাজবংশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে মহারাজ বসন্ত রায় এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে অতুল প্রভায় যশোর রাজ্যকে সোনার যশোর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার পরে স্বাধীনতা হারাইয়াও তদ্বংশীয়গণ কিছুকাল পূর্ব্বপুরুষের কীর্তিকলাপ গৌরবমণ্ডিত রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহা নির্বানোন্মুখ দীপ-শিখার ক্ষণিকপ্রভা বিকীরণের ন্যায় স্থায়ী হইয়াছিল। প্রায় সার্দ্ধ এক শতাব্দী হইতে যশোর পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। যশোর ধুমঘাটের আর সে শোভা, সে সম্পদ, সে গৌরব কিছুই নাই; এবং যশোর রাজবংশধরগণেরও সে বিষয়-বিভব বা প্রবল প্রতিপত্তি এখন কোন্‌ কঠিন শিলাতলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যশোর রাজবংশীয়গণ বর্ত্তমানে ছিন্ন ভিন্ন শতবিভক্ত হইয়া নানা স্থানে নানা প্রকারে জীবন যাপন করিতেছেন। তবু তাঁহারা রাজা; বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতির বিপুল কীর্তি-কাহিনীর অমরস্মৃতি লইয়া গৌরবান্বিত। ধুমঘাটে (বর্ত্তমান যশোরেশ্বরীপুরে) যতদিন যশোররাজবংশের ভাগ্য-দেবতা পীঠদেবী শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী মাতা বিরাজিতা থাকিবেন, ততদিন শতবিপর্যয়েও এই বংশের বিনাশ নাই।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিশ্বাসহন্ত্রী সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ কর্ত্তৃক ঢাকায় বন্দী হন। মোগল সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁর সহিত সন্ধিকার্য্যের জন্য ঢাকায় গমনকালে তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ উদয়াদিত্যের উপর যশোরের নেতৃত্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতাপের বন্দীর পর বাহার-ই-স্তানের লেখক অন্যতম মোগল সেনানী মির্জা নথনের অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হইয়া উদয়াদিত্য যশোরের শেষ মর্য্যাদা রক্ষার্থে সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হন এবং সেই যুদ্ধেই তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। প্রতাপের দুই মহিষী; প্রথমা মহারাণী শরৎ-কুমারীর গর্ভে উদয়াদিত্য, প্রতাপ-নরেন্দ্র, প্রতাপ-কণ্ঠ নামে তিন পুত্র ও হেমপ্রভা, বিমলা (বিন্দুমতী) নাম্নী দুই কন্যা এবং দ্বিতীয়া মহারাণী বিদ্যুদ্বরণীর গর্ভে প্রতাপ-ভীম, প্রতাপ-অর্জ্জুন, প্রতাপ-রুদ্র নামে তিনপুত্র, মোট ছয়পুত্র জন্মে। প্রতাপ-নরেন্দ্র রোগ-শয্যায় এবং প্রতাপ-কণ্ঠ যুবরাজ উদয়ের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। প্রতাপ-অর্জ্জুন ও প্রতাপ-রুদ্র নিতান্ত বালক-বয়সে মাতৃসঙ্গে জলমগ্ন হন। প্রতাপ-ভীম বালক হইলেও সাহসী ও বলশালী ছিলেন। তিনি প্রাণপণে মোগলসেনার সহিত লড়িয়া অবশেষে বন্দী হন। মোগলসেনাগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করে। তাঁহার বংশীয়গণ এখনো পাটনায় বসবাস করিতেছেন। তাঁহারা তথাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমান।

মহারাজ শ্রীশ্রীবসন্তরায়ের চারি বিবাহ এবং একাদশ পুত্র। তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষীর নাম কমলাদেবী ও চতুর্থার নাম বিমলাদেবী। প্রথমা ও তৃতীয়া মহিষীর নাম জানা যায় না। প্রথমার গর্ভে জগদানন্দ ও নারায়ণ, তৃতীয়ার

গর্ভে শ্রীরাম, গোবিন্দ, কমল, পরমানন্দ, মধুসূদন ও রমাকান্ত এবং চতুর্থার গর্ভে রাঘব, চন্দ্রশেখর (চাঁদরায়) ও রূপরাম নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে রমাকান্ত, রাঘব ও চন্দ্রশেখরের সহিত পরবর্তী ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। অবশিষ্ট আটজনের মধ্যে জগদানন্দ, শ্রীরাম, মধুসূদন বাল্যে এবং কমল নিঃসন্তান অবস্থায় যৌবনে পরলোকগত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রতাপ-হস্তে নিহত হন; রূপরাম ও পরমানন্দের বংশ লুপ্ত। নারায়ণের বংশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধি হইবার সময়ে রাঘবরাম রায় যশোর রাজ্যের ছয় আনা অংশ (তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি) মোগল সরকারে দাবী করেন এবং তদনুসারে পূর্ব্বে কালিন্দী হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড, অর্থাৎ ধুলিয়াপুর, পারধুলিয়াপুর, বাজিতপুর, নসরাজপুর প্রভৃতি বহু পরগণার তিনি পুনরায় নূতন সনন্দ পান। এই সকল পরগণার অধিকারী হইয়া রাজা রাঘবরাম রায় কিছুদিন যশোরের পুরাতন রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজত্ব পাইয়া বা রাজা হইয়া রাঘব আর এতটুকু শান্তি পান নাই। লোকে তাঁহাকে যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইত। তিনিও স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন। তদুপরি নিঃসন্তান বিধায় রাজ্য ও রাজত্বের উপর তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখরকে সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবশেষে গুরুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় গিয়া তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার গড়-বেষ্টিত আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ সেখানে এখনো দৃষ্ট হয়।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর রায়ের জন্ম হয়। তিনি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য তখন জীবিত। রাঘবরাম রায়ের রাজত্বকালে চন্দ্রশেখর শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কিছুদিন হালিশহরের নিকট যমুনা বক্ষে নৌকায় বাস করিয়াছিলেন। তথায় একদিন নদীর ঘাটে স্নানরতা এক পরম রূপবতী কিশোরীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। কিশোরীটি কৃষ্ণচন্দ্র ওহদেদারের কন্যা। চন্দ্রশেখর কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বীকৃত করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। রাজা চন্দ্রশেখরের এই মহিষীর নাম যশোর রাজবংশীয়দের নিকটেও পাই নাই।

চন্দ্রশেখর রাজা হইবার পর তদীয় ভ্রাতা রমাকান্ত খানপুর (চাকশিরির নিকট) হইতে আগমন করেন এবং রাজ্যাংশ প্রার্থনা করেন। কিন্তু, কতিপয় গুরুতর কারণ বশতঃ রাজা চন্দ্রশেখর তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। তন্নিমিত্ত তিনি ও তাঁহার বংশীয়গণ চিরদিনের জন্য রাজ্য ও রাজোপাধিতে বঞ্চিত হন। রমাকান্ত তখন হইতে ফতুল্যাপুরে আসিয়া বাস করেন। খুঁড়া, খোড়গাছী, বাঁশদহ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বংশীয়রা বাস করিতেছেন।

রাজা চন্দ্রশেখর রায় ছিলেন ছত্রধারী রাজা। তাঁহার বংশধরগণের রাজ্যাংশ বিশেষ কিছু না থাকিলেও এখনো তাঁহারা দেশে ও দশে রাজা বলিয়াই পরিচিত, অভিহিত এবং সম্মানিত। চন্দ্রশেখরের সহিত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সৌহৃদ্য ছিল। পারস্পরিক বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে ছিল অটুট। চন্দ্রশেখর সুপুরুষ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও বংশোচিত বীর্য্যবত্তায় তিনি প্রতাপের পরবর্তী। তাঁহার রাজোচিত উদারতায় এবং প্রজানুরঞ্জনে যশোরবাসী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এবং তাঁহার পরিবারবর্গের মৃত্যুর পর রাজা চন্দ্রশেখর আসিয়া ধূমঘাট দুর্গে বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে (বঙ্গাব্দ ১০১৬ সালের ২রা চৈত্র তারিখে) চন্দ্রশেখর ৺যশোরেশ্বরী দেবী ও গোপালপুরে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহের সেবা-পূজাদির জন্য অধিকারীদিগকে অর্থাৎ বল্লভাচার্য্যের পুত্রবর্গকে (প্রতাপাদিত্য যখন উড়িষ্যা হইতে উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনয়ন করেন, বল্লভাচার্য্য সেই সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং সেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়া অধিকারী উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন) নিজ অধিকারভুক্ত চাকলা ধুলিয়াপুর পরগণা হইতে ২৮৩/০ বিঘা পৃথক্ পৃথক্ দেবোত্তর সম্পত্তির সনন্দ প্রদান করেন। সে সনন্দ এবং তাহার অবিকল প্রতিলিপি এখনো রায়পুরের বল্লভাচার্য্য-বংশীয় অধিকারী মহাশয়দের এবং যশোর রাজবংশীয়দের নিকট রহিয়াছে শুনিয়াছি।

খৃষ্টীয় ১৬১৯ অব্দের শেষভাগে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়হেতু ধূমঘাট জলপ্লাবিত হওয়ায় এবং ক্রমে ক্রমে জলবায়ু অত্যধিক দূষিত হইয়া উঠায় সে অঞ্চল বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে। রাজা চন্দ্রশেখর তখন তথা হইতে রুদ্রপুরে (অধুনা ২৪ পরগণার আঁধারমাণিকের সন্নিকট) চলিয়া যান। সেই হইতে জলপ্লাবনাবনমিত ধূমঘাট দুর্গ "চাঁদরায়ের দীঘি" নামে আখ্যাত হইতেছে। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সঙ্গে সেবায়েৎ অধিকারীগণ ঈশ্বরীপুর ত্যাগ করিয়া যমুনার পরপারে মামুদপুরে আসিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে গোপালপুর গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গোপালপুর হইতে তাঁহারা নিত্য গিয়া শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী মাতার পূজাদি করিয়া আসিতেন। অবশেষে তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। গোপালপুরেরও দুর্দশা যখন চরম হইয়া উঠিয়াছিল সেবায়েৎ অধিকারী তখন শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ লইয়া (১৬৯২ খৃষ্টাব্দে) পরমানন্দকাটি গিয়া বাস করেন। তখন হইতে শ্রীশ্রীমাতার নিত্যপূজাদি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। যশোরেশ্বরীপুর এইরূপে সম্পূর্ণ জনশূন্য ও ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্ত দস্যুগণের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। সেই সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষাংশে যশোরেশ্বরীপুরের বর্ত্তমান অধিকারী মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেই অঞ্চলে আসেন এবং কৌশলে দস্যুদলের অধিনায়কত্বের পদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দস্যুবৃত্তি দ্বারা বহু অর্থ-সম্পদ ও যশোরেশ্বরীপুরকে কেন্দ্র করিয়া বহু ভূমি অধিকার করিয়া লন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রবর্গ ক্রমান্বয়ে তথায় পরাক্রমের সহিত বাস করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণের প্রপৌত্র বিষ্ণুরামের সময়ে হয় ইংরাজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেই সময় তাঁহাদের দখলী সম্পত্তির পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। বিষ্ণুরামের পুত্র বলরাম শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী মাতার মন্দির একপ্রকার নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধিকারী উপাধিধারী তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি যশোরেশ্বরীপুরে বাস করিয়া শ্রীশ্রীমাতার সেবা ও সম্পত্তি পরিচালনা করিতেছেন। যশোর রাজবংশীয়দের ভাগ্যদেবতা শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী মাতা আজ আপন হস্তে যশোর রাজবংশীয়দের ভাগ্যহত করিয়াছেন। উহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অমনোযোগীতার ও অবহেলার প্রতিফল ব্যতীত আর কি হইতে পারে।

রাজা চন্দ্রশেখর রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যখন ধূমঘাটে ছিলেন তখন মোগল সেনানী ইনায়েৎ খাঁ যশোরের ফৌজদার হইয়া আসেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইনায়েৎ খাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ ফৌজদার নিযুক্ত হন। রাজা চন্দ্রশেখর তখন রুদ্রপুরে। কিছুদিন ধূমঘাটে থাকিবার পর নানারূপ অসুবিধায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া সরফরাজ খাঁ পুঁড়ায় যান। তখন হইতে পুঁড়া পরগণার নাম হয় সরফরাজপুর পরগণা। সরফরাজ খাঁর পর মির্জা সফসিকান্ ফৌজদার হইয়াছিলেন। তিনি আর যশোরেশ্বরীপুরে না থাকিয়া উত্তরে কপোতাক্ষী ও ভদ্র নদীর ত্রিমোহানীর সন্নিকট মির্জা নগরে বাস করেন। সফসিকানের পরবর্তী ফৌজদারের নাম নুরুল্যা খাঁ। তিনি প্রথমে নূরনগরে, পরে মির্জানগরে গমন করিয়াছিলেন। নুরুল্যা খাঁর পর যথাক্রমে মীর খলিল ও মহাম্মদ আস্রফ খাঁ (১৭৬০) যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। আস্রফ খাঁর পর যশোরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলির নানারূপ বন্দোবস্ত হয়, সেজন্য যশোরে (ধূমঘাটে) কোন শাসন-কেন্দ্র রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সবে সূচনা।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজা চন্দ্রশেখরের মৃত্যু হয়। তদাত্মজ রাজা রাজারাম রায় তখন রাজা হইয়া পিতৃতক্তে অধিরোহণ করেন। রাজারাম ১৬২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যশোরের ফৌজদার মির্জা সফসিকানের সময়ে সুলতান সুজার রাজস্ব সংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব প্রবর্তিত হয়। তাহার ফলে পরগণা সমূহের অনেক পরিবর্তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা রাজারামের রাজ্যও সেই সময় নানা কারণে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। রাজা রাজারাম ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশীয়দের সহিত সম্প্রীতি স্থাপিত হয় এবং নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর গিয়া তিনি কয়েকটি পরগণা ও প্রভূত স্বর্ণ মুদ্রা যৌতুক দান করিয়া আসেন। খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে রাজা রাজারাম রুদ্রপুর রাজ-প্রাসাদে লোকান্তর গমন করেন।

রাজা রাজারামের চারিপুত্র। জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ ও মধ্যম শ্যামসুন্দর। তৃতীয় ও চতুর্থ বাল্যকালে কালকবলিত হইয়াছিলেন। রাজারামের দেহান্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ রাজ্যের অধীশ্বর হন। নীলকণ্ঠের সময় হইতেই যশোর রাজবংশীয়দের প্রকৃত পক্ষে অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল বলা চলে। নীলকণ্ঠ রাজা হইবার পর সমগ্র রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। রাজা নীলকণ্ঠ জ্যেষ্ঠ বিধায় রাজ্যের নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ রাজা শ্যামসুন্দর সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। এই প্রকারে যশোর রাজবংশ নয় আনী ও সাত আনী দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দিন দিন পতনের পথে অগ্রসর হয়।

রাজা নীলকণ্ঠের এক স্ত্রী রাণী সাবিত্রী দেবী। তাঁহার চারিপুত্র মুকুন্দদেব, ব্রজকিশোর, নবনীত ও ব্রজমোহন। রাজা মুকুন্দদেবের স্ত্রী রাণী অরুণদ্যুতি। যশোরের ফৌজদার নুরুল্যা খাঁর নূরনগর ত্যাগ করিবার পর মুকুন্দদেব সেই অঞ্চলে কোথাও গিয়া বাস করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হন। তখন পুঁড়া-খোড়গাছী প্রভৃতি অঞ্চলের বঙ্গজ কায়স্থগণ তাঁহাকে খোড়গাছীতে তাঁহাদের সন্নিকটে বাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা মুকুন্দদেব সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তারপর নুরুল্যা খাঁর দেওয়ান রামভদ্র রায় বৃদ্ধ বয়সে পুঁড়ায় আগমন করেন। রাজা মুকুন্দদেব এবং রাজোপাধি ও রাজ্যাংশ বঞ্চিত হইলেও মহারাজ শ্রীশ্রীবসন্ত রায়ের পুত্র রমাকান্তের বংশীয়দের বাস-গৌরবে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া রামভদ্র সে অঞ্চলে বঙ্গজ কায়স্থের এক সমাজ স্থাপন করেন। তাহার সমাজপতি (গোষ্ঠিপতি) করেন রাজা মুকুন্দদেবকে, এবং নিজে হন নায়েব গোষ্ঠিপতি। রাজা মুকুন্দদেবও ঐ সব কারণে এবং ভাবী জ্ঞাতিবিরোধ পরিহার মানসে নূরনগর অঞ্চলের পরিবর্তে খোড়গাছী গ্রামে বাস করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তদবধি যশোর রাজবংশের নয় আনী শাখার বাস খোড়গাছীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নয় আনীর আদি রাজা নীলকণ্ঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ধারা অধিকদূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। চতুর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠ পুত্র রাজা ব্রজমোহন পৈতৃক দাদাদের (অর্থাৎ নয় আনা অংশের) পনের পাই অংশ প্রাপ্ত হইয়া খোড়গাছী পরিত্যাগ পূর্বক নূরনগরের অন্তর্গত মানিকপুরে বাস গ্রহণ করেন। রাজা ব্রজমোহনের পুত্র রাজা আনন্দচন্দ্র উত্তরকালে টাকীর প্রসিদ্ধ রামকান্তী দলের প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণকান্তী দলের (বহরমপুরের সেন বংশীয় দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের দল) গোষ্ঠিপতি এবং কৃষ্ণকান্ত নায়েব গোষ্ঠিপতি হইয়াছিলেন। রাজা ব্রজমোহনের ধারার কেহই বর্তমানে মানিকপুরে নাই এবং তাঁহাদের সে সম্পত্তিও গিয়াছে। বহুদিন তাঁহারা মানিকপুর ত্যাগ করিয়াছেন ও নকিপুর, সৈদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সাধারণ ভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা এখন শোচনীয়।

রাজ্য বিভাগের পর রাজা নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা শ্যামসুন্দর রায় দক্ষিণাংশের সাত আনা জমিদারী পাইয়া সেই দিকে বাস করিবার জন্য গমন করেন। পথে খাজিরার নিকটে শোলপুর নামকস্থানে তিনি কিছুদিন বাস করেন। তথায় থাকিবার সময় তিনি পরমানন্দকাটিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহের নিমিত্ত সুন্দর মন্দির ও দোলমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দেন (বঙ্গাব্দ ১০৯৯-১১০০ মধ্যে)। এখনো সেখানে তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার পর তিনি নূরনগরের পূর্বাংশে রামজীবনপুরে (১১০২ বঙ্গাব্দে) গিয়া বসতি নির্দেশ করেন। রামজীবনপুরের গড়বেষ্টিত বিরাট রাজ-প্রাসাদ তাঁহার সময়ে নির্মিত হইয়াছিল।

রাজা শ্যামসুন্দর একজন কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান, তেজস্বী এবং প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন। যখন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সমগ্র বাংলাকে তেরটি চাকলায় ভাগ করিয়া সেইগুলি পঁচিশটি জমিদারী ও তের জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন তখন নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে রাজা শ্যামসুন্দর ১১২০ হিজরীতে দক্ষিণ বঙ্গের মনসবদার নিযুক্ত হইয়া কতিপয় জমিদারী ও জায়গীর পাইয়াছিলেন। তখনকার মনসবদারগণ দেশের সীমান্ত রাজাদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেন। দেওয়ান রামভদ্র রায় বিশ্বস্ততার নিমিত্ত সেই সময় রাজা শ্যামসুন্দরের নিকট সমগ্র আমীরাবাদ পরগণাটি বৃত্তি পান। রামভদ্রের বংশধরেরা আজিও সে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

টাকীর বড় চৌধুরী বংশীয় জমিদারবর্গ বহু পূর্ব হইতে বরাবর যশোর-সমাজের নায়েব গোষ্ঠিপতি ছিলেন।

সহসা পুঁড়া-খোড়গাছীতে রামভদ্র রায়ের অভ্যুদয়ে এবং ভিন্নসমাজ সংগঠন পূর্বক তাঁহার নায়েব-গোষ্টিপতিত্ব গ্রহণে এক দারুণ মনোবাদ, পরে কলহ সৃষ্টি হয়। বড় চৌধুরী বংশীয় রামকান্ত মুনসী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সাত আনীর আদি রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের পুত্রবর্গকে গোষ্টিপতি নির্বাচিত করিয়া নিজেরা নায়েব গোষ্টিপতি হন। এইরূপে যশোরসমাজ শেষে রামভদ্রী, রামকান্তী ও কৃষ্ণকান্তী দলে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে।

রাজা শ্যামসুন্দর দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমা স্ত্রী রাণী দুর্গাবতীর গর্ভে এবং মধ্যম কৃষ্ণকিঙ্কর ও কনিষ্ঠ নন্দকিশোর দ্বিতীয়া পত্নী রাণী করুণাময়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র রাজা শুকদেব, পৌত্র রাজা গুরুপ্রসাদ —তাঁহাদের কাহারো স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। তবেই রাজা গুরুপ্রসাদ রামজীবনপুর হইতে নূরনগরে সর্বপ্রথম বাস পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশধারা তাঁহার পৌত্র পর্য্যন্ত পৌছাইয়াই শেষ হইয়া যায়।

রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের মধ্যমপুত্র রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের পত্নী রাণী দিনমণি। রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর ছিলেন অত্যন্ত ধর্মশীল, উদার এবং মহানুভব। তাঁহার দুই পুত্র— জ্যেষ্ঠ হরেকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ। দুই ভ্রাতাই ১২৫৯ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে নূরনগরে আসিয়া বসতি করেন। রাজা হরেকৃষ্ণের স্ত্রী রাণী দয়াময়ী। তাঁহার প্রপৌত্র রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় বি-এল একজন কৃতবিদ্যপুরুষ। তিনি মুন্সেফ ছিলেন। "প্রতাপাদিত্য" নামে ইংরাজী ভাষায় তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী রাণী বরদাসুন্দরী। রাজা নগেন্দ্রনাথের তিন পুত্র— রাজা নৃপেন্দ্রনাথ, তদীয় পত্নী রাণী সুশীলাসুন্দরী; রাজা তেজেন্দ্রনাথ, তদীয় পত্নী রাণী কুসুমকুমারী এবং রাজা রবীন্দ্রনাথ বি-এ, তদীয় পত্নী রাণী প্রতিভাসুন্দরী। রাজা রবীন্দ্রনাথ পুলিশ ইনস্পেক্টার। তাঁহার তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা সত্যেন্দ্রাদিত্য বি-এ একজন সুশিল্পী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পত্নী রাণী সুলেখা।

রাজা প্রাণকৃষ্ণের দুই পত্নী—রাণী ভগবতী ও রাণী মহামায়া এবং পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ দেবনাথ ও মধ্যম লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথমা স্ত্রীর এবং তৃতীয় কালীকুমার, চতুর্থ প্রতাপনাথ ও পঞ্চম প্রসন্ননাথ দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে জন্মিয়া ছিলেন। রাজা দেবনাথের পত্নী রাণী দুর্গাতারিণী ও রাণী মেনকাসুন্দরী। রাণী দুর্গাতারিণীর গর্ভের পুত্রবর্গের মধ্যে রাজা সুরথনাথ রায় বি-এল (জন্ম ১২৪২ বঙ্গাব্দ, চৈত্র) সমধিক প্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি বসির-হাট কোর্টের খ্যাতনামা প্রধান উকীল ছিলেন। তাঁহার ন্যায় আত্মভোলা, অমায়িক, দয়ার্দ্রচিত্ত, আশ্রিতবৎসল এবং ধর্মভীরু অতীব বিরল। এখনো তাঁহার কথায় বসিরহাট অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা আর্দ্রকণ্ঠ। তদীয় পত্নী পদ্মনাথ বোষজ (শিবহাটীর) স্বর্গীয় রসিকলাল রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা—রাণী তরঙ্গিনী (জন্ম ১২৬৬ ও বিবাহ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে)। তিনি স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। তাঁহার ন্যায় দানশীলা পুণ্যবতী রমণী বর্ত্তমানে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। রাজা সুরথনাথের (মৃত্যু ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস) একমাত্র পুত্র রাজা ইন্দুভূষণ বাল্যকালে মারা যাওয়ায় তিনি তদীয় কনিষ্ঠা শ্যালীপতি কাটুনীয়ার রাজা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়ের মধ্যমপুত্র রাজা শ্রীপূর্ণেন্দুকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায় বর্ত্তমান যুগের অন্যতম উদীয়মান ও প্রতিভাবান কুমার কবি। মুদ্রিত না হইলেও অতি অল্প বয়সে তিনি পাঁচ ছয় খানি কাব্য এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বহু প্রসিদ্ধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "প্রবাসী-বান্ধব-সমিতির" নিকট হইতে "বাণী-বিনোদ" উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত; তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ২৫ বৎসর। আমরা কিশোর কবির দীর্ঘ-জীবন ও ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি।

রাজা দেবনাথের অপর ভ্রাতাদের মধ্যে তৃতীয় রাজা কালীকুমারের পুত্র রাজা যোগীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা কালীকুমারের স্ত্রী রাণী স্বর্ণময়ী। পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগে

নিজকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী রাণী গহনকামিনী। রাজা যোগীন্দ্রনাথের চারিপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রাজা সুবোধকুমার এম-এ বর্ত্তমানে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর, তাঁহার পত্নী রাণী রূপমঞ্জরী।

রাজা দেবনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা প্রসন্ননাথের দুই পুত্র—রাজা মনীন্দ্রনাথ, পত্নী রাণী শিশিরবাসিনী ও রাজা ফনীন্দ্রনাথ, পত্নী রাণী মৃণালিনী। রাজা মনীন্দ্রনাথের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে রাজা শৈলেন্দ্রনাথ, তদীয় স্ত্রী রাণী শৈবলিনী ও রাজা জিতেন্দ্রনাথ, তদীয় স্ত্রী রাণী সুবর্ণময়ী। রাজা জিতেন্দ্রনাথ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। রাজা ফনীন্দ্রনাথের পুত্রবর্গের ভিতর তৃতীয় রাজা সৌরেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট গীতবাদ্যবাদক, তদীয় স্ত্রী রাণী আশালতা।

রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নন্দকিশোর রায়ও পিতৃদেবের ন্যায় কর্মদক্ষ, কৌশলী ও তেজস্বী ছিলেন, এবং তিনিও ১১৭০ হিজরীতে মনসবদারীপদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী রাণী মহারাণী। নন্দকিশোরের পৌত্রদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ রাজা রামনারায়ণ রায়ের স্ত্রী রাণী ব্রহ্মময়ী। ১১৬৮ বঙ্গাব্দে রাজা নন্দকিশোরের মৃত্যু হয়।

রাজা হরেকৃষ্ণ, রাজা প্রাণকৃষ্ণ, রাজা রামনারায়ণ—তাঁহাদের সময়েও শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ পরমানন্দকাটীতে ছিলেন। পরমানন্দকাটী বাজিতপুর পরগণার অন্তর্গত। পরে ঐ পরগণা কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বাবুরা (লাডিলমোহন ও গোপীমোহন ঠাকুর) ক্রয় করেন এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহের মালিক হইতে ইচ্ছা করেন। যশোর রাজবংশীয়েরা সে সময়ে রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। ঠাকুর বাবুরা শেষে বিগ্রহ দখল করিবার চেষ্টা করিলে অধিকারীরা গোবিন্দদেব বিগ্রহ রামজীবনপুর রাজবাটীতে আনিয়া রক্ষা করেন। ঠাকুর বাবুদের পক্ষ হইতে তখন তদানীন্তন অধিকারীদের নামে বিগ্রহ অপহরণের মোকদ্দামা দায়ের হয়। মোকদ্দামায় ঠাকুর বাবুরাই পরাজিত হন। ১২০৪ বঙ্গাব্দের ৩০এ মাঘ সে মোকদ্দামা শেষ হয়।

১২৩৫ বঙ্গাব্দে অধিকারীরা যশোর রাজবংশধরগণের নিকট হইতে রায়পুর গ্রাম পত্তনী লইয়া তথায় গিয়া বাস করেন। ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ তখন রামজীবনপুরে। অধিকারীরা বিগ্রহ রায়পুরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে রাজারা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাহাতে নানা গোলযোগ ও মামলা-মোকর্দ্দমা সৃষ্টি হইলেও শেষে মীমাংসা হইয়া যায়। তাহাতে স্থির হয়—অধিকারীরা পুরোহিত এবং যশোর রাজবংশীয়েরা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহের ও সম্পত্তির মূল মালিক। মীমাংসার পর রাজারা অধিকারীদের শ্রীশ্রীবিগ্রহ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রায়পুর লইয়া যাইবার অনুমতি দেন। তাহার পর হইতে প্রতিবৎসর ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ নূরনগর আনিয়া মহাসমারোহে দোলোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। নূরনগরের দোল সর্ব্বথা চিরপ্রসিদ্ধ এবং সে সময়ে সেখানে প্রতিবৎসর বহু সহস্র লোকের সমাগম হইত। এখনো নূরনগরে সে দোলমঞ্চের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

রাজা রামনারায়ণ ও রাজা প্রাণকৃষ্ণের পুত্রদের আমলে উপরিলিখিত ব্যাপার সংঘটিত হয়। রামনারায়ণের ১২৫২ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় লোকান্তর ঘটে। তাঁহার চারিপুত্র—রাজা জগদীশনারায়ণ, তদীয় পত্নী রাণী জগত্তারা ও রাণী স্বর্ণময়ী; রাজা জয়নারায়ণ, তদীয় পত্নী রাণী জয়দুর্গা ও রাণী উমাসুন্দরী; রাজা বাণীনারায়ণ, তদীয় পত্নী রাণী বসন্তকুমারী; রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ, তদীয় পত্নী রাণী নীরদমোহিনী। তাঁহারা চারিভ্রাতাই ১২৬২ বঙ্গাব্দে নূরনগরের অন্তর্গত কাটুনীয়া গ্রামে বাস পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তখন হইতে এক বৎসর নূরনগর, এক বৎসর কাটুনীয়া এই পালা ক্রমে দোলোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে। প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ চলিয়াছিল।

রাজা জয়নারায়ণের (জন্ম ১২২৭, মৃত্যু ১২৭১ বঙ্গাব্দ) দুই পুত্র। রাণী জয়দুর্গার গর্ভে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে রাজা অন্নদাতনয় এবং রাণী উমাসুন্দরীর গর্ভে রাজা চারুচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। রাজা অন্নদাতনয় (মৃত্যু ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) সদাশয়, প্রজাবৎসল, ধার্মিক এবং রাজোচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার পত্নী রাণী দীনতারিণী এবং পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজা যতীন্দ্রমোহন, তদীয় পত্নী রাণী সুকুমারী। যতীন্দ্রমোহন ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুচতুর, কর্মকুশল, সাহসী, সর্বোপরি

সুলেখক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় লোকে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। পিতার ন্যায় রাজোচিত গুণ তাঁহারও যথেষ্ট ছিল। গত ১৩৪৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাজা যতীন্দ্রমোহনের তিন পুত্র। মধ্যম কিশোর-বয়সে মারা যান। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের নাম যথাক্রমে রাজা লালমোহন, পত্নী রাণী আশালতা এবং রাজা নেপালচন্দ্র।

রাজা যতীন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা রাজা মতীন্দ্রমোহনের ১২৭৮ সালের মাঘ মাসে জন্ম হয়। তিনি ১২৯৯ সালে শিবহাটীর পদ্মনাভ ঘোষ বংশীয় স্বর্গীয় রসিকলাল রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা অনিলাবালাকে বিবাহ করেন। রাণী অনিলাবালা কোমলপ্রাণা আদর্শ-চরিত্রা রমণী। তিনি ১২৮৫ সালে জন্মিয়াছিলেন। রাজা মতীন্দ্রমোহন চিন্তাশীল, স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং অতিথিবৎসল। জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। নিজের বংশমর্য্যাদা রক্ষায় তিনি সর্বদা সচেষ্ট। তিনি উন্নতমনা জমিদার, প্রজারঞ্জক রাজা। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে সকল লোক তাঁহাকে আপনজনের মত ভালবাসে, ভক্তি করে। ধর্মে তাঁহার অপূর্ব নিষ্ঠা এবং কর্মে তাঁহার তেজস্বিতা অনুকরণীয়। নূরনগর শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ আজ একমাত্র তাঁহারই আগ্রহে, উৎসাহে, উদ্যোগে এবং প্রাণপাত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের যাবতীয় লোককল্যাণকর কর্ম একমাত্র তাঁহারই ভরসায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় সহস্র বাধা-বিপত্তি, সহস্র মিথ্যা কুৎসা ও কলঙ্ক রটনা, সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে এ যাবৎ নিজকে অব্যাহত ও অক্ষত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে।

তাঁহার আরও একটি মহৎগুণ সৌভ্রাত্র এবং ভ্রাতৃভক্তি। একমাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতার চক্রান্তের ফলে তিনি নূরনগরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সহসা ক্ষতি এবং জীবনসমস্যার মধ্যে পড়িয়াও তিনি কোনদিন অগ্রজের স্বার্থপরতার এবং চক্রান্তের বিন্দু প্রতিবাদ করেন নাই। নির্বিকার চিত্তে জ্যেষ্ঠের স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচার মানিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার নূরনগর বাটীতে তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহা দেখিবার জিনিস। সেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য-পূজার্চনাদি হইয়া থাকে। তাঁহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কন্যা স্বেচ্ছায় চির কৌমারী ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত এবং যথাক্রমে রামকৃষ্ণপ্রিয়া, রামকৃষ্ণবিলাসিনী ও রামকৃষ্ণভাবিনী নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা তিন ভগিনীই সূচি-শিল্পে সুনিপুনা এবং সুকণ্ঠি সঙ্গীতজ্ঞা। কলিকাতা কাঁকুড়গাছি পল্লীর অন্তঃপাতী শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মহাপীঠ-যোগোদ্যানের আচার্য্যদেব শ্রীমৎ-স্বামী রামানন্দজী তাঁহাদের দীক্ষাগুরু।

রাজা মতীন্দ্রমোহনের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজা নলিনী-মোহন, তাঁহার স্ত্রী রাণী নীলিমারাণী। রাজা নলিনী-মোহন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনী এবং নিজবংশ সম্বন্ধে আরো দুই একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিগুলি আজিও মুদ্রিত হয় নাই। যশোর রাজবংশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহারও নিকট অবগত হওয়া যায়। মধ্যম রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু। তিনি নূরনগরের স্বর্গত রাজা সুরথনাথ রায় বি-এল মহাশয়ের দত্তকপুত্র তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ রাজা যামিনীমোহন। বয়স তাঁহার অল্প হইলেও তিনি বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং সচ্চরিত্র।

রাজা অন্নদাতনয়ের তৃতীয়পুত্র রাজা শৈলেন্দ্রনাথ (জন্ম ১২৮১ সাল), স্ত্রী রাণী ষোড়শীবালা। শৈলেন্দ্রনাথ বহুদিন যোগ্যতার ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও কর্মঠ। কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি সরকার বাহাদুরের নিকট তরবারি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ পুত্র রাজা গুণেন্দ্রমোহন বি-এ এবং পঞ্চম পুত্র রাজা জ্ঞানেন্দ্রমোহন। উভয়েরই যথাক্রমে ১৩২০ ও ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। গুণেন্দ্রমোহন ফারসী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

রাজা জবনারায়ণের তৃতীয় ভ্রাতা রাজা বাণীনারায়ণের বংশ নাই। জ্যেষ্ঠ রাজা জগদীশনারায়ণ এবং কনিষ্ঠ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ধারার রাজগণ কাটুনীয়াতেই বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পৌত্র রাজা

কমলেশচন্দ্র বি-এ উল্লেখযোগ্য। তদীয় পত্নী রাণী লাবণ্যলতা।

বাঙ্গালা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজা যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গ যখন একান্নবর্তী, মধ্যম রাজা মতীন্দ্রমোহনই তখন জ্যেষ্ঠের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাহার পর স্বার্থ বুদ্ধি মনোবৃত্তিকে দংশন করায় জ্যেষ্ঠ ক্রমশঃ মধ্যমের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য অস্বস্তিকর বোধ করিতে থাকেন। সেই সময় অকস্মাৎ এক ঘটনা ঘটে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে টাকীর খ্যাতনামা জমিদার স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রায়পুরের অধিকারী-দের নিকট হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ চাহিয়া লইয়া টাকীর নিজবাটীতে রাসোৎসব সম্পন্ন করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যশোর রাজবংশীয়েরা পূর্বেই সে সংবাদ জানিতে পারিয়া অধিকারীদিগকে তাঁহাদের বিনানুমতিতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদান করিতে নিষেধ করেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সাহায্য ও উৎসাহে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত অধি-কারীগণ রাজাদের সে নিষেধ না-মানিয়া তাঁহাদের ঠাকুর তাঁহারা যাহা খুশী করিতে পারেন, প্রকারান্তরে তাহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিগ্রহ টাকী প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। যশোর রাজবংশীয়েরা তদানীন্তন অধিকারীদের সে কৃতঘ্নতায় অত্যন্ত অপমান বোধ করেন। ফলে বিদ্বেষ বিসম্বাদের বিষম বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। শেষে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত রায় যতীন্দ্রনাথ রাজাদের নিকট স্বয়ং আসিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া পারস্পরিক মনোবাদ ভঞ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ রায় যতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রত্যা-র্পিত হইবার পর অধিকারীদের হস্ত হইতে তাহা উদ্ধার মানসে নূরনগরের রাজা সুরথনাথ ও রাজা প্রসন্ননাথ এবং কাটুনীয়ার রাজা যতীন্দ্রমোহন, রাজা মতীন্দ্রমোহন ও রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা রমেশচন্দ্র উদ্যোগী হন। বহুদিন ধরিয়া অধিকারীদের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ ও মামলা মোকদ্দমা হয়। জোর করিয়া রায়পুর হইতে বিগ্রহ লইয়া যাইবার চেষ্টা চলে। অবশেষে অধিকারীদের বাড়ীতে শ্রীশ্রী-বিগ্রহ রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট হইতে পুলিশ-পাহারা বসে। কিন্তু তাহাতে কিছু ফলোদয় হয় নাই। ১৩১১ বঙ্গাব্দে পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান পায় নাই। পরে সেই প্রকৃত বিগ্রহ যশোররাজবংশীয়গণের হস্তগত হয়। টাউন শ্রীপুর নিবাসী ভক্তবর স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বেচ্ছায় কাটুনীয়া রাজবাড়ীতে নিজের ব্যয়ে শ্রীশ্রীবিগ্রহের প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন এবং সেখানেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হন। মূল রাজা যতীন্দ্রমোহনের কৌশল রহিয়াছে বুঝিয়াও নূরনগরের অথবা কাটুনীয়ার অন্যান্য সরিক তাহাতে অমত করেন নাই। তখন হইতে শুধু কাটুনীয়ায় দোলোৎসব সুরু হয়।

তাহার চারি-পাঁচ বৎসর পরে রাজা যতীন্দ্রের স্বার্থবুদ্ধি সর্বাংশে ঘনতর এবং ধূমায়মান হইয়া উঠিলে মধ্যম ভ্রাতা মহানুভব রাজা মতীন্দ্রমোহন আহতচিত্তে জ্যেষ্ঠের অপ্রীতি-কর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া নূরনগর চলিয়া আসেন। ঐ ব্যাপারের কয়েক বৎসর পরে একবার বলপূর্বক শ্রীশ্রী-বিগ্রহ আনীত হইয়া নূরনগরে দোল হইয়াছিল। তাহার পর হইতে যতীন্দ্রমোহনের লালসাবহ্নি দ্বিগুণ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমে ক্রমে অপরাপর সরিক, পরে আপন ভ্রাতৃবর্গকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিয়া গোপনে গোপনে শ্রীশ্রীবিগ্রহকে নিজের এবং আপন সকল সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া ফেলেন; এবং আপন পুত্রদ্বয়কে সেবায়েৎ করিয়া রাখেন। তাহাতেও বিপদ ঘটিতে পারে বুঝিয়া সর্বশেষে সরিকীস্থান হইতে উঠাইয়া এক মাইল দূরবর্তী নিজের অধিকারভুক্ত স্থানে দোলমেলা ও উৎসব সম্পন্ন করিতে থাকেন। এখন সেখানেই মেলা হইতেছে। রাজারা বহু সরিক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ এখানে-ওখানে বিদেশে ছড়াইয়া আছেন। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও একতা তাঁহাদের শিথিল হইয়া হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজা যতীন্দ্রমোহনের নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে ইচ্ছা করিলে সকলেই বাধা দিতে পারিতেন এবং অমন ঘটিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। বাস্তবিকই ঐ দুর্নীতি ও প্রতারণার বিষয় ভাবিলে স্বতঃই দুঃখ জন্মে। এখনও সরিকেরা সমবেত চেষ্টা করিলে হয়তো অনেক কিছু হইতে পারে।

বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের পতনের পর হইতে যশোর রাজবংশীয়গণের ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইল। বঙ্গের এই প্রাচীন রাজবংশ বর্তমানে স্তিমিত প্রদীপের ন্যায় যতই নিষ্প্রভ হউন না কেন, তথাপি যে তাঁহারা কীর্তিমান, যশস্বান, সমগ্র ভারতের চিরস্মরণীয়—চিরবরণীয় পূর্বপুরুষের অমর এবং শৌর্য্যমণ্ডিত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়াছেন—এই পরম গৌরবে ভারতবাসী আমরা আজি পরম গৌরবান্বিত। শ্রীভগবান্ যশোর রাজবংশকে পুনরায় জাগাইয়া তুলিয়া জয়যুক্ত করুন—ইহাই কামনা।

শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য

বন্ধুত্ব

দৌলতন নেছা খাতুন

হালফ্যাসানের এ্যারিসটোক্র্যাট ফ্যামিলিতে শচীন্দ্র গাঙ্গুলী যে সকলের অতি সুপরিচিত ছিল শুধু তাহাই নহে, বিবাহযোগ্যা কন্যার মাতাদের নিকট এবং অবিবাহিতা তরুণীদিগের নিকট সে ছিল একটি মস্ত লোভনীয় বস্তু। কারণ ছিল অবশ্য যথেষ্ট। শ্রেষ্ঠ বরের আসন দাবী করিতে যে কয়েকটি গুণ থাকা মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের কৃপায় শচীন সেগুলি দখল করিয়াছিল একচেটিয়াভাবে। বিত্ত এবং বিদ্যার দিক দিয়া সে ছিল লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বরপুত্র। বার দুই বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে নামের পিছনে মস্তবড় একটা লেজুড় জুড়িয়া লইয়া। তাহার সুগঠিত সুঠাম সুপুষ্ট মাংসপেশীযুক্ত দেহ, শুভ্রবর্ণ, প্রতিভায় দীপ্ত উজ্জল মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ তরুণী মহলে এমনি আকাঙ্খনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে ইহার জন্য তাহাকে মাঝে মাঝে রীতিমত বেগ পাইতে হইত। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে বহু চেষ্টা সর্ত্বেও কেহই এ পর্য্যন্ত তাহাকে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। তরুণীদের সহিত সে মিশিত নিসঙ্কোচে এবং নির্ব্বিকার চিত্তে। প্রয়োজন হইলে তাহাদের সাহায্য করিত অতি অযাচিতভাবে। কিন্তু এতদিনে তাহারা সকলেই বুঝিতে শিখিয়াছে যে শচীনের এই অযাচিত সাহায্য এবং মিশিবার ভিতর কোনরূপ গূঢ় অর্থ নাই। কাহারও প্রতি সে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছে এ দোষ তাহাকে কেহ দিতে পারিবে না। ইহাতে মনে মনে অনেকে চটিলেও আজ পর্য্যন্ত কেহই একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই।

শচীন ছেলেটি ছিল একটু অনন্যসাধারণ। চরিত্রবলে সে ছিল সাধারণ হইতে অনেকখানি উপরে। তবে বোধ হয় ইহার মূলে ছিল মেয়েদের প্রতি একটা অন্তর্নিহিত অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা। কেন,—এ প্রশ্ন করিলে সে যে যুক্তিগুলির অবতারনা করিত সেগুলি নেহাৎই তাহার নিজস্ব তৈরী ব্যক্তিগত যুক্তি। সে বলিত মেয়েরা অত্যন্ত হালকা এবং চপল। ইহাদের ভিতর না আছে গুরুত্ব, না আছে ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশটি মেয়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখ সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। আকৃতিগত যা পার্থক্য, প্রকৃতিতে এক। সে আরও বলিত ইহারা নিজেদের বিকাইয়া দিবার জন্য এমনই উন্মুখ হইয়া থাকে যে আমাদের হাত পাতিবারও তর সয় না, আসিয়া ধরা দেয়। যেখানে জয় করিবার দুর্জ্জয় সংগ্রাম নাই, সেখানে পাইবারও কোন আনন্দ নাই। মূল্য দিয়া যে জিনিষ কিনি, তাহাকে আমরা কদর করি। বিনামূল্যের জিনিষের কোন কদর নাই। ইহাদের সহিত সাময়িকভাবে যুদিবা প্রেম করা চলে, বিবাহ করিয়া ঘর করা চলে না। দুদিনেই হাঁপাইয়া উঠিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য শচীনের এই মতবাদগুলি তরুণী মহলে ততটা আসিয়া এখনও পৌছায় নাই। পৌছিলে হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, তাহারা নিজেদের সম্মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এ হেন বিজ্ঞ শচীনও একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে এই ফাঁদে পা দিল—অবশ্য নিজের অজ্ঞাতে।

মিঃ ব্যানার্জ্জি সেদিন তাহার রায়বাহাদুর খেতাব পাইবার উপলক্ষে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাটিতে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সুন্দর একখানি মোটরে চড়িয়া শচীন আসিয়া নামিল। মিঃ ব্যানার্জ্জি এবং তাঁহার স্ত্রী সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শচীন ঘরে প্রবেশ করিতেই মেয়েদের ভিতর একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি উঠিল।

"এই স্যুটে আপনাকে আজ চমৎকার মানিয়েছে মিঃ

গাঙ্গুলী।" ডলি দত্ত নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

আপনার থেকে বেশী নয় নিশ্চয় মিস্ দত্ত। আপনার এই সাড়ীখানিতে আপনাকে যা মানিয়েছে beautiful!" প্রতিনমস্কার করিয়া শচীন সহাস্যে উত্তর করিল।

একটা পরিতৃপ্তির হাসি ডলি দত্তের মুখে ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঈষৎ লাল্‌বর্ণ ধারণ করিল। অবশ্য ইহা তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয়। সত্যই সে অপূর্ব্ব সুন্দরী। অন্যান্য তরুণীরা তাহার প্রতি একটু ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে চাহিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ওর বেশী শচীনকে কেহ কখন অগ্রসর হইতে দেখে নাই। গায়ে পড়িয়া যেমন মেয়েদের সহিত মিশিবার তাহার গরজ নাই, তেমনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহারা তাহার নিকট আসিয়াছে দস্তুরমত তাহাদের মনোরঞ্জনেও সে কখন পিছু পা হয় নাই। পরিচিত সকলকেই সে এইরূপ কিছু না কিছু বলিয়া সম্ভাষণ করিতে ত্রুটি করিল না।

বাহিরে মিঃ ব্যানার্জ্জির গলা শুনিতে পাওয়া গেল। তিনি যেন কাহাকে পরমসমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। পরক্ষণেই বিরলকেশ মোটাসোটা একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি আসিয়া হলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারই পশ্চাতে যে তরুণীটি আসিয়া ভিতরে দাঁড়াইল তাহাকে দেখিয়া শচীন অকস্মাৎ কেমন স্তব্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। মেয়েটি সুন্দরী নয় কিন্তু সুশ্রী। বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী, চিন্তাপরিস্ফুট দীর্ঘপক্ষ্মযুক্ত টানা টানা উজ্জ্বল চক্ষু, পাতলা বদ্ধ ওষ্ঠ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, প্রতিভায় সমুজ্জ্বল ললাট;—মোটকথা, সবশুদ্ধ মিলিয়া মেয়েটির মুখে এমন একটি বিশিষ্ট ছাপ, যাহা শচীনকে সজোরে নাড়া দিল। ইহাকে যেন ঠিক অবজ্ঞা করিতে যেন কোথায় বাধে। নারী সম্বন্ধে শচীন যে মত পোষণ করিত তাহাতে এইবার ঘা পড়িল। মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে নারীর এমন একটি রূপের সন্ধান পাইল যাহা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। শচীন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। চমক ভাঙ্গিল মিঃ ব্যানার্জ্জির কথায়। তিনি বলিতেছিলেন, "এই যে শচীন, এঁদের তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম।"

শচীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "ইনি মিঃ চাটার্জ্জি, অর্থাৎ সত্যেন চাটার্জ্জি, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ষোল বৎসর পর সম্প্রতি বিলাত থেকে দেশে ফিরেছেন। এটি এঁর মেয়ে বীণা; এইবার অক্সফোর্ড থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। সত্যেন, ইনি শচীন গাঙ্গুলী। সব—

শচীন গাঙ্গুলী। মিঃ চাটার্জ্জি চমকিয়া উঠিলেন। এ নাম যে তাঁহার অতি পরিচিত। তিনি শচীনের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমার বাবার নাম কি নিরোদ গাঙ্গুলী?"

বিস্মিতভাবে শচীন কহিল, "হ্যাঁ।"

মিঃ চাটার্জ্জি তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন—"তুমি—তুমি শচীন—তুমি নিরোদের ছেলে... অ্যাঁ!—"

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। শচীন নিজেও কম বিস্মিত হয় নাই। মিঃ চাটার্জ্জি তাহাকে পরম যত্নে পাশের চেয়ারখানিতে বসাইয়া বলিলেন, "তোমায় যে কত জায়গায় খুঁজেছি বাবা, তার ঠিক নেই।"

শচীনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। মিঃ চাটার্জ্জি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, "তুমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না, না শচীন?"

শচীন একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ—তা—ঠিক—"

বৃদ্ধ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "কি করে তুমি জানবে বাবা? তোমার বাবা যখন মারা যান তুমি তখন খুব ছোট। আমি তখন বিলাতে। দৈবদুর্ব্বিপাকে সে সময় আসতে পারিনি। কিছুদিন পরে এসে অনেক চেষ্টা ক'রেও তোমার কোন খোঁজ পেলাম না। সে আজ বিশ বছরের কথা।" মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চুপ করিলেন তাহার পর সাদরে শচীনের একখানি হাত তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার বাবা যে আমার কতবড় বন্ধু ছিলেন সেটা ঠিক ভাষা দিয়ে তোমায় বোঝাতে পারব না শচীন।"

শচীন এতক্ষণে দিশা পাইল। কি বলিতে যাইয়া মুখ

তুলিতেই সে হঠাৎ থামিয়া গেল। বীণা কেমন একরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। শচীনকে চাহিতে দেখিয়া সে মুখ নামাইয়া লইল।

পার্টি হইতে যখন শচীন বাড়ী ফিরিল রাত্রি তখন ন'টা। আজ সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক। আনন্দে অথবা নিরানন্দে—মনটা ঠিক কোন পর্য্যায়ে আছে সে নিজেও আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

"দিন দশ বার হয়ে গেল শচীনকে একবারও নিমন্ত্রণ করা হল না, কি অন্যায় বলত বীণা! বুড়ো বয়সে কাজের তাড়ায় আমার যেন ভুল হতে পারে, কিন্তু তোর ত এটা মনে রাখা উচিত ছিল মা।"

চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢালিতে ঢালিতে বীণা পিতার এই অনুযোগে মৃদু হাসিল।

"না, না, হাসি নয়, ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। আজই বেয়ারাকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেও।" চায়ের পেয়ালায় নীরবে বার কয়েক চুমুক দিয়া তিনি নামাইয়া রাখিলেন; বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় যদি এতদিন পরে তাকে ফিরে পেলাম, তখন যত শীঘ্র তোদের দুহাত এক করতে পারলে আমার জীবনের এক মস্ত কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পাই।"

বীণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। একটু হাসিয়া বলিল, "আমায় তাড়াতে পারলে তুমি বাঁচ,—না বাবা?"

মিঃ চাটার্জ্জি মৃদু হাসিলেন; কহিলেন, "সত্যি মা, ওর বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, তারপর ওকে না পেয়ে এতদিন যে কি চিন্তায় কেটেছে তা একমাত্র আমার অন্তর্যামী জানেন।" একটু থামিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ছেলেটি উপযুক্ত,—নইলে, নইলে যে কি হত—" বৃদ্ধের স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে চায়ের পেয়ালাটি হাতে উঠাইয়া লইলেন।

ইহার মধ্যে বীণার যে দুই-চারিজন তরুণীর সহিত আলাপ হইয়াছিল তাহাদের নিকট সে শচীন সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিল। তাই একটু চিন্তান্বিতস্বরে কহিল, "আমি আজই তাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছি, কিন্তু ও কথাটা এত তাড়াতাড়ি নাই বা বললে বাবা।"

পেয়ালার শেষ চুমুক দিয়া তিনি বলিলেন, "কেন?"

বীণা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি শুনেছি বিয়ে জিনিষটার প্রতি নাকি তার প্রবল বিতৃষ্ণা।"

মিঃ চাটার্জ্জি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ও বাতিক এক সময় আমাদেরও ছিল, শচীনেরও আছে দেখছি। হা হা হা হা!"

বীণাও হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "সে যাই হোক বাবা, তুমি ও কথা আজ কিছুতেই বলতে পাবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।" হাসিতে হাসিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অতি শৈশবে বীণার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। মিঃ চাটার্জ্জি একাধারে তাহার মাতা ও পিতা ছিলেন। তাই কোন কথাই এই পিতা পুত্রীর মধ্যে বাধিত না।

বৈকাল চারিটায় শচীন আসিয়া উপস্থিত হইল। মিঃ চাটার্জ্জি তাহাকে অতি সমাদরে ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। একটু পরে চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বীণা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সাজসজ্জা সে করিয়াছিল সামান্যই, কিন্তু উহাতেই তাহার সুশ্রী প্রশান্ত মুখশ্রীকে অতি মনোরম দেখাইতেছিল। মুহূর্ত্তমাত্র স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া শচীন ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। নিমন্ত্রিত অতিথি সে একা। ইহাতে শচীন একটু বিস্মিত হইলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া নীরবে চায়ের পেয়ালাটি হাতে তুলিয়া লইল।

মিঃ চাটার্জ্জি অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "নিমন্ত্রণ না করলে কি আসতে নেই বাবা? তোমার বাবার সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল তাতে—"

বাধা দিয়া শচীন কহিল, "না, না, আমি নিশ্চয়ই আসব। এ কদিন একটু ব্যস্ত ছিলাম।"

ধীরে ধীরে নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। শচীনের সহিত আলাপ করিয়া মিঃ চাটার্জ্জি খুব খুসী হইলেন। পুঁথিগত বিদ্যাই ছেলেটির জ্ঞানের মাপকাঠি নয়, চলতি জগতের অনেক খবরই সে রাখে। কিছুক্ষণ

পরে মিঃ চাটার্জ্জি উঠিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আমার কাজ আছে শচীন, তুমি ততক্ষণ বীণার সঙ্গে একটু গল্প-টল্প কর, ও বড্ড একা পড়েছে। নূতন জায়গায় সঙ্গী সাথী এখনও যোগাড় করে উঠতে পারেনি।" হাসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বাহির হইয়া গেলেন।

দুই জনেই চুপচাপ। একজন আকাশের দিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন, অপরজন হাতের নোখ খুঁটিতে ব্যস্ত। হটাৎ মুখ ফিরাইয়া শচীন আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা, অবিবাহিত নরনারীর বন্ধুত্বে কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

বীণা এইবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিমন্ত্রিত অতিথির সামনে এইরূপ নিঃশব্দে বসিয়া থাকা বিসদৃশের চরম, কিন্তু নারীর প্রতি শচীনের অবজ্ঞার যতটুকু ইতিহাস সে জানিয়াছিল তাহাতে কথার সুরু ঠিক কোথা হইতে আরম্ভ করিলে সুসঙ্গত হইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। একলা নিজেকে লইয়া বিব্রত বোধ করিতেছিল। এইবার মুখ তুলিয়া বলিল, "কি রকম?"

শচীন তাহার-মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যদি বলি যে আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি, অর্থাৎ আপনাকে আমি আমার প্রকৃত বন্ধুরূপে পেতে চাই তাহলে কি আপনি—" শচীন কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

বীণা বেশ একটু আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, "আপনার দুটো প্রশ্ন যে দু'রকমের হ'ল মিঃ গাঙ্গুলী, প্রথম প্রশ্ন হল অবিবাহিত নরনারীর বন্ধুত্বে আমার বিশ্বাস আছে কিনা। আগে আপনি বন্ধুত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন, বন্ধুত্ব বলতে আপনি কি বোঝেন সেটা শুনতে চাই, তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।"

শচীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এই যেমন, একজন ছেলের সঙ্গে অন্য ছেলের অথবা একজন মেয়ের সঙ্গে অন্য মেয়ের বন্ধুত্ব হয়। অবশ্য আমি সাধারণ বন্ধুত্বের কথা বলছি না। প্রগাঢ়, অর্থাৎ গভীর, মানে প্রকৃত বন্ধুত্বের কথাই বলছি।"

শচীনের কথা বলার ধরণে বীণা না হাসিয়া পারিল না; বলিল, "না, ওতে আমার বিশ্বাস নেই।"

"বিশ্বাস নেই? কেন?"

"অসাধারণ বলে।"

"ও ত ঠিক উত্তর হল না মিস্ চাটার্জ্জি।"

"হতে পারে। কিন্তু যেতে দিন এ কথা মিঃ গাঙ্গুলী, কি হবে আমার মতামত দিয়ে?"

"কারণ, আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি।"

"ওঃ! ভুলে গিয়েছিলাম।" বীণা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস নরনারীর দেহের ছোট-বড় কামনাগুলি এসে নির্জ্জলা বন্ধুত্বে বাধা জন্মায়, যা পুরুষে পুরুষে অথবা নারী নারীর বন্ধুত্বে ঘটতে পারে না।"

মুখখানা বিকৃত করিয়া শচীন বলিল, "ও ত পুরণো কথা, সবাই বলতে পারে।"

"কিন্তু পুরনো বলেই ত সত্য জিনিষের মূল্য কমে যায় না মিঃ গাঙ্গুলী।"

বীণার কথায় কান না দিয়া শচীন বেশ জোরাল গলায় বলিল, 'মানুষ তাদের পূর্ব্বপুরুষ থেকে আজ বহু উন্নতস্তরে উঠেছে। দেহ-কামনার বহু উর্দ্ধে মানুষ আজ তার চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করেছে। সামান্য নরনারীর বন্ধুত্বকে গ্রহণ করতে পারবে না মিস্ চাটার্জ্জি? অবশ্য এ জিনিষ যে সকলের জন্য নয়, সে আমিও বুঝি।" একটু থামিয়া গলার স্বর নামাইয়া লইয়া বলিল, "তাহলে জগতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? পূর্ব্বপুরুষ থেকে তারা যে ঢের বেশী উন্নত হয়েছে, এ বড়াই বা তারা করবে কি দিয়ে?"

মৃদু হাসিয়া বীণা বলিল, 'বড়াই করবার অনেক জিনিষই বর্ত্তমান মানুষে পেয়েছে, কিন্তু এদিক দিয়ে আমরা বিশেষ কিছু উন্নতি করিনি বলেই আমার বিশ্বাস মিঃ গাঙ্গুলী। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সঙ্গে খুব বেশী প্রভেদ নেই।"

শচীনের কান লাল হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিতস্বরে কহিল, "কক্ষণ নয়!" পরক্ষণেই নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাই আপনার বন্ধুত্ব কামনা করছিলাম। আমার জীবনে এটা আমি প্রমাণ করতে চাই মিস্ চাটার্জ্জি, যে পুরুষ ও নারীর প্রকৃত বন্ধুত্বে দেহের ছোট-বড় দাবীগুলি এসে বাধা জন্মাতে পারে না। এ বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাই মিস্ চাটার্জ্জি।" তাহার কণ্ঠে মিনতির সুর।

বীণা মুখ নীচু করিয়া ভাবিতেছিল। তাহার মুখে কৌতুকপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভাবী স্বামীর সহিত বন্ধুত্ব!—মন্দ হইবে না। কিন্তু ইহার শেষ পরিণতি যে—

চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। শচীন তাহাকে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন মিস্ চাটার্জ্জি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" বীণা মুখ তুলিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই আপনাকে আমি বিশ্বাস করি মিঃ গাঙ্গুলী।"

"তাহলে আপনি রাজী?"

বীণার সম্মতি পাইয়া শচীন উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত মনে তাহার বিপুল পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতেছিল।

ইহার পর প্রায় একমাস গত হইয়াছে। বীণা এবং শচীনের বন্ধুত্ব ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া চলিয়াছে। যখন খুসী শচীন মিঃ চাটার্জ্জির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন দুজনে মিলিয়া বই পড়ে, আলোচনা করে, কখন বীণা গান করে শচীন অর্গান বাজায়, কখন বা দুজনে মিলিয়া বেড়াইতে অথবা সিনেমায় যায়। সময়ের যেন পাখা হইয়াছে। শচীনের দিন যে কোথা দিয়া কাটে সে টের পায় না। সমস্ত অন্তর তার পরিপূর্ণতায় ভরা। মিঃ চাটার্জ্জি ইহাদের মেলামেশায় দোষনীয় কিছুই পাইলেন না। ভাবিলেন কিছুদিনের মধ্যেই শচীনকে সব জানাইয়া বিবাহের দিন স্থির করিবেন।

ইহার পর আরও কিছুদিন বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, কিন্তু হঠাৎ একদিন শচীন তাহার অন্তরের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। বীণা সম্বন্ধে তাহার মনের ভিতর যে জিনিষগুলির আনাগোনা সুরু হইয়াছে তাহাকে হাজার চেষ্টা করিলেও ঠিক বন্ধুত্বের গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় না। শচীন অস্থির হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া মনকে অতি কঠোর সুরে শাসন করিল। দুর্ব্বলতাগুলির কান ধরিয়া টানিবে বলিয়া শাসাইল। কিন্তু তবু সে লক্ষ্য করিল বীণার হাত সে পূর্ব্বের ন্যায় অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইতে পারে না, সঙ্কোচ বোধ হয়। বীণার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে বলিতে মাথাটা আপনা হইতেই নীচু হইয়া পড়ে, অথবা ঘুরিয়া যায়। শচীন রীতিমত ভয় পাইল। বীণার সহিত তাহার ব্যবহারের প্রতি পদক্ষেপ সে কঠোর পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখিতে সুরু করিল, পাছে বন্ধুত্বের গণ্ডীর বাহিরে কিছু করিয়া বসে। কিন্তু অতি বিস্ময় এবং অতি দুঃখের সহিত শচীন দেখিল যে তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জিনিষটা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনের আদর্শের ভিতর এইরূপ গলদ ঢুকিতে দেখিয়া শচীন মনে ব্যথা পাইল বটে, কিন্তু উপায় খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল সে সব সময়ে মনের মধ্যে বীণাকে না ভাবিয়া পারে না। অতর্কিত মুহূর্ত্তে বীণাকে নিকটে দেখিলে তাহার সমস্ত রক্তে নাচন সুরু হয়—রোধ করিতে পারে না। নিরুপায় হইয়া শচীন বীণাকে ক্রমে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বীণা কিছুদিন হইতেই শচীনের ব্যবহারে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব অনুভব করিতে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিল যে সে তাহার নিকট হইতে অনেকখানি দূরত্ব রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বীণা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিল বটে, কিন্তু তাহাকে সে আমল দিল না। শচীন ক্রমেই তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল।

বৈকালে পশ্চিমদিকের বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়া বীণা এই কথাই চিন্তা করিতেছিল। শচীন নিঃশব্দে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল। যেখানে সে দাঁড়াইয়াছিল সে স্থান হইতে বীণার মুখের একাংশ দেখা যাইতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যের স্বর্ণাভ আলো বীণার স্বভাবসুন্দর মুখশ্রীকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। শচীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ঐ মুখখানিকে নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিবার অদম্য ইচ্ছা তাহাকে বারংবার সম্মুখে ঠেলিতে লাগিল। শচীন এক পা আগাইয়া ত্রস্তে দুই পা পিছাইয়া আসিল। কি করিতেছে সে! অতি অসহায় ভাবে শচীন ভাবিল, বীণার নিকট হইতে সে পলাইবে যেখানে হোক, পৃথিবীর একপ্রান্তে যাইতে হয় সেও স্বীকার তবুও সে জীবনের এই লজ্জাকর পরাজয়ের কাহিনী বীণার নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিছুতেই না—বুক ফাটিয়া

মরিয়া গেলেও না। নিজেকে সবলে সংযত করিয়া শচীন ডাকিল, "বন্ধু।"

"বন্ধু?"—বীণা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"আমি কিছুদিনের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছি।"

বীণা চমকিয়া উঠিল! "অন্যত্র? কেন?"

শচীন রেলিংএ ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "যাই, একটু ঘুরে আসি, অনেকদিন হল বাইরে বেরোইনি।"

"ও।" বীণা মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল;—বলিল, "তুমি কি আমার বন্ধুত্বে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ শচীন?"

বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া শচীন বলিল, "কি যে বল!"

"কিন্তু আমি যে কদিন থেকেই তোমার ভিতর একটা পরিবর্ত্তনের সুর শুনতে পাচ্ছি, কি হয়েছে বন্ধু? আমাদের বন্ধুত্বের ভিতর পরস্পরের কোন কিছুই গোপন থাকবে না এইরকম কথাই কি ছিল না?"

তেমনি বাহিরের দিকে চাহিয়া শচীন উত্তর করিল, "আমার কিছুই হয়নি বীণা।"

"মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।"

"বারে", শচীন ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাস করি না মানে? কিছুই হয়নি তবু বলতে হবে কিছু হয়েছে?"

"হ্যাঁ কিছু হয়েছে" দৃঢ় কণ্ঠে বীণা বলিল, "নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ না বল্লে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমিও অন্যত্র চলে যাচ্ছি শচীন।"

বিস্মিতভাবে শচীন বলিল, "কোথায়?"

"শীগগিরই আমার বিয়ে।" বলিয়া সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শচীনের মুখের দিকে চাহিল।

আচমকা শচীনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। "বিয়ে—তোমার?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে দেখছি! বিয়ে হবে না আমার? চিরদিন তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই কাটবে নাকি?"

তাত বটেই, শচীন বলিতে চাহিল, তাত বটেই। বন্ধুত্ব করিয়া চিরদিন কিছু আর একজনের কাটিতে পারে না। কিন্তু সে একটি কথাও কহিতে পারিল না। শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিল। চোখ দুটি বাহিরে ঠেলিয়া আসিতে চায়। মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়াও সে নিজেকে সংযত করিতে পারিতেছিল না। আচ্ছন্নের মত মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বীণা তখনও শচীনের সেই নত মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; বলিল, "আর তিন চার দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ছোটবেলার থেকেই বাগ-দত্তা কিনা।" বাগদত্তা! তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় শচীন লাফাইয়া উঠিল।—"তুমিত—তুমিত একথা কখনও বলনি আমায়?" দুরন্ত উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে-ছিল। কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। চোখ দুইটি জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। বীণা তাহার চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত হইল। শচীন বীণার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ় হস্তে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন বলনি আমায় এ কথা? কেন?"

ব্যস্তকণ্ঠে বীণা কহিল, "জানাইনি তার কারণ আমাদের বন্ধুত্বের ভিতর এ জিনিষটাকে টেনে আনার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিনি বলে। কিন্তু তুমি ও রকম করছ কেন শচীন?"

"বন্ধুত্বই বটে!" বিকৃত কণ্ঠে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া শচীন ঝড়ের ন্যায় বাহির হইয়া গেল।

বীণা স্থাণুর ন্যায় শচীনের গমন পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ সে শচীনের ভিতরটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে।

বিকাল ৫টা। ইহারই মধ্যে কিন্তু শীতের সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। শচীন একটা মোটা বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ কাহার পদশব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল মিঃ চাটার্জি ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া।

"একি এখনও শুয়ে, শরীর খারাপ নাকি? কৈ, বীণা ত আমায় কিছু বলেনি।"

শচীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাতি জ্বালাইতে জ্বালাইতে বলিল, "না। একটু মাথা ধরেছে মাত্র।"

কিন্তু বিজলি বাতির উজ্জ্বল আলোয় শচীনের চেহারা দেখিয়া মিঃ চাটার্জ্জি ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "না কি রকম? চেহারা যে বড্ড খারাপ ঠেকছে!"

ম্লান হাসিয়া শচীন কহিল, "মাথা ধরলে ও রকম আমার হয়ে থাকে কাকাবাবু, ওতে আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাল ভাল হয়ে যাবে।" শচীন তাঁহার সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিল।

ক্ষণকাল মিঃ চাটার্জ্জি চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর শচীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি। ভেবেছিলাম আর কিছুদিন পরে বললেই চলবে কিন্তু আজ খবর পেলাম যে সামনের এই বিয়ের দিন ছাড়া মাস তিনেকের মধ্যে কোনো ভাল দিন নেই।" মিঃ চাটার্জ্জি চুপ করিলেন।

শচীনের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। বীণার বিবাহ!—বীণার বিবাহ! বীণার বিবাহ!

মিঃ চাটার্জ্জি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পঁচিশ বৎসর আগের কথা শচীন, তুমি তখনও হওনি। এই গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে তোমার বাবা আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমাদের ছেলেমেয়ে হলে পরস্পরের বিয়ে দিয়ে এই বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করব।"

শচীন চমকিয়া মিঃ চাটার্জ্জির মুখের দিকে চাহিল। মিঃ চাটার্জ্জির দৃষ্টি তখন ঊর্দ্ধে। তিনি বলিতেছিলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় যদিই সেদিন পেলাম, কিন্তু সে আজ বহুদূরে!" তাঁহার গলার স্বর কম্পিত হইয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। শচীন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। হঠাৎ মিঃ চাটার্জ্জি মুখ নামাইয়া শচীনের একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন,—"আজ আঠার বৎসর আমি তোমারই আশায় বীণাকে বসিয়ে রেখেছি শচীন।" শচীনের সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বীণা তাহারই!—তাহারই বাগদত্তা বধূ! কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু তাহার চোখ ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বাতির আলোয় বৃদ্ধের চোখে তাহা ধরা পড়িল না।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের নিকট আত্মীয় কেউ ছিল না। দূরসম্পর্কীয় যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাউকেই আমি চিনতাম না। তোমার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর তোমায় যে কে নিয়ে গেল জানতে পারলাম না। শুধু তোমার নাম জানতাম। সেইটুকু সম্বল ক'রে অনেক খোঁজ করলাম কিন্তু খোঁজ পেলাম না।" তিনি চুপ করিলেন; যেন সেই সব পুরনো জিনিষ হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন।......"তারপর বহুবার খোঁজ করেও যখন তোমার কোন সংবাদ পেলাম না, তখন যে কি ভাবনাই হয়েছিল বাবা। আজ সে সব কথা মনে হলে হাসি পায়।" মিঃ চাটার্জ্জি মৃদু হাসিলেন। "যাক্ সে সব পুরনো কথা আর একদিন বরং বলব; কিন্তু আজ আমি উঠি, বীণা আবার বাড়ীতে একা রয়েছে কিনা।" চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আজ আমার মনটা ভারী হালকা হয়ে গেল শচীন। মনে হচ্ছে কাঁধ থেকে যেন একটা মস্ত বড় বোঝা নেমে গেল।" সহাস্যে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অসহ্য পুলকে শচীনের শিরা উপশিরাগুলা ঝিম ঝিম করিতেছিল। মিঃ চাটার্জ্জি চলিয়া গেলে খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, যেন আনন্দকে একা নিভৃতে রসিয়া বেশ রশিয়া কশিয়া ধীরে সুস্থে উপভোগ করিতেছে। হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আলনা হইতে একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া একরকম ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আজ দুই দিন হইল শচীনের কোন খোঁজ নাই। বীণার মন অস্থির হইয়া উঠিল। একবার কাহাকে দিয়া খোঁজ লওয়া উচিত কিনা সেই কথাই সে তাহার পড়িবার ঘরের জানলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। নবমীর চাঁদ আকাশে হাসিয়া উঠিয়াছে। এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া বীণার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বীণা দাঁড়াইয়াছিল। পিছন হইতে নিঃশব্দে শচীন আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

বীণা চমকিয়া উঠিল—"ছিঃ শচীন!"

"ছিঃ বীণা!"

"বন্ধুর অমর্য্যাদা।"

"মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া!"

নিজেকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বীণা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "বাগ্দত্তা বধূর এই রকম ব্যবহারের কথা ভাবলে আমার ভাবী স্বামী—"

"ঠিক এইভাবে তোমায় আদর করবে।" শচীন নিজের মুখটি তাহার মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া অর্দ্ধপথেই তাহাকে থামাইয়া দিল।

দৌলতন নেছা খাতুন

রসসাহিত্যে পরশুরাম ও কেদারনাথ

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ এম-এ

সাহিত্যে করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রস থাকিলেও রসসাহিত্য বলিতে এই প্রবন্ধে ও অনেকস্থলে হাস্যরসাত্মক সাহিত্য বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সাহিত্য বাংলাদেশে প্রথম সৃষ্টি করেন ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১১—১৮৫৮)। কিন্তু কবি ও পাঁচালীওয়ালাদের প্রভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য বিশুদ্ধ হাস্যরস বা ইংরাজীতে যাহাকে হ্যুমার (humour) বলে তাহা গুপ্ত কবির অমার্জ্জিত সাহিত্যে বড় দেখিতে পাইনা। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের জন্মদাতা হইলেও উহাকে লালন পালন করিয়াছেন তাঁহার শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই সর্ব্বপ্রথম হাস্যরসকে সাহিত্য-সমাজে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রভৃতি রচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল গানের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া এক যুগান্তর আনিলেন। কথাশিল্পে স্বর্গীয় প্রভাতকুমার হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুকুমার রায়, রসময় লাহা, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন লেখক হাস্য-ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীময় ভাঙাগড়ার ফলে যে মনোবৃত্তির সম্ভব হইল তাহার ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া লাগিল। আর সেই নূতন মনোবৃত্তি বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রসসাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিলেন সর্ব্বপ্রথম পরশুরাম ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা-সাহিত্যে এই দুইজন রসশিল্পীর স্থান নির্ণয়ের সময় হয়ত আজও আসে নাই। আজ সাহিত্যবিচারকগণ তাঁহাদের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিবেন মহাকালের বিচারে ঐ স্থানের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু তবুও তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা আছে। তাঁহারা স্রষ্টা, সৃষ্টিই তাঁহাদের আনন্দ, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টি যে শতসহস্র নরনারীকে নির্ম্মল আনন্দদান করিয়াছে তাহার জন্য কি সাহিত্যসেবীগণের কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহাদের সৃষ্টির প্রকৃত রস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া সম্মান প্রদর্শনই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। জাতির মঙ্গলের দিক দিয়াও ইহার সার্থকতা আছে। জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে জাতির আপন সত্তা সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। এইরূপে জাগ্রত থাকিবার অন্যতম পন্থা জাতির শিল্পী ও কবিকে পূজা করা। বিশেষতঃ যে সকল শিল্পী জাতিকে আপনার দোষগুণ দেখিবার সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত কর্ত্তব্য। এই দুইজন শিল্পী বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও অসঙ্গতি সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের চিত্রে বিদ্বেষ বা ঘৃণার গন্ধমাত্র নাই, বরং কেদারনাথের চিত্রে দেখিতে পাই চিত্রকরের অন্তরে রহিয়াছে অন্তহীন সহানুভূতি ও দরদবোধ। তাঁহাদের রচনাকে শুধু সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, সেই রচনার তলে যে ভাবের ফল্গুধারা বহিতেছে তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হইবে। বাঙালী কোন্ 'গড্ডলিকা' প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়াছে, বাঙালী কোন্ 'হনুমানের স্বপ্ন' দেখিতেছে পরশুরাম তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। কেদারনাথের দেশপ্রীতি ও জাতিপ্রীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। 'আই হ্যাজ' পড়িলে বুঝিতে পারা যায় তিনি বাঙালীর ক্লৈব্যপ্রাপ্তির আশঙ্কায় কত ভীত, কত ব্যথিত। তাঁহারা উভয়েই

হাস্যরসের মধ্য দিয়া বাঙালীকে বলিয়াছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি।' তবে তাঁহাদের রসরচনায় প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্য্যের লেশমাত্র চেষ্টা নাই। এইজন্যই তাঁহাদের সৃষ্টি এত আনন্দদায়ক।

পরশুরাম ও কেদারনাথের শিল্পীজনোচিত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাঙালী চরিত্রের নানাবিধ হাস্যোদ্দীপক অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে। পরশুরাম দেখিয়াছেন বর্ত্তমান বাংলার তরুণ সমাজে লালিমা পাল (পুং), দোদুল দে, শিহরণ সেন জাতীয় যে পৌরুষহীন যুবকের দল দেখা যাইতেছে তাহাদের ব্যঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কেদারনাথও 'ভাদুড়ীমশাই' গ্রন্থে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বর্ণনায় বর্ত্তমান যুগের যুবকগণের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া মধুর হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। ভণ্ড লম্পট সন্ন্যাসী, স্বার্থসর্ব্বস্ব চিকিৎসক, বঞ্চক, শঠ ব্যবসাদার কেহই পরশুরামের পরশুর আঘাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। কেদারনাথ প্রবাসী বাঙালীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন অতি নিপুণ তুলিকাস্পর্শে। সে নৈপুণ্যের মূলে রহিয়াছে নিজের প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা। দেওঘর, মধুপুর, কাশী ও পূর্ণিয়া তাঁহার অধিকাংশ চিত্রের পটভূমি। বাঙালীর দেশত্যাগের ফলে 'ধেমোশালিক' বা 'ডোমিসাইলড' হইবার করুণ কাহিনী 'কোষ্ঠীর ফলাফলে' কেদারনাথ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। পরশুরামের ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, লাটুবাবু, বিরিঞ্চিবাবা, নকুড়মামার মত কেদারনাথের 'পাওনা'র কুলীনশিরোমণি মাতুল, 'ভাদুড়ী মশাই'য়ের ভাদুড়ী মশাই, আচার্য্য মহাশয়, 'কোষ্ঠীর ফলাফলে'র বৈবাহিকমহাশয়, ভোজনপটু জয়হরি ও লৌহব্যবসায়ী অমর প্রভৃতির চিত্র ভুলিবার নহে। বাঙালীর কেরাণীজীবনের পশ্চাতে যে ট্র্যাজেডি আছে তাহার সন্ধান কেদারনাথ 'পাওনা' গ্রন্থে দিয়াছেন। চাকরীর মোহে বাঙালীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাচ্ছলে তিনি বলিতেছেন :—

চাকুরির ডাকে শব্দ নাই—শোনা যায় না; চাকুরির টানও দেখা যায় না, কিন্তু ছুট করায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রণয় অপেক্ষা প্রবল,—প্রণয় ধীরে ধীরে টানে—গোপন অভিসারেই তার মাধুর্য্য। চাকুরির টানের সঙ্গে চাবুক চলে। ভাগ্যবানেরাই সেটা অনুভব করেন।

এই বর্ণনায় হাসি অপেক্ষা কান্নার সুরই অধিক বাজে। অফিসের মধ্যে কেরাণীর কর্ম্মজীবনের চিত্রে যে অসঙ্গতি দেখিতে পাই তাহাও বেশ অম্লমধুর রসের সঞ্চার করে। নিম্নলিখিত বর্ণনায় তাহা সুস্পষ্ট হইবে—

'বেলা তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। আপিসের বিবিধ বিভাগের সজীব যন্ত্রগুলির কর্ম্মচাঞ্চল্য মুখর হইয়া একটা গম্ গম্ ধ্বনির গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত রেস সৃষ্টি করিয়াছে। কাজে অকাজে সকলেই ব্যস্ত। কাহারো কাহারো তখনো দুর্গানাম লিখিয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া প্যাডের মধ্যে রাখা হয় নাই, কেহ পেনসিল কাটিতে নিবিষ্ট। যাহারা কাজের জন্য আসিয়া অতিষ্ঠভাবে অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের প্রতি দৃকপাত নাই।'

পরশুরামের বর্ণনা আরও সুন্দর ও নিখুঁত। সামান্য খুঁটিনাটী হইতে গভীরতম বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আছে। তাঁহার মত বাস্তব চিত্র অতি অল্প সাহিত্যিকের লেখনী দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের অফিসের বর্ণনা, 'জবকর্ণে' দুর্য্যোগের বর্ণনা, 'রুচিসংসদে'র কেষ্টোর বর্ণনা এক একটি নিখুঁত চিত্র।

পরশুরামের সহিত কেদারনাথের তুলনা করিতে গেলে ডিকেন্স ও থ্যাকারের কথা মনে হয়। থ্যাকারের মত সুবৃহৎ পটভূমি ব্যবহার না করিলেও পরশুরাম প্রধানতঃ ব্যঙ্গশিল্পী বা স্যাটায়ারিষ্ট (satirist)। কেদারনাথ ডিকেন্সের মত দরদী হ্যুমারিষ্ট (humurist)। চলচ্চিত্র জগতে প্রসিদ্ধ চার্লি চ্যাপলিনের হাস্যরসের সহিতও তাঁহার হাস্যরসের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রকৃত হ্যুমারের লক্ষণই হইতেছে হাসির পিছনে অশ্রু লুক্কায়িত থাকে। কেদারনাথের হাসিও প্রায়ই অশ্রুসিক্ত। মনুষ্যচরিত্রের অসঙ্গতি ও ত্রুটি লইয়াই হাস্যরসের উৎপত্তি হয়, কেদারনাথও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার হাসি ফুটিয়াছে, তাহাদের জন্য তিনি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। বাঙালীর দুঃখ, বাঙালীর সংকীর্ণতায় তিনি প্রকাশ্যে হাস্যধ্বনি করিলেও অন্তরে অশ্রুপাত করিয়াছেন। তাঁহার হাসির ধ্বনির সহিত প্রায়ই একটা করুণ সুর জড়িত

থাকে। এইরূপ হাস্যরসের প্রসঙ্গে কার্লাইল বলিয়াছিলেন, 'Humour is sympathy with the seamy side of things'. পরশুরামের হাস্যরসের মধ্যে এই সহানুভূতি নাই, তাই যেন উহা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপই পরশুরামের বিশেষত্ব। এই হিসাবে পরশুরাম কেদারনাথ অপেক্ষা আরো আধুনিক। আধুনিক যুগের হাস্যরসে সর্ব্বদাই যে একটু ব্যঙ্গের ভাব থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখক কম্প্‌টন্ রিকেট আধুনিক হ্যমার সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'The spirit of mockery is more in evidence than in the elder humour; there is an absence of that immense flow of animal spirits that meets us in Dickens, or the tender spontaneous whimsicality of Lamb. The humour is thinner, drier, less universal in its appeal'. পরশুরামের ব্যঙ্গচিত্রে সরসতার অভাব থাকিলেও তাহাতে ইংরাজী স্যাটায়ারের বিষোদ্গীরণ নাই, আছে শুধু হাসি। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময় হিংসা অসূয়া অকৌশল নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া।...হুতোম পেঁচার মত নক্সা বিদ্বেষ পরিপূর্ণ। ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে এই যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পরশুরাম সম্বন্ধে প্রকাশ করিতে পারি। পরশুরামের ব্যঙ্গের আরও গুণ এই যে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষকে লক্ষ্য করে নাই। পরশুরামের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার নির্ব্যক্তিকত্ব। তিনি যে শুধু আপনার নাম গোপন করিয়াছেন তাহা নয় নিজের ব্যক্তিত্বও গোপন করিয়াছেন। শেক্স্পীয়রের নাটকাবলী হইতে তাঁহার চরিত্র নিরূপণ যেমন অসম্ভব, পরশুরামের ব্যঙ্গরচনা হইতেও পরশুরামের ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার তেমনই কঠিন। এই নাটকীয় গুণটী বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার রচনাগুলিকে সহজেই নাটকের রূপ দেওয়া যায়। তাঁহার চরিত্রগুলির কথোপকথন তাই এত নাটকীয়। পরশুরাম চেষ্টা করিলে হয়ত একজন শ্রেষ্ঠ নাট্য শিল্পী হইতে পারিতেন। তবে পরশুরামের হাস্যরস কেদারনাথের মত হৃদয়স্পর্শী নহে, পরশুরামের হাস্যরস উইট্ (wit) জাতীয় বুদ্ধিয়া মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি দিয়া উহা গ্রহণ করিতে হয়। কেদারনাথের গ্রন্থে যে wit নাই তাহা নহে, কিন্তু পরশুরামের মত উহা অত জমাট অথচ স্ফটিকস্বচ্ছ নহে। এইজন্য পরশুরাম আমাদের প্রশংসার পাত্র, আর কেদারনাথ আমাদের ভালবাসার পাত্র।

ভাষার দিক দিয়া পরশুরামের জোড়া নাই। তাঁহার শব্দ নির্ব্বাচন এরূপ সুচিন্তিত যে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। তাঁহার প্রতি শব্দটীতে তাঁহার কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনায় একটুও জড়তা নাই, একটুও কষ্টকল্পনা নাই। পরশুরামের নিজস্ব এমন একটী ষ্টাইল আছে যাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ অনুকরণ করিতে পারে নাই। কেদারনাথের মধ্যে বাকসংযম দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুপ্রাস, শ্লেষ, ধ্বনিসাদৃশ্য প্রভৃতি অনেকস্থলে কেদারনাথের পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হয়। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, 'জলযোগে আর ফলযোগে অমৃতযোগের কাজ করিল। কিন্তু মশকের ব্যতীপাৎযোগে—সব রসটুকুই শোষণ করিল।' এইরূপ কথার মোহে কেদারনাথ অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু পরশুরামের কথার বাহুল্য এতটুকুও নাই। বাক্‌সংযম থাকিলে কেদারনাথ শিল্পী-হিসাবে পরশুরামকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেন।

বাংলাসাহিত্যে পরশুরাম ও কেদারনাথের আবির্ভাব আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। মামুলি প্রেমের কাহিনীতে প্লাবিত বাঙলা দেশে তাঁহাদের রসরচনা প্রকৃত রসিকজনের পক্ষে বিধাতার অপ্রত্যাশিত দান। বিংশশতাব্দীর সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের রচনার মৌলিকতাও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যুগে মৌলিকতা সৃষ্টি বা রক্ষা করা অল্প গৌরবের কথা নহে। জীবজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেও ক্রমবিবর্ত্তন আছে এবং প্রত্যেক কবি

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিকট ঋণী। এই সত্যটী স্বীকার করিয়া লইলে পরশুরাম ও কেদারনাথের মৌলিকতায় মুগ্ধ হইতে হয়। পরশুরামের রচনায় রবীন্দ্রনাথের শব্দ নির্ব্বাচন নৈপুণ্য ও কেদারনাথের ভাষায় মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অমৌলিক মনে করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে।

বর্ত্তমান যুগের সাময়িক পত্রিকায় যে সকল রসরচনা বা ব্যঙ্গ রচনার প্রচলন হইয়াছে তাহার মূলে আছেন পরশুরাম। শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দবাজারে' যে রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা পরশুরামের রসেরই মতো। দুঃখের বিষয় তিনি দ্বিতীয়বার সেই রসসৃষ্টির জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। আর একজন উদীয়মান হাস্যরসিকের মৃত্যুতে বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র রচয়িতা হিসাবে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত পরশুরামের সমকক্ষ হইতে পারিতেন। বর্ত্তমান সাহিত্যে পরশুরামের অনুকরণের চেষ্টা চলিতেছে, অনেক নবীন সাহিত্যিক তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়াছেন, তবে আসল ও নকলের প্রকাশভঙ্গিতে যে চিরন্তন পার্থক্য থাকে তাহা থাকিবেই। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে কেদারনাথের পথেও নূতন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

কণা

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

তুমি নিলে চোখে অনাদিকালের
জাগ্রত নীরবতা ;
মোর হাতে তুলে দিলে বীণাখানি,
কণ্ঠে মুখর কথা।

হে প্রেম, দুঃখের মাঝে ধরিয়াছ অম্লান-সুন্দর
দেবতা মূরতি।
স্ফটিকের চাকচিক্য গেল যবে আঁধারে, ফুটিল
মাণিক্যের জ্যোতি।

চীন জাপানে যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

যাদুসম্রাট—পি, সি, সরকার

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন সে দেশের 'নিচি নিচি' নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে একদিন দেখি যে—"চীনের ফেংটাই সহরে একদিন একদল জাপানী সৈন্য কুচকাওয়াজ ও কৃত্রিম আক্রমণের অভিনয় করিতেছিল। উহাকে (ভ্রমবশতঃ) প্রকৃত আক্রমণ মনে করিয়া স্থানীয় চৈনিক সৈন্যদল বাধা দেয়। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে। পরের দিন ভুল বুঝিতে পারিয়া উভয় দলই যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছে।"

ছিল এবং সুযোগ অন্বেষন করা যাহাদের স্বভাব তাহাদের সুযোগের অভাব কখনও হয় না।

জাপানীদিগের নিকট বর্ত্তমান চীন জাপান যুদ্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি সকলেই এক অজুহাত দেখাইতেন যে—জাপানের লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং (ইতালীয়দের ন্যায়) তাহারাও যথেষ্ট উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাহারা একটী তুচ্ছ অজুহাত দেখাইয়া মাঞ্চুকুও অধিকার

সাংহাইর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাস্তা নানকিন রোড
(বোমাবর্ষণে এ অংশও ধ্বংস হইয়াছে)

বর্ত্তমান বৎসরের চীন জাপান যুদ্ধের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। অন্ততঃ জাপানী সংবাদপত্রসমূহে জাপানী সংবাদ পরিবেশক অনুরূপ রিপোর্টই প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ থামিয়াও থামিল না। কারণ জাপান সর্ব্বদাই এক তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া সংঘর্ষ বাধাইবার সুযোগ খুঁজিতে-

করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত যে উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা সেবার মাঞ্চুকুও অধিকার করিয়াছিল তাহার পরিণাম আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া, জাপানীরা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ নানা উপায়ে চীনে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। সেই জন্যই উত্তর চীনের প্রতি ইহাদের লোলুপ

দৃষ্টি রহিয়াই গিয়াছে। বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পিপিং সহরের নিকটবর্ত্তী হোপি ও চাহার প্রদেশে জাপানের কর্ত্তৃত্বে একটী তথাকথিত স্বায়ত্ত শাসনাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হয়। চীন সাম্রাজ্যের নানকিংস্থ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট

একটি চৈনিক মন্দির
(ক্যাণ্টনে অবস্থিত)

জাপানের প্রভাবে উহা বাধ্য হইয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। সুযোগ পাইলেই সবলে বলীয়ান জাপান চীনের নিকট নূতন দাবী উপস্থিত করে এবং চীনও উপায়ান্তর না দেখিয়া উহা মানিয়া লয়। এইভাবে যুদ্ধ থামে এবং তাহার পর-মুহূর্ত্তেই আসে আবার নূতন অভিসন্ধিপূর্ণ নূতন দাবী। বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে চীনের নিকট জাপান নিম্নলিখিত তিনটী দাবী উপস্থিত করিয়াছিল—"(১) চীন বিদেশী জাতিগুলিকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে চালিত করিয়া জাপানের কার্য্যে বাধা দিতে পারিবে না ; (২) মাঞ্চুকুও রাজ্য নিশ্চিতরূপে মানিয়া লইতে হইবে ; (৩) উত্তর চীনে কম্যুনিজম্ দূর করিবার জন্য তাহাকে জাপানের সহিত যোগ দিতে হইবে।"

কিন্তু এদিকে চীনের যুদ্ধোপকরণ ও শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাইলেও, রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তাহারা জাপান অপেক্ষা হীন নহে। সেজন্য চীনের নিকট হইতে জাপানের দাবী-

সাংহাই সহরের প্রসিদ্ধ রাস্তা—নানকিন রোড
(সম্প্রতি বোমাবর্ষণে ধ্বংসীকৃত হইয়াছে)

গুলি নানা অছিলায় পূরণ হইতেছে না। এজন্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ন্যায় এবারেও তাহারা অনুরূপ তুচ্ছ দাবী লইয়া নির্ম্মম ভাবে চীন সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছে। এবার-

কার চীন আক্রমণে আমার মনে হয়, অপর কোন কারণও জাপানীদের বিদ্যমান আছে। কারণ চীনের পরস্পর বিবদমান দলসমূহের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যেরূপ মিলন সংগঠিত হইতেছিল জাপান তাহা স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছিল। কাজেই চীন সম্বন্ধে তাহাদের আর উদাসীন থাকা কোনমতেই চলিত না। কারণ এর পর উপযুক্ত সময় ও সুযোগ নাও আসিতে পারিত। অপর কারণ এই যে, ইউরোপের শক্তিবর্গ স্পেনের ব্যাপার লইয়াই তখন ব্যস্ত ছিল কাজেই চীন সম্বন্ধে তাহারা মনোযোগ দিতে সক্ষম হইবে না। ও বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি পরিচালনায় সুদক্ষ। চীনে আজ যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেদিনকার আবিসিনিয়ার উপর ইটালীর দৌরাত্ম্যেও একে একে একটি স্বাধীন দেশকে নিরুপায় হইয়া প্রবলের নিকট আত্মসমর্পণের চিত্রই চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। প্রবলের সহায় জগতের সকলেই। সেই জন্যই বোধ হয় চীন ও আবিসিনীয়ার চরম মুহূর্তেও বিশ্বব্যাপী কোন মহাসমর বাঁধিয়া উঠিল না। চীন এ পর্য্যন্ত বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রকৃত পরিচয় বহুবারই পাইয়াছে।

সাংহাই যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র—ইয়াংসি নদীতীর (সাংহাই)

জার্ম্মানীর সহিত চুক্তি অনুযায়ী সে তখন জাপানের সহায়। তদুপরি চীনে ক্রমশই বলশেভিক রাশিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। জাপান দেখিল যে চীনে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে সে দেশে তাহাদের প্রবেশ অধিকার একেবারেই থাকিবে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই তাহারা এবার চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগের যুদ্ধবিগ্রহ বড়ই ভীষণ—তদুপরি জাপান আজ সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বলিত মারণাস্ত্র সেজন্য চীন-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদাসীনতা দেখিয়া তাহারা মোটেই আশ্চর্য্যান্বিত হয় নাই।

চীন আজ আত্মপর ভুলিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। জেনারেল চিয়াং কাইশেকের অধিনায়কত্বে তাহারা দেশপ্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে তাহা জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। চীনেও লোভী মিরজাফরের দলের অভাব নাই। বিভীষণের ন্যায় কোন দেবতার আশীর্ব্বাদেই যেন মিরজাফরের দল যুগে যুগে জন্মাইতেছে; উহারা যেন অমর! হোপি-চাহারাস্থ

স্বায়ত্বশাসনাধীন রাজ্যের অধিনায়ক জেনারেল সাং-সে-উয়েন জাপানীদের আধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। জেনারেল স্যাং নাকি জাপানের হাতে ক্রীড়া পুত্তলিকা সাজিতে নারাজ ছিলেন। এদিকে উত্তর চীনে জাপানীদের লোলুপদৃষ্টি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে লক্ষ্য করিয়া—তদঞ্চলে জাপানী আধিপত্য খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে নানকিং গভর্ণমেণ্ট বহু সৈন্য ও রণসম্ভার প্রেরণ করেন। ইহার অধিনায়ক নিযুক্ত হন জেনারেল সাং। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল পলাশীক্ষেত্রে মিরজাফরের ন্যায় ব্যক্তিত্বের উপরই এক্ষনে চীনের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে চীনের অনুকূলে ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠিত হইয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী মাত্রেই আজ ইয়াংসিতীয়ে চিয়াংএর বিজয় নিশান দেখিতে উৎসুক হইয়া আছে। কিন্তু কেহ কেহ মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করিয়া থাকেন দেখা যায়। তাঁহাদের বিবেচনায় চীন অপেক্ষা জাপানের জয়ে নাকি ভারতবর্ষের লাভের সম্ভাবনা অধিক। তাঁহারা বলেন যে—"জাপান অতিশয় পরাক্রান্ত হইলে এবং

জলযানবহুল সাংহাই বন্দরের একাংশ

(সম্প্রতি বোমাবর্ষণে এই রাস্তা ধ্বংস হইয়াছে)

জেনারেল সাং আক্রমণ নীতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত না করিয়া তিনি সন্ধি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি পিওটিংএও প্রত্যাবর্ত্তন করেনই নাই—পক্ষান্তরে পিপিং পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যদল সহ বহুদূরে চলিয়া যান। এই স্বদেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী মার্শাল চিয়াং কাইশেক সদলবলে জাপানীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মার্শাল চিয়াং কাইশেকের

তাহার সীমা ভারতবর্ষের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া ইংরেজকে ভারতবর্ষের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং রাজনীতিক অধিকার দান করিয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিক অসন্তোষ প্রশমিত করিতে হইবে।" আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে জাপান দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সমগ্র চীন গ্রাস করিয়া ফেলিতে যদিই বা সক্ষম হয় এবং যদিই বা ইংরেজদের সহিত ইহাদের সংগ্রাম বাধে তাহা হইলে উপরিউক্ত বিষয় নিশ্চয় সত্য হইবে। কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে তাহা হইবার নহে। বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায় যে জাপান শক্তিশালী হইলে ইংরেজদের বৈদেশিক রাজনীতির ফলে তাহারা ইংরেজের শত্রু না হইয়া মিত্রও হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আর বেশী শক্তিশালী হইলে রাশিয়া অপেক্ষা জাপানের সহিতই ইংরেজ সদ্ভাব রাখিতে প্রয়াসী হইবে—এবং উহা লাভ করিতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধাও হইবে না — তদুপরি ইংরেজ নিজেকেও

আধুনিকা চৈনিক রমণী

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সজাগ রাখিয়াছে। সিঙ্গাপুরের বিমান ঘাঁটীকে শক্তিশালী করিয়া তুলা, কলিকাতা, করাচী, বোম্বাই সহরে 'ব্লাক আউট' করিয়া বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায় শিক্ষা দান প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যেন এদিকে ইংরেজও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, উপযুক্ত শক্তিশালী হইলেই প্রবল জাপান বন্ধুত্ব প্রস্তাবে রাজী হইবে নতুবা ইংরেজের বন্ধুত্ব সে প্রত্যাখ্যানও করিতে পারিত। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষ চীনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার আরও যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চীন ও জাপানে চলিতেছে উহা দুইটী প্রবল সাম্রাজ্যবাদী জাতির মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষ নহে। উহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অন্যায় অত্যাচার। ইহা একটী ধনতান্ত্রিক দেশের সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সার বিরুদ্ধে বহুকোটি নিরস্ত্র লোকের আত্মরক্ষার ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। চীনের পূর্ব্বকার রাজ্য গঠন যাহাই হউক না কেন বর্ত্তমানে গণশক্তিই চীনের রাষ্ট্রনিয়ন্তারূপে দেখা দিয়াছে এবং এই গণশক্তির উপরই চীনের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। চীন যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় তবে গণশক্তি আরও শক্তিশালী হইয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে। এইভাবে চীনদেশের ন্যায় একটী বিরাট দেশ যদি ধনতান্ত্রিকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া তাহার রাজশক্তি জনসাধারণের হাতে আসে তাহা ভারতবর্ষের গণআন্দোলনে যথেষ্ট নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবে। গণতান্ত্রিক চীন হইতে এই ভাবে ভারতীয় আন্দোলন যেভাবে পুষ্ট ও শক্তিশালী হইবে, জাপানের বিজয়ে তদ্রূপ কোন আশাই ভারতবর্ষের নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস দুর্ব্বল

সাংহাইর একটি গগনস্পর্শী অট্টালিকা
(সম্প্রতি বোমাবর্ষণে ধ্বংস হইয়াছে)

চীনের প্রতি আন্তরিক সহায়তা প্রকাশ করিয়াছে। কংগ্রেসের মত অর্থাৎ অধিকাংশ ভারতীয়ের মত এবং

সেইজন্য সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী জাপানের বিরুদ্ধে ও চীনের অনুকূলে প্রবল জনমত গঠিত হইয়াছে।

যুদ্ধের প্রথম দিক দিয়া চীন সামরিকশক্তির যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে চীনের জয়ের আশার প্রতি জগতের সকলের আস্থা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জেনারেল চৌ-এন-লেই ও মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সম্মিলিত বাহিনী এবারে সুসংবদ্ধ হইয়া অসীম ক্ষমতার

যাদুকর—পি, সি, সরকার

পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণ চীনে কয়েকটী যুদ্ধে পর পর জয়লাভ করিয়া চৈনিক সৈন্যদল আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে। চীনের বিমানবাহিনী ও গরিলাবাহিনী জাপানকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে জাপান পড়িয়াছে এক মহাসঙ্কটে! বর্ত্তমানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে চাহিয়া জাপান ঘোরতর সংগ্রামের মোটেই পক্ষপাতী নহে। কারণ চীনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে—তাহাকে জয় করিতে হইলে জাপানের সমস্ত শক্তিই ব্যয়িত হইবে। জয় তবুও সুনিশ্চিত কিনা সন্দেহের বিষয়। আন্তর্জাতিক ঘটনা পরম্পরার দিকে মনোযোগ দিলে বুঝা যায় যে এই মহাসন্ধিক্ষণে জাপান তাহার সমস্ত শক্তি নিশ্চয়ই ব্যয় করিবে না। কাজেই আপোষের চেষ্টা ব্যতীত এ যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু এই আপোষের প্রস্তাব জাপানের পক্ষে পরাজয়েরই সমান নয় কি? সম্প্রতি জনশ্রুতি শুনা যাইতেছে যে জাপান নাকি বৃটেনকে মধ্যস্থ করিয়া চুপে চুপে আপোষের চেষ্টা করিতেছে। ইহা জাপান সরকারীভাবে অস্বীকার করিলেও অনেকে মনে করেন ইহা নিতান্ত অমূলক নহে।

সে যাহাই হউক, আজ চীনে পরস্পরের মধ্যে জাগিয়াছে মনুষ্যত্বের প্রেরণা—তাই তাহারা আজ দলাদলি ও আত্মপর ভুলিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখীন হইয়াছে। দেশকে তাহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসে বলিয়াই তাহারা স্বাধীনতার জন্য দেশ-মাতৃকার চরণে প্রত্যহ শত শত প্রাণী আত্মবলি দিতেছে। তাহাদের সাম্প্রদায়িক ঐক্য জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতেছে। আর সেই চীনেরই প্রতিবেশী ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে আজ বিরাজ করিতেছে হীন স্বার্থান্বেষণ ও ঘোরতর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি। এখনও আমরা "রাম জিন্দাবাদ—শ্যাম বরবাদ" ধ্বনি তুলিতে ব্যস্ত। আমরা আজও পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে উন্মত্ত হইয়া দুর্ব্বার আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছি। সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদ ও মোহান্ধতা আজ আমাদিগকে কোথায় টানিয়া নামাইতেছে? কে জানে এই ব্রতের ফল কি?

পি, সি, সরকার

প্রার্থনা

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

পথের প্রান্তে দাঁড়ায়ে রয়েছি আসিবে বলি'
ভ্রান্তির ঘোরে ফেলিয়া গিয়াছে সকলে চলি',
ঘনায়ে আসিছে নয়নে আমার
গভীর সুপ্তি শ্রান্তি আঁধার,—
পথ দেখাইতে নাহিক প্রদীপ বড় যে একা,
এমন সময় মিলিবে কি হায় কাহারও দেখা ?

কত মরুপথ ঘুরেছি বহিয়া অসহ তৃষা,
কত নিদ্‌হারা যামিনী যাপিনু অশ্রুমিশা !
ব্যাকুল হইয়া ডেকেছি তোমায়,
দাও নাই সাড়া আসোনি গো হায়,
প্রভাতের আশা ভাষা হারায়েছে, এসেছে নিশা,
বৃথা প্রতীক্ষা, নয়নে কণ্ঠে অসহ তৃষা।

এবার ক্লান্ত চরণ চলিতে চাহে না আর,
সুমুখে সরণি আসিল কী সাঁঝে ? তন্দ্রাভার
ঘনায়ে আসিছে স্তব্ধ নয়নে,
শিথিল শিথানে বিজন শয়নে
স্বপনে তুমি কী জাগিবে উজলি' এ আঁধিয়ার ?
মুছিয়া লবে কী স্নেহভরে এই বেদনাভার ?

পথ চলিবারে পাথেয় যা ছিলো তোমারি দান
ফুরালো যদি বা, আবার—দাও গো ভরিয়া প্রাণ—
নাহি যার আদি নাহিক বিলয়,
দাও সে অমৃত নাহি সংশয়,—
শ্রান্ত পথিকে হে প্রিয় এবার দাও গো স্থান,
দাও গো আবার, দাও দাও আরো ভরিয়া প্রাণ।

তোমার সে দানে নাহি সংকোচ নাহিক ক্ষতি,
যত খুসী চাই, আরো তত পাই,—নাই বিরতি।
হে জীবননাথ হে আমার কবি,
আঁকো এ স্তিমিত চোখে তব ছবি,
লহো শেষবার চরণে তোমার করুণ নতি ;
তোমার দানের নাহি কোন ক্ষয় নাহি যে ক্ষতি।

উপকার

"ভাস্কর"

১

পরোপচিকীর্ষার জন্য এ পাড়ায় জগদীশ বাবুর খ্যাতিই সর্বাপেক্ষা বেশি। সেদিন দুপুরের পর দিবানিদ্রার আলস্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, খবর শুনেছ ?

কিসের খবর ?

পাড়ায় থাক, আর পাড়ার খবর রাখ না ?

ব্যাপারটা কি বলত ?

তোমাদের ওই রামহরি বোস—ওই বুড়ো যাচ্ছে বিয়ে করতে !

বটে ! এমন খবরটা আমার কাণে পৌছয় নি—ছোঁড়াগুলো একেবারে অপদার্থ ! দেখি, এর একটা বিহিত করতেই হবে। কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে, কিছু শুনেছ ?

অত আমি জানিনে। শুন্‌লাম নাকি একটা পনর বছরের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে—অজেই রাত্রে বিয়ে।

কি সর্বনাশ ! পনর আর পঞ্চাশ ! আমি বেঁচে থাকতে এ হতে দেবো না। দেখি আমার পাঞ্জাবীটা আর মনিব্যাগটা—এর একটা হেস্তনেস্ত না করে বাড়ী ফিরছি নে। আমার সামনে এসব তরুণী সংহার চল্‌বে না !

২

রামহরিবাবু বাড়ী আছেন ?

কে ?

আজ্ঞে, আমি জগদীশ !

ও, এস এস। তা এমন সময়ে কি মনে করে ? আমি তো আজ একটু ব্যস্ত। বরঞ্চ আর এক সময়ে এসো, বসে বসে গল্প সল্প করা যাবে।

আজ্ঞে, আমিও ভয়ানক ব্যস্ত। এখুনি আপনার সঙ্গে দুটো দরকারী কথা না বল্‌লে চল্‌ছে না।

নেহাতই যদি কিছু বলতে চাও তো চট্ করে বলে ফেল—বললামই তো, আমি একটু ভয়ানক ব্যস্ত আছি আজ।

কথাটা অত্যন্ত গুরুতর। একটু বস্‌তে হবে আপনাকে—আর আমার কথাটা শুনতে হবে।

বেশ তো; যা বল্‌বে, চট্ করে বলে ফেলো—আমি আজ একটু বিশেষ ব্যস্ত।

তবে শুনুন। শুন্‌লাম, আপনি নাকি আজ বিয়ে করতে যাচ্ছেন !

অ্যাঁ—তা তোমাকে কে বল্‌লে ?

আর পাত্রীটির বয়স নাকি পনর ?

দেখে তো তাই মনে হ'ল। তা পনর-ষোলই হবে খুব সম্ভব—মেয়েছেলের বয়স, জোর করে কিছু বলা যায় না।

এ বিয়ে তো হ'তে পারে না !

মানে ?

মানে, পনর আর পঞ্চাশ—অসম্ভব !

কেন ?

কেন, তাও আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

বুঝতে যখন পারছিনে, তখন বুঝিয়ে দিতে হবে বৈকি।

এই বিয়ে যে মেয়েটির পক্ষে হত্যার সমান, তা বুঝতে পারছেন না ?

না।

কি আশ্চর্য ! এ বয়সে আপনার বিয়ে করাই উচিত নয়। যদি নেহাতই করতে হয়, তবে চল্লিশ বা অন্তত পক্ষে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত।

বিয়ে করা উচিত নয়, একথা মানলেও মান্‌তে পারি। কিন্তু যদি বিয়েই করতে হয়, তবে প্রৌঢ়া বিয়ে করব কেন ? নিরামিষ আহার ভাল হ'তে পারে, কিন্তু যদি পাঁঠা খেতেই হয়, তবে বুড়ো পাঁঠা খাব কেন ?

নদীপথে [ফটোগ্রাফ—শ্রীলালবিহারী রায়

ছিন্নরশ্মি [ফটোগ্রাফ—শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

দেখুন, আপনার যে শুধু মানসিক রুচিবিকার ঘটেছে, তা নয়, আপনার ভাষাটাও অত্যন্ত অসংযত।

এ তো আমার ভাষা নয়, তোমাদেরই মহামহোপাধ্যায়-দের লেখা পত্রিকার ভাষা।

দেখুন, বিয়েটা শুধু ভোগ নয়, ওটা একটা কর্ত্তব্য, একটা দায়িত্ব, একটা সামাজিক ব্যাপার, একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান। শুধু ব্যক্তিগত খেয়ালটাকেই বড় করে না দেখে যদি বিরাট মানবতার দিক্ থেকে জিনিষটা বিচার করে দেখেন, তাহলে—

বুঝেছি। আচ্ছা বল তো, আমি যদি মানসীকে বিয়ে নাই করি, তাহলে ওর কোথায় বিয়ে হবে, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?

তা অবশ্য নেই। ওদের অবস্থার কথা যা শুনলাম, তাতে হয়তো ওদেরই মত গরীব ঘরেই বিয়ে হবে। আপনার মত অবস্থাপন্ন ঘরে হয়তো স্থান পাবে না। কিন্তু তাই বলে ওদের ওই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনি মানসীর মত একটা রূপসী গুণবতী মেয়ের সর্বনাশ করবেন?

সর্বনাশ করবো! সে কি! আমি যতদূর জানি, মানসীর এতে অমত নেই। ঘটকের মুখে শুনলাম, আমি যদি এ বিয়ে না করি তা হলে মানসীর বিয়ে হবে এমন জায়গায়, যেখানে ভাল খেতে পরতেও পাবে না, এমন কি ভগবানের দেওয়া আলো বাতাসটুকুও জুটবে না, পূর্বপুরুষের জরাজীর্ণ বাড়ির নীচের তলার অন্ধকার একখানি ঘর, একটি জান্‌লা আর একটি দরজা—এই তার সম্বল। কোন্ আফিসে পঁচিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি, তাতে তার আপিসের ভদ্রবেশ রক্ষা করাও কঠিন। ছোকরার বয়স অবশ্য অল্প—বছর তেইশ চব্বিশ হবে।

সেও ভাল। তবু আপনার মত একটা বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে এ হতেই পারে না।

কেন? যদি আমার পক্ষে স্ত্রীর বয়স কামনা করাটা তোমার মতে নিতান্তই গর্হিত, বিশাল মানবিকতার একান্ত গ্লানিকর বলে মনে হয়, তাহলে স্বামীর রূপ, গুণ, বিদ্যা, মান, যশ, আর্থিক স্বচ্ছলতা, [illegible]দের আহ্লাদ, গৃহিণীর পদ মর্যাদা, সংসারের কর্তৃত্বও [illegible]ই উপেক্ষা করে শুধু বয়সটাকেই একমাত্র কাম্য মনে করাটা নারীর পক্ষে গর্হিত নয় কেন? কোন বৃদ্ধ বা বয়স্ক লোক যখন কোন তরুণীকে বিয়ে করতে যায়, তোমরা তৎক্ষণাৎ ধরে নাও যে একটা সবল সুন্দর বিদ্বান্ চরিত্রবান বিত্তশালী যুবক তরুণীটিকে তার স্পোর্টস্ কারে তুলে নিয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে বেড়াতে চায়, আর এই সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করে, এক বৃদ্ধ তাকে জোর করে দুঃখের কূপে নিক্ষেপ করতে চায়। কিন্তু ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরূপ—যেমন এ ক্ষেত্রে।

আপনি যদি মানসীর মনটা দেখতে পেতেন, তাহলে বুঝতেন, সে কি চায়। তা'ছাড়া অতটুকু খুকির পক্ষে চাওয়া না চাওয়ায় মূল্যই বা কি? কিই বা বোঝে সে?

দেখ, আমার প্রথম বিয়েও হয়েছিল পনর বছরের মেয়ের সঙ্গে। বাংলা দেশের পনর বছরের খুকিরা কি চায় না চায়, ভাবে না ভাবে, বোঝে না বোঝে, তার খবর তোমার চেয়ে আমি বেশী জানি। তা'ছাড়া মানসীর চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড় বলেই তার প্রকৃত মঙ্গল কিসে তা আমার পক্ষে বোঝার সম্ভাবনা বেশি। অভিজ্ঞতারও একটা মূল্য আছে।

আর একটা দিক আপনি একেবারেই ভাবছেন না। এ বিয়ের মানে, ইচ্ছা করে একটি মেয়েকে বালবিধবায় পরিণত করছেন।

দেখ, আমি যে আর বিশ বৎসর বাঁচবো না, এ কথা জোর করে বল্‌তে পার? আর যদি শিগগিরই মরে যাই, এর আর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও—তুমি তো বিধবা-তারিণী সমিতিরও একজন পাণ্ডা।

আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি। নিজেই বল্‌ছেন নিজের বিধবা স্ত্রীর বিয়ে দিতে?

কেন বল্‌ব না? তুমি তো জান, আমি বিধবাবিবাহের সমর্থক, তোমাদের সমিতিতে চাঁদাও দিয়েছি। আমি অন্য বিধবাদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে করি, আমার স্ত্রী সম্বন্ধেও তাই মনে করি।

কি ভয়ানক লোক আপনি! আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। দেখুন, তরুণীতারণ সমিতির পক্ষ থেকে

আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে। আপনার এ বিয়ে আমি হতে দেবো না।

এই কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩

রামহরিবাবু এ বিবাহে বেশি লোক নিমন্ত্রণ করেন নাই। ক্লাবের কয়েকজন বন্ধুকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই সঙ্গে যাইবেন। সন্ধ্যার পরেই তাঁহাদের আসিবার কথা। জগদীশের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি আরও একটু সতর্ক হইলেন। নিজে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই সজ্জিত হইয়া বন্ধুগণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন যে প্রথমে যিনি আসিবেন, অন্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার সহিতই একখানি ট্যাক্সিতে বাহির হইয়া পড়িবেন।

সন্ধ্যা হয় হয় রামহরিবাবু এক কাপ চা খাইয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছেন এবং বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে বাড়ির বাহিরে একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইল। জানালা দিয়া রামহরিবাবু দেখিতে পাইলেন, প্রকাণ্ড একদল ছোকরা জড় হইয়াছে। একখানি কচি-কলাপাতা-রঙের সাড়ী দুই পাশে দুইখানা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—তরুণীতারণ সমিতি। দেখিতে দেখিতে ছোকরার দল তিন ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ রামহরিবাবুর বাড়ির সিঁড়ির সামনে সটান শুইয়া পড়িল, আর দুই ভাগ দুই পাশে দাঁড়াইয়া পর্য্যায়ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, তরুণী—জিন্দাবাদ, তরুণী—জিন্দাবাদ। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে লোক ছুটিল তামাসা দেখিতে।

রামহরিবাবুকে এ পাড়ায় সকলেই জানে। তাঁহার বাড়ির সামনে এমন একটা বিকট দৃশ্য তাঁহার মোটেই প্রীতিকর মনে হইল না। তিনি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং দলপতি জগদীশকে ডাকিয়া সবিনয়ে বলিলেন, আমি কথা দিচ্ছি, এ বিয়ে আমি করব না—তুমি দয়া করে তোমার সবুজবাহিনীটাকে এখান থেকে সরাও।

বিজয়-সেনানী এইরূপে হেলায় যুদ্ধ জয় করিয়া পুরস্কার স্বরূপ নিকটবর্ত্তী একটি রেঁস্তোরায় ঢুকিয়া এক কাপ চা আর একখানি করিয়া ফাউল কাটলেট খাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৪

যে বয়সে মনে হয় জগতে মাত্র একটি মেয়েকেই বিবাহ করা সম্ভব এবং তাহার সহিত বিবাহ না হইলে আত্মহত্যাই বিধেয়, সে বয়স রামহরিবাবুর নাই। সুতরাং মানসীর পরিবর্তে ললিতাকে পছন্দ করিতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না।

ঘটকের সহিত পরামর্শ করিয়া পাত্র এবং পাত্রী উভয়েই এমন স্থান এবং এমন কাল মনোনীত করিলেন, যেটা তরুণী-তারণ সমিতির জুরিস্‌ডিক্‌সনের বাহিরে। পিতৃমাতৃহীনা চঞ্চলা রূপসী ললিতা সজ্জিতা ও সালঙ্কারা হইয়া রামহরির গলায় মালা পরাইয়া দিল।

জগদীশের চেষ্টায় মানসীরও বিবাহ হইয়া গেল। আফি-সের সেই ছোকরা সুধীর নিজের শতবঞ্চিত, শতধিকৃত জীবনের মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদরূপে কম্পিতহৃদয়ে মানসীকে আপন জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করিয়া লইল।

মানসী-রামহরি ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া ললিতা-রামহরি ও মানসী-সুধীরে পরিণত হইল।

৫

তিন বৎসর পরের কথা।

শীর্ণ ক্লান্ত দেহখানি কোনমতে বহন করিয়া ছিন্ন মলিন একটি জামা গায়ে সুধীর আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। ততোধিক মলিন একখানি সাড়ী গায়ে জড়াইয়া রুগ্ন শয্যাগত মানসী নবাগত ক্ষুদ্র মানবিকাটিকে সাদরে জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সুধীর বলিল, কেমন আছ?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, আমার আর থাকাথাকি নেই। থাকবার ইচ্ছেও নেই। কিন্তু এই সুখশেলটার জন্যই মরেও আমার শান্তি নেই। ভগবান্ কেন একে পাঠালেন এই নিরন্ন কুটীরে?

অত উতলা হয়ো না। একটু ভাল চিকিৎসা হলে শিগ্‌গিরই সেরে উঠবে। কিন্তু কি করি? বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কারো কাছে তো হাত পাত্‌তে বাকি রাখি নি। তোমার গায়ের গয়নাগুলোও এক একখানা করে শেষ করেছি। ডাক্তার বলে এখানে অসুখ সারবে না— চেঞ্জে যাও। আমার যে এই ঘরখানা ছেড়ে অন্য ঘরে যাবার সঙ্গতিও নেই। চেঞ্জ তো দূরের কথা।

সবই তো বুঝ্‌ছি। বাঁচবার সাধ আমার একটুও নেই। কিন্তু, এই এটাই তো আমাকে মরতে দিচ্ছে না। এই নাও, এই বালাটা নিয়ে যাও, দেখ কিছু ওষুধ পথ্যের জোগাড় করতে পার কি না। সামনের মাসে নাকি তোমাদের আপিস থেকে কিছু বোনাস পাবে, তাই থেকে এ দেনা শোধ করা যাবে। যাও, আপত্তি করো না। ঐ কোণে দেখ দুখানা রুটি আর একটু গুড় আছে, মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে যাও—আমি আর এখন উঠতে পারছি নে।

ঠিক এই সময়েই চৌরঙ্গী রোড দিয়া একখানা ভি-এইট ফোর্ড দুইটি যাত্রী লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। বলা বাহুল্য যাত্রী দুইটি আমাদের ললিতা আর রামহরি। ললিতা বলিল, তোমার পছন্দের বাহাদুরি আছে! এই জন্যই তো বলি, আমাকে না নিয়ে কখনো দোকানে যেও না।

তোমাকে যারা দেখেছে, তারা কিন্তু বলে আমার খুব পছন্দ!

আচ্ছা! দেখতো ফ্রকটার কি ছিরি, যেমন কাপড় তেমনি তার ডিজাইন—

আমার তো ভালই লেগেছিল। তা উনিশের পছন্দ আর তিপ্পান্নর পছন্দ মিলবে কেন?

আবার ঐ বয়সের কথা! তোমার তিপ্পান্নর তো কোন লক্ষণ দেখছিনে। এই বার আনার ফ্রক বদলাতে দেড় টাকার পেট্রল খরচ—এটা তিপ্পান্নর লক্ষণ নয়, তেইশের।

তুমি যে বললে, তোমার পছন্দ হয়নি।

বল্লামই বা। সবই আমার পছন্দ মত করতে হবে? তোমার অতটা ইয়ে আমার ভাল লাগে না।

তাই নাকি। আমার তো সব সময়েই ভয় হয়, কিসে তুমি মনে কষ্ট পাও।

আমি কি কচি খুকি নাকি? তোমার মনের ভাব সব আমি বুঝি। তুমি সত্যিই অমন করো না। তোমার আমার সুবিধে অসুবিধে, ভাল মন্দ সব তো এখন একাকার হয়ে গেছে। বয়সের ফাঁকটা ভুলে যাও।

তুমি ভুলতে পারবে?

কেন, আমাকে কখনো অখুসি দেখেছ?

তা দেখিনি, আশ্চর্য মেয়ে তুমি!

আশ্চর্য মোটেই না, অতি সাধারণ।

মোটর নিউ মার্কেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে উহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল।

৬

জগদীশ চা খাইতেছে। গৃহিণী বলিলেন, মানসীর কোন খবর রাখ?

রাখি বই কি, বড় কষ্টে আছে তারা। ও হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবে না।

এর জন্য কি তুমি দায়ী নও?

তা খানিকটা দায়িত্ব আছে বই কি?

খানিকটা? সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। তুমিই মেয়েটার সর্বনাশ করেছ। ললিতাকে দেখে আনন্দ হয়। কেমন সুখে আছে—কোন দুঃখই তো দেখি না।

মনে মনে সুখী হয়েছে কি না কে জানে?

এতদিন ধরে মিশছি আর তার মনের কথা বুঝতে পারি না!

যাক্, মানসীর বদলে ললিতা তো সুখী হয়েছে।

ও ব'লে আর মনকে সান্ত্বনা দিয়ে কি হবে! সে যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে তোমার তরুণীতারণ ছাড়তে হবে।

কেন?

কে কেমন করে কার দ্বারা তারিত হয় বা প্রতারিত হয়, তা বোঝা সহজ নয়—ওসবের মধ্যে না থাকাই ভাল।

সত্যি, ওসবের মধ্যে না থাকাই ভাল।

"ভাস্কর"

শরতের রূপ

শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী

শরতের রূপমুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন—

"এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হ'য়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায়ে ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।
আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু
প'ড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয় মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।"

প্রকৃতির প্রত্যেক ঋতু বিভিন্নরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক ঋতুরই নিজস্ব এক একটা বিশেষ রূপ আছে। এই বিভিন্নরূপ মানুষের অন্তরেও বিভিন্ন ভাবের সাড়া জাগাইয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য গ্রন্থাবলী হইতে আমরা প্রত্যেকটি ঋতুর বর্ণনা পাই। প্রত্যেক ঋতুর রূপ তাঁহার প্রাণে যে আনন্দ ও বেদনাময় অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব বর্ণনাভঙ্গী ও অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তিদ্বারা তিনি আমাদের নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। আমি আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে শরৎঋতু তাঁহার মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালীর চোখে শরৎঋতু একটা অপরূপ রূপ লইয়া দেখা দেয়। বর্ষাবিধৌত শরতের রূপ বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রনে বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে তাহার তুলনা হয়ত অন্য কিছুর সঙ্গেই চলে না। হয়ত সংস্কারমুক্ত এমন বাঙ্গালী নাই যাহার মনে শরৎ প্রভাতের শিশিরভেজা বনানী, সোনালী রৌদ্র, বর্ণহীন খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ একটা অব্যক্ত আনন্দের বার্ত্তা না আনিয়া দেয়, আগমনীর অপূর্ব্ব সুর যাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে দিয়া না উঠে।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত যেন কাহার আগমনের সার্থকতায় প্রতি পত্র পুষ্পের ভিতর দিয়া পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতির এই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য পরিবেশের ভিতরে একটা করুণতার সুরও রহিয়াছে। এই সময় কন্যাবৎসল পিতামাতার হৃদয় পতিগৃহবাসী কন্যার আগমন প্রতীক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে; কন্যার বিরহে তাঁহাদের প্রাণ আকুলি বিকুলি করে, যেমন করিয়া একদিন পতিগৃহ-বাসী উমার বিরহে গিরিরাণী মেনকার প্রাণ আকুলিত হইয়াছিল। বর্ষাস্নাত স্বর্ণকরোজ্জল শারদীয় দিনগুলির ভিতরে যেন একটা অব্যক্ত আনন্দ ও করুণতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কবি তাঁহার 'লোক সাহিত্যের' একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙ্গালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙ্গালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর অম্বিকা পূজা এবং বাঙালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী ও বিজয়া [illegible]ংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"

তাই বলিতেছিলাম শরতের রূপ যেন বাংলার নিজস্ব অন্তরের রূপ। বাংলারই অন্তর যেন প্রকৃতিতে রূপায়িত হইয়াছে। শারদীয় প্রভাতের অনির্ব্বচনীয় রূপ কবির হৃদয়ে যে মোহের সঞ্চার করিয়াছে, তাহার একটি চমৎকার বর্ণনা 'মানসসুন্দরী'র নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে সুপরিস্ফুট—

"অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্য্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'ত দু'ইজনে
আধ চেনা-শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ ধারে সদ্যঃস্নান করি'।
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথি পত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা কারা হ'তে।"

শরৎ প্রকৃতি হইতে যে পরম রহস্যময় অনুভূতি কবির মনে জাগ্রৎ হইয়াছে, তাহার একটি অপূর্ব্ব বিকাশ আমরা এই কবিতাটিতে দেখিতে পাই।

এই শরৎ প্রভাতেরই এক শুভ মুহূর্ত্তে কবির কণ্ঠে শারদলক্ষ্মীর আহ্বান-গীতি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।—

"এসগো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের' রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল
আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে,
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা।"

এমন দিনে কবির হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। আগমনীর [illegible] বাংলার আকাশে বাতাসে যে এক প্রচ্ছন্ন আনন্দ বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ভাবী মিলনের দ্বারা অপূর্ব্ব সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে। এই কল্পনার রঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি আজ রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। আজ কবি কাহাকেও নিরানন্দ দেখিতে চান না। তাই তিনি যখন শরৎ প্রভাতের এমনি একটি দিনে ধনীর দুয়ারে মাতৃহীনা ম্লানমুখী কাঙ্গালিনী বালিকাকে দণ্ডায়মান দেখিলেন, তখন তিনি মেয়েদের সম্বোধন করিয়া মাতৃহারাকে কোলে তুলিয়া লইতে আহ্বান করিলেন, কারণ এমন দিনেও—

"মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

আমাদের দেশে শরতের যে একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহার আভাষ প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে।

কবি যখন যৌবনে জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে বাংলার নিভৃত পল্লীগুলির ভিতর দিয়া বোটে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁহার তখনকার লিখিত 'ছিন্নপত্রের' পৃষ্ঠায় শরতের যে রূপ বর্ণনা পাই তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর। ভরা নদীর ধারে বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো, জলের মধ্যে অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের শ্যামশ্রী, আকাশের নির্ম্মল নীলিমা কবি চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশের শরতের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়াই হয়ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছিলেন—

"কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে। একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া

বলিতেছেন, 'তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে ; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙ্গা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া ! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসর-শয্যা তুমি রচিয়াছ। যা কিছু ম্রিয়মান তুমি তাদেরই বাণী, যত কিছু 'গতস্য শোচনা' তুমি তারই অধিদেবতা।'

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে। তার কাঁচা দেহখানি ; সকালে শিউলি-ফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছপালায় যা কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।"

শরতের আগমন উপলক্ষ করিয়া কবি যে আহ্বান গীতি গাহিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়া উঠে তাঁহার প্রাণের দ্বারে আকাঙ্ক্ষিত অতিথির আগমনে। আনন্দাপ্লুত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কবি তখন গাহিয়া উঠেন,—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে !
আনন্দ-গান গারে হৃদয়
আনন্দ-গান গারে।
নীল আকাশের নীরব কথা,
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।"

কবি প্রকৃতির রূপের ভিতর দিয়া অসীমের সন্ধান করিয়াছেন। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার অন্তর হইতে সীমা ও অসীমের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। কবির মন কল্পনায় কোন-রহস্যসিন্ধুর পরপারে অজানার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারই সন্ধান তিনি পান কখনও শারদ প্রাতে, কখনও মাধবী রাত্রিতে। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার কাব্য রচনার একটিমাত্র পালা। "সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা"। আর এই মিলন সাধনের পালায় শরতের রূপ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছে।*

শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী

* রাঁচির রবীন্দ্র-সাহিত্য-সেবা-প্রতিষ্ঠান 'মধুচক্রে'র সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

হিমালয়ের বাঘ

(শিকারের সত্য কাহিনী)

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলিপুর দুয়ার)

জলপাইগুড়ি জেলার যে অংশের উত্তরে ভূটান, হিমালয় ও ভারতে বৃটিশ রাজ্যের সীমান্ত—পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ এবং যে জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য ভূমিকে, 'পূর্ব্ব দুয়ার' বলে, কার্য্যোপলক্ষে সেখানে আমার কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। হিমালয় থেকে নেমে বড় বড় বাঘ প্রায়ই সেখানকার বাহেদের (এদেশের সম্ভ্রান্তদের সম্বোধন বাহে অর্থাৎ মহাশয়) কাছ থেকে গরু মহিষ ইত্যাদি ট্যাক্স্ আদায় করত বিনা নোটিশে। তার যেটী পছন্দসই হবে, তখন কি রকমে আদায় ক'রে নেবে বুঝতে দেবে না, যখন বুঝতে পারা যাবে তখন আর আপিল চলবে না।

এদিককার বাঘেদের একটা আশ্চর্য্য প্রথা দেখতে পাই যে কালো অথবা লাল রংএর গরু বাছুর পেলে সাদার কাছে যায় না। এ পর্য্যন্ত যতগুলি দেখেছি ও শুনেছি সবই প্রায় এই শ্রেণীর। এর কারণ কি ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয় জঙ্গলী জানোয়ারের শুভ্রভীতি, মানে সাদাকে বিপজ্জনক মনে করা একটা সহজাত সংস্কার। অধিকাংশ পশু পক্ষীর বুকের নিম্ন অংশ সাদা বা অপেক্ষাকৃত ফিকে রংএর। বলবত্তর জন্তুর কবল থেকে নিজকে রক্ষা করবার জন্যে ছিটকে পালাবার সময় সাদা রঙএর চমক লাগিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুকে অভিভূত করাই এর উদ্দেশ্য কিনা জানি না। এদের স্বভাব সম্বন্ধে আর একটী চমৎকার ব্যাপার এখানে বলতে চাই, যা প্রায় সমুদয় জঙ্গলী প্রাণীরই আছে এবং না থাকলে তাদের জঙ্গলে বাস করা চলতো না। ইংরাজীতে যাকে bluff বলে অর্থাৎ মিথ্যা চমক লাগিয়ে স্বরে ও ভঙ্গিতে ভয় দেখান, আর শত্রুর সেই দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তে চট ক'রে পালিয়ে যাওয়া। কে তাদের সেখায় জানে।

এখানে কাছাকাছি অনেকগুলি বড় চা বাগান আছে, অধিকাংশ বিদেশী মূলধনে পরিচালিত। বাঙ্গালীদেরও চা বাগান আছে, কিন্তু সংখ্যায় কম। সুখের বিষয় এঁরাও বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাজারে স্থান অধিকার করেছেন। গুণ মর্য্যাদায় এঁদের চায়ের চাহিদাও ভাল, দেশের চেয়ে বিদেশেই চালান যায় বেশার ভাগ।

এখানকার বাঙ্গালী অফিসার রা......বাবু অতিথিপরায়ণ ও সদাশয় লোক বলেই আমাকে কোন বিষয়ে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। স্বাস্থ্য রক্ষা ক'রবার জন্যে আমার মাঝে একদিন জোলাপ দিবস আর সপ্তাহে একদিন কুইনাইন দিবস তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই বোধহয় সুস্থ দেহে শিকারের পরিশ্রম সহ্য ক'রে ফিরে আসতে পেরেছি; নতুবা এ জায়গাটী ম্যালেরিয়ার ডিপো, কালাজ্বর ও ব্লাক ওয়াটারের দক্ষিণ দুয়ার বলা চলে। নিকটে একটা জায়গারই নাম 'যমদুয়ার'।

রা......বাবুর নিজের বন্দুক ছিল, শিকারের সখও ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিস্তর টোটা খরচ ক'রেও সামান্য শিকারও কোন দিন মারতে পারেন নি। তিনি বলেন, সেখানকার ঘুঘু পাখীগুলোও নাকি তাঁকে চেনে; বন্দুকে নিশানা করলে তাঁর দিকে চোখের কোন দিয়ে তাকায় আর মনে মনে হাসে। (মুখের ভাবে যদিও প্রকাশ করতে পারে না।) শিকার বিষয়ে আমার সহিত খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বাঘ মারবার আশা তিনি কখনও করেনও নি, করবেনও না। চা-বাগানের এক সাহেব ম্যানেজার বাঘ মারতে গিয়ে কিরূপ বিড়ম্বিত হ'য়েছিলেন সে খবর আমায় বললেন। সাহেবের নাম মনে নেই আর মনে থাকলেও হয়ত প্রকাশ করা আইনতঃ উচিত হবে না, যেহেতু আত্মসম্মানের উপর সকলেরই প্রখর দৃষ্টি।

সাহেবের বাগানের এলাকার মধ্যে পাহাড়ের সানুদেশে

এক বৃহৎ রাজকীয় বাঙ্গলা বাঘ (Royal Bengal Tiger) মাঝে মাঝে এসে উৎপাত করত। কিন্তু একদিন সাহেবের প্রিয় কাল রঙএর গাভীটী যখন অন্তর্হিত হ'ল তখন তাঁর টনক নড়লো। গোচারণকারী রাখালের সাহায্যে জায়গার সন্ধান নিয়ে তখনই ছুটে গেলেন—বাঘের এতখানি আস্পর্দ্ধার শাস্তি দিতে। কিন্তু সে অত বোকা জানোয়ার নয়; সমস্ত রাত পেট ভ'রে খেয়ে মড়ার অধিকাংশ পরবর্ত্তী ডিনারের জন্যে রেখে, নিরাপদ—দূরে ঠাণ্ডা জায়গায় শুয়ে সে তখন হয়ত বা অত্যাহার জনিত নেশার ঘোরে কোনও সুমধুর স্বপন দেখছিল।

এখানে শিকারীদের একটু ইঙ্গিত করতে চাই যে, kill বা মড়া নিয়ে বাঘ যদি কোন দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে রাখে আর সেখানে মাচান করা বা হাতী দিয়ে তাড়া করান অসম্ভব হয়, তাহলে কাছাকাছি ঝরণা বা ভাল জলের জায়গা খুঁজে তার ধারগুলো দেখলে পায়ের দাগ পাওয়া যাবে। সেইখানে সমস্ত দুপুর ও বিকাল গাছে বসে থাকলে তাকে পাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত বলা যায় কারণ মড়া খাবার পরে তাদের ঘন ঘন জলপানের দরকার হয়। সে কাছাকাছি কোথাও থাকবে, খুব সাবধানে খুঁজতে হবে। মানুষের সাড়া পেলে বা পরস্পর দেখা হয়ে গেলে আর আসবে না। এতে সাহস ও খুব ধৈর্য্য থাকা চাই।

সাহেব সেখানে মাচান বাঁধিয়ে বেলা তিনটার সময় একটা নেপালীকে দূরের গাছে বসিয়ে স্বয়ং দুইটী বন্দুক নিয়ে বসে গেলেন। ৪টার কিছু পরে সাহেব "সহসা" দেখতে পেলেন গাছ তলায় kill এর পাশে বাঘ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। "সহসা" বললাম এই জন্য যে সাহেব একটু অন্যমনস্ক ছিলেন আর বাঘও জঙ্গল থেকে এমন নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে যে তিনি মোটেই বুঝতে পারেন নি। যাই হোক এত কাছে অতবড় বাঘ জীবনে কখনও দেখেন নি বলেই বোধহয় তাঁর তালুতে জিহ্বা ঠেকে গিয়েছিল এবং একটু সরে ব'সে নিরাপদ হ'বার জোগাড়ও হয়ত করেছিলেন, তারপর কিসে কি হল ঠাওর করবার পূর্ব্বেই দেখা গেল তিনি ভূমি শয্যা বা পাথর শয্যায় নেমে এসেছেন। বন্দুকের বাঁট গিয়েছে ভেঙ্গে—হাফপ্যান্ট গিয়েছে ছিঁড়ে—পাথরের ধাক্কায় যেখানে সেখানে গিয়েছে ছড়ে। দুগ্ধ-শুভ্র চামড়ার উপর ছোট বড় সব আঘাতই রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। ভাগ্যে মাচান খুব উঁচুতে ছিল না।

নেপালী ঐ শব্দে তাকিয়ে দেখে বাঘটা লাঙ্গুল উঁচু ক'রে উর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। বাঘটা বোধ হয় মাচানের উপর নড়াচড়ার শব্দে সেই দিকে তাকিয়েছিল, এবং সহসা উপর থেকে বিরাট কোন প্রাণীর (সাহেবের দেহটী বেশ একটু মোটা ছিল) আক্রমণ আশঙ্কা করে কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। তার তখন পেটের চেয়ে পিটের ভয়ই বেশী হয়েছে। নেপালী তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে দেখলে সাহেব তখনও কাঁটার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। নেপালীর সাহায্যে মুক্ত হয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাচান বন্ধনকারী কুলীদের ইংরাজী ভাষায় উদ্ধার করতে লাগলেন, অর্থাৎ মাচান বাঁধার দোষেই যেন এই ঘটনাটা ঘটেছে। শুনলাম সেই থেকে তিনি আর অমন কাজে যাননি। রা…বাবু প্রজাদের ব'লে রেখেছিলেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে একজন খবর নিয়ে এল প্রায় ১৪ মাইল দূরে ঝিলের ধারে জঙ্গলে একটা বড় বাঘ আস্তানা করেছে আর ইতিমধ্যে ২।৩টী গরু তার হাতে শেষ হয়েছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি না গেলে পাওয়া যাবে না। কারণ বাঘেদের নিয়ম এক জায়গায় বেশীদিন ক্রমাগত উৎপাত করে না, অন্য জায়গায় চলে যায়; সেখানে কিছুদিন অর্থাৎ যতদিন না গরু মহিষাদির মধ্যে সেই জঙ্গল সম্বন্ধে একটা ভীতিজনক সাড়া পড়ে যায়, ততদিন হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে, পরে সেই জায়গা পরিত্যাগ করে পুরাণো জায়গায় তত দিনে শিকার জমতে থাকে। কুমীরের শিকার পদ্ধতিও অনুরূপ।

রা…বাবুর সহকারী জানালেন তিনিও যাবেন। ভাল কথা। যাবেন তাতে আপত্তি নাই বরং তিনি উপস্থিত থাকলে প্রজাদের কাছে দরকারমত সাহায্য পাওয়া সহজ হবে; কিন্তু তিনি বাঘশিকার বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞ এবং পরিণামে বাধা বা বিপত্তির কারণ হবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন তিন[illegible]টি চিতা বাঘ মেরেছেন, কিন্তু রাজবংশে এখনও হা[illegible] পারেননি। তা না পারুন

আমি কিন্তু ভরসা পেলাম অনেকখানি ; কারণ আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি একটা বাঘ বা ভালুকের আক্রমণের চেয়ে একটী দুর্ব্বলস্নায়ু সঙ্গী অনেক সময় শিকারীর কাছে বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ বড় শিকারে সঙ্গী বেছে নেওয়াই প্রথম ও প্রধান কাজ।

পরদিন ভোরে আমি, সহকারী বাবু, একজন পাচক ও একজন মুসলমান ঠিকাদার হাতীর পিঠে রওনা হ'য়ে গেলাম। জঙ্গলাকীর্ণ দীর্ঘ পথ কিছুতেই শেষ হতে চায় না। এপ্রিল

রাস্তার ধারেই একটা বট ও পাকুড় গাছ মিলে পাতার হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছিল। সে আহ্বান উপেক্ষা করলাম না। তাদের বুকের নীচে সুশীতল ছায়া ; আর তলায় পাখীদের ভুক্তাবশিষ্ট ফলে ও বীজে মাটী লাল হ'য়ে আছে। হাতী গাছের নীচে দাঁড় করাতে সকলেই বড় বড় নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরের গরম হাওয়া খানিকটা বার ক'রে ফেল্‌লে। টুপি খুলে অন্যমনস্কে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি অনেকগুলি হরিয়াল পাখী দস্তুর মত ফলাহার ক'রে ছায়া-

লেখক ও নিহত ব্যাঘ্র

মাস, গরমে মাথা ঘেমে টুপির পাশ দিয়ে ঘাম টস্ টস্ করে পড়ছে। খাকীর সার্ট ভিজে ঢোল হয়ে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। হাতীও হাপর টানছে। শুঁড় দিয়ে ঘামছে আর সেই ঘাম নিজের গায়ে পিচকারী করে দিচ্ছে। নিকটে ঝরণা কিংবা জলাশয় নেই। ফ্লাস্কগুলোও খালী হয়ে গেছে। এরকম সময়ে গরম চায়ের উপকারীতা বুঝিযে দিতে সহকারী বাবু বললেন, মাইল দুই পরে একটা বসতি পাওয়া যাবে। তদ্ভিন্ন আর [illegible]ও উপায় নেই। তথাস্তু।

শীতল ডালের উপর গায়ে গায়ে মিশে বোধহয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল। আমাদের এই অনধিকার গোলমালে সচকিত হয়ে ঘাড় কাত ক'রে দেখতে লাগল। সহকারী বাবুর লোভ-লালাসিক্ত অনুরোধে এবং ভবিষ্যৎ ভেবে 'সাররা' টোটা একটা ছুঁড়তে হোল। একসঙ্গে তিনটী পড়ে গেল তলায় ; একটী রইল ডাল আঁকড়ে ঝুলে। কিন্তু যার শক্তি গেছে জীবনের সাথে, সে কতক্ষণ অভ্যাসের জোরে উপরে থাকতে পারে। পরে তাকে নেমে আসতেই

হোল তার মরণ-সাথীদের মাঝে। অনাহত অন্য সঙ্গীরা ততক্ষণে সোরগোল করে ঝড়ের বেগে বহুদূর চলে গেছে। সব শুদ্ধ চারটী পড়েছে দেখে অংশাদার হিসাবে মাহুতের আনন্দ হোল সবচেয়ে বেশী। কেননা দুটো একটা হ'লে বেচারীর থালা অবধি হয়ত তা নাগাল পেত না।

আবার খানিকটা রোদ্দুর ঠেঙ্গিয়ে সেই বসতি পাওয়া গেল। হাতী থেকে সকলে নেমে বাঁচলাম। অনেকক্ষণ বদ্ধ আর বাধ্যতামূলক ঝাঁকানির পরে না হলে হাঁটবার আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের কোমরগুলো ক্রমাগত দোলার আনন্দে তখন আত্মহারা, শিথিল। দারুণ রোদে হাতীর পিঠে বোসে ঢেউ খেতে খেতে চলা যে কিরূপ সহনশীলতার পরিচায়ক তা যারা না ভোগ করেছে তাদের বুঝান সম্ভব নয়।

সেই বাহে অর্থাৎ মহাশয়ের বাহিরের খোলা ঘরে ব'সে তার দেওয়া দই, চিঁড়ে আর গুড়-চা খেয়ে সকলকেই যেন আরামের নেশায় পেয়ে বস্‌ল। ক্রমে সকলেই কাত হ'তে লাগল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট জায়গায় না পৌছান পর্য্যন্ত আমার স্বস্তি ছিল না। কাজেই আমার তাড়াতাড়িতে বিরক্ত হয়ে অগত্যা শোবার চেষ্টা সবাই ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের হাতীও একটা গোটা কলাগাছ ভেঙ্গে চোখ বুজে চিবিয়ে নিয়েছিল। আবার রওনা হওয়া গেল।

এবার আমরা সেই ঝিলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর আধ মাইলের মধ্যে যথাক্ষেত্রে হাজির হওয়া যাবে। মাতব্বর বাহে দেখলে আমরা বাঘের গতিবিধি বাসস্থান ইত্যাদির খবর নিচ্ছি এবং মারবার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করছি। স্থানীয় লোকেদের কাছে উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে, এমন ভরসা পাচ্ছি না। বরঞ্চ নেপালী মহিষওয়ালারা কিছু আশা দিচ্ছে। কিন্তু তারাও আমাদের বাঙ্গালী বুঝে বোধ হয় তেমন জোর পাচ্ছে না। যাই হোক একজন বাহের বাড়ী বিলের কাছে ছিল। সেইখানে ঠাকুরকে রান্নার ব্যবস্থা করতে ব'লে সহকারী বাবু আর আমি হাতী ছেড়ে পদব্রজে সেই ঝিল পরিদর্শন করতে গেলাম অবশ্য সশস্ত্রে।

মাঠের মধ্যে খানিকটা জলাভূমি তীরের দিকে ক্রমোচ্চ হ'য়ে মাঠ পর্য্যন্ত উঠে এসেছে। জলের সীমা থেকে খানিক-দূর উপর শুকিয়ে কাঠ ফেটে আছে। তারপর থেকে ছোট ঘাসের জঙ্গল ক্রমে বড় আর ঘন হ'য়ে মাঠের নীচে এসে বিরাট খাগড়ার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তারই মাঝে শ্যাওড়া শিশু প্রভৃতি বড় বড় গাছও আছে। জঙ্গল কোথাও ঘন এবং উঁচু; কোথাও পাতলা এবং নীচু, মাটী দেখা যায়। কোথাও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গরু মহিষাদি ঘাস খেতে যাতায়াত ক'রে সরু সরু পথ করেছে। আজকাল জঙ্গলে বাঘ আছে; সুতরাং বড় মহিষ ভিন্ন আর কোন জীব এদিকে বড় আসে না। এই মাঠ থেকেই সুবিধামত দিনের বেলায় গরু ধরে টেনে জঙ্গলে নামিয়ে নেওয়াও সেটা শেষ ক'রে আর একটা মারবারও অসুবিধা নেই। এইরূপ ৫।৬ দিন চলেছে। মাঠের ওপারেও খুব বড় জঙ্গল আছে এবং সেটা কিছু দূরে নদীর ওপার থেকে কুচবিহার জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে। নদী পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের এলাকা।

ঐ জঙ্গলের দিকে মাঠ ঘেঁসে যদি খানকয়েক শুয়োর-মারা জাল টাঙিয়ে দেওয়া যায়, তাড়া খেলেও বাঘ হঠাৎ ওদিকে পালিয়ে যেতে পারবে না, এই মনে করে সহকারী বাবুকে জাল ও জালের অধিকারীদের ডাকিয়ে আনতে বললাম। কিন্তু অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তারা, কিছুতেই রাজী তো হোলই না বরং সন্দেহ প্রকাশ করল যে, জালশুদ্ধ তাদের ধ'রে চালান দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। বাঘ মারতে আসা ছলমাত্র। সুতরাং সে বিষয়ে হতাশ হ'য়ে আস্তানায় ফিরে গেলাম।

আহারাদির পর প্রায় তিনটার সময় হাতী সাজিয়ে মাঠের দিকে যেতে দেখি ইতিমধ্যে অনেকগুলি লোক নিকটবর্ত্তী গাছে উঠে বাঘ শিকার দেখবার জন্য ব'সে গেছে। জালওয়ালারাও তার মধ্যে আছে। জাল দেয় নি বা কোন সাহায্য করে উপকার করে নি বলে এমন মজাটা দেখবে না এমন বোকা ও চক্ষু লজ্জার লোক তারা নয়। একজন বাহেকে দিয়ে তাদের ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে কথা কইলে কিম্বা চেঁচামেচি করলে তাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না।

আমাদের হাতীর সঙ্গে ৫।৬ জন লোক এবং দুটো গ্রাম্য কুকুরও আসছিল। মাঠের ধারে ধারে চলেছি, নীচে একটা ঝোপের দিকে ফিরে কুকুর দুটো নাক উঁচু ক'রে বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে ছুটে আমাদের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল আর প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল—ভীষণ ভয় পেয়ে যেমন আর্ত্তনাদ ক'রে। ইতিমধ্যে আমি হাতী দাঁড় করিয়ে ফেলেছি। কুকুরনির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি খাগড়ার মাথাগুলো নড়ছে, কিছু শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। গৃহপালিত জন্তুর জঙ্গল নাড়া আর বুনোদের জঙ্গল নাড়ার মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। নড়বার কর্ত্তা কি জাতীয় তাও অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারা যায়। শুকর ও ভালুক শব্দ করে চলে। হরিণ জঙ্গলে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে কাণ দুটো আর মাথাটা এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকে। বিপদ কাছে আসছে আশঙ্কা হ'লে লাফিয়ে তীরের মত খানিকটা ছুটে গিয়ে দাঁড়ায়। চারদিকে দেখে শোনে বাতাস শোঁখে—সন্দেহ হ'লে আবার ছোটে। ফাঁকা জায়গা হলে দৃষ্টির বহির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ছুটতে থাকে। এদেশের হরিণ বড় লাজুক। বাঘ এত নিঃশব্দে জঙ্গলে চলা ফেরা ক'রে বেড়াতে পারে যে গায়ে জঙ্গল লাগার খস্‌খসানি কিংবা পায়ের তলার শুখনো পাতার শব্দ খুব অভ্যস্ত কানছাড়া ধরতে পারা যায় না। সাধারণতঃ এইরূপই হয়, তবে অবস্থা বিপর্য্যয়ে ব্যবস্থার তারতম্যও তারা করতে পারে!

জঙ্গলের মধ্যে যেই থাকুক তাকে বেরুতে হ'লে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা দিয়ে এবং আমাদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও বেরোবার কোন লক্ষণ না দেখে একটা মৎলব খাটান গেল; একটী লোককে মাঠ থেকে দুটো বড় মহিষ তাড়িয়ে এনে ওদেরই ঘাস-খাওয়া রাস্তা ধরে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিতে বল্‌লাম। ইত্যবসরে কুকুর দুটীকে নানা কৌশলে সরিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম। কারণ ওরা যেমন উপকার ক'রে দরকার মত শিকারের সময় অশিক্ষিত কুকুর অপকারও করে তেমনি। মহিষ দুটো যেই হুড়মুড় করে জঙ্গলে নেমেছে একটা রাজকীয় জাতির পুরুষ শার্দ্দূল তৎক্ষণাৎ সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে কখনও আড়ালে কখনও ফাঁকায় চোরের মত বুকে হেঁটে মহিষের দিকে এগোতে লাগল। আমাদের দিকে চোখ ফেরায়নি। তার পূর্ণদৃষ্টি তখন মহিষদ্বয়ের উপর ন্যস্ত। বন্দুক উঠিয়ে নিশানা করছি, সহকারী বাবু, আমার বামে ছিলেন, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার বন্দুকের নল ধরে নামিয়ে দিলেন। কি ব্যাপার? কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়ে ফিরে দেখি তাঁর চোখ দুটোর সবখানি খুলে গেছে। কালো তারা দুটো একবার বাঘের দিকে একবার আমার দিকে আন্দোলিত হ'চ্ছে। ফিস্ ফিস্ করে বলছেন, "করছেন কি? অত বড় বাঘ এমন অবস্থায় গুলি করলে হাতীকে যখম করবে। আমাদের জন্যে তত ভয় করিনে।" বলেই ঝুলানো পা দুখানা তাড়াতাড়ি টেনে তুলে উবু হয়ে বসলেন। বলতে ভুলেছি হাতীর পিঠে হাওদা ছিল না—শুধু বাঁধা ছিল। এই আশঙ্কাই গোড়ায় করেছিলাম। বড় রাগ হোল—শিকারে বাধা পেলে কার না হয়। কিন্তু ভীতু মানুষকে বকাবকি ক'রে কোন লাভ নেই।

বাঘটা ততক্ষণ মহিষের পেছন নিয়ে আমার বন্দুকের পাল্লার বাইরে গিয়ে পড়েছে। চুপ ক'রে বসে থাকা ছাড়া আর কি করব? হঠাৎ বাঘটা লাফ দিয়ে তার নিকটের মহিষটার ঘাড়ের উপর পড়বার চেষ্টা করতেই দুটো মহিষই একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। লেজ উঁচু করে ক্ষুরের খট্ খট্ শব্দ ক'রে দুতিন পা এগিয়ে এল। যেন বলছে, "তোমাকে নজরে রেখেছি প্রভু! আমরাও প্রস্তুত, এস যুদ্ধং দেহি।" বাঘও আজন্ম শিকার করে পেকে গেছে, চট করে এক লাফ দিয়ে খানিক তফাতে এসে মুখ খিঁচিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করতে লাগল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই যে ভীষণ মরণের বিচিত্র খেলা—একের স্বভাবজাত হত্যালীলার তীব্র লালসা, অন্যের আপনাকে বাঁচাবার প্রাণান্ত কৌশল—সত্যই অনির্ব্বচনীয়। আমাদের সঙ্গে ক্যামেরাম্যান ছিল না। তাই পাঠক পাঠিকাদের এই ভয়াবহ কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যটী উপহার দিতে পারলাম না। সেজন্য আজ আমার নিজেরও

অনুতাপের অন্ত নেই। বাঘের এবং মহিষ দুটীর দাঁড়ানর অপূর্ব্ব ভঙ্গি এখনও আমার চোখে ভাসে। তার পরেই বাঘটা আস্তে আস্তে পাশের ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল, মহিষ দুটোও চোখ কাণ খাড়া রেখে ঘাস খেতে লাগল।

এরূপ কাজে জোড়া মহিষই লাগান উচিৎ। একক কিংবা বাচ্চা মহিষ পাঠানয় বিপদের সম্ভাবনা। গরু তো জঙ্গলে ঢুকতেই চাইতো না। জোর করে ঢোকালে তৎক্ষণাৎ......খতম। সহকারী বাবু শুষ্ক মুখে তখনও আশ্বাস দিচ্ছিলেন, "আবার পাওয়া যাবে।" এমন চমৎকার শিকারের প্রথম সুযোগ নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় আমার মনে কি কষ্ট হচ্ছিল তা প্রকাশের ভাষা নেই।

তখন আমার মাথায় একটা ফন্দী এল। তাঁকে বল্লাম, "আপনি এই শিশু গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকুন; আমি হাতী নিয়ে জঙ্গলে তাড়া করি। আপনার গাছের নীচে ঘন জঙ্গল আছে সুতরাং তাড়া পেলে এখানেই এসে আশ্রয় নেবে। তখন আপনি সুবিধামত বেশ বসিয়ে গুলি করতে পারবেন। নচেৎ সে যদি একবার বড় জঙ্গলমুখো ধাওয়া করে তাহলে তার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তা সে একবছরই হোক আর বেশীই হোক।" প্রস্তাবটা তাঁর পছন্দ হোল। হাতী শিশু গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে বন্দুক পিঠে বেঁধে ক্রমে অনেকখানি উপরে চ'ড়ে গেলেন। আমিও হাতী নিয়ে মহিষের সেই রাস্তায় নেমে পড়লাম। মোষ দুটো তখন ওপারের মাঠে উঠে গেছে।

যেখানে বাঘটা ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিল তার আশে পাশে অনেকটা ঘুরেও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন মাহুতকে আরও দূরে যেতে বললাম। এইবার হাতীরও কিছু ভাবান্তর দেখা গেল। অর্থাৎ ফণার মত শুঁড় উচু ক'রে ফোঁস ফোঁস করছে এবং বাঘের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তখন আশা করছি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে দেখতে পাবার। সহসা একটা ছোট ঝোপের মাথার উপর হলদে একখানা ডোরাকাটা মাথা যেন ভেসে উঠল। বন্দুক তুললাম কিন্তু তার আগেই সে আবার ডুব মেরেছে। অত ছোট ঘাসের মধ্যে অত বড় দেহ কি করে লুকিয়ে রাখতে পারে তা সাধারণের কল্পনাতীত। মাহুতকে তাড়াতাড়ি হাতী ঘুরিয়ে বড় জঙ্গলের দিকে আটকাতে বললাম। দেখি বড় জঙ্গলে যাওয়ার জন্যে গুঁড়ি মেরে বাঘটা বেরোচ্ছে। বন্দুক তুলে নিজের সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার উপর বিশ্বাসী হ'য়ে—বক্ষস্থল লক্ষ্য করে প্রথম গুলি করলাম। কোথায় লাগলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে লেগেছে সেটা বুঝতে দেরী হলো না। গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে উঠে ঘাসের মধ্যে পড়ে উলটে পালটে আছাড় খেতে লাগলো। কখনও লেজ কখনও পা উপরে উঠে উলটে যাচ্ছে। দেহ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না, আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আর একটা গুলি করলাম—কিন্তু পরিবর্ত্তন বিশেষ বোধ হোল না।

শিকারের এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন মুহূর্ত্ত। শিকারীকে সর্ব্বদা বাঘের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আহত অবস্থায় তাদের বেপরোয়া আক্রমণ বড় ভয়ানক। বিদ্যুদ্বেগে লাফিয়ে হাতীর উপর চড়ে বসতে পারে। হাতী মেরে শিকারী বা মাহুতকে টেনে নামিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিতে পারে। তার পেশীবহুল বিরাট হাতের একটী চড়—সঙ্গে পাঁচখানা ছুরির মত ধারাল নখের টান একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্টের চেয়েও বেশী। মাহুতকে একপাশে সরে যেতে বললাম। কিন্তু উত্তেজনার মুখে সে আমার মতলব বুঝতে না পেরে হাতীর মাথায় অঙ্কুশাঘাত করলে। শিকারী হাতী ভীষণ চিৎকার করে শুঁড় উচু করে বাঘের দিকেই এগিয়ে চল্লো। সর্ব্বনাশ! মাহুতের পীঠে এক কিল মারতে হাতী থেমে গেল।

প্রায় পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার পর মাহুতকে জিজ্ঞাসা করলাম,—বিনা শব্দে ও ধীরে ধীরে এমন জায়গায় হাতী নিয়ে যেতে পারবে কিনা যেখান থেকে বাঘটা দেখা যায়—বললে, "পারবো", ইতিমধ্যে বাঘের হাত পা ছোঁড়া বন্ধ হয়েছে। বন্দুক নিয়ে হাতীর পিঠে উঠে দাঁড়ালাম—কোন্ জায়গায় বাঘটা আছে অনুমান করে—বেশ নজর রেখে চলেছি একটু যেতেই দেখি ঘাসের মধ্যে হলদের উপর কাল ডোরা [illegible] মত দেখাচ্ছে। ভরসা

পেয়ে একটু এগিয়ে দেখি বাঘ মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে—, তার ব্যাঘ্রলীলার শেষ হয়ে গেছে। হাতী বসিয়ে, নেমে ৪।৫টী বড় বড় পাথরের ঢেলা তার দেহের উপর ছুঁড়ে ফেললাম। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করে বাঘকে মৃত ভেবে, উত্তেজনার মুখে—মূহ্যমান বাঘের কাছে গিয়ে অনেক শিকারী প্রাণ দিয়েছে।

সহকারী বাবুকে আমাদের ওখান থেকে দেখতে না পাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কেননা তিনি আকাশের প্রায় কাছে একটী ডালে পাখীর মত বসেছিলেন। তাঁর হয়ত তখনও সন্দেহ ছিল বাঘটা সত্যিই মরেছে কিনা।

বাঘের কাছে গিয়ে লেজটা উঁচু ক'রে ধরতে তিনি নেমে এলেন। আমার হাত ধরে খুব ঝাঁকিয়ে দিলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি জোর করে খুসী হবার চেষ্টা করছেন। নিজের হাতে এত বড় বাঘ মারার সৌভাগ্য তাঁর হোল না—কি করবো!

পূর্ব্বেই বলেছি অনেকগুলি এই দেশী লোক গাছে বসে শিকার দেখছিল; কিন্তু ভয়ে তখনও নামেনি। হাতীর পিঠে বাঘটা তুলবার জন্য তাদের ডাকলাম। ৪ মনের বেশী ওজনের মৃতদেহ অতখানি তোলাও সহজ কথা হবে না। সকলে নেমে এসে দূরে দাঁড়িয়ে বাঘ দেখতে লাগলো, কেউ গায়ে হাত দিতে চায় না। তখন ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়তে হোল, অর্থাৎ ভীষণ রাগ ক'রে খুব গালি দিতে লাগলাম। অতবড় বাঘ যে মেরেছে তার হাতে তাদেরও কিছু বিপদ থাকতে পারে ভেবে বোধ হয় কজন এগিয়ে এল কিন্তু কেউ আগে হাত লাগাতে সাহস পাচ্ছে না দেখে আমি নিজে যখন বাঘের একটা কাণ ধরে মাথাটা উঁচু করলাম, তখন সকলে এসে ধরলো। তারা ধরতেই আমি ছেড়ে দিতে মাথাটা যেই দুম করে মাটীতে পড়েছে তারা ছেড়ে দিয়ে ছিটকে ঘাসের মধ্যে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেল। আমার হাসির শব্দে একজন উঠে (সেই বোধহয় সব চেয়ে বেশী সাহসী) বাঘের দিকে একবার দেখে নিয়ে জোড় হাত করে আর একটা গুলি বাঘকে মারতে অনুরোধ করতে লাগল। আবার খানিকটা বুঝিয়ে তাদের দিয়ে হাতীর পিঠে বাঘ তুলে নিই, বাঘটা নয় ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা। দেখলাম দুই গুলিই তার বক্ষস্থল ভেদ করেছে এবং উহাদের পরস্পরের ব্যবধান এক ইঞ্চি মাত্র।

জঙ্গলের মধ্যে হাতী চালিয়ে যাবার সময়ে কোথা থেকে একটা ক্রুদ্ধ বোলতা ছুটে এসে আমার কপালে হুল ফুটিয়েছিল। শিকারের উত্তেজনায় তখন গ্রাহ্য করিনি, এখন যন্ত্রণা বোধ হ'তে লাগল। ঔষধের জন্য তাড়াতাড়ি আস্তানায় ফিরে গেলাম। এই কারণেই শিকারীদের সঙ্গে কিছু ঔষধ ও তার প্রয়োগ বিধি জেনে রাখা খুব দরকার। আইয়োডিন, লাইকার এ্যামোনিয়া, পারমাঙ্গানেট অব্ পটাশ ইত্যাদি। লোকালয় থেকে দূরে, যেখানে ডাক্তারের সাহায্য পাবার আশা নেই, নিজের বা সঙ্গীদের জীবন অনেক সময়ে সামান্য মূল্যের কয়টী ঔষুধের উপর নির্ভর করে। আসামে একবার একসঙ্গে তিনটী ক্রুদ্ধ বোলতা (ঐগুলি আরও হিংস্র) আমার মুখে কামড়েছিল। তৎক্ষণাৎ মাথার মধ্যে যেন আগুনের ছুটাছুটী আরম্ভ হোল। অতি কষ্টে সেই বোলতাবিদ্ধ বদন হাঁড়ির মত ক'রে বাসায় ফিরে এসেছিলাম—তখন আমার জ্বর এসেছে। সেবারেও একটা বড় বাঘ মারতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে কথা উপস্থিত থাক।

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

STUDENT

শান্তি ও অশান্তি

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

এক যে ছিল রাজপুত্র।—

তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অন্দরে বাহিরে দাস দাসী সেপাই বরকন্দাজ, বিত্ত-ভাণ্ডারে থৈ থৈ করছে অর্থ সম্পদ, আর চিত্ত-ভাণ্ডারে থৈ থৈ করছে মন। রাজার ছেলে, রাজার আদরে প্রতিপালিত,—রাজার মতোই তার শিক্ষা দীক্ষা, রাজার মতোই সম্মান। সম্মানের বহরটা বোধ হয় রাজার চেয়েও তার বেশি, কারণ স্বয়ং রাজার কাছে সে সকলের চেয়ে প্রিয়। বাল্যকাল থেকেই যে এমন প্রিয় হয়, তার ধাতটাই যেন একটু ভিন্ন রকমের ক'রে তৈরী হ'য়ে ওঠে। একজনের কাছে আদর পেতে পেতে সে ক্রমে সকলের কাছেই কেবল আদর পেতে থাকে। তার মন কোথাও কোনো রকম আঘাত পায় না, তার আকাঙ্ক্ষা কখনো ব্যাহত হয় না। কাজেই তার মনের চারা গাছটি নিরুপদ্রবে আপন খুসিতে গজিয়ে উঠতে থাকে, এবং এক দিন ডাল পালা বিস্তার ক'রে অতি বিশাল হ'য়ে ওঠে। আমাদের এই রাজপুত্রের মনটিও তেমনি ভিতরে ভিতরে বিশাল আকার নিয়ে গজিয়ে উঠেছিল।

মন যার অনেকখানি, সে কেমন ক'রে যেন পৃথিবীর অনেক জিনিসই টের পায়। সে সহজে কিছুতে ডুবে যায় না, ডুবে যেতে যেতেও বুঝতে পারে আমি ডুবে যাচ্ছি। মনের একমাত্র উপাদেয় খোরাক হচ্ছে আনন্দ, তাই মানুষের মন আনন্দেরই সন্ধান করে। কিন্তু যার যত বড়ো মন, তার আনন্দটাও চাই তত উঁচু দরের। এই বাছাই এবং বিচার করতে গিয়েই সে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভূতি বিলাসী হ'য়ে থাকে।

রাজপুত্রের অভাব কিছুই নেই। যা কিছু তার প্রয়োজন সে না চাইতেই পেয়ে যায়, কিছুমাত্র প্রয়াস করতে হয় না। কিন্তু তবুও যেন রাজপুত্র ম্লান হাসি হাসে, যেন হাসির মধ্যেও আবল্য মাখানো। রাজপুত্র মৃগয়ায় যায়, প্রমোদ কক্ষে গীত বাদ্য নিয়ে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে, নদীতে গিয়ে সন্তরণ ক্রীড়া করে, বনে গিয়ে বনভোজন করে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিষ্ট আলাপ এবং সুমিষ্ট কাব্যালোচনা করে, চিত্রশালায় গিয়ে শিল্পীদের নব নব উদ্দীপনা দান করে, নাট্যশালায় গিয়ে নৃত্যকুশলা নর্তকীদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ নটী তা অনায়াসে বুঝে নেয় এবং তার পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেয়, ব্যায়ামাগারে গিয়ে অন্যান্য সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে নিজেও কিছু ব্যায়াম করে, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে উঠে নিজেও হয়তো কিছু বক্তৃতা দিয়ে আসে, আবার পারিষদবর্গের সঙ্গে মিশে সময় মতো রাজকার্যও পর্যবেক্ষণ করে। রাজপুত্র সমস্তই করে, তবুও যেন কিছু নিরাসক্ত, কেমন নিস্পৃহ। রাজা যথাসময়ের পূর্বেই পুত্রের বিবাহ দিলেন, পরমাসুন্দরী রাজবধূ এসে শয্যাকক্ষ নিত্য আলোকিত ক'রে রইলো।

মানুষের জীবনে যা কিছু কাম্য, সমস্তই রাজপুত্রের করতলগত। তবু কেন রাজপুত্র স্ফূর্তিযুক্ত নয়? মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু যেন পাওয়া তার এখনো বাকি আছে, কিন্তু কী সে বস্তু, বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা নতুন কিছু অভাব যদি দেখা দেয় তো বেশ হয়, সেটাকে পূরণ ক'রে একটা নতুন রকমের তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু অভাব তো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না! চিন্তা করতে করতে রাজপুত্র ক্লিষ্ট হয়, অন্যমনস্ক হয়।

একদিন সে অকস্মাৎ আবিষ্কার করলে যে অন্যান্য লোকের তুলনায় তার মনের আগ্রহের প্রাবল্যটাই সকলের চেয়ে কম। যাকেই লক্ষ্য করা যাক, যার সঙ্গেই দুটো কথা বলা যাক, দেখা যাবে জীবন নিয়ে তাদের কত আগ্রহ, সামান্য জিনিসের জন্যে তাদের কত ঔৎসুক্য, লাভ-ক্ষতি

সম্বন্ধে তারা কত সচেতন, সামান্য একটু বিচ্যুতি ঘটলে তারা কতই বিব্রত! তারা যেমন অতিমাত্রায় সজাগ, এমন সজাগ তো কৈ সে নিজে নয়! কিসে অতটা পার্থক্য হয়? রাজপুত্র নিবিষ্টমনে অনুসন্ধান করতে লাগলো।

ক্রমে সে বুঝতে পারলে যে অশান্তিই মানুষকে এমন ক'রে জাগিয়ে চঞ্চল ক'রে রেখেছে। যেখানে নিশ্চিন্ত শান্তি, সেখানেই আলস্য, সেখানেই নিদ্রা। যেখানে অশান্তি, অপ্রাপ্তি, অপরিপূর্ণতা,—সেখানেই চেষ্টা জাগে, সেখানেই মানুষের মন তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। আর যেখানে স্বতঃই শান্তি, যেখানে পাবার কিছু দেখা যাচ্ছে না সুতরাং উদ্বেগও কিছু নেই, সেখানে-জাগন্ত মনও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলতে সুরু করে।

কিন্তু এই অশান্তি ওরা পায় কোথা থেকে? কোন রসবস্তুর সন্ধানে ওদের এই অশান্তি? খোঁজ নিলে দেখা যায় কারো বা চিত্তের জন্যে, কারো বা ক্ষমতার জন্যে, কারো বা নানারকম প্রাপ্তির চেষ্টায় এই অশান্তি জেগেছে। কিন্তু তার অন্তরালে উঁকি মারলে দেখা যায় প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য আত্মতৃপ্তি এবং প্রত্যেকেরই মনে তার একটা অঙ্কিত আদর্শ আছে। কিন্তু আশ্চর্য তো মানুষের এই অশান্তি! আশ্চর্য তো তার ক্ষমতা!

রাজপুত্রের মনে ভারী লোভ হোলো। একবার নিজে অশান্তি পেয়ে দেখতে ভারী ইচ্ছে হলো। কিন্তু কেউ তো তাকে অশান্তি পেতে দেবে না, সবাই চারিদিক থেকে জোর ক'রে তাকে শান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে!

রাজবাড়ীর পাশেই আছে বানেশ্বর শিবের মন্দির। তিনিই রাজপুত্রের আরাধ্য দেবতা, তিনিই ওর ভাগ্য-দেবতা। ও তাঁকে প্রণাম ক'রে বল্লে,—ঠাকুর, আমাকে এইবার একটু অশান্তি দাও, আমি একটু চোখ চেয়ে জেগে উঠি। শান্তি আর আমার ভালো লাগছে না, ক্রমাগত শান্তি পেয়ে পেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। শান্তির মধ্যে কোনো চেতনা নেই, আমাকে একটু অশান্তি দিয়ে মানুষের মতো মানুষ করো। ছোটোখাটো জিনিস চাই নে, যা দেবে তা যেন আমারই মনের উপযুক্ত হয়।

ঠাকুর রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বলে গেলেন,—তথাস্তু।

* * * *

অশান্তি দেখা দিল দুই দিক থেকে। প্রথমে এলো ভিতর থেকে, তার পরে এলো বাইরের থেকে।

অশান্তির আঘাত রাজপুত্রের গায়ে কখনো লাগেনি। প্রথম আঘাতটা পাওয়া গেল একেবারে রাজবধূর নিজের হাতে। বড়ই লাগলো। রাজপুত্র বুঝতে পারলে, যে অভাবটা এতদিন সে খুঁজেই পায়নি, সে অভাবটা লুকিয়ে ছিল কোথায়। অভাবটাকে মেটাতে সে প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু এক রকমের অভাব থাকে, চেষ্টার দ্বারা যা কিছুতেই মেটাবার নয়। এ অভাবটা অনেকটা সেই ধরণের। অনেক দিন চেষ্টার পর রাজপুত্র তা ক্রমশ টের পেলে। তার তখন খুব হাসি পেলো। ঠাকুরকে বললে,—ঠাকুর, এমন অভাবই কি আমি চেয়েছিলুম যার কোনো কিনারাই নেই, যে প্রশ্নের কোনো নিষ্পত্তি নেই, যে পথের কোনো পৌছনোই নেই? এতে আমার কতক্ষণ পর্যন্ত কী অশান্তিই বা ঘটবে? মরীচিকার পিছনে যদি সত্যি কোথাও জলের আশা থাকে তবেই তো মানুষ ছোটে, নইলে কতক্ষণ ছুটবে? ঠাকুর আমার মনকে তুমি চিনতেই পারলে না? দেখ তবে আমার ক্ষমতা!

যে অভাব মনে মনে দেখা দিয়েছিল, রাজপুত্র মন থেকে তা বিদ্ধ কাঁটার মতো ঘুচিয়ে ফেলে দিল। অনেক কাঁটা ফুটেছিল, একটি একটি ক'রে সমস্তই তুলে ফেলে দিল।

রাজপুত্রের মন কিন্তু অনেকটা জেগে উঠেছে। রাজপুত্র এখন তেমনি রাজকার্য করে, প্রমোদ কক্ষে যায়, নাট্যশালায় যায়, চিত্রশালায় যায়, ব্যায়ামশালায় যায়, কাব্যালোচনা করে, মৃগয়া করে, বনভোজন করে, আর থেকে থেকে আপন মনে হাসে। রাজপুত্রের চতুর মন, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, রাজপুত্র কখনো আর ম্রিয়মান থাকে না, কেউ ধরতে পারে না কোথায় কী হ'য়ে গেছে।

* * *

এর পরের অশান্তি এলো বাইরের থেকে। রাজ্যে দেখা দিল অনাবৃষ্টি, অনটন, অন্নকষ্ট। চারিদিকে হাহাকার, অসন্তোষ। হাতীশালে হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়ার সংখ্যা কম, দাস দাসী সেপাই বরকন্দাজের মুখ ভার, অর্থের থলি হ'য়ে আসে সঙ্কুচিত, মন হ'য়ে ওঠে বিব্রত।

রাজপুত্রের আবার হাসি পেলো। বাইরের থেকে দেখতে খুব দুঃখ বটে, কিন্তু এও তো কাটানো যায়! এ দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় বটে, কিন্তু মনকে অনায়াসে এর থেকে পৃথক ক'রে রাখা যায়! পৃথিবীতে এই দুঃখই চারিদিকে, কিন্তু সকলেই এর থেকে মনকে যথাসাধ্য ভুলিয়ে রাখে, আর মন এর মধ্যে থেকেই নিজের কাজ ক'রে যায়! একটা অশ্বস্তি হয় বটে, কিন্তু অশান্তি তেমন হয় না তো! জীবনে এতই সুখ দেখেছি যে এতে আমার কিছুই হবে না, বরং নিজের বাহাদুরি দেখাবার একটা এই সুযোগ। এ আর একটা অশান্তি কি?

রাজপুত্র রাজ্যের একটা যাহোক ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌লে, চারিদিক থেকে ব্যয় সংক্ষেপ করলে, অনাবশ্যক যত কিছু পরিত্যাগ করলে, আবশ্যকের মাত্রাও কম ক'রে দিলে, সুতরাং তারপর আর বিশেষ কিছু মানসিক বেগ পেতে হোলো না।

তখন দেখা দিল সুন্দরী সুরভি।

সুরভি শ্রেষ্ঠী কন্যা। ধনকুবের রতনচাঁদ শ্রেষ্ঠীর একমাত্র আদরিনী কন্যা। তাকে কেউ বা বলে পুষ্প সুরভি, কেউ বলে সুরভি রাণী, কেউ বলে শুধু সু।

সুন্দর তার দেহের গঠন, আশ্চর্য্য তার অঙ্গের ভঙ্গি। অতি মিষ্টভাষিনী সে, মিষ্ট কথা সহজে বলতে জানে, মিষ্ট হাসি হাসতে জানে। সুর পঞ্চমে ধ্বনিত হয় তার গলার স্বর, পার্ব্বত্য নির্ঝরের কুল্ কুল্ শব্দের ন্যায় ধ্বনিত হয় তার মুখের হাসি। সে হাসি কেবল মুখ দিয়েই ঝরে না, খানিক ঝরে মুখ দিয়ে, খানিক ঝরে চোখ দিয়ে। সুন্দর সেই চোখ দুটি ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, সুন্দর তার ভ্রু-দুটি ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত হয়, ক্ষণে ক্ষণে নাচে। মোম দিয়ে গড়ার মতো তার দেহের লাবণ্য। আপাত দৃষ্টিপাতে সহসা কিছু বোঝা যায় না। মনে হয় দেহটা বুঝি কোনো কঠিন বস্তু, এমনি ঋজু তার আকৃতি, এমনি সুঠাম তার ভঙ্গিমা। কিন্তু চোখ দিয়ে কেবল দেখা নয়, চোখ দিয়ে একটু অনুভব করলেই জানা যায় সে কত কোমল। একটু লজ্জা পেলেই সাদা গাল নিমিষের মধ্যে সিঁদুরবর্ণ হয়ে ওঠে। অপরূপ তার কুঞ্চিত চুলের শিথিল বেণী, অপূর্ব তার তাম্বুলরাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধর। দেহের অন্যান্য অঙ্গও স্থানে স্থানে অতি মনোহর, স্থানে স্থানে অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নেই কারণ তাতে যে কেবল কাহিনীটাই ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠবে তা নয়, বর্ণনা অন্যপ্রকার দোষেও দূষিত হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু আমরা কিছু উল্লেখ না করলেও রাজপুত্রের নজরে কিছুই এড়ায়নি। যার চোখ আছে সে দেখবে না কেন, যার মন আছে সে মুগ্ধ হবে না কেন? রাজপুত্রের মতো চোখ যাদের আছে তাদের তৃপ্তি দেবার জন্যেই স্রষ্টার এই সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এ সকলের জন্যে নয়, এবং সকলে দেখতেও পায় না।

সুন্দরী সুরভি সে দিন এসেছিল বানেশ্বরের মন্দিরে, পূজার উদ্দেশে। ছেলেবেলায় সে এই দেবতার পূজা করেছে, দেবতার মাথায় কত ফুল দিয়েছে। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পূজা করা ছেড়ে দিয়েছে, বহুকাল এ মন্দিরে আসেনি। সেদিন হঠাৎ বোধ হয় দেবতার কথা মনে হয়েছে, তাই ভোরে উঠেই এসেছে।

রৌপ্যবেদীর উপরে বসানো শ্বেতপাথরের গড়া ছোটো একটি শিবলিঙ্গ। সুরভি ঝারির জল দিয়ে দেবতাকে স্নান করাচ্ছিলো, হঠাৎ অন্যমনস্কে তার হাতের আঘাত লেগে বিগ্রহ বেদীর উপর থেকে নীচে পড়ে গেল। সুরভির সমস্ত অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি বিগ্রহকে বুকের উপর তুলে নিয়ে আপন স্বর্ণ-অঞ্চল দিয়ে তার ধূলা মুছিয়ে দিতে লাগলো। এ অঘটন কেউ দেখতে পেয়েছে কিনা জানবার জন্যে সে দরজার দিকে ফিরে চেয়ে দেখে, সেখানে রাজপুত্র দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

রাজপুত্রের মনটা আজ ঘুম ভেঙে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল, হঠাৎ দেবতার কথা মনে উদয় হয়েছিল, তাই সেও এসেছিল অসময়ে প্রণাম করতে।

রাজপুত্রকে দেখেই সুরভির ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকা দেবার জন্যে সে সপ্রতিভ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার বুঝি মোটে ঘুম হয় নি, তাই এমন সময়ে এসেছেন মন্দিরে?"

রাজপুত্র হাসিমুখে জবাব দিলে—"হাঁ, তাই। কিন্তু

আমি জানতাম না যে এটা তোমার পক্ষেই সময় আর আমার পক্ষেই অসময়। আজই আমি সেটা প্রথম জানলাম। এবার থেকে অবশ্য রোজই আমি অসময়ে আসবো, আশা করি দেবতা আমার সে অপরাধ ক্ষমা করবেন। অসময়ে এলেও যে লাভ হয় সে কথা আমি জানতাম না।"

সুরভির গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লজ্জায় সিঁদুরের মতো রাঙা হ'য়ে উঠলো। বিব্রত হ'য়ে সে বল্লে—"মোটেই তা নয়। আজ আমি এসেছিলাম অনেক দিনের পর। আবার হয়তো বহুদিন আসবো না।"

রাজপুত্র এবার অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বল্লে—"আচ্ছা, তুমি পূজা করো, আমি চলে যাচ্ছি।" এই কথা বলে সুরভির উত্তরের অপেক্ষা না করে সে চলে গেল।

কিন্তু তার পর দিন দেখা গেল ঐ সময়ে সুরভিও এসেছে, রাজপুত্রও এসে উপস্থিত হয়েছে মন্দিরে।

এ তো বড় আশ্চর্য্য কথা! রাজপুত্রের মনে দারুণ খট্‌কা লেগেছে। রাজ্যের সমস্ত চিন্তা তুচ্ছ ক'রে হঠাৎ একটি মানুষকে আর একটি মানুষের দিবারাত্র কেবলই মনে পড়তে থাকবে কেন? তাকে দেখতে, তার কথা ভাবতে ক্রমাগতই ইচ্ছা হবে কেন? অত্যন্ত অন্যায়, অতীব লজ্জার বিষয়। এ কথা কাউকে বলাও উচিত নয়, ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেওয়াও উচিত নয়। ঐ মেয়েটি যদি এ কথা জানতে পারে, ছি ছি, কী মনে করবে সে?

কিন্তু কথা চেপে রাখা যায়, কাজ চেপে রাখা যায় না। দেখবার ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় না, মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে যাওয়া নিবৃত্ত হয় না। যেতে বড়ই ভালো লাগছে, রাজপুত্র না গিয়ে কী করবে?

মেয়েটি নিশ্চয় এতদিনে জানতে পেরেছে। নইলে ওই বা এমন ভোরে উঠে আসে কেন, এতই বা এমন হাসে কেন? আচ্ছা, ওর মনেও কি এই রকম হয়? অসম্ভব, না না সে অসম্ভব। তবে কেন সে আসে? কৌতূহল, শুধুই একটু কৌতূহল।

একদিন রাজপুত্র গেল না। তার পর দিন গেল, কিন্তু আড়ালে লুকিয়ে রইলো। আড়াল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলে সুরভির মুখ বড় বিষণ্ণ। যখন রাজপুত্র দেখা দিলে, তখন তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে ক্ষণিক, তার পরেই দুর্জ্জয় অভিমান, চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়তে লাগলো, সুরভি কথা না ব'লে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সে অভিমান শান্ত হলো।

এখনো কি বলবে কৌতূহল? কিন্তু আরো স্পষ্ট জানা চাই। নিজের কথা জানাবার ইচ্ছা অতি ভীরু, কিন্তু তার আগে অন্যের কথা জানবার ইচ্ছাই অদম্য। নইলে যদি ভুল কিছু হয়?

দুজনেই সুযোগ খোঁজে। পরামর্শ ক'রে দুজনে মিলিত হয় মন্দিরের দ্বারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যখন দিনের আলোও বেশ নিভে গেছে কিন্তু রাত্রের দীপালিও জ্বলে ওঠে নি,—যখন অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না, মুখ না দেখে নিঃসঙ্কোচে মন আপন কথা কিছু ব্যক্ত করবার সুযোগ পায়। সন্ধ্যার অন্ধকার শান্ত, স্তব্ধ, নিরুদ্বিগ্ন,—সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্তঃশীলা বেয়ে চলে অনেক নদীর বেগ; মনকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে অথচ কিছু জানতে দেয় না। মনকে সে বড় অসাবধান ক'রে দেয়। রাজপুত্র নিজের মনের কথা একটু একটু বলে ফেলে, সুরভিও চুপ ক'রে থেকে থেকে অল্প একটু আভাস দেয়। রাজপুত্র আবার প্রগল্‌ভ হ'য়ে ওঠে, সুরভি অনেকক্ষণ পরে আবার একটু আভাস দেয়। এমনি ক'রেই অল্পে অল্পে হ'তে থাকে দুজনের মন জানাজানি।

আরো অনেক রকমের ঘটনা ঘটতে থাকে।

সুরভির পায়ে ফুটেছে কাঁটা। জানতে পেরেই রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ "দেখি দেখি" বলে দুহাত দিয়ে পা ধ'রে কাঁটা তুলে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

—"ছি ছি রাজপুত্র, কী যে করো, আমি যে শ্রেষ্ঠীকন্যা, আমার পায়ে তুমি হাত দাও?"

—"ছি ছি শিউলিরাণী, কী কথাই যে তুমি বলো! চণ্ডীদাসের কবিতা তো তুমি পড়েছো, যে কবিতা রজকিনী রামীর নামে আজও অমর হ'য়ে আছে? তুমি কি তার চেয়েও নীচ?"

সুরভি আজকাল রাজপুত্রকে আর "আপনি" সম্বোধন করে না, বলে "তুমি।" আর রাজপুত্র সুরভিকে কখন যে কী নামে ডাকে তার ঠিক নেই,—কখনো বলে শিউলিরাণী, কখনো বলে দেবী, কখনো বলে লক্ষ্মী,—কিন্তু সুরভি নামে কখনো ডাকে না।

আবার রাজপুত্র একদিন পায়ের জুতা খুঁজে পায় না। সুরভি এদিক ওদিক খুঁজে হাতে তুলে নিয়ে আসে।

—"ছি ছি, চামড়ার জুতোটা তুমি হাতে নিলে কেন?"

—"পায়ে হাত দিতে দোষ নেই, আর পায়ের জুতোয় হাত দিতেই বুঝি যত দোষ?"

এমনি সব অনেক রকমের তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা অনেক ঘটতে থাকে।

এরপর কিন্তু একদিন অন্যরকমের একটি ঘটনা ঘটলো। দেখা গেল সুরভি অপর এক যুবকের হাত ধরে বেড়াচ্ছে। সুরভিকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে ঐ যুবক একজন শ্রেষ্ঠীর পুত্র, তার পিতা ওর সঙ্গে সুরভির বিবাহ দিতে মনস্থ করেছেন।

রাজপুত্র অস্থির হয়ে উঠলো। অবিলম্বে একেবারে রতনচাঁদের কাছে গিয়ে হাজির।

—"তোমার কন্যা সুরভিকে আমি বিবাহ করতে ইচ্ছা করি।"

—"অসম্ভব। তুমি কি পাগল হয়েছো রাজপুত্র? তোমার গৃহে রয়েছে রাজবধূ, আমার একটি মাত্র মেয়েকে আমি কি সতীনের হাতে দেবো?"

—"আমি তাকে স্বতন্ত্র রাজপ্রাসাদে নিয়ে রাখবো, তাকে শ্রেষ্ঠ রাণীর আসন দেবো, তাকে আমার পাটরাণী করবো।"

—"অসম্ভব। তোমার মতো দরিদ্র রাজাকে বিবাহ করবে আমার কন্যা? তার একটা রত্নবলয় কিনে দিতে তোমার একটা পরগণা বিক্রয় হ'য়ে যাবে, এক জোড়া কর্ণ-কুণ্ডল কিনে দিতে তোমার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠী-কন্যার মর্যাদা রাখতে পারে একমাত্র শ্রেষ্ঠীর পুত্র। আমাদের মর্যাদাও স্বতন্ত্র, আমাদের আভিজাত্যও স্বতন্ত্র।"

রাজপুত্র ফিরে গেল, তার পর আরো অস্থির হ'য়ে উঠলো।

দিন যায়, রাজপুত্রের মনে শান্তি নেই। রাত্রি যায়, রাজপুত্রের চোখে নিদ্রা নেই। আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, রাজপুত্রের খাদ্যে রুচি নেই। রাজপুত্র আর রাজ-কার্যে মন দিতে পারে না, প্রমোদ কক্ষে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, মৃগয়ার অস্ত্রে মরিচা ধ'রে গেল, গীতবাদ্য একে-বারে বন্ধ, বন্ধুবান্ধবদের এড়িয়ে চলে, এদিকে ওদিকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

এ দারুণ অশান্তি। রাজপুত্রের মুখের সেই বিদ্রূপের হাসি, সেই হাল্কা ধরণের হাসি, সমস্তই মিলিয়ে গেছে। সুরভির সঙ্গে যখন দেখা হয় তখনো অশান্তি, যখন দেখা হয় না তখন আরো অশান্তি। যাকে দেখতে আকুল হ'য়ে ওঠে, তাকে দেখবামাত্রই কিন্তু অতৃপ্তি আরো বেড়ে যায়, এ রাজপুত্রের কী হোলো?

রাজপুত্র ভেবে চিন্তে আবার ভাগ্যদেবতার শরণাপন্ন হোলো। কায়মনোবাক্যে পুজা ক'রে ঠাকুরকে বললে—ঠাকুর, এ আমার কী অশান্তি দিলে? যে অশান্তি দূর করবার আমার কোনো ক্ষমতাই নেই, যা জয় করতে পারা কোনো মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, সেই অশান্তিই কি আমি চেয়েছিলাম? আমি একটু জেগে উঠতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিলে। ক্ষান্ত হও ঠাকুর, ক্ষান্ত হও, আমাকে একটু শান্তি দাও।"

ঠাকুর আবার স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বললেন—তথাস্তু।

* * * *

দিন যায়। রাজপুত্রের মনে আবার যেন শান্তি ফিরে এসেছে। কেমন ক'রে তা হোলো?

শান্তি পাওয়া গেল সুরভির কাছ থেকে। সুরভির প্রেম অতিশয় গভীর, পাতালস্পর্শী, কিন্তু সেখান থেকে যে জল ওঠে তা কূপবারির মতো স্নিগ্ধ, কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ, অমৃতের মতো মধুর। সে জলের কেউ সন্ধান জানে না বটে, কিন্তু যে একবার সন্ধান পেয়েছে তার কাছে সে জল কখনই ফুরিয়ে যায় না, শূন্য পাত্র ডোবালেই জল উঠে আসে।

সেই প্রেমের পরিচয় পেয়ে গেল রাজপুত্র। রাজপুত্রের আকুলি বিকুলি প্রেমের চেয়ে সে অনেক যথার্থ। সে আগুনের

মতো দর্প ক'রে জ্বলে ওঠে না, সে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মতো ধীরে ধীরে আসে। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত একটু একটু ক'রে ফুটতে তার অনেক দেরী লাগে, যত সময় যায় ততই ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। সুরভির দেহের সঙ্গে তার মনের অনেকটা মিল আছে, সে সৌন্দর্য সহজে ধরা যায় না, একটু চেষ্টা ক'রে ধরতে হয়। বাইরে থেকে মনে হয় যেন কঠিন, কিন্তু একটু ভিতরে গেলে জানা যায় কত কোমল।

কিন্তু এ সব হোলো রাজপুত্রের নিজের মনের কথা। পরিচয় যার যেমনই হোক, তা নিয়ে কথা নয়। শান্তির আসল কারণ হোলো বিশ্বাস। আস্থা যেখানে আছে সেখানে কিছু মাত্র অশান্তি থাকে না। রাজপুত্র আজ সুস্থ মনে অনুভব করছে যে আমি আছি, এবং তার এই অনুভূতির মধ্যে অত্যন্ত একটা সার্থকতা মিলছে।

সুরভির রাজপুত্রের প্রতি নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতা। তার ঐ মহার্ঘ মনটি শেষ পর্যন্ত সে অকুতোভয়ে রাজপুত্রকে দান করেছে। তার কোনো অধিকারস্পৃহা নেই, কোনো দাবী নেই। রাজপুত্র এটুকু বুঝেছে। রাজপুত্র তাকে বিশ্বাস করে।

কিন্তু যদি তার অন্যত্র বিবাহ হয়? তা কিছুতে হবে না। রাজপুত্র এটুকুও বুঝেছে, এটুকু বিশ্বাস জন্মেছে।

কিন্তু এত বিশ্বাস, এত নির্ভরতা, তবু তো ভয় ঘুচলো না! থেকে থেকে বিশ্বাসটা যেন কোথায় উবে যায়, কোথা থেকে বেরিয়ে আসে একটা অবিশ্বাসের সূত্র, ভয় হয় বুঝি হারাই হারাই, মন হ'য়ে ওঠে অস্থির। আবার থেমে যায়, কিন্তু আবার আসে।

কেন আসে? কোনো বন্ধন নেই তাই কি? কিন্তু আস্থাই কি সকলের চেয়ে বড় বন্ধন নয়? তবু কেন, তবু কেন—

এমনি ক'রে থেকে থেকে রাজপুত্র অস্থির হয়। দূর করতে চায় এই অশান্তিটাকে, মনকে নিষ্কণ্টক করে ফেলতে চায়।

তার কী উপায়? রাজপুত্র ভেবে চিন্তে আবার ভাগ্য-দেবতার শরণাপন্ন হলো। পূজা দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে,—ঠাকুর, শান্তি তো কৈ পূর্ণমাত্রায় দিলে না, নিশ্চিন্ত হই না কেন, ঠাকুর? এবার আমায় নিশ্চিন্ত করো।

বাণেশ্বর মহাদেব আবার স্বপ্নে দেখা দিলেন। বল্লেন,—আর তোমায় পরীক্ষায় ফেলবো না। এবার নিশ্চিন্ত হবার ফল কি হবে তা তুমি স্বপ্নেই দেখে নাও।

রাজপুত্র দেখলে সুরভির সঙ্গে যেন তার বিবাহ হয়েছে। কোথায় একটা রাজপ্রাসাদে ওরা থাকে। দুজনেই নিশ্চিন্ত, সুতরাং কারো আর কোনো আগ্রহ নেই, স্বচ্ছন্দ গতানুগতিক জীবন। সেই একই প্রকারের আলস্য-জীবন, সেই পূর্বের মতো। রাজপুত্র থাকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে, কাব্য সঙ্গীত আর রাজকার্য নিয়ে, সুরভি থাকে সখীদের নিয়ে, ঘর সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে। দুজনের জীবনেই আলস্য এসেছে, এখনকার মাধুর্যটুকু কোথায় নষ্ট হ'য়ে গেছে।

স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে দেবতা বল্লেন,—এই যে ছবি দেখলে, এই হোলো সকলের চেয়ে সহজ। এ ছাড়া অন্য রকমের ছবিও দেখানো যায়, তা আর দেখালাম না। উপস্থিত সব চেয়ে বড়ো যে অশান্তি তাও তোমায় দিয়েছি, সব চেয়ে বড়ো যে শান্তি তাও দিয়েছি। কিন্তু তুমি কী চাও, শান্তি কি অশান্তি, তা নিজেই তুমি জানো না। তার চেয়ে আমি যা দিয়েছি তাই মাথা পেতে নাও। সবটাই তোমার রইলো, অথচ মিলছে না তোমার কিছুই। এই সব চেয়ে ভালো। এখন মনে করলেই তুমি শান্তি পাবে, আবার না মনে করলেই পাবে না। মনে রেখো যা তোমাকে দিয়েছি এ আমার নিজের হাতের দান। ভেবো দেখো দেখি এই কি তুমি চাও নি?

রাজপুত্র বল্লে—কিন্তু ঐ শ্রেষ্ঠী-পুত্র?

দেবতা বল্লে,—ও রইলো তোমার অশান্তিকে জাগিয়ে রাখার জন্যে। জীবনের আস্বাদ তুমি পেতে চেয়েছিলে। তাই তোমাকে শান্তিও দিলাম, অশান্তিও দিলাম। দুই-ই তুমি গ্রহণ করো, তবেই জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ তুমি পাবে।

রাজপুত্র এবার একটু ম্লান হেসে বল্লে—তথাস্তু।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

ঘিয়ের কথা

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-বি

আপনি জানেন, 'চরখা' একটি কত বড় কুটীর-শিল্পের যন্ত্র। কিন্তু তার চাইতেও বড় কুটীর-শিল্পের যন্ত্র হচ্ছে মন্থন-দণ্ড! দিগন্তবিস্তৃত ভারতের সহস্র লক্ষ গ্রাম্য কুটীরে প্রতি প্রভাতে এই মন্থন-দণ্ডের যে মৃদুমধুর গুঞ্জন লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব করে, তার সম্যক উপলব্ধি আজও বোধ করি হয়নি।

তুলা, সুতা ও কাপড়ের দরের উপর কাটুনি ও তাঁতিদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য যতটা পরিমাণে জড়িত, অদ্যকার নিরন্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর স্বাচ্ছন্দ্য এই মন্থন-দণ্ড-পরিচালনা প্রসূত ঘি, মাখন বা ননী প্রভৃতির উপর ততোধিক নির্ভর করে। এই কুটীর শিল্পটি কার্পাস শিল্পের চাইতে অধিকতর ব্যাপক, অথচ সে শিল্পের মত কল-কারখানার প্রতিযোগিতা ও তন্নিবন্ধন সমস্যা হ'তে এখনও মুক্ত। এই শিল্পের শুধু ব্যাপকতাই নয়, আর্থিক ও nutritional মূল্যও রয়েছে প্রচুর। তাই মনে হয় চরখার শক্তিশীলতা অপেক্ষা মন্থন-দণ্ডের কার্য্যকারিতা ভারতে কম নয়।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে লক্ষ লক্ষ কুটীর-প্রাঙ্গণে প্রতি প্রভাতে বিহগ কাকলী সমন্বয়ে মন্থন-দণ্ডের যে গুঞ্জন রণিত হয়, তার মাঝে একটি ঐক্য আছে। এই গুঞ্জনের সাথে সাথে কি ক'রে লক্ষ লক্ষ শুভ্র হিমকণাবৎ মাখন বা ননী জন্ম নেয়, সেগুলি সংগৃহীত হয়ে কি ক'রে কাঁচা ঘৃতে পরিণত হয়, কেমন করেই বা তা নিকটবর্ত্তী সহরে আনীত হয়, তারপর সেখান হতে ঘৃত আকারে কি ভাবে ভারতের বিভিন্ন জনপদে বিতরিত হয়, সর্ব্বশেষে কি ক'রে তা গৃহস্থালীর আবেষ্টনে ভোজ্যপাত্রে পরিবেষিত হয় —এর সমগ্রতা একটি মুগ্ধকর কাহিনী!

আজ নূতন নয়, বৈদিক সভ্যতার প্রথম প্রভাত হতে এই উপাদেয় হবির অর্ঘ চলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যে সকল ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, ঘৃতের ব্যবহার তার মধ্যে অন্যতম। দুধ ও মাখন প্রভৃতির প্রচলন পাশ্চাত্য দেশেও হয়েছে, কিন্তু ঘৃতের সমজদার এক ভারতীয় ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ভারতের নানা সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতে, দ্বীপময় ভারতে, শ্যাম, ইন্দোচীন, ব্রহ্ম, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচলিত হয়েছে সত্য। যদিও দূরত্বের ও কালের ব্যবধানে তা রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে নানা বিষয়ে, কিন্তু এ প্রাচ্য অধিবাসীদের মাঝে দুধ, দই, ক্ষীর, মাখন প্রভৃতির প্রচলন ও আদর আজও হয়নি। তাই মনে হয়, শুদ্ধ ঘি ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য, যার সমজদার অন্য কোন দেশীয়ের মধ্যে আদৌ নেই।

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত মেহতা সেদিন নিখিল ভারত ঘি কন্‌ফারেন্সে বলেছিলেন, ভারতেই গবাদি পশু প্রায় ১৮ কোটি,—সমগ্র ভূমণ্ডলের সংখ্যার ⅓ অংশ। সোভিয়েট রুশিয়ায় ৬½ কোটি, ইউনাইটেড ষ্টেটসে পৌণে ছয় এবং ব্রিটেনে পৌণে এক কোটি মাত্র। ভারতের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মূল্য বৎসরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। আর মাত্র এই একটা জিনিষ ভারতের সমগ্র বহির্বাণিজ্যের সমান। ভারতের সমগ্র কৃষক কুলের ধান চাল বিক্রয়ের মূল্যের ইহা সমান, এবং ভারতের বার্ষিক উৎপন্ন সমগ্র গমের মূল্য অপেক্ষা চতুর্গুণ। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘি প্রভৃতি পদার্থের ভারতের আর্থিক জগতে কত বড় স্থান এ থেকেই অনেকটা বোঝা যায়। তাই এই ঘিয়ের চাহিদা অবস্থা ও দরের উত্থান

পতনে বহু লক্ষ পরিবারের ভাগ্য বিজড়িত। গোমহিষাদি পালন ও দুগ্ধ জাত দ্রব্যাদি বিক্রয়, বহু কৃষক পরিবারের একটি আনুষঙ্গিক আয়। কিন্তু গ্রাম্য কৃষকের এ পথটিও আজ নানারূপে বিপন্ন।

যারা যে কাজ করে, তাদের সকলকেই একটা ন্যায্য মজুরি বা লভ্য দিতেই হয়। নচেৎ সে কাজ বিপন্ন হতে বা বন্ধ হতে বাধ্য। চিনির দর যদি এত সস্তা হয় যে, কলকারখানা চালানর খরচা পোষায় না, কারিগরদের মাহিয়ানা পোষায় না, ক্ষেতে আক উৎপন্ন ক'রে কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদন হয় না, তবে জিনিষ সস্তা হয়ত হ'ল, কিন্তু তা টিকতে পারবে না।

'চরখা সঙ্ঘ' কাটুনিদের মজুরি বাড়িয়েছেন। তাতে খদ্দরের দর বাড়ে ক্ষতি নাই। দুধ বা ঘি উৎপন্ন করে যারা, তাদের সকলের মজুরি যদি না পোষায়, তবে নানা কুফল কলা ও দুর্নীতি ঘটা অনিবার্য্য। বিক্রেতা আগে না ক্রেতা আগে, এ প্রশ্ন চিরকালই আছে। ঘিয়ের দর খুব সস্তা হলে ভাল, না দাম বাড়লে ভাল, এ প্রশ্নও তার আর একটা দিক। কোনটি যে ন্যায্য দর তারও মীমাংসা নেই, তাই এ সমস্যার মীমাংসা হল না। বহুকাল ধ'রে তাই কম দরে বেশী জিনিষ পাওয়া আবার বেশী দরে কম জিনিষ দেওয়ার চেষ্টা আছে। মজুরি কারও নির্দ্দিষ্ট নেই, তাই উভয়েই কম দিয়ে, বেশী নিতে চায়—গ্রাহক ও বিক্রেতা। তারপর মানুষ যখন এই ঘিয়ে ভেজাল করে, তখন হয় প্রমাদ—মন্থনদণ্ডের অমৃত বিষে পরিণত হয়—ক্ষীরকে উপলক্ষ ক'রে চোখে নীর ঝরে, ঘিয়ের সুখ অসুখে গিয়ে পৌছোয়। যে কাহিনী এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শোনা যাচ্ছিল, এইখান থেকে হয়ে পড়ল বিষাদ। মানুষের এই অবস্থা ও ব্যবস্থায় পৃথিবীর কত সরস মাধুর্য্য ব্যর্থ হয়েছে নানা ভাবে।

মানুষের মনে অতিরিক্ত লোভ আছে সত্য; সে লোভ কোনদিন সম্পূর্ণ দূর করা যাবে কিনা তাও সন্দেহ। কিন্তু মানুষ অভাবের দিকে তাকিয়ে অসৎ উপায় নানাভাবে আবিষ্কার করতে থাকে। শাসনে বন্ধ করতে পারা যাবে কতটা? প্রস্তুতকারক যদি বা শুদ্ধ জিনিষ দেয়, অসংখ্য মধ্যবর্তী বিক্রেতা রয়েছে। ভেজাল দূর করবার ব্যাপকতা বিচার করতে গেলেও তাই একই জায়গায় ঘুরে ফিরে আসতে হয়,—যেখানে সমাজ-জীবনের নানা সমস্যা জড়িত রয়েছে ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে।

ঘিয়ের সমস্যা কঠিনতর হয়েছে, অনেকের পক্ষে ঘি বস্তুটি চেনাই দুরূহ ব'লে। অনেকেই ঘি চিনতে পারেন না। যার গন্ধ ভাল নয়, অনেকের কাছে তা মন্দ লাগে না, এবং যার গন্ধ ভাল, তাও অনেকের কাছে হয়ত ভাল মনে হয় না। আস্বাদেরও পরীক্ষাও সহজ নয়। ঘিয়ের ব্যাপারে অনেক লোক অনেকবার ঠকেছে, এবং অনেক সংশয় জমেছে, যা দূর হওয়া কঠিন। ব্যাপারটা ক্রমশঃ এমন দাঁড়িয়েছে যে, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মতো, অনেকে মন্দ ঘিকে ভাল মনে করেন এবং ভালকে মন্দ ব'লে সন্দেহ করেন।

এই বিভ্রমের বা গোলযোগের কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমস্যার গ্রন্থিকে জটিলতর করেই তোলে। পাশের দোকানের ঘি খারাপ হলেও, ভাল ধারণায় যদি খুব চলে, তা হলে অপর দোকানে ভাল ঘি বেশি দামে বিক্রয় করে কয় মাস চালানো যেতে পারে? ঘিয়ের ব্যবসায়ের দোকান সম্বন্ধেও এই অবস্থা। তাই এই হীন বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ একটি অফুরন্ত শৃঙ্খলের মত বাড়তেই থাকে। এর শেষ কোথায়?

সকলেই খাঁটি জিনিষ চান, কিন্তু বাজারের সাধারণ জিনিষগুলোর চাইতে দাম কিছু বেশী দিতে হলে অসন্তুষ্টও হন। ভাল জিনিস বিক্রেতার ক্রেতা দুর্ল্লভ। সস্তায় ভাল জিনিষও সুলভ নয়। তাই অধিকাংশ স্থলে ভালর মত জিনিষ বিক্রয় হয়, কিন্তু আসলে ভাল নয়। অনেকে অবশ্য এমন আছেন, বেশী দাম দেওয়া যাঁদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু যাঁরা অবস্থাপন্ন তাঁদের মধ্যেও ন্যায্য দাম অপেক্ষা সস্তায় চাওয়ার লোভ যথেষ্ট দেখা যায়। অথচ ভেজালে দেশ উৎসন্ন গেল বলে, আক্ষেপ করতেও তাঁরা ছাড়েন না। লোভ কেবল বিক্রেতাদের মধ্যেই নাই, ক্রেতাদের মধ্যেও প্রচুর।

দাম বেশী হলে, জিনিষ ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দাম বেশি হলেই যে জিনিষ সব চাইতে ভাল হবে তাও নয়। কতক লোকের এরকম ধারণা আছে

বটে, এবং তাদের এই বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ ক'রে জিনিষ উৎকৃষ্ট না হলেও উৎকৃষ্ট জিনিষের দরে বা তততোধিক দরে, বাজারে বেশ কাজ চলেছে। একেই বলে লাভের দোহন (Profiteering)।

সনাতন পদ্ধতিতে কেবল চক্ষু এবং নাসিকার সাহায্যে ঘি চেনা আজকাল দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্তৃত রাসায়নিক পরীক্ষা ভিন্ন সকল সময়ে বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু দেখা যায়, যাঁদের দাম সব চাইতে বেশী, তাঁদের নিজস্ব ল্যাবরেটরী নেই। অনেকে বিজ্ঞাপিত করেছেন যে, তাঁদের ল্যাবরেটরীতে সকল ঘির পরীক্ষা হয়, কিন্তু তাঁদের এই নিজস্ব ল্যাবরেটরীগুলোর অস্তিত্ব এই মরজগতে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

ঘি দেখে চেনা দুঃসাধ্য এইজন্য যে, ভারতেই নিজস্ব পাঁচটী বৃহৎ কারখানায় বৎসরে ৭ লক্ষ মণ ভেজিটেবল প্রডাক্ট তৈরী হচ্ছে। এবং তাদের রাসায়নিকদের ক্রমাগতই চেষ্টা চলছে, যাতে ঘিয়ের সঙ্গে 'বনস্পতি' মিশ্রিত করলে কোন রকমে ধরতে পারা না যায়। এ ছাড়া ভারতের অন্যান্য জিনিষ ত আছেই এবং ছিলই,—যথা মহুয়ার তেল, চিনেবাদামের তেল, তিলের তেল, নারিকেল তেল, তুলোর বিচির তেল, ফুলওআ ও চর্ব্বি প্রভৃতি। বিদেশজাত বহুপ্রকার ভেজিটেবল প্রোডাক্ট এবং জমান মাছের তেল প্রভৃতির আমদানিও আছে। এই সকল বস্তুর ভেজালের অবাধ প্রসারে ঘিয়ের দর অস্বাভাবিক উপায়ে কমছে, যা অতিশয় অবাঞ্ছনীয়। চরখার সঙ্গে কলকারখানার প্রতিযোগিতার সমস্যার মত, মন্থন-দণ্ডের প্রতিযোগিতা নেই সত্য, কিন্তু এই ভেজিটেবল প্রডাক্টগুলিরও ভেজাল আছে। গোলাপেরও কাঁটা থাকে।

গভর্ণমেন্ট বলেছে, "বনস্পতি" বা vegetable product চলুক। গরীবের জন্য দরকার। ওতে অপকার নেই। ঐ জিনিষ ঘিয়ের সঙ্গে না মিশিয়ে বিক্রী করলেই হ'ল। কিন্তু যখন প্রমাণ হয় যে, শতকরা ৯০ ভাগ তথাকথিত "বনস্পতি" ঘি ভেজালের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন ওর সাধু প্রয়োজনের কৈফিয়ৎ কোথায় রইল!

Vegetable Productগুলির ব্যবহারে যে অপকার নেই, এ কথাও ঠিক নয়। ডাক্তার প্রিমার, ডাক্তার ড্রামণ্ড, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কেমিক্যাল একজামিনার ডাক্তার ডি আর টমাস এবং ইংলণ্ডের মেডিকাল রিসার্চ কমিটি প্রভৃতি প্রমাণ করেছেন যে, উহার ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিশেষ করে গরীবদেরই বেশী ক্ষতি হয়। কারণ সস্তা তেল দেশে অনেক ছিল এবং আজও আছে। 'বনস্পতি' শুধু একটা জমান ঘিয়ের আকার হওয়ায়, তাদের দামও বেশী দিতে হচ্ছে অথচ হাইড্রোজেনাইসড্ করায়, সাধারণ উদ্ভিজ্জ তেলের যে গুণ থাকে তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দেহ পুষ্টির জন্য ভিটামিন 'এ'র প্রয়োজন রয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ ভিটামিন 'এ' ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতির মধ্যেই থাকে। "বনস্পতি" প্রভৃতির ব্যবহারে, পেট খারাপ, দাঁত খারাপ, ক্ষয়, কাশী, ডিসপেপসিয়া ও অর্শ হওয়ার আশঙ্কা আছে। শিশু ও প্রসূতির পক্ষে ত একেবারেই বিপজ্জনক। Rickets ও খর্ব্বাকৃতির ভয় যথেষ্ঠ আছে।

'বাংলার ঘি' ব'লে সম্প্রতি একটা কথা উঠেছে। কথাটা সত্যিই ভাল। বাংলায় যদি যথেষ্ঠ পরিমাণ খাঁটি ঘি তৈরী হয় এবং তা কারবারি পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে নিরন্ন বাঙ্গালী গো-পালকের একটা উপরি আয়ের সুযোগ হয়। তবে বেগুসরায় ও খাগাড়িয়ার ভয়সা ঘি বাংলার পল্লী অঞ্চলে চালান আনিয়ে, তা বাংলার কুটীর-শিল্প বলে চালানর চেষ্টাটা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়।

বাংলার ঘিয়ে কয়েকটা গুণাগুণ আছে, যার জন্য তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না, নষ্ট হয়ে যায়। হয়ত বা কাঁচা দুধ থেকে ঘি করার জন্য এই রকম হয়। এ সম্বন্ধে বেশী পরীক্ষা হওয়া দরকার। বাংলার ঘি গন্ধে শীঘ্র খারাপ হওয়ার জন্য, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়, ব্যবসায়ের পক্ষে একটা গুরুতর অসুবিধা ভোগ করে।

শুধু খাঁটি হলেই ভাল ঘি হয় না। ঘি পুরাণ হলে তার acid value বাড়ে। ঘি তৈরী করবার কয়েক রকম দোষেও এমন হয়। এই প্রকার কটুগন্ধী ঘি খাওয়াও অম্বল হওয়ার একটা কারণ। সরকারি রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, পরীক্ষিত ঘৃতের শতকরা ১৮টি ঘিই এই দোষে দুষ্ট। এই

সকল ঘিয়ের acid value ১৯ পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে এবং বাজারে অবাধ চলছে, অথচ ভাল ঘিয়ের এসিড ভ্যালু ২·৫ অপেক্ষা বেশী হওয়ার কথা নয়।

ঘিয়ে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, তার জলীয় অংশ। যে ঘিয়ের জলীয় অংশ বেশী, তা কড়ায় কোন কিছু ভাজার কাজে জলে যাবে বা কমে যাবে বেশী। সে রকম ঘি দামে সস্তা হলেও, মোটের উপর সস্তা নয়। ভাল ঘিয়ের জলীয় অংশ (moisture content) ·৫ অপেক্ষা বেশী হবে না, অথচ বাজারে এরকম ঘি দুর্লভ। আবার এমন ঘিও আছে যার জলতি হয়ত বেশী যাবে না, অথচ অন্য প্রকার দোষে তার "ভিটামিন" খাদ্য প্রাণ নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ পছন্দ করে কড়াপাক, কেউ বা নরম পাক পছন্দ করে। উভয় পদ্ধতিতেই ঘিকে নিকৃষ্ট করে।

খাঁটি ঘিয়ের মান ভারতের ১১টা প্রদেশে এক নয়, এবং নির্দ্দিষ্ট মান অপেক্ষা কোথাও নিচু কোথাও বা উঁচু। এই সকল কারণে অনেক সময় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটা স্বাভাবিক।

ভারতের নানাস্থানে বিক্রেয় ঘির নমুনা দেখাও যে বিশেষ হয় না, তা' বলা বাহুল্য। ভারতে প্রায় ৮০০ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ১৪০টি ঘি প্রভৃতির শুদ্ধতা সম্বন্ধে আইন কানুন প্রবর্ত্তিত করেছেন। বাকী যারা করেন নি, এবং যে সকল গঞ্জ বা হাটবাজার বা দোকান মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে তাদের ত কথাই নেই।

কলিকাতা, বম্বে প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র মিউনিসিপ্যালটি বিশেষ খাদ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত করেছে। অন্যান্য স্থানে একজন মাত্র Head Sanitary Inspector থাকে, তারই উপর এই ভার। অন্যান্য কাজের ভার সেরে, কতটাই বা অবসর এ বিষয়ে দিতে পারা সম্ভব? তা ছাড়া রবিবার ও ছুটীর দিনে ও সন্ধ্যার পর মিউনিসিপ্যাল এলাকার দোকানদারেরও কোন আশঙ্কা নেই।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতের প্রধান সহর গুলিতে যেখানে সেখানে বিশেষ খাদ্য পরিদর্শক মোতায়েন আছে, দোকান পিছু সারা বছরে একটি ক'রে ঘিয়ের নমুনাও পরীক্ষা করা হয় না। এবং এর ভিতরেই প্রতি তিনটির মাঝে একটি ভেজাল ঘি পাওয়া গেছে (১৯৩৫-৩৬)। ভেজালের পরিমাণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে (১৯৩৪) নর্ম্মান রাইট সাহেবের সংগৃহীত রিপোর্টে শত করা ৭ হইতে ৬৫ ভাগ পাওয়া গেছে। বড় সহরগুলির অবস্থা আরও খারাপ। শতকরা ৫০ ভাগ ভেজাল ত অনেক সময়ই এবং শত করা ৭৫ ভাগ হতে ৮০ ভাগ ভেজাল (১৯৩৫-৩৬) বস্তুতে পূর্ণ থাকাও বিচিত্র নয়।

খাঁটি দুধ, খাঁটি মাখন, খাঁটি ঘি, খাঁটি মধু, খাঁটি তেল, খাঁটি আটা ও ময়দা পাওয়ার জন্য কত না চিন্তা আজ। কিন্তু অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতি তাঁর অসীম স্নেহের প্রাচুর্য্যে এ সকলই সম্ভব করেছেন। তাই আক্ষেপ হয়, সেই তপোভূমি ভারতের কেন এ অবস্থা, কেন সততার এত স্বল্পতা। যারা আজ বস্তুতান্ত্রিক বলে অভিহিত তাদের মধ্যে নিছক পরিশুদ্ধ ও ভেজাল হীন বস্তুর কদর ও প্রচলন অনেক বেশী। জাতির অগ্রগতি কি এই দিকে রুদ্ধ হয়েই থাকবে। উৎকৃষ্ট খাদ্য সকল স্থানেই সহজ লভ্য করার ব্যবস্থা কি আজও দেশে হবে না।

পয়সা দিয়ে ভাল জিনিষ সর্ব্বত্র পাওয়া যাবে না, এ কম দুঃখের কথা নয়। কিন্তু পয়সা কম দিয়েও ভাল জিনিষ চায়, এবং পায় না ব'লে মানুষের আক্ষেপ বড় কম নয়। যত লোক চায় খাটি জিনিষ, তার মধ্যে অনেক বেশী লোকই চায় সস্তা জিনিষ। খোলা টিন হতে ঘি কেনার একটি মোহ আছে। খোলা টিন থেকে জিনিষ নিলে দাম সব সময়ই একটু কম হয়। কিন্তু সব সময় হয়ত ঠিক জিনিষটি পাওয়া যায় না। ছোট ছোট টিনের প্যাকিংএর তাই বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং এই প্যাকিংএর অতিরিক্ত দামটা তাই গ্রাহককে দিতে শিখতে হবে, নচেৎ নিরাপত্তা নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বন্ধ টিন নেওয়ার সময়ও কিন্তু চোখ বুজে নিলে চলবে না। সকল বন্ধ জিনিষের শীলটা চিনতে হবে; এবং দেখে নিতে অভ্যাস করা দরকার। নচেৎ বন্ধ টিন জিনিষের কোন মানে থাকে না। অল্প আয়াসে বেশী উপায় করা—প্রতারণা ও জাল করার লোকের অভাব আজও হয় নি।

বাজারে শুদ্ধ ঘি যে কোনগুলি, তা সাধারণে জানতে পারলে অনেক সময় ভেজালের হাত থেকে বাঁচতে পারে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালের এগ্রিকালচারাল প্রডিউস্ (গ্রেডিং এণ্ড মার্কিং) একট্ অনুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধ ঘৃতের পরীক্ষা ও 'গ্রেড' নির্ণয় আরম্ভ হয়েছে। এই স্কীম অনুযায়ী, প্যাক ও শীল করার সময়ও ঘি গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষা সাপেক্ষ। যে সকল ঘৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ভারত গভর্ণমেণ্টের "এগমার্ক" (Agmark) শীল, সেই শুদ্ধ ঘৃতের টিনগুলিতেই পড়ে। এবং ঘৃত কোন্ 'গ্রেডের' শীলে সে পরিচয়ও থাকে। এই সকল ঘি কি পরিমাণ তাজা কেবল তাই নয়, কোন্‌টি ঘৃতের জলীয় অংশ হতে কতখানি মুক্ত, তাও জানা যায়। এর "খাদ্য প্রাণ" বজায় থাকে, কারণ এই সকল ঘৃত প্রস্তুতের সময় গভর্ণমেণ্ট হতে এর তাপও নির্দ্দিষ্ট করা আছে।

বাজারে সর্ব্বত্র ছোট ছোট টিনে, এই শীল করা ঘৃতের প্রচলন বিশেষ দরকার, কারণ কাটা ও খোলা টিনের ঘৃতে কেবল ভেজালের আশঙ্কাই থাকে না, নানারূপ ময়লার দ্বারা দূষিত হওয়ার আশঙ্কাও যথেষ্ট।

দেশে খাদ্যে ভেজালের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। "শ্রী" ঘৃত সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্টের গ্রেডেড ও শীল বদ্ধ টিনে বার হয়েছে। আশা করা যায় শুদ্ধ ঘৃত পাওয়া সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা দেশের অপরাপর ঘৃত প্রতিষ্ঠানও শীঘ্রই করবেন। কিন্তু অন্যান্য খাদ্য বস্তুর অবস্থা যে আজও শোচনীয়। যতদিন না ঘি, তেল, দুধ, আটা, ময়দা ও মধু প্রভৃতি খাদ্য সম্বন্ধে এইরূপ কোন উপায় ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয়, ততদিন দেশবাসীর উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা অতিশয় সঙ্কীর্ণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দানের মোহ

শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যতীর্থ, কাব্যনিধি, সাহিত্যশেখর

দ্বাদশীর মুষ্টিভিক্ষা মহা আয়োজন
অর্থপতি সদাচারী রত বিতরণ।
বালবৃদ্ধ কাঙালেরা ভিক্ষাপাত্র লয়ে
চলিয়াছে বিত্তহীন দলবদ্ধ হ'য়ে।
দ্বারদেশে রক্ত-আঁখি বৃত্তিভোগিগণ
প্রবেশের অনুমতি দেয় জনে জন।
হেনকালে অন্ধ মাতা শিশুকর ধরি
সর্ব্বজন সঙ্গ পিছে যায় অগ্রসরি।

ধর্মশীল পুণ্যকামী কৃপাসত্রকাজে
রুখি ওঠে দ্বারপাল মাতাপুত্র মাঝে।
শিশু বলে—'ছাড়ি দাও', জননী কাতর-
যুগপৎ নাহি গেলে কে ধরিবে কর?
প্রত্যাখ্যান কোলাহলে দানঘণ্টা থামে
ধনীর 'নিয়মসেবা' শৃঙ্খলা আরামে।

ছায়াপট

"বাণীনাথ"

দেশের মাটি

প্রযোজক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

পরিচালনা, চিত্রশিল্পী ও চিত্রনাট্যকার—নীতীন বসু

শব্দযন্ত্রী—মুকুল বসু

সম্পাদনা—সুবোধ মিত্র

সুরশিল্পী—পঙ্কজ মল্লিক

চরিত্রলিপি

অশোক—সায়গল

অজয়—দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জী

শশধর—ইন্দু মুখার্জ্জী

কুঞ্জ—কৃষ্ণচন্দ্র দে

যদু চক্রবর্ত্তী—অমর মল্লিক

অরুণা—চন্দ্রাবতী

গৌরী—উমা দেবী

রূপবাণীতে 'অভিনয়' মুক্তিলাভ করবার পরেই শারদীয়া পূজার আগে দর্শকদের বহু আকাঙ্খিত চিত্র নিউ থিয়েটার্সে'র নবতম নিবেদন 'দেশের মাটি' ১৭ই সেপ্টেম্বর একই সময়ে চিত্রা এবং নিউ সিনেমায় যুগপৎ মুক্তিলাভ করেছে। বহু অর্থব্যয়ে তোলা এবং নিউ থিয়েটার্সে'র নামজাদা নটনটীর সহযোগীতায় এই অনবদ্য চিত্রখানি তৈরী হ'য়েছে।

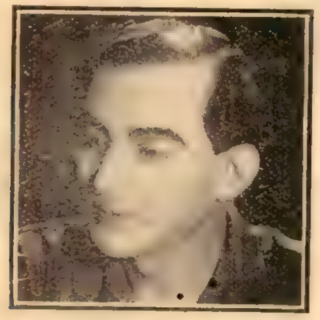

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের মাটি চিত্রের কাহিনী লিখেছেন চারজন কৃতবিদ্য কলাকুশলী। কোন ভাল ইংরাজী বা দেশী ছবিতে এত অধিক সিনারিও-লেখকদের এক সঙ্গে দল পাকাতে দেখা যায় না। চিত্রনোপযোগী ক'রে গল্পের কাঠামো তৈরী করতে কার কতখানি হাত ছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু চারজন 'গ্রহের' অভ্যুদয়ের ফলে ছবির গল্পের দিক দিয়ে যত রকম গলদ ও দোষ থাকতে পারে তা আলো ও অন্ধকারে প্রকাশ পেয়েছে রূপালীপর্দ্দায়।

সত্যিকার দর্শকদের অন্তরে পৌছিতে হ'লে লেখকদের কতখানি দরদ ও শিল্প প্রতিভা থাকা দরকার তা বোধহয় অনেক লেখকই জানেন না। বর্ত্তমানে এই অভাগা দেশে

পঙ্কজ মল্লিক

কথাসাহিত্যিকের ত অভাব নেই। ষ্টুডিয়োর পরিচালকরা যদি প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকদের সাহায্যে সিনেমা উপযোগী কাহিনী তৈরী ক'রে দর্শকদের উপহার দেন, তা' হলে চিত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে হয়ত বা একদিন চিত্র-সাহিত্যও শীর্ষস্থানে এসে পৌছিতে পারে।

দেশের মাটি চিত্রের উদ্দেশ্য মহৎ। কিছু নূতনত্ব দেখাবার চেষ্টা এতে করা হ'য়েছে। সেই এক ঘেয়ে সামাজিক ছবির ড্রইং রুমের দৃশ্য এবং নিছক বাজে প্রেম, এই সব অভিনয় দেখে আমরা সত্যিই হাঁফিয়ে উঠেছিলাম।

অমর মল্লিক

রুদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে এই সব ছবির অতি সাধারণ কাহিনী দেখার পর দেশের মাটির ন্যায় উন্নত, কলাময় চিত্র আনন্দ দান করলেও অতৃপ্ত চিত্তের তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ মেটাতে সক্ষম হয়নি। বাংলার পল্লীরাণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সুখ দুঃখ, তার অন্তরের গভীর পরিচয়টুকু চিত্রনাট্যের দোষে ক্যামেরার ঈগল চোখেও ধরা দেয়নি।

কৃষ্ণচন্দ্র দে

গল্পাংশ :—

অজয় আর অশোক দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। অজয় ধনী, পয়সা আছে, আর বাড়ীতে আছে এক সুন্দরী অবিবাহিতা ভগিনী অরুণা ও পিসতুতো ভাই শশধর। দুই বন্ধু স্থির করেছে বিলেত যাবে। কিন্তু সব আনন্দ শেষ মুহূর্ত্তে মাটি করে দিলে অশোক। সে অজয়কে জানাল—দূরের কোনও গ্রামে গিয়ে সে চাষের কাজ করবে এবং শেষ পর্য্যন্ত করলেও তাই। অশোকের সঙ্গী হ'য়ে গেল আরোও

অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী

তিনজন বন্ধু। একজন ডাক্তার, একজন উকীল, আর একজন ব্যবসাদার এবং শশধর। অশোক কৃষিকার্য্যকে প্রধান সম্বল করে পুরন্দরপুর গ্রামে এসে হাজির হ'লো। চাষ ত করবে, কিন্তু এদের জমি দেবে কে? গ্রামের মাতব্বর যদু চক্রবর্ত্তীর ভয়ে কেউ এদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে চাইল না। এরা এল অন্ধ কুঞ্জর কাছে। গাঁয়ের লোক কুঞ্জকে একঘরে করেছে কারণ সে তার বয়স্থা মেয়ে

গৌরীর এখনও বিয়ে দিতে পারে নি ব'লে। কুঞ্জ এদের জমি, লাঙ্গল ও গরু দিল। কিন্তু চাষ করতেও পয়সা লাগে। পাবে কোথায়? অশোক এলো কলকাতায় টাকার সন্ধানে। অজয় তখন বিলেতে চলে গেছে। তার সঙ্গে দেখা হ'লো না। অজয়ের বোন অরুণা টাকা দিতে চেয়েছিল কিন্তু অশোক নিলে না। অরুণা তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে অশোককে তার টাকা নিতেই হ'বে। শশধরের হাত দিয়ে অরুণা লুকিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিলে। শশধরকে টাকার কথা অশোককে বলতে নিষেধ করে দিলে। আজ তিনি সীমা পেরিয়ে গেছেন বলে। যদুর সঙ্গে বৃহত্তর যদুর পরিচয় হ'লো। এমন সময় বিলেত থেকে অজয় ফিরে এল। তার অভিপ্রায় ছিল অরুণার সঙ্গে অশোকের বিয়ে দেবে। কিন্তু অজয় ভীষণ মর্ম্মাহত হ'ল যখন সে জানল অশোক গৌরীকে ভালবাসে। এদিকে অনাবৃষ্টির জন্যে চাষ না হওয়ায় সমস্ত লোক আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য চিন্তিত। এমন সময় কলিয়ারী করবে বলে অজয় গ্রামে এলো তার প্রচুর অর্থ নিয়ে সমস্ত জমি কিনে নেবার জন্যে। গাঁয়ের লোক দলে দলে জমি বিক্রি করতে ছুটলো অজয়ের কাছে।

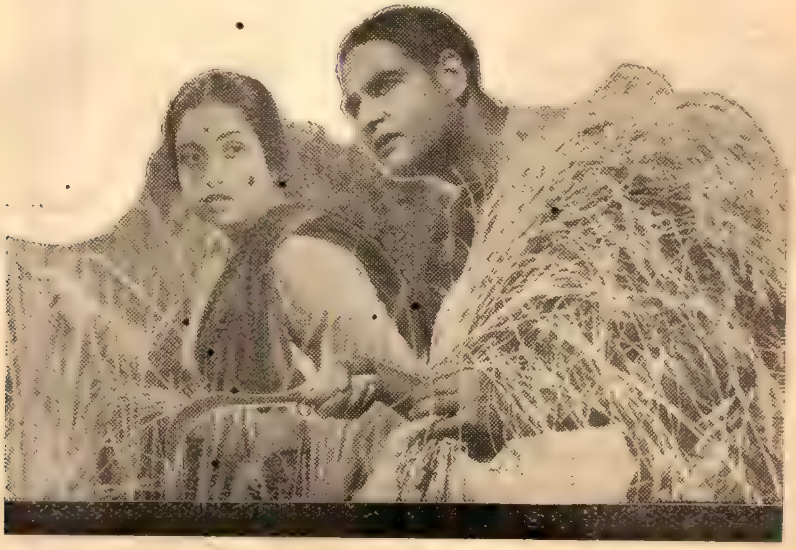

উমা দেবী ও সায়গল

কারণ অশোকের প্রতি অরুণার একটা দুর্ব্বলতা ছিল। সে মনে মনে অশোককে ভালবাসত কিন্তু অশোককে জানতে দিত না। অশোক জানে না কার পয়সায় মাঠে মাঠে ধান ভরে গেছে। অরুণার পয়সায় কলকাতা থেকে একদিন একটা প্রকাণ্ড ট্রাকটার কিনে এলো। গাঁয়ের লোকেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে অশোকের সঙ্গে দলে দলে যোগ-দিতে লাগলো। একদিন রাত্রে যদু চক্রবর্ত্তী এলেন এদের ধানক্ষেতে। উদ্দেশ্য সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিতে হবে। কিন্তু কাজে অগ্রসর হ'তেই যদু হঠাৎ বাধা পেলেন। বাধা পেয়ে তাঁর বিবেক আজ আর সুপ্ত থাকতে চাইলো না, কেন না অশোকও এলো, তবে টাকা ধার করতে। সেই মুহূর্ত্তে এলো বৃষ্টি—আকাশ অন্ধকার ক'রে। ধরণী শীতল হ'লো—আর ধরিত্রীর বুকে দুটী হৃদয় মিলিত হ'লো—অশোক আর গৌরী।

একজন নায়ক ও দুইজন নায়িকা লইয়াই দেশের মাটি গল্প তৈরী হয়েছে। সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে ছবির কলা-কৌশল উন্নতধরণের ও নিখুঁত হয়েছে। কিন্তু নাটকীয় রসের অভাবে গল্পটী তেমন জমে উঠেনি। গল্পের দোষে কয়েকটি climax scene অবান্তর বলে মনে হ'য়েছে এবং চিত্রের কাহিনী স্বচ্ছ ও সহজভাবে প্রবাহিত না হওয়ায়

স্থানে স্থানে খাপছাড়া হ'য়েছে। তারপর চিত্রের চরিত্রাঙ্কনগুলি পরিচালকের যথেষ্ট শিল্প প্রতিভার পরিচয় দেয়নি। যদু চক্রবর্ত্তী 'পল্লীসমাজের' বেণী ঘোষালের চেয়েও ধূর্ত্ত ব্যক্তি। গভীর রাত্রে যদু এলেন প্রতিশোধ নেবার জন্যে অশোকের ধানক্ষেতে, কিন্তু তাঁর বিবেক আর অচেতন হ'য়ে থাকতে রাজী হ'ল না। যদুর সঙ্গে বৃহত্তর যদুর পরিচয় হ'ল এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে নূতন "আলোর" সন্ধান দিতে জাপানী লণ্ঠন হাতে গৌরী এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে গৌরী ছাড়া বোধ হয় আর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কিন্তু ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে অজয়ের কলিয়ারী, এর ওপর গল্পের শেষ কাঠামো তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশে পুরন্দরপুরের মত গ্রাম হ'তে আজ পর্য্যন্ত কোন Geologist কয়লা তুলে কোন কলিয়ারীর সন্ধান দিতে পারেননি। আমরা জানতাম যেখানে কয়লার খনি থাকে সেখানে ধান চাষ হ'তে পারে না। তারপর বাংলার গ্রামের সেই

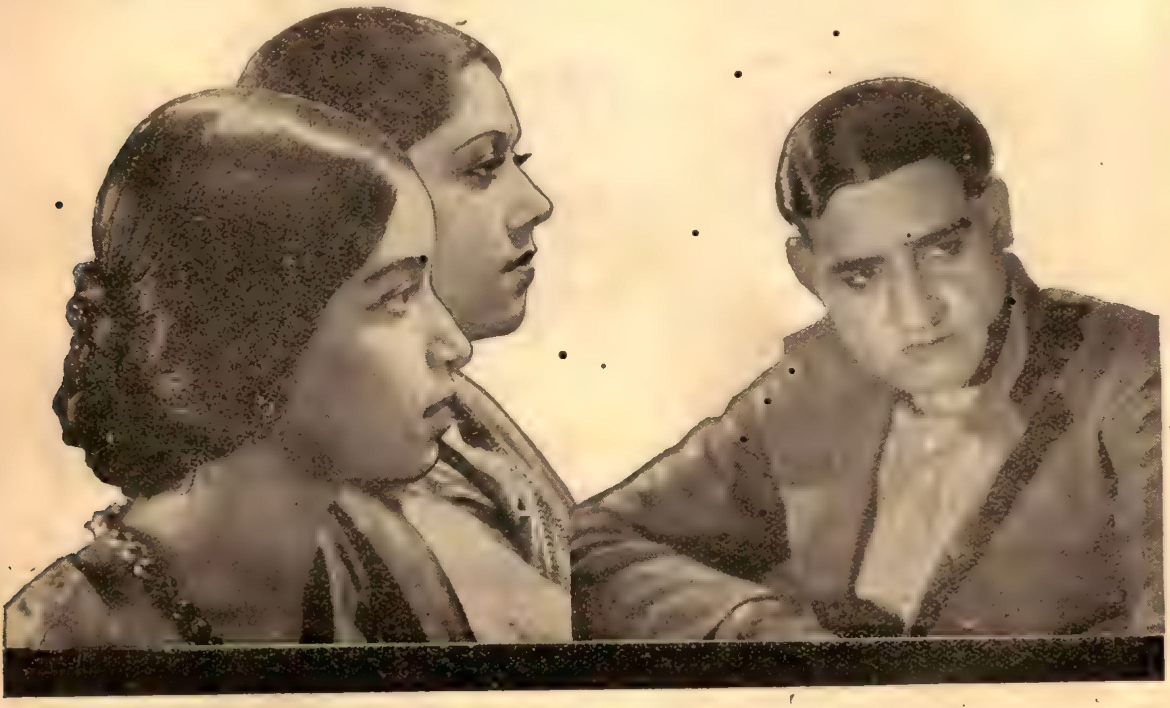

উমা দেবী, চন্দ্রাবতী ও সায়গল

গাঁয়ে কি গরু বলদ ছিল না যার সাহায্যে যদুর উদ্দেশ্য সফল হতে পারত? যদু চক্রবর্ত্তীর মত চরিত্র বিকাশের মুখেই নির্ব্বান লাভ করেছে। গৌরী গাঁয়ের মেয়ে, বয়স্থা, লজ্জা সরম আছে, কিন্তু অশোকের দলের সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচয় হ'তে শেষ পর্য্যন্ত কোনখানেই সহুরে মেয়ের কাছে সে হার মানেনি। গ্রাম্য ভাব আনবার জন্যে তার বিশ্রি চুলবাঁধা পর্দ্দার গায়ে উমাকে কুৎসিৎ করে তুলেছে। তারপর একই সময় দুই রকম চুলবাঁধা দেখান হ'য়েছে। পুরন্দরপুরের মুগ্ধকর পল্লী-সৌন্দর্য্য ক্যামেরার চোখে ধরা পড়েনি। ষ্টুডিয়োর মডেল করা ধানক্ষেতও সহুরের চোখকেও ফাঁকি দিতে পারে নি। এই অনবদ্য চিত্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে উন্নত টেকনিক, সুন্দর ফটোগ্রাফি ও শ্রুতিমধুর সঙ্গীত। এত সুন্দর ফটোগ্রাফি শুধু অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান নীতীন বসুর কাছ থেকেই আমরা আশা করতে পারি। পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় গানগুলি হ'য়েছে চিত্রের বিশিষ্ট সম্পদ। কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গানগুলি সন্নিবেশ করা হয় নি।

চন্দ্রাবতী, উমা দেবী ও দুর্গাদাস

সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে গৌরী, অরুণা, অজয়, শশধর কুঞ্জ প্রভৃতি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। উমা দেবী গৌরীর ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। তাঁর গাওয়া গানগুলি শ্রুতিমধুর হ'য়েছে। অশোকের প্রতি ভালবাসা এবং শেষ পরিণাম অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। অজয় বেশে দুর্গাদাস তাঁর পূর্ব্ব সুনামকে বজায় রেখেছেন। ছবিতে তাঁকে পেয়েছি আমরা সবচেয়ে কম। চিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণহীন অভিনয় করে সায়গল প্রশংসালাতে বঞ্চিত হয়েছেন। ভাষার প্রতি অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি রাখায়

সায়গলের অভিনয়ে অশোকের ব্যক্তিত্ব যে খুঁজে পাওয়া যায় না এ আর আশ্চর্য্য কি! সায়গলের গানগুলি চমৎকার কিন্তু ছবির অশোক বাউল গায়ক নন—অশোক কর্ম্মী, নায়ক ও বক্তা। কুঞ্জ হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্র দে ভালই অভিনয় করেছেন। যদু চক্রবর্ত্তী বেশে অমর মল্লিক সুবিধা করতে পারেন নি। কারণ চরিত্রাঙ্কনে দোষ থাকতে যদুর শেষের দৃশ্যগুলি হাস্যস্পদ হ'য়ে উঠেছে। অশোকের তিনজন বন্ধু অশোকের ছায়া হিসেবে মন্দ করেন নি। ভানু ব্যানার্জ্জী, শ্যাম লাহা ও পঙ্কজ মল্লিক সমস্ত চিত্র জুড়ে

ডিরেক্টার নীতীন বসু

আছেন এবং অভিনয় ছাড়া মাঝে মাঝে হেসেছেন, হাত নেড়েছেন এবং দু'এক টুকুরো লাইন মনের দুঃখে গেয়েছেন। এমন কি পঙ্কজ মল্লিকের নিজের গানও অন্যান্য গানগুলিকে বিদ্রূপ করেছে। নায়েব বেশে টোনা রায় ও ষষ্ঠীচরণ রূপে অহি সান্যাল মন্দ অভিনয় করেন নি। সবচেয়ে হাসির খোরাক যুগিয়েছেন শশধর বেশে ইন্দু মুখার্জ্জী। তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট নট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছবির শব্দযন্ত্রীর কাজ ও সম্পাদনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশের মাটি নব আদর্শের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে মেনে না নিলেও ভারতীয় চিত্র নির্ম্মাতাদের মধ্যে নিউ থিয়েটার্স ই প্রথম সরল দেশকল্যাণকর ছবি নির্ম্মান করে আনন্দ বিতরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। সকলের সঙ্গে বসে ছবিখানি উপভোগ করবার মত হয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচবার যে অন্য পথ আছে—দেশের কথা—যাদের আমরা একরকম ভুলতে বসেছি তাকেই নূতন বেশে ও রসে অভিজ্ঞ শিল্পী নীতীন বসু দেখিয়েছেন। পরিশেষে একটী কথা বলতে চাই যে, নিউ থিয়েটার্সের অভিনব প্রচার বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের উন্নত ধরণের পাবলিসিটি সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য হয়েছে।

ষ্টুডিয়ো সংবাদঃ

নিউ থিয়েটার্স

ষ্ট্রীট সিঙ্গার (সাথী)—

ফণী মজুমদার পরিচালিত 'সাথী' নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে ব'লে জানা গিয়েছে। সুস্থ আমোদ উপকরণ ও আবেগময় সমস্ত উপাদান লইয়া পরিচালক মহাশয় বইখানিকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। অতি উপভোগ্য এই ছবিখানির অন্য আকর্ষণ ছেড়ে দিলেও সায়গল ও কাননের নৃত্যগীত ও অভিনয় দেখে দর্শকগণ আনন্দ পাবেন। তরুণ পরিচালক তাঁর গুরু প্রমথেশ বড়ুয়ার মত প্রথম বই তুলিয়া হঠাৎ বিখ্যাত হ'য়ে পড়লে আমরা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ব না। এই ছবির পরে ফণী মজুমদার এক মুহূর্ত্তও বসে নেই। হয়ত সাথী চিত্র মুক্তিলাভের আগেই তাঁর পরবর্ত্তী হিন্দী ছবি 'কপালকুণ্ডলার' সুটিং আরম্ভ হ'বে। এই কপালকুণ্ডলার প্রতি মিঃ সরকারের একটা দুর্ব্বলতা আছে। বাংলা কপালকুণ্ডলা প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় তোলা হ'য়েছিল; কিন্তু এতদিন নিউ থিয়েটার্সের কোন পরিচালক এর হিন্দী সংস্করণ তুলতে সাহস করেন নি। এতদিন পরে মিষ্টার সরকারের আশা পূর্ণ হ'ল। হিন্দী দর্শকদের কাছে এই ছবির কতটা আদর হবে তা বলা শক্ত। তবে পরি-

এ্যান্ সদার্ণ—আর, কে, ও রেডিও

চালনার গুণে এই কপালকুণ্ডলাই যে চিত্রজগতে চাঞ্চল্য আনবে না কে বলতে পারে। পাত্র-পাত্রী, প্রায় একরকম নির্ব্বাচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় নাবছেন—লীলা দেশাই—কপালকুণ্ডলা, নাজাম হোসেন—নবকুমার, জগদীশ—কাপালিক এবং কমলেশকুমারী—মতিবিবি।

তুসমন—নীতিন বসুর পরিচালনায় হিন্দী ছবি তুসমনের সুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাঝে কয়েক দিন নীতীন বাবু অসুস্থ থাকায় সুটিং বন্ধ ছিল। নিউ থিয়েটার্সের নামজাদা সব আর্টিষ্টরা এই চিত্রে অভিনয় করছেন। সায়গল, নাজাম, পৃথ্বীরাজ, জগদীশ, লীনা দেশাই

গডন হেকার—আর, কে, ও রেডিও

সাথী চিত্রের আলোকশিল্পী দীলিপ গুপ্ত এবং শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু কপালকুণ্ডলায় উক্ত দুই বিভাগে কাজ করবেন।

ও নেমো অর্থাৎ এ ছাড়া আর কোন ভাল আর্টিষ্টই নেই যারা ছোটখাট কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন না।

বড়দিদি—অমর মল্লিকের পরিচালনায় বড়দিদি ছবির

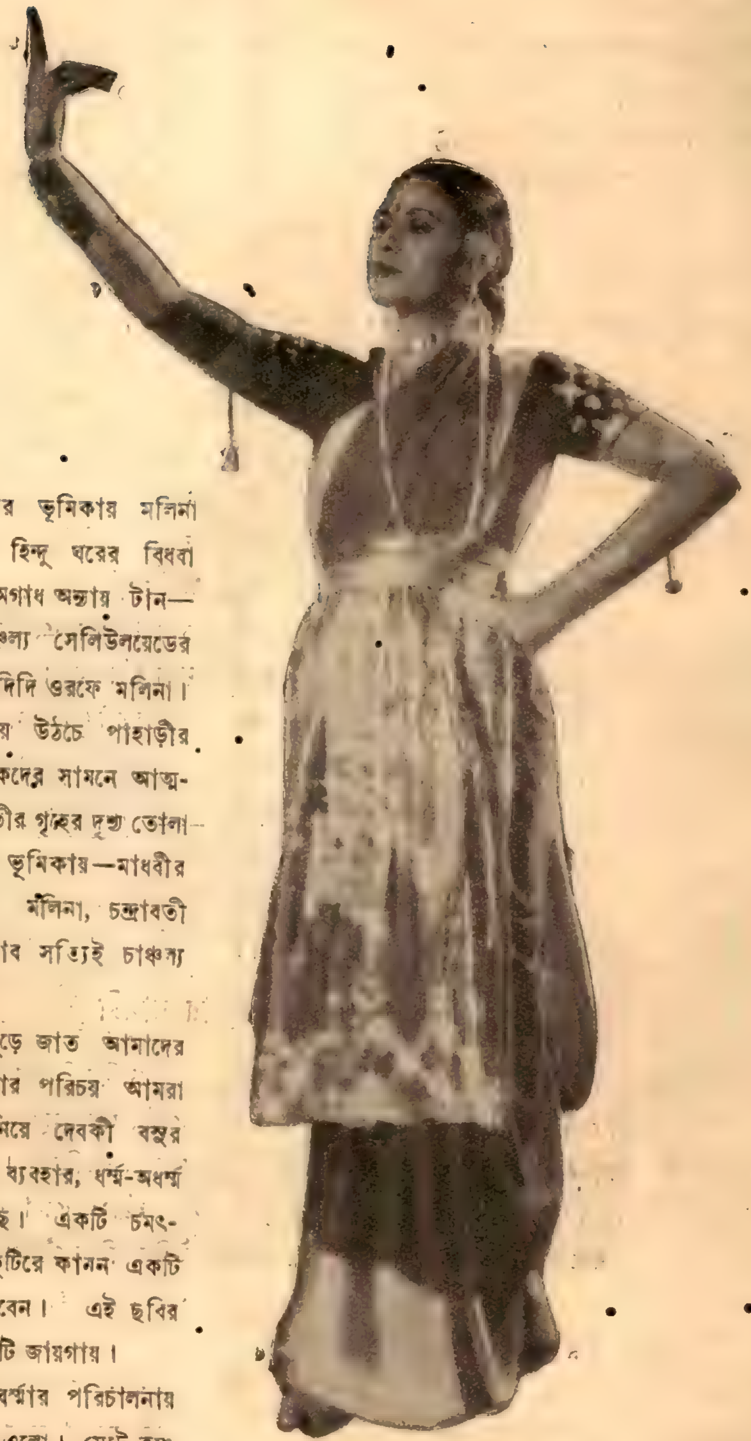

দ্রৌপদী নৃত্যে সাধনা বোস

প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বড়দিদির ভূমিকায় মলিনা অভিনয় ভালই করছেন। একদিকে হিন্দু ঘরের বিধবা অন্যদিকে সুরেন্দ্রের প্রতি তাঁর একটা অগাধ অন্যায় টান—এই দোটানায় পড়ে তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য সেলিউলয়েডের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে রূপ দিচ্ছেন বড়দিদি ওরফে মলিনা। সুরেন্দ্র চরিত্রও বেশ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠচে পাহাড়ীর অভিনয় গুণে। শান্তির ভূমিকায় দর্শকদের সামনে আত্ম-প্রকাশ করবেন চন্দ্রাবতী। এখন চন্দ্রাবতীর গৃহের দৃশ্য তোলা হচ্ছে। চন্দ্রাবতীর চেয়েও ঢের ক্ষুদ্র ভূমিকায়—মাধবীর বন্ধু হিসেবে হঠাৎ দেখা দেবেন মেনকা। মলিনা, চন্দ্রাবতী ও মেনকা এক সঙ্গে তিন জনের আবির্ভাব সত্যিই চাঞ্চল্য এনেছে।

সাপুড়ে—বহু যুগ থেকে এই সাপুড়ে জাত আমাদের দেশে বাস কর্চ্ছে। কিন্তু এদের সত্যকার পরিচয় আমরা খুব অল্পই জানি। এই মানুষগুলোকে নিয়ে দেবকী বসুর নূতন ছবি তৈরী হ'বে। এদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম জ্ঞান অতি বিচিত্র ভাবে চিত্রে রূপ নিচ্ছে। একটি চমৎ-কার সেটে সাপুড়েদের ওস্তাদ জহরের কুটিরে কানন একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ভূমিকায় দেখা দেবেন। এই ছবির বহির্দৃশ্য তোলা হবে গিরিডির কাছে একটি জায়গায়।

রাধা ফিল্ম কোম্পানি—ফণী বর্ম্মার পরিচালনায় **জনকনন্দিনী** চিত্রখানি প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। সেটে কৃষ্ণ হরধর্নু ভঙ্গ করে সুশীল রায় রাম বেশে মিস্ সাবিত্রী অর্থাৎ

সীতাকে বিবাহ করলেন। এই সেটে নর্ত্তকীদের নাচ গান ছাড়া জনকনন্দিনীর বহির্দৃশ্যের কাজও প্রায় ফুরিয়ে এলো। বিভিন্ন ভূমিকায় নেবেছেন ; রাম—সুশীল রায়, রাজা জনক—তুলসী লাহিড়ী, সীতা—সাবিত্রী, বিশ্বামিত্র—অহীন্দ্র চৌধুরী, অহল্যা—উমাতারা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স :—

যখের ধন—হেমেন রায় লিখিত যখের ধন বইখানির চিত্র সংস্করণ প্রায় শেষ হয়ে এলো। হরি ভঞ্জ চিত্রের জন্যে কাহিনীর বহু অদলবদল করেছেন। এঁরা শীঘ্রই আসামে যাচ্ছেন বহির্দৃশ্যের সুটিংগুলি শেষ করতে।

শ্রী ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স :—

পরশমণি—প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় বাংলা চিত্র পরশমণির কাজ কিছুদিন হ'ল আরম্ভ হয়েছে। ভারতলক্ষ্মীর কাছে সব চেয়ে সুখবর হচ্ছে যে, সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জি এই চিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম দিন হতে দুর্গাদাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এতদিন পরে ছিন্ন হ'লো। পরশমণির চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় দুর্গাদাস, ধীরাজ, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি অভিনেতা আত্মপ্রকাশ করবেন। বেশীর ভাগ আর্টিষ্টই বাংলার রঙ্গালয় হতে আনা হয়েছে বেশ বোঝা যায়। সেটের ভার পেয়েছেন নামজাদা চিত্রশিল্পী সুধাংশু চৌধুরী।

অভিনয়—মধু বসু পরিচালিত অভিনয় দর্শকদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রযোজক বাবুলাল চোখানি এই উৎকৃষ্ট ছবিটি তুলে বেশ লাভবান হয়েছেন তা রূপবাণী চিত্রগৃহে দর্শকদের ভীড় দেখলেই বোঝা যায়। এ বছরের একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে অভিনয় স্থান পাবে সন্দেহ নাই। আমরা মধু বোস ও মিসেস্ সাধনা বোসের কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ফাষ্ট এম্পায়ারে নৃত্যানুষ্ঠান—মধু-বোসের পরিচালনায় সি, এ, পি দলের কয়েক দিন উক্ত থিয়েটারে নৃত্যানুষ্ঠান হল। সব কয়টি নৃত্যই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী ও সাধনা বোস অশেষ প্রশংসা পেয়েছেন।

বাণীনাথ

পরাজয়

শ্রীসরোজকুমার বাগচী

সবাই বলে আমার পরাজয় হয়েছে।

সেদিন বিকেল বেলা বাদাম গাছটার ঝুলে-পড়া ক'টা পাতার ফাঁক থেকে একটা শালিকের ছোট বাচ্ছা তার বাসার বাইরে কুচকুচে কালো দু'টো চোখ বের ক'রে ভুরুটা একটু কুঁচকে যা বলতে চাইলো, তার মানে "তোমার পরাজয়।"

আমার কিন্তু ভারী হাসি পায়, ভাবি, পরাজয়টা কিসের ?

পরাজয়ের কাহিনীটা আপনাদের একটু বলি, আপনারাই বিচার করুন!

সেদিন বিকেল বেলা ছিলাম পড়ার ঘরে বসে, শক্ত একটা অঙ্ক কস্‌তে না পেরে অজ্ঞতাজনিত একটা অবসাদ অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ এলো ঘরের মধ্যে দমকা একচোট বাতাস। উড়িয়ে নিয়ে গেলো ছিটিয়ে পড়ে থাকা খোলা ফুলস্‌কেপের কাগজগুলো এদিকে ওদিকে। মনের মধ্যে কেমন ওলটপালট হয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এলাম বাগানে। পশ্চিম-গগনে সূর্য্য তখন ডুব্‌বো ডুব্‌বো করছে। যতদূর দৃষ্টি যায় পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ চারিদিক আলোপড়া চক্‌চকে ধুলোয় একাকার।

বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণে গন্ধরাজ-কুঞ্জ আর হল্‌দে গোলাপের ঝাড়ের মধ্যে বাতাস ম্লান রবিরশ্মিগুলোকে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে ছোট ছেলের মতো আকুলি-বিকুলি নৃত্যে মেতে পড়েছে। অদূরে বাগানের রক্ষিত পাখীগুলো তাদের বদ্ধ গৃহের জাল দেওয়া জান্‌লা দিয়ে লম্বা ঠোঁট বের করে চীৎকার করছে বাইরের সৌন্দর্য্য দেখে।

আকাশে দেখি রংয়ের খেলা—বুড়ো সূর্য্যের মরবার আগে ভীমরতি,—রঙীন মদ খেয়ে আর ছিটিয়ে শেষ মাতলামি সুরু করেছে।

সেই সময়ে দেখা তার সাথে,—যাকে ভালোবেসেছিলাম —যার কাছে ওরা বলে আমার পরাজয়। সে একটুকরো মেঘ,—পিঙ্গল, রুক্ষ, রুদ্র ও অনাদৃত। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া কোথা থেকে তাকে যেন নিয়ে এলো মাঝ আকাশে। বর্ণে এলিয়ে পড়া আকাশের মধ্যে তখন তার রুদ্র-রংটা বড় ভালো লেগেছিল। মেঘকে ভালো বাসলাম গভীর ভাবে।

বাগানে পুষ্করণীর ধারে আমার প্রিয় জায়গাটায় বসে-ছিলাম। সামনে জল, সেই পিঙ্গল মেঘটার প্রতিবিম্ব বাতাসে দুলে মাঝে মাঝে ছিন্ন-ভিন্ন হচ্ছে, আবার বাতাস সুস্থির হোলে সে সুস্পষ্ট অবয়ব লাভ করছে।

মেঘকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভালোবাসো আমাকে?'

উত্তর এলো—আমরা বিংশ শতাব্দীর মেঘ, ভালোবাসা সম্বন্ধে সুস্থির কিছুই বলতে পারি না। 'ফ্রয়েড'কে দিয়ে আমার মনে তোমার সম্বন্ধে যে ভাব হচ্ছে তার একটা 'এ্যানালিসিস' করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

বললাম—কিন্তু তোমাকে আমি ভাল বেসেছি। তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে? অন্তরের আকুলতা, এর কোন দামই কী তোমরা দাও না? ঘড়ির 'বব্' এর মত তোমাদের ঐ সন্দেহদুষিত মনের ওপর কারুর ভালবাসাই কী রেখাপাত করে না?

মেঘ বললে—ভালোবাসা মানে—আজকাল আমরা যতোটা বুঝি—শুধু ছেলেমানুষী। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ওকথাটার যে অর্থই দিয়ে থাকুন না কেন, ওকথাটার কোন গূঢ় অর্থ নেই।

তবুও বললাম, একটু জোরের সঙ্গেই যেন—'তোমাকে ভাল যদি বেসেই থাকি, আমার পরাজয় কখনো হবে না।'

হঠাৎ দেখি আর এক পশলা দমকা হাওয়া এলো, পিঙ্গল মেঘ কৌতুকে একটু হেসে তার সব ঔদ্ধত্য নিয়ে উড়ে গেল।

পুষ্করণীর জলে গাঢ় কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। সন্ধ্যার একতারাতে বেজে উঠলো ঘর ছাড়ানো উদাস বাউল সুর। অন্ধকার আকাশের তলে আমি, পায়ের কাছে নীচে কালো জল। কালো বাতাস সান্ত্বনা দিয়ে কানে কানে বলে গেল, —"বন্ধু, কিসের দুঃখ? ওরা ঐ রকমই—সব নিতে জানে, দিতে জানে না। ওদের ভেতরটা ফাঁকা, সেখানে অন্তর ব'লে কিছুই নেই, শুধু জলবুদ্‌বুদে ভর্ত্তি। ওরা একদেশ থেকে আর একদেশে ঘোরে আর ঠকিয়ে বেড়ায় লোককে, ওদের মধ্যে সত্যি শুধু শোষণ প্রবৃত্তিটুকু,—যেখানে যা সুশীতল তাই ওরা শোষণ করে। বিজ্ঞানপাঠেই ত' পড়েছ—নিজেদের ভার পর্য্যন্ত সইবার ক্ষমতা এদের যখন থাকে না, পৃথিবীর বুকে ওরা এলিয়ে পড়ে—তবুও, তবুও ভালোবাসেনা, ক্ষণেকের তরে সেখানে থাকে, থাকবার ভাড়াটা আবার আদায় করে নেয়,—তা'রি নদী, সাগর, মহাসাগর থেকে,—তারপর যেখানে খুসি চলে যায়। ছিঃ এদের জন্য তুমি আবার দুঃখ করো,—এতো স্বার্থপর নিরেট কদর্য্য মন যাদের।"

মেঘকে আমি ভালোবেসেছি সত্যি। এবং এও সত্যি সে আমাকে ভালোবাসেনি। কিন্তু আমার হাসি পায়, যখন 'আলো' বলে আমারই পরাজয় হয়েছে, চারিদিক যখন হাততালি দিয়ে ওঠে। পরাজয় যদি কিছু হয়ে থাকে সে ত মেঘেরি। ভালোবেসেছি আমি, সে ভালবাসা অনুভব করার মত ক্ষমতা যদি তার না থাকে ত' সেটা তারি দৈন্য, তারি স্থূলত্ব প্রমাণ করে দেয়। ঐ যে উন্নত মেঘ উড়ে যায়, আজকের বাইরের ঔদ্ধত্য একদিন ওকে আঘাত করবেই, সেদিন ও বুঝবে যে একজনের ভালো-বাসাকে অন্ততঃ ও অবহেলা করেছিল। সেদিন আসবে অনুতাপ, চমকাবে বিদ্যুৎ ওর বুকে। তখন গলবে পাথর, টলবে ওর উদ্ধত মন্ত্র। ভালোবাসার অপমানের প্রতিশোধ ভালোবাসা দিতে জানে।

তাই যেদিন সকলেই বল্‌লো আমার পরাজয় হয়েছে, ভারী হাসি পেল আমার। বাদাম গাছে শালিকের বাচ্চাটাও যেদিন বল্লে 'তোমার পরাজয়', ক্রোধে সেদিন ওর নিপাত-গমন কামনা করিনি, করুণায় একটু হেসেছিলাম মাত্র।

এখন আপনারা বিচার করুন পরাজয়টা কার?

শ্রীসরোজকুমার বাগচি

শ্রীসুশীলকুমার বসু

দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি—

উড়িষ্যার ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ঢেনকানাল সমগ্র রাজনীতিক ভারতবর্ষের আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু ঢেনকানাল নহে, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, রাজকট, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি একের পর আর দেশীয় রাজ্যগুলিতে ঘটনার যে দ্রুত আবর্ত্তন চলিতেছে, একদিকে যে ভাবে গণ-আন্দোলন গণসংগ্রামের আকার গ্রহণ করিতেছে এবং অন্যদিকে স্বৈরাচার ও দমননীতি যে ভাবে উগ্র ও বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্বের কথা আমাদের নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। হরিপুরায় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের অকর্ম্মণ্যতার কথা বলিয়াছিলেন এবং হরিপুরায় গৃহীত নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু, আজ তাঁহাদের বলিবার কি আছে? আজও যে কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের গণসংগ্রাম সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন রহিয়াছেন তাহার উত্তরে তাঁহারা কি বলিবেন? রাজন্যবর্গের প্রতি তাঁহাদের এই দুর্ব্বলতার মূল কোথায়?

বিদুরাশ্বথমে গুলিবর্ষণ সম্পর্কে মহীশূরে যাইয়া সর্দ্দার প্যাটেল সেখানকার জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই কংগ্রেসের এই মনোভাবের কারণ কতকটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন: ব্রিটীস ভারত ও দেশীয় ভারতের অবস্থা সমান নহে—ব্রিটীস ভারতে আমরা জাতীয় পতাকার সম্মানের ও ইউনিয়ন জ্যাকের স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি—ব্রিটীস ভারতে আমাদের ন্যায় আপনারা মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই সেজন্য মহীশূর রাজ্যের পতাকার প্রতি আপনাদের আনুগত্যের ঋণ আছে।

অর্থাৎ কংগ্রেসের সর্দ্দারপন্থী নেতৃবৃন্দ মনে করিয়া থাকেন যে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধেই কংগ্রেসের সংগ্রাম—নৃপতিবৃন্দ যখন আমাদের দেশের লোক তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করা যুক্তিসঙ্গত নহে এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনার দ্বারা এই সকল রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইঁহারা প্রজাদের উপর সহানুভূতি সম্পন্ন হইলেও এবং তাঁহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকার করিলেও, জনসাধারণ যে এই সকল অধিকার লাভের নিমিত্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, স্পষ্টতঃ তাঁহারা ইহার বিরোধী। রাজন্যদের সম্পর্কে ইঁহাদের এই দুর্ব্বলতাই ব্রিটীস ও দেশীয় ভারত নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতের গণআন্দোলনকে কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রিত করিবার পথে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অন্তরায় হইয়াছে।

একদিন ছিল যখন আমাদের স্বাধীনতার ধারণা অস্পষ্ট ছিল; যাহা কিছু দেশী তাহাকেই আমরা ভাল মনে করিতাম। জনসাধারণ সেদিন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল না। দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে আমাদের মনে গৌরবভাব ছিল—অনেকে এতদূর পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তাঁহারাই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইবেন এবং প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহায্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন

করিবে। কিন্তু, আমাদের রাজনীতিক ধারণা বর্ত্তমানে এতটা অস্পষ্ট ও পশ্চাদ্বর্ত্তী নাই। আজ আমরা দেশ বলিতে দেশের জনসাধারণকে বুঝিতেছি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং দাসত্ব হইতে তাঁহাদের মুক্তি চাহিতেছি, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব চাহিতেছি, তাঁহাদের স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ মনে করিতেছি এবং এই আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। জনগণের স্বার্থ ও অধিকারের যাঁহারা শত্রু, স্বদেশী হোন, বিদেশী হোন, তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শত্রু এবং এদেশে ব্রিটীশ প্রভুত্বের প্রধান নির্ভর।

কিন্তু, এই স্বার্থের সংঘর্ষের কথা বাদই দেওয়া যাক। ধরিয়া লওয়া যাক যে মাত্র ব্রিটীস প্রভুত্বের বিরুদ্ধেই কংগ্রেসের সংগ্রাম এবং ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর মুক্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য (এ কথা সর্দ্দারজীও অস্বীকার করেন না)। ৩৫ কোটি নরনারীর মুক্তি যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয় তবে দেশীয় রাজ্যের ৮ কোটি নরনারী সেই সংগ্রামে বিরত থাকিবেন কেন? যদি তাঁহাদিগকে সেই সংগ্রামে যোগদান করিতে হয় তবে তাঁহাদের পক্ষে ব্রিটীস ভারতে আসিয়া তাহা করা সম্ভব হইবে না। নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যেই তাহা করিতে হইবে। সেখানে কাহার সহিত তাঁহারা সেই সংগ্রাম করিবেন—কাহারা সেখানে ব্রিটীস সরকার এবং ব্রিটীস প্রভুত্বের প্রতিনিধি? নিঃসংশয়ে দেশীয় রাজ্যের রাজারা এবং তাঁহাদের শাসনতন্ত্রগুলি। ইঁহাদের সহিত যদি প্রজাদের সংগ্রাম করিতে হয় তবে তাহা মূলতঃ ব্রিটীস প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রিটীস সরকারের বেতনভুক দেশীয় লোকদের মুখামুখি আমাদের দাঁড়াইতে হয় বলিয়া তাহাকে দেশীয় লোকদের পরস্পরের মধ্যের বিরোধ বলিয়া যেমন আমরা অভিহিত করিতে পারি না, তেমনই প্রজাবৃন্দের সহিত সংঘর্ষে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ যে ব্রিটীস সরকারের প্রতিনিধিরূপে এবং ব্রিটীস প্রভুত্বের সহায়করূপে কাজ করিয়া থাকেন সে কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কাজেই, জাতীয় মহাসভা যদি এই সংঘর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন তাহা হইলে, গণশক্তি দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে এবং কংগ্রেস তাহার সংগ্রামের পূর্ণশক্তিকে সংহত ভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

দেশীয় রাজ্যগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং যদিও যুগপৎ বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তির বিরোধ চলিতেছে এবং বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই সকল বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে তবুও, এই সকল সংঘর্ষের মূল প্রেরণা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে মূল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান এবং সেই ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে ব্রিটীসের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ। ব্রিটীস শাসনের উচ্ছেদই যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয় তবে কোন্ যুক্তির বলে কংগ্রেস এই সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে পারেন? কংগ্রেস এই সকল সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ না করায়—মূলতঃ এক ও অবিচ্ছিন্ন রাজ্যের গণশক্তি বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে—ব্রিটীস ভারতের গণশক্তিও তাহার সম্ভাবিত শক্তিলাভে বঞ্চিত হইতেছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রিটীস সাম্রাজ্য বিস্তারের গোড়ার দিকের অনিশ্চিত নীতির ফলেই দেশীয় রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাকে একটা ঐতিহাসিক আকস্মিকতা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি, ভৌগোলিক বা অর্থনীতির সীমা কোন দিক দিয়াই ব্রিটীস ভারত ও দেশীয় ভারতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ভারতের গণশক্তিকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে এই ঐতিহাসিক আকস্মিকতাকে স্থায়ী করিয়া ভারতকে স্থায়ী ভাবে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। কাজেই দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি ও মনোভাবের পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের কথা যদি আমরা বিবেচনা নাও করি, তবুও কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি তাহার লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্যহীন। ব্রিটীস সরকার এদেশে স্থায়িত্বের জন্য কিসের উপর নির্ভর করিতেছেন এই প্রসঙ্গে তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকদের সাহায্যেই আত্মরক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে

আবার দেশীয় নৃপতিবৃন্দই প্রধান। ইঁহাদের সাহায্যে ব্রিটীস সরকার যে শুধু আমাদের জনশক্তির এক চতুর্থাংশকে জাতীয় সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে, ফেডারেশান পরিকল্পনায় প্রায় অর্দ্ধ ভারতের শোষণপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল নৃপতিবৃন্দকে বাধাস্বরূপ আমাদের অগ্রগতির পথে স্থাপন করা হইয়াছে। কাজেই ব্রিটীস সরকারের সহিত যদি কংগ্রেস সংগ্রাম করেন তবে ব্রিটীস শক্তির প্রধান স্তম্ভকে তাঁহারা অক্ষত রাখিতে পারেন না। যদি নৃপতিদের সহিত তাঁহাদের বোঝাপড়া করিতে হয় তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সাহায্যেই তাহা করিতে হইবে। ব্রিটীস শক্তির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা নিতান্তই অর্থহীন, অযৌক্তিক এবং স্ববিরোধী নীতি।

হিন্দু সমাজে অন্তর্বিবাহ

হিন্দু সমাজের বিবাহবিধির কঠোরতা অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর রক্তমিশ্রনের ফল ভাল কি মন্দ হইবে এই বৈজ্ঞানিক বিতর্কের সীমার মধ্যে পড়ে না। জাতিতে (race), জীবনযাত্রায়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে, শিক্ষা দীক্ষায় যাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই এবং যাঁহাদের মধ্যে বিবাহের ফলে শাঙ্কর্য্যজনিত কোনও কুফলের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা (যদি শাঙ্কর্য্য অবনতির কারণও হইত) নাই, হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরে সমপর্য্যায়ের এমন লোকেরা বৈবাহিক সম্পর্কহীন নানাজাতিতে বিভক্ত। জাতির (cast)—অনেক সময় আবার ইহার অন্তর্ভুক্ত উপবিভাগের,—বাহিরে বিবাহাদি হইতে পারে না। ইহার জন্য সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু সমাজের বৈবাহিক মণ্ডলীগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র—অনেক ক্ষেত্রে নিকট রক্ত সম্বন্ধের মধ্যেও বৈবাহিক সম্পর্ক এড়াইবার উপায় নাই। সাধারণতঃ নবশাখ প্রভৃতি শ্রেণীগুলির মধ্যে সংকীর্ণ বৈবাহিক প্রথার কুফল খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। কৃষক শ্রেণীগুলির অথবা তথাকথিত বর্ণ হিন্দুদের অনেক পরিবারকে একস্থানে (এক বা পাশাপাশি গ্রামে) বাস করিতে দেখা যায়। কিন্তু, কথিত শ্রেণীগুলি ব্যবসায়ী অথবা শ্রমশিল্পী বলিয়া প্রতিযোগিতা এড়াইবার জন্য একস্থানে অধিক লোক বাস করেন না এবং খুব বেশী দূরে যাওয়ার অভ্যাস না থাকায় ইঁহাদের বিবাহগুলি ৫।৭ টি গ্রাম, অর্থাৎ ৫০।৬০টি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। এইরূপ নিকট রক্ত সম্বন্ধের প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর, বংশ বৃদ্ধির উপর, উদ্যমশীলতার উপর, জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যের উপর ভাল হয় নাই। কোনও শ্রেণীর হিন্দুর উপরই হয় নাই।

সকল শ্রেণীর মধ্যেই তুলনায় পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা কম। যে সকল শ্রেণীর বৈবাহিক বেষ্টনীগুলি অপেক্ষাকৃত বড় তাঁহাদের মধ্যে সহসা এই অসমতা ধরা পড়ে না। কিন্তু ক্ষুদ্র গণ্ডীগুলির মধ্যে কন্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং কন্যাপণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কন্যার চাহিদা বেশী হওয়ায় অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ হইয়া যায় এবং অধিক বয়স না হইলে পুরুষের বিবাহ হইতে পারে না। এই প্রকার অসমবয়স্কদের বিবাহের ফল ভাল না হইবার কথা। তদুপরি, ইহাতে বালবিধবার সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং বিধবা-বিবাহ সুপ্রচলিত না থাকায় তাহাও জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটায়। অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হইলে এই সকল সমস্যার অতি সহজ সমাধান হইয়া যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আজকাল দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে সে জন্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পরস্পর মিশিবার প্রয়োজন ও সুযোগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার ফলে সমপর্য্যায়ের, সমশিক্ষাদীক্ষা বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হওয়া অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক হইবে। বর্ত্তমান কৃত্রিম বিধিনিষেধের জন্য তাহার ফল শুভ হইবে না।

অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হইলে, বরপণ, কন্যাপণ প্রভৃতি দুষ্ট প্রথা সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং যোগ্য পাত্র বা পাত্রীর অভাবে অসম-বিবাহের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। হিন্দু সমাজের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ইহার ফল শুভঙ্কর হইবে।

অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে আমরা প্রতীয়মান বৈজ্ঞানিক কারণের অবতারণা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু, এ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তির কারণ আমাদের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস বা সমাজ শরীরে কোন কুফলের আশঙ্কায় নহে। অনেক দিনের অভ্যাস ও নূতন কার্য্যে অনিচ্ছাই ইহার কারণ। যাঁহাদের নূতন পথে পা বাড়াইবার সাহস আছে তাঁহাদিগকেই আদর্শ সৃষ্টি করিতে হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বৈদেশিক

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

মিউনিকে ডেমোক্রেসীর সমাধি

শেষ পর্য্যন্ত মিঃ চেম্বারলেনের আচরণের ফলে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স ফ্যাসিষ্টতন্ত্রী ইটালী ও জার্ম্মানির সহিত মিলিত হইয়া মিউনিকে ডেমোক্রেসীর সমাধির ব্যবস্থা করিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যার উদ্ভব হইতেই মিঃ চেম্বারলেন খুব সরগোল করিয়া সমস্যার সমাধানে লাগিয়া গিয়াছিলেন। সমস্যার সমাধানও হইয়াছে বটে, কিন্তু যে ভাবে লোকে—এমন কি গ্রেটব্রিটেনের লোকেরাও আশা করিয়াছিল সে ভাবে হয় নাই। হয় নাই মিঃ চেম্বারলেন রাতারাতি পুরা ফ্যাসিষ্টে পরিবর্ত্তিত হইয়া ফ্রান্সের উপর পরোক্ষ চাপ দিয়া হিট্‌লার ও মুসোলিনীর সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন বলিয়া। এমন কি মন্ত্রীসভার অনেক সহকর্মীও চেম্বারলেনের প্রকৃত উদ্দেশ্যর কথা জ্ঞাত ছিলেন না—মিঃ ডাফ কুপারের মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ তাহারই প্রমাণ; মন্ত্রীসভায় রদ বদলের যে কথা শুনা যাইতেছে তাহারও সহিত চেম্বারলেনের মিউনিক অভিনয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানির হস্তগত হইয়াছে, বিজিতের দেশ দখল করার ন্যায় জার্ম্মান সৈন্য পুরা সামরিক কায়দায় সুদেতেন অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। এক কথায় হিটলার যাহা চাহিয়াছিলেন, চেম্বারলেন তাহা পুরামাত্রায় দিয়াছেন। চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যার সমাধানে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সকল উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল তাহার কিছু কিছু এখন প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে দেখা যায় একদিকে যখন ব্রিটিশ নৌবহর মহাসমারোহে যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত ছিল অন্যদিকে তখনই সুদেতেন অঞ্চলে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন ব্রিটিশ বনিকগণ হিটলারের সহিত তাহাই আলোচনা করিতেছিলেন। মিঃ চেম্বারলেন যে অভিনয় করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য কি? মিঃ চেম্বারলেন যে ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে চেম্বারলেন প্রথম হইতেই হিটলারের হস্তে সুদেতেন অঞ্চল তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তথাপি জার্ম্মানির প্রতি গ্রেটব্রিটেন যে প্রকাশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্রিটিস জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা। আর একটা মহা সমরের কালো ছায়া যদি চেম্বারলেন ব্রিটিশ জনসাধারণের উপর না ফেলিতেন, তবে তিনি যে অপকার্য্য করিয়াছেন তাহা ব্রিটিশ জনসাধারণ কখনই ক্ষমা করিত না।

অপকার্য্যের সাফাই গাহিবার সময় হাউস অব কমন্সে চেম্বারলেন বলিয়াছেন ব্রিটিস জনসাধারণ যুদ্ধ চাহেনা বলিয়াই তিনি অতিকষ্টে ইউরোপের শান্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। যুদ্ধ কোন সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি চাহিবে না, হিটলারও বলিয়াছেন অতঃপর ইউরোপে কোনদিকে প্রসারের চেষ্টা জার্ম্মানী আর করিবে না (যদিও একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে)। কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন ফ্যাসিষ্টতন্ত্রী দেশদ্বয়ের বিশেষতঃ জার্ম্মানির যে শক্তি ও মর্য্যাদার বৃদ্ধি করিলেন তদ্দ্বারা পৃথিবীব্যাপী ভীষণ সমরের যে সূচনা করিলেন তাহাকে রোধ করিবে কে?

ব্রিটেনও ফ্রান্স

বহুদিন হইতে ইটালী ও জার্ম্মানী রাশিয়াকে নিঃসঙ্গ করিয়া ফেলিবার যে চেষ্টা করিতেছিল তাহা এবার সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত মিঃ চেম্বারলেনের চেষ্টায় মিউনিকে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে চতুঃশক্তির যে মত-মিলন হয় তাহাতেই ফ্যাসিষ্টদের বহু আকাঙ্ক্ষিত চতুঃশক্তির চুক্তির

বনিয়াদ গাঁথা হইয়াছে। গ্রেটব্রিটেন ও চেম্বারলেনের পরোক্ষ চাপে ফ্রান্স যে ফাঁদে পা দিয়াছে তাঁহাতে তাহাদের ফ্যাসিষ্টতন্ত্রীদের সহিত চুক্তি করিয়া ফ্যাসিষ্টদের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় নাই। জাপান যে ভাবে পূর্ব্ব এশিয়ায় অগ্রসর হইতেছে তাহাতে গ্রেটব্রিটেনের স্বস্তির কারণ থাকিতে পারে না। জাপানকে বাধা দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল রাশ্যা ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করা। কিন্তু রাশ্যার সহিত কোন সামরিক সাহায্যের জন্য সম্পর্ক স্থাপনের কথা এখন আর উঠিতেই পারে না, অপর দিকে জাপানকে বাধা দিতে গেলে বিশ্বব্যাপী সমরের যে আশঙ্কা দেখা দিবে তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য আশা করা গেলেও গ্রেটব্রিটেন নিজেই ইটালী ও জার্ম্মানির যে শক্তি বৃদ্ধি করিল তাহাতে ঐ দুইটী রাষ্ট্রের সম্মিলিত-বর্দ্ধিত শক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানের অপ্রতিহত গতি গ্রেটব্রিটেনকে সহ্য করিতেই হইবে। অপর-দিকে ভূমধ্যসাগরে ইতালীর শক্তি ও মর্য্যাদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—সুয়েজখালের দিকেও যে জার্ম্মানি ও ইটালীর লক্ষ্য নাই এমন নহে।

ফ্রান্সের অবস্থা আরও শোচনীয়। যে কয়টী মিত্র তাহার ছিল, একে একে সকলকেই হারাইতে হইতেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া তো গিয়াছেই, লিট্‌ল আঁতাত ফ্রান্স অপেক্ষা জার্ম্মানীর সহিত মিতালীকেই অধিকতর নির্ভরশীল মনে করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, জার্ম্মানী ও ইটালীর চাপে রাশ্যার সন্ধিসূত্র ফ্রান্সকেই ছিন্ন করিতে হইবে। সকল সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ফ্রান্সকে 'কলোনি'র মূল্যে যে জার্ম্মানির নিকট হইতে শান্তি ক্রয় করিতে হইবে তাহার সম্ভাবনা এখন হইতেই দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের শক্তি এতটা খর্ব্ব হইয়াছে যে ইটালী জার্ম্মানির মনোরঞ্জনার্থ মিঃ দালাদিয়ার কম্যুনিষ্ট দমনের কথা চিন্তা করিতেছেন; ফ্রান্স শীঘ্রই রাশ্যার সহিত সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিবে এমন কথাও শুনা যাইতেছে।

শান্তি ?

চেম্বারলেনের নেতৃত্বে ও দালাদিয়ারের সহায়তায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানি ও ইটালীর নিকট আত্মসমর্পণের বিনিময়ে যে শান্তি ক্রয় করিতেছে, তাহা কি সত্যই আসিবে? না, জার্ম্মানির সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধাকে দমিত রাখিলে সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ ইউরোপে অশান্তিকে দূরবর্ত্তী করা যাইত? এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, পৃথিবীর মধ্যে দুইটী সর্ব্বপ্রধান 'কলোনিয়াল' শক্তি হইতেছে গ্রেট-ব্রিটেন ও ফ্রান্স। যতদিন না ইহারা অধীন দেশসমূহকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী শান্তির আশা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু, তাহা সত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে লুণ্ঠিত সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য যে শান্তি আবশ্যক, ভার্সাই সন্ধির পর হইতে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এক উদ্দেশ্যে এক প্রকার কার্য্যধারা অনুসরণ করিলেই সে শান্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হইত। কিন্তু, এক উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ না করিয়া সমর আসন্ন করিবার ভয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেন শেষ পর্য্যন্ত মিউনিকে আসিয়া এমন একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যদ্বারা যে শান্তি তাহারা চাহিতেছিল তাহাকেই অধিকতর পিছাইয়া দিয়াছে। রাশ্যার সহিত সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের জার্ম্মানির সহিত মিতালী করিতে অগ্রসর হওয়া সত্বেও য়্যালসাস-লোরেনে জার্ম্মানির প্রচার কার্য্য ফ্রান্সের প্রতিকূলে সমানে চলিয়াছে। জার্ম্মানী পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা বাদ দেয় নাই। অপর দিকে জার্ম্মানির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য ফ্রান্স যে সকল পূর্ব্ব ইউরোপীয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সহিত মিতালী করিয়াছিল তাহাদেরই সাহায্যে জার্ম্মানী তাহার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে; আর সে আয়োজন সাফল্যের দিকে দ্রুত ধাবমান। জার্ম্মানির লোলুপ দৃষ্টি ইউক্রেইনের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। আজই হউক কালই হউক জার্ম্মানী সে দিকে হস্ত প্রসারিত করিবেই এবং তখন তাহার গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত মনান্তর ঘটিবেই। ইউরোপের কোন প্রধান শক্তিই অপরকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শক্তিতে পরিণত হইবার অনুকূলে নিজের স্বার্থের জন্যই কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত ফ্রান্স ও গ্রেট-ব্রিটেন পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার নিমিত্ত যে চতুঃশক্তি সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা স্থায়ী হইতে

পারে না। কল্পিত সন্ধি স্থায়ী না হইবার আরও একটি কারণ, জার্ম্মানী তাহার বিগত মহাসমরের পূর্ব্ববর্ত্তী কলোনিগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য এখন হইতেই জোর আন্দোলন সুরু করিয়াছে; কলোনিগুলির কিয়দংশ লইয়াই যে জার্ম্মানী ক্ষান্ত হইবে এমন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। সুতরাং চেকোস্লোভাকিয়াকে ফ্যাসিষ্টবাদের প্রীত্যর্থে বলি দিয়া যে শান্তি ক্রয় করিবার বড়াই চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার করিতেছেন সে শান্তি মরীচিকা মাত্র।

উদ্দেশ্য সাধনের পথে জার্ম্মানী—

জার্ম্মানীতে সর্ব্বময় প্রভুত্ব পাইবার পর-হইতে হিট্‌লার যুদ্ধের ভীতি সমগ্র ইউরোপে—বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে দেখাইতে লাগিলেন। তৎকালে জার্ম্মানীর কোনও প্রথম-শ্রেণীর শক্তির সম্মুখীন হইবার সামর্থ্য ছিল না; তথাপি এই যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা একের পর এক সুবিধা জার্ম্মানী আদায় করিয়া লইতে লাগিল। জার্ম্মানীর লক্ষ্য হইতেছে তাহার সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিয়া পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিণত হওয়া; কিন্তু এ লক্ষ্য সাধনের সামর্থ্য জার্ম্মানীর কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ছিল না। বিস্ময়ের বিষয় এই প্রধানতঃ যে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্য ও শক্তি খর্ব্ব করিতে না পারিলে জার্ম্মানীর লক্ষ্যসাধন অসম্ভব, সেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বর্ত্তমান প্রভুগণই জার্ম্মানীকে অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল সমর্পণ করিয়া তাহার উদ্দেশ্যের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক হইয়াছেন। সুদেতেন অঞ্চল ও স্লোভাকিয়া অঞ্চল চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় চেকোস্লোভাকিয়ার সামরিক সামর্থ্য আর রহিল না; আর্থিক অবস্থাও তাহার এত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে জার্ম্মানীর সহিত অর্থনৈতিক ফলে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই। এদিকে পূর্ব্ব ইউরোপীয় যে সকল রাষ্ট্র ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিল, তাহারাও বর্ত্তমানে ইটালী-জার্ম্মানীর দিকে ঝুঁকিতেছে। সমগ্র পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর প্রভাব অপ্রতিহত হইল, ফলে জার্ম্মানী নিজের আর্থিক বনিয়াদ ও খাদ্য ও সমরোপকরণার্থ দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা এরূপভাবে পাকা করিয়া লইতেছে যে বিগত মহাসমরের অভিজ্ঞতা পুনরায় তাহার লাভ না করিতে হয়। এদিকে মিউনিকে চতুঃশক্তির মধ্যে যে পন্থা ও মিলন সম্ভবপর হইয়াছে তাহার ঢেউ স্পেনেও পৌঁছিবার উপক্রম করিয়াছে। স্পেনেও মিঃ চেম্বারলেন দালাদিয়ার উপর চাপ দিয়া ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের প্রভাব স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র ইউরোপে জার্ম্মানির ক্ষমতা অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। হিটলার কলোনি ফিরিয়া পাইবার দাবি বহুদিন হইতে করিতে থাকিলেও, সাম্রাজ্যগঠন করিবার জন্য জার্ম্মানির ইউরোপে নিজের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, এবং সে পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রধান কর্ত্তাগণই হিটলারকে সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি ডাঃ গোয়েবেলস একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানির বন্ধু না থাকিলেও ঐ দুই রাষ্ট্রের কর্ত্তাগণের মধ্যে জর্ম্মানির বন্ধু অনেক রহিয়াছে। কথাটা গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে নির্ম্মম হইলেও খুবই সত্য।

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

সাঙ্গীতিকী—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৮। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বইখানা যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নামকরণেই তার পরিচয়। বাস্তবিক, কোনো গানের বইএর পক্ষে এর চাইতে শোভন ও উপযুক্ত নাম আর কী হ'তে পারে? তবে দিলীপকুমার ইতিপূর্বে যে ক'খানা সাঙ্গীতিক বই লিখেছেন আলোচ্য বইটি তাদের থেকে স্বতন্ত্র—প্রকারে তো বটেই, আকারেও বটে। তাঁর গীতিমঞ্জরী ও নব গীতিমঞ্জরী মুখ্যত: স্বরলিপির বই। বিভিন্নরাগের লক্ষণ গীত ও বিভিন্ন সঙ্গীত রচয়িতার বিখ্যাত বিখ্যাত অনেক গানের অবিকল মূলানুরাগ স্বরলিপি তাতে আছে। তার পরেই তাঁর 'গীতশ্রী'। এত বৃহৎ স্বরলিপি সংগ্রহ বাংলা ভাষায় আর আমাদের চোখে পড়েনি। আর স্বরলিপি সন্নিবেশই শুধু নয়, বহুকাল প্রচলিত তথা লোকানুরঞ্জক অনেকগুলি বিখ্যাত রাগের ঔপপত্তিক (theoritical) আলোচনায় তিনি যে সূক্ষ্ম শ্রাবণিকতা ও তদোধিক নিবিড় মর্মজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত না হ'য়ে পারিনে। এ শুধু পাণ্ডিত্যের কথা নয়—কেন না পাণ্ডিত্য অনেকেরই থাকে—কিন্তু যা কিছু দেখবো, শুনবো, গ্রহণ করবো তাকে বাইরের দিক থেকে না নিয়ে আন্তর রসায়নে রঙ্গিয়ে তবে তাতে দেবো অনুমোদক স্বাক্ষর এটা তো কই বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

কিন্তু আলোচ্য বইখানার ধরণ ধারণ সবই আলাদা। প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার যে বইখানা স্বরলিপি পুস্তক নয়। স্থানে স্থানে সানুবাদ দুটি চারটি গান আছে অবশ্য, কিন্তু তা গীতি-সংগ্রহও নয়। মাঝে মাঝে গান বসাতে হয়েছে, সেটা আলোচনার সৌকর্যের জন্য। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বিশেষ ক'রে বাঙ্গালার দেশী সঙ্গীত অর্থাৎ কাব্য সঙ্গীতের একটা ধারাবাহিক বিকাশের অন্তর্মুখী আলোচনা এতে আছে। কিন্তু যেহেতু, সঙ্গীতকোবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রই জানেন, বাঙ্গালার দেশী সঙ্গীতের বিকাশের মূলে আমরা দেখতে পাই মার্গ সঙ্গীতের পোষকতা; যেহেতু বাঙ্গালার কাব্য-সঙ্গীতের লীলায়িত ক্রম-অভিব্যক্তি সম্ভব হ'তো না যদি না তার পেছনে থাকতো মার্গ সঙ্গীতের পটভূমিকা, সেজন্যে মার্গসঙ্গীত অর্থাৎ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও ক্রম বিকাশ দিলীপকুমার এই বইটিতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ঝড়বালি বা গবেষণার খড়কুটো উড়িয়ে নয়, প্রকৃত রসজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে; ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী তস্য ষোল হাজার নাতিপুতি জ্ঞাতি কুটুমের খুঁটিনাটি বংশ পর্যায়ের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে নয়, মার্গসঙ্গীতের বিকাশকে সমগ্র ভাবে অন্তর্মুখিতার আলোয় মেলে ধ'রে। এ যেন রাগসঙ্গীতের মিছিল, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ রাগ বা রাগিণীর ওপর তাঁর দৃষ্টি নেই নিবদ্ধ। যেমন দুই-নয়নের পার্থিবতার পেছনে আছে তৃতীয় নয়নের স্বর্গীয় দ্যুতি, ধ্যান দৃষ্টি দুই, কালের পরেও তেমনি রয়েছে তৃতীয় শ্রবণ, ধ্যান শ্রুতি। আকাশের ঈথর সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠেছে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ইতিহাস, দিলীপকুমার ধ্যান শ্রুতির ভেতর দিয়ে তারই অনুরণন যেন শুনছেন কান পেতে। বিচিত্র রাগের বিচিত্র বিন্যাস, বিচিত্র কলাকারু, বিচিত্র রূপকল্প, কিন্তু দিলীপকুমারের শ্রবণ তন্ত্রীতে ধ্বনিত হচ্ছে উদাত্ত মহান ধ্বনি-সঙ্গীতের এককতা।

বাঙ্গলা ভাষায় গান নিয়ে লেখা বইয়ের যে একান্তই অভাব সে কথা হয়ত সত্যি নয়। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর আমল থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত তথা রাগ ভঙ্গিম বাঙ্গলা গানের আলোচনা নেহাৎ অল্প হয় নি। কিন্তু বাঙ্গলা কাব্য সঙ্গীতের বিকাশের কথা সেই গুরু আলোচনার নিচে চাপা প'ড়ে গেছে। তার কারণ মুখ্যতঃ দুইটি। প্রথম, আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গের সুরকোবিদগণ বাঙ্গলা কাব্য সঙ্গীতকে তখনো দেয় নি শিরোপা, সেজন্যে পংক্তি ভোজনের দরদালানে তার কোনো আসন ছিল না, সে আঙিনার পাশে দাঁড়িয়ে বড়োই করুণ ভাবে চেয়ে থাক্‌তো ভেতরকার সরব আড়ম্বরের দিকে। দ্বিতীয়, কাব্য সঙ্গীত আজিকার ম'ত রূপে লীলায় লাস্যে ভাবে সৌন্দর্যে তখনো এতোটা বিকশিত হ'য়ে উঠেনি। রসের ক্ষেত্রে, কাজেই, হরিজনত্বটা তাকে এক রকম মেনেই নিতে হ'য়েছিলো।

রাগ সঙ্গীতের আলোচনার অনেকেই ইতিপূর্বে কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন। ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কণ্ঠকৌমুদী, ৺দক্ষিণাচরণ সেনের রাগের গঠনশিক্ষা, ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতসূত্রসার প্রভৃতি বই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর ভেতর ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শুধু রাগ সঙ্গীতের আলোচনা নয়, এই রাগ সঙ্গীত বাঙ্গলা গানের ভেতর দিয়ে কোন্ দিকে নেবে মোড়, কোন দিকে রয়েছে তার সহজ প্রবণতা তিনিই সর্বপ্রথম তার ইঙ্গিত দিয়ে যান তাঁর বিখ্যাত গীতসূত্রসার বইটিতে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলায় কাব্য সঙ্গীত ও নাট্য সঙ্গীতের এক সুমহান বিকাশ হ'বে, আর সেই সঙ্গে রাগ ভঙ্গিম বাঙ্গালা গানের প্রভাব আস্‌বে স্তিমিত হ'য়ে, এই ভবিষ্য সম্ভাবনার ছবি প্রথম ফুলে উঠেছিল তাঁরই তৃতীয় নয়নের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে। তাঁর সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ধ্যানলব্ধ কল্পনা আজ সত্য হ'তে চলেছে এতে তাঁর দূরদৃষ্টিকে করতে হয় ভূয়সী প্রশংসা। প্রকৃত পক্ষে, আধুনিক সঙ্গীত জগতে রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারকে বাদ দিলে এমন আর কোনো সঙ্গীতজ্ঞ আমাদের চোখে পড়ে না যাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা যায় বাস্তবিক উদার। সঙ্গীত জগতে কৃষ্ণধন ছিলেন ঋষি। ভাতখণ্ডে ও কৃষ্ণধন—এঁদের দুজনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হ'তে বাধ্য, দুজনেই সমান উদার, দুজনেই সমান ওস্তাদি গোঁড়ামি বর্জিত, কিন্তু ধ্যান-দৃষ্টি ও দূর কল্পনায় কৃষ্ণধন ভাতখণ্ডেকেও ছাড়িয়ে গেছেন। সব চাইতে অবাক হই আমরা এই ভেবে যে আধুনিককালে দিলীপকুমার বাঙ্গালা গানের জগতে যে কাব্যসঙ্গীত ও নাট্যসঙ্গীতের আন্দোলন এনেছেন পঞ্চাশ বৎসর আগে কৃষ্ণধনের রাগসঙ্গীতাভ্যস্ত শ্রবণের তটেও লেগেছিল তার ঢেউ। গীতসূত্রসারে তিনি সেই ভবিষ্যৎ আন্দোলনেরই আভাস দিয়ে গেছেন। দিলীপকুমারের ভাষায় "এই বইটি একাধারে আমাদের সঙ্গীতের উপক্রমণিকা, তথা পানিনি।"

পঞ্চাশ বছর আগেকার কৃষ্ণধনে যার আভাস আমরা পাই পঞ্চাশ বছর পরেকার দিলীপকুমারে দেখতে পাচ্ছি তারই পরিণতি। বাস্তবিক কৃষ্ণধনের গীতসূত্রসারের পর এমন আর কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয়নি যাকে দিলীপকুমারের সাঙ্গীতিকীর সমপাংক্তেয় করা যায়। দিলীপকুমারের ধ্যান ধারণা, কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গী সবই এমন একটা ঔদার্যের রসে সংপৃক্ত; আর শুধু উদার দৃষ্টিভঙ্গীই নয়, নিজের অন্তরের কাছে খাঁটী থেকে কর্ম জগতে তিনি সেই ধ্যান ধারণাকে এমন একটা মহান রূপ দিয়েছেন যে বাঙ্গলা সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকবে। কৃষ্ণধনের পরেই যদি কোনো সঙ্গীতকোবিদের নাম করা যায় তিনি হচ্ছেন দিলীপকুমার। সাময়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তু কিম্বা ব্যক্তিরই তুল্যমূল্য নির্ধারিত হয় না। কিন্তু এমন একটা সময় আস্‌বে, হয়ত দিলীপকুমার বেঁচে থাক্‌বেন না তখন, যখন বাঙ্গলা গানের জগতে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা স্মরণ ক'রে, বাঙ্গালী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে পূজা করবেন। এটা আমাদের কোনো মনগড়া কথা নয়,—এ আমাদের অন্তরের দৃঢ় প্রতীতি। সমসাময়িকতার সীমায় যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষবাষ্প ওঠে উদ্বেল হ'য়ে তাকে নিঃশেষে লুপ্ত ক'রে দিয়ে এক বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকার প্রত্যেক বস্তু কিম্বা ব্যক্তিকেই "disinterested contemplation"এর আলোয় তুলে ধরা—এটা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে কবে দেখতে

পাবো? সুরকার হিসেবে দিলীপকুমারের যে রূপ সেটা এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নয়, কিম্বা সুরশিল্পী হিসেবে তাঁর যে রূপ সেটাও আমাদের আলোচনার বাইরে। এই উভয় রূপকে জড়িয়ে অথচ তাকে ছাড়িয়ে দিলীপকুমারের যে ধ্যান-দৃষ্টি বাঙ্গলা গানকে অপূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখে তার ভেতর বিচিত্র সম্ভাব্যতার স্বপ্ন দেখেছে গানকে শুদ্ধমাত্র ভালোবেসেই সেই ধ্যানদৃষ্টির প্রসাদ লাভ করা যায় না। গান যখন মোজার্টের কথায় সত্যি সত্যি 'অন্তরের দুরন্ত আকুতি' হ'য়ে উঠে তখনই ধ্যানের আলো নেমে আসে হৃদয়ের পরে। দিলীপকুমার পেয়েছেন, সন্ধান যদি বা নয়, সেই আলোর আভাষ—আর সেই আলোতেই ফুটে উঠল তাঁর গানের কলি। সেদিন দূরে নয়, হয়ত আমরা তখন বেঁচে থাকবো না—যখন এই ধ্যানদৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি ক'রে বাঙ্গলার আগামী পুরুষ তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দিলীপকুমারের সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম পর্য্যায়ের বললে ভুল বলা হ'বে না। তবে এইটুকু পার্থক্য আছে যে, রবীন্দ্রনাথ যাকে দেখেছেন সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দিলীপকুমার তাকে দেখতে পেয়েছেন প্রেরণার আলোয়। এই থেকে যদি মনে করেন যে সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের প্রাণের জিনিষ নয় তা হ'লে তিনি আমার প্রতি অবিচার করবেন। কেননা, এটা প্রত্যেকেই জানেন সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা বাল্যকাল থেকেই। সঙ্গীত তাঁর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের তুলনা নেই। তাঁর রবীন্দ্র-গীতির অফুরন্ত ভাণ্ডারই এ-কথার বড়ো পরিচয়। বিচিত্র সাঙ্গীতিক নিবন্ধও তাঁর লেখনী থেকে কম বেরোয়নি। কিন্তু গানের ব্যাপারে যে পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয়, প্রশ্ন-সমস্যা দিলীপকুমারের মনকে আলোড়িত করেছে এমন বোধ করি আর কাউকে নয়। রবীন্দ্রনাথও যৌবনে যে সাঙ্গীতিক মত আঁকড়ে' ছিলেন পরিণত জীবনে ত'াকে বদ্‌লিয়েছেন বহুবিধ ব্যবহারিক পরীক্ষার পরে, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের ভেতর সেই মানসিক আন্দোলন সামান্য বীচিভঙ্গ মাত্র—তাঁর বহুমুখী কর্মাবলীর ভেতর তা'কে যেন আলাদা ক'রে চেনাই যায় না। কিন্তু দিলীপ-কুমারের অন্তর্জগতের ইতিহাস বিশেষ ক'রে এই সাঙ্গীতিক প্রেরণা-লাভেরই অখণ্ড ইতিবৃত্ত। মাঝে মাঝে সংশয় এসে তাঁর দৃষ্টিকে করেছে আবিল, রাগসঙ্গীতের মহিমলোকের আলোর দ্যুতিতে বর্ণচ্ছটায় কাব্য সঙ্গীতের স্বরূপ হয়ে গেছে তাঁর চোখে কুয়াসাচ্ছন্ন, একপেশো ভাবে রাগসঙ্গীতকে দিয়েছেন সম্পূর্ণ বৈর নির্বাসন, কতো কতো দিন সমস্যায় দুলেছে তাঁর মন, প্রশ্ন পীড়িত অন্তরে জেগেছে কত না অনৈশ্চিত্য, কখনো আবার অনিশ্চিতভাবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রাণশক্তিকে আবাহন করতে চেয়েছেন বাঙ্গালা গানের মন্দিরে, সন্দেহ দ্বিধা, আলোড়ন বিলোড়ন বিক্ষোভে তাঁর চিত্ত হ'য়েছে মথিত, সত্য গানের দিশা খুঁজতে গিয়ে কত না সময়ে দৃষ্টি তাঁর হয়েছে ঘোলাটে, কিন্তু তবু তিনি গীতি ধ্রুবালোকের সন্ধান ছাড়েন নি। নানারূপ ব্যবহারিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে পর্যন্ত না বাঙ্গলা গানের একটা নিশ্চিন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ততদিন তিনি সেই অন্বেষণকে শিথিল হ'তে দেননি। তারপর প্রেরণার আলো যেই নেমে এসেছে তাঁর হৃদয়ে সমস্ত আলোড়ন থিতিয়ে এলো অপরোক্ষ অনুভূতিতে। আর সেই অনুভূতির ইতিহাস এই সাঙ্গীতিকী।

প্রথমেই মার্গ সঙ্গীতের অধ্যায়। গোড়াতেই দিলীপ-কুমার ব'লে নিয়েছেন যে তিনি শ্রুতি-কচায়ন অথবা গবেষণা কণ্ডূতি কিছুই করবেন না মার্গসঙ্গীতের আলোচনায়। যদিও তিনি তথ্যপ্রমাণ বহুল প্রমাণে সংগ্রহ করেছেন, বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি সঙ্কলন ক'রে যদিও অধ্যায়টিকে মূল্যবান করেছেন নানা দিক থেকে, তত্রাচ বলা চলে তাঁর আলোচনা মুখ্যতঃ অন্তর্মুখী। আর এ-কথার কী সুন্দর প্রমাণই না মেলে তাঁর 'মার্গ সঙ্গীতের ধ্যানলোক' পরিচ্ছেদটিতে! এখানে তা থেকে একটি অংশ উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি—তাতেই পাঠকবর্গ আমাদের কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারবেন:

"'রাগ-সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায় এই ঊর্দ্ধ-আবাহনের স্তব্ধতা, গাঢ়তা, উচ্ছল সক্রিয় সমাহিতি। ভোরের তোড়িতে, সাঁঝের পুরবীতে, অপরাহ্ণের মুলতানে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে এই ধ্যানঘন আনন্দবন্দিত ছায়ালোকের আলোক-

ঝঙ্কার।...বিশ্ব সঙ্গীতে ও লোকোত্তর, অদ্বিতীয়, মহিমময়, নিজের সুররাজ্যে ও ছত্রপতি, নিজের দাক্ষিণ্য-দ্বীপে ও রাজচক্রবর্তী।" রাগ সঙ্গীতের ছবিটি কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে!

দিলীপকুমার তারপর বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এতাবৎকাল পর্যন্ত রাগ সঙ্গীতের ক্রম বিকাশ খুব নিপুণ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী মার্গসঙ্গীতের এই চারটি অঙ্গের চরিত্র লক্ষণ রসানুভূতির আলোকে তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন হৃদয়গ্রাহী প্রণালীতে। তিনি ধ্রুপদকে বলেছেন কঠিন (solid), খেয়ালকে তরল (fluid), আর টপ্পা ঠুংরীকে বায়বীয় (gaseous)। তিনটি কথায় সমস্ত রাগসঙ্গীতের মর্ম উদ্ঘাটিত ক'রে দেখানো হয়েছে। যাঁরাই রাগসঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠতঃ ও যন্ত্রতঃ জড়িত আছেন তাঁরাই এ কথা তিনটির মাধুর্য উপভোগ করতে পারবেন। ঠুংরীর ওপর যে কবিতাটি লেখা হয়েছে তা একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সৌকুমার্যে লালিত্যে, উপভোগ্যতায়, ভাবপ্রকাশে কবিতাটি দিলীপকুমারের কবি-প্রতিভার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

ধ্রুপদ কোন্ জায়গায় এসে আর ধ্রুপদ রইলো না, খেয়ালের পথে বাঁক নিলে সে বড়ো সুন্দর বোঝানো হয়েছে বইটিতে। কিন্তু খেয়ালের প্রসঙ্গে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের নাম না দেখে আমরা একটু বিস্মিত হ'য়েছি। সত্য বটে আমীর খসরু খেয়ালের জনক, কিন্তু বহুদিন যাবৎ খেয়াল দেশে কোনরকম পাত পায়নি। যদি আলাউদ্দিন খাঁর সভাগায়ক আমীর খসরু খেয়ালের জনক হন তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তানসেন বৈজু বাওরার খেয়াল দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুস্থানে 'কাউয়াল' সঙ্গীত নামে যে সব গান অভিহিত হয় পদমর্যাদায় খেয়াল তখন তার থেকেও নিচে ছিল। সঙ্গীতকোবিদ সমাজে সে ছিল অবজ্ঞাত অনাদৃত—সাধারণ দশজনের মধ্যেই প্রতিপত্তি ছিল তার সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহম্মদ শাহের সভাগায়ক সদারঙ্গ (নিয়ামত খাঁ)ই প্রথম খেয়ালকে রাগসঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তার আগে আর কোনো বিখ্যাত খেয়াল গায়ক জন্মগ্রহণ করেছে ইতিহাসে এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

তারপরেই দেশী সঙ্গীতের অধ্যায়। এই অধ্যায়টি এমন বিস্তৃত অথচ এমন মনোজ্ঞভাবে লিখিত হ'য়েছে যে আগাগোড়া এক নিশ্বাসে পড়ে ফেল্‌তে বাধে না। তার ওপর গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোক সম্পাতে অনুভবের এজাহারে এ এমন দীপ্ত এমন চিত্তাকর্ষক হয়েছে যে, যদি এমন কখনো হয় যে কাব্যসঙ্গীতের আদর্শ, সার্থকতা, প্রবণতা অন্তর্নিহিত ভাব ও রস নিয়ে দ্বিমত হ'বার কারণ ঘটে তা হ'লে এই একখানি পুস্তকপাঠেই সমস্ত সন্দেহের ভঞ্জন ও সংশয়ের নিরাকরণ হ'বে ব'লে মনে করি।

কাব্য সঙ্গীত তথা লোক সঙ্গীত আজ আর খাঁচার ভেতর নেই। বাঁধা প্রাচীরের আড়াল ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে তাকে খোলা হাওয়ায় দিগন্তবিসারী প্রান্তরে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ম'ত উড়তে দেওয়া হয়েছে। কাব্য সঙ্গীত নূতন ক'রে বেঁচেছে: এ যেন স্বতোৎসার ঝরণা; পাষাণ-কারা ভেঙ্গে রাশি রাশি শিলা খান খান ক'রে জগৎকে প্লাবিত ক'রে দিয়ে 'আকুল পাগোল-পারা' হ'য়ে ছুটেছে, কোথাও নেই তার বাধা নেই বন্ধন; উপলে প্রতিহত হ'য়ে কল্ কল ছল ছল সুরের লীলায় উদ্দাম গতিতে হয়েছে দূরের অভিসারী, কোথায় কতদূর তার গতি কে জানে! এ যেন নীলিমাভিসারী কোন পাখী; রাগ সঙ্গীতের সুরের পাখায় ভর ক'রে উড়েছে। সে নীলাকাশে, কাব্যকূজন তার কলকণ্ঠে, অথচ পাখার সঞ্চালনে কলকণ্ঠের কূজনে কোথাও তাল কাটছে না, ছন্দ পতন হ'চ্ছে না, প্রাণে তার অমিত আশা আকাঙ্ক্ষা, উর্ধ্বাশার স্বপ্নে আবেগের রসাবেশে হৃদয় তার ভোর। এ তো আর 'অচল-প্রতিষ্ঠ' রাগসঙ্গীত নয়, লোক সঙ্গীতও এ নয়। এ যে 'গান'—সুরেও তার পরিনয়, কথায়ও তার মিল্‌বে না পরিচয়—দুইয়ের সুসমঞ্জস সঙ্গতিতে ও যে তারা হ'য়ে ফুটে উঠলো আকাশে। আমাদের মনের আকাশ তারকান্বিত হোক গানে গানে—দেশীয় সুর লহরীর আকাশ—দীপ নয়, বৈদেশিক স্বর-সঙ্গতির ঝাড় লণ্ঠনও নয়, নীলাকাশকে মনের ভেতর অবাধ সঞ্চরণে বিস্তৃত ক'রে দিতে হ'লে ফোটাতে হ'বে তারা, শুধু তারা।

বাস্তবিক দিলীপকুমার কী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতেই না এ সব কথা আলোচনা করেছেন। তার ওপর বাঙ্গলা

গানের ধারাবাহিক ইতিহাস, তার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষত্বের কথা কোনোটাই তিনি বাদ দেন নি। গজল, কীর্তন, বাউল, কাব্য সঙ্গীত, রবীন্দ্র গীতি, রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাঙা খেয়াল, অতুল প্রসাদের ঠুংরী, সুরেন্দ্র মজুমদারের টপ খেয়াল, এ ছাড়া পূর্ববর্তী অধ্যায়ের নিধু বাবুর টপ্পা, দাশু রায়ের পাঁচালি, কবি, তর্জা, হাফ-আখড়াই—এক কথায় বাঙ্গালা গানের যতো বিভিন্ন বিভাগ থাকতে পারে তার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং অখণ্ড ইতিহাস তিনি সংকলন করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে, গোষ্ঠী-বিবরণীর ইতিহাস এ নয়, অন্তর্মুখিতার আলোয় এ ঐতিহাসিকতার চেহারাই গেছে বদলে। গবেষকসুলভ ফুট নোটের কাঁটা এতে নেই, কাঁটার ওপরকার ফুলটাকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

একটা কথা। কথা ও সুর নিয়ে তিনি দুটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। এই নিয়ে আর আলোচনা করতে ইচ্ছে হয় না। বক্ষ্যমাণ সমালোচনীর লেখকই একদিন এই নিয়ে বাদবিতণ্ডার সূত্রপাত করে—সে এক বছর আগেকার কথা। হয়ত অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হ'য়েই সে সেটা করেছিল। কিন্তু তাতে করে মাসিক কাগজে যে বাক্যের ঝড় তর্কের তুফান উঠলো তাতে হাঁফিয়ে না উঠাটাই অস্বাভাবিক। শেষে এমন হলো যে আলোচনার তোড়ে এই লেখক যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার আর হদিসই পাওয়া গেল না। আলোচনার সুরু যার থেকে সে যদি এখন সমাপ্তির রেখা টানতে চায় তা হ'লেই তার ইতি হ'বে মনে হয় না। তবে লেখকের সপক্ষে এই মাত্র বলার আছে যে নানা আলোচনা পড়ে সে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ন্যায়শাস্ত্রে এমন কোন বিষয়-বস্তু যদি থাকে যার মীমাংসা নেই, সাঙ্গীতিক কথা ও সুরের কলহের কাছে তাকেও হার মানতে হ'বে বিচার নিষ্পত্তি নী হওয়ার দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও দিলীপ-কুমারের 'ছন্দায়' প্রকাশিত 'কথা বনাম সুর' পড়ে লেখকের স্থির ধারণা হয়েছে যে এ আলোচনায় কোনো ফল নেই। লেখক এটা জানিয়ে রাখলো প্রসঙ্গতঃ।

দিলীপকুমার সঙ্গীতজ্ঞ অমিয় সান্যাল মহাশয়ের কণ্ঠবাদন কথাটির তারিফ করেছেন শতমুখে। রাগসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত নয়, কি না কণ্ঠবাদন। বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এই কথাটি আমি অনুমোদন করতে পারলুম না। কথাটির জৌলুস আছে স্বীকার করি, আমাদের অনভ্যস্ত কানে সদ্যোচ্চারিত কথাটি খুব মধুর হ'য়ে বাজছে তাও না হয় স্বীকার করলুম—কিন্তু এর সুস্পষ্ট অর্থ যে কী সে কথা দিলীপকুমার ভেবে দেখেছেন কি? কথাটির চাকচিক্য আছে, কিন্তু অর্থপূর্ণতার দিক থেকে কথাটি নিষ্ফল হয়েছে মানতেই হ'বে। রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের আঁখরকে 'কথার তান' বলেছেন। তাঁর সামান্য দুটি কথায় আঁখরের সমস্ত রূপটিই উদ্ঘাটিত হ'য়েছে আমাদের চোখে। কিন্তু কণ্ঠবাদন কথাটিতে সেটি সম্ভব হ'য়েছে কি? অমিয় সান্যাল মহাশয়ের সমর্থক দিলীপকুমার কি বল্‌তে চান যে কণ্ঠ, (রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্য) আর আর বাদ্যযন্ত্রের মতোই একটি বাদিত্র? বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে দেখলে এ কথা সত্য ব'লে গৃহীত হ'বে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানই কি সব? কণ্ঠযন্ত্রে সুরের যে বিশেষ রূপ ফুটে ওঠে তারযন্ত্রে কিম্বা অন্য কোনো যন্ত্রে তা কখনই সম্ভব হ'তে পারে না এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির এজাহার কি বাতিল ক'রে দেবার মত? না হয় মানলুম রাগসঙ্গীতে কথার কোন মূল্যই নেই, সেটা সুরের একটা অবলম্বন মাত্র, কিন্তু তা থেকে কি প্রমাণ হলো কণ্ঠ একটি বাদিত্র? শারীর বিজ্ঞানের দিক থেকে কণ্ঠ যে একটি যন্ত্র বিশেষ তা আমিও মানি—কিন্তু আমার বলবার কথা হচ্ছে এই যে সুরের যে রসরূপকে কণ্ঠের সাহায্যে লীলায়িত হ'তে দেখি আর কোনো যন্ত্রেই তা সম্ভব নয়—সম্ভব হ'তে পারে না। দিলীপকুমার যদি বলেন কণ্ঠ একটি উন্নত ধরণের যন্ত্র তা হ'লে তারও জবাব আছে। 'কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখী'—এ পাখি-পোষ-মানানোর বিদ্যেটা সম্পূর্ণ আন্তর বিদ্যে, ভেতরকার আবেগে কণ্ঠে জাগে সুরের কলতান। যন্ত্রের সুরের লীলাও আন্তর বিদ্যে এ কথা কেউ অস্বীকার করছে না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাতের কারিকুরি দরকার হয় তার কী? যন্ত্র একটু বেশিমাত্রায় সক্রিয় (active), সেইখানেই লুকিয়ে আছে তার গলদ, আর

কণ্ঠ যে বাজি মাৎ ক'রে নিল সে তা'র অই অল্পবিস্তর নিষ্ক্রিয়তার জন্যেই। 'দেহসম্বন্ধ' না হ'য়ে 'দেহাঙ্গ' হ'য়েছে ব'লেই তো কণ্ঠের জাত আলাদা।

তারপর দিলীপকুমার শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকরের "নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ" এই সংজ্ঞার শেষের দিকটা রাগসঙ্গীতের আলোকে উল্‌টে নিতে চান, কিনা গীতং বাদ্যানুবৃত্তি চ'। এটা যে ঘোড়ার আগেভাগে গাড়ি-জুতে-দেবার ভুল হ'ল। এটা সর্বজন-স্বীকৃত যে কণ্ঠ সঙ্গীতের পরে যন্ত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি। সে কথা না-হয় ছেড়েই দেওয়া হ'ল। কিন্তু সঙ্গীতকোবিদ দিলীপ-কুমার নিজেও এটা বিশেষ ক'রে জানেন নিশ্চয়ই যে যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা করবার আগে কালোয়াত ওস্তাদগণ নবদীক্ষিত সাকরেদদিগকে কণ্ঠসঙ্গীতের তালিম দিয়ে থাকেন। কেন, না ভেতরে সুর সঞ্চারিত ক'রে দেবার জন্যে। গোড়াতেই যন্ত্রসঙ্গীতে হাত দিলে সুরের ভিৎ শেষ পর্য্যন্ত কিছুটা কাঁচা থেকে যায়, তাই না। যাক্ এ তর্কচায়নে এখানেই ইতি টানি।

সাঙ্গীতিকীর যেটা হচ্ছে আসল কথা সেটা আছে 'গান—তীর্থ পথে' এই পরিচ্ছেদে। অত্যন্ত বড়ো পরিচ্ছেদে—কিন্তু সবটাই কথোপকথনের ভঙ্গীতে লেখা। দিলীপকুমারের আলাপ ভঙ্গিম রচনার তুলনা হয় না। অতি বড়ো জটিল জিনিষও তাঁর লেখার গুণে জলের ম'ত সহজ হ'য়ে যায়। রাগ ও গানের বিবাদে রাগ শেষ পর্যন্ত গানের মনোহারিত্ব, লালিত্য, সৌকুমার্য, ভাবঋদ্ধি, সুরায়ন সমস্তই স্বীকার ক'রে নিল। এই দেহী 'গানের' ভূমিকাটি দিলীপকুমারের নিজের। তাঁর আদর্শ অনুভূতি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী সমস্তই 'গানের' মারফৎ আমরা জানতে পেরেছি। ভবিষ্যতের সঙ্গীতরসিক সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতপ্রেমিকদিগকে তিনি নূতন পথ চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন, দেখিয়েছেন অদৃশ্য আলোর আভাস। এই জন্য সমস্ত দেশ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর মতামতের আলোচনা কিছুটা আমরা আগেই ক'রেছি। বিদেশী সুর সম্বন্ধে বাংলা গানকে মহিয়ান করার বিষয় নিয়ে যে কথা তিনি বলেছেন দিলীপকুমারের বিদেশভঙ্গিম কয়েকটি বাংলা গান শুনে আমরা সে-কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। ভরসার কথা এই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন আছে এর পেছনে। কিছুদিন আগে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন এই ব'লে যে বিদেশী সাহিত্যকে আমরা অন্তরের জারকরস দিয়ে যেভাবে জীর্ণ ক'রে নিয়েছি বিদেশী সঙ্গীতকে যদি সেভাবে গ্রহণ কর্তে পারতুম তা হ'লে দেশীসঙ্গীত বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হ'তো সন্দেহ নেই। দিলীপকুমারও সেই কথা বলেন।

দিলীপকুমার তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে 'গানের' যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন তা কবে আমরা নিজেদের জীবনেও প্রত্যক্ষ দেখতে পাবো? এমন দিন কবে হ'বে যখন রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় বল্‌তে গেলে হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল বাঁধা সাক্রেদী না ক'রে নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চল্‌লেও' মনে করবো একটা সত্যিকার কাজ করা হচ্ছে? সেই দিন যদি কখনো আসে, যদি এমন কখনও হয় যে সমস্ত দেশ 'গানের' এই মোহনরূপকে হৃদয়মন্দিরে বিনা-প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছে ঠিক সেই দিন হবে দিলীপকুমারের স্বপ্ন সার্থক, চেষ্টা জয়যুক্ত। সেদিনই শুধু বল্‌তে পারবো গানকে যে, "Thou speakest to me of things which in all my endless life I have not found and shall not find" (Jean Paul Richter)

পরিশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদিগকে এমন একখানা অপূর্ব বই পড়বার সুযোগ দিয়েছেন ব'লে।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব বা সাধন রহস্য—(প্রথম খণ্ড)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। জেলা হুগলি, পোঃ চণ্ডীতলা, গরলগাছা গ্রাম হইতে শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব যে ভাবে ফুটিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা নিজ সাধনা এবং ধারণা অনুযায়ী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন—প্রথম ভাগ দেবীমাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় ভাগ মূলগ্রন্থ এবং তৃতীয় ভাগ রহস্যত্রয়

(পরিশিষ্ট)। তন্মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থে অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে দেবী মাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা ভাগের অন্তর্গত দেবীসূক্ত এবং অর্গলাস্তোত্র মাত্র আলোচিত হইয়াছে। ১১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী দেবীসূক্ত আলোচনা এবং ১৩৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী অর্গলা-স্তোত্র আলোচনা হইতে সমগ্র গ্রন্থ যে কত বড় হইবে, তাহা আমরা কতক অনুমান করিতে পারি। উপক্রমণিকা অংশের অন্তর্গত কীলক এবং কবচ ইহাতে নাই। দেবীসূক্তের এবং অর্গলা স্তোত্রের আলোচনায় প্রথমে মন্ত্রটী দেওয়া হইয়াছে, তৎপর সেই মন্ত্রের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের আলোচনার ভিতর অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা করিতে চান তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে যে বিশেষভাবেই উপকৃত হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, তবে অনেক স্থলেই পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হইল। গ্রন্থরচনার সময় গ্রন্থকার এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে ভাল হইত এবং হয়ত এই খণ্ডের মধ্যেই কীলক ও কবচাংশ দেওয়া যাইতে পারিত। সে যাহা হউক শ্রীশ্রী-চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে আলোচ্য গ্রন্থখানি যে তাহার মধ্যে এরূপ বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে ইহা নিশ্চয়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি এবং ইহার অন্যান্য খণ্ডের প্রকাশ দেখিতে ইচ্ছা করি। পুস্তকখানি ভাল এন্টিক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে এবং মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮১।

বৈদিক গবেষণা—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীউমাকান্ত হাজারী প্রণীত। কলিকাতা ১১ বিডন ষ্ট্রীট হইতে ডাক্তার কে হাজারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বেদ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনামূলক পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এই পুস্তকখানি তাহাদিগের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ইহার প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় বৈদিক ও প্রাগ্বৈদিক যুগ আলোচনায় বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় এবং সমালোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সমূহের পরিচয় ও আলোচনা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে সূত্র (কল্প) সাহিত্যের পরিচয় এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আর্য্যজাতির পরিচয় প্রসঙ্গে আর্য্য শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর্য্য-জাতির আদিম বাসস্থান নির্ণয়, তৃতীয় অধ্যায়ে আর্য্যজাতির বসতি বিস্তার ও উপনিবেশ সংস্থাপনের বিবরণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ভাষা ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালীর আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকের সর্ব্বত্রই বহু বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এবং কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিতেরও মত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু স্থানেই যুক্তি সহকারে নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তকের সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের পাণ্ডি-ত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিকট অনেক নূতন তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা পুস্তক-খানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বিদ্বম্মণ্ডলীর নিকট পুস্তকখানির বিশেষ সমাদর হওয়া উচিত। গ্রন্থকার পুস্তক-খানি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের সম্মানার্হ হইয়াছেন। যাঁহারা বেদ এবং বৈদিক যুগ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান তাঁহাদের এই পুস্তকখানি নিশ্চয়ই পাঠ করা উচিত। পুস্তকের ভাষা সরল এবং আলোচ্য বিষয়াবলি সহজবোধ্য ভাবে বিশ্লেষিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকপাঠিকা-গণও ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন। আমরা পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের আশায় রহিলাম।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

সূর্য্যোদয়—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দাম দেড় টাকা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীমান সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কথাসাহিত্যের আসরে নূতন অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম বই 'সূর্য্যোদয়' সাতটি গল্প—ছোট গল্পের সংগ্রহ। গল্পগুলির নাম যথাক্রমে

—গানের পার্টির পর, তাই তুমি মা, স্বর্য্যোদয়, প্রিয়, ট্রেণ, বিদ্যুৎ, অসাধারণ। গল্পগুলি সম্ভবত কোনো কোনো পরিচিত মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আজকাল গল্প লেখকেরা পরিচিত মাসিক পত্রগুলিতে গল্প ছাপাইয়া পরে সেগুলিকে একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। শুনিয়াছি, ছোট গল্পের বই বেশি বিক্রয় হয় না। উপন্যাসে একটানা গল্প পড়িতে সকলেই চায়। ছোট গল্পের রস একমাত্র সাহিত্যরসিক ভিন্ন কেহ বড় একটা গ্রহণ করিতে পারেন না। ছোট গল্পের বই ধীরে ধীরে পড়িতে হয়—একটির বেশি গল্প একেবারে পড়িতে পারা যায় না। সেজন্য ছোট গল্পের চাহিদা কম। ছোট গল্প লইয়া বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পর নানা চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি ছোট গল্পের চাহিদা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকেই ছোট গল্প লিখিয়াছেন—কত আর নাম করিব? সুধীরঞ্জন সেই ভিড়ে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত 'স্বর্য্যোদয়' লইয়া আসিয়াছেন। 'স্বর্য্যোদয়ে'র গল্পগুলিকে এককথায় চিত্তাকর্ষক বলা চলে। ছোট গল্পের গঠন সম্বন্ধে লেখকের ধারণা আছে—'তাই তুমি মা', 'ট্রেণ', 'অসাধারণ' এই কয়টি গল্প বেশ ভালো লাগিল। 'বিদ্যুৎ' গল্পটিতে একটি ছোট মেয়ের বড় সুন্দর চিত্র আছে—এমনি ছোট ছোট চিত্র রচনায় লেখকের হাত আছে। তাঁহার লেখায় নাগরিক জীবনের চিত্র বেশি ফুটিয়াছে। ভাষা গল্পের। কোথাও অতিরঞ্জন নাই—বেশ স্বচ্ছ সরল রচনা। লেখক এখনও বয়সে তরুণ, আশা করি তিনি তাঁহার জীবনের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা তাঁহার অন্য গ্রন্থে প্রকাশ করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

তপকুমার—শ্রীমৎ ওঁকারেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ২০৪, নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট কলিকাতা, বরেন্দ্র লাইব্রেরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা।

মহিষাসুর, গণেশ ও কার্ত্তিকের জীবনী সম্বলিত এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যারপর নাই আনন্দ উপভোগ করিলাম। বহু বৎসর পরম অধ্যবসায়ের সহিত পুরাণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া গ্রন্থকার ইহাতে অনেক নূতন তথ্য নূতন সংবাদ সন্নিবেশিত করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহিষাসুর কে, কোথায় কি প্রকারে তাঁর জন্ম, শ্রীরামচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মধ্যে কে প্রথম দুর্গাপূজা জগতে প্রচলন করেন, কোন্ শক্তি প্রভাবে সপ্তমদিবসীয় শিশু কার্ত্তিকেয় দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-মনুষ্যের অবধ্য শিব-ভক্ত তারকাসুরকে বধ করেন, হিন্দুর প্রতি সূতিকা-গৃহে ষষ্ঠীদেবীর পূজা কেন করা হয় এবং কোন সময় হইতে উহা ভারতে প্রথম প্রচলিত হইল এই সমস্ত এবং অন্যান্য নূতন সংবাদ এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহিত জীবন মধুময় ও সার্থক করিবার উপায়ও দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তর্গত ৫টী অধ্যায়ের—যাহাতে দেবীর স্তব ও মাহাত্ম্য আছে—বাঙ্গলায় অনুবাদ বড়ই সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। পূজান্তে প্রত্যেক হিন্দুই শান্তি-জল লইয়া থাকেন—কিন্তু ঐ শান্তি পাঠ মন্ত্রের অর্থ অনেকেই অবগত নহেন—শান্তি পাঠ মন্ত্র ও উহার অর্থ এই গ্রন্থে থাকায় একটি মস্ত অভাব দূর হইয়াছে। বইখানির ভাব উচ্চ, ভাষা প্রাঞ্জল সুখপাঠ্য ও সুলিখিত। মলাট, কাগজ চমৎকার। প্রত্যেককে তপকুমার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীব্রজেশ্বর গুপ্ত

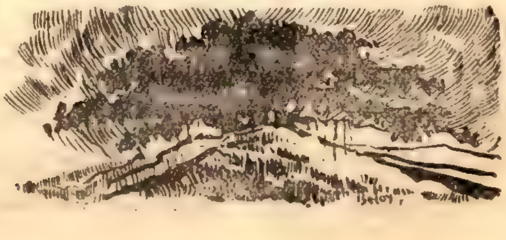

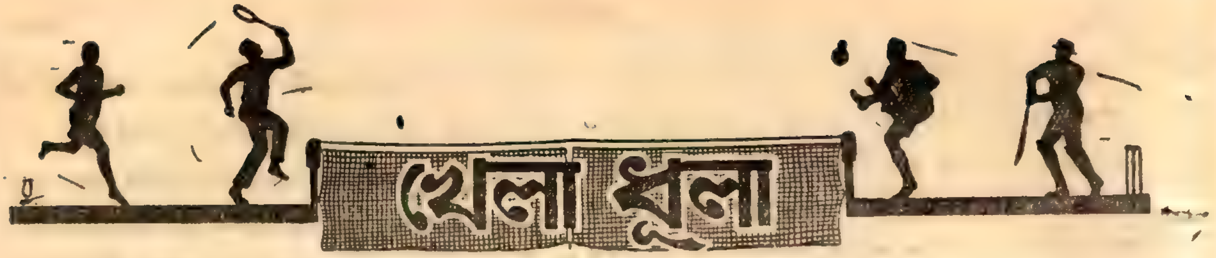

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সন্তরণে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড—

ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ মহিলা সন্তরণকারী র‍্যাগেনহিল ভেজার ২২০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত দূরত্বটুকু অতিক্রম করিতে লাগিয়াছে ২ মিনিট ২৫·৭ সেকেণ্ড মাত্র। এর আগে ১৯৩৩ সালে মিস্ উলিডেন আইডেন উক্ত দূরত্ব ২ মিনিট ২৭·সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সন্তরণ ইতিহাসে নূতন রেকর্ড করিয়াছিলেন। অপর দিকে হল্যাণ্ডের মহিলা সন্তরণকারী ইভা পোগলিন ২০০ গজ বুক সাঁতারে ২ মিনিট ৪০·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া মিস্ ভেজারের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিস ভেজার উক্ত দুরত্বটুকু ২ মিনিট ৪১·৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া রেকর্ড করিয়াছিলেন।

ডুরাণ্ড কাপ—

গত ১লা অক্টোবর তারিখে সিমলায় অনুষ্ঠিত ডুরাণ্ড কাপের ফাইন্যাল খেলাটী হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসর লইয়া উক্ত প্রতিযোগিতাটীর বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। বর্ত্তমান জয়ন্তী বৎসরে ফাইন্যাল খেলায় সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারস্ দল এন, ডব্লিউ, আর লোকো স্পোর্টস ক্লাবকে এক গোলে পরাজিত করিয়া উক্ত কাপটী লাভ করিয়াছে। রেল দল ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া একটি রেকর্ড করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ হারাইয়াছে। কারণ আজ পর্য্যন্ত যতবার ডুরাণ্ড খেলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রত্যেকবারে সৈন্যদলই জয়ী হইয়াছে। সৈন্যদল ভিন্ন এর পূর্ব্বে দুইটী বিভিন্ন রেলদল ফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। ১৯২৭ সালে ই, আই, আর দল ফাইন্যালে উঠিয়া ইয়র্ক ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেণ্টের নিকট পরাজিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৎসরেও এন, ডব্লিউ, আর দলও সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারস দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। সৈন্যদলের কাপ বিজয়ী হওয়া আদৌ সঙ্গত হয় নাই। কারণ রেলদল সর্ব্ববিষয়ে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সৈন্যদলকে কোণঠাসা করিয়া রাখে। রেলদল যে কয়টি অব্যর্থ গোলের সুযোগ পাইয়াছিল, যদি তাহাদের ফরোয়ার্ডগণ ঠিক মত গোলে সট করিতে পারিত তবে খেলার ফল অন্যরূপ দাঁড়াইত। তাহাদের ফরোয়ার্ডগণের লক্ষ্যভ্রষ্টতার জন্যই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী বৎসর হইতে উক্ত প্রতিযোগিতাটী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। তার কারণ সিমলায় প্রতিযোগিতাটী হইলে আগত দলসমূহকে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। সেই কারণে যাহাতে বিদেশাগত দলসমূহকে অসুবিধায় পড়িতে না হয় তজ্জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত বৎসরের বিজয়ী দল এ বৎসর সুবিধা করিতে পারে নাই। সেমি-ফাইন্যালে তাহাদের প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় লইতে হয়।

বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মৃত্যু:—

গত ১০ই অক্টোবর তারিখে লর্ড হক পরলোক গমন করিয়াছেন। যাঁহারা এম, সি, সির ক্রিকেট খেলার খবর রাখেন তাঁহাদের কাছে লর্ড হক একেবারে অপরিচিত নহেন, এ কথা বলা যাইতে পারে। মার্টিন ব্যারণ ব্লাডেন হক ১৮৬০ সালে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই এই খেলাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রথমে ইটন, পরে

কেমব্রিজ ও ল্যাঙ্কাশায়ার দলের অধিনায়করূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। লর্ড হক দশ বৎসর ধরিয়া ল্যাঙ্কাশায়ার ক্লাবের অধিনায়কত্ব করেন। এই সময়ে উক্ত ক্লাব আটবার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। তিনি সর্ব্বসমেত ১৩০০০ হাজার রাণ করেন।

তিনি ক্রিকেট খেলার উন্নতি বিধান কল্পে ছুইবার আমেরিকা ও আফ্রিকাতে গিয়াছিলেন। ১৮৯২-৯৩ সালে তাঁহার নেতৃত্বে ইংরাজদল আফ্রিকাতে সমুদয় টেষ্টে বিজয়ী হয়। তিনি এম, সি, সির সভাপতি ছিলেন। তারপর কিছুদিন বাদে শরীর অপটু হইয়া পড়ায় তিনি সভাপতি পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি একেবারে এই খেলার যোগসূত্র ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি এম, সি, সির কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উক্ত ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

আই, এফ, এ, দল—

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন তাহাদের পর্য্যটন শেষ করিয়া ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার মাদ্রাজ মেলযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক, সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারের উপস্থিতিতে হাওড়া ষ্টেশনের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। টিমের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন এম, দত্ত রায়, রহিম ও জোসেফ ব্যতীত সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এম, দত্ত রায় বর্ত্তমানে টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হইয়া সিংহলে অবস্থান করিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় আই, এফ, এ দলের খেলার ফলাফল এইরূপ হইয়াছে—সতেরটী খেলার মধ্যে ৭টীতে জয়ী, ৮টী খেলায় পরাজিত এবং ২টী খেলায় ড্র হয়।

টেনিস—

আমেরিকা টেনিস খেলায় যে জগতের অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে—ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি ফরাসী দেশের বিখ্যাত "লি অটো" নামক সংবাদপত্রে বর্ত্তমান টেনিস খেলোয়াড়দের এক ক্রম-পর্য্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়দ্বয় যথাক্রমে পুরুষদের বিভাগে ডোনাল্ড বাজ ও মহিলাদের বিভাগে মিসেস উইলস্ মুডী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। ডোনাল্ড বাজের সহিত কাহারও তুলনা করা যাইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে জগতে একই খেলোয়াড়ের পক্ষে উইম্বলডন, আমেরিকা, ফরাসী ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের টেনিস প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে দেখা যায় নাই। নিম্নে ক্রমপর্য্যায়ের তালিকা দেওয়া হইল।

পুরুষদের :—

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা)
জে, ব্রমউইচ (অষ্ট্রেলিয়া)
আর, এল, রিগস্ (আমেরিকা)
এস, বি, উড (আমেরিকা)
জে, হাণ্ট (আমেরিকা)
এইচ, ডব্লিউ, অষ্টিন (গ্রেটব্রিটেন)
জি, মাকো (আমেরিকা)
এ, কে, কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া)
আর, ম্যাঞ্জেল (চেক)
এফ, পুনসেক (যুগোশ্লাভিয়া)

মহিলাদের :—

মিসেস উইলস্ মুডী (আমেরিকা)
মিস, এ, মার্ব্বেল (আমেরিকা)
মিসেস হেলেন জেকব (আমেরিকা)
ম্যাডাম এইচ, স্পারলিং (আমেরিকা)
মিসেস এস, ফারিয়াল (আমেরিকা)
মিস ফ্যানসী ওয়ালী (অষ্ট্রেলিয়া)
ম্যাডাম জে, জেডরেস্ওয়াস্কা (পোলাণ্ড)
মিস ডরোথী বাণ্ডী (আমেরিকা)
ম্যাডাম আর মাথিইউ (ফ্রান্স)
মিস আর, এম, হার্ডউইক (গ্রেটব্রিটেন)

ধ্যানচাঁদ—

হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদ শীঘ্রই ঢাকায় স্থানান্তরিত

হইবেন। কোহাট হইতে দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান চতুর্দ্দশ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আগামী নভেম্বর মাস হইতে পলাশী ব্যারাকে মোতায়েন থাকিবে। ধ্যানচাঁদ এই রেজিমেন্ট দলের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া তাঁহাকে ঢাকায় থাকিতে হইবে। জনরব শুনা যাইতেছে যে, ঢাকায় অবস্থানকালে ধ্যানচাঁদ কলিকাতার কোনো একটি বিশিষ্ট হকিদলের পক্ষ হইয়া খেলিবেন।

মল্লক্রীড়ায় নারী—

লুধিয়ানার জুলফিকরগঞ্জে একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষের মধ্যে মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এই দুই-জনের মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য প্রায় ৫০ হাজার লোক জমা হইয়াছিল। ঐখানকার স্থানীয় বিখ্যাত মল্লবীর আলাউদ্দীন এবং মুসাম্মত হামিদাবানুর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় হামিদাবানু পরাজিত হন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নানা কথা

বিজয়া সম্ভাষণ

আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং অপরাপর সকল বন্ধুবান্ধবকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বড়-দিনের অবকাশে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে।

এ বৎসর সম্মেলনের অধিবেশনে পাঁচটি শাখা বিভাগ থাকবে, যথা:—সাহিত্য, শিল্পকলা, বৃহত্তর বঙ্গ, সমাজ-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান। ঐ সকল বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে অধিবেশনে সহায়তা করবার জন্য অনুষ্ঠাতৃপক্ষ বাঙলা দেশের লেখক সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছেন। প্রবন্ধ ও তার একটি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠাতৃ-পক্ষের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

কেহ যদি আলোকচিত্র সাহায্যে সর্বসাধারণের উপযোগী কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করতে ইচ্ছা করেন, তবে পূর্বাহ্নে জানালে সে বিষয়েও ব্যবস্থা হ'তে পারে। এ সংবাদও ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে।

এবারের অধিবেশনের কার্য নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত-রূপে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে—

সভাপতি—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি-এল
সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাশ এম্-এ
শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

পত্রাদি সম্পাদকদের নামে প্রেরিতব্য।

পরলোকে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু—

গত ২৪শে আশ্বিন, ইং ১১ই অক্টোবর ১৯৩৮, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি, শব্দরত্নাকর, তত্ত্বচিন্তামণি, এম-আর-এ-এস মহাশয় পর-লোকগমন করেছেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ, বিশেষতঃ ১৯৩৫ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ বসুর মৃত্যুর পর হ'তে, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। ভীষণ হাঁপানি রোগে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর হয়েছিল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিরাট কীর্ত্তি বাঙলা

বিশ্বকোষ সঙ্কলন। তিনি যখন মাত্র ১৯ বৎসর বয়সের বালক তখন এই দুরূহ কার্যের ভার দৈবক্রমে তাঁর উপর পতিত হয়। হরিদাস সাধু, বিজ্ঞানদর্শক, চিত্তচৈতন্ত উদয় প্রভৃতি পুস্তকাবলীর প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথের উপর। অদম্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের সহিত এই বৃহৎ কার্যে ব্রতী হ'য়ে দীর্ঘ ২৬ বৎসরে, তাঁর ৪৫ বৎসর বয়ক্রমে, বিশ্বকোষের সঙ্কলন সমাপ্ত করেন।

বাঙলা বিশ্বকোষ সমাপ্ত ক'রেই তিনি উপলব্ধি করলেন

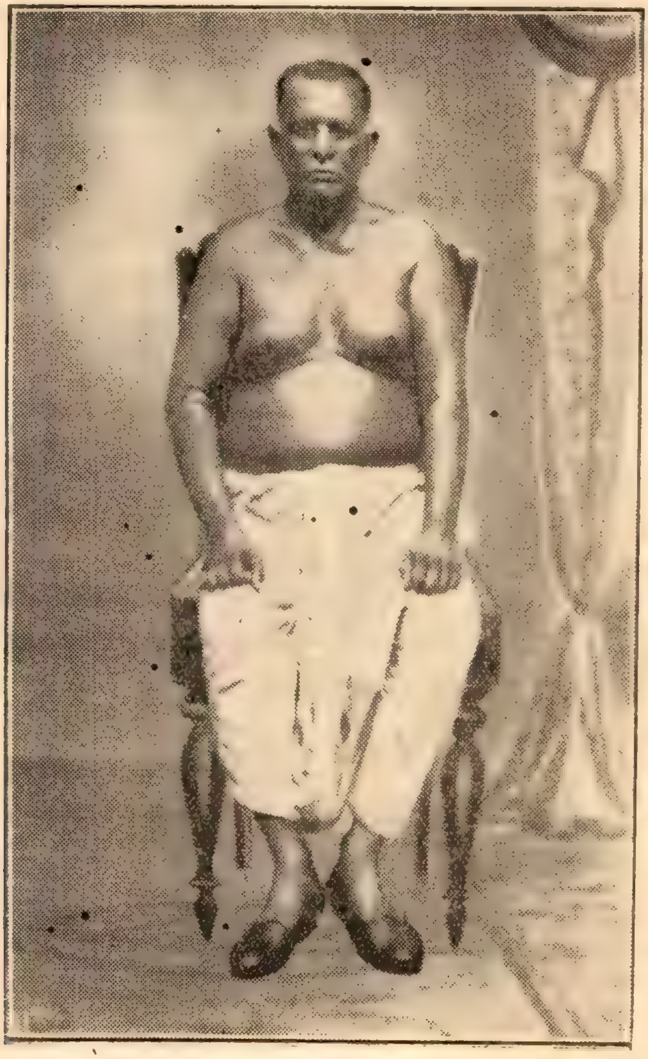

পরলোকে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে বিশ্বকোষের সঙ্কলন আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি মাত্র "অ" অক্ষর সমাপ্ত করেছিলেন, বাকি সমস্ত অংশ সঙ্কলনের ভার অর্পিত হয়েছিল বালক যে, একটি অনুরূপ হিন্দী বিশ্বকোষেরও অভাব এবং চাহিদা আছে। দুই বৎসর পরে তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে হিন্দী বিশ্বকোষ সঙ্কলনের

কার্য আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন হিন্দী বিশ্বকোষ শেষ হ'তে কতকটা বাকি ছিল। হিন্দী বিশ্বকোষের কথা তিনি অবগত ছিলেন, ২রা জানুয়ারী ১৯২৯ সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে যাবার পথে ৮নং বিশ্বকোষ লেনে উপস্থিত হ'য়ে তিনি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হিন্দী বিশ্বকোষের প্রকাশিত অংশ পরিদর্শন করে এবং বসু মহাশয়ের সহিত কথোপকথন ক'রে মহাত্মাজী বিশেষ ভাবে চমৎকৃত হ'ন এবং পরে ১০ই জানুয়ারীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বিশ্বকোষ পরিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কীর্ত্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত করেন।

বাঙলা ও হিন্দী বিশ্বকোষ বসু মহাশয়ের নাম বহুকাল ভারতবর্ষের মধ্যে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। বাঙলা বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এই আরব্ধ কার্য তিনি শেষ ক'রে যেতে পারেন নি। আমরা আশা করি বাকি কার্য যথাসময়ে পরিসমাপ্ত হবার বিষয়ে কোনও অসুবিধা হবেনা।

সাহিত্য জীবনের প্রথমাংশে বসু মহাশয় "তপস্বিনী" ও "ভারত" নামে দুইটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করেন। পরে দর্জিপাড়া নাট্য সমিতির জন্য "শঙ্করাচার্য" "পার্শ্বনাথ" প্রভৃতি কয়েকটি নাটক রচিত করেন।

দীর্ঘকালের জন্য বসু মহাশয় "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল তিনি "কায়স্থ পত্রিকাও" সম্পাদন করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী", জয়ানন্দের "চৈতন্য-মঙ্গল", জয়নারায়ণের "কাশী পরিক্রমা" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীরূপে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটে অবস্থান কালে তিনি ময়ূরভঞ্জের যে সকল পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কার করেন তদবলম্বনে তাঁর Archaeological Survey of Mayurbhanj নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" "History of Kamrup", "Modern Buddhism" প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তক রচিত করেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী জাতির যে ক্ষতি হ'ল তা সহজে পূরণ হবার নয়।

শ্রী—

এখানি একটি হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১১নং গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড কলিকাতা হ'তে শ্রীউপেন্দ্রনাথ নন্দীর পরিচালনায় তরুণ লেখকদের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। বর্ত্তমান বৎসরে পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে।

পত্রিকাখানির বহিঃসৌষ্ঠব দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। বহুসংখ্যক সুদৃশ্য চিত্র এবং আলোকচিত্রের দ্বারা সমৃদ্ধ এই বৃহদায়তন পত্রিকাটির আরম্ভ হ'তে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে যত্ন এবং অধ্যবসায়ের নিদর্শন দেখলাম তাতে এই পত্রিকাখানির মধ্য দিয়ে যাতে বাঙলা দেশ কয়েকজন ক্ষমতাশালী লেখক লাভ করতে পারে সে জন্য আন্তরিক কামনা করি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

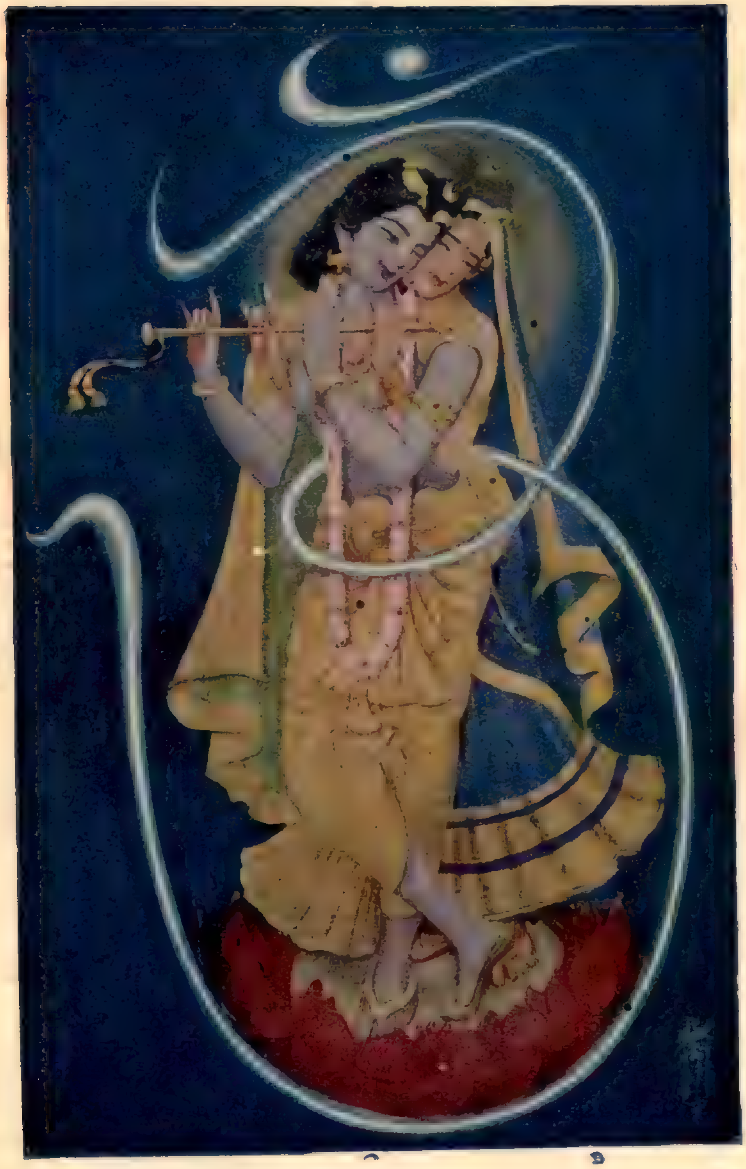

বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

রাধাকৃষ্ণ।

সি, এচ্ আরান, কোং'র
সৌজন্যে।

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	৫ম সংখ্যা

তোমারে কি চিনিতাম আগে

কেন মনে হয়
তোমার এ গানখানি এখনি যে শোনালে তা নয়।
বিশেষ লগ্নের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই এর সুরে ;
শুধু এই মনে পড়ে এই গানে দিগন্তের দূরে
আলোর কাঁপনখানি লেগেছিল সন্ধ্যাতারকার
সুগভীর স্তব্ধতায়, সে স্পন্দন শিরায় আমার
রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো
আজি দেয়ালির দিনে। আজো এই অন্ধকারে জ্বালো
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্র সভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়,—
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অনন্তের পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।
সেই স্মৃতি পার হয়ে মনে মোর এই প্রশ্ন লাগে,
কালের অতীত প্রান্তে তোমারে কি চিনিতাম আগে ?
দেখা হয়েছিল না কি কোনো এক সঙ্গীতের পথে
অরূপের মন্দিরেতে অপরূপ ছন্দের জগতে॥

দেয়ালি
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতার উত্তর

হে পরম আত্মীয়

শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

হে কবি, তোমার রত্নবেদীর তলে
কত পারিজাত মন্দার বৈভব,
কত গীতি সুর, আরতির ধূপ দীপে
নিত্য তোমার পূজার মহোৎসব।

আমি ঘাস ফুল, গন্ধ সুষমাহীন
পথের প্রান্তে রয়েছি সঙ্গোপনে,
দূর হতে তব স্বপন-মূরতিখানি
পূজেছি মনের গোপন পদ্মাসনে।

চিরজীবনের ব্যাকুল দুরাশা মোর
সার্থক হয়ে উঠিল অকস্মাৎ,
কেমনে না জানি পরম শুভক্ষণে
লভিনু তোমার প্রসন্ন আঁখিপাত।

তুচ্ছ ব'লেই করিলেনা অবহেলা,
ভেঙে ছিলে ভয় হে পরম আত্মীয়,
সকল দীনতা, সকল অগৌরব
আলোক-সুধায় ক'রে দিলে রমণীয়।

এনেছিনু দুটী গানের অফুট কুঁড়ি
অঞ্চলে ঢেকে কুণ্ঠিত উপহার,
অন্তরযামী, কেমনে বুঝিতে পেরে
আপনি তাহারে করিলে আবিষ্কার!

তোমার স্মৃতির চির-অক্ষয়দীপ
ঘুচাল আমার সকল অন্ধকার,
তোমার প্রীতির জোছনা কিরণ লেগে
হ'ল উচ্ছল মর্ম্মের পারাবার!

লজ্জা ভাঙিয়া এসেছে দুঃসাহস
তোমারই স্নেহের অযাচিত প্রশ্রয়ে,
মুখর হৃদয় এনেছে দেউল দ্বারে
অসংবদ্ধ বন্দনা গান ব'য়ে।

এত পেয়ে তবু অতৃপ্তি জেগে রয়,
লোভী মনে নেই দুরাশার অবসান,
আর কোন দিন তোমার পায়ের কাছে
বসিয়া শোনাব শুধু একখানি গান!

মনের মৃণাল ভ'রেছে অমৃত রসে
ফুটেছে তাহাতে আনন্দ শতদল;
ওগো অপরূপ, তারি মাঝে একবার
ক্ষণতরে রাখো রাতুল চরণতল।

পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতা এই কবিতার উত্তর

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[stamp]

১৮

ফোন করবার জন্য বাসনা প্রস্থান করলে অমরেশ ধীরে ধীরে সুগভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হ'ল। সেদিন গগন-বিহারীর গৃহ হ'তে প্রত্যাবর্তনের পথে মোটর থেকে অবতরণ ক'রে বাসনার কথা শুনে যে ক্ষীণ সংশয় তার মনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, আজ যেন তা সকল সংশয়ের সীমান্ত-রেখা পার হ'য়ে গেল! "পারুলের সঙ্গে কোথায় তোমার বিরোধ সত্যিই তা আমি বুঝি নে" অমরেশের এই উক্তির উত্তরে "তা হ'লে কোনো কথাই আপনার বুঝে কাজ নেই" বাসনার এই কয়েকটি কথা যেন তার অন্তরের অনেক কথাই প্রকাশিত করলে। দুর্মদ অভিমানের এই উচ্ছ্বসিত বাণী হয় ত এই কথাই নির্দেশ করলে যে, পারুলের সহিত তার বিরোধের যথার্থ কারণ সামাজিক নৈতিকতার মধ্যে ততটা পাওয়া যাবে না, যতটা পাওয়া যাবে ততোধিক জটিল এবং প্রবল কোনো হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে। অর্থাৎ, ঘৃণা এবং ঈর্ষা যেমন এক বস্তু নয়, ঠিক তেমনি পারুলের বিরুদ্ধে তার মুখের অভিযোগ আর মনের অনুযোগও এক বস্তু নয়।

কিন্তু এ সংশয় যদি সত্য-সত্যই মিথ্যা না হয় তা হ'লে বাসনার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখ গ্লানির অনিবার্য্যতা আশঙ্কা ক'রে অমরেশের মনে তীব্র দুশ্চিন্তা দেখা দিলে। জীবনের মধ্যে এই অসঙ্গতিকে প্রশ্রয় দিলে ফল তার কখনই ভাল হবে না, অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ড হাতে হাতে গ্রহণ করতে হবে। সরস উর্বর ভূমি পরিত্যাগ ক'রে শুষ্ক উষর ক্ষেত্র অবলম্বন করলে লতার কল্যাণ নেই, এ কথা বাসনাকে কে বোঝাবে?

মনে মনে অমরেশ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বল্‌লে—আমি ছাড়া আর কে বোঝাবে? আমিই বোঝাব। অনিষ্টের মূল যত শীঘ্র উৎপাটিত ক'রে ফেলা যায় ততই মঙ্গল;—সুতরাং বিলম্ব নয়, আজই।

কিন্তু তার এ সংশয় যদি বস্তুত অমূলক হয়, ঔষধ প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে ব্যাধির অস্তিত্বই নেই, তখন যে মহা লজ্জায় পড়তে হবে। অহেতুক চর্চার ধৃষ্টতা নিয়ে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না। কিন্তু তা হোক, এ আশঙ্কা বরণ করেও সে বাসনাকে সাবধান ক'রে দিতে প্রবৃত্ত হবে। এ ক্ষেত্রে নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবতে গেলে চলবে না।

ক্ষণকাল পরে বিরস অপ্রসন্ন মুখে বাসনা ফিরে এল। বন্ধ গভীর কণ্ঠে সে বল্‌লে, "আর আপনার অপেক্ষা ক'রে কোনো লাভ নেই, ওঁদের ফিরতে অনেক রাত্রি হবে। ওঁরা বল্‌লেন, যদি ইচ্ছে করেন রবিবারে বেলা ৯টার সময়ে দেখা করতে আস্‌তে পারেন। কিন্তু আমি বলি, তার আর বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে কি?"

অমরেশ বল্‌লে, "না, কিছুই নেই।"

আর চেয়ারে উপবেশন না ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাসনা বল্‌লে, "যা বলবার আমিই না হয় ব'লে দোবো?"

অমরেশ বল্‌লে, "তাই দিয়ো।"

"আচ্ছা, আর বোধ হয় আমাদের কোনো কথাবার্তা নেই।" ব'লে বাসনা গমনোদ্যত হ'ল।

অমরেশ বল্‌লে, "আর মিনিট দু-চার বস্‌লে তোমার বিশেষ অসুবিধা হবে কি বাসনা?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বাসনা ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে উপবেশন করলে।

কথাটা কি ভাবে আরম্ভ করবে মনে মনে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে অমরেশ বললে, "আমাকে যদি তোমার শুভাকাজ্ক্ষী ব'লে মনে কর বাসনা—"

অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে অধীরভাবে মাথা নেড়ে বাসনা বল্‌লে, "না, আপনাকে আমি আমার শুভাকাজ্ক্ষী ব'লে মনে করিনে!"

ক্ষণকাল অপলক নেত্রে বাসনার দিকে চেয়ে থেকে অমরেশ বল্‌লে, "তবে কি তুমি আমাকে তোমার অশুভাকাজ্ক্ষী ব'লে মনে কর?"

"হ্যাঁ, করি।"

শান্ত কণ্ঠে অমরেশ বল্‌লে, "তা হ'লে ত আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত আর সহজ হ'য়ে গেল। শোন বাসনা, এই অশুভাকাজ্ক্ষী লোকটির সঙ্গে আজ থেকে তোমার বাইরের বন্ধন ত আমি শেষ ক'রে দিলাম, ভিতরে যদি কোনো রকমের বন্ধন থাকে তা-ও তুমি শেষ ক'রে দাও। অশুভ গ্রহের সঙ্গে যোগ রেখে কোনো মঙ্গল নেই।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বাসনা বল্‌লে, "মঙ্গল নেই, তা' ত আপনি প্রমাণ করেছেন,—কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার ভিতরের কি বন্ধন থাকতে পারে বলুন ত?"

অমরেশ বললে, "সে কথা তুমিই বলতে পার।—আমি কি ক'রে বল্‌ব বল? ভক্তি শ্রদ্ধার কথা বলতে ত আর সাহস হয়না।—তবে পশু-পক্ষীর প্রতিও ত' মানুষের মায়া-মমতা থাকতে দেখা যায়,—আশ্চর্য হব না যদি আমারও প্রতি তোমার তেমনি একটা কিছু থাকে।"

উত্তপ্তস্বরে বাসনা বল্‌লে, "যদিই বা কিছু ছিল, এখন কিন্তু আর নেই।"

অমরেশ বল্‌লে, "তা হ'লে ভালই হয়েছে। যে অপাত্র তার বঞ্চিত হওয়াই উচিত।"

তীক্ষ্ণ চক্ষে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বাসনা বল্‌লে, "তাই? না, যে-পাত্র পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তাতে আর অন্য কোনো জিনিসের স্থান নেই?"

অমরেশের একবার ইচ্ছা হ'ল বলে, 'কথাটা বোধহয় নিতান্ত ভুল নয়।' কিন্তু জিহ্বাগ্রে এসেই কথাটা আটকে গেল; মৃদু স্বরে বল্‌লে, "তর্কের দ্বারা এসব কথার মীমাংসা হয় না বাসনা, তর্ক আজ থাক্। আজ তোমাকে আমি এই কথা বল্‌তে চাই যে, জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলোর সমাধান করবার সময়ে নিজের হৃদয়াবেগকে খুব বেশী প্রশ্রয় দিতে নেই; স্থৈর্যের সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে সকল দিক বিবেচনা ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়; যারা বয়সে বড়, যারা হিতৈষী, যাদের ভাল-মন্দ বিচার করবার শক্তি হয়েছে তাদের মতামত গ্রহণ করা উচিত।"

অধীরভাবে বাসনা বল্‌লে, "আচ্ছা, জীবনের বড় বড় সমস্যা সমাধান করবার সময়ে তাদের মতামত না-হয় গ্রহণ করব,—কিন্তু আপনি কি মনে করেন, পারুল আমার জীবনের একটা বড় রকমের সমস্যা?"

অমরেশ বল্‌লে, "না। বড় রকমের ত' নয়ই, ছোট রকমেরও আশা করি, নয়; অন্তত, হওয়া ত উচিত নয়।"

"তবে এসব কথার অর্থ কি?"

"তবু এসব কথা একেবারে অর্থহীন নয় বাসনা। পারুল তোমার জীবনের কোনো সমস্যা নয় তা নিশ্চয়, কিন্তু তোমার জীবনে অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

গভীর কৌতূহলে বাসনা জিজ্ঞাসা করলে, "কি সমস্যা?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে অমরেশ বল্‌লে, "উপস্থিত নরেনবাবু তোমার জীবনের সমস্যা হয়েছেন।"

অবিচলিত কণ্ঠে বাসনা বল্‌লে, "না। এ আপনার ভুল ধারণা। পারুল যদিও বা আমার জীবনের সমস্যা হ'য়ে থাকে, নরেনবাবু কোনো সমস্যাই নন। তাঁকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।"

"তুমি তা হ'লে তাঁর বিষয়ে মন স্থির করেছ?"

নির্বিকল্প প্রশান্তির সহিত বাসনা বল্‌লে, "কোনো দিনই ত' তাঁর বিষয়ে আমার মন অস্থির করিনি।"

একটু চিন্তা ক'রে অমরেশ বল্‌লে, "তা হ'লে অন্তত তোমার বাবা আর মার পক্ষে নরেনবাবু কঠিন সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌লেন, কারণ তাঁরা বোধহয় তোমার বিষয়ে তাঁকে কতকটা কথা দিয়ে রেখেছেন।"

বাসনা বল্লে, "তা হ'লে সে সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজেরাই করবেন,—আমি তার কি করব বলুন ? আমার সমস্যা ত' কেউ সমাধান করে' দেয় না। দেবেন আপনি আমার সমস্যার সমাধান ক'রে ?"

বাসনার প্রশ্নে অমরেশের মনে সামান্য চিন্তা দেখা দিলে ; মনে করলে এবার বুঝি প্রকৃত সঙ্কটের সম্মুখীন হবার সময় উপস্থিত হ'ল ; যে কথা উত্থাপিত করবার জন্য এতক্ষণ সে নানা দিক দিয়ে চেষ্টা করছিল স্বয়ং বাসনাই বুঝি এবার তা উত্থাপিত করলে ; মৃদু স্বরে বল্লে, "কি তোমার সমস্যা বল ?"

অমরেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বাসনা বল্লে, "হঠাৎ যদি জীবন অর্থহীন হ'য়ে যায় তা হ'লে সে জীবন নিয়ে মানুষ কোন্ পথে চলবে, এই আমার সমস্যা। কিন্তু থাক্ সে সমস্যার কথা—আমার সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করব।"

অমরেশ বল্লে, "কিন্তু বাসনা, নরেনবাবুর কথা নিয়ে আমরা যদি একটু আলোচনা করি তা হ'লে হয়ত তোমার সমস্যার খানিকটা সমাধান হ'তে পারে।"

এবার বাসনা হেসে ফেললে ; বললে, "ঠিক যেমন চাল জলে ফেলে একটু ফোটালে ডাল খানিকটা সিদ্ধ হ'তে পারে।" বলে ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

অমরেশও দাঁড়িয়ে উঠে, বললে, "কি ? এরই মধ্যে দু-চার মিনিট হ'য়ে গেল না-কি ?"

বাসনা বললে, "দু মিনিটও হ'য়ে গিয়েছে, চার মিনিটও হ'য়ে গিয়েছে ; এমন কি, দুই আর চারে ছ মিনিট, কিম্বা চার দুগুণে আট মিনিট, তাও হয়ে গিয়েছে।"

অমরেশ বললে, "কিন্তু দুয়ের পিঠে চার চব্বিশ মিনিট ত এখনও হয় নি।"

পূর্ব্বেকার কথোপকথনের ধারায় বাসনার চক্ষু হঠাৎ সজল হ'য়ে এল ; মনে মনে বললে, কিছুকাল আগে হ'লে চারের পিঠে দুই বিয়াল্লিশ মিনিটেও বোধহয় কুলোতো না, কিন্তু দিনকাল বদ্‌লে গেছে ; প্রকাশ্যে বললে, "কি হবে অদরকারি কথার মিথ্যে আলোচনা ক'রে ? তা ছাড়া, কিছু মনে করবেন না, এ প্রসঙ্গ গুলো একটু ব্যক্তিগত নয় কি ?"

অমরেশ বললে, "অর্থাৎ, আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা বলছ ?"

"যদিই বলি ?" বাসনার মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখা।

অমরেশ বললে, "তা হ'লে অন্যায় কথা বলবে ; কারণ মুখে তুমি যা-ই বলনা কেন, মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান যে, আমি তোমার হিতৈষী, শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং—"

অমরেশকে থামিয়ে দিয়ে বাসনা বললে, "ও আর বলতে হবে না, ও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মনে মনে আমি যদি জানি যে, আপনি আমার শুভাকাঙ্খী, তা হ'লে মনে মনে এ কথাও নিশ্চয় জানি যে, কিসে আমার শুভ, আর কিসে অশুভ, তা আপনি জানেন না,—সে বিষয়ে আপনার ভুল ধারণা আছে।"

বাসনার কথা শুনে অমরেশের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল ; বললে, "তাই নাকি বাসনা ? আমি কিন্তু তোমাকে এতক্ষণ এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে, কিসে তোমার শুভ আর কিসে অশুভ, সে কথা তুমিই জাননা, —সে বিষয়ে তোমারই ভুল ধারণা আছে !"

শান্তস্বরে বাসনা বললে, "তা হ'বে। নিমপাতা তেতো কি মিষ্টি তা হয়ত' আমিই জানিনে—সে বিষয়েও হয় ত আমার ভুল ধারণা আছে !" তারপর এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললে, "দেখুন, একটু আগে আপনি যে কথা বলছিলেন তা ঠিক,—তর্কের দ্বারা এ সব কথার মীমাংসা হয় না। সুতরাং এ সব কথা শেষ করাই ভাল।"

অমরেশ বললে, "শেষ ত' হয়েই গেছে। কিন্তু তোমার কি এখন বিশেষ কোনো কাজ আছে বাসনা ? মনে হচ্ছে তুমি যেন একটু ব্যস্ত হ'য়ে আছ।"

বাসনা বললে, "হ্যাঁ, একটু কাজ আছে—একটা জরুরী চিঠি লিখতে হবে।"

"আজ রাত্রেই ?—এত জরুরী।"

"হ্যাঁ, খুব জরুরী।"

"আচ্ছা, আমি তা হ'লে এখন চললাম। তুমি সুখী হও, সৌভাগ্যবতী হও বাসনা। জীবন তোমার সফল হোক, সুন্দর হোক্। এ ছাড়া আর আমার কিছু বলবার নেই।"

অমরেশের দিকে অল্প-একটু এগিয়ে এসে বাসনা বললে, "এ আপনি আশীর্বাদ করছেন, না প্রার্থনা করছেন ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে স্মিতমুখে অমরেশ বল্‌লে, "এ আমি কামনা করছি।"

গভীর মৃদুস্বরে বাসনা বললে, "আমি প্রার্থনা করি আপনার এ কামনা পূর্ণ হোক।" তারপর নত হ'য়ে অমরেশের পদধূলি গ্রহণ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, এবার তা হ'লে আসুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।" ব'লে অমরেশের অগ্রবর্তিনী হ'ল।

চলতে চলতে অমরেশ বললে, "আচ্ছা, তা না হয় চল,—কিন্তু হঠাৎ পায়ের ধুলো নিলে কেন বাসনা ?"

অমরেশের আগে-আগে চলতে চলতে বাসনা বললে, "হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল ব'লে।"

অমরেশের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "হঠাৎ ইচ্ছে হ'লে কোনো কাজ ক'রে ফেলাকে অভিধানে হঠকারিতা বলে। হঠকারিতার পরিণাম অনুশোচনা তা জান ত ?"

এ কথার বাসনা কোনো উত্তর দিলে না।

সিঁড়ির যে স্থান হ'তে অমরেশকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সেই পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে উপরে ফিরে এল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ ক'রে কিছুক্ষণ সে অন্ধকারে নিঃশব্দে শয্যার উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে রইল, তারপর শয্যা ত্যাগ ক'রে টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হ'ল।

চিঠির কাগজের ডানদিকের কোণে তারিখ এবং সময় লিখে ক্ষণকাল সে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। বোধ হয় কোন্ সম্বোধন শব্দ প্রয়োগ করবে সেই কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল। প্রথমে লিখলে 'শ্রীচরণকমলেষু'—তারপর কি ভেবে সে চিঠির কাগজখানা প্যাড থেকে খুলে ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে লিখলে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'। তারপর তার নীচে নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখে শেষ করলে।

"চিঠি আরম্ভ করলাম 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' দিয়ে—কিন্তু এ হঠকারিতা বশত নিশ্চয় নয়,—কারণ প্রথমে আর-একটা শব্দ লিখেছিলাম, পরে ভেবে-চিন্তে সে কাগজখানা বাতিল ক'রে লিখেছি 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'। সুতরাং, আশা করি আপনার হিসেব মত এর জন্য অনুশোচনা করতে হবে না।

যে জরুরী চিঠি লেখবার কথা একটু আগে আপনার কাছে বলছিলাম, তা যে এই চিঠিই, সে কথা বোধকরি না বললেও চলে। এ চিঠি লেখবার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরে ব্যক্ত করব,—তার আগে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আপনি আমাদের বাড়ি আসার পর বাক্যে এবং আচরণে আপনার প্রতি যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি তার জন্য আপনি আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন। এত দিন দেখে দেখে আমাকে জানতে ত আর আপনার বাকি নেই। এত বড় রাগী আর তার্কিক মেয়ে আপনি আর দেখেছেন কি-না জানি নে, আমি ত নিশ্চয় দেখি নি। আমার যখন পাঁচ ছয় বৎসর বয়স তখন আমার তর্ক করবার বহর দেখে বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন 'তর্কপটিষ্ঠা'।

আমার তার্কিকপনার পরিচয় এই দুই বৎসরে আপনাকেও কম পেতে হয়নি। তা ছাড়া, হরিদ্বার থেকে ফিরে আসার পর আপনার সঙ্গে যে রকম তর্ক করেছি তা'তে আপনি আমার নাম 'তর্কপটিষ্ঠা'র পরিবর্তে 'তর্কপাপিষ্ঠা'ও দিতে পারেন। তর্ক করব না ব'লে সঙ্কল্প নিতান্ত কম করিনে, কিন্তু কার্যকালে কিছুই মনে থাকে না। স্বভাবত যারা রাগী, তাদের স্বভাব পরিবর্তিত করার মত কঠিন ব্যাপার বোধহয় আর কিছুই নেই,—মনে হয় কয়লাকে ধুয়ে সাদা ক'রে ফেলার মতই তা অসম্ভব। এই সব কথা বিবেচনা ক'রে আপনি আমার প্রকৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।

এইবার আসল কথাটা বলি। কথা প্রসঙ্গে আজ আপনি বলছিলেন, 'পারুলের সঙ্গে কোথায় তোমার বিরোধ তা আমি বুঝতে পারিনে।' এই ধরণের কথা এর আগেও আপনি কয়েকবার বলেছেন। বুঝতে পারছি পারুলের সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমার আচরণ আপনার কাছে একটা রহস্য হ'য়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছেও তা যে একেবারেই রহস্য নয়, তাও বলতে পারি নে। আমিও এক-এক সময়ে আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি, আপনি আমাকে পড়ান, আমি আপনার কাছে পড়ি, সম্পর্ক ত এই;

—এর মধ্যে পারুল প্রবেশ করে কেমন ক'রে, আর কোথা দিয়ে! পারুলের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি; কিন্তু পারিনে; মনের মধ্যে খচখচ ক'রে সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে।

তথাপি, পারুল আমার পক্ষে তেমন কোনো সমস্যাই নয়; সমস্যা আপনি। আপনি না হ'য়ে যদি আমার আগে-কার শিক্ষক প্রোফেসার বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় হ'তেন তা হ'লে পারুল পারুলই থাকত, যেমন আরও শত শত পারুল রয়েছে, তা'তে কোনো ক্ষতিই হ'ত না। শুধু পড়াটুকু বুঝে নিলেই যার সঙ্গে দেনা পাওনার শেষ, কি প্রয়োজন তার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে? কিন্তু এই দুই বৎসর আপনাকে আমি শুধু শিক্ষক রূপেই পাইনি, পেয়েছি আমার জীবনের আদর্শ রূপে। আপনার শিক্ষা দীক্ষা রুচি অভিমত চরিত্রবল—এমন কি আপনার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত আমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেছি। এক কথায়, আপনার মাটিতে আমি আমাকে গ'ড়ে তুলেছি। আমার সৌভাগ্যক্রমেই বলুন, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বলুন, শুধু শিক্ষার প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গ আমার প্রয়োজনের বস্তু ছিল না, রুচির দিক দিয়ে আপনার সঙ্গ আমার কামনার বস্তু ছিল।

রুচির মিলের সঙ্গে মনের মিলের এমন অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে যে, আমাদের রুচির মিলকে ক্রমশঃ আমি আমাদের মনের মিলের মত একটা বস্তু ব'লে ভুল ক'রে বসেছিলাম। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে, অন্নবস্ত্রের অভাবই আশ্রয় লাভের একমাত্র দাবী নয়, মনের দিক থেকেও আশ্রয় লাভের একটা দাবী থাকতে পারে।—আজ যখন আপনি বললেন যে, আমি আশ্রয়হীন নই, তাই আপনার নিকট আমার আবেদন সম্পূর্ণ নিরর্থক, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তখন বুঝলাম আমার সে দাবীর মূল্য এক কানাকড়িও নয়। আমার আশ্রয় আছে, আমার অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই,—এ-যে আমার পক্ষে এত বড় একটা অপরাধ তা আগে জানতাম না। এই অপরাধের জন্যে পারুলের দাবীর বিরুদ্ধে আমার দাবী এত অবলীলার সহিত আপনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন।

এ আপনি কেন পারলেন তা জানেন? আপনি হয়ত বলবেন, যে যুক্তি-দেবতার আপনি উপাসক তার সহায়তায়, তার অনুগ্রহে। কিন্তু এ আপনার ভুল ধারণা। যে যুক্তি ভাল-মন্দর, পাপ-পুণ্যের ভেদ করে না সে যুক্তি যুক্তি-দেবতা নয়, সে যুক্তি যুক্তি-দানব। নিকৃষ্ট আর উৎকৃষ্ট, ইতর আর ভদ্রকে এক দৃষ্টিতে দেখাকে আপনি যে মনের উদারতা ব'লে মনে মনে দম্ভ করেন, বস্তুত কিন্তু সে জিনিস তা নয়, সে হচ্ছে ধর্মহীন ঈশ্বরহীন মনের অনাচার। তার মধ্যে বিচারের নাম-গন্ধ নেই।

আমি বুঝতে পারছি আমার এ কথাগুলো একটু বেশি রকম কটু হয়ে পড়ছে। কিন্তু যে সত্যকে সম্প্রতি আমি মনের মধ্যে খানিকটা উপলব্ধি করেছি ব'লে মনে করছি তাকে প্রকাশ না ক'রেও উপায় নেই। আমার মনে হয় আমাদের সামান্য মনের ছোট ছোট যুক্তি আমাদের জীবনের খুব বড় বড় ব্যাপারে খাটাতে নেই। যা দেখতে পাচ্ছিনে, শুনতে পাচ্ছিনে তা আমার পক্ষে নেই, অতএব প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরও অসিদ্ধ—এ রকম যুক্তির দ্বারা আমরা পাপাচার করি, ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করিনে।

এর দ্বারা ভাল হয় না,—আত্মার অকল্যাণ হয়। বিশ্বাসহীন, ঈশ্বরহীন, ধর্মহীন মন অবিনয়ী অসরস বস্তু। মায়া মমতার সহিত তার সম্পর্ক নেই। অন্তঃসার-শূন্যতার গহ্বরে যত কিছু সুলভ বাহাদুরীর আশ্রয়। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, পারুলকে আশ্রয় দিয়ে একটা খুব কীর্তি করেছেন ব'লে যে আপনার ভঙ্গী, তাও এই সুলভ বাহাদুরীর লক্ষণ।

আমিও এ থেকে অব্যাহতি পাইনি। ধর্মহীন শিক্ষার আবহাওয়ায় বাস ক'রে আপনার ছোঁয়াচ আমাকেও লেগেছে। তাই বোধহয় আমার বস্তুবিচারহীন মনে নরেনবাবুর প্রতি এত অবহেলা।

আমি কিন্তু স্থির করেছি আমার মনের গতি পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করব। কলেজের লেখাপড়া আমি ছেড়ে দোবো; যা হয়েছে আমার মত হিন্দুঘরের সাধারণ মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এবার থেকে আমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়ব,

বারব্রত করব, এমন কি পূজাপাঠেও মন দোবো। বিশ্বাসের অতল গর্ভে যুক্তি তর্ককে ডুবিয়ে দিয়ে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে যা কিছু শিক্ষা-পাঠ পেয়েছি সমস্ত বিস্মৃত হব। অর্থাৎ, মনকে নিষ্কণ্টক করব। তারপর যেদিন প্রথম অনুভব করব যে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার মতো আমার অধিকার হয়েছে, সেদিন তাঁর কাছে আমার প্রথম প্রার্থনা হবে, তিনি যেন আপনার অন্তরে প্রবেশ করেন, তাঁর জ্যোতির সোনালী রঙে আপনার মন যেন রঙিন হ'য়ে ওঠে। আপনি বলেন, আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু আমি বলছি, আমিও আপনার কম শুভাকাঙ্ক্ষিণী নই। সেইজন্য আজ আপনাকে ব'লে রাখলাম, ঈশ্বর আছেন—তা'তে কোনো সন্দেহ নেই।

এইটেই আজকে আমার প্রধান কথা বলবার ছিল, কিন্তু তখন বলতে সাহস পাইনি, পাছে এত বড় কথাটা তর্কে তর্কে ঝগড়ার মতো হ'য়ে দাঁড়ায়, যদিও চিঠিটাও অনেকটা সেই ধরণেরই হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু কি করব বলুন, অনেক জিনিসই আমি উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু যা পারিনে তা একেবারেই পারিনে। এ বিষয়ে আমার মনে মাঝামাঝি ব'লে কিছু নেই।

চিঠি হ'ল দীর্ঘ। মা আর বাবা ফিরে এসেছেন; আর, এখনো আমি খাইনি ব'লে মা একবার তাড়া দিয়ে গেছেন। সুতরাং এইখানেই শেষ করলাম। উত্তর পাবার কল্পনা ক'রে এ চিঠিতে কিছুই লিখিনি, সুতরাং উত্তর না পেলে বিস্মিতও হব না, দুঃখিতও হব না। বরং এ বিষয়ে আলোচনা এইখানে বন্ধ হয়ে যাওয়াই ভাল। এই চিঠিতে যদি কিছু অন্যায়, অসঙ্গতি, অথবা রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন। ইতি

প্রণতা

বাসনা

চিঠিখানা পরদিন প্রাতঃকালে ডাকে পড়ল, এবং অমরেশের হাতে পড়ল সেইদিন বৈকালে। মনোযোগ সহকারে চিঠিটা আদ্যন্ত পাঠ ক'রে একখানা চিঠির কাগজ নিয়ে সে লিখলে,

কল্যাণীয়াসু,

তবুও উত্তর দিলাম। জীবনের নূতন পথ তোমাকে সরসতা এবং সফলতার মধ্যে নিয়ে যাক, একান্তভাবে এই কামনা করি। ইতি,

শুভাকাঙ্ক্ষী

অমরেশ মুখোপাধ্যায়

চিঠিখানা পেয়ে বাসনা এই অতি-ক্ষুদ্র চিঠিখানার উপর দীর্ঘকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে রইল। তারপর মনে মনে অমরেশের নিকট আর একবার পরাজয় স্বীকার ক'রে চিঠিখানা তুলে রাখলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস একটা পড়ল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে মনটাও হ'য়ে উঠল রুক্ষ।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস

"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং"। প্রাতঃ-স্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অসংখ্য কীর্ত্তি-চিহ্নের কথা বিস্মৃত হইলেও যাঁহারা তাঁহার পুত্রের,—বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনাভূত মহাত্মার—সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা

রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন যে এরূপ পুত্রের পিতা যথার্থই পুণ্যবান ছিলেন। যে অটল সত্যনিষ্ঠা, যে কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা, যে গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা, যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, যে উদার বিশ্বপ্রেম, যে অকপট মাতৃভাষানুরাগ, ভূদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা তাঁহার যত্নে লালিত ও মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত পুত্র মুকুন্দদেবের চরিত্রেও সংক্রামিত হইয়াছিল। আমরা জ্ঞানে কখনও ভূদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, কিন্তু তাঁহার অসংখ্য পুণ্য কীর্ত্তিসমূহ দর্শন করিয়া, তাঁহার গভীর চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া, তাঁহার পবিত্র জীবনচরিতের আলোচনা করিয়া আমাদের মানস নয়নে যে উজ্জ্বল ঋষি মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার জীবন্ত প্রতিরূপ দেখিয়াছিলাম রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সরল, শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তিতে। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল ভূদেবকে চাক্ষুষ দেখিলাম। কবি হেমচন্দ্রের সেই ভূদেব-বর্ণনা মনে পড়িয়াছিল,—"ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে।"

আজ আমরা বঙ্গ জননীর সুসন্তান, এই নীরব কর্ম্মী ও একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

সন ১২৬৪ সালে ২৩শে অগ্রহায়ণ (ইং ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) চুঁচুড়া নগরীতে মুকুন্দদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র।

গৃহে বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষার পর তিনি হুগলী মডেল স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা, চরিত্রগঠন, প্রভৃতির জন্য তাঁহার মহাগুরু ঋষিকল্প পিতার নিকট তিনি ঋণী। কিরূপে এই শিক্ষালাভ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক বিবৃত দুইটি কাহিনী এই স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে।

বাল্যকালে একদিন মুকুন্দদেব মল্লিক কাসিম হাট দিয়া মডেল স্কুলে যাইবার সময় জলখাবারের দুই পয়সা "কুপন" খেলায় হারিয়াছিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে মাতা তাঁহার ক্ষুধার প্রাবল্য দেখিয়া প্রশ্নদ্বারায় ঘটনা অবগত হন। কয়েকদিন পরে ভূদেব স্কুল পরিদর্শনান্তে গৃহে

প্রত্যাগত হইলে তিনি এই বিষয় জ্ঞাত হন।* তিনি সংবাদ শুনিয়া মুকুন্দদেবকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকেন, "সে কার পয়সা? তুই কেন পাইবি? কেন তাহার উপর লোভ করিলি?" পরিশেষে বলেন "ঐ চেষ্টার জন্য মার হইল। যদি ঐ ভাবে পরের পয়সা প্রকৃতই পাইতিস্ এবং বাড়ীতে আনিতিস্ ত আরও মার

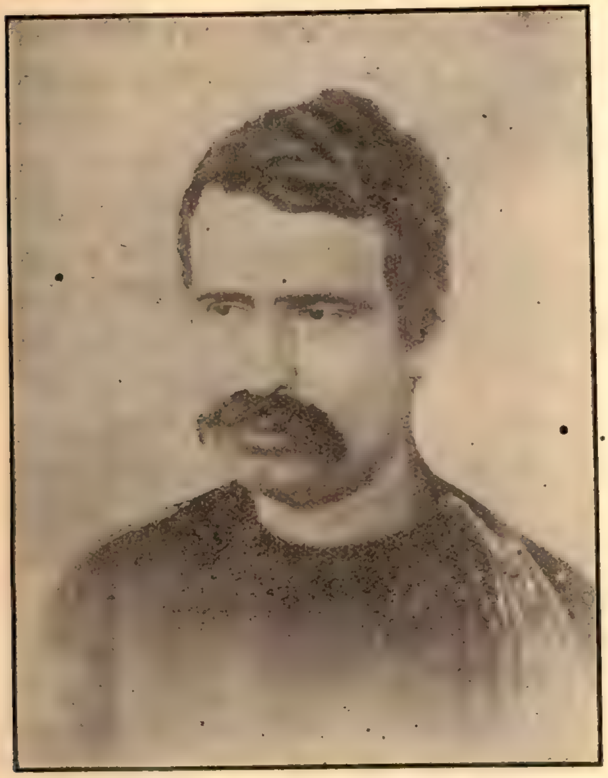

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই

হইত।" এই শিক্ষা মুকুন্দদেব জীবনে বিস্মৃত হন নাই এবং পরিণত বয়সে কেহ তাঁহার জীবন বীমা করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন যে নয় বৎসর বয়সে পিতৃদেবের যে ক্ষোভের ও ক্রোধের স্বর শুনিয়াছিলেন তাহা যেন তখনও কানে বাজিতেছে—'সে কার পয়সা, তুই কেন পাইবি?'

যখন মুকুন্দদেব ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন একদিন বালসুলভ চাপল্যবশতঃ বাড়ীতে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু।" ভূদেব পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পশ্চিম বঙ্গ কবে বিজিত হয়?" পুত্র ছাত্রবৃত্তির জন্য ইতিহাস মুখস্থ করিয়াছিলেন, বলিলেন "১২০৩ খৃষ্টাব্দে।" প্রশ্ন হইল "পূর্ব্ববঙ্গ?" উত্তর "আরও দুইশত বৎসর পরে।" "উড়িষ্যা?"—"আরও দুইশত বৎসর পরে।" ভূদেব বলিলেন, "তবে কি শীঘ্র শীঘ্র স্বাধীনতা বিসর্জ্জনই মনুষ্যত্বের লক্ষণ?" জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় পুত্রের চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। ভূদেব বলিলেন, "প্রথম মুসলমান আক্রমণের উপদ্রবে পশ্চিম বঙ্গ হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থ ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া 'বড়নদী' পারে হিন্দু-রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। প্রায় সকল কুলীন সন্তানের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বেই পূর্ব্বাঞ্চলে আমাদের সংবাদ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ পূর্ব্বপুরুষদিগের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জ্ঞাতিদিগের বাসভূমি।" এই সুশিক্ষায় মুকুন্দদেবের মুখে 'বাঙ্গাল' শব্দ আর কখন নির্গত হয় নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৩ই জুলাই মুকুন্দদেব তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীকে হারান। ইনি আদর্শ চরিত্রা রমণী ছিলেন এবং মুকুন্দদেবের চরিত্র গঠনে অল্প সহায়তা করেন নাই।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান। অতঃপর তিনি হুগলী কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবেশ লাভ করেন।

কলেজে ইংরাজী অধ্যাপক এফ-জে-রো এবং ইতিহাস অধ্যাপক আচার্য্য লালবিহারী দের উপদেশে তিনি বিশেষ উপকৃত হন। এই কলেজেই তিনি তাঁহার সতীর্থ সৈয়দ সখাওয়াৎ হোসেনের সহিত যে বন্ধুত্ব সংস্থাপন করেন,—সে বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। সৈয়দ সখাওয়াৎ হোসেন

একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন, এবং পরে ভূদেবের সাহায্যে কৃষিশিক্ষার বৃত্তি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইনি পরে ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। ইঁহার বিদুষী পত্নী বাঙ্গালাতে 'মহরম' সম্বন্ধে একখানি এবং 'মতিচুর' নামে আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া পতির স্মৃতিরক্ষা করিয়াছেন।

আচার্য্য লালবিহারী দে

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা ছাত্র বৃত্তি পান। পর বৎসর বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ধরাসুন্দরী দেবীর সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

কিছুদিন পিতার সহিত বাঁকীপুরে থাকিয়া পাটনা কলেজে অধ্যয়ন করত তিনি পুনরায় হুগলী কলেজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা-গৃহে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পেণ্টালুনের পকেটে গণিতের একখানা খাতা রাখিয়াছিলেন, উহা পকেট হইতে তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেব উহা কুড়াইয়া পান এবং খাতায় কাহারও নাম না থাকায় উহা কাহার খাতা জিজ্ঞাসা করেন। সত্যনিষ্ঠ মুকুন্দদেব তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার খাতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং কিরূপে ভ্রমক্রমে তিনি উহা পরীক্ষা-গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা বলেন। উহা হইতে নকল করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া গ্রিফিথস্ তাঁহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু টনি সাহেবের পরামর্শ লইলে তিনি বলেন যে পরীক্ষা-গৃহে খাতা লইয়া যাওয়ায় যে নিয়ম লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহার জন্য পরীক্ষা-গৃহ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। মুকুন্দদেব সে বৎসর আর পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রিফিথস্ সাহেব তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়াছিলেন এবং দুই বৎসর পরে যখন মুকুন্দদেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের জন্য আবেদন করেন তখন তাঁহাকে সানন্দে সচ্চরিত্রতার প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব প্রথম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে নর্ম্যাল স্কুলে গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। মুকুন্দদেব গণিতে তেমন পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া বি-এ তে গণিতের পরিবর্ত্তে উদ্ভিদ বিদ্যা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু গণিতের জ্ঞান অতি প্রয়োজন বলিয়া ভূদেব পুত্রের জন্য এই পদ প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মুকুন্দদেব সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দর ভাবেই অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রগণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ উপাধি লাভ করেন এবং ঐ বৎসরেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

প্রথমে তিনি নোয়াখালিতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

সেখানে ই-ভি-ওয়েষ্টম্যাকট্ নামক একজন সিভিলিয়ান তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ছিলেন। ইনি সব সময়ে মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিতেন না। একবার নাকি তিনি এক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে 'দুইজন কনষ্টেবল আধ ডজন হাইকোর্টের জজ অপেক্ষা অধিক উপকারী।' এরূপ মনোভাববিশিষ্ট কলেক্টরের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত স্বাধীন-প্রকৃতিবিশিষ্ট যুবক মুকুন্দদেবের কার্য্য শিক্ষা করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। একবার একজন য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই' এবং মুকুন্দদেব ম্যাজিষ্ট্রেটের উপদেশ সত্ত্বেও ছাত্রগণকে অব্যাহতি দেন। ইহাতে, বলা বাহুল্য, তিনি কিছুদিন কলেক্টরের রোষ কটাক্ষে পড়েন।

নোয়াখালিতে বেশীদিন শিক্ষানবিসী করিতে হয় নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর মুকুন্দদেব হাবড়ায় বদলী হন। হাবড়ায় আসিবার পূর্ব্বে মুকুন্দদেব চন্দ্রনাথ, বাড়বানল, সহস্রধারা, জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিয়া আসেন।

হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাকল্যাণ্ড খামখেয়ালী লোক

হুগলী কলেজ

কোন্ ছাত্রকে ছাতা দ্বারা প্রহার করেন। তিনি বলেন যে ভিড় সরাইতে গিয়া আঘাত করিয়াছেন, মারিতে ইচ্ছা ছিল না। ছাত্রটি তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিবে এই আশঙ্কায় ম্যাজিষ্ট্রেটের তিনি শরণাপন্ন হইলে ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব সেই ছাত্রকে ও অপর কয়েকজন ছাত্রকে দাঙ্গা করিতেছিল বলিয়া গ্রেপ্তার করান এবং মুকুন্দদেবকে গোপনে ডাকাইয়া তাহাদিগকে ৫০৲ করিয়া জরিমানা করিবার ইঙ্গিত দেন। কার্য্যভার গ্রহণকালে ভূদেব পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে বিচার কার্য্যে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাবড়ায় অন্যতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্‌ল্যাণ্ড বিশেষ ভাল ব্যবহার করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন প্রকৃতিই এজন্য অধিকতর দায়ী। একবার বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব আদেশ দেন যে মিউনিসিপ্যাল মোকদ্দমা প্রভৃতিতে এক টাকার কম জরিমানা করা হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র সেইদিনই ফুটপাথে বোঝা নামান, বেলাইনে ঘোড়ার গাড়ী রাখা, অভদ্রলোকের রাস্তার ধারে প্রস্রাব প্রভৃতির জন্য চারি আনা বা আট আনার পরিবর্ত্তে দুই আনাও জরিমানা করিয়াছিলেন।

একটি মিউনিসিপ্যাল নোটিসে Combustible কথার অনুবাদ করা হইয়াছিল 'জ্বলনীয়'। এই শব্দের অশুদ্ধি ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আসামীকে ছাড়িয়া দেন। বাকল্যাণ্ড সাহেব রাগিয়া নথির গায়ে লিখিয়াছিলেন insufferable pedantry (অসহ্য বিদ্যাড়ম্বর)। বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বলেন বা কমিশনার সাহেবের নিকট নথি প্রেরণের জন্য জিদ করেন। কমিশনার বীম্‌স্ সাহেব বঙ্কিমের অনুরাগী ছিলেন। অবশেষে বাকল্যাণ্ড তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। যাহাই হউক এরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটকেও মুকুন্দদেব (তাঁহার শুভার্থী বন্ধু সবডেপুটী প্রসন্নকুমার বসুর নিকট হইতে সাহেবের 'ধাত' অবগত হইয়া) বশে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রতিদিন হাবড়া হইতে চুঁচুড়ার বাটীতে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর মুকুন্দদেব আরেরিয়া, গয়া, আওরঙ্গাবাদ, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া তাঁহার উর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের সুখ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর তিনি ল্যাণ্ড রেকর্ডসের অধ্যক্ষের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বাটীর নিকটে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনও হইয়াছিল, কারণ, তাঁহার পিতার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে ভূদেব স্বর্গারোহণ করেন। পিতৃবৎসল মুকুন্দদেব তাঁহার পিতৃবিয়োগে যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

তাঁহার অন্যতম হিতৈষী স্যর হেনরী কটন মুকুন্দদেবের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে হুগলীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন মুকুন্দদেব শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হাবড়ায় বদলী হন।

অতঃপর মুকুন্দদেব বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে সুখ্যাতির সহিত রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। পুণ্যক্ষেত্র ৺বারাণসীধামে তিনি তাঁহার শেষজীবন যাপন করিতে সঙ্কল্প করেন।

মুকুন্দদেবকে বহু পারিবারিক দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমদেব এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম পুত্র গণদেব এবং এবং কিছু দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র রামদেবের মৃত্যুতে তাঁহার কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের পথ হইতে এতটুকু বিচলিত হন নাই।

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি-আই-ই

বাল্যকালে ঋষিকল্প ভূদেবের নিকট সদুপদেশ লাভার্থ বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনস্বীবর্গ যখন আগমন করিতেন তখন হইতেই মুকুন্দদেবের স্বদেশপ্রীতি, মাতৃভাষানুরাগ জাগরিত হইয়াছিল। পিতার আদেশে তিনি এডুকেশন গেজেটে বহুদিন হইতেই লেখকরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন এবং পিতার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শেষ আদেশ অনুসারে এই পত্রিকাখানিকে সুপরিচালিত করিবার জন্য জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা

গ্রন্থাকারেও তাঁহার জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—

(১) অনাথ বন্ধু (উপন্যাস) ১৩০৩ সাল

(২) নেপালী ছত্রী (ইতিহাস) ১৩২৩ সাল

ডাক্তার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩) সদালাপ ১ম ভাগ ১৩১৮ সাল

(৪) „ ২য় ভাগ ১৩২৩ সাল

(৫) „ ৩য় ভাগ ১৩২৩ সাল

(৬) „ ৪র্থ ভাগ ১৩৩৪ সাল

(৭) আমার দেখা লোক (স্মৃতিকথা)

(৮) ভূদেব চরিত ১ম ভাগ ১৩২৪ সাল

(৯) ভূদেব চরিত ২য় ভাগ ১৩৩০ সাল

(১০) „ ৩য় ভাগ ১৩৩৪ সাল

"অনাথবন্ধু" উপন্যাসে আদর্শ হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যে আদর্শ পরিবারের মধ্যে লালিত মুকুন্দদেবের যোগ্যতা যে কত অধিক ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। 'নেপালী ছত্রি'তে গ্রন্থকার নেপাল সম্বন্ধীয় বহু অজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। ১৩৩২ সালে এডুকেশন গেজেটে 'নেপালী গুর্খা নামে যে প্রবন্ধনিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই গ্রন্থে পুনঃ প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে প্রকাশিত 'সদালাপ নামক গ্রন্থে বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহা পাঠে বালকগণ চরিত্র গঠনে সহায়তা পাইবে। স্যর গুরুদাস এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন "ইহা কেবল বালক ও যুবকের নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।" "আমার দেখা লোক" নামক গ্রন্থে মুকুন্দদেব বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার সরল রচনাভঙ্গী ও আন্তরিকতা সহজেই মনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মুকুন্দদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি তাঁহার পিতৃদেবের জীবন চরিত। তিনখণ্ডে প্রায় তেরশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবিস্তৃত জীবন চরিত রচনা মুকুন্দদেবের অবসর-প্রাপ্ত (?) জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই জীবন চরিতের তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি বহুবিধ রিপোর্ট ও এডুকেশন গেজেটের প্রত্যেক পৃষ্ঠা, ভূদেববাবুর রোজনামচার প্রত্যেক পংক্তি, কীটদষ্ট পুরাতন পত্রাদির প্রত্যেক অক্ষর (সময়ে সময়ে লেন্স সহযোগে) মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করিয়াছেন। এবং ভক্তিনম্র হৃদয়ে তাঁহার পিতার স্মৃতির

প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেট সম্পাদন, ভূদেব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ড প্রভৃতির অধ্যক্ষতা এবং নানা দেশহিতকর কার্য্যের উপর তিনি অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি সহকারে এই জীবন চরিত রচনা করিতেন। ভগ্ন হৃদয়ে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শিরঃপীড়া হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভাগ ভূদেব চরিত প্রকাশের পর তাঁহার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয় এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া তাঁহার জীবন সংশয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তথাপি তিনি যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সাধন করিবার জন্য তিনি নিরলস ভাবে পরিশ্রম করিয়া যাইতেন। আমরা তাঁহার এই অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। যখন আমরা কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন চরিত রচনায় নিযুক্ত ছিলাম তখন তাঁহার সহিত আমাদের পত্রদ্বারা প্রথম আলাপ হয়। এদেশে অনেকেই এ সকল কার্য্যে জীবনীরচয়িতাকে কোনও রূপে সাহায্য করিতে ঔদাসিন্য দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু মুকুন্দদেব সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি হেমচন্দ্র ও ভূদেবের কয়েকখানি পত্র, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত ভূদেব লিখিত হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যের সমালোচনা প্রভৃতি স্বহস্তে নকল করিয়া পাঠাইয়া এবং নানাপ্রকার তথ্য দ্বারা আমাদিগকে অতি তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন তিনি কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (এবং তখন আমাদের প্রতিবেশী) পরম প্রীতিভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত ভবদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় চিকিৎসার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন তখন প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত এবং বৃদ্ধ বয়সে রুগ্ন শরীরে কিরূপে পরিশ্রম সহকারে তিনি ভূদেব চরিত রচনা করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমরা আমাদের আলস্য পরায়ণ জীবনকে ধিক্কার দিতাম।

১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে বিপুল পরিশ্রমে ভূদেব চরিত রচনা শেষ হইল। তাঁহার সুযোগ্যা দুহিতা অনুরূপা দেবীকে তিনি বলিলেন "তুমি এসেছ, তোমায় আমি চাইছিলুম, বাবার জীবন-চরিত শেষ হয়েছে। দুই বৎসরের আয়ু দিয়ে ওকে আমায় শেষ করতে হয়েছে। ছাপিয়ে যাওয়া আর চলবে না। এখন তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার দেশের লোক এ বই পাবে? আমার বাবার পুণ্য আদর্শময় জীবন চরিত তাঁহার দেশের লোককে দিতে না পারলে আমায় তাঁহাদের কাছে অপরাধী হয়ে যেতে হতো!"

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন "পিতৃশ্রাদ্ধের পর সেই দিনই বৈকালে আমায় যেতে ইচ্ছা আছে। বাবাকে যে আমি সব চেয়ে ভালবাসিতাম।"

২৪ শে বৈশাখ ভূদেব বাবুর মৃত্যু তিথি। মুকুন্দদেব যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। যথাবিধি অধ্যাপক বিদায় ও দানাদি করিলেন। সকলের আহার হইয়াছে কিনা সংবাদ লইলেন। সে দিন একাদশী। বিধবা কন্যা ও পুত্রবধূ আহার করেন নাই শুনিয়া বলিলেন 'দেখ একাদশীতে মৃত্যু ভাল নয়, বাড়ীর লোকের বড়ই কষ্ট হয়। দ্বাদশী

তিথি ভাল নয়, ত্রয়োদশীতে যাওয়াই ভাল।' ২৬শে বৈশাখ দিবা দশ ঘটিকায় ত্রয়োদশী তিথিতে ৺বারাণসী ধামে মুকুন্দদেব দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্যা কন্যা অনুরূপা দেবী ভূদেব চরিতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থ বাঙ্গালীকে কেবল পুণ্যশ্লোক ভূদেবের অলোকসামান্য চরিত্রের কথা, তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শের বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিবে না, তাহার সঙ্গে ভূদেবের 'হাতে গড়া', তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত, পিতৃগত প্রাণ পুত্র মুকুন্দদেবের কথাও চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

কামাল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ধরা যবে হয় গ্লানিভরা
মজ্জমান দুর্গতির গ্রাসে,
হেন্ কালে যুগে যুগে আসে
মুক্তিদাতা, পায় বসুন্ধরা
পরিত্রাণ তাঁদের প্রসাদে।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে হেরি
ক্ষণজন্মা বীর সিংহনাদে
বাজায় মুক্তির জয় ভেরী।

তুরস্কের কল্কি অবতার,
অবতীর্ণ হলে যথাকালে
স্বদেশেরে করিতে উদ্ধার
অপ্রধৃষ্য খর করবালে।
আবার আসিবে তুমি জানি
দুর্ব্বৃত্ত নিধনে খড়্গপাণি।

পদ্মা: প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসুবোধ বসু

এক

ইংরেজী ১৯২৯ শাল।

ল' কলেজ হষ্টেলের পাঁচতলার এক ঘরে বসিয়া রাত্রির আহারের পর গুটিকয় যুবক আড্ডা দিতেছিল; বস্তুতঃ তাকে আড্ডা না বলিয়া সঙ্গীতের আসরও বলা যাইতে পারে। পূর্ণানন্দ দাস এতক্ষণ ধরিয়া বাঁশিতে অতি সুমিষ্ট ভূপালী আলাপ করিয়া সবেমাত্র থামিয়াছে; বেচারাকে বিশ্রাম দিবার জন্যই গল্পগুজবের সূত্রপাত করা হইয়াছিল; তবে মুস্কিল এই, একবার গল্প সুরু হইলে থামিবার লক্ষণ দেখা যায় না; এবং বিষয়টা যদি একবার স্বরাজ বা সমাজতন্ত্রবাদে পৌঁছায় তবে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত তর্ক চলিতে থাকে। সিনেমা অভিনেত্রী হইলে রাত দশটার বেশি হয় না; নৃত্য পটিয়সী সুমনা চৌধুরির কথা উঠিলে আর কিছু বেশিক্ষণ চলে, এবং ল' কলেজের অধ্যাপকদের কথা উঠিলে দশ মিনিটের মধ্যে সকলের ঘুম পাইয়া যায়।

সমর ভটচাজ ছাত্রসমিতির সেক্রেটারি। ছাত্র ধর্ম্মঘট পরিচালিত করিয়া করিয়া এখন সে পাকা রাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। তার বিশ্বাস, বর্ত্তমান গতিতে সে যদি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকে, তবে অচির ভবিষ্যতে সে একদিন ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে দেশের সমগ্র শ্রমিকমণ্ডলীর ক্রুদ্ধ আক্রমণ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। সমুখের টেবিলটায় এক প্রচণ্ড চাপড় দিয়া সে কহিল—তোমরা যে স্বরাজ চাও, এ স্বরাজের অর্থ কি, জান? এর অর্থ শুধু এই যে দশবিশটা মিলের মালিক, দশবিশটা ধনী মহাজন, কিছু ধুরন্ধর বেকার নেতা, কিছু স্বার্থান্বেষী বিদেশী ধনিক তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার পরিপূর্ণতর সুযোগ পাবে।—কী লাভ হবে এতে সর্ব্ব সাধারণের, অগণিত মূক জনমণ্ডলীর, যারা সারা বছর হাল চষে করে' শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু খেতে পায় না, ধনীর ভোগের উপাদান সংগ্রহ করতে যারা কারখানার যন্ত্রদানবের উদরে নিজেদের বিসর্জ্জন দিয়ে ছিবড়ে হয়ে বেরিয়ে আসে? যে-স্বরাজ তোমাদের লক্ষ্য, পারবে তা এই বঞ্চিতদের বাঁচাতে? কি উপকারে লাগবে সংখ্যাতীত জনসাধারণের উপকারে এই তথাকথিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার? তোমাদের এ স্বরাজ তো কতগুলি মিল মালিকের স্বরাজ; জনসাধারণের স্বরাজ একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে: কিন্তু তোমাদের কংগ্রেস ও সম্বন্ধে তাদের মতামত এমন অস্পষ্ট করে রাখচে কেন?—জিজ্ঞেস করি, এই স্বরাজে বড় বড় মিল-মালিকদেরই বা এতটা আগ্রহ দেখি কেন?—

প্রবীর বর্দ্ধন কহিল,—মিল-মালিক হলেই কি তার স্বাধীনতার আকাঙ্খা লোপ পেতে হবে নাকি: এ তো তোমার অদ্ভুত মতবাদ!—এর কোনও যুক্তি নেই।

'অদ্ভুত নয়, যা অদ্ভুত তা' হল তোমার ধনিক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা'—সমর উত্তেজিতস্বরে কহিল। 'জগতের ধনিকে ধনিকে আছে পৈশাচিক সখ্য; সমস্ত জগৎ জুড়ে ধনতান্ত্রিকতার ষড়যন্ত্র চলচে; তাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে লুণ্ঠন, তাদের দর্শন হচ্চে—স্বার্থপরতা; তাদের স্বপ্ন হচ্চে, স্বর্ণ; তাদের ধর্ম্ম হচ্চে,—ভোগ; স্বাধীনতার স্পিরিচুয়াল

সিগনিফিকেন্স—যা তোমাকে আমাকে, যদু মধু হরিকে মুগ্ধ করে, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে'—জেলের মধ্যে পচিয়ে মারে,—ধনিক সম্প্রদায়ের তাতে সামান্য কাণাকড়িও এসে যায় না! স্বাধীনতার কোনও আধ্যাত্মিক মূল্য তাদের কাছে আছে? তারা টাকার দামে মূল্য হিসাব করে,—ওদের দেবতা—ম্যামথ্!'

তর্কটা হইতেছিল প্রধানত সুনন্দ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। সুনন্দের এক পিসামশায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির একজন হোমরা চোমরা;—ব্যবসায়ে ব্যারিস্টর। সুনন্দ তাই নিজেকে এই হুষ্টেলে বহুলাংশে নিজেকে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির কার্য্যাবলীর একজন পরিপোষক বলিয়া বিবেচনা করে; এবং একই কারণে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্রনেতা সমর ভট্চাজ তাকেই বিশেষ আক্রমণের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং তাহারই উদ্দেশে তাহার কংগ্রেস সমালোচনার শ্রান্তিহীন বাগ্মিতা নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

সুনন্দ কহিল,—স্বরাজ যদি না পাওয়া যায়, তবে সমাজতন্ত্রেরই বা প্রবর্ত্তন সম্ভব কি করে'—এই কথাটা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সমর ভটচাজ? আমরা সবাই এ বিষয়ে স্বীকৃত যে দেশের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা,—যাকে বলে,—ফ্রি প্রাইমারি এজুকেশান—প্রবর্ত্তন করা একেবারে অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রবর্ত্তনটা কে করছে শুনি? ফ্রি এডুকেশান একান্ত প্রয়োজনীয় বলে, আমাদের প্রভুরা মিলিটারী বাজেটটা কি একটু কমাবেন?—তবেই বোঝ,—যে কোনও কল্যাণকর আন্দোলনের Condition Precedentটা হচ্ছে স্বরাজ—অর্থাৎ রাষ্ট্রিক স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার। স্বরাজ লাভের আগে অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা হচ্ছে আত্মহত্যার নামান্তর। অর্থাৎ,—সেটা হবে—

'অর্থাৎ সেটা হবে'—কথা কাড়িয়া লইয়া সমর সব্যঙ্গে কহিল,—'কংগ্রেসের অর্থ সাহায্যকারী মিল মালিকদের স্বার্থ-বিরোধী—আর কিছু নয়।—যুদ্ধ যখন বেঁধেছে, তখন প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যটা নির্দ্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত; কেন আমরা যুদ্ধ করচি? কোন্ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লাভের জন্য, কোন্ নিঃসন্দেহ আদর্শের জন্য, কোন অভ্রান্ত কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করচি,—তা আগে থাকতেই ঠিক করে নাও। জনসাধারণের সহানুভূতি যদি আকর্ষণ করতে চাও, গণ-বাহুর শক্তি যদি লাভ করতে চাও,—তবে তোমাদের চরম উদ্দেশ্যের রূপটা তাদের দেখতে দাও।—অর্থনৈতিক পরাধীনতা রাষ্ট্রিক পরাধীনতার চাইতে কম পীড়াদায়ক, কম পাশবিক নয়; যুদ্ধ যখন একবার আরম্ভ হয়েচে, তখন সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা কষা হয়ে যাক;—দুবার করে যুদ্ধ করা কারুর পক্ষেই লাভের নয়। তোমাদের বড় বড় কংগ্রেস-নেতারা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে অভিমত ব্যক্ত করছেন না কেন?—Issueটা এমন করে ধোঁয়াটে করে রাখার হেতুটা কি?—

সুনন্দ কহিল—কেন, পণ্ডিত জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি তো এ সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত গোপন রাখেন নি; তাঁরা তো স্পষ্ট করে নিজেদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন; তাঁরা তো বলেছেন:—

'তাঁরা যাই বলুন না,—তাতে কংগ্রেসের কিছু এসে যায় না। আমি এ কথা অবিশ্বাস করি না যে এরা হয় তো এক সময়ে তোমার কংগ্রেসের কর্ণধার হতে পারেন; কিন্তু এখন কিছুতেই কংগ্রেস এদের মত মতন চলছে না।—কংগ্রেস কাদের মত মতন চলছে শুনবে?—তাদের নাম করবো?—না, থাক,—কিন্তু তারা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, এটা অতিশয় নিশ্চিত,—এতে—'

'সমাজতন্ত্রও একটা নির্ভুল ত্রুটীহীন সমাজব্যবস্থা নয়, এটাও তোমার জেনে রাখা উচিত'—সুনন্দ পিশামশায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ কংগ্রেসের বামপন্থীদের উদ্দেশে কহিল—'একটা practical ব্যবস্থা হিসাবে সোসিয়ালিজম্ কতটা সচল, এখনও তার প্রমাণিত হ'তে বাকি আছে।—এটা হচ্ছে মানুষের চিরন্তন handicap যে তার কল্পনা তার সামর্থ্যের অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করে; যাকে আমরা ভাল বলে কল্পনা করতে পারি, জীবনে তার রূপ দিতে গিয়ে ভালর চাইতে যদি মন্দ বেশি করে বসি, তাতে বিস্ময়ের কিছুই হবে না।—রাশিয়ার নব্য ব্যবস্থা অত্যন্ত অল্পদিনের; এখন পর্য্যন্তও তা বিস্ময়কর কোনও ফল প্রসব করে নাই। দুর্ভিক্ষ, ব্যক্তিস্বাধীনতার হ্রাস, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং

গোলযোগ—আমরা তো প্রধানত এই দেখতে পাচ্চি।—অন্ততঃ এমন কোনও বিস্ময়কর উপকার দেখতে পারচি না, যার জন্য ভারতবর্ষে তাকে প্রবর্ত্তন করতে কিছু দেরি হলে মারাত্মক হবে। তোমার সোসিয়ালিজম্ নিয়ে মাতামাতি কদিন পরে করলেও চলতে পারবে;—দেশে এমনি যেন বাদবিসম্বাদের অভাব আছে;—তার ওপর সোসিয়ালিজম্ চাপিয়ে আর মারামারিটা বাড়ান কেন?'

সমর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল; অধৈর্য্য হইয়া সে কেবলি প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া সক্ষম হইতেছিল না,—সুনন্দও বক্তৃতাতে এমনি দক্ষ। সুনন্দও ছাত্র-নেতা; তবে তাদের প্রতিষ্ঠান সমরদের প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন—এমন কি এদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। কাজেই উপস্থিত সবাই বুঝিল,—তর্ক-যুদ্ধটা আজ রীতিমত জমিয়া উঠিবে, এবং আসে পাশের ঘরে কাহারও নিদ্রা যাওয়া আর সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। সঙ্গীতের আসর জমিবার আর কোনও সম্ভাবনাই রহিল না; বাঁশির স্থানে অসি (বাচনিক) আসিয়া আস্ফালন করিয়া উঠিল।

'বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি' সমর আরম্ভ করিল, 'অত্যন্ত শোচনীয় বুর্জ্জোয়া arguments যা দিয়ে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধনিকেরা নিষ্পেষিত শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী চাপা দিতে চেয়েচে।—কিন্তু সত্যকে কেউ চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে না,—কবি যাকে বলেছেন—'ব্যথায় না হয় ম্লান, আঘাতে না ট'লে।'—যদি সোসিয়ালিজমের ক্রিটিসিজমের কথাই তুললে, তবে আমার কাছ থেকেই তার উপযুক্ত জবাবটা শোন; স্পষ্ট করেই প্রসঙ্গটা আমি ওঠাচ্চি—

'দেখ্ সমর,—তোর লাফালাফিটা একটু থামাতো;—আমি এখানে পূর্ণের বাঁশি শুনতে সবাইকে ডেকে এনেছিলাম,—সমাজতন্ত্রের বক্তৃতা শুনতে নয়। থাম, একবার।—পূর্ণ, তুই বাঁশি ধর,—চমৎকার একটা রাগিণী চাই,—যা শুনে, ক্যাপিটালিজম্ এবং সোসিয়ালিজম্, দুই যেন tremble and die!

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলটার ছায়ার অন্ধকারে একটী যুবক শুইয়াছিল,—সমরকে যুদ্ধের জন্য গলা সানাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাবধান করিল। শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনি উঠিল—হিয়ার হিয়ার! রাজনীতি হইতেও যে এরা সঙ্গীত পছন্দ করে, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারা গেল।

সমর বক্তৃতা উদ্যত করিয়াছিল,—বাধা পাইয়া রাগিয়া কহিল—বুর্জ্জোয়া অব দা বুর্জ্জোয়াস্! জমিদার,—প্রজার রক্ত খাস,—সোসিয়ালিজম্ ভাল লাগবে কেন?—তুই যে এতটা heartless,—তা আমি জানতাম না, রজত।

রজত হাসিয়া কহিল, 'থাম,—বেশি বাজে বকিস না; আর্ম-চেয়ার সোস্যালিষ্ট,—ঘরে বসে বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন! পারিস এখন গোলদীঘির পারে গিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিতে—সাহস আছে? তবে যা না;—জগতের কিছু উপকার হবে। কেন শুধু শুধু এতটুকু ঘরে এতটা বাগ্মিতা নষ্ট করে ফেলচিস, আহাম্মুক; চুপ করে বাঁশি শোন, নইলে গোল্লায় যা—যা তোর ইচ্ছে।' পূর্ণ ধ'র তোর বাঁশি;—ওর নার্ভগুলো ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেচে; সুর হয় তো ওর পক্ষে ওষুধের কাজ করতে পারে।—এই উঠছিস কেন?—উচ্চশ্রেণীর সুর না বাজিয়ে তোর জন্য মাঠের সুর বা কারখানা-ই রাগিণী বাজাবে এখন—'

'রোম যাচ্চে পুড়ে, এদিকে নীরো বাজাচ্চেন বাঁশি', বলিয়া সমর তীব্র আপত্তির ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হয়ে উঠচিস রজত তুই: a promising youngman like you—কষ্ট হয়! যদি Spiritual death এড়াতে চাস্, তবে ঐশ্বর্য্যের বন্ধনগুলি দূর কর'—বলিয়া অতিরিক্ত দৃপ্ত পদক্ষেপে সমর বাহির হইয়া গেল।

রজত মুচকি হাসিয়া কহিল—তুই নির্ঘাৎ চুরুট আনতে যাচ্চিস্; নইলে তোর এতটা বীরত্ব!—

সমর কহিল—যাচ্চিই তো,—একশো বার; স্বার্থপর ধনিক,—চুরুট খাস্ যে Communism করবো? নইলে কি দরকার ছিল আমার উঠবার—এক চোখো বুর্জ্জোয়া?'

'দূর হ' দাড়ি-না-কামানো কম্যুনিষ্ট'—রজত কহিল। 'তুই সুরু কর, পূর্ণানন্দ।'

পূর্ণানন্দ সুরু করিল। এবং রজত পুনর্ব্বার চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল।

রজতের মধ্যে শৈশবের রাজাকে খুঁজিয়া পাইতে দেরি হয়; কত বড়ই না সে হইয়া উঠিয়াছে। সেই এক রতি হাওয়ার মত চঞ্চল শিশু আজ দীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ যুবা। গায়ের রঙ উত্তম শ্যামবর্ণ, নাকটা খড়্গের মত তীক্ষ্ণ; রাজার দুর্ব্বলতার সঙ্গে রজতের বলদৃপ্ত দেহভঙ্গীর তুলনা করিলে তাহারা দুজনে একই লোক বলিয়া সহসা প্রত্যয় হইবে না। তবে এক জায়গায় শৈশবের সঙ্গে তার একান্ত সংযোগ রহিয়াছে; তার মধ্যে যে-ব্যক্তিত্ব, যে-সহজ গৌরব ও তেজদৃপ্তা অবিসংবাদীরূপে বন্ধুমহলে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়, শৈশবেও তাহা প্রায় এমনি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপ্রসন্নের মৃত্যু হইয়াছে। প্রিয় পুত্রের ঘর বাঁধা তিনি আর স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না,—কিন্তু রজতের যে পরিচয় তিনি পাইয়া গিয়াছেন, তাতে তাঁর সংশয় থাকে নাই যে বড় হইলে পুত্র যোগ্যতায় পিতাকে ছাড়াইতে পারিবে। পূর্ব্বে তিনি তার এক এর্টনী বন্ধুর কাছে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, রাজা সাবালক হইলেই সমস্ত কর্ত্তৃত্বের ভার তাহাকে অর্পণ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা ছিল। রাজার তত্ত্বাবধানে তাঁর সম্পত্তি এবং প্রজারা যে ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাঁহাতে তাঁর সন্দেহমাত্র ছিল না কোটালনগরকে তিনি অপূর্ব্ব সম্পন্ন জনপদে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন; রাজার কাছে তাঁর একমাত্র অনুরোধ ছিল সে যেন কোটালনগরকে ত্যাগ না করে,—তার এত স্বপ্নের, এত কল্পনার জনপদকে সে যেন সার্থক করিয়া তোলে। রজত এ-পর্য্যন্ত পিতার সে আদেশ প্রতি বর্ণে পালন করিয়াছে; কলেজের যখন ছুটী হয়, বন্ধুবান্ধবেরা কেহ যায় পাহাড়ে, কেহ যায় সমুদ্রে, কেহ যায় সাঁওতাল পরগণার ঢেউ খেলান প্রান্তরে; কত জন তাহাকে আমন্ত্রণ করে সঙ্গী হইতে, কত বন্ধু অনুরোধ করে; কত প্রলোভন দেখায় পার্ব্বত্যশ্রীর; কিন্তু প্রতি ছুটীতে রাজার কোটালনগর যাওয়া চাই; সেখানে গেলে সে যেন তার বাবার সান্নিধ্য অনুভব করে,—দুর্গাপ্রসন্নের কীর্ত্তিগুলি তাকে পিতৃগর্ব্বে গর্ব্বিত করে। কি গভীর বেদনায়, কি তুলনাহীন হতাশায় তার পিতা যে এই গ্রামপত্তন করিয়াছিলেন, কি সুগভীর আক্রোশে তিনি যে এই কোটালনগরকে সম্পদে, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আজকাল রজত তার অনেকটাই বুঝিতে পারিতেছে। তাই পিতার জন্য এক সুগভীর শ্রদ্ধায় তার বুকটা পূর্ণ হইয়া ওঠে।

রজত সাবালক হইয়াছে। তাঁর পিতৃবন্ধু এর্টনী সত্যানন্দ মিত্র এক বছর পূর্ব্বে এক প্রকার জোর করিয়াই তাকে সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়াছেন। রজত কহিয়াছিল—এত তাড়া কেন, কাকাবাবু; সম্পত্তি তো আর আপনি খেয়ে ফেলছেন না; পড়াটা না হয় শেষ করে নিই।

বৃদ্ধ সত্যানন্দ হাসিয়া জবাব দিলেন—পড়বে বৈ কি,—নিশ্চয়ই পড়বে। সম্পত্তি তদারক ক'রে তুমি পড়াশুনার ব্যাঘাত করবে, সে কি আমিই চাই, বাবা।—সব আমিই দেখাশুনা করব; সব হাঙ্গামা পোয়াবার ভার এই বুড়োর; কিন্তু আইন মতে তুমি মালিক হও,—তার পর তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপরে দিও, দুর্গাপ্রসন্ন তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার জন্য যেন পাগল হয়ে উঠেছিলেন;—সব দিক দিয়ে এমন ধীর স্থির যে লোক, নাবালক ছেলের হাতে সম্পত্তির সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে যাবার জন্য কি বিষম তার জেদ; সব কিছু তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারলে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—তোমাকে দিয়ে যেতে পারলে সে যেন ধন্য হয়ে যায়;—তাই, বাবা, সম্পত্তি তোমাকে হাতে নিতেই হবে; দেরি হলে সে কষ্ট পাবে যে।

সত্যানন্দবাবুই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে রজত বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকুক। এত বড় ধনীর সন্তান কলেজ-হষ্টেলের অসুবিধায় কষ্ট পাইবে, ইহাই ছিল তাঁর ভয়। কিছুদিন সত্যানন্দবাবুর বাড়িতেও রজতকে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু রজত অত্যন্ত সঙ্গীপ্রিয়; বন্ধুবান্ধব না হইলে তার চলে না। এম্‌-এ এবং ল' ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াই

সে ল’ কলেজ হষ্টেলে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এবং সেখানে তার বিবিধ সম্পত্তি লইয়া এক কম্যুনিষ্ট-প্রথার প্রবর্ত্তন—তার জামা, জুতা, মাথার তেল সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া গেল।

পূর্ণানন্দের বাঁশি অপূর্ব্ব হইয়া বাজিতেছে। কি বর্ণনাতীত মধুর সে সুর। নিদ্রালস মধ্যরাত্রের কোন এক অজ্ঞাত জায়গায় অব্যক্ত আকুলতা আত্মগোপন করিয়াছিল; উন্মাদী যৌবন বাঁশির মন্ত্রে অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে; এমন যোগাযোগ না হইলে এমন বাঁশি বাজেনা; চাই নিদ্রিত রাজপুরীর স্পন্দনহীন অন্ধকার; চাই স্বপ্নবিলাসী যৌবনের রহস্যময় অনুভূতি; চাই অব্যক্তের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা—মানুষের চৈতন্যের সঙ্গে তার এক অপূর্ব্ব মিতালীর অভিপ্রায়।—তবেই না এমন করিয়া বাঁশি বাজিতে পারে! কোন্ রহস্যের আভাস পাইয়াছে পূর্ণানন্দ? কোন্ সৌন্দর্য্য কোন রঙীন আশা, কোন্ বেদনা তাহাকে এ সুর জোগাইল?

এমন সময় মস্ত মোটা এক চুরুটে ইঞ্জিনের মত ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সমরের পুনঃ প্রবেশ।

প্রবীরই তাহাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাইয়াছিল—সামান্য পরিহাসের সুরে কহিল—এই যে! বর্ম্মা চুরুটের পশ্চাতে কার্ল মার্কস-এর প্রবেশ!

সমর চকিতে দাঁড়াইয়া পড়িল: এবং প্রচণ্ড এক গর্জ্জনে বাঁশিকে ধিক্কৃত করিয়া কহিল—খবরদার বলচি; আর যা কর, তা কর; কার্ল মার্কসকে নিয়ে ঠাট্টা করো না, সেটা সহ্য করবো না। বলিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সমুখের চেয়ারটায় গভীর প্রতিবাদের সঙ্গে বসিয়া পড়িল।

বাঁশি বলিল—পিউ পিউ পিউ পিউ।

দুই

‘শুনচেন?’

ল’-ক্লাস অন্তে রজত হষ্টেলে ফিরিতেছিল। স্নান আহারাদি করিয়া এম্-এ ক্লাসে আসিবার জন্য এক ঘণ্টা সময় থাকে, এবং কলেজের গায়েই হষ্টেল বলিয়া হষ্টেলবাসী ছেলেরা প্রায় কেহই স্নান বা খাওয়া সারিয়া আসে না। আশুতোষ বিল্ডিংস ও দারভাঙ্গা বিল্ডিংস-এর মধ্যে দোতলায় যে প্যাসেজ আছে সেখান হইতে আহ্বান শুনিয়া তেতলার এ-প্রান্তের রেলিঙের কাছে রজত দাঁড়াইয়া পড়িল; নিচে তাকাইয়া দেখিল এম-এ ক্লাসের সহাধ্যায়িনী মঞ্জুরী রাঙা মুখ এবং পক্ষ্ম উর্দ্ধায়িত করিয়া তাকাইয়া আছে। রজতের সঙ্গে চোখাচোখি হইলে মঞ্জুরী অনুচ্চস্বরে ডাকিল—একটু শুনুন, রজতবাবু!

রজত নামিয়া আসিল। কহিল, কি ব্যাপার, বলুন তো?

মঞ্জরী কহিল,—সাহায্য চাই; এড়াতে চেষ্টা করবেন না, আগেই বলে রাখচি।’

মৃদু হাসিয়া রজত কহিল—গুণ্ডা পিছু নেয় নি তো? অবশ্যই সাহায্য করব: একজন ভদ্রমহিলাকে বাঁচাব, ও আর করব না; বলুন, কোথায় সেই দুর্বৃত্ত।

মঞ্জরী হতাশার অভিনয় করিয়া কহিল,—কেবলই পরিহাস করবেন; সীরিয়স হওয়া কি আপনাদের মধ্যে আর ক্যাসান নয়? গুণ্ডা আক্রমণ করলে আপনাদের সাহায্য চাইবই বা কেন; হিল-উঁচু জুতো কি অমনি পায়ে দিই?

‘আশ্বস্ত করলেন’—রজত সামান্য গম্ভীর হইয়া কহিল। ‘তবে একটু দেরি হলেও চলবে। এদিকে আমার স্নানাহার কিছুই হয়নি; আপনার সামান্যতম দেরি করা সম্ভব হলে সে ছুটো সেরে আসি; ক্লাস আরম্ভ হতে আর দেরি নেই।’

‘যান, চাই না আপনার সাহায্য; আপনি যান্ গিয়ে’ বলিয়া মঞ্জরী অনাবশ্যক উগ্রতার সঙ্গে ডান কাঁধটা ভঙ্গিভরে ঘুরাইয়া লইয়া পাশ ফিরাইল; তার শাড়ির আঁচলের প্রত্যন্ত দেশটা ওড়নার মত ফুলিয়া উঠিয়া মঞ্জরীর অভিমানের অনুকরণ করিয়া অবশেষে ওর স্কন্ধ ও দক্ষিণ বাহুর উপর আঁটিয়া বসিল।

‘না হয়, নাই খেলাম। বলুন কি করতে হবে।’

‘‘টিকেট বিক্রি করে’ দেবেন’—ওদিক হইতে মঞ্জরীর জবাব আসিল।

'টিকিট ? কিসের ?'

'আগে প্রমিশ করুন।' মঞ্জরী এমন একটা সুরে বলিল যাহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে পরিপূর্ণ ভাবে এই সর্ত্তে রাজি না হইলে সে মুখটা এদিকে আর না ফিরাইয়া সোজা আশুতোষ বিল্ডিংস-এ যাইয়া পুনঃ প্রবেশ করিবে।

'না, তা আমি করতে পারি না; আমি ক্যানভাসার নই: উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া টিকিট আমি বিক্রি করি না?'—রজত ঈষৎ আপত্তির সুরে কহিল। 'আপনার জন্য কাজে লাগাতে হলে ক্ষেত্রটা আপনি বলতে পারেন, বিবেচনা করে' দেখব।'

দুই চারটি ছেলে এ-পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল; তারা সকৌতুকে ওদের দিকে চাহিয়া ফিসফাস করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মঞ্জরী কহিল, আপনি থান: কিছু আমার জন্য আপনার করতে হবে না: আপনি মস্ত বড় লোক, তা আমি জানি।' বলিয়া হিল-এর আঘাতে মেঝেতে শব্দ ও দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বন্দুকের গুলির মতন দ্রুত আশুতোষ বিল্ডিংস-এ ঢুকিয়া গেল।

রজত মনে মনে কহিল—বাবা! একবার রাগ দেখ না: যেন আমার মাথা কিনে ফেলেচে দিদির সঙ্গে চেনা থাকায়।' বলিয়া এক এক বারে দুই দুই ধাপ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

মঞ্জরীর বাবা সত্যব্রত রায় ইণ্ডিয়ান অডিট্ এণ্ড একাউণ্টস সার্ভিসের বড় চাকুরে। কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদে ছিলেন। সেখানে রজতের দিদিদের ওঁরা প্রতিবেশী ছিলেন; এবং সেইখানে তাদের পরিবারের সঙ্গে মিঃ রায়ের পরিবারের অন্তরঙ্গতা হয়।

সেই সম্পর্কে মঞ্জরী প্রথম হইতেই রজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করে। রজত বেচারী ব্যাপারটাতে খুব বিশেষ যে প্রীত তা নয়; তবে তা বলিয়া মধুর রসের কোনওখানে অভাব হয় না। রজত লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে, কিন্তু খুব বেশী লিপ্ত হয় না। এটা ওর স্বভাব। মঞ্জরী ঐটাকে অনেক সময় রজতের দেমাক, কখনও বা ঔদাসীন্য এবং কখনো বা অপমান বলিয়া মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু রজতের তাতে কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না—এদিকেও না, ওদিকেও না।

রজত উপর তলায় পৌঁছাইতেই সমর বদনমণ্ডল বিচিত্র-রূপ এবং বিবিধ অর্থদ্যোতক রেখাসমূহে ভরিয়া তুলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

'ওকি ?' রজত জিজ্ঞাসা করিল,—'ও রকম করছিস কেন ?'

'মিসিবাবা কি বল্লেন ?'

'যা ইচ্ছে বলুক, তোর কি ?—একটা হতভাগা হয়েচিস।' রজত ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে বলিল।

'হতভাগা বই কি ?' সমর কহিল, 'হতভাগা না হলে অন্যকে আমিই বা জিজ্ঞাসা করব কেন; আমাকেই অন্যেরা জিজ্ঞাসা করত। শোন্,—প্ল্যাটোর কম্যুনিসম্-এর রূপটা কি রকম ছিল শুনবি ?—তার Utopiaতে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে স্ত্রীলোকেরা ষ্টেটের—

'থাম্ বলচি।' রজত গম্ভীর স্বরে ধমক দিয়া কহিল, 'এ কি বাঁদরামি হচ্চে। কম্যুনিসম্-এর যে দিকটা তোকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করে কার্ল মার্কস তা নিশ্চয়ই তোকে শেখায় নি; যা, পালা এখান থেকে।' বলিয়া রজত ঘরে প্রবেশ করিল।

সমর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল—তেল ?

'নে না, তেল, মানা করচে কে!'

'সাবান ?'

'সাবান দিয়ে কি হবে রে, ভূত ? গায়ে মাখবি ?'

'রামঃ! আজ মিটিং আছে না ?' সমর কহিল, 'সর্ব্বনাশ! আজ কি গায়ে সাবান দিতে পারি; বুর্জ্জোয়া, বুর্জ্জোয়া দেখাবে যে! শুধু গেঞ্জিটা কেচে নেব, ব্যাস্! সুগন্ধি ভাল সাবানে ময়লা তাড়াতাড়ি কাটে।'

'তা জানতাম না তো।'

'কত কিছুই জানিস না; শিখে রাখ্। কিন্তু অমনি অমনি শেখাচ্চি না, জেনো।—প্রতিদান হাতে হাতে চাই।'

রজত জিজ্ঞাসা করিল—যথা ?

সমর তালুতে তেল ঢালিয়া লইতে লইতে কহিল—প্রেস্‌টা আজ দিয়ে দিস্‌; স্পীচ্‌টা তৈরী করতে হচ্ছে কিনা; ভুলিস না যেন! বলিয়া কেস্‌-সহ গায়ে দিবার নাম্বানটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

রজত যখন ক্লাসে গেল তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। প্রথমত মনোরঞ্জন দত্তরায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিল। গান্ধীটুপি মাথায়, সর্ব্বাঙ্গ খদ্দরে মণ্ডিত; নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলনের সময় জেলও নাকি খাটিয়াছিল। ক্লাসে আসিয়া রোজই কোনও না কোনও ছুতাতে সে রাজনীতিপ্রসঙ্গে বাঙালী ছাত্রসম্প্রদায়কে তিরস্কার করে: সে-ভীরুতার জন্য ছাত্রসম্প্রদায় দলে দলে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয় না, তাহাকে সে নির্দ্দয় বাক্যে জর্জ্জরিত করিয়া গেল। মনোরঞ্জন বলে—এদেশের যুবকদের গায়ে মাছের রক্ত; শত অন্যায়, সহস্র provocationএও তাহা কখনো তপ্ত হয় না। যে দুর্ব্বার অনুপ্রেরণায় দেশে দেশান্তরে স্বভূমির স্বাধীনতার জন্য তরুণেরা দীপ্ত লাল রক্ত অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছে, যে প্রেরণায় কামানের শব্দে সঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছে, রিভলবারকে বন্ধু মনে করিয়াছে—যাক গে, ওসব নাম আর করবো না—বলা যায় না কার মনে কি আছে—আমাদের নৈতিক দৈন্য, আমাদের ভীরুতা, বাঙালীর স্বভাবসুলভ আরামপ্রিয়তা সে অনুপ্রেরণায় আমাদের সাড়া দিতে দেয় না; সমস্ত জাতির একটা আধ্যাত্মিক মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েচে। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে?'—কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের যুবক সম্প্রদায়!

মনোরঞ্জনের উৎসাহ এত তীব্র এবং বাঙালী ছাত্রদের রাতারাতি বদলাইয়া তুলিবার আগ্রহ এত উগ্র এবং বক্তৃতা এত অজস্র যে ওকে আর ছেলেরা এখন সীরিয়াসলি নেয় না; বরঞ্চ ওর বাগ্মিতায় কৌতুকই বোধ করে। তবে দুয়েকজনকে ও গোপনে কি একটা সম্প্রদায়ের কথা বলে; তবে সে অতি সামান্য দুয়েকজনকে মাত্র। যাদের ও সেই গোপনীয় সংবাদ জানায়, তাদের প্রত্যেকেরই কাছে পূর্ব্বাহ্নে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে এ বিষয়ে তার সহানুভূতি থাকুক আর না থাকুক, ও সংবাদ সে অন্য কাহাকেও জানাইতে পারিবে না, মরিয়া গেলেও নয়। যাদের সে দলে টানিতে চাহিয়াছে, রজত তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু রজতের বিষয়ে সে হতাশ হইয়াছে; রজত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে নাই বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন বা তাহার গোপনীয় সংবাদের উপর সে কোনই শ্রদ্ধা দেখায় নাই; বরঞ্চ যারা মনোরঞ্জনকে বাতুল মনে করে, রজত তাহাদের অগ্রণী। মনোরঞ্জনও আর রজতকে ভজাবার চেষ্টা করে না; তবে নির্জ্জনে দেখা হইলে তাকে সাবধান করিয়া দেয়—ভুলেও যেন রজত 'সে-সব' কথা প্রকাশ না করিয়া দেয়! সর্ব্বনাশ তাহা হইলে মনোরঞ্জনদের একাব হইবে না!

রজত আসিয়া এক পাশের বেঞ্চে জহির আহাম্মদের পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—এই জহির, ফেজ্‌ পরিস না কেন ?

জহির কিছু জায়গা ছাড়িয়া রজতকে বসিতে দিয়া খুসিভরা হাসিমুখে কহিল—তোমার টিকি কই? টিকি রাখ না কেন, শুনি?

'তাও তো বটে', হাসিয়া রজত কহিল: এই বেশ ভাল রে, জহির; আমিও টিকি নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না, তুইও ফেজ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবি না; হিন্দু আর মুসলমান তফাৎ বোঝে কার সাধ্য?—আমরা প্রায় সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটিয়ে আনলুম বলে।

জহির কহিল,—আনবই তো, রজত।

জহির ছেলেটাকে রজতের বড় ভাল লাগে: মুসলমান যে কত ভদ্র হইতে পারে, কত মোলায়েম কত বন্ধুপ্রিয় হইতে পারে, জহিরকে না জানিলে তার পরিচয়ই পাওয়া যায় না। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘচোখ, সদা হাস্যবিকসিত বদন; বুদ্ধি এবং সৌকুমার্য্য, এবং সর্ব্বোপরি এক বিনয়নম্রতা তার স্বভাবকে এমন আকর্ষণীয় করিয়াছে যে রজত তাকে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করে। ফরিদপুরের জেলায় জহিরের বাড়ি; ওর বাবা সরকারী উকিল

ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলাদেশের বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের সহিত ওদের আত্মীয়তা এবং কুটুম্বিতা। ওরই এক দূর সম্পর্কের কাকা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক বিশিষ্ট নেতা আবদুর রহমান চৌধুরি। বাঙলা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ওর একাধিক আত্মীয় সদস্য: তাদের কারুর সঙ্গে জহিরের রাজনীতিক মতবাদ খাপ খায়, কাহাদেরও মতবাদকে সে তীব্র নিন্দা করে। জহিরের রাজনৈতিক মতবাদের প্রসারতাই রজতকে সর্ব্ব প্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। এখন কিন্তু রজত বলে—তুইও বাঙাল, আমিও বাঙাল,—ভাবটা এই জন্যই বুঝলি না, জহির।

দুইটা ক্লাস করিবার পর রজত কহিল,—ক্লাস পালাবি তো চল, জহির; ম্যাটিনীতে ছবি দেখে আসি; তারপর বিকাল বেলায় ইডেন গার্ডেন বা গঙ্গার ধারে বসে তোর ফিঁয়াসের (বাকদত্তার) কথা শুনব,—বলবি তো?

লজ্জায় জহিরের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল; কহিল, তার চেয়ে ভাল ছেলে হয়ে বরঞ্চ আমি ক্লাসই করি, রজত।

'তাতে কি আর বেহেস্তে যেতে পারবি? কার ঘণ্টা এটা মনে আছে তো? জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে!'

জহির শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—'ওঃ! তবে চল, পালাই। প্রফেসারের নামটা মনে ছিল না!'

দুজনে ওরা ক্লাসের বাহির হইয়া আসিল: প্রফেসার সমাদ্দারের ঘণ্টায় ক্লাস-পালান ওদের নতুন নয়। অসহিষ্ণুতা ছাড়া এর জন্য ওদের বিশেষ কিছু অপবাদও দেওয়া যায় না; পারসেণ্টেজের ভয়টা না থাকিলে সমাদ্দারকে শূন্য বেঞ্চের কাছে লেকচার দিতে হইত: শুধুমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বেশি রকম মাখামাখি থাকায় তাঁর উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হইতেছে—পড়াইবার দক্ষতার জন্য নয়। সমরের প্রশ্নটার কথাটা রজতের মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু সে ভাবিল,—এটা কম্যুনিসম্-এর necessary evil—সর্ব্বসাধারণের দোষ, ত্রুটী এবং ক্ষতি-গুলিও সমান ক'রে ভাগ করে' নিতে হবে বৈ কি! আমি যখন একটা পারসেণ্টেজ হারাচ্ছি, ও-ও হারাক্; কাউকে ওর কথা বলে গিয়ে সমরকে communismএর প্রিন্সিপল থেকে আর ভ্রষ্ট করি কেন। মনে মনে হাসিয়া রজত জহিরের সঙ্গে নিচে নামিবার জন্য সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

'রজত বাবু?'

'যাচ্চি'—রজত ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিয়া কহিল। 'তুই দাঁড়া, জহির আমি এক মিনিটের মধ্যে আসচি।" বলিয়া লেডিজ কমন রুমের সম্মুখে যেখানে মঞ্জরী দাঁড়াইয়াছিল, সে দিকে অগ্রসর হইল।

'আচ্ছা, ও-রকম আপনি তখন বীরত্ব দেখালেন কেন, বলুন তো; গায়ে জোর আছে বলে?'—মঞ্জরী অভিযোগ করিল।

'আমি তো ভেবেছিলাম—বীরত্ব আপনিই বরঞ্চ দেখিয়ে গেলেন। যা রাগ, এবং যেমন হঠাৎ। বলুন তো কি করতে হবে? টিকিট কিসের?—চ্যারিটী পার্ফমেন্স-এর সম্ভবতঃ?' রজত কহিল।

'তাতে দোষটা কি হল?'

'কিছু নয়, কিছু নয়; নাচটাচ নাকি? নিশ্চয়ই আমি কিনব?'

'কেনবার জন্য তো আপনাকে বলিনি; কিছু বেচে দিতে বলেছিলাম।' মঞ্জরী একটু বাঁকা চোখে চাহিয়া কহিল।

রজত কহিল—'দেখুন, আমার বন্ধুরা বলে: আর যার জন্য সাহায্য করতে বল পকেটে পয়সা না থাকলে সাহায্য করতে চেষ্টা করে অন্তত পক্ষে ব্যাপারটার সঙ্গে নৈতিক সহানুভূতি জানাব; কিন্তু অভিজাত পাড়ার মেয়েরা যে চ্যারিটী অভিনয় করে, তাতে সাহায্য করতে বলে আমাদের সহানুভূতির ওপর জুলুম করো না: ওটা ভারি sensitive মনোবৃত্তি—

'কেন, অন্যায়টা কোথায়?'

'তা আমি বলতে পারব না; এই জন্য বলতে পারব না যে সেটা সর্ব্বাংশে আমার নিজের মত নয়;—দিন্ না, একটা টিকিট?'

এক মুহূর্ত্ত কাল দুই চোখ স্তিমিত করিয়া মঞ্জরী ভাবিয়া লইল, রজতের এই এড়ান, এই ঔদাসীন্যে রাগিয়া ওঠা উচিত হইবে কিনা, সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কহিল—এটা সখের চ্যারিটী, বা ভণ্ডামি নয়, সেটা আপনাকে জানাই;—সন্দেহ আপনাদের অত্যন্ত প্রবল কিনা: 'নারী-উদ্ধার-আশ্রম' সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত আপনারা বিবেচনা করবেন কিনা, জানিনা: কিন্তু অত্যাচারীদের হাত থেকে দেশের মেয়েদের বাঁচান, অন্ততঃ আমরা মেয়েরা কর্ত্তব্য মনে করি; ভেবেছিলাম অন্তত এতে—

'জহির, শোন!' রজত জহিরকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। উপায় ছিল না; জহিরেরও না আসিয়া উপায় নাই, মঞ্জুরীরও চলিয়া যাইবার উপায় নাই। লাজুক জহির এমন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে যে রজতের মায়া হইল, কেন এমন সহসা বেচারীকে এই অনালাপিতা মেয়েটীর কাছে আনিয়া বিব্রতের একশেষ করিয়াছে। কহিল,—'এ জহির আহাম্মদ, আমার প্রিয় বন্ধু;—একে তো চিনিস্‌ই জহির; জহির, টিকিট কিনবি,—চ্যারিটী পার্ফর্মেন্সের টিকিট,—মিস রায় বিক্রি করছেন।'

মঞ্জরীকে বিব্রত নমস্কার করিয়া থামিয়া জহির ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

'বেশ তো বললি; কিসের জন্য চ্যারিটি জানিস তো?'

'না।'

'তবু রাজি? এমন ক্রেতা আর পাবেন না মিস রায; জহির সেই ধরণের মুসলমান নয় যারা মুসলমান গুণ্ডার হাতে হিন্দু মেয়ের নিগ্রহকে দোষনীয় এবং নিন্দনীয় মনে করে না; খাঁটী মুসলমান; দিন একটা টিকিট ওকে।

'আর আপনি?' মঞ্জরী শুধাল।

'আমিও এমন কোনও পাষণ্ড নই: আমাকেও একটা।' মৃদু হাসিয়া রজত বলিল। 'কেমন, দিলুম তো বিক্রি করে? এর পর আর আপনার অভিযোগ থাকতে পারে না; সর্ব্বনাশ, আড়াইটা! পালিয়ে আয়, জহির: সিনেমায় যাচ্ছি; নমস্কার!'

ট্রামে জহির কহিল,—মিস্ রায়ের সঙ্গে তোমার ভাবটা বিস্তর ছেলের চক্ষুশূল।

'কেন?'

'ঈর্ষ্যা হবে, তা ছাড়া আর কি?'

'ঈর্ষ্যা? কেন? আমরা কথাবার্ত্তা বলি বলে? তবে তো তোর সম্বন্ধেও লোকে আমাকে ঈর্ষ্যা করতে পারে, জহির!' রজত গম্ভীর হইয়া কহিল।

'আমি তো মেয়ে নই, বন্ধু; মেয়েদের নিয়েই পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব কিনা।' জহির কহিল, 'কিন্তু যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্যের মিলন হয়, এটা আমি একটা প্রাকৃতিক বিধান বলে বিশ্বাস করি বন্ধু। তোমাকে অভিনন্দন জানাই।'

রজত কহিল, ধ্যেৎ গাধা; তুইও ওদেরই মত একটা উজবুগ। এই জন্যই বুঝি কিসের চ্যারিটি জিজ্ঞেস না করেই টিকিট কিনতে রাজি হয়ে গেলি!

জহির প্রশ্ন করিল—তবে, তোমাদের মধ্যে কোনও undorstanding হয় নি?

'কিচ্ছু না' রজত গম্ভীর স্বরে কহিল, 'অন্তত আমার দিক থেকে নয়,—এইটা তুই মনে রাখিস্, এবং যারা কাউকে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলেই একটা মাত্র সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু করতে পাবে না, তাদের বলিস। —যা, তুই টিকিট, এস্‌প্লানেডের।'

(ক্রমশঃ)

সুবোধ বসু

P. G. COMMON-ROOM

কোন্ পথ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় কার্ত্তিকের 'বিচিত্রা'য় গীতায় শাস্ত্রবিধি নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনিলবাবু উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ*, ইহা শ্রীকৃষ্ণের কথা; অনিলবাবু ফেলিতেও পারেন না; অথচ শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে অনিলবাবু সেগুলিকে বড়ই মন্দ বলিয়া মনে করেন, তাঁহার মতে জাতি-ভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, প্রভৃতি ব্যবস্থার ফলে (এ সকল ব্যবস্থাই শাস্ত্রে আছে) "হিন্দু সমাজ আজ জগতের সকল সভ্য সমাজের নিকট হেয় হইয়াছে।" এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনিলবাবু নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করিতেছেন ততই গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে প্রথম প্রথম শাস্ত্র মানা যাইতে পারে কিন্তু শেষে অন্তরের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী অনুসারে কর্ম করিতে হইবে। এ কথা গীতার কোন অধ্যায়ে কোন শ্লোকে আছে অনিলবাবু তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ এ কথা গীতায় কোথাও নাই। দ্বিতীয়তঃ ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী কয়জন শুনিতে পান? ভগবানের সাক্ষাৎ বাণীর সহিত সাধারণ বিবেক বুদ্ধির (conscience) সহিত অনেক প্রভেদ। বিভিন্ন ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি বিভিন্ন নির্দ্দেশ দেয়। মুসলমানের বিবেক বলে যে প্রতিমা পূজা করা সকলেরই অন্যায়; হিন্দুর বিবেক তাহা বলে না। লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে একজনও ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী লাভ করেন কিনা সন্দেহ। অবশিষ্ট ৯৯,৯৯৯ ব্যক্তির উচিত শাস্ত্র বাক্য অনুসরণ করা,—ইহাই অনিল-বাবুর মত। অথচ অনিলবাবুর মতে শাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত অনিষ্টকর, হিন্দু জাতির পতনের কারণ, অতীত যুগের উপযোগী ছিল, এখনকার সুসভ্য উন্নত যুগের উপযোগী নহে। যে ব্যবস্থা এত মন্দ সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত একথা অনিলবাবু বলেন কি করিয়া?

আরও এক কথা। অনিলবাবু বলেন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিবে সাধারণ ব্যক্তির উচিত তাহার অনুসরণ করা।* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্তরের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী শুনিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিবে—ইহাও অনিল-বাবুর মত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্বভাব যদি শাস্ত্র লঙ্ঘন করা এবং সাধারণ ব্যক্তিদের যদি উচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা,—তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তিদেরও উচিত শাস্ত্র লঙ্ঘন করা। সাধারণ ব্যক্তিদের যদি উচিত শাস্ত্র লঙ্ঘন করা, এবং উন্নত সাধকদেরও যদি উচিত শাস্ত্র লঙ্ঘন করা, তাহা হইলে ব্যাপার এইরূপ দাঁড়ায় যে কাহারও কখনও শাস্ত্র অনুসরণ করা উচিত নয়। তাহা হইলে ভগ-বান যে বলিয়াছেন—কোন কর্ম কর্ত্তব্য কোন কর্ম কর্ত্তব্য নহে এবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ—সে কথাটি একেবারে মাঠে মারা যায়। অনিলবাবু যে বলিয়াছেন প্রথম প্রথম শাস্ত্র

* তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
গীতা ১৬।২৪

* কিন্তু বস্তুতঃ গীতায় ভগবান একথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনাঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে সাধারণ ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করে। "করে" অর্থাৎ "করিয়া থাকে"। "করা উচিত" এ কথা ভগবান বলেন নাই। অনিলবাবু সুবিধা মত গীতার কথা বদলাইয়া লইয়াছেন।

মানা উচিত, শেষে শাস্ত্র লঙ্ঘন করা উচিত—তাহার সহিত কোনও সামঞ্জস্য হয় না। অনিলবাবু বলেন যে "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ" ইহার অর্থ এই যে বেদ ও স্মৃতি পরস্পর বিরোধে পরিপূর্ণ। অনিলবাবুর রচনাও বোধহয় বেদ বা স্মৃতির পর্য্যায়ভুক্ত, নচেৎ তাহাতে এত পরস্পর বিরোধ থাকিবে কেন?

অনিলবাবু বলিতেছেন যে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র যে যুগের উপযোগী ছিল সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে গ্রন্থে কতকগুলি অনিষ্টকর ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে তাহা অতীত যুগেরও উপযোগী নহে, বর্ত্তমান যুগেরও উপযোগী নহে। অনিলবাবুর মতে মনুসংহিতাতে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বড় অনিষ্টকর। সুতরাং মনুসংহিতা অতীত যুগের উপযোগী ছিল একথা তিনি বলিতে পারেন না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে মনুসংহিতা একটি জাল গ্রন্থ —কোনও পণ্ডিত ইহা লিখিয়া মনুর নামে চালাইয়া দিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে "মনুনা গীতৌ" অর্থাৎ মনু গান করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান মনুসংহিতার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ১৮।৩১,৩২)। অতএব দেখা যাইতেছে যে মনুসংহিতা যে জাল গ্রন্থ বাল্মীকি তাহা ধরিতে পারেন নাই। মহাভারতে মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—সুতরাং ব্যাসও এই জুয়াচুরি ধরিতে পারেন নাই। যাস্কের নিরুক্তে (খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী) মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (Dr. Radha Kumud Mukharji's Hindu Civilisation গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ উভয়েই মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ৩।৪৩৭ ও ৩৮)। অতএব ব্যাস বাল্মীকি হইতে শঙ্কর রামানুজ পর্য্যন্ত যে জুয়াচুরি ধরিতে পারেন নাই, অনিলবাবু তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

বুদ্ধি নির্মল না হইলে উত্তম ব্যবস্থাকে মন্দ বলিয়া মনে হইতে পারে, অথবা মন্দ ব্যবস্থাকে উত্তম বলিয়া মনে হইতে পারে (গীতা ১৮।৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা হিন্দু শাস্ত্রে আছে। অনিলবাবুর বুদ্ধিতে সেগুলি মন্দ বলিয়া মনে হইতেছে। অপর পক্ষে ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে এই সকল ব্যবস্থা উত্তম বলিয়া মনে হইয়াছিল। সুতরাং হয় স্বীকার করিতে হইবে যে অনিলবাবুর বুদ্ধিতে কিছু মলিনতা থাকার দরুণ তিনি এই ব্যবস্থাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নচেৎ বলিতে হইবে ব্যাস বাল্মীকি শঙ্কর রামানুজ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সকলের বুদ্ধি মলিন ছিল, তাই তাঁহারা মন্দ ব্যবস্থাকে ভাল মনে করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র অনিলবাবুর বুদ্ধি নির্মল বলিয়া তিনি এই সকল ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন।

অনিলবাবু বলিয়াছেন এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার দরুণ হিন্দুর পতন হইয়াছে। অনিলবাবুর যুক্তি এইরূপ :—

হিন্দু সমাজে এই সকল ব্যবস্থা ছিল—
হিন্দু সমাজের পতন হইয়াছে—

অতএব—এই সকল ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের পতনের কারণ।

ইংরাজি ন্যায় শাস্ত্রের কোন Syllogismএ এই অপরূপ যুক্তি পাওয়া যায় তাহা অনিলবাবুই বলিতে পারেন।

অনিলবাবুর মতে এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। এখানেও সেই একই প্রকার যুক্তি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, সেই প্রদেশে কেন হিন্দু কমিয়া মুসলমান বাড়িতেছে না—সে কথা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই বোধহয় অনিলবাবু বিবেচনা করেন নাই।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে গীতায় ইহা বলা হইয়াছে বটে যে কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য নহে এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪); কিন্তু এখানে শাস্ত্র শব্দের অর্থ কেবল শ্রুতি ও স্মৃতি এরূপ গ্রহণ করা উচিত নহে,—বাইবেল ও কোরাণকেও শাস্ত্র শব্দের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ করিতে কিছু বাধা আছে। কতকগুলি বিষয়ে বাইবেল ও কোরাণের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের মিল দেখা

যায় না। কোরাণে বলা হইয়াছে প্রতিমা পূজা করা অন্যায়; হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধান আছে। হিন্দুশাস্ত্রে কলিকালে গোমাংস ভোজন নিষেধ আছে; কোরাণে তাহার বিধান আছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের নিন্দা আছে; কোরাণে তাহার বিধান আছে। সুতরাং কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণ সকল গ্রন্থই গ্রহণ করিলে অনেক সময় কর্ত্তব্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর এক কথা গীতার এই শ্লোকে শাস্ত্র শব্দের অর্থের মধ্যে বাইবেল ও কোরাণকে গ্রহণ করিতে হইবে একপ কোনও লক্ষণ গীতায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অনিলবাবুও উল্লেখ করেন নাই। এই অসম্ভব অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বোধহয় রহস্য করিয়া অনিলবাবুর কানে কানে বলিয়া গিয়াছেন। (অন্তরের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ বাণীর ইহাই কি নমুনা?)

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে গীতার শিক্ষা সার্ব্বজনীন—সকল দেশের ও সকল সময়ের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু খৃষ্টান বাইবেলে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গীতার সকল উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে, মুসলমান কোরাণে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গীতার সকল উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে একথা বলা যায় না। গীতার সকল উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে খৃষ্টানকে বাইবেলে বিশ্বাস শিথিল করিতে হইবে, মুসলমানকে কোরাণে বিশ্বাস শিথিল করিতে হইবে। গীতায় ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; বৈদিক যজ্ঞে ইঁহাদিগকে উপাসনা করিলে স্বর্গলাভ হয় বলা হইয়াছে। ইহা বাইবেল ও কোরাণের বিরোধী। গীতার পুনর্জন্মতত্ত্ব বাইবেলে ও কোরাণে স্বীকার করা হয় নাই। গীতার সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব বাইবেল ও কোরাণের সহিত মিলে না। গীতায় বলা হইয়াছে যে প্রলয়ের সময় জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়,—অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণও বটেন, উপাদান কারণও বটেন। ইহা বাইবেল ও কোরাণের মতের বিরুদ্ধ। বাইবেল ও কোরাণ বলিয়াছেন যে জন্মের পূর্ব্বে জীবের অস্তিত্ব থাকে না; গীতা বলিয়াছেন জন্মের পূর্ব্বেও জীবের অস্তিত্ব থাকে। বাইবেল বলিয়াছেন সকল মৃত আত্মা বিচারের দিন পর্য্যন্ত (day of judgement) purgatoryতে অবস্থান করে, বিচারের দিন তাহারা ঈশ্বরের নিকট আসে, ঈশ্বর পাপ ও পুণ্য অনুসারে কতকগুলি জীবকে অনন্ত স্বর্গবাস করিতে পাঠান, কতকগুলি জীবকে অনন্ত নরক বাস করিতে পাঠান,—এই অযৌক্তিক মত গীতার বিরোধী; গীতার মতে মৃত্যুর পরেই পাপী নরকে যায়, পুণ্যবান স্বর্গে যায়, এবং সে স্বর্গ ও নরক অনন্তকাল স্থায়ী নহে। বাইবেল বলিয়াছেন যীশু খৃষ্টকে না বিশ্বাস করিলে মুক্তি নাই, ইহাও গীতার মতের বিরোধী। গীতার মতে মৃত্যুর পর জীব দেবযান বা পিতৃযান পথে গমন করে। এই মত বাইবেল ও কোরাণ অনুমোদিত নহে। গীতা বলেন ঈশ্বরকে ফল ফুল জল দ্বারা পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, (৯ অধ্যায়) নিরাকার ঈশ্বরকে পূজা করা অপেক্ষা সাকার ঈশ্বরকে পূজা করিলে সহজে সিদ্ধিলাভ করা যায় (১২ অধ্যায়)। এ সকল বিষয়ে গীতার সহিত বাইবেল ও কোরাণের মিল নাই। গীতার শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন বলিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে যেখানে গীতার সহিত বাইবেল কোরাণের মিল নাই, সেখানে গীতার শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ। গীতার যে অংশগুলির বাইবেল কোরাণের সহিত মিল আছে, সেগুলি গ্রহণ করিয়া বাকী অংশগুলি বর্জ্জন করিলে গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন বেদাঃ বিভিন্নাঃ অতএব বেদের দ্বারা পথ নির্ণয় হয় না—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—মহাজন যে পথে গিয়াছেন সেই পথ ধরিতে হইবে। কিন্তু সকল মহাজন ত এক পথ ধরেন নাই। কেহ ধরিয়াছেন জ্ঞানের পথ, কেহ ভক্তির পথ। কোন মহাজনের পথ ধরিব? বেদ বিভিন্ন বলিয়া যদি বেদের দ্বারা পথ নির্ণয় না হয়, মহাজন বিভিন্ন বলিয়া মহাজনের দ্বারা পথ নির্ণয় হইবে না। অতএব মূল সমস্যা সেইরূপই রহিল।*

শঙ্করাচার্য্যকে সকলে মহাজন বলিয়াই জানে। সুতরাং তাঁহার পথ অনুসরণ করা উচিত। অথচ অনিলবাবু

* বেদাঃ বিভিন্নাঃ—এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে কোনও মহাপুরুষের সাহায্যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইবে।

বলিয়াছেন শঙ্করাচার্য্যের পথ অনুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইয়াছে। অনিলবাবুর পরস্পরবিরোধী কথার আর একটি দৃষ্টান্ত।

অনিলবাবু বলিয়াছেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী নামক ভদ্রলোক দৈনিক বসুমতীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যে শাস্ত্র সকল পরস্পরবিরোধী। এ বিষয়ে আশুতোষবাবুর মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রামায়ণে লেখা হইয়াছে যে এই গ্রন্থ "বেদশাস্ত্র সম্মতম্"— অর্থাৎ বেদানুযায়ী। ভাগবত বলিয়াছেন স্ত্রী শূদ্রগণ বেদ পাঠ করিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না এ জন্য তাহাদিগকে ধর্ম উপদেশ দিবার জন্য বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে মনুর সকল বিধান বেদানুযায়ী। অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থেও বেদের প্রামাণিকতা এবং সেই সকল গ্রন্থের বেদানুযায়িতা উক্ত হইয়াছে। শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ সব কথা মানিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ—শাস্ত্র পরস্পর বিরোধী হইলে ইহা বলা যায় না। এক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত আশুতোষ জ্যোতিঃশাস্ত্রী মহাশয় দৈনিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে শাস্ত্রসকল পরস্পরবিরোধী? অনিলবাবুর এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় হউন। আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

অনিলবাবু কল্পনা করিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা অনুসারে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিবার বিধান গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাঁহার বুঝিবার ভুল। শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস। যাহাদের শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্র বিশ্বাস আছে তাহারা শাস্ত্রবিধান ত্যাগ করিতে পারে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি অনুসারে শ্রদ্ধা তিন প্রকার। এই সকল কথা সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সপ্তদশের শেষে অশ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রে অবিশ্বাসের নিন্দা আছে। শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিবার বিধান সপ্তদশে কোথাও নাই।

অনিলবাবু বলিয়াছেন রাসলীলা রূপকমাত্র, এরূপ কোনও ঘটনা হয় নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। ভাগবতে দেখা যায় পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন কেন শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, উহা ধর্ম বিরুদ্ধ। শুকদেব উত্তর করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার পক্ষে কেহ পরস্ত্রী নহে, সুতরাং তাঁহার ইহাতে দোষ হইতে পারে না। যখন শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতেছিলেন তখন গোপগণ তাঁহাদের রমণীদিগকে নিজেদের নিকটেই দেখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অলৌকিক। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা তাঁহার আচরণে দোষ দর্শন করা অযৌক্তিক। মানব ও ভগবানে অনেক প্রভেদ। মানবের যাহা অকর্ত্তব্য, ভগবানেরও তাহা অকর্ত্তব্য এরূপ বলা যায় না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন, বৌদ্ধযুগ ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর কীর্ত্তি, বৌদ্ধের নহে। ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম বহিষ্কার করিয়া হিন্দুধর্মের যখন পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহা হিন্দুর ইতিহাসে অতিশয় গৌরবজনক। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, কালিদাস, ভবভূতি, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক হিন্দুর পুনরুত্থানের যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সাধু মহাপুরুষদের সংখ্যা হিন্দুধর্মেই খুব বেশী। বৌদ্ধ ধর্মের মতের অযৌক্তিকতা এবং অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আমি পূর্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন,—রমণীগণ যে কোনও জাতিতে বিবাহ করিতে পারিবে এ ব্যবস্থা স্মৃতি শাস্ত্রে আছে। ইহা যথার্থ নহে। প্রতিলোম বিবাহের (অর্থাৎ কন্যার জাতি উচ্চ, স্বামীর জাতি নীচ) ব্যবস্থা কোনও শাস্ত্রে নাই। গীতাতেই আছে, "সঙ্করো নরকায়ৈব"।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন—সনাতনীদের মত এই যে সমাজে এখন যাহা চলিতেছে এইটিই ঠিক, ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলেই সর্বনাশ হইবে। এরূপ কথা কোনও সনাতনী কখনও বলে নাই। আমাদের পার্থিব ঐশ্বর্য্য এবং পারলৌকিক উন্নতি উভয়ের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, আন্দোলন করিতে হইবে। শাস্ত্রবিহিত পথ অনুসরণ করিলে উভয়বিধ উন্নতিই হইবে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পথ ধরিলে

ইহলোক পরলোক দুই-ই নষ্ট হইবে। গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে ইহা বলিয়াছেন।

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥

গীতা ১৬।২৩

"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করে সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, সুখ পায় না, মোক্ষলাভ করিতে পারে না।"

পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি আমাদের উন্নতির প্রতিকূল, যাঁহারা এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আন্দোলন করিতেছেন সনাতনীগণ তাঁহাদের প্রতিবাদ করেন।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন,—"বসন্তকুমার মাঝে মাঝে চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে বচন উদ্ধৃত করেন তাই আমি মনে করিয়াছিলাম যে তিনি ঐটিকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন (আশ্চর্য্য যুক্তি !) বসন্তকুমার যদি চৈতন্যচরিতামৃতকে শাস্ত্র বলিয়া না মানেন, তন্ত্রকেও শাস্ত্র বলিয়া না মানেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের গ্রন্থকে শাস্ত্র বলেন ?" গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং শাক্ত ভিন্ন অন্য কোনও সম্প্রদায়ের নাম কি অনিলবাবু শোনেন নাই ? শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা কি অনিলবাবু অবগত নহেন ? যে সকল গ্রন্থ হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্য প্রামাণিক বলিয়া মানিয়াছেন আমি সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থ সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অনিলবাবুর শ্রেষ্ঠ উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলেন "যদি কোনও চোরের বাস্তবিকই এ বিশ্বাস থাকে যে চুরি করাও অন্যায় নহে, তাহা হইলে চুরি করিলেও তাহার পাপ হইবে না।" অনিলবাবুর নূতন শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা চোরদের বড়ই মনঃপূত হইবে। চুরি করিয়া করিয়া তাহাদের মানসিক অধোগতি হয়,—চুরি করা যে অন্যায় এ বোধও তাহাদের থাকে না। সুতরাং অনিলবাবুর মতে তাহাদের পাপ হয় না। হিটলার ইহুদিদের পীড়ন করিতেছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই এরূপ বিশ্বাস যে ইহুদিপীড়ন অন্যায় নহে, অতএব হিটলারের কোনও পাপ হয় নাই। মুসোলিনি আবিসিনিয়া গ্রাস করিয়া কোনও পাপ করে নাই। জাপান চীনে যে কাণ্ড করিতেছে তাহাতে কোনও পাপ হয় না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী*

কানাই সামন্ত

সুপ্ত পান্থশালা—
নির্বতদীপালি, জ্যোৎস্নাঢালা।
মায়াময়ী এ শর্বরী
আস্খলিত স্বপ্নাংশুকে নিখিল আবরি
মন্দারহসিত কোন্ নন্দনের তীরে
একা বসি অলক্ষ্যে লক্ষিছে ধীরে ধীরে
প্রসারিত গিরি বন নগর প্রান্তর,
ঘণীভূত সুপ্তি মৌন, স্নিগ্ধ ছায়ান্তর,—
তারি প্রান্তে আঁকাবাঁকা তটিনীরা
অধীর গদ্‌গদগিরা
অভিসারিণী রে
অপার অগাধ সিন্ধুনীরে
নিত্য-আন্দোলন যেথা উন্মথিয়া উঠে
শিবের তাণ্ডব-পদপাতে।......

নেত্রপুটে
আজি নিদ্রা নাই।
বন্ধু ভাই
দুই ধারে নিদ্রাগত।
স্বপনের মত
মনে পড়ে অতীত জীবন
সাহস, সাধনা, অনুক্ষণ
প্রাণের যে প্রকাশ-আকূতি—
বোবা অনুভূতি—
এ বিশাল অপূর্ব জগতে
ফিরাইল অন্তহীন পথে
ফিরাল রে, চিরদিন,
সুচির নবীন
অজন্তার এই তীর্থে পুণ্য-অভিষেকে
বিস্ময়ের যৌবরাজ্যে—সীমা থেকে
অসীম অবধি—লভিনু যে ঐশ্বর্য্যসম্ভার—
চির অনায়ত্ত যাহা চির সাধনার
ধন।......

প্রথম সে এসেছি যখন
প্রথম যৌবন।
বুঝিনি রূপের মর্মে কী মাধুরী,
হাসির চাতুরী
অঙ্গে অঙ্গে তাই তারি অনায়াসে ফুটে,—
রেখার ভঙ্গীতে আর বর্ণের সঙ্গীতে নেয় লুটে
শোভামুগ্ধ হৃদি।
কী অপূর্ব নিধি
প্রভাত প্রদোষ নিশা,
পুষ্পপাখীগিরিমেঘ-আঁকা দশ দিশা।

---

* ১৩৪৩ সনে দ্বিতীয়বার অজন্তা দর্শনের পর শিল্পগুরু নন্দলালের আত্মগত উক্তি। উক্ত পান্থশালা অজন্তা-ইলোরার মধ্যবর্তী ঔরঙ্গাবাদ সহরে।

কী অপূর্ব। শুধু বুঝিনি যে
কোন্ সূত্রে গেঁথে গেঁথে নিজে
পরিব—পরাব মোর মালা
প্রিয়জনে।……

আশ্বিনের স্বর্ণসুধাঢালা
প্রভাতবেলায় এসেছিনু এই গিরিতটে ;
গুহায় গুহায় তার মৃত্যুহীন পটে
কী জানি কী আঁকা।—নির্ঝরিণীকলস্বর ;
গিরিগাত্রে বন্ধুর সোপানপংক্তি' পর
অজস্র শেফালি ফুল ;
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্ব হতে তখনও রবিকরাঙ্গুল
মুছেনি উত্তরি গিরিব্রজ শিশির তাদের।
বহু শতাব্দের
শান্তি আর নীরবতা
নীলাম্বর-হতে-অবনতা
অলক্ষ্যে কি আগুলিছে
বুদ্ধের অলক্ষ্য ধ্যানাসন।—তারি পিছে
শোভা লয়ে ফুলগুলি, গীত লয়ে পাখী
করে আত্মনিবেদন।—মোর ভাবনা কি
হেথায় পাবেনা ভাষা ?
স্বপ্ন সাধ আশা
মূর্তি-মাঝে হবে না সফল ?
কী উত্তর পাব তার না জেনে কেবল
ভালো লেগেছিল এই ভূমি।…

দিনে দিনে মুকুল হৃদয় উঠিল কুসুমি।
অভিনব দিগ্বলয়
এ বিশ্ব বেষ্টিয়া নিল হেন মনে লয় ;
কেন্দ্রে নিত্য ধ্যানসমাসীন
বুদ্ধ ভগবান।—প্রতিদিন
অশরীরী শ্রমণের স্তবমন্ত্রসনে
অজন্তার গুহায় গুহায় আঁধার গহনে
অনন্ত জীবনছন্দ
প্রকাশিল—কী করুণা কী আনন্দ
সীমাহীন সমুদ্রের তরঙ্গের মত
দেবতার লীলায় নিয়ত
জড়ত্বের বিশ্বব্যাপী বাধায় বাজিছে ঃ
একি ব্যর্থ, একি মিছে—
তরুলতা পশুপক্ষী মানবের জীবনে জাগিছে
মহামানবের মূর্তি আর আত্মদান।

অতীতের অনির্বাণ
অমৃতপ্রদীপ ঃ সে শিখায় দীপ্ত করি তুলি
উন্মাদ বাউল হেন আপনারে ভুলি
তোমারেই করিনু আরতি পথে পথে ভ্রমি।
নমি তব পদপ্রান্তে, নমি আজ, নমি
ওগো নরনারায়ণ।
এ তুলি কি করিবে গ্রহণ—
এ আরতি ?
লোকান্তরে পাঠাবে আবার ?—যদি
সেথাও তোমার পূজা হয়
আনন্দ আবেগভরে চিরমূর্তিময় ?

কানাই সামন্ত

খড়কুটো

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় অঙ্ক

(চারি মাস পর। স্যানাটোরিয়মের একটি স্বতন্ত্র আইসোলেশন গৃহ, একপাশে একটি শয্যা। অক্টোবর মাসের রবিবার এক অপরাহ্ণ। ঘরে আসবাব পত্র সামান্য,—মাঝে একটি টেবিল, দুখানি চেয়ার, ও একটা আবরণযুক্ত দেরাজ। শয্যার পাশে একটি ছোট টেবিল রাখা আছে। শয্যার অপর দিকের জানালা দিয়া দেখা যায় প্রচুর গাছপালা, কয়েকটি ফুলসমেত ডাল জানলার মধ্য দিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। দূরে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইতেছে, তাহার মাথায় মাথায় গাছের সারি পড়ন্ত রৌদ্রে চক্ চক্ করিতেছে।

যবনিকা উঠিতে দেখা গেল, লীনা কয়েকটি বালিশে হেলান দিয়া শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক রোগা দেখাইতেছে। মুখের রং ফ্যাকাশে হইয়াছে, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। চোখে আর সে জ্যোতি নাই। নিস্পন্দ হইয়া সে যেন অসাড়ভাবে দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আছে।

প্রবেশ দ্বার দিয়া প্রথমে মিস্ হেমপ্রভা প্রবেশ করিল; তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল বলাই চৌধুরী, বিনোদিনী, আর মীরা। বলাই চৌধুরীর আচার ব্যবহার এখন অনেকটা সভ্য, তাহার পোষাক পরিচ্ছদও সভ্য এবং সযত্ন বিন্যস্ত। মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তির আভাস। চেষ্টা করিয়া সে ভদ্রভাব রক্ষা করিতেছে। বিনোদিনীর লম্বা চওড়া চেহারা, চঞ্চল এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, ছোট ছোট চোখ, প্রকাণ্ড মুখবিবর, ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখার আভাস, ভারী মুখ, কর্কশ কণ্ঠ, বয়স আন্দাজ ৪০। কাপড় চোপড়ের অস্বাভাবিক বাহার। মীরা একটু লম্বা হইয়াছে, ফ্রক্ পরিয়া আসিয়াছে। মুখখানা ভারী অসন্তুষ্ট।)

মিস্ হেমপ্রভা। (দূর হইতে) ঐ দেখুন, বিছানায় ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

বিনোদিনী। (ভদ্রতার আড়ম্বরের সহিত) আপনাকে কষ্ট দিলুম, কিছু মনে করবেন না।

মিস্ হেমপ্রভা। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকদের প্রতি চাহিয়া) লীনার শরীরটা আজকাল ভাল নেই, সুতরাং ওকে যেন বেশি বকাবেন না আপনারা। যাতে ওর মন খুব প্রফুল্ল হয় এই রকম কথাবার্ত্তা বলবেন।

বলাই। (মুখে বিমর্ষতা আনিয়া) আমরা যতদূর সম্ভব ওকে খুসি হবার মতো কথাই বলবো। (বিনোদিনীর প্রতি চাহিয়া) কি বলো?

বিনোদিনী। (মীরা দেরাজের কাছে কি নাড়াচাড়া করিতেছে দেখিয়া ধমক দিয়া বলিল) এদিকে আয় মীরা, সব তাতে হাত দেবার কি দরকার তোর? বারণ করে দিয়েছি না একশো বার? আয়নায় বুঝি নিজের মুখ দেখা হচ্ছে? (মীরা ফিরিয়া আসিল। মিস্ হেমপ্রভার দিকে চাহিয়া তখন বলিল) আপনি কিছু ভয় করবেন না; লীনাকে আমরা কোনো রকম উত্যক্ত করবো না।

মিস্ হেমপ্রভা। আর একটি কথা। ওকে যে এখান থেকে অন্য হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সে কথা ঘুণাক্ষরেও ওর কাছে বলবেন না। শেষ দিন পর্য্যন্ত ওকে সে কথা জানানো হবে না।

বলাই। (ব্যগ্র ভাবে) আমরা ও বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করবো না।

মিস্ হেমপ্রভা। থ্যাংকস্, তা হলেই যথেষ্ট। (প্রস্থান)

বিনোদিনী। (ক্রুদ্ধস্বরে) ইস্, মাগীর তেজ দেখ না। এটা করতে পাবে না, ওটা বলতে পাবে না, ওর হুকুম মতন আমাদের চলতে হবে। আর তুমি অমনি ভারী বাধ্য, মুখে কথাটি পর্য্যন্ত বেরুলো না, যা বলছে তাতেই ঘাড় নাড়চো, এক ফোঁটা মুরোদ নেই।

বলাই। (হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইবার ছলে) কেন বাপু, ওদের সঙ্গে মিছে তর্কাতর্কি করে আর ফল কি। লীনা তো এখান থেকে দু দিন বাদেই চলে যাবে!

বিনোদিনী। যাক, অন্য হাঁসপাতালে যে আমাদের খরচা দিতে হবে না, এইটেই যথেষ্ট। (বাড়ী ঘর দেখিতে দেখিতে) এদিকে ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে দেখছি। তা হবে নাই বা কেন, এইটুকু তো ঘর, ওরা এতগুলো লোক, সমস্ত দিন ঝাড় পোঁছ করা ছাড়া ওদের আর কাজই বা কি? ওমা, এমন ঘরে কোনো আসবাব নেই, কেবল একটি মাত্র টেবিল আর দুখানি চেয়ার?

বলাই। যাক্ যাক্, যাচ্ছে তাই জায়গা, মেয়েটা এখানে আট মাস রইলো, ভাল না থেকে আরো খারাপ হয়ে গেল। নতুন জায়গায় গিয়ে হয়তো কিছু ফল হবে।

বিনোদিনী। কি হয় না হয় সে ভগবানের হাত, মানুষের হাত কি? যে যেমন কাজ করেছে তাকে সেই রকম ফল ভোগ করতেই হবে। মেয়েটার কি রকম স্বভাব দেখ না। হৃদয় বলে কোনো বালাই নেই, দু মাসে একখানা চিঠিও লেখে নি, কোনো খবরও দেয় নি। এখান থেকে ডাক্তারের চিঠি না গেলে আমরা জানতেই পারতাম না যে অসুখটা বেড়েছে। বাড়ুক কমুক, একটু খবর দিতে কি হয়েছিল?

বলাই। না না, রোগা মেয়ের নামে ও রকম দোষ দেওয়াটা ভাল নয়।

মীরা। ঐ যে বিছানায় কে শুয়ে আছে? ঐ না লীনাদি?

বিনোদিনী। তোমাকে আর ওর কাছে যেতে হবে না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। (নিম্নস্বরে) কি গো, ওকে সে কথা বলবে না কি?

বলাই। (বোকার মতো) কোন্ কথা বলো তো?

বিনোদিনী। ন্যাকা, কিছু জানো না যেন! আমাদের বিয়ের কথা, আবার কোন কথা?

বলাই। হাঁ, হাঁ, ওকে যে এখনো জানানো হয় নি তা কি আর মনে আছে? আমিই বলবো তা হলে, বলা দরকার।

বিনোদিনী। (ভ্রূকুটি করিয়া) আমিই বলবো তা হলে,—অমন করে ভঙ্গি করাটার মানে কি? ঐটুকু এক-রত্তি মেয়ে, ওর কাছে বলতে তোমার লজ্জা হয় বুঝি? বেশ, এত যদি তোমার লজ্জা, তা হলে তোমায় আর কষ্ট করে বলতে হবে না, যা বলবার আমিই বলবো

বলাই। (রাগিয়া উঠিয়া) আর তোমায় ব্যাখ্যা করে শোনাতে হবে না, থামো! আমি যখন বলবো বলেছি তখন আমিই বলবো।

বিনোদিনী। (খুসি হইয়া) তা হলে ওর কাছে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হবে? ঘড়িটার দিকে নজর রেখো, মেয়ের কাছে গিয়ে যেন বেহুঁস হয়ে যেও না, ট্রেণ ধরতে হবে মনে থাকে যেন। চল্ মীরা।

(উহারা কতকটা অগ্রসর হইয়া গেল, কিন্তু লীনা উহাদের লক্ষ্য করিল না, সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল)

বিনোদিনী। (বলাইকে কনুই দিয়া ঠেলিয়া চাপা গলায়) আমাদের এখনো দেখতে পায় নি, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবছে। মেয়েটা বড্ডো রোগা হয়ে গেছে। তুমিই আগে সাড়া দাও।

(লীনা একটু নড়িয়া বসিল)

বলাই। (গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া) লীনা!

লীনা। (চমকাইয়া উঠিয়া ভীত চকিত দৃষ্টিতে উহাদের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল)—বাবা! বিনোদিনী মাসী!

বিনোদিনী। (কণ্ঠস্বরে স্নেহের আভাস আনিয়া) হাঁ লীনা, আমরা এসেছি তোমাকে দেখতে। এখন কেমন আছ লীনা?

(বলিতে বলিতে কাছে গিয়া সে লীনার একটি হাত ধরিল। লীনা হাত সরাইয়া লইয়া তাহার পিতার দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিল। বিনোদিনী ক্রুদ্ধ হইয়া খাটের নিকট হইতে কিছু সরিয়া গেল)

বলাই। (আবেগকম্পিত স্বরে, তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে) লীনা, কতদিন তোমাকে দেখি নি। (হাতখানি ধরিয়া খাটের নিকট বসিয়া হাতের উপর চুম্বন করিতে গেল, কিন্তু হঠাৎ রোগটির কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সন্ত্রস্ত হইয়া মুখ সরাইয়া লইল। লীনা ইহা বুঝিতে পারিয়াছে দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া উঠিল এবং

বাধো বাধো স্বরে বলিল) তা, আজকাল কেমন আছো লীনা ? চেহারায় তো বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে।

(লীনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল)

বিনোদিনী। মীরা, অমন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? দিদির সঙ্গে দুটো কথা বল্ না।

লীনা। (অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া মীরাকে দেখিতে পাইয়া খুসি হইয়া উঠিল)—ও, মীরা নাকি ? দেখিনি তো এতক্ষণ। এদিকে আয়, আয়।

(মীরা ভয়ে ভয়ে বিনোদিনীর দিকে অপাঙ্গে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইল। লীনা হাত বাড়াইয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইল)

মীরা। (ছট ফট করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া) ছেড়ে দাও না ! (লীনা তাহাকে ছাড়িয়া দিল, অবাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পর চোখ মুদ্রিত করিল। মীরা অপ্রস্তুত হইয়া তথায় দাঁড়াইল, পরে বলিল) লীনাদি, তোমায় যেন কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে।

লীনা। (চোখ বুজিয়া) তুইও অমনি হলি ? যা যা, আমার কাছ থেকে সরে যা।

বিনোদিনী। আমার কাছে এসো মীরা, দিদিকে বিরক্ত করতে নেই।

(মীরা উহার নিকট না গিয়া দেয়ালের পাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং দূর হইতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে লীনাকে দেখিতে লাগিল)

বলাই। (কিছুক্ষণ পরে) লীনা, তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে ?

লীনা। (চোখ না খুলিয়া) না, কষ্ট কিছু নেই। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া) ঘরে চেয়ার রয়েছে, টেনে নিয়ে এসে বোসো।

বিনোদিনী। আর বেশি বসবার সময় নেই। এখনি ট্রেণ ধরতে হবে।

লীনা। (অসাড় নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে) মিছিমিছি এতটা কষ্ট করে সবাই এলে। তোমাদের আনিয়ে এমন করে কষ্ট দেবার কোনো দরকার ছিল না।

বলাই। (থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন আকুল হইয়া উঠিল, ব্যগ্র কণ্ঠে বলিতে লাগিল) আমাদের আবার কষ্ট কি লীনা, তোমায় একবারটি দেখতে আসবো না ? তিন মাস হয়ে গেল, একবারও আসি নি, দেখতে আসবার জন্যে আমার মন ছটফট্ করছিলো। কিন্তু তুমি আমাকে একখানা চিঠিও লিখলে না কেন ? আমাদের কথা কি একবারও তোমার মনে পড়ে নি ? (লীনা চুপ করিয়া রহিল। বলাই ঘোরাফেরা করিতে করিতে বলিল) বাড়ির কোনো খবর তুমি জিগ্যেস করলে না, এখানে এসে আমাদের কথা ভুলেই গেছ দেখচি। আমরা অবশ্য সকলে ভালই আছি। আমার একটা নতুন চাকরী হয়েছে, মাইনেও কিছু বেশি, নইলে কি খরচ চালাতে পারতাম ? বিল্লুরও চাকরী হয়েছে, সে এখন হপ্তায় সাতটাকা করে পায়। আজ আমাদের সঙ্গে আসতো, কিন্তু কোথায় যেন আজ বেড়াতে গেল। তোমাকে তার কথা বলতে বলেছে আমাদের। (লীনা নড়িয়া বসিল) কেষ্ট আর নীরাও আসতো, কিন্তু তাদের ইস্কুলে কি খেলাধূলো আছে, সেইখানে গেছে। ওরা সব বড়ো হয়ে গেছে এখন। কেষ্টা একদম পড়াশুনা করে না, খালি খেলার দিকে মন। আর নীরাটা দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। (হঠাৎ থামিয়া লীনার দিকে চাহিয়া) কৈ লীনা, তুমি তো কোনো কথা কইছো না, সারাক্ষণ চোখ বুজেই রইলে, কোনো কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

লীনা। (মৃদুস্বরে) না, কষ্ট নয়, একটু দুর্ব্বল বোধ করছি।

বলাই। আর কার কথা বলবো ? মীরার কথা ? ও যেমন ছিল তেমনিই আছে, দেখতেই তো পাচ্ছ।

লীনা। (তিক্তস্বরে) তেমনিই আছে ? না না, তা নেই।

বলাই। একটু বড়ো দেখাচ্ছে বুঝি ? তা হবে, তুমি অনেক দিন পরে দেখলে কি না, হয় তো তাই বুঝতে পারচো।

(কথা ফুরাইয়া গেল, বলাই অস্থির হইয়া ঘুরিতে লাগিল)

বিনোদিনী। কতটা সময় হোলো কিছু খেয়াল আছে ?

বলাই। (ঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে চারটে প্রায় বাজে।

বিনোদিনী। এইবার তা হলে যেতে হবে। ষ্টেশন এখান থেকে অনেকখানি।

(বলাইকে ইসারা করিয়া নিজেদের বিবাহের সংবাদ জানাইতে বলিল)

বলাই। (গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া) লীনা।

লীনা। বলো।

বলাই। (রাগিয়া) চোখ দুটো খুলে একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্। আমি কি কেবল নিজে নিজেই বকে যাবো?

লীনা। (চাহিয়া দেখিয়া) কি বলছো বলো।

বলাই। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) বলবো আর কি, এই তোমার বিনোদিনী মাসীকে আমি আর কি—

লীনা। (অবিচলিত স্বরে) বিয়ে করবে?

বলাই। (তাড়াতাড়ি) করবো নয়, করবো নয়, করা হয়ে গেছে।

লীনা (শুষ্ক কণ্ঠে) ও, বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি? (আবার চোখ বুজিল)

বলাই। হাঁ, সে আজ প্রায় দু সপ্তাহ হোলো।

(লীনার কোনো সাড়া না পাইয়া বিরক্ত হইয়া চাহিয়া রহিল)

বিনোদিনী। (বিরক্ত হইয়া) নাও, এবার চলো। দেখলে তো তোমার মেয়ের আক্কেল, আমাদের ও চায় না মোটেই। এত যে ওর জন্তে পয়সা খরচ করলে, তা একটু কৃতজ্ঞতাও নেই।

বলাই। তাই তো লীনা, তোর হোলো কি? একটু কি তোর মায়া মমতাও নেই? একজন নতুন-মা পেয়েছিস, তাতেও কি তোর কিছু বলবার নেই?

লীনা। (তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) না, না, কিছুতেই না।

বিনোদিনী। (বলাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া) চলে এসো না বাপু? তোমার স্ত্রীর অপমান করছে আর তাই তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছো? ওকে ধমকে দেবারও তোমার ক্ষমতা নেই?

বলাই। (ক্রুদ্ধ হইয়া) তুমি চুপ করো তো একটু।

লীনা। (যন্ত্রনাসূচক কণ্ঠে) যাও বাবা যাও! ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে।

বিনোদিনী। (বলাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া) যাবে তো চলো, নইলে আমি একাই চললুম!

বলাই। (ঠেলিয়া দিয়া ঘুসি উঠাইয়া) চুপ করবে কি না শুনি!

বিনোদিনী। আচ্ছা, থাকো তুমি এখানে। আমি চললুম (অগ্রসর হইল)

বলাই। (ব্যগ্রভাবে) এক সেকেণ্ড দাঁড়াও, যাচ্ছি। (বিনোদিনী দরজার কাছে দাঁড়াইল। বলাই লীনার প্রতি চাহিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিল) লীনা, আজ হয়তো আমার সঙ্গে তোর শেষ দেখা, আজ আমার সঙ্গে এই রকম নিষ্ঠুর ব্যবহারটা করলি?

(লীনা চুপ করিয়া রহিল। বলাই চাহিয়া চাহিয়া দরজার নিকট গেল। মীরা ভয় পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে গেল। লীনা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল)

বিনোদিনী। কী, এখন যাবে না আবার দাঁড়াবে? (বলাই চুপ করিয়া রহিল) কথা কও না কেন, যাবে, না দাঁড়াবে?

বলাই। (গম্ভীর ভাবে) এর মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে—নিশ্চয়, নিশ্চয়। (হঠাৎ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া ঘুসি পাকাইয়া) আজ আমি যতোটা পারবো ততটা খাবো কেউ আটকাতে পারবে না। আমি বলছি শুনে রাখো, আজ আমি একেবারে মাতাল হয়ে যাবো। দেখি কে আমায় থামাতে পারে!

(উহারা প্রস্থান করিল। লীনা চোখ খুলিয়া দূর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মিস্ হেমপ্রভা প্রবেশ করিল, হাতে এক গ্লাস দুধ)।

মিস্ হেমপ্রভা। এইটে খেয়ে নাও লীনা। আমার আগেই আনা উচিত ছিল। রবিবার এলেই কাজের গোলমাল হয়ে যায়, যত বাইরের লোক এসে জোটে। তোমার আত্মীয়দের দেখতে পেয়ে খুসি হলে তো?

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) হাঁ।

মিস্ হেমপ্রভা। তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওরা ঘরের কথা বলে কোনো রকম ভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে নি তো?

লীনা। না, না। (দুধ খাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া গ্লাসটি দিল)

মিস্ হেমপ্রভা। (হাসিয়া) দুধ খেতে মুখখানা কেমন করলে দেখ না! যেন বিষ দিয়েছি।

লীনা। দুধ আমার মোটে ভাল লাগে না। এর বদলে যদি বিষ দিতেন সে তো ভালোই হোতো।

মিস হেমপ্রভা। (ঠাট্টার স্বরে) যাও, যাও, আজ রবিবারে ফুর্ত্তির দিনে কি সব কথার ছিরি! (দুষ্টামির হাসি হাসিয়া) এমন খবর আমি দিতে পারি যাতে এখনি একগাল হাসি বেরিয়ে পড়বে। বলো দেখি কে আজ এখানে হাজির হয়েছে?

লীনা। (চমকাইয়া উঠিয়া ভয়ে ভয়ে) কে এসেছে? কে এসেছে?

মিস্ হেমপ্রভা। মুরারী বাবু। (লীনা চোখ বুজিল, মুখে বেদনার আভাস) অনেকক্ষণ তিনি এখানে এসেছেন দেখেছি। এসেই ঢুকলেন ডাক্তার সরকারের ঘরে। (কৌতূহলী হইয়া) কেমন, খবরটা কেমন লাগছে?

লীনা। (উদ্বেগ চাপিয়া শান্ত স্বরে) বোধহয় পরীক্ষা করাতে এসেছেন?

মিস্ হেমপ্রভা। (হাসিয়া) আহা, কেবল সেই জন্যেই যেন আসা? চেহারাটা যদিও এখন খারাপ হয়েছে বটে, বোধ হয় আবার খুব পরিশ্রম করছে। (ব্যস্ত হইয়া) যাই আমার অনেক কাজ রয়েছে। (দরজার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া চাহিল এবং ঠাট্টা করিয়া বলিল) তোমায় দেখতে নিশ্চয়ই আসবেন, অতএব মুখে একটু হাসি এনো।

(প্রস্থান)

(লীনা যেন ভয় পাইয়াছে, বিছানায় সে উঠিয়া বসিল। পুনরায় উত্তেজিত হইয়া শুইয়া পড়িল, মাথা ঘুরাইয়া দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কান পাতিয়া উদ্গ্রীব হইয়া রহিল, বিছানার চাদর মুঠা করিয়া ধরিতে লাগিল এবং ছাড়িয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুরারী প্রবেশ করিল। তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখটি ফ্যাকাশে হইয়াছে এবং শুষ্ক দেখাইতেছে। চোখের কোল অত্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অন্তদিক হইতে মিস্ হেমপ্রভা পুনঃ প্রবেশ করিল।)

মিস্ হেমপ্রভা। এই যে, আপনি ভাল তো?

মুরারী। (খুসি হইবার ভাণ করিয়া) হাঁ, ভালই। আপনারা ভাল তো?

মিস্ হেমপ্রভা। চমৎকার। আপনি এখানে যে আবার এলেন, পুরোনো লোককে দেখতে পেয়ে খুব আমোদ হচ্ছে। তা বলে মনে করবেন না, এখানে আবার আপনাকে থাকতে বলবো। (হাসিয়া) লীনার সঙ্গে দেখা করতে বুঝি? যান যান, আর আটকে রাখবো না, আমারো অনেক কাজ আছে। (মুরারী অগ্রসর হইল) ও ভাল কথা, আপনার গল্পগুলো সব আমরা পড়েছি, চমৎকার গল্প লিখেছেন কিন্তু। আমরা সকলেই আপনার সম্বন্ধে গর্ব্ব অনুভব করি, ঐ নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়।

মুরারী। ওঃ, ও আর কি এমন!

মিস্ হেমপ্রভা। আর অতো বিনয়ে কাজ নেই। আচ্ছা, চললুম।

মুরারী। হাঁ, আবার দেখা হবে। ডাক্তার সরকার আজ এখানে খেতে বলেছেন।

মিস্ হেমপ্রভা। তাই না কি! তবে তো ভালই।

(প্রস্থান)

(মুরারী লীনার শয্যার নিকট গেল। লীনা তাহারই প্রতীক্ষার চাহিয়া আছে। পরস্পর পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল)

লীনা। (চোখ নীচু করিয়া মৃদুস্বরে) বসবেন না?

মুরারী। (শয্যাপার্শ্বে গিয়া পরম আদরে লীনার হাত দুখানি ধরিয়া) লীনা। (লীনার মুখের প্রতি চাহিয়া সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল) তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে লীনা?

(লীনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইল)

লীনা। (ঈষৎ হাসিয়া) না আমার কোনোই কষ্ট হয় নি। (ব্যস্তভাবে) কিন্তু তুমি? তুমি কেমন আছ? (উত্তেজিত হইয়া) তোমায় দেখে খুব আমোদ হচ্ছে। (মুরারীর মুখের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

মুরারী। (থামিয়া থামিয়া) আর আমিও তোমায় দেখে কত খুসি হলুম তা জানো লীনা? (লীনার হাত ছাড়িয়া দিল, একটু সরিয়া বসিল) আমি এখন খুব ভাল আছি। বোধ হয় আমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে, ওটা সহরে বাস করার ফল।

(লীনা চুপ করিয়া রহিল। সে কোনো কিছুর প্রত্যাশায় এতক্ষণ মুরারীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সে প্রত্যাশা

বিফল মনে করিয়া বিছানায় শরীর এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল)

মুরারী। (ব্যস্ত হইয়া) কী হোলো লীনা? কোনো ব্যথা উঠেছে না কি?

লীনা। (ক্লান্ত স্বরে) না।

মুরারী। শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বুঝি? হঠাৎ তোমার চিঠিপত্র একদম বন্ধ হয়ে গেল, তিন সপ্তাহ কোনো খবর পেলাম না, তাই—

লীনা। (তিক্তস্বরে) জবাব না পেলে আর কত চিঠি লেখা যায়?

মুরারী। (লজ্জিত ভাবে) না না, ওটা সত্যি নয়। মোটেই চিঠির জবাব পাওনি?

লীনা। হাঁ, আগে তো পেতাম। কিন্তু ইদানিং—

মুরারী। হাঁ, আমার দোষ হয়েছে বটে। কি জানো, ইচ্ছে থাকলেও লিখতে পারতাম না। আমাদের কাজটাই এই রকম, একটা কাজ করবো মনে করতে করতে আর একটা কাজ এসে বাধা দেয়। কোনো কাজটা ঠিক সময়ে করা হয়ে ওঠে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো লীনা?

লীনা। (ম্লান মুখে) হাঁ, এখন সবই বুঝতে পারছি।

মুরারী। (ক্ষুণ্ণ হইয়া) ও কি রকম কথাটা হোলো? আমায় তা হলে বিশ্বাস করলে না? (লীনা চুপ করিয়া রহিল। মুরারী ভ্রূকুটি করিল, কিছুক্ষণ পরে বলিল) তোমায় এখানে এনেছে কেন লীনা?

লীনা। (নিরস ভাবে) কে জানে, ওদিকে জায়গা ছিল-না বলে বোধ হয়।

মুরারী। তোমার কোনো চিঠিতে তো এখবরটা লেখো নি—

লীনা। চিঠিতে কেবল রোগের খবর লেখাই কি ভাল? কারো কি ঐ সব কথা বারে বারে শুনতে ভাল লাগে?

মুরারী। (আহত স্বরে) এ কথাটা ঠিক হোলো না লীনা। তুমি তো জানো আমি—এখানে কতদিন থেকে আছ?

লীনা। প্রায় এক মাস।

মুরারী। (আশ্চর্য্য হইয়া) এক মাস? তার আগে তো তুমি বেশ ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছো,—নয় কি?

লীনা। না। এর আগেও আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম।

মুরারী। অর্থাৎ যখন থেকে আমি গেছি তখন থেকেই তুমি আর ওঠো নি?

লীনা। না।

মুরারী। কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে মনে হোতো যেন তুমি খুব ভাল—

লীনা। খুব ভাল হবে উঠছি? সে কথা সত্যি। আমি এখন বেশ চলে ফিরে বেড়াতে পারি, কিন্তু ডাক্তার সরকার বলেছেন যে বেশি দিন পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলে আমি একদম সেরে উঠবো—যাক্ ও সব কথা এখন থাক। আমি এখন বেশ ভালই আছি। তুমি বুঝি ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে?

মুরারী। হাঁ।

লীনা। তিনি তোমায় পরীক্ষা করলেন?

মুরারী। হাঁ। তিনি বললেন আমি খুব ভাল আছি।

লীনা। তাই হলেই হোলো। (কিছুক্ষণ পরে) তুমি নিজের কথা সব বল,—এতদিন কি কি করেছো। অনেক গল্প লেখা হয়ে গেছে তো?

মুরারী। না, মোটে সময় পাই নি। সহরে থেকে সময় করা বড় মুস্কিল। তুমি যা কপি করে দিয়েছিলে তাই বেচেই কিছু টাকা পেয়েছি কিনা, সুতরাং কুঁড়ে হবে পড়েছি। ঠেকায় না পড়লে লেখা বেরুবে না।

লীনা। কেন, লেখা বুঝি শক্ত? এখানে তো কত সহজে লিখে যেতে?

মুরারী। তার কারণ, এখানে আমি খুব আনন্দে ছিলাম। হয় তো তখন নতুন একটা কাজ পেয়ে কয়েকদিন ভারী মন লেগে গিয়েছিল। এখন আর তেমন ভাল লাগে না। সব কাজই বোধ হয় এই রকম, কিছুদিন বেশ নতুন লাগে, তার পরেই পুরোনো হয়ে যায়। প্রত্যেক জিনিষের বেলাই বোধ হয় আমাদের এই রকম মনের ভাব হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিনিষটা হস্তগত না হয় ততক্ষণ মনে হয় যেমন

যেন করেই হোক ঐ জিনিষটা পাওয়া চাই, কিন্তু যেমনি পাওয়া হয়ে গেল অমনি দেখা যায় আর সেটাতে কোনো দরকার নেই।

লীনা। (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু লেখার মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র আনন্দ নেই?

মুরারী। (লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি) হাঁ, তা আছে বৈ কি। ও আমি এমনিই বলছি। আমার নিজেরই একটা কুঁড়েমি এসে পড়ে সকল বিষয়ে, তাই সব কাজেই বিরক্ত হয়ে উঠি। (মৃদু হাসিয়া) মাঝে মাঝে আমার ঐ রকম একটা অনাসক্তি এসে পড়ে। ও ভাব কেটে গেলেই আবার লিখতে সুরু করবো।

লীনা। (উৎসাহের সহিত হাসিয়া) হাঁ তাই তো করা উচিত। যে গল্পগুলো বেরিয়েছে সমস্তই আমি পড়েছি, আমার তো খুব চমৎকার বলেই মনে হয়। প্রত্যেকটি লাইনের মধ্যেই তোমার পরিচয় পাওয়া যায়, অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জিনিষ নিয়েই লেখো, যা আমরা প্রত্যহই দেখতে পাই। সকলেই এই কথা বলে, আমি একা নয়।

মুরারী। (খুসি হইয়া—কৃত্রিম ভাবে) সকলেই বলে, তা হলে নিশ্চয় ভাল নয়। যাক্, এখনো অনেকগুলো গল্প লেখা আছে। মনে মনেও অনেকগুলো জমে আছে, লেখবার তাগাদা হলেই সেগুলো লিখে ফেলবো। সেগুলো আরো ভাল লেখা হবে, দেখো। (হাসিয়া) তোমার কাছে এসেই আবার আমার মনে হচ্ছে এমনি এখানে কাগজ কলম নিয়ে বস্‌লে অনেক কিছু লিখে ফেলতে পারি। তোমার মধ্যে যেন একটা প্রেরণা আছে। তুমি যে আমার এ বিষয়ে কত সাহায্য করেছো সে কথা আমি ভুলি নি।

লীনা। (দুঃখিত ভাবে) আমি তো কিছুই করি নি!

মুরারী। (ব্যগ্রতার সহিত) নিশ্চয় করেছো, তুমি না থাকলে আমার লেখাই সম্ভব হোতো না। তোমার চিঠিগুলোও আমাকে উৎসাহ দিয়েছে তা তুমি জানো না, যখনই আমার মনে আলস্য এসেছে তখনই ঐ চিঠিগুলো পড়লেই নতুন উদ্দীপনা পেয়েছি। তোমার প্রতি যে আমি কত কৃতজ্ঞ তা তুমি জানো লীনা!

লীনা। (মৃদুস্বরে) ওটা তুমি তোমার নিজের গুণেই বলছো, কিন্তু চিঠির মধ্যে এমন কিছুই ছিল না।

মুরারী। যথেষ্ট ছিল। তিন সপ্তাহ চিঠি না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, আমার সব কাজে একটা ফাঁক পড়ে যাচ্ছিল। সেই জন্যেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে তোমায় দেখতে এলাম।

লীনা। (মৃদু হাসিয়া) এসে দেখছো তো আমি ভালই আছি।

মুরারী। (চাপিয়া গিয়া) হাঁ, ভালই তো আছ, কিন্তু যদি দেখতাম ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছো তা হলে খুসি হতাম। বাইরে তা হলে তোমাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতাম। (লীনার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা গেল, সে চোখ বুজিল) সেদিনকার রাত্রের কথা তোমার মনে আছে লীনা?

লীনা। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া কম্পিত স্বরে) সে কথা মনে পড়িয়ে আর কেন লজ্জা দাও? সে দিন খুব জ্বর হয়েছিল কিনা, তাই বুদ্ধিটাও কেমন হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় তখন মাথাটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নইলে কি ঐ কাণ্ড করতাম? তখন যে কি বলেছি, কি করেছি, কিছুই আমার হুঁস ছিল না।

মুরারী। (আহত স্বরে) কিন্তু আমি তা ভুলি নি, আর কখনো ভুলবো না লীনা। যাই হোক, আমি জানতাম যে সমস্তই তুমি ভুলে যাবে, খেয়ালের বশে কি একটা করে ফেলেছিলে বৈ তো নয়। তোমার কোনো চিঠিতেও আর সে কথার উল্লেখ করো নি—

লীনা। যাক্, ও কথায় আর কাজ নেই। একেবারেই ভুলে যাও ও সব কথা। মনে হলেই আমার লজ্জা করে।

মুরারী। (অপ্রসন্ন ভাবে) বেশ, বেশ, আর বলবো না তা হলে। মনের ভেতর তোমার কোনো উদ্বেগ আনা উচিত নয়। আমি এত বক্ বক্ করচি, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছো বুঝি? একটু ঘুমোবে?

লীনা। (ক্লান্ত স্বরে) হাঁ, একটু ঘুমোতে চাই।

মুরারী। (হাত ধরিয়া) বেশ, তুমি ঘুমোও, আমি এখন যাই। এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকবো, যাবার সময় আবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো। কেমন?

লীনা। আচ্ছা, দেখা করে যেও।

মুরারী। নিশ্চয় আসবো।

(লীনার হাত ধরিয়া চাপিয়া দিল এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে লীনার প্রতি চাহিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল, যাইবার সময় দরজাটি ভেজাইয়া দিল। দরজা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিয়া লীনা উঠিয়া বসিল, ফোঁপাইয়া উঠিয়া মুরারীর উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া দিল। পরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

পাশের ঘর

(মুরারী ঘর পার হইয়া বাহিরের দিকে যাইতেছে, এমন সময় মিস্ গীতিকা সেই দিক দিয়া প্রবেশ করিল)

মিস্ গীতিকা। এই যে মুরারীবাবু, ভাল আছেন তো? এইমাত্র ডাক্তার সরকার বললেন যে আপনি এলেছেন।

মুরারী। (হাসিমুখে) হাঁ আমি বেশ আছি। আপনি ভাল তো?

মিস্ গীতিকা। হাঁ ভাল। ডাঃ সরকার বললেন তিনি আপনাকে পরীক্ষা করেছেন, আপনি খুব ভাল আছেন। শুনে খুব আনন্দ হোলো। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) লীনার কাছে গিয়েছিলেন নাকি?

মুরারী। হাঁ, এইমাত্র তার কাছ থেকে আসছি। সে একটু ঘুমিয়ে পড়লো।

মিস্ গীতিকা। (বিস্মিত হইয়া) ঘুমিয়ে পড়লো? ভাল কথা নয় তো! আমি যদি আগে শুনতাম যে আপনি এসেছেন তা হলে বড় ভাল হোতো। আপনি লীনার সঙ্গে দেখা করবার আগে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতেন তা হলে বড় ভাল হোতো। আমি জানতাম যে আপনি একবার এখানে আসবেন। (মৃদু হাসিয়া) যাক্ গে, এখনো উপায় আছে। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

মুরারী। বলুন কি বলবেন।

মিস্ গীতিকা। (একটি চেয়ার লইয়া দরজার নিকট হইতে দূরে আনিয়া রাখিল) বসুন এখানে। এখান থেকে লীনা আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে না। এই ঘরে কথা না কইলেই ভাল হোতো, কিন্তু কোথায় বা আপনাকে নিয়ে যাই, চারিদিকেই লোকজন ঘুরচে। দরজাটা বেশ বন্ধ করে দিয়ে এসেছেন তো? লীনা যেন আমাদের কোনো কথা না শুনতে পায়। (দরজার কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল এবং উৎসুক দৃষ্টিতে ফিরিয়া আসিল) লীনা ভয়ানক কাঁদছে! কী বলেচেন ওকে? যাঃ, বড্ডো দেরী হয়ে গেল, আগে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতেন! নার্সগুলো এমন বোকা, আমার কাছে খবর না দিয়ে একেবারে আপনাকে —যাক্ গে, এখন কি হোলো বলুন তো? বলুন সব কথা, আমার জানা দরকার।

মুরারী। (আমতা আমতা করিয়া) হবে আবার কি? কিছুই না। লীনা কাঁদছে দেখলেন? আপনি কি জানেন না, ওকে কাঁদাবার মতো কথা আমি কিছু বলতে পারি কখনো?

মিস্ গীতিকা। (নরম হইয়া) ইচ্ছে করে কাঁদাবেন না তা আমি জানি। কিন্তু নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। যাক্, এমন করে কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। আপনি যখন কিছু বলচেন না, তখন আমাকেই আগে বলতে হয়। দেখলেন তো লীনার অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছে?

মুরারী। তা তো দেখলাম।

মিস্ গীতিকা। (গম্ভীর ভাবে) ওর অবস্থা ক্রমাগতই খারাপ হচ্ছে,—যখন থেকে আপনি চলে গেছেন ঠিক তখন থেকে। এখন যা দাঁড়িয়েছে তা অত্যন্ত সিরিয়াস্। আমরা সকলেই ওকে অত্যন্ত ভালবাসি, এমন মেয়ে প্রায় দেখা যায় না,—সকলেই আমরা ওর জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করচি,—তাই ছ'মাস পার হয়ে গেলেও ওকে আমরা এখান থেকে সরাতে রাজি হইনি। কেবল আমরা আশা করে এসেছি যে এইবার ও সেরে উঠবার মুখে আসবে,—আরো এক সপ্তাহ দেখা যাক, আরো একটা দিন দেখা যাক,—এমনি করে আমরা কতই অপেক্ষা করে দেখেছি। কিন্তু আর আমাদের ভরসা নেই। ডাঃ সরকার বলেন যে, এখানে আর ওর কোনো উপকার হবে না। ওর বাপও আর খরচ যোগাতে চাইছে না। সেই জন্যে ওকে দু' এক দিনের মধ্যেই দাতব্য হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মুরারী। (আতঙ্কের সহিত) দাতব্য হাঁসপাতালে পাঠানো হবে?

মিস্ গীতিকা। আপনি তো এখানকার নিয়ম জানেন,—যতদিন পর্য্যন্ত এখানে রাখা যায় তার চেয়েও বেশিদিন ওকে রাখা হোলো, তবুও কোনো ফলই হোলো না।

মুরারী। (উদ্বিগ্ন মুখে) তার মানে—

মিস্ গীতিকা। (তীব্রস্বরে) তার মানে এইবার মরে যাবে আর কি? ওকে আর বাঁচানো যাবে না।

মুরারী। (বিবর্ণ মুখে) কী ভয়ানক কথা! এ যে স্বপ্নেও—

মিস্ গীতিকা। অন্য কেউ হলে হয়তো সেরে উঠতেও পারতো। হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গেলে কিংবা অন্য-রকম চেষ্টা-চরিত্র করলে কিছু ফল হোতো। কিন্তু ওর আর সে আশা নেই। ও মরবে। সুতরাং এখানে আর মিছিমিছি রেখে লাভ কি? এখানে থাকলেও মরবে, অন্য কোথাও গেলেও মরবে। নিজের জীবনের সমস্ত আশাই ও ছেড়ে দিয়েছে, ও আর বাঁচতেই চায় না। জীবনের হাল ছেড়ে দিয়ে ও এখন মৃত্যুর কামনা করছে,—এখন আর চেষ্টা করেই বা ফল কি? বড্ডো দেরী হয়ে গেছে।

মুরারী। দেরী হয়ে গেছে মানে কি? কিসের দেরী হয়ে গেছে? বাঁচাবার আর কি কোনোই উপায় নেই? (মিস্ গীতিকা ঘাড় নাড়িল। মুরারী আবিষ্টের মতো হইয়া বলিতে লাগিল) বলেন কি? কিছুই আর করবার নেই? কিছুই আমরা করতে পারবো না?

মিস্ গীতিকা। (বিষণ্ণভাবে) কি জানি, কিছুই বোধ হয় আর করা যায় না। আপনার সঙ্গে যদি আমার আগে দেখা হোতো—কিন্তু এখন কি আর তা হয়? ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেছে। ও সব জেনে ফেলেছে। (মুরারী কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল) বুঝতে পারছেন না? লীনা যে আপনাকে ভালবাসে এটা জানেন তো?

মুরারী। (যেন দায়িত্ব আরোপ করা হইতেছে বুঝিয়া নিজের দোষ কাটাইবার ভাবে বলিল) না, মিস্ গীতিকা, এটা আপনি ভুল করছেন। আগে ওর মনে মনে ঐ রকম একটা কিছু হয়েছিল হয়তো,—যখন আমি এখানে থাকতাম। কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। তার পর-ও সে সব কথা ভুলেই গেছে, আমি তা বেশ ভাল রকমই জানি। (মিস্ গীতিকা তিক্তভাবে হাসিয়া উঠিল) দেখুন, তারপর এই ক' মাস ধরে ও আমাকে অনেক চিঠি লিখেছে, বেশ সাদাসিধে চিঠি, তার কোনোটার মধ্যে ও-কথার উল্লেখমাত্র ছিল না।

মিস্ গীতিকা। আপনি কি কখনো নিজে কোনো চিঠিতে ও-কথার উল্লেখ করেছিলেন?

মুরারী। না, নিশ্চয়ই না। আপনি বুঝছেন না। এই দেখুন না, এখনি তো আমাদের কথাবার্ত্তা হোলো, ঐ সম্বন্ধে কথা উঠতেই ও বল্লে যে তখন ও না-ভেবে-চিন্তে পাগলের মতো কি একটা কাজ করে ফেলেছিল; এখন সেটা বুঝতে পেরেছে,—ও বল্লে সে সব কথা না তোলাই ভাল, মনে পড়লেই ওর লজ্জা হবে।

মিস্ গীতিকা। কিন্তু কথাটা বুঝে দেখুন। লীনা দেখলে যে আপনি তখনো ওকে যেমন ভালবাসতে পারেন নি, এখনো তেমনি আছেন, ওকে আপনি ভালবাসেন না। দেখুন, আমরা এ সব লক্ষ্য করেছি। আপনাদের মধ্যে কি হচ্ছে তা আমরা জানতাম। তখনই আমি এটাতে বাধা দিতে পারতাম, কিন্তু দেখলাম যে তা করলে ওর শরীরের পক্ষে অনিষ্ট হবে। তা ছাড়া মনে করলাম এটা একটা চোখের নেশা মাত্র, বাধা দিয়ে দরকার নেই, আপনি চলে গেলেই ওর মনের ভাবটা বদ্‌লে যাবে। (একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন, এই সব ডেলিকেট বিষয় নিয়ে আমি খোলাখুলি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু লীনার ভালো করবার চেষ্টাতেই এটা করতে হচ্ছে, লীনাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। আমরা সকলেই ভালবাসি। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) লীনার মনের কথা আমি সব জানি। আমি নিজেও ওর মতো একজন ভুক্তভোগী,—সে অনেক দিনের আগেকার কথা,—আমিও ওর মতো এমনি ভুলই করেছিলাম। কিন্তু আমার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল, বন্ধু বান্ধব ছিল, আমি একরকম করে সাম্‌লে নিলাম। কিন্তু অনেক দিনের জন্যে আমার জীবনটা একদম মাটি হ'য়ে গিয়েছিল। সেই জন্যেই আমার মনে হয় যে লীনার সম্বন্ধে বলবার আমার কিছু অধিকার আছে, ও বেচারার দুনিয়ায় কেউ বন্ধু নেই।

মুরারী। (ভগ্নস্বরে) আমাকে যা আপনার বলবার ইচ্ছে তাই বলুন।

মিস্ গীতিকা। (কিছুক্ষণ পরে, বিষন্ন স্বরে) আপনি ওকে মোটেই ভালবাসেন না,—নয়?

মুরারী। না, দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, ও রকম ধরণের ভালবাসার কথা আমি মোটেই কখনো ভাবি নি পর্য্যন্ত,—কাউকেই আমি কখনো সে রকম ভালবাসিনি।

মিস্ গীতিকা। (বিষন্ন স্বরে) আহা, বড্ডো দেরী হয়ে গেল! আমাদের এই কথাবার্ত্তাগুলো যদি ওর সঙ্গে দেখা হবার আগে হয়ে যেতো। আমার ইচ্ছে ছিলো সব কথা আপনাকে বলবো, আর যদি জানতে পারতাম যে আপনি ওকে ভালবাসেন না, তা হলে ওর সঙ্গে আপনাকে দেখা করতেই দিতাম না, অর্থাৎ এই জিনিষটা ওকে মোটেই জানতে দিতাম না। ওর মনে মনে বরাবরই একটা আশা ছিল, সেই আশাটা তা হলে আর ভাঙতো না,—যদি এখন দেখা না করতেন তা হলে আশাটা শেষ পর্য্যন্তই থেকে যেতো। আপনার সম্বন্ধে এই সত্যি কথাটা ও আর কখনো জানতেই পারতো না। আমার একবার মনে হয়েছিল আপনাকে চিঠি লিখে এই কথাগুলো জানাই,—কিন্তু চিঠিতে এত কথা বোঝানো যায় না। (দুঃখিত স্বরে) কিন্তু এখন তো ডাঃ সরকার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন ওকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে,—আর কিই বা করবার আছে? ও যখন শুনবে এ কথা তখন কি আর বাঁচবার কোনো আশা থাকবে? বেচারা সেখানে গিয়ে একা একা শেষকালে নিতান্ত অসহায়ের মতো মরবে।

মুরারী। (বিবর্ণ মুখে) না না,—তা হ'তে দেওয়া চলবে না। আমি তো রয়েছি। আমার কাছে কিছু টাকা আছে,—ওটা অন্তত যেন না হয়। আপনারা বরং ওকে কোনো ভাল জায়গায় পাঠান,—যেখানে বাঁচবার কিছু আশা থাকতে পারে—

মিস্ গীতিকা। তা যেন হোলো, কিন্তু তাতে তো ওর মনের কষ্ট দুর করা যাবে না! শেষ ক'টা দিন যদি ওর মনে কিছু সুখ দিতে পারা যেতো তা হলেই তো ভাল হোতো। আপনার জন্যেই ও এতটা দুঃখ পেলে। আচ্ছা, আপনি কি অন্তত মুখেও বলতে পারেন না যে ওকে ভালবাসেন?

মুরারী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে) সে কথা বললেও ও এখন তা বিশ্বাসই করবে না।

মিস্ গীতিকা। (ব্যগ্র কণ্ঠে) ওকে বিশ্বাস করিয়ে দিন না। আপনি ওকে বিয়ে করবেন, এই কথা বলুন না। আপনি বলুন যে আপনি ওকে বিয়ে করবেন, তা হলেই ওকে অন্য কোনো স্যানাটোরিয়মে সরিয়ে নিয়ে যাবার আপনার অধিকার হবে। একটা খুব স্বাস্থ্যকর জায়গায় চমৎকার একটি স্যানাটোরিয়ম আছে, সেখানে ওকে নিয়ে যান। আপনি কাছাকাছি কোথাও থাকবেন, শেষ কটা দিন অন্তত ও তা হলে সুখে থাকবে। এইটুকু অন্তত করুন,—ওর ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ,—তা কি করতে পারবেন না?

মুরারী। (ধীর স্বরে) পারবো। (স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া) কিন্তু মিছে কথা বলার কোনো দরকার নেই, সেটা ওর প্রতি অবিচার করা হব। আমি সত্যি সত্যিই ওকে বিয়ে করবো। ও যদি তাতে সুখী হয় তা হলে তাই করাই উচিত। কিন্তু মিছিমিছি বলবো যে বিয়ে করবো, আর ও তাতে প্রতারিত হয়ে—না, না, সে আমার দ্বারা হবে না।

মিস্ গীতিকা। (ম্লান হাসিয়া) শুনে সুখী হলুম। এখন আর ওকে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে না। কিন্তু আমি তো লীনাকে জানি, একেবারে সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত ও তাতে নিজেই রাজি হবে না। কিন্তু দাঁড়ান—আরো একটা কথা ভাববার আছে। এই সব অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে যেমন উত্তেজিত হয়ে উঠবে, সেটাও ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ের কথা। আমাকে আগের থেকে খানিকটা সাবধান হতে হবে, ওকে একটু শুনিয়ে রাখতে হবে। বেশিদিন ও বাঁচবে না, এটা নিশ্চয়। ডাঃ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি কথা কয়ে দেখেছি, ওর তেমন কোনো আশা নেই। যে কটা দিন বাঁচে যেন মনের শান্তি পায় এইটুকুই আমি চাই। এই কথাটাই যেন আপনার মনে থাকে।

মুরারী।—(ধীরস্বরে) হাঁ, তাই মনে থাকবে। কিন্তু কী যন্ত্রণা বলুন তো—(হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া লীনার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল—) আমি এখনি যাচ্ছি ওর কাছে,—নিশ্চয় ওকে আমার কথা এখন বিশ্বাস করাতে পারবো।

মিস্ গীতিকা। ফিরে এসে আমাকে জানাবেন সব কথা।

মুরারী। নিশ্চয়।

(দরজা খুলিয়া লীনার ঘরে প্রবেশ করিল। মিস্ গীতিকা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তাহার পর চলিয়া গেল)

লীনার কক্ষ

(মুরারী পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল। লীনা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। মুরারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল, চোখে স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টি। তৎপরে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া লীনার বিছানার পাশে গিয়া বসিল, তাহার হাত দুটি ধরিয়া চুম্বন করিয়া আবেগের সহিত ডাকিল)—লীনা!

লীনা। (চকিত হইয়া উঠিয়া) ও তুমি এসেছো? (আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দুই হাতে মুরারীর মুখটি ধরিয়া এক দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বলিল) তুমি,—তুমি এসেছো?

মুরারী। (তাড়াতাড়ি কথাটা পাড়িবার জন্য) তখন কি যে বলতে চেয়েছিলে, অথচ বললে না, সেই সেই দিনকার রাত্রির কথা,—তাই না? তুমি আমায় ভালবাস, এই কথা বলতে চেয়েছিলে,—না লীনা?

লীনা। (অভিমানের সুরে) হাঁ,—ঐ কথাই তো; কিন্তু তুমি তো আমায় ভালবাস না। (হাত দুটি ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল)

মুরারী। (বাধা দিয়া আদরের সহিত) কোন্ কথাটা তোমাকে বলবার জন্যে আমি এতটা রাস্তা দৌড়ে এসেছি—ঐ না-ভালবাসার কথা বুঝি? তোমার ঐ ভুলটা ভাঙাতেই তো আমি এসেছিলাম, আর সে কথা প্রথমেই আমি বলতাম, কিন্তু মিস্ গীতিকা আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন যে হঠাৎ তোমাকে কোনো রকম উত্তেজিত করা উচিত নয়। আমারও তাই ভয় হয়ে গিয়েছিল,—মনে করেছিলাম এখন আমার কোনো কথা না বলাই হয় তো ভাল, কিন্তু থাকতে পারলাম না,—কথাটা বলবার জন্যে আবার আমায় ফিরে আসতেই হোলো।

লীনা। (বিস্ময়ের সহিত হাসিয়া) ও—তাই বুঝি তখন কেমন কেমন অদ্ভুত রকমের ভাব দেখাচ্ছিলে? কিন্তু ওরা কি বোকা, আমার যদি খুব আনন্দ হয়, তাতেই আমার শরীরের ক্ষতি হবে? আমার তো এই একটি মাত্র চাইবার জিনিষ, এই আমি চেয়েছিলাম, তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম।

মুরারী। (কম্পিত কণ্ঠে) তা হলে বিয়ে করতেও রাজি আছ তো?

লীনা। (কতকটা সন্দিগ্ধ ভাবে) কিন্তু তুমি যা বলছো তা ঠিক তো, আমাকে সত্যিই তুমি নেবে তো?

মুরারী। (রুদ্ধকণ্ঠে) নেবো লীনা, তোমাকেই আমি চাই।

লীনা। (আনন্দে) তবে আর কথা কি, আগে আমি সেরে উঠি, তারপর বিয়েও হবে অখন। (হাত ধরিয়া বুলাইতে লাগিল)

মুরারী। (রুদ্ধ স্বরে) তার আর বেশি দিন দেরী হবে না লীনা।

লীনা। (খুসি হইয়া) আর দেরী হবে কেন,—সারা জীবনের দুঃখের পর এবার যখন আনন্দ পেয়ে গেছি। তুমি দেখো এবার কত শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠবো। এমন মোটা হয়ে যাবো যে দেখলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এক মাস পরে আমাকে আর চিনতেই পারবে না। তা যদি না হয় তবে এই হাড়সার রোগা বিশ্রী চেহারা দেখে তুমি ভালবাসবে কেমন করে? (হাসিয়া) আমি যদি পুরুষ হতাম তো এই ভীষণ চেহারাকে কখনো ভালবাসতুম না।

মুরারী। কী যে যা তা বকো!

লীনা। (বিশ্বস্ত ভাবে) তুমি দেখো, আমি নিজেকে এবার ঠিক সারিয়ে তুলবো। বেশী দিন তোমার অপেক্ষা করতে হবে না গো। আচ্ছা তুমি এখানকার কাছাকাছি একটা কোথাও বাসা টাসা নাও না, তা হলে রোজ আমাকে দেখতে আসতে পারবে,—আর আমি একটু সেরে উঠলেই তোমার গল্পগুলো কপি করে দিতে পারবো, লেখার সম্বন্ধে কত তোমার সাহায্য করতে পারবো; (হাসিয়া) কিন্তু আমার আবার কথা শোনো, যেন আমার সাহায্য না হলে তোমার গল্প লেখাই হোতো না। কী যে বলি তার ঠিক নেই।

মুরারী। (রুদ্ধ কণ্ঠে) কেন, ঠিক কথাই তো, তোমার সাহায্যেই তো ওসব লেখা, ধরতে গেলে ও তো তোমারি সৃষ্টি! (শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়া) কিন্তু তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয় লীনা। আমি তোমায় এখানকার চেয়েও একটা ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখবো। ডাঃ সরকারের সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ হয়ে গেছে। সেখানকার কাছাকাছি একটা জায়গায় আমি থাকবো, রোজ তোমায় দেখতে পাবো।

লীনা। (পরম সুখে) এই সব ব্যবস্থা তুমি আগের থেকে করেই এসেছো বুঝি? (মুরারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল) কি আশ্চর্য্য, তুমি কত ভাল বল তো! সেখানে এখানকার মতো ভিড় নেই বুঝি? তুমিও সেখানে থাকবে কাছাকাছি, তাতে তোমারো ভাল হবে,—শহরে একা একা থাকবে, আমি কাছে থাকবো না, সেটা ভাল নয়। তুমি তো বললে জায়গাটা খুব ভাল, তা হলে আমি আরো তাড়াতাড়ি সেরে উঠবো,—কি বল? তুমি যদি কাছে থাকো তবে যেখানেই আমি থাকি না কেন, সেখানেই ভাল থাকবো। (মুরারী মুখ লুকাইল। তাহার গলায় কান্নার মতো স্বর শুনিয়া হঠাৎ উদ্বিগ্ন হইয়া) ও কি,—তুমি,—তুমি কাঁদছো নাকি? (কাঁদিতে লাগিল)

মুরারী। (মুখ তুলিল, চোখে তাহার অপূর্ব্ব মুগ্ধ দৃষ্টি) আমি তোমায় ভালবাসি লীনা। সত্যি বলছি, সত্যি বলছি, আমি তোমায় সত্যি সত্যি ভালবাসি।

লীনা। (সুখে মগ্ন হইয়া বিদ্রুপের ন্যায় হাসিয়া) তাইতো, কী কথা! এমন করেই বলছো যেন এই মাত্র ঐ মহাসত্যটা আবিষ্কার করে ফেললে!

মুরারী। যেমন ভাবেই বলে থাকি, আমি তোমায় ভালবাসি। কী অন্ধ, কত বড় গাধাই আমি যে ছিলাম এতদিন! আমি এখন ভালবাসি লীনা। তুমি আমার জীবনের চেয়েও বেশি, তুমি এখন সব। আমি ভালবাসি লীনা! সত্যিই ভালবাসি! বিয়ে হলে দেখবে—

(বলিতে বলিতে হঠাৎ লীনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে পড়িয়া গেল, ভয়ে পাংশু হইয়া গেল। মৃত্যুর কালো ছায়া যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইল)

লীনা। (ভয় পাইয়া) এ কি, বলতে বলতে অমন করে থামলে কেন? কী হয়েছে গো,—কী হোলো—

মুরারী। (কাতরোক্তির সহিত) না, না, তা হতেই পারে না,—হা ঈশ্বর (দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল)

লীনা। (চীৎকার করিয়া) কেন, কী হয়েছে? (হঠাৎ যেন সে সমস্ত বুঝিতে পারিল) ও, আমি বুঝেছি বুঝেছি (ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল) ও, আমি আর বাঁচবো না, নিশ্চয় মরে যাবো।

মুরারী। (পাগলের মতো) না, না, কিছুতেই না।

লীনা। (অস্ফুট স্বরে) হাঁ, আমি মরেই যাবো।

মুরারী। (সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া) না, লীনা, না, না, না! তুমি বলছো কি? তুমি—মরবে? আমরা একদিন সকলেই তো মরবো জানি, কিন্তু সে কথা নয়। তুমি বাজে কথা বলছো। তুমি ভাল হয়ে আসছো,—সকলেই তাই বললে। আমি শপথ করে বলছি। দুর্ব্বল হয়ে পড়েছো বটে, কিন্তু সেরে উঠতে তোমার দেরী হবে না। একথা আমি বলছি না, এখানকার সবাই আমাকে তাই বলেছে। এখন আর তোমার ও রকম কুচিন্তা করাই উচিত নয়।

লীনা। (অবিশ্বাসের সহিত) তবে তুমি অমন করে চাইলে কেন,—হঠাৎ কথা বলতে বলতে অমন ভয় পেয়ে উঠলে কেন?

(মিস্ গীতিকা এই সময় দরজার ফাঁক দিয়া উকি মারিয়া দেখিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু মুরারীর গলা শুনিয়া পুনরায় দরজার কাছে থামিয়া গেল)

মুরারী। (লীনার কাঁধ দুইটি ধরিয়া) তোমার কথা ভেবে আমি ভয় পাইনি লীনা,—তোমার সম্বন্ধে নয়। আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম,—হাঁ আমার নিজের সম্বন্ধেই ভাবছিলাম। তোমাকে সে কথা আমি বলতে পারি নি। সকলে আমায় বারণ করে দিয়েছিলো তোমায় যেন কোনো রকম উত্তেজিত না করি,—সেই জন্যেই সে কথা বলতে পারি নি।

লীনা। (আতঙ্কের সহিত) সে কি কথা? তোমারও অসুখটা বেড়ে গেছে না কি?

মুরারী। (অনাবশ্যক জোরের সহিত) হাঁ, তাই।

ডাঃ-সরকার আমাকে তাই বল্‌লেন। আমি সে কথা তোমার কাছে চাপা দিয়েছিলাম। আমার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, আবার রোগটা দেখা দিয়েছে। জীবনের প্রতি আমার আর তেমন মায়া ছিল-না। তোমাকে যদি নাই পেলাম, তবে একা একা বেঁচে থেকেই বা লাভ কি, এই রকম ভাবতাম। তবে যদি তুমি আমায় এখনই বিয়ে করতে রাজি হও, সেরে ওঠা পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা না কর,—তা হলে আমারও মনে মনে একটা আশা হয়, আর তোমারও তাতে উপকার হতে পারে। ডাক্তাররা যাই বলুক না কেন, ওদের কথা শুনে কাজ কি, আমাদের কিসে ভাল হবে তা আমরাই বুঝবো। কেমন, রাজি হবে তো লীনা?

লীনা।—তুমি যা করতে বলবে তাই আমি করবো,—এর চেয়ে সুখ আর আমার কী হতে পারে? (কাঁদিয়া ফেলিল) কিন্তু দেখ, আমার কেমন ভয় করচে। মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কোন কথাটা বিশ্বাস করবো বুঝতে পারছি না।

মিস্ গীতিকা। (এতক্ষণ অবাক হইয়া মুরারীর কথা শুনিতেছিল, এইবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল)—মুরারীবাবু!

মুরারী। (থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া) ও আপনি —(মুরারীর বেদনাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দেখিয়া মিস্ গীতিকা চম্‌কাইয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। লীনা ইতিমধ্যে লজ্জায় কাপড় ঢাকা দিয়া মুখ লুকাইয়াছে। দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত মুরারী মিস্ গীতিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল)—মিস্ গীতিকা, আপনি ঠিক সময়েই এখানে এসেছেন। লীনা! শোনো না লীনা! মিস্ গীতিকার কথা তুমি বিশ্বাস করবে তো নিশ্চয়? উনি সব জানেন।

(লীনা মিস্ গীতিকার মুখের প্রতি চাহিল)

মিস্ গীতিকা। কোন কথা হচ্ছে?

মুরারী। (দৃঢ়তার সহিত) আপনি তো জানেন, ডাঃ সরকার আমাকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলেছেন। সেই কথাই বলছিলাম যে আমাকে আবার টি. বি. ধরেছে,—কিন্তু লীনা ও-কথা বিশ্বাস করছে-না। ও যে কি মনে করছে তা জানি না। আপনাদের অবশ্য কোনো রোগীর সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা বারণ,—কিন্তু সব নিয়মেরই একটা ব্যতিক্রম আছে। লীনাকে বলুন না সত্যি সত্যি কি শুনেছেন?

মিস্ গীতিকা। (হতভম্বের মতো হইয়া) সে কি মুরারীবাবু! আমি—আমি—কেমন করে—

মুরারী। (ব্যগ্র ভাবে) তা হোক, লীনাকে আপনার বলতেই হবে। ওর শোনবার অধিকার আছে। ও আমাকে ভালবাসে,—আর আমিও ওকে ভালবাসি। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস গীতিকার দিকে চাহিয়া) বুঝতে পেরেছেন, আমি ওকে ভালবাসি!

মিস্ গীতিকা। আপনি,—ভালবাসেন—লীনাকে?

মুরারী। হাঁ, হাঁ, তাই তো বলছি। মিছে কথা না কি? তবে কেন ওকে সে কথা বলবেন না?

মিস্ গীতিকা। (কষ্টের সহিত মিথ্যা বলিতে চেষ্টা করিয়া) হাঁ লীনা, উনি যা বলচেন তা সত্যি। (মুখ ফিরাইয়া দরজার দিকে অল্প অগ্রসর হইয়া গেল)

লীনা। (ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি মুরারীর হাত ধরিয়া) তবে? তা হলে কি হবে?

মিস্ গীতিকা। (মৃদুস্বরে) মুরারীবাবু, ওদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মুরারী। (তীব্র কটাক্ষ করিয়া) হাঁ চলুন, যাচ্ছি।

মিস্ গীতিকা। (লীনার প্রতি মৃদু হাসিয়া) ওঁকে তোমার কাছ থেকে বেশিক্ষণের জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাবো না, ভয় নেই। (লীনা খুসি হইয়া হাসিতে লাগিল)

(মুরারী মিস্ গীতিকার সহিত পাশের ঘরে চলিয়া গেল। পাশের ঘরে গিয়া উহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

মুরারী। (জিজ্ঞাসু ভাবে) কী বলতে চান?

মিস্ গীতিকা। (মৃদুস্বরে) কী আবার গোলমাল বাধালেন? এ সবের মানে কি,—হঠাৎ আমাকে দিয়ে এমন একটা মিথ্যে কথা বলালেন,—হয় তো অন্যায় করলাম,—একটা কিছু অনিষ্ট ঘটালাম। কিন্তু আপনি এমন কাণ্ড করলেন যে না বলে কোনো উপায় ছিল না।

মুরারী। কিছুই অনিষ্ট করেন নি মিস্ গীতিকা,

আমাদের দুজনকেই আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। আপনাকে সব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারছি না। হঠাৎ তাই দেখতে পেয়ে গেলাম,—জানেন, ওর আর তুলনা হয় না, ওকে ছাড়া আমার আর বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়,—এই আর কি! (লজ্জা পাইয়া থামিয়া গেল, পুনরায় দৃঢ় স্বরে) আমি এখনই ওকে বিয়ে করে ফেলবো,—তার পরে ওকে একটা ভাল জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে আপনারা বলেন। আমিও সেখানে থাকবো,—দেখাবো যে আমি ভাল হয়ে উঠেছি,—আমার সম্বন্ধে ওর একটা চেষ্টা হবে তো,—তাতেও ও ক্রমে-ক্রমে ভাল হয়ে উঠতে পারে। আমার মনে হয় ও নিশ্চয় এবার সেরে উঠবে,—বুঝতে পারচেন না কেন? আধাআধি চেষ্টার দ্বারা কখনো কোনো ফল হয় না,—মিছে কথা, কিংবা চালাকি, কিংবা স্তোক বাক্যের দ্বারা ওকে ভাল করা যাবে না। আমরা দুজনেই দুজনকে অত্যন্ত ভালবাসি! (জোরের সহিত) দেখবেন, আমরা নিশ্চয়ই জিতবো। হারবো না কিছুতে, দেখবেন আপনারা! ডাক্তাররা যতই বলুক, সব জিনিষের ওজন তারা কখনো বোঝে না, এ সব কথার যে কত দাম আছে তা তারা জানতেই পারে না। আমি বলে রাখছি, দেখে নেবেন, লীনাকে আমি নিশ্চয় আরাম করে তুলবো। আনন্দ দিয়েই ওকে সারিয়ে তুলবো। ভালবাসার চেয়ে তেজী ওষুধ—(মিস্ গীতিকা তবুও আশান্বিত হন না, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন দেখিয়া মুরারী ভাঙিয়া পড়িল। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিল। ভগ্ন কণ্ঠে বলিল)—তবে কেন আমাকে অমন মিথ্যে আশা দেখালেন?

মিস্ গীতিকা। (মুরারীর কাঁধে হাত রাখিয়া নম্র কণ্ঠে) আমরা যতটা জানি, যতটা বুঝি, তাই কি সব? আর কি কিছু নেই? (চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল) যা আমরা দেখতে পাই তার পেছনে আর কিছু আছে,—সব জিনিষেরই একটা সার্থকতা আছে—যেখানেই হোক,—যেমন করেই হোক,—এ-সব জিনিষ কখনো ব্যর্থ হয় না,—আশা করার মধ্যেও একটা সার্থকতা আছে।...

মুরারী। (হতাশভাবে) কিন্তু, শুধু মুখের কথাতে আর লাভ কি? (হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, কাঁধ হইতে মিস্ গীতিকার হাত রূঢ়ভাবে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল)—থাক্ আপনাদের যত সব বাজে কথা! আমরা নিশ্চয় জিতবো! আপনাকে বলে লাভ কি, আপনি এর কী বুঝবেন? আপনাদের মেটিরিয়া মেডিকাতে ভালবাসার কোন স্থান নেই। আপনাদের ডাক্তারদের দল যাই বলুক, যতই তারা অভিমত জানিয়ে দিক,—আমার তাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। এসব বিষয় হচ্ছে তাদের সীমানার বাইরে। সমস্ত ডাক্তারদের অভিমত উল্টে দিয়ে আমরা জয়ী হবো। আচ্ছা, আপনারা বলেন কি করে যে রোগী হোপলেস্ হয়ে গেছে,—আর বাঁচবে না? কত বড় ভুল কথা আপনাদের,—সেটা স্বীকার করে নিন। সব ক্ষেত্রেই আশা আছে,—আশা নেই এ কেমন কথা? আপনারা জানচেন কি করে? আপনারা কি সবজান্তা?

মিস্ গীতিকা। (প্রথমে অবাক হইয়া থাকিয়া, পরে হাসিকান্না মিশ্রিতভাবে গদগদ হইয়া) আমি? আমি কতটুকু জানি,—কিছুই না! কোনো বিষয়েই আমরা নিশ্চিত কোনো কথাই বলতে পারি না। সে কথা যাক, ভগবান আপনাদের ওপর অমৃতধারা বর্ষণ করুন (মিস্ গীতিকা রুমালে চোখ ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। মুরারী কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া লীনার কক্ষে প্রবেশ করিল)

লীনার কক্ষ

লীনা। (মুরারী আসিয়া তাহার বিছানার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া হাত ধরিয়া) বড়ো লক্ষ্মী তুমি! (হস্তে চুম্বন করিল। পরে মুরারীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তোমার শরীরের দিকে এবার আমাকেই যত্ন নিতে হবে দেখছি, নইলে তো তুমি সারবে না! এখন থেকেই কড়াকড়ি সুরু করতে হবে। প্রত্যেক দিন কয়েক ঘণ্টা তোমায় একদম বিশ্রাম নিতে হবে, একদম নড়াচড়া করতে পাবে না,—ঠিক আমি যখন দুধ খাবো তখন প্রত্যেক দিন তোমাকেও দুধ খেতে হবে,—রাত্রি ন'টা বাজলেই আমি ঘুমোবো, আর তোমাকেও তখন

ঘুমোতে যেতে হবে,—আমি যা যা বলবো সমস্ত তোমায় মেনে চলতে হবে—আর—

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

মুরারী। ঐ শোনো, অ্যাসেম্ব্লি রুমে কে গান করছে।

গান

একটু যদি খড়কুটো পায় তাতেই বাঁধে বাসা
অল্প থেকেই বেড়ে চলে সেই তো ভালোবাসা
বীজ থাকে তো ফলটি পাবে, আশা কেন ব্যর্থ হবে,
একটু করে জল দিয়ে যাও, গাছটি হবে খাসা।
মিথ্যারে সে সত্য করে, হৃদয় দিয়ে হৃদয় ধরে,
ছেড়ে দিয়েও ফিরিয়ে আনে, নিরাশাতেও আশা,
জীবন করে সঞ্জীবিত, নয়কো জীবন নাশা।

যবনিকা

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

সুর ও কথা

নিশিকান্ত

নূপুর

মনের মণি ভেঙে মাগো,
গড়েছি এই নূপুরদুটি,
তোমার চরণতলে রাখো,
সুরের ফুলে উঠবো ফুটি।
মাগো, তোমার চলার সাথে
চল্‌ব আমি দিনে রাতে
আকাশ ছাওয়া আলোর কথায়
সূর্য্যশশীর সুধায় লুটি॥

চির-কালের পথের ভালে
নেব তোমার চলার গতি,
তোমার নৃত্যনিবিড় তালে
বইবে আমার প্রাণের নদী।
স্বচ্ছ-গানের ঢালব লীলা
ভাসিয়ে দেব কৃষ্ণ শিলা—
মরণরূপী কঠিনতার
বাধার দুয়ার দেব টুটি'॥

ভোরের পাখী

এই গহন রজনী অন্তে
আমি আলোছায়াআঁকা পাখী,
এই কালের কালো দিগন্তে
মম অপরূপ মায়া রাখি ॥

আমি সুদূরের শাখে কাঁপা
কার উদয়-আগের আভা।
মম সুরগুলি গোলাপিয়া
রাঙি ধরার ধূসর হিয়া,
তারে ঘুম ভাঙিবারে ডাকি ॥

আমি জীবনের মঞ্জুষা
আমি আধ-ঢাকা আধ-খোলা,
কোন অচেনা রতন-উষা
করে আমারে আপনা-ভোলা।
তাই আধ-ঘুমে আধ-জাগি ॥

কোন গোপন-গভীর আশা
মম বিকাশে যে পায় ভাষা,
কোন কবির স্বপন লভি'
আমি স্বপনে মগন-কবি,
কার অতল-মাধুরী মাখি ॥

বলাকা

সুরের সোনার চিকণ-সূতায় গাঁথা সে
সোনালি কথার মরালমুকুলরাশি,
কোন্ রক্তিমকাঞ্চনময় আকাশে
উধাওলীলার আবেগে চলেছে ভাসি।
আমি অপলক আঁখি দুটি মোর তুলিয়া
সে উধাওতালে যাই যে আপন ভুলিয়া,
গভীর উদয় কিরণমগ্ন বাতাসে
উজল পাখার সাথে হই উল্লাসী ॥

চির-বাঞ্ছিত মিলন উষার লগনে
স্বপন বিভোল কোন রাজা কোন রাণী,
তাদের কনকচরণলগ্ন গগনে
আমি রচি সেই বলাকার মালাখানি ॥
রচনা আমার চলে ডানা সঞ্চালিয়া
পালকে পালকে ধ্বনিরঞ্জন জ্বালিয়া,
হিরণগানের মোহনমাধুরী মাখা সে
আলোক-রাগিনী অনুরাগে উদ্ভাসি

নিশিকান্ত

রিভিয়েরার স্মৃতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা কয়েকদিন ধরিয়া প্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী ইতালীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ সহর পরিদর্শন করিয়া ভীনিস হইতে উত্তর ইতালীর ভিতর দিয়া স্বভাব-শোভার লীলা-নিকেতন বিশ্ববিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ভূমধ্য সাগরের রঙ্গ-রত-তরঙ্গরাজি আলিঙ্গিত রিভিয়েরা প্রদেশে গমন পূর্ব্বক কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। অনেকেই জানেন রিভিয়েরার কিয়দংশ ইতালীতে এবং কিয়দংশ ফ্রান্সে অবস্থিত। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন রিভিয়েরার ইতালীস্থ অংশ ফ্রান্সে বিরাজিত অংশের সহিত সদ্যনির্ম্মিত রেলপথের সহায়তায় সংযুক্ত হইয়াছে। অম্বর-চুম্বী গম্ভীর পর্ব্বতপুঞ্জের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত এই রেলপথকে এঞ্জিনীয়ারিং কৌশলের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলা চলে।

ফ্রান্সের কোটে-ড্য-আজুর প্রদেশের রাজধানী নাইস নগর হইতে এই রেলপথ ইতালীর কোনি নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রেল-লাইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে টিউরিন হইতে স্যাভোনে হইয়া ইতালীর রিভিয়েরার পশ্চিমাংশে পৌছিতে হইত। পরম রমণীয় রয়া-উপত্যকার উপর দিয়া রেলপথ প্রসারণপূর্ব্বক কোনির সহিত ভিন্টিমিল্লেকে সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা ইতালী বহুকাল হইতে পোষণ করিতেছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভিয়েভোলা পর্য্যন্ত এই রাস্তা বিস্তৃত হইলে ইতালী বুঝিতে পারে ফ্রান্সের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাহার পক্ষে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন সম্ভব নহে। বিশেষ রয়া-উপত্যকা ফরাসী গণতন্ত্রের অন্তর্গত অংশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অন্ততঃ ইহার ১২ মাইল ব্যাপী স্থান ফ্রান্সের অন্তর্গত।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন অনুষ্ঠিত একটি পরামর্শ সভায় ইতালী এবং ফ্রান্স উভয়েই এই রেল রাস্তা প্রস্তুত ব্যাপার সমর্থন করেন এবং স্ব স্ব অধিকারাধীন অংশে ঐ সংযোগ-সাধক পথ প্রসারিত করিতে সম্মত হন। উভয় দেশের সহযোগিতায় সসপেলের ভিতর দিয়া একটি রেলপথ নাইস হইতে কোনি পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় এবং অপর একটি পথ ফরাসী রয়া উপত্যকার উপর দিয়া ইতালীর অন্তর্গত ভিন্টি-মিল্লে পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। মহাযুদ্ধের সময় প্রায় ৫ বৎসর ব্যাপিয়া এই পথ প্রস্তুত কার্য্য স্থগিত ছিল।

আমরা এই রেলপথে কোনি হইতে নাইস গমন করিবার কালে যে নিরুপম নৈসর্গিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিবার নহে। দেখিতে দেখিতে ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও কানন-কুন্তলা কাংরা-উপত্যকার স্মৃতি অন্তরে জাগরূক হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের কথা স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। কোনি হইতে প্রসারিত রেলপথের ইতালীর অংশ অতিক্রম করিয়া ফরাসী রয়া উপত্যকা-বক্ষে প্রবেশের সময় লাইনটি চক্রাকারে ঘুরিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়াছে। এই অংশের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিট। ইতালীর উত্তর সীমান্তে বিরাজিত এই চিত্ত চমৎকারী চক্রের পর ফণ্ডান-সায়র্জ্জ ষ্টেশন। রয়া-উপত্যকার পর এই রেলপথ পুনরায় নিম্নতর প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে।

১ হাজার ১৬ ফিট উচ্চে অবস্থিত আন্তর্জ্জাতিক ব্রেয়িল ষ্টেশনের পর ফরাসী রয়া-উপত্যকায় মণ্ট গ্রাজিয়ানের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রস্তুত দুই মাইল দীর্ঘ টানেল বা সুড়ঙ্গ পাওয়া যায়। ইহার পর রেলপথ বেভেরা উপত্যকা হইতে সস্পেল উপত্যকায় আরোহণ পূর্ব্বক ১ হাজার ৩ শত ৯০ ফিট উচ্চ কল-ড্য ব্রাউসের সার্দ্ধ তিন মাইল ব্যাপী সুড়ঙ্গের ভিতর

প্রবেশ করিয়াছে। তদনন্তর পার্ব্বত্য প্রকৃতির পরমপ্রীতিপদ কমনীয় ক্রোড়ের উপর প্রসারিত এই রেলপথ ১ হাজার ২ শত ৮১ ফিট উচ্চ এস্কারিন হইতে পায়লন উপত্যকার ভিতর দিয়া অম্বুধি-চুম্বিত নাইস-নগরে অবতরণ করিয়াছে। আমরা যে পরিমাপ প্রদান করিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইবে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের উচ্চতা অধিক নহে। যাঁহারা গিরিরাজ দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই উচ্চতার মধ্যে বিচিত্র বা বিস্ময়কর কিছুই নাই। কিন্তু এই রেল-পথটি বন-শ্যাম পর্ব্বত-বন্ধুর প্রকৃতির বুকের উপর দিয়া যে ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া আগাইয়া গিয়াছে তাহাতে চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। পথের চক্রাকার বক্রতা ও সুদীর্ঘ মধ্যে অবস্থান করেন তাঁহাদের পক্ষে দক্ষিণ য়ুরোপের এই নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল দেশ স্বর্গ-সদৃশ সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। উত্তর য়ুরোপের অধিবাসীরা সুতীব্র শীতের সময় এই চির-বসন্তের দেশে আসিয়া আত্মতৃপ্তির নানাপ্রকার উপায় অনুসন্ধান করেন।

শান্ত-গম্ভীর শোভার আধার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের লীলাস্থলী আল্লাইন প্রদেশ এই রেলপথের জন্য অপেক্ষাকৃত অনেক সুগম বা সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। এখন ভ্রমণ-কারিগণ কামনা করিলে তৎক্ষণাৎ ভূমধ্যসাগরের উচ্চবীচি-চয়-চুম্বিত উপকূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাইলন নদের উপত্যকার উপর দিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্যও জলপাই বৃক্ষ-

জুয়ানের সমুদ্র-তীর

সুড়ঙ্গগুলি যাত্রীর অন্তরকে সর্ব্বদা কৌতূহলাক্রান্ত ও আগ্রহান্বিত করিয়া রাখে। দেখিতে দেখিতে মনে হয় কে যেন পথের দুইধারে দর্শকের হর্ষাপ্লুত দৃষ্টির সম্মুখে দুইখানি ভাব-গভীর কান্ত-মধুর কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

এই রেলপথ স্থাপিত হইবার পর হইতে রিভিয়েরায় দর্শক ও স্বাস্থ্যান্বেষীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহু ব্যক্তি এখানে হৃতস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য বা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। যাঁহারা উত্তর য়ুরোপের তুষার-শীতল বা মেঘ-মলিন আবহাওয়ার বীথি-বিমণ্ডিত চির-হরিৎ পাইন পাদপপুঞ্জ পূর্ণ আল্লাইন প্রদেশের বন্ধুর বক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার ভীমকান্ত শোভা উপভোগ করিতে পারেন। শৈল-শীর্ষ শোভী প্রাচীন পল্লীগুলি দেখিতে কতকটা ঈগলপক্ষী-নির্ম্মিত নীড়ের ন্যায়। এই সকল পল্লীর ঊর্দ্ধে সবুজ শোভায় সমৃদ্ধ জলপাই ও পাইনের বন। শ্যামসুন্দর সঙ্কীর্ণ শৈল-সানুর অঙ্কে ভ্রমণ করিতে করিতে দর্শকগণ অপূর্ব্ব হর্ষ-রসে অভিষিক্ত হইবেন। হাস্যোজ্জ্বল সসপেল উপত্যকার বক্ষে গলফ ক্রীড়া উত্তর য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণের চিত্ত বিনোদনের এক প্রকৃষ্ট উপায়। রয়া উপত্যকার স্ফটিকস্বচ্ছ সলিলে সন্তরণ ও আনন্দ পাইবার অন্যতম পন্থা।

এই নূতন রেলপথ যাত্রীদিগকে এস্কারিণ ও সস্পেলের পার্শ্ব দিয়া ৬ হাজার ৯ শত ৩৫ ফিট উচ্চ আউটিয়ন শৈল-শীর্ষে, বিশাল-গম্ভীর তুরিনি-বনানী বক্ষে, ২ হাজার ৮ শত ৩০ ফিট উচ্চ মাউলিনেটে এবং ৫ হাজার ২ শত ৬১ ফিট উচ্চে বিরাজিত পেয়িরা-কাভা স্বাস্থ্যনিবাসে লইয়া যায়। পেয়িরা-কাভা প্রভৃতি শৈলাবাস হইতে ভূমধ্যসাগর এবং কর্সিকা দ্বীপের দৃশ্য একান্ত মনোমুগ্ধকর।

উদ্যান—রিভিয়েরা

এই রেলপথ প্রস্তুত করিতে কত যে স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে এঞ্জিনীয়ারী বিদ্যার বা কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার জন্য ফ্রান্স ও ইতালীকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। ফ্রান্সে নির্ম্মিত অংশ সম্বন্ধে হিসাব করিয়া আমরা জানিতে পারি প্রতি মাইলে ৯০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ভূমধ্যসাগরের উপকূল-রূপ এই রিভিয়েরা প্রদেশের সহিত প্রাচীন কালের কোন স্মৃতি-বিজড়িত রহিয়াছে কি না? অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি নৌবিদ্যা-নিপুণ প্রাচীন ফিনিসীয়ানগণ ফিনিসীয়ার বিখ্যাত বন্দর টায়ার ও সিদন হইতে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী এই প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ফিনিসীয় বণিকগণ পণ্য লইয়া সমুদ্রের তীরে তীরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক এই দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়। রোমান সৈন্যগণ ইতালী হইতে এই পথে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন এই সত্যও আমরা অবগত হই। সুতরাং আমাদিগের মনে হয় প্রাচীনকালেও দক্ষিণ য়ুরোপের এই উপকূলবর্ত্তী অংশে সমৃদ্ধ জনপদসমূহ বিরাজিত ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতালীর রিভিয়েরায় অতি অল্পকাল অবস্থান করিয়া আমরা ফ্রান্সের অন্তর্গত অংশে আগমন করিয়াছিলাম। আমরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী জুয়ান-লেস্-পিন্স নামক স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া উহার নিকটস্থ দর্শনীয় দৃশ্যগুলি দেখিয়াছিলাম। এই স্বাস্থ্যকর পরম সুন্দর স্থানের লীলা-চঞ্চল অম্বুরাশি-চুম্বিত শুভ্র সৈকতকে মুক্তির উদার ক্রীড়া-প্রাঙ্গন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দূর-দিগন্ত-চুম্বিত অনন্ত বারিরাশি যেন অবিরাম মানব মাত্রেরই চিরাকাঙ্ক্ষিত মহান্ মুক্তির গম্ভীর গাথা গাহিয়া তরঙ্গ-বাহু তুলিয়া আবেগভরে নৃত্য করিতেছে। সমুদ্র-সলিল-সংস্পর্শ-শীতল উতলা বাতাসও স্বাধীনতার বার্ত্তা বহন পূর্ব্বক বেগে বহিয়া যাইতেছে। যাঁহারা বারমাস বড় বড় সহরের বদ্ধ-বাতাসের মধ্যে বহুবিধ বন্ধনে বিজড়িত

হইয়া বাস করেন তাঁহাদিগের নিকট মেঘ-মুক্ত সূর্য্যকর-সমুজ্জ্বল আকাশের নীচে প্রসারিত এই সুনীল সমুদ্র—এই শুভ্র সৈকত—এমন কি সৈকতের পার্শ্ববর্ত্তী পথ ও পথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহগুলিও অভিনব শোভায় ভূষিত ও মুক্তি-মহিমায় মণ্ডিত বলিয়া মনে হইবে। ভ্রমণকারী বা স্বাস্থ্যান্বেষী-রূপে যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই ইংরেজ, জার্ম্মাণ ও আমেরিকান। যাঁহারা প্রাচ্য দেশসমূহ হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প।

চারপ্রকার লোক আমরা রিভিয়েরায় দেখিয়াছিলাম। একদল লোক শুধু স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য আসিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর লোক আসেন স্বভাব-শোভা উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে। যাঁহারা কেবল প্রমোদের বা ইন্দ্রিয়ানন্দের সন্ধানে আসিয়াছেন এরূপ নরনারীও আমরা অনেক দেখিয়াছিলাম। আর এক জাতীয় লোক দেখা যায় যাহারা জুয়া খেলিয়া ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য রিভিয়েরার অন্তর্গত মন্টি-কার্লো প্রভৃতি স্থানে আগমন করেন।

নানা বর্ণ-বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক শত শত নর-নারী অবগাহন ও সন্তরণ করিয়া জুয়ানের সমুদ্র-গর্ভ ও সমুদ্র-সৈকতকে একান্ত চিত্তাকর্ষক দৃশ্যে পরিণত করিয়াছে। যত রকম রঙ কল্পনা করা যায় সব রকম রঙের পরিচ্ছদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। স্নান ও সন্তরণের জন্য ব্যবহৃত পরিচ্ছদসমূহের প্রস্তুত-প্রণালীর বৈচিত্র্যও কম নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতা কিরূপ বহির্ম্মুখ বা বাহ্যসর্ব্বস্ব তাহা এই সকল বৈচিত্র্যের দ্বারা বেশ বুঝা যায়। দেখিলে ইহাও উপলব্ধি করা যায় এই বহির্ম্মুখিনতা দিন দিন যেন বৃদ্ধি পাইতেছে।

জুয়ানের সূর্য্যকরোজ্জ্বল সমুদ্র-সৈকত ও সমুদ্র-সলিল সর্ব্বদা উৎসাহদীপ্ত নরনারীর কল-কোলাহলে মুখরিত থাকে। সমুদ্রের কলনাদের সহিত মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত এই কলরব মিলিত হইয়া এক বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করে। কেহ জলক্রীড়া করিতেছে, কেহ রৌদ্রদীপ্ত শুভ্র সৈকতে বসিয়া বা শুইয়া রহিয়াছে। বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকল বয়সের লোকই রবি-রশ্মি-রমণীয় সমুদ্র-সলিলের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত। চারিদিকে শুধু গল্প ও গীতি, হাস্য ও লাস্য। বন্ধনবিহীন বিমুক্ত আবহাওয়ার প্রভাবে বৃদ্ধও বালকবৎ ব্যবহার করিতেছে। স্বাধীনতার অপব্যবহার যাহাকে বলে তাহাও যথেষ্ট দেখা যায়। যাঁহারা কয়েক মাস এখানে অবস্থান করিতেছেন সেই সকল নরনারীর শুভ্র বর্ণ (সর্ব্বদা রৌদ্রে বেড়ানর জন্য) বাদামিতে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উৎকর্ষের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত। সুনির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল সূর্য্যকরের সহিত উত্তর য়ুরোপের অধিবাসীদিগের পরিচয় অল্প। সুতরাং তাঁহারা এখানে আসিয়া অশেষ আগ্রহের সহিত সুনির্ম্মল সূর্য্য সেবন করিয়া থাকেন। এই কার্য্য সান্-বাথ

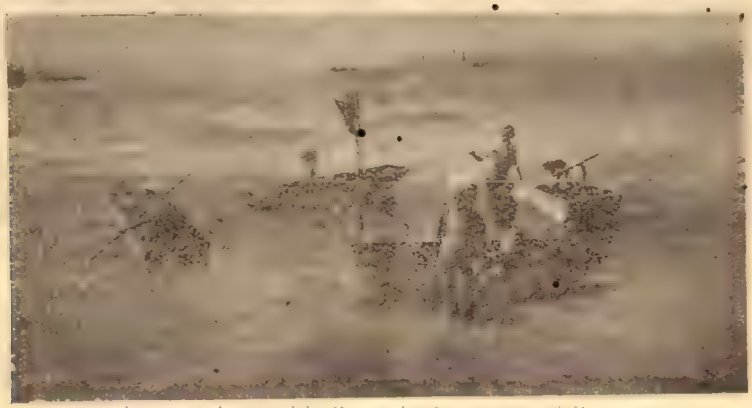

সমুদ্রগর্ভে জলক্রীড়ারত বালক-বালিকা (ওয়াটার-বেবি)

বা রৌদ্র-স্নান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রিভেয়েরার রৌদ্রে প্রাচ্য দেশসমূহের রৌদ্রের মত একটা তীব্র তেজ বিদ্যমান বলিয়া বেশী বেড়াইলে বর্ণ অবিলম্বে বাদামি হইয়া পড়ে। আজকাল য়ুরোপ ও আমেরিকায় রৌদ্রস্নানের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবল প্রচার চলিতেছে।

স্নানার্থীদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্র-সলিলে সন্তরণ ও অবগাহনের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈল বা তৈলজাতীয় পদার্থ লেপন করিয়া লয়। ইহার দ্বারা জলের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যাঁহারা সন্তরণ-কৌশল শিক্ষা করিতে চান তাঁহাদিগের পক্ষে এখানে আদৌ শিক্ষকের অভাব নাই। বহু সন্তরণ-দক্ষ শিক্ষক কিছু অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। ইচ্ছা করিলে কয়েক ফ্রাঙ্ক ভাড়ায় ডিঙ্গি পাওয়া যায়। ভেলাও মিলিয়া থাকে। সন্তরণ-শিক্ষার্থীদের পক্ষে এইরূপ ডিঙ্গি বা ভেলার আবশ্যকতা আছে। যাঁহারা সঙ্গতিশালী তাঁহারা দ্রুতগামী মোটর-বোট ভাড়া করিয়া থাকেন। মোটের উপর পয়সার বিনিময়ে এখানে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ইচ্ছা মাত্রই পাওয়া যায়।

সমুদ্র-সৈকতে ফল-বিক্রেতা, চাটনি বা মোরব্বা বিক্রেতা স্ব স্ব পণ্য লইয়া বসিয়া আছে। নানা রকম খাবারের দোকানও অতি নিকটেই রহিয়াছে। অনেকে প্রাতরাশাদি এই সকল "রিফ্রেসমেণ্ট ষ্টলে" সারিয়া লন। অনেকে মাছ ধরিবার জন্য মোটর-বোট ভাড়া করিয়া সকাল ও সন্ধ্যায় জুয়ান ও আণ্টাইবিসের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রাংশে গমন করেন। কতকগুলি সুদক্ষ ফরাসী ধীবর অর্থের বিনিময়ে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। শুনা যায় এখানকার মৎস্য নাকি খুবই স্বাদু। আমরা নিরামিশাষী বলিয়া এ বিষয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ সম্ভব নহে।

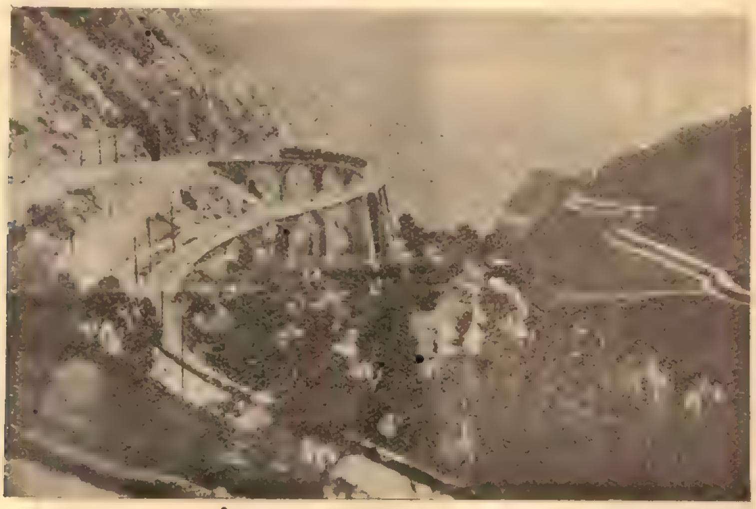

রিভিয়েরা রেলপথের একাংশের দৃশ্য

(ইতালীয় ও ফরাসী রিভিয়েরার সংযোগ-সাধক এই রেলপথের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও চক্রাকার-বক্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়)

রিভিয়েরায় সমুদ্র-তীরস্থ স্বাস্থ্যনিবাসগুলির পশ্চাতে পর্ব্বতপুঞ্জ প্রাকার-প্রায় দণ্ডায়মান। ইহারা তুষার-শুভ্র-শীর্ষ অভ্র-ভেদী হিমাদ্রির বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তি অন্তরে জাগ্রত করে না, হিমাচলের পবিত্র পাদ-পীঠরূপ শিবালিকা শৈল-শ্রেণীর স্মৃতিই জাগাইয়া তুলে। ইহারা মহান বা "সাব্লাইম" নহে, ইহাদিগকে সুন্দর বা "বিউটিফুল" বলা চলে। নতোন্নত চলিবার পথটি সর্পিল গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া

পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যেভাবে আগাইয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। পথে চলিতে চলিতে শ্যাম-সুন্দর দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রায়ই পাওয়া যায়। সকলেই জানেন ফরাসীদেশ দ্রাক্ষার জন্য বিখ্যাত। মধ্যে মধ্যে লিলি ও গোলাপের ক্ষেত্র নেত্রকে পরিতর্পিত করে। শস্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ সবুজ উপত্যকা ফরাসী কৃষককুলের সঙ্গতির বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করে। দেখিতে দেখিতে শস্য-শ্যামা বঙ্গমাতার সন্তান দরিদ্র কৃষকদের স্মৃতি অন্তরতন্ত্রীতে এক প্রকার করুণ সঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে। ক্ষেত্রগুলি দেখিলে মনে হয় ফরাসী-চাষীরা সুদৃঢ় সঙ্কল্পশালী সন্তানের

সেতু—রিভিয়েরা রেলপথ

মত মৃন্ময়ী মাতার নিকট হইতে ষোলআনা সম্পদ আদায় করিয়া লইতে জানে। পর্ব্বত পার্শ্বে স্তরে স্তরে সজ্জিত শস্য-ক্ষেত্রগুলি অতিশয় নেত্র-রঞ্জন। যেন সুনিপুণ চিত্র-করের অঙ্কিত একখানি বিচিত্র চিত্র চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে।

এই পরম প্রীতিপ্রদ পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর দিয়া আমরা একদিন আদ্-আত্রা নামক স্থানে বেড়াইতে গেলাম। বিখ্যাতনামা ফরাসী নক্ষত্র-বিদ্যাবিশারদ ফ্লামারিয়ন এখানে বাস করিতেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম। যে গৃহে তিনি থাকিতেন তাহা হোটেলে পরিণতি পাইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ভ্রমণকারিগণ এখানে নানাপ্রকার রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারেন।

একদিন আমরা নৌকাযোগে চারি মাইল দূরবর্ত্তী লেরিন্স দ্বীপমালা দর্শন করিতে গমন করিলাম। আমরা নৌকা হইতে সেণ্ট-অনোরাট নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে অবতরণ করিলাম। দ্বীপটি বারিধি বক্ষে বিরাজিত সৌন্দর্য্যের স্বপ্নপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেন কোন পরম-রমণীয় অপরূপ রূপ-কথার রাজ্যে—আরব্য-রজনী-বর্ণিত কোন মনোমদ মায়াপুরীতে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পাইন-পাদপ-পুঞ্জের প্রীতিপ্রদ মধুর গন্ধ বহন করিয়া শীতল বাতাস সর্ব্ব শরীরকে পরিতর্পিত করিতেছিল। বারিধির গভীর গর্জ্জন-গীতি স্বপ্নশ্রুত শব্দের মত কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। আমরা আহার্য্য সঙ্গে লইয়া গিয়া-ছিলাম। সমুদ্র তীরে পাইন পাদপপুঞ্জপূর্ণ মঞ্জুল কুঞ্জ-কাননে বসিয়া অম্বুধির গভীর গর্জ্জন-গান শুনিতে শুনিতে আমরা সেই সামান্য আহার্য্য অসামান্য আনন্দময় অনুভূতির সহিত সেবন করিয়াছিলাম।

আহারান্তে আমরা ট্রাপিষ্ট নামক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসি-

সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত মনাষ্টারি বা মঠ দর্শনার্থ গমন করিলাম। এই মঠ ৩৭৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট-অনোরাট নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সন্ন্যাসীর দ্বারা স্থাপিত। এক সময় এই মঠ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। মধ্যযুগে ফ্রান্সের প্রভিন্স প্রদেশের এবং কর্সিকা-দ্বীপের নানাস্থানে এই প্রবল-প্রভাবশালী মঠের অধিকারাধীন ভূসম্পত্তি ও গৃহাদি বিদ্যমান ছিল। আমরা ইহাও জানিতে পারি যে এখানকার মঠাধ্যক্ষগণ মধ্যযুগের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী "ব্যারণ" বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এই সকল সুবিখ্যাত শার্লেমানের শাসন সময়ে এই দ্বীপে প্রায় ৩ হাজার ৭ শত "মঙ্ক" বা খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বাস করিতেন। কানেস্ প্রভৃতি উপকূলবর্ত্তী নগরকে প্রচুর কর লেরিন্স দ্বীপ-মালার মঠাধ্যক্ষগণকে দিতে হইত বলিয়া জানা যায়। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই মঠে পুনরায় জেনোবা হইতে আগত জল-দস্যুদিগের দ্বারা লুণ্ঠন-লীলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫২৪ এবং ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়দিগের দ্বারা ইহা আক্রান্ত হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেরিন্সের মঠাধীশকে গ্রাসির ধর্ম্মযাজক পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইলে

সেণ্ট-মার্কের গীর্জ্জা

মঠাধ্যক্ষদিগের অবস্থা ছিল অনেকটা আমাদের দেশের প্রচুর ভু-সম্পত্তিশালী মঠবাসী মোহান্ত-মহারাজদের মত।

৭২৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনবিজয়ী সারাসিনদিগের দ্বারা এই মঠ অধিকৃত হয়। বিজয়-দম্ভ-দৃপ্ত মুসলমানগণ কেবল অকুণ্ঠ লুণ্ঠনলীলা নয়, শত শত মঠবাসী সন্ন্যাসীকে বিনষ্ট করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। কিছুকাল পরে এই মঠ পুনরায় খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়। মাত্র ৪ জন মঙ্ক এই মঠে অবশিষ্ট রহিয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পদার্পণ করিবার কালে এই মঠের গৃহগুলি ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই মঠের ইতিহাস অতিশয় বিচিত্র। ইহার পর এই মঠ বিক্রয় করা হইবে শুনিয়া ফ্রান্সের এক অভিনেত্রী ইহা ক্রয় করেন। এই অভিনেত্রীর মৃত্যুর পর একজন ইংরেজ ধর্ম্মযাজকের দ্বারা এই মঠ ক্রীত হয়। এই ধর্ম্মযাজকের

পরলোক প্রাপ্তির পর মশিয়ে জর্দ্দানি নামক এক ব্যক্তির প্রবল প্রচেষ্টায় এই প্রাচীন মঠ পুনরায় ফরাসী চার্চ্চের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। মশিয়ে জর্দ্দানির কোন পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীনকালে এই মনাষ্টারির "প্রায়র" পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পুরাতন মঠের এই নূতন প্রতিষ্ঠাতা বিচিত্র মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। কোন নারী এই মঠে প্রবেশ করিতে পারিবে না—এই কঠোর নিয়ম তিনি বিধিবদ্ধ করেন। মঠবাসী তপস্বীদিগের তপোভঙ্গ বা

গ্রাণ্ড ক্যানাল—ভীনিস্

ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবার আশঙ্কায় ইনি এইরূপ করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়।

ট্রাপিষ্ট সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের নিয়ম, যাঁহারা ইহাতে যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম প্রবেশকারীর পক্ষে শুচি-শুভ্র জীবন লাভ করিবার জন্য এইরূপ বাক-সংযম অবশ্য অবলম্বনীয় বলিয়া বিবেচিত। যাঁহারা বহুদিন মঠে বাস করিতেছেন তাঁহারাও মৌন-ব্রতচারী নহেন তাহা নহে তবে প্রত্যেকেই কিছুদিন করিয়া কথা কহিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপ না করিলে মঠের ব্যবহারিক ব্যাপারগুলি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যিনি পথিপ্রদর্শকরূপে আমাদিগকে মঠটি দেখাইলেন তিনি কিছুকালের জন্য মৌন-ব্রত-বন্ধন হইতে বিমুক্ত ছিলেন। ইনি প্রাচীন কালের নানাপ্রকার দর্শনীয় নিদর্শন আমাদিগকে দেখাইলেন। ফরাসী ভাষায় লিখিত বহুবিধ উৎকীর্ণ লিপির অর্থ তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। যেখানে ট্রাপিষ্ট তপস্বিগণ ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকেন সেই স্থানটিও আমরা দেখিলাম। এক একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসনে তপস্বীরা উপবেশন করেন এবং সেই আসনের সম্মুখে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত থাকে। জলের পাত্র, মদের বোতল, তৈলাধার, ভিনিগার-ভাজন প্রভৃতি আমরা কাষ্ঠাসনের সম্মুখে রক্ষিত দেখিলাম। এই সকল ব্যাপার তিব্বতের বৌদ্ধ তপস্বীদের স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগরূক করিল।

মঠের উপাসনা গৃহটির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আমাদের মনের উপর এক প্রকার অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিল। আমাদিগের মনে হইল যেন যুগযুগান্তরের উপাসনা সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি এই প্রাচীন প্রার্থনাগারের বায়ুস্তরে আজিও বিরাজিত রহিয়াছে। মঠের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য প্রধান সন্ন্যাসিগণের যে সকল চিত্র আমরা দর্শন করিলাম তাহা শুধু সুন্দর নয় বিস্ময়কর। এই সকল প্রাচীন চিত্র ফ্রান্সের শিল্পসাধনা ও সমুন্নত সংস্কৃতির গৌরবগীতি গাহিতেছে বলিলে সত্যই বলা হয়। প্রাচীনকালের বর্ণরাগরঞ্জিত কাচরচিত বাতায়নগুলিও মনোমুগ্ধকর। আমরা দুগ্ধ-শুভ্র পরিচ্ছদধারী কয়েকজন মঙ্ককে প্রার্থনা-গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। মৌনমণ্ডিত সেই মহান মঠ আমাদের মনকে একপ্রকার বিচিত্র মায়াজালে জড়িত করিল বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। কোটি কোটি কণ্ঠের কঠোর কর্ম্মকোলাহলের ভিতর ভগবদ্ভাবনা সম্ভব নহে বলিয়া মানুষ এইরূপ মহান মৌনের মধ্যে মনকে ডুবাইয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে চাহে।

মঠের মধ্যস্থলে সমাধি-ক্ষেত্র। সমাধি-মগ্ন সাধকবর্গের

উপযুক্ত সাদাসিধা সমাধি বটে। একটি অতি সাধারণ ক্রশ ও অতি সামান্য লিপিযুক্ত ফলক ব্যতিরেকে অন্য কোন অলঙ্কার সমাধিশীর্ষে দেখা যায় না। মঠের চারিদিকে নয়ন-রঞ্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। পথের পার্শ্বে শোক-সকরুণ ভাব-লক্ষারক সাইপ্রেস বৃক্ষ-বীথি। স্থানটি স্বতঃই মানুষের মনকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে। ফিরিবার কালে কান্ত-কবির সেই শান্ত-করুণ সঙ্গীত আমাদের অন্তরতন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়াছে—

"যদি দেখবি তাঁরে নয়ন ভ'রে এ দুটো চোখ কররে কাণা
যদি শুনবি রে তাঁর মধুর বুলি বাইরের কাণে আঙুল দেনা॥"

আমরা সেন্ট-অনোরাট হইতে ফিরিবার সময়ে সেন্ট-মার্গুরেরাইট দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইলাম। গ্রীকগণ এই দ্বীপকেই জর্জ্জোয়ান নাম দান করিয়াছিলেন। পরে রোমানগণ এই দ্বীপ অধিকারপূর্ব্বক ইহার বক্ষে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা ফরাসী রাষ্ট্র-নীতিক রিকল্প রোমান-গৃহের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি দুর্গ স্থাপিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একজন মুখোস পরা বন্দী এই দুর্গে আনীত হয়। এই ব্যক্তিকে একখানি আচ্ছাদিত কেদারার উপর বসাইয়া আনা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। নিকষকৃষ্ণ ভেলভেট নির্ম্মিত মুখোসের দ্বারা ইহার সমগ্র মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আবৃত ছিল। কে এই হতভাগ্য তাহা আজিও জানা যায় নাই। ইতিহাসে এবং কথা ও কাহিনীতে এই চির-রহস্য-তিমিরাবৃত ব্যক্তি "দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। ফ্রান্সের অক্লান্তকর্ম্মা কথা-শিল্পী আলেকজেণ্ডার ডুমা এই রহস্যাবৃত ব্যাপারকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে রোমাঞ্চকর রমণীয় রোমান্স রচনা করিয়াছেন তাহা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। ফ্রান্সের পুরাতন দপ্তর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও এই বিচিত্র ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই। এই ব্যক্তি মরিয়া গেলে ইহার মস্তককে দেহচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হইয়াছিল।

জুয়ানের নিকটবর্ত্তী এণ্টাইবিস নগরটি ক্ষুদ্র বটে কিন্তু সুদৃশ্য। এই পুরাতন নগরের পথ-ঘাট সবই প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তুত বলিয়া আমাদিগের দৃষ্টিতে বিচিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অপ্রশস্ত পথগুলি পোতাশ্রয়ের পানে প্রসারিত। নগরের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত পুরাতন "স্কোয়ার"টি অতিশয় সুন্দর। পোতাশ্রয় বা বন্দরটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর। যে সকল জলযান আমরা বন্দরে দেখিলাম তাহার অধিকাংশই ভ্রমণকারীদিগের। পর্য্যটনপ্রিয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা বিচিত্রাকৃতি পোত প্রস্তুত করাইয়া তাহার সাহায্যে দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

রিভিয়েরার অন্যতম নগর কানেস এণ্টাইবিস অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর। ইহার রাস্তাগুলি গোলোকধাঁধার মত চারিদিকে বিস্তৃত। এখানকার বন্দরটিও বড় এবং জল-যানের সংখ্যাও অনেক বেশী। বিভিন্ন আকার, প্রকার ও বর্ণের বোট ও পোত সারি সারি রক্ষিত রহিয়া অতি বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা নাইস, মেনটোন প্রভৃতি স্থানগুলিকে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র দেখিয়াছি-লাম। এই স্বল্প দর্শনেও ইহাদিগের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা আমাদের মনে সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল সহরকে সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন করিয়া তুলিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র জাতির সৌন্দর্য্যানুভূতিও সুতীব্র হইয়া থাকে।

আমরা রিভিয়েরায় অবস্থানকালে আমাদের এক ইংরেজ-বন্ধু ইংলণ্ড হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। ইনি একখানি জনপ্রিয় ইংরেজী মাসিকের সুদক্ষ সম্পাদক। ইঁহারা যে ট্রেণযোগে প্যারিস হইতে আসিয়াছিলেন উহা ব্লু ট্রেণ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই ট্রেণে যাত্রী-দিগের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অতি সুন্দর ব্যবস্থা বিদ্যমান। ইনি স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য রিভিয়েরায় আগমন করিয়াছিলেন।

ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য ও উত্তর য়ুরোপে যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা তীব্র তুষারপাত হয় তখন দক্ষিণ ফ্রান্সের এই অম্বুধি-চুম্বিত স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে বসন্ত বা গ্রীষ্মের জীব-হাওয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া আরোগ্যোন্মুখ ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য সংগ্রহের পক্ষে রিভিয়েরা একান্ত উপযোগী। অনেকে কঠোর কর্ম্মক্লান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কিছু-কালের জন্য অবকাশ লইয়া এখানে আসিয়া থাকেন।

যাঁহারা প্রচুর অর্থ আছে বলিয়া স্বভাব-শোভার এই লীলা-নিকেতনে আসিয়া এখানকার দ্যূতাবাস (Casino) গুলিতে টাকা লইয়া খেলা করেন অথবা হোটেলগুলিতে বিলাস-লালসার স্রোতে গা ঢালিয়া দেন তাঁহাদের ব্যবহার কখনও সমর্থিত বা অনুমোদিত হইতে পারে না। ধনীদের এই হৃদয়হীন ব্যবহার দরিদ্র জনসাধারণ বা শ্রমজীবীদের মনে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিলে তাহাতে বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকে না। আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া পেট পুরিয়া খাইতে পাই না আর তোমরা টাকা লইয়া ছিনি-মিনি খেলিতেছ—দিবারাত্রি প্রমোদের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছ—আমাদের অনাহার-শুষ্ক শ্রমমলিন বা রোগ-কাতর মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও দেখিতেছ না—আমরা নানাস্থানে ধনীদের বিরুদ্ধে দরিদ্রদের কণ্ঠে এইরূপ বাণী ধ্বনিত হইতে দেখিয়াছি। ফ্রান্সের বিদ্রোহ-বহ্নি, রাশিয়ার বিপ্লব-প্লাবন মানব জাতিকে সাম্য-সূত্রে বাঁধিয়া যে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল সেই সমস্যা মানব-মিত্র মাত্রেরই মনকে আজিও ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। সার্ব্বভৌম বা সর্ব্বজনীন সাম্যের সুখস্বপ্ন কখনও সফল হইবে কিনা কে বলিতে পারে ?

মন্টি-কার্লো, নাইস এবং কানেস এই তিনটি স্থানেই দ্যূত-ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়া থাকেন। স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের মধ্যে অনেকে ভালেস্কিওর নামক স্থানেও আগমন করেন। একদিকে ভূমধ্যসাগরের সুনীল সলিল-রাশির নয়নাভিরাম নৃত্য—অন্যদিকে পাইনপাদপপুঞ্জ পরিশোভিত পর্ব্বতশ্রেণীর মনোলোভা শোভা—এইরূপ প্রীতিপ্রদ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্বাস্থ্য-সঞ্চয় সহজ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

হেমন্ত বায়

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

হেমন্ত বায় ওড়না ওড়ায়
প্রভাতের ওই কুয়াসাতে।
শিশির পরা শিউলি ঝরা
বক্ষে ওরা দুরাশাতে।

শরৎ শেষে, রূপের আলো,
নেভার ক্ষণে, লাগলো ভালো,
গীতের শেষের রেশের মতন
অতীতেরই মূর্চ্ছনাতে।
হেমন্ত বায় ওড়না ওড়ায়
প্রভাতের ওই কুয়াসাতে।

মিহিন পরশ তুহিন হরষ
আন্‌লো আজি প্রাণে মোর।
যৌবনের এ শেষ দশা যে
তাই এ সাজে আজকে ভোর।

ডাকতে এলো ধরার জরা,
উদ্‌রে বায় তুষার ভরা,
শীতের আগে হেমন্ত তাই
আসলো ধরার আঙিনাতে।
হেমন্ত বায় ওড়না ওড়ায়
প্রভাতের ওই কুয়াসাতে॥

নিরর্থক

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী এম-এ

'ক্র্যাক্!'

সঙ্গে সঙ্গে বোলারের 'হাউ'জ দ্যাট' বলিয়া চীৎকার। পিছন দিকে চাহিয়া অমল দেখিল 'লেগস্ট্যাম্প'টা পরিষ্কার উড়িয়া গিয়াছে! বোলারটিকে প্রায় ছেলেমানুষ বলা চলে—অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তাহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

অমল একটু হাসিল। হ্যাঁ বয়স হইয়াছে—পা দুইটা আগের মত চলতি থাকিলে আগাইয়া গিয়া যে বলটা পিটিয়া 'বাউণ্ডারী' করিতে পারিত, পিছাইয়া খেলিতে গিয়া তাহাতেই 'ইয়োর্কড্' হইয়া গিয়াছে! বলটাও ভালো দেখে নাই। বয়স বাড়তির লক্ষণ 'লেগ্ উইকেটে' দুর্বলতা,—অমলের বয়স হইয়াছে!

স্কোর বোর্ডের দিকে চাহিল, শেষ খেলোয়াড়ের স্কোরের জায়গায় লেখা—০!

ক্রীকেটে এক একদিন 'রান্' করিতে না পারা আশ্চর্য্য মোটেই নয়, কিন্তু পা তাদের দ্রুততা হারাইয়াছে, চোখে দৃষ্টি বিভ্রম আসিয়াছে,—মারাত্মক বটে!

অমল বিদেশ হইতে খেলিতে আসিয়াছে,—নাম করা খেলোয়াড়, সে অপ্রত্যাশিত ভাবে 'আউট' হইয়া যাওয়াতে বিরাট জনতা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্যে ব্যাটখানা লইয়া অমল প্যাভিলিয়নের দিকে অগ্রসর হইল।

ক্যাপ্টেন আসিয়া বিশুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল অমলবাবু?" বেচারী! অনেকখানি ভরসা করিয়াছিল সে অমলের ওপর! একটু হাসিয়া অমল জবাব দেয়, "বিজুকে পাঠাও!"

প্যাড্ খুলিতে খুলিতে অমল বিজুর খেলা লক্ষ্য করিতে লাগিল! তার নিজ হাতে তৈরী খেলোয়াড়, বয়সে সবার ছোট! গিয়াই বেপরোয়া 'হুক্' ও 'গ্লাইড্' করিতে সুরু করিয়া দিল। অমল বোলারটির দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল!

বাচ্চা বোলার—এখনও জানে না যে কম বয়সী খেলোয়াড়দের সোজা লেগ্ উইকেটে বল দিয়া সহজে কাবু করা যায় না!

অমল একটা সিগারেট ধরাইল।

প্যাভিলিয়নের ধারেই বিশিষ্ট দর্শকগণের বসিবার স্থান! সেখান হইতে একটি মহিলা অনেকক্ষণ ধরিয়া অমলকে লক্ষ্য করিতেছিলেন! অমল ঘাড় ঘুরাইয়া তাঁহার দিকে চাহিতেই একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কে, অমলবাবু না? কেমন আছেন? নমস্কার!"

অমল চমকাইয়া উঠিল, প্রতিনমস্কার করিয়া একটু মৃদু ভদ্রতার হাসি হাসিল, কিন্তু কিছুতেই চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

মহিলাটি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, "আমায় চিনতে পার্ছোনা,—আমি—",

চেহারা দেখিয়া যাহা মনে পড়ে নাই হাসিটি তাহাই মনে করাইয়া দিল। অমল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সুলতা দেবী!" চারিদিকের হাজার চক্ষু তখন ক্রীকেট ছাড়িয়া এই দুই জনের উপর কেন্দ্রীভূত অনুভব করিয়াও সুলতা মোটেই ইতস্ততঃ করিল না, অমলের কাছে আসিয়া প্রায় হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তবু ভালো যে চিনতে পারলে।"

"চিনতে পেরেছি। না পারলেও আশ্চর্য্য হবার কিন্তু কিছু ছিলোনা। তোমার চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক! আগে ছিলে—"

অমলকে ত্রস্তে থামাইয়া দিয়া সুলতা বলিল "চলো আমার গাড়ীতে সব শুনব!"

অমল একটু যেন ইতস্ততঃ করিল—বিজু খুব পিটাইতেছিল; বিপক্ষদলের ক্যাপ্টেন তখন বোলার পরিবর্তন করিয়াছে—বিজুও খেলার ধরণ বদলাইয়া খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছে! অভিজ্ঞ বোলার নানা কৌশলে তাহাকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে। সাধারণ দর্শকদের কাছে খেলা হইয়া উঠিয়াছে নীরস, বিস্বাদ, কিন্তু অমলের মত অভিজ্ঞ লোকের কাছে খেলাটা এখন রীতিমত বুদ্ধির 'ডুয়েলে' দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এখন খেলার মাঠ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না—তবু সুলতার আহ্বানে একটু আগ্রহের সঙ্গেই সে বলিল,—'চলো'।

দুইজনে পাশাপাশি গিয়া গাড়ীতে বসিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে অমলের দিকে একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া সুলতা হাসিয়া বলিল, "কি বলতে চাইছিলে এবার বলতে পারো।"

"বলতে চাই, সুলতা, তোমার দেহখানি হয়ে উঠেছে সুন্দর সুডৌল। তার আবেদন তীব্র স্থুল। চক্ষে তোমার সন্ধ্যাতারার ইসারা! তবু তোমার ভয় পেয়ে মাঠ থেকে আমায় তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে আসার দরকার ছিলোনা। অতো লোকের সামনে আমি আর কিছু এমনি করে বলতাম না।"

"তুমি কি করে জানলে যে আমি এম্নি করে বলা শুনতে ভালোবাসি বলেই তোমাকে টেনে নিয়ে আসিনি?"

"দেশটা তাহলে অধঃপাতে গিয়েছে সু—"

"মানে?"

"তুমি বলতে চাও তোমার আমার শেষ দেখার পর দেশে অন্ততঃ দু ডজন admirer-ও তোমার জোটেনি যারা তোমার রূপের স্তুতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে?"

সুলতা গম্ভীর হইয়া গেল। অমলের নিকট হইতে একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "হয়ত তারও বেশী জুটেছে কিন্তু অমল, মেয়েদের এত দেখেও তুমি তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত কিছু একেবারেই পাওনি, না?"

"সুলতা, মেয়েরা আমার কাছে সোজা দুইদলে ভাগ করা,—interesting, আর uninteresting। প্রথম দলের যারা, তারা আমাদের মাতাল করে তোলে—we lose our heads completely over them—তাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-টদ্ধা ওসব বড় বড় কথা মনেই আসে না, আর দ্বিতীয় দলের কথা আমরা চিন্তাই করিনা! দিব্বি নিশ্চিন্তে তাদের বড় পিসীমার দলে ফেলে দিই!"

"মাত্র এই?" সবিস্ময়ে সুলতা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ এই, তুমি প্রথম দলের, তাই তোমার চুলের গন্ধে আমি বোকা হয়ে উঠছি, মোটরের চলতিতে আমার গায়ে হেলে পড়ছ—সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহে হচ্ছে রোমাঞ্চ,—হৃষ্টি-বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বুক থেকে উঠছে স্তব-বাণী। যে তোমার কাছে আসবে তারই মুখে এমনি বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে বাধ্য! আমি শুধু জানতে চেয়েছিলুম যে, এই স্তবে তোমার ক্লান্তি এসেছে কিনা। Whether you have grown tired of it all"!

একটু বেদনার হাসি হাসিয়া সুলতা জবাব দেয়—"হয় তো বা এসেছিল, তুমি শুনে হাসবে,—তোমার হঠাৎ দেখা পাওয়ায়, তোমার স্তুতিতে আবার আমার প্রথম প্রণয়ের সুর বেজে উঠল! যাক্‌গে,—তারপর তুমি এখন কি কোরছ?"

অমল হাসিল—"আমি? আমাকে কোনোদিন তা' হলে খুব কাজের মানুষ মনে করতে তুমি? আর তিন দিন আগে জিজ্ঞাসা করলে জবাব পেতে ক্রীকেট খেলি, আজ থেকে সে ব্যবসাও গেল।"

সবিস্ময়ে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "মানে—তুমি ক্রীকেট খেলা ছেড়ে দিচ্ছ? হঠাৎ বৈরাগ্য যে? বাব্বা! খেলার যা নেশা ছিলো তোমার! আমার তো মাঝে মাঝে হিংসাই হতো! কতদিন আমার কাছে আসবে বলেও আসোনি, খেলতে চলে গিয়েছ কোথা থেকে কোথায়।"

মাথাট একটু হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে অমল জবাব দিল, "বুড়ো হয়ে গিয়েছি সু, বল আর আগের মতো দেখতে পাইনে।"

সুলতার বুকে যেন ধ্বক করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল! অমল—জীবনের সব কিছুকে যে চিরকাল বিদ্রূপই করিয়া আসিয়াছে সেই আজ ঘাড় হেঁট করিয়া বলিতেছে—"বুড়ো হয়ে গিয়েছি সু!"

পুরাতন অন্তরঙ্গতায় সস্নেহে হাতখানি তার ঘাড়ের ওপর রাখিয়া চোখ নামাইয়া বলিল, "আমারও বয়স হয়েছে অমু, আমার মেয়ের বয়সই ষোলো।"

"তোমার মেয়ে !!"

সুলতা হাসিল—"চমকে উঠলে যে? কেন, আমার বুঝি আর ছেলে মেয়ে হতে নেই? তবে ঐ এক মেয়েই, ছেলে আর হয়নি,—যদি হতো—"

অমল তখন সুলতার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সুলতাকে যেন সে নূতন করিয়া দেখিতেছে; হ্যাঁ, সুলতা মা হইয়াছে বটে, আগের মতো আর ধারালো চক্‌চকে মেয়ে সে নেই, একটু মোটা সোটা বোকাটে ধরণের যেন, তবে আগের চাইতেও ইন্টারেস্‌টিং।

সুলতার খেয়াল নাই, সে বলিয়া চলিয়াছে, "হ্যাঁ, যদি আমার একটি ছেলে হতো আর সে যদি হতো তোমারি মতো দেখতে—অমনি একটু দুষ্টু, ঝকঝকে, অথচ কোথায় একটু কেমন যেন বোকা বোকা মতন, তুমি যেমন ছিলে—। আঃ আজো মনে হয় অমু,—একটু আগে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না স্তুতিতে আমার বিতৃষ্ণা এসেছে কিনা,—কিন্তু তোমার মতো মিষ্টি স্তুতি আর শুনিনি, তার তৃষ্ণা আজো আমার যায়নি! তুমি প্রশংসা করতে, তার মধ্যে মিশে থাকতো যুবকের প্রশংসার সঙ্গে শিশুর বিস্ময়,—তাই তার নেশা আজো আমার কাটেনি। অথচ আমি জানতাম, তুমি না ছিলে নিষ্কলঙ্ক, না আমিই ছিলাম তোমার স্তুতির একমাত্র পাত্রী। তোমার জন্য বড় suffer করেছি অমল, তোমার মত পুরুষরা আমাদের কষ্ট দিতেই জন্মায়; তবু আজো আমার ইচ্ছা করে তোমার মতো একটা ছেলে আমার হোক। যাকগে আমার বাড়ীর কাছে চলে এসেছি, এখন কি করবে ঠিক করেছ?"

বিমুগ্ধের মতো অমল জবাব দেয়,—ঠিক করিনি কিছু, তবে আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সু, সত্যি সত্যি একটা কিছু করলে হতো! তোমরা মেয়েরা চাও যাদের তোমরা ভালোবাসো তারা মস্ত একটা কিছু করুক—তা যেদিক দিয়েই হোক। এদ্দিন তবু ক্রীকেটে মাঝে মাঝে এক আধটা সেঞ্চুরী করে পদে ছিলুম। মিষ্টার—কিনা উপাধিটা তোমার স্বামীর? হ্যাঁ সিন্‌হা;—মিষ্টার সিন্‌হা মোটামুটি একজন জমিদার, আমি মোটামুটি একজন ক্রীকেটর, তুলনায় হয়তো বেশী নীচে যেতুম না। এখন তো "Othello's occupation is gone!"

গাড়ী ততক্ষণ একটা ফটকওয়ালা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—গাড়ী হইতে নামিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিতে করিতে সুলতা জবাব দিল, "তুমি কথাটাকে একদিক থেকে ঠিকই দেখছো অমল, তবে এর আর একটা দিক দ্যাখোনি। মেয়েরাও তোমারি মতো বেকার। সুতরাং তাদের শ্রদ্ধা আর সহিংস প্রশংসা যেখানেই পড়ুক, তাদের সত্যিকার অন্তরঙ্গতা গিয়ে পড়ে তাদের ওপর, যারা বেকার এবং যাদের কতগুলি গুণ আছে যা মেয়েদের রূপের মতোই পৃথিবীর কোন কাজে লাগে না, অথচ গোলমাল সৃষ্টি করে প্রচুর। তুমি যদি আজ হতভাগা বেকার ক্রীকেটর অমল রায় না হয়ে মিষ্টার অমলেন্দু রে আই, সি, এস্ এখানে টুরে আসতে তো এই ষোলো বছর পরে আমি অমি গিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারতাম?"

সুলতার কণ্ঠে এমন একটা স্নেহ স্নিগ্ধতা খেলিয়া গেল যে অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুলতার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ তুমি মা হয়েছ বটে—It's just that makes you look this fine!"

সুলতা আনন্দে ছেলেমানুষটির মতো খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"সত্যি অমু, এতোক্ষণ বুঝি এইটাই আমি খুঁজছিলাম। ষোল সতর বছর আগেকার তরুণী সুলতা, যে তোমার হাতের একটু ছোঁয়াচ্ পেলে থর্ থর্ করে কাঁপতো, আমাতে আর সে সুলতাতে তফাৎ আকাশ পাতাল। তাই আমি একটু আগে তোমার কাছ থেকে বিশ বছরের তরুণ অমুর কবিত্ব শুনে খুসী হলেও তা আমার সত্যিকার পাওনা বলে নিতে পারিনি। এইবার বুঝলুম আজকের আমাকেও তোমার ভালো লেগেছে। নিমন্ত্রণ—আমার এখানে আজ থাকো।"

সুলতা গেল ভিতরে, অমল ড্রইংরুমেই বসিয়া রহিল। বসিবার ঘরের পাশ দিয়াই দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে দুই জোড়া চটির শব্দ শুনিয়া অমল একটু নড়িয়া

চড়িয়া বসিল। একটা ট্রেতে করিয়া খাবারের প্লেট ও চায়ের পেয়ালা লইয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল সুলতা, পিছনে একটি পাতলা ছিপ্ ছিপে শ্যামবর্ণ মেয়ে। ডাগর ডাগর দুটি চোখ, কচি শ্যামল মুখখানি দেখিলেই ইচ্ছা করে দুই হাত দিয়া মুখখানি চাপিয়া আদর করিতে। চোখ দুটি অমলের দিকে একবার উঠিয়াই নত হইয়া পড়িল।

টিপয়ের ওপর থালাটা রাখিতে রাখিতে সুলতা বলিল, "এই আমার মেয়ে। নাম লীলা ডাক নাম এখনও খুকী, ভবিষ্যতে গিয়ে 'কমললতায়'ও দাঁড়াতে পারে, কে জানে। অমলবাবুকে প্রণাম কর্ খুকী। বাইরে গিয়ে রঘুয়াকে পাঠিয়ে দে।"

সস্নেহ দৃষ্টিতে তার গতিপথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল বলিল, "বেশ মেয়ে তোমার। তা মেয়ের বাপকে যে দেখছি নে?"

একটা দুষ্টু হাসিতে সুলতার চোখ নাচিয়া উঠিল, বলিল, "যদি বলি আমার সামনেই সোফায় বসে চা খাচ্ছে?"

ধ্বক করিয়া অমলের বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগিল। তবু মুখে হাসি রাখিয়াই বলিল, "হতেও পারে। মেয়েটাকে দেখেই মনটা যেন কেমন করে উঠল।"

হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল সুলতা,—"থাক কাজ নেই আর অতো বাহাদুরীতে। মেয়ের ঝক্কি পোয়াবে তুমি, তা যদি হোতো তো তখন আর অমন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াতে না। একটা কিছুতে যদি লেগে থাকতে তো বাবা নিশ্চয় তোমার হাতে দিতে আপত্তি করতেন না— ক্রীকেটের তাঁর যা বাতিক ছিলো! তা তুমি তো তখন ক্রীকেট আর মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া দুনিয়ার কিছুর খবরই রাখতে চাইতে না। আশ্চর্য্য কিন্তু, অতো ভালো লেখাপড়া শিখেও তুমি এই একটানা বোলো সতেরো বছর এক ক্রীকেট খেলেই কাটিয়ে দিয়েছ।"

নির্ব্বিকার ভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অমল ভ্রূ দুইটা একটু উপরের দিকে তুলিয়া জবাব দেয়—"তাই দিলুম তো।"

তারপরেই চায়ের কাপটা মুখ হইতে নামাইয়া সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আজ এই প্রথম মনে হচ্ছে সু, হয়তো বা ভুল করেছি। জীবনকে দুহাতে খরচ করেছি প্রচুর। ঋণ করিনি, কিন্তু সঞ্চয়ও কিছু নেই। আজ মনে হচ্ছে, এমনি একটি মেয়ে, তোমার মতো একটি স্ত্রী, এম্নি কি এর চাইতে ছোটো একখানি ঘর তো আমারও হতে পারতো।"

"পারতো কেন? এখনও পারে, তোমার বয়স তো এই সবে ৩৭।৩৮ এর মধ্যে বিয়ের সময় তোমার পেরিয়ে যায়নি। অমু, তুমি বিয়ে কর—আমি মেয়ে দেখে দি— চমৎকার হবে।"

মুখ গম্ভীর করিয়া হাত তুলিয়া অমল বলে, "No heroics please। অতটা ত্যাগ স্বীকার নাই বা করলে। আর এখন বোহেমিয়ান জীবনটাই অভ্যাস হয়ে গেছে—ঘর সইবে না। আর কে জানে—এর বেলায়ও হয়তো, সেই যে কি বলে—

'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস
ও পারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।'

যাক্‌গে—তারপর গৃহকর্ত্তা কোথায়?"

"মিষ্টার সিনহা থাকেন দেশের জমিদারীতে নয়তো কলকাতায়, এখানে এলেও পাকুড়তলার বড় বাড়ীতে থাকেন—সঙ্গে লোকজন আসে, যায় থাকে বহু। কোনো কোনো সময় নিজে আমার এই ছোট্ট কুটিরেও থাকেন। মেয়ের পড়ার অজুহাতে আমি এই কোনাটাই বেছে নিয়েছি। বড় একটা বেরুইনে তবে ক্রীকেটের নেশা জানো তো, ছোট বেলা থেকেই। বাবা যেখানেই খেলতে বা খেলা দেখতে যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন,—সে তো তুমি জানোই; তাই আজো সহরে ভালো খেলা হলেই না গিয়ে পারিনে। ছেলেরাও পেয়ে বসেছে মোটা চাঁদা আদায় করে নেয়।"

"তাতে আর তোমার লোকসান কোথায়? লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।"

"যে সেনই দিক্ আজ দেখ্‌ছি ঠকিনি। নয়তো তুমি তো আমার জীবন থেকে হারিয়েই গে'ছ্‌লে। সত্যি তোমরা পুরুষ-মানুষরা যেন কী! মেয়েদের অসুবিধে অনেক, তুমি তো অন্ততঃ একটু খবর নিতে পারতে—"

"দ্বাভ্যাম তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্"—

"দ্যাখো, তোমার সংস্কৃত আওড়ান শুন্‌লে আমার রাগ ধরে যায়। তোমার সংস্কৃত আওড়ান আর বেসুর গলার গান শুন্‌তে সমান। তারপর—শোনো, একটু serious হয়ে।"

"রীতিমতো serious ব্যাপার তা'লে নিশ্চয়।"

"ভাঁড়ামো করোনা,—সত্যি সত্যি কাজের কথা। তোমার তো চাল চুলো কিচ্ছুই ঠিক নেই, ক্রীকেটও ছাড়লে বল্‌ছো যদিও আমি বিশ্বাস করিনি এখনও—"

"তামা তুলসী দাও, হলফ্ করি"

"না অতটা ভয়ানক কিছু করতে হবে না, বিশ্বাস করলাম; আমি বলছিলুম কি—এই—তুমি না হয় এইখানেই কিছুদিন জিরিয়ে নিয়ে কাজ কর্ম্ম ত্যাখো না কেন?"

সবিস্ময়ে অমল বলে, 'এখানে জিরিয়ে নিয়ে মানে? তোমার বাড়ীতে নাকি? তারপর যখন তোমার স্বামী দেবতা আস্‌বেন and when he will wring your neck in the approved manner—তখন? লোকের sympathy পর্য্যন্ত প্যাবে না। লোকে বলবে উনি অন্যায় কিছু করেননি—He 's only treated Desdemona as the Desdemonas are treated world over। আমি ওসবের মধ্যে নেই, খুনী মামলার সাক্ষী দেওয়ার চাইতে সেরউডের বডিলাইন বল্ খেলা ভালো—আমি নির্ব্বিরোধী লোক—ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।"

"আঃ জালিয়ো না বল্‌ছি। তুমি আমার চাইতে worldly wise হবার ভান কোরো না—তুমি তা নও। আর আমারও কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পায়নি জেনো—তোমাকে এদ্দিন পর দেখে যতো খুসীই হই না কেন। আমি বলছিলুম কি মানে তুমি তো এখন একরকম vagabond। সুতরাং আগের মতো অতো touchy না হলেও পারো।—এই—আমার মেয়েটা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে—ওকেই না হয় কিছুদিন পড়াও না। মোটা মাইনে দোব অন্ততঃ তোমার হোটেল খরচ হয়েও আরও বেশ কিছুটা বাঁচ্‌বে।—আর কিছু না হোক্ রোজ একবার দুবার দেখা তো হবে। বসে বসে পুরোনো দিনের জাবর কাটব।"

ব্যাপারটাতে intrigue এর গন্ধ আছে। তোমার চাক্‌রী নিলাম। শরীরটাও কিছুদিনের জন্যে ছুটি চাইছে যেন।

২

অমল সুলতার মেয়েকে পড়ায়। শিলচর থাকার মতলব তার যাই হোক খুকীকে পড়ানোতে সে তাচ্ছিল্য করে না। খুকীকে পড়াইতে পড়াইতে সে ভুলিয়া যায় তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা,—বিষাদ, বিষাক্ত মধ্যবয়সী একঘেয়েমী। সে যেন আবার ফিরিয়া যায় তার কলেজ জীবনে। শেলী আবার তার কাছে লইয়া আসে তরুণী পৃথিবীর স্বপ্নের ঘোর, কীটস্ আবার বোনে রূপের ইন্দ্রজাল, টেনিসন আবার বাজায় তার কানে অতীন্দ্রিয় লোকের বীণার ঝঙ্কার। পড়াইতে পড়াইতে যেন তার মুখ হইতে নীরস বিস্বাদ একটা যুগ মুহূর্ত্তে উড়িয়া যায়। চোখ দুটি তার আবার ঝক ঝক করিয়া ওঠে,—ব্যাকব্রাস করা চুল, সুডৌল কপাল, সরল নাসিকার দু পাশের বড় বড় দুটি চোখ, ছোট্ট কোমল চিবুক, পাতলা ঠোঁটের কোন দুটিতে এমন একটা ব্যগ্রতা আত্মপ্রকাশ করে, যে লাজুক ছাত্রীটির মুখ চোখে পর্য্যন্ত যেন তার প্রতিবিম্ব পড়ে। তন্ময় অমল অতর্কিতে মেয়েটির মুখের দিকে চায়, দেখে—খুকীর ভীরু চোখের পাতাদুটি নত হইয়া পড়িতে ভুলিয়া গিয়াছে। মুখখানি তার উজ্জ্বল,—যেন শরতের প্রভাতে একটি কোমল তরুণী পদ্ম তরুণ সূর্য্যকিরণ মরু-তৃষ্ণায় পান করিতে তার কোমল দলগুলি মেলিয়া দিয়াছে।

মাঝে মাঝে সুলতাও আসিয়া বসে, চাহিয়া চাহিয়া দেখে অমলের মুখের পাশটি, এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—"অমল এখনও যেন ছেলেমানুষটি আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা তার জীবনের সহজ গতির উপর কোনো দাগই কাটিতে পারে নাই। গতি স্বাচ্ছন্দ্যে সে জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এমনি যদি সেও পারিত তার অতীতকে ভুলিয়া শুধু বর্ত্তমান লইয়া চলিতে কিন্তু তা হয় না। পুরুষ আর মেয়েতে তফাৎ অনেক; পুরুষের গতি স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণ সে করিতে পারে, ভাণ করিতে

পারে, কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে দিয়াছেন পুরুষের গতিকে সংযত করিবার ক্ষমতামাত্র।' চাহিয়া চাহিয়া সুলতা দেখে তন্ময় অমল পড়াইয়া যাইতেছে আর শীলা যেন সমস্ত সত্ত্বা দিয়া তাহাকে পান করিতেছে। কি রকম একটা বিতৃষ্ণায় সুলতার মন বিষাইয়া উঠে। সে উঠিয়া চলিয়া যায়। অমল পড়াইতে পড়াইতে একটু থামিয়া শুধু বলে, "চল্লেন?" এই পর্য্যন্ত। সুলতার কিন্তু মনে হয় অমলও তো শীলাকে বলিতে পারিত, "আজ থাক পড়া—ওঁর সঙ্গে একটু কথা কয়ে আসি।" তাতে তো সুলতা তার মহিমা কাটিত না।

একটা রুদ্ধ আক্রোশে মন তার গুমরাইয়া উঠিতে থাকে। সে ঘর হইতে বাহির হইতে হইতে শোনে অমল আবার পড়িয়া চলিয়াছে—

"When we two parted
In silence and tears
Half-broken-hearted
To sever for years.

ঠোঁটের কোনাটা সুলতার বেদনায় বাঁকিয়া যায়, সে মনে মনে আবৃত্তি করে—

Pale grew thy cheek
Colder thy kiss,
Truly that hour foretold
Sorrow to this.

বুকটা তার বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে। এই কবিতাটাই শিলং পাহাড়ে পাইন গাছের নীচে তার উরুতে মাথা রাখিয়া অমল একদিন আবৃত্তি করিয়াছিল, এম্নি গলায়, এম্নি আবেগ মেশা ছিলো তাতে! সেদিন সুলতার চোখে ছিলো মাদকতা, স্পর্শে ছিলো বিদ্যুৎ—তাই সেদিন আলোকোজ্জল প্রভাতে পাইন বনের নীচ দিয়া সুলতার পাশে চলিতে চলিতে অমল গাহিয়া উঠিয়াছিল—

Ther's madness in the air
Ther's madness in the pine wood,
Ther's madness in the blue sky
Ther's madness in my bl-o-o-d!

তাই সুলতার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ-কল্পনায় অমলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই কবিতাটার বিয়োগ বিধুর সুর—। তারপর সুলতা কত নিঃসঙ্গ দিনে সেই কবিতাটা পড়িয়াছে।

সেদিন আর নাই।

সুলতার চোখের জল দুই গাল বাহিয়া ঝরিতে থাকে। চোখের জলের লোণা স্বাদ লাগে মুখে, নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া উদ্গত বেদনাকে ঢোঁক গিলিয়া নীচে পাঠাইতে বৃথা চেষ্টা করে,—রোদনকম্পিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস করিয়া আবৃত্তি করিতে করিতে নিজের ঘরে যায়—

If I should meet thee,
After long years,
How should I greet thee
With silence and tears!

সেই দিনের পর আর সে শীলার পড়ার ঘরে যায় না। অমল মাঝে মাঝে আসিয়া তার কাছেও বসে, কিন্তু একটা নিরুদ্ধ বেদনা শুধু সুলতার মনে গুমরাইয়া উঠে—কোথায় অমলের সেই উদ্দাম আবেগ! আজ আর সুলতার কাছে বসিবার জন্য তার হাতের একটু স্পর্শের জন্য অমল তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠে না। মনে হইতেই সে আপন মনে বলিয়া উঠে—থাক্ আর তো তার সেদিন নাই! কিন্তু তারপরই তার মন বুকের পাঁজরায় যেন মাথা কুটিয়া কুটিয়া মরে।

ওদিকে অমলেরও মনে হয় সুলতা যেন কেমন হিম-সুদূর হইয়া গিয়াছে। সেই প্রথম দিনের দেখার পর কয়েকদিন যে সুলতাকে পাইয়াছিল—সেই তার তরুণী প্রিয়া অন্তরঙ্গ সুলতা তার জীবনে ফিরিয়া আসিয়া আবার যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। সুলতার গম্ভীর দূরত্বে মুখর অমলের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। আবার সে যেন নিজেকে ফিরিয়া পায় যখন শীলাকে পড়াইতে থাকে।

সন্ধ্যার পর বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে সুলতা শোনে অমলের কথা। কখনও বা শোনে শীলা তার স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচ ছাড়িয়া অমলের সঙ্গে তর্ক করিতেছে। ঘরের মধ্যে চাহিতেই খোলা দরজা দিয়া চোখে পড়ে শীলার সারা মুখ চোখ যেন একটা অস্বাভাবিক সজীবতায় ঝক্ ঝক্

করিতেছে! সুলতার পা দুইটা যেন হঠাৎ শিথিল হইয়া যায়। কোনো রকমে দেহটাকে টানিয়া লইয়া সে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে।

আবার উঠিয়া সে বারান্দা দিয়া চলে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে পা টিপিয়া টিপিয়া চলে। বুক তার ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে—সে চুরি করিতেছে—অন্যায় গোয়েন্দাগিরি করিতেছে—নিজেকে সহস্রবার গালি দেয়,—আবার এই বলিয়া নিজেকেই প্রবোধ দেয় যে, সে শীলার মা, অমলের মতো সন্দিগ্ধচরিত্র লোকের কাছে মেয়ের পড়ার সময়ে তাহার মাঝে মাঝে দেখা দরকার। আবার তৎক্ষণাৎ নিজেকে ধিক্কার দিয়া বিছানায় গিয়া মুখ লুকায়! যৌবনের শেষ সীমায় তরুণ প্রেমের পুনরাবির্ভাবের মতো দুর্ভাগ্য বুঝি আর নাই। সুলতা সহস্রবার নিজের দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া বালিশ ভিজায়, অথচ এই কান্নার মধ্যে তরুণ যৌবনের বেদনামাধুর্য্য থাকে না,—থাকে শুধু তিক্ততা, শুধু ধিক্কার, শুধু ভয়—কোনদিন কোনদিক দিয়া সীমা অতিক্রম করিয়া নিজেকে ধিকৃত, হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবে! তাই অমলের সঙ্গে দেখা হইলে মুখ তুলিয়া কথা সে ভালো করিয়া বলিতে পারে না, তাই অমলের বিরুদ্ধে একটা রুদ্ধ অভিযোগ তাকে নির্ব্বাক্ করিয়া রাখে।

সীমা কিন্তু সে একদিন সত্যই লঙ্ঘন করিল।

একদিন সন্ধ্যার পর অমল শীলাকে পড়াইতেছে—এনক্ আর্ডেন। বারান্দা দিয়া চলিতে চলিতে সুলতা শুনিল কাব্যের নায়িকাকে এনক্ বেশী ভালোবাসিত না ফিলিপ বেশী ভালোবাসিত এই লইয়া তুমুল তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। থমকিয়া দাঁড়াইয়া সুলতা সবিস্ময়ে শুনিল—শীলা বলিতেছে "ফিলিপের ভালোবাসাকে আমি ভালোবাসাই বলি না! সত্যি সত্যি ভালোবাসলে সে আর এতদিন অমন চুপ করে থাকতো না—আমি হলে প্রথম থেকেই ঝগড়া বাধিয়ে দিতুম —ভারি তো ভদ্রতা—ওসব প্যান্ প্যানানিতে আমার গা জ্বলে যায়—"

বিস্ময়ে সুলতা যেন নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল! এ তো তার ছোট্ট ভীরু খুকী নয়! যেন কোন এক অপরিচিতা তরুণী তার উন্মুখ যৌবনের স্পর্দ্ধায় অমলের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছে—তার প্রেমাস্পদকে পাইবার কামনার কাছে পৃথিবীর সমস্ত নীতিজ্ঞানকে সে তুচ্ছ করিতে পারে! চোখে তার নারীর জাগ্রত দৃষ্টি, মুখ আগ্রহোজ্জ্বল! কৌমার্য্যের ক্ষীণ ভীরুতার কোন চিহ্নই আর শীলার মুখে নাই!

সুলতা দেখিল অমল মৃদু হাসিতেছে। তাহার আর সহ্য হইল না। বুকের ভিতরে কি একটা যেন পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া চারিদিক লালে লাল হইয়া গেল। কি করিতেছে চিন্তা না করিয়াই ত্বরিত গতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া কঠোর কণ্ঠে শীলাকে বলিল—"তুমি হলে কি করতে না করতে সে কথা তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি! প্রেমচর্চ্চার সময় তোমার এখনও হয়নি। তুমি এখান থেকে যাও।"

শীলা কিন্তু ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল!

সুলতার আকস্মিক প্রবেশ ও অপ্রত্যাশিত কঠোর কণ্ঠে অমল যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল—এইবার ধীরে ধীরে বলিল—"Does it matter much ?"

অমলও শীলাকে সমর্থন করিতেছে মনে করিয়া সুলতা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—It does,—it does a world! আমার মেয়েকে প্রেমতত্ত্ব শেখাবার জন্তে তোমাকে এখানে রাখা হয়নি! ভেবেছ আমার চোক কাণ নেই, আমি বুঝিনে কিছু—নয়? বুঝি আমি সব,—শুধু আমার চক্ষুলজ্জায় বাধে বলে কিছু বলিনে আর আমার এই weaknessএর advantageই তুমি নিয়েছো। Mean—I call it!

অভ্যাসমতো ব্যঙ্গের সুরে অমল বলিতে গেল—Doing it all to the wrong person—Eh? কিন্তু সহসা শীলার ওপর চোখ পড়ায় তার দুর্ব্বল হাসি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

একটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ চোখে মুখে লইয়া শীলা সোজা সুলতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! কি এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে যেন মুহূর্ত্তে সে সুলতার সমকক্ষতায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে! তাহার মধ্যে অমলের সেদিনের দেখা কচি শ্যামল মেয়েটির আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সে যেন যৌবনের অহঙ্কার সুর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘোষণা করিয়া বিজয়িনীর স্পর্দ্ধা লইয়া সুলতার

উপর অকুণ্ঠায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্থলতা একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে! তাহার ঈষৎ স্থূল সুগৌর দেহখানি আপনার বেদনাভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! শীলার দৃপ্ত ঋজুতার পাশে তাহাকে অমলের যেন বড় অসহায়—দুর্ব্বল মনে হইল।

অমলের গলাটা যেন আটকাইয়া গেল,—সে শুধু বলিতে পারিল,—"Sorry সু—" একটু থামিয়া তাহারই সহিত আবার যোগ করিতে চাহিল—

"But I didn't mean to"

কিন্তু কি মনে করিয়া আর কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া গেল!

প্রায় দুই মাইল দূর রেলওয়ে ষ্টেশন—।

ষ্টেশনে গিয়া অমল দেখিল সে রাত্রের মতো শেষ ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে! চারিদিকের কোয়াসা ঢাকা নিস্তব্ধতার মধ্যে ছোট্ট ষ্টেশনটা যেন শীতে আড়ষ্ট হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে!

সোজা রেললাইন ধরিয়া সে পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিল! কিছুক্ষণ অত্যন্ত বেদনার সহিত সে স্থলতার কথা ভাবিল তারপরই আস্তে আস্তে চিন্তার খেই হারাইয়া ফেলিল, দুইটা রেলের মাঝখান ধরিয়া চলিতে চলিতে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নীচের কাঠগুলি সে গুনিতে লাগিল—

এক,—দুই,—তিন—।

—তারপর খালি চলিতে লাগিল—

সত্যভূষণ চৌধুরী

হেলেনের দুল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এমনি যে দুল এক শোভা পেত সুন্দরী
উর্ব্বশী-হেলেনের কর্ণে,—
জমানো সে এক ফোঁটা রক্তের বর্ণে!
...কুড়াইয়া পেনু বুঝি তাহা মহা দৈবে,
প্রিয়ার তো আলোকিত করিলায় গণ্ড;
না জানি কী হেলেনের তৃপ্তিতে সইবে?
নিঃশ্বাস কার পড়ে তপ্ত প্রচণ্ড!

দুল এক, ছোট দুল—
হোমারের কাব্যে—
উহ্য যে আছে তাহা
কেউ কী সে ভাববে?

...হেলেনের-ই মতো ইহা রূপসীর যোগ্য;
—নইলে অভোগ্য!
কার কী বা দাবী আছে এক ফোঁটা স্বর্ণে?
ব্যথিতের রক্তে এ-রাঙা যে,
কতো বিরহীর বুক ভাঙা যে!
সোনালী-সুকুন্তল প্রান্তে—
টুকটুকে দালিমের বর্ণে!—
দীপ্তি যা পেত রাজ হর্ম্ম্যে,—
সাগরের স্নানে আর নর্ম্মে,—
চন্দ্রিকা ঝলমল,
যৌবন উচ্ছল—
সুবাসিত সুকোমল চর্ম্মে!
ছিল দুল...বিদ্যুৎ...পান্নার বর্ণে;
হেলেনের কর্ণে!

শরৎ-সাহিত্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ডাক্তার এ, গুপ্ত, এম্-বি, বি-এস্

শরৎ গ্রন্থাবলীর বহু আলোচনা হইয়াছে। একাধিক লেখক তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার এক একটী ধারা কেন্দ্র করিয়া গদ্যে ও পদ্যে নানা নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দরদী শরৎচন্দ্র, পল্লীচিত্রে সিদ্ধহস্ত শরৎচন্দ্র, সমাজ-সংস্কারে শরৎচন্দ্র, নারীচিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র প্রভৃতি অবলম্বনে বহু প্রবন্ধ ও সমালোচনা বাংলার নানা দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমি একজন সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী। আমি শরৎ সাহিত্যের একটা উপেক্ষিত অংশের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আলোচ্য বিষয়ে আমি শরৎচন্দ্রকে একজন প্রবীন চিকিৎসকের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে (Uncommon veteran physician) অঙ্কিত করিব।

"দত্তা"য় দেখিতে পাই, "এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটার সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাহারা ভাবিতেও পারে না, কত বড় বিস্ময় এই ছোট জিনিষটার ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মত এমনি সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ড যে মানুষের একটী ক্ষুদ্র মুঠার ভিতর ধরিতে পারে, সে আভাস শুধু এই যন্ত্রটার সাহায্যেই পাওয়া যায়। এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়াই সে বিজয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করিল।"

"সৃষ্টিতত্ত্বের যাহা অজ্ঞেয় ব্যাপার, তাহার সম্বন্ধে বিজয়া বড় বড় পণ্ডিতের মুখে অনেক আলোচনা অনেক গবেষণা শুনিয়াছে; কিন্তু যে অংশটা তাহার জ্ঞেয়, সে কোথায় সুরু হইয়াছে, কি তাহার কার্য্য, কেমন তাহার আকৃতি প্রকৃতি, কি তাহার ইতিহাস, এমন দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে সে যে আর কখনও শুনিয়াছে তাহা মনে হইল না।"

মনে না হইবারই কথা—ইহা Bacteriologyর গোড়া পত্তনের কথা, "জীবাণুর স্বচ্ছ দেহের অভ্যন্তরের" কথা। "কে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিতেছে আর কে যক্ষায় গৃহশূন্য করিতেছে" তাহারই কথা। বিজয়ার তাহা না জানাই সম্ভব। তথাপি গ্রন্থকারের ইঙ্গিত আমাদের নিকট নিষ্ফল নহে।

কয়েকপাতা উল্টাইয়া আবার দেখিতে পাই, "বিজয়া কহিল, ওরে একটু দাঁড়ান। সেই পরেশ ছেলেটাকে ত আপনি চেনেন,—পরশু থেকে তারও জ্বর। তার মাকে আনতে বলে দিয়েছি।

বলিতে বলিতেই পরেশের মা ছেলেকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন নিমেষমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও, বাছা, আমার দেখা হয়েছে।

ছেলের মা এবং বিজয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইল। মা মিনতির স্বরে বলিল, সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা বাবু, নাড়ীটা দেখে একটু অষুধ-টষুধ দিতেন—

বেদনা আমি জানি বাপু, তোমার ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও, হাওয়া-টাওয়া লাগিয়ো না, ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তখন নরেন বিজয়ার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এদিকে ভারি বসন্ত হচ্চে এবং এই ছেলেটার মুখের উপরও বসন্তের চিহ্ন আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। একটু সাবধানে রাখতে বলে দেবেন। বিজয়ার মুখ কালী হইয়া গেল,—বসন্ত! বসন্ত হবে কেন?

নরেন কহিল, হবে কেন—সে অনেক কথা। কিন্তু হয়েচে। আজও ভাল বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু কাল ওর পানে চাইলেই জানতে পারবেন। আমার মনে হচ্চে,

আপনার আচার্য্য বাবুকেও আর দেখবার বিশেষ আবশ্যক নেই—তাঁর অসুখটাও খুব সম্ভব কালকেই টের পাবেন।

ভয়ে বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। সে অবশ নির্জ্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেন বাবু—আমারও কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল, আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা!

নরেন হাসিল, কহিল, ব্যথা ভয়ানক নয়, ভয়ানক যা হয়েছে, তা আপনার ভয়। বেশ ত, জ্বর যদি একটু হয়ে থাকে, তাতেই বা কি। আশে পাশে বসন্ত দেখা দিয়েছে বলেই যে গ্রামশুদ্ধ সকলেরই তাই হতে হবে, তার কোন মানে নেই। বিজয়ার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া আসিল, হলেই বা আমাকে দেখবে কে? আমার কে আছে?

নরেন পুনরায় হাসিয়া কহিল, দেখবার লোক অনেক পাবেন, সে ভাবনা নেই—কিন্তু কিছু হবে না আপনার।"

ফাল্গুনের আরম্ভে হঠাৎ গরম পড়িলে (যাহাকে change of season বলা হয়) বসন্ত রোগের প্রকোপ হওয়া বিচিত্র নহে। ইনফ্লুয়েঞ্জাও তখন পূর্ণমাত্রায় বিস্তার লাভ করে। গুটী উঠিবার পূর্ব্বে বসন্ত ও সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভেদ নির্ণয় (Differential Diagnosis) করা এক দুরূহ ব্যাপার। চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন। বিজয়ার ইনফ্লুয়েঞ্জাই হইয়াছিল। গ্রন্থকার অবশ্য অতি সহজেই নরেনকে দিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের এক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

তথাপি ভয় ভাঙ্গিল না। পরের দিন নরেন্দ্র যখন বিজয়ার ঘরে উপস্থিত হইল তখন সে প্রবল জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে.... বিজয়া রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না; তারপর দুই বাহু বাড়াইয়া কহিল, আসুন।.....চক্ষের পলকে বিজয়া দুই হাত দিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হত না—আমি সমস্তদিন পথ পানে চেয়ে ছিলুম।

নরেন্দ্র আকার—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে প্রবল জ্বর উগ্র মদের নেশার মত অনেক আশ্চর্য্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে না অন্তরে কোথাও হয়ত থাকে না। (Vide Psychology Subconscious mind is like a floating ice)

নরেন সহজ সান্ত্বনার স্বরে প্রসন্নমুখে কহিল, ভয় কি, জ্বর দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে। (Remedy selected by suggestion as in nervous breakdown.)

পরের কথা—"পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে বিজয়ার রোগ সারিয়া গেল বটে কিন্তু শরীর সারিতে দেরী হইতে লাগিল। বিলাস ভাল ডাক্তার দিয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটী করিল না, কিন্তু দুর্ব্বলতা যেন প্রতিদিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল।"

ইহাকে Post Febrile neurosis বলা যাইতে পারে। এখানে ইহার কারণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়াও আর কিছু!

আরও পরে দেখিতে পাই—"একখানি প্রেস্‌ক্রিপসন্, উপরে বিজয়ার নাম লেখা। (কোন nerve tonic হইতে পারে যেমন Phospholecithin অথবা Rochetone!) লেখাটুকুর উপর চোখ পড়িবামাত্র কয়টা অক্ষর যেন আনন্দের বাণ হইয়া বিজয়ার বুকে আসিয়া বিঁধিল।"

ইহার পরে গ্রন্থকার আর ঔষধ পরীক্ষার ফলাফল আমাদিগকে জানিতে দেন নাই।

শ্রীকান্তের প্রথমে দেখিতে পাই, মেজদা সেই যে বিদ্যুৎ-বেগে দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া আঁ আঁ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না। এরূপ Epileptic fit এর পক্ষে তিনি একজন উপযুক্ত লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সুকুমার দেহ ও অনুন্নত মস্তিষ্ক (অর্থাৎ নিজের ও পরের শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন দায়িত্ব বোধ থাকা সত্ত্বেও বারংবার ফেল—) এই দুইটী জিনিষ তাঁহার রোগের predisposing factore হিসাবে ধরা যাইতে পারে। আর একটী বিষয়ে নজর পড়ে সেটী তাঁহার স্বার্থপরতায়। ইহাও বোধ করি তাঁহার Inherent lack of adoptibility to normal lifeএর জন্য প্রকৃতি দত্ত আত্মরক্ষার (nature's protective mechanism) উপাদান বিশেষ।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমাদের নিরুদিদির সহিত সাক্ষাৎ। হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সুতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া ছয়মাস ভুগিয়া মরেন তখন তাঁহার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শ্রীকান্ত শুনিতেছেন—'শ্রীকান্ত তুই যা। যা ভাই যা, আর এতটুকু দেরী করিস্‌নে—তুই পালা।"

"যাবি নি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখচিস নে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?"

তারপর সেই যে সুরু করিলেন "ঐ খাটের তলায়, ঐ মাথার শিয়রে। ঐ মারতে আসচে? ঐ নিলে। ঐ গেলে! (Delerium ferox in which the patient is violent and maniacal) এ চীৎকার শুধু থামিল শেষ রাত্রে যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া গেল।"

এখানে আমার বক্তব্য এই যে নিরুদিদির নিতান্ত কৈ মাছের প্রাণ তাই ছয়মাস সমানে সুতিকা রোগের (Puerperal sepsis followed by abortion or premature labour) সহিত যুঝিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিলেন। সাধারণতঃ এ সব রোগী গোড়ার দিকটাতে যতটা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভিতর থাকে দুই এক সপ্তাহ পরে বিপদ গণ্ডী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্রমশঃ ভালর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যদিও বহুদিন ভুগিয়া ভুগিয়া অল্প বিস্তর chronic condition এ দুর্ভাগ্যক্রমে Residual infection এর দ্বারা (strepto coccus haemolyticus) নূতন করিয়া আক্রান্ত হইয়া সংজ্ঞা শূন্য হওয়ায় কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। তথাপি চিকিৎসক মাত্রই স্বীকার করিবেন এ হেন নিরুদিদিরা বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁহাদের মনে একটা গভীর ছাপ রাখিয়া প্রস্থান করেন।

এইবার শ্রীকান্ত নিজে অসুখে পড়িলেন। তিনি বলিতেছেন, "দিন পাঁচ ছয় হইতে আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে কিছুই ভাল লাগিত না। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ টিপ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুর বেলা যাহা কিছু খাইলাম অপরাহ্ন বেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি নয়টা দশটার সময় টের পাইলাম, জ্বর হইয়াছে।"

এই লক্ষণগুলি সমস্তই Enteric এর প্রথম অবস্থার সহিত মিলিয়া যাইতেছে। Savil বলেন, During incubation the most important early symptom is headache otherwise there are simple malaise and lassitude, anorexia, vomiting and fever. Malaise is a very constant feature from the outset and it is for this symptom that we are generally consulted. Lethergy is very marked and gives rise to the aspect 'facies' Typhosa' which is fairly Characteristic.

তারপরের ঘটনায় দেখিতে পাই শ্রীকান্ত বলিতেছেন, "তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহা বেশ বুঝিতেছিলাম, আর বেশীক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব আর যাহা কিছু করিবার ইতিমধ্যে না করিলে, আর করাই হইবে না।" এবং "তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল।" (C. F. lodder like temperature).

এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, The drowsiness deepens to semi stupes and in severe case Typhoid state eventually supervenes. (Vide Savil. page 583)

এই Typhoid state এর আভাষ আমরা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাতেই পাই। প্রায় ১৩দিন পরে শ্রীকান্ত সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিতেছেন, "জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্‌ব্যাগ্‌। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপর শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোক, কাছে গোটা দুই তিন ওষুধের শিশি এবং তাহারই পাশে একটী দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন লাল চেক র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তারপরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা

যাওয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে তুলিতে তোলা, মাথা ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ান—এমনি কত কি ব্যাপার।"

ইহা Convalescent রোগীর দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কলাপ বিশেষ—জ্বর নামিয়া আসিতেছে, stuporএর ভাব কাটিয়া গিয়াছে, mental confusion নাই বলিলেই হয়। তখন ক্রমশঃ আরোগ্যপথে আগাইয়া চলিয়াছে। প্রমাণ, রোগী নিজ মুখেই বলিতেছেন, "যাহাতে অচেতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর—ডাক্তারি শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই।"

নামটা enterio fever—গালভরা মোটেই নহে—শরৎবাবুর পছন্দ হইল কিনা জানি না। *

এইবার রশ্মামুলুকে প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তীকে অবলম্বন করিয়া ভয়াবহ প্লেগের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। শরৎবাবু বলিতেছেন, "এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া মুখখানি (প্লেগের অপর নাম Black-Death দ্রষ্টব্য) বাহির করিয়া দেখা দিল। হায়রে! তাহাকে সমুদ্র পারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ কোটি যন্ত্র তন্ত্র, কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা সমস্তই একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। অথচ সহরের চোদ্দ আনা লোক হয় চাকুরীজীবী নয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পালাইবারও যো নাই,—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজী ছাড়িয়া দিল। ভয়ে এ পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা পাঁটলি ঘাড়ে করিয়া ওপাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ওপাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই লোকে ছুটিতে সুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ার একরাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কাহার যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে Black Death সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত উপরোক্ত ঘটনার কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। Black Death সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে, "One day of August, in 1348, a man died with terrible suddenness in the town of Weymonth. Well and strong at one minute, he became aware of a strange swelling on a part of his body, then of a few black marks on his chest, and in a few hours he was dead.

With almost equal suddenness this scourge swept from town to town. Men were dying like flies in Bristol, the same black marks on their body; Gloucester-shire tried to cut off the stricken city from the rest of its towns and villages, but swift death filled its streets. Before a week was over London lay in grip of this Black Death."

আবার অন্যত্র দেখিতে পাই, "the population was reduced perhaps by a third. The epidemic was probably a severe form of bubonic plague of the East and those stricken by it died usually in two or three days, sometimes in one" (Vide Book of Knowledge Vol V & IX P. P. 3637 & 6468)

ইংলণ্ডের ইতিহাসের দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যে ভয়াবহ প্লেগের কথা (The Great plague of London) বর্ণিত আছে তাহার কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

This was a terrible disease, which spread rapidly in the badly drained, crowded lanes of the city. The doctors did not know how to cure those who caught the plague, and so many people died of the disease that they had to be

* এই প্রবন্ধটী শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পূর্ব্বে লিখিত।

burried in great pits which held hundreds of bodies.

আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমার সহ-ব্যবসায়ীদিগের ভিতর যাঁহার Public Health Department হইতে Epidemic Dutyতে নামিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য এরূপ মারাত্মক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমি তাঁহাদের এমন এক জনের বিষয় জানি যিনি বলিতে গেলে কেবলমাত্র স্বীয় পিতৃপুণ্য বলেই ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, পরে মাসাধিককাল Nervous breakdownএ শয্যাশায়ীও ছিলেন।

মনোহর চক্রবর্তীর কুঁচ্‌কি ফুলিয়া জ্বর হইল (Bubonic plague) তারপর বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতে বকিতে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে "ঠেলা গাড়ী চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওয়ানা হইয়া পড়িলেন।"

এদিকে মাদ্রাজী 'মেসে' সুমুখের খাটের উপর দুজন যুবা পাশাপাশি বালিসে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও ভাঙ্গিবে না......সমস্তই বুঝিতে পারিয়া আমাদের শ্রীকান্তবাবুরও মনে হইল ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে এবং ব্যথা করিতেছে। সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন কিংবা সত্য সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

উপরোক্ত Nervous Breakdown দ্রষ্টব্য। Mumps অথবা Angeo Neurotic Oedemaও হইতে পারে। কারণ, পরে নিজেই ব্যক্ত করিতেছেন, "খুব সম্ভব সে আমার প্লেগ নয় তাই মরণ আমাকে শুধু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।"

ইহার পরে শ্রীকান্ত বাঙ্গালী কেরাণীদের ছেলেমেয়েদের কথা বলিতেছেন। "ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব তার মায়ের উপরে থাকে কিন্তু ত্রিশ টাকা ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না সে জানতে হলে কোন ত্রিশ টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক।...পল্লীগ্রামে গো দুগ্ধের অভাবে যখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটী পানাপুকুরের জল আর বিদেশী খাঁটী বার্লির গুড়ো, কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয়ত এক আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্য জোটে, কিন্তু সে সৌভাগ্য এ সব ঘরে বেশী দিন থাকার আইন নাই। মাস চারেকের মধ্যেই আর একটী নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়।...

তারপরে ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে (Rickets Infantile Liver ?) এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া জ্বরে।...তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুঁড়ো যোগান এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বললুম, আতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্ত্তি নেবার ফুরসুতে—ঐ গুলি খাঁটি দিশী জলে গুলে তাকে গেলান। তারপরে যথাসময়ে সূতিকা গৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন কতক চ্যাঁচান। কেন না, ওটা মায়ের স্বভাব কেবল। এমন কি কেরাণীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ কর্ত্তে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন।"

অনেকেই জানেন শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে যদি তাহাকে মাতৃ দুগ্ধের অভাবে বার্লি অথবা এরারুট (starchy food) দেওয়া হয় তাহা কখন হজম হইবে না। উপরন্ত লিভার ও অন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা আনিয়া দিবে। বাজারে যে সব Tinned food বা 'পেটেন্ট ফুড্' পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই এইরূপ হিত অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে তাহা কয়জন পিতামাতা জানেন।

Indian Medical Recordএর সম্পাদক Dr. Mukherjee বলেন, "The greatest susceptibility is between six and twenty-four months i.e. during the period of dentition of child and reconception of mother. In many cases of our series

the mother had become once more pregnant when the child was only several months old.

The children under six months who were affected by the disease (Infantile liver) were fed mainly on cow's milk and barley from the birth and got very little mother's milk···The disease is seen in children fed on artificial food as well.

এইরূপ শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি। শুধু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বিরত হইলাম। একদিকে গ্রন্থকার যেমন মূল উপাখ্যানের সহিত শাখা পল্লবের সামঞ্জস্য রাখিয়া গিয়াছেন আবার তেমনই অন্যদিকে দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ বাঙ্গালী ঘরের অসুখ বিসুখগুলির সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র আপন সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাবে যে সকল রোগভোগের বিবরণ দিয়াছেন তাহার ভিতর কোথাও কোনরূপ ফাঁক বা গোঁজামিল নাই। এগুলি এতই জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে প্রত্যেকটী চিত্র যেন চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। রোগ ও তাহার পারিপার্শিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ নানা উপদ্রবে ইহার ক্রমবিকাশ, পরিস্থিতি ও পরিশেষে পরিণতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ সংযমের সহিত অতি অল্প কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবদাসের কথাই ধরা যাউক। যথা, দেবদাসের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সমস্ত পেট প্লীহা লিভারে পরিপূর্ণ ; তাহার উপর জ্বর কাশি। রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, দেহ অস্থিচর্ম্ম সার। চোখ একেবারে ঢুকিয়া গিয়াছে, শুধু একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চক্ চক্ করিতেছে। মাথার চুল রুক্ষ ও ঋজু—চেষ্টা করিলে বোধ হয় গণিতে পারা যায়। হাতের আঙ্গুলগুলার পাশে চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়—একে শীর্ণ, তায় কুৎসিত ব্যাধির দাগে দুষ্ট।"

ইহা Chronic alcoholism এর সহিত কালাজ্বরের ঘনিষ্ট যোগাযোগ নহে কি? কুৎসিত ব্যাধির উল্লেখে কেহ যেন Syphilis ভাবিয়া না বসেন। ইহা alcoholic neuritis এর দরুণ perforating ulcerও হইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ইডেন হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বনামধন্য গ্রীন্ আর্ম্মিটেজ মহোদয় বলিয়াছেন, Shakespeareএর নাটকে যে সমুদয় রোগের বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এতই সম্পূর্ণ ও বাস্তব (Realistic and complete) তাহাতে মহাকবিকে সত্যসত্যই পৃথিবীর অদ্বিতীয় ভেষজশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 'ম্যালেরিয়া-পীড়িত দুঃখ দারিদ্র্যে জীর্ণশীর্ণ ক্ষুদ্র বাঙ্গালীঘরে শরৎ-চন্দ্রেরও অনুরূপ একটী স্থান আছে কিনা তাহা সুধী পাঠকবৃন্দের বিবেচ্য।

এ, গুপ্ত

ধর্ম্ম ও সংসার

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি-এ

যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম্ম। এই সংসারের নানা ঘটনাচক্রে, নানা বৃত্তি-প্রবৃত্তির সংঘাতের মধ্যে মানুষ এমন কিছু জিনিষ চিরদিনই খুঁজিয়া আসিয়াছে, যাহা দ্বারা সে নিজেকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষা হয়, আপৎ-শান্তি হয় ও তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হয়। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের ও ধর্ম্মপথে জীবনযাত্রাগঠনের প্রাথমিক নিদান। এই আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিই মানুষকে প্রথম, তাহার আপাতদৃশ্যমান পারিপার্শ্বিকের অন্তরালস্থ কোনও নিগূঢ় বিধান আবিষ্কারে প্রণোদিত করিয়াছে, যদ্দ্বারা সে সাংসারিক বিপদ আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারে।

আত্মরক্ষা ও আত্মধারণের জন্য মানুষ নানা উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে আত্মা ও বিশ্বের অস্তিত্বের মূলরহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল ও দেখিল যে তাহার আত্মা অবিনশ্বর, দেহই মাত্র বিনাশী। আরো দেখিল যে এই জগতে এমন কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলা আছে, যাহা জানিতে পারিলে সে ইহজগতে ও পরলোকে নিজেকে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করিতে পারে, এবং সর্ব্বপ্রকার অশুভের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। এই জ্ঞানে মানুষ তাহার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পথ খুঁজিয়া পাইল—তাহার অন্তরতম স্বভাবের সন্ধান পাইল।

স্বভাবই সকলকে ধারণ করিয়া রাখে—স্বভাব বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলেই বিপদ। প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেই সম্পদ্। পশুপক্ষীরা প্রকৃতিকে মানিয়া চলে—তাহাদের প্রকৃতি ছাড়া স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বা বুদ্ধি নাই। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা বুদ্ধি আছে—তাহা দ্বারা যদি সে আত্মপ্রকৃতিকে ও বিশ্বপ্রকৃতিকে চিনিয়া চলিতে পারে তবে তাহার হানির কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মানুষ তাহার স্বভাবকে না দেখিয়া সাময়িক বৃত্তি প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অনেক কিছু করিয়া বসে, যাহার পরিণাম মন্দ। যাহাতে মানুষ তাহার আপন-প্রকৃতির বিরোধী আচরণ করে তাহাই তাহার অধর্ম্ম। এই অধর্ম্ম, যে সব বৃত্তি-প্রবৃত্তি বা শক্তির প্রেরণায় সে করে তাহাই তাহার শত্রু বা রিপু বলিয়া গণ্য। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলি মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তি নহে—এইগুলি তাহার প্রকৃতির বিকৃতি—তাই এই রিপু সকলের অনুসরণে তাহার অশুভ অনিবার্য্য।

মানুষের ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ রহিয়াছে। গোড়াতেই মানুষ নিজের আত্মাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না—কিন্তু ক্রমশ তাহার চক্ষু ফোটে ও সে নিজেকে ও জগৎকে উত্তরোত্তর গভীরতররূপে চিনিতে পারে। আত্মপরিচয় ও বিশ্বপরিচয়ের চূড়ান্ত সীমানায় আসিয়া মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়াছে।

মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা স্বভাবকে ছাড়িয়া ধর্ম্মের কোনও সত্তা নাই। এই স্বভাবের অনুসরণ করিয়াই মানুষ দেখিয়াছে, যে এই স্থূল জগৎ ও তাহার স্থূল প্রকৃতির অতীতে রহিয়াছে, তাহার সূক্ষ্মতর প্রকৃতি ও সূক্ষ্মতর জগৎ সকল—যাহাকে দেবজগৎ বলা হয় এবং আরো অতীতে রহিয়াছে তাহার আত্মা—এবং আত্মিক বৃহৎ এক জগৎ। তাহাই ব্রহ্ম। আর সকল আত্মার উপরে সর্ব্ব দেবতার উপরে রহিয়াছেন এক পরমেশ্বর—যাঁহার অংশ নিয়াই সর্ব্ব আত্মা, সর্ব্ব দেব ও সর্ব্ব প্রাণী-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্ম্মের এরূপ বৃহত্তর অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন তাহার পারমার্থিক সত্তার সন্ধান পাইল, তখনই তাহার লক্ষ্য হইল, সেই পারমার্থিক সত্তাকে সম্পূর্ণ লাভ করা। সকলেই ইহার জন্য সমভাবে অগ্রসর হইল না—কিন্তু

অনেকেই চাহিলেন জগৎকে, জীবনকে ও নিজ স্বভাবকে ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মনোনিবেশ করিতে। তাঁহারাই সন্ন্যাসীনামে অভিহিত। সন্ন্যাসীগণ জীবন থাকিতেও ইহজীবনের সকল গতি নিরুদ্ধ করিয়া চাইলেন, জীবনের অতীত পারমার্থিক সত্তায় মগ্ন হইতে।—

কিন্তু, আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা এ প্রকার বিরতি বা ত্যাগ নহে। স্বভাবকে অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয় এবং স্বভাবের মধ্যেই যদি ভগবান্ আত্মা ও দেবগণ থাকেন, তবে স্বভাবকে চিনিয়া চলাই মানুষের পরম ধর্ম্ম।

মানুষ যা, তা নিয়াই তার স্বভাব। মানুষ, আত্মস্বরূপ,—তার সত্তা ভগবানেরই অংশ ও বিশাল ব্রহ্মসত্তার সকলের সহিতই সে এক। সুতরাং সে ভগবানকে যেমন ছাড়িতে পারে না—অপর, সকলকেও ছাড়িতে পারে না। ভগবানের সঙ্গে সংযোগে সকলের সহিত যুক্ত হওয়াই তার স্বভাব। এই বিশ্বের আকাশের আলো দিয়া তাহার চক্ষু আলো পাইয়াছে, জগতের হাওয়ায় তাহার নিশ্বাস বহিতেছে, ধরণীর শস্য তাহার জীবন পোষণ করিতেছে—এই জগৎ ছাড়িয়া তাহার শরীরের অস্তিত্ব কোথায়? তাহার অন্তর্জ্জগতও বাহিরের বিভিন্ন শক্তির সংস্পর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—অন্তর্জ্জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শে শব্দে তাহার অন্তরের খাদ্য জোগাইতেছে—সুতরাং অন্তর্জ্জগতের শক্তি বা দেবতাদের ছাড়িয়া তাহার অন্তঃকরণের অস্তিত্ব নাই। আবার তাহার আত্মপুরুষ, বা তাহার নিজ সত্তা এক অখণ্ড ব্রহ্মের বিশেষ অভিব্যক্তি—ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জীবের জীবত্ব নাই। পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অংশই সে—ভগবানকে ছাড়িলে, আত্মভ্রষ্ট হওয়াই তাহার অভিশাপ। সুতরাং মানুষের শরীর অন্তঃকরণ আত্মা এই সকলেরই পরিণতি ও বিকাশ যদি তাহার ধর্ম্ম হয়—তবে, জগৎ, দেবতা, ব্রহ্ম ও ভগবান এই সকলের সহিত সমভাবে যোগেই তাহা সম্ভব। সন্ন্যাসীরা বলিবেন, তাহা সম্ভব নয়। আমরা বলি, প্রকৃতির মধ্যে এই সম্ভাবনাই রহিয়াছে—প্রকৃতিই পরমার্থের সহিত জগতের সামঞ্জস্য করিয়াছে। প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া মানুষ পরমার্থ ও সংসার উভয়ই পাইবে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

"একমেবাদ্বিতীয়ম্"

(যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা)

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

পুকুরের চারিদিকে বহু ঘাট থাকে,
বহুজন সরে তাহে, কেবা কয় কা'কে।
'জল' ব'লে লয়ে যায় কলসিতে ভ'রে,
কেহ আনে 'পানি' কহি একই বস্তু ঘরে।
অন্যে কহে 'ওয়াটার' পিয়ে ভরপুর,
'একোয়া' যে বলে তারো তৃষ্ণা হয় দূর।

তেমনি 'জিহোবা', 'যীশু', 'আল্লা' ও 'ঈশ্বর'
'রাম', ও 'রহিম', 'গড্', 'হরি' কিংবা 'হর'।
যার যাহা ইচ্ছা হয় সে তেমন কয়,
একই ব্রহ্ম ব্যেপে আছে ত্রিজগৎময়।
"মিছরির রুটি" এযে কহেন ঠাকুর,
কামড় যেদিকে দিবে লাগিবে মধুর।

একই তীর্থে যাইবার মাত্র ভিন্ন পথ,
বৃথা তর্কে গড় শুধু ভিন্ন ভিন্ন মত।

মুক্তিলাভ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই. সি. এস্

প্রথম দৃশ্য

[ষ্টেজের মধ্যে দুইটি অংশ,—এক অংশ বৃহত্তর, আর অংশ ক্ষুদ্রতর। ক্ষুদ্রতর অংশ রাস্তা, তাঁহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই, মাঝে মাঝে লোক চলাচল করিতেছে, একপাশে কেরোসিনের বাতী। বৃহত্তর অংশ অনুকূল চাটুর্য্যের বাড়ীর সদর বাহিরের ঘর। এই ঘর ও রাস্তার মধ্যে ঘরের দেওয়াল, সেই দেওয়ালে একটি জানালা। এই ঘরের একটি মাত্র দরোজা, দরোজা ষ্টেজের ভিতরের দিকে খোলে। এই দরোজা দিয়া ষ্টেজের ভিতর দিকে যাইলে ষ্টেজের যে দিকে রাস্তা সেই দিকে আর একটি দরোজা—সেইটিই অনুকূলের বাটীর সদর দরোজা। রাস্তা হইতে অনুকূলের বহির্গৃহে যাইতে হইলে এই সদর দরোজা দিয়া পরে গৃহের দরোজা দিয়া যাইতে হয়। নিম্নের নক্সা হইতে এ বর্ণনা সহজেই বুঝা যাইবে—

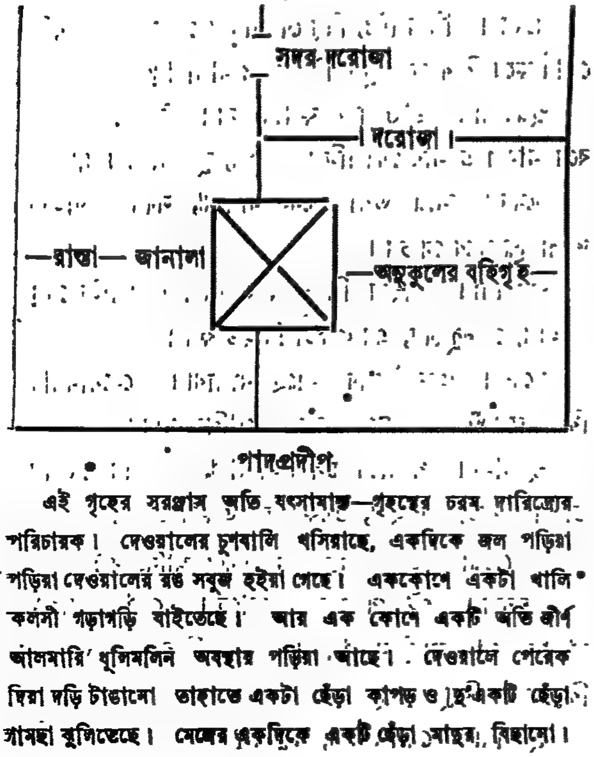

এই গৃহের সরঞ্জাম অতি যৎসামান্য—গৃহস্থের চরম দারিদ্র্যের পরিচায়ক। দেওয়ালের চুণবালি খসিয়াছে, একদিকে জল পড়িয়া পড়িয়া দেওয়ালের রঙ সবুজ হইয়া গেছে। এককোণে একটা খালি কলসী গড়াগড়ি যাইতেছে। আর এক কোণে একটি অতি জীর্ণ আলমারি ধূলিমলিন অবস্থায় পড়িয়া আছে। দেওয়ালে পেরেক দিয়া দড়ি টাঙানো তাহাতে একটা ছেঁড়া কাপড় ও দু'একটা ছেঁড়া গামছা ঝুলিতেছে। মেজের একদিকে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছানো। একপাশে একটি পায়াভাঙা জীর্ণ চেয়ার। তাহার বেত সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনুকূল চাটুর্য্যের জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন মূর্ত্তি। তাঁহার চুল উস্কা খুস্কা, একটি ছিন্ন ধুতি ও একটি জীর্ণ ধূলিমলিন, চটি জুতা পরিয়া আছেন। অনুকূলের স্ত্রী সুরবালারও শীর্ণ মূর্ত্তি, অঙ্গে ভূষণের বালাই নাই। তাঁহার মুখ নিরানন্দ, বর্ণ মলিন। দেখিয়াই মনে হয় ইনি পৃথিবীতে দুঃখ সহ্য করিবার জন্যই যেন আসিয়াছেন।]

অনুকূল। বল কি সুরো, তুমি একে পাগলামি বল!

সুরবালা। মাসতুতো ভাই বোনে কখনো বিয়ে হয়। হিন্দু হয়ে এমন কথা মুখেও আনতে নেই।

অনুকূল। তাহলে আমি হিন্দু নই।

সুরবালা। ছিঃ ছিঃ, ধর্মত্যাগ করবে!

অনুকূল। বকাধার্মিকেরা আমাকে কী রক্ষাই বা করেছে? মেয়েটার বর খুঁজতে কোথায় না ঘুরেছি, দুপুরের রোদে, অবিরাম বর্ষায় ধূলো খেয়ে, কাদা মেখে, ধার্মিকদের গালাগালি খেয়ে। তুমিত তা দেখনি সুরো। কেউ রাজি হয় না। যে কড়া দর হাঁকে তা'ত দেবার সাধ্য আমাদের নেই।

সুরবালা। অস্থির হোয়ো না, মেয়ের বিয়ে কি আর বন্ধ থাকে?

অনুকূল। আশার কথা আর শুনিয়ো না বলচি। তোমাদের ঐ মিথ্যে আশা, ঐ সর্ব্বনাশী রাক্ষুসী আশা। যে জাতের মেয়ে হল গলগ্রহ সে জাতের মার কে বাঁচাবে? দেখছ না দুর্দ্দশা, কেমন উচ্ছন্ন যাচ্ছে! ঠিক হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে।

সুরবালা। তুমি এমন উত্তেজিত হোয়ো না। বস, এইখানে বস, একটু বিশ্রাম কর। এই তেতে পুড়ে এলে। আমি তোমায় পাখার বাতাস করি।

অনুকূল। ও সব আর হবে টবে না। রমেনের সঙ্গেই আমি বিলুর বিয়ে দেব। হোক্ মাসতুতো ভাই। কাল যদি আমি চোখ বুজি, মেয়েটা পথের ভিখারী হয়ে যাবে, বেশ্যাবৃত্তি করবে। মা হয়ে তুমি তা দেখবে ?

সুরবালা। ছিঃ ছিঃ, অমন সর্ব্বনেশে কথা মুখে আনতে নেই।

অনুকূল। মুখে আনতে নেই। তোমার সহানুভূতি আমার দিকে নয়, সমাজের দিকে।

সুরবালা। না গো না, তাও কি কখনো হয়।

অনুকূল। সমাজ আমায় কোন্ সাহায্যটা করেছে ?

সুরবালা। করেনি। কিন্তু সব সমাজই সমান। যেচে গিয়ে কাকেও সাহায্য করে না। তা ছাড়া পরের সাহায্যের ওপরই বা নির্ভর করবে কেন ? মান সম্ভ্রম বুঝি বড় লোকেরই একচেটে ?

অনুকূল। কারো ভিক্ষে চাই না। কিন্তু সাহায্য করবার দায় সমাজের যদি না থাকে পীড়ন করবার অধিকার তাকে কে দিয়েচে ? কে দিয়েচে বলতে পার তুমি ?

সুরবালা। ওগো তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

অনুকূল। জান, আজ আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। সব সময় এই খানটা জলচে। চোখের ভিতর যেন আগুণ ঠিকরে পড়চে। এমন একটা যন্ত্রণা বুকে, মাথায়, যা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না,—যেন সব সময়ে কারা সব সরু সরু ঠ্যাং, কালো কালো ধড়, ড্যাব-ডেবে চোখ কিল কিল করে আমার সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। (আর্ত্তস্বরে) আমায় বাঁচাও সুরো তুমি বাঁচাও।

সুরবালা। চুপ কর, চুপ কর। আজ আবার তোমার আবোল তাবোল বকুনি সুরু হয়েছে।

অনুকূল। (জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন রাস্তায় রমেন আসিতেছে। কহিলেন) ঐ রমেন আসচে। সুরো তাকে তুমি ধরে রাখ। জোর ক'রে ধরে রাখ। কিছুতে ছেড়ো না। বল রাখবে ত ? রাখবে ? যাচ্ছি আমি, এখুনি বিয়ের যোগাড় করচি।

(অনুকূল দরোজা দিয়া ঘরের ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই রমেন রাস্তা হইতে সদর দরোজা দিয়া বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের দুজনকে দেখা গেল না, কারণ তাঁহারা ষ্টেজের পিছন দিকে রহিলেন, কিন্তু উভয়ের কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট শোনা গেল। অনুকূল সদর দরজা দিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন, যাইবার সময় সদর দরোজা তালাবদ্ধ করিয়া গেলেন। রমেন অন্য দ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।)

রমেন। কি মাসীমা, মেসোমশাইকে এই দুপুর রোদে অমন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যেতে দিলেন কেন ?

সুরবালা। কি করব বাবা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না। তুইও ত বারণ করলি, তোর কথাই কি শুনলেন ? আজ যেন ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এখুনি বলছিলেন কারা যেন সরু সরু ঠ্যাং, কালো কালো ধড়—

রমেন। থামো মাসীমা, তুমিও কি পাগল হলে নাকি। মেসোমশায় বলে গেলেন পুরুৎ ডাকতে যাচ্ছেন, আমি যেন এখানে থাকি, বিলুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। এ কী খেয়াল চেপেছে মাসীমা ?

সুরবালা। কোথাও পাত্র জুটবে না, তাই গোঁ ধরেচেন।

রমেন। কিন্তু ছিঃ, বিলু যে আমার বোন হয়। যদি জোর করে বিয়ে দেন, তুমি কি করবে মাসীমা ?

সুরবালা। তাও কি কখনো হয়। উনি ক্ষেপেছেন বলে আমরা ত আর ক্ষেপিনি। রমেন, তুই পালিয়ে যা।

রমেন। আর উপায় নেই মাসীমা, সদর দরোজায় তালা বন্ধ করে গেচেন।

সুরবালা। তাহলে কি করব তা যে ভেবে পাচ্ছি নে। হে হরি, হে মধুসূদন, এর একটা বিহিত কর।

রমেন। এক উপায় আছে মাসীমা। মেসোমশায় ফিরে এলে ওঁকে এই ঘরে বন্ধ করে পালিয়ে যাব।

সুরবালা। পালালে চলবে না বাবা, একবার নেপাল ডাক্তারকে ডাকতে হবে, ওঁকে দেখে একটা ওষুধ দেবে।

(উন্মাদের ভঙ্গীতে অনুকূল ঘরের মধ্যে আসিলেন)

অনুকূল। এই যে সবাই আছে। কোনো পুরুৎ রাজী হল না, বলে তুমি পাগল। আমিই বিয়ে দেব। ডাকত বিলুকে। বিলু—বিলু—

সুরবালা। সে কি গো, এখুনি ?

অনুকূল। এখুনি। ডাক বিলুকে—বিলু, বিলু—

সুরবালা। কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ গো? রমেন তো ঘরের ছেলে, সে ত পালাচ্ছে না। তুমি একটু শোও, সুস্থ হও, পরে বিয়ে দিলেই হবে। তখন থেকে কেবল দৌড়দৌড়ি করচ। রমেন, যাও ত বাবা একবার নেপাল ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এস ত।

অনুকূল। ন্যাপলাকে কেন ডাকবে শুনি? আমার মাথার রোগ হয়েচে? বটে রে—(অনুকূল সুরোকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, সুরো সভয়ে পিছু হাটিয়া গেলেন)

সুরবালা। হ্যাঁ, একি, এমন তো কথনো করনা, আজ তোমার হয়েচে কি? আজ তোমার কি হয়েচে গো, কি হয়েচে?

অনুকূল। সত্যিই আজ আমার কি যেন হচ্ছে মাথার মধ্যে সুরো। আমি বোধ হয় পাগল হয়েই যাচ্ছি। (সহসা উত্তেজিত স্বরে) না, না, না—এখুনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর দেরী নয়, এখুনি।

(অনুকূলের উন্মাদ লম্ফঝম্প দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ও রমেন উভয়েই দরোজার দিকে দৌড়িয়া গেলেন)

রমেন। মাসীমা, একটিবার বাইরে আসুন ত—

(এই বলিয়া সুরবালার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন ও যাইবার সময় ঘরের বাহির হইতে দরোজা বন্ধ করিয়া গেলেন। অনুকূল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ দরোজার দিকে দৌড়াইলেন)

অনুকূল। এই কোথা যাচ্ছিস্ তোরা? পালাচ্ছিস্? হবে না, সে হবে না, হবে না। যাঃ চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, আমায় ঘরের মধ্যে বন্ধ করে গেছে। দরোজা খোল, দরোজা খোল। সুরো, তোমার পায়ে পড়ি দরোজা খোল। কই খুললে না ত দরোজা! (মাথায় দুই হাত চাপিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন) যাঃ সব গোলমাল হয়ে গেল। কি গোলমাল হয়ে গেল বলত? ঠিক মনে করতে পারচি না। এ—এরা সবাই কারা? এই যে সরু সরু ঠ্যাং, কালো কালো কঙ্কাল। (কাল্পনিক কোনো বিভীষিকা দেখিয়া প্রাণভয়ে ঘরের এককোণে ছুটিয়া পলাইলেন) সুরো, তুমি বাঁচাও, আমায় একা ফেলে যেও না। (কিছুক্ষণের জন্য ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন, কোনও জ্ঞানের লক্ষণ পাওয়া গেল না। পরে ধীরে ধীরে উঠিলেন, ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দৃষ্টি সম্পূর্ণ উন্মাদের দৃষ্টি) এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ দিচ্ছিল দেওয়াল। কি রে বেটা দেওয়াল, তুই বলত এ বিয়ে ভাল নয়? না বলবার সাধ্য কি তোর। নিশ্চয় ভাল। (দেওয়ালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন) ওহে ভায়া জানালা, তুমি ত এতগুলি গরাদ নিয়ে অনেকদিন বসবাস করচ, এমন বিয়ে আর দেখেচ কখনো? (ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নিজমনে কি বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই পুরানো আলমারিতে মাথা ঠুকিয়া গেল) উঃ, বাপরে, কে আমার মাথায় মারল রে! তুই! ওরে সৃষ্টিছাড়া, হতচ্ছাড়া আলমারি, দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে মজা। (আলমারিতে লাথি মারিতে লাগিলেন। আলমারির দরোজা খুলিয়া গেল, দেখা গেল তাহার ভিতর ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি, পুরাণো কতকগুলি বই, একটি ছেঁড়া তুলা বাহির করা বালিশ, কতকগুলি শিশিবোতল প্রভৃতি রহিয়াছে। অনুকূল সেই গুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, হঠাৎ একটা শিশি হাতে লইয়া লেবল পড়িয়া দেখিলেন) বুকের মালিষ! আমার বুকে যে জ্বালা এতে কি তা ভাল হবে? দেখি এর কত গুণ। (শিশি হইতে খানিকটা মালিষ লইয়া নিজের বুকে মালিষ করিতে লাগিলেন) কই কিছুই তো হল না। (লেবল পড়িতে লাগিলেন) বিষ! বিষকে আমি কি ডরাই। কন্যাদায়ের যে বিষ পান করেচি তার কাছে এ বিষ ত অমৃত। কথায় বলে বিষে বিষক্ষয়, দেখি ত একবার পরখ করে। (শিশির সমস্ত মালিষটা পান করিয়া ফেলিলেন) বিষে বিষক্ষয়। কেমন জব্দ।—যাক বিয়েটা ত হয়ে গেল, এবার নিশ্চিন্ত। কিন্তু বুকের জ্বালাটা ত কমল না, বিয়ে হল, তবু বুকের জ্বালা যায় না কেন? বরং বাড়চে যে! (বিকৃত কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন) বিলু, বিলু, একটু জল।

(বন্ধ দরোজার পিছন হইতে বিলুর স্বর আসিল—যাই বাবা।)

(বিলু জলের গ্লাশ হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন)

অনুকূল। (বিকৃত কণ্ঠে) এ কি বিলু, তোর মাথায় সিঁদুর নেই কেন? তোর না বিয়ে হয়েচে?

বিলু। বাবা, তোমার গলার স্বর এমন শোনাচ্ছে কেন ? তোমার হাতে ওটা কিসের শিশি ? দেখি। (শিশি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন) খেয়েছ নাকি ?

(অনুকূল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—সবটা খেয়ে ফেলেছি কিছু ছাড়িনি। বুকের ওষুধ ওটা বুকের ভেতর গিয়ে কাজ করবে।) একি করলে বাবা, বাবা, বাবা, আমার বেচারী বাবা। আমার জন্যে তোমায় বিষ খেতে হল। ওমা, মা, শিগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবা বিষ খেয়েছেন।

(সুরবালা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন)

সুরবালা। এ্যাঁ, সে কি গো, সে কি গো। সত্যি বিষ খেয়েছ ? বল, কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে। বল, বল, ওগো বল।

(অনুকূল আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না ; দেওয়ালে হেলান দিলেন। ক্রমে তাঁহার অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সুরবালা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন)

অনুকূল। ওঠো ওঠো সুরো ওঠো, ধুলায় কেন বসিয়া ?

(এই কথাটাই অনুকূল বারংবার বলিতে লাগিলেন, ক্রমে কথা আর শোনা গেল না, শুধু ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেহ অসাড় নিস্পন্দ হইয়া গেল, চোখ দুটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুরবালা ও বিলু কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া অল্পক্ষণ পরেই আবার উঠিল। এই সামান্য অন্তরালে আঠারো বৎসরের ব্যবধান সূচিত হইবে। দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হইল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যখন যবনিকা উঠিল তখন দেখা গেল অনুকূলের সে গৃহের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে, সুদৃশ্য টেবিল চেয়ার ছবিতে আলমারিতে ঘরটা পরিপূর্ণ ; জানালায় ফুলের টব, দরোজায় পরদা, ঘরের মধ্যে রেডিও বাজিতেছে। যন্ত্রসঙ্গীতের তাড়নায় সমস্ত ঘরখানি প্রকম্পিত। গৃহস্বামী মনোরঞ্জন চৌধুরী চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছেন, চুলে পাক ধরিয়াছে। সোফায় বসিয়া দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন। তাঁহার স্ত্রী রমা দেবী সেলাই করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে অল্প বয়স্কা দেখায়। মুখচোখে বুদ্ধির দীপ্তি, অসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে রূপের চিহ্ন অপেক্ষা দাহিকাশক্তিই বেশী মনে হয়। ঘরের অপরাংশে রাস্তাটিও পরিবর্ত্তনের হাত এড়ায় নাই। পূর্ব্বে যেখানে কেরোসিনের আলো ছিল, এখন সেখানে বিজলী বাতী হইয়াছে।]

মনোরঞ্জন। যন্ত্ররাজ্যের গর্জ্জনও যেমন, তার গুঞ্জনও তেমনি।

রমা। কেন, আজ ত বাজছে বেশ। ভীমুনের ভাষায় "রেডিয়মটী হুজুর বাজছেন্ পোক্কের"।

মনোরঞ্জন। রেডিয়ামই বটে। বস্তুটি রঞ্জন-রশ্মিতে পরিপূর্ণ। এখানে একমাত্র আমিই মনোরঞ্জন। দ্বিতীয় রঞ্জনের আবির্ভাবে গৃহমঞ্চ ক্রমে যুদ্ধমঞ্চে পরিণত হব হব হচ্ছে।

রমা। আচ্ছা আচ্ছা থামাচ্ছি। (রেডিও বন্ধ করিলেন) বীরেন্দ্রকেশরী, এই দারুণ গ্রীষ্মে আর যুদ্ধ করে গলদঘর্ম হয়ো না। বাঙালীর বীরত্ব স্ত্রীর ওপর ত যথেষ্টই ফলিয়েছ, আর তার প্রকাশেরও দরকার নেই। দেখ দিকি ঘরখানাকে আবার কেমন নূতন করে সাজিয়েছি। পরদা, কার্পেট সব বদলেছি। একই জিনিষ ক্রমাগত দেখলে চোখে বাজে।

মনোরঞ্জন। তাই থাকো (থাকো), ঘরের সাজ সব পরিবর্তন করে ফেল। কিন্তু মানুষটাকে আর পরিবর্তন করতে পার না।

রমা। হুঁ, আমি এত খেটে খুটে তোমার হাউস-কিপিং করি, তুমি কোনোদিন ভুলে ত একটা প্রশংসার কথা বল না, উল্টে খোঁটা দাও।

মনোরঞ্জন। তোমার পরিবর্তনপ্রয়াসী মনের আমি কি করে তারিফ করি বল ?

(রমা রাগ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন)

মনোরঞ্জন। কি রমা, রাগ করলে বুঝি ?

রমা। ভুলে গেছ না ? ছিল একটা ভূতের বাড়ী, তাকে ঘসে মেজে ঝেড়ে মুছে—

মনোরঞ্জন। ভূতের বাড়ী তোমায় কে বললে ?

রমা। আহা এত বছর এখানে বাস করেও একথা যেন লুকানো থাকে। এ বাড়ীতেই ত কে একজন পাগল হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

মনোরঞ্জন। ও সব উলিখুরী কথায় বিশ্বাস কোরো না।

রমা। থাক। একথা যে সত্যি তা তুমিও জান, আমিও জানি। জান না তুমি? দেখতে পাওনি কোনোদিন কিছু?

(উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন)

মনোরঞ্জন। সত্যি তোমার ঘর সাজাবার রুচি আছে।

রমা। থাক, আর সুখ্যাতির দরকার নেই। তোমার আজকাল আমার কথা মনেই থাকে না, সে কি আমি জানি না ভেবেছ?

মনোরঞ্জন। সেটা উভয়তঃ। সত্যি করে বলত রমা, মনে মনে একটা অবসাদ আসেনি?

রমা। কখনো তুমি আমাকে মিষ্টি করে একটা কথা বল না।

মনোরঞ্জন। বলতে চাই, কিন্তু বলবার আগেই তার প্রয়োজনীয়তা ফুরায়।

রমা। তাত ফুরাবেই। মনে কর ওটা ত স্ত্রী, ওকে আবার মিষ্টি কথা বলে কথার বাজে খরচ করা কেন?

মনোরঞ্জন। সেটাও উভয়তঃ। নতুন করে জয় করবার আগ্রহ যেখানে নেই, কথার প্রয়োজনও সেখানে নেই। যদি শুধু প্রণয়িনী হতে, বলতাম প্রতিদিনের প্রভাত কালে রমা ওগো রমণীয়া, যে লিপষ্টিক তোমার ওষ্ঠে তার রঙ মরুভূমির দিগন্তের প্রাতঃসূর্য্যের রঙ, যে অঞ্জন তোমার চক্ষে সে আছে ছড়িয়ে ওয়েসিশের কুঞ্জছায়ার নীচে, যে পাউডার তোমার কপোলে সে ঐ দিগন্তবিস্তারি সূর্য্যরশ্মির আভা। স্বামী না হয়ে যদি শুধু প্রণয়ী হতাম, একথা তোমার কাণে সুধা ঢালত। আমি বললে এ সব কথায় উন্মাদনা জাগে না, মুখস্থ নাটুকে কথা বলে মনে হয়। না রমা? (রমা নিরুত্তর রহিলেন) বিবাহের দ্বারা মানুষ যেই সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করবার প্রয়াস করেচে অমনি তার ভাবের জোয়ারে ভাঁটা এসেচে। রামসীতাকে বাদ দিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা কবিকে এত মুগ্ধ করেচে কেন বলতে পার?

রমা। অতঃপর তুমি কি বল, বিয়েটাই উঠিয়ে দেওয়া উচিত?

মনোরঞ্জন। অতঃপর আমি বলি রেডিওটাই চালিয়ে দাও। প্রচুর বাদ্যভাণ্ডের তলে ভাবনা যত ডুবে যাক।

রমা। ভাবনাকে ডোবালেই কি সে ডোবে?

মনোরঞ্জন। একটা কিছু ত চাই। চণ্ডীদাসের যুগে একে এড়াবার জন্যে মানুষ আকণ্ঠ পান করত ধর্ম, মাইকেলের যুগে মদ, আর এ যুগে যন্ত্র ঘর্ঘর, এরোপ্লেনে, *Jazz*এ আর রেডিওতে ডোবাও, ডোবাও তোমার ভাবনাকে। ভেবেছ কি মরেছ। অতএব চলুক, চলুক তোমার ঐ রেডিও।

রমা। তোমার কথাগুলার মধ্যে বারো আনা নাটুকেপণা, চার আনা ছেলেমানুষী। তোমরা পুরুষরা জীবনটাকে নাট্যমঞ্চে পরিণত করতে স্বভাবতঃই ভালবাস, তাই উত্যক্ত হলেই তোমাদের কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে শিশির ভাদুড়ী চাল, আর তোমরা হলে চিরশিশু।

মনোরঞ্জন। চিরশিশু বলে তুমি আমার সৌজন্য গর্ব্বকে পরিতৃপ্ত করছ?

রমা। না, সত্যি কথাই বলছি। অল্পতেই তোমরা সন্তুষ্ট, সেই অল্পটুকু জোর করে দখল করবার জন্যে আমাদের মনের মাঝে অনেক সময় কী দাগ যে দাও তা তোমরা জান না। সেই অল্পটুকু না পেলে তোমরা হও বিভ্রান্ত, হয়ত খুন করতে ছোট, হয়ত বা সংসার ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে যাও। কিন্তু পেলে বেশ নিশ্চিন্ত, পৃথিবীতে আর সকলের অস্তিত্বই ভুলে যাও যতক্ষণ না আবার সেই ক্ষুদ্র প্রয়োজন জাগে। তোমাদের যত কবিত্ব, যত গান, যত কথা, যত উচ্ছ্বাস সবই সেই অল্পটুকু ঘিরে ঘিরে। তাইতেই তারা পর্য্যবসিত। মেয়েদের মনের খবর তোমরা রাখও না, পাওও না। কোন অতলতলে রয়েছে তাদের মন, কিসের দোলা লেগে কী তরঙ্গ ওঠে জেগে স্বভাবশিশু চপল তোমরা তা জানবে কি করে? সৃষ্টির ক্রমবিকাশে তোমরা মেয়েদের অনেক পিছনে পড়ে আছ—তোমরা আছ আজও সেই আদিম গুহাবাসীর যুগে। তাই তোমাদের আছে দেহ, আমাদের আছে মন।

মনোরঞ্জন। আমরা পুরুষরা এক স্থবির স্বর্গলোকে বাস করি আর ভাবি আমরা প্রেম দিয়ে তোমাদের চিত্ত জয় করেছি।

রমা। আর আমরা মেয়েরাও যা কিছু কাম্য সব পেয়েচি ভেবে আর এক নিষ্ফল স্বর্গলোকে বাস করি।

মনোরঞ্জন। যা বলেছ রমা। এ হল বিবাহিতের চির অশান্তি। কিছুদিন ছেড়ে থাকা দরকার। যাও না কোথাও ঘুরে এস না।

রমা। যাব আর কোথা। এম্‌নি করেই আঠারো বছর কেটেচে, আর কটা বছরই বা বাকী। তখন একেবারেই যাবো।

মনোরঞ্জন। (খানিক অন্যমনস্ক রহিয়া বলিলেন) আঠারো বছর? ঠিকই ত। মীনার বয়স যে পনের হল।

রমা। বিবাহ সম্বন্ধে তোমার এ মৌলিক মতবাদ কি মীনার ওপরও খাটাবে? তার বিয়ে টিয়ে দেবে না?

মনোরঞ্জন। কেন, মীনার বিয়ে ত আমি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি—নরেশের সঙ্গে।

রমা। নরেশের সঙ্গে?

মনোরঞ্জন। চমকালে যে! নরেশ ওর মাস্তুতো ভাই হয় তাই? ওসব কুসংস্কারগুলো এখনো গেল না? একটু ভেবে দেখ, এমন সুপাত্র আর পাবে না। কি—চুপ করে রইলে যে? কী ভাবছ?

রমা। ভাবছি কি আশ্চর্য্য, নরেশের কথা আমারো মনে এসেছিল। তোমাকে বলিনি পাছে তুমি আপত্তি কর।

মনোরঞ্জন। তবেই দেখ, great minds think alike শুভস্য শীঘ্রং, তুমি তোমার সেলাইটি আপাততঃ একটু স্থগিত রেখে তোমার দিদিকে লিখে দাও, যাতে বিয়েটা শ্রাবণ মাসের মধ্যেই হয়ে যায়।

রমা। দিদিকে ত জান। অমন প্রখরা একগুঁয়ে মেয়ে আর হয় না। যদি বেঁকে বসেন?

মনোরঞ্জন। তুমি লিখেই দেখ না।

রমা। তাছাড়া শ্রাবণের মধ্যেই বা হবে কি করে? মুখের কথা খসালেই তো আর হয় না, যাকে যোগাড় যন্ত্র করতে হয় সেই জানে। তোমার আর কি, তুমি নিশ্চিন্তে পা নাচিয়ে খবরের কাগজ পড়বে।

মনোরঞ্জন। খুব হবে, খুব হবে। তুমি লিখেই দাও না।

(রমা উঠিয়া লিখিবার টেবিলে বসিয়া চিঠি লিখিতে লাগিলেন)

মনোরঞ্জন। আর দেখ, রেডিওটা চালিয়েই দাও।

(রমা রেডিও চালাইয়া দিলেন। আবার উচ্চৈঃশ্রবার হ্রেষাধ্বনি আরম্ভ হইল। রমা চিঠি লিখিতে লাগিলেন, মনোরঞ্জন খবরের কাগজের পাতা উল্টাইলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(সেই একই দৃশ্য। মনোরঞ্জনের বসিবার ঘর ও তাহার পাশের রাস্তা। ঘরের মধ্যে মনোরঞ্জন বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন, রাস্তায় ও পাড়ার সুরেন, নগেন, শৈল, নিখিল প্রভৃতি চারি পাঁচজন যুবক দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। সুরেন ইহাদের চেয়ে বয়সে বড়।)

সুরেন। তা বলে তোরা একটা দাঙ্গা বাধিয়ে বসিস নে যেন। মনোরঞ্জন বাবু শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাঁকে বুঝিয়ে বললেই যথেষ্ট হবে।

নগেন। হুঁ, শিক্ষিত ভদ্রলোক। মাস্তুতো ভাইবোনে বিয়ে দেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক?

সুরেন। বার বার তিনবার আই, এ, ফেল করে শিক্ষিতের প্রতি তোর একটা আক্রোশ এসেছে, তা আমি বুঝি রে বুঝি।

নগেন। হুঁ, বুঝি রে বুঝি!

শৈল। আমরা গিয়ে বলব হিন্দু সমাজের বুকের ওপর বসে—

নিখিল। বসে—তুমি যে এ অত্যাচার করবে—

শৈল। করবে—তা এ সমাজ সইবে না।

নিখিল। যে সমাজ কত শতাব্দীর কত বিপদে—

শৈল। কত ঝঞ্ঝাবাতে—

নিখিল। হাঁ হাঁ, কত ঝঞ্ঝাবাতে গিরি কন্দরের মত অটুট—

শৈল। গিরিকন্দর হয় না, কন্দর মানে গুহা।

নিখিল। না, গিরিকন্দর হয় না, যদিও গিরিকন্দর শোনায় ভাল। গিরিচূড়ার মত অটুট—যার বিরাট শক্তি—

শৈল। নিখিল, তোমার সব কথার মধ্যেই একটা বিরাট থাকা চাই বিরাট কথাটা বাদ দাও—বল প্রচণ্ড শক্তি—

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫]　　হরপার্ব্বতী　　প্রাচীন চিত্র।

সুরেন। আরে তোরা কচ্চিস্ কি, এঁ্যা, এসব কি বলচিস, আমি যে তার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারচি না।

নিখিল মনোরঞ্জন বাবুকে যেয়ে আমরা কি বলব তারই একটা রিহার্সাল দিয়ে নিচ্চি।

সুরেন। ওঃ রিহার্সাল দিয়ে নিচ্চিস। নিখিল।

নিখিল। কি?

সুরেন। শৈল।

শৈল। কি?

সুরেন। ভারি যে তোরা হিন্দুধর্মের বড়াই করচিস, তোরা মুর্গী খাস?

নিখিল। কই, না!

শৈল। মানে, ইয়ে

সুরেন। হয়েচে, হয়েচে, তোরা মুর্গী খাস। মনোরঞ্জন বাবু যদি বলেন, বাপু সকল হে, তোমরা মুর্গীখোর, তোমরা আবার কিসের হিন্দু, তখন কি বলবি?

শৈল। তাইত।

নগেন। তার চেয়ে তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? তাঁকে দিয়েই ঐ কথা বলাব। তিনি ত আর মুর্গী খান না।

সুরেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর নামেই তর্কালঙ্কার, কথা কইতে গেলেই তাঁর ত্রিকচ্ছ খুলে গিয়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে যান। তাঁকে সঙ্গে নিলে তোদের ল্যাটা বাড়বে বই কমবে না।

শৈল। না, না, ও সব তর্কালঙ্কার টঙ্কার নয়। যেমন রিহার্স্যাল চলছিল তেমনি চলুক। একজনকে মনোরঞ্জন বাবু হওয়া দরকার। এই নগেন, তুই এইখানে এসে দাঁড়া, তুই যেন হলি মনোরঞ্জন বাবু, বুঝেছিস ত? আমরা রিহার্স্যাল করচি কি বলব।

নগেন। রেখে দাও তোমাদের রিহার্স্যাল। আমি ওসব বুঝি না। মনোরঞ্জন বাবু কথা যদি না শোনে দু'ঘা পিটিয়ে দিয়ে আসব।

সুরেন। দেখ্ নগেন, তোর নিজের পৃষ্ঠে লাঠ্যৌষধি খুব আশু ফলপ্রদ, তাই বলে সবাই ত তোর সমশ্রেণীর নয়।

শৈল। না, না, নগেন, তুই এইখানে দাঁড়া। তুই হলি মনোরঞ্জন বাবু। এখন বল নিখিল তুমি কি বলবে—

নিখিল। (নগেনকে লক্ষ্য করিয়া) দেখুন মনোরঞ্জন বাবু, আপনার স্পর্দ্ধা ক্রমে সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেচে—

(ইতিমধ্যে একজন বর্ষীয়সী মহিলা ঘোড়াগাড়ী হইতে নামিয়া রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন ও যুবকদের কথা শুনিতে লাগিলেন)

বল না, শৈল, এবার তুমি বল—

শৈল। দেখুন মনোরঞ্জন বাবু, আপনি ও পন্থা ছেড়ে দিন—

নিখিল। দেখুন মনোরঞ্জন বাবু (আস্ফালন)

শৈল। দেখুন মনোরঞ্জন বাবু (আস্ফালন)

ভদ্রমহিলা। আ মরণ, এ ড্যাকরারা করে কি গো! মনোরঞ্জন বাবু কাকে বলিস্? ও কেন মনোরঞ্জন হবে! সে আমার ভগ্নীপতি হয়, তাকে আমি চিনি না। তোরা মস্করা পেয়েচিস, না? মাধী বামনীকে এখনো চিনিস্ নে। খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব।

নগেন। রাগ করবেন না ঠাকরুণ, একটা কথা জিগেস করতে দিন। আপনারই ছেলের সঙ্গে কি মনোরঞ্জন বাবু মেয়ের বিয়ের ঠিক করেচেন?

(একথা শুনিয়া ভদ্রমহিলা টঙ্কৃত ধনুর ছিলার মত ক্রোধে থন্‌থন্ করিয়া বাজিয়া উঠিলেন)

ভদ্রমহিলা। কোন্ হাড়হাবাতে মুখপোড়া একথা বলে র‍্যা—আমি আমার সোনার চাঁদ নরেশের সঙ্গে তার মাস্তুতো বোনের বিয়ের সম্বন্ধ করেচি! খ্যাংরা মারি তোর—

(বলা বাহুল্য নগেন সভয়ে পিছু হটিয়া গেল)

সুরেন। রাগ করবেন না মা, নগেন কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে নি। এ বিয়েতে আপনার মত নেই তা বুঝতে পেরেচি।

মহিলা। মত্? খ্যাংরা মারি মতের মাথায়। আমি এই যে সেই ঝালকাটি নিশ্চিন্দিপুর থেকে ছুটে এসেচি সে কি মত দেবার জন্যে। কোথায় গেল সেই মুখপোড়া, সেই নগেন মুখপোড়া গেল কোথায়?

নগেন। (অন্য সকলকে) ওহে, চল এই বেলা সরে পড়। এ মাগী আর কাকেও আস্ত রাখবে না।

মহিলা। যাচ্ছি আমি মনোরঞ্জনের কাছে। অতি বড় বিদ্বান, তার টাকার গরমে সে চোখে কাণে দেখতে পাচ্ছে

না, তাই আমায় এমন করে অপমান করেচে। চেনেনি এখনো ঝালকাটি নিশ্চিন্দিপুরের মাধী বামনীকে—

(মনোরঞ্জনের গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন)

শৈল। দাঁড়ান, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—আপনি একা বিধবা মেয়েমানুষ—

মহিলা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কি বললি একা বিধবা মেয়েমানুষ। তোদের মত পঁচিসটা ধিনিকেষ্ট মিনষেকে আমি এই এক হাতে চিট্ করে দিতে পারি, দেখবি পরখ করে, আয়না কাছে—

(মুহূর্ত মধ্যে শৈল তিন হাত পিছাইয়া গেল)

নগেন। না, না, ওঁকে যেতে দাও, যেতে দাও—উনি একাই পারবেন।

(ভদ্রমহিলা মহাক্রোধে মনোরঞ্জনের বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন)

সুরেন। ঐ শোন, বাড়ীর ভেতর কুরুক্ষেত্র বেধেছে।

(যুবকেরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল)

(নেপথ্যে মাধী বামনী অর্থাৎ মাধবী দেবীর কাঁসরের মত গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতে লাগিল—কথা সেই একই—"খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব।")

নেপথ্যে রমা। দিদি তুমি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাও। উনি বাইরের ঘরে বসে আছেন।

মাধবী। একথা জেনে রেখে দিস রমা, মাধী বামনী দুনিয়াতে কাকেও ভয় করে না। কোথায় মনোরঞ্জন, দেবই ত তাকে দুকথা শুনিয়ে। দেব না! ভয় করব নাকি!

(বলিতে বলিতে রমা ও মাধবী দেবী মনোরঞ্জনের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মনোরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন—)

মনোরঞ্জন। এই যে দিদি আসুন আসুন। আপনি যে আসবেন তা রাস্তা থেকেই জানিয়ে দিয়েচেন। দিদি যে এসেচে মোর ভবনে, তাই রব উঠেচে ভুবনে।

রমা। দিদি ত ভীষণ রেগে এসেচেন আমার চিঠি পেয়ে। বলচেন এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করবেন না।

মনোরঞ্জন। রেগেচেন যে তার আভাস বহুক্ষণ পেয়েচি। তবে একটা কথা বলি দিদি, একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখুন, এতে কোনো অন্যায় নেই। আর একান্তই যদি আপনার অমত হয়, বেশত, তাহলে বিয়ে হবে না। এর পরে ত কথা নেই। কি দিদি চুপ করে আছেন যে?

(মাধবী দেবীর চেহারা, গলার স্বর এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, একটু আগে যে এমন উত্তেজিত হইয়াছিলেন তাহা আর বুঝিবার উপায় নাই)

মাধবী। কি জান ভাই, রমার চিঠিটা পেয়ে বড় রেগে উঠেছিলাম। কথাটা তখন ভাল করে ভেবে দেখিনি বোধ হচ্ছে। নরেশের সঙ্গে মীনার বিয়ে, মন্দ শোনাচ্চে না ত। মন্দ কেন, ভালই। কথাটা ভাল করে বুঝিনি ভাই, তাই অমন রেগে উঠেছিলুম। আমার কি আর মনের ঠিক আছে ভাই, মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে মানুষ, তাতে রোগে তাপে—

রমা। দিদি, দিদি! তোমার একি আশ্চর্য্য পরিবর্তন। হ্যাঁগা, হ্যাঁগা, দিদির মন হঠাৎ অমন বদলে গেল কেন এ ঘরে এসে।

মাধবী। অবাক হস নি রমা। মনোরঞ্জন বেশ ভাল করে কথাটা বুঝিয়ে দিলেন কিনা, তাই বুঝতে পারলুম। মুখ্যু মানুষ, তাতে রোগে তাপে—

রমা। হ্যাঁগা, একি সেই এ ঘরে যে থাকে তারই—

মনোরঞ্জন। ছিঃ রমা ছিঃ, মনকে অমনভাবে কল্পনার পথে ছেড়ে দিতে নেই। যাও দিদিকে নিয়ে গিয়ে কাপড় চোপড় ছাড়াও। দিদি আপনি নরেশকে আসতে লিখে দিন, আমি বিয়ের একটা দিন দেখে ফেলি। যান আর দেরী করবেন না। যাও রমা, দিদিকে নিয়ে যাও।

(রমা ও মাধবী চলিয়া গেলেন, মনোরঞ্জন লিখিবার টেবিলে ফিরিয়া গিয়া পাঁজী দেখিতে বসিলেন)

(বাহিরে রাস্তায় যুবকেরা ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে)

শৈল। কই আর যে কারো গলাই শোনা যাচ্ছে না। হল কি? প্রথমটা ত বেশ আরম্ভ হয়েছিল, হঠাৎ সব থেমে থুমে গেল যে!

নগেন। বুড়ীটাকে ওরা খুন করে ফেলেছে।

নিখিল। তা আর করতে হয় না। এমনিতেই বুড়ী

চীৎকারে পাড়া মাথায় করে, খুন করতে এলে এমন চীৎকার করত যে হনলুলু থেকে লোক ছুটে আসত।

নগেন। তা হলে ওরা কৌশল করে বুড়ীর হাত পা বেঁধে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে বন্ধ করে রেখে দিয়েচে।

শৈল। সম্ভব।

নিখিল। সম্ভব।

নগেন। চল তবে সবাই আমরা গিয়ে বুড়ীকে উদ্ধার করি।

(সকলে মালকোচা মারিয়া আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল)

শৈল। ওহে নিখিল, তোমার ও চটি ফটফটিয়ে যাওয়া চলবে না। চটি জুতাটা তুমি বরং এইখানে খুলে রেখে দাও।

নিখিল। হ্যাঁ, তারপর-ওটা চুরি যাক আর কি। তার চেয়ে সুরেন দাদা তোমার যেয়ে কাজ নেই, তুমি বরং আমার চটি আগলাও।

সুরেন। আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোর চটি আগলাব।

শৈল। না সুরেন দা, আমাদের একজনকে বাইরে থাকতেই হবে—আমরা যদি না ফিরি, যদি ঐ বুড়ীর মতই দুর্দ্দশা ঘটে—তখন তুমি আছ।

সুরেন। আচ্ছা তা তোরা বেশী দেরী করিস নে।

নগেন। চল সবাই তৈরী হয়ে এক সঙ্গে পা ফেলে চল। ভয় কি।

নগেন, শৈল ও নিখিল পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া গান ধরিল—

বুড়ী উদ্ধারে চল গো, চড় চড় জয় রথে তব—

সুরেন নিখিলের পরিত্যক্ত চটিজুতা হস্তে লইয়া গান ধরিল—

আমি চটিজুতা হাতে আশা পথ চেয়ে রব।

(সুরেন রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল)

(নগেন, শৈল ও নিখিল সদর দরোজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। নেপথ্য হইতে তাহারা ডাক দিতে লাগিল, মনোরঞ্জন বাবু, মনোরঞ্জন বাবু—)

মনোরঞ্জন। কে হে তোমরা?

নেপথ্যে। দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা মানুষ।

মনোরঞ্জন। যাক্, সন্দেহ ভঞ্জন হল, এখন ভেতরে এস।

নেপথ্যে। চালাকি রাখুন মশায়, লাস বার করুন।

মনোরঞ্জন। লাস, কিসের লাস।

নেপথ্যে। সেই ঝালকাটি নিশ্চিন্দিপুরের ঠাকরুণটিকে কোথায় লুকিয়েছেন—জীবিত কি মৃত বার করে দিন।

("বার করুন," "বার করুন" বলিতে বলিতে যুবকেরা মনোরঞ্জনের গৃহে প্রবেশ করিল)

মনোরঞ্জন। আরে তোমরা তো এ পাড়ারই সব ছেলে। তা বার করব কি? (যুবকের নিরুত্তর হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল) তা তোমরা এমন মালকোচা বেঁধে আস্তিন গুটিয়ে এসেছ কেন? যুদ্ধ করবে নাকি? (যুবকেরা হাঁ হাঁ করিয়া পরস্পরের আস্তিন ও মালকোচা খুলিয়া দিতে সাহায্য করিল) ব্যাপারটা কি?

নিখিল। কিছু নয়, এমনি একবার এই আপনার সঙ্গে এই—

শৈল। এই দেখা করতে এলুম আর কি স্যর।

মনোরঞ্জন। এমনি দেখা করতে এলে! বুঝেচি, তোমরা বোধ হয় এ বিয়ের খবর শুনেচ তাই প্রতিবাদ করতে এসেচ, না?

শৈল। প্রতিবাদ ঠিক নয়, প্রতিবাদ ঠিক নয়।

নগেন। প্রতিবাদ করতেই এসেছিলাম, তবে সে না বুঝে। এঘরে এসেই সেকথা বুঝলুম। আমি স্পষ্ট কথাই বলে ফেললুম। আমার তেমন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, আমি তিনবার আই, এ, ফেল করে ফেলেচি স্যর।

মনোরঞ্জন। তিনবার আই, এ, ফেল করে ফেলেচ? বাহাদুর ছেলে, তোমার ধৈর্য্য আছে।

নিখিল। পণপ্রথা ঘোচাতে হলে এমনি বিয়ের দরকার আছে—এখন ভেবে দেখলুম।

শৈল। অন্য সমাজেও ত এমন বিয়ে চলে, আমাদের সমাজেই বা তা চলবে না কেন? এখন বুঝে দেখলুম।

মনোরঞ্জন। শুনেচি পাড়ায় এই নিয়ে ভারী গণ্ডগোল হচ্চে।

নিখিল। লোকে ত আর তলিয়ে দেখেনি ব্যাপারটা কি তাই গণ্ডগোল করচে। তা আমরা এখন আসি তাহলে। চল হে চল।

(যুবকেরা প্রস্থানোদ্যত হইল। হঠাৎ শৈল ফিরিয়া কহিল—)

শৈল। আর দেখুন স্যর আমরা আপনার পাড়ার ছেলে—যদি কোনো দরকার হয়, আমাদের ডাকতে সঙ্কোচ করবেন না। এই ধরুন যেমন পরিবেশন করা—

নিখিল। কি ধরুন লোকজনদের অভ্যর্থনা করা—

নগেন। কি ধরুন সাত পাক দেওয়া—

মনোরঞ্জন। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমাদের সবাইএর নিমন্ত্রণ রইল। এসো তোমরা।

(যুবকেরা বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। মনোরঞ্জন আবার তাঁহার লিখিবার টেবিলে ফিরিয়া গেলেন)

সুরেন। কই হে বুড়ি কোথা ?

শৈল। কোন বুড়ী ?

সুরেন। সেই যে নিশ্চিন্দিপুরের ঠাকরুন্।

নিখিল। ঐ যাঃ, সে কথা একদম ভুলে গেছলাম।

সুরেন। সে কি!

শৈল। সে আর কি, সব ঘুলিয়ে গেল।

নগেন। হাঁ সব ঘুলিয়ে গেল।

সুরেন। এই নাও নিখিল তোমার চটি জুতো। মিথ্যাই আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে। জানতাম তোমাদের দ্বারা হবে না।

শৈল। জান সুরেন দা, ও বাড়ীর ঐ ঘরে—যাদু—যাদু আছে।

সুরেন। বলিস কি রে।

চতুর্থ দৃশ্য

[সেই একই দৃশ্য। মনোরঞ্জনের বাটীর অভ্যন্তর হইতে ঘন ঘন শাঁখ বাজিতেছে, বিবাহ বাড়ীর গোলমাল শোনা যাইতেছে। বসিবার গৃহ হইতে টেবিল, চেয়ার আলমারি প্রভৃতি সব সরান হইয়াছে—সেখানে ফরাস পাতিয়া চাদর বিছাইয়া তাকিয়া দেখা বরাসন প্রস্তুত হইয়াছে—আসনের পিছনে দেয়ালে লতাপাতা ফুল দিয়া সাজান হইয়াছে। আসনের উপর চুপটী করিয়া বর বসিয়া আছে। নানা প্রকারের লোক ঘরের ভিতর আনাগোনা করিতেছে। বাড়ীর ভিতর হইতে মনোরঞ্জনের গলার স্বর শোনা যাইতেছে—'ভীখণ, ওরে ভীখণ, তামাক দে পান নিয়ে আয়"—ইত্যাদি। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় বরাসন যেদিকে তাহার বিপরীত দিকে গৃহের মেঝের উপর বিচিত্র আকারের এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রাশি রাশি লাঠি, ছড়ি, বেত স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। রাস্তা হইতে দলে দলে লোক উত্তেজিত ভাবে এ বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে লাঠিতে সজ্জিত হইয়া ঘরে ঢুকিতেছে, কিন্তু প্রবেশ মাত্র অলৌকিক ভাবে তাহাদের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

এমনি একদল লোক হাঁকডাঁক করিয়া লাঠি ছড়ি ঘুরাইয়া রাস্তা হইতে ঘরে প্রবেশ করিল। মনোরঞ্জন আসিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।]

মনোরঞ্জন। আপনারা আর এক দল বুঝি? বিয়ে ভেঙে দিতে এসেচেন লাঠি সোঁটা নিয়ে। সকাল থেকেই ত এমনি চলছে। এবার যেন একটু এক ঘেয়ে হয়ে উঠচে। রাখুন ঐখানেই লাঠিগুলো রাখুন। আর আপনাদের কোন রাগ নেই ত? (সবাই 'না', 'না' বলিয়া লাঠিগুলি লাঠির স্তূপে নিক্ষেপ করিলেন) উঃ কত লাঠিই জমা হয়ে উঠল। আসুন আপনারা সবাই ভেতরে আসুন, খাবার তৈরী। না খেয়ে কিন্তু যেতে দেব না। ওরে ভীখন, ভীখন। (যোড় হাত করিয়া) যদি কিছু দোষ ত্রুটি হয়ে থাকে মাফ করবেন। আমি একলা লোক, পেরে উঠিনে। এখনো বিয়ের লগ্নের এক ঘণ্টা দেরী। নিজেরা একটু দেখে শুনে নেবেন দয়া করে, মনে করবেন এ আপনাদেরই গৃহ—

(আগন্তুকরা "হাঁ, হাঁ, তা কি, সে কি" প্রভৃতি আপ্যায়নের বাক্য বলিতে বলিতে মনোরঞ্জনের পিছু পিছু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।)

(বাড়ীর ভিতর হইতে বিবাহ বাড়ীর গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল—"এখানে লুচি দাও"—"মাছের তরকারি নিয়ে এস"—"ওরে ভীখন"—ইত্যাদি।

হঠাৎ বাড়ী কাঁপাইয়া সমস্ত শব্দকে ছাপাইয়া উঠিল এক দারুণ আর্ত্তনাদ—"সামলাও, সামলাও, ঘিয়ের কড়া জ্বলে উঠল—আগুন, আগুন, ওরে জল নিয়ে আয়, জল জল—ষ্টেজের ভিতর দিক হইতে আগুনের শিখা বাহিরের ঘর পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ধূম। ঘরের সমস্ত বাতি নিভিয়া গেল, কেবল মাঝে মাঝে

আগুনের শিখা জ্বলিতে লাগিল। বহুলোক প্রাণ ভয়ে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া পলাইতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া কেহ আর ঘরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না—সকলেই বলিয়া গেল—'হবে না, ঠিক হয়েছে।' ইত্যাদি।

কোলাহলের মধ্যে মাধবী দেবীর চীৎকার শোনা গেল—"ওরে আমার নরেশ রে—নরেশ রে—তুই কোথায় রে—"ইত্যাদি।

মাধবী দেবী বরবেশী নরেশকে লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন)

মাধবী। বেঁচে আছিস বাবা! লাগেনি ত কোথাও! (নরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না')। এঁ্যা, এতক্ষণে যেন আমার চমক ভাঙল! ওমা, কী লজ্জা, কী লজ্জা, আমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল গা! আমার না হয় তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ভীমরথি হয়েছে, তোরও ত বাছা খেয়াল করা উচিত ছিল।

নরেশ। তুমিই ত জোর করে আমায় আনালে মা। আসবার আগে ত কিছু জানতেও দাও নি।

মাধবী। যত নষ্টের মূল ঐ রমা। ঐ যে রমা আসচে। (রমা ও মীনা বাড়ীর ভিতর হইতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমার শাড়ীর স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে, শরীর অবসন্ন, মুখে শোকের চিহ্ন পরিস্ফুট। মীনার বধূবেশ মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সর্বাঙ্গে কালো ভূষার দাগ)। তোদের এ কী চেহারা হয়েচে রে!

রমা। আমাদের এ কী সর্বনাশ হল দিদি! উনি কোথায়, উনি কি এখনো ঐ আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। দিদি! (কাঁদিতে লাগিলেন)

মাধবী। তুই কাঁদিস নে রমা। ভগবান সব রক্ষা করবেন। চুপকর, কাঁদিস নি। তুই এই সর্বনাশই দেখচিস, আর একটা সর্বনাশের কথা ভাবচিস নে। ভাই বোনে যদি বিয়ে হয়ে যেত!

রমা। (জ্বলন্ত গৃহের পানে চাহিয়া ভয়ার্তকণ্ঠে কহিলেন) ও বাড়ীতে ভূত ছিল, ভূত। এক অতৃপ্ত আত্মা আমাদের কাঁধে ভর করেছিল এতদিন। আমি তাকে দেখেছি, দেখেছি।

মাধবী। থাম রমা, থাম। ভূত, বলিস কি রে, ভূত? আমার গা যে ছমছম্ করে উঠল রে। এখানে আর দাঁড়াব না। নরেশ, চল বাবা এখুনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল,—মীনা, আয় আয় আমার সঙ্গে। রমা তুইও আয়।

রমা। মীনাকে নিয়ে যাও দিদি। আমি ওঁকে না নিয়ে যাবো না।

(মাধবী নরেশ ও মীনা চলিয়া গেলেন)

(রমা হঠাৎ জ্বলন্ত আগুনের দিকে ছুটিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন)

রমা। ওগো, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি। (আগুনের ভিতর প্রায় পড়িয়া যাইতেছিলেন এমন সময় ভিতর হইতে মনোরঞ্জন আসিয়া রমাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং এক রকম কোলে করিয়াই তাঁহার অর্দ্ধচেতন দেহ রাস্তায় আনিলেন। মনোরঞ্জনের গায়ে আগুনের পোড়া পোড়া দাগ, নানাস্থানে কাটিয়া গিয়াছে, বসন ছিন্ন ও ঝুলে কালো)

মনোরঞ্জন। একি করছিলে তুমি রমা? অমন করে আগুনের দিকে ছুটে চলতে আছে?

রমা। তুমি এসেছ, আঃ বাঁচলুম। ভগবানকে প্রণাম করি।

মনোরঞ্জন। আগুনের হাত থেকে কিছুই বাঁচাতে পারলুম না রমা। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আমার চোখের সামনে।

রমা। তা যাকগে। তুমি বেঁচে আছ এই আমার যথেষ্ট।

মনোরঞ্জন। তোমার কোথাও লাগে নি ত? (রমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না)। মীনা কোথায়, মীনা?

রমা। সে ঠিক আছে, দিদি তাকে নিয়ে গেছেন।

মনোরঞ্জন। তুমিও তাঁদের সঙ্গে গেলে না কেন রমা?

রমা। তোমাকে না নিয়ে? তুমি হলে পারতে বোধ হয়।

মনোরঞ্জন। যদি আর ফিরে না আসিতুম, কি করতে রমা?

রমা। ছিঃ! ও কথা বলতে নেই।

মনোরঞ্জন। আমি নিজের চোখেই আজ দেখেছি তুমি কি করতে যাচ্ছিলে। (তাঁহার স্বর গাঢ় হইয়া

আসিল) আজ এই আগুনের আলোতে তোমাকে আমি নতুন করে চিনলাম। কী অপরূপ মূর্ত্তি তোমার।

রমা। ভারী অপরূপ মূর্ত্তি। কালীঝুলে মাথা একেবারে পেত্নী বললেই হয়। (খানিক জ্বলন্ত গৃহের পানে তাকাইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন) হ্যাঁগো, ও ঘরে তুমি কি আজ তাকে দেখেছ ?

মনোরঞ্জন। (চমকিয়া) কাকে ?

রমা। সেই যে ওঘরে থাকত, কী বিশ্রী শীর্ণ চেহারা তার, চোখ দুটো যেন জ্বলচে, শুনেচি যে বিষ খেয়ে ওখানে মারা গিয়েছিল।

মনোরঞ্জন। কী পাগলের মতো বকছ তুমি।

রমা। না, সত্য করে বল, দেখেছ তাকে আজ ?

মনোরঞ্জন। (খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন) না দেখিনি। আজ সে বোধ হয় আর ওখানে নেই।

রমা। আমিও আজ তাকে দেখিনি। সে আজ অগ্নিদাহে মুক্তিলাভ করেচে। আহা সে বাঁচল।

(রমা মনোরঞ্জনের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপর একটা বড় পোড়া দাগ দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)

রমা। একি, এঁ্যা, এতটা পুড়ে গেছে কি করে। কি করে পোড়ালে। বড্ড জ্বলচে কি ?

মনোরঞ্জন। না রমা, জ্বলচে, তবে বড্ড নয়। তার চেয়ে আর একটা মস্ত জ্বালা জ্বলচে যে—আজ আমি একেবারে নিঃস্ব, আজ যে আমি তোমায় সত্যি সত্যিই পথে বসালুম রমা। কী করে চলবে আমাদের ?

রমা। ও কথা বোলো না, তুমি আছ আর আমার কোনো ভাবনা নেই। ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন, আবার আমাদের সব হবে।

মনোরঞ্জন। কিন্তু সে সবের মধ্যে ত সুখ ছিল না রমা। সেখানেও এক ভূত ছিল, তার মুক্তি লাভ হয় কি করে ?

রমা। সামান্য কারণে আমরা দুজনে দুজনের ওপর প্রায়ই রাগ করতাম, তাই।

মনোরঞ্জন। অথচ দেখ, যখন সব ঘুচে গেল তখন আবার দুজনে দুজনকে ফিরে পেতে একটুও দেরী হল না। আমার ভয় হয়, আবার যদি সব হয়, সেই অশান্তির জীবন আবার ফিরে আসবে।

রমা। তুমি তোমার রাগকে একটু সামলালেই ত পার।

মনোরঞ্জন। তোমাকে আজ কী অভিনব মূর্ত্তিতেই দেখচি। আজ আমার কেবলি ছেলে বেলার কথা মনে পড়চে। সাধনা করেছিলুম, হে দেবী বিদ্যা দাও, বিদ্যা দাও। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একাগ্র মনের সাধনা। প্রতিদিনের প্রভাত হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে নিশীথ রাত, বিদ্যা দাও, বিদ্যা দাও,—ছিল এই তপস্যা। সাফল্যে অধিকতর সাফল্যের সাধনা, হার হলে দ্বিগুণ উৎসাহে জয়ের জন্যে সাধনা। একদা সত্যি সত্যিই হল জয়, তোমাকে নিয়ে এলাম ঘরে, লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম সেদিন ফুটল আমার প্রাঙ্গনে। কিন্তু তারি মাঝে বিধাতা সেদিন বিষবীজ যে বপন করলেন তা পড়েনি চোখে। এতদিন ধরে অর্জন করা শক্তিকে প্রেরণাহীন সাধনাহীন নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের অবকাশ বাড়াবার প্রয়োজনে নিযুক্ত করলাম। দেবতা ক্ষুব্ধ হলেন, বিবাহিতের চির-অশান্তি ধীরে ধীরে উঠল জেগে। প্রেমের আলো আঁধার হল অতি পরিচয়ের অন্তরালে। অবসাদের একঘেয়েমিকে সহনীয় করবার জন্যে বারম্বার প্রয়োজন হল মনোমালিন্যের সঙ্ঘাত। আমাদের ব্যর্থ জীবনের, ব্যর্থ প্রেমের এই ইতিহাস যুগে যুগে নরনারীর ব্যর্থতা রিক্ততা নিয়ে রচিত হয়েচে, পুনঃ পুনঃ রচিত হয়েচে।

রমা। কিন্তু কেন, কেন তা হয় ?

মনোরঞ্জন। যুগে যুগে পুরুষ ও মেয়ে পরস্পরকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেচে। বিবাহ সংস্কারের ছলনা করে প্রবৃত্তিকে অতি নির্লজ্জভাবে উন্মোচিত করেচে। শ্লীলতাকে অপমানিত করেচে। হিংস্র তাদের স্বভাব, মিথ্যা তাদের ব্যবহার। নরনারীর ভালবাসা আঘাতে আঘাতে আজ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত।

রমা। কিন্তু কি করবে তুমি ?

মনোরঞ্জন। অতি পরিচয়ের সঙ্ঘাত থেকে আমাদের বাঁচাব। মনে হয় আবার যেন তুমি আমার নবযৌবনে

ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ,—যেখানে কতকালের ফাগুন দিনে আমের মুকুলে বকুল ফুলের গন্ধে অনাগত তোমার আগমনী শুনত, যেখানে শিশির ধোওয়া শিউলিফুলের কুঞ্জপথে চোখে না দেখা তোমার মূর্তিখানি চুপে চুপে জেগে উঠত।

রমা। সেদিনের সঙ্গিনী বলে আজ কিসে আমায় চিনলে?

মনোরঞ্জন। যে অন্তরায় চিনতে দেয় নি এতদিন সে আজ অগ্নিদাহে ভস্ম হয়ে গেছে। এবার হতে আমরা থাকব দূরে দূরে, পরস্পরের সজ্ঘাত থেকে পরস্পরকে বাঁচিয়ে। কোনো দাবী থাকবে না কারো পরে, আশা করে পথ চেয়ে থাকব চিরদিন, কিন্তু দেখা দেব না কেউ কারো কাছে। অনিশ্চিতের পথে যদি কোনো দিন দুজনে হয়ে যায় দেখা, আমার শুভ্র চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ দেব তোমার কেশে দুলিয়ে, আমার হাত হয়ত ছুঁয়ে যাবে তোমার কপোলতল, সরমে রাঙা হবে তোমার মুখ, একাকী পথে চকিত সুখের হাসিটি তোমার নিয়ে যাব আমার পাথেয়। দুঃখ বেদনা ব্যর্থতার অংশ দেব না কেউ কারোকে, লাভের আনন্দের সুখের ভাগটি তুলে রেখে দেব পরস্পরের জন্যে ভবিষ্যৎ মিলনের মুখ চেয়ে। সামান্য কোনো প্রয়োজনের দাবীতে আসব না কেউ কারো কাছে। কিন্তু যেদিন তোমার মানসকমল তার সহস্রদলে বিকশিত হবে, যেদিন তার পুঞ্জিত মধুভার আত্মনিবেদনের সুতীব্র বেদনা বইবে, সেদিন সেই মদির গন্ধ ভেসে আসবে হয়ত আমার সঙ্গীবিহীন বাতায়নে। দুঃসহ পুলকে সেদিন হয়ত মিলন হবে দুজনায়। অপেক্ষা করে থাকব প্রিয়া সেই দিনটির কামনায়। তারপর মোহ ভাঙবার আগেই বিদায় নেব রাত্রিশেষের শুকতারার সাথে,—চোখে তখনো লেগে থাকবে ঘুমঘোর। এমনি করে চিরজীবনের দেবায়তনে জ্বালিয়ে রাখব আমরা প্রেমের আগুন। এমনি করে প্রিয়া করব আমরা প্রেমের পূজা।

রমা। তোমাকে আজ আমি প্রণাম করে যাই। হে জীবনদেবতা, অগ্নিসাক্ষী করে সেই নবজীবনের তোরণ দ্বারে আমাদের নতুন করে পরিণয় হল।

যবনিকা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

হেমন্তে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্ত ওই হলুদ রঙের আবীর খেলে প্রান্তরে,
আয় ছুটে আজ মাখ্‌বি গায়ে রোদ বাদলের শ্রান্তরে।
আনমনে আজ ধানের ক্ষেতে কিষাণ-বধূর যায় বেলা,
হায় ভোলা তুই দেখ্‌লি না এ রূপের খেলা রঙ-মেলা।

COMMON-ROOM

নারী চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ, বিদ্যাবিনোদ

(১)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব লইয়া যে সকল মনীষী মহিমান্বিত হইয়া গিয়াছেন, কবি হেমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষা সাধনায় সমাহিত 'মধুসূদন' তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে অন্তঃসলিলা ভাব-গঙ্গার সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহার প্রবলস্রোতে বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্য বিরাটরূপে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে, কবি হেমচন্দ্র সেই পাঞ্চজন্যধারী মধুসূদনের কাব্যমুগ্ধ ভক্তবীর, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চারণ কবি।

তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে নূতন যুগের নূতন প্রভাব সর্ব্বত্রই বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নারী চরিত্রও সে প্রভাবে প্রভাবান্বিত। কারণ কবির কাব্য সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। করুণ-রসের সন্ধান না পাইয়া যেন তাঁহারা একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবির কাব্যে, বিশেষতঃ নারী-চরিত্রে করুণ রসের অভাব নাই। তবে ভক্তি ও প্রেম মার্গাবলম্বী বৈষ্ণবাদি যুগের রসাত্মিকা গীতি-কাব্যের করুণ রস তাঁহার কাব্য-মধ্যে পাইবার আশা করিলে হতাশ হইতে হয়, এ কথা সত্য। ওরূপ আশা করাও অবশ্য অন্যায়। 'ভেরী' নিনাদী চারণের উদ্দীপনাময় সঙ্গীতের ভিতর বীণার করুণ ঝঙ্কার আপনা আপনিই মিলাইয়া যায়। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সন্ধান করিলে সে ক্রন্দনের একটা পাষাণ বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। মনে হয়, বাহিরের ভৈরব হুঙ্কার বুঝি অন্তরের সেই বিরাট বিগ্রহেরই অশ্রুধারার বহিঃপ্রকাশ। চারণ-কবির নারী-চিত্র বৈষ্ণব কবির নায়িকা চিত্র নহে, কৃত্তিবাসী যুগের বাঙ্গালী ঘরের মহিলা মূর্ত্তিও নহে। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালি মহিলার সুচিত্রিত মূর্ত্তি।

২

কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে প্রধানতঃ "চিন্তা-তরঙ্গিনী" "বীর বাহু" ও "বৃত্র সংহার" এই তিনখানি গ্রন্থে যথাক্রমে জগতারা, হেমলতা, এবং ঐন্দ্রিলা-শচী-ইন্দুবালা এই কয়েকটী নারী চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। চিন্তা তরঙ্গিনীর জগতারা ও বীরবাহুর হেমলতা কবি সৃষ্টির অঙ্কুর মাত্র। পরবর্ত্তী 'বৃত্র সংহারে' এই অঙ্কুরেরই বিশাল প্রকাশ আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

জগতারা অবলা রমণী, রন্ধন শালার সীমানার ভিতরেই সে চির আবদ্ধ। বাঙ্গালি ঘরের বিদ্যাবুদ্ধিহীনা পতিপরায়ণা রমণী মাত্র। তাহার স্বামী একজন ঘোর বিদ্রোহী বাঙ্গালি—পৃথিবী জুড়িয়া নূতন মানব জাতি গড়িয়া আনিতেই তাহার একান্ত বাসনা। সংসারবিদ্রোহী স্বামীর আশ্রয়ে আসিয়া জগতারা প্রণয়ের নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু পারিল না। অবশেষে নিরাশা-দগ্ধ প্রাণ লইয়া নীরবে স্বামী-সেবা করিতে করিতে তাহার সকলই শেষ হইয়া গেল। স্বামী আত্মহত্যা করিলে তাহার পরেই তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

জগতারার সারা জীবনের সেই বেদনা কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয় যদি কোন প্রকারে সে তাহার স্বামীর পরিপূর্ণ সোহাগের অধিকারিণী হইতে পারিত তাহা হইলে কতই সুখের হইত! বোধ করি তাহার স্বামীরও কত সুখ কত আনন্দের কারণ হইতে পারিত! বোধকরি তাহার স্বামীও আত্মহত্যা করিতে পারিত না!

জগতারার চরিত্রে প্রথম জীবনে আমরা তাহার স্বামী সোহাগের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বয়সোচিত চাঞ্চল্য দেখিতে পাই, উহা বাঙ্গালী ঘরের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা! তাহার গভীর নৈরাশ্য ও বেদনা বাঙ্গালী ঘরেরই একটী সাধারণ

চিত্র; তাহার সহিষ্ণুতা ও পতি-সর্ব্বস্ব প্রাণের নীরব পতি সেবা ও পতি-বিচ্ছেদে মৃত্যুর রূপ হিন্দু ঘরেই পরিচিত আবেশ-মূর্ত্তি।

৩

বীরবাহুর হেমলতাও বাঙ্গালি ঘরের অন্য আর একটি চিত্র। হেমলতা স্বামীর সোহাগ পরিপূর্ণ ভাবেই লাভ করিয়াছিল। কালক্রমে সংসার চক্রে পতিত হইয়া যখন সে বাদশাহের কারাগারে বন্দিনী হইল তখন স্বামীর বিরহ শোকে বিধর্ম্মীর গৃহে বিষ-পান করিয়াই সে তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বিষ পান করিতে উদ্যোগী হইল সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল তাহার গর্ভে বীরবাহুর সন্তান জন্মগ্রহণ করিযাছে। হেমলতা মা' হইয়াছে। তাহার সঙ্কল্প শিথিল হইয়া পড়িল। শুদ্ধ মাতৃত্বটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া হেমলতা দাসীবৃত্তি করিয়া যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। ওদিকে বীরবাহু তাহার একান্ত প্রণয়িনী হেমলতার দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাত হইয়া বীরগর্ব্বে ভারতের রাজন্য-মণ্ডলীকে একীভূত করিয়া ফেলিলেন ও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া হেমলতার উদ্ধার সাধন করিলেন। হেমলতা গৃহে আসিয়া তাহার মাতৃত্বের দায়-ধরা চুকাইয়া বুঝাইয়া দিয়া স্বামীর নিকট বিদায় লইতে চাহিল। প্রজারঞ্জনানুরোধ বা লোকাপবাদ ভয়ে নির্ব্বাসিতা সীতা দেবী যেমন পরবর্ত্তীকালে মাতৃত্বের দায়িত্ব পরিপূর্ণ রূপে পালন করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে ধরণী-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন—হেমলতাও বুঝি তেমনি তাঁহার দায়িত্ব পরিশোধের পরে দেশাচার ভয়ে জীবন ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সখী দীল্লিশ্বর কন্যার সান্ত্বনা পাইয়া হেমলতা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। বীরবাহুও অসঙ্কোচে আপন প্রণয়িনীকে গ্রহণ করিলেন।

হেমলতা সাধারণ বাঙ্গালি ক্ষত্রিয়ের পতিপরায়ণা বিবেকসম্পন্না ধৈর্য্যশীলা নারী, সন্তানের জননী।

৪

ইহার পরেই কবি তাঁহার কাব্য বৃত্রসংহারে তিনটী নারী চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ঐন্দ্রিলা শচী ও ইন্দুবালা। আমরা সাধারণ ও বিশেষ ভাবে একে একে এই তিনটী চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

ঐন্দ্রিলা বৃত্রাসুরের মহিষী। দৈত্যরাণীর সহিত স্বর্গের নন্দন কাননেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। ঐন্দ্রিলা স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়া প্রকৃতি-জাত ভোগ বাসনার অনুকূল সখী-সহচরী পরিবৃতা হইয়া দৈত্যরাজের নিকট আপনার অতৃপ্ত সোহাগ জ্ঞাপন করিতেছেন। অমর-সখীবৃন্দ সহ শচীরাণী আসিয়া তাঁহাকে বিলাস শিখাইবে; তিনি আপনার অঙ্গে 'নবীন প্রকাশ' ধারণ করিয়া স্বামীর মনোহরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। শচীর রূপ গুণের কাহিনী শুনিয়া বুঝি তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য উতলা হইয়াছেন, বুঝি বা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারিলে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইবার আশা আছে। কিন্তু ইহার পরে বৃত্রাসুর রুদ্রপীড়কে পাঠাইয়া শচীরাণীকে বন্দিনী করিয়া আনিলে ঐন্দ্রিলার অন্তরচিত্র বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। শতগুণে শচীর গুণ-গান শুনিয়া তাঁহার চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রুদ্র-পীড়ের নিকট যখন শুনিলেন "দেবী বটে, বটে শচী শত্রুর বণিতা, তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে আভাষিতা," তখন ঐন্দ্রিলার যেন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ঐন্দ্রিলা, 'লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর, তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার···নারী মাঝে আমা হতে' অন্য যদি কেহ অধিক গৌরব ধরে দহে যেন দেহ।" ঐন্দ্রিলা ক্ষমতাবান স্বামীর সোহাগিনী, বিলাসিনী, রাজ-রাণী, প্রকৃতির প্রেরণার পথে স্বাতন্ত্র্য-বাদিনী, অভিমানিনী। তাঁহার চরিত্রে কবি দানবী-প্রকৃতির নির্ব্বন্ধাতিশয্যতা ও তাহার পরিণাম বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঐন্দ্রিলা সহচরী পরিবৃতা হইয়া সুমেরু শিখরে কারারুদ্ধা শচীর নিকট যেন তাঁহার মাৎসর্য্য-প্রবৃত্তির প্রকাশ্য পরিচয় দিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আঘাত পাইয়াই ফিরিয়া আসিতে হইল। অভিমানিনীর অভিমানে আঘাত লাগিল। ঐন্দ্রিলা কাল-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধা হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ওদিকে শচীর দুর্দ্দশা ও অবমাননার সংবাদ জানিতে পারিয়া ঈশানী মহেশের ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। সে অগ্নির দীপ্ত

শিখা দেখিয়া ইন্দ্রজয়ী বৃত্রাসুর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন, কিন্তু দৈত্যরাণীর তাহাতে কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ হইল না, পরন্তু চতুরা মহারাণী স্বামীর তখনকার সেই মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া লইয়া মুহূর্ত্তেই সেই মনস্তত্ত্বের উপর কঠোর আঘাত প্রদান করিলেন। সে আঘাতে বৃত্রাসুর কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার ভীত-প্রাণে একটা সঞ্জীবক ধ্বংশ শক্তির আবির্ভাব হইল। ঐন্দ্রিলার হৃদয়ে একমাত্র অনুভূতি ছিল—একটা প্রকৃতিজাত ভোগের। একটা অভিমানভরা স্বতন্ত্রতার জন্য তিনি তাঁহার সকল ইচ্ছাকে সেই এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ছুটিয়াছেন। উহারই জন্য তিনি স্বর্গের অধীশ্বরীত্ব, এমন কি পুত্র, স্বামী সকলই একে একে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রুদ্রপীড়কে দেবসেনার সহিত যুদ্ধে পাঠাইতে বীর-মাতা ঐন্দ্রিলার বক্ষ কাঁপিয়া উঠে নাই। পুত্রকে বীর-বেশে সুসজ্জিত করিয়া মাতৃ-আশীর্ব্বাদ রক্ষা কবচ বাঁধিয়া দিয়া ভীষণ সমরক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। আবার রুদ্রপীড়ের মৃতদেহ সম্মুখে দেখিয়া যখন পিতৃহৃদয় শোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তখন ঐন্দ্রিলাও "শিশুহারা কেশরিণী"র ন্যায় ভয়ঙ্করী হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার কপোলে শুষ্ক অশ্রুধারা অঙ্কিত রহিয়াছে; বেশভূষা বিশৃঙ্খল; আলুলিত কেশ। যেন একটা প্রচণ্ড শোকের জ্বালাময়ী মূর্ত্তি লইয়া ঐন্দ্রিলা কাঁদিয়া উঠিলেন—"কে হরিল? কারে' দিলে অহে দৈত্যরাজ, আমার অমূল্যনিধি হৃদয়-রতন?" বীর রমণী আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার স্বভাব কোথায় সরিয়া গেল। রাণীর বিলাপ শুনিয়া বৃত্রাসুর কহিলেন—"আগে ঘাতি পুত্র-ঘাতি ইন্দ্রের হৃদয়, এ ত্রিশূলে, পরে বিলাপিব দোঁহে"। এ সান্ত্বনা ঐন্দ্রিলার প্রকৃত স্বভাব ফিরাইয়া আনিয়া দিল। শোকের বেগ প্রতিহিংসার খর-স্রোতে ছুটিয়া চলিল। তবে পুত্র-ঘাতি ইন্দ্র-শত্রু নিধন করিবার কথা তাঁহার মনে হইল না। চির-বাঞ্ছিত বীর পুত্রের বিয়োগ-ব্যথার প্রতিশোধ স্পৃহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ঐন্দ্রিলা তখনই অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রতিশ্রুত হও, পুত্র-ঘাতি পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ।" বৃত্রাসুরও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতির ভাষায় যেন একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল—"পুরাইব মনোবাঞ্ছা, এ শূল-আঘাতে পারি যদি পুরাইতে।" স্বামীর এ দুর্ব্বলতা বীর নারী সহ্য করিতে পারিল না। ঐন্দ্রিলা জানিত শিবের বরে বৃত্রাসুরের নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকালের বহু বিলম্ব রহিয়াছে, শিবের ত্রিশূল তখনও তাঁহার হস্তে বিরাজমান। মহারাণী শিব-ভক্ত স্বামীকে শিব-শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তখনই উদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। বৃত্রাসুরও প্রবল শক্তি লইয়া ভীষণ সমরে প্রবেশ করিলেন। যথা সময়ে বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর নিহত হইলেন। ঐন্দ্রিলাও প্রচণ্ড হতাশে দগ্ধ হইয়া উন্মাদিনী হইয়া ছুটিতে লাগিলেন।

কবির ঐন্দ্রিলা একদিকে যেমন মনস্তত্ত্ববিৎ, প্রতিভাশালিনী, অন্যদিকে তেমনি সোহাগিনী অভিমানিনী। তাঁহার চরিত্রে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ অপেক্ষাও ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষটাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সবল। এই স্থলেই কবি গত যুগের আদর্শ হইতে বহুদূর সরিয়া আসিয়া ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন।

কবির শচী-চিত্রে আমরা এক দেবী রাণীর মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। কিন্তু শচী স্বর্গেশ্বরী হইলেও ঐন্দ্রিলা হইতে পারেন নাই। শচী নৈমিষারণ্যে পতি চিন্তায় নিরতা। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বৃত্রাসুর তাঁহাকে হরণ করিয়া লইবে। শচীরাণী মায়াজাল বিস্তার করিয়া হয়ত বা রক্ষা পাইতে পারিতেন, কিন্তু মিথ্যার সাহায্য লইতে তিনি একান্তই অনিচ্ছুক। পুত্রগর্ব্বে গরবিণী শচী আপনার পুত্রকে স্মরণ করিলেন। জয়ন্ত মাতার উদ্দেশে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াও জননীকে রক্ষা করিতে পারিল না। এইস্থলে জয়ন্তের মূর্চ্ছাগত দেহ লইয়া শচীদেবীর যে আত্মহারা নীরব ক্রন্দন ও মূর্চ্ছা উহার সহিত পুত্রশোকাতুরা ঐন্দ্রিলার আত্ম-বিস্মৃত ক্রন্দন, এ দুয়ে তুলনা করিলে বাহ্যতঃ বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উহার ভিতর দিয়া এই দুই স্বর্গেশ্বরীর আপন আপন বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া

পড়ে। ঐন্দ্রিলা স্বামী-গরবিনী, ঐন্দ্রিলার পুত্রশোক প্রতিহিংসার লক্ষ শিখায় জ্বলিয়া উঠিল; তিনি স্বামীকে 'পুত্র-ঘাতি-পুত্রে' বধ করিবার জন্য পাগল করিয়া তুলিলেন। শচীর শোক পতি-পুত্র ও স্বদেশের চিন্তায় পর্য্যবসিত হইল। পতিহস্তে কারামুক্তি ভিন্ন শচীর সুখ নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষ ধর্ষক শত্রু রুদ্রপীড়ের প্রণয়িনী ইন্দুবালার সাহচর্য্য লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। কারাবাস তাঁহার পক্ষে যেন যন্ত্রণাদায়ক হইল না। ইহার পরে ইন্দুবালার সঙ্গ ও সেবা লাভ করিয়া শচীর কারাবাস যেন মধুর হইয়া উঠিল। কারামুক্তি অপেক্ষাও যে মাতৃহৃদয় সন্তানের সুস্থ-সংবাদের জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, সেই মাতৃহৃদয়ের পবিত্র তৃষ্ণা অনেকটা উপশম হইয়া গেল। ইন্দুবালা কন্যা-স্থানীয়া হইয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। কারাবাস একটা মধুরিমায় প্লাবিত হইয়া গেল।

কবি চিত্রে শচীদেবীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ বিষয়ে বহু পরিচয় থাকিলেও তাঁহার হৃদ্‌বৃত্তি যেন অধিকতর সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়া অন্য সকল দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শচী সন্তানের জননী, স্বামীপরায়ণা, করুণাময়ী স্বর্গের দেবী। পৃথিবীর নারী জীবনের যত দুঃখ, যত বেদনা সকলই যেন স্বভাবতঃই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে হৃদয় ব্যথার মহিমায় পরম রমণীয়।

কবি-কুঞ্জে ইন্দুবালা নন্দনের পারিজাত। দানব রাজ্যের প্রচণ্ড বিভীষিকার মধ্যে ইন্দুবালার সরলতাময়ী করুণার মূর্ত্তিখানি বড় তৃপ্তিদায়িনী।

রুদ্রপীড় শচীদেবীকে আনিবার জন্য নৈমিষারণ্যে গিয়াছেন। এ সংবাদে ইন্দুবালা চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িয়াছেন। নৈমিষকাননে শচীকে রক্ষা করিবার জন্য অমর সৈন্যাদি কিরূপভাবে সুসজ্জিত রহিয়াছে, ইহাই জানিবার জন্য তাঁহার চিন্তা। কন্দর্পকামিনী তাঁহার সখী,—সখী ভাবিল, বুঝি বা ইন্দুবালার মনে তাঁহার স্বামীর জন্য আশঙ্কা হইয়াছে। কিন্তু পরে আমরা দেখিতে পাই—স্বামীর নিরাপদতা সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা হয় নাই। তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী জয়লাভ করিবেন। শচীরাণীর জন্যই তাঁহার যত চিন্তা। স্বামীর এইরূপ কার্য্য তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। "আমিও রমণী, রমণীও শচী, তবে কেন তিনি তায়, না করিয়া দয়া, ধরিতে গেলা ধরায়?" ইহাই তাঁহার বেদনা। কিন্তু উহার জন্য তিনি স্বামীকে দোষারোপও করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহচরী তাঁহাকে বলিয়াছিল, "পতি যে তোমার, তাঁহার হৃদয় এতই নির্দ্দয় কেন?" স্বামী-প্রিয়া সতী তদুত্তরে মধুর স্বরে বলিয়া দিলেন, "বল'না ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সী, তুমি সে জাননা তায়। দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত স্বাদু নীরধারা বয়?" আরও বলিলেন—"পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে কে ঢাকিবে তবে আর।" ইন্দুবালার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। পতির এ দোষ যাহাতে শচী ভুলিতে পারেন উহাই তাঁহার একান্ত সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার পরে ইন্দুবালা যথাকালে সেবিকা রূপে শচীদেবীর পদসেবা করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন। স্বর্গ রাজ্যের সুখ, স্বামীর সোহাগ-ভোগ আশা, রাজপুত্র-বধূর অভিমান, কিছুই তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। পবিত্র প্রণয়ের নীরব বেদনায়-নীরবে প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া নন্দনের পারিজাত আবার চিরনন্দনে প্রবেশ করিল। রুদ্রপীড়ের মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র শচীরাণীর সমীপে সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। যেন পতির মালিন্য ঘুচাইবার জন্যই তিনি এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যেন তাঁহার জীবনের অন্য কোনই প্রয়োজন ছিল না।

ইন্দুবালা দানব রাজ্যের দেবী। হিন্দু পল্লীর স্বামীপরায়ণা, উদারহৃদয়া সতী-কন্যা। কবি তাঁহার ইন্দুবালার চরিত্রে তাঁহার বুদ্ধি-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন সত্য—কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্য, তাঁহার করুণাময়ী, পতি-সোহাগিনী নারীহৃদয়ের নীরব প্রায়শ্চিত্তের আনন্দ-ভরা বেদনার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার সুকোমল হৃদ্‌বৃত্তি এত উৎকর্ষিত হইয়াছে যে তাঁহার সাহচর্য্যলাভ স্বর্গের অধীশ্বরীর পক্ষেও একান্ত কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৬

বৃত্রসংহার শেষ করিয়া কবির সহিত তাঁহার "আশা কাননে" প্রবেশ করিলে আমরা কবির কল্প-লোকের প্রণয়িনী

ও মাতৃমূর্ত্তির একটা সুস্পষ্ট সন্ধান পাইতে পারি। এই সাঙ্গ-রূপক কাব্যে কবি প্রণয়ের একটী মনোহারিণী ছবি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রণয়ের মাধুর্য্য বেদনার মহিমায় চিরসমুজ্জ্বল। স্বামী উন্মাদ। নিমেষে নিমেষে বিভীষিকা দেখাইতেছে, কত অত্যাচার! কিন্তু প্রণয়িনী "এক ধ্যান চিত্তে" বসিয়া সেবা করিয়া যাইতেছে। কি আনন্দ! "নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড় হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া নয়নে পেয়েছে স্থান।" উন্মাদ-স্বামীর সেবার বৈকুণ্ঠের আনন্দ-সুধা পান করিয়া প্রণয়িনী নীরবে তাহার সুষ্ঠু সবল জীবলীলা শেষ করিয়া দিতেছে! প্রণয়ী ভিন্ন বুঝি অন্য কেহ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম নহে।

কবির প্রণয়-মূর্ত্তি যেমন একটা মধুরিমায় পরিপূর্ণ, তাঁহার মাতৃমূর্ত্তিও তেমনি এক 'নিরুপমা' "মাধুরির রাশি" নারী-রূপ যেন দেবীমূর্ত্তি ধরিয়া শুধুই স্নেহ প্রকাশ করিতেছে! যেন "ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান ক্ষণমাত্র নহে ক্ষয়"। যেন কেহ কোনকালে সে সুধা-সলিল হইতে বঞ্চিত হয় নাই।"

৭

জগতারা, হেমলতা, ইন্দুবালা, শচী ও ঐন্দ্রিলা, এই সকলকে লইয়া যেন কবি তাঁহার আশা-কানন রচনা করিয়াছেন। আশা-কাননে প্রণয়-আদর্শের যে অঙ্কুর জগতারা ও হেমলতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন কবির 'ইন্দুবালা'র মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। জগতারা তাহার যে বিদ্রোহী স্বামীকে লইয়া আপনার নৈরাশ্যে প্রথম জীবনে ডুবিয়া মরিতে চাহিয়াছিল, অথবা পরে যে বিদ্রোহী স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ইন্দুবালার নীরব প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেও আমরা সেই প্রণয়েরই একটু সজীব ছবি দেখিতে পাই। তবে ইন্দুবালা পতি-সোহাগের নৈরাশ্যে পড়িয়া কিছুই করে নাই। পতির মালিন্যকে সৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলিতেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। অপর দিকে হেমলতা। হেমলতা বিধর্ম্মীর গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে কাতর হয় নাই। ইন্দুবালাও সেবিকা-রূপিণী হইয়া শত্রুর গৃহে স্বেচ্ছায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। কিন্তু হেমলতা কতকটা বাধ্য হইয়াই দাসী হইয়াছিল, স্বামীর বিরহ অপেক্ষা "গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগই" হেমলতার দাসীবৃত্তির প্রধান কারণ। স্বামীর কোলে সন্তান রাখিয়া পরে দেশাচার বশতঃ হেমলতা স্বামীর নিকট বিদায় লইতে চাহিয়াছিল, অথবা বিদায় লইয়া পরে সখীর সান্ত্বনায় পুনরায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রকৃতিজাত ভোগবাসনার কিছু সন্দেহ আসুক বা না আসুক, হেমলতার সবলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইন্দুবালা জগতের নারীজাতির প্রণয়, মর্য্যাদা ও দুঃখ আপনার হৃদয়ে অনুভব করিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে আপনিই শত্রু-সেবিকা হইয়া প্রণয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া "পতির মালিন্য" অমিয়ধারায় প্লাবিত করিয়া দিল। হেমলতার প্রণয়ে যেন একটু হিসাব-কিতাবের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ইন্দুবালার প্রণয় একেবারে বে-হিসাবি—কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। শুধুই আনন্দ! বেদনার অনন্ত আনন্দধারা!

এক্ষণে শচী। শচীর প্রণয় ও হৃদ্বৃত্তির মধ্যে ইন্দুবালার মূর্ত্তি অনেকাংশেই অঙ্কিত রহিয়াছে। তবে শচী স্বর্গের দেবী; ইন্দুবালা দানব-রাজ্যের দেবী। ইহাই পার্থক্য। স্বর্গের জল-হাওয়ার মধ্যে স্বর্গের মাটিতেই শচী আবির্ভূতা। আর স্বর্গের জল-হাওয়ায় বৃদ্ধি পাইলেও ইন্দুবালার ভিতর-ভাগ দানব-রাজ্যের সার-মাটিতে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট। তাই শচীর চরিত্রে শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার লক্ষণ যে পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দুবালার চরিত্রে তাহা ঠিক সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। বরং কিছু রাজসিকতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সার-মাটির পার্থক্য হেতু যেরূপ পার্থক্য থাকা উচিৎ কবি তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াই রাখিয়াছেন। শচী যে পরিমাণে স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া আত্ম-নিবেদনের একটা সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, ইন্দুবালা তাহা পারেন নাই। শচী ও ইন্দুবালার মধ্যে এ পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। তথাপি কবি সুকৌশলে সেই সূক্ষ্মতম পার্থক্যও পরিস্ফুট করিতে ত্রুটী করেন নাই। (এই সত্ত্বিকতা ও রাজসিকতা হেতু শচী ও ঐন্দ্রিলা চরিত্র-

ন্দ্রের পার্থক্য-অঙ্কনেও কবি-তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই) যাহা হউক শচীর মাতৃত্ব—পত্নীত্বকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। হেমলতার মধ্যে অলক্ষিতে সন্তানের মমতা লইয়া যে মাতৃরূপ আমরা দেখিতে পাই—শচীর মাতৃত্ব উহাপেক্ষা বহু উর্দ্ধতর প্রদেশে অবস্থিত। মাতৃ-হৃদয়ের সে স্নেহানন্দ শক্রও অনন্ত ধারায় পান করিতেছে। ক্ষয় নাই, চাঞ্চল্য নাই।

পরিশেষে ঐন্দ্রিলার কথা,—জগতারার মধ্যে তাহার নিজের অযোগ্যতাবোধ হেতু সর্ব্বদা প্রণয়ের যে একটা বেদনাপূর্ণ আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায় কবির ঐন্দ্রিলা চরিত্রেও সেইরূপ একটা অপূর্ণতার অনুভূতি সর্ব্বদা রহিয়া গিয়াছে। জগতারা, নিরালা-ঘরের বিদ্যাবুদ্ধিহীনা রমণী—স্বামীর উপযুক্ত প্রণয়িনী হইবার যোগ্যা নহে বলিয়াই তাহার দুঃখ। ঐন্দ্রিলার সকলই আছে, তবুও যেন তাহার কি নাই, অথবা আরও কত কি হইলে ভাল হয়,—এইরূপ অপূর্ণতার আশঙ্কায় পড়িয়াই তিনি স্বর্গেশ্বরী শচীকে আনাইয়া তাঁহারই শিক্ষায় পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে ব্যতিব্যস্ত। জগতারার রুদ্ধ বেদনার নিশ্চেষ্ট আক্ষেপ অপেক্ষা ঐন্দ্রিলার এ তীব্র আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে উন্নত ও মধুর।

এই পূর্ণতালাভের আশার সহিত তাঁহার সম্রাজ্ঞীজনোচিত মর্য্যাদা তাঁহার চরিত্রকে এমন একটা উর্দ্ধতর প্রদেশে লইয়া উপস্থিত করিয়াছে যে জগতারা-হেমলতা-ইন্দুবালা সকলেই তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। একটা সরল-সবল প্রণয়ের মূর্ত্তি লইয়া ঐন্দ্রিলা তাহার বীরপতির হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, তাহার প্রণয়ের মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মাতৃত্বের মধ্যেও ঠিক তদ্রূপ একটা বলিষ্ঠতা বিকশিত হইয়া গিয়াছে।

পরন্তু, জগতারা-হেমলতা-ইন্দুবালা-শচী ও ঐন্দ্রিলা প্রভৃতির চিত্রগুলি আরও একটু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে কবির প্রকৃত লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জগতারা স্বামীকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই, অধিকন্তু তাহার জীবন যেন পরোক্ষভাবে তাহার স্বামীর পক্ষে ভার-স্বরূপ হইয়াছিল। হেমলতা বীরবাহুকে একটা শক্তির প্রেরণা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে হেমলতার প্রতি বীরবাহুর প্রণয়েরই গভীরতার বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দুবালা জগতারা ও হেমলতা অপেক্ষা উন্নততর হইলেও তাহার শক্তি নীরবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল—স্বামীকে 'মালিন্য' হইতে মুক্ত রাখিয়া মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে তাহার শক্তি যেন অনেকাংশে দুর্ব্বল। শচীর শক্তি মাতৃত্বে বিকশিত হইয়া মধুর হইয়াছে সত্য, কিন্তু সন্তানের অঙ্গে অস্ত্রক্ষত চিহ্ন দেখিয়া, আশঙ্কায় তিনি ঐন্দ্রিলার পদসেবা করিতেও কাতর নহেন। শচী-শক্তি হেমলতার শক্তির ন্যায় অতি পরোক্ষভাবেই কার্য্যকরী হইয়াছিল। শচীর প্রতি ইন্দ্রের প্রণয়ই অনেকাংশে তাঁহার-কর্ম্মপ্রেরণা। কিন্তু ঐন্দ্রিলা জগতারার ন্যায় নিশ্চেষ্ট আক্ষেপে কাল অতিবাহিত করে নাই। স্বামী-হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণা আনিতেই যেন সে জন্ম লইয়াছে। সে প্রেরণা হেমলতা বা শচীর প্রেরণার ন্যায় পরোক্ষ নহে; অথবা ইন্দুবালার ন্যায় নীরব প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেও তাহা নিহিত নহে। সে প্রেরণা তাহার প্রত্যক্ষ শক্তির প্রভাবেই প্রবাহিত। তাহার ভোগে—অভিমানে—অপমানে—বিপদে—ধ্বংসে সর্ব্বত্র একটা অদম্য শক্তি যেন ছুটিয়াই চলিয়াছে।

চারণ কবি তাঁহার ঐন্দ্রিলা চরিত্রে তাঁহার মনোমত শক্তির একটা বিরাট রূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন—নারী-শক্তি। সে শক্তি প্রণয়ে মধুর, সোহাগে অপূর্ব। সে শক্তি নারীজাতির প্রতি অণুমাত্র উপেক্ষার আভাসেও ভীষণভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠে; "বামা তুমি"—বলিয়া উপেক্ষিত হইবার কল্পনায় বিদ্রোহ করিয়া বলিয়া উঠে, "পুরুষের বন্ধু বামা, মন্ত্রী পুরুষের, বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।" সে শক্তি মাতৃত্বে বীর-প্রসূতি, সন্তান-বিচ্ছেদে কেশরিণীর ন্যায় ভয়ঙ্করী, পুত্র-ঘাতক-পুত্রে বধিয়াই বিচ্ছেদ বেদনার প্রকাশ দেখাইতে চায়। সে শক্তি কর্ম্মপথে দুর্নিবার্য্য, উদ্দীপনাময়ী,—"স্খলিত হিমানী-স্তূপ কম্পিত ভূধরে, ঘর্ঘর নিনাদে চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা, ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি, কে নিবারে গতি তার,—কার সাধ্য হেন?"

সে শক্তি প্রলয়ের বন্যার ন্যায় আপন বিক্রমে প্রলয়ের পথেই ছুটিতে চায়। কোন বাধাই মানিতে চাহে না। শক্তির আনন্দেই সে আত্মহারা—উন্মাদিনী। ঐন্দ্রিলা-শক্তি মহেশের ক্রোধে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবার নহে। রুদ্রের ভৈরব ক্রোধ পদতলে চাপিয়া ধরিয়া শুধু তা'থৈ, তা'থৈ নৃত্য করিয়া উঠে। প্রকৃতির পূর্ণ উদ্যমে পুরুষকে লইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তাণ্ডব খেলা খেলিতেই তাহার আবির্ভাব।

জগতারা-হেমলতা-ইন্দুবালা ও শচী প্রাচীন ভারতের নিরীহ সহধর্ম্মিণীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আদর্শ মাত্র কিন্তু ঐন্দ্রিলার মধ্যে সহধর্ম্মিণীত্বের সহিত কতকটা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মানুযায়ী সহকর্ম্মিণীত্বের আদর্শ যুগপৎ ফুটিয়া উঠিয়া কবির নারী-সৃষ্টি বিষয়ে একটা বিশেষ মৌলিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। কবির এ আদর্শ তাঁহার 'গীতি-গাথা'র ভিতরেও বিশেষ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি গাহিয়াছেন :—

"এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী, প্রাচীনা মহিলা,
সাবিত্রী ভারত পবিত্র ক'রে।
এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনীসকল
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে ;
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
বধূদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।

* * * * *

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবেরে অঙ্গনা মহিমা প্রচার ?
পেয়ে নিজ মান পরি নিজ বেশ
জ্ঞান দম্ভ তেজে পুরে নিজ দেশ
বীর বংশাবলী প্রসূতি হবে ?"

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ

কণা

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

আপন বিরাট-মহিমার ভরে
বট ভাবিতেছে মনে,
"গোলাপ ধরায় আসিয়াছে কী কারণে ?"

মন যেন কোন নারী :—
অসম্ভবেরে ভালবেসে তার
ঘোচেনা নয়ন-বারি ;
জানে ক্রন্দন, আছে শুধু উচ্ছ্বাস ;
প্রবীণ বুদ্ধি আড়চোখে চেয়ে,
করে তারে পরিহাস ॥

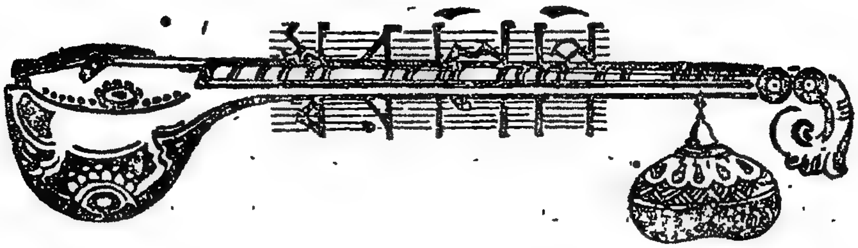

ঠুংরী গজল—দাদ্‌রা

ভালো বাসিব যত,
দিবে বেদনা যত।
তব ব্যথার জ্বালা
মোর ফুলের মালা।
আমি তোমারি লাগি'
নিতি রজনী জাগি,
হেরি শিথিল বায়ে
ঝরে শিউলি-বালা।

আজি আকাশ-পীঠে
চাঁদ হাসিছে মিঠে
তারে বাহুতে বাঁধে
মেঘ কাজল-কালা।
তবু এলে না ভুলে
মম হৃদয় কূলে,
মিছে আকাশে বায়ে
আজি ভুলের পালা।

কথা—শ্রীধীরেন্দ্র রায়, বি-এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

সা	সা
ভা	ল

	+				২												
II	সরা	-জ্ঞরা	সণ্া	|	ধ্া	ণ্া	রা	I	সা	-া	-া	|	-া	ধ্া	ণ্া	I
	বা	০০	সি০	|	০	বে	ত		ত	০	০	|	০	দি	বে	
	রা	-া	রা	|	রজ্ঞা	-মা	জ্ঞা	I	রা	-া	-া	|	-া	মা	মা	I
	বে	০	দ	|	না	০	য		ত	০	০	|	০	ত	ব	
	গরা	-গা	রা	|	সা	-া	রা	I	সরা	-গা	রগা	|	-পা	পা	-া	I
	ব্য০	০	থা	|	র	০	জ্বা		লা০	০	০০	|	০	মো	র্	
	মা	-জ্ঞা	মা	|	জ্ঞমা	-পণা	পা	I	জ্ঞা	-া	-সরা	|	-সা	সা	সা	II
	ফু	০	লে	|	র০	০০	মা		লা	০	০০	|	০	"ভা	ল"	

গা	গা
আ	মি

	+				২												
II	ধা	-া	পা	|	মা	-া	মধা	I	পা	-া	-া	|	-া	পা	পা	I
	তো	০	মা	|	রি	০	লা		গি	০	০	|	০	নি	তি	

মরা -া মা | রমা -পদা পা I মজ্ঞা রা -া | -া মা মা I
র ০ জ | নী০ ০০ জা গি ০ ০ | ০ হে রি

গরা -গা রা | সা -া রা I সরা -গমা -রগা | -পা পা পা I
শি০ ০ খি | ল ০ বা রে০ ০০ ০০ | ০ ঝ রে

মা -জ্ঞা মা | জ্ঞমা -পণা পা I মজ্ঞা -া -মসরা | -সা সা সা II
শি ০ উ | লি০ ০০ বা লা ০ ০০ | ০ "ভা ল"

সা সা
আ জি

\+ ২
II পা -া পদা | না -া সা I সা -া -া | -া সরা জ্ঞা I
আ ০ কা | শ ০ পী ঠে ০ ০ | ০ চাঁ দ

জ্ঞা -জ্ঞরা জ্ঞা | সা -জ্ঞা ঋা I -সা -া -া | -া গা গা I
হা ০ সি | ছে ০ মি ঠে ০ ০ | ০ তা রে

গা -া গা | গা -জ্ঞা গা I মা -া -া | -া পা মপদপা I
বা ০ হু | তে ০ বাঁ ধে ০ ০ | ০ মে ঘ০০০

মজ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞরা -সা না I সা -া -া | -া সণা ণা I
কা ০ জ | ল০ ০০ কা লা ০ ০ | ০ ত বু

ধা -া পা | মা -া মধা I পা -া -া | -া পা পা I
এ ০ লে | না ০ ভু লে ০ ০ | ০ ম ম

মরা -া মা | রমা -পদা পা I মজ্ঞা রা -া | -া মা মা I
হৃ ০ দ | য়০ ০০ কূ লে ০ ০ | ০ মি ছে

গরা -গা রা | সা -া রা I সরা -গমা -রগা | -পা পা পা I
আ ০ কা | শে ০ বা রে০ ০০ ০০ | ০ আ জি

মা -জ্ঞা মা | জ্ঞমা -পণা পা I মজ্ঞা -া -মসরা | -সা সা সা II II
ভু ০ লে | র০ ০০ পা লা ০ ০০ | ০ "ভা ল"

অনুবর্তন

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

—নেহাৎই এলি বাবা, তা আয়, ভাল ক'রেই আয়; কিন্তু একটু ভোগাবি, এই যা। নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া যিনি এই কথা কয়টি আবৃত্তি করিতে করিতে পথিপার্শ্বে ঐ মহুয়া গাছটার তলায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তিনি আমাদের পঙ্কজ রায়ের পিতা বৃদ্ধ ব্রজরাজ বাবু। কিন্তু যে ব্রজবাবু প্রায় মাস তিনেক পূর্বে পুত্রের হাত ধরিয়া পশ্চিমের এই সহরটিতে হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে আজ ইঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই রোগজীর্ণ দুর্বল দেহখানা পশ্চিমা বায়ুতে উৎসাহ পাইয়া এমনি সরস ও চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে যে পুত্র পঙ্কজও মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়। পিতার এ পরিবর্তন সে প্রথম লক্ষ্য করিল সেইদিন, যেদিন অপরাহ্ণ ভ্রমণের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াও তিনি পুত্রকে সঙ্গে আসিবার জন্য ডাকিলেন না।...ইহার পর হইতে তিনি একাই বাহির হন। কারণ, কেহ সঙ্গে আসিতে চাহিলে তাঁহার মুখে-চোখে বিরক্তির ভাবই ফুটিয়া উঠে।

নন্দন পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া গাছে ঢাকিয়া ফেলা যে রাস্তাটা বাঁকিয়া চুরিয়া কোলাহল-মুখর সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন তিনি ঐ সরু রাঙ্গা মাটির পথ ধরিলেন, তখনও আলোকের সন্ধান না পাইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিতেই তাঁহার মনের দোল্না বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে গিয়া ঠেকিল। যদিচ ইহা বসন্তের শেষ—বাম দিকের বৃহৎ খাঁ-খাঁ করা মাঠখানা পলাসে-পলাসে ভরিয়া গিয়া আকাশের খানিকটা পর্যন্ত রাঙা করিয়া তুলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে পথের ধূলিরাশি ও শুষ্ক পত্রাবলি আকস্মিক বায়ুবেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া এবং মুখে চোখে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বেশ ভাল করিয়াই জানাইতেছিল 'ইহা বসন্তের শেষ'—তথাপি এমন সময় এবং এরূপ স্থানে যে সারা আকাশটা মেঘে মেঘে ছাইয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিতেও যেন কেমন বিশ্রী বিসদৃশ ঠেকে।... কিন্তু উপায় নাই, ব্রজবাবু বড় বড় পা ফেলিতে লাগিলেন।

'জলপার' মোড় পর্য্যন্ত পৌছিতে অবকাশ দিবারও বেয়াড়া বৃষ্টিটার আর তর সহিল না, তাঁহারই ন্যায় বহু পথিকের নিঃশব্দ চোখ-রাঙানি এবং অভিশাপের ভয় অগ্রাহ্য করিয়াও প্রবল বেগে আসিয়া পড়িল।

কিন্তু, একজন রুগ্ণ বৃদ্ধ এইভাবে জলে ভিজিতে ভিজিতে ভয়ে ও ভাবনায় কণ্টকিত হইতে থাকিবে—এ দৃশ্য আশে পাশের ঐ কাণ্ডজ্ঞানহীন গাছগুলা এবং পায়ে পায়ে নিষ্পিষ্ট ঐ বিস্তৃত পথটার সহিত আরও অনেকে উপভোগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু এমন লোকও তো সম্মুখের ঐ বাড়িটাতে থাকিতে পারে—যে তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া এমন ধারা জলে ভেজার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাই ব্রজবাবুকে আমরা যখন শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রবাবুর বসিবার ঘরে একখানি আশ্মানি রঙের শালে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তরুণী তনিমা এবং তাঁহার মাতা মৈত্রেয়ী দেবীর সম্মুখে চা পানে ব্যস্ত দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময় বোধ করিলেও তাহা প্রকাশ করিবার মতো দুর্বার সাহস হইল না।

—বাবা তো এখনও এলেন না মা: অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা সহসা মেয়েটি ভাঙ্গিয়া দিল।

—ওঃ, তিনিও আমার মতো নাকি? ব্রজবাবু সোজা হইয়া বসিলেন।

—না, না, আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তিনি নিশ্চয়ই গাছতলায় নিঃশব্দে ভিজছেন না।

—তা বটে। সকলে তো আর আমার মতো নির্বোধ

নয়।···কিন্তু এই বুড়োটাকে বেদখল দেওয়ারও তো বিশেষ প্রয়োজন ছিল না মা! বাইরে তো বেশ ছিলাম।

এই অপরিচিত বৃদ্ধটির মুখে 'মা' ডাকটি শুনিমাত্র মন্দ লাগে না, কহিল—সে' তো দেখেইচি।

—এদিকে আমার শ্রীমান্ হয়তো এতক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চেন তার রোগা বাপের খোঁজে।

—একটা খবর পাঠানো তো তাহলে উচিত ছিল; মা ব্যস্ত হইলেন; ভজুয়াটাকে ব'লে দে না, তনু!

অবিলম্বে ভজুয়া নামধারী খোট্টা দরওয়ানটি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার তরফ হইতে প্রশ্ন আসিল, কোথায় যাইতে হইবে এবং কী বলিতে হইবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর মুখে দিয়া, দ্বিতীয় উত্তরটি ব্রজবাবু এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া দিলেন। অবশ্য লিখিবার পূর্বে কাগজের উপরের দিকটায় একবার চোখ বুলাইয়াই বুঝিয়া লইলেন, তিনি ডাক্তার রমেন্দ্র দত্তের অতিথি।

লম্বা সেলাম করিয়া ভজুয়া বিদায় গ্রহণ করিলে ব্রজবাবু মেয়েটিকে লইয়া পড়িলেন—আচ্ছা মা, তোমার দাদা-মশায়ের নাম রামপ্রাণ বিশ্বাস নয়?

—আপনি জানলেন কি ক'রে? চিনতেন নাকি?

—হ্যাঃ হ্যাঃ, এ বুড়ো কি আজকের লোক! তোমার মায়ের বিয়েতে প্রায় নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম আর কি!

—'প্রায়' মানে?

—ওঃ, সে পুরনো কথা। বাড়ি থেকে হঠাৎ 'তার' এলো 'father expired'। তাই বিয়ের ঠিক দু'দিন আগে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই কলকাতা ছাড়তে হ'ল।···সে বুড়োটার বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল আবার আমার চেয়েও কম। বছর শেষ হতে তখনও তো ছিল মাস কয়েক বাকি, মরণটাও তো আর পালাচ্ছিল না,—দু'দিন পরেই না হয় মরতিস্।

মৈত্রেয়ী দেবী হয়তো তখন তাঁহার 'স্মৃতির' পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন, তিরিশ বৎসর পূর্বে কোন অতিথি ভগ্নমনোরথে তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। বুঝিবা দেখিলেন: সে পঁচিশ বৎসরের এক যুবা, নাম ব্রজরাজ রায়।

বাদ্‌লা দিনগুলির বুঝি একটা নেশা আছে। সে তাহার লম্বা সাঁড়াশিটা মনের ভিতরে সজোরে চালাইয়া দিয়া পুরানো কথাগুলা টানিয়া বাহির করে—রঙীন স্বপ্নের কথা, প্রথম ভালোবাসার কথা। তখন পারিপার্শ্বিক জগতের কথা মনে থাকে না, মনে হইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করে না। একটা অব্যক্ত উচ্ছ্বাসের প্রবল বাত্যা সমস্ত অন্তরটাকে আলোড়িত তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে। তবে তরুণের সহিত বৃদ্ধের প্রভেদ বোধ হয় এইখানে যে মদের উগ্রনেশায় মাতাল যেমন করিয়া তাহার হৃদয়টাকে দর্পণের মতো সকলের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, তরুণ তেমনি করিয়াই আপনাকে আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলে; কিন্তু বৃদ্ধ সৃষ্টি-নিয়মের উত্তাপ ও উচ্ছ্বাস কমিয়া আসিয়াছে বলিয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, অতো সহজে আপনার গাত্র-বস্ত্রটা ছুঁড়িয়া ফেলিতে ভরসা পায় না,—সদাই ভয়: পাছে ঠাণ্ডা লাগে, পাছে সহ্য না হয়।

বাহিরের প্রবল বৃষ্টি তখনও একটু কমে নাই, বরং যেন একটু চাপিয়া আসিতেছে—শীঘ্র থামিবার লক্ষণ নাই। ব্রজবাবু অনেকক্ষণ হইতেই কী একটা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কেমন করিয়া আরম্ভ করিবেন তাহা ভাবিয়া না পাওয়ায় অবস্থাটা ক্রমশই করুণ হইয়া উঠিতেছিল।

—হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে: মেয়েটি হাসিয়া উঠিল।

—সেদিন একটা গল্প পড়ছিলাম, এখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

এই সেদিনটা যে 'কাল-পরশু' নয়, একেবারে 'তিরিশ-বৎসর অন্ত' শুনিয়া তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে! কিন্তু গল্প শুনিতে তাহার আগ্রহ আছে, কহিল—বেশ তো, বলুন না।

—তবে ওখানে দাঁড়িয়ে নয়, এই এখানে এসে ব'স; বলিয়া বড় সোফাটায় প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও একটু সরিয়া বসিলেন। মেয়েটি কাছে বসিয়া কহিল—বলুন এবার!

—হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে—

—তার আগে?

—তুমি ফার্ষ্ট ইয়ারে পড় না মা?

—কি ক'রে জানলেন ?

—অন্তর্যামী কিনা! কিন্তু 'বুড়োর গল্প' তবে তো বাতিল। ছেলে-ছোকরা চাই কলেজে পড়া, না ?

—কি যে বলেন আপনি! মুখে বিরক্ত হইলেও মনে হয়তো অনুভাব।

—আচ্ছা, তবে আরম্ভ করা যাক, কি বল মা ?

—করুন না, কতবার আর বলব।

—তাহলে আরম্ভ করি ?

—আঃ।

মা হাসিতেছিলেন। একজন শুভ্র কেশ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট বৃদ্ধ, আরেক জন চঞ্চলা ষোড়শী। অথচ এই সামান্য ক্ষণের মধ্যে ইহাদের কতই না ভাব জমিয়া উঠিয়াছে, যেন মঙ্গলগ্রহ হইতে পরিচয়। গল্প তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

—বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন।

—এ যে বঙ্কিমচন্দ্র আওড়াচ্চেন দেখচি।

—তবে সুর বদলান যাক ?

—নিশ্চয়ই!

—ধর, সকাল হয়েছে। এক ঝলক জল-ধোয়া সোনালী রোদ এসে···পবিত্রর...চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা কুলি এসে ডাকল,—বাবু, গাড়ি আ গিয়া। চোখ মেলে পবিত্র দেখে ও একটা টিন শেডের তলায় পড়ে আছে। অনুমানে বোঝে; তার জামা কাপড় সব ভেজা, সকালের মিঠে রোদে খানিকটা শুকিয়ে উঠেছে। আর ঐ বাড়ি-গুলোর মাথায় মাথায় লেখা 'পার্ব্বতীপুর'। মাথাটা তার ঝিম ঝিম ক'রে উঠল। কপালে হাত দিয়ে দেখলে: সেখানে যেন 'কার' বিয়ের রান্না চলেছে, ধোঁয়া জমে উঠছে তার মনের মধ্যে।

—এযে শেষ দিক থেকে আরম্ভ করলেন!

—তবে প্রথম দিকে আসা যাক, কি বল ?···পবিত্রর মনে পড়ল মাস কয়েক আগে সে ঠিক এমনি ক'রেই চলেছিল কলকাতা, আর আজ আবার ফিরে চলেছে। ওর মনে হয় এই দু'মাসে যেন কতযুগ চ'লে গেছে। দীর্ঘ জীবনের ভারে আজ সে ক্লান্ত, অবসাদ গ্রস্ত। তার জীবন-নাট্যে সেদিন যে অভিনয়ের আরম্ভ করেছিল, আজ তা চুকিয়ে দিয়েই সে আসছে। বায়স্কোপের ছবির মতো সে সব দৃশ্য একে একে তার চোখের সামনে ভেসে উঠে।···

···এ অভিনয়ের যবনিকা উঠেছিল এই পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনেই। দিনাজপুর কুচবেহার প্রভৃতির যাত্রীরা প্ল্যাট-ফরমে জমায়েত হ'য়ে উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করছে ডাউন দার্জ্জিলিঙ মেলের জন্যে। এই একখানা গাড়ি, অনেক যাত্রীরই আশা ভরসার স্থল। তাই কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্তির আশায় নিরীহ বাঙ্গালির কাকুতি-মিনতি থেকে আরম্ভ ক'রে চলতে থাকে কাবলিওয়ালার জোর জুলুম পর্যন্ত। গাড়ি যখন এখান থেকে ছেড়ে যায়, তখন রেল আইনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অন্তত দ্বিগুণ লোক তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর প্রতি রেল-কর্তৃপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য সহযাত্রীর কাছে বিবৃত করতে থাকে।

—পবিত্রর কি হ'ল ছাই ?

—ও সেদিন গ্রীষ্মের ছুটি শেষ ক'রে কুচবিহার থেকে চলেছে কলকাতায়, ও ভার্সিটিতে এম-এ পড়ে। গাড়ি এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়ালে যে দুরবস্থা উপস্থিত হবে, মনে মনে তা চিন্তা ক'রে ও বেশ একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী বলেই তার অবস্থা আরও শোচনীয়। এ শ্রেণীর গাড়ি থাকেও কম, আর বিপন্ন যাত্রীরা কোন রকমে ওঠার আগ্রহে দেড়া-মাশুলের গৌরব প্রায়ই রক্ষা ক'রে চলে না। কুমড়ো বোঝাই হ'যে সারা রাত যেতে হবে, এ এক কঠিন দুশ্চিন্তাই বটে।

—কিন্তু গল্পের কি হ'ল ?

তবে আরম্ভ করা যাক।...পবিত্র চেয়ে দেখে কিছু দূরে টিনশেডের তলায় এক বৃদ্ধ পিতা জ্বরে হি-হি করে কাঁপছে, মাতা খবরের কাগজ ভাঁজ করে মাথায় বাতাস করছে, আর তন্বী মেয়েটি...তার নাম ধরে নেয়া যাক্ 'তনু'···সে মিনতিভরা দৃষ্টিতে পাশে দাঁড়িয়ে তার কর্তব্য স্থির ক'রে উঠতে পারছে না। বৃদ্ধের ক্ষীণ অনুরোধে আর তনুর নীরব আকুলতায় তাদের গাড়ীতে তুলে দেওয়ার ভার পবিত্রকে নিতে হয়।

শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর মুখখানা, লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইত, পলকের জন্য একটু রাঙা হইয়া উঠিল। একখানা

ইংরাজি নভেল টানিয়া লইয়া তাহারই ভিতর মনোনিবেশ করিতে তিনি চেষ্টা পাইলেন। গল্প চলিতে লাগিল।

—যারা ওঠে আর যারা নামে, কেউই কাউকে খাতির করে না, ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি চলতে থাকে। দেশীয় চরিত্রের এই এক নিদর্শন পাওয়া যায় রেলগাড়িতে—শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে চলতে এরা শেখেনি।

—দেখুন, আপনি বড় ভূমিকা করেন।

—তাহলে সংক্ষেপেই বলা যাক্।...দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান মধ্যম শ্রেণীর একখানা কামরা মেয়েটিই প্রথম বলে: অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ এখনও সবটুক কাটেনি, তবু আপনি না থাকলে আমাদের কী যে হত বলা যায় না।

—উত্তরে পবিত্রকে বলতে হয়: এতো সবাই করতো। আমারই বরং সৌভাগ্য বলতে হবে। কতবার যাই আসি, এবার তবু কিছু কাজে লাগলাম।

—পবিত্রর কথা হয়তো তনুর বেশ লাগে, বলে: আপনার এ কথা মেনে নিতে পারিনে। পরের আপদ কে ঘাড়ে নিতে চায় বলুন? আমি হ'লে তো কখ্খনো রাজি হইনা।

—পবিত্র বলে: ঠিক অবস্থার সঙ্গে দেখা হবার আগে মানুষ কিছুতেই জানে না, সে কী করবে আর কী করবে না। আপনি হ'লে হয়তো এ অবস্থায় আরও বেশী ক'রে কাজে লাগতেন।

—তনু হার মানে: থাক্, এ নিয়ে মিছে তর্ক ক'রে লাভ নেই। ধরে নেয়া গেল, আপনি অতি সাধারণ লোক।—তারপর নিজের উক্তিটাকে আরও একটু ঘনিয়ে তুলতে সে হঠাৎ হেসে ওঠে।

—সেদিন এই অপরিচিতার পরিচয় নিতে পবিত্রর আগ্রহ যেন আর বাধা মানছিল না। একটু থেমে আবার শুরু করে: এবারে ঠিক ধরেছেন, আমার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই। বাবার হয়তো মনে ছিল একটু আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু বি-এ পরীক্ষার ফলে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেলাম, তখনই তিনি বুঝে নিয়েচেন ছেলের দৌড়। আমায় এম-এ পড়াবার ইচ্ছে তাঁর একরকম ছিলই না। কতকটা কলকাতাবাসের প্রলোভনেই হঠাৎ লেখাপড়া করার দুর্বার বাসনা আমার জেগে উঠল। হস্টেল জীবন! বুঝতেই পারেন কী শান্তিতে থাকি।

...তারপর পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ চলে। প্রকাশ পায়: মেয়েটি প্রথম বিভাগে এবার ম্যাট্রিক পাশ করেচে। ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছিল, পথে এই বিপদ, তারপর পবিত্রবাবুর দয়ায় ইত্যাদি।

ওদিক হইতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। মেয়েটির পরিচয় দিতে গিয়া যে এই কাণ্ড-জ্ঞানহীন বৃদ্ধটা আর বেশী কিছু বলিলেন না, তাহাতে অদূরে উপবিষ্টা মৈত্রেয়ী দেবী নভেলের পাঁতায় মুখ রাখিয়াই হঠাৎ প্রসন্না হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বক্তা বা শ্রোতা কাহারও দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না।

—তৃতীয় দৃশ্যের যবনিকা উঠল শেয়ালদ'য়। তনুর এক 'দাদা' ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল, ট্যাক্সি ডেকে ওদের নিয়ে গেল।

...যাবার সময় তনুর বাবা বললেন: তোমার কাছে ঋণী রইলাম বাবা, পারো তো যেয়ো আমাদের ওখানে।

...তনু হঠাৎ হাত জোড় ক'রে ব'লে উঠল: নমস্কার পবিত্রদা। যাবেন কিন্তু—ষোল নম্বর—মনে থাকবে তো? আপনার যে ভুলো মন, হয়তো ভুলেই যাবেন!

...এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে তনু পাশে চেয়ে দেখে: তার সেই 'দাদা' যেন কেমন কঠিন হ'য়ে উঠেচে। পবিত্রও এভাব লক্ষ্য করে। তারপর চলন্ত গাড়ি থেকে দুয়েকটা কথা পবিত্রর কানে আসে।—

—এই ছেলেটির সাথে বুঝি আলাপ হ'ল পথে?

—হ্যাঁ। ছেলেটি বেশ, তাই নয় কি? তবে একটু লাজুক। আমার কিন্তু এরকম মুখ-চোরা দেখলে ভারি দয়া হয়।

...তার 'দাদা' হয়তো ভাবে: তার বেশী কিছু না হ'লেই বাঁচি।

—কিন্তু, এই 'দাদাটি'কে? তনিমা প্রশ্ন করে।

সহসা মেয়ের এ প্রশ্নে মৈত্রেয়ী দেবী আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। এখন এই নির্লজ্জ বৃদ্ধটি যদি ফস্ করিয়া বলিয়া বসে, তাহারই নাম রমেন্দ্র দত্ত, তবে মেয়ের সম্মুখে

নিজের লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু ব্রজবাবু সে ধার দিয়াও গেলেন না দেখিয়া তিনি মনে মনে খুসি না হইয়া পারিলেন না।

—পাশের বাড়ির 'দাদা'। রোজ খোঁজ নেয়, দেখা-শুনো করে, ভা-রি যত্ন করে।

—অথচ কোন সম্বন্ধ নেই। তারপর?

—তারপর...পবিত্রর নভেল-পড়া মনে প্রেমের প্রথম ছোঁয়া লাগে। একরাত্রির জন্য সে যেন জগৎসিংহে পরিণত হয়েছিল, তার গায়ে গা মিশিয়ে ছিল তিলোত্তমা। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কত অদ্ভুত ধারণাই তার ছিল এতদিন। এবার সে সত্যি ক'রেই জেনেছে পুরুষের বুকের মাঝে কোথায় যেন একটু ফাঁক রেখেছেন ভগবান, নারী না এলে এ শূন্যতা ঘোচে না।

—এরপরে বুঝি নিত্য যাওয়া আসা, ভালোবাসা, শেষ পর্যন্ত বিয়ে, তাই না?

—বিয়ে হ'লে তো হ'তোই। কিন্তু যত গণ্ডগোল বাধল ঐ 'দাদাটিকে' নিয়ে। শেষ পর্যন্ত...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর শেষ করা হইল না। দ্বারের বাহিরে দুই জোড়া জুতার শব্দ পাইয়াই ব্রজবাবু থামিয়া গেলেন। এবং পরমুহূর্তেই রমেন্দ্রবাবু শ্রীমান পঙ্কজের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই চেঁচাইয়া উঠিলেন।

—এ আপনার ভারি অন্যায় ব্রজবাবু। এতদিন এখানে আছেন, অথচ একদিনও এদিকে আসেন নি!

ব্রজবাবু মৃদু অনুযোগ করিলেন—

—আহা, আমিই কি ছাই জানতাম আগে।

—তবে এবারের 'আবিষ্কারটা' করলে কে শুনি? বলিয়া কটাক্ষে রমেন্দ্রবাবু একবার পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীর পানে চাহিলেন।

ও পক্ষের মাথা নিচু করা ছাড়া আর পথ নাই।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

দেশের কথা

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের 'দেশের কথা' বিভাগের নিয়মিত লেখক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু মহাশয় দৈব দুর্ঘটনায় বাস হইতে নামিবার সময় পড়িয়া গিয়া দক্ষিণ হস্তে গুরুতরভাবে আঘাত পাইয়া হাসপাতালে আছেন। সেইজন্য এ মাসে 'দেশের কথা' দেওয়া সম্ভব হইল না। আমরা আশা করি ভগবানের কৃপায় শ্রীযুক্ত সুশীলবাবু শীঘ্রই আরাম হইয়া উঠিবেন এবং আগামী মাস হইতে বিচিত্রায় নিয়মিতভাবে 'দেশের কথা' প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বিঃ সঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব

শ্রীঅবনীনাথ রায়

একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু তবু এতদিন পরেও আমরা তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান করিতে বসিয়াছি। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে তাঁর প্রভাব জাতির মনে কালজয়ী হইয়া বিরাজ করিতেছে। কি সে প্রভাব যা কালের শাসনকে তুচ্ছ করিতে পারিল? তিনি ত আজ স্বশরীরে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই। কিন্তু তবু তাঁকে স্মরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা পড়িল কেন? তার কারণ তাঁর সাহিত্য বাঙালীর জীবনে এমন কিছু দিয়াছে যা একদিনের খেয়ালের বস্তু নয়, যা চিরদিনের আদরের সামগ্রী।

সাহিত্য হইলেই তাহা কালজয়ী হয় না বলা বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে অনেক লেখক জন্মিয়াছেন এবং মরিয়াছেন, পরেও অনেক লেখক জন্মিয়াছেন এবং মরিয়াছেন কিন্তু কাহাকেও এমন করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র লেখকই থাকিয়া গেছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনকালে তাঁহাদের হয় ত ডাক পড়িবে কিন্তু জাতির জীবনে মহাপূজা পাইবার আসন তাঁহারা লাভ করেন নাই। গত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে বঙ্কিমের লেখনী থামিয়াছে, তাহার পর আমরা সাহিত্যিক এবং কবিও বড় কম পাই নাই—জগতবরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি—কিন্তু তবুও স্বীকার করিব বঙ্কিমচন্দ্র জাতির জীবনে যে অমূল্য সম্পদ দিয়া গেছেন তার নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিঃ আজ পর্য্যন্ত অপরিম্লান রহিয়াছে। সাহিত্য সখের বস্তু নয়, সাহিত্য সাধনার ধন—এ কথা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি কিন্তু কয়জনের জীবনে এই সত্য ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছি? সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া যিনি সত্যিকারের সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাঁর সাধনার ফলে সত্যের ভাস্বর রূপ তাঁর চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তিনিই বঙ্কিমচন্দ্র। সত্যদ্রষ্টা না হইলে কি কখনো জাতির কল্যাণ অকল্যাণ, বিবেচনা করিবার অধিকার লাভ করা যায়? যেই যুগ-সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম সেই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার, পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীন কুহকে জাতি মুগ্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত কিন্তু তবু অকৃত্রিম সাধনার বলে প্রাচ্যের সাহিত্য-লক্ষ্মী বঙ্কিমের জ্ঞানগর্ভ তৃতীয় নেত্র উন্মীলন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই তৃতীয় নেত্রের অপাপবিদ্ধ আলোকে বঙ্কিম দেখিলেন, পরানুকরণে শ্রেয় নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে জাতি আত্মসম্বিৎ হারাইলে মহতী বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি বাঙালী জাতির, হিন্দু জাতির, আর্য জাতির সভ্যতার মর্ম্মমূল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সেই আর্য সভ্যতার মর্ম্মমূল উদ্ধারই বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠোদ্ধার—সেই বাণীই বঙ্কিম সাহিত্যের শ্রেয়সী বাণী—সেই সনাতন ভাবসম্পুট ভারতবর্ষের যুগ যুগবাহী মুরলীধ্বনি—Back to the self—আত্মচেতনা, আত্মপ্রত্যয়—জাতির আত্মাকে, আত্মবস্তুকে বিশ্বাস, নির্ভর এবং শ্রদ্ধা।

বঙ্কিমের সাহিত্য এই সত্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই জাতির নিকট তাহা পুরাণো হইল না, কোনদিন হইবে না। যে সাহিত্য ঐ সত্যের দিকে হাত বাড়াইল না তাহা অপাংক্তেয়, তাহা গণমনে ক্ষণিক চমক লাগাইলেও প্রতীচ্যদেশে কখনো স্থায়িত্বের দাবি করিতে পারিবে না। সম্প্রতি সাময়িক সাহিত্যে একটা কথা উঠিয়াছে যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু যার ইংরাজি তরজমা Communal Hindu। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব কি সাম্প্রদায়িক বর্ণে অনুরঞ্জিত? তাহা যদি হইত তবে আজ

আমরা বর্ণ হিন্দুরা বঙ্কিমের সাহিত্য লইয়া শাশ্বতত্বের বড়াই করিতে পারিতাম না। কেননা কোন ক্ষুদ্রত্ব, কোন অসম্পূর্ণত্ব, কোন ভগ্নাংশ দৃষ্টি চিরঞ্জীবত্বের কামনা করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব আর্য্যসভ্যতার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত। 'সীতারাম' হইতে তাহার উদাহরণ দিব। বঙ্কিম লিখিতেছেন, 'পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিযাছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে ক্ষোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা, তরলিত রত্নহারা, পীবর যৌবনভাবাবনতদেহা—

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভি :—

এই সকল স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার।' বঙ্কিমের এই হিন্দু-আদর্শবাদে কোন বিদ্বেষের, কোন অপূর্ণতার ছোঁয়াচ নাই। তাঁর হিন্দুবাদ কেবল আত্মপ্রশস্তিতে পর্যাপ্ত নয়, কেবলমাত্র থিওরি লইয়া কারবার করে নাই, তাঁর আদর্শ militant Hinduism। তাঁর হিন্দুত্বকে বীরত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। যখন সীতারাম দেখিলেন মুসলমান আসিযা মহম্মদপুরের দুর্গ অধিকার করিল বলিযা, সম্মুখে মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন তিনি সূচীব্যূহ রচনা করিয়া পঞ্চাশ জন অনুচর মাত্র পরিবৃত হইয়া মুসলমান-কটক পার হইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন জয়ন্তী এবং শ্রী অবলীলাক্রমে সীতারামের অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলধ্বজ উন্নত করিয়া গাহিল :—

"জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুরনিধনকর!
রণে ভযঙ্কর! জয় জয় রে!
চক্র গদাধর! কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরি হর! জয় জয় রে।"

যে জাতি-প্রাণ বার বার মৃত্যুভয়ের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিযাছে তাহা অবিনাশী—সে যুগ সঞ্চিত সত্যবস্তু যুগান্তেও ধ্বংস হইবার নহে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবিধ্বংসী হিন্দুত্বের পূজারী ছিলেন।*

শ্রীঅবনীনাথ রায়

* ১৩ই নবেম্বর ১৯৩৮ এলাহাবাদে বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসবে পঠিত।

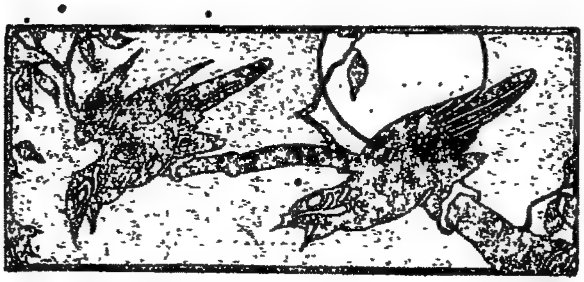

মুখবন্ধ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এ খাতাটি সুরু হল আজ তোমারে স্মরণ ক'রে,
তোমার অমল মূর্ত্তিখানি মনে মনে বরণ ক'রে।
যে মাধুরী তোমার মুখে
নিত্য ফোটে দুঃখে সুখে,
অভিমানের যে সুষমা ওষ্ঠে অবতরণ করে,
আমার নূতন খাতার পাতায় আনব অপহরণ ক'রে।

আনব তোমার স্নিগ্ধ চোখের এক পলকের দৃষ্টিকণা,
আনব মুখের অল্প সুখের সঙ্কুচিত উন্মাদনা,
আনব শোকের সজল মায়া,
চিন্তা ভয়ের তামস ছায়া,
সঙ্কোচেরি যে জড়তা তোমার গতি হরণ করে
আনব তাহা বিলম্বিত ছন্দে অনুকরণ ক'রে।

আনব খুঁজে কৌতুকেরি ঝিলিক মারা মিষ্ট হাসি,
তপ্ত চোখের স্তব্ধ কোপের উচ্ছ্বসিত অগ্নিরাশি,
আনব দেহের গঠনেরে
ছন্দ লয়ের শতেক ফেরে,
আল্গা মনের মুক্ত পথে গভীর অনুসরণ ক'রে
আনব সুদূর গহন বনের পুষ্প অপহরণ ক'রে।

তুমি হবে হে সুন্দরী, এই খাতারি উৎস-ভূমি,
ছুটবে ইহা তোমার স্মৃতি-তটের দুটি প্রান্ত চুমি'।
ফুটবে ইহা তন্দ্রাহত
তোমার চোখের তারার মত,
পদ্মসম একে একে দলগুলিকে ভরণ ক'রে
এ খাতাটি পূর্ণ হবে তোমার মধু ক্ষরণ ক'রে॥

———

ছায়াপট

বাণীনাথ

খনা

প্রযোজক—বি, এল, খেমকা
কথা-শিল্পী—মন্মথ রায়
পরিচালক—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক-শিল্পী—দ্রোণাচার্য্য
শব্দ-যন্ত্রী—এ, গফুর
সুর-শিল্পী—ধীরেন দাস

ভূমিকালিপি

খনা—ছায়া দেবী
বরাহ—অহীন্দ্র চৌধুরী
মিহির—সুশীল রায়
ধরণী—দেববালা
মদনিকা—অরুণা
বিক্রমাদিত্য—সমর ঘোষ

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নূতন অবদান 'খনা' ছবি উত্তরা চিত্রগৃহে গত ১২ই নভেম্বর মুক্তিলাভ করেছে। ছবিখানি প্রযোজনা করেছেন বি, এল, খেমকা। বহুদিন আগে মন্মথ রায়ের 'খনা' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয়ে গেছে। পরিচালক মাত্র ছবির প্রথমদিকে কিছু অদলবদল ক'রে সম্পূর্ণ ছবিটি একেবারে 'খনা' নাটককে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন। সুতরাং সমস্ত ছবি জুড়ে রঙ্গমঞ্চের ছায়া বিদ্যমান। খনার ঐতিহাসিক সত্যের ওপর স্বয়ং নাট্যকার যে কল্পনার আলোক সম্পাত করেছেন পরিচালক তাকে যথাযথ রূপ দিয়ে বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছেন।

গল্পাংশ :—

সিংহলের রাজকন্যা খনা এক অজ্ঞাত কুলশীল ভারতীয় যুবক মিহিরের প্রণয়ে আসক্ত। পিতামাতার ঘরে যে ছিল আদরের দুলাল পবিত্র প্রণয়ের অদম্য আকর্ষণে সে একদিন রাজ-ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ ক'রে মিহিরকে স্বামীত্বে বরণ করল এবং হাসিমুখে চলল স্বামীর ভিটার উদ্দেশে। কিন্তু নিয়তির খেলা অতি অদ্ভুত। মিহিরের পিতা জ্যোতিষার্ণব বরাহ বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঘটনাচক্রে মিহির এসে একদিন উপস্থিত হ'ল এই রাজসভায় এবং বরাহের কোন একটি গণনা ভুল প্রতিপন্ন ক'রে সকলকে বিস্মিত ক'রল। বরাহ কিম্বা মিহির পরস্পর পরস্পরের পরিচয় জানতে পারেন নি। বরাহ এঁদের পরিচয় জানতে চাইল কিন্তু খনা সত্যিকার পরিচয় গোপন করল। বরাহ মিহিরের জন্মের পরেই গণনায় হঠাৎ এক বছরের মধ্যে মৃত্যু দেখে পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। একমাত্র খনা নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা তা জানতে পেরেছিল। তারপর বরাহের শিষ্য কামন্দক গুরুর অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল এঁদের গৃহে আগুন লাগিয়ে কিন্তু সত্যিকার সেই চক্রান্তও বিফল হ'ল। সেই মুহূর্ত্তেই বরাহ জানতে পারল খনার কাছ থেকে মিহির তাঁদের কে? উজ্জয়িনীতে খনা ও মিহিরের জয়জয়কার। লোকে বরাহের কাছে আর গণনার জন্যে যায় না—সবাই আসে খনার দুয়ারে। সম্রাট বিক্রমাদিত্য পণ্ডিত বরাহকে একটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। প্রশ্নটি হ'চ্ছে আকাশে কটি তারকা? বরাহ তাতে অসমর্থ হ'য়ে অবশেষে খনার সাহায্য গ্রহণ করলেন এবং সম্রাট ছদ্মবেশে এসে তা দেখতে পেলেন। ফলে নবরত্ন সভায় বরাহের শূন্য স্থানে খনা দেবী সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন। কিন্তু বরাহের অপমানের জন্য প্রধানতঃ দায়ী সে—এই বৃহৎ সত্যটুকু যখন বুঝতে পারলেন তখন খনা নিজের হাতে জিভ কেটে আত্মহত্যা করলেন।

খনার ন্যায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্র দেখায় বাংলায় দর্শকদের অভাব নেই। কিন্তু এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছবি তুলতে যে শিল্প-দৃষ্টি, গবেষণা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়

মেট্রোপলিটান পিকচার্স'র 'ধনা' চিত্রে সুনীল রায় ও ছায়া দেবী

বন্যা চিত্রের একটি দৃশ্যে হিরণ, মালবিকা ও বন্যা

দরকার অনেকস্থলে তার ব্যতিক্রম ঘটায় দর্শকগণের পরিতৃপ্তিলাভে প্রায়শঃ বঞ্চিত হ'তে হয়।

এই চিত্রের পরিচালক রোমাঞ্চকর কিছু করবার প্রয়াস পান নি। বরং অতি সহজভাবে গল্পকে ছবির ভাষায় বুঝিয়েছেন। ছবির প্রথমদিকে আমাদের দৃষ্টিকে আহ্বান করে না। এত বড় সিংহল রাজপ্রাসাদের মাত্র ছুটি প্রাণী রাজা ও রাণী এবং তাঁদের প্রাণহীন কথা-বার্ত্তা চিত্রনোপযোগী হয় নি। মিহির ও খনার প্রেম অভিনয় কাউকে স্পর্শ করে না। সমুদ্রের ধারে মিহির ও খনার (ছায়া

বড়দিদি চিত্রে শান্তির ভূমিকায় চন্দ্রাবতী

দেবী) পরিবর্ত্তে হঠাৎ আরেকটি মেয়ের আবির্ভাব ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। হঠাৎ তারা সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লই বা কেন? তারপরই ভারতের এক পল্লীগ্রামে গানের সঙ্গে মিহির ও খনার পথে চলা এবং মাঝে মাঝে সমুদ্রের insertsগুলি বড় বেখাপ্পা হ'য়েছে। ধরণীর কাছে বরাহ গল্পচ্ছলে নিজের কথাগুলি ছবির ভাষায় বুঝিয়ে দিলে আরো জীবন্ত হ'তো। শেষ দৃশ্যের climax তেমন সজীব ও মুগ্ধকর নয়—এ ছাড়া ছোট খাট দোষও কম নয়।

অহীন্দ্র চৌধুরী বরাহের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। স্থানে স্থানে মঞ্চ-ঘেষা অভিনয় হ'লেও একমাত্র অহীন্দ্র চৌধুরীর চিত্তাকর্ষক অভিনয়গুণেই খনা আনন্দ বিতরণ করতে পেরেছে। নায়িকা খনার ভূমিকায় ছায়া দেবী অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গানগুলি মন্দ হয় নি কিন্তু play back গানগুলি বহুস্থানে মেলেনি। মিহিরবেশে সুশীল রায়কে মানিয়েছিল ভাল। এঁর অভিনয়ে বড় একটা সজীবতা দেখা যায় নাই। খনার পাশে মিহিরের নিকৃষ্ট অভিনয়, কামন্দকের থিয়েটারের ভঙ্গিমায় কথা-বার্ত্তা, রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা ঢংএর আচরণ, ভৈরবের মূক অভিনয় এই চিত্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়-বস্তু। সেট, সাজ সরঞ্জাম অতি সাধারণ। শব্দ গ্রহণ ভাল হয় নি। ফটোগ্রাফী এক রকম, সঙ্গীত পরিচালনা মন্দ নয়।

অভিসারিকা

প্রযোজক—বি,এল, খেমকা
পরিচালক—ধীরেন গাঙ্গুলী
কাহিনী—অয়স্কান্ত বক্সী

প্রধান চরিত্রলিপি

বিকাশ—ধীরেন গাঙ্গুলী
তরুণী—সাবিত্রী
শাশুড়ী—রাজলক্ষ্মী

বহুদিন পর "হাল বাঙলার' পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় অভিসারিকা" রূপালী পর্দ্দায় রূপ নিয়েছে। নিকৃষ্ট কথাটির দ্বারা অভিসারিকার সমালোচনা শেষ করা যায়। অভিসারিকা আমাদের কৌতুকের পরিবর্ত্তে ব্যঙ্গ করেছে। হাসির ছবি তুলতে পরিচালকের যে নৈপুণ্য ও দূরদৃষ্টি থাকা দরকার এ ছবিতে তা প্রকাশ পায়নি। "অভিসারিকার" আখ্যানভাগ হাসির নয়—কেবল লেখক ও পরিচালকের পাগলামির খেয়াল মাত্র। তারপর কাহিনীর সঙ্গে ঘটনার কোন সামঞ্জস্যই নেই;—ইচ্ছেমত কতকগুলি সিন্ তুলে জোড়া দিয়ে দর্শকদের উপহার দেওয়া হ'য়েছে। জল থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করবার সময় বিকাশের গায়ে ছিল পাঞ্জাবী। যখন জল থেকে ওঠে এল,

দেখা গেল গায়ে গেঞ্জী এবং সামনেই একটা মোটার। কোথা থেকেই বা মোটার এ'ল, কে আনলে, কিছুই বোঝা গেল না। পাঁচ রিলের বই দুই রিলে সমাপ্ত হওয়া উচিৎ ছিল এবং প্রযোজকের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ছিল এমন নিকৃষ্ট ছবি তু'লে ছায়াচিত্রের প্রগতির পথে বাধা না দেওয়া। পরিশেষে আরেকটা কথা বলতে চাই—অভিসারিকা চিত্রের বাজে অভিনয় ছাড়া, অশ্লীল কথা-বার্ত্তা এই চিত্রের হচ্ছে আরেকটি বিশেষত্ব। তারপর বিকাশের স্ত্রীর শেষ পর্য্যন্ত মূক অভিনয়ই অভিসারিকায় একমাত্র কৌতুক জুগিয়েছে।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ :

নিউ থিয়েটার্স :

সাথী—আগামী ৩রা ডিসেম্বর শনিবার এই অপরূপ আনন্দচঞ্চল চিত্রখানি চিত্রা ও নিউ সিনেমায় এক যোগে মুক্তিলাভ করবে। যতদুর জানতে পারা গেছে সাথী চিত্রখানি সত্যকার আনন্দ বিতরণ ক'রতে অপারগ হ'বেনা। সাইগল ও কানন—ছায়াচিত্র-রাজ্যে দুই জন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গায়িকার সমাবেশ এবং এঁদের যুগল নৃত্য-গীত ও সুন্দর অভিনয়—এই চিত্রটীর হ'বে প্রধান আকর্ষণ। সুবিখ্যাত চিত্রনাট্যলেখক সাথীর পরিচালক ফণী মজুমদার হিন্দী 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রনাট্য কার্য্যে হাত দিয়েছেন। সরাইখানায় মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের সাক্ষাৎ, এই দৃশ্যটি এখন তোলা হ'চ্ছে। নবকুমার বেশে নাজামকে মানিয়েছে অতি সুন্দর। তারপর কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি-চরিত্রে অবতীর্ণা হ'চ্ছেন—লীলা দেশাই ও কমলেশকুমারী।

নিউ থিয়েটার্সের সাথী চিত্রের একটি দৃশ্যে কানন ও সাইগল

বড়দিদি চিত্রে নিভাননী, ছবি ও পাহাড়ী সান্যাল

দুশমন—

দেশের মাটির পরিচালক নীতীন বসু হয়ত উক্ত চিত্রের সাফল্য লাভে বঞ্চিত হওয়ায় একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছেন। দুশমন চিত্রখানি হ'চ্ছে প্রোপাগ্যাণ্ডা ফিল্ম। সুতরাং নাটকীয় উপদান যতই থাকুক না কেন পরিচালকের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভীষণ যক্ষা রোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তারপর দুশমন হিন্দি ছবি ব'লে আমরা নীতিন বসুকে বাংলার প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দ্দায় কিছুদিন দেখতে পাব না। দুসমন চিত্রে—গীতা (লীলা দেশাই) সায়গলের বিবাহ প্রস্তাবকে

বড়দিদি চিত্রের একটি দৃশ্যে চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী, রাজলক্ষ্মী ও শৈলেন চৌধুরী

উপেক্ষা করায় সাইগল কিছুদিন সে থেকে ছুটি পে'য়ে বেঁচেছেন। এবার যে সাহস ক'রে গীতার ভবনে নিত্য মটর ক'রে আসছেন তিনি ডাক্তার (নাজাম)। এই সুদর্শন ডাক্তারের ভাগ্য ভাল নইলে অভিভাবকের পক্ষ হ'তে এমন অভ্যর্থনা কখনও দেখা যায় না। সুটিং চলছে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে ছবিখানি শেষ হ'বে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

বড়দিদি—

বড়দিদি চিত্রে এলোকেশীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন মিস্ রাণী। সুরেন্দ্রের জীবনের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। মিস রাণীর কয়েকটি সুন্দর নাচ ও গান তোলা হয়ে গেছে। এখন বড়দিদির শেষ দৃশ্য তোলা হচ্ছে। শহরের বুকে গঙ্গার পাড় দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চলেছে। তাঁর চির

নিউ থিয়েটার্সের অধিকার চিত্রের একটি দৃশ্য

ফ্রাঙ্ক কাপরা পরিচালিত 'ইউ কাণ্ট টেক ইট উইথ ইউ' চিত্রের একটি দৃশ্যে জেমস্ ষ্টুয়ার্ট এবং জিন আর্থার

উপাস্য বড়দিদির সন্ধানে। তার প্রার্থিত ধন পেল বটে কিন্তু তার ভোগের সীমা কত সংকীর্ণ ছিল তা চিত্রেই সব দেখতে পাওয়া যাবে।

সাপুড়ে—

ছবিখানি তোলার মুখে পরিচালক অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। (সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়ালের তত্ত্বাবধানে) সেই সময়ে কাননের একটি গান রেকর্ড করা হয়। দেবকীবাবু সুস্থ হ'তে আবার সুটিং আরম্ভ হয়েছে এবং কানন, মনোরঞ্জন বাবু প্রভৃতিকে নিয়ে পুরাদমে কাজ চলেছে। মুক্তি ও সাথীর পর কাননকে এবার একটি সম্পূর্ণ নূতন ভূমিকায় দেখা যাবে।

অধিকার—

প্রমথেশ বড়ুয়া ও মিস্ যমুনা ইউরোপে ভ্রমণ শেষ করে' সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। এঁদের আসার আগেই বোম্বেতে হিন্দি অধিকার মুক্তিলাভ ক'রেছে, কিন্তু তেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। অধিকার চিত্রখানি ২৪শে ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তিলাভ ক'রবে। একই সময় গুরু ও শিষ্যের লড়াই মন্দ হ'বে না। তবে এ যুদ্ধে ফণী মজুমদার জয়ী হ'লে আমরা একটুও বিস্মিত হ'ব না।

জনকনন্দিনী—

ফণী বর্ম্মার পরিচালনায় তোলা রাধা ফিল্ম কোম্পানির নবতম পৌরাণিক চিত্র 'জনকনন্দিনী' প্রায় শেষ হ'য়ে এ'লো এবং সম্ভবতঃ অভিনয়ের পরেই রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে।

বাণীনাথ

MON-ROO

বৈদেশিক

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

ফ্যাসিজিমের উত্থান

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মিউনিক এগ্রিমেণ্ট দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থের ক্ষতি হইয়াছে। ফ্রান্সের ক্ষতি হইয়াছে অধিক। স্পেনের ব্যাপারের সমাধান চেম্বারলেন যে ভাবে করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সফল হইলে ফ্রান্সের প্রায় চতুর্দিকে থাকে ফ্যাসিস্ত বা ফ্যাসিস্ত-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র-সমূহ। ইউরোপে ফ্রান্সের একটিও মিত্র রাষ্ট্র রহিল না। তদুপরি জার্ম্মাণির কলোনির ক্ষুধা শান্ত করা যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তবে ফ্রান্সের আফ্রিকার বৈদেশিক অধিকার হইতেই তাহা দিতে হইবে।

গ্রেট ব্রিটেনের বর্ত্তমান কর্ণধার মিউনিক এগ্রিমেণ্ট পর্য্যন্ত গিয়াই থামেন নাই। মিউনিক এগ্রিমেণ্টের পর তিনি যে ভাবে মুসোলিনী ও হিটলারের প্রশংসার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি ত পুরা ফ্যাসিস্ত হইয়াছেনই, উপরন্তু ব্রিটেনের উপর ডিক্টেটরী করিতে তিনি উদ্‌গ্রীব। এংলো-ইটালীয়ান চুক্তি বলবৎ করার জন্য চেম্বারলেন লাগিয়াছেন; ইহা বলবৎ হইলে নাকি ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু, যে ভাবী ফল আমরা লক্ষ্য করিতেছি তদ্দারা স্পেনে ফ্যাসিস্ততন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে ও ভূমধ্যসাগরে ইটালীর শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুতঃ মিউনিক এগ্রিমেণ্ট দ্বারা মিঃ চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার যে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের নিষ্কৃতির আর উপায় নাই। ইটালী ও জার্ম্মাণীর দাবী ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে একের পর আর এক মানিয়া লইতে হইবে। এ সম্পর্কে জার্ম্মাণি ইউরোপে প্রসারের যে আশা পোষণ করে সে সম্পর্কে যে নয়টী নক্সা জার্ম্মাণি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিতরিত হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম :—

১। ১৯৩৮এর বসন্ত (spring)—অষ্ট্রীয়া অধিকার।

২। ১৯৩৮এর শরৎ—চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ অধিকার।

৩। ১৯৩৯এর বসন্ত—নাজী প্রভাবে হাঙ্গারী।

৪। ১৯৩৯এর শরৎ—হিটলারের কুক্ষিতে।

৫। ১৯৪০এর বসন্ত—যুগোশ্লাভিয়া জার্ম্মাণির সামন্ত রাজ্যে পরিণত।

৬। ১৯৪০এর শরৎ—রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া অধিকৃত।

৭। ১৯৪০এর বসন্ত—ফ্রান্সের উত্তরভাগ, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং ডেনমার্ক জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবে।

৮। ১৯৪১এর শরৎ—ইউক্রেইন ও দক্ষিণ রাশিয়া জার্ম্মাণ অধিকারে আসিবে।

এই যে আটটী মানচিত্রের কথা এখানে বলা হইল, তাহা সমগ্র ইউরোপের উপর মিউনিক এগ্রিমেণ্টের ফল কি হইতে পারে তাহারই পরিচায়ক। সত্যসত্যই যে হিট্‌লার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিবেন বা কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা কেহ মনে করে না। কিন্তু, তথাপি এই মানচিত্রগুলির মধ্য দিয়া অতিরঞ্জন (Caricature) দ্বারা মিউনিক এগ্রিমেণ্টের ফল ও গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের হীন অবস্থা অতি পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে।

সুদেতেন অঞ্চল গ্রহণের পর চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহাকেও ইতিমধ্যেই খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফ্যাসিস্ততন্ত্রীরা পূর্ব্ব ইউরোপে নিজেদের প্রভাব বিস্তৃত করিতেছে। এখানে অবশ্য একটা কথা বলা আবশ্যক—জার্ম্মাণী চাহিতেছিল রুথেনিয়াকে বিভাগ করিয়া পোলাণ্ড ও হাঙ্গারীকে দান করিতে। কারণ তাহা হইলে জার্ম্মাণির সংশয়াতীতরূপে বিনা বাধায়

রাশ্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু, মুসোলিনী বোধহয় মনে মনে হিটলারের এতটা সুবিধা করিয়া দেওয়া পছন্দ করেন না। সুতরাং মুসোলিনীর হস্তক্ষেপে রুমেনিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দান না করিয়া শ্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়ার একটা বৃহৎ অংশ হাঙ্গেরিকে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ইহাতেও হিটলারের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ার বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

ফ্যাসিস্ত ব্রিটেন—

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা হইতে মিঃ ইডেনের বহিস্কারের পর হইতেই ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা, বিশেষতঃ চেম্বারলেনের ফ্যাসিস্ত মনোভাব কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। অল্প অল্প করিয়া হিটলার ও মুসোলিনীর সহায়তা করিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা যেভাবে সমগ্র ইউরোপে ফ্যাসিস্ত নীতি প্রসারের সাহায্য করিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু চেক সমস্যা সমাধানের সময় চেম্বারলেনের ফ্যাসিস্ত সংযোগ যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ব্রিটেন কি ফাসিস্ত নীতি গ্রহণ পূর্ব্বক ডিক্টেটরী শাসন মানিয়া লইবে? সুদেতেন অঞ্চল হিটলারের হস্তে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প চেম্বারলেনের ছিল। মিউনিক এগ্রিমেণ্টের পূর্ব্বে তিনি ব্রিটিশমন্ত্রীসভার উপর চেক সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ও কার্য্য-পরিকল্পনা চাপাইয়া দিয়াছেন—মন্ত্রীসভার সম্মিলিত পরামর্শানুসারে কার্য্য করেন নাই। পরেও হিটলারের সহিত একত্রে ব্রিটেন ও জার্ম্মাণির মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই করিয়াছেন। অথচ, ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ঐ বিবৃতিখানা গুরুত্বপূর্ণ।

এতদ্ব্যতীত চেম্বারলেন যে ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ফ্যাসিস্তবাদের যে ভাবে শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে সত্যই মনে হয় চেম্বারলেন ব্রিটেনকে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণ বিশেষতঃ শোষিত জনসাধারণ কি চেম্বারলেনের ডিক্টেটরী শাসন লইয়া ব্রিটেনে ফ্যাসিস্ততন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিবে। ইহার জবাব একমাত্র ব্রিটেনের জনসাধারণই দিতে পারে।

রাশ্যা—

ফ্যাসিস্ত-বাদের যে ত্বরিৎ প্রসার হইতেছে তাহাতে জনগণের স্বার্থকামী মাত্রেরই ভীত হইবার কারণ আছে। ভয়ের নবতম কারণ হইতেছে (রাশ্যাবাদে) গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স এই দুইটী প্রধান ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদ্বয় ঐ দুই রাষ্ট্রকে ফ্যাসিস্ততন্ত্রে পরিণত করিবার পথে চলিতেছেন। সুতরাং স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র রাশ্যাই রহিল যে প্রাণপণ করিয়াও ফ্যাসিস্তবাদের প্রসারকে বাধা দিতে অগ্রসর হইতে পারে। এখানে স্মরণ রাখিলে ভাল হয় যে ইতিপূর্ব্বেই ফ্যাসিস্ততন্ত্র রাষ্ট্রত্রয়—ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপান—রাশ্যার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রোম বার্লিন টোকিও একসিসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এক্ষণে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনও কার্য্যতঃ ঐ একসিসের সহিত সংযুক্ত হইয়া তথাকথিত ইউরোপীয় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়া হত্যার পর রাশ্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার করা আবশ্যক। কারণ মিউনিক এগ্রিমেণ্ট অনুসারে কার্য্য হওয়ার পর বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত ফ্রান্স ও রাশ্যা পরস্পরকে সাহায্য করিবার সন্ধিতে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই সমস্যার উদ্ভব হইলেই ফ্রান্স যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে রাশ্যাও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সন্ধি সূত্রানুসারে সর্ত্তাদি পালন করিবে বলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে জানায়। কিন্তু, তৎপূর্ব্বেই চেম্বারলেন দালাদিয়ারের সহযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুতরাং রাশ্যা যতই চেকোশ্লোভাকিয়াকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করুক না কেন, প্যারি ও লণ্ডনে ফ্যাসিস্তবাদ সমর্থনকারীরা সমস্বরে রাশ্যা সন্ধিসর্ত্ত পালনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। পরের ঘটনাবলী বাদ দিলেও, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বহু পূর্ব্ব হইতে রাশ্যাকে বিচ্ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সেও এক শ্রেণীর ভিতর চলিয়া আসিতেছিল। এখন তো, ফ্রান্স যখন ফ্যাসিস্তবাদের কবলে পড়িয়া

গিয়াছে—ফ্রান্স রাশ্যার সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেই। রাশ্যার সহিত পরস্পরকে সাহায্য করিবার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্র ইউরোপে আর রহিল না। এদিকে আবার জার্ম্মাণী কার্য্যতঃ রাশ্যার সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

রাশ্যা দুর্ব্বল নহে—সমরোপকরণও তাহার অল্প নহে। সুতরাং একা হিটলার রাশ্যার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন না। রাশ্যার সহিত যুঝিতে হইলে রোম-বার্লিন-টোকিও এ্যাকসিস্‌তো চাই-ই—আরো চাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা। ঘটনা অবশ্য যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে এই সহযোগিতা—নিষ্ক্রিয় অপেক্ষা সক্রিয় হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক—জার্ম্মাণী হয়তো প্রয়োজনকালে পাইবে। এখানে আমরা রাষ্ট্রের কর্ত্তাদের কথাই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতা না পাইলে কর্ত্তারা যুদ্ধ চালাইতে পারেন না এবং এখানেই রাশ্যার অনুকূলে একটা শক্তি যাহা গণনার মধ্যে আনা যায় না, অথচ ফ্যাসিস্তুতন্ত্রসমূহকে রাশ্যাগ্রাসে প্রবল বাধা দিতে কাজ করিতেছে। রাশ্যা সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ কোনও দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় বলিয়া সারা পৃথিবী জুড়িয়া প্রত্যেক দেশেই রাশ্যার একদল শক্তিশালী ও কর্ম্মতৎপর সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী সমর্থক আছে। এ দলের আদর্শের সফলতা অনেকটা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশ্যার টিকিয়া থাকার উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যেক দেশে এই শক্তিশালী দলটি রাশ্যার বিরুদ্ধে আক্রমণের শক্তিকে পঙ্গু করিতে চেষ্টা করিবে। নিজের দেশের সীমার বাহিরে প্রত্যেক দেশে এই সমর্থক দল রাশ্যার খুব বড় একটা মিত্রশক্তি।

জার্ম্মাণীতে ইহুদী নির্য্যাতন

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে রাজনীতিক দাবা খেলায় হিটলার জিতিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের দেশের রাজনীতিক আবহাওয়া নাৎসীবাদের প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইউরোপের রাষ্ট্রকর্ত্তারা যুদ্ধকে তত ভয় করেন না, কিন্তু জনসাধারণ—যাহাদের রক্তে, অর্থে শান্তিপূর্ণ জীবন আহুতিতে যুদ্ধ সম্পন্ন হয়—তাহারা যুদ্ধকে রীতিমতো ভয় করে। বিশেষ করিয়া গত মহাসমরের বিভীষিকা ইউরোপের লোকের মন হইতে এখনও দূর হয় নাই। জার্ম্মাণীর জনসাধারণের তো কথাই নাই;—যুদ্ধ থামিবার পরও যে নির্য্যাতন ও দুঃসহ দুঃখ তাহাদের সহ্য করিতে হইয়াছে, যতদিন অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা অতি পুরাতন হইয়া নিশ্চিহ্ন না হইবে ততদিন বোধহয় জার্ম্মাণীর জনসাধারণ সে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলিবে না। কিন্তু, তাহারা যুদ্ধ চাহুক বা না চাহুক, অপর দেশ শোষণ করিতে পারিলে যাহাদের স্বার্থপুষ্ট হইবে তাহারা যুদ্ধ বাধাইবেই। তাই, গত সেপ্টেম্বরে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার লইয়া আর একটি মহাসমরের আশঙ্কায় আকাশ যখন কালো হইয়া উঠিল, তখন জার্ম্মাণীর জনসাধারণ নাৎসী নির্য্যাতনের ভয় সত্ত্বেও নাজীবাদের প্রতিকূল মনোভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিল। এমন কি কেহ কেহ প্রকাশ্যেও নাজীনীতির প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল। মিউনিক এগ্রিমেন্টের পরেও নাজীবাদের পক্ষে এই প্রতিকূল আবহাওয়া দূর হইল না। নাজীরা যতই অত্যাচার করিতে সমর্থক হউক না কেন, রাষ্ট্রতরীর হাল তাহারা যতই শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকুক না কেন, প্রতিকূল জনসাধারণের সম্মুখে—বিশেষতঃ সেই প্রতিকূল মনোভাব যখন যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হইতে পারে—তাহাদের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা খুব কম। সুতরাং হিটলার ও নাজীগণ খুব শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে কোনও উপায়ে হউক জনসাধারণের দৃষ্টি অপর কোনও বিষয়ে নিবদ্ধ করিয়া এই শঙ্কাজনক আবহাওয়া দূর করিতেই হইবে। অতএব নাজীরা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় ইহুদী নির্য্যাতনের পরিকল্পনা করিয়া জনসাধারণের মন হইতে যুদ্ধনীতি ও তৎসহ নাজী প্রতিকূল মনোভাব দূর করিতে সঙ্কল্প করিল।

ইহুদী নির্য্যাতনের অজুহাতও মিলিল। প্যারিসের জার্ম্মাণ দূতাবাসের কর্ত্তাকে জনৈক ইহুদী যুবক গুলি করিল। আর অমনি সারা জার্ম্মাণী জুড়িয়া ইহুদীদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন চলিল। ইহুদীদের বাড়ী, দোকান প্রভৃতির

পর অবাধে লুঠতরাজ চলিল, গৃহদাহ গৃহভঙ্গ প্রভৃতিও বিনা বাধায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অবর্ণনীয় শারীরিক নির্য্যাতনও ইহুদীদের ভোগ করিতে হইল। জার্ম্মাণ পুলিশ তো এই সকল বর্ব্বর অত্যাচারে বাধাই দিল না; উপরন্তু প্রচার বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ গোয়েবেলস্ এই সকল অত্যাচারকে জার্ম্মাণ অধিবাসীদের "বিরক্তি" ও "জনমত" বলিয়া সমর্থন করিলেন। যদিও প্রকাশিত তথ্য হইতেই প্রকাশ এই সকল অত্যাচার, কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তের কথা বাদ দিলে, একমাত্র নাজীগণই করিয়াছে। ইহার সহিত জনসাধারণ বা ডাঃ গোয়েবেলস্ কথিত জনমতের কোনও সম্পর্কই নাই। ইহুদীগণ তো বলিতেছে তাহাদের উপর নির্য্যাতন চালাইবার অজুহাত তৈরী করিবার জন্য প্যারিসের জার্ম্মাণ দূতাবাসের ঘটনা নাজীগণ কর্ত্তৃক সাজানো ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মিউনিকে পাঁচ হাজার নাজীর সভায় বক্তৃতা কালে জনৈক নাজীনেতা এ্যাডলফ ওয়েগনার বলিয়াছেন, যে সকল ইহুদীকে নাজী-প্রতিকূল আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার পরিকল্পনা নাজীগণ অনেক দিন হইতেই করিতেছিল। এ্যাডলফ ওয়েগনারের এই স্পষ্ট উক্তির পর, ইহুদীগণ "সাজানো-ঘটনার" কথা যাহা বলিতেছেন তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

নাজীগণ যে অত্যাচার করিল একা তাহাই যে কোনও লোকের মনেই তাহাদের সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করিতে যথেষ্ট। ইহার উপর নাজী অধ্যুষিত জার্ম্মাণ সরকার আইনের ভিতর দিয়া যাহা করিলেন তাহা জার্ম্মাণ সভ্যতা সম্পর্কে সকলের মনেই সন্দেহ সৃষ্টি করিবে। ইহুদীগণ কোনও প্রকার ব্যবসায় বানিজ্য করিতে পারিবে না। তাহাদের কাগজ, সিনেমা, থিয়েটার, স্কুল প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকুরী তো তাহারা পায়ই না। অপরদিকে তাহাদের ধন সম্পত্তি লইয়া অন্যদেশে যাইবার উপায়ও নাই। জগতের কোথাও তাহারা বসতি স্থাপন করিতেও পাইবে বলিয়া মনে হয় না। এখানেই শেষ নয়, নাজীগণ ইহুদীগণের গৃহাদির যে ক্ষতি করিয়াছে সে সকল পূরণ করিতে যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা আবশ্যক তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্যারিসের জার্ম্মাণ দূতাবাসের কর্ত্তার মৃত্যুর মূল্য স্বরূপ ইহুদীগণের উপর সমষ্টিগতভাবে এক হাজার মিলিয়ন মার্ক জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। বৃদ্ধ, আতুর, শিশু নির্ব্বিশেষে হিসাব করিলেও এই জরিমাণার পরিমাণ জার্ম্মাণ ইহুদীদের মাথা পিছু ১৩৬ পাউণ্ড-ষ্টার্লিং পড়িবে ও এই জরিমাণা জার্ম্মাণ ইহুদীর ও যে সকল ইহুদী অপর কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক নয় তাহাদের জার্ম্মাণিতে অবস্থিত সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ হিসাবে চার কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

ইহুদীদের উপরে এই নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া সকলদেশের জনসাধারণের উপরেই দেখা দিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কর্ত্তাগণও নাকি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ দুই রাষ্ট্রের সহিত জার্ম্মানির যে হৃদ্যতা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটুও আঁচড় লাগে নাই। বোধ করি উল্লিখিত রাষ্ট্র-কর্ত্তাগণ মর্ম্মাহত হইয়াও তাহা অল্পবিস্তর প্রকাশ করিয়া জার্ম্মাণির সহিত তাঁহাদের হৃদ্যতার বিষয়টিকে জনসাধারণের দৃষ্টির বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঐ দেশ দুইটীর প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রসমূহে এ বিষয়ে যাহা লেখা হইতেছে তাহাও বোধহয় একই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকর্ত্তা-গণকে সাহায্য করিবার জন্যই লেখা হইতেছে। সুতরাং ইউরোপে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার, ও তত্রত্য রাষ্ট্রকর্ত্তাগণের এ-সম্পর্কিত মনোভাবের প্রতি হিটলার বিশেষ দৃষ্টি দিয়া, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের সহিত তাহার যে হৃদ্যতা স্থাপিত হইতেছে তাহা নষ্ট করিয়া বোকামির পরিচয় দিতেছেন না। (যদিও নাজীরা শাসাইতেছে যে ব্রিটেন যদি জার্ম্মাণ ইহুদী লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান, তবে জার্ম্মাণীকেও প্যালেষ্টাইন ও ভারতের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে।

হিটলার দৃষ্টি দিতেছেন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে জার্ম্মাণীর নাজীদের ইহুদীদলনও যেমন রাজনৈতিক চাল, যুক্তরাষ্ট্রের জার্ম্মাণ ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনও তেমনি রাজনৈতিক চাল। চীনে জাপানী আধিপত্য ও রোম-বার্লিন-টোকিও

এ্যাকসিস যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর। অপরদিকে জার্ম্মাণী যেরূপভাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেণকেও রাজনীতিক চালে পরাজিত করিল, তাহাও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং, এই ইহুদী নির্য্যাতনকে যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মাণী তথা জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্যই মানবতার নামে যুক্তরাষ্ট্রের জনমতকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে তাতাইয়া তোলা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তাগণও যেমন সুচতুরভাবে অভিযানে অগ্রসর হইতেছেন, তেমনি তাহাদের ইহুদী-প্রীতির অপর দিকটাও নাজীদের নিকট গোপন নাই। সুতরাং হিটলার যুক্ত-রাষ্ট্রের ইহুদী প্রীতিতে সত্যকার অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন। অবশ্য এতটুকু অজুহাতে, যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী প্রীতির প্রাবল্য হউক না কেন, সশস্ত্র সমর বা তদ্রূপ কিছু ঘটিবে না, তবে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতিক অভিযান জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে চালাইবে; এবং তাহার আভাষও দেখা দিয়াছে।

চীন-জাপান

হ্যাঙ্কাউ ও ক্যান্টনের পতন ঘটিয়াছে। ক্যান্টনে অবশ্য চীনা সেনানায়কেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জাপানের সহায়তা করিয়াছে। এক্ষণে চীনারা ক্যান্টন পুনরায় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। মোটামুটি বলিতে গেলে সামনা-সামনি যুদ্ধের এবার শেষ হইল; চীনারা এবার শেষ আশ্রয় ও তাহাদের প্রধান অস্ত্র গরিলা যুদ্ধের শরণ লইবে। জাপানের সুবিধা হইল, চীনাদের অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর প্রধান পথের উপর এবার তাহারা লক্ষ্য রাখিতে পারিবে। অসুবিধা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ও আধুনিক যুদ্ধের পূর্ণ উপকরণ লইয়া তাহারা আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না। এতদিন তাহারা চীনের রেল লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এখন তাহাদের পথঘাটহীন দুর্গম চীনের দূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। এবং চীনের দূর অভ্যন্তরে তুলনায় জাপান অপেক্ষা চীনা গরিলা বাহিনীদেরই অধিকতর সুবিধা হইবে। চীনারাও জাপানের এই অসুবিধার উপর নির্ভর করিতেছিল।

চীনের বিরোধিতা করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে জাপান ভুল গণনা করিয়াছে। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ চীনকে সাহায্য করিতেছে না, তবুও চীন দমিত হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে না। জাপানকে শুধু যে চীনা সৈন্যের সহিত লড়িতে হইবে এমন নহে। তাহাকে চীনের কৃষকদের সহিতও লড়িতে হইবে। এ বিষয়ে চীনাকর্ত্তাগণ খুব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। চীনা কৃষকগণকে সামরিক শিক্ষা দিবার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং চীনা কৃষকগণকে বন্দুক বারুদ দেওয়া হইতেছে। এই সকল কৃষকদের কিয়দংশ গরিলা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে ও অপর অংশ নিজেদের ধন প্রাণ জাপানী বর্ব্বরতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। চীনা বাহিনীকে জাপান হয়তো নিশ্চিহ্ন করিতে পারে; কিন্তু এই সমস্ত শিক্ষিত ও বন্দুক-বারুদে সজ্জিত কৃষকরা থাকিতে জাপান কি চীনের উপর যথার্থ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে?

অপর দিকে বোধহয় ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার সীমাও শেষ হইয়া আসিল। আর এখনও যদি শেষ নাই হইয়া আসে, বিজয়ের পর জাপান চীন গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে এই শক্তি-ত্রয় জাপানকে নিজেদের সাম্রাজ্যের খাতিরেই বাধা দিতে বাধ্য হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী-প্রীতি বোধহয় চীন জাপান সম্পর্কে তাহার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইবার আভাষ দেয়।

দক্ষিণ চীনে জাপানের অপ্রতিহত আধিপত্যের অর্থ হইতেছে ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব এশিয়ায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তি লাঘব হওয়া।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাহাই ঘটুক না কেন, গ্রেট ব্রিটেন যে পন্থা এখন পর্য্যন্তও অনুসরণ করিতেছে তাহা তাহার মর্য্যাদা ও তাহার শক্তি সম্পর্কে অপরের ধারণা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সম্প্রতি চীনাদের সমর সম্ভারসহ একটি জাহাজ রেঙ্গুনে আসায় ও বার্ম্মা সরকার রণসম্ভারকে য়ুনীন—বার্ম্মা পথে প্রেরিত হওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ায় সমগ্র বার্ম্মাব্যাপী যে জাপান-আতঙ্ক দেখা দিয়াছে বার্ম্মা সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও তাহা দূর হইতেছে না।

প্যালেস্তাইন

প্যালেস্তাইন ত্রি-খণ্ডিত করিবার কথা উঠিবার পর

হইতে সেখানে গণআন্দোলন যেরূপ তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা ব্রিটেনকে খুবই আশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ আরবরা হৃদয় বিনিময়ের সত্যাগ্রহরূপ কৌশলও বুঝে না, বা বন্দুক ছুড়িতেও অপারক নয়। ফলে একদিকে যেমন সেখানে কড়া সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অন্যদিকে তেমনি উডহেড কমিশনের রিপোর্টে প্যালেস্তাইনকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব ব্যক্ত হইয়াছে। একটি রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সে আরব ও ইহুদীদের এক করিয়া একটা মিটমাটের চেষ্টা দেখিবার প্রস্তাবও চলিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ভালভাবেই জানে সামরিক শাসন—তাহা যত তীব্র ও দুঃখদায়কই হউক না কেন—প্রবর্ত্তন দ্বারা অধীনস্থ জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যায় না বা গণআন্দোলন চিরতরে ধ্বংস করা যায় না। গণ-আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে মিটমাটের কথা তোলা সাম্রাজ্যবাদের একটি কূট কৌশল। এই কৌশল ভারতের ব্যাপারেও অবলম্বিত হইয়াছে; ব্রিটেনের ইতিহাস খুঁজিলে আরো উদাহরণ যে না মিলিবে এমন নহে। কিন্তু, মুস্কিল হইতেছে এই, অধীনস্থ জাতিরা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হয়। আর, আরবগণের সম্মুখে রহিয়াছে তো মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বকার ভারত সম্বন্ধীয় রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্স ও তদনুবর্ত্তী ঘটনা সমূহের অভিজ্ঞতা।

প্যালেস্তাইনে ভারতের ব্যাপারের নিখুঁত পুনরাভিনয় হইতে চলিয়াছে। একদিকে ব্রিটিশ সিংহের রক্তচক্ষু, অপরদিকে রাউণ্ডটেবিলে বাছিয়া বাছিয়া প্রতিক্রিয়াশীল আরবগণনেতাগণ কর্ত্তৃক দেশদ্রোহী বলিয়া আখ্যাত আরব-দিগকে নিমন্ত্রণ করা। কিন্তু আরবগণনেতাগণ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, ইমিগ্রেশন বা ইহুদী আমদানী, জমি সম্পর্কিত আইন ও কোন প্রকার গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসা না হইলে আরব জনমত রাউণ্ডটেবিলদ্বারা শাসিত করার আশা ব্যর্থ হইবে।

আরবদিগকে মিষ্টমুখে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টায় অবশ্য ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কমতি নাই। হাউস-অব-কমন্সে মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন, তিনি যদি আরব হইতেন তাহা হইলে, ইহুদী যে ভাবে আমদানী হইয়াছে তাহাতে তিনিও ভীত হইতেন। ব্যালফুর-ঘোষণা বা ম্যানডেট প্রতিষ্ঠার সময় অবশ্য আরবদিগের সহিত পরামর্শ করা হইবে (?) কিন্তু যে ভাবে ও যে শ্রেণীর আরবের সহিত পরামর্শের আয়োজন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় আরব নেতাদের নিকট ব্রিটিশের পাকা রাজনৈতিক মস্তিস্কই হারিয়া যাইবে। ব্রিটেন মনে রাখিলে ভাল করিত যে, শত্রু প্যালেস্তাইন অপেক্ষা স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত বন্ধু ও আরব অধ্যুষিত প্যালেস্তাইনই তাহার সহায়।

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

পৃথিবীর চিড়িয়াখানায়

শ্রীবিমল সেন

স্কটল্যাণ্ডের এক ক্ষুদ্র শহরে ঘটনাটি ঘটে।

মে মাস। গাছ-পালা সবুজ পাতায় এবং নানা রঙের ফুলে আবার সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের চূড়ায় আর বরফ দেখা যায় না। পার্ক এবং 'লন্'গুলিতে টাটকা সবুজ ঘাসের বাহার খুলিয়াছে। ওভারকোট ছাড়িয়া সকলে ফুল দেখিতে এবং 'সান্ বাথ' লইতে দলে দলে বাহির হইয়াছে।

বেলা একটার সময়ে 'লাঞ্চ' খাইয়া, সুবোধ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। আকাশে এক খণ্ড মেঘও নাই। রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। এদেশে সূর্য্যের মুখ বড় একটা দেখা যায় না। দারুণ শীতের পর সেদিন প্রথম রোদ উঠিয়াছিল; তাই পথে এত লোকের ভীড়।

সুবোধেরও আর ঘরে মন টিকিল না। বেড়াইবার মত দিনই বটে। হ্যাট মাথায় দিয়া 'রেন-কোট' হাতে ফেলিয়া সেও বাহির হইয়া পড়িল।

নিকটেই এক মস্ত বড় পার্ক। সেইখানেই লোকের ভীড় বেশি। যে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার চারিদিকে ঘড়ো হইয়া উৎফুল্ল মুখে সকলে ফুল দেখিতেছে। ছেলেরা, কোট খুলিয়া, ছাঁটাই করা ঘাসের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া হ্যাট দিয়া মুখ ঢাকিয়া 'সান-বাথ' লইতেছে। মেয়েরা যত্ন সহকারে যতটা সম্ভব নিজেদের অঙ্গ অনাবৃত করিয়া, নানা ভঙ্গিতে শুইয়া আছে। শুধু 'সান-বার্থ' লওয়াই যে তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহা ঐ শুইবার ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। বড় গরম! তাই বেচারি মেয়েরা গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না!

পার্কের মাঝখানে একটি বড় 'লেক্'। ছোট ছোট নৌকায় করিয়া অনেকে 'রোইং' করিতেছে। টেনিস-লন এবং ক্রিকেটের মাঠগুলিতেও লোক ভরা। সবার মুখে হাসি; সবার মুখে একই কথা—চমৎকার দিনটা—না?

লোকের ভীড় সুবোধের ভাল লাগে না। তাই সে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান দিয়া হাঁটিতেছিল। অবশ্য, 'নির্জ্জন স্থান' বলিতে আজ আর কিছু নাই। ঝোপ-ঝাড় গুলিতেই ছেলে মেয়েদের ভীড় বেশি।

পার্কের এক কোণে একটি গির্জ্জা এবং তাহার সংলগ্ন গোরস্থান। পার্কের এদিকটায় কেহ বড় একটা আসে না। সে দিনও সেখানে কেহ ছিল না। অদূরে একটি ঝোপের ভিতর বেঞ্চের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। অনেক হাঁটিয়া ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সুবোধ সেই বেঞ্চটার দিকে অগ্রসর হইল।

পাশেই একটি ছোট নদী কুল কুল করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

ঝোপের নিকটে আসিয়া হঠাৎ সুবোধ ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একটা লোক মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে। দেহের কতকটা অংশ মাটিতে এবং কতকটা বেঞ্চের উপর। তাহার সারা মুখ এবং আসে-পাশের স্থান রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। হাতের কাছেই একটা পিস্তল পড়িয়া। চোখ দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত। মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ব্যাপার যে কি, তাহা বুঝিতে সুবোধের একটুও বিলম্ব হইল না। প্রথমেই তাহার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পালায়; নহিলে ফ্যাসাদে পড়িবে। কিন্তু পলাইতে গিয়া যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলেও বিপদের সম্ভাবনা। চাহিয়া দেখিল নিকটে কোথাও কেহ নাই। শেষে পলায়নই শ্রেয় মনে করিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেঞ্চ-এর উপর একখানা সাদা খাম্ পড়িয়া আছে।

এইবার কৌতূহলও দেখা দিল। নিকটে কেহ না

থাকিলেও পলায়নটা ঠিক হইবে না। দূর হইতেও ত কেহ লক্ষ্য করিতে পারে। লোকটা যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা ত পরিস্কার বোঝা যায়। পলাইতে গিয়া অনর্থক হয় ত পুলিশের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে।

সুবোধ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। লোকটা মাথায় কানের সামনে গুলি করিয়াছিল। খুলি ভেদ করিয়া গুলি বাহির হইয়া গিয়াছে।

জামা কাপড়ে রক্ত চাপ বাঁধিয়া আছে। সে বীভৎস মুখের দিকে সুবোধ আর চাহিতে পারিল না। বেঞ্চ হইতে খামটা তুলিয়া লইল। খোলাই ছিল। তাহার ভিতর দুইখানা এক পাউণ্ডের নোট এবং দুই টুকরা কাগজ দেখিতে পাইল। প্রথমটায় লেখা—

'যে আমাকে প্রথম দেখিতে পাইবে, তাহার প্রতি আমার অনুরোধ, সে যেন পুলিশে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে এই টাকা এবং চিঠি লইয়া—নং, হাইষ্ট্রীটের মিসেস ষ্টিফেন্স—আমার স্ত্রীকে দিয়া আসে। কারণ পুলিশের হাতে এই চিঠি এবং টাকা পড়িলে, আমার স্ত্রীর পাইতে দেরি হইবে। তাহার প্রয়োজন নাই। আমার পকেটে আর একখানা চিঠি আছে। আমি যে আত্মহত্যা করিয়াছি একথা প্রমাণ করিবার জন্য সেই চিঠিই যথেষ্ট হইবে। সুতরাং অন্য কেহ দেখিয়া না থাকিলে, তুমি এক্ষুনি সরিয়া পড়িয়া, আগে আমার এই উপকারটা করিয়া দিতে পার। থ্যাঙ্ক ইউ, বন্ধু!'

উহার সহিত আর এক টুকরা কাগজ ছিল। নিজের স্ত্রীকে লিখিয়াছে—

'ডার্লিং,

বিদায়! এ পৃথিবীতে আর আমার থাকিবার হুকুম নাই। একমাত্র আশ্রয়, আমার সামান্য চাকরিটিও আজ গেল। এক সপ্তাহের মাহিনা দিয়া, জবাব দিয়াছে। আমার মস্ত বড় সান্ত্বনা ছিল—তোমার ভালবাসা। ইদানিং, তুমিও যেন আমার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছ। হইবেই বা না কেন! তোমাকে বিবাহ করিবার পর এক দিনও ত একটু সুখে রাখিতে পারি নাই। তাই আজ তোমাকে মুক্তি দিয়া গেলাম। অন্য কাহাকেও বিবাহ করিয়া সুখী হইও। আমি জানি, তুমি মনে মনে আমায় কত ভালবাস। সেই ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া এবং আমি গেলে, আবার বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে ভাবিয়াই এ কাজ করিতে সাহস পাইলাম। তোমাকে আর এ মুখ দেখাইতে পারিব না।

মাহিনার টাকা ক'টা রহিল। তোমার কাজে লাগাইও। বিদায়, ডার্লিং,

জন্'

মৃতের পকেটে আর একখানা চিঠি ছিল। 'করোনার'কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছে—

'আমার এ কাজের জন্য অন্য কাহাকেও জড়াইবার প্রয়োজন নাই। নিজেই এ কাজ করিতেছি। সুতরাং 'সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি' বলিয়াই 'ভারডিক্ট' দিও। আমার নাম—জন ষ্টিফেন্স।—নং হাই ষ্ট্রীটে বাড়ী। আত্মহত্যার কারণ—বেকার অবস্থা।'

সুবোধ আর একবার চারিদিক চাহিয়া লইল। তখনও নিকটে কেহ ছিল না। 'করোনারের' চিঠিখানা আবার মৃতের পকেটে রাখিয়া দিয়া, অন্য চিঠি এবং টাকা লইয়া সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তখন তাহার ভয় অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। চিঠি দুইখানা থাকিতে তাহার আর ভয়ের কি আছে? বাহিরে আসিয়া মনে হইল, কি এখন তাহার করা উচিত? চিঠিখানা মিসেস্ ষ্টিফেন্সের বাড়ী আগে লইয়া যাইবে, না, আগে পুলিশে সংবাদ দিবে? শেষে সে মিসেস ষ্টিফেন্সের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিল। তাহারাই যাহা ভাল বোঝে করিবে।

পথ চলিতে চলিতে তাহার মন ভারি হইয়া উঠিল। হায়রে, এ ট্রাজিডি বুঝি আজকাল সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরে অন্ন নাই; গায়ে বস্ত্র নাই; সামান্য মাহিনার চাকুরিটিও যখন চলিয়া যায়, তখন মানুষ সত্যই বুঝি পাগল হইয়া ওঠে। সুবোধের মনে পড়িল, নিজের হতভাগ্য দেশের কথা। সে দারিদ্র্য যে কত ভীষণ তাহা ইহারা হয়ত ধারণাও করিতে পারিবে না। তবু তাহারা বাঁচিয়া থাকে। এত সহজে আত্মহত্যা করিয়া বসে না।...যাক,

সে কথা। মিসেস ষ্টিফেন্সের জন্যও ভাবিতে হইবে না। জন ত তাহাকে মুক্তি দিয়াই গিয়াছে। তাহার আবার দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে বিলম্ব হইবে না। তবে, এমন হঠাৎ এ নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনাইবার পর, তাহাকে ঠাণ্ডা করিবে কি করিয়া—ইহা ভাবিয়াই সুবোধ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। আহা বেচারি, স্বামীর এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিলে তাহার বুকে কত বড় আঘাতই না লাগিবে। হয়ত 'ফিট' হইয়া পড়িবে। বাড়ীতে যদি অন্য কেহ না থাকে তাহা হইলে তখন সে কি করিবে?

ভাবিতে ভাবিতে সে যখন হাই ষ্ট্রিটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। জন-এর বাড়ী খুঁজিয়া লইতে অধিক বেগ পাইতে হইল না। রাস্তার দুই পার্শ্বে, পুতুলের খেলাঘরের মত সারি সারি ছোট বাড়ী। তাহারই একটি বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া সুবোধ ঘণ্টায় টান দিল।

ভিতর হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। ঘণ্টার শব্দ হইতেই থামিয়া গেল। কিন্তু দরজা খুলিতে কেহই আসিল না। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সুবোধ আবার ঘণ্টায় টান দিল। এবং অনতিবিলম্বে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল।

বয়স তেইশ-চব্বিশ বৎসর হইবে। মোটামুটি সুশ্রী দেখিতে। সোনালী চুলগুলি অবিন্যস্ত। চোখ দুটি এবং মুখ জবাফুলের মত লাল। চোখে আবেশ-ভরা চাহনি। কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই 'বিয়ারের' গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্রও অবিন্যস্ত। স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। টানিয়া টানিয়া সুবোধের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল —কি চাও?

সুবোধ হ্যাট খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মিসেস ষ্টিফেন্স কি এই বাড়ীতে থাকেন?

স্ত্রীলোকটি আর একবার তাহার দিকে চাহিয়া দুই হাত তফাতে সরিয়া গিয়া রুক্ষ, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—আমিই মিসেস ষ্টিফেন্স।...কি চাই?

সুবোধ অবাক হইয়া গিয়াছিল। একটু ইতঃস্তত করিয়া শেষে বলিল—মিঃ ষ্টিফেন্সের খবর এনেছি। আপনার সঙ্গে একটু একান্তে কথা কইতে পারি?

স্ত্রীলোকটি আরও একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—একান্তে কথা কইবার দরকার কি? কি খবর এনেছ এইখানেই বল না।

প্রথম দর্শনেই স্ত্রীলোকটির প্রতি সুবোধের অশ্রদ্ধা হইতেছিল। তবু যথাসাধ্য সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বলিল—ভাল খবর নয়, মিসেস ষ্টিফেন্স। বাড়ীতে আর কেউ আছে?

সে এবার প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিল—সে খবরে তোমার দরকার কি? কি জন্যে এসেছ,—বলতে হয় এইখানেই বল; না হয়, বেরও এখান থেকে।

সুবোধ আর বাক্যব্যয় না করিয়া চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিল—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিসেস ষ্টিফেন্স। এই অপ্রিয় কাজের ভার বিধাতা আমার উপরই দিয়াছেন।

তাহাকে লেখা চিঠির টুকরাখানা সে পূর্ব্বেই আলাদা করিয়া রাখিয়াছিল। মিসেস ষ্টিফেন্সের চিঠি এবং টাকা সমেত খামখানা সে তাহার হাতে দিল।

মিসেস ষ্টিফেন্স সেইখানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চিঠিখানা পড়িল। কিন্তু, এ দুঃসংবাদ পড়িয়া সে চোখে রুমাল চাপাও দিল না, 'ফিট' হইয়াও পড়িল না, চেহারার কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না। সুবোধের দিকে চাহিয়া বলিল—থ্যাঙ্ক্ ইউ ভেরি মাচ; আমি বুঝতে পারিনি। এসো, বসবে, এসো।

পাশেই 'সিটিং রুম'। সেই ঘরে লইয়া গিয়া, সুবোধকে বসিতে বলিয়াই ডাকিল—বব্।...'ইট্‌স্ অল্ রাইট, বব্'। এসো এ ঘরে।

পাশের ঘর হইতে বব্ ও বিয়ারের গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারও চোখ-মুখ লাল। তবে; মিসেস ষ্টিফেন্সের মত অত বেসামাল অবস্থা নহে। লম্বা-চওড়া, জোয়ান পুরুষ। চোয়াড়ে চেহারা দেখিয়াই যেন হিংস্র প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়।

তাহার চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। ইতঃস্তত করিতে করিতে

ঘরে আসিয়া সুবোধের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে ?

মিসেস ষ্টিফেন্স জন-এর চিঠিখানা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—পড়ে দেখ।

চিঠি পড়িয়া বব্-এর চোখের ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, ভীত কণ্ঠে বলিল—কী সর্ব্বনাশ! এ কি কাণ্ড!...কোথায় দেখতে পেলে তাকে ?

কথাটা সুবোধকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। কিন্তু, সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মিসেস ষ্টিফেন্স বলিল—ওকি, অত ভয় পাচ্ছ কেন, বব্ ?...নেশা হয়েছে ?...হিঃ, হিঃ, হিঃ,... ড্রিঙ্কটা সব শেষ করেছ বুঝি ?...দাঁড়াও তাহলে, আমিও আমারটা শেষ করি। শেষে সব শোনা যাবে।

বলিয়া আলমারি খুলিয়া, অর্দ্ধ সমাপ্ত বিয়ারের গেলাস্ বাহির করিল।

বব্ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাহার দিকে একবার বিরক্তি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, সুবোধকে বলিল—কিছু মনে ক'র না...বুঝতেই ত পারছ,...মিসেস ষ্টিফেন্সের এখন অবস্থা স্বাভাবিক নয়। তাই, ব্যাপার বুঝতে পারছে না। 'ডোজ্' বেশি হয়ে গেছে।...কিন্তু, তুমি...

মিসেস ষ্টিফেন্স তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অবশিষ্ট বিয়ার এক চুমুকে শেষ করিয়া, আবার হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বলে কিনা, আমার 'ডোজ' বেশি হয়ে গেছে।...মাতালদের কি আর কথার ঠিক আছে ?...তুমিই ববং কিছু বুঝতে পারছ না...তুমিই বুঝছ না যে, এবার আমি মুক্ত...সম্পূর্ণ মুক্ত...আর আমাদের বিয়ে হতে কোন বাধা হবে না...হিঃ, হিঃ, হিঃ,...এই আসল কথাটাই বুঝতে পারলে না, বব্ ডার্লিং ?...বলে কিনা...

কিন্তু বব্ মহা অপ্রস্তুত হইয়া একবার সুবোধের দিকে এবং একবার মিসেস ষ্টিফেন্সের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল —ছিঃ, ছিঃ, চুপ কর, মিসেস ষ্টিফেন্স। এ সময়ে অত বেসামাল হলে কি চলে ?...

...কিছু মনে ক'রনা, মিষ্টার...মিষ্টার...তোমার সঙ্গে যে এখনও 'ইনট্রোডাকশানটাও হল না...বুঝতেই ত পারছ ওর অবস্থা ? আমি এদের বন্ধু; আমাকে সব বলতে পার।...তুমি ঐখানে স্থির হয়ে বসো, মিসেস ষ্টিফেন্স, আমি সব শুনছি।

মিসেস ষ্টিফেন্স স্থির হইয়া বসিল না। বরং ছুটিয়া আসিয়া বব-এর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—আর আমাদের ভয় কিসের, ডার্লিং ?...ওখানে কেন স্থির হয়ে বসতে যাব ? আমার স্থান যে এখন এখানে।...ও কি, অমন করছ কেন, বব্ ?...আর বুঝি আমাকে ভালবাস না ? ওঃ তুমি কি নিষ্ঠুর !

বলিয়া সে ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেচারি বব-এর তখন শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে মিসেস ষ্টিফেন্সের কানে ফিস ফিস করিয়া বলিল—চুপ কর, ডরোথী; ছিঃ! ঘরে একজন বাইরের ভদ্রলোক রয়েছে, ও কি মনে করবে ? তোমাকে ভালও বাসি, বিয়েও করব। কিন্তু, এখন চুপ করে একটু বসো।

বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া দিয়া, সুবোধের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া মুখ কাঁচু মাচু করিয়া বলিল—দেখত, কি কাণ্ড ? এমন বেসামালও হয় ?...যাক্, এ সব কথা কাহাকেও বল না, মিষ্টার, তোমাকে অনুরোধ করছি। আমি সত্যই বড় লজ্জিত।...এখন বল ত ব্যাপারটা। কোথায় দেখলে তাকে ?

সুবোধের মন এতক্ষণে ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এ-ই জনের স্ত্রী; যাহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, ইহার ভালবাসা। সেই ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়াই জন্ ইহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে।...অথচ, তাহার অলক্ষিতে ইনি যে কি কাণ্ড করিতেছিলেন, তাহা সে বেচারি বোধহয় সন্দেহও করে নাই। ভালই হইয়াছে, সে মরিয়াছে। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইল না।

সুবোধের আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সংক্ষেপে বব্‌কে আজিকার বিবরণ দিয়া, অন্য চিঠির টুকরা বাহির করিয়া দেখাইল। বলিল—সেই জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।...এখন তোমরা কি করবে কর—আমার দেরি হচ্ছে।

বব্ তাহাকে বার বার ধন্যবাদ দিয়া বলিল—তোমার বড় দয়ার শরীর দেখছি। ধন্যবাদ।…আহা বেচারি জন! সে আমার বড় বন্ধু ছিল। তার এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমি কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। এতই যখন করলে, তখন আর একটু সাহায্য করবে, ভাই? অনেক কিছুই ত করতে হবে; পুলিশে খবর দিতে হবে। চল, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক। তুমি সঙ্গে থাকলে একটু সাহস পাব।…মিসেস ষ্টিফেন্স থাক এখানে।…কিন্তু, ভাই আজকের এ সব কথা যেন কারুকে বলো না। বুঝতেই ত পারছ সব।—কেমন? চল, আর দেরি নয়।

মিসেস ষ্টিফেন্স তখন চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িয়া, ছিঁচ কাঁদুনি কাঁদিতে কাঁদিতে, নাকি সুরে বলিয়া চলিয়াছে—সব পুরুষ মানুষেরই ঐ ধরন! যখন বাধা ছিল, তখন কি সে ঢলাঢলি! আর যেমনি হাতের মুঠোর ভেতর পেয়েছে, অমনি সব প্রেম উবে গেল।…ওঃ, কি নিষ্ঠুর… কি বেইমান…কি……

বব্ সুবোধের হাত ধরিয়া টানিয়া ঘর হইতে বাহিরে লইয়া আসিল।

শ্রীবিমল সেন

বিকাশ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

পূর্ণ করিয়া পুষ্প নিজেরে বিকাশে
আলোকে আঁধারে গন্ধ বিলায়ে বাতাসে
  কোনো দ্বিধা নাহি কিছু নাহি তার ভয়
  বিকশি তুলিতে কিছু নাহি সংশয়
  মুক্তির সুখে সহজে ফুটিয়া উঠি
    স্নিগ্ধ মধুর বাসে।

আপনারে আমি ফুটায়ে তুলিতে চাই
মনে মনে তারি বিফল বেদনা পাই
  সকলের কথা অন্তরে আসি বাজে
  আমার কথাটি বিকশিতে পারে না যে
  সহজে তাহারে বাহিরে ফুটায়ে তুলি
    এমন ক্ষমতা নাই।

আমার পরাণে সকলে মিলায় আসি
আমার পরাণে বাজিছে সবার বাঁশি
  আমার বাঁশরী কেহ নাহি আর শোনে
  আকুল করিয়া বাজে সে আমারি মনে
  সকলের সুর শুধু জানি অন্তরে
    নীরবে বেড়ায় ভাসি।

[library stamp: ...MON-RO...]

বীরভূমের পল্লীপথে *

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ

এবার 'আনন্দময়ীর আগমনে' যে ভাবটি সারা দেশের মনকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল, তার মধ্যে আনন্দের অংশ কতখানি ছিল তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন; তবে ক'লকাতা সহরে, আমাদের মত জনসাধারণের চোখে প্রতিবারের মতই দু'টি জিনিষ পড়েছিল: একদিকে মহানগরীর দোকানগুলি 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মত' ক্রেতা ও বিক্রেতার গুঞ্জনে মুখর হ'য়ে উঠলো, আর একদিকে সিটি বুকিং অফিসের দরজায় দরজায় দূর দেশের মৌন আহ্বানগুলি বিচিত্র চিত্রে ও সুলভ ভাড়ার ইঙ্গিতে নিঃসম্বল নাগরিকের বুকে জাগিয়ে তুলতে লাগলো 'মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাশরি।' তবে কিনা, আমাদের মত এমন দু' চার জনও আছেন, যাঁরা জন্মান্ধের মতই জন্মনিষ্কাম। অতএব হরতুকীবাগান থেকে কুমোরটুলী ভায়া বাগবাজার এণ্ড ব্যাক্—এই প্রোগ্রাম্ নিয়েই পূজোর দিনগুলি বেশ প্রসন্ন চিত্তেই কাটছিল।

এমনি ভাবে অবস্থার সঙ্গে আপোস্ ক'রে যখন দিন চ'লছে, দুর্গতিনাশিনী দিলেন একটা গতি ক'রে। সিউড়ি থেকে রায়সাহেব লালা মৃত্যুঞ্জয়লাল পত্রে পাঠালেন একখানি ছোট্ট ভ্রমণের পরিকল্পনা এবং তারই উপসংহারে একটি সস্নেহ আমন্ত্রণ। সঙ্গী হ'তে হবে। একটি প্রলোভন, অপরটি তদধিক মধুর কর্ত্তব্য। দুই দুর্লঙ্ঘ্য। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পূর্ব্ব রাত্রি—চাঁদের আলোয় আর অসংখ্য দীপমালার প্রতিবিম্বে হাওড়ার পুলের দু'পাশে গঙ্গাবক্ষ যখন ঝলমল্ ক'রছে—আমার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তখন ষ্টেশনের ঘড়ির পানে। দশটা পঁচিশের গাড়ীর ১২ মিনিট বাকি।

সারারাত্রি চলন্ত ট্রেনে নাক ডাকিয়ে এবং ভোর বেলা চোখ রগড়াতে রগড়াতে সিউড়ি ষ্টেশনে নেমে, সেই কথাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ভ্রমণ কাহিনী নাম দিয়ে সম্পাদক মশায়ের হাতে পাঠা'ল, তিনি যদি বা ছাপেন, পাঠকবর্গের অভিশাপ এড়াতে পারবো না। অবশ্য পরবর্ত্তী ঘটনাগুলিও আমার মত কূপমণ্ডুকের কাছে ভ্রমণ পদবাচ্য হ'লেও তাকে কাহিনী নাম দিয়ে আজকালকার বহুপঠিস্নু পাঠক সমাজে কাটানো যায় কিনা সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ নই। কিন্তু গল্প বলার ঝোঁকটা এমনি নিরপেক্ষ যে শ্রোতার আগ্রহের কথাটাও অনেক সময় গৌণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। দাদামশাই হবার ভাগ্য যাঁর হ'য়েছে তিনি এ কথা বোঝেন।

সিউড়ি ষ্টেশনে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর গাড়ীর খোঁজ পাওয়া গেল না। দোষ ছিল না তাঁর পক্ষে, কারণ পত্রের নির্দ্দেশ মত তাঁর গাড়ী ইতিপূর্ব্বে একবার ফিরে গেছে। সুতরাং একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করা গেল। কষাহত অশ্বিনীকুমার দু'টি যখন মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সদর দেউড়ীতে প্রবেশ ক'রলো আমার ঘড়িতে তখন ৮টা। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি, তিনি সহাস্যমুখে অপেক্ষা ক'রছেন। সত্তর বছরের যুবা; সুনিয়ন্ত্র ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের একটি লজ্জাকর (আমাদের মত নব্যদের পক্ষে) উদাহরণ। গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়ে শুনলুম, বাড়ী শূন্য। রায়সাহেবের এই বাড়ীটি কর্ম্মব্যপদেশে সিউড়ির আস্তানা হ'লেও এঁদের পৈতৃক ভিটে সিউড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে তিলপাড়া গ্রামে। আজ তিনপুরুষ থেকে প্রতিবছরই এই গ্রাম্যগৃহে দশভূজার শুভাগমন হ'য়ে আসছে। সেই

* আমাদের সঙ্গে "ক্যামেরা" ছিল না বলে আলোকচিত্র দিতে পারলাম না। এরজন্য কাহিনীর বিশেষ অঙ্গহানি ঘটেছে বোধহয় না; কারণ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সঙ্গে চোখের চেয়ে মনের সম্পর্কই বেশী ছিল। তবে রচনাগত ত্রুটী যদি কিছু থাকে তা' আমার অক্ষমতার। লেখক।

উপলক্ষে এবারও পরিবারবর্গ দেবীপক্ষের আগেই সেখানে গেছেন। মোটর অপেক্ষা ক'রছিল; আমরা স্নান ও প্রাতরাশ সমাধা ক'রে তিলপাড়া রওনা হলাম। একটা কথা না বল্‌লে একটু ফাঁক থেকে যায়। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব পুরাতন না হ'লেও একটু আকস্মিক। সে কথা থাক, তবে তিনবছর আগে রাস্তায় ধাক্কা লাগ্‌লেও যে চিন্‌তে পারতেন না, এবং এখন তিনদিন খবর না পেলেই যে চিন্তিত হন্—একথা ঠিক। আর এই যে আপনাদের কাছে এত ঘন ঘন "মৃত্যুঞ্জয় বাবু" বলছি, এ ডাকে এখন তিনি সাড়া দেন.না, "দাদু" বল্‌তে হয়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

তিলপাড়া গ্রামখানি ছোট। উচ্চবর্ণের বসতি বিরল। দেখবার কিছু না থাক্‌লেও বেরুলাম। দাদু, তাঁর ছেলে লালা রামচন্দ্র লাল, এবং কলকাতা থেকে আগত একটি ভদ্রমহিলা সঙ্গী হলেন। রামবাবু সিউড়ি কোর্টে প্রাক্‌টিস করেন এবং জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। অমায়িক আমুদে ভদ্রলোক। বাঙালীর চাকুরী-মনোভাবের জন্য এত গভীর ক্ষোভ এঁর, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ব্যবসা-প্রবণতা এত প্রবল যে দাদুকে তাঁর একটি চোখ এবং একটি কান এই ছেলেটির জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখতে হয়; নইলে কোনদিন যে রাতারাতি ভাগ্যকুলের উপর টেক্কা মেরে অকূলে ভাগ্য ভাসিয়ে বসেন, ঠিক নেই। আমার ধাতুর সঙ্গে এঁর এই দিক দিয়ে খানিকটা মিল থাকায়, দুজনে তিলপাড়ার মাঠে poultry farming এর একটা বিপুল সম্ভাবনার আলোচনায় বিভোর হ'য়ে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের তেজকে প্রায় ফাঁকি দিতে দিতেই বাড়ী এসে পৌঁছুলাম। খাওয়া দাওয়ার পর ভ্রমণের প্রোগ্রামটার কথা পাড়তেই রামবাবু তাকে লুফে নিয়ে যে প্ল্যানটি দিলেন তার মর্ম্মার্থ এই:—ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের তরফ থেকে মফঃস্বলের ইউনিয়নগুলি পরিদর্শনের জন্য তাঁকে যেতে হবে। যান মোটর, পথ স্থানে স্থানে সন্দেহজনক হ'লেও অধিকাংশই motorable (রথ্যা?)। বীরভূম একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবের মহাতীর্থ। এর দুই প্রান্তে কেঁদুলি ও নান্নুর প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব ও চণ্ডীদাসের স্মৃতি বুকে নিয়ে অমর হ'য়ে আছে; আর একদিকে বাংলার সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি, শান্তিনিকেতনের ঋষি সমস্ত জগতের শ্রদ্ধাদৃষ্টি বীরভূমের মাঠে আহৃত ক'রে ব'সে আছেন। রামবাবুর সরকারী পরিভ্রমণের জল্পনা যখন এই লোভনীয় স্থানগুলির পাশে পাশে চল্‌তে লাগলো তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরদিন শনিবার দুপুরে যাত্রা স্থির হোলো। রামবাবুর উদ্যোগ মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের মতই বিরাট। দাদু, রামবাবু, পূর্ব্বোক্ত ভদ্রমহিলা (পথি নারী বিবর্জ্জিতা হ'লেও, ইনি সব চেয়ে উৎসাহিনী বলে Reductionএর তালিকায় পড়লেন না), আমি, পুটুবাবু (সারথি), মিস্ত্রী মশাই, গোবিন্দ ও মহারাজ, এই আটজন যাত্রী। শেষোক্ত দুজন ভৃত্য এবং পাচক। পথ যে রকম বন্ধুর, তাতে বাড়ীর বাবু-গাড়ীটির উপর নির্ভর করা চললো না। রামবাবুর নতুন-কেনা একটা পুরাণ ফোর্ড রামবাবুর মতে খুব 'hardy' (মজবুৎ) বিধায়, তাকেই যাত্রার উপযোগী ক'রে তোলা হোলো।

বেলা তখন সওয়া তিনটে; ক্যারিয়ারে, সিটে, মাডগার্ডের উপর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের মাল এবং মানুষের বোঝাই নিয়ে রামবাবুর হার্ডি ফোর্ড প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারের নিঃশ্বাস ফেলার মত হাঁস্‌ফাস্ ক'রতে ক'রতে যাত্রা ক'রলো। বাড়ীর মেয়েরা এবং ছেলেরা যাঁরা পড়ে রইলেন, তাঁদের ক্ষুব্ধ মন ও লুব্ধ দৃষ্টির পিছুটান আমরা অন্তরে অনুভব ক'রলেও যন্ত্র-দানবের নির্ব্বিকার গতি ক্রমশঃ বেড়ে চল্‌লো। সিউড়ির রেলওয়ে ষ্টেশন বাঁ পাশে ফেলে গুমটি পার হ'তেই দু' পাশে দেখা দিল দিগন্তপ্রসারী ধান ক্ষেত। শুনলাম, ক' বছর উপর্য্যুপরি অজন্মার পর এ বছর ফসলের অবস্থা ভাল। 'মন্দ'-র দৃশ্য কেমন লাগতো জানি না, কিন্তু 'ভাল' যে চোখে কত ভাল লাগে তা বুঝলাম। আমি ন'দে জেলার লোক। নদীয়ার পল্লী শোভার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। শুধু 'পল্লবঘন আম্রকানন' এ নয়, অসংখ্য রকমের গাছে, গুল্মে, লতায়, পুষ্পপত্রপুঞ্জের সুস্নিগ্ধ বাধায় সেখানে প্রতিপদে দৃষ্টি ব্যাহত হয়। নদীয়ার এক একটি গ্রাম যেন এক একটি নিভৃত কুঞ্জ। গ্রামের বাইরে শস্য-

ক্ষেত্র ও গোচারণের প্রান্তরগুলি ও অজস্র উদ্ভিদের উপদ্রবে নিরবকাশ ও অবচ্ছিন্ন। কিন্তু এবার বীরভূম জেলায় শতাধিক মাইল পল্লীপথে ঘোরা হোলো তো,—যেখানেই গিয়েছি, চারিদিকের অবাধ বিস্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চোখ যেন হার মেনে গেছে। নীচের সমতল সবুজ উপরের নীলিমার সঙ্গে ছুটে ছুটে কোথায় গিয়ে যে আলগোছে ধরা দিয়েছে দুজনকে, দৃষ্টি যেন তার হদিস্ পায় না। মন মুক্ত বিহঙ্গমের মত তা'র মাঝখানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে আসে। মনে হয়, বাংলার যেরূপ কবির ধ্যাননেত্রে "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" হ'য়ে প্রতিভাত হয়েছে তা তাঁর শিলাইদহের সাধনার ফলে, আর "অবারিত মাঠ, গগন ললাট" যাঁর 'পদধূলি' চুম্বন করছে, তিনি কবির শান্তি নিকেতনের প্রতিমা। বীরভূমের পল্লীগুলি ধুলায় কাঁকরে রুক্ষ শ্রীহীন; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের মাঠগুলি কেমন যেন মনকে উদাসী ক'রে উড়িয়ে নিয়ে চলে—লাল মাটির পথের ধুলা কোথা থেকে যেন খানিকটা গেরুয়া ছোপ মনে মাখিয়ে দিয়ে যায়।

সিউড়ি থেকে দু'মাইল পরে চন্দ্রভাগা নদীর পুল পার হ'য়ে হার্ডি ফোর্ড বার তিনেক একটু বেয়াড়াপনা ক'রেছিল। মিস্ত্রী মশাইয়ের শাসনগুণে কিন্তু তার পর বেশ বাধ্য হ'য়েই চলছিলো। হঠাৎ ৭ মাইলের মাথায় চিনপাইয়ের কাছাকাছি গাড়ীর গতি মন্থর হ'য়ে এল। কাছে আয়না ছিল না বটে, কিন্তু নিজের নিজের মুখের চেহারা সকলেই পরস্পরের মুখে দেখে নিলাম। 'About turn' নাকি রে বাবা! রামবাবুর একটা মহৎ গুণ দেখেছি, কোনো অবস্থাতেই কাহিল হন না। তা' ছাড়া এই গাড়ীটির উপর তাঁর বিশ্বাস এমনি অটল যে টাইটেনিকের আরোহীদেরও বোধ হয় এতখানি বিশ্বাস ছিল না। হোলোও তাই। মিস্ত্রী মশাই খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কোথা থেকে একটু সুতোর মত কি বা'র ক'রে দেখালেন যে সেইটেই নাকি অত বিপুলভারবাহী দানবটির গতিপথের এক মাত্র অন্তরায়। এবার বক্রেশ্বর নদীর পুল অতিক্রম করিলাম। মোটর স্বচ্ছন্দ গতিতে ১৩ মাইলের মাথায় হেতমপুরে এসে পৌছাল। হেতমপুর গ্রামখানিতে বহু উচ্চবর্ণের হিন্দুর বসতি। রাজোপাধিক সমৃদ্ধ জমিদারের সান্নিধ্যের জন্য গ্রামটিতে শিক্ষা সংস্কৃতির হাওয়া আছে। একটি কলেজ পর্য্যন্ত রয়েছে দেখলাম। হেতমপুর ছাড়িয়ে মাইল খানিক এসে শাল নদীর সম্মুখীন হোলাম। রাজনির্ম্মিত ক্ষুদ্র সাঁকোটি বন্যার বেগে ধ্বসে যাওয়ায় মোটরকে সাঁতরে পার হ'তে হবে। কাক চক্ষুর মত জল আধহাঁটুর বেশী হবে না,—চওড়াও ৮।১০ গজ মাত্র। এই পাহাড়ী নদীগুলি কামরূপী; মুহূর্ত্তে করালমূর্ত্তি ধারণ করতে পারে। পুটুবাবু বেশ জোর ক'রেই চালালেন, কিন্তু ওপারের কাছাকাছি এসে ঘস্-স্-স্ ক'রে কর্ণের রথচক্রের মত অবস্থা। অতি কষ্টে ঠেলে যদি বা পথে তোলা গেল, হার্ডি ফোর্ডের আবার এক নতুন উপসর্গ দেখা দিল। কিছুদূর না ঠেলে নিয়ে গেলে তিনি আর ষ্টার্ট নেন না। আজকালকার সাম্যের যুগে বোধহয় একলা খাটতে নারাজ। তাই বাহনের একটু সওয়ার হ'তে সাধ গেল। একবার নারদ মুনির কাছে ঢেঁকি নাকি এমনি বায়না ধরেছিল। দেবর্ষিকে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর বীণাটি ঢেঁকির শুড়ে বেঁধে, তাকে কাঁধে ক'রে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ ক'রতে হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁর মত দেবোচিত Stamina তো আর আমাদের মত মর মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই মিস্ত্রি মশাই এবার মরিয়া হ'য়ে মেরামত সুরু করলেন। সূর্য্য তখন দূর দিগন্তে ক্ষেতের প্রান্তে অস্ত যাচ্ছেন। সঙ্গিনী, রামবাবু ও আমি নেমে পড়লুম। সহরে লোকের বছরের মধ্যে তিনদিনও উদয় অস্তের শোভা দেখবার সুবিধা ঘটে না;—হ্যাংলার মত তাকিয়ে রইলুম। এই দুর্নিরীক্ষ্য দেবতাটিকে উদয়ের চেয়ে অস্তের সময়েই বেশী শান্ত দেখায়। বোধ হয় দুনিয়ার নিয়মই এই। তাঁর অতিবিক্ত বর্ত্তুল রেখাটি যখন টুপ ক'রে ধানের মধ্যে ডুবে গেল আমার ঘড়িতে তখন ৫-৩০। দু'পাশের সুবিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মাঝে সন্ধ্যাকাশের লালিমারঞ্জিত রাঙা মাটির পথটি যেন কোন্ রূপসী পল্লীবধূর সিন্দুররাগরক্ত সীমন্ত শোভাখানি প্রসারিত ক'রে অস্তায়মান দিনমণির উদ্দেশ্যে একটি প্রণতির মত পড়ে আছে।

আধঘন্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর গাড়ী এবার সত্যই ধাতস্থ হোলো। কিন্তু এবার এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হোলো।

কিছুদূর আগেই কেঁদুল যাবার যে রাস্তা ভেঙেছে, সেখান থেকে কেঁদুল ৬ মাইল। কেঁদুল গেলে এই ৬ মাইল পথে আজ রাত্রেই আবার ফিরতে হবে। কারণ আজ আমাদের গন্তব্য ইলামবাজারের ডাকবাংলো। শুধু তাই নয়; ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের মানচিত্রে এই রাস্তাটি কাঁচা লেখা আছে, এবং অনেকের মতে পথটি দুর্গম। এ পর্য্যন্ত বরাবর যে পাকা রাস্তা দিয়ে এসেছি, তাতেই দেহের অস্থিসন্ধিগুলির উপর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল, সুতরাং এই কাঁচা রাস্তায় রাত্রির অন্ধকারে সুদীর্ঘ ১২ মাইল অভিযানের প্রস্তাবে সকলেই মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। সামনের তেমাথা থেকে ইলামবাজার ৮ মাইল ব্যবধান। একদিকে ৮ মাইল অন্যদিকে ২০ মাইলের যাত্রা। সিদ্ধান্তের ভার যখন আমার উপর ন্যস্ত হোলো, মুস্কিলে পড়লাম। একদিকে লোভ আর একদিকে লজ্জা। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ক'রলেন ভদ্রমহিলাটি। তাঁর কৌতূহলের খাতিরে চালকের হাল ডানদিকে জয়দেবের পথে মুখ ফেরালো। কেন্দুবিল্ব দর্শনের জন্য এঁর কাছে কৃতজ্ঞতার যে-ঋণ আছে তা স্বীকার্য্য। পথ অবশ্য কিছু বন্ধুর বটে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কাও দেখলাম অতিরিক্ত হ'য়েছিল। প্রতিপদের চাঁদ যখন উঠি উঠি করছে, তখন আমরাও মন্দিরে পৌঁছুলাম। দাদু প্রথমেই মহান্তমহারাজের সন্ধান নিলেন। অনেক দিনের কথা; দাদু তখন সিউড়ির উকিল। বর্ত্তমান মহান্তের গদীলাভের সময় যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিলেন। সুতরাং আমাদের সৎকারের প্রত্যাশাটা একটু বিশেষ ভাল রকমেরই ছিল। কিন্তু পরে শোনা গেল মহান্ত স্বাস্থ্য-লাভের জন্য স্থানান্তরে গেছেন। অবশ্য ম্যানেজারবাবুও সেবা এবং সৌজন্যে ক্রটীহীনভাবেই আমাদের আপ্যায়িত ক'রেছিলেন। এখানে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তিতে একটি বড় মেলা বসে। যাত্রীনিবাসটি বেশ বড়ই। মঠের প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক পরিপূর্ণ ধানের মরাই মন্দিরের দেব-বিগ্রহ ও সেবাইতের স্বাচ্ছল্যের পরিচয় দিচ্ছিল।

"মধুরকোমলকান্তপদাবলী"র লেখক জয়দেব ঠাকুরের চিহ্নের মধ্যে তাঁর ভিটের স্তূপটি বর্ত্তমান; তার উপর বর্দ্ধমান-রাজবংশের জনৈক ভূস্বামী একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। ভিতরে বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন; সন্ধ্যারতি শেষ হ'য়েছিল বলে দর্শন হোলো না। জয়দেব ঠাকুর গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। এই আটশত বছর পূর্ব্বের কাহিনী প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা নয়, অথচ আজ তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু সবই জনশ্রুতিমূলক। এতদিন এর জন্য কোনো অসুবিধা ঘটেনি; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস না থাকলেও ভারতবাসীর চোখে বিশ্বাসের দৃষ্টি ছিল। ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিয়ে না দাঁড়ালেও এতদিন পর্য্যন্ত তার প্রাচীন বস্তুগুলি বিশ্বাসী নরনারীর প্রাণে শান্তি ও তৃপ্তি দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ সেখানে বিচারপন্থী মন ইতিহাসের নজির খুঁজতে গিয়ে পদে পদে ব্যর্থ কৌতূহল নিয়ে ফিরে আসে। কেউ কেউ বলেন গীতগোবিন্দের কবির কাব্য-জীবন গৌড়নগরে ভাগীরথীতীরে অতিবাহিত হ'য়েছিল। জানি না, মন্দির ঘিরে এই মাটির ঢিবিটিই 'পদ্মাবতীচরণ-চারণ চক্রবর্ত্তী'র চরণরজঃপূতকিনা—জানি না আজ হ'তে আটশত বৎসর আগে একদা কোন অতীতমধ্যাহ্নবেলায় এক অপূর্ণপাদ শ্লোকের চিন্তায় বিভোর কবি ঐ সম্মুখের গ্রাম্যপথটি দিয়েই অদূরবর্ত্তী নদীতীরে স্নানাভিলাষে গিয়েছিলেন কি না; আর, যিনি 'দেহি মে পদপল্লবমুদারম্' লিখে সেই শ্লোকের পাদপূরণ ক'রে আপনার প্রেমের চরম কাহিনী রেখে গিয়েছিলেন ব'লে শুনেছি, জানি না, ঐ কৃতার্থ মৃত্তিকাস্তূপই তাঁর স্মৃতি-সম্পদ্ বক্ষে নিয়ে আজও সে দিনের সৌভাগ্যস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রয়েছে কি না। পৃথিবীতে সব জিনিষেরই সীমা আছে, কিন্তু স্বপনী মনের বুঝি আর সীমা নেই। তার ভাবনা ও সম্ভাবনা, আশা ও বিশ্বাস, পাল এবং হালের মত জীবনে যে ভাবে গতি ও গন্তব্যের নির্দ্দেশ দিতে পারে, আধুনিক যুগের যুক্তির জাহাজ সেখানে জল মেপে মেপে, সত্যমিথ্যার পরিমাপ নিতে নিতে যেতে পারে না। তাই আমরাও বিংশ-শতাব্দীর মৃত্তিকাস্তূপ দেখেই ফিরে এলাম—অতীতের অনুপথে অভিসারের উপযুক্ত রতি কই! তবু ক্ষণেকের জন্য যে আবেগটুকু অনুভব করেছিলাম, সেই সুযোগে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে রুমালে বেঁধে

রাখলাম। ম্যানেজার বাবু ও স্থানীয় সঙ্গিগণ জয়দেব ঠাকুরের সিদ্ধিলাভের স্থানটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। কবির ভিটের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি সোজা অজয়ের তীরে চলে গেছে সেই পথে। অজয়ের তীরে একটি ছোট ঘরে কবির শিলাময় সিংহাসন। পাশেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী-বক্ষ। ওপারের পাণ্ডুর বালুতট অস্পষ্ট স্বপ্নলোকের মত ধূ ধূ করছে। মনে হলো যেন ঐখানেই এপারের এই বিস্মৃত অতীতের যত কিছু রহস্য সব খুঁজে পাওয়া যায়। জলপ্রবাহের অস্ফুট কলধ্বনি পিছনে ফেলে যখন ফিরলাম, খানিকক্ষণ কেমন যেন আচ্ছন্নের মত কাটলো।

রাত্রি সওয়া আটটার সময় কেঁদুল থেকে যাত্রা করলাম। দূরে তরুশ্রেণীর মাথায় চাঁদ তখন অনেকখানি উঠেছিল। কেন জানি না তা দেখে 'কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী রমণেনৈ' পংক্তিটি মনে পড়ে গেল। ফেরবার পথ পুরাতন —বৈচিত্র্যের অভাবে উৎসাহও ছিল না, ঢুলুনি এল। তবু, ঝাঁকানির কল্যাণে মাঝে মাঝে চোখে পড়তে লাগলো দু'পাশের নাতিক্ষুদ্র জলাশয়গুলির বক্ষ জুড়ে চাঁদ ও কুমুদের নিস্তব্ধ বাসর। কখন ইলামবাজারের পথে পড়ে-ছিলাম মনে নেই। গাড়ী চলেছে ঘোড়ার মত কদমে— এমনি পথ। অথচ মানচিত্রে এটি metalled road। পাশে দাদু আপাদমস্তক আলোয়ান মুড়ি দিয়ে ধ্যানস্থ। মাঝে মাঝে হাঁকছেন "সুধাংশু", (অর্থাৎ আমি জেগে আছি বুঝলে)। সহসা মনে হোলো মঙ্গল গ্রহটা বুঝি পথ ভুলে পৃথিবীর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ভাল করে বুঝবার আগেই দেখি পুটুবাবুর মাথার পাছে ছিটকে এসে পড়েছি। বেঁচে আছি—এটা আবিষ্কার করবার পরে জানা গেল, যে পুটুবাবুর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গাড়ী চোরা গর্ত্তে পড়েছিল। ওঁর দোষ ছিল না। কারণ হার্ডি ফোর্ডের নানা সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও তার সার্চ্চ লাইটের আলোটা যে ছানি পড়া চোখের মত অবস্থা হ'য়েছিল, তা রামবাবুও অস্বীকার করেন নি। ইলামবাজার গ্রামের উপকণ্ঠে এই দুর্ঘটনা। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ডাক বাংলোয় যখন পৌঁছুলাম, তখন রাত্রি পৌনে এগার। এতটা দেরী হবার কারণ পথের দুর্দ্দশা। আমার অজ্ঞাতসারে দু' এক জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাতে হ'য়েছিল। বাংলোটি একটি পুরাতন নীলকুঠি। এবং সেই কারণেই বোধহয় ঘরগুলি খুব উচ্চ ও প্রশস্ত—কুঠির সাহেবদের বাসগৃহ হিসাবে নির্ম্মিত। পরদিন প্রাতে প্রাঙ্গনের একটি পাশে চার পাঁচটি সমাধি দেখেছিলাম। একটি আগাগোড়া মর্ম্মর নির্ম্মিত। সবগুলিই ভূতপূর্ব্ব কুঠিয়াল এক আর্স্কীন পরিবারের। এঁদের জন্মভূমি বোধহয় স্কটল্যাণ্ডে ছিল। স্বদেশ থেকে কতদূরে এই সুনির্জ্জন পল্লীকোণে তাঁদের প্রবাস জীবনটি কেমন ছিল কে জানে। যিনি সব শেষে আপনার প্রিয়জনদের পাশে এই কবরে শুয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীজীবনখানির সুদীর্ঘ ক্লান্ত অবসরটি যেন আজও তাঁদের শত সুখদুঃখবিজড়িত এ বাংলোটির কক্ষে কক্ষে ঝিমিয়ে আছে। আমাদের সঙ্গিনীটি যাবার সময় কতগুলি বনফুল কবরের উপর রেখে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু (ডাঃ রায়) এসে উপস্থিত হ'লেন। আমাদের সঙ্গে "ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুলের" অভাব ছিল না, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু বেশ অভিজ্ঞ লোক—শুধু যে শারীর ব্যাধি নির্ণয়েই পটু তা' নন, মনোব্যাধি নিরূপণেও বেশ দক্ষ। চট ক'রে আমাদের অবস্থাটা diagonise ক'রে ভরসা দিয়ে গেলেন। সেই unearthly hourএ (দারুণ অসময়ে) ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আট জনের উপযুক্ত চা, লুচি, বেগুন ভাজা, ছানাবড়া এনে হাজির করলেন। এ ভোজন পর্ব্ব এক স্মরণীয় ব্যাপার। ভদ্রলোক যখন আমাদের খাইয়ে দাইয়ে হাসিমুখে বিদায় নিলেন, তখন রাত্রি একটা। কত-খানি অসুবিধা যে একজন সানন্দে ঘাড়ে তুলে নিতে পারেন, এ তারই একটা নমুনা।

পরদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, গ্রামের বাসিন্দাদের কুতূহলী দৃষ্টির সামনে গ্রাম প্রদক্ষিণ, হাটে দুনো দাম দিয়ে কিছু শওদা করা, এবং দুপুর বেলা মোটরে চ'ড়ে অজয়ে স্নান ক'রতে যাওয়া। বাংলো থেকে অজয় আধ মাইল দূরে। বেলা সাড়ে তিনটেয় যাত্রা করলাম। একটি বেলা ও একটি রাত থাকা—তবু বাংলোটি ছেড়ে যেতে কেমন লাগছিলো। মানুষের মন কী অদ্ভুত! সহাস্য মুখে ও বিষন্ন মনে ডাক্তার

বাবুর কাছে বিদায় নিলাম। ভদ্রলোক সারল্যে সৌজন্যে হৃদয়তায় typical বাঙ্গালী।

এবার আমাদের লক্ষ্য বোলপুরের ডাক বাংলো। ১৩ মাইল দূরে। পথটি বেশ ভালই। গাড়ীর গতি ক্রমশঃ স্বচ্ছন্দ এবং দ্রুততর হ'য়ে উঠলো। কিছুদূর গিয়েই একটি বন পেলাম। দু'পাশে ঘন শালে সমাকীর্ণ বন। শালবনের একটি রূপ আছে,—যা বাংলার গাছপালা থেকে আলাদা। পার্ব্বত্য প্রদেশ এদের স্বদেশ, বাংলায় এদের প্রবাসী বলে মনে হয়। প্রায় ৩৫ মিনিট চ'লে আমরা লর্ড সিংহের স্বগ্রাম রায়পুর ডানদিকে রেখে চল্‌তে লাগলাম। দূরে বৃক্ষশ্রেণীর অবচ্ছেদে তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি চকিতে একবার উঁকি দিয়ে গেল। হার্ডি ফোর্ডের গতিগৌরবে রামবাবুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—সুরুলের গ্রাম ডানদিকে ফেলে কিছুদূর যেতেই আমরা বোলপুর বাজারের পথে প্রবেশ করলাম। রেলপথ আমাদের সমান্তরালে চল্‌ছিল। ষ্টেশনের পাশ কাটিয়ে প্রায় মাইলখানেক এসে আমরা ডাক বাংলোয় উঠলাম। এটি ইলামবাজারের বাংলোটির মত আয়তনে বড় না হ'লেও নূতন এবং এই উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত ব'লে তদধিক পরিপাটি ও আসবাবমণ্ডিত। এই তের মাইল আস্‌তে ঠিক ৩৫ মিনিট লাগলো। গাড়ীটিকে ভারমুক্ত ক'রে, জামা কাপড় বদলে, গোবিন্দ ও মহারাজকে আহারের ব্যবস্থার ভার দিয়ে, আমরা শান্তিনিকেতন দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দাদুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর আলাপ ছিল। ইনি বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং বর্ত্তমান কর্ম্মী। ভদ্রলোক আশ্রমের কথায়, কবির কথায় উৎস একটি। এ সব সংক্রান্ত আলোচনায় মধ্যে এঁর নিবিড় প্রীতি শ্রদ্ধালু অন্তর অনুভব করা যায়। প্রথমেই বল্লেন আপনারা বড় অসময়ে এসেছেন, আশ্রমের অধিকাংশই বন্ধ, একটু imagination exercise (কল্পনা খাটিয়ে) ক'রে দেখতে হবে। ঘাবড়ে গেলাম। বল্লাম, "হ্যাঁ মশাই, শেষকালে কবিকেও কল্পনানেত্রে দেখে যেতে হবে নাকি ?" উত্তরে তিনি জানালেন যে কবির দর্শন পেতে হ'লে আজ শান্তিনিকেতনের প্রোগ্রামে ফুলষ্টপ দিতে হবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মোটরে আরোহণ করা হোলো—কারণ কবি তখন শ্রীনিকেতনে ছিলেন, মাইল দেড়েক দূরবর্ত্তী সুরুল গ্রামপ্রান্তে। শ্রীনিকেতনের পাকা রাস্তাটি বেশ মসৃণ। গোরুর গাড়ীর জন্য একপাশে একটি কাঁচা রাস্তা আছে। ব্যবস্থাটি যে কত সুন্দর, তা' আমাদের মত ভুক্তভোগীদের বুঝতে বিলম্ব হোলো না। বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাগুলির মত পচা রাস্তা খুব কম দেখেছি। হয়তো বাংলা দেশের সব জেলাতেই এই দুর্গতি। কর্ত্তৃপক্ষের উপেক্ষার কথা বল্‌ছি না, গলদ্ হ'চ্ছে তাঁদের হিসাবে। বাস্তবিক, গোরুর গাড়ীগুলির অত্যাচার ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের এই ব্যবস্থাটি তাঁরা গ্রহণ করলে খরচের দিক দিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের সুরাহা তো' হোতোই, রাস্তার তদ্‌বিরের জন্য বারম্বার বিব্রত হওয়া থেকেও রেহাই পেতেন। শ্রীনিকেতনে পৌঁছে শুনলুম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে এখানে যে গুরুট্রেনিং ক্লাশ খোলা হয়েছে—তারই ছাত্র-শিক্ষকেরা কবির কাছে গেছেন। একটু অপেক্ষা ক'রতে হবে। আমরা সেই অবসরে শ্রীনিকেতন পরিক্রমায় বেরুলাম। অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। দূরে দূরে তরুছায়ান্তরিত বিদ্যুতালোকের স্তম্ভগুলি সহরের মত তীব্রতা নিয়েও চোখে পড়ে না, অথচ পর্থও দুষ্প্রেক্ষ্য হয়নি। পথের দু'পাশে স্থানীয় শিক্ষকদের লতাগুল্মবেষ্টিত বাংলোর মত ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন বাসগৃহগুলি। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে পৃথক তাড়িৎ-কেন্দ্র আছে। ক'লকাতায় ফিরে এসে কাগজে পড়েছিলাম—পণ্ডিত জহরলাল পৌরসভায় অভিনন্দনের উত্তরে আদর্শ পৌর ব্যবস্থার প্রসঙ্গে বলেছেন—'The town should approach the village and the village should approach the town'—পড়ে, শ্রীনিকেতনের এই ছবিটি মনে পড়েছিল। এদিকে সুধাকান্ত বাবুর মুখের আর বিরাম ছিল না। এবার আমাদের শান্তিনিকেতন দেখা হোলো না নিজেদের দোষে; কিন্তু সুধাকান্ত বাবুর সৌজন্যে সে ক্ষতি অনেক পরিমাণে পূরণ হ'য়েছে—তাঁর মুখে গল্প শুনে। কথায় কথায় একবার বল্লেন,—"জানেন, ওঁর (কবির) ধারণা, শান্তিনিকেতনের চেয়ে সিউড়িই নাকি আমার বেশী প্রিয়। এখানে থাকি কাজের খাতিরে, আর সিউড়ি যাই প্রাণের টানে।"

কবি যে গৃহটিতে ছিলেন, সেটি কবির 'উত্তরায়ণ' ভবন। একতলা থেকে দোতলা পর্য্যন্ত সিঁড়িগুলি ছোট ছোট। দোতলা থেকে তেতলা যেতে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে যেতে হয়। পরে শুনেছিলাম এই সিঁড়ি ভাঙবার ভয়ে কবি আর নামতে চাইচেন না। সিঁড়িগুলি দেখলে, তা খুব অসঙ্গত বলে মনে হয় না। তেতলায় উঠেই বাঁদিকে কবির শয়ন কক্ষ। এক ঝলক যতটুকু দেখে নিতে পেরেছিলাম, তাতে সব চেয়ে চোখে পড়েছিল ঘরটির তৈজস সারল্য। একটি সাধারণ খাট,—উপাধানের স্থানে কম্বল ছিল কিনা মনে পড়ছে না,—মেঝেতে একটি সতরঞ্চি পাতা; দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে একটি অতি সাধারণ ক্যাম্বিসের আরাম কেদারা। এই ঘরটির সামনে দক্ষিণমুখী বারান্দায় কবি বিশ্রাম করছেন। ঘরের আলো সামনের দেয়ালে আড়াল পেয়ে স্থানটিকে ছায়াবৃত করে আছে। একটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে কবি আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। সমুখের বেতের মোড়ার উপর পাশের জানালা দিয়ে এক ফালি আলো তেরছা হ'য়ে এসে পড়েছে —পা দু'টি সেইখানে রক্ষা ক'রে আছেন। আমরা সবাই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। যাঁর কথা এত শুনেছি, যাঁর কাব্যে জীবনের এত জিজ্ঞাসা, এত জবাব খুঁজে পাই—যাঁর কর্ম্মবহুল জীবন একটি ইতিহাসের অধ্যায়ের মতই বিরাট এবং বিচিত্র এই সেই বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ সায়াহ্নের সূর্য্যের মত যিনি এ দেশের আকাশটিকে অপরূপ আলো ও শোভায় মহীয়ান্ ক'রে আছেন—এই নিভৃত পল্লীর এক কোণে আধ আলো আধ অন্ধকারে তাঁর এত কাছে দাঁড়িয়ে একটু বিহ্বলতা অনুভব ক'রেছিলাম। "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে চিত্রাঙ্গদা এক এক জায়গায় বলছে—

……"এই সেই পার্থ বীর ?
বাল্য দুরাশার কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থ কীর্ত্তি নিষ্প্রভ করিব আমি
নিজ ভুজ বলে। সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য।
… … … …
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল তোর সেই অহঙ্কার……"

নিজের এই ক্ষণিক বিহ্বলতাটুকু অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানটি মনে পড়ে গেল, হাসিও পেল। নিজের কাছেই নিজেকে লজ্জিত ক'রে যে কথাগুলি মনে হোলো, তাকে গুছিয়ে লিখলে এই parodyতে দাঁড়ায়—

"… … এই সেই রবিবাবু ?
বাল্য দুরাশায় কতদিন করিয়াছি মনে,
রবিদীপ্তি নিষ্প্রভ করিব আমি
কলমের জোরে, কবিতা-কসরত করি'।
… … … …
হারে মুগ্ধ, কোথায় চলিয়া গেল তোর
সেই অহঙ্কার"… … …

যাই হোক, একেবারে "বর্ব্বরের মত" দাঁড়িয়ে থাকি নি। দাদুর সঙ্গে দু' একটি কথা হবার পরেই স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বল্লেন,—"ভালই আছি। লেখাপড়ার কাজ আটকায় না, তবে বেশী চলাফেরা পেরে উঠিনে।" ইতিমধ্যে কলকাতায় যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইলাম। উত্তর দিলেন, "না। এখানে (শ্রীনিকেতনে) পালিয়ে আসা সেই উদ্দেশ্যেই; আত্মরক্ষা, শান্তিরক্ষা দুই-ই।" বল্লাম, "আমাদের মত অবুঝের হাত থেকে এখানেও তো আপনার নিস্তার নেই।" একটু হাসলেন মাত্র। বোধ হয় ভাবলেন, পৃথিবীতে জ্ঞানপাপীর মত সাঙ্ঘাতিক আর কিছু নেই। আমরা কোথায় আছি, একথা উঠতে দাদু ডাকবাংলোর কথা বল্লেন; আরো জানালেন যে আমরা আপাততঃ সুধাকান্ত বাবুর আশ্রিত। কবি বল্লেন—"সুধাকান্তর বাড়ীটি তো প্রায় সিউড়ির extension, সিউড়ী থেকে যাঁরা আসেন ওখানেই উঠেন। ওরও শান্তিনিকেতনের চেয়ে সিউড়িই বেশী প্রিয়"। আমি হেসে উত্তর দিলাম। বল্লাম—"হ্যাঁ, সুধাকান্তবাবু এইমাত্র সেই কথাই বলছিলেন; আপনি ওঁকে এরকম অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেন।" কবি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন, "নাঃ সন্দেহ করি-ই, তবে অন্যায় ভাবে নয়, ঠিকই করি।" বুঝলাম ভদ্রলোক কবির স্নেহভাজন।

এই শান্তিকামী ক্লান্ত ব্যক্তিটিকে বেশীক্ষণ বিরক্ত ক'রতে বোধ হয় সকলেরই একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল; তাই

কোন দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করতে কারো ইচ্ছা হোলো না। দাদুই প্রথমে উঠবার প্রস্তাব করলেন। কবি স্নিগ্ধ হেসে অনুমোদন করতেই আমরা একে একে প্রণাম ক'রে চলে এলাম। ফিরবার পথে সুধাকান্তবাবু জোর ক'রে সৎকার করলেন। মানে, চা লুচি ইত্যাদি। সেদিন ডাকবাংলোয় ফিরে, যতক্ষণ জেগে ছিলাম, কবির কণ্ঠ, তাঁর রহস্যময় রূপটি, মনকে ছেয়ে রইল। সন্ধ্যার এই সুন্দর আবেশটিকে হাল্কা ক'রে ভাঙতে ইচ্ছা হোলো না—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

তার পরদিন, সোমবার, সকাল ৮টায় প্রচুর প্রাতরাশের পর মোটরে চেপে বসলাম। আজ আমাদের গন্তব্য নান্নুর। আজই আবার বোলপুরে ফিরে আসতে হবে। মহারাজ এবং গোবিন্দ বেচারী রইল। কারণ, তারা গেলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ হয়। ডান পাশে রেলওয়ে ষ্টেশন রেখে আমরা ওভারব্রিজ দিয়ে লাইন পার হোলাম। কিছু দূর গিয়েই কাঁচা রাস্তা সুরু হোলো—তবে দুর্গম নয়। মাইল কয়েক যাওয়ার পর ডানদিকে যে ডাঙ্গা পাওয়া গেল, এত বড় বিশাল তৃণহীন ভূমিখণ্ড পূর্ব্বে কখনো দেখি নি। মরুভূমির ধারণা নেই, তবু মনে হোলো এ যেন একটি স্থল-সমুদ্র—যেন দু'টি আকাশ মুখোমুখী হ'য়ে চেয়ে আছে। যেখানে দিগন্ত রেখাটি থাকবার কথা, সেখানকার স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল যেন অন্তরের সন্দেহের মতই কাঁপছে। বোলপুর থেকে ১২ মাইল এসে আমরা নান্নুরের সীমান্তে পৌঁছুলাম। পেছনে যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠ; সামনে নান্নুর গ্রাম। "নানুরের মাঠে, হাটের বাটে"তে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' কি এই পথেরই উল্লেখ ক'রেছেন? গ্রামের প্রবেশ পথে আমরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "চণ্ডীদাস চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্পেন্সারী"র দরজায় গাড়ী দাঁড় করালাম। এখানকার ডাক্তারবাবু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় আমাদের সঙ্গী হ'লেন। যে অনতিক্ষুদ্র মৃৎ-স্তূপ বেষ্টন ক'রে আমরা বাশুলী দেবীর (বিশালাক্ষী) মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম, পরে শুনেছিলাম, সেইটেই চণ্ডীদাসের ভিটে। এই স্তূপটির সম্মুখেই দেবী বাশুলীর আধুনিক মন্দির। চণ্ডীদাসের পিতা বাশুলীর পূজারী ছিলেন। একটি ছোট কাল পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ (Bas relief) সেই প্রাচীন বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান। তবে মন্দিরটি নূতন। শুনলাম উলার কোন জমিদার বিগত শতাব্দীতে এটি নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। মন্দিরের সামনে যে ভিত্তি-স্তূপ চণ্ডীদাসের গৃহাবশেষ বলে পরিচিত, ১৯০৪ সালের 'প্রাচীন-কীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন'এর বলে তা'র চারি পাশে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভারতবর্ষের শাসন-সম্পর্কে নেতৃত্ব ভার গ্রহণ ক'রে লর্ড কার্জন যে কয়টি সৎকার্য্য করেছিলেন, উল্লিখিত আইন প্রণয়ন তার অন্যতম। ফিরবার পথে একটি অতি জীর্ণ মন্দির দেখলাম। কয়েকটি খণ্ডিতাঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি কালাপাহাড়ের কলঙ্কের মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা কে জানে, তবে, স্থানীয় লোকেরা তাই সত্য বলে বিশ্বাস করেন, এবং দর্শকদের মধ্যেও প্রচার করেন। এতে ক'রে এ সবের ঐতিহাসিক আকর্ষণ (interest) বাড়ে কি না সে আলোচনায় ফল নেই, তবে, এইটুকু মনে হয় যে, যে সুদীর্ঘ কালের উপেক্ষা এদের উপর দিয়ে গেছে তাতে পাথরের দেবতা বলেই এতদিন সহ্য করেছেন, নইলে, শুধু দেবতা হ'লে, যত বড় অভিযোগই থাক না কেন, আজও তার সাক্ষী হ'য়ে টিকে থাকা চলতো না,—তা, বিধর্ম্মীর অত্যাচার অথবা সেবকের অনাদর যার বিরুদ্ধেই হোক।

ফিরবার পথে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ্ চৌধুরী সাহেব অতি সমাদরে আমাদের তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। উন্নত জমির উপর এই অফিসটির পরিস্থিতি ভারী মনোজ্ঞ। সামনে সমুদার শস্য ক্ষেত্র; পেছনে সেই পুকুরটি যার এক পারে তরুণী রামী কাপড় কাচতেন—আর চণ্ডীদাস পাশেই কোথাও মাছের টোপ ফেলে মানুষের মন গেঁথে তুলতেন। এ সব কি কবি কল্পনা? যাই হোক, পুকুরটি খুব বড়। ডাক্তার বাবু এরই একধারে, একটা শান-বাঁধানো জায়গায় একটা প্রস্তরীভূত (fossilised) কাষ্ঠখণ্ড দেখালেন। এইটিই নাকি রজকিনী রামীর কাপড় কাচার পাটা ছিল। কাঠের সূক্ষ্ম তন্তুগুলি এবং বল্কলের আবরণের গঠন দেখে এটি যে এককালে কাঠ ছিল তাতে সন্দেহ থাকে না, অথচ ওজনে, কঠিনতায় ও আঘাত জনিত ধ্বনিতে পাথর প্রমাণিত হয়।

তবে, ছয় সাত শত বছরের মধ্যে কাঠ পাথরে পরিণত হ'তে পারে কিনা তা ভূতত্ত্ববিদ্‌রাই বলতে পারেন। এই ক্ষীয়মান শিলাপট্ট তরুণী রামীর করাস্ফালিত মলিন বস্ত্রের নির্ম্মলতা সাধনের সাক্ষী কিনা জানি না, কিন্তু কত বৈষ্ণব নরনারী যে এর' পরে অশ্রুমোচন ক'রে হৃদয়ের মালিন্য ধুয়ে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

কয়েক জন বল্লেন, চণ্ডীদাসের আসল সমাধি কীর্ণাহারে, নান্নুর থেকে ৫ মাইল পূর্ব্বে। বেলা তখন এগারোটা। এরা ভাল ক'রেই জলযোগ করালেন। কীর্ণাহার পৌছুলাম সাড়ে এগারোটায়। রামবাবু গেলেন ডিস্পেন্সারী পরিদর্শনে, আমরা গেলাম সমাধি দর্শনে। এখানকার জমিদার বাড়ী থেকে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সরকার মহাশয় আমাদের পথপ্রদর্শক হ'য়ে সাহায্য করলেন। এখানেও তেমনি একটি স্তূপ, তবে পূর্ব্বোক্ত আইনের বলে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি, বৃত্তিবেষ্টিত নয়। সীতারাম ব্রহ্মচারী নামে একটি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এই স্তূপটির যে ইতিহাস আমাদের শোনালেন, তা' চণ্ডীদাসের তিরোভাব সম্পর্কে যতগুলি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তার অন্যতম। বাদশাজাদী চণ্ডীদাসের অনুরাগিণী হওয়ায় চণ্ডীদাস বাদশাহের কোপে পড়লেন। একদিন কীর্ণাহারের এই স্থানে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন, এমন সময় বাদশাহের ফৌজ ঘেরাও ক'রলো; কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করবার আগেই ছাদ ধ্বসে পড়লো। গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ পরিকর সহ চণ্ডীদাস এইভাবে স্বেচ্ছায় সমাহিত হলেন। নান্নুরের স্তূপের সঙ্গেও অনুরূপ জনশ্রুতি জড়িত। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কিন্তু কীর্ণাহারের কথা কিছু লেখেন নি। অথচ স্থানীয় লোকের বিশ্বাস দেখে দর্শকগণ দ্বিধায় পড়েন এই বাঙ্গালী কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের প্রকৃত স্থান কোথায়। অদ্বৈত বংশের এক গোস্বামী একবার এই স্তূপের একাংশ খনন ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিলেন, কিন্তু তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় স্থানটির পবিত্রতা ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে আশঙ্কা ক'রে বাধা দিয়েছিলেন।

অনেকের মতে ১৪ শতকের প্রথমভাগ চণ্ডীদাসের জীবৎকাল; রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় চণ্ডীদাস রচিত 'বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবান' পদটিতে দেখিয়েছেন যে কবি ১৩২৫ শকে আপনার জন্মতারিখ নির্দ্দেশ ক'রেছেন। কিন্তু এ সবই অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত। চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যই শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, কবিকে কেন্দ্র করে যে সব প্রবাদ এতদিন লোক মুখে ভেসে বেড়িয়েছে, আজ একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় সে সব গল্পও নিরবলম্ব হ'য়ে পড়েছে। ইতি মধ্যে 'দীনচণ্ডীদাস' এবং 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে দু'জন পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। তবে, এঁদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসই যে বাংলার প্রথম romantic কবি, তা 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে এঁর রচিত একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কারে সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হ'য়েছে। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' চণ্ডীদাসের ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনার উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত ক'রেছে।

যাইহোক, যে অর্থে চণ্ডীদাসকে romantic কবি বলা হোলো, সেই অর্থে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি জয়দেবকে classical পর্য্যায়ে ফেলা চলে। সচরাচর classic বলতে সবদেশেই এমন দু'চারজন লেখককে বোঝায়, যাদের কাব্য স্থায়ীভাবে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা ব্যাপকতা লাভ করে। অনেক সময় তাদের সামাজিক এবং নৈতিক জীবনেও তার প্রভাব প্রসারিত দেখা যায়। এই সব "পূর্ব্বসূরি"দের মৌলিক রচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে যে পরবর্ত্তী লেখকেরা কাব্য রচনা করেন, তাঁরাও classic পর্য্যায়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিভাবলে ভাবীকালের কষ্টিপাথরে নিজের স্বাতন্ত্র্যের রেখা রেখে যান—তাঁদের সাহিত্য জগৎসভায় আভিজাত্যের মর্য্যাদা পায়, বাকি অধিকাংশের প্রয়াসই হয় অল্পায়ু, নয়তো অনাদরে সাহিত্য-সমাজে Proletariat শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে বেঁচে থাকে। পরবর্ত্তী লেখকদের Classical মর্য্যাদা দিতে যদি বাধে, তাহ'লে ইংরাজ সমালোচকদের মত Pseudo-classic নামে অভিহিত করা যেতে পারে। বাংলাসাহিত্যে বহুকাল ধরে এক শ্রেণীর কবিরা সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিকে প্রধান উপজীব্য ক'রে একই ধাঁচের কাব্য-সৃষ্টি ক'রে গেছেন। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ

এমন কি মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী প্রভৃতি লোক-সাহিত্যগুলিও পরোক্ষভাবে সেই প্রভাবে অনুপ্রাণিত। সাধারণতঃ এ জাতীয় সাহিত্য বহির্মুখী, গতানুগতিক। কারণ, এই সব কবিদের কারবার কল্পলোক নিয়ে—যেখানে কল্পনাই হোলো মুখ্য বাহন। মানুষকে দেবতা ক'রে তোলাই এঁদের আদর্শ। Romantic কবিরা অন্তর্লোকের অধিবাসী। বোধহয় আবেগ (emotion) এবং অনুভূতি এঁদের কাব্যের উৎস। এঁরা চান মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রতে। বাংলা সাহিত্যে, আপনার অন্তরকে ঘিরে কাব্য-রচনার সূচনা হ'য়েছিল চণ্ডীদাসের হাতে। জয়দেবের রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিক চরিত্র; কবি সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি, দর্শক। কিন্তু চণ্ডীদাস আপনার অন্তরের সুগভীর সহানুভূতি দিয়ে রাধাশ্যামের প্রেমলীলাকে এতখানি নিজস্ব ক'রে তুলেছেন যে তাঁর কাব্য আত্মকাহিনী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ নরনারীর তুচ্ছ প্রাত্যহিকতাকে সম্বল ক'রে, অন্তরের সমবেদনার রসে মহীয়ান ক'রে যাঁরা তোলেন তাঁদের কাব্যে ব্যক্তিগত ছায়া না পড়ে পারে না। তাই চণ্ডীদাসের রাধিকা উপলক্ষ্য মাত্র—কবি আপনার উপচীয়মান প্রেমাবেগকেই রাধিকার পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান ও বিরহের গানে প্রবাহিত ক'রেছেন। যে কবি দেবতা ও দৈবের প্রাধান্যের যুগে "সবার উপরে মানুষ সত্যের" গান শুনিয়েছেন, তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা যে নূতন কালের সূচনা করবে—তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। তাই মনে হয়, আমাদের বাংলা দেশে আধুনিকতার (modernism) অরুণাভাস প্রথম জেগেছিল চণ্ডীদাসের যুগে। এক বিষয়ে ইংরাজী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চমৎকার সন্নিপাত (coincidence) দেখা যায়। যে সময়ে চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের একঘেয়ে classic-এর অনুকরণ ও আদর্শসৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মানবতা (humanism) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individualism) বিক্ষোভ তুলেছিলেন ঠিক সেই সময়ে ইংরাজী সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে নতুন ধারার প্রবর্ত্তনা করেছিলেন চসার। "Chaucer is the first English writer to bring the atmosphere of romantic interest about the men and women and daily work of one's own world." ভূমিকম্পে অনেক সময় নদীর গতি-পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন কোন কবির জীবনেও তেমনি বাহির থেকে একটা অনিবার্য্য ধাক্কা এসে তাঁর প্রতিভাব অভিব্যক্তির পথ বদলে দেয়। রজকিনী রামীর প্রেমকে উপলক্ষ ক'রে চণ্ডীদাসের জীবনে যদি এমনি প্রচণ্ড অনুভূতি ও আবেগের ধাক্কা এসে না লাগতো,—কে জানে হয়তো এত বড় একটা প্রতিভা, আর একখানি মঙ্গলকাব্য বা বাংলা রঘুবংশ লিখেই নিঃশেষ হ'য়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "আমি নাব্ব মহাকাব্য সংরচনে
> ছিল মনে,
> ঠেকল কখন তোমার কাঁকন কিঙ্কিনীতে
> কল্পনাটি গেল ফাটি' হাজার গীতে;
> মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনার
> পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।"

বাঙালীর বহু সৌভাগ্যে চণ্ডীদাসের জীবনে রজকিনীর প্রেমসংঘাত তেমনি দুর্ঘটনার মত এসে লেগেছিল, তাই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় চণ্ডীদাসের পদগুলি অমূল্য রত্নকণার মত ছড়িয়ে আছে।

বোলপুর ডাক বাংলোয় যখন ফিরে এলাম বেলা তখন ঠিক আড়াইটে। বিকেলের দিকে একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে এলাম, কিন্তু সবই বাইরে থেকে দেখা হোলো। মঙ্গলবার ভোর ৬টায় সিউড়ির পথে যাত্রা। ফিরবার পথ ভিন্ন। শ্রীনিকেতনের কবি-ভবন প্রদক্ষিণ ক'রে মোটর চললো। দর্শন-লালসায় গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে রইলাম, যদি একবার—। মাইল তিনেক গিয়ে সেই শালনদী আবার পথে পড়লো। পার তো হ'লাম,—কিন্তু তারপর যে রাস্তা সুরু হোলো—তার কথা জীবনে ভুলবার নয়, এমনি দাগ দিয়েছিলেন তিনি। অধিক কি, রামবাবু হেন লোক মুষড়ে পড়লেন। মোটরে শেষ টিন তেল ঢালা হ'য়েছিল। কিন্তু যে হারে তেল পুড়তে লাগলো এবং যে অনুপাতে অগ্রসর হ'তে লাগলাম তা'তে সকলেই বুঝলেন 'তদা নাশংসে সিউড়িং প্রাপণায়'। পুটুবাবুর অসাধারণ কৌশল এবং অপরিসীম সতর্কতা উপেক্ষা করে গাড়ী তাণ্ডব

সুরু ক'রে দিল। অবশেষে তিনিও পরিশ্রান্ত হ'য়ে বিশ্রাম প্রার্থনা করলেন। গাড়ী থামান হোলো। এম্‌নি যখন নিরুপায় অবস্থা, তখন সকলে গলা ছেড়ে—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার"—

সুরু ক'রে দিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে বেলা ন'টার সময় আমরা পাঁড়ুই এসে পৌঁছ্‌লাম। বোল-পুর থেকে পাঁড়ুই দশ মাইল। এই দশ মাইলের ধকল কাটিয়ে উঠতে বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেল। এখান থেকে সিউড়ি এগার মাইল। পাছে বাকি তেলে অতদূর পর্য্যন্ত না চলে, সেই ভয়ে গোবিন্দকে আগেই সিউড়ি থেকে তেল আনতে পাঠান হ'য়েছিল। গাড়ী ছাড়লাম। ভরসা যত-দূর যায়। এবার পথ ভালই পাওয়া গেল। বক্রেশ্বর নদী পার হ'য়ে গাড়ী হু হু করে ছুটলো। তেল নিঃশেষ প্রায়। মাইল চারেকের বেশী চ'লবে না বোধ হয়। মিস্ত্রী মশাই ঘন ঘন তেল পরীক্ষা করছেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। গাড়ীর কিন্তু থামবার লক্ষণ দেখা গেল না। প্রতি মুহূর্ত্তের আশঙ্কা নিয়ে মাইলের পর মাইল পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে। পুরন্দরপুর ছাড়িয়ে কিছু আশার সঞ্চার হোলো। অবশেষে হরিষ বিষাদের মধ্যে সিউড়ি সহরের চিহ্নগুলি দূরে ভেসে উঠলো। বাঁয়ে ষ্টেশন রেখে সহরে প্রবেশ করলাম। বাড়ী পৌঁছে দেখি গোবিন্দ সাইকেলে তেল বেঁধে যাত্রার আয়োজন করছে। ঘড়িতে বেজেছে ঠিক ১১-২৫।

সেই দিনই দুপুরের গাড়ীতে কল্‌কাতা।

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত

শ্রী-র ওকালতি

শ্রীকালীচরণ মিত্র

কেমন লাগে সুনয়নীর বারবার তাহার উদ্দেশে 'খেঁদি' বা 'পটলি' ডাক ছাড়িলে! 'ঘেঁটু' নাম দিলে বসরাই গোলাপেরও হয়ত মন ভার হইয়া যায়! নূতন নামকরণে দু'য়ের কাহারও রূপের বা গুণের রদবদল যদিও ঘটে না। ঘটিবেই বা কেন? নামের বেসাতি ত তাহাদের নয়। যে নামই ধর সুনয়নী আঁখিকোণের মধু ঢালিয়াই চলিবে, গোলাপ শোভায় ও সুগন্ধে মন মজাইতেই থাকিবে—অপভাষায় অন্তর বিঁধিয়া উঠিলেও।

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াই কি সেক্‌সপীয়র সেকালে ফতোয়া দেন—'নামে আছে কি?—যে নামই রাখ গোলাপ গোলাপই থাকিবে—সৌরভে ভরপুর।' ঘেঁটু বা শেয়াকুল নাম বহাল হইলে একালের আবহাওয়ায় গোলাপসুন্দরী কবিগুরুর নামে মানহানির নালিশ না করে, এই আশঙ্কা হয়। তাহা হইলে আইন সমুদ্র মন্থন করিয়া কবির ভাগ্যে কোন্ ধারার সুধাভাণ্ড (?) উত্থিত হইবে!

মন্থনে সুধা বা বিষ—কলস যাহারই উঠুক, ভব্যতা তালপত্রের খাঁড়া লইয়া ঐ যে পথ আগুলিয়া—কোতোয়ালিতে তাহার দোসর কোথায়! কোন্ শব্দ সুষ্ঠু বা শোভন, কোন্‌টাই বা বাতিল তাহার মানদণ্ড তাহারই হাতে। দেশে দেশে এই রীতি। এই প্রচার বলেই নামের আস্ত অক্ষর বা বিশেষণ হিসাবে—হের, সিনর, মুঁসো, মিষ্টার, মৌলভী, জনাব, বাবু, শ্রী প্রভৃতি; আবার লেজুড়ও আছে—স্কোয়ার, সাহেব, জী, মহাশয়, গারু (তেলেগু) ইত্যাদি।

'বাবু' শব্দে অবস্থাপন্ন দয়াপরবশ মহাশয়কে বুঝাইত।

ক্রমশঃ ইতর জন ছাড়া অপর সকলেরই প্রতি উহার প্রয়োগ চলিতে থাকে বেপরোয়া, ইংরাজের আমলে কেরাণীর নাম হইল 'বাবু'। এখন বাবুর অন্তর্জলির দশা। অসহযোগ আমল হইতে বাবুর বদলে 'শ্রী' শব্দের বহুল প্রচলন।

'বন্দে মাতরম্' বাক্যে ফিরিঙ্গীরা যেমন একদিন নাচিয়া উঠিতেন, মোসলমান ভাই সাহেবরা 'শ্রী' শব্দে তেমনই অস্থির হইতে সুরু করিয়াছেন, তাই না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক-চিহ্ন পদ্মের সঙ্গে 'শ্রী'-র প্রতিও জেহাদ্ ঘোষণা হইল—অজুহাত এগুলি নাকি পৌত্তলিকতা-গন্ধী। অথচ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের জেনারেল ডিরেক্টরের গবেষণার ফলে সম্প্রতি প্রকাশ—গিয়াসুদ্দীন তোগলকের আমলের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রায় নিজের নাম 'শ্রীসুলতান গিয়াসুদ্দীন' লিখাইতেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ বিন তোগলকের আমলের কোন কোন মুদ্রাতেও দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে —'শ্রীমহম্মদ'। আবার মহম্মদ বিন ছম নামক আর একজন মুসলমান নৃপতির আমলের স্বর্ণ-মুদ্রায় ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর প্রতিকৃতিও অঙ্কিত আছে!

কৌতুকের বিষয় এই, মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি জিন্না সাহেবকে 'শ্রী জিন্না' শিরোনামায় পত্র লেখেন। ইহার তীব্র প্রতিবাদে 'চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠার' বচন স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্ষুব্ধচিত্তে 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা যে নিবন্ধিকা মুদ্রিত করিয়াছেন তাহাতে শ্লেষ ও উপদেশের রেশ পাওয়া যায়। ইংরাজী সংজ্ঞাবাচক 'মিষ্টার' বা 'স্কোয়ার' মহাত্মার মত নির্ব্বিরোধীরও কাণে বাজে, অন্তরে হাস্যরসের উদ্রেক করে আওয়াজে। তিনি বলেন—"ইংরাজী শিক্ষার ফলেই 'মিষ্টার' ও 'স্কোয়ারে'র পক্ষপাতী হই আমরা। নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ও অন্তে 'জী' মধুরতর লাগে না কি? এক দেশের লোককে অপর দেশে নামের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত বিশেষণ কেহ প্রয়োগ করে না। হিটলার বা মুসোলিনীকে কেহ মিষ্টার, বলিয়া লেখে না, বলে—হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনী। আমরাই বা চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করি কেন? 'শ্রী' বা 'জী' শব্দের বহুল ব্যবহার আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।" মুসলমানদের উদ্দেশ করিয়া বলেন—"ঐ দুই শব্দে যদি তাঁহাদের একান্তই আপত্তি থাকে, 'মৌলভী' ও 'জনাব' শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। জিন্না সাহেবকে 'শ্রী' শব্দে সম্বোধন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয়, যদি তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকি ক্ষমা প্রার্থনায় প্রস্তুত।" 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রের সম্পাদকীয় এক প্রবন্ধ-লেখক রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—'জী' শব্দ সর্ব্বজনীন হইবার দাবি রাখে,-ধ্বনির দিক দিয়া ইহার লালিত্য চিত্তচমৎকারী। জার্ম্মাণ মুলুকে বেড়াইতে গিয়া কেহ যদি সর্ব্বময় কর্ত্তাকে হের হিটলার না বলিয়া 'হিটলার জী' সম্বোধন করেন পাথর হইতেও রস বাহির হইতে পারে!

মহাত্মা এই প্রসঙ্গে একটা ভুল করিয়াছেন। ফরাসীরা অপর দেশের লোকের নামের পূর্ব্বে 'মুঁসো' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন আরও কোন কোন দেশে প্রথা প্রচলিত। কিন্তু চৌদ্দআনা দেশে উহার ব্যতিক্রম, স্বদেশের প্রচলিত বিশেষণই ব্যবহৃত হয়। এই গণতান্ত্রিকতার যুগে অধিকাংশের রীতি অনুসরণ আমরা না করিব কেন? মুসলমান, খৃষ্টান আদি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর কথা ছাড়িয়া দিলেও সমগ্র হিন্দুর ভিতর কেহ মিষ্টার, কেহ বা স্কোয়ার না সাজিয়া সকলেই সেকালের শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত, শ্রীমান, অথবা সংক্ষেপে শ্রী হইলেই শোভন হয় না কি? 'বাবু' শব্দ ধ্বনির দিক হইতে শ্রুতিমধুর হইলেও চন্দ্রে এখন কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে —ভাবাতত্ত্বের গহন কাননে এমন অনেক শব্দই বাতিল হইয়া যায়। তা ছাড়া আপনাকে কেহ 'বাবু' বলিতে পারে না, 'শ্রী' বলিতে বা লিখিতে কোনই আপত্তির কারণ নাই।

'শ্রী' বর্জ্জন করার রব উঠিয়াছে বঙ্গে কিছুদিন হইতে। শ্রী-হীন হইতে সাহিত্যিক অসাহিত্যিক কাহারও কাহারও সাধ। ধুয়া—শ্রী শব্দে বিনয়ের অভাব সূচিত, ইহাতে নাকি অহমিকাই প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাই কি? বাংলার চিরন্তন প্রথা—জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-র ব্যবহার অপরিহার্য্য, মৃতের ৺। ইহার কারণ কি, নদীয়া কুমারখালী হইতে পণ্ডিত কান্তিবর ভট্টাচার্য্য তাহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

"আজকাল অনেকে নামের পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাসূচক চিহ্ন 'শ্রী' শব্দের ব্যবহার অসভ্যতামূলক বোধে বর্জ্জন করিয়াছেন এবং সকলকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরাও উহা পরিত্যাগ কর। নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রজো-গুণ—সৃষ্টিশক্তিতে জীবের জন্ম হয়, তমোগুণ ধ্বংস শক্তিতে বিনাশ ঘটে, আর সত্ত্বগুণ—স্থিতি শক্তিতে জীব জীবিত থাকে। সত্ত্বগুণের অধিপতি বিষ্ণু, বিষ্ণুশক্তিই শ্রী বা লক্ষ্মী। জীব যতদিন জীবিত থাকে ততদিন সত্ত্বগুণময়ী বিষ্ণুশক্তি শ্রীর অধিকারেই থাকে। এই জন্যই জীবিত ব্যক্তি নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দ যোগ করিয়া প্রতিপাদন করে যে, এই নামধেয় ব্যক্তি জীবিত, মৃত নয়। ইহা ভিন্ন শ্রী শব্দ ব্যবহারের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাই প্রাচীন হিন্দু আচার্য্যেরা স্থিতি শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তই নিজেরা নামের পূর্ব্বে শ্রী শব্দ ব্যবহার করিয়া এবং পরবর্ত্তীদেরও সেই পথ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।"

টীকা নিষ্প্রয়োজন। সারা ভারতবর্ষে 'শ্রী' চলিত হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ। ইংরাজি ভাষার 'মিষ্টার' 'স্কোয়ার' হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল। বাঙ্গালী শ্রী'-কে আঁকড়িয়া ছিল হয়ত মান্ধাতার আমল হইতে। এখন আমরাই তাহা বর্জ্জন করিলে কৃতঘ্নতাও প্রকাশ পায় না কি? 'শ্রী'-র সঙ্গে লেজুড় হিসাবে 'মহাশয়' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'জী' অর্থেও তাই; তবে কথাটা হিন্দী ঘেঁষ, এই যা। কিন্তু ধ্বন্যাত্মক মাধুর্য্য হিসাবে কোনটার দাবী বেশী, সুধীরা তাহার বিচার করুন।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

পুস্তক-পরিচয়

রসকণিকা—শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত—প্রথম সংস্করণ (১৩৪৪)—ডবলক্রাউন ষোলপেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৩—কাগজের বাঁধাই—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের ভূমিকা এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ ও অধ্যাপক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের অভিমত সহ—প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৯ নলিন সরকার ষ্ট্রীট (আবাস), কলিকাতা—মূল্য ২৲ টাকা।

এই গ্রন্থখানি খুলিলেই ইহার কয়েকটি স্তরভেদ প্রথমেই দৃষ্টিতে পড়ে।—প্রথমতঃ, রসতত্ত্ব সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতামতের সারসঙ্কলন, দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রসানুভূতির সরস পরিচয়, তৃতীয়তঃ ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস, চতুর্থতঃ দার্শনিক চিন্তার প্রচেষ্টা ও পঞ্চমতঃ ভাবুকতার আভাস।

গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বৃহৎ একুশটি বিভিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি বা সংহৃতি। অবশ্য সকল প্রবন্ধই রসবিষয়ক নহে। "রসসূক্ত," "কবি ও কাব্যরস," "ব্রজরসের উৎকর্ষ," "রসধ্বনি," "রসিক সম্প্রদায়" ও "রসসূত্র"—এই ছয়টি প্রবন্ধই মুখ্যতঃ রসবিচারমূলক। এই রসানুশীলন প্রসঙ্গে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার একদিকে যেমন আনন্দবর্দ্ধন, অভিনবগুপ্ত, মম্মটভট্ট, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রমুখ আর্য্য আলঙ্কারিক চূড়ামণিবর্গের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিসর্গদুর্ব্বোধ দীর্ঘ আলোচনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সংক্ষেপে করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি রসিক ভক্তশিরোমণিগণের প্রসন্নগম্ভীর ভাবধারায় অবগাহন পূর্ব্বক তাহা হইতে রসপিপাসুগণের অন্তরের আহার্য্য আহরণে প্রয়াসী হইয়াছেন।

"মীরার পীড়া," "শ্রীশ্রীদোললীলা," "হোরিলীলা"

"শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত," "রূপ ও গুণ," "প্রথমদর্শন," "লীলামৃত" "বন্ধু-বিরহ" এই কয়টি প্রবন্ধে অনাবিল ভক্তি প্রবাহ অবাধগতিতে অগ্রসর। আবার তাহার পরেই "শাস্ত্রসমন্বয়," "দুঃখবাদ," "দর্শনসমন্বয়" ও "কর্ম্মরহস্য" প্রবন্ধে বিচারমূলক দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। "নীলকণ্ঠের নৃত্য" প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রোক্ত নাট্য-নৃত্যকলার উৎপত্তি ও স্বরূপবিচার করা হইয়াছে। আর সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি "শ্রীকুণ্ডস্মৃতি"—ভাবুকতার মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের ভক্তিপূর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে।

গ্রন্থখানির ভাষা নিতান্ত প্রাঞ্জল না হইলেও অস্পষ্টতা বিশেষ কোথাও নাই। গ্রন্থকার বহুস্থলেই তাঁহার সহজ ভাবপ্রবণতা, রসবোধে প্রাবীণ্য ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি গ্রন্থমধ্যে যে সকল অতি মনোহর শ্লোকাবলী চয়ন করিয়াছেন, তাহা সজ্জন সহৃদয়গণের কণ্ঠে মণিহারের শোভা বিস্তার করিবে বলিয়া আশা করা যায়। হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ের নিদর্শন এ গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য গ্রন্থকার আমাদিগের অভিনন্দনীয়। গ্রন্থখানির একমাত্র দোষ—স্থানে স্থানে অমার্জ্জনীয় মুদ্রাকর প্রমাদ। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ দোষটি নিরাকৃত হইবে। আমরা এ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

"প্রিয়দর্শী"

অপরাজিতা—উপন্যাস। প্রণেতা শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, প্রকাশক শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান-ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

একটি প্রেমের উপাখ্যান লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত। উপাখ্যানটির প্রথমাংশ চমৎকার, পড়িবামাত্রই পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া উঠে; কিন্তু তাহার পরেই গ্রন্থকার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যেভাবে গ্রন্থখানির আরম্ভ তিনি করিয়াছিলেন, তাহা বজায় রাখিতে পারিলে ইহা একখানি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। তথাপি তিনি যে রসটুকু পরিবেষণ করিয়াছেন, নবীন লেখকের পক্ষে তাহা প্রশংসনীয়; যদি এই গ্রন্থই তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল হয়, তজ্জন্যও তিনি প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। গ্রন্থের ভাষা বেশ ঝরঝরে ও সুস্পষ্ট; প্রকাশের ভঙ্গী পাকা হাতের গাঁথুনির পরিচয় দেয়। আমাদের মনে হয়, লেখকের সাহিত্য-সাধনার নিষ্ঠা থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে তাহা সিদ্ধ হইবেই। বইখানির কাগজ ও ছাপা বেশ পরিষ্কার ও ঝরঝরে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দিনী-সুভদ্রা। শ্রীআশীষ গুপ্ত প্রণীত। বিচিত্রা নিকেতন লিমিটেডের পক্ষে শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমুরারিমোহন কাঞ্জিলাল কর্তৃক ভারত প্রেস লিমিটেড ৪২নং রামধন মিত্র লেন কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই গল্প-পুস্তকে 'বন্দিনী', 'পিশাচী', 'মায়ের পেটের ভাই', 'খুনী', 'যে জীবন দীন' ও 'সুভদ্রা' নামক ছয়টি গল্প স্থান লাভ করেছে। এই ছয়টি গল্পের মধ্যে পাঁচটি গল্প বিভিন্ন সময়ে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং সেগুলির নাম বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত।

এই গল্প-পুস্তকটির একটি বিশেষত্ব এই যে, যে শৃঙ্গার রস বাঙলা ভাষার কথা-সাহিত্যের অন্ততঃ বারো আনা অংশ অধিকার ক'রে আছে আলোচ্য গল্প কয়েকটির মধ্যে কোনোটিরই তা বিষয়-বস্তু নয়। মানুষের মনের এবং জীবন-যাপনের গতির মধ্যে যে বীভৎস এবং কদর্য্যের লীলা আছে, প্রতিভাবান শিল্পীর দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে এবং সুনিপুণ শোধন এবং সংগঠন কার্য্যের ফলে যা কলাসংগত রসবস্তুতে পরিণত হয়, তারই সন্ধান এই বিচিত্র গল্পগুলির মধ্যে। সবল এবং লীলায়িত লেখনী-শক্তির পরিচয় গল্পগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। ভাষা সর্বত্র সমর্থ এবং সুমধুর। একমাত্র 'যে জীবন দীন' ভিন্ন অপর সকল গল্পগুলিকেই আমি 'প্রথম শ্রেণী'র মুদ্রা-চিহ্নে চিহ্নিত করতে প্রস্তুত।

সাহিত্য রসিকদের নিকট এই গ্রন্থের বইখানি যথেষ্ট আদৃত হবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। কথা সাহিত্যের যে ভঙ্গী এবং সুর আশীষ বাবু বাঙলা সাহিত্যকে উপহার দিচ্ছেন তা অভিনব এবং সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর নিজস্ব।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

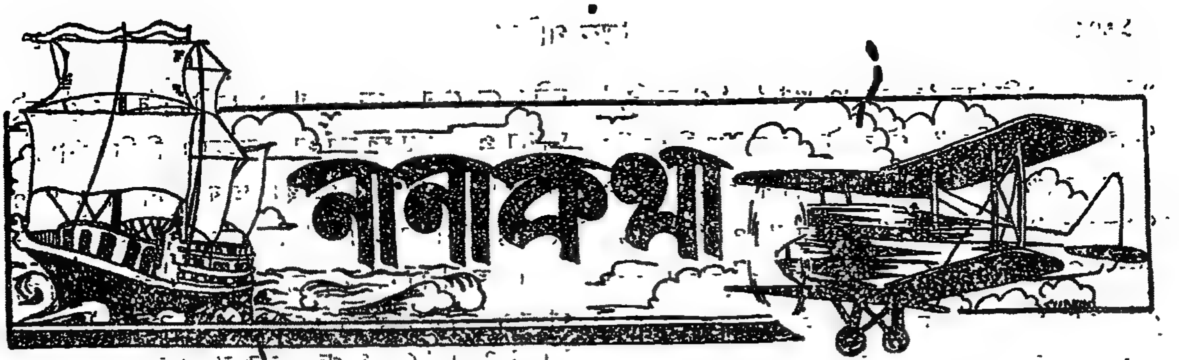

কামাল আতাতুর্ক—

গত ১০ই নভেম্বর তুরস্ক গণতন্ত্রের অধিপতি মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হয়েছিল।

বর্তমান কালে সমগ্র পৃথিবীর পাঁচ সাত জন মহৎ লোকের মধ্যে কামাল আতাতুর্ক ছিলেন অন্যতম। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে শুধু তুরস্কই নয়, সমস্ত পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের অবস্থিতি ধর্ম, সমাজ রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সামান্যতার বহু উর্ধে। মানবজাতির মধ্যে যে সকল আনুষ্ঠানিক ভেদ্র বিরোধ বৈষম্য আছে তা এঁদের কাছে ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি এঁদের নিকট এমন একটা রূপ পরিগ্রহ করে যা নিখিল মানবতার পরিপন্থী ত নয়ই, পরন্তু পরিপোষক। এই সকল ব্যক্তির দ্বারা স্বজাতি সম্পন্ন হয়, কিন্তু ভিন্ন জাতি বিপন্ন হয় না,—সমগ্র জগতের ভেদনীতির বিকাশের দ্বারা এক মহামানব জাতি সংগঠনের ইঁহারা সহায়ক।

কামাল আতাতুর্ক ছিলেন এই শ্রেণীর লোক। ইনি ধর্মকে করেছিলেন দাক্ষিণ্যযুক্ত, সমাজকে করেছিলেন সংশোধিত, রাষ্ট্রকে করেছিলেন ধর্মস্বতন্ত্র, এবং সর্বোপরি তুরস্ককে করেছিলেন এমন সর্বজনীন যে, মনে হয় একজন হিন্দুর পক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষে বাস করা তত নিরাপদ নয়, আধুনিক তুরস্কে বাস করা যত।

সম্পদের আরামযুক্ত ক্রোড়ে কামাল জন্মগ্রহণ করেন নি। দরিদ্রের অন্ধকার অনটনের মধ্যে তাঁর জন্ম। নিজের অদম্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম ও সৎসাহসের গুণে তিনি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে তিনি জেনারেলের পদ লাভ করেন এবং সেই সময়েই তুরস্ককে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। কিন্তু তুরস্ককে স্বাধীন করার চেয়ে তাঁর মহত্তর কীর্তি বোধ হয় তুরস্ককে সংস্কৃত করা। তিনি তুরস্কের নারী-অবরোধ দূর করেছেন, তুরস্ক নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিস্তার সাধন করেছেন, ফেজ-টুপির বিলোপ করেছেন, ধর্মযাজকগণের প্রভাব হরণ করেছেন, রাষ্ট্রকে ধর্মের গ্রাস থেকে মুক্ত করেছেন, বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত করেছেন, ভাষায় আরবী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের প্রবর্তন করেছেন, এবং আরও বিভিন্নক্ষেত্রে এত সংস্কার সাধন করেছেন যে, একটি লোকের জীবনের পক্ষে তা অসাধ্য সাধন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে তুরস্কের অপরিপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সতীশচন্দ্র বাগচী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী গত ১৮ই অক্টোবর পরলোক গমন করেছেন। কলিকাতা ল কলেজ হ'তে অবসর গ্রহণের পর বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিষয়ে অবৈতনিক অধ্যাপকের কার্য্য করছিলেন।

ডক্টর বাগচীর পুস্তক ক্রয় করবার অতিশয় আগ্রহ ছিল। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহের চেষ্টায় তাঁকে প্রায়ই সন্ধ্যাকালে কলেজ ষ্ট্রীটের পুরাতন পুস্তকের দোকানের নিকটে দেখা যেত। এইরূপে নূতন এবং পুরাতন পুস্তকের সাহায্যে তিনি একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলেন। কার্য হ'তে অবসর গ্রহণ করবার পর এই গ্রন্থাগারের যাবতীয়

পুস্তক দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

ডক্টর বাগচী নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি মিষ্টভাষী এবং অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিচিত্রায় তাঁর রচনা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

গুলাব দেবী নারী যক্ষ্মা চিকিৎসালয়—

সম্প্রতি গুলাব দেবী নারী যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যার্থে তিনজন বাঙ্গালী শিল্পী, যথা শ্রীদিলীপকুমার রায়, কুমারী উমা বসু ও কুমারী এষা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সঙ্গীতাভিনয়

কুমারী এষা বন্দ্যোপাধ্যায়

করেছিলেন। ঐ অভিনয়ে নৃত্য এবং গীত উভয়েরই ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীমতী এষা দিলীপকুমারের ভাগিনেয়ী,—অর্থাৎ স্বর্গীয় স্যর সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী এবং স্বনামধন্য কবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী। শ্রীমতী এষার পিতা ৺ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাত্র কয়েক-মাস পূর্ব্বে পরলোক গমন ক'রেছেন, সে সংবাদ বিচিত্রার পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

কুমারী উমা বসু দিলীপকুমারের প্রতিভান্বিতা শিষ্যা। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার বসু মহাশয় ইঁহার পিতা। ইনি গান গেয়ে মহাত্মা গান্ধীজিকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং গান্ধীজি সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে 'নাইটিঙ্গেল' আখ্যা প্রদান করেছিলেন এ কথা অনেকেরই জানা আছে। কুমারী উমার কণ্ঠস্বর অতিশয় মধুর, এবং সঙ্গীত বিষয়ে ইনি বিশেষ নিপুণতা অর্জন করেছেন।

কুমারী এষা কথক নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। সম্প্রতি ইনি লক্ষ্ণৌ নিবাসী কথকনৃত্যবিশারদ শ্রীযুক্ত শম্ভুজীর নিকট ভক্তি ও ভাবদ্যোতক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আধুনিক প্রথার নৃত্য শিক্ষা ক'রছেন।

এই তিনজন শিল্পী তাঁদের নৃত্যে ও গীতে সাহায্য-অভিনয়ের সমস্ত দর্শকবর্গকে বিমুগ্ধ ক'রেছিলেন।

ননীগোপাল মজুমদার—

যে শোচনীয় অবস্থায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং প্রত্ন-তাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদারের মৃত্যু ঘটেছে সংবাদপত্র পাঠকমাত্রেই তা অবগত আছেন। ননীগোপাল মজুমদার সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন বিশেষ খ্যাতনামা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বাঙলা দেশের পাহাড়পুরে এবং সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদাড়োর মূল্যবান গবেষণা কার্য্যের দ্বারা তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি তিনি সিন্ধুদেশের দাদু জেলার অন্তর্গত জোহি নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন ক'রে কর্ম্মচারীবর্গসহ গবেষণা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বহু দূর-বর্ত্তী কোনো গ্রামে জনৈক ধনী গৃহস্থের ভবনে ডাকাতি ক'রে পলায়নপর একদল পাঠান দস্যু সন্ধ্যার পর জোহিতে উপনীত হয়। পথ পার্শ্বে ননীগোপালের কার্য-নিবেশ দেখ্‌তে পেয়ে সহসা তারা গুলি চালাতে আরম্ভ করে। বন্দুকের শব্দে কৌতূহলপরবশ হ'য়ে ননীগোপাল এবং তাঁর

তিন জন কেরাণী তাঁবু হ'তে নির্গত হ'য়ে আসেন, এবং পাঠানদের গুলির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন। ননীগোপাল তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন এবং কেরাণীত্রয় গুরুতরভাবে আহত হন।

বিভাগ বঞ্চিত হ'ল একজন প্রতিভাবান প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীর কর্মকুশলতা হ'তে।

দুর্দান্ত পাঠাণ দস্যু অধ্যুষিত এরূপ বিপদ সঙ্কুল অঞ্চলে সরকারী কার্যের কর্তব্য পালনের মধ্যে নিতান্ত অরক্ষিত

নৃত্যের ছন্দে কুমারী এবা

অনতিবিলম্বেই ননীগোপালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের পদে উন্নীত হবার কথা ছিল। গভর্মেন্টের আর্কিয়লজিকাল ডিপার্টমেন্টের এই সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করা কম গৌরবের কথা নয়। এই শোকাবহ অকাল মৃত্যুর জন্য শুধু ননীগোপালই নন, সমগ্র বাঙালী জাতি এই গৌরব হ'তে বঞ্চিত হ'ল, এবং সরকারী প্রত্নতত্ত্ব

অবস্থায় এই অপমৃত্যুর জন্য গভর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণের কি ব্যবস্থা করেন্ তা দেখবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছি। হয় ত সে বিষয়ে সুব্যবস্থাই হবে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এ সকল কর্মচারীর মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য এতাবৎ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না! অর্থের দ্বারা কি এ সকল ক্ষতির যথার্থ পূরণ হয়?

দীলিপকুমার রায় ও তাঁর ছাত্রী কুমারী উমা বসু

ননীগোপাল ছিলেন আমার আবাল্য সুহৃদ্‌ শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ জামাতা। সুকবি নলিনীমোহন বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নন। গত কার্তিকের সংখ্যাতেও তাঁর রচিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রচণ্ড শোকে বন্ধুবর নলিনীমোহনকে এবং ননীগোপালের সহধর্মিণী ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে সান্ত্বনা দেবার উপযুক্ত ভাষা নেই। ভগবান তাঁদের শোক-সন্তপ্ত চিত্তে শান্তি প্রদান করুন, এই প্রার্থনা করি।

বসন্ত-মিলনী—বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসব

গত ২৭শে নভেম্বর অপরাহ্ণে ব্যাটরার "বসন্ত-মিলনী"র উদ্যোগে সমারোহের সহিত বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশেষ করে নির্মিত বিস্তৃত মণ্ডপে বহুজন সমাগম হয়েছিল। সভা পৌরাহিত্যের ভার পড়েছিল বিচিত্রা সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। সভার বিবিধ

কার্যাবলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী প্রতিভা এবং কীর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য ভারত-প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বিশারদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। স্বনামধন্য মৃদঙ্গাচার্য ৺মুরারী গুপ্ত মহাশয় দুর্লভবাবুর গুরু ছিলেন, এবং দুর্লভবাবুও গুরুলব্ধ বিদ্যার সম্মানার্হ অধিকারী হয়ে অসংখ্য শিষ্য গঠন ক'রে গেছেন। তিনি নিরহঙ্কারী অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন।

সাহিত্যিকের গৌরব—

বিচিত্রার পুরাতন লেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ডক্টর উপাধি লাভ করলেন। পি-এইচ-ডি পরীক্ষায় তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক (thesis) ছিল, মুখ্য বিষয়ে রাজশেখর কৃত প্রাকৃত ভাষায় নাটক কর্পূরমঞ্জরী, এবং গৌণ বিষয় 'পাণিনীয় শিক্ষা'। কর্পূরমঞ্জরীর রচনা কাল নয় শত খৃষ্টাব্দ। দুটি ভাষ্যসহ পাণিনীয় শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ কৃত ভূমিকা, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছেন। এবং কর্পূরমঞ্জরী প্রকাশিত হয়েছে হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজে। তিনজন পরীক্ষকই ছিলেন বিদেশী—অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এফ ডবলিউ, টমাস; প্যারিসের অধ্যাপক ঝুল্ ব্লক (Prof. Jules Bloch); এবং এডিনবরার প্রোফেসার এ, বি, কীথ। উক্ত তিনজন পরীক্ষকই মনোমোহনবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। মনোমোহনবাবু অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র।

আমরা ডক্টর ঘোষকে অভিনন্দিত করছি। বিচিত্রার নিয়মিত লেখিকা সুকবি শ্রীমতী মমতা ঘোষ (মিত্র) মনোমোহনবাবুর পত্নী।

বাঙালী অধ্যাপকের কৃতিত্ব—

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রভাতচন্দ্র সর্বাধিকারী ডি-এস্‌সি (লণ্ডন) এ বৎসর রয়েল সোসাইটি লণ্ডন হ'তে "বীজাণুর ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তি লাভ করেছেন। ডক্টার সর্বাধিকারী ইতিপূর্বে হাক্সলে স্বর্ণপদক (Huxley Memorial Gold Medal) ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমরা ডক্টার সর্বাধিকারীকে অভিনন্দিত করছি।

বড়দিনের ছুটিতে রেল ভ্রমণ—

বড়দিনের ছুটিতে দেশ ভ্রমণের জন্য এ বৎসর ই, আই, রেল-কোম্পানী একটি নূতন ধরণের ব্যবস্থা করেছেন। হাওড়া হইতে নির্গত হ'য়ে হাওড়ায় ফিরে আসবার এঁরা একটি ১৪ দিনের পরিক্রমা প্রস্তুত করেছেন। এই পরিক্রমা সাঙ্গ করতে মোট রেল ভাড়া নিম্নলিখিত হারে ধার্য হয়েছে :—প্রথম শ্রেণী ১৩৪৶১০, দ্বিতীয় শ্রেণী ৬৭৶১০, মধ্যম শ্রেণী ৩৫৶১০, এবং তৃতীয় শ্রেণী ২০৶৫। পরিক্রমার গতি এইরূপ হবে :—হাওড়া হ'তে রাত্রি ৯টা.১২ মিনিটে ডুন এক্সপ্রেসে গয়া যাত্রা, গয়া হ'তে কাশী, কাশী হ'তে আগ্রা, আগ্রা হ'তে ফতেপুর সিক্রি এবং মথুরা, মথুরা হ'তে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন হ'তে দিল্লী, দিল্লী হ'তে হরিদ্বার, হরিদ্বার হ'তে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ হ'তে অযোধ্যা, অযোধ্যা হ'তে কাশী, এবং কাশী হ'তে বৈকাল ৩টা ৪৮ মিনিটে ডুন এক্সপ্রেসে হাওড়া ফিরে আসা। অর্থাৎ একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী মাত্র ২০৶৫ রেল ভাড়ায় এতগুলি স্থান পরিদর্শন করবার জন্য ১৪ দিন সময় পাবেন। এই পরিক্রমার টিকিট ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারীর মধ্যরাত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে; সুতরাং ১৪ই ডিসেম্বর হ'তে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যখন ইচ্ছা যাত্রারম্ভ করা যেতে পারে।

এই ব্যবস্থা ক'রে কোম্পানী যে, অল্প ব্যয়ে বহুদেশ ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা ক'রে দিয়েছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পরিক্রমার বিস্তারিত বিবরণের কপি ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের পাবলিসিটি অফিসারের নিকট হ'তে বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

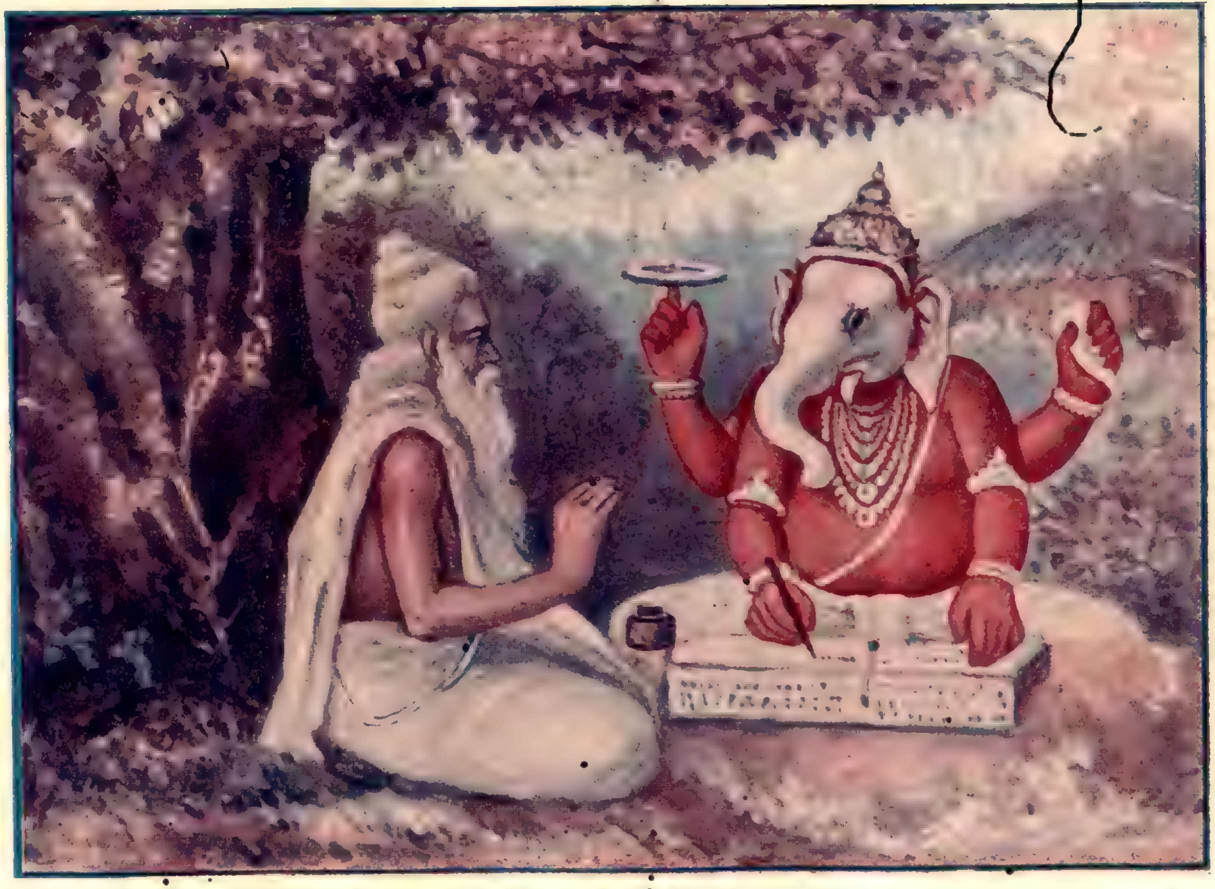

পৌষ ১৩১৫ ।

বেদব্যাস ও গণেশ

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

বিচিত্রা

দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | পৌষ, ১৩৪৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অটবী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ছিল পোড়ো বাড়ী এক দুষ্পবেশ্য ঘন অটবীতে
পথহীন অগম নিভৃতে।
এল সেথা কোথা হ'তে তরুণ সন্ন্যাসী সুশোভন,
চির পরিচিত সম আসিল সে ভিটায় আপন;
অর্গলিত সিংহদ্বার খুলিল সে আপন চাবীতে,
গবাক্ষ খুলিয়া দিল কক্ষে কক্ষে। জাগিল চকিতে
যেন সে প্রাচীন সৌধ সুপ্ত আঁখি মেলি
পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঠেলি,
উঠিয়া বসিল যেন সচকিতে বিহ্বল নয়নে
সদ্যোজাগরণে।

সন্ন্যাসী বসিত নিত্য আপনার পূজার আসনে,
একতন্ত্রী সনে গানে গানে
ভরিত সে নিরজন প্রকোষ্ঠের মৌন হাহাকার,
উল্লঙ্ঘিয়া বাতায়ন বনবীথি পথে গীতি তার—
তন্বী গিরিধারা সম আঁকি বাঁকি চলিত ছুটিয়া,
অরণ্যের নীরবতা কলোচ্ছ্বাসে দিত সে টুটিয়া।
জীর্ণ গৃহ পরিণত হিমাদ্রি শিখরে,
সুর নির্ঝরিণী যেন ঝরে
সন্ন্যাসীর কলকণ্ঠে উৎসারিত বন্ধলেশহারা
প্রবাহিণী ধারা।

নবীন বসন্তে এক কি কুহকহানা দখিনায়
ছায়াঘন বনবীথিকায়
কে আসি পশিল ধীরে পায় পায় পথখানি ভুলি,
আঁচোল ভরিয়া তার রাশি রাশি বনফুল তুলি
আনন্দে অনন্যমনা ক্রমশঃ সে হয় অগ্রসর
গহন হইতে আরো সুগহন বনের ভিতর।
কুসুমের হাতছানি বনের নিভৃতে
নিল তারে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে,
ধীরে ধীরে দ্বিপ্রহর নিভে আসে সায়াহ্ন আঁধারে
বনের মাঝারে।

তিমির গুণ্ঠনতলে পুষ্পরাজি লুকাইল মুখ,
শঙ্কাকুলা তরুণার বুক
সহসা উঠিল কাঁপি সমাচ্ছন্ন আসন্ন আঁধারে,
কোথা পল্লী-বেলাভূমি তিমির সাগর পর পারে?
গৃহে ফিরিবার পথ ডুবিল কাজল সিন্ধুনীরে
চরণ চলিতে চায় বাঁধা হায় ভীতির শৃঙ্খলে!
ভাসিছে সে দৃষ্টিহারা তরঙ্গ দোলায়
আঁখি ভেলা অতলে তলায়।
উথলে চৌদিকে তার সমীরণ বিক্ষুব্ধ তিমির
ঘন বনানীর।

ভেদিয়া সে অরণ্যের স্তম্ভিত গহন আঁধার
দূর দূরান্তর হ'তে কার
সঙ্গীতের প্লুতরব তীর সম সুতীক্ষ্ণ ফলকে
আঁধারের বক্ষ চিরি এল ছুটি পলকে পলকে।
সহসা আলোক মঞ্চে দীপ্তশিখা যেন জ্বলি ওঠে
মেঘের ফাটলে যেন সমুজ্জ্বল ধ্রুবতারা ফোটে।
অকূলে লভিল কূল দিশাহারা তরী,
চলিল সে সুরপথ ধরি,
এমনি যে যায় ধেয়ে গন্ধাভাসে অন্ধপ্রায় অলি
কমল দেহলি।

সুরের সরণি ধরি চলে বালা সন্ন্যাসীর ঘরে,
মুক্ত কেশে বনফুল ঝরে।
অভিসার পথ তার বিরচিত হল গানে গানে,
আঁধারে আলোক-সিথি বনবীথি পরিল সিথানে,
বনানীর পত্রে পত্রে জ্বলে যেন সুর-খদ্যোতিকা,
সে কাজলে ঝলমলে তারারাজি, শুভ্র নীহারিকা
সুর-ছায়াপথখানি রাখিয়াছে পাতি,
চৌদিকে পল্লবঘন রাতি।
দীর্ঘ যাত্রা শেষে বালা উত্তরিল পাষাণ কন্দরে
সুরের নির্ঝরে।

পল্লববুনানি চন্দ্রাতপখানি শেষ হল যেথা
চন্দ্রা নিশি দেখা দিল সেথা।
জরাজীর্ণ প্রাসাদের তৃণাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের পরে
অষ্টমীর ইন্দুলেখা বিগলিয়া জ্যোৎস্নাধারে ঝরে।
কাহার চরণ স্পর্শে শুষ্কপর্ণ মর্ম্মর মুখর।
চকিতে থামাল গান সে সন্ন্যাসী উদ্বিগ্ন অন্তর,
লঘু পদে কক্ষ হতে আসিল বাহিরে
হেরিল অজানা তরুণীরে।
আলুল কুন্তল তার কাঁপিতেছে উতলা পবনে,
কী দিঠি নয়নে!

নয়নে নয়নে বাঁধা পড়িল যে দুটি অজানায়,
বসন্তের মধু জোছনায়
কোন্ জন্মান্তর হতে পূর্ব্ব স্মৃতি উঠিল কি ভাসি?
অধরে অধরে তাই পরিচয়ঘন মধু হাসি
উঠিল কি উথলিয়া, নয়নের নিস্পন্দ আলোকে
মরমের কোন্ বাণী পেল ভাষা অপলক চোখে?
নিঃশবদে কাছাকাছি এল দুজনায়,
পরস্পর মুখপানে চায়,
দুটি প্রসারিত পাণি বাঁধিল অটুট গ্রন্থিটিরে
অবচনে ধীরে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রীনিকেতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হোলো শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্য চর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লাগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসিদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কী রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে, অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্র-রঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হোলো। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবি-কল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বে আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না ব'লেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্যব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়? যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হোত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভ মাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতন লোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণ কার্য্যের স্বভাব অন্য রকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এদিক ওদিক করলেই কানে ধরে তাকে সায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে, তাতে সময় লাগে বেশি কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বুঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ উৎসেরও সেই দশা। সেই জন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার

থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্ব্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না—একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্য্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্য্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্যশক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে এ আমি বিক্রি করব না। এই যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ যার দাম সকল দামের বেশি একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব কি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তাহলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি কিন্তু সৌন্দর্য্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করিনি। আমরা জানি যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্‌কলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। স্বচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাববশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারিনি —তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিক মতো তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হোলো। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে এ'কে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরও লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই সকল শিল্পকাজ আপনি উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সব শেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

২২শে অগ্রহায়ণ,
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ কলিকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্প ভাণ্ডারের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ

ROOM

বিজয়িনী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

পাত্র

বিভূতি—ধনী জমীদার পুত্র, সখের চিত্রকর

প্রমথ—বিভূতির বন্ধু

তরজী— রেবার আশ্রয়দাত্রীর পুত্র

আনন্দস্বামী

কর্ম্মচারী, পথচারী, সাধু, জ্যোতিষ, প্রতিবেশীগণ, পাইক, প্রজা, বরকন্দাজগণ, পুরোহিত, হাওড়া ষ্টেসন এবং গড়ের মাঠের জনতা।

পাত্রী

গিরিজাসুন্দরী—বিধবা জমীদার পত্নী, (বিভূতির মাতা)

স্বাতী— ঐ পালিতা, বিভূতির বাগ্‌দত্তা

রেবা—দরিদ্রা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যা, পিক্‌চার মডেল

রুক্মাবাই— ঐ রেবার আশ্রয় দাত্রী

ঠান্‌দি প্রভৃতি পরিজনবর্গ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—বোম্বাই সহরের সমুদ্রকূলবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন প্রান্ত। সময়—উষাকাল। তীরে তালীকুঞ্জ-ছায়াচ্ছন্ন শ্যামল তৃণাস্তৃত ভূখণ্ডে বসিয়া বিভূতি তার অসমাপ্ত চিত্র 'উষা'র উপর বর্ণ সমাবেশ করিতে করিতে অন্যমনা হইয়া ইতস্ততঃ চাহিতেছিল। অরুণরাগরঞ্জিত ভোরের দৃশ্য পরম রমণীয় মূর্ত্তিতে প্রকটিত।]

বিভূতি। (শিশিরসম্পৃক্ত কুসুমদল মধ্যে দণ্ডায়মানা সহাস্যাননা উষাপ্রতিরূপা বালিকা মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া অস্ফুটে) রেবা! (চিত্র চুম্বন করিল) আঃ, কি সুন্দর তুমি! উষা! উষা! রেবা!

রেবা। (সম্মুখীন হইয়া সহাস্যে) কি, বিভূতিবাবু! কার নাম জপ করছেন?

বিভূতি। (ব্যস্তভাবে) এসেছ? এসো, এসো, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে দেখে আমার ভয় করছিল যে—

রেবা। (কলহাস্যে) ভয় করছিল! কেন একলাটি রয়েছেন বলে? আপনি জোয়ান পুরুষ মানুষ না?

বিভূতি। (হাসিয়া) সেইজন্যই তো ভয় পাচ্ছিলাম যে, হয়তো আজ আর এলে না।

রেবা। (গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া) না এসে কি করি? বুঝতেই তো পারছিলাম যে, আপনি সেই কোন্ ভোর না হ'তে হ'তেই এসে বসে আছেন। মাগো, আজ যে তাড়া-হুড়ো ক'রে কাজ সেরেছি, সে দেখলে আপনি কি বলতেন!

বিভূতি। (বিরক্তিপূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাবে) ছাই কাজ! না করলেই হয়। না করলেই পারো!

রেবা। (কলহাস্যে) তা' নয়! কাজ না করলে বাড়ী-উলি মা পিঠের চামড়া ছিঁড়ে নেবে না। 'ছাই কাজ' না করলে রক্ষে আছে নাকি আমার!

বিভূতি। কেন, কিসের জোর তার! সে তো তোমার কেউই হয় না! বাপ-মা মরে গেলে দু'চার বছর খেতেই দিয়েছে, তেমনই এ দু'বছর মডেল হ'য়ে তুমি যা রোজগার করেছ সবই তো তাকেই ধরে দিয়েছ। ব্যস্! আর কিসের দাবী শুনি!

রেবা। (বিষণ্ণভাবে হাসিয়া) সে বলে দাবী কিসের নয়! এ দু'বছরে যেমন টাকা দিয়েছি, তেমন থাকা ও খাওয়াও তো বন্ধ করিনি! তার উপর চারখানা সাড়ী কিনে দিয়েছে। আগে তো তা' দিতে হতো না, বাড়ীর মধ্যে থাকতাম, ছেলেদের ছেঁড়াগুলো পরতাম।

বিভূতি। রেবা!

রেবা। আজ্ঞে!

বিভূতি। না, না, ওরকম ক'রে উত্তর দিওনা; ওতে পিঠের চামড়া ছেঁড়ে না বটে, কিন্তু অস্থি ফুঁড়ে মর্ম্মে বেঁধে।

রেবা। (পুনশ্চ কলরবে হাসিয়া) তবে কেমন করে উত্তর দেব? আপনি বলেন, নাম ধরতে—সে হয় না; সে আমি পারব না।

বিভূতি। (সৌৎসুক্যে) কেন রেবা? হয় না কেন?

রেবা। (বিব্রতভাবে) আপনি বয়সে অনেক বড়, তা ছাড়া আমার মনিব, মাইনে দেন, আমি……।

বিভূতি। (রেবার মুখে হাত চাপা দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) রেবা! রেবা! কতবার বারণ করেছি ওকথা বলতে।

রেবা। (পিছনে হটিয়া মৃদু হাস্যে) কিন্তু দেন তো সত্যি, আর খুব বেশীই দেন, আমি শুনেছি বাড়ীউলি মা একদিন কার কাছে বলছিল।

বিভূতি। সে শুধু ওর জন্যেই, না হ'লে তোমায় আসতে দেবে না বলে। না হ'লে ওই সামান্য কটা টাকা যে তোমার দাম নয় সে আমি জানি রেবা। রেবা! আমায় শীঘ্র বাড়ী যেতে হবে, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

রেবা। (সুবিস্ময়ে) কোথায়? আপনার বাড়ী?

বিভূতি। হাঁ—

রেবা। (আশ্চর্য্যে) আপনার বাড়ী আমায় নিয়ে যাবেন?

বিভূতি। (সগাম্ভীর্য্যে) নিশ্চয়!

রেবা। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া) কেন? কেন আমায় নিয়ে যাবেন? সেখানে গিয়েও ছবি আঁকবেন বুঝি?

বিভূতি। আমি চলে গেলে আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবে না?

রেবা। (সাগ্রহে) খুব, খুউব করবে।

বিভূতি। তবে কেন জিজ্ঞেস করছো, কেন তোমায় নিয়ে যাবো? আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না রেবা! তুমি যদি না যাও আমায় এইখানেই থাকতে হবে।

রেবা। (স্মিতমুখে) আপনি এইখানেই থাকবেন? বেশ হবে, (মুখ ম্লান হইল) না, বাড়ীতে মা আছেন যে। তাঁর যে বড় কষ্ট হবে।

বিভূতি। (নীরসস্বরে) আমি মায়ের খোকা নই, যথেষ্ট বড় হ'য়েছি।

রেবা। (হাসিয়া উঠিয়া) খোকা না হ'লে বুঝি মায়ের কাছে থাকে না? আমার ইচ্ছা করে, আমারও যদি মা থাকতো! (বিষন্ন হইল)

বিভূতি। (হাত ধরিয়া) রেবা! বল তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমার কাছে থাকবে? আমি তোমায় চাই।

রেবা। (চিন্তিত মুখে) বাড়ীউলি মা যেতে দেয় তো যাবো। (হাসিয়া উঠিয়া) কিন্তু আপনার বাড়ীর লোকে আমায় যদি ভাল না বাসে,—তাড়িয়ে দেয়? আমি বাঙ্গালী নই, মহারাষ্ট্রী। সেখানে গিয়ে আমি কি করবো? আপনাদের বাড়ীর ঝি হ'ব ত?

বিভূতি। (রেবার হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া) বোকা মেয়ে। এত করেও তোমায় বোঝাতে পারলাম না। না রেবা! তুমি ঝি হ'বে না, তুমি হ'বে আমার ঘরের লক্ষ্মী।

রেবা। (আশ্চর্য্যে) লক্ষ্মী! আমি? ঘরের লক্ষ্মী হবো?

বিভূতি। (উচ্চকণ্ঠে) হাঁ,—আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার স্ত্রী—আমার……আমার সর্ব্বস্ব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—বাংলার পল্লীগ্রাম, পুরাতন সুবৃহৎ প্রাসাদ ভবন, রান্নাবাড়ীতে পরিজনবর্গ কর্ম্মনিরত, ঘটী-কাঁসরের শব্দ শুনা যাইতেছে। রান্নার হাঁক্ হাঁক্ শব্দ হইতেছে। উঠানে ঝি মাছ কুটিতেছে, দালানে তরকারি কোটা চলিতেছে। গিরিজাসুন্দরী পট্টবস্ত্র পরিয়া কপালে ও নাকে চন্দন-তিলক, হাতে হরিনামের মালা, সকলকে কাজ বুঝাইয়া বেড়াইতেছিলেন। একপাশে স্বাতী ও কয়টী অল্প বয়সী মেয়ে বউ মিলিয়া পান সাজিতেছিল।]

জনৈকা বধূ। স্বাতী ঠাকুরঝির আজ মুখে হাসি ধরছে না যে, কি আনন্দই হচ্ছে! না ভাই?

স্বাতী। (বাহুমূলে আঘাত করিয়া) দূর হ' পোড়ার মুখী! হাসি আবার কখন্ দেখ্‌লি না?

জনৈকা বধূ। সর্ব্বক্ষণই তো দেখছি। তা আহ্লাদ হ'বে না, আহা কতকাল ধরে 'পথ চেয়ে আর কাল গুণে' বসেছিলি ভাই! এতদিনে বিধি সদয় হ'য়ে মুখ তুলে চাইলেন। ঠাকুরঝির আমার বিয়ের ফুলটী ফুট্‌লো।

আমারই আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছে করছে, তোর করবে সে আর কোন বেশী কথা।

ঠানদি। (প্রবিষ্ট হইয়া নৃত্য ভঙ্গীতে) "তোরা উলু-ধ্বনি দে, সব উলুধ্বনি দে। মোদের দময়ন্তী বিরহিণীর কপাল ফিরেছে।"

সারদা। হ্যাঁ ঠানদি! তবে যে শুনছি বর এখনো বাড়ী আসেনি! বিভূতিদা'কে কই দেখতেও তো পাচ্ছিনে?

ঠানদি। ওলো পাবি, পাবি, দেখতে এক্ষুনি পাবি। আমি সেই সুখবর নিয়েই এই আসছি। কাল পৌঁছুতে পারেনি, আজ এই মাত্তর সে এসে বাড়ী পৌঁছেছে। সদরে ঢুকেছে, খবর পেয়েই আমি ছুটে এসেছি আমার নাত্‌নীর কাছ থেকে বক্‌শিষ আদায় করতে। কই দে'না লো।

স্বাতী। (সলজ্জে) কি ঠানদি! পান চান?

ঠানদি। আহা লো—এত সস্তার খবর আমার নয়, একটা গান শোনা দেকি, অনেক দিন শোনাসনি। নে, আজ তো মুখের মেঘ কেটেছে, খুশী হ'য়ে একটা গান শুনিয়ে দে।

স্বাতী। (স্বগতঃ) গান শোনাব, এতো সামান্য কথা। গান ছেড়ে প্রাণ দিতে বল্লেও বোধ হয় আমি তা দিতে পারতাম। তবে সত্যিই আমায় পায়ে স্থান দিতে সম্মত হয়েছেন? বাড়ী ফিরেছেন? আজ আর একটু পরেই আমাদের দু'জনকার গায়ে হলুদ পড়বে! আর, কাল?

ঠানদি। কিলো! চুপ ক'রে রইলি যে, এখনই সব এসে পড়বে, নে গা।

স্বাতী।

গান

কে যায় বাঁশী বাজায় বাজায়, সুর শুনে তায় চিনি
চিনি,
বাঁশীর সুরের সাথে ভেসে আসে, কার নূপুরের
রিনি ঝিনি।
বাঁশীর গানে কত ব্যথা, জানে না কেউ থাকে কোথা,
কোন সুদূরে বেড়ায় ঘুরে, কার সাথে তার বিকি
কিনি॥
দেখিনি তায় পথের বাটে, দেখি নাই যমুনার ঘাটে,
যার বাঁশী শুনে প্রাণ সঁপেছি, তারে আনব খুঁজে
একাকিনী॥

সারদা। ওলো স্বাতি! খুঁজতে আর তোকে যেতে হ'বে না, ওই দেখ, যার বাঁশী শুনে প্রাণ সঁপেছিস, সে এই দিকেই আসছে।

(বিভূতি ও গিরিজা অদূরে প্রবিষ্ট হইলেন)

বিভূতি। মা! এই তোমার অসুখ! এমন মিথ্যে ছল করে আমায় সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে—সওয়া বারো শ' মাইল দূর হ'তে—টেনে আনার মানে?

গিরিজা। ওরে বাবা! অসুখ আমার একটুও মিথ্যে নয়। তুই সবাইকে জিজ্ঞেস কর, মরতে মরতে সেদিন বেঁচেছি। আর সেইজন্যেই ত' বিভু! আমার জীবনের একমাত্র শেষ কর্ত্তব্য পালন না ক'রে আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি নে।

বিভূতি। অসুখ তো তোমার সেরে গেছে, তবে কেন 'সিরিয়াস্‌লী ইল' বলে নায়েববাবু টেলিগ্রাম করলেন শুনি। না, এ ভারি অন্যায়।

গিরিজা। তা' না করলে তুই যে আসিস্‌নে। চিঠি পেয়ে কি এসেছিলি? এক বছর তোকে চোখে দেখিনি যে রে। একদিন যে না দেখে থাকতে পারতাম না। (চোখ মুছিলেন)

বিভূতি। মা, আমি কি চিরদিন তোমার আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকবো?

গিরিজা। থাকলেই বা, ক্ষতি কি বিভু? তোমায় ত' খেটে খেতে হয় না। বোম্বাইয়ে বসে তুমি রোজগার তো করো না, ঘরের ধনই নিয়ে গিয়ে খাও।

বিভূতি। (সবেগে) আমি এখন আর নাবালক নই। আমার পৈতৃক ধনের যথেচ্ছ ব্যবহার করবার অধিকার আমার হয়েছে।

গিরিজা। সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সে তুমি যা খুশী করো, আমি বারণ করতে যাব না। মানুষ করে দিয়েছি—নিজের ভাল মন্দ তুমি নিজেই বুঝে নেবে। এখন এই শেষ কাজটুকু আমায় চুকিয়ে ফেলতে দাও।

স্বাতীর মায়ের কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সে এখন বড় হ'য়েছে, তাকে বিয়ে ক'রে, ইচ্ছে হয় এখানে থাকো, ইচ্ছে হয় তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তীর্থধর্ম্ম ক'রে দিন ক'টা সার্থক করি। কিছুই তো এ পর্য্যন্ত এই সব ঘাড়ে নিয়ে পেরে উঠিনি।

বিভূতি। মা! আমি তোমায় লিখেছি, স্বাতীকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তুমি আমায় এ কথা কেন বলছ?

গিরিজা। অসম্ভব কিসের জন্য হলো শুনি? তুমি বড় হবার আগে থেকেই কি জান্‌তে না যে, স্বাতী তোমার বাগ্‌দত্তা বউ?

বিভূতি। আমি তাকে কোন কথাই দিইনি।

গিরিজা। আমি দিয়েছি।

বিভূতি। তার জন্যে আমি দায়ী নই। আমি তাকে বিয়ে করতে পারব না, যেহেতু আর একজনকে আমি কথা দিয়েছি। সেই আমার বাগ্‌দত্তা।

গিরিজা। কী! সেই ছবির মডেল! একটা ছোট-লোকের মেয়ে হবে এতবড় রাজবংশের বউ! তোমার বল্‌তে লজ্জা বোধ হলো না।

বিভূতি। হবার কোন কারণ নেই। এও এক অনাথা, সেও তাই। এর চেয়ে সেই বা পাত্রী হিসেবে হীন কিসে?

গিরিজা। স্বাতীর পিতামহ——

বিভূতি। মা, পিতামহ রেবারও হয়তো বাজীরাও পেশোয়ার সভাপণ্ডিতই বা ছিলেন তাই বা কে জানে? মোদ্দা এই যে, আমি বিয়ে করব ব'লে স্থির নিশ্চয় ক'রে ফেলেছি। কোন মতেই এর রদ বদল হ'বে না। স্বাতীর তুমি অন্য পাত্র দেখে বিয়ে দাও, বরং এক কাজ করো—ওই প্রমথকেই বর ধরো। ও তোমার খুব অনুগত আছে; আমার মত পাষণ্ড নয়; সেই ভাল হ'বে। একি! বিয়ে আরম্ভ হ'য়ে গেছে নাকি! এসব আয়োজন কিসের?

গিরিজা। আজ তোমাদের দু'জনের গায়ে হলুদ দেব, কাল বিয়ে।

বিভূতি। মা!

গিরিজা। কিসের চোখ রাঙাচ্ছ বিভূ! তোমার ওই চোখ রাঙানীকে আমার ভয় করতে হবে? আমার আদেশ—তুমি কাল স্বাতীকে বিয়ে করবে। তার দিক্‌টা কি ভেবে দেখবার নেই?

বিভূতি। মা! শোন, তুমি যখন আমার দিক্‌টায় দৃক্‌পাতই করলে না, তখন আমার কর্ত্তব্যেরও এই শেষ! আমি স্বাতীকে বিয়ে করবো না, রেবাকেই করবো—এ স্থির।

গিরিজা। কুলাঙ্গার! কুসন্তান! এই জন্যেই তোকে দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলাম, এই দীর্ঘকাল বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ করেছি। না, কখনই তুমি সেই মারাঠী ছুঁড়ি-টাকে বিয়ে করতে পারবে না। আমি যদি বামুনের মেয়ে হই, এই আমার প্রতিজ্ঞা রইল। শেষে কি জাতজন্মও খোয়াতে হ'বে তোর জন্যে?

বিভূতি। জাত নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও। আমি চল্‌লাম।

গিরিজা। (গভীর স্বরে) বিভূ! (স্তম্ভিত থাকিয়া) চলে গেল। পারলে চলে যেতে, সত্যিই পারলে! ওঃ! ভগবান্! এই সন্তান! এর জন্যে তোমায় কোনদিন ভাল ক'রে ডাক্‌তে পর্য্যন্ত পাইনি! না, যেতে পারবে না। দেখিগে কি করছে। মুখে যে একটু জলও দেয় নি। (স্বাতী স্তম্ভিত রহিল, হাতের মুঠায় খয়েরের কাঠি ধরা। অন্যান্য মহিলারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছিল। গিরিজা হতাশভাবে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন) চলে গেল! ধুলো পায়ে ফিরে চলে গেল! কেউ ফেরাতে পারলে না। ঠাকুর! ওগো ঠাকুর! একি করলে! এ কি করলে!

তৃতীয় দৃশ্য

বোম্বাই—রেবাদের কুটির

(রেবা বাসন মাজিতে মাজিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল)

চিতোয়া কাহে উদাস, কাহে উদাস? হা'রে কাহে
উদাস?
আরে, রামজী কো নাম পর্ রাখো বিশোয়াস্,
হা'রে কাহে উদাস?
(হা'রে কাহে উদাস?)

(নেপথ্যে) রেবা! আজ তোর বাসন মাজা শেষ হবে না? 'রামজীকো নাম পর বিশোয়াস্' করে বাবুজী না খেয়েই আফিস করতে যাবেন? চুলায় আগুন দিবি কবে?

রেবা। (ত্রস্তে) এই যে এক্ষুনি দিচ্ছি মা! (জোরে জোরে বাঁটলো ঘষিয়া)

চিড়িয়া কো যব্ শিখ্লায়া যাত, উহ্ দিন্ ভর নাম গা'তা।

(নেপথ্যে) রেবা! ভাল কথার তুই মেয়ে নোস, ফের গান গাইছিস? যাচ্ছি দাঁড়া, ঠেঙ্গার বাড়ী পিঠের চামড়া ছিঁড়ে না দিলে তোর আজ কাজ করবার চাড় হবে না। (এক গাছা পাতলা বেতের ছড়ি হাতে বাহির হইয়া আসিল)

রেবা। (সভয়ে মুখ ফিরাইয়া) এই আমি যাচ্ছি, এই বাঁটলো মাজছিলাম ওতেই ভাত চড়াবো। (মাজিতে লাগিল)

রুক্মাবাই। (ছড়ির দ্বারা আঘাত করিয়া) বাঙালীর কাছে আহ্লাদ পেয়ে মাথায় উঠেছে। যখন তখন গান-গাওয়া। অ্যাঁ, তোকে বারণ করিনি যে, কাজ করতে করতে গান গাওয়া আমি পছন্দ করি না। কাজ ওতে এগোয় কক্ষণো? আর গাইবি? শীগ্‌গির বল্ (পুনরাঘাত) কথা কইছিস না যে?

রেবা। (মুখ গুঁজিয়া ঘাড় নাড়িল, হাতের কাজ চলিতে লাগিল। একটী বার চমকিয়া মুখ তুলিয়াছিল, দেখা গেল মুখ ব্যথাহত, দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপা।)

রুক্মাবাই। নে শীগগির নে, শেষ কর, আর যেন ডাকতে না হয়। (প্রস্থান)

রেবা। (আর্ত্তভাবে মাথা তুলিয়া) উঃ! উঃ! বাবা গো! (কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতে গিয়া ত্রস্তে উঠিয়া পুনশ্চ বাসন ধুইতে লাগিল। চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। পিছনে তন্নজী আসিয়া দাঁড়াইল)।

তন্নজী। রেবা! তুমি কাঁদছ? কেন কি হয়েছে। মা বুঝি তোমায় গাল দিয়েছে? না, গাল শুনে তো তুমি অত কাঁদ না! নিশ্চয় বড় রকম কিছু—মেরেছে বুঝি?...যাচ্ছি এখনি আমি মার কাছে।

রেবা। (ব্যাকুল হইয়া) ভাইজি! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, তুমি আমার হ'য়ে মার সঙ্গে বচসা করো না, আমার মাথা খাও।

তন্নজী। (উষ্ণভাবে) একি অন্যায় তোমার। অত বড় দিব্যি দিয়ে বসলে! নিজে কুকুরের মত পড়ে মার খাবে, আবার আমি যদি বাঁচাতে চেষ্টা করতে চাই, তাও করতে দেবে না। ধিক! তোমার মতন মেয়ে এই রকম হ'বে, সে আর আশ্চর্য্য কি!

রেবা। (ভগ্নকণ্ঠে) তুমি কিছু বললে আমার পক্ষে আরও খারাপ ফল হয়, মনে করেন আমিই তোমায় লাগিয়েছি। কত যে অকথা বলেন। দোহাই তোমার ভাইজি! সে সব কথা কানে শোনার চাইতে আমার বেত খাওয়া ঢের সহ্য হয়।

তন্নজী। বেত! উঃ! না, আর না! আর আমার সহ্য হচ্ছে না। শোন, মাকে আমি কিছুই বলতে চাইনে; বলা বৃথা, তা বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু পাষাণ মায়ের গর্ভে জন্মেছি বলে আমি পাথরের মূর্ত্তি নই। আমার মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় রক্ত বইছে। যে মহারাষ্ট্র মানুষের অধিকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছিল বলে প্রবল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দুর্ব্বল শক্তি নিয়েও প্রচণ্ড তেজে দাঁড়াতে পেরেছিল, তাদেরই মধ্যে একজন আমার পূর্ব্বপুরুষ। তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো, আমি তোমায় বিয়ে করবো, খেটে খাওয়াবো। বাড়ীতে স্ত্রীহত্যা হ'তে দেব না।

রেবা। (কাতরস্বরে) দাদাজি! আমি যে তোমার বোন। আমি যে ছোট ঘরের মেয়ে, অনাথা, তুমি আমায় খুব ভালবাস জানি।

রুক্মা। (নেপথ্যে) কার সঙ্গে অত গল্প হচ্ছে শুনি? না, আজ তোকে বেতিয়ে পিঠের চামড়া না ছাড়াতে পারলে আর হবে না দেখছি।

রেবা। (সভয়ে) ভাইজি। তুমি পালিয়ে যাও। যাও, যাও, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি। (উপুড় হইয়া পড়িল। তন্নজী নড়িল না)।

রুক্মা। (বেত্র হস্তে প্রবেশ করিয়া) হাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই! তাই বলি, সয়তানী এত বড় ভরসা পায়

কোথা ? এত তেজ ওর কিসের ? তোমার প্রশ্রয়ে ওর লঙ্কা নিকেশ হচ্ছে। আচ্ছা, বাবুজীকে আজ সব কথা জানাচ্ছি। তোমার বোম্বাইয়ে বসে থাকা বার করছি, দাঁড়াও না।

তন্নজী। মা! সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে। মাতৃভক্তিরও তাই। একে বলো তুমি প্রশ্রয় ? পথের কুকুরের পরে লোকে যতটুকু দয়া করে, তুমি এই এক ফোঁটা মানুষের মেয়ের প্রতি ততটুকুও দরদ দেখাও না। একবার মেরে গেছ তাতেও খুশী হও নি, আবার ঐ বেত উচিয়ে ছুটে এসেছ, তার চেয়ে একেবারে ওকে খুন ক'রে ফেলো না, সব ল্যাঠা চুকে যাক্।

রুক্মা। (জলন্ত চক্ষে পুত্রকে দেখিতে দেখিতে) হুঁ, ডাইনী তোমায় চুষে খেয়েছে! কিছু রাখেনি, নৈলে মার মুখের উপর তোমার এই কথা! খুন! হ্যাঁ, খুনই ওকে করবো; যদি বা না করতাম, তোমার জন্যেই করতে হ'বে।

তন্নজী। রোজগার করে পয়সা আনবে কে ও খুন হ'লে ? কম পয়সাটি ত তোমায় দেয় না।

রুক্মা। তুই, তুই আনবি। এই রাক্ষসি! সয়তানি! ভেতরে ভেতরে তোর এত কারসাজি। অনেক দিন থেকেই আমার এই সন্দেহ, আজ হাতে নাতে ধরেছি তো ? পথের কুকুর ? ঠাকুর পূজোর নৈবিদ্যিতে লোভ করলে কি হয় এই দেখ্। (বেত উঠাইল) (রেবা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বাসন ফেলিয়া উঠিতে গেল, তন্নজী উভয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সবেগে বেত লাগিল তন্নজীর গালে, চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রুক্মা গালি দিয়া রেবাকে পুনরাক্রম করিতে ছুটিতেছিল, আসিয়া দাঁড়াইল প্রমথ।)

প্রমথ। মাপ করবেন! ডেকে ডেকে কারু সাড়া না পেয়ে অগত্যা চেঁচামেচি শুনে এই দিকে এসে পড়েছি। বাঃ, এ যে দেখছি দস্তুর মত 'ধর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র'!

তন্নজী। (রুমাল দিয়া গাল চাপিয়া) কে আপনি ?

প্রমথ। বিভূতিবাবুর বন্ধু। রেবা বলে যে পিক্‌চার মডেল আছে, তাকে তাঁর এক্ষুণই একবার দরকার।

রুক্মা। (নম্রভাবে) বাবু এর মধ্যেই ফিরে এসেছেন নাকি ? দেরী হ'বে ব'লেছিলেন না ? হ্যাঁ মা, রেবা, তাই তো তুমি আমায় বলেছিলে মা! আচ্ছা যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে শীগ্‌গির তৈরী হ'য়ে নাও, আসুন বাবু! ততক্ষণ একটু বসবেন, আসুন। এক পেয়ালা কফি কি চা দেব ? (প্রমথকে লইয়া প্রস্থান)

তন্নজী। রেবা! আজ রাত্রেই আমরা এখান থেকে চলে যেতে চাই।

রেবা। (সভয়ে) ভাইজি! আমার জন্য তুমি কেন ঘর ছাড়বে ? আমি না হয় মরেই যাবো।

তন্নজী। হুঁ, সবাই দেয় উপদেশ! জানো রেবা! ঘরে যখন আগুন লাগে তখন ঘরের চেয়ে পথই নিরাপদ। যাও, তৈরি হয়ে নাও গে। আজ তোমার আর্টিষ্টের অশ্রুপ্লাবিতা অথবা বাদল নিশীথের পরিকল্পনা সার্থক করিয়ে দিয়ে এসো। কিন্তু যা বলেছি ভুলে যেও না। আজকেই এর শেষ হোক। (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদি যুগ

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এম-এ, পি এইচ-ডি

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্যের রস যথার্থ-রূপে উপলব্ধি করা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। এই দুই ব্যাপারেই প্রতিভা অথবা প্রাক্তন সংস্কারের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিভার উপর নির্ভর করিয়াই সকল ক্ষেত্রে সাহিত্যের রস পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না। যে গঠন কৌশল (technique) অনুসরণ করিয়া সাহিত্য রচিত, তাহার জ্ঞানও সাহিত্যের রস আহরণের জন্য আংশিকরূপে প্রয়োজন। আর তাহা ছাড়াও প্রয়োজন, যে-দেশকালে সাহিত্য রচিত—সম্ভবপর হইলে—তাহার সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সুস্পষ্ট জ্ঞান। কারণ সাহিত্যের রস অন্যান্য সুকুমার শিল্পের রসের মতই অধিকাংশ স্থলে দেশকালের অনুবর্ত্তী। যেই দেশে ও যেই সময়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে সে দেশের ও সে সময়কার লোকেদের জীবন যাত্রা, চিন্তাধারা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সেই সাহিত্যের রস যথোচিত ভাবে উপলব্ধি করা সুসাধ্য নহে। এমন কি, যেই অত্যুচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্য (classics) দেশকালের অববেষ্টনী নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে লোকের চিত্তে রসোদ্রেক করিতে সমর্থ তাহার সম্বন্ধেও এ নিয়ম যে কিয়ৎ পরিমাণে খাটিবে না এমন নয়; তবে এরূপ অত্যুত্তম সাহিত্যের রস দেশ বা কালের দ্বারা একান্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত নহে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ অপেক্ষাকৃত বিরল বলিয়া এরূপ উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণত যে সকল রচনা রসলিপ্সু জনতার রসাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া থাকে তাহা 'সাহিত্য'পদ বাচ্য হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ উৎকর্ষ-সম্পন্ন নহে। তবু জাতীয় সংস্কৃতির অংশ বিশেষকে জীবিত রাখিতে সাহায্য করে বলিয়া তাহাদের মূল্যবত্তা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। জীবনের উৎসব ক্ষেত্রে মাটির দীপমালার মত তাহাদের কাজ। কোন এক দেশকালের কিয়দংশকে উজ্জ্বল করিয়া তাহাদের রসের শিখা নির্ব্বাণ লাভ করে। ভিন্ন দেশকালের কেহ যদি সেই রসের স্বরূপটি জানিতে চাহেন তবে তাঁহাকে কল্পনার সাহায্যে সেই দেশের ও সেই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে সাহিত্যকে স্থাপন করিলে তবেই ঐ রসের সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভবপর হইবে। এইরূপ রসের বোধ হইতেই আমরা অতীত বা ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যের ভাবধারাকে জানিতে পারি; আর এই জ্ঞান হইতেই বর্ত্তমান সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণও সহজতর হয় এবং ভবিষ্যতের সাহিত্য গঠন সম্বন্ধেও যথেষ্ট ফলদায়ক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহাই হইল সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় মোটামুটি প্রয়োজন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের বর্ত্তমান ইতিহাস এইরূপ প্রয়োজনের তাগিদেই রচিত হইয়াছে।

যে বাঙ্‌লা ভাষায় বর্ত্তমান ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার উৎপত্তি প্রাচীন 'আর্য্য' ভাষা সম্ভূত 'প্রাকৃত' হইতে। খুব সম্ভব মৌর্য্য রাজবংশের শাসন কালেই (খৃঃ পূঃ ৩০০) বঙ্গদেশে এই প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎপূর্ব্বে এদেশের লোকে কথা বলিত 'দ্রবিড়', 'কোল' আদি অনার্য্য ভাষায়। প্রাকৃত ভাষাই ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলিকে লুপ্তপ্রায় করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। মগধের রাজশক্তির প্রভাবে যে 'মাগধী' প্রাকৃত বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করিল তাহার সাহিত্যিক আভিজাত্য ছিল না বিন্দুমাত্রও; কারণ, দেখিতে পাই সুপ্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত নাটকে অধম (= নিম্ন শ্রেণীর) পাত্র পাত্রীর মুখে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই (আধু-

নিক বাঙ্‌লা নাটকে উড়িয়া বা পূর্ব্ব বঙ্গের উপভাষার মত) চলিয়াছে মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিরূপে এই মাগধী ভাষীদের সন্ততিরা আধুনিক জগতের একটি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যের সৃষ্টি করিল তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কিন্তু বাঙালী জাতির সংস্কৃতির উৎস-ভূমির প্রতি তাকাইলে এবং তাহার সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই বিস্ময়ের কোন অবকাশ থাকে না।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের 'মধ্যদেশ' ছিল সমগ্র আর্য্য ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ স্থল। উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা এই মধ্যদেশের আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাষারও সমাদর করিতেন। কাজেই অতীতে বঙ্গদেশে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে মুখ্যত আসিয়াছে ভারতের মধ্যদেশ হইতে এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বাঙালীর সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও কৃতকার্য্যতার নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিখ্যাত 'গৌড়ী' (=মাগধী) রীতি মধ্যদেশ-সুলভ সংস্কৃত চর্চ্চারই ফল। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালী বিদ্বান্‌ ও সাহিত্যরসিকেরা এই সংস্কৃত সাহিত্যেরই সেবা করিতেন এবং এই সংস্কৃত চর্চ্চার ফল বাঙলা সাহিত্যকে পরবর্ত্তী যুগে নানা ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও যে সে প্রভাবের একান্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। সে যাহাই হউক, পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত সাহিত্যের চরম বিকাশের যুগ যখন শেষ হইয়া আসিল তখন ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহ 'অপভ্রংশ' রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন মধ্যদেশে সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অপভ্রংশ বা 'শৌরসেনী অপভ্রংশ'ও দেখা দিল সাহিত্যের বাহনরূপে। এই শৌরসেনী অপভ্রংশে গাথা, কবিতা ও গীতাদি রচিত হইতে লাগিল। সমগ্র আর্য্য ভারতের অধিবাসীরা এতদিন দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হইতে সুদূরে অবস্থিত সংস্কৃতের বা সংস্কৃতেরই আদর্শে প্রাকৃতে রচিত সাহিত্যের রস কষ্টে সৃষ্টে উপভোগ করিত বা মোটেই উপভোগ করিতে পাইত না। তাই জীবন্ত ভাষা অপভ্রংশে সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং সমস্ত উত্তর ভারতের জনসাধারণ এ বিষয়ে আনন্দের সহিত মধ্যদেশের অনুকরণ করিল। এই কারণেই বাঙ্‌লা দেশে শৌরসেনী অপভ্রংশে সাহিত্য সৃষ্টি চলিয়াছিল। অপভ্রংশ সংস্কৃতের মত কোন ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধা নয়, তাই মাগধী ভাষীদের হাতে পড়িয়া তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্‌লা ভাষা তাহার নিজস্ব রূপটি প্রাপ্ত হইবার পথে চলিল।

বাঙ্‌লা ভাষা তার নিজস্ব রূপ লাভ করিয়াছিল খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে। এই যুগেই বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও আরম্ভকাল বা আদি যুগ। তখন বাঙ্‌লা দেশে পাল বংশের রাজত্ব চলিতেছিল। এই পাল বংশীয় রাজাদের শাসনকালে যে বাঙ্‌লা সাহিত্যের আরম্ভ হইয়াছিল ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। কারণ পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং আদি যুগ হইতেই জনসাধারণ ও জনসাধারণের ভাষা ছিল বৌদ্ধ-ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিকট বিশেষ আদরণীয়। ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মাদি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। প্রাকৃত (বা জনগণের) ভাষায় লিখিত সাহিত্যের চর্চ্চা ছিল ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের অনুগামী অন্যান্য উচ্চবর্ণদের উৎসাহের অভাবে পালরাজাদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকালে বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্মের মর্য্যাদালাভ করিল। এবং সেই ধর্ম্মের প্রয়োজনে বাঙ্‌লা দেশের জনসাধারণের ভাষা সাহিত্যিক মর্য্যাদা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। এই সম্মান বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে দান করিলেন 'সহজযান' মতাবলম্বী বৌদ্ধাচার্য্যগণ। যতদূর ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় এই সহজযানের তত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রচারিত ছিল সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যে। আচার্য্যগণের নাম হইতেই তাহার খানিকটা অনুমান করা যায়, যেমন, লুই, ভুসুকু, ঢেণ্ঢণ, শবর, চাটিল, ভাদে, কুক্কুরী, ডোম্বী ইত্যাদি। এই অসংস্কৃত নামগুলি হইতে মনে হয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্রষ্টাগণের অনেকে উচ্চবংশ সম্ভূত ছিলেন না। শবর, ডোম্বী প্রভৃতি নাম ত স্পষ্টই অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিচয় দিতেছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মত প্রচার

করিতে হইলে তাহা সংস্কৃতাদি পণ্ডিতের ভাষায় সম্ভব পর নহে। তাই বৌদ্ধ সহজযান মতের আচার্য্যগণ তাঁহাদের সময়ের জনসাধারণের সহজবোধ্য কথ্য ভাষায় তত্ত্ব প্রচার ও ব্যাখ্যানাদি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই তত্ত্ব প্রচার বা ব্যাখ্যান পণ্ডিত-জনোচিত ধর্ম্মালোচনার মত 'সূত্র' বা তাহার 'ভাষ্যবার্ত্তিকে'র আকারে করা হইল না। সহজপন্থী আচার্য্য-গণ তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য এমন এক সহজ উপায়ের আশ্রয় লইলেন যাহা সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সহজ মতের মূলনীতিও বোধহয় এই যে, ধর্ম্মাচরণের জন্য জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বা ক্রিয়াকলাপকে ওলট-পালট করিবার প্রয়োজন নাই। তাই তাঁহারা পণ্ডিত জনের পাঠ্য শাস্ত্রগ্রন্থ না লিখিয়া রচনা করিলেন কতকগুলি গান যাহা সুরলয়-সহকারে গীত হইয়া আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাকে সহজ-তত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করিত। এইরূপে গানের সাহায্যে তত্ত্বের দিকে লোককে আকৃষ্ট করার পদ্ধতি আমরা পরবর্ত্তী যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখিতে পাই। খুব সম্ভব ইহা ঐ বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যদের অনুসৃত-নীতিরই অপ্রত্যক্ষ অনুসরণ।

সে যাহাই হোক্ সহজযানের বৌদ্ধাচার্য্যগণ পারমার্থিক তত্ত্ব এবং উপদেশপূর্ণ যে গীতসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহাই প্রাচীনতম বাঙ্‌লা সাহিত্যের নিদর্শন। এই গীতনিচয় 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' বা সংক্ষেপে 'চর্য্যাপদ' নামে পরিচিত। এই পদগুলি বাঙ্‌লা দেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে ৪৭টি চর্য্যাপদ লইয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের অর্থ সরল হইলেও রচয়িতা ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রকৃত আশয় চর্য্যাপদগুলি পড়িয়া বোঝা যায় না। নিম্নে এই হেঁয়ালীপূর্ণ রচনার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল :—

> দুলি দুহি পিটা ধরণ না জাঅ।
> রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥

কচ্ছপ (দুলি) দোহন করিয়া [তাহার প্রচুর দুগ্ধ] পেটিকায় ধরা যায় না। বৃক্ষের তেঁতুল কুম্ভীরে খায়।

> জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
> কাহ্নু ডোম্বী-বিবাহে চলিআ॥
> ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
> জউতুকে কিঅ আনুতু ধাম॥

জয় জয় [ও] দুন্দুভি শব্দ তুলিয়া কাহ্নু চলিলেন ডোমনী (ডোম্বী) বিবাহ করিতে। ডোমনীকে বিবাহ করিয়া তিনি করিলেন জন্ম পরিহার এবং যৌতুকে তাঁহার লাভ হইল অনুত্তর ধর্ম্ম।

> সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
> কানট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
> দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
> রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥

শ্বশুর নিদ্রাগত হইলে বধূ জাগ্রত থাকে। [বধূর] কর্ণভূষণ চোরে লইয়া গেল, কী প্রকারে সে তাহার অন্বেষণ করে? দিনে বধূ শঙ্কায় ভীত হয়। রাত্রি হইলে বধূ কাম-রূপ যায়।

প্রাচীনতম বাঙলা রচনায় এইরূপ দেখিয়া উহাকে সাহিত্য বলা চলিতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে সংশয় জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। সহজযান পন্থাবলম্বী সাধকগণের রচিত চর্য্যাপদগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সহজতত্ত্বের প্রচার। তাই আমাদের নিকট হেঁয়ালির মত দুজ্ঞেয় হইলেও এই চর্য্যাপদ-গুলির অর্থ সমসাময়িক সাধকগণের নিকট সুপরিচিত ছিল। কিন্তু চর্য্যাপদের ভিতরের (esoteric) অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ লোভ্ নাই। যেরূপে উহা লোক সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল তাহারই মূল্য আমরা যাচাই করিব। যে উদ্দেশ্য লইয়া চর্য্যাপদগুলি রচিত তাহাতে রচয়িতাগণ সেগুলিকে লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা না করিয়া পারেন নাই। প্রাকৃত সাহিত্যের সুপরিচিত 'পাদাকুলক' বা 'চৌপাই' ছন্দে রচিত এই গীতিনিচয়ে স্থানে স্থানে বেশ সুসঙ্গত উপমা রূপকাদি অলঙ্কার দেখা যায়। যেমন,

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥

যোগিনি, তোকে বিনা আমি ক্ষণেকও বাঁচিব না, তোর মুখ চুম্বন করিয়া আমি কমল মধু পান করিব।

কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥

কাহ্ন আসব-মত্ত হইয়া সহজ [রূপ] নলিনী বনে প্রবেশ করিয়া নিবৃত [ভাবে] বিলাস করিতেছেন।

করুণা মেহ নিরন্তর ফারিআ
ভাবাভাব দ্বন্দ্বল দলিয়া।
উইত্তা গগন মাঝেঁ অদভুআ
পেখরে ভুসুকু সহজ-সরুআ ॥

করুণা-(রূপ) মেঘ নিরন্তর ভেদ করিয়া, ভাবাভাব দন্দ্ব দলিয়া গগণ মাঝে অদ্ভূত [সূর্য্য] উদিত হইয়াছে ; হে ভুসুকু, সহজরূপ দেখ।

বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝ্‌ঝ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥

গগণ যেমন চন্দ্রের দ্বারা আলোকিত হয় বিষয়ের বিশুদ্ধি দ্বারাও তেমনি আমি আনন্দ অবগত হইয়া—

মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আশা বহল পাত ফলাহা ॥
বর গুরু বঅণে কুঠারে ছিজঅ
কাহ্ন ভণই তরু পুন ণ উইজঅ ॥

মন তরুর প্রায়, পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, বহুল আশা তাহার পত্র ও ফলাদি। শ্রেষ্ঠ গুরুর বচনরূপ কুঠার দিয়া উহাকে ছেদন কর। কাহ্ন বলে, তরু আর উৎপন্ন হইবে না।

উপমা রূপকাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও চর্য্যাপদগুলি যে সাহিত্যিক-শ্রীবিহীন তাহা বলা যায় না। উহাদের মধ্যে কোনও কোনওটিতে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যাহা পড়িলে চোখের সামনে একটি জীবন্ত ছবি ভাসিয়া উঠে। যেমন,

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছহ পরহিণ সবরী গীবত
গুঞ্জরী মালী ॥

* * * *

নানা তরুবর মৌলিলরে
গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই
কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী ॥

উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত, তাহাতে বাস করে শবরযুবতী ; ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত (এই) শবরী ; ইহার গ্রীবায় (গলদেশে) গুঞ্জার মালিকা।

* * * *

(পর্ব্বতে) নানা তরুবরে মুকুল নির্গত হইল। তাহাদের ডাল (বাড়িয়া) গগনে (গিয়া) লাগিল। একেলা শবরী কর্ণকুণ্ডল ও হীরক ধারণ করিয়া এই বনে বিচরণ করিতেছে।

কিন্তু চর্য্যাপদে এইরূপ সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের ছিটে ফোঁটার সন্ধান পাওয়া গেলেও উহা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নহে। কিন্তু সে জন্যে বৌদ্ধ চর্য্যাগীতির রচকগণকে সাহিত্যিক ক্ষমতা-হীন বলা যায় না। কারণ তাঁহাদের কাছে চর্য্যাগুলি তত্ত্বপ্রচারের বাহন-মাত্র। নিছক শিল্প-সৃষ্টির আনন্দে তাঁহারা এই গীতগুলি রচনা করেন নাই। তবু-যে কিছু সাহিত্যিক রস এই সকলের ভিতর পাওয়া যায় তাহার মূলে রহিয়াছে হয়ত বাঙালী জাতির স্বভাবসুলভ ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তির খেলা। এই ভাবাবেগ ও কল্পনাবিলাসই বাঙালীকে যুগে যুগে অল্পবিস্তর বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এই দুইটি বস্তুই একাধারে বাঙালী চরিত্রের শক্তিমত্তা এবং দুর্ব্বলতা। বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টিতে বা সামাজিক ব্যাপারে যখনই ভাল মন্দ কিছু দেখা দিয়াছে তাহারই মূল খুঁজিলে দেখা যাইবে এই দুইটি বস্তু।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

প্যারিস

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর এম-এ

১৯ শে জুলাই বেলা ১১ টায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন ছাড়লাম। কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আমাদিগকে বিদায় দিতে ষ্টেষণে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিস্ সিলবার্ণ ও তাঁহার ভগ্নীর কথাই বেশী মনে পড়িতেছে। তাঁরা ফরাসী দেশের লোক; মনে মনে ভাবতে ভাবতে চললাম যদি দেশের সব লোক এমন সরল ও অমায়িক হয়, তবে দেশটা দেখবার মত বটে!

ট্রেণ ছেড়ে দিল। ইংলণ্ডের নিকট বিদায় নিয়ে মন যে বড় বিষণ্ণ হলো, তা বলতে পারিনে। যে দেশ দেখবার জন্যে প্রধানতঃ ছুটে এলাম, সে দেশ ভাল করে' দেখবার সুযোগ এবং সময় পেলাম না, এটা অবশ্য আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু ইংলণ্ডে এসে লোকের সঙ্গে মিশে একটুও আরাম পাইনি। এখানে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরা সাধারণতঃ খুঁজে খুঁজে নিজের দেশের লোকের সঙ্গ করতেই ভালবাসেন। নিজের দেশের লোকের রেঁস্তরায় খানা খেতে যান এবং গাওয়ার ষ্ট্রীট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ভারতীয়দের আড্ডা, সেই সকল স্থানেই তাঁদের গতায়াত বেশী। যা কিছু আরাম, আমোদ, আনন্দ তা ঐখানেই। ও দেশের লোকের সঙ্গে মিশবার তেমন সুযোগ যে ঘটে না, সেটা আমাদের দোষে নয়; ওদের চালচলনের মধ্যে সৌজন্যের অভাব না থাকলেও যেন একটু গর্বের ভাব আছে যার জন্যে ভাব-বিনিময়ে বাধা ঘটে। ও-দের সৌজন্য একটা অ-ভাবের মত, ঠিক স্বভাবের মত নয়, অর্থাৎ একটা negative quality যাতে সর্ব প্রকার অসৌজন্যকে নিষেধ করে বটে কিন্তু তেমন অমায়িকতা বড় একটা থাকে না যাতে পরকে আপন করে' ফেলতে পারে, যাতে একবার দেখা হলে আর পাঁচবার দেখা করতে ইচ্ছা করে। যাই হোক, আমার নিজের বিষয় বলতে পারি ইংলণ্ডে এসে অনেকেরই এমনি একটা ধারণা হয়। আবার অনেকে এদের সৌজন্য ও অমায়িকতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন, তাও শুনেছি। এবার এও শুনেছি যে একজন বিখ্যাত ভারতীয় ডাক্তার এক ফ্যাশনেবল হোটেলে সস্ত্রীক উঠেছিলেন। কিন্তু একদিন সেই হোটেলের সাধারণ ভোজে তাঁদের আসতে মানা হয়েছিল।

লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে' খুব সোয়াস্তি অনুভব করতে পারিনি। কাজেই ইংলণ্ড থেকে বিদায় নেবার সময় যে সামান্য দুঃখ হয়েছিল, তা অপর দেশ দেখবার কৌতূহলে বেশ চাপা পড়ে গেল। এবারে আর পুলম্যান কার নয়, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেশ আরামেই যাওয়া গেল। কন্টিনেন্টে যেতে হলে আমার বোধ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাওয়া ভাল। বিশেষতঃ বিদেশীর পক্ষে। একটু ভাড়া বেশী বটে; কিন্তু আমাদের দেশের মত অত বেশী নয়। আর তার পরে সামাজিক হিসাবেও তারতম্য কিছু নেই।

গাড়ী চললো, ক্রমে বেগ সঞ্চয় করে। দেখতে দেখতে লণ্ডনের প্রাসাদোপম গৃহগুলি দূরে চলে গেল। সবুজ খেতের মধ্য দিয়ে, টানেলের ভিতর দিয়ে ট্রেণ চললো। সেদিন সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দুপুরের রোদ কোনো রূপসী বালার সোণালি অলকে ঝলক দিল কিনা, দেখি নি। তবে যত আমরা ডোভারের কাছে আসতে লাগলাম, ততই আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। সঙ্গে ছিলেন ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। আমাকে কোনো কিছুর ভাবনা ভাবতে হয়নি। তিনি প্রায় প্রত্যেক বৎসর ইয়ুরোপে আসেন। কাজেই চলতে ফিরতে তাঁর সঙ্গে খুবই আরাম। ভাষা না-জানার যে অসুবিধা, সে অসুবিধাও তাঁর সঙ্গে ছিল না। কারণ ফরাসী ভাষা তাঁর বেশ আয়ত্ত।

আমরা ডোভারে নেমে ষ্টীমারে উঠলাম। কুলির মজুরী মিটিয়ে দিয়ে, আমাদের জন্ত নির্দিষ্ট আসন আবিষ্কার করে', ওভারকোট ও ছত্র সেখানে ফেলে' নীচের ডেকে খানা-কামরায় প্রবেশ করলাম। বেলা তখন প্রায় ২টা। খিদের তাড়না ছিল প্রবল। কিন্তু খেতে খেতে যখন ষ্টীমার ছেড়ে দিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ খাওয়া স্থগিত করে হঠাৎ উঠে পড়লেন; আমাকে বললেন 'উঠে পড়ুন, স্যার'। আমি দেখলাম জাহাজ প্রবল বেগে দোল খাচ্চে। ভাবলাম 'এই বই ত নয়।' বললাম 'আমি যাচ্ছি, তুমি এগোও।' সুরেন্দ্র-নাথ টলতে টলতে উপরে উঠে গেলেন। আমি অবশিষ্ট খাদ্যের প্রতি পুনরায় 'বিনিয়োগঃ'। কেননা অর্থের অপব্যয় যতটা পারি কমিয়ে আনাই বুদ্ধিমানের কার্য মনে করলাম।'—তখন অবশ্য ব্যাপারের গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারি নি। যখন খাওয়া শেষ করে' উঠতে গেলাম, তখন দেখি দাঁড়াতে পারি নে। সেদিন চ্যানেল অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। আমার দুরবস্থা দেখে দুজন 'ওয়েটার' আমার দুই দিকে ধরলো। ইংরেজের বাচ্চা; সমুদ্র তাদের ঘর বাড়ী বললেই হয়। কিন্তু জাহাজ যেরূপ ভীষণ বেগে দুলছিল, তাতে যে তারা কি করে' টাল সামলাচ্ছে তা ভগবান জানেন। যা হোক, তারা আমাকে কোনও মতে সিঁড়িটা ধরিয়ে দিলে। আমি সিঁড়ির রেলিং ধরে' ধরে' উপরে উঠে গেলাম কোনো মতে। কিন্তু আর খানিকটা না গেলে ত আমার নির্দিষ্ট যায়গা পাব না। কাজেই রেলিং ত্যাগ করে' যাবার চেষ্টা করতেই গিয়ে পড়লাম একজনের ঘাড়ে। সে জাহাজের দেয়াল ধরে' চলেছিল! লোকটা অবশ্য বিরক্ত হয়েছিল! কিন্তু সে গালাগালির ভাষা খুঁজে বের করবার পূর্বেই আমি ঢেউয়ের তাড়নে একেবারে পড়লাম গিয়ে বারান্দার প্রান্তে রেলিং এর কাছে। এইরূপভাবে টলতে টলতে মনে হলো যে চ্যানেল পার হবার জন্ত আরও বড় জাহাজের ব্যবস্থা করা ওদের উচিত এবং হয়ত আমা অপেক্ষা মজবুত লোকেরও দরকার। দেশে ফিরে' একদিন খবর পেলাম যে চ্যানেলে একখানি জাহাজ মারাও গেছে।

শাজ এনিজে

আসনে গিয়ে দেখি সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। জাহাজের দুলুনিতে তাঁর ভিতরটা বোধ হয় সজোরে বাহিরে আসবার চেষ্টা করছিল। তিনি মুখ বুজে

STUDENTS P. G. A COMMON-RO

আমাকেও মৌন অবলম্বন করতে ইঙ্গিত করলেন। চ্যানেল পার হতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। এর মধ্যে যে সাগর ব্যাধিতে (sea sickness) আমায় ধরে নি, তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমি একজন ভাল সমুদ্র-যাত্রী (good sailcr)।

ক্যালেতে যে ট্রেণ অপেক্ষা করছিল, তাতেও আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন ছিল। কাজেই গাড়ীর নম্বর দিতেই কুলিরা আমাদের বাক্স পেটরা সব ঠিকমত চাপিয়ে দিলে। ট্রেণ ছাড়লো আধ ঘণ্টা পরেই। প্যারিসে যখন পৌছুলাম তখন বেলা আছে। ষ্টেশনে একজন চীনা ভদ্রলোক ও তাঁর

সেন নদীর সেতু—আলেক্‌জান্দার

পরিবার সুরেন্দ্রনাথকে আনতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ট্যাক্সি করে' রুয়ে দা গ্রামং ষ্ট্রীট হোটেল ডি পেরিগোর্ড এসে উঠলাম। হোটেলটি ছোট। রাস্তাও ছোট। কিন্তু দিবারাত্র তাতে মোটর, বাস প্রভৃতি চলছে। লণ্ডনের মত, রাস্তা পার হওয়া এখানে তত বিপজ্জনক না হলেও ভীড় যথেষ্ট। বড় রাস্তা সেখান থেকে বেশী দূরে নয়।

আমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হলাম। যে হোটেলে উঠেছি, সেখানেও খাবার ব্যবস্থা হতে পারতো। কিন্তু আমরা বেড়াতে বেড়াতে অন্যত্র যাওয়াই পছন্দ করলাম। বড় রাস্তা ধরে একটা রেস্তর াঁয় গিয়ে আমরা ৪ জন খেতে বসলাম। আমার খাওয়া নিয়ে কিছু মুস্কিল হলো। বললাম নিরামিষ থাকে ত দেও। পরিচারিকা মিষ্ট হেসে বললে 'artichoke'। নামটা যেন আমার পরিচিত বোধ হলো, তাই বলে' দিলাম 'আচ্ছা'। কিন্তু শেষে সে দ্রব্যটি দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। আনারসের মত ফলটি। কিন্তু ঢের ছোট। কফির পাতার মত পাতায় (কিন্তু ছোট ছোট) ফলটির দেহ গঠিত। মনে পড়লো 'বাগান থেকে এল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।' কিন্তু এখন উপায় কি? কিছু ভাবিত হয়ে পড়লাম। আমরা ছাড়াও আরও অনেক লোক খেতে বসেছিলেন। দু দিকের দুই দেওয়ালে প্রকাণ্ড আর্শী। ঘরে যে সকল আলো ঝুলানো আছে, তা দশ গুণ কিম্বা কুড়ি গুণ হয়ে আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ভোজনকারীরাও এক একজন দশজন কি তারও বেশী হয়ে রীতিমত একটা জন সংঘট্টের মত করে তুলছে। আমি কিন্তু তখন সেই আর্টিচোকের পাকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। অবশেষে সেই চীনা ভদ্রলোক আর্শলাশী চীনা আমার পথ বাৎলে দিলেন। প্লেটের উপর খানিকটা olive oil ও খানিকটা vinegar

ঢেলে চামচে দিয়ে একটু মেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, যে, এইবারে একটি একটি করে পাতা খুলুন আর এই মিক্শ্চার মাখিয়ে খান। ছোট ছোট পাতা এক একটি ডবল পয়সার মত। সে ডবল পয়সার আবার ১৫ আনা শক্ত, এক আনা মাত্র একটু নরম। সুতরাং আমি শীঘ্রই গলদ-ঘর্ম হয়ে উঠলাম। মনে পড়লো দ্বারিক কবিরাজ একজনকে খই খাবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সে পরদিন এসে কবিরাজ মহাশয়কে বললো 'কবিরাজ মশায়, আর যেন খই খাবার ব্যবস্থা দেবেন না।' কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলেন 'কেন, কি হয়েচে!' রোগী বললে যে তার চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে খই খেয়ে। কবিরাজ জানতে চাইলেন সে কি পরিমাণ খই খেয়েছে। রোগী বললো, 'ধামা দুইয়ের বেশী খাই নি। পেটটা ভরা চাইত কবরেজ মশায়।' আমি রোগী না হ'লেও সে আর্টিচোকের ফেরে পড়ে প্রায় চোয়াল ব্যথা করবার যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণেই রণে ভঙ্গ দেওয়ায়, ঠিক ততটা হয় নি। মনে মনে সংকল্প করলাম আর অজানা জিনিষ ফরমাস দিয়ে এমন বিপদ্‌কে ডেকে আনব না কদাচ।

সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেড়াতে যেখানে গেলাম, সেটা ভুবন বিখ্যাত ফলিজ বাজিয়ার (Folies Bergiere); সেখান-কার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। কারণ অনেকের রুচিতে হয়ত সেটা বাধতে পারে। আমার রুচিতেও যে ঠেকে নি, তা নয়। তবে রুচিবাগীশের মত আমি যদি তার নিন্দা করতেই প্রবৃত্ত হই, তা হলে সেটা একেবারেই ঠিক হবে না। কারণ ফরাসীরা যা করে তা সব সময়ে আমাদের চোখে সুশোভন না হলেই এটা বলতেই হবে যে তাদের মধ্যে যে রুচিপ্রিয়তা ও কলা-সৌষ্ঠব দেখতে পাওয়া যায়, জগতে তা দুর্লভ। ইংরেজদের কলা-প্রিয়তা দেখেছি, জার্মানদেরও দেখেছি, কিন্তু এ বিষয় ফরাসী ও ইটালীয়দের সমকক্ষ কেউ আছে বলে মনে হয় না।

ফলিজে দৃশ্যপট, নৃত্য এবং আলোর বাহার যা দেখলাম, তা অতি সুন্দর। গান খুব বেশী ছিল না, যা ছিল, তা'ও আমার ভাল লাগলো না। আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারি নি। কিন্তু যতটা দেখলাম তা সৌন্দর্য্য ও ললিতকলা হিসাবে নগণ্য নয় বলেই মনে হলো। অবশ্য তার সঙ্গে নগ্নতারও সমাবেশ ছিল—যা কেবল ঐ স্বাধীন দেশেই হতে পারে। আর একদিনও গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম ঐ একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। কাজেই কিছুক্ষণ থেকেই চলে এসেছিলাম। শুধু এই মনে হলো যে ও-সব যতই ভাল হোক, একবারের বেশী দু'বার ভাল লাগা কঠিন। তার পরে শুনলাম যে শেষের দিকে নতুন কিছু কিছু ছিল।

হ্ফেল টাওয়ার

রাত্রির প্যারিস (Paris by night) সম্বন্ধে অনেক কথাই আগে শুনেছিলাম। শুনেছিলাম যে এমন সব বীভৎস ব্যাপার হয়, যা লেখা দূরে থাক, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করাও চলে না। অবশ্য সে সব ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে, তার জন্যে ভিন্ন রকম ব্যবস্থা করতে হয়। সব সময়ে সে সকল সুযোগ

ঘটে না এবং সে সুযোগ গ্রহণ করতেও সকলের শিক্ষা, সংস্কার ও প্রবৃত্তিতে কুলায় না। কিন্তু এটাও ঠিক যে পৃথিবীর নানা দিক্‌দেশ থেকে যারা প্যারিস দেখতে আসে, তারা রাত্রির প্যারিস না দেখে যায় না। সেটা পরে প্রকাশ করুক বা না-ই করুক। দিনের বেলা যখন বুলভার্দে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন ২।৩ জন পর পর এসে নৈশ নগরী দেখাতে চেয়েছিল। তার মধ্যে একজন বিশ্বাস জন্মাবার জন্তে কলকাতার নানা স্থানের বর্ণনা ক'রে বুঝালো যে সে কলকাতায় এক সময়ে ছিল। তাদের সঙ্গে গেলে অধঃপতনের চরম স্তর দেখে আসা যেতো হয়ত। কিন্তু সেদিকে আমার কৌতূহল ছিল না।

যা হোক আমি টমাস কুকের আফিসে গিয়ে রীতিমত টিকিট কেটে এলাম এবং রাত্রিতে খাবার পর ৯টায় আফিসে গিয়ে হাজির হলাম। তখনও অন্ধকার হয় নি। আমরা ৯-৩০ টার সময় একটা শ্যারাব্যাঙ্কে উঠে যাত্রা করলাম। আমার আসন নির্দিষ্ট ছিল। সেই আসনে বসলাম। মনে কৌতূহল, আর তার সঙ্গে ছিল ভয়—একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। ২।১ জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে আরও যাত্রী তুলে নেওয়া হলো। মোট আমরা বোধ হয় ৩০।৩২ জন হলাম। তার মধ্যে ১০ জন ছিলেন মহিলা। আমরা সকলেই বিদেশী। আমেরিকা জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক দেশের লোক ছিল। আমিই একমাত্র ভারতীয়।

যা' যা' দেখলাম এখন ঠিকমত বর্ণনা করতে পারবো না। কোনও কোনও বিষয় একটু আধটু সামলে বলতে হবে। তবে মোটের উপর বলতে পারি যে ফ্রান্স স্ফূর্তির দেশ। যাদের প্রাণে স্ফূর্তি, শরীরে বল এবং পকেটে টাকা আছে, তাদের জন্যই প্যারিস। Conscience নামে কণ্টক যাদের আছে, তাদের পক্ষে প্যারিস নয়। এদেশের মূল সূত্র হচ্ছে Good digestion and no Conscience হজমটি ভাল হওয়া চাই—কারণ আনন্দ উপভোগ করতে হলে চাই স্বাস্থ্য। আর চাই কন্‌শেন্সের অভাব। আমাদের যেখানে প্রথমে নিয়ে গেল সে অঞ্চলের নাম কোয়াতিয়ে লাতিন্ (Quatier Latin); সেখানে একটা নিতান্ত পুরানোগোছের বাড়ীর ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম পাতাল পুরীতে। সেখানে একটা ঘরে দেখলাম কতকগুলি প্রাচীন জিনিষ সাজানো রয়েছে। সেগুলি দেখে নামলাম তার পাশের ঘরে—এক এক করে'। একসঙ্গে দুজন যাবার মত চওড়া নয়। সে ঘরে পা দিতেই এক সুড়ঙ্গের মুখে পড়লাম। তার নীচে শুনলাম এক গভীর গর্ত আছে—সেই গর্তের মধ্যে অপরাধীদের পুরে মেরে ফেলা হতো। এখন সেটা তক্তা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। পা দিতেই ভয়ানক শব্দ হয়—আর সেই ঘরের মধ্যে যারা আছে তারা উচ্চ হাস্ত ক'রে ওঠে। দু চারজন আমার আগে ছিলেন, তাঁদের দুর্গতি দেখে আমি সাবধানে পা দিয়েছিলাম যাতে তক্তা ডিঙ্গিয়ে পড়ে। এই-রূপ আরও অনেকে বেঁচে গেলেন বিদ্রূপের হাসি থেকে। আমার মনে হলো যে দু তিন শ বছর আগে যা দেখে বা চিন্তা করে' রক্ত জল হয়ে উঠতো, আজ তাই আমাদের হাসির উপাদান হয়েচে! ঘরটি ছোট্ট, আমরা এবং আর ১০।১৫ জন বোধ হয় ছিলাম। একদিকে একটা প্লাটফরম। তার উপরে একজন মেয়ে গান্ করছে—ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় এবং তার সঙ্গে পিয়ানো আর বেহালা বাজছে। গান প্রায়ই হাসির গান, অঙ্গভঙ্গীও তার অনুকূল। নিতান্ত এক ঘেয়ে লাগল'। তারপরে পানপাত্র পরিবেষণ হলো। যাঁরা ও-রসে বঞ্চিত, তাঁরা অপরের আনন্দ কল্পনায় উপভোগ করলেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা অনেক পথ পেরিয়ে এলাম মোমার্তে (Montmarte)। মোমার্ত পল্লী এই নৈশ আমোদের জন্ম প্রসিদ্ধ। এখানে এক ক্যাবারেটএ আমাদের নিয়ে গেল। দেখলাম নাচ চলছে! কোনও নাচে যুগল, কোনও নাচে পুরুষের অভাবে দুইটি মেয়ে নাচছে। এদের মধ্যে একজন আমাকে নাচবার জন্তে আহ্বান করেছিল, আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে বললাম, জানি না, পারি না, বুঝালাম কোনও পুরুষেও ও-ব্যবসা নেই। সে মেয়েটি কিন্তু আমাকে পেয়ে বসলো। সে বললো তবে ড্রিঙ্ক্। আচ্ছা, তাই সই। 'শ্যাম্পেন' বলে দিল সে-ই মেয়েটি। সে দু' গেলাশ ফরমাস দিল। আমি বে-গতিক দেখে সরে' পড়বার

চেষ্টা করলাম। কিন্তু একে ত পয়সা দেওয়া হয় নি—শ্যাম্পেনের। পয়সা না দিয়ে পলায়ন লাভজনক হলেও তাদৃশ সম্মানজনক নয় এটুকু বোধ আছে। তারপরে আমার সঙ্গীরা কেউ কেউ নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং বসে থাকতেই হলো। দু'-গেলাশ শ্যাম্পেন এলো। আমি তখন এই মেয়েটির সঙ্গিনীকে আহ্বান করলাম। সে বোধ হয় নিগ্রোবংশাবতংসা। একটু মিষ্টি হেসে সে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। বিল আমি দিলাম—২৫ ফ্রাঁ অর্থাৎ প্রায় ৫ টাকা। মেয়ে দু'টি পাউডারে ও রঙে আগাগোড়া চিত্রিত—ও বিশ্রী।

স্বামী স্ত্রী। আমিও ভেবেছিলাম তাই। কারণ পরের রমণীর প্রতি এত নির্দয় হওয়া কঠিন! এখানেও মদ্যপান চললো রীতিমত। অবশ্য যাত্রীরা যে সকল মদ্য পান করচেন, তা কুক কোম্পানীর খরচে। অর্থাৎ সেইটি ধরে ওরা টিকিটের মূল্য স্থির করেচে। আমার মত যারা পানের মর্ম অবগত নয়, তাদের পুরোপুরি লোকসান। এ যায়গাটি কিন্তু ভদ্র—কারও উপর জুলুম নেই।

এরপর যেখানে নিয়ে গেল, সেটি ফলিজ বার্জিয়ারের মত। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়। নামটি মনে পড়ছে না। এখানে যা নাচ ও দৃশ্যপট দেখেছি, তা সারা জীবন

ত্রোকাদেরো

মনে থাকবে। বহু লোকসমাগমে স্থানটি জমজম করছে। আমরা যেখানে যায়গা পেলাম বসে পড়লাম। নাচ তার আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। ষ্টেজটি অতি সুন্দর, প্রশস্ত এবং সুসজ্জিত। তার সম্মুখেই একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মত। তার চারিধারে দর্শকের আসন এবং গ্যালারি। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে এই খালি যায়গাটা রেখে দিয়েছে—বোধ হয় নাচের জন্যে—এই মনে করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে সেটা দু'ভাগ হয়ে সরে গেল। আর তার ভিতর থেকে কলসী মাথায় করে কুড়িজন নর্তকী

এখান থেকে আমরা আর এক যায়গায় গেলাম। সেটার নাম মনে হচ্চে না। কিন্তু সেখানকার ঘরটা ছিল বড়—কাঠের মেজে। নাচও জমেছিল বেশ। এ ক্যাবারেটটার একটু নূতনত্ব এই যে নাচের অবসরে একটি যুবক ও যুবতী জিমন্যাষ্টিক দেখালে। সে যুবকটি মেয়েটিকে একবার এমন আছাড় দিলে সেই কাঠের মেজেতে যে আমি ত ভাবলাম বুঝি আর উঠতে পারবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটি উঠে আবার কসরৎ দেখাতে লাগলো। তবে তার যে খুব লেগেছিল, তা স্পষ্ট বুঝা গেল। শুনলাম তারা

আস্তে আস্তে উপরে উঠলো। আবার সে স্থানটি যে-ই আবৃত হলো, সে-ই তারা সেখানে সুন্দর নাচলো কলসী মাথায় করে'। বলা বাহুল্য ফলিজেরই মত অনেক নর্তকীর বসনের অপ্রাচুর্য ছিল। এখানে যে সব নাচ দেখলাম, তার অনেকগুলিই দেখবার মত। আমি শুধু একটির কথা বলবো। সে নাচের নাম 'Proverbs'—প্রবচন। যেমন আমাদের

ইনভ্যালিড্‌স—নেপোলিয়নের সমাধি (যাদুঘর)

দেশে 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' 'লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়'। ওদের দেশে মেয়েদের জন্যে এমন অনেক প্রবচন বা ছড়া আছে—সেগুলিতে প্রায় মেয়েদের সৎপথে থাকবার উপদেশই দেওয়া হয়েছে। নর্তকীরা এই প্রবচন-নৃত্যে সেই যুগযুগসঞ্চিত প্রবচনগুলিকে পদদলিত করছে। প্রথমে ষ্টেজের ডানদিকে কয়েকটি সিঁড়ি আবির্ভূত হলো (অবশ্য সবই কলে)। সিঁড়িগুলি যেন এক একখানা প্রকাণ্ড বই। তাতে Vol I, Vol II ইত্যাদি লেখা আছে। এমনিতর ১০ টা কি ১২টা সিঁড়ি। একটি মেয়ে প্রায় নগ্ন অবস্থায় উপরের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়—রুচির সম্বন্ধে যাই বলি না কেন, বেশের মধ্যে এমন শিল্প-কলার পরিচয় আছে, যার প্রশংসা না করে' থাকা যায় না। মেয়েটি সর্বোচ্চ ধাপে যখন দাঁড়ালো, তখন ষ্টেজের বাঁ দিকে একখানি বোর্ডে সেই বিশেষ প্রবচনটি উৎকীর্ণ হলো। আর মেয়েটি তখন ঐ গ্রন্থ-সোপানাবলীর উপর দিয়ে নাচতে নাচতে ষ্টেজের মাঝখানে এলো এবং একটু নাচ দেখিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো। এমনি একটির পর একটি মেয়ে বিভিন্ন রঙের ও রকমের পোষাক পরে মানবের রাশিরাশি জ্ঞানগর্ভ প্রবচনগুলিকে পদদলিত করে' চলে গেল। পরিকল্পনাটি মৌলিক—আমার মন্দ লাগলো না। এর পরে যথারীতি পানের ব্যবস্থা ছিল।

যখন বাড়ীতে ফিরলাম, তখন প্রায় ৩টা। কুকের শ্যারাব্যাঙ্ক থেকে নেমে গলিতে ঢুকতেই এক দালালের সঙ্গে দেখা হলো। সে বললে তুমি কুকের সঙ্গে নৈশ প্যারিস দেখতে গিয়েছিলে। কিন্তু ছাই দেখেছ, আমরা তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিষ দেখাবো। লোকটির কথাবার্তা বেশ ভদ্র হলেও সন্দেহ হলো। মনে হলো যে, সে যে সকল দৃশ্যের প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হয়েচে, সেগুলি হয়ত সকলের পক্ষে নয়। আমি তাকে কোনওরূপে পাশ কাটিয়ে বাসায় ফিরলাম। মনটায় খুব শান্তি ছিল না। কাজেই ঘুম আসতেও বিলম্ব হলো। ভাবতে লাগলাম এই প্রতিভা-সম্পন্ন জাতি, এত কলা-নৈপুণ্য, এত নৃত্যগীতে অনুরাগ, অথচ এত বিকৃতরুচিবিশিষ্ট, এত আদর্শ-ভ্রষ্ট কেন?

পরদিন সোমবার। প্যারিস নগরীর গৌরব-নিকেতন লুভ্‌ (Louvre) চিত্রশালা দেখতে গেলাম। কিন্তু কন্টিনেন্টে সোমবারে এ সকল চিত্রশালা, যাদুঘর প্রভৃতি যে বন্ধ থাকে, তা ত জানিনে। ঢুকতে পেলাম না। তখন আমরা বেড়াতে বেড়াতে গেলাম টুইলারি উদ্যানে। প্রশস্ত রাস্তা, তার দুধারে ছোট ছোট বাগিচা—নানা রঙের পুষ্প-পল্লব ও

ফোয়ারায় সজ্জিত। মাঝে মাঝে নগ্ন মর্মর মূর্তি। অতি সুন্দর। এ রকমের উদ্যান সজ্জা আর কোথায়ও দেখি নাই। ফরাসীরা মনের মত করে' সাজিয়ে পৃথিবীর মধ্যে প্যারিসকে সমস্ত মহানগরীর রাণীরূপে বরণীয় করে তুলেছে। উদ্যানের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড ফোয়ারা এবং তার নীচে সুপ্রশস্ত একটি গোলাকার জলাশয়। সেটি এত বড় যে তাকে চৌবাচ্চা বলা যায় না। সেই জলাশয়ে রঙ বিরঙের মাছ খেলা করছে। দু চারটা বড় মাছও দেখলাম। টুইলারির উদ্যান বা উদ্যানশ্রেণী ছাড়িয়ে আমরা এলাম Place de la রাস্তাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুধারে উদ্যানশ্রেণী দূরে Arc du Triomph বিজয়-তোরণ। মনোহর মর্মর মূর্তি এই স্বপ্ন-পুরীর শোভা বর্দ্ধন করচে। আমাদের দেশের চৌরঙ্গী দেখেছি, লণ্ডনের হাইড্ পার্ক দেখেছি, বের্লিনের উন্টার লিণ্ডেন দেখেছি। কিন্তু এত সুন্দর রাস্তা কোথায়ও দেখি নি।

এখান থেকে সেন (Seino) পার হয়ে' গেলাম কি দি অসে (Qui de Orsay)! সেন নদীটি ছোট এবং তার বক্ষে অনেকগুলি পুল। কাজেই শৃঙ্খলাবদ্ধ সেন নদী কঙ্কাল

নোত্‌রদাম গির্জা—আমাদের মেরী

Concord—শান্তি-উদ্যানে; সামনেই ক্যারুসেল তোরণ (Arcdu carrousel)। এই তোরণটি অতি সুন্দর। উপরে গোটাকতক তেজস্বী অশ্বের বল্গা ধারণ করে' ফ্রান্সের বিজয়-দেবতা শৌর্যের প্রতীকভাবে দণ্ডায়মান। তোরণের গাত্রে নানা কারুকার্য খোদিত রয়েছে। লা কোঁকর্দ (La Concord) বেশ সুপ্রশস্ত। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ এখানে হতো। এখান থেকে আমরা এসে পড়লাম সাঁজ্ এলিজে (Champs Elysees). সাঁজ এলিজে পৃথিবীর মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে যত বড় বড় লোকের বাড়ী, বড় বড় হোটেল, নাচ ঘর প্রভৃতি আছে। রূপে প্রবাহিত। লোকে বলে এখানে all the fish are in sane (in Seine) সেখানকার সব মাছ পাগল। আমার বোধ হয় এই ফরাসী জাতটাই পাগল—তা নইলে ছোট একটা খালকে এমন অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে! কতকগুলি পুল আছে, যা' দেখবার মত। পুলের প্রবেশ পথে প্রকাণ্ড স্তম্ভ এবং মাঝে মাঝে মর্মর মূর্তি। সাজাতে কসুর নেই। কিন্তু নদীটার শোভা একেবারেই গিয়াছে। আমরা বোধ হয় Pont Alexandre III নামক পুল পার হয়েছিলাম। এই পুলটির প্রবেশ পথে দুটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ এবং তার উপরে সোণার পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রভাতের রোদে ঝলমল করছিল।

কি দি অসে ধরে' আমরা ইফেল টাওয়ারের (Tordeffel) পাদমূলে দাঁড়ালাম। প্রথমতঃ কি করে' এর উপরে উঠবো, সেই ভাবনা হলো। কারণ কলিকাতার অকটারলোনী মনুমেণ্টে উঠেছি, কাশীতে বেণীমাধবের ধ্বজা, আগ্রায় সেকেন্দ্রা এবং দিল্লীতে কুতুবমিনারে আরোহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই তরদা ইফেল সকলের থেকে উঁচু। সিঁড়ি ভেঙ্গে প্রায় হাজার ফুট উঠা অসম্ভব। কাজেই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু টিকিটের ঘরে (সকলকেই টিকিট কিনিতে হয়) গিয়ে দেখি বেশ ভীড় জমেছে। সন্দেহ হলো এরা কি সবাই উপরে যাবে? বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু বহু তুলে দিলে। সেখানে স্থান কিছু অল্প পরিসর। কিন্তু পানীয় ও আহার্য্যের ব্যবস্থা আছে, নানাপ্রকার স্মৃতিচিহ্ন রকমের (souvnirs) দোকান আছে। মোটের উপর আমরা ৯০০।৯৫০ ফুট উঠেছিলাম বোধ হয়। কারণ বাতাস ঠাণ্ডা বোধ হলো, আর নীচের বাড়ীঘর লোকজন গাড়ী ইত্যাদি অত্যন্ত ছোট দেখাচ্ছিল। এখান থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অদূরে ফ্রান্সের বিখ্যাত ত্রোকাদেরো, টুইলারি উদ্যান, দূরে বোয়া দি বুলোন (প্যারিসের বিখ্যাত পার্ক বা উদ্যান) এবং শীর্ণকায় সেনু নদী বহুদূর এঁকে বেঁকে গেছে দেখা গেল।

কারুসেলের দৃশ্য

ছিল সে ভীড়ের মধ্যে। পরক্ষণেই আমার সন্দেহ নিরসন হলো। পাশেই দেখি Lift রয়েছে। তখন ভরসা হলো। প্রথম লিফটে নিয়ে গেল প্রায় শ' আড়াই ফুট। সেখানে বেশ প্রশস্ত বারান্দা। আহার্য্য ও পানীয় আছে। দোকান পসারও আছে। তারপরে আর একটা লিফ্‌ট্ আমাদের নিয়ে প্রায় শ' চারেক ফুট উঠ্‌লো। এ উত্তোলকটি আকারে ছোট। আরোহীদের বোধ হয় দুভাগ করে দুবারে তুললো। সেখানে আবার লিফ্‌ট্ বদল করতে হলো। শেষের লিফট্ আরও ছোট। সেটা আরও তিন শ' ফুট

আসবার সময় আমরা Pont des Invalides নামক পুল পার হ'লাম। এর নিকটেই ইনভ্যালিডস্ নামক স্মৃতি সৌধ ও যাদুঘর আছে। নেপোলিয়নের সমাধি এর মধ্যে রয়েছে। যাঁর জীবনের শেষটা অমন বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হ'লো, তাঁর স্মৃতি-সৌধও তেমনি সাদাসিধে সৌন্দর্যবর্জিতভাবে গঠিত হয়েচে মনে হলো। এত বড় উদার জাতি, তার শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষের সম্মান এ অপেক্ষা আরও ভাল করে' করতে পারতো!

পরদিন আমরা 'লুভ' চিত্রশালা দেখতে গেলাম। এই

চিত্রশালাটি পর্যটকের মানসসরোবর, বিশেষজ্ঞের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কবি ও ভাবুকের স্বপ্নপুরী। ফ্রান্সের জাতীয় ঐশ্বর্য যে শুধু এই চিত্রশালাকে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের শিল্পাবদান দিয়ে বিভবমণ্ডিত করে' রেখেছে, তা নয়। এ-চিত্রশালা ফরাসী জাতির শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানে পাওলো ভেরোনিজ, লেনার্দো দা ভিঞ্চি, ভ্যান ডাইক, রেম্বাণ্ট প্রভৃতির সুপ্রসিদ্ধ চিত্র আছে। যে ঘরেই যাই, মনে হয় সেইটে সব চেয়ে ভাল। চিত্রের দর যাচাই অবশ্য আমাদের মত আনাড়ী দিয়ে হতে পারে না। কিন্তু ভাল ছবি কিম্বা মূর্ত্তির দর যাচাই সম্বন্ধে ভাবের সঙ্গে একটি বালক গান করলো, আমরা শুনে বাহবা দিয়ে এলাম। আর একজন ওস্তাদ বহুদিন ধরে' তাল মান সুর শিক্ষা করে' নানা রাগ রাগিনী আয়ত্ত ক'রে বিচিত্র মীড় মূর্ছনা আদায় করে' গান করলেন, সে-টা তেমন ভাল লাগলো না। এর কারণ আর কিছুই নয়; যে মানসিক উন্নতি ও চেষ্টা থাকলে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও স্বরবিন্যাসাদি বুঝতে পারা যায়, তা অনেকের নেই। এখানেই বিশ্বমানবতার দোহাই পাড়লে চলবে না। এখানে সেই যে কবি বলেছেন যে একশত মূর্খ নিয়ে স্বর্গে বাস করা অপেক্ষা পাঁচজন

কারুসেল তোরণ

শিক্ষা লাভ করতে হ'লে, এই সকল শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের শিল্পকলা যেখানে একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সেইখানেই যেতে হবে। আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে-ছবি চোখে ভাল লাগে, সে-ই ভাল ছবি। সঙ্গীত মিষ্ট লাগলেই সেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে একখানি ভাল ছবি, বা একটি ভাল কবিতা বা একটি ভাল সঙ্গীতের পিছনে যুগযুগান্ত সঞ্চিত সাধনার ফল রয়েছে। সে ছবি বা সঙ্গীত ভাল কি মন্দ তার বিচার করতে হলেই সেই সাধনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হবে। মিষ্ট-গলায় সুপণ্ডিত বিজ্ঞলোক নিয়ে পাতালে বা নরকে যাওয়াও ভাল। সেই কথাটি মনে পড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যা বলা যায়, চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও তাই খাটে। অভ্যাস, সাধনা, অভিজ্ঞতা বহু চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করলে তবে এই সকল সাধনার ফল বুঝতে পারা যায়। লুভ্রে দেখলাম একটী ছবি একজন চিত্রকর নকল করে' নিচ্ছেন। তিনি তাঁর পটে আবশ্যক মত রঙ ফলিয়ে তুলির টানে, রেখা ও রঙে ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে' তুলবার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

আমরা সেই চিত্রকারিণীর প্রচেষ্টা দেখলাম। কিছু বুঝলাম কি?—শুধু এইটুকু মনে হলো যে নকলে যতটুকু আদল আনা যেতে পারে, তার কিছুমাত্র ত্রুটী হয়নি। কিন্তু আসল ছবিটিতে রেখা-বর্ণ ও পটুতার অতীত আর কিছু আছে, সেইটি মহিলা ধরতে চেষ্টা করছেন। ছবিখানি লেনার্দো দা ভিঞ্চির সুবিখ্যাত 'মোনা লিজা'—যে ছবি জগতের মন হরণ করেছে। কোন্‌গুণে, তা কে বল্‌তে পারে? সম্ভবতঃ সে গুণটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, রঙে ফুটানো যায় না। যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়ী অনুভূতি কবির কবিতার প্রাণ, শিল্পীর শিল্পপ্রতিভার বিকাশ, গায়কের ধ্যানপ্রসূত আধ্যাত্মিক আবেদন, তা অনুকরণে ধরা যায় না। সে-টা চিরদিনই জগতে সেই কবি, সেই রূপদক্ষ এবং সেই সুর-শিল্পীর নিজস্ব হয়ে থাকবে।

আমরা যেভাবে 'লুভ' দেখা শেষ করলাম, সেভাবে যে তা দেখা যায় না; এ কথা বলা বাহুল্য। মনে মনে ঐ চিত্রশালার চিত্র মনের মর্ম্মরে চিরমুদ্রিত করে' আমরা ক্ষুধার তাড়নে এক চীনা রেস্তঁরায় খেতে গেলাম। প্যারিসে চীনাদের অনেকগুলি ভোজনাগার আছে। সেখানে চীনা ব্যতীত ভিন্ন দেশীয়েরাও মুখ বদলাতে যান। আমার কিন্তু প্রথম ঘ্রাণেই অন্তরাত্মা খাঁচা ত্যাগ করবার উপক্রম করছিল। সবই বেশ পরিষ্কার পরিপাটী। কিন্তু এত বেয়াদবী গন্ধ আসে কোথা থেকে? বন্ধুবর বললেন, একটু ধীরে! এখনই ও-টা অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আমি ভাবতে লাগলাম জগতের যাবতীয় আরশোলা দগ্ধ করে' কি আমাদের জন্য এইরূপ ঘ্রাণ-বিনোদন কাবাব তৈরী করেছে? যা হোক, খাবারগুলি মন্দ লাগলো না। ভাত ছিল। বাঙ্গালীর ভাত হলে আর চাই কি? বিলাতে গেলে ভাত খেতে হয় না, বা ভাতের প্রয়োজন বোধ করা যায় না, বা ভাতের কোনো ব্যবস্থা নেই, একথা বললে অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বা তাদের মাতার বিলাত-গমনের সখ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভাত না খেয়ে কি প্রকারে থাকা যেতে পারে? অসুখ হলে' যারা অন্নপথ্যের প্রত্যাশায় বিনিদ্র যামিনী জাগিয়া পোহায়, তাদের পক্ষে 'ভাত' অবশ্য একটি পরমাদপি পরম উপাদেয় খাদ্য।

কিন্তু আমাদের এক চীনা বন্ধু মিঃ লিন—যাঁর নিমন্ত্রণে আমরা সেই চীনা হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম তিনি এই ভোজনে বাধা ঘটাবার জোগাড় করলেন। দেখলাম তিনি ও তাঁর পত্নী দুইটি কাঠি নিয়ে তারই সাহায্যে বাটী থেকে ভাত তুলে তুলে বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুখে পুরে দিতে লাগলেন। কাঠি দুইটি উলবোনার কাঠি থেকে বেশী মোটা নয়। আমিও তাঁদের দেখাদেখি কাঠি দিয়ে ভাত তুলতে গিয়ে দেখি, ওমা, ভাত সব পড়ে গেল সেই বাটীতে, আর মুখে উঠ্‌লো শুধু কাঠি। চীনা পরিবেশক যত আমার দুরবস্থা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে, আর আমি তত জোরে কাঠি চালাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার ফলে ২.৩টি ভাত যা আমার মুখে প্রবেশ করছে, তা আমার ক্ষুধার অনুপাতে একটি দশমিক ভগ্নাংশ এবং তার আগে গোটাকতক প্রকাণ্ড শূন্য। চৈনিক বন্ধুর পত্নী আমায় বার কতক দেখিয়ে দিলেন ওর কৌশলটা এবং অনুকরণ-চাতুরীতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলাম না। বোধহয় শৈশবই হচ্ছে ঐরূপ কাঠি-চালন শিক্ষার উপযুক্ত সময়। চীনা মহিলা আমার দুর্দশা দেখে কাঁটা চামিচে আনতে আদেশ করলেন এবং তারই সাহায্যে কোনও প্রকারে সেদিন দগ্ধোদর শীতল করি। কাঁটা চামচ এবং ছুরির বিভীষিকাতেই ক্ষুধা দেবী অন্তর্ধান হন, আবার এই কাঠি ভাঁজা বা লাঠি ভাঁজা সুরু করতে হলেই ত গিয়েছিলাম আর কি! আর একদিনও এক চীনা রেস্তরাঁয় গিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিন গোড়া থেকেই কাঁটা ছুরি চেয়ে নিয়েছিলাম।

খাবার পরে প্যারিসের 'সরবন' নামক রাস্তায় গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বাড়ী দেখলাম। গ্রীষ্মের অবকাশে সমস্ত বন্ধ। কাজেই ভিতরে গিয়ে জাতীয় পাঠাগার, পরীক্ষাগারের আয়তন দেখবার সুযোগ হ'ল না। বন্ধুবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জুল্‌স্ ব্লকের নিকট একটা পরিচয় চিঠি দিয়েছিলেন। শুনলাম তিনি গ্রীষ্মাবকাশে অন্যত্র চলে গেছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আলাপ এবং তার সূত্রে অন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ হ'ল না বলে মনে অত্যন্ত দুঃখ হলো। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

STUDENTS' P.G. COMMON-ROOM

পদ্মা : প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসুবোধ বসু

তিন

'এসো, রজত'—সত্যানন্দ মিত্রের গৃহিণী সত্যবতী কহিলেন। রজত অগ্রসর হইয়া কহিল,—'কই, কাকাবাবু বাড়ি ফেরেন নি, এখনও? আপিস ঘরে দেখলুম না তো।'

'জল খেয়ে সন্ধ্যার আগেই উনি কোথায় একটু কাজে বেরিয়েছেন; শীগগিরই ফিরবেন বলে গেছেন, তুমি বস।' সত্যবতী বড় কৌচটার মধ্যে নিজের চওড়া দেহটাকে কোনও প্রকারে আঁটাইয়া বসিয়াছিলেন; অতি কষ্টে আড়মোড়া ভাঙিয়া সিধা হইয়া বসিয়া রজতের প্রতি অতিথি সৎকার দেখাইলেন। কহিলেন—আমারও রান্না শেষ হয়ে এল বলে, বেশি রাত হবে না—ওরে গয়ারাম, ব বুর্চ্চিকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় তো পাঁঠার মেটেতে সবটা পেঁয়াজ বাটা দিয়েচে কিনা—কিছু যদি লক্ষ্মীছাড়াটার মনে থাকে। বলবি আর পনেরো মিনিটের মধ্যে খানা চাই,—শুনলি ওরে গয়ারাম—সত্যবতী বেয়ারা গয়ারামের প্রতি হাঁকিতে লাগিলেন।

গয়ারাম ইহার এক বর্ণও শুনিতে পাইল না; মেমসাহেবের আদেশ এমনি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আসিতে থাকে যে সে-বেচারী এ-ছুতায় ও-ছুতায় তাহার সান্নিধ্য প্রতিনিয়ত এড়াইতে চেষ্টা করে। তার কোনও সাড়া শব্দই আসিল না।

সত্যবতী কহিলেন—'ঐঃ, লক্ষ্মীছাড়াটা সুযোগ বুঝে সরে পড়েছে; এদের জ্বালায় যদি একটু সোয়াস্তি পাবে—একটু জিরোতে দিয়েচ কি এ তল্লাটেও আর খুঁজে পাবে না।—ওরে ঐ: গয়ারাম শুনছিস্। রান্নার কত দেরি দেখে আয় তো—ওরে শুনচিস্ হতভাগা'—

রজত কহিল, 'আমার কিছু তাড়া নেই, কাকীমা। মিছিমিছি আপনি চেঁচিয়ে মরচেন,—গয়ারামের আরামে ঐতে, একটুও বিঘ্ন হবে না।' বলিয়া সত্যবতীর পাশের সোফাটায় বসিয়া পড়িল। এবং সেই মুহূর্তে সোফার হাতলে খদ্দরের কাপড়ে একটা অসমাপ্ত নক্সা আবিষ্কার করিয়া সেটাকে সকৌতূহলে উঠাইয়া লইল। কহিল, এটা কি, কাকীমা? টেবিল ক্লথ!

সত্যবতী কপালে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মৃদু আঘাত করিয়া কহিলেন—টেবিল ক্লথ! পোড়া কপাল, ওটাতে মেয়ের ব্লাউজ হবে; তুমি আছ কোথায়। একবার কাণ্ডখানা দেখতো,—চট দিয়ে তৈরি হবে গায়ে-দেবার ব্লাউজ; কালে কালে আরও কতই দেখব—

"কার ব্লাউজ? মন্দার?" রজত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

'তবে আর বলচি কি, বাবা। কত বোঝালুম, এই গরমে চট পরা কি ভদ্রলোকের সম্ভব; শীত আসুক, তখন না হয় সখ মেটাস্। কিন্তু কে শুনচে তোমার কথা। যা নতুন ফ্যাসন হবে তাই করা চাই, তা সে উচিতই হোক আর নাই হোক। কিন্তু চটের মধ্যে ফুল তুলিয়ে নিতে এই বুড়িকেই। বাবুর্চ্চিটাকে রান্নাগুলো যে দেখিয়ে দেব, তার পর্য্যন্ত ফুরসৎ পেলাম না। এখন খেতে পার, তবে হয়। ওরে ও গয়ারাম, শুনচিস্—

খবরটা শুনিয়া রজত মুচকিয়া হাসিল। এই ফ্যাসন-

দুরন্ত বিলাসী পরিবারে খদ্দরের প্রথম প্রবেশটা এমনই বিস্ময়ের যে তার ভারি কৌতুক বোধ হইল; এবং সন্দেহ রহিল না যে মেয়ে ইস্কুলের ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমন্দালিকা দেবীর ইহা স্বাদেশিকতার চাইতে অনুকরণপ্রিয়তারই বড় উদাহরণ। তবু স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দেশের লোকের যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই অনুরাগের ঢেউয়ের একটু আন্দোলন যে এই ধনীর বাড়ির দেউড়ি এড়াইয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া তার যুগপৎ আনন্দ এবং কৌতুক বোধ হইল। কহিল—'মন্দ কোথায়? পড়ছে বুঝি?'

সত্যবতী কহিলেন—তা ছাড়া আর কোন কাজটা আছে আজকালকার মেয়েদের। পড়া, পড়া আর পড়া; দিন রাত্তির বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থেকে চোখ দুটো নষ্ট করে তবে ছাড়বে। সংসারের কোনও কাজকর্ম্ম যদি শিখবে।' এবং সহসা কণ্ঠস্বর উচ্চ গ্রামে তুলিয়া ডাকিলেন —'মন্দা, ও মন্দা, শুনচিস্, তোর রজত-দা এসেচে যে। ওরে ও গয়ারাম, দিদিমণিকে একবার ডেকে দে দিকিনি— গয়ারাম, বলি, আচিস্ এ-দেশে—

দেখা গেল গয়ারামের উপর রজত বিশেষ একটা ভরসা রাখে না। সে নিজেই হাঁকিতে লাগিল—মন্দ, ও মন্দ, পড়াশুনা বন্ধ করে একবারটি ওপর থেকে নেমে আসুন তো। ও পড়ুয়া মেয়ে মন্দালিকা দেবী'—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উপরতলায় যাইবার সিঁড়ি দিয়া রজত প্রচণ্ড আহ্বান পাঠাইতে লাগিল। রজত এ-বাড়ির ছেলের মত, এবং আদব কায়দা তার কোনও দিনই ধাতে সয় না; তাই অনায়াসে সে ফ্যাসান বিরুদ্ধ চেঁচামেচি করিতে পারে। কিন্তু মন্দালিকার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না।

সত্যবতী পুনর্ব্বার হাঁকিলেন—ওরে গয়ারাম, গেলি কোথায়?

রজত দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—গয়ারামকে পাওয়ার চেয়ে মন্দটাকে ধরে আনাও সহজ হবে, কাকীমা। আপনি আর ব্যর্থ ডাকাডাকি করবেন না, বরঞ্চ শ্রীমতী মন্দালিকার চুলের মুঠিটা ধরে আমিই হাজির করে দিচ্ছি।' বলিয়া সে বীরের ভঙ্গিতে মন্দালিকার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। সত্যবতী মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আড়মোড়া ভাঙিলেন এবং অধ্যবসায় সহকারে আবার ডাকিলেন—ওরে গয়ারাম, বাবুর্চ্চিকে একবার ডেকে দে তো। বাতের ব্যথাটা জোর করেচে, হেঁটে যেতে পাবব না। হতভাগা বাবুর্চ্চি কিযে কি রেঁধে বসে আছে ভগবান জানেন—

রজত হাঁকিতে হাঁকিতে উপরতলায় যাইবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। দারোয়ান ভজন সিং অপিস ঘরের আলোটা বন্ধ করিয়া বাহিরের বারান্দা দিয়া খড়ম পায়ে খটাস্ খটাস্ করিয়া দেউড়ির দিকে নিজ ঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, রজতের চেঁচামেচি শুনিয়া কৌতুক করিয়া কহিল—ক্যায়া হুয়া, হুজুর? ডাকু গিড়া ক্যায়া?

এ-বাড়ির চাকর দাসী সকলেই রজতকে পছন্দ করে; এদের সবার সঙ্গেই রজতের আলাপ আলোচনা, এমন কি কখনও রসিকতা পর্য্যন্ত চলে। এই সব অধীনস্থদের প্রতি সহরের ধনী পরিবারগুলিতে যে ঔদাসীন্য এবং অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, তাহা রজতকে বড় ব্যথা দেয়; মানুষ মানুষকে এত দূর এত অবহেলার কি করিয়া যে মনে করিতে পারে, সে ভাবিয়াই পায় না। অথচ রজত আশৈশব দেখিয়াছে গ্রামের গৃহস্থালীতে অধীনস্থদেরও একটা বিশেষ স্থান আছে; তাহাদেরও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। তার শৈশবের বিচিত্র সঙ্গীদের এবং তাহাদের সঙ্গে তাহার সম্প্রীতির কথা রজত এখনও বিস্মৃত হয় নাই।

ভজন সিংকে কহিল—ডাকু গিড়লে সে ভি তোম্‌হরা বাড়িকো আদমী জবাব নহি দেতা, ভজন সিং। আচ্ছা হায়?

'আচ্ছা হায়, হুজুর।'

'আভি কেত্‌না কাচা দুধ পিতা?'

'দুধ কিধার মিলে গা, হুজুর; গরিব আদমী।'

'মন্দ! ও মন্দ! কোথায় গেলি, মেয়েটা। ওরে ঐঃ দুষ্টু মেয়ে, খুব তামসা হচ্চে, না? পিঠটাকে মারা কর তো? তবে শীগগির সাড়া দাও।'

উপর তলায় শুইবার কোণার ঘরটায় অবশেষে মন্দালিকাকে আবিষ্কার করা গেল। স-চীৎকারে পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই রজত আরেকটু হইলে মন্দালিকার

উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িত। সামলাইয়া লইয়া কৃত্রিম ক্রোধের ভঙ্গিতে কহিল—ডাকচি, শুনতে পাস্ না? ঈস্, গলাটাকে একেবারে জখম করে ফেলেচি, আর এইখেনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে মজা দেখা হচ্ছিল, না?

মন্দালিকা খুকীর যোগ্য স্বরে জবাব দিল—বাঃ রে, পড়ছিলাম না বুঝি?

'পড়লে বুঝি একটা জবাবও আর দেওয়া যায় না! আমরা কি আর কখনও পড়ি? আমার আজ এখানে নেমন্তন্ন গো, জান্?'

মন্দালিকা কহিল—বাঃ, জানিনা বুঝি।

'তবে আবার পড়া হচ্ছিল কেন?'

'বাঃ রে, তাতে কি?'

'তাতে সাইক্লোন, সুতরাং অনধ্যায়। করে করে অনধ্যায় হয় জানিস্? মনুসংহিতায় লেখা আছে। তুমি যদি বসে পড়া করো, তবে আমি করি কি শুনি? আমি বুঝি শুধু খেতেই আসি? হচ্চেলে বুঝি আর আমাদের রান্না হয় না। চমৎকার রান্না হয়, যা স্বাদ।'

মন্দালিকা সামান্য দুষ্টামির স্বরে কহিল,—খুব স্বাদ?

'তা আর নয়, চমৎকার সব স্বাদ। আলু খাচ্চ, মনে হচ্চে গাজর; ছিম খাচ্চ, মনে হচ্চে পালং শাক; মাছ খাচ্চ, মনে হচ্চে পাঁপর ভাজা।'

মন্দালিকা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে আঁচলটা গুঁজিয়া দিল। তারপর কহিল—ওঃ, এমন! তবে আর এলেন কেন, এখানে খেতে যে কষ্ট হবে।'

রজত কহিল,—এসেচি আপনার গানের বিচার করতে; তা কি মহারাণীকে সারা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে! কি নতুন গান শিখেচিস্ আগে শোনা, তারপর আমার রায় বেরুবে।

মন্দালিকা আপত্তির ভঙ্গি করিয়া কহিল—ঈস্, কেবল চালাকি, আমি বুঝি আর বুঝি না। আমার গলাটা একটুও আজ ভাল নেই; যা সর্দি হয়েচে, বুঝলেন—

রজত হাসিয়া কহিল—তুই একেবারেই ইস্কুলের মেয়ে। না সাধলে অবশ্যি গান গাওয়া উচিত নয়, কিন্তু রোজ রোজ এক কারণ দেখালে, সাধবে কে রে, বোকা।' বলিয়া মন্দালিকার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—লক্ষ্মীমেয়ে তো, বসবার ঘরে এসে একটু নাকী সুর শুনিয়ে যা—আঃ, কি করিস্,—হ্যাঁ, নাকী সুরই আমার ভাল লাগে—ওতেই হবে—

মন্দালিকার প্রথম গানটা সমাপ্ত হওয়া মাত্র সত্যবতী বাতের ব্যথা উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন—তোমরা বসে গল্পগুজব কর, খাওয়ার তৈরি হ'তে আর দেরি হবে না। আমি যাই, একবার হতভাগা বাবুর্চ্চিটাকে দেখে আসি। বাতের ব্যথায় নড়তে পারি না, এই সুযোগে লক্ষ্মীছাড়া অর্দ্ধেক জিনিষ সরিয়ে ফেলেচে; আর বাকি অর্দ্ধেকে অখাদ্য রেঁধে বসে আছে। কী যে আমি করব হতভাগাদের নিয়ে। ওরে ও গয়ারাম—'বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মেদবহু কলেবরটিকে কোন প্রকারে বহন করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং রসুইখানায় যাইবার চেষ্টা না করিয়া বারান্দার অন্তপ্রান্তে এক বেতের চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং অত্যধিক পরিশ্রমে হাঁপাইতে লাগিলেন।

'বড় যে খদ্দর পরা হচ্চে।'

'হচ্চেই তো; তা দোষের হলো বুঝি!'

'ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে স্নো ক্রিমগুলি কোথাকার তৈরি দেখে এলাম?'

'ও তো ওষুধ।'

'বেশ বেশ।—অন্তত স্বদেশী গান তো গাওয়া উচিত ছিল', রজত কহিল, 'তাতে বোঝা যাবে মনটা স্বদেশী কিনা।'

'বাঃ রে, বিদেশী গান গাইলাম বুঝি?' মন্দালিকা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'এ গুলি কোথাকার গান?'

'একটা শুনে বিচার করা চলে না।' রজত কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিল। 'আরও শুনি, তবেই এ-সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারব। ধর্, ধর'—বলিয়া সে বিচারকের মত গম্ভীর হইয়া শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া বসিল।

মুচকি হাসিতে হাসিতে মন্দালিকা কহিল—যত সব আপনার চালাকি—সব বুঝতে পারি। বেশ, আরেকটা

গাইচি, কিন্তু এইটাই শেষ কিন্তু। হলেই আমি পালাব, বলে রাখচি।'

রজত চোখ উঠাইয়া কহিল—কেন ঠাকরুণ, কি আপনার কাজটা শুনি?'

'বাঃ রে, কাজ আছে না বুঝি। কত কাজ।' বলিয়া মন্দালিকা অর্গ্যানের তলদেশে পদাঘাত করিয়া সুর উঠাইল—গ্যাং গ্যাং গ্যাং। এবং অচিরে গানটা সমাপ্ত করিয়া এক ছুট দিয়া বাহির হইয়া গেল,—অতিথির অনুমতির অপেক্ষা মাত্র করিল না।

রজত চিৎকার করিয়া কহিল—দাঁড়া, তোর দুষ্টুমি দেখাচ্চি। চালাকি হচ্চে, না?

রজত জানে না, মন্দালিকা ওকে লজ্জা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এটা অত্যন্ত অল্প দিনের ব্যাপার। রজতের কাছে মন্দালিকার কোনও লজ্জাই ছিল না; বোনের মত সহজ স্বাধীনতায় রজতের সঙ্গে সে কখনও কৌতুক, কখনও দৌরাত্ম্য এবং কখনও বা অভিমান করিত। কিন্তু এমন সময় সহসা তার দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর-রূপে বদ্‌লাইয়া গেল। মন্দালিকা একদিন শুনিতে পাইল ওর মা ওর বাবাকে বলিতেছে—'রজতকে একবার বলেই দেখ না, মন্দার সঙ্গে তো কত হাসি খেলা করে; অপছন্দ হবে কেন?' গম্ভীর স্বরে সত্যানন্দ কি বলিলেন, সে কি অনুমোদন না তার বিপরীত, তাহা মন্দালিকা ঠিক শুনিতে পায় নাই; কিন্তু তখন হইতেই এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন তাহার মধ্যে দেখা দিল, এবং তার ফল এই হইল যে রজতকে আজকাল সে লজ্জা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাতের আহারের পর সত্যানন্দ রজতকে অপিস ঘরে লইয়া গেলেন এবং এষ্টেট-সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোটালনগরের ম্যানেজার বাবুর কাছে পাঠাইবার জন্ত কিছু আদেশ পত্রের খস্‌ড়া তৈরি করিলেন। বিশেষ করিয়া এই কাজের জন্তই রজতকে আজ তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এষ্টেটের পরিচালনায় তার পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইলেই রজতের এ বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকে; একমাত্র রাত্রেই সত্যানন্দের সময় হয়। তারপর চিঠি পত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি তার ক্লার্কের হাতে সেগুলি সই করাইবার জন্ত রজতের নিকট হষ্টেলে পাঠাইয়া দেন। রজত এই বৃদ্ধের মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। রজত কহিত—কাকাবাবু, আপনি যা ভাল বোঝেন, তার চাইতে কি আমি কিছু বেশি বুঝব? আমার পরামর্শ এমন করে নেওয়ার কি প্রয়োজন।' বৃদ্ধ সত্যানন্দ মৃদু হাসিয়া কহিতেন—শিখতে হয়, সবই শিখতে হয় বাবা। না শিখলে চলবে কেন।'

রজত যখন হষ্টেলে ফিরিল তখন রাত্র দশটা বাজিয়া গেছে। পাঁচতলার খোলা চত্বরটায় তখন রীতিমত এক বিতর্ক সভা বসিয়া গেছে এবং প্রধানত তার সর্ব্বপ্রধান ও সার্ব্বাধিক বাগ্মি বক্তা সমর ভটচাজ বক্তৃতা দিতেছিল:—যা আমি বিশ্বাস করি; আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, পোলিটিক্যাল ষ্টেট একটা ধাপ্পাবাজী; সমাজে যারা প্রকৃত শ্রমিক, ধন যারা সত্যি সত্যি নিজ হাতে উৎপাদন করে, শুধু তারাই সমাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী: তাদের মঙ্গল যাতে হয়, সমাজ ব্যবস্থা শুধু তেমনি হওয়া উচিত। তোমাদের ষ্টেটের আসল রূপটি জান?—ওটা হচ্চে বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের আখড়া, তাদের অত্যাচারের কলকাঠি। তাই আমি শুধু সোস্যিয়ালিষ্ট নই, আমি Syndicalism এ গভীর ভাবে বিশ্বাস করি। আমি বলি—

সুনন্দ বাধা দিয়া কহিল—স্বাধীনতায় যদি সত্যিকারের আস্থাবান হও, তবে অন্তত Syndicalism এর এক-চোখোমিটাও ভুলে যেয়োনা, তার জবরদস্তির দিকটাও ভেবে দেখো। সিণ্ডিক্যালিসম তো সর্ব্বসাধারণের ওপরে শ্রমিক এবং ট্রেড্ ইয়ুনিয়নের অত্যাচার: গোঁড়ামিটা তোমার একটু কম তীব্র হলে অন্তত Guild socialism পছন্দ করতে—কেননা, তাতে পোলিটিক্যাল ষ্টেট্ এবং গিল্ড দুই-ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান।'

'আমরা কারুর পরাধীনতাই চাই না,' উত্তেজিত হইয়া সমর সচিৎকারে কহিতে লাগিল, 'আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী: এমন কি লেনিন্ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতেন যে Proletariat দের ডিক্টেটর সিপ-এর

প্রয়োজনটা মিটে গেলেই ষ্টেট-প্রথাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হবে। ইতিহাসে এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ কি হয়েচে, জান? মানুষের পরস্পরের উপর অন্যায় অব্যাহত রাখতে ষ্টেট চিরকাল—

'পূর্ণানন্দ কোথায়?' রজত অকস্মাৎ পিছন হইতে বক্তৃতায় বাধা দিয়া কহিল। 'বায়ুমণ্ডলে প্রমত্ত ঝঞ্ঝার সূচনা—বাঁশি না হলে এ ঝড় থামায় কার সাধ্য। তবে সমর, তোর oratoryটা একটু থামাবি?—'

"আমাদের আদর্শ হচ্চে—এনার্কিসম্' সমর ভটচাজ না দমিয়া কহিতে লাগিল। 'মানুষ পরস্পরের সঙ্গে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুধু সৌহৃদ্যের আনন্দে, অনাবিল আত্মীয়তা-বোধে মিলিত হবে'—মানুষের আত্মার স্বাধীনতাকে কোনও গবর্ণমেণ্টের জবরদস্তি, কোনও আইনের বন্ধন, কোনও কৃত্রিম নিষেধ খর্ব্ব করবে না; মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে। প্রিন্স ক্রপটকিন্ বলেছেন—

'শুনচিস, সমর।' রজত মুচকিয়া সামান্য একটু হাসিয়া কহিল, 'এত হাঙ্গামা করে নেমন্তন্ন থেকে বাঁচিয়ে খাবারগুলি তবে আমি শুধু শুধুই নিয়ে এলাম দেখচি; তোরা দেখি সবাই নির্লোভ পুরুষ হয়ে উঠেচিস।' বলিয়া যে পুঁটলিটাতে জমিদারি সংক্রান্ত কতগুলি কাগজপত্র বাঁধিয়া বগলে চাপিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহাই ইঙ্গিতপূর্ণ-ভাবে নাড়িয়া দেখাইল। কহিল,—'আসবি যদি, তবে তাড়াতাড়ি আয়; বড় ঘুম পেয়েচে, এক্ষুনি গিয়ে শুয়ে পড়ব। ভোর বেলায় ফুরিয়ে গেলে দোষ দিতে পারবে না—' বলিয়া বাণ্ডিলটা পুনর্ব্বার নাড়িয়া দেখাইয়া রজত দ্রুত প্রস্থান করিল।

সমর লুব্ধভাবে তাকাইয়া দেখিতেছিল। কহিল—দাঁড়া, এই এইটুকু সেরেই আসচি।—গবর্ণমেণ্ট একটা লোককে কতটা demoralise করতে পারে, জানিস্? প্রিন্স ক্রপটকিন্ বলেচেন—'This or that despicable minister might have been an excellent man if power had not been given to him.—রজত, দাঁড়া, এই এলাম; বন্ধ করিস না।—কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসের কার্য্যাবলী আমি কিছুতেই অনুমোদন করবো না—কিছুতেই নয়। রজত—

'রজত বাবু?'

অত্যন্ত মৃদুস্বরে পিছনের আসন হইতে ডাক আসিল।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া রজত কহিল—ওঃ, আপনি? দেখতে পাইনি তো আগে, কখন উঠলেন? বাড়ী ফিরছেন?

উত্তরে মঞ্জরী সম্মতি জানাইয়া রজতকে তার আসনের অপরার্দ্ধে উঠিয়া আসিয়া বসিতে আহ্বান করিল। রজত ঐ আমন্ত্রণকে মোটেই কোনও সৌভাগ্য মনে করে না, কিন্তু মঞ্জরীকে হতাশ করিতেও তার দ্বিধা হইল; এবং একটু ভাবিয়া চলমান বাস্‌টার গতিতে টলিয়া টলিয়া মঞ্জরীর পাশে যাইয়া বসিয়া পড়িল। কহিল—আমার বাড়ী যদি কলেজ থেকে দূরে হতো, তবে এমনি একরাশ বই নিয়ে বাসএর মধ্যে ঝাঁকুনি খেতে খেতে মজা করে কলেজে আসতে যেতে পারতুম; কলেজের গায়েই বাস করি, কলেজ-যাত্রাটাকে কিছু গৌরবজনকই মনে হয় না।'

'ব্যঙ্গ করা হচ্চে বুঝি?' মঞ্জরী চোখ বাঁকা করিয়া কহিল।

'না, মোটেই নয়।' রজত প্রতিবাদ করিল। 'কোনও কথাই কি অকপটে বলতে পারব না? সত্যই বলচি, জগতের সমুখ দিয়ে সগর্ব্বে বই বগলে করে কলেজে আসাটা আমি অত্যন্ত গৌরবজনক মনে করি। আমি ছাত্র, আমি জ্ঞানের সন্ধানী, এই কথাটা বিশ্বকে জানান কি কম শ্লাঘার!'

'কিন্তু যাচ্চেন কোথায়?'

'যদি বলি কালীঘাটের কালীকে দেখতে, বিশ্বেস করবেন?'

'কিছুমাত্র না।'

'তবে নাই করলেন। ওখানে যাচ্চিও না।' রজত হাসিয়া কহিল। 'আমি যাচ্চি টালিগঞ্জে।'

'টালিগঞ্জে? কেন?' কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মঞ্জরী প্রশ্ন করিয়া বসিল।

'যদি বলি, দূর দেশ ভ্রমণ করতে, তবে যেন আপনি মোটেই অবিশ্বাস ক'রে বসবেন না। একই রকম পিচ-বাঁধান রাস্তা আর রেলিং-ঘেরা পার্ক আর ইঁটের স্তূপ দেখতে দেখতে আমি হাঁপিয়ে উঠি। তাই একটু দম

সংগ্রহ করে আনবার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে পাড়াগাঁয়ে যেতে হয়। দমদমা, দক্ষিণেশ্বর, বা টালিগঞ্জে পল্লী খুঁজে নেওয়া সহজ, এবং পথও তেমন দুর্গম নয়। অমন অবাক হয়ে কি আর দেখচেন, যে গ্রাম্য ছিলাম সে গ্রাম্যই রয়ে গিয়েচি, কিচ্ছুই আর উন্নতি হলো না।'

বাস্‌টা এতক্ষণে ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়াছে। স্থানটা আবিষ্কার করিয়া মঞ্জরী সহসা কহিয়া উঠিল—'উঃ, এমন তেষ্টা পেয়েচে, কি আর বলব; কেউ যদি একটু সরবত খাওয়াতো, প্রাণ বাঁচাত। খাওয়াবেন আপনি?'

'আমি? হ্যা, হ্যা, নিশ্চয়। নয় কেন।' বলিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু এমন বিব্রত সে বহুকাল বোধ করে নাই। মঞ্জরীও চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং চলমান বাস্‌টাকে হাঁকডাক করিয়া থামাইয়া দুজনেই নামিয়া পড়িল, এবং চৌরঙ্গী দিয়া অগ্রসর হইয়া সম্মুখের সাহেবী রেস্তরাঁতে গিয়া ঢুকিল।

এ পর্য্যন্ত রজত বিরক্তি বোধ করে নাই, বা মঞ্জরীর ব্যবহার তার কাছে বাড়াবাড়ি বা ক্লেশকর মনে হয় নাই। কিন্তু লিমন্ স্কোয়াস্ পানান্তে হোটেলের বাহিরে আসিয়া মঞ্জরী যখন ফরমাস করিল—'চলুন না একটু নিউ-মার্কেটে; বিস্তর জিনিষ কেনবার আছে, অথচ একা যেতে ভরসা হয় না,—যা সব হাঁকডাক আর দামাদামি করে।'—তখন রজত সত্যই কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ভাবিল—অদ্ভুত মেয়ে তো! উনি যাবেন রাজ্যের লেশ জর্জ্জেট জর্গেণ্ডি কিনতে, আমাকে ওঁর সঙ্গে খাম্‌খা ঘুরে মরতে হবে। এ অত্যন্ত অসঙ্গত আব্দার।'

কিন্তু যাইতে হইল এবং সম্পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল মঞ্জরীর নির্ব্বাক সাথী হিসাবে দোকান হইতে দোকানান্তরে ওর পছন্দের বস্তু দেখিয়া বেড়াইতে হইল। অবশেষে কেনা সমাপ্ত করিয়া মঞ্জরী দুষ্টু হাসিয়া কটাক্ষ হানিয়া কহিল—খুব রেগে উঠেচেন তো? একটু দেরি হয়ে গেল, কি করব; কিনতে এলে এমন একটু হয়—ই। কিন্তু বিনে পারিশ্রমিকে খাটাব না; বাড়ি চলুন, খুব ভাল চা খাওয়াব। মা তো কতদিন আপনার কথা বলেন,—একদিনও তো গেলেন না—

রজত গম্ভীর হইয়া কহিল—আজকে নয়।

'তবে কবে বলুন?'

'সে অন্য একদিন হবে। আপনার কেনা সব শেষ হয়েচে তো? নমস্কার।'

মঞ্জরী মৃদু একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া ট্রামে যাইয়া উঠিল।

চার

ইহার কয়মাস পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে বিষম দুর্য্যোগের সূত্রপাত হইল।

মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে পঞ্চাশজন অহিংস স্বেচ্ছাসৈনিক লইয়া তাঁর ইতিহাস-বিখ্যাত ডাণ্ডী যাত্রা করিলেন; ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভাইসরয় লর্ড আরউইন্ ব্যাপারটাকে সামান্য বলিয়াই গ্রহণ করিলেন; তাঁর নীতি দেখিয়া মনে হইল,—তাঁর বিশ্বাস এ আন্দোলন অতি সহজেই থামিয়া যাইবে, ইহার জন্য ভাবিবার কিছুই নাই।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে দাবানলের মতন এই স্বাধীনতা আন্দোলন কুমারিকা হইতে হিন্দুকুশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল; আসমুদ্র হিমাচল "বন্দে-মাতরম" ধ্বনিতে ধ্বনিত হইল; উত্তেজনার, উন্মাদনার আত্মত্যাগের সুমহান আড়ম্বরের অবধি রহিল না। সমগ্র জগৎ ভারতবর্ষে অভিনব যুদ্ধের দিকে বিস্মিত সম্ভ্রম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আইন বিরোধিতার তীব্রতা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গবর্ণমেণ্ট সজাগ হইয়া উঠিল: আন্দোলন দাবাইয়া দিবার চেষ্টার ত্রুটি হইল না: ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণতম হইয়া উঠিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিশেষ কিছুই বজায় রহিল না—এই আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিনান্স প্রবর্তিত হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষের ঠোকাঠুকিতে যুদ্ধটা আরও তীব্রতর হইয়া উঠিল।

ছাত্রসমাজে উত্তেজনার অন্ত রহিল না। খবরের কাগজে প্রতিদিন নতুন নতুন রোমাঞ্চকর বিবরণ বাহির

হয়; কংগ্রেসের নতুন কার্য্যাবলী, গবর্ণমেণ্টের নতুন দমনাস্ত্র, নতুন উত্তেজনার এবং নতুন সংগ্রামের বিবরণ সমস্ত দেশকে সচকিত করিয়া রাখিল।

কংগ্রেসের প্রতি যাদের বিশেষ কোনও আনুগত্য ছিল না এমন অনেক ছাত্র এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় কংগ্রেসের সভ্য হইল—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক বিরাট মন্থন সুরু হইয়া গেল এবং ইহার প্রতিধ্বনিটা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র হইয়া বাজিতে লাগিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিক্‌স্‌থ্ ইয়ারের ছাত্র মনোরঞ্জন দত্তরায়ের কণ্ঠে। তার সচরাচরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বিষ-উদ্গীরণ করিতে লাগিল। একমাত্র কণ্ঠ দিয়াই সে যেন সমগ্র তন্দ্রাচ্ছন্ন ছাত্রসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়া তবে ছাড়িবে; যেন হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া লইয়া ভীরু এবং অনিচ্ছুকদের জেলের দরজার নিকটে আগাইয়া দিবে, তবে ক্ষান্ত হইবে। 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা', সে সচীৎকারে বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকে। 'সবার ঊর্দ্ধে স্বাধীনতা। এজুকেশান্ ক্যান্ ওয়েট, স্বরাজ ক্যান্ নট্!'

ইতিমধ্যে রজতকে নিরালায় পাইয়া সে তাদের সেই সমিতির কথাটা পুনর্বার উল্লেখ করিয়াছিল; কিন্তু রজত এবারেও কোনও উৎসাহ দেখাইল না। তাই ক্রুদ্ধ হইয়া মনোরঞ্জন বলিল—চারদিকে এত অবর্ণনীয় অত্যাচার, এত অমানুষিক জবরদস্তি, এত কুৎসিত বীভৎসতা, তবু তোমার বিবেক জাগল না,—ধিক্!' রজত ওর কথাকে কোনও দিনই মূল্য দেয় নাই, আজও দিল না; মৃদু হাসিয়া চলিয়া আসিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি একদল মুসলমানের ঔদাসীন্য এবং বিরুদ্ধাচার রজতকে বড় পীড়া দিতেছিল। স্বাধীনতা তো সকলেরই সমান কাম্য; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন ওঠে কেন! স্বাধীনতার জন্য যখন সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া এমন একটা তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তাকে সাহায্য করা জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য, রজতের কাছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। অথচ শক্তিশালী একদল মুসলমান নেতা যে ইহার বিরুদ্ধাচার করিতেছে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের যে একটা নগণ্য অংশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে হিন্দুর ব্যাপার মনে করিয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রজত মুসলমান সম্প্রদায়কে ভালবাসে; তাই তার আদর্শবাদ বড় আঘাত পাইল। কাজেই রবিবার দুপুরে জহির আসিয়া যখন তার ঘরে প্রবেশ করিল তখন রজত ওর স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া জহিরের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইল।

'কেন মুসলমান সম্প্রদায় এমন ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে, বলতে পারিস জহির; দেশটা কি হিন্দুদের একলার?'

স্বাধীনতার যারা বিরোধী এবং স্বাধীনতা বিষয়ে যারা উদাসীন তাহাদের উপর বিরাগ জহিরেরও কম নয়; তার নিজ সম্প্রদায়ের এক অংশের এই ব্যবহারের দরুণ সে তার হিন্দু বন্ধুদের কাছে নিজেকেই প্রায় অপরাধী বোধ করিত। তবু কহিল—'মুসলমান সম্প্রদায় হয়তো সন্দেহ করে যে এই আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল নয়; হয়তো তারা সন্দেহ করে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হিন্দুর স্বার্থ-বৃদ্ধি, এতে তাদের লাভ কিছুই নেই।'

'বেশ, তাই যদি হয়, তবে মুসলমানরা দলে দলে এসে কংগ্রেসে যোগ দিক না কেন! কংগ্রেস তো একটা open এসোসিয়েশান্ নয়, সভ্য হওয়ার পক্ষে কারুর কোনও বাধা নেই। মুসলমান সম্প্রদায় যদি মনে করে কংগ্রেস্ হিন্দুস্বার্থে চালিত হচ্ছে, তবে দলে দলে এসে কংগ্রেসের রূপ তারা বদলে দিক না, কংগ্রেসের নীতিকে তার প্রভাবান্বিত করুক না; ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিকস এমন করে জড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করা কি উচিত হচ্ছে, জহির?"

'হচ্ছে না', জহির বালিশটায় কনুইয়ের ভর রাখিয়া বলিল। 'কিন্তু সন্দেহের অবকাশ কি হিন্দুরাই সৃষ্টি করে নাই, বন্ধু। তুমি রাগ করো না, স্পষ্ট করে মনের কথা আমাকে বলতে দাও। এতকাল ধরে বাংলা দেশে মুসলমানেরা কোন্ স্থান অধিকার করে ছিল, একবার ভেবে দেখো তো? সব চেয়ে নিচু স্থান ছিল তাদের জন্য বাঁধা; তারা শিক্ষা পায় নি, সুযোগ পায়নি, বড় এবং বিকশিত হবার সুযোগ তাদের মধ্যে অল্পজনই পেয়েচে। অথচ শিক্ষা দীক্ষায়, আভিজাত্য এবং সংস্কৃতিতে, ধনে দৌলতে

সহস্রগুণ অধিক উন্নত হিন্দুসম্প্রদায় তাদের উন্নতির জন্য কতটুকু সাহায্য করেছে, বন্ধু? একটা সমগ্র সম্প্রদায়কে তোমরা ভুলে ছিলে; এতকাল ধরে তোমরা তাদের শুধু অবহেলাই করে এসেচ। চাষা আর বাবুর্চ্চি, লাঠিয়াল আর চাপরাশি, এই তো ছিল তাদের বিকশিত হওবার ক্ষেত্র। তাই আজ যখন সমগ্র সম্প্রদায়টার মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তখন তোমাদের প্রতি শুধু সন্দেহ নয়, আক্রোশ যদি তীব্র হয়ে ওঠে তবে তুমি মুসলমানদের এই আত্মঘাতী ব্যবহারে দুঃখিত হ'তে পার, কিন্তু মানুষের এটা চিরকালের স্বভাব, তা ভুলো না, বন্ধু! যেমন ইংরাজের উপর তোমাদের বর্ত্তমান আক্রোশটা একটা স্বাভাবিক কড়াকড়ি, হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রোশটাও তাই।'

রজত কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কহিল—অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এই ঔদাসীন্যই বল আর অত্যাচারই বল, অত্যন্ত নীচ এবং আত্মঘাতী, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু শুধু মাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি প্রয়োগ করবার জন্য তার সৃষ্টি হয় নি; হিন্দু সমাজের অনুন্নতদের উপর তা সমান নির্ম্মমতার সঙ্গে প্রযোজ্য হয়ে এসেচে। মুসলমান সম্প্রদায় যদি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলত, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাদের পক্ষে যোগ দিতাম; কিন্তু যা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলা যেত, তার জন্য মুসলমানেরা এ কি আরম্ভ করেছে বলত? একটা রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করে' তারা যে সমস্ত দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বসেচে। ঘরোয়া বিবাদ করে সারা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ। আসল লড়াইয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে যদি আমরা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে সুরু করি, তবে তুইও ঠকবি, আমিও ঠকব; আমাদের দুজনেরই হার হবে।'

'তা আমি জানি, বন্ধু; জানি বলেই এমন দুঃখ পাই! কিন্তু আমাদের সমগ্র সম্প্রদায় এখনও বড় অশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বলেই, আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার নিকট আবেদন করে' একটা সুবিধা করতে পারচেন। নিজ স্বার্থের জন্য মহান ইসলামীয় সম্প্রদায়কে তারা ভুল বোঝাচ্চেন, হিন্দু-বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে জাগাচ্চেন,—মানুষের যেগুলি অসভ্য বৃত্তি, মুসলমান সাধারণের মধ্যে তা প্রচার করে বেড়াচ্চেন; মুসলমান সমাজের প্রকৃত মঙ্গল যাতে হবে, তার কথাটা বেমালুম চাপা দিয়ে শুধু মাত্র স্ব স্ব প্রাধান্য বজায় রাখতে চেষ্টা করচেন। অশিক্ষিত না হলে আমার সম্প্রদায়ের ইতর সাধারণ ও-কথাটা বুঝত না মনে কর, বন্ধু? দেখো না, তর্কে এঁটে উঠতে না পারলে অমনি আমাদের সাম্প্রদায়িক যুবকেরা ইসলামের দোহাই পেড়ে বসেন। যেন ইসলাম কোনও দিন পরাধীনতা অনুমোদন করেছিল! নিজেদের ভুল-তর্কজাল চাপতে গিয়ে তাঁরা বলেন,—ইস্লাম বিপন্ন। যেন ইসলাম এতই দুর্ব্বল! আমার সম্প্রদায় যদি কোনও দিন অধিকতর শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে তুমি ভাবতে পার, এসব তথাকথিত নেতাদের কখনও আমরা মানব? ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রাখা যায়, জানতো? একবার ইতিহাসের পাতাগুলি মনে মনে উল্টে দেখ, ধর্ম্মের গোঁড়ামি করে' গেছে কারা? তাই তো আমি বলি—যদি মুসলমানদের মিলন তোমরা চাও, যদি তাদের ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে উপযুক্ত সীটিজেন করে গড়ে তুলতে চাও, তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রচলন করে বেড়াও, তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দাও; তাতে রাজনৈতিক প্রচারের দশগুণ কাজ হবে!'

জহির উত্তেজনায় একবারে হাঁপাইতে লাগিল।

রজত স্তব্ধ সম্ভ্রমে এই সুন্দর মুসলমান যুবকটির পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এমন সব যুবক যখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হতাশের আর কিছুমাত্র কারণ নাই; অদূর ভবিষ্যতে ইসলামীয় সম্প্রদায় ভারতবর্ষে যে নতুনতর গৌরবের আসনে উন্নীত হইবে, তাহাতে রজতের কোনই সন্দেহ রহিল না। কহিল—আজ তুই সত্যি আমার চোখ খুলে দিলি জহির; তোদের সম্প্রদায়ের মনঃস্তত্ত্ব আর এমনটি কখনও বুঝতে পারি নি।'

চারটার সময় চা আসিল, খাবার আসিল, এবং দুই বন্ধু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

চা-অন্তে জহির কহিল,—'রজত, এখন আমার সঙ্গে তোমাকে সিনেমায় যেতে হবে। আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলাম, কিন্তু রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিলাম; বড় সর্ব্বনাশ জিনিষ রাজনীতি।'

'নিঃসন্দেহে,' রজত হাসিয়া কহিল। 'কিন্তু হঠাৎ সিনেমায় নিমন্ত্রণ কেন?'

'হঠাৎ নয়, আমাদের ঠিকই ছিল।'

'আমাদের আবার কে রে?'

'হাসিনাও আসবে কিনা।' সলজ্জ একটু হাসিয়া জহির জানাইল। 'সাড়ে পাঁচটায় সে সিনেমার সমুখে পৌঁছবে, তার আগে আমাদের যাওয়া চাই।'

রজত খুসি হইয়া কহিল—ওঃ, নিশ্চয়ই যাব; তোর কাছে গল্প শুনে শুনে কতদিন মিস্ জেহানকে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা কেমন হয়, দেখতে আমার বড়ই সাধ।'

হাসিনা জেহান্ জহিরের দূর সম্পর্কের এক মাসির মেয়ে। ওদের বাক্‌দানের কথাটা রজত অনেক দিন হয় জানে। হাসিনা বিটন কলেজে তৃতীয় বার্ষিকে পড়ে। ওরা পর্দ্দা মানে না; প্রয়োজন হইলে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও কথা কয়; জহিরের এম-এ পরীক্ষা হইয়া গেলেই ওদের বিয়ে হইবে ঠিক আছে ইত্যাদি সমস্ত খবরই রজতের জানা আছে।

কিন্তু সাড়ে পাঁচটার সময় ম্যাডান থিয়েটার্সের সমুখের বারান্দায় হালকা নীল খদ্দরের এক শাড়ি পরা এক তরুণীর সঙ্গে জহির যখন রজতকে আলাপ করাইয়া দিল, তখন রজতের প্রায় বিস্ময় বোধ হইল।

আভিজাত্যপূর্ণ প্রসন্নমুখ, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অতি দীর্ঘ এক জোড়া চোখ, কাণে কর্ণভূষণটা জ্বলিতেছে; এমন সুন্দর করিয়া ফিকা নীলবর্ণের শাড়িটা মেয়েটীর সপ্রতিভ সচ্ছন্দ দেহটী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মেয়েটীর উপর একটা মধুর ধারণা গড়িয়া ওঠে। সঙ্গে বুড়া এক কাকাকে রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহের সমসাময়িক কালের এক চিত্র দেখাইতে লইয়া আসিয়াছে, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্যটা চাচাজানের কাছে গোপন থাকে নাই,—তা বৃদ্ধের দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি দেখিয়াই বোঝা গেল।

হাসিনা হাসিয়া রজতকে কহিল—আপনার সমস্ত কথা আমি শুনেছি। আপনি একটুও আর অপরিচিত নন্; মনে হয় যেন কতদিনের চেনা।

রজত মৃদু হাসিয়া জবাব দিল—জহির, তোর বুঝি এই গুপ্তচর বৃত্তি? এ পক্ষের কথা ও পক্ষে জানান, আর ও পক্ষের কথা এ পক্ষকে?

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ওরা সকলে অডিটোরিয়মে গিয়া প্রবেশ করিল।

ছবি আরম্ভ হইবার অনেক বিলম্ব ছিল: আসনগুলি প্রায় শূন্যই পড়িয়া আছে। তাই অবাধে তারা গল্পগুজব চালাইতে লাগিল। তারপর ছবি আরম্ভ হইলে ওরা চুপ করিল, এবং ইণ্টারভ্যাল সুরু হইলে আবার গল্প আরম্ভ করিল। এই সপ্রতিভা সদাহাস্যময়ী মুসলমান তরুণীকে রজতের বড় ভাল লাগিল; মেয়েটি যে জহিরের উপযুক্ত সঙ্গিনী হইতে পারিবে, তাহাতে রজতের সন্দেহ রহিল না।

পর্দ্দাতে তখন বিজ্ঞাপন চলিতেছিল: অস্পষ্ট আলোয় ঘর ভরা।

হাসিনা মৃদুস্বরে কহিল—আপনি নাকি মুসলমানদের খুব ভালবাসেন, রজতবাবু?

'কে বল্লে আপনাকে?' রজত কহিল।

'কেন, জহিরদা বলেছেন।'

'তা এতে বিস্ময়টা কোথায়? ভালবাসব না কেন?' রজত কহিল।

একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে হাসিনা কহিল—'এমন অনেক তো হিন্দু আছেন, যাঁরা মুসলমানদের পছন্দ করেন না। আমি নিজেও অনেক জানি; এমন আঘাত পেয়েছি কতবার সে বলবার নয়।'

রজত কহিল—'আছে বৈ কি, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বর্ব্বরতার বহু উদাহরণ আছে; কিন্তু তা বলে, সবাই কিছু এমন নয়।'

'তা সত্যি!' হাসিনা কহিল।

'তা ছাড়া দেখুন, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খাওয়া-ছোঁয়ার গোঁড়ামি বড় বেশি, সেজন্য কিছু হয়তো বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য কিছু এমনটা হয়। তবে আমার কি

মনে হয় জানেন? রাজনৈতিকক্ষেত্রে হিন্দুদের বিপক্ষাচরণটাই মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করে তুলেচে। কিন্তু আমি তো জানি, প্রকৃত মুসলমান কি রকম হয়।' বলিয়া জহিরের দিকে চাহিতেই জহির লজ্জায় মুখটা সরাইয়া লইল। কহিল, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কর, রজত!

রজত কহিল,—না, আমি করি না: বাড়াবাড়ি করা আমার স্বভাব নয়; এবং এই বলে তোকে আমি অভিনন্দিত করচি যে যাকে তুই সঙ্গিনীরূপে পাবি, সেও তোর উপযুক্ত হয়েচে।'

এইবার হাসিনার লজ্জা পাওয়ার পালা। মুখ নীচু করিয়া কহিল—আপনি এমন দুষ্টু!

'দুষ্টু কেন?'

'কেন?—আচ্ছা, বেশ বলুন তো, আমার মধ্যে প্রশংসা করার এমন কি পেলেন?—আপনি নিশ্চয়ই flattery করছেন।'

'যে মুসলমান মেয়ে খদ্দরের শাড়ি পরে' উগ্র-ফ্যাসান দুরন্ত সম্মিলনীর মধ্যে আসতে পারে, সে flatteryর অপেক্ষা রাখে না, মিস জেহান,—এই জ্ঞানটুকু আমার আছে।'

'আপনি বড় বাড়িয়ে তুলছেন, রজতবাবু,' হাসিনা বিব্রত হইয়া কহিল। 'এটা এমন কি একটা মহাকার্য্য করেছি যে এমন করে আমাকে তুলে দেবেন। দেশের জন্য কোনও কাজই তো করতে পারি না; এতটুকু যদি না করি, তবে নিজের বিবেককে কি বলে প্রবোধ দেব? দেশটা তো কারুর একলার ভাবনার জিনিষ নয়।'

সিনেমার বেল পড়িল, ক্রিং ক্রিংক্রিং ক্রি রি রি—

হষ্টেলে ফিরিয়া রজত দেখিল, চত্বরে বিরাট জটলা বসিয়া গেছে। সন্ধ্যাকালীন খবরের কাগজে আন্দোলন সম্বন্ধে নতুন নতুন সংবাদ বাহির হইয়াছে; উত্তেজনার আর অন্ত নাই। সুনন্দ এবং অন্যান্যেরা উত্তেজিতকণ্ঠে নানা বাক্য বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু দেখিয়া রজত বিস্মিত হইল, বাগ্মিতা প্রকাশ করিবার এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমর উপস্থিত নাই।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নতুন সংবাদগুলি জানিয়া লইয়া এবং আরও কিছুক্ষণ তর্ক এবং উত্তেজিত উক্তি সকল শুনিবার পর, সে কহিল—সমর কোথায় রে আজ?

সুনন্দ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বর লাগাইয়া কহিল—'দেশের দুর্দ্দিনে কি সন্ধান পাবে ওদের?—Socialist না ব্যাঙ্; যখন দায়িত্ব বইবার সময় হয়, তখন বড় বড় বুলি ছেড়ে আসল কর্ত্তব্যটা এড়িয়ে যায়। সমর ভটচাজকে আমি চিরকালই জানি—ওর Communism হচ্চে, অন্যের তেল আর সাবানের শ্রাদ্ধ করা।'

সুনন্দর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমর আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার চোখটা উঠাইয়া জনতা লক্ষ্য করিল, তারপর বক্তৃতা দিবার এতবড় একটা সুযোগ উপেক্ষা করিয়া পকেট হইতে চাবিটা তুলিয়া নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

প্রবীর বর্দ্ধন হাঁকিয়া কহিল—খবরটা কি সমর ভটচাজ?

শুনিয়া সমর অলস গতিতে ফিরিয়া আগাইয়া আসিল। কহিল—আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে এলাম জে, এম, সেনগুপ্তকে।

রজত বিস্মিত হইয়া কহিল—কি শুনিয়ে এলিরে?

'বল্লুম, মশায়, আপনাদের কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মোটেই বনিবনা নেই; কিন্তু তা বলে যখন যুদ্ধটা আরম্ভ করে দিয়েচেন, ঝগড়াটা আর করব না; নামটা লিখে নিন্। তবে স্বরাজটা হবে নিক্; কংগ্রেসের right wingএর সঙ্গে, মশায়, আমাদের বিবাদটা একদিন বাঁধবেই,—বলে রাখলুম।' বলিয়া আর বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া সমর নিজের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

চত্বরের মিটিংএ আর বাগ্মিতা অবশিষ্ট রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

STUDENT'S P.G.A COMMON-ROOM

নীলাচলের নীলমাধব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল

অতি আশ্চর্য্য দেবতা নীলাচলের ঐ নীলমাধব জগন্নাথ।

পুরী মন্দিরের নীলমাধব জগন্নাথ সম্বন্ধে প্রত্নপণ্ডিত-গণের পরিকল্পনা হইতেছে যে মন্দিরের তিন মূর্ত্তি,—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—পূর্ব্বজন্মে বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ ছিলেন। এই প্রত্ন অনুমানের অনুকূলে অবশ্যই কোন ভূর্জ্জপত্রের প্রাচীন লিখন, শিলা-লিপি, এমন কি তাম্রশাসন পর্য্যন্ত অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই। এবং এই অনুমানের অনুকূলে, যতদূর জানা যায় পণ্ডিতগণের একমাত্র যুক্তি এই যে, বৌদ্ধ মঠ বা বিহারের ন্যায় জগন্নাথক্ষেত্রে আজো কোন জাতি-বিচার নাই।

কিন্তু পুরীতে যে, কোন জাতি-বিচার নাই ইহা আদৌ সত্য নহে। অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের ন্যায় জগন্নাথক্ষেত্রেও যথেষ্ট জাতি-বিচার আছে। এবং মুচিতে পাক করিয়া দিলে কোন ব্রাহ্মণই তথায় তাহা অম্লান বদনে ভোজন করেন না। এমন কি সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও আমরা দেখিতে পাই, যবন বলিয়া হরিদাস ঠাকুর, এবং যবন সংস্পর্শে জাতিচ্যুত বলিয়া সনাতন ও রূপ গোস্বামী শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। পুরী সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য কথা এই যে, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অন্ন সম্বন্ধেই কোন জাতি-বিচার নাই। তাহার কারণ এই যে, মহাপ্রসাদের প্রভাব সম্বন্ধে লোকের এতই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা মনে করে নীচজাতি স্পর্শ করিলেও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। সেই জন্য আজও দেখিতে পাওয়া যায় পুরীর প্রত্যেক অতিথিশালায়, শুধু সকল দেশের ও সকল জাতির মানুষেই নহে কিন্তু মনুষ্য, গরু ও কুকুর পর্য্যন্ত কাড়াকাড়ি করিয়া মহাপ্রসাদ অন্ন খাইয়া থাকে। তাহারা গরু কুকুর, এমন কি কাক পর্য্যন্তও তাড়াইয়া দেয় না। তাহাদের বিশ্বাস জীবমাত্রেরই মহাপ্রসাদে সমান অধিকার এবং এই সভ্যযুগেও জগন্নাথ-দেবের মহাপ্রসাদ প্রত্যহ রেলওয়ে পার্শ্বেলে 'প্যাক্' হইয়া দেশ বিদেশে চলিয়া গিয়া থাকে। অরুণ স্তম্ভের উত্তরে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই সব পার্শ্বেল প্যাক্ হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা অবশ্যই বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচায়ক নহে। ইহা যদি কোন কিছুর পরিচায়ক হয় তবে তাহা পুরীর সেই অধিষ্ঠাতা দেবতারই পরিচায়ক,—যাঁহার সম্বন্ধে চব্বিশ ঘণ্টায় ৫২ ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারই ভূরি-ভোগের বিরাট মহাপ্রসাদ-পর্ব্বত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে এক বিপুল অন্নক্ষেত্র-রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং নিশ্চয়ই কোন বৌদ্ধ প্রভাব সে অন্নক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলে নাই।

বাঙ্গালার প্রথিতনামা প্রত্নবিৎ ভট্টশালী মহাশয়ও সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুরীতে কোনই বৌদ্ধ চিহ্ন তিনি দেখিতে পান নাই।

অতএব পুরী ও জগন্নাথ সম্বন্ধে প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগ আমাদিগকে কোন আলোকই প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু পুরী ও জগন্নাথের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট আভাস আমরা পৌরাণিক বিভাগ হইতে প্রাপ্ত হই এবং পুরাণের অতিরঞ্জিত বিবরণের সহিত মনুষ্য-হৃদয়ের সনাতন আরাধনার ইতিহাসকে এক সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলে, তাহা হইতে জগন্নাথ সম্বন্ধে একটা সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসাধ্য হয় না।

পুরাণ বলেন, অতি আদিম যুগে ওড্র দেশের ঐ নীল সমুদ্রচুম্বিত তটভূমি অতি বিস্তৃত নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। এবং বর্ত্তমানকালে যাহাকে আমরা 'পুরী' বলি, তাহা নীলাচল নামে কথিত হইত। নীলাচলের উপরে

একক্রোশ ব্যাপী এক বিপুল বটবৃক্ষ তাহার শাখা-উপশাখা-বিতানে নীলাচলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। মহারণ্যে কোনই লোকসমাগম ছিল না এবং নীলাচলের কথা মনুষ্যের অবিদিত ছিল। অরণ্য মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক "ম্লেচ্ছ" শবর জাতি মাত্র বাস করিত। ঐ শবরদের একজন, পুরাণ বলেন, তাহার নাম "বিশ্বাবসু"—এক কাঠের নীলমাধব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সাগরকূলের সেই নীলাচলের উপর বটবৃক্ষতলে স্থাপন করিয়াছিল।

শবর-নির্ম্মিত সেই মূর্ত্তির "নীলমাধব" নামের সার্থকতা কি ছিল পুরাণ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কারণ পুরাণেরই মতে তাহা কৃষ্ণ-পূর্ব্ব যুগ, এবং দ্বাপরের নীলমাধব তখনও ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই। কিন্তু পুরাণ নাই বলুন, আমরা অনায়াসে সেই মনে করিয়া লইতে পারি, নীল সমুদ্রকূলে নীল আকাশতলে নীল অরণ্যবেষ্টিত নীলাচলের আদি দেবতার যদি কোন সঙ্গত নাম হইতে পারে, তবে সেই নাম হইতেছে "নীলমাধব"।

পুরাণ হয়ত বলিবেন 'মাধব" হইতেছেন বিষ্ণু ও চিরন্তন নারায়ণের একটি নাম—যাহা কৃষ্ণ-পূর্ব্ব যুগেও প্রচলিত ছিল। এবং পণ্ডিত 'মধু' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া বুঝাইবেন যে, যশোদানন্দন ছাড়াও অন্য নীলমাধবও থাকিতে পারেন। আমরাও একথা বলিতে বাধ্য, বৃন্দাবনের প্রত্যক্ষ নীলমাধব না হইলেও, নীলমাধব অবশ্যই কোন দেবতা ছিলেন—শবর যাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সে দেবতা কোন্ দেবতা?

সে দেবতা যে শাস্ত্র-বর্ণিত কোন বিশেষ ও পরিচিত দেবতা ইহা মনে করা অসঙ্গত। একজন মূর্খ অশিক্ষিত "ম্লেচ্ছ" ও বর্ব্বর,—যে এমন এক শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে বাস করিত যেখানে মনুষ্য সমাগম অসাধ্য ছিল,—যে মহারণ্যের এই ভূমিকে সমুদ্র অনাদিকাল হইতে তাহার উত্তাল তরঙ্গমালার রুদ্র-তাণ্ডব নৃত্যের রঙ্গভূমি করিয়া রাখিয়া সর্ব্বকাল হইতেই নৌ সমাগম নিষেধ করিতেছেন,—সেই জগতের বহির্ভূত স্থানের অধিবাসী একজন অসভ্য বর্ব্বর—কোনও শাস্ত্র, বেদ পুরাণ, ও ইতিহাস তল্লাস করিয়া তাহার কাষ্ঠমূর্ত্তির নীলমাধব নাম রাখিয়াছিল ইহা মনে করাই অসঙ্গত এবং এ অসঙ্গতকে সঙ্গত করিবার জন্য, অবশ্যই কোন দৈব-স্বপ্ন কিম্বা মূর্ত্তিমান দেবতা বা দেবর্ষি নারদের আগমন প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমরা অবশ্য ইহা কখনই স্বীকার করি না যে, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার মাত্রই মিথ্যা কিন্তু পার্থিব বিষয়ের যদি কোন সঙ্গত পার্থিব কারণ থাকে তবে তাহাকেও উপেক্ষা করা অনুচিত হইয়া থাকে।

এই জন্যই আমাদের বিশ্বাস সেই আদিম যুগের শবর তাহার নীলমাধবকে সর্ব্বপ্রথম সে তাহার অন্তরাকাশের মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছিল। আকাশ, সমুদ্র ও অরণ্যের দিগন্তব্যাপী স্নিগ্ধ, নীলম, মাধুর্য্যের মধ্য হইতে নীলমাধব সমুত্থিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে শবরকে দর্শন দান করিয়াছিলেন!

এইরূপে ঋগ্বেদের মধ্যেও এক মধু-দেবতার আভাষ পাওয়া যায়, যাহার উদ্দেশ্যে ঋষি-বিখ্যাত "মধুবাত" মন্ত্র গাহিয়াছিলেন। মধুবাত মন্ত্র হিন্দুমাত্রেরই পরিচিত মন্ত্র কারণ আমাদের সর্ব্ববিধ শ্রাদ্ধ কর্ম্মে ইহা একটি বিহিত মন্ত্র। ঋষি বলিয়াছিলেন, "বায়ু মধু বিকীরণ করিতেছে, সিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করিতেছে, বনস্পতি মধুস্রাব করিতেছে, এমন কি পৃথিবীর ধূলিও মধুমৎ। সর্ব্বত্রই—মধু,—মধু,—মধু,—ওঁ মধু। আমাদের দৌম্পিতাও মধুমান হউন, আমাদের সূর্য্যও মধুমান হউন।"

কে বলিতে পারে আদিম যুগের সেই বন-সন্তান তাহার জীবনের কোনো এক শুভলগ্নে ঐ সমুদ্র, আকাশ ও অরণ্যের পরিব্যাপ্ত নীলিমার মধ্যে ঐ রূপে নীলমাধবকে দর্শন করে নাই? এবং নীলমাধব কোনো কথা, কাহিনী, বেদ ও পুরাণের পথ অবলম্বন করিয়া সেই বনবাসী শবরের নিকট প্রকাশিত হয়েন নাই? নীলমাধব উদিত হইয়াছিলেন তাহার হৃদয়-গগনে, অসীম নীলিম ঐশ্বর্য্যের অরুণালোকের মধ্য দিয়া এবং শবর যদি বৈদিক ঋষি হইত তবে সে নিশ্চয়ই গান গাহিয়া বলিত, 'হে নীলমাধব, সিন্ধু তোমার নীলিম মধু ক্ষরণ করিতেছে, আকাশ ও বাতাসে সেই মধু স্থতারিত হইতেছে, বনস্পতি তাহাতেই মধুমান হইয়াছে

হে আমার নীলমাধব, তুমিও মধুমান হও।' কিন্তু সেরূপ গান শবর অবশ্যই শিখে নাই।*

এখন ভাবিয়া দেখুন সেই অসভ্য "ম্লেচ্ছ" এইরূপে যদি তাহার নীলমাধবকে পাইয়া থাকে তবে সে কি করিবে? তাহার প্রত্যক্ষ নীলমাধব দর্শন কি আমাদের নীলমাধব দর্শনের মত দু'চার পাতা 'অ্যামেচিওর' কবিতার মধ্যেই চরম পর্য্যাবসান লাভ করিবে? না ক্ষণিকের একটা উচ্ছ্বাসের মত বিগত ও বিস্মৃত হইয়া যাইবে? নিশ্চয়ই তাহা হইবে না। কারণ ঐ বর্ব্বরের পক্ষে এ দেখা ত' যে-সে দেখা নহে,—এত তাহার পক্ষে শুধু একটা মনের খেয়াল মাত্র নহে, স্বাভাবিক ও অশিক্ষিত কবিত্বের একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, কিম্বা কল্পনার একটা আকস্মিক বিড়ম্বনা মাত্রও নহে। এ দেখা যে তাহার পক্ষে এক সংঘাতিক দেখা।—এ দেখা যে শবরের পক্ষে নীলমাধবের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান হইয়া দর্শন দান করা,—এ দেখা যে বিজন নীলাচলকে পরম তীর্থে পরিণত করিবার জন্য জগন্নাথের সাক্ষাৎ ভাবে আবির্ভাব হওয়া।

তখন কি করিয়াছিল সেই গরীব অরণ্যবাসী শবর? হয়ত সে মনের আনন্দে অরণ্যময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। হয়ত সে দিবানিশি ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল কোথায় রাখিবে তাহার সদ্য পরিদৃষ্ট দেবতাকে, কি দিয়া পূজা করিবে তাহার করুণাময় নীলমাধবকে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বোধ হয় সে তাহার কুঠার দিয়া জঙ্গল হইতে এক গাছ কাটিয়া আনিয়া তাহার গুঁড়িকে তাহার কুড়ালি দিয়াই চাঁচিয়া ছুলিয়া, তাহাতে নীলরঙ মাখাইয়া, এবং বড় বড় দুইটি চক্ষু আঁকিয়া বলিয়াছিল—এই আমার নীলমাধব। এবং সেই দারুময় নীলমাধবকে লইয়া সে সেই দিগন্তব্যাপী বনস্পতির শাখাবিতানের অনাবৃত মন্দিরে স্থাপন করিয়া—অরণ্যজাত ফলমূল, পত্র পুষ্প, ও অরণ্যসঞ্জাত নীবার ধান্যের পক্কান্ন দ্বারা পূজা করিয়াছিল। আমরা মনে করি আদিম নীলমাধব প্রতিষ্ঠার ইহা বা এইরূপ কোন কিছু বিবরণই প্রকৃত বিবরণ। পুরাণের মতে তখনো নীলমাধব মূর্ত্তির পার্শ্বে বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই। শবরের একেশ্বর নীলমাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার—এক "মন্বন্তর" পরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জগন্নাথ নীলমাধবের পার্শ্বে অপর তিনটি মূর্ত্তি—বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি—স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং পুরীতে তিনিই প্রথম রথযাত্রা প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক বিবরণও সত্য বলিয়াই মনে হয়।

পুরাণে একথাও আছে, পরযুগে রাজারা আসিয়া শবর-প্রতিষ্ঠিত নীলমাধব মূর্ত্তির উপর বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক মন্দির ধ্বংস হইলে, তাহার স্থানে দ্বিতীয় মন্দির উঠিয়াছিল। এবং অস্থায়ী দারুমূর্ত্তি কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জগন্নাথ নব কলেবর ধারণ করিয়াছিলেন এবং এখনও তাহা করিয়া থাকেন। পুরীর মন্দির সংলগ্ন যে উদ্যান আছে তাহা "মহাশ্মশান" নামে অভিহিত হয়, এবং সেইখানে জগন্নাথের পুরাতন, জীর্ণ কলেবর সকল নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই মন্দিরের বিচিত্র কারু-শিল্পের মধ্যে, শবর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের আদিম দারুমূর্ত্তির আকার ও অবয়বের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই; জগন্নাথ চারিযুগ ধরিয়া কারু-শিল্পের অতীত হইয়াই বাস করিতেছেন। শবর স্বহস্তে যে নীলমাধব মূর্ত্তি গড়িয়াছিল—সেই মূর্ত্তির এত বড় প্রভাব ছিল—যে চারিযুগের শিল্পীরা তাহার উপর নূতন করিয়া একটি রেখাপাত করিতেও সাহসী হয়েন নাই। এবং শবরের মৃত্যুর এক "মন্বন্তর" পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যখন খোদ্ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি গড়াইয়া জগন্নাথ মূর্ত্তির পার্শ্বে স্থাপন করিলেন—অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই—সে সময়েও সেই মূর্ত্তিত্রয়ও সেই আদিম "শবর-প্যাটার্নেরই" মূর্ত্তি হইল। এবং সেই মূর্ত্তিত্রয় যে গ্রীকদের Apollo কিম্বা Jupiter মূর্ত্তির সহিত কোন অংশে তুলনীয় এ কথা কেহই বলিতে পারেন না।

সেই জন্য মেকলে সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের অনেক স্বদেশী ও বিদেশী বন্ধু বিরূপ জগন্নাথ মূর্ত্তির উপর বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করিয়াছেন। এ যেন প্রকৃতই আদিম যুগের শবর ছেলে মেয়েদের খেলিবার পুতুলের এক বৃহৎ সংস্করণ। এবং আদিম যুগ কেন, এ যুগেও আমরা দেখিতে পাই, ঐরূপ হস্ত-পদহীন, বিরূপ ও রঙ মাখান কাষ্ঠ-খণ্ড

পুতুল বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়—এবং তাহা যে কোন এক মানবজাতির প্রতীক-মূর্ত্তি, তাহা পুতুলের সেই অসম্ভব বড় বড় চক্ষু দুইটি মাত্রই বলিয়া দেয়। গরীবের ছেলে মেয়েরা সেই পুতুলে ন্যাকড়া জড়াইয়া এবং পুঁতির মালা পরাইয়া তাহা লইয়াই খেলা করে।

তা' বলিয়া সেই সব ছেলে মেয়েদের পুতুল খেলা কি কোন অংশে ব্যর্থ হয়?—কখনই না। কারণ পুতুল খেলার চরম সার্থকতা পুতুলে নহে—তাহার চরম সার্থকতা অন্যত্র অবস্থিত। তাহা হইতেছে ছেলে মেয়েদের কল্পনা-রাজ্যে—যেখানে তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র বাসনা ও কামনা ও ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যতের ঘরকরণা পাতিয়াছে,—যেখানে তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদের অজাত ছেলে মেয়েরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে,—সেই খানেই পুতুল খেলায় ত' চরম সার্থকতা। এবং পুতুল যদি কোন সূত্রে তাহাদের অন্তর-রাজ্যের ছেলে মেয়েগুলিকে জাগাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই তাহারা যথেষ্ট।

দেবমূর্ত্তি ও প্রতীক সম্বন্ধেও অবিকল তাই। ভক্ত যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিম্বা যাহার আভাস অন্তরের মধ্যে পাইয়াছে—প্রতিমা ও প্রতীক যদি কোন সূত্রে ভক্তের হৃদয়ে সেই দেবতাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলেই তাহা যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা শুধু প্রতিমাকেই পূজা করে,—যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিকেই পূজা করে,—সেই সব পৌত্তলিক ও মূর্ত্তিপূজকদের পক্ষেই সুঠাম ও সৌষ্ঠবান্বিত প্রতীকের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এইজন্য বিরূপ কাষ্ঠ-পুত্তলিকা জগন্নাথ দ্বারাও জগন্নাথ পূজা হইতে পারে এবং আকার ও অবয়বহীন প্রস্তর খণ্ড দ্বারাও কাশীর বিশ্বেশ্বরের পূজা সিদ্ধ হয়। হিন্দু "পৌত্তলিকতার" ইহাই বিশেষত্ব। এবং সেইজন্য আজো দেখা যায়—জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন মাত্র শত শত নরনারী যখন 'জয় জগন্নাথ নাদে মন্দির কাঁপাইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে ছুটিয়া যায়, তাহাদের একজনের চক্ষেও মূর্ত্তির বিরূপতা লাগে না। এবং আমরা সকলেই জানি, আমাদের শ্রীচৈতন্য যখন ঐ বিরূপ মূর্ত্তির মধ্য দিয়া, "ভুবনৈক সুন্দর" প্রত্যক্ষ নীলমাধবকে দর্শন করিতেন—তখন তাঁহার চক্ষু হইতে "জলযন্ত্র-ধারার" ন্যায় প্রেমাশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইত, এবং অনেক বৈষ্ণব অনুভব করিয়া থাকেন যে গরুড়স্তম্ভের পাদ-মূল আজো সেই প্রেমাশ্রু-ধারায় অভিষিক্ত রহিয়াছে।

জগন্নাথ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটি দ্বিতীয় আশ্চর্য্য তথ্য এই যে আদিম যুগের শবর যে বিধি-বিধানে নীলমাধবের মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছিল—আজো জগন্নাথ আরাধনার তাহাই মুখ্য বিধি-বিধান।

শবর ফল মূল ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারাই তাঁহার নীলমাধবকে পরিতুষ্ট করিতে চাহিয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে একদা একজন অরণ্য-পর্য্যটক সেই অরণ্যে দৈবাৎ উপস্থিত হইলে শবর তাহাকে বিচিত্র ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়াছিল। বিস্মিত পথিক শবরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই মহারণ্যে এই সব বিচিত্র ভক্ষ্য, ভোজ্য কোথায় পাইলে। শবর উত্তরে বলিয়াছিল—এ নীল-মাধবের মহাপ্রসাদ—দেবতারাও আসিয়া বিচিত্র ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা নীলমাধবের পূজা করিয়া থাকেন। এবং আজো প্রধানতঃ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারাই জগন্নাথের পূজা হইয়া থাকে—এবং তথায় পূজা, হোম, স্তবস্তুতি প্রভৃতির কোনই বাহুল্যই দেখা যায় না। এবং পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতির দ্বারাও যে ভগবানের সত্য পূজা হইতে পারে, তাহা সচল নীলমাধব মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গীতায় বলিয়াছেন—

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

—যে ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল জল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে, সেই প্রযতাত্মা ভক্তের উপহৃত দ্রব্য আমি "অশ্নামি" বা ভোজন করি।

এবং শবরের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের জগন্নাথও ভক্তের উপহৃত দ্রব্য ভোজন করিয়াই ভক্তের হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় অর্চ্চনার প্রেরণাকে সত্যভাবে সার্থক করিতেছেন।

শবরের পর হইতে, জগন্নাথ সম্বন্ধে পৌরাণিক বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপের মধ্যে বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পুরাণে কথিত হইয়াছে একজন জটাচীরধারী ঋষি দৈবাৎ

সেই মহারণ্যে উপস্থিত হয়েন এবং শবরের নীলমাধবকে দেখিয়া এতই বিস্মিত হয়েন, যে তিনি অবন্তী দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে গিয়া পরামর্শ দেন যে রাজা যেন অবিলম্বে রাজ্যসহ ওড্র দেশের সেই মহারণ্যে চলিয়া যান এবং তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গের সহিত নীলমাধবের পূজা অর্চনা করেন। কিন্তু নীলাচল ও ওড্র দেশের মহারণ্যের কথা কেহই জানিত না। বিদ্যাপতি নামে এক বিখ্যাত অরণ্য পর্য্যটককে মন্ত্রী নীলাচল ও নীলমাধবকে আবিষ্কার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি বহুদিন অরণ্য পর্য্যটন করিয়া অবশেষে শবর, নীলাচল ও নীলমাধব আবিষ্কার করিলেন, এবং তিনি অবন্তীরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা রাজ্যসহ ওড্রদেশে যাত্রা করিলেন এবং বিদ্যাপতি হইলেন তাঁহার পথপ্রদর্শক। নীলাচলে সমাগত হইলে, শবরের জগন্নাথ কিন্তু রাজাকে দর্শন দিলেন না। শাস্ত্রীয় বাধা পড়িয়া গেল, —রাজার দেবদর্শন হইল না। তখন নারদের উপদেশে রাজা নীলাচলক্ষেত্রে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন বর্ত্তমান ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের নিকটেই ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞ ক্ষেত্র ছিল। তাহার পর প্রসন্ন হইয়া নীলমাধব রাজাকে দর্শনের অনুমতি দিলেন। তখন রাজা নীলাচলে নীলমাধবের জন্য এক সমুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যথাশাস্ত্র নীলমাধব প্রতিষ্ঠা করিবার মনস্থ করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা দ্বারায় মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য, ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। শবর ও অরণ্যপর্য্যটক বিদ্যাপতি দেবতা ও মন্দিরের "চার্জ্জে" রহিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নের কিন্তু ব্রহ্মলোকে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিতে রাজাকে এক মুহূর্ত্ত ব্রহ্মলোকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে বলিলেন— প্রভু চলুন, মর্ত্ত্যলোকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছে, আপনি গিয়া তথায় দেবপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার সমস্ত আয়োজন ও দ্রব্য সম্ভার কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—তোমার সে মন্দিরও আর নাই। তুমি ধরাতলে ফিরিয়া গিয়া নূতন করিয়া আয়োজন কর ও নূতন মন্দির কর। তুমি ব্রহ্মলোকে এক মুহূর্ত্ত অবস্থান করিয়াছ সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে এক 'মন্বন্তর' হইয়া গিয়াছে।

রাজা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—বহুকাল হইল তাঁহার রাজ্যপাট লোপ হইয়া গিয়াছে। সে মন্দিরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৈতরণী পারের এক রাজা তখন সেই দেশ অধিকার করিতেছেন এবং তিনি নীলমাধবকে এক নব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তা' দেখিয়া রাজা ত' চটিয়া লাল। তিনি নীলমাধবকে টানিয়া বৈতরণী পারের রাজার মন্দির হইতে বাহির করিলেন। তাহা শুনিয়া বৈতরণী পারের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইতিমধ্যে নারদঋষি আসিয়া দুই রাজার মধ্যে আপোষ করিয়া দিলেন। স্থির হইল,—ইন্দ্রদ্যুম্ন যে মন্দির করিবেন নীলমাধব তাহার মধ্যেই বাস করিবেন।

তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত এক সমৃদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে নীলমাধবকে স্থাপন করিলেন।

এটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য কথা—যে, ইন্দ্রদ্যুম্নই সর্ব্বপ্রথমে নীলমাধবের পার্শ্বে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন—এবং পুরীতে রথযাত্রা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি কালেই বোধ হয় বৃন্দাবনের প্রত্যক্ষ নীলমাধব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন— নতুবা ইন্দ্রদ্যুম্ন সুভদ্রা ও বলরাম পাইবেন কোথা হইতে?

এখন পাঠক বিচার করিয়া দেখুন পুরীর জগন্নাথের প্রকৃতি ইতিহাসের আভাস বৌদ্ধ পক্ষে না পৌরানিক পক্ষে অবস্থিত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

নিবেদন

শ্রীমমতা ঘোষ (মিত্র)

আলোক মালায় হাসে উৎসব রাতি,
ফুলের গন্ধে বায়ু আজি মন্থর ;
রজনী চলেছে স্বপনের মালা গাঁথি'—
নিবিড় আবেশে ভ'রে আসে অন্তর।
বিশ্বদেবের পুলক-কমল খুলে
একটি দল কি প'ড়েছে হেথায় ভুলে ?

বন্ধ দুয়ার—বাতায়ন পথ চিনি'
বাতাস আসিছে স্নিগ্ধ সুরভি মাখি',
শ্রাবণ রজনী নহে আজি বিষাদিনী—
আসে নি সে চোখে অশ্রু-কাজল আঁকি'।
চন্দ্র তারার গগনেতে সমারোহ,
ধীরে ধীরে মনে ঘনায় মদির মোহ।

নবীন তুমি হে, তুমিই চিরন্তন,
উজ্জ্বল সাজে সেদিন ছিলে যে বর ;
তোমার নয়নে মিলাইয়া দু'নয়ন
বধূ যে হ'লেম ভুলিয়া আত্মপর।
তোমারে পেয়েছি মাঝে আজি আপনার,
তব লাগি' মোর উৎসবে অধিকার।

তুমি কাছে আছ—তুমি আছ পাশে মোর
এই অনুভূতি হরষ জাগায় মনে,
প্রাণে মনে মোর লেগেছে মদিরা ঘোর—
অবশ হইয়া আসে হিয়া ক্ষণে ক্ষণে।
মনে ভাব-রস, মায়ার কাজল চোখে ;
মুগ্ধ হৃদয় ভাসিছে স্বপন-লোকে।

সুরু হ'লো আজি স্বপ্ন জীবনখানি—
চ'লেছি যেন গো গভীর ভাবের ঘোরে,
দিলেম নিজেরে ও পদপ্রান্তে আনি'
সুনিবিড় প্রেমে পূজার পুষ্প ক'রে।
চিত্ত আমার সমস্ত রাতি দিন
তোমারে ঘিরিয়া করিছে প্রদক্ষিণ।

পাবার কথা ত' ভাবি নাই মনে মনে,
দেবার নেশায় রাখিনে ফলের আশা ;
দিলেম দিলেম আজি এই শুভক্ষণে
নিবেদন ক'রে ছিল যত ভালবাসা।
চন্দ্র তারার উজ্জ্বল দীপ জ্বেলে
অসীম আকাশ দেখিল নয়ন মেলে।

সতীদাহ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এই ইংরেজ শাসনের যুগেও সতীত্বের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে পাওয়া যাইবে, সেটা কেউ কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু কল্পনাতীত হইলেও এ সত্যি,—হিন্দু নারী আরো একবার প্রমাণ করিয়া দিল যে পতিব্রতার আদর্শে সে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। যে দেখিল বা যে-ই শুনিল, সেই-ই সমস্বরে ধন্য ধন্য করিল। কহিল, "না হ'বে কেন, সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তো?"

একজন কহিল, "কিন্তু দেখেছ, পুড়ে মরেছে ঠিক সতীমঠের তলায়, ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল. জায়গাটা! ভাগ্যি বটে এই-গাঙ্গুলি বাড়ির। বড় কর্তার উচিত, ওরি পাশে আর একটা নতুন মঠ তৈরী ক'রে দেওয়া।"

নেশাখোর ছন্নছাড়া 'জগা' ওরফে জগন্নাথ গাঁজার কল্‌কেটাতে দম মারিয়া বহুক্ষণ যাবৎ বুঁদ হইয়া বসিয়াছিল, এবার ধীরে সুস্থে নাসিকা এবং মুখের উভয় রন্ধ্রে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ ধূম নিঃসৃত করিয়া জবাব করিল, "হুঁঃ, আর বৌ কপাল আমাদের, এদের বৌ মরা সোয়ামীর পিছু পিছু ধাওয়া করে আর আমাদের বৌ জ্যান্ত সোয়ামীর নাকের ডগা দিয়ে পর পুরুষের হাত ধ'রে ট্যাং-ট্যাং ক'রে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়। হায়রে দুনিয়া,—হায়রে ভানুমতীর খেল্!"

এই গভীর দার্শনিকতার অন্তরালে অনেকখানি ব্যক্তিগত ইঙ্গিত ছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটামুটি এই—

কাল বিকালে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল, গাঙ্গুলি কর্তার মেজো ছেলে রামগোপাল কলিকাতায় একটা শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়াছে। এই আকস্মিক বজ্রপাতে সমস্ত বাড়ীটার বুকের উপর দিয়া যখন শোকের উত্তাল ঝড় বহিয়া চলিল, তখন সেই বিক্ষোভের মধ্যে মেজো বৌ উষা পাষাণ মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত সরিয়া গিয়া শাদা হইয়া গেল, কিন্তু আর কোনো ব্যতিক্রম ঘটিল না। চৌকাঠটা ধরিয়া যে ভাবে সে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সে এতটুকুও নড়িল না, এক ফোঁটা চোখের জলও গড়াইয়া পড়িল না তাহার গালের উপর দিয়া। দেখিয়া মনে হইল, যেন সমস্ত ব্যাপারটার একটি বর্ণও সে বুঝিতে পারে নাই।

মধ্য রাত্রে শোকবিক্ষুব্ধ নরনারী যখন বেদনার অবসাদে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বাড়ির বড় গিন্নী দোতলার জানালার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইতে একটা বিচিত্র দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল তাঁহার চোখের উপর। বড় গিন্নী চাহিয়া দেখিলেন, খিড়কীর বাগানের মধ্যখানে নিবিড় আম কাঁঠালের ছায়ায় কাঁটা লতা ও বুনো ঝোপে আকীর্ণ হইয়া যেখানে সতীমঠের ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টকস্তূপ ঘুমাইয়া আছে, তাহারি সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড আগুন যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—। তার পরেই মনে হইল আগুনটা যেন ছুটোছুটি করিতেছে, নারী কণ্ঠের অস্ফুট খানিকটা আর্তনাদও ভাসিয়া আসিল যেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র সন্দেহে মন চমকিয়া উঠিল, বড় গিন্নী চীৎকার করিয়া বাড়ীটাকে জাগাইয়া তুলিলেন।

যা' সন্দেহ হইয়াছিল তাই-ই। লোকজন জড়ো হইয়া সতীমঠের তলায় পৌঁছিতে অনেক দেরী হইয়া গেল। ততক্ষণে আগুনটা গিয়াছে প্রায় নিবিয়া, ক্রমান্ধকার সতীমঠের তলা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে দগ্ধ. নর মাংসের উৎকট দুর্গন্ধ। কাছে যাইতে কাহারো সাহস হয় না,—উষার সুঠাম সুন্দর দেহটিকে আর চিনিয়া লইবার উপায় নাই।

তার পরের কথা আগেই বলিয়াছি।

কিন্তু উষাকে লইয়া কাহিনী রচনার দায়িত্ব আমার নয়,—প্রয়োজনও কিছুমাত্র নাই বোধ হয়। লোক মুখে বহুদিন ধরিয়া তাহার সতী-কথা কীর্তিত হইবে, খবরের কাগজে বড় বড় হরফে এই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ প্রচলিত হইবে, দু-একখানা ছোট খাটো পদ্য-পুস্তিকা বাহির হওয়াও আশ্চর্য নয়। সুতরাং ইঁহাদের উপর গল্প লিখিয়া অনধিকার চর্চার ধৃষ্টতা আমি করিতে চাই না। আমার কাহিনী ইহারি দেড়শো বছর আগেকার পটভূমিকা লইয়া, এই সতীমঠ স্থাপনের সামান্য এতটুকু ইতিহাস—

এই গাঙ্গুলি বাড়ির অতীত ইতিবৃত্ত গৌরবময়।

বেদগর্ভের বংশজাত মৌলিক কুলীন ইঁহারা—ইঁহাদের ঊর্ধ্বতন কোন পূর্ব্বপুরুষ বাঙলার নবাবের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নবাব তাঁহাকে প্রচুর নিঃশুল্ক ব্রহ্মোত্তর এবং ভূমি সম্পত্তি দান করেন, সেই হইতেই তাঁহার বংশধরেরা জমিদারি করিয়া আসিতেছেন। এক সময়ে ইঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে আশে পাশের দশ খানা গ্রাম তটস্থ হইয়া থাকিত, বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই বাড়ির বধূ হইয়া মালিনী যেদিন সংসারে প্রবেশ করিল, সেদিন সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তাহার বেশ খানিকটা বিলম্ব হইয়া গেল। সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর হইতে শুধু অসামান্য রূপের জোরেই মালিনী এই গৃহে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু সব অধিকারই আর এমন কিছু সৌভাগ্যের পরিসূচক নয়, অন্তত এই বধূ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া মালিনী যে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিল না, সে কথা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়।

ঘোর তান্ত্রিক বংশ ইঁহাদের। বাড়ির পিছনে যে প্রকাণ্ড বাগানটা রাশীকৃত প্রাচীন গাছ গাছড়া ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্গম হইয়া আছে, এই বাগানের মধ্যে আজো একাধিক পঞ্চমুণ্ডী আসন বিদ্যমান। এই আসনে বসিয়া এই বংশের পূর্ব্বপুরুষরা তন্ত্র সাধনা করিতেন। অনেকেই সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, ব্যর্থতার ইতিবৃত্তও একেবারে অবিদিত নয়। মালিনীর দাদাশ্বশুর নাকি তন্ত্র-সাধনা করিতে গিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যান, তারপর তে-তলার একটা ঘরে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। সেখান হইতে জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়া তিনি আত্মহত্যা করেন।

এই বাগানটা জন-সমাগম বর্জিত, লতাগুল্ম জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে ; বর্ষার পর বর্ষায়—দিনের পর দিনে। বাগানে এককালে ফল-পাকড় হইত যথেষ্ট, কিন্তু বহু বৃদ্ধ গাছগুলির প্রাণশক্তি গেছে ক্ষীণ হইয়া,—তেমনি করিয়া আর ফলন হইতে পারে না। যাও বা হয়, বেশির ভাগই আকারে ক্ষুদ্র,—স্বাদে বিকৃত। লোকে বলে ওই বাগানে ভূত আছে। কেহ কেহ বা তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেয় : ভূত নয়, মা কালীর ডাকিনী যোগিনী। কিন্তু ভূতই হোক আর মা কালীর অনুচারিণীই হোক ভীতির মাত্রা তাহাতে এতটুকুও কম হইবার কথা নয়।—

কিন্তু ঐ সব অবান্তর কথা। মোটের উপর এই বিরাট বাড়িটা এবং ইহার সমগ্র পরিস্থিতি এমনি একটা রহস্যের জালে সমাচ্ছন্ন যে অনভ্যস্তের পক্ষে তাহা কেমন যেন বিচিত্র অস্বস্তিকর বলিয়া মনে হয়। ইহাকে অলৌকিকতা বলিয়া হয়তো বা তর্কচ্ছলে হাসিয়াই উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু এই প্রভাবটার অস্তিত্বকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এই বস্তুটাকে ব্যাখ্যা করা চলে না, বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া বিশ্লেষণও করা চলে না, তবুও ইহাকে মানিয়া লইতে হয়। মনের উপর দিয়া ইহারা দৃষ্টির অজ্ঞাতে জাল বুনিতে থাকে কিন্তু যখন সেটা ধরা পড়িয়া যায়, তখন আর সংশোধন করিয়া লইবার উপায় নাই। অবাঞ্ছিত মাত্রেই তো আর অনাগত নয়।

তাই এই বাড়িটায় পা দেওয়া পর্য্যন্তই এই ভূতুড়ে শাসনটা মালিনীকে যেন দিবারাত্রি তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল। সাত-মহলা প্রকাণ্ড বাড়িটা যেন প্রেত-পুরীর মতো দাঁড়াইয়া—বড় বড় থাম, অন্ধকার রাশি রাশি কুঠুরী, গৃহদেবী কালিকার খর্পর-কৃপাণ-শোভিত রণ-মূর্ত্তি সবটা মিলাইয়া এমনি একটা পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে যে আপনা হইতেই সমস্ত গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে। আর এ বাড়ির মানুষগুলি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-জগতের জীব—বাইরের

পৃথিবীর সাথে কোনো ধাঁচে ইহাদের চালিয়া লওয়া কঠিন।

শ্বশুর তারাকিঙ্কর বাঁচিয়া—কিন্তু বয়সের চাপে শরীরে ভাঙন ধরিয়াছে। তাই সংসারের গণ্ডীর মাঝখানে তাঁহাকে সব সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠপুত্র কালীকিঙ্কর জমিদারীর কাজ কর্ম্ম দেখাশোনা করে, তারাকিঙ্করের দিনগুলি কালী মন্দিরেই কাটিয়া যায়। পরিবার-পরিজনের তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প—নাই বলিলেই চলে।

মালিনী তাঁহাকে ক'বার দেখিয়াছে, সেটা গণিয়া বলা শক্ত নয়। বিয়ের পর বজরা হইতে নামিতে সেই যে তিনি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি একবার দেখিলে জীবনে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। ঘাড়ের দু'পাশে ধূসর বাবরী চুল নামিয়া আসিয়াছে, কপালে রক্ত চন্দনের প্রকাণ্ড ফোঁটা। রাশীকৃত কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়িতে সমস্ত মুখ আচ্ছন্ন—দাড়ি বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে গৈরিক, কণ্ঠে এবং বাহুতে অক্ষের ছোট বড়ো অসংখ্য মালা।

মালিনী প্রণাম করিল। শ্রদ্ধা কিংবা ভয় কোন্ ভাবটা সে সময় তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সেটা বলা যায় না, কিন্তু শ্বশুর যখন "সাবিত্রী সমানা ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন তখন মালিনী চমকিয়া উঠিল। এমনি অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠ ও ওর জীবনে কোনদিন শুনিতে পায় নাই।

অস্বাভাবিক। ওইখানেই তাহার শেষ নয়—তারাকিঙ্করের এই ভীষণ প্রশান্ত কণ্ঠস্বরকেও ভবিষ্যতে পূর্ণতর রূপে শুনিবার অবকাশ পাইয়াছে। যখন অনেক রাত্রিতে এই বিরাট প্রাসাদটা নিদ্রার কোলে মৃতের মতো স্তব্ধ হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে পুরাণো চণ্ডীমণ্ডপটার অন্ধকার আনাচ্ কানাচ্ হইতে শুধু ভাসিয়া আসিয়াছে নিশাচর প্যাঁচার কর্কশ চীৎকার,—দূরে মেঘনার বুক হইতে হু হু করিয়া রাত্রির বাতাস বহিয়া আসিয়া মালিনীর জাগ্রত চোখের পাতাকে অবসাদে ভারী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে; সেই সময়ে সেই জানালার ধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মালিনী শুনিয়াছে মন্দিরের ওদিক হইতে উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণার একটানা কম্বু-কণ্ঠ। কথাগুলোকে ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না—শুধু অবিচ্ছিন্ন একটা ছন্দঃ স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে তাহারা, কিন্তু এই নিঃশব্দ প্রেতায়িত মৌন রাত্রির সঙ্গে সে মন্ত্রবাণীর এমনি একটা সুর সঙ্গতি আছে যে তাহা অনুভব করিতে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কোথা হইতে কোথায় ভাসিয়া যায়।

স্বামী কালীকিঙ্কর বৈষয়িক মানুষ, ধর্ম্মের দিকটা সে ভালো বুঝিতে পারে না। কিন্তু শাক্তের রক্ত তাহার শিরায় শিরায়,—তাই রক্ত লইয়া খেলা করিতে সে ভালো বাসে, তাই মানুষের জীবনটা তাহার কাছে অতি অবলীলাক্রমেই ব্যবহার করিবার সামগ্রী। সৃষ্টির আদিম যুগের এই সংস্কারটাকে বহিয়াই সে চলিয়াছে—পৌরুষের মূল্য তাহার কাছে নররক্ত লইয়া মাতামাতি করায়, নারীর সার্থকতা তাহার দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সন্তান প্রসবে। পুরুষ বাহিরের পৃথিবীতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িয়া চলে, তাহার সাথে সমান ছন্দে যে পা ফেলিয়া চলিবে, নারীর এমন শক্তি কোথায়?—

স্বামী সম্বন্ধে এ সত্যটাকে আবিষ্কার করিতে মালিনীকে বেগ পাইতে হয় নাই। যেদিন সে সর্বপ্রথম তাহার পত্নীত্বের অধিকার লইয়া স্বামীর সামনে উপস্থিত হইল সেইদিনই কালীকিঙ্কর তাহার দাবী সম্পর্কে তাহাকে সচেতন করিয়া দিল।

মালিনী প্রশ্ন করিয়াছিল: "রোজ এত রাত পর্য্যন্ত থাকো কোথায়?"

কালীকিঙ্কর স্ত্রীর মুখের পানে নীরস কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করিয়াছিল: "তা' জেনে তোমার কোনো প্রয়োজন আছে?"

ব্যথায় এবং অভিমানে মালিনীর অন্তরটা মুহূর্ত্তে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তবুও বলিয়াছিল, "না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। স্ত্রী হিসেবে আমার খানিকটা অধিকার—"

কথাটা শেষ হইবার আগেই কালীকিঙ্কর এমনি একটা পৈশাচিক অট্টহাসি করিয়া ঘরটাকে একবারে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল যে মালিনী সাতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কালীকিঙ্কর হিংস্র দীপ্ত চোখে খানিকটা তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও অবজ্ঞা ফুটাইয়া তুলিয়া কৌতুকের ভঙ্গীতে বলিয়াছিল,

"স্ত্রী হিসাবে তোমার অধিকার। স্ত্রীলোককেও যদি এখন থেকে খানিকটা ক'রে অধিকার দিতে হয় তা হ'লে কুকুর গোরুগুলোর দাবীও দেখছি মেনে নিতে হবে। ভ্যাখো টুলো পণ্ডিতের মেয়ে তুমি ভালো ভালো কথা হয়ত অনেক শিখেছ, কিন্তু গাঙ্গুলিবাড়ির বৌ হয়ে ও সব বিদ্যে ঝাড়া চ'লবে না, একথাটা মনে রেখো। মেয়ে মানুষ থাকবে মেয়ে মানুষের মতো চলায় ফেরায় সব সময়ে তার কাছে যদি পুরুষের কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তা' হ'লে জমিদারী করা চলে না।"

এই সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার এবং অতি প্রাঞ্জল কথা শুনিয়া মালিনী আর কোনো কিছু বলিবার ধৃষ্টতা করে নাই। চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিতে কালীকিঙ্কর ফিরিয়া ডাকিয়া বলিয়াছিল "আর দ্যাখো ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে এ রকম অসঙ্গত কৌতূহল তোমার যেন আর না হয়। এসব আমি একেবারেই পছন্দ করিনে'।"

রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করিয়া গেছে।

মালিনীর চোখে তন্দ্রার খানিকটা আবেশ আসিয়াছে, এমনি সময় একটা মেটে হাঁড়ি হাতে লইয়া কালীকিঙ্কর ঘরে ঢুকিল। পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া বসিতে প্রদীপের নাতি-উজ্জ্বল আলোকে মালিনী যা দেখিল তাহাতে ওর সমস্ত বুকটা কাঁপিয়া গেল। প্রায় চীৎকার করিয়াই মালিনী বলিল, "এ কি!"

কালীকিঙ্কর গায়ের রক্ত ছোপ্যানো জামাটা একটানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, শাসনের দৃঢ় কঠিন সুরে কহিল, "চেঁচাচ্ছ কেন? হাতের উপর দিযে সড়কিটা ঘেঁসে গেছে বটে, একটু না কেটেছে এমনও নয়, কিন্তু চরটাকে দখল ক'রে নিয়েছি। আজ থেকে চিতলপুরের চরের মালিক এই গাঙ্গুলিরা, এত বড় একটা মালিকানা পেতে হ'লে দু' দশটা খুন-জখমও ক'রতে হবে না?"

মালিনী আড়ষ্ট বিহ্বল স্বরে বলিল, "কি সর্বনাশ! দেখি, হাতটা কতখানি কেটেছে? উঃ রক্তে একেবারে—দেখি?"

কালীকিঙ্কর হাতটা সরাইয়া লইয়া বিরক্তভাবে কহিল, "হাত দেখবার তোমার দরকার নেই। সে ঠিক হয়ে গেছে।"

সসঙ্কোচে মালিনী চুপ করিয়া গেল। কালীকিঙ্করের উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র হাসিতে বিচ্ছুরিত হইল, কাপড় দিয়া মুখ বাঁধা হাঁড়িটা সে এবার মালিনীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার জন্য একটা জিনিষ নিযে এসেছি।"

মালিনী ইতস্তত করিয়া হাত পাতিয়া হাঁড়িটা লইল,—অত্যন্ত ভারী। কালীকিঙ্কর আবার কহিল, "খুলে দ্যাখো খুশী হবে নিশ্চয়। জিনিষটার দাম অনেক টাকা।"

কম্পিত ভাবে হাঁড়ির মুখটা খুলিয়াই মালিনী আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া হাঁড়িটাকে হাত হইতে ফেলিয়া দিল। মেজের উপর আছড়িয়া পড়িয়া হাঁড়িটা শত খণ্ড হইয়া গেল, আর তাহারি মধ্য হইতে সদ্যকর্তিত একটা রক্তাক্ত মানুষের মাথা ছিটকাইয়া পড়িল। চোখ দুইটা তাহার বিস্ফারিত দুই কাণে দুইটা পিতলের আঙটা—সমস্ত মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার পৈশাচিক চিহ্ন; তখনো ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত তাহার ছিন্ন কণ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে।

ঠিক সেদিনকার মতো করিয়া কালীকিঙ্কর রক্ত লোলুপ রাক্ষসের মতো অট্টহাসি করিয়া উঠিল। বলিল, 'আহা-হা, ভয় পাচ্ছ কেন? মাথাটার দাম সত্যিই অনেক টাকা, চৌধুরীদের বড় তরফের সর্দার, অনেক লোকের মহড়াই ও নিতে পারত। এত বড় একটা শত্রু নাশ করে মাথাটা তোমাকে উপহার দেবার লোভ সামলাতে পারি নি, তাই—ও কি ওকি!"

মালিনী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

শ্রীমন্ত ছেলেটি এই পরিবারের আশ্রিত।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা খানিকটা হয়তো আছে, কিন্তু সেটা আপাতত খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। গাঙ্গুলিদের অন্নদাস ব্যতীত তাহার আর স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নাই। তবুও এই বাড়িতে তাহার বেশ খানিকটা অবাধ অধিকার আছে, সকলেই যেন কেমন সহজ ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকে। জমিদারীর খুঁটিনাটি এটা ওটা কাজ যে ওকে না করিতে হয়, এমন নয়, তবুও মোটের উপর ও মুক্ত, অবাধচারী।

—"কাকীমা"—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে একটা হাঁক পাড়িয়া সে সোজা মালিনীর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল,—"কী পড়ছ ওটা, মহাভারত ?"

তুলট কাগজের হাতে লেখা মহাভারতটাকে মুড়িয়া রাখিয়া মালিনী বলিল, "এসো।"

শ্রীমন্ত খাটের এক পাশে আসিয়া বসিল, তারপর কেমন একটা বিচিত্র দৃষ্টি মালিনীর মুখের পরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "সত্যি বলছি কাকীমা, আমার কী মনে হয় জানো ?"

ওর বিচিত্র দৃষ্টিটা মালিনী যেন বুঝিতে পারিতেছে: "কী মনে হয় ?"

—"মনে হয়, এখানে তোমাকে মানায় না। তোমার পৃথিবী আর এদের পৃথিবীতে তফাৎ আছে, তোমার আকাশ আর এদের আকাশের রঙ সম্পূর্ণ আলাদা। তোমাদের দাওয়ার সামনে যে বুনো ফুল ফোটে, যে বাতাস আসে মাঠের গন্ধ নিয়ে, তার সঙ্গে তুলনা করে এই পাথরের কঠিন ফুলগুলো, এই রক্তের গন্ধকে কী তুমি সহ্য করতে পারো ?"

—"সহ্য না ক'রতে পারলেই বা উপায় কী ?"

শ্রীমন্ত চিন্তিত সুরে কহিল, "হাঁা, সে কথা তুমি ব'লতে পারো। এই কারাগারে যখন ঢুকেছো, তখন এক মৃত্যু ছাড়া আর কেউ তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না।"

মালিনী মলিন হাসিল: "তা' জানি। আর সেই জন্যই তো কামনা করি, সেই মৃত্যুটা—"

শ্রীমন্ত কথাটা থামাইয়া দিল: "থাক্। কিন্তু আমি শুধু ভাবছি, তুমি এখানে কেন এলে, কেমন ক'রে এলে ? এই পরিবারের সঙ্গে আমার এই ষোলো বছরের পরিচয়, এই সময়ের মধ্যে এদের সম্পূর্ণ ভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছে। যে বাঁধা-নিয়মে এদের জীবনটা বয়ে চলেছে, তা'র মাঝখানে তুমি একান্ত অবাঞ্ছিত, নিতান্ত আকস্মিক, নিশ্চিত ছন্দ পতন।"

মালিনী কথা কহিল না।

শ্রীমন্ত নিজের ঝোঁকের মুখে বলিয়া যাইতে লাগিল: "এই ছন্দ পতনটা ভালো কী মন্দ, সেটা আমি ব'লতে পারিনে, কেন না অন্ধকারটাই যেখানে একান্ত প্রয়োজন, সেখানে আলোটা অনিমন্ত্রিত কি-না, সে কথাটা ভেবে দেখতে হবে। তবু আমি নিশ্চয় ব'লব, তুমি এখানে অপ্রত্যাশিত, এখানে তোমাকে দরকার ছিল না।"

—"আর আমার নিজের দিক থেকে ?"

—"সেটা বিচার ক'রবার ভার তোমারই।"

—"তা হবে"—মালিনীর মুখে ফুটিয়া উঠিল আবার তেমনিই খানিকটা বিবর্ণ হাসি: "ভবিতব্য তো মানো ? মানুষের অদৃষ্ট যে তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়, সে কথা কেউ বলতে পারে না।"

শ্রীমন্ত হঠাৎ প্রখর হইয়া উঠিল: "সেই জন্যই সব কিছু ভাঙচুর ক'রতে ইচ্ছে করে, ভবিতব্যের এই অন্যায়কে আর সহ্য করতে পারিনে। আমার নিজের কথা জানো কাকীমা, আজ আমি এই সংসারের একটা অনাবশ্যক বোঝা, কিন্তু আমারো এমন দিন ছিল না। একদিন আমাদের বাড়িতে আমারি মতো বহু আশ্রিতের অন্ন জুটতো। কিন্তু আজ ? বলতে পারো কেন এমন হয় ?"

—"ভবিতব্যকে তো ব্যাখ্যা করা যায় না ?"

—"ব্যাখ্যা করা যায় না ব'লেই আমি তাকে মানব না, কিছুতেই না"—শ্রীমন্ত নিজেকে সংযত করিয়া লইল: "কিন্তু থাক্ সে কথা।...কাকা কোথায় ?"

মালিনী শান্ত চোখ দুটি এবার শ্রীমন্তের মুখে তুলিয়া ধরিল: "তাঁর সন্ধান কী তুমি আমার কাছ থেকে আশা করো ?"

—"না, তা করিনে, কারণ এ বাড়ির নিয়ম আমি জানি।"

শ্রীমন্ত আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

বসন্তের এক শান্ত সন্ধ্যা।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়াছে বটে, কিন্তু এ আলো আজ না হইলেও চলিত। মালিনী ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে ছাতে আসিয়া পড়িল। এখানে আসিলে অন্তত বাতাসের অভাব হয় না।

দিগন্তে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র—আলোয় চারিদিক একেবারে স্নান করিতেছে। সামনে অশোক কুঞ্জে বসন্তের বর্ণ-বিকাশ সেই জ্যোৎস্নার আলোতেও যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনেক দূরে একটা পাপিয়া হয় তো প্রিয়-বিরহেই পিউ পিউ করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। রাশি রাশি জ্যোৎস্না আর দক্ষিণের বিহ্বল বাতাস মালিনীর মুখের উপরে ঝরিতে লাগিল। একটা যেন কিসের তীব্র বেদনায় ওর অন্তরটা খসিয়া উঠিতেছে, আজকের দিনে ও যেন অকস্মাৎ ওর দুর্ভাগ্যের আর অন্ত খুঁজিয়া পাইতেছে না।

একেবারে অকারণে নয়। এই বসন্তের রূপোৎসব, এই কৌমুদীর হিল্লোলিত তরঙ্গ আর অশোক কুঞ্জে ওই যে বর্ণোৎসব, ইহাদের কোনো মূল্যই কী নাই? শুধু কী ঋতু চক্রের সনাতন নিয়ম অনুবর্তন করিয়াই ইহারা আসে আর চলিয়া যায়? তাই-ই যদি হইবে, তবে এমন করিয়া কেন এই বিরহী পাপিয়া বেদনায় অধীর হইয়া ওঠে, কুসুমাকীর্ণ বনের পথে হরিণী কেন চঞ্চলা হইয়া হরিণের সন্ধান করিয়া ফেরে?

ওর মনে আজ যদি সেই চিরন্তন বসন্ত তাহার রঙ বুলাইয়া দিয়া ওকে অবশ, আকুল করিয়া তোলে, ওর দেহ মন যদি আজ নিয়ম ভাঙা উন্মাদনায় অধীর হইয়া ওঠে তবে সেই শাশ্বতের অনুশাসনকে ও কেমন করিয়া অবজ্ঞা করিবে? এবং অবজ্ঞা যদি না করিতেই পারে, তাহা হইলে বাহিরের দিক দিয়া চিরাচরিত সংস্কারের মুখে, পুণ্য পাপের মান দণ্ডে অপরাধের বোঝাটা যতখানি ভারী হইয়াই উঠুক না কেন, অন্তরের দিক্ দিয়া খুব অন্যায় হইবে কী? আর সে অন্যায় কী এই শাশ্বত দাবীর অপেক্ষা এতটাই বড়? শুধু প্রাণহীন সংস্কারটাই প্রধান, আর স-মন দেহটা কিছুই নয়?

কালীকিঙ্কর আজ সাত দিন হইল ঘরে বাহির হইয়া গেছে, কবে ফিরিবে তাঁর কোনো নিশ্চয়তাই নাই। যাওয়ার পূর্ব্বে মালিনীকে একবার বলিয়া যাইবার প্রয়োজনও মনে করে নাই পর্যন্ত। তাহার দিক্ হইতে এটা সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক। স্বামীর অনুগৃহীতা দুই চারিটি নারীর নাম যে মালিনীর কাণে একেবারেই না আসিয়াছে তা' নয়, সুতরাং বাড়ির কথা কালীকিঙ্করের আদৌ মনে না পড়িলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু মালিনী?

মেয়ে হইয়া জন্মানোটা কী এম্‌নিই একটা অভিশাপ? না,—ন্যায়শাস্ত্র বা মনুর বিধি-বিধান মালিনীর একেবারে অজানা নয়। ওর পিতৃবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য দেশ-প্রসিদ্ধ, সেই পাণ্ডিত্যের আওতায় থাকিয়া মালিনী যে একেবারে অন্ধকারেই পড়িয়া রহিবে না, সেটা জোর করিয়াই বলা যায়। আর সেইজন্যই মালিনীর আজ সব চাইতে বেশী করিয়া বাধিতেছিল। ওদিকের ওই জ্ঞানের বাধা বিধি-বিধানের বাধাটা যদি ওর না থাকিত তাহা হইলে আজ কোনোখানেই হয়তো ওর ঠেকিত না। এদের কাছ হইতে ও কী পাইয়াছে? চরম অসম্মান, চরম অমর্যাদা, ব্যক্তিত্বের নির্ম্মম নির্বাসন। ইহাদের অন্ধকূপে তিলে তিলে ওর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, হ্যাঁ,—ওই যে শ্রীমন্ত বলিয়াছিল, এখানে যখন একবার ঢুকিয়াছে, তখন মৃত্যু ছাড়া আর কেহই ওকে মুক্তি দিতে পারিবে না।

—শ্রীমন্ত!

ওই নামটা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মালিনীর হৃৎপিণ্ডটা সজোরে একবার নৃত্য করিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল রক্তের প্রখর প্রবাহ-মুখে ওর ধমনী ওর শিরা উপশিরাগুলো সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে বিপ্লব ঘটাইয়া দিবে। বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মালিনীর বুকখানা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

আবার সেই ন্যায়শাস্ত্র মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতন চমকিতে লাগিল,—এ কী করিতেছ! কী করিতেছ! নিজের পবিত্রতাকে এম্‌নি করিয়া সাময়িক উন্মাদনার মুখে বলি দিতে হইবে নাকি? নিজের সর্ব্বোত্তম গৌরবটিকে নিজের হাতেই নির্বাসিত করিয়া দিয়া ব্যক্ত অথবা অপরিব্যক্ত কলঙ্কের ডালিটাকে মাথায় তুলিয়া লইবে! তাহার পর থাকিবে কী লইয়া, কিসের জোরে নিজেকে করিবে প্রতিষ্ঠিত?

কিন্তু সাময়িক-উন্মাদনা বা যাহাই বলো, কোনো তর্কই আজ আর বুঝি তাহাকে ঠেকাইতে পারিবে না। মালিনী নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চরম আত্ম-বিস্মৃতি আজ ওর আসিয়াছে। কোনো কিছু

জানাটাই যদি সব চাইতে বড় কথা হইত এবং সেই জানাই যদি দাবীর সমস্ত ক্ষুধাকে মিটাইতে পারিত, তাহা হইলে প্রবৃত্তির দিক্ হইতে মানুষ হইত বায়ুভুক্।—

—"কাকীমা! এখানে? এভাবে?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে মালিনী বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো চম্‌কিয়া উঠিল—হৃৎপিণ্ডটা একেবারে মাতাল হইয়া গেছে। কামনা স্বয়ং মূর্ত্তি ধরিয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেও মানুষ এত বিস্মিত হয় কি-না সন্দেহ। শুধুই কী বিস্ময়? আর কিছুই নয়?

মালিনী কহিল, "তুমি!"

শ্রীমন্ত হাসি মুখে সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল, "হ্যাঁ, আমিই তো! তা এত চম্‌কে উঠলে যে?"

মালিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইল, মনের দ্বন্দ্বকে ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইয়াছে। ব্যর্থ বিধি-বদ্ধতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ও কিছুতেই এই মুহূর্ত্তকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। যে বসন্ত অগ্নি-মুকুট পরিয়া ওর দ্বারে আজ বিজয়িনী বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে বরণ না করিয়া ও থাকিবে কেমন করিয়া?

মালিনী বলিল, "শ্রীমন্ত, অদৃষ্টকে তুমি অস্বীকার ক'রতে চেয়েছিলে। সত্যিই কী তা পারো?"

বিস্মিত শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "তার অর্থ?"

মালিনী ধীর প্রশান্ত ভাবে একেবারে শ্রীমন্তের বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একান্ত নির্জ্জন ছাত্‌টা জুড়িয়া রাশি রাশি চাঁদের আলোয় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—শ্রীমন্তের মুখখানাকে দেখাইতেছে এত সুন্দর। দক্ষিণ বাতাসের স্পর্শে উগ্র মাদকতা!—

মালিনীর অত্যন্ত গভীর চোখ দুইটা প্রবৃত্তির বহ্নিতে জ্বলিতে লাগিল, শ্রীমন্তের চকিত মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অদ্ভুত রুদ্ধ শ্বাসে কহিল, "তার অর্থ জানতে চাও? বলছি।"......

চাঁদের উজ্জ্বল মুখের উপর দিয়া একখানা হাল্‌কা আবরণ টানিয়া দিল......।

—মাতৃত্ব!

নারীর জীবনে যুগান্তর,—তাহার সমগ্র অন্তর ও বহির্জ্জগতের আমূল বিবর্ত্তন। দেহটা যখন দিনের পর দিন ভারগ্রস্ত হইয়া ওঠে, মনটা তখন স্নেহের অমৃত ধারায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়—অভিষিক্ত হইয়া যায়। অকস্মাৎ নারী নিজেকে খুঁজিয়া পায়, তাহার সৃজনী-শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া ওঠে, সে বুঝিতে পারে, তাহার এই তুচ্ছ ভঙ্গুর দেহটার অন্তরালে একটা অলক্ষিত এবং অপরিব্যক্ত বিরাট জগৎ অবলুপ্ত হইয়া আছে। সেই আত্মোপলব্ধি আজ আসিল মালিনীর জীবনে, সে আপনার পরম গৌরবে আজ ধন্য হইতে চলিয়াছে, কৃতার্থ হইতে চলিয়াছে।

এমন যে কালীকিঙ্কর, সে পর্য্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ইহা আর্য উক্তি। পরম শাক্ত যে ইহার মর্ম খুব ভালো করিবাই গ্রহণ করিবে সেটা নিঃসন্দেহ। এমন কি সে একদিন নিজে যাচিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমার কী খেতে ইচ্ছে করে?"

মালিনী মাথা নাড়িয়া জানাইল, কিছু না।

কিন্তু কালীকিঙ্করের মনটা নাকি আজ অবিশ্বাস্য রকমেই ভালো, তাই একথা শুনিবার পরেও সে স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপের প্রয়োজন অনুভব করিল। কঠিন নির্ম্মম মুখখানার উপরে একটা জোর করিয়া টানা অমায়িকতা আনিয়া কহিল, "না, না, লজ্জা কোরো না। এখন যা যা বলবার আছে অসঙ্কোচে—"

মালিনী মুখ ফিরাইল।

কালীকিঙ্কর বলিল, "আচ্ছা, আমার কাছে জানাতে আপত্তি থাকলে বোলোনা। কিন্তু আমি বড়মাকে পাঠিয়ে দিই তাঁর কাছেই তোমার সব কথা জানিয়ো।"

—গাঙ্গুলি বংশের বংশধর আসিতেছে, তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোনো দিকেই যাহাতে এতটুকুও ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আয়োজনও যথা নিয়মে চলিতে লাগিল, এমন কি স্বয়ং তারাকিঙ্কর পর্য্যন্ত মন্দির ছাড়িয়া আসিয়া মালিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। এই বংশের ছেলে হইবে পাষাণের মতো নিষ্ঠুর বাঘের মতো রক্তলোলুপ, দুর্ব্বার এবং দুর্জ্জয়—

অবশেষে বহু ঈপ্সীত আগন্তুক একদা সত্য সত্যই

পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া অনেকগুলি এক সঙ্গে মুখর হইয়া উঠিয়া দিকে দিকে এই আবির্ভাবের সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিল। অন্ধকার বিষণ্ণ, বিচিত্র অনুভূতি বিচঞ্চল বাড়িটার অপ্রীতিকর পরিমণ্ডলে একটা আনন্দের আলো মণি-দীপ্তির মতো বিচ্ছুরিত হইয়া গেল। নব জাতকের মঙ্গলার্থে কালী মন্দিরে মহিষ প্রকাশ্যেই বলি পড়িল, লোকে কানাকাণি করিল মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে নরবলিও···

—কিন্তু বিস্ময়ের তখনো বিলম্ব ছিল।

তাই কয়েকটা দিন না কাটিতেই একদা উন্মাদের মতো কালীকিঙ্কর আসিয়া মালিনীর ঘরে ঢুকিল। তাহার সমস্ত অবয়ব ক্রোধে, হিংস্রতায় ও উত্তেজনায় অস্বাভাবিক, বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। কালীকিঙ্কর ক্ষিপ্তের মতো প্রশ্ন করিল: "এ সব লোকে কী বলছে?"

মালিনীও আকস্মিক ভাবে কঠিন হইয়া তেমনিই সতেজে প্রশ্ন করিল: "কী ব'লছে লোকে?" কালীকিঙ্কর হাত বাড়াইয়া নিদ্রিত ছেলেটার দিকে দেখাইয়া বজ্রকণ্ঠে কহিল, "ওর চোখ মুখ দেখে' লোকে বলছে—" ক্রোধে ক্ষোভে কালীকিঙ্কর কয়েক মুহূর্ত্ত বাকী কথা কয়টা উচ্চারণ করিতে পারিল না: "লোকে বলছে ও-ও-ও শ্রীমন্তের সন্তান।"

মালিনীর চোখ মুখ দিয়া যেন আগুনের ঝাঁঝ বাহির হইতে লাগিল, মালিনী চীৎকার করিয়া উঠিল: "মিথ্যে—মিথ্যে কথা!"

—"মিথ্যে কথা!" কালীকিঙ্কর ক্ষেপিয়া গিয়াছে: "কিন্তু গাঙ্গুলী বংশের এত বড় কলঙ্ক কিছুতেই পৃথিবীতে থাকতে পারবে না! আমি ওকে মুছে ফেলে দেবো, নিজের হাতেই শেষ ক'রে দেব ওকে। তার পরে রইলে তুমি, আর তোমার শ্রীমন্ত!"

কালীকিঙ্কর ছেলের বিছানার দিকে অগ্রসর হইল।

মালিনী দু' হাতে তাহার পথ আড়াল করিয়া ধরিল, "না, না—কোনোমতেই না,—এ মিথ্যে, তুমি ওকে কিছুতেই—"

কালীকিঙ্কর একটা ঝট্‌কা মারিয়া মালিনীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর পাগলের মতো বিছানার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দু' হাতে নিদ্রিত ছেলেটার গলা টিপিয়া ধরিল।

মালিনী হিংস্র পশুর মতো ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল কালীকিঙ্করের গায়ে,—প্রাণপণে স্বামীকে আঁচড়াইতে কামড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। ছেলেটা ততক্ষণে লৌহ মুষ্টির করাল নিষ্পেষণে অন্তিম প্রচেষ্টায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

মালিনী চীৎকার করিতে লাগিল, "ছাড়ো—ছাড়ো—"

কালীকিঙ্কর সে ব্যাকুলতার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

মালিনী দিশে হারাইয়া ফেলিল, বিপন্ন শাবককে দেখিয়া বাঘিনীর চিরন্তন জিঘাংসা ওর অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দেহ মন জ্বলিতেছে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মতো। মালিনীর সম্মুখ হইতে সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত বাস্তব অবাস্তব একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেছে। ছুটিয়া আসিয়া মালিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো পাঁঠা কাটিবার বড় রামদাখানিকে খুলিয়া লইল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতে কালীকিঙ্করের হাত লক্ষ্য করিয়া কোপ মারিল।

কিন্তু কোপ হাতে লাগিল না, লাগিল অন্য জায়গাতে। একটা চীৎকার করিয়া উঠিবার আগেই প্রখর ধারালো দায়ের মুখে কালীকিঙ্করের বিচ্ছিন্ন মাথাটা দূরে ছুটিয়া পড়িল, ফিন্‌কি দিয়া খানিকটা উষ্ণ রক্ত আসিয়া পড়িল মালিনীর চোখে মুখে, তারপরে কালীকিঙ্করের রক্তাক্ত দেহটা মেজের লুটাইতে লাগিল।

মালিনী নিজের কীর্ত্তির পানে চাহিয়া স্তব্ধ বিমূঢ় দৃষ্টিতে সেই রক্তস্রোত দেখিতে লাগিল।

খবর পাইয়া তারাকিঙ্কর আসিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চারিদিকের জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন "অনেক দিন এ বংশে সতীদাহ হয়নি, আজ আবার হ'বে। তোরা বাগানে চিতার ব্যবস্থা কর,—অনুষ্ঠানে কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না থাকে।"

—আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া আবার কাড়া নাকাড়া বাজিল, ধূপ-ধুনা-গুগগুলের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। মালিনীর কণ্ঠস্বর তাহার অন্তরালে কোথায় যে মিলাইয়া গেল, কে বলিবে।

সতীমঠ স্থাপনের ইহাই ইতিহাস।

সতীত্ব গৌরবের এই মহাতীর্থের পাদমূলে পাতিব্রত্যের এই মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া উষা লোকান্তরে বৈকুণ্ঠলাভ করিল কি না সে প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রবিদেরাই করিবেন।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

"প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতিরও এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন জীবন সঙ্গীতের প্রধান সুর। অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐক্যতান উৎপাদন করিতেছে। ভারতে ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।"—বিবেকানন্দ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল লেখার মধ্যে যে ভাবটি প্রধান, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে সে ভাবটি তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম। কেবল উপন্যাসে নহে, প্রবন্ধাদিতে ধর্মতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্রে এমন কি লোকরহস্য প্রভৃতি রহস্যাত্মক রচনায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আনন্দমঠে' ইহার পূর্ণ পরিণতি এবং "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে ইহার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম উচ্চস্তরের, পাশ্চাত্য Patriotismএর সংকীর্ণ সীমায় ইহা আবদ্ধ নহে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্মের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র চাহেন, যে দেশ বড় হউক কিন্তু অপর দেশ লুণ্ঠন বা জয় করিয়া নহে। স্বার্থের সহিত পরার্থের সঙ্গতি রাখিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আদর্শ।

বর্ত্তমানে নানা জটিল সমস্যা সমাধানে যে সকল ভাবধারা আমাদের জাতীয় জীবন উদ্বেলিত করিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র বহুকাল পূর্ব্বে উহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় উহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র গৌণভাবে ভারতের এমন কি সমুদয় বিশ্বের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রহিলেও মুখ্যভাবে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীজাতি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিয়াছিল এবং ইহাই স্বাভাবিক। যে মাতৃস্বরূপিনী জননী জন্মভূমিকে ভালবাসে না, সে বিশ্বপ্রেমের বড়াই করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, ধ্যান, ধারণা ও সাধনার বস্তু ছিল বঙ্গভূমি এবং অনুপ্রেরণার ফলে তিনি যে মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহাই "বন্দেমাতরম্"। এই "বন্দেমাতরম" মন্ত্র দিকে দিকে, দেশে দেশে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে যে মিলনের সুরধনী প্রবাহিত করিয়াছে তাহার তুলনা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন, আজকাল এইরূপ একটি অভিযোগ শুনা যায়। ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি, হিন্দু হউক, কি মুসলমান হউক, দোষ গুণ অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ সকল চরিত্র সাধারণতঃ ঐতিহাসিক। ইতিহাস পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর চিত্র যথাযথ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবে সত্য নির্ণয়ে ভ্রম হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু সেইরূপ ভ্রম বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত নহে এ কথা অনায়াসেই বুঝা যায়। কিন্তু সেরূপ ভ্রমও বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা যদুনাথ সরকার মহাশয় অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর এক কথা, জাতি বিদ্বেষ, অনুদার ভাব ও সংকীর্ণতা বঙ্কিম সাহিত্যে স্থান পাইলে, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকের রচনাও ক্ষণপ্রভার ন্যায় আলোক বিকীর্ণ করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা শাশ্বত গৌরবের অধিকারী হইতে পারিত না।

শ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লক্ষণ এই যে তিনি যেটি সত্য বলিয়া স্থির করেন তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। লোক ভয় বা লোক

লজ্জার তিনি অধীন নহেন। তিনি আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়, আত্মনির্ভরে বলীয়ান্ এবং কখন কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়েন না। এইজন্য কখন কখন লোকে তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়া মনে করে। অবশ্য এ কথাও যথার্থ যে ঐরূপ সত্য নির্ণয়ে ভুল হইতে পারে এবং উহা ধরা পড়িলে মত পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় এবং সে সাহসও তাঁহার থাকে। জীবন প্রবাহ সদাই পরিবর্ত্তনশীল। নব নব চিন্তায় নব নব ভাবে নব নব কল্পনায় সমৃদ্ধ হইয়া বেগবতী নদীর ন্যায় কখনও এক টানা স্রোতে তাঁহার জীবন যাপিত হয় না। বঙ্কিম সাহিত্যে ইহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান।

প্রতিভা অক্লান্ত শ্রমশীলতার প্রদর্শন। আত্মসমাহিত ভাব না থাকিলে উহার অধিকারী হওয়া যায় না। জন্মান্তরীন সংস্কারে প্রতিভার স্ফুরণ দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয় এইমাত্র।

লক্ষ্মী সরস্বতীর ন্যায় বাস্তব ও আদর্শের চিরকাল ধরিয়া একটা বিরোধ চলিতেছে। সাহিত্যে নিছক আদর্শবাদ বা নিছক বাস্তবতা কোনটাই প্রশংসাযোগ্য নহে। বাস্তবের সহিত আদর্শের, সত্যের সহিত কল্পনার সুসঙ্গত সামঞ্জস্য সূক্ষ্ম শিল্পির কার্য্য। এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, সাহিত্য জগতে বঙ্কিমচন্দ্র বরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে, তৎ-সমসাময়িক ইতিহাস জানা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের কিছু পূর্ব্বেই রামমোহন রায়ের যুগ। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফল, হিন্দু কলেজ। তথায় শিক্ষিত ছাত্রগণ পাশ্চাত্যভাবের প্রবল আকর্ষণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কার অতল জলে বিসর্জ্জন দিলেন। ইহার মনোজ্ঞ ও বিস্তৃত বিবরণ ৺যোগীন্দ্রনাথ বসুর "মাইকেল মধুসূদন দত্তের" জীবন চরিতে পাওয়া যায়। দুইটি বিরুদ্ধভাব সংঘাতে তাঁহাদের মতিগতি স্বদেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রবল বন্যার ন্যায় দেশের মন্দের সহিত যাহা কিছু ভাল নির্বিচারে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ইহার কিছুপরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তখন প্লাবনের বেগ কিছু প্রশমিত হইলেও স্বদেশের ও স্বজাতির দিকে লক্ষ্য স্থির হয় নাই। এইদিকে সদা জাগ্রত ও পূর্ণদৃষ্টি রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত শক্তিশালী যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি যে কেবল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যশস্বী লেখকগণের ভাষা সংস্কৃত করিয়া এক নূতন ভাষা সৃষ্টি করিলেন তাহা নহে; তিনি উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগে নব নব চিন্তারাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও, সাহিত্যে অন্যান্যদিকে তাঁহার দান অপরিমেয় ও অমূল্য। শুধু বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্কিমকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার প্রতিচ্ছবি তাঁহার ভাষা। ভাব প্রকাশে ভাষার এরূপ স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা ও সুস্পষ্টতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যুক্তিহীন বাক্য বঙ্কিমের রচনায় একেবারেই দুর্ল্লভ। তাঁহার রচনা সর্ব্বতোগামী স্বাধীন ও সংযত। সরসতায় উহা ভরপুর অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় শ্লীলতার সীমা কখনও রেখা মাত্র অতিক্রম করে নাই।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে জাতির জীবনে কখন কখন একটি গৌরবময় যুগ আসে। সে সময়ে দুর্দ্দশার অবসান করিতে বহু মনিষীর একত্র সমুদ্ভব হয়। ফরাসী দেশে মহাবিপ্লবকালে এবং ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের সময়ে ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এইরূপ ঘটে। তৎকালে বহুপ্রতিভাশালী লেখকগণ তারকাবলীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চারিদিকে বঙ্গের সাহিত্য গগন সমুজ্জ্বল করিয়া উদিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিম যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। আমাদের জাতীয় জীবনে সুপ্তি ভাঙাইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে উদ্বোধিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও গভীর। উহার বিস্তৃতির অবধি নাই। উহার গভীরতার শেষ নাই। উহার অভ্যন্তরে এত রত্ন মণিমানিক্য প্রবাল রহিয়াছে, রত্নাকরের অগাধ জলে বারম্বার ডুব না দিলে তাহাদের সন্ধান মিলিবে কিরূপে?

বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, দর্শনবেত্তা, রাজনৈতিক, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারক, ঐতিহাসিক আরও কত কি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে উহাদের এক এক দিকের বিস্তৃত আলোচনা সবিশেষ বহু পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ। ক্রমশঃ বিভিন্ন দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের যুগ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সম্প্রতি একটা কথা উঠিয়াছে এই যে রবীন্দ্রনাথের যুগ গত হইয়াছে। কথাটা এই প্রথম নয়, ইতিপূর্বেও মাঝে মাঝে শোনা গিয়াছে। কিন্তু গ্রাহ্য করি নাই—এই ভাবিয়া যে কথাটা এতই অসত্য এবং অবাস্তব যে ইহার স্বাভাবিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহার প্রতিবাদ করে কোন চেষ্টার আবশ্যকতা নাই—কেন না ইহার হাস্যকর অবিশ্বাস্যতা লোকের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেরি হইবে না। কিন্তু কথাটা যখন পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়া সত্যের দাবি করিতে আসে, যখন সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনেও ইহা সভাপতির অভিভাষণের সম্মান পায়, যখন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকবর্গ এবং অধ্যাপকশ্রেণী ইহা নির্বিবাদে গলাধঃকরণ করেন, তখন মনে হয় প্রতিবাদ না করার ফলে ইহার আয়ু পরিশেষ হইতেছে না এবং এই অসত্যকে বাঙালী-ইতর দেশে এবং ভবিষ্য কালে বিকৃত করিয়া দেখার সম্ভাবনা আছে।

বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাবর্গ এই তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এমন কথা আমার মনে হয় না। কেন না এখনো প্রতি মাসে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় কবিগুরু সাহিত্য-সন্দেশ পরিবেশন করিয়া চলিয়াছেন এবং এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যিনি সেই সাহিত্য-সম্ভারের সমকক্ষ সাহিত্য রচনা করিতে সমর্থ। রবীন্দ্রনাথ যে অদ্বিতীয় সাহিত্যিক এমন স্বতঃসিদ্ধ কথাটা বাংলা ভাষাভাষীর কাছে প্রমাণ করিবার লজ্জা আমাকে লজ্জা দিতেছে। অতএব সে চেষ্টা স্থগিত থাক। আমি কেবল এই আশঙ্কা করিতেছি যে উক্ত অসত্য সম্বলিত সংবাদপত্রের বিবরণী-ভগ্নাংশ যদি কোন অ-বাঙ্গালী পাঠকের হস্তগত হয় এবং সে যদি তার স্বদেশবাসীর নিকট এই কথা প্রচার করে যে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে এবং সেখানে এখন সংস্কারমুক্ত প্রগতি সাহিত্যের যুগ চলিতেছে তবে সে লজ্জা ঢাকিবার জন্য আমরা মুখ লুকাইবার স্থান পাইব কোথায়? যদি আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পরে অক্সফোর্ডের কোন Indologist সংবাদপত্রের বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া এমন কথা বলেন যে রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহার যুগ-প্রভাব অপসারিত হইয়াছিল এমন কথা তাঁর স্বদেশবাসী সাহিত্যিক নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে, তবে সে কত বড় মিথ্যাভাষণ হইবে? শুধুই কি সাহিত্য? এই কলিকাতা-সহরে এমন কোন্ কর্ম্মপ্রচেষ্টা আছে যার বাণী কবীন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া পৌছিতেছে না? বিজ্ঞান পরিষদের উদ্বোধন, দর্শন সম্মেলনের মর্মকথা, রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সাধনা ব্যাখ্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের বাণী প্রভৃতি বড় বড় বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া সিনেমা গৃহের বা নাট্যশালার দ্বারোদ্‌ঘাটনের কিম্বা ব্যক্তিগত পত্র ব্যবহারের দ্বারা সমস্যার দিগ্‌নির্ণয় প্রভৃতি ছোটোখাটো বিষয় পর্য্যন্ত এমন্ কোন ব্যাপার আছে যার উপর বিশ্বকবির অঙ্গুলি স্পর্শ পড়িতেছে না? এগুলি কি যুগ-প্রভাব অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার লক্ষণ? শক্তির কেন্দ্রে বসিয়া না থাকিলে কি শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে সারা বাংলার তথা ভারতের সংস্কৃতিমূলক কর্মের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়? সে দায়িত্ব পালন করিবার সত্য অধিকার যদি না থাকে তবে কি দেশ তাহা শুধু শুধুই স্বত্ব করে? আমি তাই অবাক হইয়া ভাবি যে রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেই তাঁর যুগ শেষ হইয়া গেল, অন্য যুগ পড়িল, সেই নূতন যুগের অভিনব আলো সকলের মুখে চোখে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল এবং

সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, আর আমি হতভাগ্য কূপমণ্ডূক এমনি চোখ কান বন্ধ করিয়াই আছি যে এত বড় সংবাদের কোন হদিশই রাখিতে পারিলাম না ?

বাঙালী-ইতর জাতির মধ্যে কিন্তু এই রীতির ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। আমি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর দেশে থাকি—সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন হিন্দুস্থানীর মুখে পণ্ডিত জবাহরলালের কিম্বা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিন্দা অথবা পরীবাদ শুনিতে পাইলাম না। অথচ মানুষ যে দোষত্রুটিবিরহিত নয় একথা সকলেই জানেন। এ কথা হিন্দুস্থানীরাও না জানেন এমন নহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ সত্যও জানেন যে নিজেদের দেশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি নিজেরাই শ্রদ্ধা না দেখাই তবে অপরে শ্রদ্ধা দেখাইবে এটা আশাও করা যায় না এবং দেখায়ও না। কিন্তু আমরা বাঙালী হিন্দুরা এই সত্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছি বলিয়া মনে হয়। নিজের দেশের কেহ বড় হইলে তাঁর প্রশংসায় মুখর হওয়া দূরে থাকুক, আমরা তাঁর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হই। আপনারা বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি না জানিনা কিন্তু আমি বাঙ্গালীর মুখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, নরসিংহ আশুতোষের এবং ত্যাগব্রতী প্রফুল্লচন্দ্রের পর্য্যন্ত নিন্দা শুনিয়াছি। এইবার কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্রের নাম হইয়াছে রাষ্ট্রভায়া। এগুলি আমাদের এত লজ্জার কাহিনী যে ইহার আলোচনা করাও অশোভন কিন্তু শোভনতার দোহাই দিয়া দোষ ত্রুটি চাপিয়া গেলেও দেখিতেছি তার ফল ভাল হয় না। সেই বিশ্বাসে এই অপ্রিয় আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই অভ্যাসের জ্বালায় জর্জর হইয়াছিলেন একথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে আক্রমণ করিতে কাহারও বাধে নাই, এখনো এমন লোক আছেন যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন নাই, তাঁদের সংখ্যা যত মুষ্টিমেয়ই হোক এবং তাঁদের বয়ঃক্রম যত বেশিই হউক। এতদিন পর্যন্ত আমরা তার একটা কৈফিয়ৎ দিয়া আসিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত মাত্রায় অভিমানী এবং দেশবাসী তাঁকে যে শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়াছে তাতে তাঁর মন উঠে নাই। কিন্তু সাহিত্য সম্মেলন করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের যুগকে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা বিদায় দিবার পর সে কৈফিয়তের পথও রুদ্ধ হইল। সত্যই কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ ঘটে নাই ? যে প্রতিভা-সূর্যকে জগতের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া এসিয়াবাসী গৌরব অনুভব করে, যাঁর সংস্কৃতিগত এবং সাহিত্যগত অতুলনীয় সার্থকতা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াও ক্লান্ত হইবার কথা নয়, যাঁর সাধনাগত ঐশ্বর্যে বাঙালী জাতি জগতের দরবারে বরেণ্য আসন লাভ করিতে পারিয়াছে, যাঁর নিদিধ্যাসনের অপরিম্লান দ্যুতি এখনো বাংলার পশ্চিম গগন অনুরঞ্জিত করিয়া বিরাজ করিতেছে, যাঁর তিরোভাবের অপ্রতিকার্য সম্ভাবনা স্মরণ করিয়া বাংলার আকাশের গাঢ় তমিস্রা কল্পনা করিতেও আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতে হয়, সেই বাণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী বরপুত্রকে যখন কোন বালখিল্য খদ্যোৎ যুগ-পরিসমাপ্তি বার্ত্তা শুনাইয়া দিবার সাহস করে, তখন ক্ষোভের কারণ ঘটে বৈকি। এমন কথাও শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এখন যাহা লিখিতেছেন তাহা আর প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে পড়ে না ইত্যাদি। আমার ধারণা এই বিচারও সাধারণ লেখকের প্রতি প্রযুজ্য মানদণ্ড দ্বারা পরিমিত। রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত কবিতা কিম্বা যে কোন রচনা উদ্ধৃত করিয়া তাহা যে প্রথম শ্রেণীর এবং তাহা যে তিনি ব্যতীত আর কেহই লিখিতে পারিত না এই সত্য প্রমাণ করা এতই সহজ যে সে চেষ্টাও আমি করিব না। আমি শুধু এই কথাটা বলিব যে রবীন্দ্র প্রতিভার শক্তি অক্ষয়, বীণাপাণি স্বয়ং তাঁহাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহস্রারে বসাইয়া দিয়াছেন, চিৎপ্রকর্ষের ঐশ্বর্য তাঁর সঙ্গের সাথী। তাঁর মধ্যে কোন ফাঁকি নাই। তাঁর শক্তির পিছনে আছে অর্ধ শতাব্দীর উপবকার সাধনা, প্রেরণা লাভ করিবার আন্তরিক প্রয়াস এবং সর্বোপরি দেবীর সুপ্রসন্ন অন্তরের সানন্দ আশীর্বাদ। রবীন্দ্রোত্তর যুগ যাঁরা সবলে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছেন, তাঁদের রচিত পুস্তকাবলীর আকার এখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য—প্রকারের কথা সুধীজন বিবেচনা করিবেন। তাই অনেক সময় অবাক বিস্ময়ে ভাবি যে সুদূরপ্রসারী কোন বিষয়ে রায় দিতে আমাদের যেমন বিন্দু-

মাত্র দেরি হয় না, আমাদের ইতিকর্তব্যতা বোধ দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিবারও তেমনি কোন কারণ ঘটে না।

Hero-worship প্রাচ্যদেশের দুর্বলতা এমন অপবাদ বহুবার শুনিয়াছি, hero-worship to the 4th. power বাড়াইয়া লইয়া যাওয়া যে বুদ্ধিমানের কার্য এমন কথাও মনে করি না। কিন্তু প্রকৃত বড় যিনি তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত করার যে অগভীর কৌশল তাহাকে আর যাহাই বলি, শ্রেয়ের পথ কোনমতেই বলিব না। শ্রদ্ধা দ্বারাই দান-গ্রহণের অধিকার জন্মে ইহা আমাদের প্রাচ্যের প্রাচীন নীতিকথা। যে অভাগ্য সেই অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিল না, সাহিত্য-গুরুর নিকট হইতে অঞ্জলি ভরিয়া সে কোন্ দান সংগ্রহ করিবে? কৃপণ দানের অকৃপণ প্রতিদান তার মুঠির ভিতর আঁটিবে ত?

কিন্তু দুঃখের কথা যাক্। সত্যই রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া গিয়াছে কিনা ইহা বিচার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙালী জাতির এবং বাংলা ভাষার শৈশব কাটিয়াছে এ বলিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতিকে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে জাগরিত করিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে নব নব ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাহার পর বাংলার মধ্যাহ্ন গগনে রবীন্দ্রনাথের উদয় হইয়াছে। যখন রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় হইয়াছে তখন বাঙালী জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে, বাংলা ভাষাও তখন বলশালী এবং সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ সেই নব জাগ্রত জাতিকে আত্মসম্মান, স্বাজাত্যবোধ এবং এক অত্যুদার বিশ্বচেতনার ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। বাংলা ভাষাকেও তিনি সুমিষ্ট এবং অধিকতর বেগবতী করিয়াছেন। বাংলা ভাষা লইয়া তিনি বহু এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট দান বাংলা সাহিত্যের নিও-রোমাণ্টিসিজম; যার প্রস্ফুট লক্ষণ 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' এই উপনিষদোক্ত বাণীর উদ্বোধন, বিরাট কলানাময়তা, মানুষের চেতনার এবং অবচেতনার রাজ্যে সুদূরের জন্য যে ব্যাকুলতা আছে কাব্যে তাহার প্রকাশ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই বিশ্বমৈত্রীর এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রেরণা,—সংসার ক্ষুদ্র নয়, সংসারের মধ্যেও ভগবানের যে প্রকাশ সংসারের সেবা দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায় এই বোধ—জীবনকে এক নূতনতর এবং সূক্ষ্মতর refinementএর পরিস্থিতিতে উন্নীত করিবার স্বপ্নাদর্শ। এ কথা বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান যুগে যে সকল লেখক লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গমাতার সেবা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদর্শ এবং টেক্‌নিক দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু ইহাতে লজ্জা পাইবার কোন হেতু নাই। কেননা বর্ত্তমান বাঙালী জাতির মন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যেই লালিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আর্ট সাহিত্যের প্রভাব এমন বস্তু নয় যে শিকলের মত তাহা জাতির অঙ্গে কাটিয়া বসে—অতএব তাহার নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার প্রয়োজন আছে। এ প্রভাব দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া রহিয়াছে। অপর কোন যুগস্রষ্টা ভিন্ন আদর্শের, ভিন্ন টেক্‌নিকের, ভিন্ন Procedureএর সৃষ্টি করিতে পারিলেই এই প্রভাব ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তৎপূর্বে দুই হাতে সজোরে ঠেলিয়া ফেলিবার বস্তু এ নয়। যুগস্রষ্টা বা যুগপ্রবর্তক বৎসরে বৎসরে গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মে না। ইহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। দেশ কাল পাত্রের শাশ্বত প্রয়োজন ইহাকে গড়িয়া তোলে। ইহার পিছনে আছে ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিত্য অভিপ্রায়।

সেই কারণে আমার মনে হয় যতদিন বিশ্বমানবকে ভাল বাসিবার মন্ত্র, শরীরকে ভগবানের দেউল বলিয়া দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ সংকীর্ণ মানুষের সুদূরের অজানা বাঁশীর আহ্বানে ব্যাকুলতা মানুষের মনে পূজা পাইবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের যুগ-প্রভাব শেষ হইয়াছে এমন কথা বলা চলিবে না। কিন্তু তাহাতে লজ্জা পাওয়ার ত কোন কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ যে সব আইডিয়াকে রূপ দিয়াছেন সেগুলি ত সনাতন বস্তু—সেই আইডিয়াকে কলেবর প্রদান করিবার স্বকীয়তা তাঁহার নিজস্ব। অপর কোন শক্তিমান পুরুষ সাধনা দ্বারা সেই স্বকীয়তা অর্জন করিতে পারিলে তিনিও সাহিত্যে নব কলেবর সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিবার কথাও উঠিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য স্বতন্ত্র সাধনার অপেক্ষা সত্যিকারের সৃষ্টি করিবার অধিকারলাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন আছে। সেই সাধনা যে দিন সত্য হইবে সেদিন নূতন পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং সেই দিন যুগ-প্রভাব গত হইয়াছে কিম্বা বর্ত্তমান আছে এ সমস্যার অবসান হইবে।*

শ্রীঅবনীনাথ রায়

* বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে পঠিত—৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৮

মনের গহনে

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

এমনি করি' কিগো সকল কথা মম লয়েছো বুঝে ?
ধরা তো দিয়ে আছো বৃথাই ঘুরি প্রিয় তোমারে খুঁজে—
কত যে পথে পথে ফিরালে তৃষাভরে কাতর মোরে,
সে কী গো তব প্রেমে শুষ্ক হিয়া মম লইতে ভ'রে ?
করিলে উচাটন ভিখারী গৃহ ছাড়া তোমারি লাগি',
ফিরিনু দ্বারে তব ক্ষণিক কৃপালেশ-প্রসাদ মাগি'—
প্রভাত মিশে গেল, গোধূলী আলোকের ছায়ার মাঝে,
অসহ ক্লান্তির বেদনা জড় সারা দেহেতে বাজে ;
এমন ক্ষণে বুঝি সাঁঝের তারাটির করুণ আঁখি
তোমারি ভাষা ভরি' কহিল কত কথা আমায়ে ডাকি।

জীবন-অঞ্জলি লয়েছো কীগো বঁধু চরণে তব ?
রক্ত কমলের হৃদয়রাগে তার শোনোনি স্তব ?
মৌন নয়নের সে মূক অভিযোগ দাঁড়ায়ে আছে—
কত না অভিমানে তোমার শ্রীচরণে তোমার কাছে ;
তবুও হাসিমুখে মধুর হাসি তব মধুরতর,
পুরাণো সেই সুরে গাহিয়া গান আজও এ হিয়া ভরো।
আমিতো চিরদিন মেনেছি পরাজয় তোমার দ্বারে,
বুকের ভাষাগুলি কেমনে গেঁথে দিলে ব্যথার ভারে।
রিক্ত মরমেতে স্নিগ্ধ রসধারা আসিল নেমে,
অনেক ঘুরে ফিরে তোমার দ্বারতলে রহিনু থেমে।

অলক্ষিত

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

১

জানি নে আমার কেন এত ব্যাকুলতা,
অন্তরতম শুনিছ কি সেই কথা ?
লুকানো হৃদয় ছেপে
বাসনা উঠিছে কেঁপে,
ঝটিকা-ক্ষুব্ধ আহত জীবন-লতা ।
অন্তরযামী বুঝেছ ত সেই কথা ?

২

সকল দুঃখ ব্যথা,
সকল সুখের রাশি,
অনেক চোখের জল
মুখের মধুর হাসি,—
সে-সব দিয়েছি কত শত উপহার,—
আজ শুধু লহো স্তব্ধ হৃদয়ভার ।
সকল ভুলায়ে প্রিয়,
তোমারে চিনিতে দিও,
সব ছাড়াইয়া-খুলে দাও তব দ্বার,
দুঃখ-সুখের ঘুচাও বেদনা ভার ।

৩

জীবনে জমানো যত
অপূর্ণতার গ্লানি,
এবার করুক শুচি
তোমার পরশখানি ।
অন্তররাজ, সহিতে পারি নে আর,
দুর্ব্বলতার তুচ্ছ অশ্রুধার
লহো লহো মুছাইয়া
আমার ক্লান্ত হিয়া ;
শুধু তব পায়ে দাও পূজা-অধিকার,
সকল ভুলিয়া কিছু চাহিব না আর ।

STUDENTS' COMMON-ROOM
P.G.A

জীবন-দেবতা

(ত্র্যঙ্ক নাটক)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্-এ

পাত্র-পাত্রীগণ :—

সুশান্ত	অনীতা
হেমচন্দ্র	বিনতি
অনুপম	প্রভাবতী
জীবন	
ভুবন	

অখিল, বেয়ারা ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বাংলার এক জেলা সহরের ডিষ্ট্রীক্ট জজের বাড়ী। গভীর রাত্রি, দোতলার এক অন্ধকার কক্ষ। সমস্ত নিস্তব্ধ। হঠাৎ জানালার ধার থেকে চাপা গলায় কে ডাকলে অনীতা, অনীতা!)

বিনতি। (বিছানার উপর থেকে সবিস্ময়ে) কে ?

সুশান্ত। আমি সুশান্ত।

বিনতি। এ্যাঁ ?

সুশান্ত। বিনু, আমি সুশান্ত।

বিনতি। আপনি! (উঠে গিয়ে সুইচটা টিপে দিয়ে অবাক হয়ে দেখে জানালার ও পাশে গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে একজন মুসলমান) মাগো!

সুশান্ত (তাড়াতাড়ি ফেজ আর দাড়ি খুলে ফেলে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) ভয় নেই। চিনতে পারছ এবার ?

বিনতি। আপনি—আমি ভাবি—

সুশান্ত। অনীতা কোথায় ?

বিনতি। দিদি মাসীমার ওখানে গেছে।

সুশান্ত। তা হলে—তাইতো—তাহলে আমি যাই।

বিনতি। কিন্তু এত রাত্রে এ ভাবে—আপনি—

সুশান্ত। সে কথা অন্যদিন বলব। এখন আমাকে এক গ্লাস জল দাও, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

বিনতি। জল ? ভিতরে আসুন না। তাইতো কি করে আসবেন ? উঠলেন কোন্ পথ দিয়ে ?

সুশান্ত। যাব ভিতরে ? থাক, কাজ নেই। তাড়াতাড়ি একটু আমায় জল দাও, আমি চলে যাই।

বিনতি। আপনি ভিতরে আসুন না। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে আসবেন ?

সুশান্ত। যাব ? ভয় করবে না তো ?

বিনতি। না। আপনি আসুন।

সুশান্ত। আচ্ছা আসছি, তুমি দরজাটা খুলে দাও।

(কার্ণিশের উপর দিয়ে আসবার জন্যে সরে গেল। বিনতি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল, বাবাঃ! দরজায় টোকা পড়ল, বিনতি খুলে দিতেই সুশান্ত প্রবেশ করল)

সুশান্ত। (একটা চেয়ারে বসে পড়ে) আর পারছি না, একটু জল দাও।

বিনতি। (শশব্যস্ত হয়ে) দিচ্ছি দাঁড়ান, এক্ষুনি আসছি। (টেবল ফ্যান খুলে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল; একটু পরেই কয়েকটা মিষ্টি ও জল নিয়ে এল।)

সুশান্ত। (প্রায় ব্যস্ত হয়ে খেতে সুরু করে) এই জন্যই

বলে নারীরা লক্ষ্মী ; অন্তর্যামীর মত তুমি আমার প্রয়োজন বুঝে নিয়েছ।

বিনতি। আর দু চারটে মিষ্টি আনব ?

সুশান্ত। থাক, আর চাই না। (জল খেয়ে) খুব অবাক হয়ে গেছলে, না ?

বিনতি। (তাকের উপর থেকে মসলার ডিবেটা এনে সামনে খুলে ধরে) হ্যাঁ।

সুশান্ত। একটা বিষয়ে পুরুষ তোমাদের কাছে চিরকাল হার মানবে, এবং মানাতে তার আনন্দও আছে ; সে হচ্ছে সেবা। এত হাঙ্গামার পর পুরুষ হলে মসলার ডিবেটা সামনে ধরতে ভুলে যেত। হাঁ, তারপর ভাবলে কি বলতো, ভাবলে বোধ হয়, ডাকাত না হয় চোর এসেছে ?

বিনতি। কিন্তু আপনি কার্ণিস দিয়ে এলেন কি করে। যদি পড়ে যেতেন ? আশ্চর্য্য, এলেন কি করে, তাই ভাবছি।

সুশান্ত। ও নিয়ে আর বেশী ভেবোনা। ও ভাবনার ফলটা বেশ সুবিধের নয়।

বিনতি। কেন বলুন তো।

সুশান্ত। এই ধর, মনে হতে পারে, মহারাজ রামচন্দ্রের অনুচর হয়ে লঙ্কা বিজয়ে বেরিয়েছিলুম।

বিনতি। (হাসিমুখে) ও।

সুশান্ত। তবে সুখের বিষয় এই, আমার আবছা মনে পড়ছে, জয়যাত্রার দিন কিস্কিন্ধ্যা রাজপুরীতে তুমি আমার সুপক্ক কদলী খাইয়েছিলে।

বিনতি। এইবার গালাগালি সুরু হল বুঝি ?

সুশান্ত। মোটেই না। কিন্তু দেখ, আবার দ্বিতীয় লঙ্কা বিজয় সুরু হচ্ছে।

বিনতি। সে কি ?

সুশান্ত। তুমি আমার জন্যে একটা ফুলের মালা তৈরি করে রেখো। তবে তোমার দিদিকে জানিও না, তিনি বরাবর সাত সমুদ্রের কথাই জানেন, এবার হচ্ছে একার সমুদ্র, শুনলে আমার আর মুখ দেখতে চাইবেন না।

বিনতি। সে কোথায় ?

সুশান্ত। চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম দ্বীপ—লঙ্কাও দ্বীপ, এও এক দ্বীপ ; সে ছিল স্বর্ণ, এ হচ্ছে শ্বেত।

বিনতি। ও, বুঝেছি। এমনি করে কথা বলেন যে বুঝবার যোটি নেই।

সুশান্ত। না বুঝাটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ, বুঝলেই তো ঝঞ্ঝাট। এই দেখ না, বুঝেই তো দেখছি, লঙ্কা বিজয়ে না বেরিয়ে আর উপায় নেই। দেবীকে উদ্ধার করতেই হবে, জানকী বিহনে অযোধ্যা যে শ্মশান হল। কিন্তু দেখ, শুধু একটা বাধার জন্যে যাত্রা সুরু করা যাচ্ছে না, তুমি সেটা সরিয়ে দিতে পারবে ?

বিনতি। কি আবার বাধা হল ?

সুশান্ত। মহারাজ রামচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এবার উঠি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমার সে ছুটো জিনিস কোথা বলতো। ও, ওই যে।

(বিনতি কেক ও দাড়ি এনে দিলে)

এত কষ্ট করে আসার পর ঘরে যে বসতে দিয়েছ, এই আমার পরম সৌভাগ্য।

বিনতি। দিদির সঙ্গে দেখা হল না, আবার কবে আসবেন ?

সুশান্ত। কবে আসব, কখন আসব, তার তো ঠিক কিছু নেই। সে তো আমার মর্জির উপর নির্ভর করে না, অনুচরদের ইঙ্গিতেই প্রভুকে চলতে হচ্ছে, কি বিড়ম্বনা বলতো। আচ্ছা, তোমার বাবা এখন আর আমার নামটাম করেন না বোধ হয় ?

বিনতি। মাঝে মাঝে করেন।

সুশান্ত। ওঃ, তিনটে বাজে, চল চল।

বিনতি। চলুন, কিন্তু যে পথ দিয়ে এসেছেন, সে পথে আর যেতে হবে না ; বাইরের দরজা খুলে দেব চলুন।

সুশান্ত। মানে ? তোমাদের সদর দরজায় তো মোহন সিং শুয়ে আছে ?

বিনতি। না, আর একটা দরজা আছে।

সুশান্ত। সে পথে আমি যাব না। আমি কি খিড়কী দরজার লোক নাকি ?

বিনতি। না সিংহ দরজার।

সুশান্ত। তোমার মুখে অমৃত পড়ুক। দুঃখের বিষয়, এ কথাটা সব সময় তোমাদের দুটী বোনের মনে থাকে না। গভর্ণমেণ্ট আমাকে সদাসর্ব্বদা খাতির করছে, দেশশুদ্ধ লোক অহর্নিশি আমার নাম করছে, আর তোমার দুজন— নাঃ, তোমরা সত্যিই একান্ত হোপলেস্। অন্য কেউ হলে এত রাজ-আদরের বদলেও আসতে চাইত না।

বিনতি। কিন্তু আপনি?

সুশান্ত। ঐ বিষয়ে আমি একটু বোকা বনে গেছি। মিষ্টির লোভটা ছাড়তে পারছি না। কিন্তু না, এবার চল।

বিনতি। চলুন।

(দুজনে বেরিয়ে গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পর্দ্দা উঠবার পূর্ব্বেই কীর্ত্তনের সুর শোনা যাচ্ছে। পর্দ্দা উঠতে দেখা গেল, পূর্ব্বোক্ত বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে ফরাসের উপর বিনতি ও কীর্ত্তনশিক্ষক ভুবনবাবু বসে আছেন। বিনতি গান গাইছে, ভুবনবাবু খোল বাজাতে বাজাতে 'মধুর', 'অমৃত' বলে উঠছেন।)

বিনতির গান

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদগদ বোল॥
নয়নে বহয়ে ঘন আনন্দ-লোর।
পথ আধ চলে রাই সখি করি কোর॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে রাই রসের তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই।
প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই॥

(হেমচন্দ্রকে প্রবেশ করতে দেখে)

ভুবন। মধুর, মধুর, অমৃত। আসুন, আসুন।

হেম। দাস মশাই, একটু গান শোনবার জন্যে এলুম, মনটা বেশ ভাল নেই।

(ফরাসের উপর বসলেন)

ভুবন। আজ্ঞে বেশ করেছেন। কিন্তু দেখুন ভক্ত-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাস বলছেন—

কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
কানু বিনে কে জানিবে মরমের ব্যথা॥

আজ্ঞে, মরমের ব্যথা তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে?

হেম। আপনি ভক্ত, ভগবান তো আপনার কাছে বাঁধা, আপনি বুঝবেন না?

ভুবন। (যুক্ত হাত কপালে ঠেকিয়ে) ও কথা বলে আমার আর অপরাধ বাড়াবেন না। আমি অতি অধম, ভক্তির আমি কিই বা জানি।

হেম। কিন্তু একথা তো সত্যি যে আপনি ভুবনমোহন, সমগ্র ভুবনকে মোহিত করছেন।

ভুবন। আজ্ঞে, পিতামাতাকে দোষ দিতে নেই, গুরুজন তাঁরা,—কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারি না, কি করে তাঁরা আমার নাম ভুবনমোহন রাখলেন—(চোখ বুজে) আহা, সেই নয়নভুলান বৃন্দাবনচন্দ্র, দেখুন তিনিই শুধু ভুবনমোহন। (চেয়ে) পৃথিবীর জীবকে দয়া করবার জন্য আর একবার তিনি এসেছিলেন, প্রেমের বন্যায় নদীয়া সেদিন ভেসেছিল, ভুবনমোহন তিনি।

হেম। আর আপনি,—আপনাকে তাহলে কি বলে ডাকব?

ভুবন। আজ্ঞে আমি ভুবনদাস, বিশ্বভুবনের আমি দাসানুদাস, চরণের ধূলিকণা।

হেম। দাসমশাই, আপনার ছাত্রী কি রকম শিখছে?

ভুবন। আজ্ঞে ক্ষুরধার বুদ্ধি। মহাকবি চণ্ডীদাস বলেছেন—

ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিতে দে।

সেই তীক্ষ্ণ ক্ষুরের মত প্রখর ওদের বুদ্ধি সব জিনিসই সহজে আয়ত্ত হয়ে যায়। মা, সেই 'কালার পিরীতি সই তোমারে সে বলি' গানখানা একবার গাও তো।

বিনতির গান

(হেমচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন, ভুবনবাবু বাজাতে বাজাতে 'মধুর' 'আহাহা' বলে উঠছেন)

কালার পিরীত সই তোমারে সে বলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥

কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
কানু বিনে কে জানিবে মরমের ব্যথা॥
যত যত পিরীতি করয়ে পিয়া মোরে।
আঁখরেতে লিখা আছে হিয়ার মাঝারে॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে মুখে মুখে।
এ বড় বিষম শেল ফুটি আছে বুকে॥
মনের যে দুখ মোর মনেতে রহিল।
ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল॥
নিচয় মরিব সই তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া॥

হেম। (গান শেষ হলে) সুন্দর!

ভুবন। মনোরম! অমৃত।

তৃতীয় দৃশ্য

(পূর্ব্বোক্ত জেলা সহরের নদীর ধার। অনীতা ও বিনতি ধীরে ধীরে ধীরে পারচারি করছে।)

বিনতি। (হঠাৎ সুশান্তকে আসতে দেখে) দিদি, দেখ কে আসছেন।

সুশান্ত। কতক্ষণ এলে তোমরা?

বিনতি। এই একটু আগে। কিন্তু আপনি কোথা থেকে এলেন?

সুশান্ত। কি মনে হয়? মাটী ফুঁড়ে উঠতে পারি, বা উড়ে আসতে পারি, কি মনে হয়? তবে এবার আর গভীর রাতের ডাকাত নয়। (অনীতার প্রতি) সেদিন-কার রাত্রের কথা শুনেছ?

অনীতা। শুনেছি।

সুশান্ত। তা অত রাত্রে বিনতি বললে কি জান? বলে, দিদি নেই, আপনি যে পথে এসেছেন, সেই পথেই ফিরে যান। জলটল আমি দিতে পারব না; রাস্তার ধারে অনেক পুকুর আছে, সেইখানে যান।

বিনতি। তারপর?

সুশান্ত। তারপর আমি আর কি করি, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এলেও অনেক কষ্টে নীচে নামলুম, এমন সময় দেখি —তারপর কি হল বিনু? আর তো মনে পড়ছে না।

বিনতি। একটু চেষ্টা করে মনে করুন।

সুশান্ত। না, না, দেখ, বিনু সত্যিই খুব যত্ন করে-ছিল; অত রাত্রে আগুনের মত ক্ষিধের মুখে মিষ্টিগুলিকে যে কি ভাল লেগেছিল, ওঃ তা আর বলা যায় না, এখনও যেন মুখে লেগে আছে। সঙ্গে দু একটা আছে? (অনীতার প্রতি) তোমার পরীক্ষার তো সময় হয়ে এল, না?

অনীতা। হাঁ।

সুশান্ত। উঃ বাবা, বেঁচেছি। এখনও সময় সময় চমকে উঠি, কোন পরীক্ষা নেই তো! কবে তোমাদের আরম্ভ হচ্ছে?

অনীতা। ১৪ই এপ্রিল।

সুশান্ত। পড়াশোনার জন্যেই যদি এত চিন্তা, তাহলে তো বেড়াতে না এলেই হয়?

অনীতা। তাই ভাবছি।

সুশান্ত। (হঠাৎ সেইদিকে শিক্ষয়িত্রী প্রভাবতী রায়কে আসতে দেখে) এই যে আপনি। আসুন, আসুন। এধার দিয়ে হঠাৎ? বেড়াতে নাকি?

প্রভা। না এমনি। এধার দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম নদীর ধার দিয়ে একটু ঘুরে যাই।

সুশান্ত। বেশ করেছেন, ভালই হল। এঁদের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই। ইনি এখানকার জেলা জজ হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, বি, এ, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী অনীতা ঘোষ; এবং ইনি এঁর কনিষ্ঠা সহোদরা আই, এ, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী বিনতি ঘোষ। এবার আপনারা শুনুন, ইনি বিদ্যাসাগর গার্লস স্কুলের সহকারী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী প্রভাবতী রায়, বি, এ।

(সকলে নমস্কার করলে)

অনীতা। আপনার নাম আমরা আগে থেকেই জানি, আজ আলাপ হয়ে আনন্দ হচ্ছে।

প্রভা। আমারও যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছে। যদিও আমার সময় অল্প, তথাপি দেখি মেলামেশা করবার মত বেশী লোক এখানে পাওয়া যায় না। ভাল আলাপী লোকের সংখ্যা বাড়লে সত্যিই আনন্দ হয়। আপনারা কি এধার দিয়ে রোজ বেড়াতে আসেন নাকি?

বিনতি। রোজ আসি না, তবে প্রায় আসি। আপনিও আসবেন।

প্রভা। বিশেষ চেষ্টা করব। তবে কি জানেন, এত এন্‌গেজমেণ্ট থাকে যে বেড়াবার বড় একটা সময় থাকে না।

সুশান্ত। কিন্তু দেখুন, আমাকে আপনারা বাদ দিয়ে চলতে চাচ্ছেন, এটা বড় দুঃখের কথা।

প্রভা। (হাসিমুখে) ও।

সুশান্ত। আপনাদের কথায় বাধা দেওয়ার জন্যে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, কিন্তু আমার বক্তব্যটা শুনুন, রীতি হচ্ছে, যিনি পরিচয় করিয়ে দেন, তাঁর পরিচয় উভয় পক্ষেরই জানা বলে সেটার আর উল্লেখ না করা; কিন্তু আমি এ রীতির সর্ব্বদা ব্যতিক্রম ঘটাই, কারণ আমি —ক্ষমা করবেন,—নিজের কথা বলতে ভালবাসি। অতএব অজ্ঞাত হলেও নিবেদন করি, অধীনের নাম শ্রীপরিতোষ সরকার, এম, এ; সম্প্রতি কর্ম্মজীবন-প্রারম্ভে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীরদের মত একদিকে পৃথিবীর প্রাচুর্য্যপযোধির কল্লোল, অপরদিকে অভাব-অনলের জয়োল্লাস শুনতে শুনতে জয়যাত্রা পথে এগিয়ে চলেছি। বেকার নিশ্চয়ই নই, কি বলেন?

বিনতি। যে ভাষায় আপনার কাজের পরিচয় দিলেন, তাতে বেকার বলতে আপনাকে কেউ সাহস করবে না।

প্রভা। তা ঠিক। কিন্তু আপনাদের পরিচয়টা হল কি করে?

সুশান্ত। সে এক কর্ম্মচক্রে। পূর্ব্বকালে শিষ্যরা গুরুগৃহে গিয়ে পাঠ নিয়ে আসত, আজ গুরুরাই শিষ্যবাড়ী গিয়ে পাঠ দিয়ে আসছেন, এ কম দুঃখের কথা নয়।

প্রভা। তাহলে মাষ্টারিও করেছেন?

সুশান্ত। কোন বিষয়ে শাস্ত্রী না হলেও শাস্ত্র হিসেবে সকল বিদ্যেরই কিছু কিছু পরিচয় নিয়েছি।

প্রভা। (হাত ঘড়ি দেখে) কিন্তু আমার তো আর সময় হবে না দেখছি, এখন চলি তা হলে।

অনীতা। কোন কাজ আছে নাকি?

প্রভা। হাঁ, একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে, সাড়ে ছটায় পৌঁছতে হবে। এখন দেখছি ছটা পনের, প্রায় চৌদ্দ মিনিট যেতে লাগবে। ঠিক সময়ে পৌঁছান চাইতো।

সুশান্ত। নিশ্চয়ই চাই। এই জন্যেই তো বাঙ্গালী মারা পড়তে বসেছে, সময়ে আর কিছুতে হল না, সব অসময়ে। যারা সময়ের মূল্য বোঝে না, তারা জীবনের মূল্য বুঝবে কি করে বলুন তো। আপনি একটা আদর্শ সৃষ্টি করে দেশের উপকার করছেন।

প্রভা। কি যে বলেন আপনি। আচ্ছা, আসি তা হলে, নমস্কার। (সকলের প্রতিনমস্কার) ওঃ, আর মাত্র বার মিনিট। (চলতে সুরু করলে)

বিনতি। আবার দেখা হবে তো?

প্রভা। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তবে দেখুন, বড় বেশী এন্‌গেজমেণ্ট থাকে কিনা।

অনীতা। মাঝে মাঝে এড়িয়ে আসবেন।

প্রভা। আচ্ছা। (তাড়াতাড়ি চলে গেল)

সুশান্ত। বিনু, কেমন দেখলে বল।

বিনতি। বাবা, যে ব্যস্তবাগীশ মানুষ!

সুশান্ত। কিন্তু তা বলে মেয়েটিকে অপছন্দ করবার কোন কারণ থাকতে পারে কি?

বিনতি। কেন বলুন তো।

সুশান্ত। খুব শীগগির বিয়ে হচ্ছে তোমাদের এক পরিচিতের সঙ্গে।

বিনতি। কার সঙ্গে?

সুশান্ত। অবশ্য তিনি তোমাদের আত্মীয় নন।

বিনতি। চেনাশোনা তো? কে তিনি?

সুশান্ত। লোকটি ভদ্র এবং শিক্ষিতও বটে।

বিনতি। কি মুস্কিল, বলুন না কে।

সুশান্ত। শ্রীযুক্ত পরিতোষ সরকার এম, এ।

(অনীতা বিশেষ বিস্মিত হয়ে সুশান্তর দিকে একবার চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলে)

বিনতি। পরিতোষ সরকার—এম, এ,—ও! এইমাত্র যার পরিচয় দিলেন বুঝি?

সুশান্ত। হাঁ, ভাবছি, আর কেন, চার বছর হায়রাণ হলুম, নিজেও একটু বিশ্রাম করি, ইংরেজও একটু করুক;

অনেক খেটেছি, মায়ের অনেক ঋণ জমে গেছে, দেশের লোকেরা শোধ দিক।

বিনতি। তা বিয়েটা কবে হচ্ছে?

সুশান্ত। শীগগির, পাত্রীর সবই ভাল। দেখলে তো মেয়েটিকে অপছন্দ করবার যো নেই। রূপ আছে, গুণও আছে, তাছাড়া আর এক মহাসদ্‌গুণ আছে— উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত পিতার বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি পেয়েছেন; এবং তার উপর আবার নিজের মাসিক আয় আশী টাকা।

বিনতি। তাহলে তো সব দিক দিয়েই ভাল দেখছি।

সুশান্ত। অবশ্য তিনি পাত্রও খারাপ পাননি। একথা ভরসা করি, তোমরাও মানবে। আর একটা বিশেষ আনন্দের কথা কি জান? তিনি বলছেন, অবশ্য পাত্রের গুণ দেখেই বলছেন—

আমি নিশিদিন সখা খাটিব একাকী
তুমি অলস শয়নে ঘুমায়ো।

(বিনতি হেসে ফেললে। সন্দেহটা এই ধরণের কথায় খানিকটা সরে যাওয়াতে অনীতা হাসিমুখে সুশান্তর দিকে চাহিল)

বিনতি। বেশ মানুষ আপনি! লোকের ঘাড়ে চেপে অন্ন ধ্বংস করবেন?

সুশান্ত। জানতো বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। অতএব বীরত্বের সার্টিফিকেট যখন আমার আছে, তখন রাজার মত আমি ভোগ করব পায়ের উপর পা দিয়ে, সেবিকার সৌভাগ্য যে সে সেবা করতে পারছে।

বিনতি। খাওয়া দাওয়া আজ হয়েছে তো?

সুশান্ত। হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি! পরীক্ষার চেয়ে তো আর খাওয়াটা বড় নয়। তাও এতক্ষণে বলা হল, আগে হলেও বলতে পারতুম, হয়নি।

বিনতি। তা চলুন, খেয়ে আসবেন।

সুশান্ত। আগে থেকে নেমন্তন্ন নেই, আমার কি একটা মান মর্য্যাদা নেই নাকি? দেখ, এবার আমি যাই।

বিনতি। আমার কবে আসবেন?

সুশান্ত। দেখি, কবে হয়। কিন্তু পরিতোষ সরকারকে ভুলোনা, অন্তত প্রভাবতী রায় মহাশয়ার কাছে। নামটা না ভুলবার উপায়টা বলে দিই, বর এবং বধূর একই অক্ষরে নামের সুরু, এবং সুশান্ত যে সেই পরিতোষ দিতে পারে তা নিশ্চয় জান? আর সতত সরকারের কৃপাভাজন বলে আমি সরকার। মনে থাকবে তো?

বিনতি। থাকবে। কিন্তু অর্জ্জুনের অপরাপর নামগুলো কি?

সুশান্ত। উত্তরে, সে কথা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে। আচ্ছা যাই। (চলতে আরম্ভ করল, অনীতা ও বিনতি সেইদিকে চেয়ে রইল)

বিনতি। (সুশান্ত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর) দিদি, এবার বাড়ী যাই চল।

অনীতা। চল্।

চতুর্থ দৃশ্য

(হেমচন্দ্রের বৈঠকখানা। হেমচন্দ্র ও অ[illegible] অ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট— চেয়া[illegible] অনীতা চায়ের ব্যবস্থা করছে।)

হেম। কদিন আসনি দেখে ভাবছিলুম, হয়তো মফস্বলে গেছ।

অনুপম। না, হঠাৎ একটা ব্যাপার নিয়ে একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম বলে আসতে পারিনি।

হেম। অফিসিয়াল কিছু নাকি?

অনুপম। না বিদ্যাসাগর গার্লস স্কুলের অ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমিষ্ট্রেস মিস প্রভাবতী রায় এক টেররিষ্টের হাতে পড়ে কিছু টাকা খুইয়েছেন।

হেম। সে কি! আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!

অনুপম। ওই স্কুলকমিটির আমি ভাইস-প্রেসিডেন্ট কিনা। অন্য মিষ্ট্রেসদের কাছ থেকে শুনে যতটা বুঝা গেল, তাতে মনে হয়, কিছুদিন থেকে এই লোকটার সঙ্গে মিস রায়ের দেখা শোনা হতে থাকে; অবশ্য এদিকে তো লোকটা দেখতে শুনতে অভদ্র ছিল না; শুনলুম he looks quite handsome, and talks fairly well, সেজন্যে বলবারও কিছু ছিল না; নাম বলেছে, পরিতোষ সরকার, এম, এ,।

(অনীতা ও বিনতি প্রায় চমকে উঠল, তবে সেটা হেমেন্দ্রর চোখে পড়ল না।)

হেম। তারপর ?

অনুপম। তাও তিনি আবার পরিতোষ সরকারই নন, ফেরারী বিপ্লবী সুশান্ত বোস। Scoundrel !

হেম। এ্যাঁ, কি আশ্চর্য্য ! এ যে—তাইতো ধরা পড়ল কি করে ?

বিনতি। তিনি কি ধরা পড়েছেন নাকি ?

অনুপম। না, পুলিশের হাতে পড়েনি, তবে ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে গেছে।

হেম। কি করে পড়ল ?

অনুপম। এই দিন কতক আগে মিস রায় তাঁর দেশের বাড়ীতে গেছলেন ; হঠাৎ সুশান্ত বোস সেখানে গিয়ে হাজির; অবশ্য পরিতোষ সরকাররূপে। এক মিষ্ট্রেসের কাছে শুনলুম, ওদের আলাপটা এত জমে উঠেছিল যে বিয়ের কথাও হয়েছিল।

হেম। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।

অনুপম। তারপর সেখানে মিস প্রভাবতী রায়ের কে এক দূর সম্পর্কীয় ভাইও নাকি হঠাৎ এসে উপস্থিত, সেই ওকে চিনে ফেলেছে, ওরা একসঙ্গে বুঝি কলেজে পড়ত। তারপর চকিতে সুশান্ত বোসের অন্তর্ধান, তাও শুধু হাতে নয়, একশটা টাকা নিয়ে।

হেম। বল কি !

অনুপম। ঘোড়েল ছেলে, বুঝছেন না, ও কি আর বিয়ের জন্যে ফিরত, ওর চেষ্টা শুধু টাকার। কোথা থেকে শুনেছে মেয়েটির কিছু টাকা আছে ; টাকা চাই তো, নাহলে দেশোদ্ধার হব কি করে ? তারপর মিস রায় ওর নাম শুনে ভয় পেয়ে এখানে টেলিগ্রাম করে,—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, বলা তো যায় না, কি করে বসতে পারে, ওসব ছেলেদের বিশ্বাস নেই, আমি আবার এখান থেকে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টারকে পাঠাই, সে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

হেম। আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে তো।

অনুপম। শুধু আশ্চর্য্য নয়, কি বিপজ্জনক ব্যাপার ভাবুন তো। একজন নিরীহ ভদ্র মহিলার সঙ্গে এমনভাবে ছলনা করে তাকে পথে বসাবার চেষ্টা। এসব হতভাগাদের গুলি করে মারলেও রাগ যায় না। ব্রুটস্ !

(বয়স্ক ভৃত্য অখিল প্রবেশ করল)

অখিল। বাবু, একজন বুড়ো ভদ্রলোক দেখা করতে চায়।

হেম। কি দরকার কিছু বলেছে ?

অখিল। বলে, আমি তা বাবুর কাছে গিয়েই বলব।

হেম। আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস।

(অখিলের প্রস্থান, একটু পরেই বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। নমস্কার হুজুর। (অনুপমের প্রতি) নমস্কার। (অনীতা ও বিনতির প্রতি) নমস্কার।

(নমস্কারের উত্তরে হেমচন্দ্র ঘাড়টা ঈষৎ নাড়লেন, অনুপম লক্ষ্যই করলেন না, বিনতি ও অনীতা প্রতিনমস্কার করলে।)

হেম। কি দরকার তোমার ?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, বড় বিপদে পড়ে এসেছি। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছি না। বড় অভাব বাবু।

হেম। (চেয়ার দেখিয়ে) বস। (বৃদ্ধ বসলে) চাকরী বাকরী কিছু কর না ?

বৃদ্ধ। একদিন ছিল হুজুর, এখন বুড়ো হয়েছি বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘাড়ে বড় সংসার, সামলাতে পাচ্ছি না বাবু।

হেম। মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে ?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হয়েছে, তবে দুশ টাকা পণ চায়। তা আমি হাতে পায়ে ধরে একশ টাকায় রাজী করিয়েছি ; পঞ্চাশ টাকা ভিক্ষে করে জুটিয়েছি, বাকীটা আর জোটাতে পাচ্ছি না।

অনুপম। তোমার ঠিকানাটা কি বলতো, আমি পুলিশ দিয়ে খোঁজ নেওয়াব, তোমার কথা সত্যি কিনা।

বৃদ্ধ। হুজুর, গরীব বলে এমনভাবে আমাকে অপমান করবেন না।

হেম। না, না, আচ্ছা, তুমি কিছু নিয়েই যাও। অনু মা, দাও তো দশটা টাকা ওকে।

বৃদ্ধ। হুজুর আর *একটি নিবেদন,* ছেঁড়াটেঁড়া কাপড় —মেয়েদের—একখানা যদি দয়া করে—

হেম। কাপড়ও চাই? দাও তো মা একখানা।

(অনীতা বেরিয়ে গেল)

বৃদ্ধ। হুজুরের এইটি বুঝি ছোট মেয়ে?

হেম। হাঁ।

বৃদ্ধ। আহা লক্ষ্মীর প্রতিমা! ঈশ্বর করুন যেন নারায়ণের হাতেই পড়ে।

অনুপম। Beggar talking literature!

বৃদ্ধ। কি বললেন হুজুর?

(অনীতা কাপড় ও টাকা এনে দিল)

অনুপম। বলছি, নেশাভাঙ করে যেন টাকাটা উড়িও না।

বৃদ্ধ। ছি, ছি, কি বলছেন হুজুর! একথা—

অনুপম। আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে, যাও এবার।

বৃদ্ধ। (হেমচন্দ্রের প্রতি) তবে আসি হুজুর। (নমস্কার করে) আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন। (তারপর 'নমস্কার' বলে অপর সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলে, অনুপম লক্ষ্য করলেন না, বিনতি ও অনীতা প্রতি-নমস্কার করলে। বৃদ্ধের প্রস্থান।)

অনুপম। ব্যবসাটা ফেঁদেছে ভাল, যত সব জোচ্চোর!

বিনতি। বাবা, তোমার জন্ত আর একটু কি চা করব?

হেম। না থাক, আর নয়। (অনুপমের প্রতি) তোমার চাই কি?

অনুপম। না, আর দরকার নেই, দেখুন, এই সব বদমাইসদের প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। দেখলেন না ঠিকানা চাইতেই কি ভাবে এড়িয়ে গেল?

বিনতি। কিন্তু সবাই যে বদমাইস, তা তো নাও হতে পারে।

অনুপম। হওয়াটাই বেশী সম্ভব। আজকালকার দিনে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

হেম। (সামান্ত হেসে) তা বটে। ওই কথাটা আজকাল সকলের কাছেই শুনি। এটা নিজেদের উপর অবিশ্বাস, না পরকে অবিশ্বাস, তাই আমি ভাবি।

(অখিল শশব্যস্তে প্রবেশ করল)

অখিল। বাবু, পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করেছে, ইন্সপেক্টার বাবু দেখা করতে চাইছেন।

(সকলে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল)

হেম। সে কি! কেন?

অখিল। কিছু তো বলেননি বাবু, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

হেম। আমার সঙ্গে? কি আশ্চর্য্য! নিয়ে এস তাঁকে। (অখিলের প্রস্থান) কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

অনুপম। Strange!

(অখিলের সঙ্গে ইনসপেক্টার প্রবেশ করলেন)

ইনস। (অভিবাদন করে) হুজুর, সি, আই, ডি জরুরী খবর পেয়ে আপনার অনুমতি না নিয়েই বাড়ী ঘেরাও করতে হয়েছে। ফেরারী সুশান্ত বোস আপনার বাড়ীতে ঢুকেছে।

হেম। সুশান্ত!

অনুপম। সুশান্ত বোস? এই বাড়ীতে?

ইনস। হাঁ হুজুর। বুড়ো ভদ্রলোক সেজে ঢুকেছে।

অনুপম। ও, তাইতো, এইমাত্র তো একজন এসেছিল বটে; সে তো চলে গেছে।

ইনস। চলে গেছে? কতক্ষণ হল?

হেম। তা আট দশ মিনিট হবে।

ইনস। তাইতো ধরা পড়েও পড়ল না, দেবী হয়ে গেল। কিছু নিয়ে গেল নাকি?

অনুপম। হাঁ, ভিখিরী সেজে এসেছিল, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। কিছু টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে গেছে। (হেমচন্দ্রের প্রতি) আমি তখনই সন্দেহ করেছিলুম।

ইনস। কাপড়টা শাড়ী না ধুতি? কি রঙ?

অনুপম। মেয়েদের কাপড়, শাড়ী, রঙটা ঠিক তো মনে আসছে না। (অনীতার প্রতি) আপনার মনে নেই? সবুজ না নীল—ঠিক মনে আসছেনা।

অনীতা। তাড়াতাড়ি এনে দিয়েছি, ঠিক মনে পড়ছে না। সবুজ, নীল, না চকোলেট—পরিষ্কার মনে আসছে না

অনুপম। (বিনতির প্রতি) আপনার মনে নেই ?

বিনতি। ঠিক মনে পড়ছে না তো।

হেমন্ত। না পড়াই সম্ভব। ওঁদের কত রকমের কাপড় থাকে, তার থেকে তাড়াতাড়িতে এনে দিয়েছেন—আসি হুজুর, এখন আবার ওই কয়েকটা রঙএর কাপড়ওলা কোন মেয়েমানুষকে ধরতে পারা যায় কিনা দেখা যাক। (হেসে) তবে বোধ হয় এক্ষেত্র আর হল না, আবার কোথাও হয় তো। এতক্ষণ পোষাক পালটে ফেললে। মায়াবী সব কিনা।

(অভিবাদন ও প্রস্থান)

অনুপম। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই।

বিনতি। (হাসিমুখে) পোষাকেরও নেই।

হেম। আশ্চর্য্য!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাত্রি। পূর্ব্বোক্ত সহরের পার্শ্ববর্তী নদীর উপরে একখানা নৌকোর ভিতর সুশান্ত ও বন্ধু জীবন। মিটমিট করে একটা ময়লা হারিকেন জ্বলছে।)

সুশান্ত। তোমার ঘন্টা তিনেকের বেশী লাগবে বলে মনে হয় না।

জীবন। না, তার বেশী লাগবে কেন। তবে লোক চলাচল বেশী থাকলে একটু দেরী হতে পারে।

সুশান্ত। না রাত দশটার পর গ্রামে আর লোক চলাচল থাকবে না। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বোলো, জ্বরে পড়েছি, উঠতে পারলুম না।

জীবন। (হাসিমুখে) বিশ্বাস না করলে ?

সুশান্ত। কোন রকমে বিশ্বাস করিয়ো। আমি ভাই তাঁর সামনে আর যেতে পারি না। অজিত কেমন আছে, জিজ্ঞেস করলে আমার চোখে জল আসে। এই আটমাস হল, আর কতদিন এমন ভাবে এড়িয়ে চলা যাবে, বুঝতে পারছি না।

জীবন। একটি মাত্র ছেলে!

সুশান্ত। খোঁজও তো কোথাও পাচ্ছি না। পুলিশে খবর রাখলে এতদিন টের নিশ্চয়ই পেতুম। হয়তো কিছু ভয়ানক অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে কোথাও পড়ে আছে, সংবাদ দিতে সাহস পাচ্ছে না, বা খুন হয়েছে। টাকা কটা অজিতের নাম করেই দিও। কুড়ি টাকার কদিনই বা হবে! দিদির যদি কাপড় অপছন্দ হয়, তা হলে ফেরৎ এনো, বদলে দেব।

জীবন। তিনি সেই রকমই কিনা, যে অপছন্দ করবেন।

সুশান্ত। বারবার আমার এই কথাই মনে হয়, অজিত যদি না বিয়ে করত! ছোট্ট মেয়েটি 'দাদা' বলে যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, আমি মুখ তুলে চাইতে পারি না। এতটুকু জড়তা নেই, তার একান্ত বিশ্বাসের কাছে আমার মিথ্যে কথাগুলো যেন আমার জ্বালা হয়ে দাঁড়ায়; তার সামনে যেন দাঁড়াতে পারি না, এখনও পরিষ্কার মনে আছে সেইদিনের কথা, যেদিন অজিত জোর করে ধরে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। সামান্য সামান্য দেশের কথা শুনে তার সে কি উৎসাহ, কত কি অদ্ভুত ধরণের প্রশ্ন করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। এখন সে চাঞ্চল্য গেছে, তার বদলে এসেছে শান্ততা; তার মুখের দিকে চেয়ে মিথ্যে কথা বলার চেয়ে বোধ হয় কঠিন কাজ আর কিছু নেই।

জীবন। আমার সামনে তিনি বের হন না বটে, তবে আড়ালে দাঁড়িয়ে অস্পষ্টস্বরে কথা বলেছেন, তাতে তাঁর ধীর স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি।

সুশান্ত। এমন মাও হয় না। জীবন, তুমি অতি দুর্ভাগ্য যে ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছিলে, মা যে কি জিনিষ, তা চিনবার সময় পাওনি। আজ দুবছর হল, আমি মাকে হারিয়েছি; কিন্তু হারিয়েও একেবারে মা-হারা হইনি জ্যেঠাইমার জন্যে—সময় সময় মনে হত, অজিত বুঝি পর, আমিই তাঁর আপন ছেলে। ঘরে ঘরে এমন মা আর স্ত্রী হবে কবে! তাহলে এখন উঠি ভাই।

জীবন। আপনি তাহলে ফিরে এসে এখানেই অপেক্ষা করবেন ?

সুশান্ত। না, এখানে নয়; ওই যে দূরে বাঁকটা রয়েছে, ওখানে। তবে যদি না থাকি, তাহলে তুমি দেরী না করে চলে যেও। জলে অবশ্য আজ কুমীরের ভয় হবে না,

তবে ডাঙ্গায় বাঘের দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়। তোমাকে একলা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারছি না. খানিকটা মন তোমার কাছে পড়ে রইল।

জীবন। সম্পূর্ণ মনই নিয়ে যান, আমার জন্যে ভাবনা নেই।

সুশান্ত। তা যে হয় না ভাই। মায়ের সঙ্গে কি রফা হয়েছে জান? মাকে বলেছি, মা তোমার সঙ্গে আর চালাকি করে লাভ কি, তাই বলছি, অর্দ্ধেক মন তোমার জন্যে রাখলুম, সিকি আমার ভাইবোনগুলির জন্যে, আর সিকি—

জীবন। জজের মেয়ের জন্যে। নিজের জন্যে কিছু রাখেন নি?

সুশান্ত। না, একেবারে দেউলে। তোমাদের কাছে ধার নিয়ে কারবার করব।

জীবন। যদি ধার না দিই?

সুশান্ত। মহাজন হবে, খাতক নেবে না?

(বলে দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকো কিনারার দিকে এগিয়ে এনে লাফিয়ে পড়ল)

চললুম ভাই।

জীবন। আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হেমবাবুর বাড়ীর দোতলার ঘর। ফরাসের উপর অনীতা, বিনতি, ও ভুবন উপবিষ্ট। অনীতা হারমোনিয়ামে একটা সুর তুলছে, ভুবন ঈষৎ শব্দে খোলে তারই তাল দিচ্ছেন। অখিল প্রবেশ করল।)

অখিল। ছোট মা, একবারটি—

বিনতি। কেন? (উঠে অখিলের কাছে গেল; অখিল মৃদুস্বরে কি বললে।)

বিনতি। (ফিরে আসতে আসতে) আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এস।

(অখিলের প্রস্থান)

অনীতা। কে?

বিনতি। (অনীতার পানে মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে কিছু বলে জোর গলায়) এক সাহেব আসছেন।

(অনীতা হারমোনিয়াম সরিয়ে রাখলে)

ভুবন। কে সাহেব মা? তাহলে আমি উঠি।

বিনতি। আপনার ভয় নেই, তিনি নন।

ভুবন। ও! আমি ভাবি বুঝি—

বিনতি। অনুপম বাবু।

ভুবন। হাঁ মা। আমার উপর তাঁর এত রাগ কেন, তা বুঝতে পারি না। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি তো তাঁর কাছে কিছু অপরাধ করিনি।

বিনতি। নতুন হাকিম কিনা, মেজাজ গরম।

(সুশান্ত প্রবেশ করল। সাদা সুট পরা, দেখে ফিরিঙ্গী সাহেব বলে ভ্রম হয়।)

সুশান্ত। নমস্কার দাস মশাই।

ভুবন। (বিস্মিত হয়ে) নমস্কার।

সুশান্ত। আশ্চর্য্য হচ্ছেন, চিনলুম কোথা থেকে। আপনার পরিচয় অনেক আগেই আমি জোগাড় করেছি, কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না, চেনেন?

ভুবন। আজ্ঞে না।

সুশান্ত। তা হলেই দেখুন, অনুরাগী কে।

(একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল)

এ পোষাক নিয়ে মেজেতে বসতে পারা যায় না, মাপ করবেন।

ভুবন। আপনি মহাশয় ব্যক্তি।

সুশান্ত। কিন্তু এখন যে আমার একটু কীর্ত্তন শোনবার ইচ্ছে হচ্ছে।

ভুবন। শুনবেন বৈকি, নিশ্চয় শুনবেন। (বিনতির প্রতি) ছোট মা, সেই—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়াযব স্বপন স্বরূপ॥

গানখানা একবার—

সুশান্ত। পদকর্ত্তা কে?

ভুবন। আজ্ঞে; কবি বিদ্যাপতি। (বলে জোড় হাত কপালে ঠেকালেন)

সুশান্ত। গানটা কিসের? মিলন, বিরহ, না অভিসার, কি?

ভুবন। আজ্ঞে রূপবর্ণন।

সুশান্ত। হঠাৎ রূপবর্ণনের পদ আপনার মনে এল কি করে? আমাকে দেখে নাকি? কিন্তু এ বিলিতী পোষাকের সঙ্গে তো বর্ণনা খাপ খাবে না। আচ্ছা, সে যাই হোক, চলুক এবার।

বিনতির গান

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কে পাতিয়াযব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝাম শামর কুটলহি কেশ।

সুশান্ত। এক মিনিট দাস মশাই! কুটলহি কেশ কেন?

ভুবন। আজ্ঞে শ্যামসুন্দরের কেশ কুঞ্চিত ছিল কিনা।

সুশান্ত। তা হবে। কিন্তু দেখুন, আমার মনে হয়, রাই বিনোদিনীকে এত কষ্ট যে দেয়, সে কুটিল না হয়ে পারে না, তাই তার কেশও কুটিল হয়েছে, কেমন নয় কি?

ভুবন। আহাহা, কি শোনালেন, মধু মধু! রাই বিনোদিনীকে যে কষ্ট দেয়, সে কুটিলের কেশ কুটিল না হয়ে পারে না, আহাহা! মধু! অমৃত! গাও মা গাও—

ঝাম শমর কুটলহি কেশ।

(গান চলতে লাগল)

সুশান্ত। (গান শেষ হলে) গানের শেষ লাইনটায় আপনারা একটা ভুল বলে গেলেন। 'শূন্য করল বিহি মদন-ভাণ্ডার' না হয়ে 'শূন্য করল বিহি পরাণ ভাণ্ডার' হবে বলে মনে হচ্ছে।

ভুবন। আজ্ঞে, আমি তো পদ ঐ রকমই দেখেছি।

সুশান্ত। তাতেও দোষ হয় না, কারণ একটা হলেই আর একটা হয়। বিদ্যাপতি বলছেন, রাই, কি আর বলব, বিধি শুধু মদন-ভাণ্ডারই শূন্য করেননি, বুকে হাত দিয়ে দেখ, তোমার পরাণ-ভাণ্ডারও খালি করে দিয়েছেন, সেথা কি আর তোমার প্রাণ আছে!

ভুবন। আহাহা, অমৃত! রাধেশ্যাম, রাধেশ্যাম! আপনি পরম ভক্ত, ছাই দিয়ে কি আগুন চাপা যায়! হ্যাটকোট পরে থাকলেও আপনার মনে কৃষ্ণপ্রেম রয়েছে।

সুশান্ত। বলেন কি। আশ্চর্য্য!

ভুবন। অধমকে কেন আর ছলনা করছেন। আমি নরাধম, আপনি পরম ভাগবত। (উঠে দাঁড়ালেন) আজ আসি, আবার কবে দেখা পাব?

সুশান্ত। আমার?

ভুবন। আজ্ঞে।

সুশান্ত। সময় পেলেই আপনার দর্শনলাভের জন্যে নিজেই ছুটে আসব।

ভুবন। আমার অপরাধ আর বাড়াবেন না। আসি তাহলে, নমস্কার। মা, আসি।

(সুশান্তর প্রতি নমস্কার, ভুবনের প্রস্থান)

সুশান্ত। বিনু, কাছে নোট বই আছে কি?

বিনতি। কেন?

সুশান্ত। যে বিশেষণগুলো আজ লাভ করলুম, সেইগুলো লিখে রাখতে, তোমাদের পাছে না মনে থাকে সেইজন্যে।

বিনতি। ও, আপনাকে যে খাবার দেওয়া হয়নি; যাই নিয়ে আসি।

সুশান্ত। খুব লক্ষ্মী মেয়ে তো। ভদ্রলোক যে এতক্ষণ না খেয়ে বসে আছেন, সেদিকে খেয়াল ছিল না বুঝি? (বিনতি একটু হেসে বেরিয়ে গেল) তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে কেন, অসুখ বিসুখ হয়নি তো?

অনীতা। না। আজ কতদূর থেকে ছুটে আসছ?

সুশান্ত। কথাটা বাঁকিয়ে না বলে সোজা করেই বলনা, কার মাথা উড়িয়ে দিয়ে আসছি। তুমি কি ভাব, আমরা দিনরাত এই ছাড়া আর অন্য কিছু করি না?

অনীতা। কর তো ভালই। আর না হলেই বা তোমায় বাধা দিচ্ছে কে?

সুশান্ত। কমটাই বা দাও কি শুনি। কতদূর থেকে

ছুটতে ছুটতে আসি, আর এসে এই মুখভার দেখা, না নন্ত কথা শোনা। তুমি দিনের পর দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ?

(বিনতি খাবার এনে দিলে)

বিমু. তোমাদের এখানে আর আসব না ভাবছি।

বিনতি। কেন?

সুশান্ত। ভাল খাতির পাচ্ছি না। সময়মত পান তামাক নেই, আপ্যায়ন, যত্ন নেই, কিছু নেই।

বিনতি। কিন্তু পবিতোষবাবুর বিয়েটা কবে হচ্ছে?

সুশান্ত। আগের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে, অন্য চেষ্টা চলেছে। সুপাত্র তিনি—একটা গেছে আর একটা আসবে, সুপাত্রীর ভাবনা হতে পারে না। তোমরা কি ভাব, তোমাদের চেয়ে ভাল পাত্রী আর সংসারে নেই? তবে তিনি এ, ডি, এম, নন্, এটা সত্যি বটে।

বিনতি। আজ সর্ব্বাঙ্গ সাদায় মোড়া কেন? সন্ধি করছেন নাকি?

সুশান্ত। করব, এবং তার সঙ্গে লাল পাগড়ীও আঁটব ভাবছি। আচ্ছা দেখ, সেদিন তোমাদের এখানে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক নাকি এসেছিলেন?

বিনতি। (হাসিমুখে) হাঁ।

সুশান্ত। লোকটাকে আমি চিনি। মদ ভাঙ খেয়ে বেড়ায়, এবার এলে হাঁকিয়ে দিও।

বিনতি। তাই দেব।

সুশান্ত। তবে একটু জলযোগ করিয়ে হাঁকিয়ে দিলে অন্যায় করবে না। চল, এবার আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে।

বিনতি। চলুন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গ্রামের একখানা ভাল মেটে বাড়ীর দোতলার একটা ঘর। গভীর রাত্রি। ঘরের এক কোণে একটা হারিকেন জ্বলছে। খাটের উপর স্বামী স্ত্রী নিদ্রিত। হঠাৎ দরজার বাইরে ক্ষীণ কিসের শব্দ শোনা গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিচিত্র কৌশলে ভিতরের খিল খুলে কারা দুজন অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করল, একজনের হাতে একখানা ছোরা ঝলসে উঠল। মার্জ্জারের মত নিঃশব্দ গতিতে এসে দুজনে স্বামীর পাশে দাঁড়াল। চকিতে একবার ছোরাখানা ঝলসে উঠেই নিদ্রিতের বুকে বসে গেল। গোঁ গোঁ শব্দ। শব্দে চমকে জেগে উঠে স্ত্রীর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, দুজনের ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন; রক্তের ভয়াবহ রূপ দেখে স্ত্রীর 'মাগো কি হল গো' শব্দে চীৎকার ও মূর্চ্ছা।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাড়ীর দোতলার ঘর। অনীতা ও হেমচন্দ্র।)

হেম। সেদিন কি চালাকিটাই না করে গেল বলতো।

অনীতা। সেটা কি ভাল হয়েছে বাবা?

হেম। মোটেই না মা। এই সব হীরের টুকরো ছেলেগুলোকে—যাদের বুদ্ধির, শক্তির, সাহসের বহর দেখে তাক লেগে যায়—এমন ভাবে নিজেদের জীবনটাকে নষ্ট করতে দেখলে কি কষ্ট হয় বল দেখি, তাই বলছিলুম, এদের ফেরান দরকার, এবং তা পারে একমাত্র মেয়েরা। দেশের নারীরা তাদের কাজ সমর্থন করে না জানলে এমন কোন পুরুষ নেই যে উৎসাহী হয়ে কাজ করে যায়। পুরুষদের সহস্র অনুরোধ উপরোধ যা না করবে, নারীদের একটি মিনতি তার লক্ষ গুণ বেশী কাজ করবে।

অনীতা। সে কথা যদি কেউ না শোনে বাবা?

হেম। অন্তরের সঙ্গে বললে কেউ কি না শুনে পারে মা? তবে কি জান, একজন বারণ করলে, অপরজন উৎসাহ দিলে, এমন করলে কোন ফলই হবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারগুলোর এমন একটা মোহকর ঔজ্জ্বল্য আছে, যাতে অপরিণত মন সহজে আকৃষ্ট হয়, নিষ্ঠুরতাকে বীরত্ব বলে ভেবে শ্রদ্ধা দিতে যায়, তার ফল কি হয় বুঝতেই পারছ।

অনীতা। কিন্তু সৎপথে চালাতে শাসকেরও তো এদের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে?

হেম। নিশ্চয় আছে। সে হচ্ছে উদারতা, ক্ষমা, শাসনের ত্রুটি সংস্কার। তবে কি জান মা, বিষয়গুলো এত জটিল, এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এমন সব স্বার্থের

উপর প্রতিষ্ঠিত যে ভাল কিছু সংস্কার করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু দেখ, সুশান্তকে বোধহয় বছর চার পরে দেখলুম, না?

অনীতা। হাঁ, বোধহয় তাই হবে।

হেম। আশ্চর্য্য, গলার স্বরটা পর্য্যন্ত চিনতে পারলুম না। স্বর পাল্টাবারও বিদ্যে জানে নাকি? কি সুন্দর ছেলেই না ছিল, যেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি স্বাস্থ্যে, তেমনি গুণে, বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে অমন স্বাস্থ্য দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ কি হয়ে গেল। বাবা নেই, তিনি বেঁচেছেন, কিন্তু মা বুড়ী কি করছে, কে জানে! একমাত্র ওই সম্বল তো। তাই ভাবি, কত বাড়ীতেই না মা বোনেরা কাঁদছে, এরা মানুষ না পাষাণ!

অনীতা। আজ এখনও খবরের কাগজ দিয়ে যায়নি?

হেম। গুপ্ত হত্যার পথে চলে কোন সত্যকে ধরা যায় না, মানুষের হৃদয়াসনে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারা যাব না, এ কথা এরা কবে বুঝবে!

অনীতা। শাসকের বুঝা উচিত যে হিংসার বদলে প্রতিহিংসা দিয়ে কোনদিনই সমস্যার সমাধান হয় না।

(বেয়ারা খবরের কাগজ দিয়ে গেল)

হেম। (একটুক্ষণ উল্টে) আবার একটা বিশ্রী খুন হয়েছে অনু।

অনীতা। কোথায় বাবা?

হেম। গ্রামের এক পুলিশ ইনসপেক্টার। পড়ি শোন, গত পরশু হুগলী জেলার রামরতনপুর গ্রামে গভীর রাত্রিতে পুলিশ ইনসপেক্টার বাবু নন্দলাল গুপ্ত দুর্ব্বৃত্তের হস্তে খুন হইয়াছেন। বিবরণে প্রকাশ, ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। পরশু রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীর দোতলার ঘরে তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন; এমন সময় দুর্ব্বৃত্ত বা দুর্ব্বৃত্তেরা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে খুন করে। তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। প্রভাতেও কেহ সংবাদ পায় নাই, বেলা হইলে টের পাওয়া যায়। স্ত্রীর এ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাবস্থা কাটে নাই; একটু সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলেই 'মাগো, কি হল গো' শব্দ করিয়া পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন। রোগিনীর অবস্থা আশঙ্কাজনক, পুলিশ এই খুন বিপ্লবীদের কার্য্য বলিয়া অনুমান করিতেছে। কি ভয়ানক ব্যাপার বলতো।

অনীতা। তাইতো দেখছি।

হেম। উঃ কি ভীষণ! নৃশংস, খুনের কাজ!

অনীতা। আর কি এখন চা খাবে বাবা?

হেম। এই তো ঘন্টাখানেক আগে খেলুম, থাক এখন। আচ্ছা মা, অনুপম অনেক দিন আসেনি, না?

অনীতা। হাঁ, সেই সার্চ্চ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আর আসেননি।

হেম। ও, আমার অতটা মনে ছিল না। তা সে কত দিন হবে বলতো।

অনীতা। প্রায় মাসখানেক হবে।

হেম। তাইতো, তাহলে তো অনেকদিন হয়ে গেল দেখছি।

অনীতা। আমি একটু আসি বাবা। (অনীতার প্রস্থান। বেয়ারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল। হেমচন্দ্র চিঠিটা রাখছেন, এমন সময় বিনতি প্রবেশ করল।)

বিনতি। কার চিঠি বাবা?

হেম। পড়ে দেখ।

বিনতি। (পড়ে) অনুপমবাবুর বিয়ে মিস প্রভাবতী রায়ের সঙ্গে।

হেম। আমি ভেবেছিলুম, অনুকে সে পছন্দ করেছে।

বিনতি। তিনি পছন্দ করলেও দিদি পছন্দ করেনি। তাছাড়া তাঁর পছন্দ করার মানে তো দেখছ?

হেম। দেখছি। কিন্তু হঠাৎ এমন হল কেন বুঝতে পারছি না তো। মেয়েটি কি অনুর চেয়ে দেখতে ভাল?

বিনতি। না, দিদির চেয়ে ভাল নয়।

হেম। তাহলে—যাক্; যা হবার হয়েছে। তাছাড়া অনুর যখন পছন্দ হয়নি, তখন তো বিয়েও হতে পারত না। আমি ভেবেছিলুম, অনুর হয়তো আপত্তি হবে না। অবশ্য একটা কথা আমার মনে আসত না যে তা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে এখন তো আর বিয়ে হতে পারে না।

বিনতি। কার সঙ্গে বাবা?

পৌষ ১৩৪৫]　　কুমারী মেরী　　[শিল্পী—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি]

P. G. A
COMMON ROOM

হেম। সুশান্তর কথা বলছি। যাক, সে কথা ছেড়ে দাও, সে কথা এখন আর তোলাও চলতে পারে না।

বিনতি। (মুখ নীচু করে) সে কথা সত্যি বাবা।

তৃতীয় দৃশ্য

(গভীর রাত্রি। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘর। সমস্ত নিস্তব্ধ, অন্ধকার, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তে লাগল।)

অনীতা। কে?

(বাইরে থেকে) আমি সুশান্ত।

অনীতা। কে?

(বাইরে থেকে) অনীতা, আমি সুশান্ত।

বিনতি। দিদি!

অনীতা। আলোটা জ্বাল দেখছি।

(বিনতি আলো জ্বাললে। অনীতা দরজার কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে, কে?)

(বাইরে থেকে) অনীতা, দরজাটা খোল, আমি সুশান্ত।

(দরজা খুলতেই সুশান্ত প্রবেশ করলে। আধময়লা সাদা পাঞ্জাবী ও কাপড় পরা, উশ্‌কুশ্‌ক্‌ চেহারা, সমস্ত শরীরে ক্লান্তি ভেঙ্গে পড়ছে, এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বিনতি তাড়াতাড়ি টেবিল ফ্যানটা খুলে দিলে; অনীতা শুধু স্থির হয়ে বিস্মিত নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল। প্রায় এক মিনিট সমস্ত নিস্তব্ধ।)

সুশান্ত। আজ দুদিন দু রাত হল, হাঁফ ফেলবার সময় পাইনি, ছুটতে ছুটতে আসছি।

(কেউ উত্তর দিলে না, সমস্ত নিস্তব্ধ)

অনীতা, তোমার কথাই যে সত্যি, আজ আমার তা বিশ্বাস হয়েছে, আমি এতদিন শুধু ভুল পথে চলেছি।

(একটুক্ষণ নিস্তব্ধ)

এই চার বছরের ভিতর কয়েক জনকে আহত করেছি বটে, কিন্তু কাউকে খুন করিনি। (বলে একবার দুজনের মুখের দিকে চেয়ে) শুনলে তোমরা আমাকে পিশাচ বলেই ভাববে, কোন দিন কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না, ওঃ সে কথা ভাবা যায় না—(দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে) নাঃ সে কথা আমি বলতে পারছি না। (একটুক্ষণ নিস্তব্ধ) সে চীৎকার যে আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। স্বামীর রক্ত দেখে মেয়েটির শিউরে-উঠা মুখখানা বার বার আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, উঃ!

বিনতি। খবরের কাগজে কি এই কথাই—

সুশান্ত। বেশী দিন বোধহয় তার বিয়ে হয়নি, কি করলুম! আমার বুকের ভিতরটা কেমন করছে, আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। আজই আমি বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর হয়তো কোন দিন ফিরব না, তাই একবার দেখা করতে এলুম। অনীতা, তোমার সামনে আজ প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, এ পথে আর কোন দিন পা বাড়াব না, এবার থেকে ভাল হব। যদি সুযোগ পাই, তাহলে——না, আর নয়, এবার যাই, শরীর নড়তে চাইছে না, পা দুটো অবশ, তাহলেও আমাকে ছুটতে হবে, যাই অনীতা।

অনীতা। কোথায় যাবে?

সুশান্ত। বর্ম্মা হয়ে চীনে যাব ভাবছি। আমি বাঁচতে চাই, ভাল কাজ করবার সময় চাই।

অনীতা। দাঁড়াও। (নত জানু হয়ে প্রণাম করে মাথা নীচু করেই বললে) এস।

সুশান্ত। এইটুকু আমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল। দরজাটা খুলে দেবে চল বিনু।

বিনতি। চলুন।

(দুজনের প্রস্থান। উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল, অনীতার কপোল বেয়ে অশ্রুধারা নামছে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(পূর্ব্বোক্ত দৃশ্যের বাড়ীর পিছনের দরজার সামনে বিনতি দাঁড়িয়ে। মৃদু জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, প্রশস্ত মাঠ, মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড়, গাছপালা। বিনতির দৃষ্টিকে অনুসরণ করলে বুঝা যায়, দূরে কে ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে, ও-ই সুশান্ত। মাঝে মাঝে গাছের আড়াল হয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ পিছনে কার ত্বরিতপদে আসার শব্দ শুনে বিনতি মুখ ফিরিয়ে দেখে অনীতা।)

বিনতি। দিদি?

অনীতা। (প্রায় রুদ্ধস্বরে) বিনু!

বিনতি। ওই যে যাচ্ছেন।

অনীতা। কোথায়?

বিনতি। ওই যে, ওই গাছের আড়াল হয়ে গেলেন।

অনীতা। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

বিনতি। ওই যে, ওই দিকে দেখ।

অনীতা। ও। ডাকচি একবার? না, না, না—ওঃ,—কতদূর!

বিনতি। দিদি।

অনীতা। উঃ, মাগো!

(মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যেতে না যেতেই বিনতি ধরে ফেললে।)

যবনিকা

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র

কলুর বলদ

(অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা)

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

কলুর বলদ তা'র চোখ বাঁধা আছে,
দিয়াছে সকাল থেকে বেঁধে ঘানি গাছে।
ঘোরে ক্রমাগত শুধু এক ঠাঁই বাঁধা,
বহুকাল ঘোরে তবু নাহি কাটে বাধা।
চক্রাকারে ঘুরে মরে মনে কিন্তু করে,
"কত পথ চলে গেছি, কেবা মোরে ধরে।"
কাজ শেষে কলু তারে বাঁধে উঠানেতে,
চোখের খুলিয়া ঠুলি কিছু দেয় খেতে;
তখন সে চেয়ে দেখে বাঁধা পূর্ব্বমত,
কি ছাই ভাবিয়াছিল,—ভুল সব যত।
কলুর দুয়ারে সে ত বাঁধা আছে ঠিক,
মুক্তি কোথা! বন্ধন যে হেরে চতুর্দ্দিক।
বদ্ধ জীবেরও দশা বলদেরই মত,
বুঝেও বোঝে না তারা কথা অতশত।

ডানিয়ুবের উদয়লক্ষ্মী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মধ্য ইউরোপের অন্তঃস্থলে হাঙ্গেরী দেশ অবস্থিত। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা একটি সমতলভূমি। জার্ম্মানীর দক্ষিণে ব্ল্যাক ফরেষ্ট পর্ব্বতে উৎপন্ন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যবাহী বৃহত্তম নদী ডানিয়ুব (১৭০০ মাইল) এদেশের মাটীকে শ্যামল আর সজীব করেছে। এর রাজধানী বুডাপেষ্ট ওরই কূলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্যকরোজ্জ্বল তুষারধবল পর্ব্বতশৃঙ্গ, তুষার নদী, আর জলপ্রপাত যার উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে সেই আগেই হাঙ্গেরীর জীবন-কাব্য-সঙ্গীত রচনা হয়েছিল। আজ হাঙ্গেরীর উন্নত সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যা কিছু পরিচয় আমরা পাই, তার মূল উৎস হচ্ছে, ঐ আপন ভোলা ডানিয়ুব নদী। তাই সর্ব্বাগ্রে ওর কথাই বল্‌লাম।

চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত বলে হাঙ্গেরীর জল বায়ু চরম শীতোষ্ণ। এখানে গ্রীষ্ম ঋতুতে নানাদেশ হ'তে বহু লোকের সমাগম হয়। আয়তনে এদেশ বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক। এর অরণ্যমর্ম্মরধ্বনি, স্রোতস্বিনীর সঙ্গীত,

সেণ্ট গেলার্ট স্মৃতিস্তম্ভ

আল্‌প্সের বন্ধুর পথ বেয়ে স্রোতোধারা নেমে এসেছে এবং ১,২৫০ মাইল, এমনিভাবে চলে এসে শেষ পর্ব্বতগাত্রকে স্নাত করে' ডানিয়ুব হাঙ্গেরীর বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারপর কৃষ্ণ সাগরের ভিতর এসে মিলিত হয়েছে। অনেকগুলি উপনদীও এই ডানিয়ুবকে আলিঙ্গন দিয়েছে। এর অপ্রতিহত গতির ছন্দে বহুদিন উদারক্ষেত্র, স্পা, ক্যাস্‌ল, পাহাড়ের উপর সুন্দর সুন্দর ভিলা আর সুন্দরীদের চটুল চাহনির মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে, সেটা অস্বীকার্য্য নয়। দিনে দিনে হাঙ্গেরীর প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়ছে—শুধু ইউরোপে নয়, ইউরোপের বাহিরেও। তাই দেখতে পাওয়া যায় এর রাজধানী বুডাপেষ্টে লণ্ডন থেকে যাত্রা করে নয় ঘণ্টার মধ্যে আকাশ পথ দিয়ে

নরনারী সব বেড়াতে আসে, আর নিউ ইয়র্ক থেকে বিমান পথে ৫২ ঘণ্টার ভিতর যাত্রীরা এসে পৌছায়। অনেকে বলেন ইউরোপের একঘেয়ে ভ্রাম্যমান অবস্থার বৈচিত্র্য আনবার শক্তি হাঙ্গেরীর আছে। একথা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। বেশী পয়সা খরচ হয় না, সামান্য পয়সাতে এখানে ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া যায়। ভ্রাম্যমানদিগের খাতির এখানে খুব বেশী।

মান। তাতার এবং তুর্কীদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে এই হাঙ্গেরীর অধিকাংশ পুরাণো সহর ও পল্লী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—শুধু আছে এর সংখ্যালঘিষ্ট স্মৃতি-স্তম্ভ। কত যে বৈদেশিক আক্রমণ, রক্তপাত, এবং যুদ্ধ বিগ্রহের শোচনীয় পরিণাম একে ভোগ করতে হয়েছে—সে সব কথা মনে করলে শরীর আজো শিউরে ওঠে। আজ যে হাঙ্গেরী নিরাপদ আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে একথাও

গেলার্ট ওয়েভ-বাথ

হাঙ্গেরীকে ইউরোপের শস্য-গোলা বলা হয়ে থাকে। দুধ আর মধু এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দেশটা হচ্ছে কৃষিপ্রধান। স্বভাবত ইহা স্তেপ ভূমি—তৃণের রাজ্য কিন্তু তৃণ আর নাই। জল সেচন দ্বারা এখানে গম, ভুট্টা, বীট, দ্রাক্ষা প্রভৃতির চাষ চলেছে। অধুনা ইহা শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদক দেশগুলির অন্যতম। স্বতন্ত্র গণতন্ত্র শাসন এখানে প্রবর্ত্তিত হয়েছে, পূর্ব্বে এদেশ অষ্ট্রেলিয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে বাঁচাতে গিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' এদেশকে সংঘর্ষ করতে হয়েছে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য হতে এদেশ আজ উজ্জীবিত হয়েছে। এদেশে আর্য্য-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আজও বিদ্য-

বলি না। কারণ ইউরোপের উপর মহাকালের ধ্বংস-দ্যোতক দৃষ্টি পড়েছে, জানি না কখন নটরাজের ধ্বংসলীলা সুরু হবে ডানিয়ুবের ধারে।

কয়েক শতাব্দী ধরে—বৈদেশিক আক্রমণ হওয়ার পর এর ভাঙার গান শেষ হয়ে গেল আর হঠাৎ শান্তির একটা যুগ এ'ল। সেই সময় থেকে সুরু হোলো হাঙ্গেরীয়দের বিবর্দ্ধনের যুগ। হাঙ্গেরীয় আর্টের অবশিষ্ট নিদর্শনগুলি রাখা হোলো অতি সন্তর্পণে। তারপর ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান স্থাপত্যরীতির অভ্যুদয় ঘটলো এবং সহর ও পল্লী নূতনভাবে জন্মগ্রহণ করলো।

বিদেশীদের কাছে প্রথম আকর্ষণীয় হচ্ছে মাউণ্ট সেণ্ট গেলার্ট। সহরের উপর এটী উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান এবং

এর শৃঙ্গ থেকে যে একত্র সন্নিবিষ্ট বহু দৃশ্যপূর্ণ হাঙ্গেরীর সুদীর্ঘ চিত্র অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দেখা যায়। নদী আর সহরের উপর এটাই ছিল য়ুরোপের বপ্র এবং আত্মরক্ষার স্থল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এশিয়ার যাযাবারদিগের আক্রমণ থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য। পর্ব্বতের সানুদেশে সেণ্ট গেলার্টএর প্রস্তর মূর্ত্তি। ইনি হচ্ছেন জীবনোৎসর্গী বিশপ। হাঙ্গেরীর প্রথম রাজা সেণ্ট ষ্টিফেনকে (১০০১—১০৩৮) ইনি খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজা তাঁর যাযাবর অশ্বারোহী হাঙ্গেরীয়দিগকে বাধ্য করেছিলেন একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। তারপর রাজাই সকলকে রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার অধীনে এনেছিলেন। এর ঢের আগের ঐতিহাসিক স্বীকৃত পরিচিতি বুডা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। রোমানদের সময়ে একটি বৃহৎ সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল এর উত্তরে কয়েক মাইল দূরে—তার নাম হচ্ছে একুইনকাম। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও পথিকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। দূরদর্শী সেণ্ট ষ্টিফেনের আগে পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতির কোন প্রভাব এখানে বিস্তৃত হয়নি। তাঁরই অদম্য চেষ্টায় এদেশ সংস্কৃতির আলো পেয়েছিল। পর পর শতকে অবশ্য দেশের ওপর দিয়ে ঝঞ্ঝাবর্ত্ত গিয়েছে কিন্তু এর বীর সন্তানেরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পুরুষানুক্রমিক কৃষ্টি সাধনাকে কখনই ব্যাহত করতে দেয় নি। এদের রেনেসাঁসের যুগে ম্যাথিয়াস করভিনাসের রাজত্ব কালে হাঙ্গেরীয় জাতির প্রথম পুষ্প বিকাশ হোলো। রাজা ম্যাথিয়াস ছিলেন আর্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং কলা-প্রেমিক। তারপর দেড়শত বছর ধরে এই আর্টের বিকাশ হয়ে গেছে তুর্কীর অধীনে থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশ আবার মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। দ্রুত অভ্যুদয় তারপর থেকে সুরু হোলো এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হাঙ্গেরী দৃঢ় রাজনৈতিক এবং আর্থিক সুশৃঙ্খলতায় গড়ে উঠতে লাগলো যাতে করে সে আজ আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার মাঝে অতি আধুনিকতার রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে।

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্ট ডানিয়ুব নদী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। বামতটে পেষ্ট এবং দক্ষিণতটে বুডা অবস্থিত। বুডায় অত্যুচ্চ শৃঙ্গমালা আছে। এরা গিয়ে সম্মিলিত হয়েছে অরণ্যানী বেষ্টিত পর্ব্বতমালার সহিত। ডানিয়ুব পর্য্যটকদের উপকার করে থাকে সঠিক পথ

সেণ্ট ষ্টিফেন

আদর্শকরূপে। নদীর দুই তটের সীমারেখা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সুন্দর এভিনিউগুলির জন্য—নদীটির উপর সাতটী সেতু বিদ্যমান—দুইটী রেলের সেতু এবং অবশিষ্ট সাধারণ ট্রাফিক সেতু। বাঁধন দিয়ে বেষ্টিত বামভাগ প্রসারিত হয়েছে, চিক্কণ ভাবে দোদুল্যমান শৃঙ্খলিত সেতুদ্বারা—সেতুটীর বয়স হচ্ছে একশত বৎসর, এই চেন ব্রিজ পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বস্তু বলে পূর্ব্বে পরিগণিত হোতো। একটি খিলানের উপর দাঁড়িয়ে আছে সুদৃঢ় এলিজাবেথ সেতু। এখানে কয়েকটী সুন্দর হোটেল অবস্থিত। এই সব হোটেল থেকে দেখা যায় বুডার মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য, মাউন্ট সেণ্ট গেলার্ট, রাজকীয় প্রাসাদ, দুর্গ আর ভিলায় ঢাকা পাহাড়গুলি। সূর্য্যাস্তের সময় এর বৈচিত্র্যপূর্ণ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের দিগন্তপ্রসারিত দৃশ্যাবলী মসীমাখা আদ্রার মত হয়ে যায় প্রদীপ্ত আকাশের উপর তীক্ষ্ণভাবে বহিরেখা অঙ্কিত করে' যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই আকাশের আলো ম্লান হয়ে লুকিয়ে পড়ে সন্ধ্যার বিষণ্ণ নীলিমায়। তখন আলো জ্বলে ওঠে চতুর্দ্দিক থেকে,—দীপালীতে সহর শ্রীমণ্ডিত হয়। মুক্তার মালার মত দেখায় আলোকশ্রেণী—নদীর শান্ত বুকে তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। আর নগর রক্ষক দুর্গের প্রাচীরগাত্রে, রাজকীয় প্রাসাদের মরকত বর্ণসদৃশ গম্বুজে এবং করোনেশান গির্জ্জার গথিক বুরুজে আলোর তরঙ্গলীলা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, মনে হয় অলকাপুরীতে আসা গেছে।

সহরের নূতন অংশ হচ্ছে পেষ্ট। আজিকার জীবন এখানে স্পন্দিত হচ্ছে। দুটী বৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। সহরের সমগ্র ট্রাফিকের দায়িত্ব এরাই বহন করে। বুডাতে অবস্থিত ক্ষুদ্রতর টার্মিনাস হতে ইটালী এবং লেক ব্যালাটন অভিমুখী ট্রেণগুলি ছাড়ে। পেষ্ট হচ্ছে আধুনিক বিলাস ব্যসনের কেন্দ্রভূমি। রংবিরঙের দোকান, গুদাম, ব্যাঙ্ক, ভ্রমণবৃত্তান্তবাহক কার্য্যালয়, সওদাগরী অফিস প্রভৃতি রয়েছে। কর্সোর উপর রিডাউট বিল্ডিংস্থ ইবুজ্ এজেন্সী আমাদের উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। বুডাপেষ্টের মূল্যবান যাদুঘর এবং পিক্‌চার গ্যালারিগুলি এই পেষ্টে অবস্থিত।

হাঙ্গেরীর পার্লিয়ামেণ্টের সুদৃঢ় এবং সুন্দর প্রাসাদ নদী পুলিনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গথিক ষ্টাইলে প্রাসাদটী নির্ম্মিত—সামনের দিকটা ২৮৪ মিটার। মার্ব্বেল পাথরের বিস্তৃত সোপানশ্রেণী পার হ'য়ে উঠেই দেখা যায় অসংখ্য গম্বুজবিশিষ্ট বৃহৎ কক্ষ—উচ্চতায় ৬৯ মিটার। এর ঐক্যবদ্ধ পরিসর আর পংক্তিগুলি সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে—হাঙ্গেরীর জাতীয় কলার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। বুডা হচ্ছে প্রাচীন সহর। এর ভেতর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে। দুর্গের প্রাচীন সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলি দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় কোন এক অতীত শতাব্দীতে আসা গেছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে পুরাণো বাঁকাচোরা অট্টালিকাগুলি। পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে বাগিচার ভিতর দিয়ে উঁচু দিকে আরোহণপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে আসতে হয়। বাগিচাগুলি পাহাড়ের সংলগ্ন।

মৌন স্মৃতি সমাচ্ছন্ন বুডা বৎসরে একদিন মুখর হয়ে ওঠে আনন্দোৎসবে। সে দিনটা হচ্ছে ২০শে আগষ্ট—ওদিন হাঙ্গেরীর একটা বড় পর্ব্বানুষ্ঠান চলে। ওদিনটাকে বলা হয় সেণ্ট-ষ্টিফেনস্ ডে। সেণ্ট-ষ্টিফেনের দক্ষিণ হস্তটী রীতিমত পর্ব্বানুষ্ঠান পূর্ব্বক শোভা যাত্রার সহিত প্যালেস চ্যাপেল থেকে করোনেশন ক্যাথেড্রলএ নিয়ে যাওয়া হয়। আজও পর্য্যন্ত সেণ্ট-ষ্টিফেনের হস্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পবিত্র স্মৃতিচিহ্নটীকে বহন করে নিয়ে যাবার সময় দেশের সমস্ত অভিজাত এবং রাজপুরুষ হাঙ্গেরীয় অলঙ্কার খচিত বহু মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পরে আড়ম্বরের সঙ্গে চলতে থাকেন, পশ্চাতে থাকে বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরিহিত কৃষক সম্প্রদায়। আনন্দ দিবসের যবনিকা পতন হয় মাউণ্ট সেণ্ট-গেলার্টের উপর বহ্নুৎসব করে'—উৎসবের আলোকচ্ছটা এসে পড়ে ডানিয়ুবের নিকষের মত কালো জলের উপর। সে দৃশ্য বড় মনোরম।

দুর্গশোভিত পাহাড়ের উপর থেকে দৃশ্যগুলি খুব সুন্দর দেখায়। ফিসারম্যানস্ ব্যাষ্টিয়নের বৃত্তাংশ শ্রেণী এবং লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র পথ হ'তে দূর বিস্তৃত হাঙ্গেরীর সমতলভূমি পর্য্যন্ত নানাদৃশ্য নয়ন গোচর হয়। ব্যাষ্টিয়ান ওয়াক্ থেকে পশ্চিমে অরণ্য বেষ্টিত পর্ব্বত শ্রেণীর পানে চেয়ে অন্তরটা আনন্দে ভরে ওঠে। হাজার হাজার ভিলায় ভরা বুডাকে এই সব পর্ব্বত ঘিরে আছে। ঘন অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়-

গুলি ভ্রাম্যমানদিগের কাছে প্রিয়। ট্রাম, বাস এবং চক্রদন্তবিশিষ্ট রেলে এ সব পাহাড়ে ওঠা যায়। প্রাচীন বনানীর স্নিগ্ধ মনোরম স্পর্শে শরীরের শীতলতা আসে। মাউণ্ট সেণ্ট জনের বুরুজে উঠে দেশের পরিবর্ত্তনশীল নানা দৃশ্য দেখে' পর্য্যটকদের অন্তরে আনন্দ উদ্ভব হয়। দেখা যায় অসংখ্য সরাইখানা রেস্তোরাঁ আর ছোট ছোট ভিলা।

মানুষের যেমন বয়স আছে, জন্ম মরণ আছে, সহরগুলিরও ঠিক সেই রকমই আছে। তাদেরও আছে পতন ও অভ্যুদয়। বুডাপেষ্টের কবে যে অভ্যুদয় হয়েছে সেটা কোথা থেকে ধরা হবে সেইটাই আলোচ্য বিষয়। দেড় হাজার বছর আগে এটা ছিল রোমান কলোনি। রোমের সৈন্যদল এবং উপনিবেশিকগণ বুডার দিকে থাকতেন, সুতরাং এর চেহারায় প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য্য মাখানো রয়েছে। কিন্তু কয়েক শতাব্দী হোলো ডানিয়ুবের বাম তটে জন্ম নিয়েছে পেষ্ট। কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় এদিকটা সব দিকে বড় হয়ে উঠেছে। এ দিকটায় আছে দশ লক্ষ অধিবাসী। তাই বুডাপেষ্টে আমরা অতীত এবং বর্ত্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার নিদর্শনগুলি সমক্রমে পাই। একদিকে আছে তার যান্ত্রিক সভ্যতার আস্ফালন, অপর দিকে আছে তার শান্ত সৌম্য প্রাচীন সভ্যতার পরিপূর্ণতা। রোমানদের সময়ে সামরিক রাজপথগুলির এক স্থানাভিমুখী বিন্দু বলে' এর খুব খাতির ছিল এবং সমসাময়িক কৃষ্টি সভ্যতাপূর্ণ জগতকে বর্ব্বরতা এবং অনিবিড় জনপূর্ণ প্রাচ্য ইউরোপের মিষ্টিক দেশগুলির সাথে এ দেশটাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কার্পেথিয়ানদের সঙ্কীর্ণ প্রণালী হ'তে কৃষ্ণসাগর এবং বৃহৎ পোলিস এবং রুষীয় সমতল-ভূমি পর্য্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্যের বিনিময়-বাণিজ্যস্থলরূপে আজ বুডাপেষ্ট এবং হাঙ্গেরী প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের অর্থনৈতিক এবং জ্ঞান-বৈজ্ঞানিক জীবনের মাঝে সম্মেলনের কাজ করছে—তাই এদের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সবাই দিয়ে থাকে।

বুডাপেষ্ট কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হয়নি। কোন রাজানুগ্রহে বা রাজার খামখেয়ালে, ডানিয়ুবের বাম তটে পুজ্টার বালু-ভূমিতে এবং দক্ষিণ তটে বুডা পর্ব্বতগুলির পাদদেশে ওর অভ্যুদয় ঘটেনি। প্রকৃতির আদেশে ওর অভ্যুদয় হয়েছিল প্রতীচ্য জীবন ধারাকে বহমান করে দেবার জন্য চতুর্দ্দিকে বিশিষ্ট ছন্দের ভিতর দিয়ে। কার্পেথিয়ানদের নদীমাতৃক দেশে যারা বসবাস করে তাদের কল্যাণের জন্য সহরটা বড় হয়ে উঠেছে। দুই কোটী লোকের উন্নতি ও সৌভাগ্যের দিকে বুডাপেষ্ট রোজই নজর দিচ্ছে। ৩২৫.০০০ বর্গ কিলোমিটার প্রদেশে এই দুই কোটী লোক বাস করছে একাত্মানুভূতি আর

রয়েল প্যালেস্—বুডাপেষ্ট

সৌহার্দ্দ্য নিয়ে। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করবার দিকে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য আছে। একদিন ম্যাগাইয়ারদের হাতে ছিল জাতির সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য। বহু শতাব্দীধরে ওরা আধিপত্য করে এসেছে। ওরা শ্বেতাঙ্গ জাতিদের শাখা সম্ভূত নহে। ওরা এখনও এখানে আছে শান্তিপূর্ণ জীবন নিয়ে কিন্তু ওদের আর সে আধিপত্য নেই। ওদের চল্‌তে হয় মাথা নীচু করে'।

বুডাপেষ্ট না থাকলে প্রাচ্য ইউরোপের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিবর্দ্ধন দ্রুত হ'তে পারতো না। প্রাচ্য ইউরোপের শস্য এবং গোশালার কেন্দ্র হচ্ছে এখানে। রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত শস্য এখনও যা হয়, তা হাঙ্গেরীর প্রাকযুদ্ধ সময় অপেক্ষাও ন্যূন নহে। প্রতিবেশী দেশগুলিতে যাতে শস্য

সমৃদ্ধ হয় তার দিকে হাঙ্গেরীর বিশেষ লক্ষ্য আছে। হাঙ্গেরীর মারফৎ প্রাচ্য ইউরোপের গম, গরু, অশ্ব, শূকরের ছানা, তীব্র সুরা প্রভৃতি নানাদিকে রপ্তানী হচ্ছে, অন্যান্য দেশের তুলনায় এদের কোনটাই গুণে নিকৃষ্ট নয়। বহুকাল হতে হাঙ্গেরী উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য বিখ্যাত।

প্যারিসের আমোদপ্রমোদের সংশ্লেষণ, লণ্ডনের ব্যবসা-বাণিজ্যিক কলরব, রোমের ক্লাসিক সৌন্দর্য্য, বার্লিনের কেতাদুরস্ত চালচলন এবং সূর্য্যালোকস্নাত দক্ষিণ দিকের সহরগুলির বৈশিষ্ট্য এক বুডাপেষ্টেই পাওয়া যায়। বুডাপেষ্ট-বাসিদের আতিথেয়তা আজও লুপ্ত হয়নি। তারা

পার্লিয়ামেন্ট—বুডাপেষ্ট

বিদেশী অতিথিদিগকে খুব যত্ন ও সমাদর করে। এমন দিনও গেছে যখন রেল ও ষ্টীমার হয়নি, শুধু ঘোড়ার গাড়ী বা ঐ ধরণের গাড়ী চল্‌তো। সে সময়ে হাঙ্গেরীয় ভূম্যধিকারীগণ রাজপথে লোক মোতায়েন রাখতেন পথিকদিগকে ডেকে এনে আহার ও বিশ্রাম দেবার জন্য। সে রকমের আতিথেয়তা আজ অবশ্য নেই কিন্তু আতিথেয়তার প্রাচীন রীতির কিছু কিছু পরিচয় কতিপয় অভিজাতদের পরিবারে পাওয়া যায়। জাপানে গেলে যেমন দেখা যাবে স্থানে স্থানে লেখা আছে—কুকুর ও ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, অন্যান্য দেশে গেলে যেমন বর্ণ বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যাবে, হাঙ্গেরীতে কিন্তু সে রকমটী নেই। বিদেশী পর্য্যটককে তার প্রয়োজনীয় খবর দেবার জন্য প্রত্যেকেই ব্যগ্র। রাস্তার লোক, পাহারাওয়ালা, ট্রাম কণ্ডাক্টার, রাজকর্ম্মচারীগণ বিদেশী যাতে বেড়াতে এসে গোলোকধাঁধায় না পড়ে তার জন্য চেষ্টা করে। কোথা থেকে আস্‌ছেন, কোথায় যাবেন, থাক্‌বার কোথাও ব্যবস্থা করেছেন কিনা, আমি কি আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারি—এম্নি ধারা প্রশ্ন বিদেশীর উপর বর্ষিত হয়। কাজেই বিদেশী পর্য্যটকের পক্ষে জানবার যা কিছু আছে তা অজানা থাকে না। বিদেশী পর্য্যটক কোন বিপদে পড়লে সকলেই চেষ্টা করে তাকে উদ্ধার করবার জন্য।

বুডাপেষ্টে বহু হাঙ্গেরীর কবি এবং লেখক বাস করছেন। অনেকেই ইউরোপের মধ্যে বেশ নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে গেজা গার্দোলি, ফেরেঙ্ক হার্সেগ, জুডি, পেকার, ল্যাজস জিলাহি, সিসিলিয়া টর্ম্মে, হেল্‌টাই, মরিজ, এম লেনগিয়েল, ডেজো স্জাবো, মিকলোক ক্যালে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাট্যকার হিসাবে ল্যাজস জিলাহি এবং ফেরেঙ্ক মলনারের যশ ও প্রতিষ্ঠা খুব বেশী হয়েছে। এঁদের গ্রন্থ ভিয়েনা, জার্ম্মানী, প্যারিস, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার নাট্যপাদপীঠে অভিনয় হয়ে থাকে। বিগত শতাব্দীর ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকারদিগের মধ্যে যাঁরা হাঙ্গেরীয় সাহিত্য-মন্দিরের মঙ্গলঘট পেতে গেছেন তাঁদের নাম হচ্ছে পিটোফি, জোকাই, আরানি, ভোরেসমার্টি, ম্যাডাক এবং মিকস্জাথ।

কাব্য ও সাহিত্যে যেমন হাঙ্গেরী উন্নত, সঙ্গীতশাস্ত্রেও তার দান কম নয়। এর জাতীয় সঙ্গীত 'ব্লু ডানিয়ুব' শুনলে প্রাণ মন মেতে ওঠে। বুডাপেষ্টে যে রয়েল অপেরা হাউস আছে, তার ভেতর বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের সমাগম হয়। বাড়ীটা চমৎকার রেণেসাঁস বিল্ডিং। এই বাড়ীটা যিনি তৈয়ারী করেছেন তিনিও একজন সুবিখ্যাত হাঙ্গেরীয় ভাস্কর। তাঁর নাম হচ্ছে মিকলস্ ইবল। তাঁর ভাস্কর্য্যের উন্নত কার্য্যগুলি দেখে কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয় বাড়ীটার দিকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ফেরেঙ্ক লিসজট হচ্ছেন হাঙ্গেরীয় ক্লাসিক সঙ্গীতের অন্যতম পুরোধা। হাঙ্গেরীয় ক্লাসিক অপেরার স্রষ্টা বলে ইনি অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে থাকেন। ব্যাঙ্কব্যান এবং হুনইয়াডি

ল্যাজলো শীর্ষক অপেরা দুইখানি আজও সাধারণের কাছে খুব আদরের জিনিস হয়ে আছে। হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ বেহালা-বাদক হচ্ছেন জিনো হিউবে, এই অপেরা হাউসে তাঁর ব্যালেট—'সিন্‌স অব দি সার্ডো' খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কনসার্ট হলে তাঁর পিটোফির সিম্ফনি চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হাঙ্গেরীয় লোকসঙ্গীতের যুগ প্রবর্ত্তন করেছেন বেলা বারটক ও জোলটান কোডালি। প্রাচীন হাঙ্গেরীর সঙ্গীতের ছন্দঃ যতি ও সুরকে এঁরা আবার ফিরিয়ে এনেছেন। আর্নো ডোনানির কথা না বললে এখানে অনেক কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

হাঙ্গেরীর সঙ্গীত জগতে এতবড় জ্যোতিষ্ক পূর্ব্বে দেখা যায়নি। অতি প্রাচীন হাঙ্গেরীর ওস্তাদদের গোষ্ঠীতে ইনি জন্মেছেন। একদিকে ইনি যেমন গান রচনায় সিদ্ধহস্ত অপরদিকে তেমনই যন্ত্রকুশলী। প্রযোজক হিসাবে এঁর খুব দক্ষতা আছে। এঁর সিম্‌ফনি, চেম্বার মিউজিক ও অপেরার বইগুলি অনবদ্য। বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে হাঙ্গেরীতে আছেন যাদের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে বুডাপেষ্ট। বুডাপেষ্টের কনসার্ট হলে অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের হাতে-খড়ি হয়ে গেছে। আমাদের দেশের ছোট ছোট থিয়েটার বাড়ীগুলো এদের অপেরা হাউস ন্যাশান্যাল থিয়েটার প্রভৃতির কাছে খেলাঘর বলা যায়। হাঙ্গেরীর ফিল্ম অভিনেতারা আজ দেশবিদেশে নাম করেছেন। বুডাপেষ্টে বড় বড় সিনেমা হলও আছে। অধুনা হাঙ্গেরীয় ভাষাতেও বহু চিত্র তোলা হচ্ছে এবং ইউরোপের চতুর্দ্দিকে সে সব চিত্রের খুব আদর হচ্ছে।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ চিত্রকর আলবার্ট ডুরার হাঙ্গেরীয় পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর বাবা হাঙ্গেরীর অধিবাসী। নুরেমবার্গে তিনি স্বর্ণকারের কাজ করতেন। বিখ্যাত চিত্রকর কুপেকজস্কি এবং ম্যালিওকি হাঙ্গেরীতে জন্মেছিলেন। এঁরা জার্ম্মান বারোক ষ্টাইলে ছবি এঁকেছেন। অধুনা যে সব চিত্রকরের নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—মুনকাক্সি, জিকি, লিজেন মেয়ার, ব্রকি, বার্টালানস্‌জিকেলি, লোজ, পল্‌স্-জিনিমার্স, সক, ফুলপলাজলো, বেলা ইভানি-গ্রুনওয়াল্ড এবং পল সি মোলনার।

ব্যালাটন্

বুডাপেষ্টে চারুকলার যাদুঘরটীর মধ্যে (The Museum of Fine Arts) অমূল্য রত্নরাজি আছে। প্রাচীন এবং নূতন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পীগণের নানাবিধ নিদর্শন সুরক্ষিত হয়েছে। এখানে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, দলিল দস্তাবেজ আছে। গ্রাফিক আর্টের দুষ্প্রাপ্য নিদর্শনগুলি দেখা গেছে। এখানে ইটালীদের মধ্যে র‍্যাফেল, জেনটাইন বেলিনি, সেবাষ্টিয়ানো ডেল পিয়োম্বো, ঘিরলাডাজো, করেগিও, বোলট্রাফিও, টিপোলো, ওলন্দাজ এবং ফ্লেমিশদের মধ্যে রুবেনস, রেমব্রানডট্, ভ্যানডাইক, মেমলিং, জরডেন্‌স,

ফ্রান্সিস হল্‌স, ভ্যান ওষ্টাডি, ভারমিয়ার ভ্যান ডেল্‌ফট, জার্ম্মানদের মধ্যে এল্‌ট ডর্ফার, লুকাস ক্রানাক, ডুরার, ফরাসীদের মধ্যে ক্লদে লেঁারে, গ্রুঁজ এবং পুরাণো ইংরাজদের মধ্যে রেনল্ডস এবং হপনারের বাছাই বাছাই চিত্র এখানে আছে। প্রাচ্য কলার রত্নভাণ্ডার রয়েছে ফেরেঙ্ক হপ মিউজিয়মে। মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসের সহিত ওটী সংলগ্ন। তার পাশেই হচ্ছে মিউজিয়াম অব এপ্‌প্লায়েড আর্ট্‌স।

ব্যালাটন্‌

কৃষিকে কিরূপে আর্টের মধ্যে আনা যায় তা হাঙ্গেরীয়রা জানে। ওদের এগ্রিকাল্‌চারাল মিউজিয়ামটী দেখ্‌লে ঐ কথাই মনে পড়ে। ওরা দেখাচ্ছে কি করে কৃষি সমস্তার সমাধান করা যেতে পারে। সব সময়েই বেশী এবং ভালো শস্য মাটী থেকে পাওয়া যায় তার কোন মানে নেই—তার পর আর একটা কথা হচ্ছে সব জমি উর্ব্বর হতে পারে না। ওরা বলে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো চলবে না, এমন একটা পথ ধরতে হবে যাতে উপযোগী উৎকৃষ্ট শস্য পাওয়া যায় এবং অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করে ফসল ফলানো যায়। ওরা নিজেদের দেশটাকে শস্য সম্পদেই বড় করে তুলেছে। ওদের মিউজিয়ামে গিয়ে আমাদের জানবার ও দেখবার অনেক কিছু আছে। সমগ্র মিউজিয়ামটীর ভিতর ঘুরলে কৃষির সর্ব্বপ্রকার সমস্তার সমাধান হ'তে পারে। অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী, জেকোশ্লোভাকিয়া, জুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলি হ'তে কৃষকরা এই মিউজিয়ম দেখ্‌তে আসেন। মিউজিয়ামে কৃষি শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

হাঙ্গেরীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে বুডাপেষ্ট। বহু শতাব্দী ধরে এখানেই সমগ্র হাঙ্গেরীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়ে আস্‌ছে। কতকগুলি প্রাদেশিক সহরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মধ্য যুগ থেকে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে হাঙ্গেরীতে। হাঙ্গেরীর ছাত্রদের মধ্যে বহু শতাব্দী হ'তে প্রথা চলে আস্‌ছে জার্ম্মানী, ইটালী, ফরাসী এবং ওলন্দাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করা।

এদিকে আবার বলকান ষ্টেটগুলি, সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং অধুনা জাপান হ'তে ছাত্ররা বুডাপেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এম্নিভাবেই চলেছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এদের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং ভাবের আদান প্রদান। দ্বিতীয় এন্‌ড্রুর রাজত্ব সময়ে হাঙ্গেরীয়ান চার্টার অব লিবার্টিস দেওয়া হয়। এ সময় থেকে হাঙ্গেরীয় আইনের বহুল উন্নতি সাধিত হয়েছে। মধ্যযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রে কয়েকজন হাঙ্গেরীয় মনীষির আবির্ভাব হয়। এঁদের যশ দিগদিগন্ত বিস্তৃত হওয়ায় এঁরা ইটালী এবং ফরাসী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেমেলউইসের নাম বিশ্ববিশ্রুত। ইনি ছিলেন হাঙ্গেরীয় গাইনোকোলজিষ্ট এবং বুডাপেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হাঙ্গেরীয় ইঞ্জিনিয়ারদের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। উত্তম ময়দার কল এঁরা নির্ম্মাণ করতে পারেন এবং যন্ত্র শিল্পের উন্ন-

পরিকল্পনার প্রকাশ করে ইউরোপকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। করিন্থ খাল কাটবার সময় এবং আপার ইটালীর রেলপথে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করাবার সময় হাঙ্গেরীয়ান বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণকে আহ্বান করা হয়েছিল। হাঙ্গেরীর রাজধানীতে শক্তিসম্পন্ন সংবাদপত্রের ছাপাখানা আছে। এখানকার প্রায় সকলেই সাময়িক পত্রগুলি পাঠ করে এবং পত্রিকাগুলির পাঠকপাঠিকার সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে খুব বেশী। সাহিত্য, সঙ্গীত, কাব্য এবং সংবাদ-সাহিত্যের উপর দেশের নরনারীদিগের অত্যন্ত অনুরাগ আছে। দেশের ভাষার সহিত পরিচয় না থাকলেও পর্য্যটকদিগের পক্ষে ভাববার কিছু নেই। এখানকার চলতে থাকে আমোদ প্রমোদের হট্টগোল নিয়ে। হাঙ্গেরীর রাজধানীতে সর্ব্বপ্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। বহু ক্লাব হাউসের অনেকপ্রকার বোট রয়েছে। অনেকগুলি সন্তরণ-স্নানের স্থান আছে তন্মধ্যে দুইটী হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এরা বিলাসীগণের চিত্তের অনুকূল সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করে রেখেছে—একটা আছে সেন্ট গেলার্ট হোটেলের মধ্যে আর একটা হচ্ছে মার্গারেট দ্বীপের ভিতর প্যালাটিনাসে। মার্গারেট দ্বীপটা সহরের গোলমাল এবং হট্টগোলের মাঝ থেকে দূরে অবস্থিত। এ দ্বীপের মধ্যে প্রকাণ্ড পার্ক, সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ এবং আড়ম্বরপূর্ণ ফুলের বাগান আছে। এর ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জ এবং প্রমোদক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য আছে।

ব্যালাটন্

মাগায়াররা বিদেশীভাষাগুলি জানে। প্রত্যেক উচ্চশ্রেণীর রেস্তোরাঁয় খাদ্যদ্রব্যের তালিকা হাঙ্গেরীভাষা ব্যতীত জার্ম্মানী, অথবা ফরাসীভাষায় লেখা থাকে। প্রত্যেক হোটেলের কর্ম্মচারীরা অন্ততঃ একটা বিদেশীভাষা জানে। গ্রামের হাঙ্গেরীয় নৃত্য বিশ্ববিশ্রুত। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ এবং কাফেতে জিপসি অর্কেষ্ট্রা বাজানো হয়। অসংখ্য নাইট ক্লাব এবং কেলি-মন্দির এখানে আছে। সন্ধ্যা থেকে সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত পান, ভোজন, আমোদ প্রমোদ এবং নৃত্যগীত চলে। বোটে কাফে-রেস্তোরাঁ আছে—এই ভাসমান কাফে রেস্তোরাঁ ডানিয়ুবের উপর দিয়ে এ দ্বীপের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখানে রাজকন্যা সেন্টমার্গারেট নীরবে ধর্ম্মসাধনা করে গেছেন। অধুনা স্বাস্থ্যকামী এবং রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গ্রীষ্মকালে এখানে খুব আরাম পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খনিজ জলের উৎস রয়েছে বুডাপেষ্টে। বহু খনিজ উৎস একই স্থানে দেখে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। উষ্ণপ্রস্রবণ, রেডিয়াম এবং লিথিয়ামসমন্বিত উষ্ণ উৎস দিয়ে প্রকৃতি দেবী এস্থানকে সাজিয়েছেন। এই সব উৎসে স্নান করলে সর্ব্বপ্রকার

ব্যাধি হতে আরোগ্যলাভ যে সম্ভব, একথা বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন এবং তা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষতঃ বাতরোগ থেকে অচিরে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ঘোড়দৌড়, গোলোখেলা প্রভৃতির জন্য বুডাপেষ্ট বিশেষ আকর্ষনীয়।

জনসংখ্যা হিসাবে হাঙ্গেরীর অন্যান্য সহর বুডাপেষ্টের অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। বুডাপেষ্টের পর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে জিগেড সহর। এখানে ১৪১,০০০ অধিবাসী রয়েছে। প্রত্যেক প্রাদেশিক সহরেই হোটেল, সরাই, উত্তম রেস্তোরাঁ, আমোদপ্রমোদের সুবন্দোবস্ত আছে। পর্য্যটকরা সর্ব্বত্রই আরামে থাক্‌তে পারেন। প্রত্যেক জায়গার লোকেরই ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখে এঁরা যে প্রীত হ'বেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গলফ্ কোর্স—বুডাপেষ্ট

ইউরোপের কোন দেশ হাঙ্গেরীর মত শীকারের উপযোগী নয়। এখানে বৃহৎ অরণ্য, জলা ও বিল আছে এবং নানারকমের হরিণ, দুষ্প্রাপ্য মাফলন, বন্যশুকর, ফেসান্ট পক্ষী, খরগোস, বৃহদাকার বাষ্টার্ড পক্ষী, টিট্টিভ, কোয়েল, বিভিন্ন রকমের পাতিহাঁস প্রভৃতি পাওয়া যায়। নদী ও হ্রদে বহু রকমের মৎস্য আছে। মৎস্য শীকারের পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। অক্টোবর মাসে অজস্র বুনো রাজহাঁস অন্যদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। সারা হাঙ্গেরীর সমতলভূমিতে তারা উপদ্রব করতে থাকে।

লেক ব্যালাটনকে অনেকে 'হাঙ্গেরিয়ান সি' বলেন। এর গাত্রটী ২৩৪ বর্গ মাইল। মধ্য ইউরোপের কুত্রাপি এরূপ উষ্ণতম হ্রদ নেই। এটী দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ মাইল, প্রস্থে ৪ থেকে ৯ মাইল এবং এর তীর ১২৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে পাহাড়, বন এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র, দক্ষিণে চিত্তাকর্ষক পশুচারণ ভূমি, ক্ষুদ্র বৃক্ষের বন এবং জলাভূমি। হ্রদটা অত্যন্ত অগভীর—গড়পড়তায় প্রায় দশ ফুট, কেবল টিহানিতে চল্লিশ ফুট গভীর। এর জলের উত্তাপ হচ্ছে ২০°—২৮° সেন্টিগ্রেড। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এখানে স্নান করা যেতে পারে। অতি প্রত্যুষে এবং বেশী রাত্রে লেকের ভিতর শ্বেত অশ্বের উপদ্রব হ'লে জল আরও গরম হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ উপকূলে সমুদ্র তীরবর্ত্তী আবহাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যায়। স্থানটী ভারি মনোরম হয়ে ওঠে। উত্তর উপকূলে আগ্নেয়গিরি, বন এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র।

ব্যাডাসকনির দ্রাক্ষা হ'তে পৃথিবীবিখ্যাত মদ্য তৈয়ারী হয়। ব্যাডাসকনির দক্ষিণস্থ ঢালু জমিতে কিস্‌ফালুডির বাড়ী আছে। এখানে বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় কবি উনবিংশ শতাব্দীতে বাস করতেন। দ্রুতগামী ট্রেণ বুডাপেষ্ট থেকে ছেড়ে লেক ব্যালাটনে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আসে। বিভিন্ন স্পাতে (উষ্ণ জলের উৎস) যাত্রীদল মোটর ট্রেণে আরোহণ করে আসে। বুডাপেষ্ট-ব্যালাটন রাজপথ দিয়ে বহু মোটর বাস চলাফেরা করে, ষ্টীমার ও মোটর বোট আছে কাজেই লেকে আসবার কোন প্রকার অসুবিধা নেই। লেকের জলে সালফেট, কার্ব্বন এসিড এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণ পাওয়া গেছে। শিশুরা এ জলে স্নান করলে সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে, রোগাদের পক্ষেও এর জল হিতকারী।

টাটকা আঙ্গুর থেকে নির্য্যাস নিয়ে তৈয়ারী সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত মদ্য খুব সস্তা। এগার, গাইওনোগিয়াস, ব্যাডাস্কলি, জেক্‌সজার্ড প্রভৃতি স্থানের মদ্য উচ্চ গুণ সম্পন্ন। যাঁরা এখানকার মদ্য একবার পান করেছেন তাঁদের মুখে অন্য স্থানের মদ্য ভালো লাগবে না। খোবানী এবং কুল থেকে উত্তম শ্রেণীর ব্রাণ্ডিও তৈয়ারী হচ্ছে, সেগুলি অধুনা প্রশংসা লাভ করেছে।

গাইড এবং দোভাষী ব্যতীত পর্য্যটকরা পেতে পারেন তার জন্য হাঙ্গেরীর সরকারী বন্দোবস্ত আছে। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ এবং জার্ম্মাণ ভাষা হাঙ্গেরীতে প্রচলন আছে। কুলি মজুর, হোটেলওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতি সকলেই ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। বুডাপেষ্টে চোর, বদমায়েস এবং প্রতারকেরও অভাব নেই। তা ছাড়া অনেক সময় মেয়েরা নির্য্যাতিত হয়, অবশ্য এ বিষয়ে হাঙ্গেরীয়ান গভর্ণমেণ্ট খুব সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন।

হাঙ্গেরীয়দের প্রধান পেশা গোপালন এবং কৃষিকার্য্য। সুদূর প্রাচ্য থেকে একদিন হাঙ্গেরীয়রা যে সব আচার ব্যবহার, সামাজিক পদ্ধতি, এবং পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান রীতির শিক্ষা পেয়েছিল, পুরুষানুক্রমে সেগুলি বজায় রেখে আসছে। এদের পোষাক পরিচ্ছদে বেশ জমকালো ভাব আছে। নানারকমের সূচিকার্য্য ওর ভেতর পাওয়া যায়। হাঙ্গেরীর পল্লী মেয়েরা সূচি ও বয়ন শিল্পে সুদক্ষ। তাদের সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতির মধ্যে যে শুধু সুন্দর সূচি কার্য্য থাকে তাহা নয়, রুমাল, শয্যাবস্ত্র এবং টেবিল ক্লথেও বিচিত্র ভাবে কাজ করা দেখতে পাওয়া যায়, কাপড়ের পর্দ্দাগুলি পর্য্যন্ত বাহার করা থাকে। লেসের কাজে মেয়েরা বিশেষ অভিজ্ঞা। পরিশ্রমী কৃষাণীদের হাতে রয়েছে দেশের সূচি ও বয়ন শিল্প। এদের মত চমৎকার বোনা এবং ছুঁচের কাজ কেউ করতে পারে না। মেষপালকরা সুন্দর ভাবে কাষ্ঠ খোদাই করতে পারে। মৃৎ শিল্পে এদেশের লোক বিশেষ উন্নত। হাঙ্গেরী তার উটজ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট।

বৃহত্তর যুদ্ধের সময় হাঙ্গেরীয়গণ একত্র বসবাস আরম্ভ করতে লাগলো। এর পূর্ব্বে তফাৎ তফাৎ জমার জমি এবং গোলাবাড়ী নিয়ে এরা বাস করতো। সন্নিকটে না থাকাতে কেহ কাহাকেও দুঃসময়ে ও সঙ্কট কালে সাহায্য করতে পারতো না। এ সব অসুবিধা অনুভব করে যুদ্ধের সময় সব এক সঙ্গে মিলিত হোলো। তাই আমরা এদের যে কোন গ্রাম বা সহরে ঘন বসতি দেখ্‌তে পাই—ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এক এক জায়গায় আছেই। এর ফলে ওরা যে যে জায়গা ত্যাগ করে এলো সেগুলি জনশূন্য রইলো—পুজ্‌টা হচ্ছে এম্নিধারা একটি জায়গা। বিশাল চক্রবাল এবং গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে ধ্যানমৌন তপস্বীর মত রয়েছে পুজ্‌টা—ইউরোপীয়ানদের চোখে হয়ে আছে বিস্ময়ের বস্তু। পৃথিবীর আদিম সৌন্দর্য্য দেখে দর্শকের চিত্ত রসাপ্লুত হয়। নিশীথে যতদূর চোখ যায়, কেবল নজরে পড়ে অসীম উদার সমতল ভূমি অনন্ত আকাশের

বুডাপেষ্ট সুন্দরী

খিলান করা ছাদের নীচে। সমতল ভূমি ঘুমিয়ে থাকে, এবং জলকুকুটের কর্কশ শব্দ মাঝে মাঝে অসীম স্তব্ধতার গভীর নীরবতাকে শিউরে তোলে। তুষার গলে যাবার পর থেকে পুনরায় তুষার পাত না হওয়া পর্য্যন্ত পশুরা এই মাঠে চরতে থাকে। অশ্বপালক এবং গোপালকগণ তাদের কুকুরগুলোকে নিয়ে মুক্ত বাতাসের মধ্যে বৎসরের আট নয় মাস অতিবাহিত করে। দূরে থাকে তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার নিজেদের ঘরে। এই অবিশ্রান্ত নীরবতার ভিতর

থেকে পুজ্‌টার মুষ্টিমেয় অধিবাসীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-উপাসনার প্রেরণা পেয়েছে। তাই তারা শিখেছে জিনিষ পত্রের উপর কেমন করে সৌন্দর্য্য বিন্যাস করতে হয়।

হর্টোবাগি হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা সমতল ভূমি। এর আয়তন ১১২ বর্গ মাইল। ডেব্রিকেনের ভিতর গেলে একে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। মোটর বা ট্রেণে এখানে আসা যায়। গরমকালে এর বুকে ফুটে ওঠে মরীচিকা—এই মরীচিকা সহরে গ্রামে পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বিত হয়। পুজ্‌টার

এলিজাবেথ ব্রীজ—বুডাপেষ্ট

মাঝে পুরাতন বিখ্যাত সরাইখানা আছে। এক শত বছর আগে হাঙ্গেরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি পিটোফি থাকতেন এবং এর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রেরণা পেয়ে ভাব-সমাধিস্থ হতেন। সরাইখানার মধ্যে কুড়িটী শয্যা, স্নানাগার, টেলিফোন, উত্তম মদ্য এবং আহার্য্য আছে। প্রত্যহ এখানে জিপ্‌সি অর্কেষ্ট্রা বাজে। পুজ্‌টা মিউজিয়ামটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বস্তু বিদ্যমান। বুডাপেষ্টের অতি সন্নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুজটার নাম হচ্ছে বুগাক। এখানে ঈষৎ তরঙ্গবৎ বালু, ছোট ছোট শর-বনাবৃত পুষ্করিণী এবং বাবলা বন দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা প্রাচীন মাগায়ারদের রীতি নীতি এবং প্রথা-পদ্ধতি বজায় রেখেছে। বুড়াপেষ্ট থেকে অটোকারে উঠে কেক্‌স্কিমেট সহরস্থ ছোট বুগাক রেলওয়ের টারমিনাসে আসতে হয়। তারপর ট্রেনে চড়ে কিছুক্ষণ গেলে বুগাক সমতল ভূমিতে উপনীত হওয়া যায়। এখানে এসে ভ্রাম্যমাণদিগকে দেশীয় শকটে উঠে সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়, নতুবা এদিককারের সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভবপর নয়। এই সরাইখানার একটু বিশেষত্ব আছে—উন্মুক্ত আকাশের তলে আগুন জ্বালিয়ে কাবাবের শিকের উপর মুরগীর বাচ্চাগুলোকে দিয়ে মাংস কাবাব করা হয়। সুন্দর দেশীয় মদ্য পান এবং জিপ্‌সি সঙ্গীত আর সুন্দরীদের নৃত্য উপভোগ করে ভ্রাম্যমানরা খুব তৃপ্তি লাভ করে।

হাঙ্গেরীয়রা অনেক রকম রন্ধন জানে। লেক ব্যালাটন ডানিয়ুব এবং টিজার মাছগুলোকে ধরে এনে চমৎকারভাবে এরা রন্ধন করেন পার্চ্চপাইক, পাইক, ফোগাস প্রভৃতি অত্যন্ত মুখরোচক। গরম এবং ঠাণ্ডা—দুই ভাবেই প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হয়। অনেকরকমের মাংস এরা রন্ধন করে তন্মধ্যে 'সাকিং পিগ' উল্লেখযোগ্য যা পশ্চিম ইউরোপে স্পেশাল গরমেন্টস্ ডিস বলা হয়। 'সাকিং পিগ' হচ্ছে এদের নিত্য আহার্য্যবস্তু। 'ষ্টাফ্‌ড ক্যাবেজ' হাঙ্গেরীর ডিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওর চমৎকার স্বাদ আছে। মিষ্টদ্রব্য এবং পুডিং দুইভাগে বিভক্ত,—সিদ্ধ এবং সেঁকা। যেগুলো সিদ্ধ করা হয় তা'তে চিনি থাকে না, কেবল লবণ দেওয়া হয়। এ ছাড়া চেরি, আঙুর, আঁপেল, খোবানি, প্লাম্প প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্যবস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানকার পনির এবং মাখন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলা যেতে পারে।

লণ্ডন-ইস্তাম্বুল ট্রান্সকন্টিনেণ্টাল মোটর রোড বুডাপেষ্টের ভিতর দিয়ে গেছে। রাস্তাটী এসফল্টের প্রস্তুত এবং কন্‌ক্রিট করা। হাঙ্গেরীয় প্রদেশের মধ্যে ২৩৮ মাইল এর দৈর্ঘ্য দেখা যায়। দুইটী রাস্তা আছে বুডাপেষ্ট থেকে রোম পর্য্যন্ত যাওয়ার আর একটা আছে সজোলনোক হয়ে

হ্রদে খাবার। কতকগুলি মোটরিং রাস্তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। সেগুলি শেষ হ'লে কার বা বাসে করে ইউরোপের নানাদেশে যাওয়া সুবিধা হবে।

ষ্টীমার যোগে ভিয়েনা থেকে বুডাপেষ্ট যাওয়া খুব আনন্দপ্রদ, অনেকে এরূপভাবে যেতে পছন্দ করেন। ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের এবং কে, এল, এমের বিমানগুলির অন্যতম অড্ডা হয়েছে বুডাপেষ্ট।

এখানে আসতে হলে দেশথেকে পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হয়। নিজের দেশের পাসপোর্ট ব্যতীত হাঙ্গেরীর বৈদেশিক লিগেসন অথবা কন্‌সলেট থেকে ভিসা নিতে হয়। ভিসা ভিন্ন এখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। কেবল অষ্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী, জাপান, লিক্‌টেনষ্টিন, পর্ত্তুগাল, সুইটজারল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, ইউনাইটেড ষ্টেটস অব নর্থ আমেরিকা, সিটি অব ভ্যাটিকাল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড এবং ব্রিটেনের অধিবাসীদের ভিসা লাগে না।

হাঙ্গেরী নানাদিক দিয়ে উন্নতি করে সে তার জীবনের গান আরও সুন্দরভাবে গাইবার চেষ্টা করছে—তার অন্তরে নিত্যনূতন প্রেরণা জোগাচ্ছে ঐ আপনভোলা ডানিয়ুব নদী। তাই মনে হয় হাঙ্গেরীর ভাগ্যে যদি কোন বাধা বিপত্তি আর না আসে, তাহ'লে অচির ভবিষ্যতে সে ইউরোপের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তি বলে পরিগণিত হবে। যে জাতি আত্মবিস্মৃত নয় তার ভবিষ্যৎ যে অত্যুজ্জ্বল একথা খুবই সত্য। হাঙ্গেরীকে দেখলে সেই কথাই মনে হয়।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আহ্বান

শ্রীগোপাল ভৌমিক

দূর বন-চক্রতলে সন্ধ্যা আসে নীরব চরণে
কালের পাখার গতি থেমে যায় মহামন্ত্রবলে,
হৈমন্তিক স্বর্ণ শীর্ষে মলিন আলোক-বিকীরণে
বিবস্বান ক্লান্ত রথ অতি ধীরে যায় অস্তাচলে।

আমারো মনের সূর্য্য ডুবে যায় ঘন অন্ধকারে
তেজোদীপ্ত অতীতের পৃষ্ঠাপরে বিলুপ্ত কাহিনী,
অবলুপ্ত তমসায় পথভ্রষ্ট হই বারে বারে।
অনন্ত অর্ণবপোতে জ্বালাময় ব্যথার বাহিনী।

তোমারে ভুলিয়া যাই জীবনে মৃত্যুর আলিঙ্গনে
অনন্তের ডাকে জাগি সুরবাঁধা বীণাতন্ত্রী সম,—
নিশ্চিহ্ন স্মৃতির পৃষ্ঠা মিলনের এই মহাক্ষণে
সন্ত্রস্ত অন্বেষি' ফিরি কোন্ জন্মে ছিলে প্রিয় মম।

মিশ্র—একতালা

বন্ধু, তোমায় দেখেছি কোথায়
মনে পড়ে আজি না ত।
তবুও চলেছি জানি না ত কেন
তোমারি সাথ সাথ।

দেখেছি কি দূর তটিনীর কূলে,
দেখেছি কি কোনো বনতরুমূলে,
দেখেছি কি হায়, চকিতের প্রায়
কোনো দিন কোনো রাত।

হরিয়াছিলে কি কভু মোর আঁখি,
ভরিয়া ছিলে কি মনে,
স্বপনের মাঝে এসেছিলে কভু,
অথবা কি জাগরণে।

আলসে হেলায় আজি ভুলিয়াছি
হয়েছিনু কবে কোথা কাছাকাছি,
নিমেষে কখন হ'য়ে আনমন
ধরেছিনু তব হাত।

কথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | সুর ও লিপি—শ্রীশৈলেন গাঙ্গুলী

সা	রা	জ্ঞা	মপা	মা	পা	পধা	পধা	মা	পধা	পধা	র্সর্সা
ব	ন্	ধু	তো॰	মা	য়	দে॰	খে॰	ছি	কো॰	থা॰	॰য়
সা	র্সা	ণর্সণা	ধণধা	মা	গরা	গা	মা	-া	-া	-া	-া
ম	নে	প॰ ॰	ড়ে॰॰	আ	জি॰	না	ত	॰	॰	॰	॰
পধা	ধর্রা	র্র্গর্রা	র্সা	র্সা	র্সা	না	নর্সা	না	ধপা	পনা	ধনা
ত॰	বু॰	ও॰॰	চ	লে	ছি	জা	নি॰	না	ত॰	কে॰॰	ন॰
গা	গপা	পা	-া	ধা	ন্যা	ধনা	পা	-া	-া	-া	-া
তো	মা॰	রি	॰	সা	থ	সা॰	থ	॰	॰	॰	॰
না	না	র্সা	ধনা	পধা	গপা	ধা	না	পধা	নর্সা	র্সা	র্সা
দে	খে	ছি	কি॰	দূ॰	॰র	ত	টী	নী॰	॰র	কূ	লে

| পদা দা দা | দা দা দা | পদা র্সা না | দা পা পা |
| দে খে ছি | কি কো নো | ব০ ন ত | রু মূ লে |

| পা ধা র্সা | ধর্সা র্সর্রা ধা | ধা র্সা র্মা | র্জ্জর্মর্জ্জা র্রর্সর্সা র্সা |
| দে খে ছি | কি০ হা০ য় | চ কি তে০ | ০০র প্রা০০ য় |

| পর্সা নর্সা ণধা | পা মগা রা | গা মা -া | গমা পদা দা ||
| কো০ ন০ দি০ | ন কো০ ন | রা ত ০ | ০০ ০০ ০ ||

|| সা জ্ঞা রা | সা ধ্‌া ণ্‌া | সা রা ণ্‌সা | রমজ্ঞা রা মা |
|| হ রি য়া | ছি লে কি | ক ভু মো০ | ০০র আঁ খি |

| রগা রগা সা | রা গা মা | পা রা গা | মা -া -া |
| ভ০ রি০ য়া | ছি লে কি | ম ০ ০ | নে ০ ০ |

| মা ধা পধা | র্সণা ণা ধা | গা মা ধপধা | গপা মা গা |
| স্ব প০ নে০ | ০র মা ঝে | এ সে ছি০০ | লে০ ক ভু |

| সা জ্ঞা রা | সা ন্‌া ধ্‌া | ন্‌রা গমা রগা | সা -া -া ||
| অ থ বা | কি জা গ | র০ ০০ ০০ | নে ০ ০ ||

|| না না র্সা | ধনা পধা গপা | গা মা পধা | পধনর্সা সা র্সা |
|| আ ন সে | হে০ লা০ ০য় | আ জি ভু০ | লি০০০ য়া ছি |

| পদা দা দা | দা দা দা | পদা র্সা না | দা পা পা |
| হ বে ছি | হু ক বে | কো০ থা কা | ছা কা ছি |

| পা ধা র্সা | ধর্সা র্সর্রা ধা | ধা র্সা র্র্মা | র্জ্জর্মর্জ্জা র্রর্সর্সা র্সা |
| নি মে ষে | ক০ থ০ ন | হ য়ে আ০ | ০০০ন ম০০ ন |

| পর্সা নর্সা ণধা | পা মগা রা | গা মা -া | গমা পদা দা ||
| ধ০ রে০ ছি০ | হৃ ত০ ব | হা ত ০ | ০০ ০০ ০ ||

সুশান্ত সা

তৃতীয় পর্ব্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৫

* * * *

তুষারবালার সাক্ষী সুরু হল বিচারের দ্বিতীয় দিন বেলা সাড়ে ১১৷৷০টা আন্দাজ। আদালতে সমস্ত লোকের একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে, নত মস্তকে দাঁড়িয়ে, হলপ নিয়ে সরকারী উকিলের প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে ধীর সংযত গলায় একটীর পর একটী করে সমর্থন করে গেল সরকার পক্ষের আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটা। বলে গেল যে আমার সমস্ত রকম অত্যাচার যতদিন সম্ভব নীরবে সে সহ্য করেছিল, শ্বশুরকুলের মুখ চেয়ে, তার একমাত্র সন্তানের মুখ চেয়ে। কিন্তু সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার একটা কুৎসিত সম্পর্কের ইঙ্গিত করে বলে গেল যে শেষ পর্য্যন্ত বিধবাটীর অত্যাচার সহ্য করা তার পক্ষে হল অসম্ভব, তাই ত হল কাল—তার সওয়াটাই বোধ হয় উচিত ছিল, নইলে ত এ অঘটন ঘটত না। মহাপ্রাণ দাদার সঙ্গে নিজের একটা নির্ম্মল পবিত্র সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বলে গেল এমনই তার দুরদৃষ্ট যে অসহায় অবস্থায় বাপের বাড়ী থাকার সময় দাদার মাঝে মাঝে পলতায় তাদের দেখাশুনা করতে যাওয়াটাও আমার মনের দিক দিয়ে হ'ল অসহ্য, একটা কুৎসিত সন্দেহে দাদাকে হুকুম করে পাঠালাম পলতা থেকে দূর হয়ে যাওয়ার জন্য, এমন কি এই সম্পর্কে দাদার কাছে লেখা আলীমিঞার চিঠি পর্য্যন্ত আদালতে দাখিল করে প্রমাণ করে গেল। এবং দাদা তাতে রাজী না হওয়ার দরুণ দাদার ন্যায্য মাসোহারা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিতেও আমি দ্বিধা করিনি। ফলে দাদার নবীন মুন্সীকে তাঁর অংশের পৃথক ম্যানেজার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ইত্যাদী একে একে সরকার পক্ষের সব কথাই বলে গেল অত্যন্ত সহজ ভাবে, সরল ভাবে, এতটুকুও ইতস্ততঃ না করে।

ঘটনার দিন রাত্রের বিষয় কেবলমাত্র বলে গেল যে রুগ্ন সন্তানকে পাশে নিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোরে সে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল শুয়ে এমন সময় হঠাৎ দাদার আর্ত্তনাদে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। কি হল—কিছু বুঝবার আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে তার বুকের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল কতকগুলি লোক, অন্ধকারে সে তাদের চিনতে পারে নি, তাই তার পক্ষে কারুকে সোনাক্ত করা সম্ভব নয়।

তুষারবালার সাক্ষী দেওয়ার ধরণে তার কথা বলার ভঙ্গীমায় স্তব্ধ আদালত গৃহের সমস্ত লোকই যে বিনা দ্বিধায় তার আগাগোড়া কথা বিশ্বাস করেছিল সে কথা বুঝতে তখন আমার এতটুকুও দেরী হয়নি। লাল পেড়ে মিহি তাঁতের সাড়ী পরিধানে, গায়ে জড়ানো একখানি সিল্কের উড়ানি, কপালে উজ্জ্বল একটী সিঁদুরের টিপ, কারো দিকে না চেয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিল সে—সত্য সত্যই মনে হচ্ছিল একখানি নির্য্যাতিত লক্ষ্মী প্রতিমা, বিসর্জ্জনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একবার এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের হাটে, নিজের দুঃখের কাহিনী উজাড় করে দিয়ে যেতে চায়। আকুল নয়নে একবার জুরিদের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম—স্তব্ধ হয়ে সবাই চেয়ে আছে তুষারের মুখের দিকে মুগ্ধ চাহনিতে, তার প্রত্যেক কথাগুলি যেন লিখে নিচ্ছে বুকের পরতে পরতে আগুনের অক্ষরে। হতাশ চক্ষে চাইলাম আমারই ব্যারিষ্টারের পানে, দেখলাম চুপ করে মাথা নীচু করে তিনি বসে আছেন—কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

সরকার পক্ষের প্রশ্ন শেষ হল, জেরা করতে উঠে দাঁড়ালেন আমাদের ব্যারিষ্টার, আদালত গৃহে একটা চাপা চাঞ্চল্যের সাড়া টের পেলাম।

উঠে দাঁড়িয়েই প্রথম প্রশ্ন করলেন, "কপালে আপনার ও কিসের টিপ পরেছেন ?"

হঠাৎ যেন তুষার কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। ব্যারিষ্টার আবার প্রশ্ন করলেন, "আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার কপালে ও কিসের টিপ ?"

এবার শান্ত গলায় উত্তর দিলে, "সিঁদুরের ?"

প্রশ্ন। "সধবার চিহ্ন—না ?"

তুষার বললে, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন। "সিঁদুর পরতে আপনি ভালবাসেন ?"

উত্তর। "সব মেয়েই ভালবাসে।"

প্রশ্ন। "আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি—আপনি ভালবাসেন কি ?"

উত্তর। "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন। "মনে মনে কামনা করেন সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "উত্তর দেবেন কি আমার কথার ?"

উত্তর। 'করি।"

প্রশ্ন। "ঐত আপনার স্বামী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন—কেমন ?"

তুষার মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোনও কথা কইল না।

প্রশ্ন। "দয়া করে একবার আপনার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখবেন কি ?"

তবুও তুষার মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে রইল—চাইলে না। আমাদের ব্যারিষ্টার বিশেষ জিদ্ করাতে অপর পক্ষের উকীল প্রতিবাদ করে বললেন যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সাক্ষী কোনও আইন অনুসারেই আসামীর দিকে চেয়ে দেখতে বাধ্য নয়। এই নিয়ে উভয় পক্ষের কিছু বাগ-বিতণ্ডার পর জজ্ সাহেবের আদেশে তুষার একবার মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখতে বাধ্য হল।

প্রশ্ন। "স্বামীকে দেখলেন ?"

উত্তর। "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন। "চিনতে পেরেছেন ?"

উত্তর। "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন। "ক'মাস জেলে থেকে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে—একেবারে ভেঙ্গে গেছে—না ?"

উত্তর। "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন। "ওঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ—আপনি জানেন ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "আপনি কি আজ পর্য্যন্ত শোনেন নি যে ওঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ?"

উত্তর। "শুনেছি।"

প্রশ্ন। "খুনের শাস্তি ফাঁসী—এটাও জানেন ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "উত্তর দিন আমার কথার। জানেন নাকি যে খুন করলে ফাঁসী হয় ?"

উত্তর। "শুনেছি।"

প্রশ্ন। এইবার একটা সোজা কথার উত্তর দিন। আপনি কি চান যে আপনার স্বামীর ফাঁসী হোক।"

তুষার নীরব।

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন "উত্তর দিন আমার কথার।"

উত্তর। "কোনও স্ত্রী কি তাই চায় ?"

প্রশ্ন। "আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কি তাই চান ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "চমৎকার। এইটেই ত স্বাভাবিক। এইবার বলুন ত এই খুনের মোকদ্দমায় স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছেন কেন ?"

তুষার নীরব।

বিদ্রূপাত্মক সুরে প্রশ্ন, "সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় করবার জন্য কি ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "আপনাকে এই মোকদ্দমায় কি কেউ সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে ?"

উত্তর। "আদালতের সমন পেয়েছি।"

প্রশ্ন। "সমন পেয়ে আদালতে আসতে আপনি বাধ্য। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে এত কথা বলতে কি কেউ আপনাকে বাধ্য করেছে?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "উত্তর দিন। কেউ আপনাকে বাধ্য করেছে—কেউ শিখিয়ে দিয়েছে এসব কথা?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ; দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসী হতে পারে; আপনি কি চান স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব কথা এখানে বলে গেছেন, আমরা সব বিশ্বাস করব, না করব না?"

উত্তর। "আপনাদের ইচ্ছা।"

প্রশ্ন। "আপনার ইচ্ছেটা কি সেইটেই জানতে চাইছি।"

উত্তর। আমার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই।"

প্রশ্ন। "ও। আপনার কথা বিশ্বাস করে আপনার স্বামীকে আমরা শাস্তিই দি বা আপনার কথা অবিশ্বাস করে তাঁকে খালাসই দি—সে বিষয় অপেনার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই কেমন?"

তুষার নীরব।

বেশ ধমকের সুরে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার। আপনার তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না—কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই আপনার?"

একটু জোরের সঙ্গে উত্তর, 'না।'

বুঝলাম তুষার এবার রেগেছে মনে মনে। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, তুষারের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

তুষারের জেরা চলল। নানান ভাবে নানান কথা নিয়ে নানা রকম প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন আমাদের ব্যারিষ্টার। তুষারকে রাগিয়ে জেরার মধ্য দিয়ে মোটের উপর বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তুষারবালা অতিশয় রাগী আত্মসুখী এবং কোপন স্বভাবের স্ত্রীলোক। স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বা প্রেম তার কোনও কালেই ছিল না; এবং জীবনে স্বামীকে এতটুকু আদর যত্নে তৃপ্ত করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত সে করেনি কোনও দিন। চিরটা জীবন স্বামীকে জ্বালিয়ে এসেছে নানান রকম অবুঝ অত্যাচারে অথবা অশান্তির উৎপীড়নে। জেরা করে বোঝাবার চেষ্টা হল—এমন কি, আজকে এই দারুণ দুর্দ্দিনেও সে স্বামীর শাস্তিই চায়, ফাঁসী হয়, তাতেও আপত্তি নেই, কেননা তাহলেই সে নাবালক সন্তানের পক্ষ থেকে জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক হবে অতি সুখে নিজের মনের মতন করে জীবন কাটাতে পারবে; এবং এই জন্যই স্বামীর চিরদিনের শত্রু মুকুন্দর সঙ্গে সে যোগ দিয়েছে, তারই প্ররোচনায় এসেছে সরকার পক্ষের সাক্ষী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে।

সাবিত্রীর কথা তুলেও তুষারকে অনেক জেরা হল। বোঝাবার চেষ্টা করা হল যে সাবিত্রীর জগতে কোনও আশ্রয় ছিল না বলেই আমাদের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল কেননা ছেলে বেলা থেকে সে ছিল আমার খেলার সাথী এবং আমরা অত বড় হয়ে উঠেছি ঠিক দুটি ভাই বোনের মতন। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল একেবারে পবিত্র ভাইবোনের সম্পর্ক। একথা ওকথার পর প্রশ্ন করা হল "এই সাবিত্রী মেয়েটার বাপের বাড়ী ত আপনাদেরই শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে?"

উত্তর। "হাঁ।"

প্রশ্ন। "সাবিত্রীর মাকে আপনার স্বামী 'সইমা' বলে ডাকতেন—কেমন?"

উত্তর। "জানিনা।"

প্রশ্ন। "শোনেনও নি, কোনও দিন সে কথা?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "সাবিত্রী আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে 'সইমা' বলে ডাকতেন—সেটা ত শুনেছেন?"

উত্তর। "হবে।"

প্রশ্ন। "শুনেছেন কি না উত্তর দিন।"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "সাবিত্রী আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে কি বলে ডাকতেন?"

উত্তর। "জানি না।"

প্রশ্ন। "এক সঙ্গে বাস করলেন প্রায় এক বৎসর অথচ সাবিত্রী আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে কি বলে ডাকতেন কখনও শোনেননি ?"

উত্তর। "লক্ষ্য করিনি।"

প্রশ্ন। "আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণের সঙ্গে সাবিত্রীর মার ছেলেবেলা থেকেই 'সই' পাতান ছিল এবং সেই সম্পর্কে আপনার স্বামী ও সাবিত্রী পরস্পরের মাকে ছেলে বেলা থেকেই 'সইমা' বলে ডেকে এসেছেন—অস্বীকার করতে পারেন ?"

উত্তর। "জানি না।"

প্রশ্ন। "সাবিত্রী আপনার স্বামীকে 'দাদা' বলে ডাকতেন—এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ?"

উত্তর। "শুনিনি।"

প্রশ্ন। "সে কি কথা ? একটা যুবতী স্ত্রীলোক বাড়ীতে এল, আপনার স্বামীর সঙ্গে তিনি কি সম্পর্কে মেলামেশা করছেন, কি বলে ডাকছেন—এটাও লক্ষ্য করার কৌতূহল কখনও হয়নি আপনার ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "মেয়েটা কি সম্পর্কে আপনাদের বাড়ীতে হঠাৎ এসে আশ্রয় নিল—এটা জানবার কৌতূহল হয়েছিল কি ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "কৌতূহল আপনার বড়ই কম দেখতে পাচ্ছি। আপনার মনটা কি স্বামীর বিষয়ে একেবারে নিরাসক্ত ছিল ?"

উত্তর। "তার মানে ?"

প্রশ্ন। "মানে, স্বামীর প্রতি কোনও ভালবাসা নেই, কি করেন না করেন কিছুই এসে যায় না, নির্লিপ্ত উদাসীন —এই ধরণের মনোভাব ?"

উত্তর। "কোনও স্ত্রীর তাই হয় নাকি ?"

প্রশ্ন। "আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

উত্তর। "আমিও ত স্ত্রী।"

প্রশ্ন। "শুনে সুখী হলাম। স্বামীর বিষয় আপনার মন তা হলে নিরাসক্ত বা উদাসীন ছিল না—কেমন ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "তা হলে স্বামীর বিষয় আপনার মন একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল বলতে হবে ; অর্থাৎ স্বামীকে কখনও সন্দেহের চক্ষে দেখেন নি বা দেখার কোনও কারণও কখনও ঘটে নি।"

উত্তর। "হবে।"

একটু হেঁসে প্রশ্ন, "এত আমার প্রশ্নের উত্তর হল না শ্রীমতী তুষারবালা। আমার সোজা প্রশ্ন হচ্ছে এই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কে লক্ষ্য করার মতন কিছু ছিল না বলেই আপনার কোনও কৌতূহলও হয়নি বা এই মেয়েটা আপনার স্বামীকে কি বলে ডাকছে লক্ষ্য করার প্রয়োজনও হয়নি—কেমন ?"

তুষার নীরব।

ধমকের সুরে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার।"

"হ্যাঁ তাই—তা কি ?"

বেশ জোরের সঙ্গে তুষার উত্তর দিল।

প্রশ্ন। "না কিছু নয় ; সত্যটা জানবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। যাক ওকথা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনাদের সমাজে কি ভাসুরের সঙ্গে কথা বলা চলে ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "কেউ বলে ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "আপনি বলতেন ?"

উত্তর। "ওমা ! সে কি কথা ?"

প্রশ্ন। "আপনি ভাসুরের সঙ্গে কোনও দিন কোন কথা বলেছেন কি ?"

জোরের সঙ্গে উত্তর। "কখনো না।"

প্রশ্ন। "ভাসুরের সঙ্গে একলা এক ঘরে কখনও কেউ আপনাকে দেখেছে কি ?"

উত্তর। "মিথ্যা কথা।"

প্রশ্ন। "কোন্‌টা মিথ্যা কথা শ্রীমতী তুষারবালা ?"

উত্তর। "কেউ কখনও কোনও দিন ভাসুরের সঙ্গে আমাকে একলা এক ঘরে দেখেনি।"

প্রশ্ন। "আপনার স্বামী ? কোনও দিন জীবনে কখনও

এমন হয়েছে কি যে আপনাকে ও আপনার ভাসুরকে একলা এক ঘরে দেখেছেন ?”

জোরের সঙ্গে উত্তর। “কখনো না।”

প্রশ্ন। “এই ধরুন সামান্য কিছুক্ষণ—কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ?”

উত্তর। “অসম্ভব। ভাসুর কোনও ঘরে একলা আছেন জানলে বা দেখলে আমি সে ঘরে ঢুকতামই না কখনও।”

প্রশ্ন। “বলে গেছেন আপনার ভাসুরের সঙ্গে নির্ম্মল পবিত্র সম্পর্ক আপনার স্বামী সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। কেন ? তার কি কোনও কারণ ছিল না ?”

উত্তর। “কোনও কারণ ছিল না।”

প্রশ্ন। “আপনার স্বামী বিকৃতমস্তিষ্কের লোক বা উন্মাদ —এই কথা কি আপনি বলতে চান ?”

উত্তর। “তার মানে ?”

প্রশ্ন। “মানে ত অতি সোজা। আপনার স্বামী পাগল নন—এ কথা ত আপনি স্বীকার করেন ?”

উত্তর। “হ্যাঁ—তা কি ?”

প্রশ্ন। “তিনি বিদ্বান—বি-এ পাশ এবং সবাই তাঁকে বুদ্ধিমান বলে। কেমন ?”

উত্তর। “হ্যাঁ।”

প্রশ্ন। “তাহলে আমাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন যে জীবনে কোনও দিন এক মুহূর্ত্তের তরেও আপনার স্বামী আপনাকে আপনার ভাসুরের সঙ্গে কথা কইতে বা একলা এক ঘরে দেখেন নি, আপনার স্বামী পাগল নন—স্বাভাবিক মস্তিষ্কের লোক, অথচ কেন তিনি শুধু শুধু আপনার ও আপনার ভাসুরের মধ্যে একটা কুৎসিত সম্পর্কের সন্দেহ করতেন ?”

উত্তর। “তিনিই জানেন।”

প্রশ্ন। “আপনি জানেন কি ?”

উত্তর। “না।”

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চল্‌ল। দাদার বিষয় আমাদের ব্যারিষ্টার মোটের উপর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন যে আমি জীবনে তুষারের সঙ্গে দাদার সম্পর্ক কোনও দিনই সন্দেহের চোখে দেখিনি এবং ভিতরে ভিতরে কি ছিল ভগবানই জানেন, কিন্তু যা-ই থাকুক সন্দেহের চক্ষে দেখবার কোনও কারণও আমার জ্ঞানত ঘটেওনি কোনও দিন, এবং এদিক দিয়ে তুষারের কথাই ঠিক। এবং সেই জন্যই তুষার আমার সঙ্গে কলহ করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন জোর করে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে সুরু করল তখন দাদার সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করার কথা শুনে আমি সত্য সত্যই বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রথম প্রথম এ নিয়ে আমি কোনও কথাই বলিনি। কিন্তু ক্রমে তুষারের ও রকম জোর করে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকার দরুণ এবং বিশেষ করে দাদার মাঝে মাঝে গিয়ে পলতায় বাস করার দরুণ তুষার ও দাদাকে নিয়ে একটা চাপা কুৎসিত কাণা-ঘুষো যখন আমাদের গ্রামে বেশ প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, তখন তুষারেরই সুনামের জন্য দাদাকে পলতা থেকে চলে যাওয়ার কথা বলে পাঠাতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, যদিও আমার নিজের প্রাণে তুষার ও দাদাকে নিয়ে কোনও রকম কুৎসিত সন্দেহের ঠাঁই কোনও দিনই ছিলনা এবং আজও নাই।

অবাক হলাম। আমার প্রাণে দাদা ও তুষারের সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না। আসল সত্য অবস্থাটাকে এমন করে চেপে কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য গল্প দিয়ে এ রকম ভাবে জেরা করার উদ্দেশ্য প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। সত্য অবস্থাটাত আমাদের ব্যারিষ্টারের কিছুই অজানা ছিল না কেননা হরিশকে ত আমি মুক্তকণ্ঠে সবই বলেছিলাম—কিছুই লুকাইনি এবং হরিশ নিশ্চয়ই সমস্ত অবস্থা আমাদের ব্যারিষ্টারকে বুঝিয়ে বলেছে। তবে ?

জেরা চলতে লাগল। ক্রমে বুঝলাম।

প্রশ্ন। “আপনার স্বামী যে আপনার ভাসুরকে নিয়ে আপনাকে সন্দেহ করেন, এটা প্রথম টের পেলেন কবে ?”

উত্তর। “মনে নাই।”

প্রশ্ন। “আপনার ছেলেটী জন্মাবার আগেই কি এটা টের পেয়েছিলেন না পরে ?”

উত্তর। “পরে।”

প্রশ্ন। “আপনার ছেলেটী জন্মাবার কত দিনের মধ্যে টের পেয়েছিলেন—বছর খানেকের মধ্যে হবে ?”

উত্তর। “হয়ত হবে।”

প্রশ্ন। "তখন ত আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক মোটের উপর স্বাভাবিকই ছিল ?"

উত্তর। "তার মানে ?"

প্রশ্ন। "অর্থাৎ আমি জানতে চাইছি—স্বামী স্ত্রী যেমন এক সঙ্গে বসবাস করে, এক ঘরে শোয়, আপনারাও ত সেই রকমই থাকতেন ?"

উত্তর। "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন। "কোনই ত কারণ ছিল না সন্দেহ করবার, ঘোমটা টেনে দূরে সরে যেতেন, কথাটা অবধি কখনও কননি ভাসুরের সঙ্গে—তবুও স্বামী যে কেন সন্দেহ করছেন একথা কোনও দিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন নি ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "কেন ?"

উত্তর। "প্রবৃত্তি হয়নি।"

প্রশ্ন। "এই ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও দিন না কোনও দিন আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা সে কলহের মধ্য দিয়েই হোক বা অন্য ভাবেই হোক,—কেমন ?"

উত্তর। "না ?"

প্রশ্ন। "আপনি কি বলতে চান এ ব্যাপার নিয়ে আপনার স্বামী কখনও কোনও কথা বলেননি তাই আপনার জিজ্ঞাসা করবার প্রবৃত্তি হয়নি—কি কারণে, কেন, তিনি আপনাকে সন্দেহ করছেন ?"

উত্তর। "হ্যাঁ—তাই বলতে চাই।"

প্রশ্ন। "আভাষে ইঙ্গিতেও কি আপনাকে জানাননি আপনার স্বামী ?"

উত্তর। "না।"

প্রশ্ন। "তাহলে আপনার স্বামী যে আপনাকে সন্দেহ করতেন এটাই বা জানলেন কি করে ? হাত গুনতে জানেন না কি ?"

উত্তর। "সে আমি বোঝাতে পারবনা।"

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন—"বোঝাবার কিছু নাই শ্রীমতী তুষারবালা। আপনার স্বামী কোনও দিনই আপনাদের সন্দেহের চক্ষে দেখেন নি। আপনার স্বামীর সন্দেহ করার গল্পটা এই মোকদ্দমার জন্য আপনারা বিশেষ করে বানিয়েছেন নতুবা আপনার স্বামীর দাদাকে খুন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কোন উদ্দেশ্যই থাকে না—নয় কি ?"

জোরের সঙ্গে উত্তর—"না।"

বুঝলাম। আমার প্রাণের সন্দেহের কথাটা স্বীকার করলে পাছে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার একটা উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়ে যায় তাই ব্যারিষ্টার জেবার ওটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেলেন; এমন কি তুষার ও দাদার সম্পর্কের মধ্যে আমার জানত সত্যিকারের দোষের যে কিছু ছিল সেটুকু ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত আভাষ দিলেন না। ধন্য-বুদ্ধি! নেহাত আলীমিঞার লিখিত চিঠি আদালতে প্রমাণিত হয়েছে নতুবা দাদাকে যে পলতা থেকে চলে যাওয়ার কথা লিখে পাঠান হয়েছিল সেটাও বোধ হয় একেবারে অস্বীকার করে যেতেন।

তুষারের জেরা শেষ হতেই বেলা ৫টা বেজে গেল—সেদিন আর কোনও কাজই হল না। পরের দিন বেলা ১১টায় আবার বিচার আরম্ভ হবে—এই কথা জানিয়ে দিয়ে জজ্-সাহেব উঠে গেলেন চলে।

তুষারের জেরার শেষের দিকটায় একটা অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল আদালত গৃহে। শান্ত গলায় প্রাণ ভরা দরদ দিয়ে আমাদের ব্যারিষ্টার তুষারকে প্রশ্ন করলেন—

"আপনার ছেলেটীর বয়স কত হল ?"

তুষার তখন ক্লান্ত। মুখের দিকে চাইলেই বুঝা যাচ্ছিল যে সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে সে তখন অভিভূত, আচ্ছন্ন। অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় উত্তর দিল—"সাত বছর।"

প্রশ্ন। "ওর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়—না ?"

উত্তর। "প্রায়ই অসুখ করে।"

প্রশ্ন। "সে এখন কোথায় আছে ?"

উত্তর। "খুলনায়ই আছে। আমার সঙ্গে এসেছে এখানে।"

প্রশ্ন। "সে নিজের বাপের কথা আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "বাবা কোথায় গেল, কবে আসবে—এ সব প্রশ্ন সে করে না আপনাকে ?"

কাতর গলায় উত্তর "করে।"

প্রশ্ন। "ছেলেটী বাপের খুব বাধ্য—বাপকে খুব ভালবাসে—না ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "উত্তর দিন আমার কথার।"

ভারী গলায় উত্তর "হ্যাঁ"

প্রশ্ন। "বাপও ছেলেটিকে খুব ভালবাসেন—নয় কি ?"

অস্ফুট স্বরে উত্তর "বাসেন।"

বেশ গম্ভীর গলায় জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "এইবার আমার কথার একটা সত্য উত্তর দিন। আপনার পেটের সন্তানের দোহাই—তারই বাপের বিরুদ্ধে এখানে যে সব কথা বলে গেলেন বলুন ত এর বেশীর ভাগই শেখান কথা কি না ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন। "বলুন। আপনার রুগ্ন সন্তানের মুখখানা মনে করে আমার কথার উত্তর দিন।"

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করে একটু ঝুঁকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তুষারের মুখের দিকে রইলেন চেয়ে। লক্ষ্য করে দেখেছিলাম তুষার স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল—মাথাটি একটু হেলিয়ে এক দৃষ্টে চেয়েছিল নীচের দিকে—চোখের পাতাটী পর্য্যন্ত যেন নড়ে না। সমস্ত আদালত গৃহ একটা স্তব্ধ নীরবতায় উঠ্‌ল ভরে—সকলেরই আকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল তুষারের মুখের উপর।

আবার প্রশ্ন "বলুন সত্য কথা—মা হয়ে মিথ্যা দিয়ে একমাত্র সন্তানকে পিতৃহারা করবেন না—বলুন।"

এইবার তুষারের সংযের বাঁধন ভাঙ্গল। "মাগো"—বলে একটা চাপা আর্ত্তনাদ করে যেন ভেঙ্গে পড়ে গেল সাক্ষীর কাঠগড়ার মধ্যে—আকুলভাবে ফুঁপিয়ে উঠল কেঁদে।

ব্যারিষ্টার সহানুভূতিমাখা মধুর গলায় বললেন "আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি শ্রীমতী তুষারবালা—আর আমার কোনও প্রশ্ন নেই।"

এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম তুষারেরই পানে। আদালত গৃহে দশ জনার চক্ষের সম্মুখে তার সেই অসহায় কান্নার আকুল ভঙ্গিটীর মধ্যে কী যে ছিল জানিনা—হঠাৎ তারই প্রতি দরদে আমারও প্রাণ কাতর হয়ে উঠ্‌ল দুলে। ক্ষণেকের তরে বহুদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া অনুভূতির আবার যেন একটু আভাষ পেলাম।

* * * * (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

শরীর-যন্ত্রের সঙ্গতি

"ডাক্তার"

এক

কোনও লোক যদি দৌড়ে খানিক দূর যায় কিম্বা যদি অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে তাহলে দেখা যায় তার খুব জোরে এবং তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস পড়ছে আর তার বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। যারা মোটা তারা খুব শীঘ্রই এই অবস্থায় আসে এবং রোগা লোকদের বিদ্রূপের পাত্র হয়; বয়স্করা ঠাট্টা করে বলেন "শরীরে আর পদার্থ নেই!"। তাঁরা ভুলে যান, বেচারা মোটা লোকটিকে কতখানি বেশী ওজন বহন করতে হচ্ছে। এখানে বলে রাখা ভাল লেখক নিজে একটু স্থূলকায় সেই জন্যই মোটা লোকের উপর তাঁর এত দরদ!

যাই হ'ক লেখক রোগাই হ'ন আর মোটাই হ'ন তা নিয়ে আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এরকমভাবে পরিশ্রম করলে মানুষ হাঁপায় কেন? যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা বলবেন শরীরের মাংস পেশী ইত্যাদির হঠাৎ বেশী পরিশ্রম করা দরুন, স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী অক্সিজেন দরকার হচ্ছে বলে শরীর হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে। তাঁরা আরো বলবেন এই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এটা বেশী পরিমানে খাদ্য দগ্ধ করার জন্য—কারণ বেশী পরিশ্রম করলেই বেশী খাদ্য খরচ হয়। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা না হয় এর কারণ জানেন বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেন, কিন্তু যারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না তাদেরও এ সময় খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হয় এবং চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না। অতএব একথা বলা যেতে পারে যে সময় শরীরের এমন একটা অবস্থা হয় যার দরুন শরীর বাধ্য করে জোরে নিঃশ্বাস নিতে এবং শরীরের দ্রুত রক্ত চলাচল দরকার হয় বলে হৃদযন্ত্র জোরে জোরে এবং দ্রুত চলে।

মানুষ ইচ্ছে করলেই খানিকটা খাবার খেতে পারে কিন্তু হজম করবার বেলায় তার কোন হাত নেই। সেখানে শরীর একেবারেই স্বাধীন। মানুষ ইচ্ছে করলেই খুব জোরে জোরে খানিকক্ষণ নিঃশ্বাস নিতে পারে কিম্বা কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস না নিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু এই যে সমস্ত দিনে সে প্রায় ২৫ হাজার বার নিশ্বাস নিচ্ছে এবং ফেলছে—সে বিষয় সে একেবারে সচেতন নয় বল্লেই হয় এবং সেখানে শরীর স্বাধীন। আরো বলা যেতে পারে কোন অবস্থায় শরীরের কতখানি হাওয়া (প্রকারান্তরে অক্সিজেন) দরকার সেটাও শরীরের ইচ্ছাধীন।

প্রথমে দেখা যাক্ আমরা আদপে নিঃশ্বাস নিই কেন? অর্থাৎ শরীরে নিঃশ্বাসের প্রয়োজন কি? নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে হাওয়া শরীরে যায় তার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে অক্সিজেন (অম্লজান) বলে এক রকম গ্যাস। সাধারণতঃ হাওয়াতে এর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এর পরিমাণ হাওয়ায় পঞ্চমাংশ। শরীরের কারবার এই অক্সিজেনকে নিয়েই। কিন্তু অবিমিশ্র অক্সিজেন হলে শরীর থাকতে পারে না বলেই এর সঙ্গে নাইট্রোজেন ইত্যাদি অন্য গ্যাস মিশিয়ে দিয়েছেন ভগবান। এখানে তর্ক উঠতে পারে যে ভগবান যদি হাওয়াতে কেবলমাত্র অক্সিজেনই দিতেন তা'হলে, তিনিই এমনি ভাবে জীব সৃষ্টি করতেন যে তারা সেই অবিমিশ্র অক্সিজেনে বাঁচতে পারে। হাওয়ার সঙ্গে এই অক্সিজেন যায় মানুষের ফুসফুসে—সেখান থেকে কেবলমাত্র অক্সিজেন রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে যায় দেহের প্রত্যেক কোষে, সেখানে সে খাদ্যের কার্ব্বনের সঙ্গে মিশে হয় কার্ব্বন্ ডাই অক্সাইড; সেই কার্ব্বন ডাই অক্সাইড আবার পুনরায় রক্তের দ্বারা ফুসফুসে বাহিত হয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে যায়।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে দেখা যায় মানুষের ছাতি বাড়ে আর কমে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে ফুস্‌ফুসও বাড়ে কমে। ছাতি বাড়া আর কমার জন্ত দায়ী বুকের কতকগুলি পেশী। এই সব পেশীকে পরিচালনা করে কতকগুলি স্নায়ু—আবার সেই সব স্নায়ুদের পরিচালনা করে মস্তিষ্ক। সেই প্রধান পরিচালকের অবস্থান হচ্ছে মস্তিষ্ক যেখানে শিরদাঁড়ার সঙ্গে মিশেছে সেইখানে, সে জায়গাটাকে ইংরাজীতে বলে মেডালা অবলংগাটা (medulla oblongata)। এইখান থেকেই তিনি টেলিগ্রাফ করেন কখন ধীরে ধীরে আবার কখন তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নিতে হ'বে। সাধারণতঃ মানুষ প্রতি মিনিটে ১৮ থেকে ২০ বার নিঃশ্বাস নেয় কিন্তু মানসিক কোনও রকম চাঞ্চল্য হ'লে কিম্বা অন্য কোনও কারণে এঁর কাজের তারতম্য হয়।

এখন কথা হচ্ছে এই যে পরিচালককেও ত জানতে হ'বে কখন বেশী অক্সিজেনের দরকার আর কখন স্বাভাবিক পরিমাণ দরকার। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়—রক্তে অক্সিজেনের অভাব এবং কার্বন ডাই অকসাইডের প্রাচুর্য্য হলেই এই পরিচালকের জানতে পারা উচিৎ যে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন নিতে হবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বা'র করতে হবে অর্থাৎ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হবে। বাস্তবিক হয়ও তাই। কিন্তু ব্যাপারটা হয় উল্টা ধরণের। অক্সিজেন জিনিষটা প্রাণ আর কার্ব্বন ডাই অক্সাইড বিষ। অক্সিজেন রক্তে খুব বেশী অভাব না হলে পরিচালক চঞ্চল হ'ন না কিন্তু কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইড সামান্ত তফাৎ হলেই বেশী রকম চাঞ্চল্য হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে রক্তে কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইডের পরিমাণ শতকরা মাত্র ৩ ভাগ বেড়ে যায় তাহলেই নিঃশ্বাসের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে যায় আর যদি মাত্র ৩ ভাগ কমে যায় তাহলে নিঃশ্বাস একদম বন্ধ হয়ে যায়।

যদি কোনও লোক স্থির অবস্থা থেকে হঠাৎ কোনও শ্রমসাধ্য কাজ করে তাহ'লে তার শরীরে খাদ্য বেশী খরচ হয়। খাদ্য খরচ হয় মানে বেশী খাদ্য (খাদ্যের কার্ব্বন) অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড তৈরী হয়। বেশী অক্সিজেনের সঙ্গে খাদ্য মেশে বলে বেশী অক্সিজেন দরকার হয় এবং বেশী কার্ব্বন ডাই অক্সাইড তাড়াতে হয় অতএব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে বেশী অক্সিজেন প্রয়োজন হয় বলে যে লোকের নিঃশ্বাসের সংখ্যা বাড়ে তা নয়—বেশী কার্ব্বন ডাই অক্সাইড তাড়াতে হয় বলেই বাড়ে। প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব হয়েছে বলে শরীর চঞ্চল হয়নি—অপ্রয়োজনীয় আবর্জ্জনা তাড়াতে হবে বলেই তার এত হাঁক ডাক!

যেখানে অক্সিজেন সুলভ সেখানে এ ব্যবস্থায় কোনও অসুবিধা হয় না। বেশী অক্সিজেন দরকার অতএব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেই কাজ মিটে গেল—তার দরুণ অক্সিজেনও নেয়া হ'ল আবার কার্ব্বন ডাই অকসাইডও তাড়ানো হ'ল। যাদের বাস ভূপৃষ্ঠে, তাদের এ বিষয়ে কোনই আপত্তি থাকতে পারে না—হাওয়াতে যথেষ্ট অক্সিজেন আছে—দরকার হ'লেই তারা পায়। এতকাল ধরে মানুষের রাজ্যেও এ নিয়ে কোনও উৎকণ্ঠা হয়নি কারণ তার কারবার ছিল ধরণীর বুকে।

সম্প্রতি অসুবিধা হয়েছে মানুষের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার জন্য। মানুষ আর ভূপৃষ্ঠ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, সে যেতে চায় ভূগর্ভের গভীর থেকে গভীরতর জায়গায়; আবার সে উঠতে চায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্ব্বতে। কেবল তাতেই যদি সে সন্তুষ্ট থাকত তাহ'লেও না হয় কতকটা পার পাওয়া যেত। উড়তে শেখার পর থেকে মানুষ ক্রমাগতই চায় উঁচুতে উঠতে—আরও উঁচুতে। সে উচ্চতার সীমা সে জানে না।

এই সব কারণে মানুষের রাজ্যে এক অভিনব অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে অক্সিজেনের অভাব খুব বেশী না হলে মানুষ হাঁপায় না। ধরা যাক্ এমন একটা জায়গায় মানুষ গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম কিন্তু কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিক। সেখানে কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকার দরুন তার নিঃশ্বাসের সংখ্যা সমানই থাকবে কিন্তু অকসিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলে হয়ত সামান্য একটু বাড়বে। এই সামান্য বাড়াটাই তার কাল হয়। যেটুকু কার্ব্বন ডাই

অক্সাইড তার রক্তে ছিল—নিঃশ্বাস একটু দ্রুততর হওয়ার দরুণ সেটুকুও শীঘ্র বেরিয়ে যায় এবং ক্রমেই এই কারণে তার নিঃশ্বাসের সংখ্যা কম হয় বলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয়। এই অবস্থায় তার শরীরে বিশেষ কোনও কষ্ট হয় না কেবল একটা অবসাদ আসে। সেই অবসাদ থেকে সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ার মতন ক্রমশঃ অজ্ঞান হবে পড়ে। তার পরেও যদি তাকে সেইখানে বেশীক্ষণ রাখা হয় তাহ'লে তার নিদ্রাভঙ্গ আর হয় না। এ অবস্থার সৃষ্টি হয় বদ্ধ ঘরে কিম্বা খুব গভীর খনিতে।

এভারেষ্ট অভিযানকারীরা কিম্বা যাঁরা এরোপ্লেনে অনেক উঁচুতে ওঠেন তাদের অবস্থা হয় একটু অন্য রকম। খুব উঁচুতে হাওয়ায় ঘনত্ব মাটীর কাছে যতখানি তার চেয়ে অনেক কম সেজন্য সেখানে সমপরিমাণ হাওয়াতে অক্সিজেন এবং কার্ব্বন ডাই অক্সাইড দুইই কম।

হাওয়ার ঘনত্ব কম হ'লে অক্সিজেন কেন কম হবে সেটা একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হতে পারে। বাজার থেকে যখন এক সের তুলা আনা যায় তখন তার পরিমাণ অতি সামান্যই—কিন্তু ধুনুরি যখন সেই তুলা ধুনে দেয় তখন তার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। প্রথমে হয়ত এক সের তুলা দুই হাতের মধ্যেই কুলিয়ে যেত কিন্তু এখন দুই হাতের মধ্যে সেই তুলার ওজন হয়ত এক ছটাক্। প্রথমে তুলার ঘনত্ব খুব বেশী ছিল বলে তার ওজন ছিল বেশী। তেমনি মাটীর কাছে হাওয়ার ঘনত্ব বেশী বলে যখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া যায় তখন তার ওজন যদি ধরে নেয়া যায় এক ছটাক্ তাহলে তাতে অক্সিজেন পাওয়া যাবে এক তোলা। (বলে রাখা ভাল, মানুষ একবারে এক ছটাক্ হাওয়া কিছুতেই নিতে পারে না কেবল উদাহরণ দেওয়ার সুবিধার জন্যই বলা হ'ল।) উঁচুতে যদি হাওয়ার ঘনত্ব কম হয় তাহলে এক বুক হাওয়ার ওজন হবে আধ ছটাক এবং তাতে অক্সিজেন থাকবে আধ তোলা। তা'হলে প্রত্যেক বার কম অক্সিজেন নেওয়ার দরুণ তার শরীরে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড তৈরী হচ্ছে কম পরিমাণে এবং সেইজন্য জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়ার প্রেরণাও তার কম হচ্ছে। এটা সে পূরণ করতে পারে যদি সে তাড়াতাড়ি অনেকখানি করে নিশ্বাস নেয় কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে জিনিষ তাকে এ বিষয়ে তাগাদা দেবে, অর্থাৎ কার্ব্বন ডাই অক্সাইড, তার পরিমাণই যে কম। তাগাদা না থাকলেও সে হয়ত ইচ্ছে করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারত কিন্তু সে দিকেও অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা হচ্ছে বেশীক্ষণ ইচ্ছা করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতেই বেশ পরিশ্রম হয়। কতক্ষণ মানুষ ইচ্ছা করে হাঁপাতে পারে! ব্যাপারটা যদি খুব কম ক্ষণের জন্য হ'ত তাহলেও না হয় কথা ছিল। তা ভিন্ন এ অবস্থাটা ত হঠাৎ আসে না, সেইজন্য অবস্থাটা বুঝতে দেরী হয় আর যখন বুঝা যায় তখন আর উপায় থাকে না। হাওয়ার ঘনত্ব ত হঠাৎ একেবারে কমে যায়নি, যতই উঁচুতে উঠছে ততই কম হচ্ছে। প্রথমটা অবস্থা অত সঙ্গীন হয় না—যখন বুঝতে পারে তখন অবস্থা খুবই খারাপ। তখন যদি সঙ্গে বোতলে পোরা অক্সিজেন না থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অবসাদ আসে। সেই অবসাদ ক্রমে পরিণত হয় অজ্ঞানতায় এবং পরিশেষে মৃত্যুতে।

২

পরিশ্রম হলে, যেসব পেশীর পরিশ্রম হয় তাদের খাদ্যেরও বেশী প্রয়োজন হয়। খাদ্য ব্যয় হয় মানে খাদ্যের কার্ব্বনের সঙ্গে নিঃশ্বাসের অক্সিজেন যোগ হয়ে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড তৈরী হয়। জোরে নিঃশ্বাস নিলে অক্সিজেন কেবল ফুসফুস অবধি পৌঁছায়। তাকে যেতে হবে সেই সমস্ত পেশীর প্রত্যেক কোষে। সেখানে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন হয় রক্তের। তাকে যেতে হবে রক্তের সঙ্গে মিশে —সেই রক্তই আবার সেখান থেকে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে ফিরে আসবে হার্টে বা হৃদযন্ত্রে; সেখান থেকে ফুসফুসে গিয়ে বাহিরে যাবে। পরিশ্রমের সময় তাহলে কেবল জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেই চলে না, অক্সিজেনকে স্বস্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে বেশী রক্তেরও প্রয়োজন হয়। শরীরে রক্তের পরিমাণ যখন একই থাকে তখন সেই রক্তকে ক্রমাগত কার্ব্বন ডাই অক্সাইড থেকে মুক্ত করে খুব তাড়াতাড়ি আবার অক্সিজেন ভর্ত্তি করে পাঠাতে হয়। অর্থাৎ রক্ত চলাচলের গতি বাড়িয়ে দিতে হয়। রক্ত চলাচলের গতি

বাড়াতে হয় বলেই হার্ট মিনিটে ৭২ বারের জায়গায় দরকার হলে ১৫০ বার চলে।

রক্ত চলাচল সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে একটা আলোচনা করে নিলে জিনিষটা বোঝা সহজ হবে। হার্ট (Heart) বা হৃদযন্ত্রের কাজ পিচকারীর মতন পাম্প করা। পিচকারী দিয়ে পাম্প করলে জল ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু হার্ট যখন পাম্প করে তখন রক্ত ছড়িয়ে পড়তে পাবে না—তাকে যেতে হয় মোটা একটা নলের মধ্যে দিয়ে—সেই নলকে ইংরাজীতে বলে Aorta, বাংলায় বলা যেতে পারে প্রধান ধমনী। এই প্রধান ধমনী থেকে নানা শাখা প্রশাখা ধমনী বেরিয়ে ক্রমেই সূক্ষ্ম হয়ে শরীরের প্রত্যেক অংশে যায়। সেখানে গিয়ে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে একটা জালের মতন বিস্তার করে। এই যে জালের মতন অতিসূক্ষ্ম ধমনী যাদের চেয়ে আর সূক্ষ্মতর ধমনী নেই—এদের বাংলায় বলা হয় কৈশিক ধমনী আর ইংরাজীতে Capillares বলা হয়। এইটে শরীরের কোষের সঙ্গে হার্টের সংযোগ করে। এখান থেকে আবার কৈশিক শিরা দিয়ে রক্ত সংগৃহীত হয়ে উপশিরা শিরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া আবার হৃদ্‌যন্ত্রে পৌঁছায়। শরীরের এই ধমনী শিরা প্রভৃতি নল কোনটাই লোহার নলের মতন শক্ত নয়—এদের তুলনা করা যেতে পারে রবারের নলের সঙ্গে। পাৎলা রবারের নলের ব্যাস যেমন অতি সহজেই বাড়ে তেমনি কৈশিক ধমনীর ব্যাস অতি সহজেই বাড়ান যায়, বড় ধমনীর ব্যাস বাড়ান তত সহজ নয়। কৈশিক ধমনীর ব্যাস দরকার হলে প্রায় ৩০০ গুণ বাড়ান যেতে পারে অর্থাৎ শরীরের যদি সমস্ত কৈশিক ধমনী ফুলে ওঠে তা হলে সেখানে প্রায় ৩০০ গুণ রক্ত ধরান যেতে পারে।

ধমনী এবং শিরা প্রভৃতি স্ফীত হয় মানে সেখানে বেশী রক্ত ধরে আর বেশী রক্ত ধরে মানে হচ্ছে এক সঙ্গে বেশী অক্‌সিজেন বহন করতে পারে। কৈশিক ধমনী স্ফীত হলে যে বেশী রক্ত বহন করে তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সুন্দরীর লজ্জারুণ মুখ কিম্বা বালকের শিক্ষকমর্দ্দিত কর্ণ। মানুষ যখন স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় থাকে তখন তার ধমনীতে রক্ত ধীরে ধীরে বহে কিন্তু পরিশ্রমের সময় এর গতি এবং পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে মনে হয় তার শরীরের ভেতর রক্তের স্রোত বহিয়া যায়। নিঃশ্বাসের মতন ধমনী এবং শিরা স্নায়বিক এবং রাসায়নিক দুই উপায়ে পরিচালিত হয়। মানসিক কিম্বা স্নায়বিক উত্তেজনা হলে ধমনী বিশেষ করে কৈশিক ধমনী, স্ফীত হয়, যেমন রাগ কিম্বা লজ্জা হলে মুখ চোখ কান প্রভৃতি লাল এবং গরম হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাসের মতনই কার্ব্বন ডাই অক্সাইডের আতিশয্য কিম্বা অকসিজেনের অভাব হ'লেই ধমনী স্ফীত হয়। নিঃশ্বাসের গতি বাড়াতে হ'লে শরীরে কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইড যতখানি বাড়া দরকার, সামান্য পরিশ্রম করলে ততখানি নাও বাড়তে পারে, যেমন যদি কেবল মাত্র হাতের কটা আঙুল দিয়েই সামান্য কাজ করা যায়। কিন্তু আঙুল দিয়ে পরিশ্রম হচ্ছে বলে সেখানে বেশী অকসিজেন সরবরাহ হচ্ছে এবং কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইডও বেশী তৈরী হচ্ছে; সে ক্ষেত্রে কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইডের পরিমাণ এত সামান্য যে তার দ্বারা নিঃশ্বাস জোরে জোরে চলতে পারে না। তখন এই সামান্য কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইড স্থানীয় ধমনী স্ফীত করে সেখানে রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

পরিশ্রমের সময় বেশী অকসিজেন দরকার হয় বলে (কিম্বা বেশী কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইড তৈরী হয় বলে) জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে এবং ধমনী স্ফীত হয়। কিন্তু তাহ'লে অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা হয় না। ধমনী স্ফীত হওয়ার দরুন শরীরের বেশীর ভাগ রক্ত সেখানে গিয়ে জমে থাকে, তার সঙ্গে অকসিজেন মেশবার সুযোগ পায় না। সেই রক্তকে ক্রমাগত টেনে আনতে হবে ফুসফুসে এবং সেখান থেকে পেশীতে নিয়ে যেতে হবে। সে কাজ করতে হলে হার্টকে খুব তাড়াতাড়ি এবং জোরে জোরে পাম্প করতে হয়। এই রকম হয় বলেই বুকের মধ্যে অত জোরে ধক্ ধক্ করে। এই সময় যদি হার্ট খুব জোরে জোরে পাম্প না করে তাহলে পেশীতে শরীরে বেশীর ভাগ রক্ত জমে যাওয়ার দরুন প্রয়োজনীয় অংশে বিশেষ করে মস্তিষ্কে রক্ত-হীনতা হতে পারে তার জন্য খুব বেশী ক্ষতি হতে পারে। খুব অনেকখানি জায়গা কেটে গেলে কিম্বা পড়ে গেলে এই শেষোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে ইংরাজীতে সার্জ্জিক্যাল শক্ (Surgical shock) বলে।

পরিশ্রম হলে অকসিজেন সরববাহ করবার জন্ত যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে এবং হার্টও জোবে জোরে পাম্প করে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পেশীতে রক্ত সরবরাহ করা। যখন মেহনত বেশী হয় তখন পেশীতে যে রক্ত থাকে তাতে সঙ্কুলান নাও হতে পারে। তখন টান পড়ে অন্ত সব ডিপোতে। এই সব ডিপো আর কিছু নয় শরীবের অন্ত সব যন্ত্র যাদেব কাজ খানিকক্ষণেব জন্ত স্থগিত বা কমিয়ে রাখা যেতে পারে। প্লীহা, অন্ত্র, কিড্‌নী বা বৃক্ক্ হচ্ছে এই ধবণের জিনিস।

প্লীহা জিনিষটা এতকাল শরীর-তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে একটা প্রহেলিকা বলেই মনে হ'ত তার একটা কারণ বোধ হয় এর কাজ বহু বকমের। একটা যন্ত্র দ্বারা এত রকমের কাজ পাওয়া একটা আশ্চর্য্য ব্যাপাব! এই প্লীহাতেই রক্তকণিকা জন্মায় আবার এই প্লীহাতেই তারা ধ্বংস হয়। এর গঠনও একটু অন্য ধরণের। সাধারণতঃ শরীবের সব অঙ্গে কৈশিক ধমনী দিয়েই রক্ত সরবরাহ হয় কিন্তু প্লীহাতে কৈশিক ধমনী নেই—এর মাংসতেই রক্ত থাকে। এর ভেতবটা দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মতন। স্বাভাবিক অবস্থায় প্লীহাবও অতি ধীবে ধীরে কিন্তু তালে তালে সঙ্কুচন ও প্রসারণ হয়।

খুব বেশী পরিশ্রমেব দরুন যখন অনেক জায়গায় কৈশিক শীরা ফুলে বেশীর ভাগ রক্ত সেখানে গিয়ে জমা হয় বলে হার্টেব গতি কমে যাবার মতন হয় তখন টান পড়ে এই প্লীহায় সঞ্চিত রক্তের। প্লীহার পেশী তখন সঙ্কুচিত হয়ে এর ভেতবের রক্ত বার করে দেয় কার্য্যরত পেশীর উপকারের জন্য। সেই সময় তার আকার স্বাভাবিকের এক তৃতীয়াংশ হয়ে যেতে পারে।

প্লীহার রক্ত নিঃশেষ করেও যখন রক্তের সঙ্কুলান হয় না তখন অন্ত্রের মধ্যে যে সব রক্ত আছে সেখানে টান পড়ে। হজম করাব কাজ খানিকক্ষণ থামিয়ে রাখলে তত ক্ষতি হয় না যত ক্ষতি হয় নিঃশ্বাস কিম্বা হৃদযন্ত্র থেমে গেলে। অন্ত্র থেকে জীর্ণ খাদ্য সংগ্রহ করে যকৃতে নিয়ে যাবার জন্য খুব মোটা শিরা আছে। তারা তখন নিজেদের সঙ্কুচিত করে রক্ত পাঠিয়ে দেয় কার্য্যরত পেশীদেব উপকারের জন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম হ'লে এমনও দেখা গেছে যে বৃক্ক্ বা মূত্র গ্রন্থীর কাজ স্থগিত রেখে সেখান থেকে রক্ত গেছে অক্‌সিজেন সরববাহ করবাব জন্য। তার দরুন সেখানে রক্তাল্পতা হয়ে সেখানকার ক্ষতি হ'তেও দেখা গেছে।

পরিশ্রম হ'লে কেবল যে জোরে জোবে নিঃশ্বাস পড়ে আর বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস্ করে হার্ট চলে তা নয় সর্ব্ব অঙ্গই যথা শক্তি চেষ্টা করে কার্য্যরত পেশীদের রক্ত বা প্রকারান্তরে অকসিজেন সরবরাহ ঠিক রাখতে। কারণ সেই সময় যদি রক্ত সরবরাহ ঠিক না থাকে তাহলে হার্টের ক্ষতি হয়ে কিম্বা মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা হয়ে প্রাণহানি হবার সম্ভাবনা থাকে। এই যে শরীবেব নানা জায়গা থেকে রক্ত টেনে আনা হয় এর জন্য দায়ী করা যায় প্রধানতঃ কার্ব্বন ডাই অক্‌সাইডকে, কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে এটা শরীবের পক্ষে একটা বিষ এবং একে জয় করবার জন্যই দেহের এ রকম আপ্রাণ চেষ্টা।

"ডাক্তার"

কমলালেবু

"ভাস্কর"

১

ধনী বন্ধুর বৈঠকখানায় বসিয়া তাস খেলিতেছি। বারান্দার বাহিরে হাঁক শুনিলাম, চাই কমলালেবু!

বন্ধুর ছোট মেয়েটি বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বাবা, কমলালেবু। বন্ধু ডাকিলেন, এই কমলালেবু!

কমলালেবুওয়ালা আসিল। ঝাঁকা নামাইবার পর বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কটা করে?

আজ্ঞে, কুড়িটা।

কুড়িটা করে? এই ছোট ছোট লেবু—চল্লিশটে করে যদি হয়, তবে এক টাকার দিয়ে যা।

আজ্ঞে, কেমন করে দেই বাবু? আমার কেনাই পঁচিশটে করে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেনাই পঁচিশটে করে! যা তা বললেই হ'ল। আচ্ছা, পঁয়ত্রিশটে করে হয় তো দে, নয়তো চলে যা।

আজ্ঞে, সে কি হয় বাবু, বউনির সময়ে—আচ্ছা—পঁচিশটে করেই নেন—আমার কেনা দাম।

হ্যাঁ, কেনা দাম বই কি—যত সব—। পঁয়ত্রিশটের কম আমি নেব না।

লেবুওয়ালা ঝাঁকা মাথায় তুলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। খুকি কাঁদিয়া উঠিল, বাবা, কমলালেবু!

বন্ধু হাঁকিলেন, ওরে, দ্যাখ্ তিরিশটে করে যদি হয় তো দিয়ে যা। মেয়েটা নেহাত ছাড়বে না, নইলে চল্লিশটের কম কিছুতেই নিতুম না।

আজ্ঞে নেন কত্তা, বউনিটা করি।

বাছিয়া গণিয়া লেবু লইয়া দাম চুকাইয়া দিয়া বন্ধু পুনরায় তাসে মন দিলেন। বলিলেন, কি জোচ্চোর এই লোকগুলো! দেখ্‌লি, বলে কিনা পঁচিশটে করে কেনা, আর বেচলে তিরিশটে করে।

জোচ্চোর ঠিক নয়। ঠিক দাম বলা, আর সেই দামে কেনা, এটা এখনও আমাদের অভ্যাস হয় নি কিনা। তা ছাড়া, ওর বড় গরীব, চার আনা আট আনার জন্য সারাদিন প্রকাণ্ড বোঝা বয়ে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরে, দু এক পয়সা বেশি কম ওদের কাছে অনেক বেশি, তাই—

রেখে দাও তোমার ন্যাকামো, ওরা অতি ইয়ে—সত্য কথা বলতেই জানে না।

কথা আর বাড়াইলাম না। তাস চলিতে লাগিল—সাড়ে পাঁচ টাকা হারিয়া বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

২

টুইশনি করিয়া ফিরিতেছি। রাত্রি মন্দ হয় নাই। পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। হাঁটার বেগ বাড়াইয়া দিলাম। বৃষ্টিও তাহার বেগ বাড়াইয়া দিল। একটা ছোট গলির মধ্যে আসিয়া পড়িতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। আত্মরক্ষার জন্য পাশের একটি জীর্ণ একতলা বাড়ির রোয়াকের উপর আশ্রয় লইলাম।

পাশেই একখানা ঘর। ভাঙা জানালা বন্ধ। তথাপি তাহার ভিতর হইতে ক্ষীণ আলো বাহির হইতেছে—কথাও শোনা যাইতেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু কিছু কথা কানে গেল। একটি গলা বেন মেয়ের এবং আর একটি বয়স্ক পুরুষের। মেয়েটি বলিতেছে, তুমি এ ফেরিওয়ালার কাজ ছেড়ে দাও। ইস্, এই কাঁধটা ফুলে উঠেছে। সারাদিন এত বড় বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ান তোমার সহ্য হবে না।

কি করব মা! তবু তো এত জায়গা ঘুরে দর কষাকষি করেও বাবো আনার বেশি লাভ রাখতে পারি নে। এত বেছে বেছে লেবুগুলো নিয়ে যাই, তবু বলে এটা ছোট, এটা পচা, এটা শুকনো, এটা টক।

এ কাজ তোমার ছাড়তেই হবে। বরং একটা পানের দোকান বা ঐ রকম একটা ছোট খাট কিছুর দোকান কর। তাতে তো অত পরিশ্রম হবে না। এমন করে রোজ রোজ আমি আর তোমার ঘাড়ে হাতে তেল মালিস করতে পারি নে।

আমিও তো তাই ভাবছি। সত্যি, ঘাড়ে বড় ব্যথা হয়েছে। আজ কাল হয়তো বেরুতেই পারবো না। খোকাটা আজ আছে কেমন? দুধ খেয়েছিল? জ্বর কত উঠেছিল?

আজও জ্বরটা যেন বেড়েছে—প্রায় বেহুঁস হয়ে আছে। একটা ডাক্তার দেখাতে পারলে হত।

ডাক্তার! তার ফি দেব কি দিয়ে? ঘরের সবই তো এক এক করে নিঃশেষ হয়েছে।

আমার এই চুড়ি একগাছা নিয়ে চাটুয্যে বাবুদের কাছে একবার যাও না। এখনো রাত তেমন বেশি হয় নি।

ও আমি নিতে পারব না, মা। ঐ ঘটিটা বরং আজ নিয়ে যাই।

ওটা দিতে আমার মন সরে না যে। মা রোজ নিজ হাতে চক্চকে করে ওই ঘটিটা রোজ দুবেলা মাজতেন।

মার মায়া ছাড়তে পারলি, আর তার ঘটিটার মায়া ছাড়তে পারবি নে?

মেয়েটি যেন কাঁদিয়া ফেলিল। বয়স্ক ব্যক্তিটি সান্ত্বনা দিয়া বলিল, কাঁদিস নে আর। খোকাকে একটু দেখিস্। আমি এলাম বলে। বৃষ্টিও ধরেছে বোধ হয়।

জানালা খুলিতেই দেখিলাম, সেই কমলালেবুওয়ালা।

৩

ফ্লাশ খেলিতেছি। বাহিরে হাঁক শুনিলাম, চাই কমলালেবু।

বন্ধু বলিলেন, ওই সেই জোচ্চোরটা না?

না, ও জোচ্চোর নয়।

মানে?

যার ব্যাঙ্কে মোটা টাকা আর পকেটে চেক বই তার পক্ষে সাধুতার আস্ফালন যত সহজ, মাতৃহীন মুমূর্ষু পুত্রের ঔষধ পথ্যের সংস্থান যার নেই, তার পক্ষে তত সহজ নয়।

মানে?

মানে বলিলাম। বন্ধু বলিলেন, তুই আজকাল ভারি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিস্ দেখ্‌ছি। মেয়েটার বয়স কত?

থাম্।

ফ্লাশ খেলা চলিতে লাগিল।

"ভাস্কর"

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের বিকাশধারা

শ্রীনীলরতন কর

বিদ্যুত শক্তির প্রকারবিশেষ এ কথা আজকাল সুপরিচিত। কিন্তু বিদ্যুত সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিকাশ লাভ করার প্রাক্কালে এবিষয়ে অনুবিধ অভিমত ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রবর্তিত হয়েছিল। ঠিক কোন যুগ হইতে বিদ্যুত বিষয়ে জ্ঞানের সূচনা হয় তা' একেবারে নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে একটা ব্যাপার খুব প্রাচীন কাল হতে অনেকেই জানত যে অ্যাম্বার বা তৈলস্ফটিককে ঘর্ষণ করলে তার নানাবিধ দ্রব্য আকর্ষণের ক্ষমতা জন্মে। অন্ততপক্ষে এই তথ্য খৃষ্ট পূর্ব ৬০০ অব্দে জানা ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের সাক্ষ্য হতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্বেও এই তথ্য মানুষের বিদিত থাকা অসম্ভব নয়। পুরাকালের লিখিত বিবরণী হতে জানা যায় যে তৎকালে বিদ্যুত জড়মধ্যস্থিত প্রাণ অথবা আত্মারূপে পরিগণিত হত।

পরীক্ষাময় বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার ফলে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রস্তুত হবার পূর্ব পর্য্যন্ত বহুশতাব্দীকাল সেই প্রাচীন ধারণা সুপ্রচলিত ছিল। খৃষ্টিয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কার্ডেন নামে এক চিকিৎসক বিদ্যুতের স্বরূপ বিষয়ে এক নূতন অভিমত প্রবর্তন করেন। সেই অভিমত বা সিদ্ধান্তের নাম 'ফ্লুইড্ থিওরী'। কার্ডেন বলেন যে অ্যাম্বারে তৈলজাতীয় এক প্রকার আঠালো রস আছে; সেই রস নিঃসৃত হলে তাকে শোষণের নিমিত্ত শুষ্ক বস্তুসমূহ, দাহ্যপদার্থ-দহনশীল-অগ্নির ন্যায় অগ্রসর হয়। কার্ডেনের এই প্রকার সিদ্ধান্ত ১৫৫১ অব্দে প্রকাশিত হয়। সেই সময় হতে বিদ্যুতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সমাপ্তি ঘটে। তারপর প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে বিদ্যুতের বাস্তব ব্যাখ্যা বিভিন্ন আকারে প্রচলিত হয়। খৃষ্টিয় ১৬০০ অব্দে উইলিয়ম গিলবার্ট নামে এক ইংরেজ চুম্বক পাথর ও তৈলস্ফটিকের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে সে সম্বন্ধে লাতিন ভাষায় একখানি বই লেখেন। এখনকার তুলনায় সে পুস্তকের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তৎকালীন অভিজ্ঞতাসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে এবং তার মধ্যে দুই একটি নিজস্ব মত সংশ্লিষ্ট ক'রে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। গিলবার্ট বলেছিলেন যে পৃথিবীটা প্রকৃতপক্ষে একটা অতিকায় চুম্বক, সেইজন্য চুম্বকের কাঁটা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে। গিলবার্টের পরীক্ষাসমূহের ফলে বিদ্যুত কতিপয় বস্তুতে অবস্থিত বাস্তব পদার্থরূপে গণ্য হতে থাকে। কারণ তিনি অ্যাম্বার ব্যতীত আরও কয়েকটি বস্তুতে বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিদ্যুতের ফ্লুইড্ থিওরী অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। ইতিমধ্যে ১৬৭২ অব্দে অটোফন্ গ্যারিকে নামে এক জার্মান, গন্ধকের গোলকযুক্ত এক বিদ্যুতজনক যন্ত্র উদ্ভাবন করে ঘর্ষণজনিত বিদ্যুতের পরীক্ষাকার্য্যে খুব সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে যাঁরা ফ্লুইড্ থিওরীকে সর্ব্বাঙ্গীন ক'রে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে এক জন ফরাসী পণ্ডিত দ্যু ফে। অপর জন আমেরিকার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্। দ্যু ফে (১৭৩৩ অব্দে) পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্য আবিষ্কার করেন যে অ্যাম্বারে ঘর্ষণ জনিত বিদ্যুতের সহিত কাচে ঘর্ষণ জনিত বিদ্যুতের পার্থক্য আছে। এই তথ্যের আবিষ্কার ফলে এক নূতন প্রশ্ন উদিত হয়। পণ্ডিতগণ জিজ্ঞাসা করেন যে কাচের বিদ্যুত ও তৈলস্ফটিকের বিদ্যুত যদি পৃথক হয় তবে সর্বশুদ্ধ কয় প্রকার বিদ্যুত আছে? শতবর্ষকাল এই প্রশ্নের খুব সন্তোষকর উত্তর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দ্যু ফে পরীক্ষাদি হতে এই মন্তব্যে পৌছেছিলেন যে সম্ভবত সর্বশুদ্ধ দুই প্রকার বিদ্যুত আছে। তিনি বলেছিলেন যে

সমপ্রকার বিদ্যুত পরস্পর বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত প্রকার বিদ্যুৎ পরস্পর আকর্ষণ করে। ফ্লুইড থিওরীর পরিকল্পনা অনুসারে তিনি এক প্রকার বিদ্যুতকে vitreous বা কাচময় ও অপর প্রকার বিদ্যুতকে resinous বা রজনময় নামে অভিহিত করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিদ্যুত এতকাল পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পদার্থরূপে পরিগণিত হচ্ছিল। কাচে রেশমী কাপড় ঘষলে অথবা তৈলস্ফটিকে ফ্লানেল্ ঘষলে যে বিদ্যুত জন্মাত সেটি ক্ষণিকের জন্য স্থায়ীত্বলাভ ক'রে অন্তর্হিত হত। এই ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে কনক্লাইষ্ট্ নামে এক ব্যক্তি বিদ্যুতকে স্থায়ী করতে ব্রতী হন এবং ১৭৪৫ অব্দে সে বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করেন। তিনি এজন্য এক প্রকার পাত্র উদ্ভাবন করেন; সেই বিদ্যুত অবধারকপাত্র বর্তমানের বেতারযন্ত্র পরিকল্পনার প্রাথমিক সূচনা বলা যেতে পারে। যাই হোক, কনক্লাইষ্টের উদ্ভাবিত সেই বিদ্যুত পাত্রের অনুরূপ পাত্র ১৭৪৬ অব্দে লাইডেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুত হবে লাইডেন্জার্ নামে খ্যাতি লাভ করে। পাত্রস্থিত কাচখণ্ডের মধ্যে বিদ্যুতকে সঞ্চিত রেখে স্বেচ্ছামত খরচ করার কৌশল সে সময়কার প্রায় প্রত্যেক বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই দেখে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ অতিশয় চমৎকৃত হন ও স্বীয় স্বার্থের পক্ষে একটি পাত্রের বিদ্যুত পর্যপ্ত না হওয়ায় অনেকগুলি জারকে ক্রমিক প্রথায় সজ্জিত করার পন্থা উদ্ভাবন করেন। এতদ্বারা অধিকতর পরিমাণে বিদ্যুত সঞ্চিত রাখার এবং বৃহত্তর বিদ্যুতস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করার কৌশল বাহির হয়। ফলে পূর্বে যে সকল পরীক্ষা সাধ্যাতীত ছিল সেগুলি সম্ভবযোগ্য হয়ে ওঠে।

ফ্রাঙ্কলিনের পূর্বে বিদ্যুতকে কাচময় ও রজনময় এই দ্বিবিধ সূক্ষ্ম প্রবহণক্ষম পদার্থরূপে অনুমান করা হত। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ধর্মের ব্যাখ্যায় একটিমাত্র বৈদ্যুতিক পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক বস্তু সহজ অবস্থায় এক প্রকার প্রবহণক্ষম পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। কিন্তু সহজ অবস্থা অতিক্রম ক'রে কোনও বস্তুতে সেই প্রবহণক্ষম বস্তুর আধিক্য অথবা স্বল্পতা ঘটলে তন্মধ্যে যথাক্রমে ধন-বিদ্যুত ও ঋণ-বিদ্যুতের সঞ্চার ঘটে। ফ্রাঙ্কলিনের এই সরল পরিকল্পনা অল্পদিন মধ্যেই বৈজ্ঞানিক খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু তত্ত্বমূলক দিক হতে শীঘ্রই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তিকর প্রশ্ন ওঠে। ফ্রাঙ্কলিনের সিদ্ধান্তানুসারে ঋণ-বিদ্যুত বলতে প্রবহণক্ষম বৈদ্যুতিক পদার্থের অভাব বোঝাত। কিন্তু সেই অভাবের ত' একটা সীমা আছে। যে অবস্থায় কোনও দ্রব্য হতে এই প্রবহণক্ষম পদার্থটি নিঃশেষ হয়ে যায় তাকেই সেই বিদ্যুত পদার্থের অভাবের সীমা বলে ধরা যেতে পারে। বিদ্যুত পদার্থের অভাব হেতু এই প্রকার ঋণ-বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্যসমূহ পরস্পর বিকর্ষিত হওয়ার কারণ কি? পদার্থ তত্ত্ববিদ্গণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিষম বিভ্রাটে পড়েন। কাজেই দ্বিবিধ বিদ্যুতের ব্যাখ্যা অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কুলো, লাপ্লাস্, বিয়ো এবং পোয়াস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ দ্বিবিধ বিদ্যুতের পরিকল্পনা অনুসারে স্থির বৈদ্যুতিক ঘটনাগুলির এমন সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে দ্বিবিধ বৈদ্যুতিক পদার্থের সিদ্ধান্ত (two fluid theory) সর্বসাধারণে গৃহীত হয়। কি উপায়ে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুত পাওয়া যায় এই সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুদিন হতে গবেষণা চলছিল। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ভোলতা voltaic pile নামে এক যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে সমস্যাটির কথঞ্চিৎ সমাধান করেন। ভোলতাইক পাইলের কৌশলটি খুবই সহজ। একটি তামার পাতের উপর একখানি দস্তার পাত এবং তার উপর ভিজা সালফিউরিক্ অ্যাসিডে ভিজানো একখানি ফ্লানেল, এই নিয়মে বহু তামার পাত, দস্তার পাত এবং ফ্লানেল উপর্যুপরি সাজানো। এই যন্ত্রের শেষ দুই প্রান্তের মধ্যে তার সংযোগ করলে তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। তারের মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহিত করার এই সহজ উপায় উদ্ভাবিত হবার পর বিদ্যুত প্রবাহ বিষয়ে পরীক্ষা করার প্রতি বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকতর লক্ষ্য পড়ে। ১৮১৯ অব্দে কোবেনহাউন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অরষ্টেড্ তারের মধ্যে বিদ্যুত-চালনা ক'রে তৎসন্নিকটবর্তী চুম্বকের কাঁটাকে নড়তে দেখেন। তিনি ভালভাবে পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, বিদ্যুত-প্রবাহকালে চুম্বকের কাঁটা তারের নীচে

থাকলে যে দিকে নড়ে তারের উপরে থাকলে ঠিক তার বিপরীত দিকে নড়ে। এই তথ্য হতে বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন উঠল যে বিদ্যুত ও চুম্বকের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না? এক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডের হাম্‌ফ্রি ডেভী এই প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি দেখান যে লোহা অথবা ইস্পাতের টুকরার চারিদিক দিয়া বিদ্যুত প্রেরণ করলে ধাতুটি চুম্বকে পরিণত হয়। সার হামফ্রী ডেভী এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কার্য করেছিলেন। বিদ্যুত বিজ্ঞানে তাঁর একটি বিখ্যাত কার্য বিদ্যুত সাহায্যে রাসায়নিক যৌগিকপদার্থের বিভজন। পূর্বে ভোল্‌তা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাহায্যে বিদ্যুত উৎপাদনের যে কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন, বিদ্যুতসাহায্যে রাসায়নিক বিভজন সাধনে ডেভী ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। ডেভীর কার্যাবলী মাইকেল ফ্যারাডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটীতে বিদ্যুত ও চুম্বকত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হন। ফ্যারাডে যখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন সে সময়ে আরও কয়েকটি তথ্য তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। ১৮২২ অব্দে সিবেক তাপের সাহায্যে বিদ্যুত উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যুত প্রবাহ ফলে বৈদ্যুতিক arc বা বিদ্যুত শিখার দ্বারা তাপ ও আলোক উৎপাদনের ব্যাপারও তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না। ফ্যারাডে ভাবলেন যে যদি তাপের সাহায্যে বিদ্যুত উৎপাদনের বিপরীত ঘটনায় বিদ্যুত সাহায্যে তাপ উৎপাদন সম্ভব হয় এবং বিদ্যুতের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনে বিপরীত ব্যাপার, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যুত উৎপাদন সম্ভব হয়, তবে বিদ্যুত প্রবাহ সাহায্যে চুম্বক উৎপাদনের বিপরীত চুম্বক সাহায্যে বিদ্যুত উৎপাদন ঘটনাও সম্ভব হতে পারে। ১৮৩১ অব্দে ফ্যারাডে বৈদ্যুত চুম্বকীয় আবেশের (electro magnetic induction) মূলসূত্র আবিষ্কার করেন। সূত্রটি সংক্ষেপে এইরূপ। কোনও তারের বিদ্যুত প্রবাহে মাত্রার পরিবর্তন হলে তৎসন্নিকটবর্তী পৃথক তারের বেষ্টনী মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহের আবেশ হয়। প্রথম তারটীতে যখন বিদ্যুত প্রবাহ তীব্র থাকে তখন দ্বিতীয় তারটিতে বিদ্যুত প্রবাহ ক্ষীণ হয় এবং প্রথম তারটিতে বিদ্যুত প্রবাহ ক্ষীণ হলে দ্বিতীয় তারে বিদ্যুত প্রবাহ তীব্র হয়। এই ব্যাপারটি ফ্যারাডে বিদ্যুত প্রবাহের চুম্বক ধর্ম অনুসারে ব্যাখ্যা করেন এবং চুম্বকের নিকট তারের বেষ্টনী সঞ্চালিত ক'রে বিদ্যুত প্রবাহ উৎপাদনে সক্ষম হন। ফ্যারাডের বৈদ্যুত চুম্বকীয় আবেশের মূলসূত্র বৈদ্যুতিক ও চুম্বক সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর মধ্যে মিলন সেতু রচনা ক'রে বর্তমানের ব্যবহারিক বিদ্যুত বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনা করেছিল। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই মূলসূত্র সম্যকরূপে প্রযুক্ত হওয়ার পূর্বে তৎসম্বন্ধে গণিতের নিয়ম উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হয়েছিল। অথচ গণিত শাস্ত্রে ফ্যারাডের তেমন পাণ্ডিত্য ছিল না। তাঁর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল বটে কিন্তু যখন তিনি গণিতের সঙ্কেতযুক্ত কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা নিজস্বভাষায় 'lines of force' এবং 'axes of power' দিয়ে বর্ণনা করেন তখন দিগ্বিজয়ী মহারথী গণিতবিদ পণ্ডিতেরাও তার বিন্দুবিসর্গ না বুঝে বিমূঢ়ভাবে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। অবশ্য ফ্যারাডের গণিত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অভাব ব্যতীত তাঁর ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। আজকাল আমরা বেতারযন্ত্রের সামনে ব'সে ইথরে বিদ্যুত চুম্বকীয় তরঙ্গসম্পর্কে হয়ত অনেক কথাই বলতে পারি কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ফাঁকা আকাশের মধ্যে বৈদ্যুতিক ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। বিদ্যুত বলতে তখন দ্রব্যাদির উপরিভাগে অবস্থিত অথবা তারের উপর প্রবাহিত কোনও সূক্ষ্ম তরল পদার্থের ন্যায় বস্তু বোঝাত। দুইটি বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্যের পরস্পর ব্যবহিত থেকে ক্রিয়া করার প্রবৃত্তি যদিও তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাকে নিতান্ত ব্যাখ্যার অযোগ্য ব্যাপার ব'লে গণ্য করা হত। যেমন জড়দ্রব্যের পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণব্যাপার জড়বিষয়ের চরম ঘটনারূপে গৃহীত হয়েছিল সেইরূপ বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের ব্যাপার নিরপেক্ষ ঘটনারূপে

পরিগণিত হত। কোনও একটি বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্য তা হতে ব্যবধানে অবস্থিত অপর কোনও বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্যের উপর ক্রিয়া করার অন্তর্বর্তী কালে কিছুমাত্র সময়ক্ষেপ হতে পারে সেকালে এরূপ কোনও ধারণা ছিল না। কাজেই বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্য সমূহের অন্তর্বর্তী প্রদেশে কি আছে না আছে সেদিকে কোনও লক্ষ্য না রেখে তাঁরা কেবল বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্যের উপরেই নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়েছিলেন। কিন্তু বৈদ্যুতিক ঘটনা বিষয়ে ফ্যারাডের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। তাঁর মানস চক্ষের সম্মুখে বিদ্যুত পরিচালক বস্তু হতে বৈদ্যুতিক প্রভাব সর্বদিকে সরল ও বক্র বলরেখা (lines of force) বিস্তার করে অবস্থিত ছিল। সেই রেখাগুলি নিজেরা পরস্পর বিকর্ষণ করত এবং অপর কোনও সমপ্রকার বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্য হতে উদ্ভূত বলরেখার দ্বারাও বিকর্ষিত হত। তারা আকাশের মধ্যে দিয়ে বিরাট রেখা বিস্তার ক'রে অপর কোনও দ্রব্যে গিয়ে মিলিত হত। এই রেখা সমূহের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বা টানের অবস্থা বর্তমান ছিল। যেমন রবারের রজ্জুকে টেনে রাখলে সেটি সর্বদা সঙ্কুচিত হবার চেষ্টা করে এই রেখাগুলিও কতকটা সেইরূপ।

বিদ্যুতযুক্ত দ্রব্য আকর্ষিত অথবা বিকর্ষিত হবার হেতু স্বরূপে ফ্যারাডে তাদের অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রস্থিত এই প্রকার বলরেখার অস্তিত্ব নির্দেশ করেন। ফ্যারাডের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনে তাঁর সমসাময়িক মনীষিগণ ভাবলেন যে তাঁর মত যদি সত্য হয় তবে বিদ্যুত পরিচালক তারের ব্যবহৃত স্থানে বিদ্যুত প্রবাহের মূল অংশটি পাওয়া যাবে, তারের উপরিভাগে অথবা ভিতরে তাকে পাওয়া যাবে না। এ প্রকার ধারণা তাঁদের নিকট স্ববিরোধী মনে হয়েছিল। কাজেই ফ্যারাডের বাস্তব আবিষ্কারটি ব্যবহারিকজগতে দ্রুতগতিতে প্রযুক্ত হলেও তার তত্ত্বমূলক দিকটা অগ্রাহ্য হয়েছিল। ফ্যারাডের মানসচক্ষে পরিদৃষ্ট সত্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এবং তাকে গণিতশাস্ত্রের ভাষায় প্রকাশের নিমিত্ত অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাব প্রয়োজন হয়েছিল। সেই প্রতিভা জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। বিদ্যুতযুক্ত বা চুম্বকযুক্ত দ্রব্যের চতুর্দিকস্থ প্রদেশে ইথরের চাপ ও টানের অস্তিত্ব আছে এ বিষয়ে ম্যাক্সওয়েল ফ্যারাডের সহিত একমত হন। কোনও দ্রব্যের বিদ্যুতযুক্ত অবস্থার বা চুম্বকযুক্ত অবস্থার তারতম্য ফলে তার পরিবেষ্টিত প্রদেশে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বলের পরিবর্তন ঘটে, এই ব্যাপারের ব্যাখ্যায় ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গণিতের ভাষা প্রয়োগ করেন। ম্যাক্স্‌ওয়েলের বৈদ্যুতচুম্বকীয় সিদ্ধান্ত বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে আলোকের প্রকৃতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত ইথরের অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়। আলোকের ধাক্কার বাহক সেই ইথরকে ম্যাক্সওয়েল বৈদ্যুতচুম্বকীয় তরঙ্গের ধাক্কাবহনের কাজে লাগান।

এখানে ইথর সম্বন্ধে ধারণাটি একটু বিশদ করা দরকার। কোনও দ্রব্যে উত্তেজনা প্রেরণ করতে হলে তাকে বহনের নিমিত্ত একটা না একটা মাধ্যমিক আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থিরজল মধ্যে ভাসমান একটি ছোট শোলার নৌকা কল্পনা করা যাক; তীরে অবস্থিত কোনও ব্যক্তি সেই নৌকার হতে দূরে অবস্থিত থেকে তাকে পরিচালিত করণে ইচ্ছুক। এই কার্য্যের নিমিত্ত তার ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করা সম্ভব। সে নৌকাটিকে একটি দণ্ডদ্বারা ঠেলা দিতে পারে, অথবা তার প্রতি লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করতে পারে কিংবা জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। শরীরের যান্ত্রিক শক্তিকে প্রয়োগ ক'রে উপরোক্ত যে কোনও উপায়ে নৌকাতে উত্তেজনা প্রেরণ করা চলে। শক্তি সঞ্চালনের সর্বত্রই প্রায় এই তিনটি দৃষ্টান্তের যে কোনও একটির অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে। সূর্য্য হতে নয় কোটি মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আলোকের পৃথিবী মণ্ডলে পৌছাতে প্রায় আটমিনিট সময় লাগে। এই আলোককে বহনের নিমিত্ত একটা মাধ্যমিক আবশ্যক সেজন্য বৈজ্ঞানিকগণ ইথরের কল্পনা করলেন। তাঁরা অনুমান করলেন যে সমগ্র বিশ্বের গ্রহনক্ষত্রতারকাপুঞ্জ হতে ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্য্যন্ত সমস্তই ইথরসমুদ্রে নিমজ্জিত রয়েছে। সূর্যের উত্তপ্ত জড় কণাগুলি নিরন্তর ছোটাছুটি করছে, সেগুলি ইথর সমুদ্রে সেকেণ্ডে কোটী কোটী বার ধাক্কা দিচ্ছে, আর সেই ধাক্কা সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী মাইল বেগে ইথরের তরঙ্গরূপে বাহিত হয়ে আমাদের দর্শনে-

ন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করছে এবং আমাদের নিকট আলোক রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই হচ্ছে মোটামুটি আলোকের ইথরীয় ব্যাখ্যা। ম্যাকস্‌ওয়েল বললেন যে বৈদ্যুত চুম্বকীয় উত্তেজনাও সেইরূপ ইথরের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট বেগে তরঙ্গাকারে ছুটে চলেছে। সেজন্য তিনি গণিতশাস্ত্র মতে হিসাব নিকাশ ক'রে দেখলেন যে এই বিদ্যুত চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ আলোকের গতিবেগের প্রায় সমান। তখন তিনি ভাবলেন যে আলোকের তরঙ্গও খুব সম্ভবত বৈদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রকার বিশেষ। ১৮৮৫ অব্দে ম্যাক্স্‌ওয়েলের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার পর বিদ্যুতকে বাস্তব তরল পদার্থরূপে পরিকল্পনার যুগ অবসান হয়। এই বৎসর পদার্থ বিজ্ঞানের দুইটি প্রধান মূল সূত্র রচিত হয়; প্রথমটি শক্তির অবিনাশিতা বিষয়ক, অপরটি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক। ১৮৭০ হতে ১৮৮০ অব্দের মধ্যে তাপ ও আলোককে বিদ্যুতের সহিত শক্তির একপর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য এই প্রকার অভিমত খুব ধীর গতিতে পুষ্টিলাভ করেছিল। ম্যাক্স্‌ওয়েলের বৈদ্যুত-চুম্বকীয় তত্ত্ব সাধারণ্যে গৃহীত হবার পথে এতটাই বাধা-প্রাপ্ত হয়েছিল যে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সেই সিদ্ধান্তকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্যরূপে দেখে যেতে পারেন নাই। এমন কি কেল্‌ভিনের মতো বিজ্ঞানী তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত ম্যাক্স্‌ওয়েলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ম্যাক্স্‌ওয়েলের মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসর পরে ১৮৮৬ অব্দে জার্মান পদার্থবিদ্‌ হার্ৎজ্‌ পরীক্ষাগারে বৈদ্যুতচুম্বকীয় তরঙ্গের আচরণ লক্ষ্য ক'রে ম্যাক্স্‌ওয়েলের স্বপক্ষে প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন করেন। তিনি বৈদ্যুতচুম্বকীয় তরঙ্গকে আলোকের ন্যায় প্রতিফলিত ও তির্যগবর্তিত করতে সক্ষম হন। ১৮৯৪ অব্দে সার অলিভার লজ বেতার তরঙ্গ সাহায্যে বার্তা প্রেরণে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম কৃতকার্যতা লাভ করেন। অবশ্য তাঁর পরে ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি এর ব্যবহারিক দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৯৭ অব্দে নয় মাইল দূরবর্তী স্থানে বেতার বার্তা প্রেরণ করেন। ১৯০১ অব্দে তিন সহস্র মাইল দূরবর্তী স্থানে বেতারবার্তা প্রেরণে মার্কনি কৃতকার্যতা লাভ করেন। আজ জগতের সর্বত্র মার্কনির নাম সুবিদিত, সেই তুলনায় ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েলের নাম খুব অল্প লোকেরই পরিচিত। অথচ ম্যাক্স্‌ওয়েলের বৈদ্যুতচুম্বকীয় সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত থাকলে হয়ত আজিও পৃথিবীর লোকে বেতার বার্তা হতে বঞ্চিত থাকত।

ম্যাক্স্‌ওয়েল বিদ্যুতের সহিত আলোকের সম্পর্ক প্রতিপাদনের পরেও বিদ্যুত সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট আকার লাভ করে নাই। বিদ্যুতকে ইথরীয় ঘটনারূপে অনেকে আবছায়ারূপে বর্ণনা করত বটে কিন্তু তৎকালীন সিদ্ধান্তানুসারে তার স্পষ্ট রূপটি উপলব্ধি করেন অলিভার লজ। লজ বৈদ্যুতিক পরিকল্পনাকে বিস্তারিত ও বিশদ আকারে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি স্থির বৈদ্যুতিক ঘটনাকে ইথরের টান ও চাপরূপে বর্ণনা করেন; বিদ্যুত প্রবাহকে ইথরের প্রবাহ জনিত বলে উল্লেখ করেন এবং চুম্বক ধর্মকে ইথরের ঘূর্ণী বা ভ্রমিরূপে ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যানুসারে বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্ত বস্তুবর্জিত ইথরবাদের মধ্যে আশ্রয় লাভ ক'রে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যখনই কোনও সিদ্ধান্ত প্রবলাকার ধারণ করে তখন তার শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষার্থে অপর কোনও সিদ্ধান্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বিদ্যুতের স্বরূপ বিষয়ক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যুত বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির রাজত্বকাল বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হতে সংক্ষিপ্ততর হয়ে এসেছে। প্রথমে সহস্রাধিক বৎসর ধ'রে বিদ্যুতের আত্মিক ব্যাখ্যা চলেছিল। তার পরবর্তী সিদ্ধান্তটি তিন শতাব্দীকাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে। সেই তিনশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুত একবিধ অথবা দ্বিবিধ সূক্ষ্ম প্রবহণশীল পদার্থরূপে পরিগণিত হত। ম্যাক্স্‌ওয়েলের আমলে বিদ্যুতের স্বরূপ কল্পনার তৃতীয় যুগে বিদ্যুত অতি সূক্ষ্মভারহীন পদার্থরূপে বস্তুত্ব হারাতে বসেছিল। তখন বিদ্যুতকে ইথরের চাঞ্চল্যরূপে গণ্য করা হত। এক্ষণে ইথরীয় যুগ অতিক্রম ক'রে আমরা বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের চতুর্থ যুগে পদার্পণ করেছি। এই আধুনিক যুগকে কণিকাবাদ বা মাত্রাবাদ (quantum theory)-র যুগ বলা যেতে পারে। ঠিক কোন সময় হতে ইথরীয় যুগের সমাপ্তি ও আধুনিক

যুগের আরম্ভ তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না, শুধু এইমাত্র বলা যায় যে বর্তমান সিদ্ধান্ত যুগের সূচনার প্রথম হতে ইথরীয় সিদ্ধান্তের মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৭১ অব্দে হ্বিলহিলম্ হেবার তাঁর চুম্বক বিষয়ক সিদ্ধান্ত রচনাকালে গুরুভার ঋণ-বিদ্যুত সঞ্চারের চারিদিকে লঘু ধন-বিদ্যুত সঞ্চারের ঘূর্ণ্যমানরূপ, গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহের আবর্তনের ন্যায় প্রতীক পরিকল্পনা করেন। ১৮৭৪ অব্দে জনষ্টোন্ ষ্টোনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনে বিদ্যুতের সম্বন্ধে এক নিবন্ধ পাঠ করেন ও ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের নিয়ম অনুযায়ী মৌলিক বিদ্যুত সঞ্চারের একটা গড়পড়তা হিসাব দেন। এর দশ বৎসর পরে তিনিই প্রথমে ইলেকট্রন পদটি ব্যবহার করেন এই চিন্তাধারা অনুসরণে হেলম্‌হোলট্‌জ ১৮৮১ অব্দের ফ্যারাডে-লেকচারে বলেন যে পরমাণুবাদ অনুযায়ী মৌলিক-পদার্থকে যেমন অবিভাজ্য পরমাণুর দ্বারা গঠিত মনে করা হয়, বিদ্যুতকেও সেইরূপ ধন ও ঋণ বিদ্যুতের নির্দিষ্ট মৌলিক অংশসমূহ দ্বারা গঠিত ব'লে কল্পনা করা যেতে পারে। তিনি বিদ্যুতকে এরূপ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর তুল্য মনে করেছিলেন যারা অপর মৌলিক রাসায়নিক পরমাণুর সহিত মিলিত হয়ে, বিদ্যুতযুক্ত পরমাণু বা আয়ন্ (ion)এর আকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাঁর নিকট বিদ্যুতের মৌলিক কণা monovalent রূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। কারণ ক্লোরিণ পরমাণুর সহিত একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর এবং অক্সিজেন পরমাণুর সহিত দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনের ন্যায় monovalent পরমাণুর সহিত একটি বিদ্যুতকণার ও divalent পরমাণুর সহিত দুইটি বিদ্যুৎকণার মিলন ঘটে বলে বোধ হয়েছিল। Valance শূন্য হিলিয়াম পরমাণুর যুগ্ম বৈদ্যুতিক সঞ্চার (double electric charge) তখনও অজ্ঞাত ছিল।

লরেন্‌ট্‌জ বিদ্যুতের ইথরবাদ ও বিদ্যুতের কণিকাবাদের বিপরীত সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তদনুসারে কোনও দ্রব্যের মধ্যবর্তী বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকে ইলেকট্রনের পরিকল্পনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় এবং স্থির বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতচুম্বকীয় ও ব্যবহিত অবস্থায়—আবিষ্ট বিদ্যুতের ক্রিয়া (Induction) ব্যাখ্যার নিমিত্ত ইথরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দ্বিবিধ ঘটনার সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক ইলেকট্রনকে ইথরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ব'লে অনুমান করেন। লরেন্‌টজের অভিমতে, ইলেকট্রণের সমাবেশে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন, ইথরের মধ্যেও পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে এবং ইথর আলোকের গতিতে চালিত হয়ে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।

এই সময় পরীক্ষাময় গবেষণাকার্য এক নূতন ধারায় চালিত হওয়ায় বিদ্যুতের কণিকাবাদ প্রাবল্য লাভের সুযোগ পায়। কয়েকজন বিজ্ঞানী বায়ুনিষ্কাষিত পাত্রের মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহ সঞ্চালনের ফলাফল পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ ক'রে বহু অদ্ভুত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। প্লাকার, হিটর্ফ এবং টমসন্ প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীগণ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হতে এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই পরীক্ষাকার্য প্রথমে সকলের তাদৃশ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ১৮৭৯ অব্দে সার উইলিয়ম ক্রুকস্ সেফিল্ডের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই পরীক্ষার ফল প্রদর্শন ক'রে সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করেন। তিনি দেখান যে কাচনল হতে বায়ু নিষ্কাশিত করলে তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দীপ্তিময় বর্ণ সুষমার সৃষ্টি হয়। এর কারণ স্বরূপে ক্রুকস অনুমান করেন যে বায়ুনিষ্কাশন করা সত্ত্বেও কাচনল মধ্যে যে গ্যাসের অণু অবশিষ্ট থাকে, তাদের বিদ্যুতযুক্ত হওয়াতেই এই অবস্থা ঘটে।

পরবর্তীকালে জে, জে, টমসন, টাউন্‌সেন্‌ড্, উইল্‌সন্ ও মিলিকান্ প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ দেখান যে সেই বিদ্যুতযুক্ত কণিকাগুলি গ্যাসের অণু নয়, এমন কি তারা পরমাণুও নহে। তাদের আকার এত ক্ষুদ্র যে পূর্ববর্তী পদার্থবিদগণের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সেই কণিকাগুলির প্রত্যেকের ভর (mass) হাইড্রোজেন পরমাণুর ১,৮০০ ভাগের এক ভাগ। তাদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যুতযুক্ত। সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণিকাগুলির নামকরণের জন্য ষ্টোনির দেওয়া নাম ইলেকট্রন পদটি গ্রহণ করা হয়।

এই বৈজ্ঞানিক কার্যের পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানে

যে সকল উন্নত শ্রেণীর গবেষনাকার্য চলেছিল তার ফলে ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা অধিক ভরবিশিষ্ট প্রোটন নামক ধন বিদ্যুতকণা আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৯ অব্দে রদারফোর্ড নাইট্রোজেন পরমাণুব উপর রেডিয়ম নিঃসৃত আলফারশ্মির বর্ষণদ্বারা পরমাণুব অভ্যন্তর হতে ধনবিদ্যুতকণা প্রোটন নির্গমনের সাক্ষ্য পান। ১৯৩০ অব্দে কস্মিকরশ্মি বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইলেকট্রনের ন্যায় ভরবিশিষ্ট অথচ ধনবিদ্যুতযুক্ত পজিট্রন নামক কণিকা আবিষ্কৃত হয়।

লর্ড রদারফোর্ড প্রবর্তিত নূতনধারার পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা ফলে এক্ষণে বৈদ্যুতিক ঘটনা ব্যাখ্যায় বিদ্যুতের কণিকাবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। কিন্তু ইথরীয় চাঞ্চল্যবাদ যে সকল বৈদ্যুতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করেছিল কণিকাবাদ সাহায্যে তার সকলগুলি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত না হওয়ায় বিজ্ঞানীগণ কণিকাবাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই। বর্তমানে উভয়বিধ মতবাদের সামঞ্জস্যের নিমিত্ত ইলেকট্রনের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ইথর বিষয়ে লরেন্‌টজের পরিকল্পনা, 'ওয়েভ মেকানিকস্‌' সিদ্ধান্তে নূতন আকারে দেখা দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দী বিদ্যুতের মূল প্রকৃতি অপেক্ষা তার অঙ্গ-সংস্থানের (structure) প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াছে। অবশ্য অঙ্গ-সংস্থানের অভিজ্ঞতা মূল প্রকৃত বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদানের সম্ভাবনা রাখে। বিদ্যুতের কণিকাময় গঠনের প্রতীক, বস্তুর স্থাপত্য রীতি নির্ণয়ের সহিত যুগপৎ প্রকাশ-লাভ করেছে। খুব বেশী দিনের কথা নয় এমন একদিন ছিল যখন এটম্‌ বা পরমাণুকেই জড়ের সৌধ নির্মাণের নিত্য এককরূপে গণ্য করা হত। এখন আমরা পরমাণুকে বস্তু-নির্মাণের অতি জটিল অবয়বরূপে অবগত হয়েছি। প্রত্যেক অ্যাটম্‌ বা পরমাণুব মধ্যে একটি ধনাত্মক কেন্দ্রিন আছে, প্রকৃত পক্ষে সেই কেন্দ্রিনের মধ্যেই বস্তুর জড়ত্ব নিহিত। এর চারিদিকে যে সকল ঋণাত্মক বিদ্যুতকণা প্রদক্ষিণশীল, তারা ইলেকট্রন নামে পরিচিত। যে কোনও পরমাণুব কেন্দ্রিনের ধনাত্মক বিদ্যুত সঞ্চার তাকে প্রদক্ষিণকারী ইলেকট্রন সমষ্টির ঋণ-বিদ্যুত সঞ্চারের সমান। যদি এক ফোঁটা জল সমগ্র পৃথিবীর আয়তনে পরিবর্ত্তিত কল্পনা করা যায় এবং তার উপাদানীভূত পরমাণুরা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় তবে একটি পরমাণুব ব্যাস হবে প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি, আর তার কেন্দ্রিনটির ব্যাস হবে এক ইঞ্চের আড়াই হাজার ভাগের একাংশ অর্থাৎ একটি খুব সরু ছুঁচের আগা যতটুকু স্থান ছুঁতে পারে এত পরিবর্ধিত আকারেও কেন্দ্রিন তার চেয়ে বেশী স্থান অধিকার করতে পারে না। পরমাণুর আকারের অনুপাতে কেন্দ্রিনটি কত সূক্ষ্ম এই পরিকল্পনা হতে তার হিসাব করা যেতে পারে। ইলেকট্রনের আয়তনও কেন্দ্রিনের সমপর্যায়ের কিন্তু এটি কেন্দ্রিনের তুলনায় এত লঘু যে সেই হিসাবে প্রায় ওজনহীন বলা চলে। এই অতি সূক্ষ্ম কেন্দ্রিনের চতুর্দিকে তারই সদৃশ সূক্ষ্মাকার ইলেকট্রনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনরা যেন পরমাণুর কেন্দ্রিনের কঞ্চুক। কিন্তু কেন্দ্রিনরূপী অবয়ব ও ইলেকট্রনের কঞ্চুকের মাঝে—পরমাণুর কণিকাময় স্থাপত্যে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের মতে—বিরাট শূন্যতা বিদ্যমান। এতদুভয়ের ব্যবহিত প্রদেশে যে ফাঁকা আকাশ রয়েছে তার সঙ্গে গ্রহরাজি এবং সূর্যের অন্তর্বর্তী মহাকাশের তুলনা হতে পারে।

সৌরজগত এবং পরমাণু উভয়েরই গুরুত্ব কেন্দ্রীয় অবয়বে ন্যস্ত রয়েছে, কেবল প্রভেদ এই যে গ্রহদের তুলনায় সূর্য আকারে খুব বড়, আর পরমাণুব কেন্দ্রিনের আয়তন ইলেকট্রনের প্রায় সমান। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সৌরজগতের সঙ্গে পরমাণুব তুলনা উপমামাত্র এবং সেই হেতু নিতান্ত পল্লবগ্রাহী ধরণের। বোর্‌ (Bohr) প্রমুখ পণ্ডিতগণ এর কারণ প্রদর্শন করেছেন। এখানে সে আলোচনার অবতারণা অনাবশ্যক।

পূর্বে প্রত্যেক কেন্দ্রিনকেই তার পরমাণবিক গুরুত্বের সমসংখ্যক প্রোটনের সমষ্টিরূপে অনুমান করা হত। কিন্তু কেন্দ্রিনের বিদ্যুত সঞ্চারের নির্ভুল হিসাব দিতে গিয়ে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রিন ব্যতীত অপর সকল পরমাণুব কেন্দ্রিনগত ধনবিদ্যুত সঞ্চার তার অভ্যন্তরে সংগ্রথিত ইলেকট্রন প্রভাবে আংশিকভাবে আসক্তিহীন হয়েছে মনে করা হত। এই প্রকার অনুমান বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রিনের বহিঃস্থিত ইলেক-

ট্রনদের আচরণ অতিশয় কৃতকার্যতার সহিত ব্যাখ্যা করেছিল সেই সিদ্ধান্তই কোনও কেন্দ্রিনমধ্যে একটিমাত্রও ইলেকট্রনের অবস্থানের অধিকার দিতে অপারগ। ইলেক্‌ট্রনের সমানভরবিশিষ্ট কণিকা কি প্রকারে কেন্দ্রিনের অত অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে তা বোঝা যায় নাই। এতদসত্ত্বেও পরমাণবিক ঘটনার ব্যাখ্যা কার্য্যে সুবিধার জন্য বিজ্ঞানীজগত এই পরিকল্পনাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

ইলেকট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অংশ সমূহের পৃথক সত্তা নির্দেশ করায় স্বভাবতঃই এইরূপ প্রশ্ন ওঠে যে ইলেকট্রনও বিভাজ্য কি না? কোন কোনও গবেষক ইলেকট্রন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিদ্যুত কণিকার সাক্ষ্য পেয়েছেন ব'লে দাবী জানিয়েছিলেন কিন্তু ১৯২৪ অব্দে মিলিকান এর চূড়ান্ত সমালোচনা ক'রে মন্তব্য করেন যে ইলেকট্রন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিদ্যুত কণিকার কোনও সাক্ষ্য মেলে নাই। ১৯৩০ অব্দে জার্মানির ডব্‌লু বোথে এবং এইচ, বেথারের গবেষণা ও তাঁদের পরবর্তীকালে ফ্রান্সের এফ, জোলিও, ইরেনকুরী এবং কেম্‌ব্রিজের জে, স্যাডউইকএর কার্যফলে পরমাণুর মধ্যে বিদ্যুত সঞ্চার বর্জিত এক কণিকা আবিষ্কৃত হয়, তার নাম নিউট্রন্। নিউট্রণের পরিকল্পনা একেবারে নূতন নয়, ১৯২০ অব্দে হারকিন্‌স্ এবং রদারফোর্ড এই প্রকার কণিকার অস্তিত্ব সম্ভব ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩২ অব্দের আগে এর পরীক্ষামূলক সাক্ষ্য মেলে নাই।

নিউট্রন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রিনের মূর্তি ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমবায়রূপে অনুমান না ক'রে প্রোটন ও নিউট্রণের সমাবেশে রচিত মনে করা হচ্ছে। হাইজেনবার্গ কেন্দ্রিনের স্থাপত্যতত্ত্বে এই প্রকার মূর্ত্তির প্রাথমিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক মিলিকান ও কার্ল ডি এণ্ডারসনের পরীক্ষাকার্যফলে পজিটিভ ইলেকট্রন বা পজিট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়। ১৯৩৩ অব্দে ব্ল্যাকেট এবং অকহিলিনি এই আবিষ্কারের সমর্থক সাক্ষ্য পান।

অধুনা পরিজ্ঞাত প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার ভর প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর তুল্য। প্রোটন কণিকাগুলি ধন-বিদ্যুত যুক্ত, পক্ষান্তরে নিউট্রন কণিকায় কোনও বিদ্যুত সঞ্চারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। লঘু ঋণবিদ্যুত কণিকা-ইলেকট্রন এবং ধনবিদ্যুত কণিকা পজিট্রনের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর $\frac{1}{1840}$ ভাগ। ইলেকট্রণের সমতুল্য ভরবিশিষ্ট অথচ বিদ্যুতবিহীন কণিকা নয়ট্রিনো (Neutrino) এক্ষণে আবিষ্কৃত না হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত নিউক্লিয়ার থিওরী অনুসারে তার আবশ্যকতা হেতু পূর্ব্ব হতেই এই নামকরণ হয়ে গেছে। প্রোটনের সহিত ইলেকট্রনের সম্মিলন ফলে নিউট্রন কণিকার সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা এখনও অজ্ঞাত। নিউট্রন কণিকার যদি বিদ্যুত ব্যতিরিক্ত কোনও স্বতন্ত্র সত্তা থাকে তবে এটি বর্তমানে গৃহীত বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের সহিত বিষম কলহের সূত্রপাত করবে। যাইহোক, এক সময়ে যেমন বিভিন্ন প্রকার পরমাণু জড়ের গঠনের চরম এককরূপে গণ্য করা হত, বর্তমানে তেমনি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও পজিট্রন এবং সম্ভবত নয়ট্রিনো সেইস্থান অধিকার করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড় ও বিদ্যুতকে দুইটি পৃথক সত্তা রূপে দেখা হত। এক্ষণে বিদ্যুতই মূলীভূত সত্তারূপে পরিগণিত হচ্ছে এবং জড়পদার্থকে তারই একটা দশামাত্র এইরূপে গণ্য করা হচ্ছে। এক সময়ে জড়ই ছিল সর্বেসর্বা, এখন সে তার সত্তা হারিয়ে বৈদ্যুতিক ঘটনামাত্রে পর্যবসিত হবার প্রবাস করছে। বিদ্যুতের স্বরূপ কি জানবার পূর্বে আমাদের জানা দরকার যে আমরা জড়ের বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, অথবা বিদ্যুতের জড়ত্বময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। বর্তমানে বিদ্যুত সম্বন্ধে যে অভিমত প্রচলিত তদনুসারে বিদ্যুতই জগতের সার উপাদান। কিন্তু অধুনা জড় পদার্থের স্থাপত্যরীতি বিষয়ে যে গবেষণা কার্য চলেছে তার পরীক্ষাময় অগ্রগতির কষ্টিপাথরে এর যাথার্থ নিরূপিত হবে।

শ্রীনীলরতন কর

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

স্থূলতার আত্মকথা

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

১

ক্লাসে আমাদের সকুণ্ঠ প্রবেশ জড়সড় হয়ে অবস্থান ও ত্রস্ত ভয়াকুল বহির্গমনের কথা যখনই একটু ভেবে দেখতাম, তখনই চোখে পড়ত ওই বিপরীত বেঞ্চের ছেলেদের অন্তরের হিংস্র প্রকাশ তাদের প্রতিটি চাহনিতে, গতিভঙ্গীতে।

অনার্স-ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা খুবই কম। মেয়ে আমরা-দুজন ; আমি আর মঞ্জরী, ছেলে দু-তিন জন। এক জন এসেছে নতুন। তার নাম জানতাম না। রোলকলের সময় সেদিন দেখে নিলাম—মনোজ। সুন্দর, সপ্রতিভ। অন্যসব ছেলেরা চলা-ফেরায় সব সময়ে বুঝিয়ে দিত যে আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওরা বেশ সচেতন। বেশী জোরে হাসত না—বিশ্রী দেখাতে পারে, চোখাচোখি হলেই চোখ নামাত। ভাবটা এই যে—চোখে চোখ না পড়ার দিকে ওরা খুব সজাগ।

মনোজের এ বালাই ছিল না। কোন দরকারী বা অদরকারী কথা থাকলে অন্য ছেলেরা অন্যের অলক্ষ্যে ছাড়া জিজ্ঞাসা করত না কে কী ভাবে! কিন্তু ও ছিল সম্পূর্ণ সাবলীল।

একদিন কলেজ থেকে ছুটির পরে হোষ্টেলে যাব বলে রাস্তায় নেমেছি, মনোজ এসে বললে—নমস্কার। প্রফেসর ঘোষালের ক্লাসে সেদিন ছিলাম না, নোট্ নিতে পারি নি। আপনার খাতাটা একটু দেবেন?

বললাম—আচ্ছা।

—কাল নিয়ে আসবেন তবে। আমি পরশুই ফিরিয়ে দেব।

ইচ্ছে করেই পরের দিন খাতাটা কলেজে আনলেম না। একটু কৌতূহল, একটু রহস্যের আস্বাদন পেয়েছি। রাস্তায় ও আবার বললে—খাতাটা আনেন নি ত। ও আমি ঠিক জানতাম, আপনি ভুলে যাবেন। কাল যেন ভুলবেন না আবার।

পরের দিনও খাতাটা নিলাম না। মনোজ রাস্তায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বললে—আচ্ছা, আপনার এইটুকু মর‍্যাল কারেজ নেই! বললেই হোত, 'খাতাটা দেব না।' মিথ্যে কথা বলার কী দরকার ছিল? আমি ত আর জোর করে নিচ্ছিনে।

ক্লাসের অন্য কোন ছেলে যখন কথা বলে, তখন এমন খোসামুদে ধরণে বলে যে আত্মসম্মানের লেশমাত্রও তাদের আছে বলে মনে হয় না। এ রকম কথা শোনার অভ্যেস নেই। এ সম্পূর্ণ নতুন।

লজ্জিত হয়ে মিথ্যা কথা বললাম,—কিছু মনে করবেন না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। হোষ্টেলের গেট-এ দাঁড়াবেন, আমি পাঠিয়ে দেব।

মনোজ বললে না—হোষ্টেলের গেটে-এ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত যথেষ্ট সময় এখন আমার নেই। আপনি কাল নিয়ে আসবেন।

আমারও সহ্য হোল না এবার। বললাম,—আমারও সে সুবিধে কাল হবে কিনা বলতে পারিনে।

কোন জবাব না দিয়ে একটা বাসে উঠে ও চলে গেল। অপমানটা তীক্ষ্ণভাবে আমার বাজল। পরের দিন রাস্তায় দেখা হতে পাশ কাটিয়ে আমি চলে যাচ্ছিলাম, ও যেতে দিলে না। একটু অ্যাপোলজির ভাব দেখিয়ে বললে—আজ চলুন, আপনাদের হোষ্টেলে যাব। খাতাটা পাঠিয়ে দেবেন গেট-এ। কাল কতগুলো বাজে কথা বলেছি—মাফ করবেন। একটু হেসে বললে—আপনার খাতা নিচ্ছি আবার আপনাকে দু'-কথা শুনিয়ে দিচ্ছি, এ ঠিক নয়।

আমার খাতাটাও যখন ফিরিয়ে দিল, তখন মেয়েদের সাধারণ কৌতূহলের বশে খাতাটা খুলে দেখতে লাগলাম। দেখি, একপাশে ওর হাতে সবুজ কালি দিয়ে ইংরাজী লেখা আমার নাম—সুলতা দেবী, থার্ড ইয়ার, বি, এ।

যারা বলে, ভালোবাসা একটা বড় কোন কারণ বা ঘটনাকে ঘিরে বেড়ে ওঠে, আমি তাদের বলি,—তারা কল্পনাহীন, তারা অজ্ঞ। মানুষের প্রবৃত্তিটা এই যে দেহ ও মনের বয়স যখন ভালোবাসার উপযুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন শুধু একটা অবলম্বনের অপেক্ষামাত্র, যে কোন অবলম্বন পেলেই তাহা ধরে সে বেড়ে উঠতে পারে। তবে শিক্ষা ও সংস্কারের দাবী যে মোটেই নেই,—এ আমি বলতে চাইনে।

সেই জন্যেই বলছিলাম, যখন বিশেষ কোন ঘটনা অবলম্বন করে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিনি, তখন আমাদের অতি সাধারণ কথাবার্তা, অতি সাধারণ রহস্যালাপের খুঁটিনাটি গুলোকে ফেনিয়ে তোলার আমার এ আত্মকথায় কী-ই বা আছে। সেই পুরোনো প্রেম।

পৃথিবীর প্রথম দিন থেকে আজকের দিনেরও যেটা প্রত্যহের ব্যাপার। আমাদের প্রেম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই কথাটাই আজ আমার মনের দুয়ারে বারে বারে উঁকি মারছে। এখন আমার স্বামী ঘুমিয়ে, রাত-ও এখন কম নয়। টেবল-ল্যাম্পটার কাছে বসে বসে একা আমি পাতার পর পাতা আমার বিগত প্রেমের সমাধির ইতিহাস লিখে যাচ্ছি। প্রেমের সেই শেষ সমাধির তোরণ দ্বারই আজ দূর থেকে আমার চোখে পড়ছে, আমাদের পূর্ব্বরাগের অনুচ্চ ভিত্তিটি কি আর এতদূর থেকে চোখে পড়ে? চোখ যে ঝাপসা হয়ে আসে।

আমাদের পড়াশোনা শেষ হয়ে গেল মধ্য পথে। মনোজের বাপ মারা যাওয়ার সময় পথ প্রদর্শক রেখে যান নি কাউকে। কিন্তু পাথেয় রেখে গিয়েছিলেন প্রচুর। কলকাতায় আমার বাবা পসারওয়ালা ডাক্তার। বাবা-মার আমি একমাত্র মেয়ে। তাহা কলকাতায় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যায়গা আছে বলে মনে হোল না। তাই সরস্বতী পুজোর পরে হোষ্টেলে না ফিরে মনোজ আর আমি এসে দাঁড়ালাম রেলওয়ে ষ্টেশনে। আমাদের সম্বল এক গোছা কারেন্সি-নোট, একটী সুটকেস, আমাদের কাঁচা ভালোবাসা, আর পৃথিবীর অভিশাপ।

২

সেই শীতের রাত্রিতে দুটোর সময় একটা ওয়ে-সাইড ষ্টেশনে আমরা নামলাম। মানুষের সংখ্যা কম। এক মিনিটের মধ্যেই বাঁশি বাজিয়ে গাড়ী চলে গেল। ঝাপসা গ্যাস লাইটটার নীচে দাঁড়িয়ে বুড়ো ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের টিকেট নিয়ে চলে গেল। প্যাসেঞ্জার যারা দু'-একজন নেমেছিল, তা'রাও নিজেদের রাস্তায় চলল। আমি আর মনোজ ছোট ওয়েটিংরুমে ঢুকে পড়লাম। ওয়েটিংরুম বটে, কিন্তু আলোর বন্দোবস্ত কিছু নেই। একটা জানালা-অস্পষ্ট যে চাঁদের আলো আসছিল তাহাতে দেখলাম, দুটো লম্বা বেঞ্চ। মেঝেটা দেশলাইএর কাঠি, পোড়া বিড়ি, ছেঁড়া কাগজ, শালপাতা—এই সবে ভর্ত্তি। আমাদের সঙ্গে ছোট একটী সুটকেস ছাড়া কিছু নেই।

আমাদের খুব পরিশ্রম হয়েছিল। এতটা রাত পর্য্যন্ত গাড়ীতে একটুও ঘুমুতে পারিনি। বেঞ্চ একটু ঝেড়ে নিয়েই র‍্যাপারটা জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। মনোজ অন্য বেঞ্চটায় চুপ করে বসে রইল। আমি খানিক পরে বললাম,—শোবে না? মনোজ চুপ করে রইল। শেষে আর দু'-একবার বলতে চুপ করে শুয়ে পড়ল। আমি বুঝতে পারছিলাম, ওর মনে তখন কী চলেছিল। আমার নিজের মনের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছিলাম।

আমার দু'-চোখ থেকে ঘুম চলে গেল। এমন অবস্থায় ঘুমোনো অসম্ভব। এতক্ষণ চোখ বুজে ভাবছিলাম। চোখ খুলতে দেখি মনোজ তার বেঞ্চে নেই। খোলা জানালার কাছে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ওর কাছে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়ালাম। ওর ডান হাতখানা আমার হাতের মধ্যে নিলাম, ও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কাছেই যেন কোথা থেকে ছোট শিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। এত রাত্রিতে এমন জায়গায়—এ রকম শব্দে বিস্মিত হয়ে গেলাম। মনোজকে বললাম—এখানে এ রকম কান্নার শব্দ আসছে কেন?

এতক্ষণে মনোজ কথা বলল। অর্থপূর্ণভাবে একটা ঘৃণিত ইঙ্গিতে জানিয়ে বললে—"বুঝছো না? কেউ ফেলে গেছে।" মনোজের কথা বলার ভঙ্গীতে আমার শরীর শিউরে উঠল। ওকে যে বাপ-মা নিজেদের অসহ্য লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ওর বাঁচবার পথ বন্ধ করে দিয়ে গেছে, যে বাপ-মার বিবেকহীন প্রেম দিনের আলোয় ওই দুর্বল শিশুকে বুকে তুলে নেওয়ার সাহস দিলে না, অন্ধকার-অরণ্যের কৃষ্ণাঞ্চলের তলে নিজেদের অপমান চাপা দিয়ে যে বাপ-মা চলে গেছে, আমার মনে হতে লাগল, তাদের সমস্ত লজ্জা অপমান আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটু পরে মনোজ বললে,—বোধ হয় মানুষ নয়, শকুনের বাচ্চা।

আমি আস্তে-আস্তে বললাম—একটু শোবে না? একটু হেসে মনোজ বললে—ঘুম কি আসে সুলতা?

কোন কথা মুখে এলো না। সত্যিই তো। ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়েছি, সেই মুহূর্তেই ত সব দায়িত্ব মাথা থেকে নেমে গেছে। কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ, ভয়-ভাবনা, লজ্জা-শালীনতা সব গেছে।

ট্রেনে এসে একবার কী কথায়-কথায় বলেছিলাম—"ভগবানের ইচ্ছে হয় যদি ত—"অমনি মনোজ আমার থামিয়ে দিয়ে বললে—"আমাদের এ প্রেমে ভগবানের ইচ্ছে বলে কোন জিনিষ নেই। আমাদের প্রেম বিশ্বের অভিশপ্ত।" কোন কথা বলিনি। বলার আছে কী?

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, জানালা দিয়ে হিমেল বাতাস এসে মুখে লাগছে। বাইরে জ্যোৎস্না নেমেছে সারা পৃথিবীর উপর—ঝাপসা, শিশির ভেজা জ্যোৎস্না। দশহাত দূরের জিনিষ চোখে পড়ে না। শুধু কী একরকম পোকার অশ্রান্ত গুঞ্জন কানে এসে বাজে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আমরা এসে বসলাম। তারপরে কোন রকমে রাতটা আমরা জেগে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ঘুমোবার আগে মনোজ বললে—সু, আগে উঠলে আমায় জাগিয়ে দিও।

ভোর হয়ে এসেছে। আমারই ঘুম আগে ভেঙে গেছে। সেই জানালাটা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত মনোজের গায়ে। ওকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মুখ শুকিয়ে গেছে। রুক্ষ চুল উড়ছে। সারারাত ঘুমুতে পারেনি। এই ভোর বেলা হঠাৎ একটু ঘুমিয়েছে। ওকে ডেকে তুলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু না তুলেও উপায় নেই। এই ভোরেই আমাদের ষ্টীমারে উঠতে হবে। এই প্রথম রাত্রি আমাদের একসঙ্গে কাটল, হঠাৎ মনে হোল, বিয়ে যাদের হয় তাদের প্রথম রাতটা কেমন কাটে? আমাদের সঙ্গে তাদের কত প্রভেদ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। পৃথিবীর মঙ্গল আশীর্বাদ নব বর-বধূর মাথায় ঝরে পড়ে। আর আমাদের ভালোবাসা অভিশপ্ত। কলঙ্কিত! আমাদের ভালোবাসা শুধু আমাদের ঘিরে। তাদের প্রেম নিজেদের নিয়ে ও সমস্ত জনসমাজ নিয়ে। আমাদের সুখ, তাদের শান্তি। তবে আমাদের বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু তার আয়ু কতটুকু?

ওর রুক্ষ চুলগুলির মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ও উঠে বলল।—অনেক দেরি হয়ে গেছে সু,—চল।

চোখ রগড়ে সুটকেসটা হাতে নিয়ে ও দাঁড়ালি। আমরা ওয়েটিং রুম থেকে বেরোলাম। ষ্টীমার ষ্টেশন দূরে নয়। আমরা তাড়াতাড়ি টিকেট করে ষ্টীমারে উঠে পড়লাম।

৩

ষ্টীমারে এসেই ওর মন হাল্কা হয়ে গেল। আবার সেই মনোজ। তেমনি হাসি খুসী, তেমনি খেয়ালী মনোজ!

নদীর বুকের ওপর প্রভাত নেমেছে। আমাদেরও এ যেন জীবন-প্রভাত। আজ ওর সমস্ত পৃথিবী যেন আমি একা। আমার ঘিরে ওর সব আনন্দ। ওর সব দেহ-মন আমায় নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে।

—দেখেছ লতা; দেখেছ? আমি ঠিক বলছি ও জেলে ডিঙিটা ডুববে।

—ডুববে না। ওগুলো ডুবেও ডোবে না।

—নিশ্চয়ই ডুববে, বাজী রাখ।—নাঃ, ডুবলো না। আচ্ছা, লতা, এই সকালে নদীর দিকে চেয়ে তোমার কোন্ কবিতাটা মনে পড়ে বলত?

—তবে চুপ করে গম্ভীর হয়ে শোন। আমি আবৃত্তি করছি। শোন, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা-

দিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।” মনোজ হেসে গড়িয়ে পড়ল।—“হয়েছে, হয়েছে, থামো। এবার আমার পালা। আমি আবৃত্তি করছি। তুমি লক্ষ্মীটির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে শোন।” মনোজ আরম্ভ করল রবিবাবুর “রাতে ও প্রভাতে।” ‘কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে।’

হাত দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করায় সে হেসে একটু সরে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগল। আমি দূরে নদী বক্ষে দৃষ্টি মেলে দিয়ে তার আবৃত্তি মুগ্ধচিত্তে শুনতে লাগলাম।

ছ-টা বাজতে ষ্টীমারের বয় চা নিয়ে এল। মনোজ বললে —“রাঁধতে হবে তোমার। দেখি কলেজে পড়া মেয়ে কেমন রাঁধে।” বললাম—খুব খারাপ রাঁধে না। কিন্তু কী রাঁধবো? আর কেমন করেই-বা রাঁধবো?

“যোগাড় করছি” বলে মনোজ চলে গেল। মিনিট পনের পরে ষ্টীমার থামলো একটা ছোট ষ্টেশনে। মনোজ ষ্টেশনে নেমে পড়ল। ফিরল রান্নার নানা উপকরণ নিয়ে। ষ্টোভ, প্যান প্রভৃতি সরঞ্জাম ভাড়া করা হোল ষ্টীমারের ষ্টল থেকে, মনোজের খুব উৎসাহ। রান্নায় আমার সাহায্য করতে লাগল। রান্নার পর্ব শেষ হলে খাওয়া। সন্ধ্যায় আমরা পৌছলাম বরিশালে।

নতুন সংসার। একটা ড্রয়িং রুম, একটা শোবার ঘর, রান্নাঘর একটা। আমার এক একটা সকাল আর সন্ধ্যা যেন আমাদের মনের খুসী দিয়ে তৈরী। যেন ভোরের আকাশে উড়ন্ত একটা পাখী—ডানায় এসে পড়েছে সকালের আলো, কণ্ঠে বেজে উঠছে আনন্দ-সঙ্গীত। রাস্তার সামান্য কুলী-মজুরকেও যেন মনে হচ্ছে অপূর্ব্ব সুখী। পৃথিবীর বেশ যেন বদলে গেছে। শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি।

বিদেশে এ ভাবে থাকতে হলে যে একমাত্র পরিচয়ে থাকতে হয় তা'র রিহার্শাল আরম্ভ হয়ে গেছে।

সাত আট দিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলে মনোজ বেরিয়েছে আমার জন্যে খানিকটা উল কিনে আনতে। আমি একা বাড়ীতে। বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠলো। দরজা খুলে দিতে দেখি বাবা আর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম, পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যেতে লাগল। তারপর আর আমি কিছু জানিনে। চান-হোল ষ্টীমারে আমায় কেবিনে রেখে বাবা বাইরে চলে গেলেন।

মনোজ এতক্ষণ কী করছে? বাড়ী এসে আমায় না দেখে মনোজ কী করবে? আর আমার অবস্থাই বা কি হবে? যে ইচ্ছে করে ঘর ছেড়ে চলে এলো, তার ওপরে এত মমতা না দেখালেই চলল না? এ ত আমার ক্ষমা করা নয়, এ যে আমার অসহ্য শাস্তি! চোখ ফেটে আমার জল বেরোতে লাগল। কিন্তু, আমার নিজের কি হবে, তার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়াল এই প্রশ্ন যে মনোজ এসে আমায় না দেখে কী করবে।

কলকাতায় এসে দাঁড়ালো আরো এক ভয়ানক ব্যাপার। বাবা ভয়ানক একগুঁয়ে লোক। আর এ রকম ক্ষেত্রে অতি সাধারণ বুদ্ধির লোকও নিজের মেয়ের কলঙ্কের কথা চাপা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাবার হোলো উলটো বুদ্ধি। মনোজের নামে কেস করলেন। আর আমি, সেই সুলতা, প্রকাশ্য আদালতে তার প্রধান ফরিয়াদী হয়ে হাজির হলাম এবং সেখানে কথাগুলো নির্বিকার ভাবে বলে এলাম। শুধু মনোজের মুখের দিকে চাইতে পারলাম না। মনোজ তখন কী ভাবল? কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না। এমন কি ছ' মাস জেলের হুকুম যখন হয়ে গেল তখনও না।

আজ মনে হয়—স্বপ্ন! সব স্বপ্ন! নইলে এ কী করে সম্ভব হোল। সেই মনোজ, আর সেই সুলতা! সেই ওয়েটিং রুমে রাত্রি কাটানো! ষ্টীমারে সেই হাস্যমুখর চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি! বরিশালে সেই স্বপ্নময় দিনগুলি! কোর্টে চুপ করে রইল, একটি কথা কইল না! একবার বলল না—“সুলতা, কী বলছ তুমি? আমার দিকে চেয়ে বলত!” তা হ'লে কি আর আমি তারই সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইতে পারতাম। আমি যে তার বিপক্ষে ফরিয়াদী এ কি তাকে ভালোবাসিনি বলে?

এর-ই চার বছর পরের কথা। এ চার বছর কী করে কেটে ছিল? তার হিসেব কি করে দেব? তার হিসেব কি দেওয়া যায়?

টাকায় না হয় এমন কাজ নেই। আমার বিয়েও ঠেকে রইল না এত কেলেঙ্কারীর পরেও। আমার স্বামী একজন উদারচেতা নবীন ব্যারিষ্টার।

সেদিন ছায়ায় বায়স্কোপ দেখে ফিরছি। রাত প্রায় দশটা হবে। হ্যারিসন রোড মির্জ্জাপুরের মোড়ে একটা রেষ্টুরেণ্টের প্রাইভেট কম্পার্টমেণ্টে। বয় খাবার দিয়ে গেছে। কে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঢুকলো। মনোজ! চমকে উঠলাম মুহূর্ত্তের জন্যে, থমকে দাঁড়িয়ে ও বাইরে চলে গেল। আমার স্বামী আমার চমকে ওঠা লক্ষ্য করেছেন। "কি হোল লতা?"

লতা! ঠিক এমনি নাম ধরে মনোজ ডাকত। বললাম —"না, কিছু না।"

হঠাৎ কেমন মনে হোল আমার স্বামীর কাছে-ই এসে ও আবার সঙ্গে কথা বলতে না চায়। তা হ'লে ত আমার শেষ আশ্রয়ও গেল। মনোজ ত আমার জীবনে থেকেও নেই। স্বামীও থেকেও নেই, কিন্তু স্বামীর আশ্রয়টুকু ত আছে!

কিন্তু সেই মনোজ কি আমার অপমান করবে? অসম্ভব! সেই মনোজ নেবে সেই স্থূলতার ওপর প্রতিশোধ! মনোজকে কি আর আমি চিনি না? সেই স্থূলতা আর সেই মনোজ!

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

সাহিত্যিক চারুচন্দ্র

শ্রীকালিচরণ মিত্র

বাংলায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ়—বিশেষ করিয়া সেই শ্রেণীর ভিতর সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যাঁহাদের খরদৃষ্টি। ছোট গল্প ও উপন্যাসের জন্যই তাঁহার খ্যাতি—কোন কোন গল্প সত্যই হীরার কুচি। প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁহার পরিচিতি লাভ তেমন ঘটে নাই —অথচ স্বচ্ছ সাবলীন ভাষার গতিতে, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে, বুদ্ধির নব নব উন্মেষে ও তথ্যপূর্ণ ব্যাপক জ্ঞানের বিকাশে, সমুজ্জ্বল তাঁহার রচনা। নানা সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রচনায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-ব্যঞ্জক 'রবি-রশ্মিতে', সত্যেন্দ্রনাথের 'কুহু ও কেকার' টীকায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী জ্ঞানের পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়।

কিন্তু সদ্য স্বর্গত সাহিত্যিকের সমালোচনামূলক বিবৃতি এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি দিক মাত্র উদ্ঘাটনের সামান্য প্রয়াস।

মনে পড়ে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন শরৎ-প্রভাতে আমার ভাগিনেয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ এক বলিষ্ঠ যুবাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এক মুখ চাপ-দাড়ি, হ্রস্বাকার, নিটোল দেহ, সংস্কৃতির ছাপ বদনে, বিনয়াবনত যুবক—হাসিতে ভরা চোখ। সত্যেন্দ্র বলিল—"বড় দরদী মানুষ ইনি, বন্ধুর কোঠায় সম্প্রতি আমাকে ফেলেছেন, প্রবাসে ছাপাখানায় হট্টগোলেও সাহিত্য চর্চ্চায় বিরত হননি।" চারুচন্দ্র যে কত দরদী তাহার ষোল আনা পরিচয় পাই সত্যেন্দ্রের অন্তিম শয্যায়? সে কি সেবা—দিন রাত্রি অবিরাম পরিচর্য্যা, হুঁস নাই নিজের আহার নিদ্রার! ছয় দিন ছয় রাত্রি মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে প্রহরীর মত জাগিয়া বসিয়া নির্নিমেষ নেত্রে—যমরাজের নিকট কবির জীবন-ভিক্ষায় যেন নতজানু। এমন বন্ধু-প্রীতি এই প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে আর দেখিয়াছি মনে হয় না। কবির অকাল-বিয়োগেও প্রাণের যোগ ছিন্ন হয় নাই বন্ধুবরের। কয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রের 'কুহু ও কেকা' তাঁহারই চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-

নয়ে বি-এ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হয়। তখন ঐ পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ নিঃশেষিত। পুনর্মুদ্রণের জন্য পত্রযোগে বার বার আমাকে তাগিদ দেন এবং স্বকৃত বিশদ মূল্যবান টীকাটিপ্পনী সংযোজিত করেন পঞ্চম সংস্করণের পরিশিষ্টে। ঢাকা হইতে আমাকে লেখেন—"ইহাই আমার শেষ বন্ধুকৃত্য। শরীর অবসন্ন, মন নিস্তেজ, সত্যেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবার ডাক আসছে।" হইলও তাই। বৎসর দুয়েকের ভিতর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর—ব্যাধি মন্দির হইয়া উঠিল, অবশেষে জোয়াল কাঁধে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন পাইকপাড়ার নিজ বসত বাটীতে। অমর লোকে দুই বন্ধুর মিলন অনাবিল আনন্দময় হউক, দূর হইতে আমাদের এই কামনা।

সত্যেন্দ্র-প্রসঙ্গে এক বাদলা উষার কাহিনী মনে জাগে। পাখীর প্রভাতী কূজন সবে থামিয়াছে, দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি তখনও ঝরিতেছে, আকাশে মেঘ সাজিতেছে, আনমনা পায়চারি করিতেছি হেদুয়ায়। সাঁতারু বেশে ভ্রমণে সঙ্গ লইলেন চারুচন্দ্র। অল্পক্ষণ মধ্যেই সত্যেন্দ্রের কথা পাড়িলেন ক্ষুব্ধচিত্তে। অনুযোগের মর্ম এই যে, সত্যেন্দ্রকে 'প্রাণের সহিত ভালবাসেন, কিন্তু সাড়া পান না। বলিলেন— "দুঃখের কথা কাহাকে বলি, আপনার কাছেই নালিশ জানাই। ব্যথিত প্রাণে সান্ত্বনা-বারি সিঞ্চন করিলাম— "বাহ্য প্রকাশ তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তবে স্নেহের অন্তঃ-সলিলা ফল্গুধারার অভাব নাই। প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে এ বিচার যথার্থ তা ধরা পড়িবে।" মাস কয়েক পরের কথা। তখন রাত্রি ১১টা। পদশব্দে পিছন ফিরিয়া দেখি—নীরব নিস্পন্দ চারুচন্দ্র। "নিশীথে বিরক্ত করলাম। আনন্দ বার্তা না জানিয়ে স্থির থাকতে পারি কৈ। আপনার কথাই ঠিক।"—চারুচন্দ্র বলিলেন স্বভাবসিদ্ধ ধীরকণ্ঠে। আকাশ পাতাল ভাবিয়া এই উক্তির কূলকিনারা পাইতেছি না বুঝিয়া কহিলেন—"সত্যেন্দ্র যে হেঁয়ালি নয় আজ বুঝেছি। তার বাহ্য প্রকাশ সম্বন্ধে কয়মাস পূর্ব্বে যে মন্তব্য করেছিলেন তার প্রমাণ পেয়ে কি যে আনন্দ! এজন্যই হানা এখানে।"—বলিয়াই নিমিষে অন্তর্ধান। চারুচন্দ্রের প্রাণ কত কোমল ও ভাবপ্রবণ আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ এই ঘটনা হইতে তাহা অনুমেয়।

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে চারুচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত গল্পের বহি "সওগাত" সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। সত্যেন্দ্রও তাঁহার পরবর্ত্তী ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'অভ্র আবীর' চারুচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন, উৎসর্গ-পত্রে লেখেন—

'বন্ধু,

দরাজ তোমার হাত
তুমি দিলে সওগাত,
কী আছে তোমারে দিতে গরীব কবির ?
হাতে বা দিতেছি তুলি
এ শুধু রঙীন ধূলি
দু'মুঠা ডালিম-কুলি অভ্র-আবীর।

দুই বন্ধুর মধ্যে কিরূপ প্রাণের যোগ ছিল এই উৎসর্গ পত্রে তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি চারুচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধার কথা সাহিত্যিক মহলে সুবিদিত। বিশ্বকবি যখন নোবেল প্রাইজ পান মনে পড়ে চারুচন্দ্র অগ্রণী হইয়া সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ ও মণিলাল গঙ্গোকে লইয়া কি পরম উৎসাহে অর্ঘ্যদানের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্র ভক্ত এই ত্রয়ী 'বঙ্গবাসী' আদি পত্রের এককালে রঙ্গ রসিকতার খোরাক যোগাইতেন।

ধন ও মানের প্রতি বিরাগ অল্প লোকেরই সারা দুনিয়ায়, কিন্তু উহার কাঙাল সকলে নয়। চারুচন্দ্রও এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। চারুচন্দ্রও 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্র-নাথের সঙ্গে একদিন ভোজনকালে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি সিনেমার প্রতি। বলা বাহুল্য, তখনও উভয়ের কোন উপন্যাস ছায়া ছবিতে রূপ গ্রহণ করে নাই। তাঁহাদিগকে বলি—ছবির পর্দ্দায় তাঁর উপন্যাস রূপান্তরিত হইলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ ঘটে (১) মানসসৃষ্ট চরিত্রগুলি সজীব হইয়া উঠে (২) লেখকের ধন লাভ ও (৩) যশ লাভ (৪) সৎ সাহিত্যের প্রচারে লোকশিক্ষার বিস্তার। চারুচন্দ্র উত্তর করিলেন (এবং উপেন্দ্রবাবুও তাহাতে যোগ দিলেন)—"ধনের বাহুল্য সে ত অন্তরের মানুষটিকে দেয় পীড়া, যশে আসল বস্তুর ঘটে হানি, কাজ কি ধর্না দিয়া সিনেমার দেবতাদের দুয়ারে।"

চারুচন্দ্রের বহু উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির ও তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার তারিফ (appreciation) করিয়া 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' পত্রে একটি দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হয়। বিশিষ্ট সংবাদপত্রে প্রশংসামুখর এই আলোচনায় তিনি যেমন নির্ব্বিকার ছিলেন, 'শনিবারের চিঠিতে' আক্রোশমূলক ও নিন্দাপূর্ণ একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হইলেও তেমনই অবিচলিত তাঁহাকে দেখা যায়। চলতি ধারণা অনুযায়ী ভক্ত বা সাধক 'অথবা গীতোক্ত হিতৈষী মুনি' অবশ্যই তিনি ছিলেন না, কিন্তু কি নীরব সাধনার বলে বা প্রাক্তন সংস্কার বশে 'অনুদ্বিগ্নমনা দুঃখে সুখে চ বিগত স্পৃহ'—সুখে অচল ও দুঃখে অটল থাকিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে, কে বলিবে?

সংসারী হইলেও চারুচন্দ্র প্রবল অর্থলিপ্সার ধার ধারিতেন না। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে সুপরিস্ফুট। সচ্চরিত্র ও সুদর্শন যুবক পুত্র এম-এ উপাধিধারী, পিতা মাসিক পাঁচশত বেতনভোগী ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক—বিবাহের বাজারে এরূপ সৎপাত্রের মূল্য কত, বাংলার পাঠক ও পাঠিকাগণকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। চারুচন্দ্র বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন পূর্ব্ববঙ্গবাসী নির্ধন স্কুল মাষ্টারের কন্যার সহিত—কন্যাও রূপগুণান্বিতা হইলেও খুব উচ্চশিক্ষিতা বা অনিন্দ্যসুন্দরী নয়।

চারুচন্দ্রের মত অক্লান্তকর্ম্মী ও অধ্যবসায়ী মানুষ বাংলায় বিরল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'এর মত দুইখানা অতিকায় মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করা যে কোন লোকের পক্ষেই সুকঠিন, তাহার উপর নিত্যনূতন নানা বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ যে কি শ্রমসাধ্য ব্যাপার তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য। এক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষীর উক্তি—প্রতিভার নামান্তর শ্রমশীলতা। এই সংজ্ঞা যদি মানিতে হয় তাহা হইলে চারুচন্দ্রকে প্রতিভাবান বলা চলে।

শ্রমশীল ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হন—সাধারণ নিয়ম। চারুচন্দ্রেরও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দুরূহ কাজের ভার দিয়াও সকলেই নিশ্চিন্ত থাকিতেন যে, প্রাণপাত করিয়াও যথাসময়ে তিনি তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন। বন্ধুবান্ধবের কত যে বেগার অম্লানবদনে খাটিয়াছেন সারাজীবন তাহার শেষ নাই। খাঁটী সহৃদয় মানুষ তিনি।

মেকির প্রতি, অতিরঞ্জন বা অসত্যভাষণের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। এজন্য অনেক সময় অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে তাঁহাকে, তাঁহার অগণিত বন্ধুবান্ধবের তাহা অবিদিত নাই। দাম্ভিকতা ও pedantryর উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। ঐরূপ প্রকৃতির লোক উচ্চপদস্থ হইলেও তাহাদের সংস্রবে আসিতে ঘৃণা বোধ করিতেন, তাহার প্রমাণ অনেকবার পাইয়াছি।

এমন একটি খাঁটী মানুষ, সাহিত্যিক প্রকৃতি বলিলে যেমনটির ধারণা মনে উদয় হয় তাহাই ছিলেন চারুচন্দ্র। তাঁহাকে হারাইয়া বাংলা সাহিত্য রত্ন হারাইল, সমাজেরও ক্ষতি প্রভূত। আর আমরা—তাঁহার সখ্য গর্ব্বিতেরা কিসে যে বঞ্চিত হইলাম তাহা প্রকাশের ভাষা কৈ-নাই।

শ্রীকালিচরণ মিত্র

STUDENTS' P. G. A COMMON-ROOM

কোথা আজি তারা

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

আজিও মরেনি পৃথ্বী—ধমনীতে তার
উল্লসিত পদক্ষেপ শুনি অনিবার
শাশ্বত প্রাণের। ফুলের সৌরভ-ভরা
পুঞ্জিত প্রলাপে তার মদালস-করা
আনে আজো আকুলতা। প্রশান্ত সন্ধ্যায়
ক্ষণেক্ষণে ভেসে আসে ঝিরিঝিরি বায়
চামেলি সুরভি সম প্রিয়ের পরশ।
গহন নিশুতি রাতে মদির বিবশ
চাঁদ খুলিয়া দিগন্ত-দ্বার আসে নামি
তন্দ্রাতুর বনতরুশিরে। অন্তগামী
রক্ত সূর্য্য অকাতরে আজিও ছড়ায়
চূর্ণিত হীরককণা মেঘের চূড়ায়।
ঋতুতে ঋতুতে আজো অশ্রান্ত চরণে
ছুটে চলে রূপ-লক্ষ্মী বন-উপবনে
ছড়ায়ে নূতন প্রাণ সুদক্ষিণ করে—
হেসে উঠে কাশবন; নদীর মর্ম্মরে
জেগে উঠে নবপ্রাণ; বেলা-বালুকায়
ফেলিয়া সচল ছায়া উড়ে চলে যায়
চঞ্চল খঞ্জনা-সারি; শ্যাম শষ্পগুলি
নীরব সঙ্কেতে আজো ডাকে বাহু তুলি
আকাশের নীলিমায়। কেটে গেছে কত
কাল, কত কল্পযুগ—তবুও অক্ষত
আজো ধরার যৌবন!—
হেরি', মুগ্ধ কবি
বিরলে বসিয়া ভাবি রয়েছে ত সবি—
কোথা শুধু তারা? পূর্ণিমা-বাসরে বসি'
যৌবনের সুধা-পাত্র অধরে পরশি'
চেয়েছিল যারা হায় আমাদেরি মত
ধরনীর মুখপানে নিমেষ-নিহত!
স্নায়ুশিরা শততন্ত্রী দেহ-বীণাখানি
ঝঙ্কারি' উঠিয়াছিল যাদেরো না জানি
কত না বিচিত্র সুরে। কদম্বের মত
রোমাঞ্চি' যাদেরো মর্ম্ম উঠিত সতত
ভালবাসি' ধরনীর ধূলি ও পরাগে
ভালবাসি' জীবনের স্নিগ্ধ অনুরাগে।
কোথা আজি তারা? কোন্ বিস্মরনী-কূলে
পাতিল শ্মশান-শয্যা সবে গেছে ভুলে।

———

ছায়াপট

"বাণীনাথ"

সাথী

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স লিঃ
কাহিনী ও পরিচালনা—ফণী মজুমদার
চিত্রশিল্পী—দিলীপ গুপ্ত ও সুধীশ ঘটক
শব্দযন্ত্রী—লোকেন বোস
সুরশিল্পী—রাইচাঁদ বড়াল

চরিত্রলিপি

মঞ্জু—কানন
ভুলুয়া—সায়গল
অমরচাঁদ—শৈলেন চৌধুরী
ত্রিলোকনাথ—অমর মল্লিক
ছোট ভুলুয়া—সুধীর

নিউ থিয়েটার্সের নূতন অবদান "সাথী" গত ৩রা ডিসেম্বর চিত্রা ও নিউ সিনেমায় এক সঙ্গে মুক্তিলাভ করেছে। সাথীর গল্পাংশ হচ্ছে—গ্রাণ্ড ট্র্যাভেলিং থিয়েটার দলভুক্ত একটি বকাটে ছেলে ভুলুয়া একটি দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে জগত্তারিণী হোমের গরীব মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। এরা পালিয়ে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নাচ গান করে কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেখান হতে এরা একদিন এলো কলকাতায়। বহু দুঃখ বিষাদময় জীবন কাটাবার পর অবশেষে সুখের দিন দেখা দিল। একদিন মঞ্জু রাস্তায় গান গাওয়ার সময় নামজাদা অভিনেতা অমরচাঁদের নজরে পড়ে যায়। ফলে মঞ্জু ত্রিলোকনাথের ডায়মণ্ড থিয়েটারে চাকরি পেল কিন্তু ভুলুয়াকে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা মিথ্যে আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখল, সে চাকরি পেল না। মঞ্জুর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নাম, যশ ও পয়সায় গর্বা নূতন মঞ্জু ভুলুয়ার সেই পুরাতন সাথীকে এক রকম বিদায় দিল। অমরচাঁদ হলো তার কাছে প্রিয়—মঞ্জুর প্রতি অমরচাঁদের দুর্ব্বলতা বেশ দেখা দিল। অন্য দিকে থিয়েটারের মালিক ত্রিলোকনাথ অমরচাঁদের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ ভুলুয়ার কাছে কুৎসা রটায়। ভুলুয়াও বুঝতে পারল —মঞ্জুর মনের বিকৃত অবস্থা—কোনখানে তাদের গভীর বিরোধ। কাউকে না জানিয়ে আবার সে পথে গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ল এবং ঝড়ের মুখেই সেই পুরাতন সাথী মঞ্জুকে আবার নিবিড় করে কাছে পেল।

সাথী তরুণ পরিচালক ফনী মজুমদারের প্রথম ছবি। সাধারণতঃ নূতন পরিচালকদের প্রথম ছবির যে দোষ-ত্রুটি থাকা সম্ভব সাথী চিত্র সম্পূর্ণ ভাবে সেই অভিযোগ হতে নিজকে মুক্ত করতে পারে নি। এই সাথী চিত্র হয়ত বড়ুয়ার 'দেবদাসের' ন্যায় চলচ্চিত্রে ফনী মজুমদারকে অমর করে রাখত। শুধু নিজের ভাগ্য দোষে সেই সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ছবিখানির সমাপ্তি হয়েছে। মূল চিত্রের চিত্রনাট্য তৈরী করবার সময় গল্পের দিক দিয়ে দোষ ত্রুটিগুলি পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়িয়ে গেছে নইলে আরও পৃথক, উন্নত ধরনে ছবি রূপালী পর্দায় দেখতাম।

সাথীর কাহিনী অনেকাংশে বিদেশী ভাবাপন্ন। নৃত্য-গীত মুখরিত সাথীর ন্যায় এমন উৎকর্ষ বিদেশী ছবি আমরা দেখে থাকতে পারি। কিন্তু সাথীর মত চিত্র বহুদিন আগেই দর্শকদের উপহার দেওয়া উচিত ছিল। ভারতীয় ছবির গল্পের ধারা এক ভাবেই বয়ে চলেছে। সেই পুরাতন পৌরাণিক কাহিনী, নয় বাঙ্গে নব্য সভ্যতার ড্রইং রুম দৃশ্য এবং সমাজের একস্তরের ছেলে মেয়েদের জীবন কাহিনী শুনাবার জন্তে বিজ্ঞ পরিচালকরা এতদিন ব্যস্ত ছিলেন।

সাথী চিত্রে নৃত্যরতা কানন দেবী

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

সাথী চিত্রের একটি দৃশ্যে
কানন ও সায়গল

সাথী চিত্র চলচ্চিত্রের সেই অভাব দূর করেছে। প্রচুর অভিজ্ঞতার জোরে ছবির গল্পের নবতর ভাবধারার সন্ধান দিয়ে ফণী মজুমদার আমাদের আশানুরূপ খুসী করেছেন। যাদের আমরা ভুলতে চলেছিলাম সেই পথের বাউল, তাঁদের

নিউ থিয়েটার্সের নূতন "সাথী" চিত্রে কানন এবং শৈলেন চৌধুরী

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদপূর্ণ ঘটনাগুলি নিপুণ কারিগরের মত ছবির ভাষায় পর্দায় দেখিয়ে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে ফণী মজুমদার একটুও কার্পণ্য করেননি।

সাথী চিত্র দোষমুক্ত নয় এ আমরা আগেই বলেছি। প্রধান অভিযোগ আমাদের যে সাথী ছবির সেটের মধ্যে যারা চলাফেরা করেছেন তাঁদের কথাগুলি খুব উন্নত, স্বচ্ছ, সুন্দর ও উপভোগ্য হয়নি। "পুরুষ কি চায়, মেয়ে মানুষ —" এমন উক্তি ত্রিলোকনাথের মুখে শোভা পেলেও ভদ্র শ্রেণীর দর্শকদের নিকট এ অশ্লীল ইঙ্গিত খুব তৃপ্তিকর নয়। মাঝে মাঝে প্রত্যেক চরিত্রগুলি একই সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেছে। সত্যিকার পুরুষ চরিত্রে সেই মেয়েলী

ন্যাকামী বাংলা চলচ্চিত্রের একটা বড় অভিযোগকেও খণ্ডন করতে পারেনি। অমরচাঁদ, ভুলুয়া ও মঞ্জুর মনের অন্তর্দ্বন্দ্বটুকু অনেক স্থলে ঘটনার আবছায়ায় বাধা পেয়েছে। তারপর চিত্রনাট্যকার ভুলুয়া ও মঞ্জুর চরিত্রকে গড়ে তোলবার জন্ত ইচ্ছে মত অমরচাঁদের সাহায্য নিয়েও শেষের দিকে খুব জটিল ও

STUDENTS' P.G.A COMMON-ROOM

সাথী চিত্রে কানন এবং সায়গল

চঞ্চলতাময় করে তুলতে পারেননি। মঞ্জু থিয়েটারে যোগদানের পর বিশেষ ঘটনার অভাবে স্থানে স্থানে static হয়ে পড়েছে। ছবির আরম্ভ আমাদের বেশ লেগেছে। সায়গল ও কাননের অপূর্ব্ব সঙ্গীত চিত্রের সব' চেয়ে বড় সম্পদ। যদিও সায়গল ও কাননের অধিকাংশ গান আমাদের মোহাবিষ্ট করেনি তবুও কয়েকটি গান ভুলবার নয়। রেডিয়োর সামনে সায়গলের গান এবং চিত্রের শেষ হিন্দি সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করেছে। সাথী চিত্র বিয়োগান্ত না হয়ে ভুলুয়া ও মঞ্জুর মিলনের মধ্যে দিয়ে শেষ করে পরিচালক বুদ্ধিমতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথী চিত্র বিশুদ্ধ আনন্দ দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে ষ্টুডিয়োর কর্ণধার বেশ লাভবান হয়েছেন।

সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে কানন, শৈলেন চৌধুরী ও সুধীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বেশ দরদ দিয়ে সায়গল ও কানন দুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্রকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাননের নাচ খুব উপভোগ্য হয়নি তবে গান ও অভিনয়ে মঞ্জুকে জীবন্ত করে তুলেছে। শুধু পরিচালনার গুণেই সায়গলের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছে।

ছোট ভুলুয়া বেশে ছুষ্টু সুধীরের উৎকৃষ্ট অভিনয় গুণে ছবি প্রথম মুখেই জমেছে। শৈলেন চৌধুরীর অমরচাঁদ বেশ

হয়েছে। চিত্রনাট্যের দোষেই অমরচাঁদ আরো উন্নত, হৃদয়-গ্রাহী সুন্দর চরিত্রাঙ্কণ হতে পারে নি। ত্রিলোকনাথ বেশে অমর মল্লিকের নূতনত্বের অভাব বেশ লক্ষিত হয়। সেই একই ধরনে কথাবার্ত্তা, আমাদের দৃষ্টিকে বার বার আঘাত করে। ছোট খাট ভূমিকায় নরেশ বোস (কবি), ভানু বানার্জ্জি (রেডিয়ো ম্যানেজার), বোকেন চট্টো (নবু), অহি সান্যাল (সঙ্গীত শিক্ষক) ও পরেশ (মধু) উল্লেখ-যোগ্য হয়েছে। কবি ও সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নরেশ বোস ও অহি সান্যাল হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ভানু ব্যানার্জ্জিকে আমরা কোন প্রধান চরিত্রে দেখতে চাই।

সঙ্গীত প্রধান ছবিতে রাইচাঁদের কৃতিত্ব কম নয়। সাথীর সঙ্গীত উচ্চ শ্রেণীর হয়েছে বলা বাহুল্য। আলোক শিল্পীদ্বয় দিলীপ গুপ্ত ও সুধীস ঘটক প্রথম ছবি হিসেবে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ বেশ উত্তম।

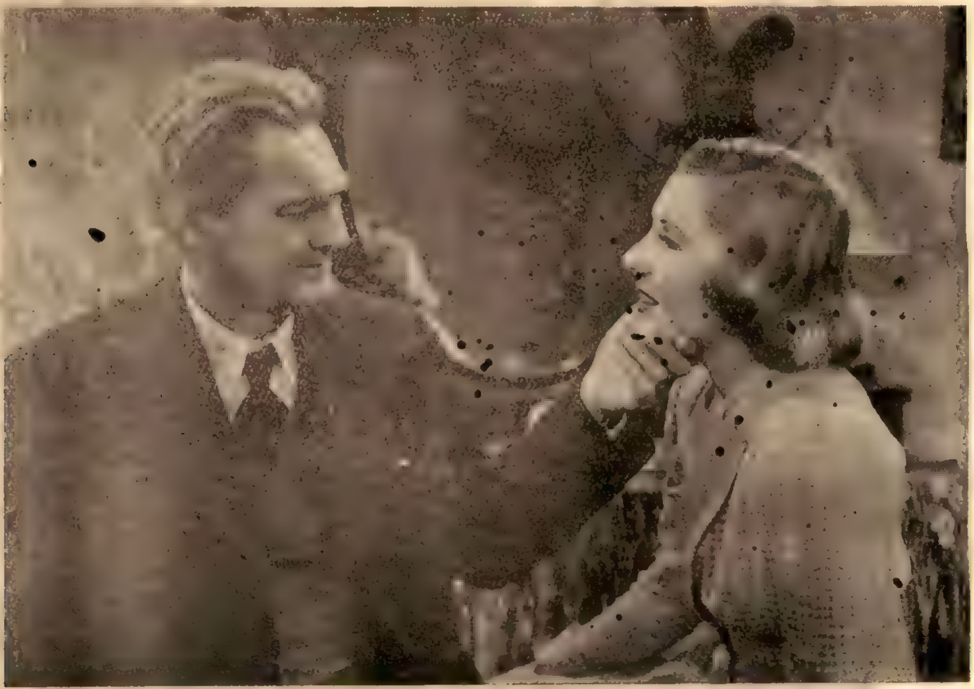

ফ্রাঙ্ক কাপরার পরিচালিত 'ইউ কানট্ টেক ইট উইথ ইউ' ছবির একটি দৃশ্যে :
লাওনেল ব্যারিমুর এবং জিন আর্থার

লোকেন বোস ও তাঁর সহকারী শ্যামসুন্দর নিজেদের দক্ষ-তার পরিচয় দিয়ে 'সাথীকে' সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। চিত্র সম্পাদক কালি রাহার কাজ বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছে।

ষ্টুডিও সংবাদ :

নিউথিয়েটার্স :

অধিকার—কিছুদিন হ'ল 'অধিকার' চিত্রের ট্রেলার চিত্রা ও নিউসিনেমায় দেখানো হচ্ছে। অধিকারের ট্রেলারখানি আমাদের ভাল লেগেছে। সাথী চিত্রখানি আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ করায় এই চিত্রের মুক্তিলাভ পেছিয়ে পড়েছে। প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর নূতন ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। ছবিটির নাম হচ্ছে "রজত জয়ন্তী"। বহুদিন আগে এই চিত্রের চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি হ'তে ছবিটির সুটিং আরম্ভ হবে।

দুসমন—নীতিন বসুর পরিচালনায় এই ছবির কাজ,

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর 'জনক-নন্দিনী' চিত্রের একটি দৃশ্যে :
সুশীল রায় এবং শ্রীমতী সাবিত্রী

প্রায় শেষ হয়ে এলো। স্যানাটরিয়ামের বন্দী-রুগী সাইগল মনের দুঃখে গান গাইছেন হয়ত গীতাদেবীর জন্যে। স্যানাটরিয়ামের পরিচালক বেশে জনপ্রিয় অভিনেতা পৃথিরাজ দেখা দেবেন। ডুসুরন চিত্রের পর নীতীন বসু কিছুদিন নিশ্চয়ই ছুটি উপভোগ করবেন কারণ আমরা একটা সুখবর পেলাম শীঘ্রই তিনি বিবাহ করছেন। এরপরে নীতীন বসুর কাছ হ'তে একটি ভাল ছবি আমরা আশা করতে পারি।

কুণ্ডলাকে নিয়ে পরিচালক ফণী মজুমদার ভীষণ ব্যস্ত আছেন। কারণ এই তিনজনকে নিয়েই ছবির যা কিছু। মতিবিবি বেশে কমলেসকুমারী ভালই অভিনয় করছেন। মিস্ লীলা দেশাইয়ের কপালকুণ্ডলা পর্দ্দায় চাঞ্চল্য আনা উচিত। নবকুমার বেশে নাজাম সুন্দর অভিনয় গুণে নাম কিনবেন। এবার কাপালিক বেশে জগদীশ কিছু নূতনত্ব দেবার চেষ্টা করবেন, সন্দেহ নাই। শব্দ গ্রহণ করছেন লোকেন বোস্ ও চিত্র গ্রহণ কাজে দিলীপ গুপ্ত আছেন।

কলঙ্কিয়া টুণ্ড্রা ছবির একটি দৃশ্য

বড়দিদি—ছবিখানি অমর মল্লিকের পরিচালনায় প্রায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে এলো। মথুরবাবু—সুরেন্দ্রনাথের ম্যানেজার হিসাবে দেখা দেবেন ইন্দু মুখার্জ্জি। হাসপাতালে সুরেন্দ্রনাথের অসুস্থ অবস্থার দৃশ্যগুলি নেওয়া হয়েছে। এই ছবির শেষে হেমচন্দ্র বহুদিনপর একটি বাংলা ছবি তুলবেন। অনাথ আশ্রমের পর হেমচন্দ্র প্রায় দু'বছর পরে আবার পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করবেন—এত দীর্ঘ সময় তরুণ পরিচালকদের কেন অযথা বসিয়ে রাখা হয় এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ষ্টুডিয়োর কর্ত্তৃপক্ষরা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

কপালকুণ্ডলা—মতিবিবি, নবকুমার ও কপাল-

ইউনিট ব্যবস্থাপক হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা বোকেন-চট্টোপাধ্যায়।

বিষের বাঁশী—দেবকী বসুর পরিচালনায় এর কাজ দ্রুত চলেছে। কানন একদিন ভোল বদলিয়ে ছেলে হিসেবে চন্দন চরিত্রে অবতীর্ণা হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে এসেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়ল দলের লোকের কাছে। তবে চন্দনের নূতন প্রিয়তম পাহাড়ীর বুদ্ধি কৌশলের জোরে চন্দন সেযাত্রা বেঁচে গেল। এদিকে গুণ্ডাদের হাত হ'তে রতীন (বিক্র) ভীষণ চেষ্টা করছে চন্দনকে পাবার জন্যে ! দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত রতীন ও পাহাড়ীর এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কে জয়ী হয়।

STUDENTS' * COMMON * P.G.A

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োঃ

পরশমণি—প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় শ্রীভারত-লক্ষ্মীর ছবি 'পরশমণির' কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। অভিনয়ের পর পরশমণি আরো অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হবে—এ আশা করা অন্যায় নয়।

আধুনিক সমাজের তরুণ তরুণীদের নিয়ে এই ছবির কাঠামো তৈরী হয়েছে। দুর্গাদাস অর্থাৎ মোহিত একজন ধনী ব্যাঙ্কার। মোহিত খুব চরিত্রবান ছিলেন না কিন্তু তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড় একটা অপবাদ ছিল—বর্ত্তমান শিক্ষিতা তরুণীদের তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। রাণীবালা (এলা) এই মোহিতের জীবনে কম অভিনয় করেনি। একদিন এই মদ্যপায়ী চরিত্রহীন মোহিত যাঁর স্নিগ্ধ পরশে

ভারতলক্ষ্মীর আগামী আকর্ষণ 'পরশমণি' চিত্রে সীতার ভূমিকায় শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তাকে দেখা যাইবে
পরিচালক—প্রফুল্ল রায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের অভিনব সামাজিক চিত্র

—পরশমণি—

ভূমিকায়
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা, রাণীবালা, কুমারী বীণা বাগচি বি-এ, অরুণা দাস, প্রভা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, রবি রায়, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, সুলেখা চাটার্জ্জী, সত্য মুখার্জ্জী প্রভৃতি।

পরিচালকঃ
প্রফুল্ল রায়

কাহিনীঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালকঃ হিমাংশু দত্ত, সুরসাগর

সেটিংসঃ সুধাংশু চৌধুরী

গীতিকারঃ শৈলেন রায়

সঙ্গীতঃ
পরীতোষ শীলের অধিনায়কত্বে হিজ মাষ্টার ভয়েসের শিল্পী সংঘের অর্কেষ্ট্রা

শীঘ্রই আসিতেছে।

নব জীবন লাভ করল—সে সেই মোহিতের ঘৃণিত শিক্ষিত নারী সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে—নাম সীতা (জ্যোৎস্না)। অভিজ্ঞ পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের সুষ্ঠু কলাজ্ঞানের প্রচুর ইঙ্গিত এই ছবিতে আমরা পাব। দুর্গাদাস, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, তুলসী ল্যাহিড়ী, প্রভা, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, অরুণা দাস প্রভৃতি নামজাদা আর্টিষ্টরা এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তারপর ভূতপূর্ব ল' কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বাগচির মেয়ে মিস্ বীণা বাগচি, বি, এ ও অরুণা বাগচি পরশমণিতে যোগদান করতে চারিদিকে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। লীলা দেশাই, সাধনা বোস, প্রতিমা দাসগুপ্তা ও প্রতিমা মুখার্জ্জির পর বীণা বাগচির আবির্ভাব চলচ্চিত্রের দিক দিয়ে ষ্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষরা লাভবান হবে সন্দেহ নাই। পরশমণির দৃশ্যপট পরিকল্পনা করেছেন—প্রথিতযশা আর্টিষ্ট সুধাংশু চৌধুরী। অভিনয় চিত্রে এঁর হাতযশ সকলের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেছে। আলোকশিল্পী ও শব্দযন্ত্রীর কাজে যথাক্রমে বিভূতি দাস ও চার্লস ক্রীড নিযুক্ত হয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)। ছবির সঙ্গীত রচনা করেছেন, শৈলেন রায়। অজস্র অর্থব্যয়ে শ্রীভারতলক্ষ্মীর স্বত্বাধিকারী প্রযোজক বাবুলাল চোখানির নূতন অবদান 'পরশমণি' রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে।

রাধা ফিল্ম:

জনক নন্দিনী—রাধা ফিল্মের নূতন পৌরাণিক চিত্র 'জনক নন্দিনী' ২১শে জানুয়ারী রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। পৌরাণিক ছবিতে রাধার বেশ সুনাম আছে। ফণী বর্ম্মার পরিচালনায় এই ছবিখানি সকলের প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হবে, সন্দেহ নাই। এতে অভিনয় করেছেন—চিত্র জগতে সুপরিচিত অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন, সাবিত্রী, সুশীল, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, জহর প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ।

"বাণীনাথ"

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

প্রাদেশিকতার প্রসার ও তাহার প্রতিকার

লঘু ও গুরু এবং কৃত্রিম ও প্রকৃত বহুবিধ জিনিসকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতেছে তাহা কাহারও সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। আমাদের দুর্ব্বলতার মধ্যে তৃতীয় পক্ষের যে স্বার্থের সুযোগ রহিয়াছে এই প্রকার আন্তঃপ্রাদেশিক বিসম্বাদের মধ্যে সেই সুযোগই বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। প্রদেশগুলির বিভাগ ভাষার সীমা অনুসরণ না করায় কেহ প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাইয়াছে এবং কেহ উচিত প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহার ফলে একপক্ষের লোভ এবং অপর পক্ষের ক্ষোভ উদ্রিক্ত ও তাহা কলহের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই সকল ব্যাপারের প্রতিকার আবশ্যক কিন্তু, তাহার জন্য যে পন্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহাতে পারস্পরিক বিদ্বেষ বাড়িয়া যাইতেছে, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা দৃঢ়মূল হইতেছে এবং জাতির অগ্রগমনের শক্তি বিভক্ত হইয়া ক্ষীণ হইতেছে। এই প্রকার কোনও ব্যাপারে কোন পক্ষের আতিশয্যই মার্জ্জনীয় নহে এবং কোনও এক পক্ষের অন্যায় আতিশয্যের উত্তরেও অপর পক্ষের আতিশয্য (যদিও তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়) সমর্থনযোগ্য নহে। এক পক্ষের উষ্মা ও বিদ্বেষবর্জ্জিত দৃঢ়তা অপর পক্ষের অন্যায় ব্যবহারকে লজ্জা দিতে পারে।

প্রদেশ বিভাগের অস্বাভাবিকতা ব্যতীত ও প্রাদেশিক বিদ্বেষের মূলে আরও কতকগুলি কারণ আছে এবং এ কারণগুলিকেও বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করিয়া আমরা তাহার হাতে অসহায় ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। বাঙ্গালীরা যাহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত এইপ্রকার এমন একটি কারণের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিব। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সকল প্রদেশেই একটা বিদ্বেষের ভাব সম্প্রতি দেখা যাইতেছে এবং যাঁহাদের হাতে ন্যায় বিচার পাইবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশা করা যাইতে পারে সেই কংগ্রেসী সরকারের হাতেও তাঁহারা প্রত্যাশিত সুবিচার পাইতেছেন না। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বঙ্গের প্রদেশগুলিতে যে সময় শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্বজ্জনোচিত চাকরিতে ও ব্যবসায়ে সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই ছড়াইয়া পড়েন। অন্য অন্য প্রদেশের লোকেরা বড় বড় দায়িত্বশীল পদে এবং সামাজিক পদমর্য্যাদায় নিজ নিজ প্রদেশে বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার ও কিছু কিছু যোগ্য লোক সব প্রদেশেই বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীদের প্রতি ঈর্ষা হইতে লাগিল এবং তাহাই বর্ত্তমানে তীব্র বাঙ্গালী বিদ্বেষের আকারে দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার জন্য বাঙ্গালীরা দায়ী নহেন; আবার অন্যদের পক্ষেও ঈর্ষার ভাব অন্যায় হইলেও অস্বাভাবিক নহে। কাজেই, উভয় পক্ষের ধীরতা ও সুবিবেচনা ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা

নাই। আবার এই বাংলাদেশেরই শিল্প ও ব্যবসা সবই প্রায় ভিন্ন প্রদেশবাসীদের হাতে। বাংলাদেশ হইতে কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর ভিন্ন প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে অথচ বাংলার ঘরে ঘরে দারিদ্র্য দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। বহুলক্ষ অবাঙ্গালী বাংলাদেশ হইতে তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিতেছে অথচ; কর্ম্মের অভাবে কর্ম্মক্ষম বাঙ্গালীরা বেকার হইয়া বসিয়া আছে। এই অবস্থার জন্য স্বভাবতঃই অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মনে অসন্তোষ জাগিতেছে। কিন্তু, ইহার জন্যও অন্য প্রদেশবাসীরা দায়ী নহেন। বাঙ্গালীদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতার সুযোগেই এই সকল সুবিধা তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে এবং রহিয়াছে। শ্রমসাধ্য কাজগুলিও বাঙ্গালীর শারীরিক অপটুতার জন্য অন্যদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। ইহার জন্য রাগ করিয়া লাভ নাই। যাহাতে আমাদের এই চরিত্রগত ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে, যাহাতে আমরা এই সকল ক্ষেত্রে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকলের প্রতিকারের জন্য সাধারণতঃ যে সকল পথ অবলম্বিত হইতেছে তাহাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না—মাত্র কলহের ফলে প্রাদেশিকতা দানা বাঁধিবে এবং ফলে প্রত্যেকেরই অসুবিধা বাড়িয়া যাইবে। এই প্রকার কলহের মধ্যে যাহাদের স্বার্থ আছে, ইহার মূলে যাহাদের হাত আছে, প্রাদেশিক প্রসঙ্গ বিচার করিবার সময় তাহাদের কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে—

আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাপারসমূহে কোন প্রকার তীব্রতার দ্বারা যেমন ফল লাভ করা যাইবে না এবং তাহাতে কাহারও লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না—তেমনই, কোন প্রকার স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়ের অথবা কাহারও লোভের অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্রতাশূন্য যুক্তি ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। যে সকল ক্ষতি শুধুমাত্র বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ (যেমন সরকারী চাকরি প্রভৃতিতে ন্যায্য অংশ না পাওয়া প্রভৃতি) সে সকল ক্ষতি, প্রয়োজন হইলে তীব্রতা হ্রাসের জন্য এবং সমগ্র জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য—উপেক্ষা করাও অনেক ক্ষেত্রে সুবিবেচনার কাজ হইবে। কিন্তু, যে সকল ক্ষতি মাত্র বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ভবিষ্যতের মধ্যেও প্রসারিত, তাহার সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সচেতন হইবার প্রয়োজন আছে।

বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির ভবিতব্যের পক্ষে এবং সমগ্র ভারতের স্বার্থের পক্ষে তাহার প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক। আগামী সেন্সাসের সময় যাহাতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা যথেষ্ট কম দেখা যায় তাহার জন্য বিহারে এখন হইতেই তোড়জোড় চলিতেছে—এইরূপ শঙ্কাজনক সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বিগত সেন্সাসগুলির তুলনা করিলেও এই প্রকার অন্যায়ের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। স্থানীয় বাঙ্গালীদের পক্ষে এজন্য সংঘবদ্ধ হইবার, সকল বাঙ্গালীকেই বিপদের গুরুত্বের কথা বুঝাইয়া বলিবার এবং সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রকার আন্দোলন যে আত্ম-রক্ষামূলক এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবার নীতি যে এখানে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে সে কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে।

বিদ্যালয়সমূহেও নানা প্রদেশে বাঙ্গালী ছেলেদের পক্ষে বাংলা শিক্ষার সুযোগ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইতেছে। বাংলা হইতে দূরে অ-বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন —বাংলা ভাষাই একমাত্র তাঁহাদের ও বাংলার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে। শিক্ষার স্বাভাবিক ও সহজ সুযোগ না থাকিলে, অনেকের পক্ষেই বাংলা শিক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে এবং ক্রমে ক্রমে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে মাতৃভাষা পরিহার করিতে হইবে। এই ক্ষতি তাঁহাদের পক্ষেও যেমন অপূরণীয় হইবে—বাঙ্গালী জাতির পক্ষেও অঙ্গহানি নিতান্তই অবাঞ্ছিত হইবে। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে এই অবিচার প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে বিস্তৃত হইতেছে। যুক্ত প্রদেশে শিক্ষার বাহন হিন্দি বা উর্দ্দু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ছাত্রের মাতৃভাষা নহে) আবশ্যিকভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়ায়

সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের বাংলা শিক্ষার পথে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার বেঙ্গলী এসোসিয়েসন বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছেন এবং প্রতীকারের আশা করিতেছেন। স্থানীয় বাঙ্গালী মেয়েদের বাংলা দেশে বিবাহ হওয়া যে অসম্ভব হইবে—তাঁহারা এ যুক্তিও দেখাইয়াছেন।

প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলন

বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে নানা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানের সাধনা, সমস্যার বৈচিত্র্য ও জটিলতা, আমাদের চিন্তা ও আদর্শের ধারা এবং কর্ম্ম ও প্রচেষ্টার গতি ও পথ—এ সকলেরই আভাষ এই সকল সম্মেলনের বক্তৃতা ও প্রস্তাবাদির মধ্যে পাওয়া যাইবে। ইহাদের সম্পর্কে যে সকল কথা বলিবার আছে তাহা বলিবার মত স্থান আমাদের হাতে নাই। এই সকল সম্মেলনের মধ্যে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলনের উপযোগিতা সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন বলিয়া ইহার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে।

সাহিত্যকে আমরা চিরন্তন ও শাশ্বত বলিয়া জানি। দেশ ও কাল ইহার চারি পাশে কোনও গণ্ডী টানিতে পারে না—কোনও কৃত্রিম সীমারেখা টানিয়াও ইহাকে বিভক্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। যাহাদের ভাষা জানি না, যাহাদের আচার ব্যবহার সুখ দুঃখের সংবাদ আমরা রাখি না, তাহাদেরও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে আমরা একান্ত নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। যে যুগের সহিত বর্ত্তমানে আমাদের কিছুমাত্র সংযোগ নাই, সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি আজও আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ আসন পাইতেছে। এই জন্যই, প্রগতি-সাহিত্যের নামে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ভেদ রেখা টানিবার প্রয়োজনীয়তা কি হইতে পারে, এ প্রশ্নটা অনেকের মনে উঠিয়াছে।

মানুষের মন সবদেশে সবকালে মূলতঃ এক বলিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা সকল দেশে ও সকল কালের মধ্যে ব্যাপ্ত। যে দেশেই হোক বা যে কালেই হোক পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রামে, অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করিবার জন্য মানুষকে যে চেষ্টা করিতে হইয়াছে তাহার রস ও স্বাদ সকল দেশের সকল কালের মানুষকে আনন্দ যোগাইতে পারে বলিয়া সাহিত্য দেশ ও কালের সীমা পার হইয়া যায়। কিন্তু, মানুষের মন যেমন মূলতঃ এক, তেমনি আবার যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহাকে অবস্থান করিতে হয়, এবং যে সব প্রতিকূলতার সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা দেশে দেশে কালে কালে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়। সাহিত্যের আদর্শ, প্রেরণা এবং লক্ষ্যও সেই জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অন্য সকল দেশের ন্যায় আমাদের দেশও এক বিপুল পরিবর্ত্তনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সংঘর্ষের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। সাহিত্যের মধ্যেও এই দুইটি প্রেরণা কাজ করিতেছে। একটির লক্ষ্য অতীতের দিকে আর একটির লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে। সাধারণ লোক অতীতের সহিতই অভ্যস্ত বলিয়া যাঁহারা ভবিষ্যতের পূজারী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, মত প্রচারের উদ্দেশ্যে আন্দোলন সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের সংঘবদ্ধ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ও ভারতবর্ষ—

য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ পুরাপুরি অর্থে ভারতবাসী। ভারতবর্ষ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য বাসভূমি নাই এবং ভারতবর্ষের ভাগ্যের সহিত তাঁহাদের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু, প্রভুজাতিদের সহিত তাঁহাদের রক্তের সম্পর্ক আছে বলিয়া তাঁহাদেরই দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহারা ভারতবাসীদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা ইউরোপীয় রক্তের গৌরবে গর্ব্বিত ছিলেন এবং ভারতীয়ত্বের লজ্জা মুছিয়া ফেলিয়া দিতে ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ইউরোপীয় জীবনযাত্রার নিখুঁত অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভারতীয়-

গণও তাঁহাদিগকে অনাত্মীয় মনে করিতে শিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তাঁহারা কোনও সহানুভূতি এপর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু, নিজেদের মনের অন্ধ অহঙ্কার ব্যতীত প্রভু জাতিদের সহিত যে তাঁহাদের আর কোন সংস্রব নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতবাসী হিসাবে ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করা ব্যতীত যে গত্যন্তর নাই সে কথা রূঢ় আঘাতে [প্রধানতঃ অর্থ-নীতিক নিরাশ্রয়তার চাপে] তাঁহারা কিছুদিন হইতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের একাধিক নেতা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি এ্যাংলোইণ্ডিয়ান এবং ডোমিসাইলড্ ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় মিঃ কে-ই-ওয়ালেস তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ক্রমবর্দ্ধিত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলিয়াছেন। শিক্ষার দিক দিয়া যাহাতে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্কুলগুলি ভারতীয় পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিচালিত হয় তাহার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চাপ দিবার কথা বলিয়াছেন। কোন একটি ভারতীয় ভাষা ভালভাবে শিখিবার প্রতিও ইনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। ভারতীয় ভাষা অর্থাৎ ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যে প্রদেশের লোক তাঁহারা সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিলে এবং তাহার মধ্য দিয়া তাঁহাদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিলেই তবে, এদেশীদের সহিত তাঁহাদের প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পরিণয়

'ইছামতী'

অবশেষে প্রজাপতি ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ মিলিল। স্বর্ণের আহুতিতে পরিতুষ্ট বিধাতা অকৃপণ হস্তেই আশীষ বর্ষণ করিলেন।

কালো মেয়ে নীলা। সে নীলিমার এমন সুষমা নাই যাহা লইয়া উচ্ছ্বসিত হওয়া চলে। ঠাকুমা নাম রাখিয়াছিলেন—কালিন্দী, সুরুচিসম্পন্ন ভাইএর তাগিদে সে নাম দাঁড়াইল নীলাতে। নামে শ্রী আসিল, কিন্তু নারীর দেহে এমন শ্রী ছিল না যাহা বর্ণের গ্লানি ঢাকিয়া দিতে পারে।

এবার আসিলেন বাপ। আশ্বাস দিলেন চিন্তার কারণ নাই। কন্যার দেহে রূপ না রহিলেও তাহার পিতার লৌহ সিন্দুকে রূপার অপ্রতুল নাই।

বাবা দূরদর্শী। লৌহ সিন্দুকস্থ বস্তুর চাকচিক্যের ছটায় ধাঁধা লাগে না, এমন বৈবাহিক বাংলা দেশে কয়টী আছে? নীলার কৃষ্ণবর্ণ ছাপাইয়া সিন্দুকস্থ রজতদ্যুতি সুযোগ্য পিতার চোখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রূপের জন্য রূপা উপেক্ষা করিতে হইবে এমন নির্ব্বোধ তিনি নহেন। পুত্র কমল। সার্থক নাম। লোকে বলে যেন রাজপুত্র। কন্যার পিতা চাহিয়াছিলেন অর্থের বিনিময়ে উপার্জ্জনশীল পাত্র। উপরি হিসাবে এমন রূপও মিলিয়া যাইবে দেখিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ভাবী বৈবাহিকের পণের মোটা অঙ্ক সাগ্রহে সমর্থন করিয়া ফেলিলেন।

পাত্র কমলের মুখ ভার হইয়া উঠিল। নব যুবক তার সুপুরুষ। কল্পনায় যে মানসীর সন্ধান সে করে তাহার সহিত মিল আছে তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, হেলেনের। শ্রীহীন নীলা তাহার মনের নাগাল পাইবে কি করিয়া? "পিতরি প্রীতিমাপন্নের" জের আর চলিল না। মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এ বিবাহ চলিবে না।

জননী বলিলেন "অবোঝ হয়ো না। তোমার নিজের বোনটিরও তো বিয়ে দিতে হবে। টাকার দরকার। রামগোপালবাবু এত টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। সুন্দরী মেয়ে

আনলে এত টাকা কোথায় পাব? স্বার্থপরের মত নিজের ভাবনা ভেবো না; বোনের কথাও ভাব। আমরা মা বাপ যা করছি তাতে তোমার ভালই হবে। আর বাইরের রূপ ক'দিনই বা থাকে? ওইতো ও বাড়ীর বউ বিয়ের সময় এল যেন ডানাকাটা পরী, আর এখন যেন শ্মশানের কঙ্কাল। এই আমি তো সময় কালে সুন্দরী কম ছিলাম না. আর আজ তার কিই বা আছে?" বলিয়া গৃহিণী সক্ষোভে নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কন্যার বাড়ীতেও ঈষৎ প্রতিবাদ উঠিল। রামগোপাল বাবুর পুত্র বলিল "বাবা—এত টাকা দিয়ে নীলার বিয়ে দিচ্ছেন?"

পিতা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "না দিলে ভাল ছেলে পাব কোথায়?"

পুত্র মনস্থির করিয়া বলিয়া ফেলিল "সুষি বড় হয়ে উঠেছে, তার জন্যও তো কিছু রাখতে হয়।"

সুষী রামগোপাল বাবুর পৌত্রী সুষমা। বয়স ১০ বৎসর। রামগোপালবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "সেজন্য আমার মেয়েকে জলে ফেলতে পারি না। তোমার দশ বছরের মেয়ের বিয়ের ভাবনা তুমি এখন থেকেই ভাবছ, আমার আঠার বছরের মেয়ের বিয়ের ভাবনা আমি না ভেবে পারি কি করে?" অপ্রতিভ পুত্র সরিয়া পড়িল।

অন্তঃপুরে পুত্রবধূ কেশবিন্যাস করিতেছিলেন। সুষি আসিয়া সরোদনে বলিল "মা, বাঁ কানের দুলটা কোথায় পড়ে গেছে, পাচ্ছি না খুঁজে।"

মা সগর্জ্জনে বলিলেন "বেশ করেছ—হারিয়েছ। কপালে তো আর জুটবে না কিছু। যা কুচোটুকু আছে তাও হারিয়ে বসে থাক।"

—বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী নীলার পানে কটাক্ষপাত করিলেন।

বাক্য ও কটাক্ষের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীলা ম্লানমুখে উঠিয়া গেল।

ভাঁড়ার ঘরে মা সুপারী কাটিতেছিলেন, নীলাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "এমন ময়লা কাপড় পরে আছিস্ কেন? কাপড়টা ছেড়ে ভাল দেখে পরে আয়, আর মুখটাই বা এমন হয়ে আছে কেন? সাবান দিয়ে ধুয়ে তোদের সেই স্নো পাউডার একটু মেখে নে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সবাই ভালবাসে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তুই যেন এমন নোংরা হয়ে থাকিস না। ভাল শাড়ী ব্লাউস পরবি, স্নো পাউডার মাখবি। পোড়া বিধাতার শত্রুতায় রংটা হয়েছে ময়লা, এখন নিজে একটু পরিস্কার না হলে লোকে পছন্দইবা করবে কেন?"

মাতা হইয়া কন্যার নিকট রূপচর্চ্চার সম্বন্ধে আর কত বলিবেন? কন্যা মায়ের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া মুখ লাল এবং অধিকতর ম্লান করিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

এবার আসিলেন মামী। ভাগিনেয়ীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন "ও কিরে, মুখ ম্লান করে আছিস কেন? কালো কুচ্ছিৎকেও হাসলে ভাল দেখায়। আর দেখ শ্বশুর বাড়ীতে বরের কাছে গোমরা মুখ করে থাকিস না। পুরুষ মানুষ গোমরা মুখ পছন্দ করে না।"

প্রত্যুত্তরে ভাগিনেয়ীর মুখ গোমরাতর হইল।

শুভক্ষণে সাড়ম্বরে শ্রীমতী নীলার শ্রীমান কমলের সহিত শুভ-পরিণয় সমাধা হইল। রামগোপালবাবু অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। লোকে বলিল—"হ্যাঁ ঘটা বটে।"

সুসজ্জিতা, সালঙ্কৃতা নীলার পানে চাহিয়া মনে হইতেছিল আভরণ মানুষের শ্রীহীনতাই প্রকট করিয়া তোলে। রক্তপট্টাম্বর ও মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যের পাশে নীলার কৃষ্ণবর্ণ শ্রীহীন দেহ যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

সখী মায়া সোৎসাহে বলিল "নীলা, কি সুন্দর তোর বর হয়েছে। সত্যি বলতে তোকে তার পাশে মানায় না। তোর কপাল ভাল বলতে হবে।"

নীলা ভাবিল সত্যিই কি তাই? ভাগ্যবতী সে? রূপহীনার রূপবান স্বামী লাভ কি সৌভাগ্য?

রূপসী বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছিল কালো বরের সাথে। সে বাঁকা হাসিয়া বলিল "কালো আর আলোর মিলনই সর্ব্বদা হয়। কালোর পাশে আলো না দাঁড়ালে আলোর মর্য্যাদা কে বুঝবে?"

অবিবাহিতা কন্যাদের মাতা ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন এমন রাজপুত্র জামাতা তাঁহাদের ভাগ্যে হইল না কেন?

সুস্মিতার মাতার কথাবার্তায় বিচক্ষণতা কোনকালেই ছিল না। ফস্ করিয়া নীলার মাকে বলিয়া বসিলেন "তোমার কপাল জোর বটে হিরণ। আমি তো আমার সুন্দর মেয়ের জন্যও এমন ছেলে পেলাম না।"

সুন্দরী সুস্মিতা নীলার হাত ধরিয়া এক পাশে টানিয়া লইয়া বলিল "হ্যাঁ ভাই, এমন গম্ভীর মুখ করে আছিস্ কেন? আজ তো তোর স্মরণীয় দিন। প্রথম মিলন, তার এমন সুন্দর বর।"

সখীর দিকে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া নীলা বলিল "সুন্দর বর আমার কি দেখে ভালবাসবে ভাই?"

পাত্র গৃহে।

ফুলশয্যার তত্ত্ব আসিয়াছে। পাত্র-জননী সগৌরবে সমবেত অভ্যাগতাবৃন্দকে বৈবাহিক প্রদত্ত দ্রব্যাদি দেখাইতেছেন। মহার্ঘ্য দ্রব্যদানে বৈবাহিক তাঁহার পুত্রের মর্য্যাদা প্রকটকরিয়া তুলিয়াছেন। সে মর্য্যাদা লোক সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

"ও ননীর মা, এই দেখ কমলের ধুতি ১২ খানা শান্তিপুরী। এই চারখানা সিল্কের চাদর পাঞ্জাবী।"

ননীর মা বলিলেন "ওমা, শীতকালে সিল্কের পাঞ্জাবী গরম কাপড় চোপড় দিতে পারেনি?" "তা আবার দেয়নি! এই দেখ গরম সুট, সার্ট, পাঞ্জাবী আর এই যে কাশ্মীরি শাল।"

লবঙ্গ বলিলেন "জুতো দেখি দিয়েছে দু'জোড়া। আর চটি দু'জোড়া।"

কামিনী বলিলেন "আর বাসন পত্র ওতো কম নয়। কত বড় বড় হাঁড়ি কড়াই। থালা বাটিও অসংখ্য।"

সুহাসিনী নববধূর গোছাভরা চুড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন "বাপরে গয়নাগুলোও কম নয় দেখছিনা। হাত ভরে গেছে দেখছি। জড়োয়া চুড়িও দিয়েছে।"

পাত্র-জননী বলিলেন "হ্যাঁ চুড়ী তিন সেট, দু'সেট্ সোনার, একসেট্ জড়োয়ার।" বলিয়া বধূকে বলিলেন "ও বউমা, তোমার গলার হারটা নেকলেসের নীচে চাপা পড়েছে, বের করে দাও।"

অভ্যাগতা জজগৃহিণী বলিলেন "পালঙ্কখানা বড় সুন্দর তো। এ রকম একটা আমি করাব।"

জজ-গৃহিণীর পুত্রবধূ বলিল "আর এই ড্রেসিং টেবলটাও চমৎকার হয়েছে। আমিও ভাবছি এ রকম একটা করালে বেশ হয়।"

জজ-গৃহিণী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "না বাছা তুমি আর ঝামেলা বাড়িওনা। ড্রেসিং টেবলের তো কমতি নেই বাড়ীতে। আরও চাও তোমার বাপের বাড়ী থেকে আনলেই পার। আমার ছেলেওতো বড় কম চাকরী করে না। তোমার বাবা এর অর্দ্ধেক জিনিষও দেয়নি।"

অপর এক অভ্যাগতা বলিলেন "সেটা বাপু তুমি বলতে পার না, তোমার এমন সুন্দর বউ। এর উপর আবার বউএর বাপ দেবে কি?"

জজ-গৃহিণী প্রসন্নমুখে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কমলের মাতা পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলাকে বলিলেন "ও স্বর্ণ। প্রণামীর কাপড়গুলো ঠিক করে সাজাও, দামী শাড়ী নষ্ট যেন না হয়।"

"দেখি দেখি কি কাপড় দিয়েছে?" অভ্যাগত মহিলাবৃন্দ সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। "ওমা, এই যে শাশুড়ীর জন্য বেনারসী, আর এই যে আর সবার জন্য গরদ, শান্তিপুরী। কত দিয়েছে একবার চেয়ে দেখ।"

এমনি করিয়া কন্যার পিতা প্রদত্ত মহামূল্য দ্রব্যের সমারোহে নিমন্ত্রিতাদের উচ্ছ্বসিত স্তুতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আর এই সমারোহের পশ্চাতে নব গৃহলক্ষ্মীর অমূল্য হৃদয়খানা ব্যর্থতায় কাঁদিয়া উঠিল। সেদিকে দেখিবার কেহ ছিল না।

ওদিকে পাত্রের বন্ধুবান্ধবদের জটলাও চলিতেছিল পুরাদমে।

সুরেশ বলিতেছিল "কমলটার কপাল ভাল। এমন শ্বশুর পাওয়া সোজা কথা? কি সুন্দর ঘড়ি দিয়েছে দেখ। এর দাম দুশো টাকার কম নয়।"

কমল বলিল "আর শ্বশুরকন্যার কথাতো বললি না।"

সুবোধ বলিল "যাই বলিস্ বাবু অমন একটা শাঁসালো শ্বশুর পেলে আমি স্বয়ং মন্থরাকেও বিয়ে করতে রাজী আছি।"

প্রবীর বলিল "না ভাই, আমি টাকার লোভ করি না। আমি চাই সুন্দরী বউ। লক্ষ্মী আমার লোহার সিন্দুকে অধিষ্ঠান না করে নাইবা করল, কিন্তু—গৃহে আমার লক্ষ্মীর বিরাজ করা চাই।"

কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সুসজ্জিত কক্ষে পুষ্পাকীর্ণ শয্যায় নীলা আসিল। নবদম্পতির প্রথম পরিচয়। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কমল ধীরে ধীরে নীলার হাতখানি তুলিয়া লইল। নীলা কম্পিত বক্ষে নীরবে মুখ পানে চাহিল। এমন করিয়া তাহার হাতখানিকে কেহ এত মর্য্যাদা দেয় নাই তো। কত প্রেম, কত আদর ইহাতে মিশ্রিত রহিয়াছে। তাহার হাত যে এত অমূল্য তাই তো সে আগে জানিত না।

কমল বলিল "তোমার চুড়ীগুলো বড় সুন্দর। কেমন চিক্ চিক্ করছে? এর দামও অনেক, না?"

নীলা হাত সরাইয়া লইল।

খানিকক্ষণ ইহা তাহা বলিয়া কমল বলিল "আচ্ছা বিয়ের সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটী, সে কে?"

নীলা মৃদুস্বরে বলিল "আমার বন্ধু সুস্মিতা।"

কমল অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া ফেলিল, "বড় সুন্দর মেয়েটী, চাঁপা রঙের শাড়ীখানাতে চমৎকার মানিয়েছিল!"

নীলা নিজের পরণের সোনালী শাড়ীখানার দিকে. এক বার চাহিয়া সম্মুখস্থিত বিশাল দর্পনের দিকে চাহিল, তার পর মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

"ইছামতী"

নবজন্ম

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

মাধবীয়া পূর্ণিমা শুভ লগনে
জোছনার ধারা ঝরে সারা গগনে।
ব্যর্থতা হাহাকার আপন করে
যতনে মুছায়ে দেয় আদর ক'রে।
মরণ আহত বুকে আঁধার ঢালা,—
শেষ ক'রে দেয় এনে আলোর ডালা।
প্রাণের নিভৃত পুরে বিষের দাহ,
নিবে পেয়ে জোছনার কি অবগাহ।
নূতন জীবন জাগে সুখের সুরে—
দ্যুলোকের বাঁশী বাজে দুখের পুরে।
নব-তর যৌবন, নূতন প্রাণে,
সাজায় প্রেমের ডালা নূতন দানে।
জোছনা-আসবমিশা দখিনা বাতে
নূতন জনম লাভ জোছনা রাতে।

STUDENTS' COMMON-ROOM P.G.A

বিলুপ্তি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মুখরা তোমার উছল বাক্য ধারা
ভাসায়ে দিল যে আমার রুদ্ধ কারা।
নিবিড়তা ভাঙ্গি টানিয়া আনিল ভিড়ে
বহুদিনের মৌন এ মনটিরে।

এতোকাল ধ'রে বসিয়া ঘরের কোণে
স্বপনের জাল বুনেছি আপন মনে।
দেখিনিতো কভু মুদিত নয়ন খুলি
কেমন পৃথিবী কেমন ধরার ধুলি।

হঠাৎ কখন তোমার কণ্ঠস্বরে
স্বপন আমার ভাঙিল কেমন ক'রে।
নামায়ে আনিল এমন পৃথিবী মাঝে
যেখানে আমাকে কখনো মানাবে না যে!

অবিরাম হেথা ঘুরিছে কাজের চাকা
বালুকা ধুলিতে আকাশ বাতাস মাখা;
ঘর্ঘর ধ্বনি উঠিছে গগন ভ'রে
ক্ষণে ক্ষণে হেথা দিবস রজনী ধ'রে।

এ কথা এখনো বুঝিতে নাইতো বাকি।
ফাঁক নাই হেথা এখানে চলে না ফাঁকি।
তাইতো কিছুতে ভরসা পাই না খুঁজি
ভাবিয়া পাই না কি আছে আমার পুঁজি।

স্বপ্ন-বিলাসী কর্ম-বিমুখ মন
শুধু খুঁজি ফেরে গোপন কক্ষ কোণ।
কিছু যে জানিনে এ কথা তুমি তো জানো
তবু কেনো হেথা আমাকে টানিয়া আনো?

এ কথা শুনিয়া তোমার আঁখির কোলে
অশ্রুর দুটি মুকুতাবিন্দু দোলে।
এ কথা কি তব কোমল বক্ষতলে
বেদনা-সায়ক হানিছে প্রতিটি পলে?

দীনতা আমার আমার অক্ষমতা
দিল কি তোমারে কঠিন মর্মব্যথা?
ভাঙিল কি তব যতেক স্বপ্ন আশা
এ কথা শুনিয়া মুখরা হারালে ভাষা?

নতুন করিয়া হে মোর বাক্যহারা
ভাসালো যে মোরে তোমার নয়নধারা
রসের সরসী অকালে শুকালো তব
অশ্রুসাগর তৃপ্ত হোলো কি নব?

হয় যদি হোক্ ভয় কি এসোনা চলে
ডুবিব দুজনে অতল সাগর তলে।
গভীর নিবিড়ে দুজনে সুপ্ত রবো
পৃথিবী হইতে আমরা লুপ্ত হবো।

সতী ফল্‌স্‌—শিলং

কুমারী কল্যাণী সরকার

বিশ্বসাগর মন্থন ক'রে অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্ভার নিয়ে কবি গড়েছিলেন নৃত্যচপলা সুন্দরী উর্ব্বশীকে, তাকে হার মানিয়ে দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেছেন এই অপূর্ব্ব সুন্দর দেশ। শিলংএ এলে মনে হয় এ যেন সুন্দরের রাজ্য—এখানে কোথাও অসুন্দরের স্থান নেই। সৌন্দর্য্যের মণিকোঠার সমস্ত অমূল্য সম্পদ্‌ দিয়ে ভগবান যেন এই দেশটাকে গড়ে তুলেছেন।

শিলংএর কথা ভাব্‌তে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় "সতী ফল্‌স্‌ (falls)"-এর কথা। স্মৃতির খাতায় অনেকটা স্থান জুড়ে আছে এই জলপ্রপাত। "A thing of beauty is a joy for ever" কবির এ বাণী যে চিরন্তন সত্য।

শিলংএ আসবার আগেই শুনেছি এই জলপ্রপাতের কথা, তখন থেকেই এটা দেখবার ইচ্ছা। এখানে এসে ক'দিন থেকেই ভাবছি সেখানে যাবো, কিন্তু খামখেয়ালী বৃষ্টির জন্য আর হ'য়ে ওঠে নি। সেদিনও ভোর থেকেই টপটিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিলো, তবু ভাবলাম—আজকে যেতেই হবে। সবাই মিলে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। যাহোক, কিছুদূর যেতেই বৃষ্টি থেমে গেল, মেঘ কেটে বেরিয়ে এল সুনীল আকাশ।

এখানকার কয়েকটা পথ এ কয়দিনে চিনে নিয়েছি। কিন্তু সেই চেনা-পথের সীমানা পেরিয়ে গেলেই একেবারে অসহায়। পাহাড়ের গায়ে ঘুরে' ঘুরে' এত রাস্তা গিয়েছে যে কোন্‌ পথে যাবো ভেবেই উঠতে পারি না। এখানকার এমনই মজা যে, সমস্ত পথগুলোই গোল হ'য়ে ঘুরে' গিয়েছে। পূবে যেতে হয়তো দক্ষিণে—চল্‌তে হবে উত্তর দিকের পথ ধরে। দুজন খাসিয়া লোক পথের ধারে বসে পাথর ভাঙছিল। ওদের ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস্‌ করলাম—

'সতী ফল্‌স্‌' কোনদিকে বল্‌তে পারো?'

ওরা অবাক্‌ হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

বল্লাম—ফল্‌স্‌ চেনো না? পাহাড় থেকে যে জল পড়ে? আমার ভাঙা হিন্দী ওদের বোধগম্য হ'ল না। একজন বল্‌লো—আমরা এসব ইংরাজী বুঝি না।

অন্য লোকটার বুদ্ধির মাত্রা একটু বেশী, 'সে ফল্‌স্‌'এর এমন ঠিকানা দিয়ে দিল সে জায়গা এখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। ওদের আশা ছেড়ে দিলাম।

একটী ছেলে যাচ্ছিল—দেখেই বুঝলাম বাঙালী। জিজ্ঞেস করলাম—খোকা, 'সতী ফল্‌স্‌' কোথায় জানো?

ছেলেটী মাথা নেড়ে বল্‌লো—হ্যাঁ, খুব জানি, এই বাঁদিককার রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবেন ওই পাহাড়ের উপরে।

মনে মনে বেশ অবাক্‌ হ'লাম। এই খাসিয়ারা জন্মাবধি এই পাহাড়ের বুকে আছে, জলপ্রপাত ওদের চিরসাথী। পাহাড় থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে, এতে দেখবার কি আছে এরা বোঝে না। তাই এই বিদেশী বাঙালী ছেলেটী যে খোঁজ দিতে পারলো ওরা তা' পারলো না।

সামনের পথ ধরে এগিয়ে চল্লাম। হঠাৎ ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামলো। এখানে কখন যে বৃষ্টি নাম্‌বে কিছুই বোঝবার জো নেই। তাই সব সময়েই ছাতার বোঝা বইতে হয়।

কতদূর গিয়ে পথটা এক পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। চারিদিকে সু-উচ্চ পর্ব্বত, তার উপরে দীর্ঘ পাইনগাছের সারি কোন্‌ সুদূর অতীতের সাক্ষী হ'যে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনও জনমানবের বসতি নেই। অন্য জায়গায় হ'লে যেতে ভয় পেতাম। কিন্তু খাসিয়াদের সঙ্গে এ

কয়দিনের পরিচয়েই বুঝেছি ওদের মন কত সুন্দর। কাজেই নির্ভয়ে এগিয়ে চল্‌লাম।

চারিদিক নির্জ্জন-নিস্তব্ধ। তারই মাঝে এই ছায়াশ্যাম গিরির বুক চিরে' এক পাহাড়ে নদী যেন উচ্ছল আনন্দে কল্ কল্ করে বয়ে যাচ্ছে। নদীর তীর ঘেঁসে সরু এক পায়ে-চলা পথ চলে গিয়েছে। পথের একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে, অন্যদিকে গভীর খাদের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই ছোট্ট নদীটা। এবার জুতো খুলে রেখে খালি পায়ে চল্লাম, কারণ এত সরু পথ যে জুতো পিছলে গেলেই সর্ব্বনাশ।

অনেকক্ষণ থেকেই প্রপাতের কলরোল শুনতে পাচ্ছিলাম, এবার চোখ তুলতেই দেখতে পেলাম সাম্‌নে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্ভার। গিরিশিখর থেকে এক ক্ষীণ জলস্রোত বয়ে এসে এখানে পাথরের গায়ে ধাক্কা পেয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড হয়ে নীচে পড়ছে। তার পরেই বয়ে গেছে ছোট নদী হয়ে। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম সেই ফেনিল উচ্ছ্বাসের দিকে। জলরাশি যেন আনন্দে ফুলে উঠে' পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। অশান্ত-উদ্দাম সে। কিন্তু নীচে গিয়েই তার সেই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা থেমে গেছে। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম এই প্রপাতের দিকে। তার রজতশুভ্র কায়া নবারুণের স্বর্ণালোকে ঝিক্‌মিক্ করছে। নৃত্যচপলা অপ্সরীর মত বঙ্কিম ভঙ্গীতে নেচে চলেছে যেন উচ্ছল আনন্দে। মনে হ'ল—মানুষ বৃথাই তার শক্তির গর্ব্ব করে। চির সুন্দরের সৃষ্টির মাঝে যে কত সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে, মানুষ যুগ যুগান্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তো তার একাংশও গড়ে তুলতে পারছে না!

জলের অশ্রান্ত কলরোল, নবারুণের সরমকুণ্ঠিত স্বর্ণদীপ্তি, আর পাইনের বক্ষের মৃদু কম্পন সেখানে যেন এক অপরূপ রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রকৃতির সেই মৌন সৌন্দর্য্যের মাঝে লুকিয়ে আছে যে আনন্দসম্ভার তা সত্যি অতুলনীয়!

প্রপাতের ঠিক উপরে কতকগুলো বড় বড় পাথর। নেমে গিয়ে সেই পাথরের উপরে বস্‌লাম। প্রপাতের তুহিন স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম পায়ের উপর।

কঠিন পাহাড়ের বুক চিরে' চলেছে এই ক্ষীণকায়া নদীর জয় যাত্রা—তার ওপারে উঠেছে এক খাড়া পাহাড়। সেখানে কালো পাথরের গায়ে অনেকের নাম লেখা। আমাদের আগে যারা এখানে এসেছিল তারা নিজেদের নাম লিখে রেখে গেছে। অনেক নাম অস্পষ্ট হয়ে মুছে গিয়েছে তবে দু' তিনটা নাম এখনো নিজেদের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে পেরেছে। সেগুলো বোধ হয় অল্প কদিন আগের লেখা।

আমাদেরো নাম লেখবার সখ চাপলো। কিন্তু কি দিয়ে লিখি? হঠাৎ চোখে পড়লো এক জায়গায় তিনটে পাথর উনুনের মত করে রাখা হয়েছে, আর সেখানে পড়ে আছে একটা আধপোড়া কাঠ কয়লা। আমাদের আগে হয়তো কারা এখানে এসে চড়ুইভাতি করে গিয়েছে—এ তারই চিহ্ন। এমনি করেই ধবার বুকে সবাই আসে যায়—পড়ে থাকে হয়তো তাদের দু' একটা চিহ্ন, ধীরে ধীরে সে চিহ্নও যায় মুছে। মূক ধরণী অনন্ত কাল শুধু দেখে আসছে এই লীলাখেলা।

হঠাৎ এক সঙ্গিনী বল্লেন—ওপারে যাবে? এই দেখ জলের ভিতর কী সুন্দর পাথর রয়েছে, এর ওপর পা দিয়ে বেশ যাওয়া যায়।

সবাই লাফিয়ে উঠলাম—নিশ্চয় যাবো। কিন্তু পাথরের উপর এক পা দিতেই পা পিছলে গেল। সাম্‌লে নিয়ে ফিরে এলাম। স্রোতের মুখে পাথর ফেলে দেখলাম হুস্ করে কোথায় যে চলে যায় তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। একটু পিছলে গেলেই একেবারে সলিল সমাধি, কাজে কারো যাবার সাহস হ'ল না। অগত্যা কয়লাটুকু তুলে নি এপারেই পাথরের এক কোণে নিজেদের নাম লিখে রা লাম। পরক্ষণেই মনে হ'ল—নিজেকে অমর করে রাখ জন্য মানুষের কী ব্যর্থ প্রয়াস। সে জানে যে মৃত্যু এ একদিন তার জীবনের উপর কালো যবনিকা টেনে দেবে কিন্তু মৃত্যুর পরেই জগৎ তাকে ভুলে যাবে একথা সে ভাবতে পারে না। তাই সে এমনি করে নিজের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আমিও সেখানে নিজের না উজ্জ্বল করে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। নিয়তি হয় অলক্ষ্যে হেসেছে। দুদিন পরেই এই নাম যাবে মুছে

র ব্যর্থতা দেখে নিষ্ঠুরা নিয়তি শুধু হাসবে। এটাই নব জীবনের বড় ট্র্যাজেডি।

র সুন্দর জায়গা যে ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হয় না। চ্ছ না হ'লেও ফিরতে তো হবেই। এই তো মানুষের । কোথাও থেমে থাকবার উপায় নেই—তাকে শুধু চলতে হবে চিরজীবন। এক-জায়গায় নীড় বাঁধতে ই সেখানকার মেয়াদ তার ফুরিয়ে আসে। আবার য় চলতে হয় সামনের দিকে—পিছন ফিরে তাকাবার য় হয় না।

মরাও সেই জলপ্রপাত পিছনে ফেলে এগিয়ে চল্লাম। দেখলাম এক সাইনবোর্ডে লেখা—Eagle Falls, হ'য়ে গেলাম। সঙ্গিনী বল্লেন—'সতী ফল্‌স' এর pread Eagle Falls—এখানে নাকি এক সতী রিয়েছিলেন, তারপর থেকে এর এক নাম হয়েছে ফল্‌স'।

পথে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পাথর পড়ে আছে। সবাই মিলে কাড়াকাড়ি করে পাথর কুড়িয়ে রুমালে বাঁধতে লাগলাম। শেষটায় এক এক জনের রুমাল পাথরের ভারে ছিঁড়ে পড়বার যোগাড়। হঠাৎ চোখে পড়লো—পাইন গাছের গায়ে সবুজ রংএর কি যেন লেগে আছে। কাছে গিয়ে দেখি—moss (শ্যাওলা)। অবাক হ'য়ে গেলাম, moss যে এত সুন্দর হ'তে পারে তা' কখনো কল্পনাও করি নি। কোনটা ফুলের মত, কোনটা সুদৃশ্য পাতার মত, কোনটা মৌচাকের মত—এত সুন্দর, যে, না দেখলে বুঝা যায় না। সবাই মিলে নানারকমের moss সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম।

ভাবলাম—এমন সুন্দর জায়গা, আর একদিন আসতেই হবে। তখন জানতাম না যে, সে বিদায়ই হবে চির-বিদায়।

কুমারী কল্যাণী সরকার

আচার্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের গগনে তিনি ছিলেন সমুজ্জ্বল ভাস্কর। তাঁর তিরোধানে বাঙলা দেশ যে পরিমাণ জ্যোতি হারাল তা সহজে ফিরে আসবার নয়। শুধু দর্শন শাস্ত্রেই যে তাঁর প্রতিভা বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা নয়; বিদ্যার বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। জাতি-তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতিই শুধু নয়, ইংরাজি সাহিত্যেও তাঁর অধিকার যথেষ্ট ছিল। গত বৎসর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক তাঁর ইংরাজি কবিতার পুস্তক The Eternal Quest প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে' স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হ'ন। পরে তিনি ভারতবর্ষের কয়েকটি কলেজে যথা, নাগপুরে মরিস কলেজে, বঙ্গদেশে বহরমপুর কলেজে এবং কুচবেহারে ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের পদ অধিকার করেন। ১৯২০ সাল হ'তে ১৯৩০ সাল, দশ বৎসর কাল, তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহীশূর সরকারী কার্যনির্বাহক বিভাগের অন্যতম সদস্যও তিনি ছিলেন। ১৮৯৯ সালে ওরিয়েন্টালিষ্টস্ কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হ'য়ে তিনি রোমে গমন করেন। এবং ১৯১১ সালে লণ্ডনে প্রথম ওয়ার্লড রেস্ কংগ্রেসে তিনি আলোচনার উদ্বোধন করেন।

আচার্য শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার সম ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে Calcutta Philosophic Societyর রৌপ্য জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হয়। সেই তাঁর বহু সংখ্যক ছাত্র, দেশবাসী এবং গুণগ্রাহী বহু দেশ বিদেশ হ'তে প্রশস্তি প্রেরণ করেন। বিলাতের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চান্সেলার এবং কলিকাতা বিদ্যালয়ের কমিশনের সভাপতি সুবিখ্যাত পণ্ডিত মাইকেল স্যাডলার সেই সময়ে আচার্য শীল মহাশয়ে প্রশস্তি পাঠান তৎপাঠে বোঝা যায় পাশ্চাত্য দে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আসন অধি করেছিলেন। স্যর মাইকেল স্যাডলারের প্রশস্তি থে আমরা নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত ক'রে দিলাম:—

"May one of his pupils (for pupil I during the years 1917-19 and shall alv revere him as one of my 'Gurus') express few words love and admiration for Dr. B jendra Nath Seal. * * * He was indeed, gui philosopher and friend to me. * * * But e more remarkable than his command of English vocabulary is the fact that in English he writes a style of his own. His English has the distinction of his personality. When you r one of the most characteristic sentences in essay written by him in English, you say t

yourself. That is written by Dr. Seal and no one else but Dr Seal could have written it. Every word as well as the cast of thought which determined the choice and order of his words bears the authentic mark of his personality. That personality we honour and love. We salute him with reverence and gratitude."

মৌলানা শওকত আলী—

মৌলানা শওকত আলীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ বিশেষত লীগ সম্প্রদায় যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব্বভাগে মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মীরূপে মৌলানা শওকত আলীর আত্মোৎসর্গের কথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বহুদিন পর্যন্ত উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। কিছুকাল যাবৎ কংগ্রেসের সহিত মতে এবং পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন হ'লেও তিনি একজন উদারহৃদয় নৈতিক ছিলেন এবং আচরণে এবং ব্যবহারে তাঁর রীতি সরল।

লোকগত রাজা হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়—

দাবাদ লালগোলাধিপতি মহারাজা রাও শ্রীযুক্ত নারায়ণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র হেমেন্দ্রনাথ রায় রলোক গমন করেছেন। তিনি নিরতিশয় ধার্মিক, ী এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। পূজা অর্চনায় তাঁর শক্তি অনুরাগ ছিল। কিছুকাল থেকে তিনি দিন যাপন করছিলেন। বিচিত্রার সুপরিচিত নপ্রিয় কথাসাহিত্যিক কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র রায় মহাশয় পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথের একমাত্র মরা মহারাজ বাহাদুরকে এবং কুমার বাহাদুরকে তীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নিমন্ত্রণে

আপনি প্রিয়জনদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। রসনা তৃপ্তির জন্যও জিনিষপত্র আয়োজনে আপনার দিক্ থেকে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল, আপনার আনা ঘিয়ে জলতি বেশী গেছে শুধু নয়, জিনিষ দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ হ'য়েছে।

আপনি নিশ্চয়ই চান্ নি যে, শিশু, বালক-বালিকা, যুবক যুবতী, কিম্বা প্রাপ্ত বয়স্ক আপনার কত আত্মীয় আত্মীয়া, বন্ধু বান্ধবী, যাদের জন্য আপনি আহারের নানা ব্যবস্থা করেছেন, এবং যাদের এনেছেন, তারা আপনার এখানে এসে কোন রকম অসুখে পড়ে। আপনার এখানে যারা এসেছে, তারা আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রেই এসেছে।

ভোজ্য তালিকার (menu) আবশ্যকবোধ ২।১টা জিনিষ কম ক'রে আরও ভাল উপাদানগুলি আন্‌তে পারলে, বোধ হয় হিতে বিপরীত ঘটত না। হয়ত কোন সময় দামে কিছু বেশী পড়ে কিন্তু পরিণামে থাকে তৃপ্তি।

কেন এমন হয়? ঘিয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলীয় অংশ থাক্‌লে, কড়ায় জলতি বেশী যায়। পুরাণ ঘি কিম্বা ভেজাল ঘি থাক্‌লে অসুখ হয়, দুর্গন্ধ তো হবেই। ঘি, তেল, আটা ও ময়দা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাই সাবধান হ'তে এবং সকল রকম পচা খাদ্য হ'তে—।

'শ্রীঘৃতে'র মত টিনে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার "এগমার্ক" শীল পড়ে, সে ঘৃত জলীয় অংশ হ'তে পরিশুদ্ধ না হ'লে তা সম্ভব নয়, ঘৃত তাজা ও বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

যাকে বেশী লোক জানে ও বিশ্বাস করে, আপনিও তাকে করুন না। সেখানে আপনারও নিরাপত্তা ও তৃপ্তি সব চাইতে বেশী হওয়া সম্ভব।

কলিকাতা শ্রীনিকেতনের পণ্যভাণ্ডার—

সম্প্রতি কলিকাতায় ২১০ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীনিকেতনে প্রস্তুত যাবতীয় শিল্পসামগ্রীর একটি ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। এখানে শ্রীনিকেতনের শিল্পদ্রব্যাদি সর্বদা ক্রয়ার্থ পাওয়া যাবে। এই ভাণ্ডারের উদ্বোধন ক্রিয়া করেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়। উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে অভিভাষণ লেখেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তা উদ্বোধন সভায় পঠিত হয়। সেই অভিভাষণে অপূর্ব ভাষায় কর্মী রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা এবং ব্যথা ব্যক্ত হয়েছে। বিচিত্রার বর্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে সেই অভিভাষণ আমরা মুদ্রিত করলাম। আমরা ঐকান্তিক চিত্তে কামনা করি দেশবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণ যেন ব্যর্থ না হয়,—বহু পরিশ্রম এবং আত্মোৎসর্গের ফলে দেশকে রবীন্দ্রনাথ যে বস্তু দান করতে সমর্থ হয়েছেন দেশ যেন তা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবার যোগ্যতা লাভ করে।

পরলোকে চারুচন্দ্র—

বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে ক্ষতি হ'ল তা সামান্য নয়। বাঙলা সাহিত্যে চারুচন্দ্রের দান শুধু আয়তনেই প্রচুর নয়, উৎকর্ষেও শ্রেষ্ঠ। বাঙলা সাহিত্যের তিনি ছিলেন অনুরাগী সাধক। ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁকে ভগ্নোদ্যম করতে পারে নি। মৃত্যুর অব্যবহিত পর্যন্ত তাঁর লেখনী নিরলস ছিল।

চারুচন্দ্র শুধু শক্তিশালী কথা সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিদ্বান, জ্ঞানী; সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার ছিল অনন্যসাধারণ অধিকার। প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু সম্পাদন কার্য্যে যে শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা সর্বদা স্মরণীয় নয়।

ব্যক্তি হিসাবে চারুচন্দ্র ছিলেন অমায়িক, মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল। তাঁর অন্তরের সদ্‌গুণাবলীর প্রভাবে অবলীলাক্রমে অপরের হৃদয়কে জয় করতেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যু দ্বারা এই বাঙলা দেশের বহুজনকে তিনি বন্ধুহীন করে গেছেন।

সাহিত্যজগতে পরিচিত শ্রীমান প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় চারুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জামাতা। আমরা চারুচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।